সাহিত্য

মাসিকপত্র ও সমালোচন।

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি

সম্পাদিত

কলিকাতা

২।১ নং রামধন মিত্রের লেন, সাহিত্য-কার্য্যালয় হইতে
সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বর্ণানুক্রমিক সূচী

লেখকগণের নামানুক্রমিক সূচী।

চিত্রসূচী

সাহিত্য

মাসিকপত্র ও সমালোচন।

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি

সম্পাদিত

কলিকাতা

২।১ নং রামধন মিত্রের লেন, সাহিত্য-কার্য্যালয় হইতে
সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বর্ণানুক্রমিক সূচী

লেখকগণের নামানুক্রমিক সূচী।

চিত্রসূচী

বাঙ্গালীর আদর্শ।

অখণ্ড মহাকালকে খণ্ড খণ্ড করিয়া লইয়া তাহারই এক অংশকে অতীত বলি, এক অংশকে বর্ত্তমান বলি, আর এক অংশকে ভবিষ্যৎ বলি। প্রকৃতপক্ষে, তাহাদের মধ্যে এক অখণ্ড যোগসূত্র বর্ত্তমান আছে। ইতিহাস সেই যোগ-সূত্রের সন্ধান প্রদান করে।

তাহার সাহায্যে বুঝিতে পারি—সংসারে কেবল পরাজয় নাই, জয়-পরাজয় আছে; কেবল পতন নাই, উত্থান-পতন আছে;—কেবল মন্দ নাই, ভালমন্দ আছে। আছে বলিয়াই আশা আছে;—যে পরাজিত, তাহার আবার জয়লাভের আশা আছে;—যে পতিত, তাহার আবার উত্থিত হইবার আশা আছে;—যে মন্দ, তাহারও আবার ভাল হইবার আশা আছে।

ইহার কোনও নির্দ্দিষ্ট কাল নাই। তাহার শুভাগমনের আশায় কোনও গ্রহ নক্ষত্রের মঙ্গলময় আবর্ত্তনের অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতে হয় না। যখন যে জাতি প্রবল পুরুষকারের প্রয়োগ করিতে সমর্থ হয়, তখনই সেই কাল আপনা হইতেই আসিয়া উপস্থিত হয়।

আমাদিগের সেই কাল আসিতে পারে। মন্থরপদবিক্ষেপে সভয়ে সচকিত-চরণে গোপন পথে নহে; প্রকাশ্য রাজপথ দিয়া সুবিন্যস্ত সুদৃঢ় পদবিক্ষেপে দ্রুতবেগেই চলিয়া আসিতে পারে। যখন তাহা আসিবে, তখন আমরাও অভ্যুদয় লাভ করিতে পারিব।

অধঃপতনের কাল প্রকৃত সঙ্কট-কাল নয়; কিন্তু অভ্যুদয়ের কালই প্রকৃত সঙ্কট-কাল। আমরা এক দিন না একদিন অবশ্যই উঠিব,—জগতের জনসমাজের মধ্যে দশ জনের এক জন হইয়া উঠিব। কিন্তু কেমন হইয়া উঠিব? আমরা কি দৈত্যদানবের মত ক্ষমাশূন্য সীমাশূন্য বাহুবল লইয়া বসুন্ধরা হইতে সকল সভ্যতা, সকল শৃঙ্খলা, সকল উন্নতি চিরপদবিদলিত করিতে করিতে, প্রচণ্ড তাণ্ডবে জলস্থল কম্পান্বিত করিয়া উঠিব? অথবা জগতের সম্মুখে মানবতার মহান্ আদর্শ সুসংস্থাপিত করিবার জন্য ধর্ম্মের নামে, সত্যের নামে, প্রীতির নামে, পবিত্রতার নামে, মনুষ্যত্বের নামে, দেবত্বের নামে,—প্রসন্ননয়নে

প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিব ? আমরা কোন্ আদর্শের অনুগামী হইব, তাহার উপরই তাহা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিবে। তাই বলিয়াছি,—অভ্যুদয়ের কালই প্রকৃত সঙ্কটকাল।

ভাঙ্গা নহে, গড়া ;—গড়া নহে, সংশোধন ;—সংশোধন নহে, সংস্কার ;—সংস্কারও নহে, চিরাগতকে নবাগতের সঙ্গে সুসঙ্গতভাবে খাপ্ খাওয়াইয়া লওয়া,—ইহাই যে যুক্তিযুক্ত কার্য্য, বিচারবুদ্ধি তাহারই পক্ষ সমর্থন করিবে। তাহাই প্রকৃত লক্ষ্য বলিয়া সকলের নিকটেই প্রতিভাত হইবে।

এই লক্ষ্য স্থির করিতে হইলে বাঙ্গালীর আদর্শ স্থির করিয়া লইতে হইবে। অতীতে বাঙ্গালীর আদর্শ কিরূপ ছিল ;—বর্ত্তমানে বাঙ্গালীর আদর্শ কেমন আছে ; ভবিষ্যতে বাঙ্গালীর আদর্শ কেমন হওয়া উচিত ;—তাহা ভাবিয়া দেখিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।

ভবিষ্যতে বাঙ্গালীর আদর্শ কেমন হইয়া দাঁড়াইবে, বর্ত্তমান কিয়ৎপরিমাণে তাহার পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিবে। সুতরাং বর্ত্তমান কোন্ আদর্শের অনুসরণ করিতেছে, তাহার সন্ধান করা কর্ত্তব্য। তাহা আমাদের দেশকালপাত্রের পক্ষে কত দূর উপযোগী, তাহা বুঝিতে হইলে, অতীতের আদর্শ কেমন ছিল, তাহারও অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা তাহার সন্ধানে নিবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহারা আমাদের জাতীয় জীবনগঠনের প্রধান সহায়। তাঁহাদের তথ্যানুসন্ধানচেষ্টা যাহাতে প্রকৃতপথে প্রধাবিত হয়, তাঁহাদের অনুসন্ধানলব্ধ ঐতিহাসিক সত্য যাহাতে অকপটে সরলতার সহিত অসঙ্কোচে প্রচারিত হইতে পারে, তাহাতে উৎসাহদান করা পরমপবিত্র পুণ্যব্রত।

কেবল বড় লইয়া বাঙ্গালী নয়,—ছোট বড় লইয়াই বাঙ্গালী। কেবল ধনী লইয়া বাঙ্গালী নয়,—ধনী দরিদ্র লইয়াই বাঙ্গালী। কেবল শিক্ষিত লইয়া বাঙ্গালী নয়, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত লইয়াই বাঙ্গালী। বাঙ্গালী বহু জাতিতে বিভক্ত,—বহু ধর্ম্মে বিভক্ত,—বহু আচারব্যবহারে বিভক্ত,—মানবসভ্যতার বহু বিভিন্ন অবস্থানন্তরে অবস্থিত। ইহার জন্য অনেকে মনে করেন,—বাঙ্গালীর পক্ষে উন্নতিলাভ করা অসম্ভব। কিন্তু যে যুগে ফিলিপিনোর পক্ষে উন্নতিলাভ করা সম্ভব হইয়াছে, সে যুগে বাঙ্গালীর পক্ষে উন্নতিলাভ করা অসম্ভব হইবার আশঙ্কা নাই। বর্ত্তমান যুগে উন্নতিলাভের যে সকল উপায় ও অনুষ্ঠান আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা যখন মানবসমাজের অপরিজ্ঞাত ছিল,—তখন সেই তথাকথিত অন্ধকারাচ্ছন্ন মধ্যযুগেও—যে বাঙ্গালী উন্নতিসোপানে আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহার পক্ষে বর্ত্তমান যুগ অধিক অনুকূল বলিয়াই বিবেচিত হইবার যোগ্য।

আশাহীনের দল—চেষ্টাহীনের দল। তাহারা আলস্য চাহে,—আয়াস স্বীকার করিতে অসম্মত। তাহাদের যাহা কিছু আকাঙ্ক্ষা, তাহার মূল—ব্যক্তিগত সৌভাগ্যসঞ্চয়। তাহার প্রভাবে বাঙ্গালী মনুষ্যত্ব হারাইয়া, অভ্যোন্নতিলাভের অযোগ্য হইয়া পড়িতেছিল। সময় থাকিতে আবার সুবাতাস প্রবাহিত হইতেছে, আশা ডুবিতে ডুবিতে ভাসমান হইয়া উঠিতেছে। এ সময়ে আলোচনার আয়োজন করিয়া আপনারা সময়োচিত কর্ত্তব্যপালনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমার ন্যায় মফস্বলনিবাসী ক্ষুদ্র ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া সৌজন্যে সংবর্দ্ধনায় কৃতজ্ঞতাভারে ভারাক্রান্ত না করিয়া, কোনও যোগ্যতর ব্যক্তির উপর এই আলোচনার সূত্রপাত করিবার ভারার্পণ করিতে পারিলে, সর্ব্বাংশে সুশোভন ও সুসঙ্গত হইত।

আমি অধিক কথা শুনাইবার আশা প্রদান করিতে পারিব না। আমার কথা, অল্প কথা;—যেমন অল্প, সেইরূপ সরল ও বোধগম্য কথা। কারণ, আমি কেবল অতীতের কথাই শুনাইব,—অন্য কথা শুনাইবার চেষ্টা আমার পক্ষে অনধিকারচর্চ্চা হইবে। কেবল লর্ড অ্যাকৃটনের একটি কথার পুনরুক্তি করিয়া বলিয়া রাখিব,—"আজ যাহা ইতিহাসের কথা, একদিন তাহা প্রতিদিবসের শাসনতন্ত্রের কথা ছিল; আজ যাহা প্রতিদিবসের শাসন-তন্ত্রের কথা, কালে তাহাই আবার ইতিহাসের কথা বলিয়া পরিচিত হইবে।" অতীতের কথা ও বর্ত্তমানের কথা, একই পর্য্যায়ের কথা;—কেবল কালের পার্থক্যে একটির নাম ইতিহাস, অন্যটির নাম অন্য কিছু। সুতরাং অতীতকে বুঝিবার চেষ্টা বর্ত্তমানকে বুঝাইবার চেষ্টার নামান্তরমাত্র।

অতি অল্পদিনমাত্র আমাদের দেশে এই শুভ চেষ্টার সূত্রপাত হইয়াছে। এখনও সকল কথা বুঝিবার ও বুঝাইবার সময় উপস্থিত হয় নাই। সুতরাং অতীত সম্বন্ধেও অধিক কথা শুনাইতে পারিব না; আর যাহা শুনাইতে পারিব, তাহাও আমার নিজের কথা নয়, গৌড়লেখমালার কথা,—গৌড়সাহিত্যলীলার কথা,—গৌড়শিল্পকলার কথা। সে কথা পুরাতন লিখিত ও ক্ষোদিত লিপিতে স্থানলাভ করিয়া, কালসমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া, আমাদের গৃহদ্বারে উপনীত হইয়াছে। তাহাকে পরমাত্মীয়ের ন্যায় বরণ করিয়া লইতে হইবে, তাহার সাহায্যে বাঙ্গালীর আদর্শের সন্ধানলাভ করিতে হইবে;—তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিলে, যাহা যথার্থ আলোক, তাহাকে নির্ব্বাপিত করিয়া, অন্ধকারে কোলাহল করাই সার হইয়া রহিবে।

একবার বাঙ্গালী এক হইয়া উঠিয়াছিল। এক অনির্ব্বচনীয় মহাপ্রাণতায় অনুপ্রাণিত হইয়া, সমস্ত পার্থক্যের মধ্যে,—সমস্ত ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র স্বার্থের অপরিহার্য্য অসামঞ্জস্যের মধ্যে,—এক বিচিত্র সামঞ্জস্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছিল। বাঙ্গালার প্রকৃতিপুঞ্জ গোপালদেবকে রাজপদে নির্ব্বাচিত করিয়া, "পালসাম্রাজ্য" নামক ইতিহাসবিখ্যাত পরাক্রান্ত প্রবল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। অন্ধ্র-সাম্রাজ্য ভিন্ন, সমগ্র ভারতবর্ষে, পালসাম্রাজ্যের ন্যায় দীর্ঘস্থায়ী সাম্রাজ্য আর কখনও প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে নাই। ব্যক্তিগত প্রাধান্যসংস্থাপনের প্রবল স্বার্থ বিসর্জ্জন দিতে না পারিলে, এই কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারিত না। সুতরাং ইহা বাঙ্গালীর ইতিহাসের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কথা।

তাহার মূলমন্ত্র একতা,—তাহার মূলমন্ত্র স্বার্থত্যাগ,—তাহার মূলমন্ত্র অকৃত্রিম অনাবিল অপার স্বদেশপ্রীতি। সেই মূলমন্ত্র মহামন্ত্র,—তাহার প্রবল প্রভাবে কৃপণ মুক্তহস্ত হয়, আত্মম্ভরী পরসেবাব্রত গ্রহণ করে, কাপুরুষ লজ্জাহীন চির-বিভীষিকা বিসর্জ্জন দেয়। সেই মূলমন্ত্র মহামন্ত্র,—তাহার সাধনায় জনসমাজের শ্রমোপার্জ্জিত বিপুল 'ধনভাণ্ডার' "জলধিমূল-গভীরগর্ভ" সরোবর খনন করাইয়া, পিপাসাতুরকে জলদান করে; পান্থশালা নির্ম্মাণ করাইয়া, পরিশ্রান্ত পথপর্য্যটকের বিশ্রামস্থানের সুব্যবস্থা করিয়া দেয়; চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠাপিত করাইয়া, রোগার্ত্তের সেবা করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ে। সেই মূলমন্ত্র মহামন্ত্র,—তাহার প্রভাবে "কুলভূধরতুল্যকক্ষ" অগণ্য ধর্ম্মমন্দির গগনচুম্বী সমুচ্চশিখরে বিশ্বনিয়ন্তার সিংহাসনের দিকে দেশের সমগ্র নরনারীর জীবনগত চরম আকাঙ্ক্ষাকে নিয়ত ঊর্দ্ধে উত্তোলিত করিয়া রাখে। সেই মূলমন্ত্র মহামন্ত্র,—তাহা ভোগে সংযম, ত্যাগে শৃঙ্খলা, জ্ঞানে সত্যনিষ্ঠা, প্রেমে আন্তরিকতা, ধৈর্য্যে অবিচলচিত্ততা, বীর্য্যে অকুতোভয়তা ও কর্ম্মে অধ্যবসায় আনয়ন করিয়া, বৃহৎ বিজয়গৌরবে জনসমাজকে গৌরবান্বিত করে। ইহার কথাই বাঙ্গালীর পুরাতন ইতিহাসের প্রধান কথা।

তখনকার বাঙ্গালীর প্রধান আদর্শ ছিল,—জীবনযাত্রার আড়ম্বরশূন্য সরল ব্যবস্থার সঙ্গে উচ্চ চিন্তা ও মহোচ্চ অবদান। তাহা রাজাধিরাজকে পুত্রহস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিতে সমর্থ করিত;—রাজকুমারগণকে বোধিমার্গ হইতে "অবিনিবর্ত্তী" হইয়া, পুণ্যব্রত পালন করিতে উৎসাহদান করিত। ভোগের সঙ্গে ত্যাগের,—ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে অস্খলিত

পরসেবা-পরায়ণতার—বীর্য্যের সঙ্গে ক্ষমার, সমন্বয়সাধন করাইয়া, সে আদর্শ বাঙ্গালীকে মানব-শক্তির মূল প্রস্রবণের সন্ধান প্রদান করিত। তাহার ফলে সে কালের বাঙ্গালী স্বয়ং সমুন্নত হইয়া, অগণ্য অনুন্নত মানবসমাজকে সমুন্নত করিয়াছে;—যাহার সভ্যতা ছিল না, তাহাকে সভ্যতা দান করিয়াছে; যাহার সমাজশৃঙ্খলা ছিল না, তাহাকে সমাজশৃঙ্খলা দান করিয়াছে; যাহার শিল্প-সাহিত্য-ধর্ম্মনীতি ছিল না, তাহাকে শিল্পসাহিত্য-ধর্ম্মনীতি দিয়া, মনুষ্যত্বের সঙ্গে দেবত্ব দান করিয়াছে;—ভারতবর্ষের বাহিরে এক বৃহত্তর ভারতবর্ষের সীমাবিস্তার করিয়া, জলে স্থলে ভারতবর্ষের প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। কি উত্তালতরঙ্গ-তাড়িত মহাসাগরবক্ষ, কি উত্তপ্তবায়ুবিধ্বস্ত মহামরুভূমি, কি অনাদিকাল-পরিপুষ্ট-বনানী-বিজড়িত পর্ব্বত-প্রাচীর,—কিছুই বাঙ্গালীর যাত্রাপথে বাধার সৃষ্টি করিতে পারে নাই। কারণ, তখনকার অধ্যবসায় জীবহিতকামনায় অকুতোভয় ছিল;—জ্ঞান-প্রচারে জুগুপ্সা, ধর্ম্মপ্রচারে পররাজ্য-লালসা, সভ্যতা-বিস্তারে পরকীর্ত্তি-বিনাশলোলুপতা তাহাকে স্বার্থান্ধ করিতে পারিত না।

তখনকার চরিত্রের আদর্শের পরিচয় দিতে হইলে, কেহ বলিতেন;—"জ্ঞানে বৃহস্পতি,—তেজে দিনপতি,—পুরুষকারে শ্রীপতি,—ধৈর্য্যে অশ্বপতি,—ধনে ধনপতি,—দানে চম্পাপতি।" তাহাকে আরও ভাল করিয়া বুঝাইবার জন্য কেহ বলিতেন,—"যুধিষ্ঠিরে সত্যবাক্য,— পর্ব্বতমালায় স্থিরত্ব,—সমুদ্রে গাম্ভীর্য্য,—বৃহস্পতিতে গুণশালিনী বুদ্ধি—ভাস্করে তেজস্বিতা।"

জ্ঞান-বুদ্ধি-সত্যনিষ্ঠা চাই,—তাহার অভাবে ব্যক্তি বা জাতি ধৈর্য্য-বীর্য্য-গাম্ভীর্য্য লাভ করিতে পারে না। ধৈর্য্য-বীর্য্য-গাম্ভীর্য্য চাই,—তাহার অভাবে ব্যক্তি বা জাতি তেজস্বিতা ও সৎপৌরুষ লাভ করিতে পারে না। তেজস্বিতা ও সৎপৌরুষ চাই, তাহার অভাবে ব্যক্তি বা জাতি প্রকৃত অভ্যুদয় লাভ করিতে পারে না। জ্ঞান-বুদ্ধি-সত্যনিষ্ঠা-হীন বাঙ্গালী বাঙ্গালী নয়,—ধৈর্য্য-বীর্য্য-গাম্ভীর্য্য-হীন বাঙ্গালী বাঙ্গালী নয়;—তেজস্বিতা-সৎপৌরুষ-হীন বাঙ্গালী বাঙ্গালী নয়;—সেরূপ অন্তঃসারশূন্য বাঙ্গালীর মধ্যে বাঙ্গালীর ইতিহাসের ধারা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

এই সকল চরিত্রাদর্শ সেকালের রাজচরিত্রে কত দূর বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল, রাজপ্রশস্তিতে তাহার কিছু কিছু পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। "পৃথু, রঘুবংশাবতংস রামচন্দ্র, নল প্রভৃতি যে সকল গুণাধার পূর্ব্ব নরপাল সময়ে সময়ে ধরণীতলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে এক সময়ে একত্র দর্শন করিবার ইচ্ছায়

বিধাতা যেন নরপালকুল-গৌরব-সংহারক ধর্ম্মপালকে কলিযুগের চিরচঞ্চল-লক্ষ্মী-করিণীর বন্ধনোপযোগী মহাস্তম্ভরূপে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন।"

জনসমাজ এই রাজচরিত্রে মুগ্ধ হইয়া ধর্ম্মপালের গুণগান করিত। "সীমান্ত-দেশে গোপগণ কর্ত্তৃক,—বনে বনচরগণ কর্ত্তৃক,—গ্রামসমীপে জনসাধারণ কর্ত্তৃক,—গৃহচত্বরে ক্রীড়াশীল শিশুগণ কর্ত্তৃক,—প্রত্যেক ক্রয়বিক্রয়স্থানে বণিক্‌গণ কর্ত্তৃক,—এবং বিলাসগৃহের পিঞ্জরাবস্থিত শুকগণ কর্ত্তৃক,—গীয়মান আত্মস্তব শ্রবণ করিয়া, এই নরপতির বদনমণ্ডল লজ্জাবশে নিয়ত ঈষৎ বক্রভাবে বিনম্র হইয়া রহিত।"

পৃথিবীর কোন্ দেশের, কোন্ যুগের, কোন্ রাজা এরূপ লোকপ্রিয় হইতে পারিয়াছিলেন, তাহা অনুসন্ধানের বিষয়। ইহাতে যেমন রাজ-চরিত্রের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেইরূপ প্রজা-চরিত্রেরও আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহারা গুণমুগ্ধ ছিল; শাসন-তৃপ্ত ছিল; রাজানুরক্ত ছিল; এবং তাহাদের এই অকৃত্রিম অনুরাগই রাজশক্তিকে অজেয় শক্তি দান করিয়াছিল। লোক-সমাজে চরিত্রের উচ্চ আদর্শ বর্ত্তমান না থাকিলে, রাজচরিত্র এত সমুন্নত হইতে পারিত না। এরূপ রাজ-চরিত্র সামন্ত-মণ্ডলীতে কিরূপ স্বামিনিষ্ঠার ও রাজভক্তির প্রতিষ্ঠা-সাধন করিয়াছিল, তাহার উল্লেখ না করিয়া, পরাভূত ও বশীকৃত শত্রুমণ্ডলীতে কিরূপ অনুরক্তির সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহার উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে।

"এই নরপতি, দিগ্বিজয়াবসানে উৎকৃষ্ট পুরস্কার-বিতরণের দ্বারা পরাজিত ভূপালবৃন্দের পরাজয়-জনিত চিত্তক্ষোভ দূরীভূত করিয়া, তাঁহাদিগকে স্ব স্ব ভবনে গমন করিবার অনুজ্ঞা প্রচার করিলে, ভূপালবৃন্দ স্ব স্ব রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া, যখন রাজাধিরাজের সমুন্নত কার্য্যকলাপের চিন্তা করিতে বসিতেন, তখন তাঁহাদের হৃদয়, পুণ্যক্ষয়ে স্বর্গচ্যুত জাতিস্মরগণের হৃদয়ের ন্যায়, প্রীতিভরে উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিত।"

রাজচরিত্রের ন্যায় মন্ত্রি-চরিত্রও উল্লেখযোগ্য। ধনাঢ্য ও সুপণ্ডিত মন্ত্রীতে একত্র মিলিত হইয়া, পরস্পরের সখ্যলাভের জন্যই, স্বাভাবিক শত্রুতা পরিত্যাগ করিয়া, লক্ষ্মী-সরস্বতী উভয়েই "একত্র অবস্থান করিতেন। শাস্ত্রানুশীলনলব্ধ গভীরগুণসংযুক্ত বাক্যে মন্ত্রী যেমন বিদ্বৎসভায় প্রতিপক্ষের মদগর্ব্ব চূর্ণ করিয়া দিতেন, যুদ্ধক্ষেত্রেও সেইরূপ অসীম বিক্রমপ্রকাশে অল্পক্ষণের মধ্যেই শত্রু-

হয় না, মন্ত্রী সেরূপ বৃথা কর্ণসুখকর অলীক বাক্যের অবতারণা করিতেন না ; যে দান পাইয়া, অভীষ্ট পূর্ণ হইল না বলিয়া, যাচককে অন্যের নিকট গমন করিতে হয়, সেরূপ কেলিদানেরও অভিনয় করিতেন না।"

সমাজ-শিক্ষক ব্রাহ্মণের পবিত্র চরিত্রের বর্ণনা করিতে গিয়া, সেকালের কবি লিখিয়া গিয়াছেন,—"গুণগ্রামের উল্লেখ করা দূরে থাকুক, নামমাত্রের উল্লেখ করিলেই সমস্ত পাপপ্রপঞ্চ বিনষ্ট হইয়া যাইত।"

সমাজস্থিতির জন্য ও জাতীয় অভ্যুদয়লাভের জন্য ধনী দরিদ্রের প্রকৃত সম্বন্ধ নির্ণীত হওয়া আবশ্যক। সে কালের জনৈক ধনাঢ্যের চিত্তবৃত্তি এ সম্বন্ধে একটি উল্লেখযোগ্য পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছে। তিনি "যাচকগণকে যাচক মনে করিতেন না ;—মনে করিতেন, যেন তাঁহার দ্বারা অপহৃতবিত্ত হইয়াই যাচক যাচক হইয়া পড়িয়াছে।" দানে এইরূপ সমুন্নতচিত্তবৃত্তি দাতাকে গর্ব্বস্ফীত করিতে পারে না,—যাচককেও আত্মগ্লানিতে অবসন্ন করিয়া দেয় না।

সেকালের বাঙ্গালী-চরিত্রের এই সকল আদর্শ বাঙ্গালীকে কিরূপ সত্যনিষ্ঠ করিয়াছিল, সন্ধ্যাকর নন্দী তাঁহার রামচরিতম্ কাব্যে মুক্তকণ্ঠে শত্রুপক্ষের গুণাবলীর কীর্ত্তন করিয়া, তাহার পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। অনেকে মনে করেন, সেকালে পরলোকই প্রধান লক্ষ্য ছিল ; ইহলোকের জন্য লোকসমাজ লালায়িত ছিল না ; সুতরাং এই সকল উচ্চ আদর্শ প্রচলিত হইতে পারিয়াছিল। ইহলোকের অভ্যুদয় লাভ করিবার পক্ষে ইহা সহায় হইতে পারে না। সেখানে শঠতাকে শাঠ্যে,—অত্যাচারকে অত্যাচারে,—অবিচারকে অবিচারে,—লুণ্ঠনকে লুণ্ঠনেই পরাভূত করিতে হইবে। ইহা সেকালের ইতিহাসের কথা নহে। ইহা বাঙ্গালীর আদর্শ বলিয়াও পরিচিত ছিল না। অকুতোভয় বাঙ্গালীর একটিমাত্র ভয়ের স্থান ছিল,—তাহা "ভবজলধিনিপাতে" পতিত হইবার ভয়। ইহা সেই "ভবজলধি-নিপাতে" পতিত হইবার প্রশস্ত পথ ;—যাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে, দমন করিতে হইবে, শাসন করিতে হইবে, লোকসমাজ হইতে চিরনির্ব্বাসিত করিতে হইবে, ইহা তাহারই কুটিলকবলে সর্ব্বাগ্রে আত্মসমর্পণ ! এই আদর্শ লোকস্থিতি বিধ্বস্ত করিয়া, ইউরোপে মহাসমরানল প্রজ্বলিত করিয়া দিয়াছে। ইহা যেন কখনও আমাদের মধ্যে সংক্রামিত না হইতে পারে।

ইহলোক-পরলোকের পার্থক্য কৃত্রিম পার্থক্য,—যাহা পরলোকের কল্যাণকর, তাহাই ইহলোকেরও প্রকৃত অভ্যুদয়-সাধক। সেকালের পারলৌকিক সাংগতিকামনাপূর্ণ সবল সুদৃঢ় চরিত্রবল ইহলোকের বিবিধ বিজয়-সাধনের অন্তরায় হয়

নাই। বাঙ্গালীর বাহুবল কান্যকুব্জের সিংহাসনে রাজ-প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠাপিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল,—"মনোহর ভ্রূভঙ্গিবিকাশে ইঙ্গিতমাত্রে ভোজ-মৎস্য-মদ্র-কুরু-যদু-যবন-অবন্তি-গান্ধার-কীর প্রভৃতি বিভিন্ন জনপদের সামন্ত নরপাল-গণকে প্রণতি-পরায়ণ চঞ্চলাবনত-মস্তকে 'সাধু সাধু' বলিয়া তৎকার্য্যের গুণ-কীর্ত্তন করাইতে" সমর্থ হইয়াছিল। তখনকার রাজধানী তপস্যাপরায়ণ তপো-ধনের তপোবনের মত শান্তরসাস্পদ আশ্রমভূমি ছিল না;—"ভাগীরথীপ্রবাহ-প্রবর্ত্তমান নানাবিধ রণতরণী সেতুবন্ধনিহিত-শৈলশিখরশ্রেণীরূপে লোকের মনে বিভ্রমের উৎপাদন করিত—নিরতিশয় ঘনসন্নিবিষ্ট ঘনাঘন নামক মদ-মত্ত রণকুঞ্জর-নিকর জলদজালবৎ প্রতিভাত হইয়া দিনশোভাকে শ্যামায়মান করিয়া, লোকের মনে নিরবচ্ছিন্ন জলদসময়-সমাগমসন্দেহের উৎপাদন করিয়া দিত;—উত্তরাঞ্চলাগত অগণ্য মিত্ররাজন্য কর্ত্তৃক উপঢৌকনীকৃত অসংখ্য অশ্ব-বাহিনীর প্রখরখুরোৎক্ষিপ্ত ধূলিপটলসমাবেশে দিঙ্মণ্ডলের অন্তরাল নিরন্তর ধূসরিত হইয়া থাকিত;—রাজ-রাজেশ্বর-সেবার্থ সমাগত সমস্ত জম্বুদ্বীপাধিপতি-গণের অনন্ত পদাতি-পদভরে বসুন্ধরা অবনমিত হইয়া পড়িত।" অপিচ, "পরাজিত শত্রুনরপালগণের মুকুট-সমাহৃত-স্বর্ণ-নির্ম্মিত সিংহমূর্ত্তি সমুচ্চ প্রাসাদ-শিখরে সংস্থাপিত হইয়া, গ্রাস-ত্রাস-সন্ত্রস্ত চন্দ্রমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী বিম্বাঙ্করূপী মৃগকে পলায়নপর করিবার উপক্রম করিত।" তখনকার রাজাধিরাজ "প্রকটলীলাচলিত-সেনাবল সমভিব্যাহারে দিগ্‌বিজয়ার্থ বহির্গত হইলে, সেনাভারাক্রান্ত বিচলিত পর্ব্বতমালা বক্রভাব প্রাপ্ত হইত;—তাহাতে মস্তকাবস্থিত নম্রীকৃত মণিসঙ্কুচনে মস্তকে বেদনা অনুভব করিয়া বাসুকি বেদনাক্রান্ত শিরঃসমূহের বেদনানিবারণের জন্য হস্তোদ্গম করিতে বাধ্য হইত।" দিগ্‌বিজয়প্রবৃত্ত নরপতির ভৃত্যবর্গ "কেদারতীর্থে যথাবিধি স্নান তর্পণ করিয়া, গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে ও গোকর্ণতীর্থে ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া, দুষ্টদলন-শিষ্টপালন-বিষয়ক ইহলৌকিক কার্য্যে পার-লৌকিক সাংগতি সঞ্চয় করিত।" রাজসেনাপতি দিগ্বিজয়ার্থ চতুর্দ্দিকে প্রধাবিত হইলে, "দূর হইতে তাঁহার নামমাত্র শ্রবণ করিয়া, উৎকলাধীশ অবসন্নহৃদয়ে রাজ-ধানী পরিত্যাগ করিতেন,—প্রাগ্‌জ্যোতিষের অধীশ্বর রাজাদেশ মস্তকে ধারণ করিয়া সন্ধি বন্ধন করিতেন।" তখনকার গৌরবমণ্ডিত গৌড়জনগণের বিজয়-গৌরবে "দাক্ষিণাত্যের শিল্পরুচি অতিক্রান্ত হইয়াছিল; লাট দেশের কমনীয় কান্তি আবিল হইয়া গিয়াছিল; অঙ্গদেশ অবনত হইয়া পড়িয়াছিল; কর্ণাটের লোলুপদৃষ্টি অধোমুখে অবস্থিত থাকিতে বাধ্য হইয়াছিল; মধ্যদেশের রাজ্যসীমা

সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছিল।” ইহা ইহলোকেরই বিজয়বার্ত্তা বিঘোষিত করিয়া দেয়। ইহাতে দুষ্টদলন-শিষ্টপালন-নীতির যেরূপ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার সহিত শাঠ্যের সম্পর্ক ছিল না,—ছল-প্রতারণার সম্পর্ক ছিল না,—লুণ্ঠন-লোলুপতার সম্পর্ক ছিল না। বরং শত্রুকে অন্তরঙ্গ মিত্রমধ্যে পরিণত করিয়া লইবার শাসন-কৌশলের ও চরিত্রগত অসামান্য উদারতারই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। তাহা আপনাকে পর করিত না,—পরকেই আপন করিয়া লইতে পারিত। তাহা গুপ্তহত্যার অকীর্ত্তিকর ছদ্মবেশকে বীরত্ব বলিয়া সমাদর করিতে জানিত না;—উন্মুক্ত করাল-করবালকে অকাতরে চুম্বন করিতে পারিত। তাই তাহার মহত্ত্বের মহনীয় পাদপদ্মে পরাভূত অরাতিনিকর সসম্ভ্রমে মস্তক অবনত করিতে বাধ্য হইত।

এই যুগের চরিত্রের আদর্শ কিরূপ ছিল, সাহিত্য অপেক্ষা শিল্পে তাহার অধিক পরিচয় প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা। সাহিত্য ব্যক্তিগত চিত্তবৃত্তির পরিচয় প্রদান করে; চিরপ্রচলিত সর্ব্বলোকনমস্কৃত সনাতন আদর্শকে চিরজাগরূক রাখিবার জন্য পুনঃ পুনঃ পুরাতন কথারই পুনরাবৃত্তি করিয়া থাকে। সাহিত্য জনসমাজের সর্ব্বোচ্চস্তরাবস্থিত অল্পসংখ্যক ভাগ্যবানের ভাবপ্রবাহের অভিব্যক্তি। শিল্পের অবস্থা সম্পূর্ণ পৃথক্। তাহার ভাষা বিশ্বমানবের সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বভৌমিক ভাষা। তাহা অকপটে অকুতোভয়ে অনায়াসবিন্যস্ত বিচিত্র রেখাসম্পাতে জনসমাজের হৃদয়নিহিত চিরসুন্দরের চিরন্তন চিন্তার বাহ্যবিকাশে মানবসমাজের উন্নতি-অবনতির অকৃত্রিম দৃশ্যপট উদ্‌ঘাটিত করিয়া প্রকৃত আদর্শের সন্ধান প্রদান করে।

শিল্পে চরিত্রের আদর্শ কত দূর অভিব্যক্ত হয়, অল্পদিনমাত্র তাহার অনুসন্ধান-চেষ্টা আরব্ধ হইয়াছে,—তাহা আমাদের দেশে এখনও বহুসংখ্যক সুশিক্ষিত ব্যক্তিকে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। যে অল্পসংখ্যক কলাকুতূহলী শিল্পসাধক, সেকালের শিল্প-সম্পদের মর্য্যাদা উপলব্ধি করিবার আশায়, তাহার যথাসাধ্য অনুকরণচেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহারা নানা নিন্দা প্রশংসার ভিতর দিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছেন। কিন্তু তাঁহারা এখনও আমাদিগকে একটী মূলসূত্র বুঝাইবার আয়োজন করেন নাই;—শিল্পের প্রকৃতিগত আদর্শ দীর্ঘকাল প্রচলিত থাকিতে সমর্থ হইলেও, তাহার আকৃতিগত আদর্শ অল্পকালের মধ্যেই পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়,—এখন আর সে কালের আকৃতিগত আদর্শের অনুকরণচেষ্টা আধুনিক শিল্পচর্চ্চাকে সফল করিয়া তুলিতে পারিবে না। সেকালের শিল্পই সেকালের শিল্পের

সূত্র, ভাষ্য ও ভাষ্যপ্রদীপ ছিল।—একালের অনুকরণ টিপ্পনী তাহাকে অধিক উদ্ভাসিত করিয়া তুলিতে পারিবে না। সে কালের শিল্পের প্রধান লক্ষণ কিরূপ ছিল, তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেই দেখিতে পাওয়া যায়,—তাহা বৃহৎ, এবং সুন্দর। তাহাতে আকৃতিপ্রবণতা অপেক্ষা ভাবপ্রবণতা অধিক ছিল। তাহা যেন জাতীয় জীবনের নব যৌবনরসের অমৃতধারার উন্মুক্ত প্রস্রবণ। সে দিন নাই; সে যৌবন-তরঙ্গ নিরস্ত হইয়াছে; সে অমৃত-প্রস্রবণও শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। এখন তাহার আকৃতিগত আদর্শের অনুকরণচেষ্টা সফল হইলেও, তাহার প্রকৃতিগত আদর্শ আবার ফুটাইয়া তুলিতে পারা অসাধ্যসাধন বলিয়াই প্রতিভাত হয়। এই জন্য প্রত্যেক যুগের শিল্পের মধ্যে সেই যুগের এক একটি স্বাতন্ত্র্যের ছাপ দৃঢ়-মুদ্রিত হইয়া থাকে; তাহার সাহায্যে সেই সেই যুগের লোক-চরিত্রের আদর্শ আবিষ্কৃত ও আলোচিত হইতে পারে। গৌড়-শিল্পের সর্ব্বাঙ্গে যে ছাপটি সর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে, তাহা ভক্তি,—"সা পরানুরক্তিঃ।", সেই অনুরক্তি সাধকের অনুরক্তি,—রসজ্ঞের অনুরক্তি,—প্রেমিকের অনুরক্তি। শিল্প-নিদর্শনের মধ্যে তাহার অনেক পরিচয় আবিষ্কৃত হইতেছে; শিল্প-নিহিত মৌন-প্রসন্নতাই তাহাকে সুচারুরূপে অভিব্যক্ত করে। কিন্তু এক জন শিল্পী একটি সুললিত কবিতা লিখিয়াও তাহার পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। এক খণ্ড মসৃণীকৃত কৃষ্ণমর্ম্মরে একটী প্রশস্তি উৎকীর্ণ করিয়া, শিল্পী সকলের শেষে একটী শ্লোক সংযুক্ত করিয়া জানাইয়া দিয়াছেন,—"প্রেমিক যেমন প্রেমবিহ্বলচিত্তে অনন্যমনা হইয়া, প্রিয়তমার কমনীয় কপোলে পত্রলেখা রচনা করিয়া থাকেন, শিল্পীও সেইরূপ প্রেমবিহ্বলচিত্তে অনন্যমনা হইয়া, প্রস্তরফলকে অক্ষরবিন্যাস করিয়াছেন।"

আর এক শিল্পী এক ধূসরবর্ণের সুবৃহৎ অখণ্ড প্রস্তরখণ্ডে এক গরুড়স্তম্ভের রচনা করিয়া, স্তম্ভ-প্রতিষ্ঠাতার আদর্শ-চরিত্রের পরিচয়-প্রদানের জন্য স্তম্ভগাত্রে এই কথাগুলি উৎকীর্ণ করিয়া গিয়াছেন;—"তাঁহার সুকুমার শরীর-শোভার ন্যায় লোকলোচনের আনন্দদায়ক,—তাঁহার উচ্চান্তঃকরণের অতুলনীয় উচ্চতার ন্যায় উচ্চতাযুক্ত,—তাঁহার সুদৃঢ় প্রেমবন্ধনের ন্যায় দৃঢ়-সংবদ্ধ,—কলি-হৃদয়-প্রোথিত শল্যবৎ সুস্পষ্ট প্রতিভাত এই স্তম্ভে, তাঁহারই যত্নে হরির প্রিয়সখা ফণিগণের চিরশত্রু এই গরুড়-মূর্ত্তি আরোপিত হইয়াছে।"

উচ্চ আদর্শ, উচ্চ চিন্তা, উচ্চ আকাঙ্ক্ষা শিক্ষা অপেক্ষা দৃষ্টান্তের দ্বারা অধিক দ্রুতবেগে জনসমাজের অন্তঃকরণে অনুপ্রবিষ্ট করাইতে পারা যায়। শিল্প তাহার

পক্ষে সর্ব্বপ্রধান অবলম্বন। সেই অবলম্বনের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, সেকালের বাঙ্গালী বিবিধ প্রস্তরমূর্ত্তিতে ও ধাতুমূর্ত্তিতে যে অনিন্দ্যসুন্দর কলাকৌশল বিকশিত করিয়া তুলিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিত, তাহার মধ্যে তন্ময়ত্বই সর্ব্বাগ্রে নয়নপথে পতিত হইয়া থাকে। যে শিল্পনিদর্শনের মধ্যে তন্ময়ত্ব যত অধিক, সে শিল্প তত সমুন্নত চরিত্রাদর্শের পরিচয় প্রদান করে। শিল্পীর চরিত্রের আদর্শ অজ্ঞাতসারে শিল্পের মধ্যে অনুস্যূত হইয়া পড়ে।

ইহাই স্বভাবের নিয়ম। যদি এক বর্ণও লিখিত প্রমাণ বর্ত্তমান না থাকিত, তথাপি পুরাতন গৌড়-শিল্পকলার ধ্বংসাবশিষ্ট অল্প নিদর্শনই গৌড়জনের চরিত্রাদর্শের অনেক পরিচয় প্রদান করিতে পারিত। তাহার দৃঢ়তা-ব্যঞ্জক স্থিতি-ভঙ্গী, গাম্ভীর্য্য-ব্যঞ্জক গতি-ভঙ্গীর পরিচয় প্রদান করিত;—তাহার অনাবিল সরল দৃষ্টিপাত, অপাপবিদ্ধ পবিত্র হৃদয়ের পরিচয় প্রদান করিত;—তাহার আড়ম্বরপূর্ণ বস্ত্রালঙ্কারের শিল্প-সুষমা, তাহার ঐশ্বর্য্যগর্ব্বের পরিচয় প্রদান করিত;—তাহার বিবিধ আয়ুধ-বিন্যাস, তাহার অপরিসীম শৌর্য্য-বীর্য্যের পরিচয় প্রদান করিত;—তাহার শিল্প-সমুজ্জ্বল রত্ন-মুকুট, তাহার উন্নত ললাটপটের অকপট মহত্ত্ব-মহিমা উদ্ভাসিত করিয়া রাখিত। সকলের উপর, এমন এক শান্ত সমাহিত মধুর-মূর্ত্তি নয়নপথে পতিত হইত যে, তাহা জন-সমাজের শান্ত সমাহিত আত্মরত আত্মতৃপ্ত মধুর মূর্ত্তির ছায়া বলিয়াই প্রতিভাত হইত। দেখিবামাত্র স্বীকার করিতে হইত—"আত্ম-শক্তিতে অটল বিশ্বাস সে কালের গৌড়-শিল্পের সকল রেখা-সম্পাতেই সমানভাবে ফুটিয়া রহিয়াছে।"

বাঙ্গালীর সকল আদর্শই বাঙ্গালীর দেশ-কাল-পাত্রের উপযোগী ছিল। বর্ত্তমানে বা ভবিষ্যতে বাঙ্গালী যেরূপ আদর্শেরই অনুসরণ করুক না কেন, তাহাকে বাঙ্গালার দেশ-কাল-পাত্রের উপযোগী করিয়া লইতে পারিলেই, বাঙ্গালী বাঙ্গালী থাকিয়া উন্নতি লাভ করিতে পারিবে। আত্মচেষ্টায় অবিশ্বাস, আত্মসামর্থ্যে অবিশ্বাস, আত্মগৌরবে অনাসক্তি, বাঙ্গালীকে পরমুখাপেক্ষী করিয়া তুলিয়াছে। ছোট বড়, ধনী দরিদ্র, শিক্ষিত অশিক্ষিত—সকলেই এক কৃত্রিম পার্থক্যের কল্পনায়, তাহাকে উন্নতিলাভের অন্তরায় মনে করিয়া, অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এই পার্থক্য সকল দেশেই বর্ত্তমান আছে; সকল দেশেই অল্পাধিকমাত্রায় চিরকাল বর্ত্তমান থাকিবে। কিন্তু এই অপরিহার্য্য পার্থক্য বর্ত্তমান থাকিতেও পুরাকালের বাঙ্গালী গুণাবলীকেই প্রকৃত "পূজাস্থান" বলিয়া সকল কার্য্যে স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। ইহা চরিত্রগত প্রশংসনীয় উদারতার দেদীপ্যমান অনাচ্ছন্ন অনির্ব্বচনীয় নিদর্শন।

বাঙ্গালী যখন "মাৎস্যন্যায়ে"র সুদীর্ঘ অরাজকতার অত্যাচারদূরীকরণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া ক্ষুদ্র-স্বার্থ-বিসর্জ্জনে স্বদেশের প্রকৃত কল্যাণসাধনের আশায় রাজা নির্ব্বাচন করিতে অগ্রসর হইয়াছিল, তখন হিন্দু বৌদ্ধ সকলে মিলিয়া বৌদ্ধকে রাজপদে নির্ব্বাচিত করিয়াছিল; ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ সকলে মিলিয়া ব্রাহ্মণকে মন্ত্রিপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছিল। আবার যখন নির্ব্বাচিত নরপালের বংশধরের অনীতিকারম্ভে উৎপীড়িত হইয়া, বরেন্দ্রমণ্ডলের প্রজাপুঞ্জ মুক্তিলাভের আশায় নায়ক নির্ব্বাচনের প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিল, তখনও সকলে মিলিয়া অম্লানচিত্তে কৈবর্ত্তকে নায়ক-পদে নির্ব্বাচিত করিতে দ্বিধা করে নাই।

এই উদারতার মূল—বাঙ্গালীর ধর্ম্মবিশ্বাস। তাহা সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে এক অনির্ব্বচনীয় সামঞ্জস্য সংস্থাপিত করিয়া দিয়াছিল। তাহা সকল নরনারীকে সাধনমার্গে যথাযোগ্য অধিকার দান করিয়া, বুঝাইয়া দিয়াছিল, তাঁহাকে জানাই জানা, যাগ যজ্ঞ পণ্ডশ্রম। তাঁহাকে জানিলে, তাহা পণ্ডশ্রম;—তাঁহাকে না জানিলেও, তাহা পণ্ডশ্রম। এই শিক্ষা তন্ত্রের শিক্ষা। ইহাতে সকল কৃত্রিমতার অলীক বন্ধন স্খলিত হইয়া পড়িয়াছিল। জনসমাজ বুঝিয়াছিল, এবং গায়িয়াছিল,—

"কুলকুণ্ডলিনী যার জাগে,
যার না জাগে,
কি করিবে তার, বল, জপ-তপ-যোগ-যাগে?"

কুলকুণ্ডলিনী জাগিলে, সভা-সমিতির আলোচনা অনাবশ্যক। কুলকুণ্ডলিনী না জাগিলেও, সভা-সমিতির আলোচনা অনাবশ্যক। তাই বলি, একবার জাগ মা! জাগিবামাত্র বাঙ্গালীর নিকট বাঙ্গালীর আদর্শ আবার জাগিয়া উঠিতে পারিবে। নমস্তস্যৈ! *

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

---

* কলিকাতার 'সরস্বতী ইনষ্টিটিউটে'র গত বার্ষিক সভার অধিবেশনে পঠিত।

প্রাচীন শিল্প-পরিচয়।

চর্ম্ম।

পূর্ব্বকালে যে সকল উপাদানে ভদ্রসমাজের ব্যবহারোপযোগী পাত্রাদি নির্ম্মিত হইত, স্মৃতিসংহিতায় দ্রব্যের শুদ্ধিবিধান প্রসঙ্গে, শ্রাদ্ধক্রিয়ার পাত্র-নির্দ্দেশ প্রসঙ্গে, গৃহস্থাদির ভোজনপাত্র, জলপাত্র প্রভৃতির বিধি-নিষেধে, গৃহ্যসূত্রে সংস্কারের উপযোগী দ্রব্যবিধানে, এবং কাব্য ইতিহাসাদি গ্রন্থে বিলাসোপকরণ, উপঢৌকন প্রভৃতির বর্ণনায় তাহার অনেক বিবরণ অবগত হইতে পারা যায়।

তন্মধ্যে চর্ম্ম একটি অতি পুরাতন উপাদান, তাহা মানব-সমাজের অভ্যুদয়-কাল হইতেই নানা কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

স্পৃশ্যাস্পৃশ্য-ভেদে চর্ম্ম দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইবার যোগ্য। অস্পৃশ্য জন্তুর চর্ম্ম অস্পৃশ্য ও তজ্জন্য ভদ্রসমাজে ব্যবহারের অযোগ্য বলিয়া নিন্দিত ছিল; স্পৃশ্য জন্তুর চর্ম্ম অস্পৃশ্য বলিয়া পরিচিত ছিল না।

মহর্ষি বোধায়ন বলিয়াছেন,—স্বর্ণ, মণি, রজত, শঙ্খ, শুক্তি, প্রস্তর, বজ্র (হীরক), বংশ, রজ্জু, চর্ম্ম, এই সকল পদার্থ জলের দ্বারা শুদ্ধ হয়। (১)

ফল, বস্ত্র, বিদল ও চর্ম্ম জলের দ্বারা শুদ্ধ হয়। (২)

বায়ুপুরাণে কথিত হইয়াছে যে, অরিষ্ট (নিম্ব), বিল্ব ও ইঙ্গু, ইহাদের দ্বারা চর্ম্মের শুদ্ধি সম্পাদিত হয়। (৩)

ভগবান্ মনুর উক্তিতে বস্ত্রের মত চর্ম্মের শুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। (৪)

মনু-স্মৃতির প্রসিদ্ধ ভাষ্যকার মেধাতিথি অভিমত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন যে, দ্রব্যশুদ্ধি প্রকরণে প্রকৃতির দ্বারাও বিকৃতির গ্রহণ বুঝিতে হইবে, এবং বিকৃতির দ্বারাও প্রকৃতির গ্রহণ বুঝিতে হইবে। সুতরাং চর্ম্মের যে শুদ্ধি বিহিত

---

(১) কনক-মণি-রজত-শঙ্খ-শুক্ত্যুপলানাং বজ্র-বিদল-রজ্জু-চর্ম্মণাং চাদ্ভিঃ শৌচং মৃৎপাত্রাণামগ্ন্যুপতাপঃ। (অপরার্ক; ২৭০ পৃ)

(২) শাক-রজ্জু-মূল-ফল-বাসো-বিদল-চর্ম্মণাম্।
পাত্রাণাং চমসানাঞ্চ বারিণা শুদ্ধিরিষ্যতে॥ (১।১৮২)

(৩) অরিষ্টৈশ্চ তথা বিল্বৈরিঙ্গুদৈ শ্চর্ম্মণামপি। (অপরার্ক। ২০০ পৃ)

(৪) চেলবচ্চর্ম্মণাং শুদ্ধি বিদলানাং তথৈব চ। (৫।১১৯)

হইয়াছে, চর্ম্মের বিকৃতি অর্থাৎ চর্ম্মনির্ম্মিত পাদুকা ও গাত্রাবরণ প্রভৃতিরও সেই শুদ্ধিই বুঝিতে হইবে। (৫)

পক্ষান্তরে, পাদুকা প্রভৃতির সম্বন্ধে বিহিত শুদ্ধিও তাহাদের উপাদান চর্ম্ম প্রভৃতির সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে। মেধাতিথির এই উক্তিতে মনে হয়, তাঁহার সময়ে চর্ম্ম স্বতন্ত্রভাবে, এবং ব্যবহার্য্য বস্তুর উপাদান-রূপে ব্যবহৃত হইত।

রামায়ণে রাজভোগ্য শয্যার আস্তরণ-রূপে চর্ম্ম-ব্যবহারের পরিচয় পাওয়া যায়। রামচন্দ্রের বনবাস-বৃত্তান্ত-শ্রবণে ভরত শোকাতুর হইয়া বলিয়াছিলেন, যে পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম উৎকৃষ্ট চর্ম্মাবৃত শয়নীয়ে শয়ন করিতেন, তিনি আজ কি প্রকারে ভূতলে শয়ন করিবেন? (৬)

রামায়ণে মেষচর্ম্মাস্তরণেরও পরিচয় পাওয়া যায়। রাবণের বিলাসভবনে উপস্থিত হইয়া হনুমান যে মনোহর শয্যা দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা আবিক চর্ম্মের দ্বারা আবৃত ছিল। (৭)

মহাভারত-পাঠে জানা যায়, সেকালে 'অজিনরত্ন' (ভাল চর্ম্ম) নৃপতিদিগের উপহার-রূপেও প্রদত্ত হইত। ভগবান্ হরি পাণ্ডবদিগের নিকট সুখস্পর্শ মনোহর চর্ম্ম উপহার পাঠাইয়াছিলেন।

তততু কৃতদারেভ্যঃ পাণ্ডুভ্যঃ প্রাহিণোদ্ধরিঃ।
কম্বলাজিনরত্নানি স্পর্শবন্তি শুভানি চ॥ (আদিপর্ব্ব; ১১৯ অ)

এই স্থলে চর্ম্মের 'স্পর্শবৎ' বিশেষণ দেখিয়া বোধ হয়, সেকালে অতি সুন্দররূপে চর্ম্ম পালিস্ করা হইত। পূর্ব্বপ্রদর্শিত মেধাতিথির উক্তিতে বুঝা যায়, সেকালে চর্ম্মের দ্বারা কবচ অর্থাৎ গাত্রাবরণ প্রস্তুত হইত।

গাত্রাবরণ (কঞ্চুক) প্রস্তুত করিতে হইলে চর্ম্মের বিশেষরূপ মসৃণতা সম্পাদন আবশ্যক, এবং উপযুক্ত রঞ্জনও আবশ্যক। এই রঞ্জনক্রিয়া-শিক্ষার জন্য আজ

(৫) উপানৎকবচাদীনামপি তদ্বিকারাণামেষ এব বিধিঃ। অত্র হি প্রকরণে প্রকৃত্যাপি বিকৃতিগৃহ্যতে, বিকৃত্যা চ প্রকৃতিঃ। (৫।১১৯ ভাষ্য)

(৬) অজিনোত্তরসংস্তীর্ণে বরাস্তরণসঞ্চয়ে।
শয়িত্বা পুরুষব্যাঘ্রঃ কথং শেতে মহীতলে॥ (অযোধ্যাকাণ্ড; ৮৮ সর্গ। ৪)

এই শ্লোকের তিলক-টীকায় কথিত হইয়াছে যে, এই সকল চর্ম্ম শীতসময়ে উষ্ণ ও গ্রীষ্মসময়ে শীতল হইয়া থাকে। "অজিনেন রাজার্হচমর্‍্যাদিমৃগাজিনবিশেষরূপেণ, উত্তরেণ মধ্যোত্তরচ্ছদেন সংস্তীর্ণেন। তানি চাজিনানি শীতোষ্ণয়োরুষ্ণশীতে।"

(৭) পরমাস্তরণাস্তীর্ণমাবিকাজিনসংবৃতম্। (সুন্দরাকাণ্ড। ১০ সর্গ। ৬)

ভারতবাসীকে সমুদ্র পার হইয়া সুদূর দেশে গমন করিতে হইতেছে; কিন্তু পূর্ব্বকালে ভারতবাসীর দৈনন্দিন ব্যবহার্য্য চর্ম্মপাত্রের শুদ্ধিবিধানার্থ রং করা আবশ্যক হইত। সুতরাং ইহা যে সাধারণের বিদিত ও সহজপদ্ধতিসাধ্য ছিল, তাহা অনায়াসে অনুমান করা যায়। ভগবান্ হারীত বলিয়াছেন যে, 'রঞ্জন' (রং করা) ক্রিয়া দ্বারা দৃতির শুদ্ধি সম্পন্ন হয়।

'ক্ষারোষাভ্যাং কার্পাস-শন-ময়ানাং পুত্রজীবিকারিষ্টৈঃ ক্ষৌমবল্বোর্ণানাং পুত্রজীবকোদশ্বিদ্‌ভ্যামজিনানাং চৈলবচ্চর্ম্মণাং শুদ্ধিঃ, দৃতীনাং রঞ্জনম্।'

টীকাকার অপরার্ক বলেন,—দৃতি শব্দের অর্থ,—চর্ম্মনির্ম্মিত জলাদিধারণোপযোগী ভাণ্ড;—'দৃতিশ্চর্ম্মময়মুদকাদিভাণ্ডম্'। ২৬২ পৃ।

মহর্ষি হারীত পুত্রজীবক ও উদশ্বিৎ, এই উভয় পদার্থের দ্বারা অজিনের শুদ্ধিবিধান করিয়া চৈলের ন্যায় চর্ম্মের শুদ্ধিবিধান করিয়াছেন, এবং দৃতির জন্য রঞ্জনরূপ বিশেষ শুদ্ধির ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহাতে বোধ হয়, যে সকল অজিন পাদুকা প্রভৃতিতে ব্যবহার্য্য, তাহাদের জন্য পুত্রজীবকাদির ব্যবস্থা, শুষ্কদ্রব্যের ধারক বা শয্যাদিতে ব্যবহার্য্য চর্ম্মের জন্য চেলশুদ্ধির সমান শুদ্ধির ব্যবস্থা, এবং জল প্রভৃতি তরল পদার্থধারণে ব্যবহার্য্য দৃতির জন্য রঞ্জন অর্থাৎ বার্নিশ বিহিত হইয়াছে। কারণ, উপরে বার্নিশ থাকিলে চর্ম্মের সহিত জল প্রভৃতি তরল পদার্থের সংস্রব হইতে পারে না, এবং চর্ম্মসংশ্লিষ্ট অমেধ্য পদার্থও ঢাকা পড়িয়া যায়।

বাঙ্গালায় চর্ম্মপাত্রে জল-ব্যবহারের প্রথা নাই; সুতরাং 'মশকে'র জল ব্যবহারের যোগ্য, এ কথা শুনিলে আপাততঃ বিস্ময়ের কারণ উপস্থিত হয়। কিন্তু চর্ম্মকে আমরা চিরন্তন সংস্কার-বশে যেরূপ অপবিত্র মনে করি, প্রকৃতপক্ষে সকল চর্ম্ম সেরূপ অপবিত্র নহে। মহাভারতে 'শ্বদৃতিবৎ' এই উক্তির দ্বারা কেবল কুক্কুরচর্ম্মনির্ম্মিত দৃতিরই অপবিত্রতা সূচিত হইয়াছে।

মেধাতিথি স্পষ্টই বলিয়াছেন, চর্ম্মের যে শুদ্ধির কথা বলা হইয়াছে, সেই শুদ্ধি স্বভাবতঃ স্পৃশ্য জন্তুর চর্ম্মনির্ম্মিত বরত্রা প্রভৃতির সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে। কুক্কুর, শৃগাল প্রভৃতি অশুচি জন্তুর চর্ম্ম শুদ্ধ হইবে না। দৃতি জিনিসটা সংস্কৃত সাহিত্যে সুপরিচিত। (মনু; ৫ ১১৯)

ইহা কোথাও চর্ম্মকরণ্ড নামে, কোথাও বা চর্ম্মপুট নামে কথিত হইয়াছে। শঙ্খ-লিখিত বলিয়াছেন,—'চর্ম্মকরণ্ডোদ্ধৃত জল শুদ্ধ।'

"আপো রূপরসবত্যঃ পরিশুদ্ধা জীর্ণচর্ম্মকরণ্ডৈকৈরভ্যুদ্ধৃতাঃ। চর্ম্মকরণ্ডকঃ চর্ম্মপুটঃ॥" (ইণ্ডো-এরিয়ান্। ২৭৭ পৃ)

মহর্ষি বিষ্ণুও চর্ম্মপুটস্থ জলকে শুদ্ধ বলিয়াছেন;—'গোদোহনে চর্ম্মপুটে চ তোয়ম্।'

এই দৃতি সাধারণতঃ পশুর দ্বারা বাহিত হইত। দৃতিবাহক পশু দৃতিহরি নামে কথিত হইত। পাণিনির একটি সূত্রে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। 'হরতের্দৃতিনাথয়োঃ পশৌ'। (৩।২।২৫)।

আদরার্থ দৃঙ্ ধাতুর উত্তর ক্তিং প্রত্যয়-যোগে দৃতি শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। সুতরাং ধাতুর অর্থানুসারে জিনিসটা আদরের বলিয়াই বোধ হয়। অদ্যাপি পশ্চিম-ভারতে পশুর দ্বারা পেয়-জল-পূর্ণ দৃতি চালিত হইয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদে জলোদর রোগের প্রসঙ্গে দৃষ্টান্তস্বরূপ জলপূর্ণ দৃতির বর্ণনা দেখা যায়। 'যথা দৃতিঃ ক্ষুভ্যতি কম্পতে চ'। পূর্ব্বকালে যুদ্ধ ব্যাপারে চর্ম্মের উপযোগিতা অনুভূত হইয়াছিল। গণ্ডারের চর্ম্মে ঢাল প্রস্তুত হয়, এ কথা অনেকেই জানেন। কিন্তু রামায়ণে ঋষভ-চর্ম্মেরও যুদ্ধোপকরণতার পরিচয় পাওয়া যায়। 'সেই ক্ষিপ্রকারী মহাবীর বৃষের চর্ম্ম ও খড়্গ গ্রহণপূর্ব্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।' (৮)

যুদ্ধসময়ে যোদ্ধৃবর্গের হস্তে ধার্য্য 'গোধা' নামক জ্যাঘাতনিবারণসমর্থ পদার্থটিও চর্ম্মের দ্বারা নির্ম্মিত হইত। মহাভারতে ও রামায়ণে এই গোধার পরিচয় পাওয়া যায়। (৯)

রামায়ণে অজচর্ম্মনির্ম্মিত পেটকের পরিচয় পাওয়া যায়।

রাম লক্ষ্মণ প্লবারোহণে সীতার সহিত যমুনা পার হইবার সময়ে রাম সাবধান হইয়া পার্শ্বভাগে প্লবোপরি সীতার বসন ভূষণ ও 'কঠিনকাজ' স্থাপন করিয়াছিলেন।

> 'পার্শ্বে তত্র চ বৈদেহ্যা বসনে ভূষণানি চ।
> প্লবে কঠিনকাজঞ্চ রামশ্চক্রে সমাহিতঃ॥' (অযোধ্যাকাণ্ডে ৫৫।১৭)

তিলক-টীকা-কার 'কঠিনকাজ' শব্দের অর্থনির্ণয় প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, কঠিন শব্দের অর্থ খনিত্র, এবং কাজ শব্দের অর্থ পেটক। মতান্তরের উপন্যাস করিয়া বলিয়াছেন, কেহ বলেন, কঠিন শব্দের অর্থ, খনিত্র; কাজ শব্দের অর্থ, অজ-চর্ম্মপিনদ্ধ অর্থাৎ ছাগচর্ম্মাবৃত পেটক। (১০)

---

(৮) আর্ষভং চর্ম্ম খড়্গঞ্চ প্রগৃহ্য লঘুবিক্রমঃ। যুদ্ধকাণ্ড। ৯৬ সর্গ। ২১।

(৯) বদ্ধগোধাঙ্গুলিত্রাণাঃ কালিন্দীমভিতো যযুঃ। বিরাটপর্ব্ব।

(১০) কঠিনং খনিত্রং কাজং পেটকং দ্বন্দ্বএকবদ্ভাবঃ। কঠিনং খনিত্রং আজং অজচর্ম্ম-পিনদ্ধং পেটকমিত্যন্যে।

এই স্থলে তিলকের ব্যাখ্যা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। কারণ, তিনি কাজ-শব্দের পেটক অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন ; ইহাতে কোনও নিরুক্তি দেখান হয় নাই। মতান্তরোপন্যাসেও কা-শব্দের অর্থ প্রদর্শিত হয় নাই ; তাহাতেই প্রকৃতার্থটি তিরোহিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ঈষদর্থ 'কু-শব্দ-নিষ্পন্ন কাদেশ' ও 'আজ' (অজচর্ম্ম-নির্ম্মিত) এই উভয় যোগে সিদ্ধ 'কাজ' শব্দের ক্ষুদ্র পেটকার্থই ব্যুৎপত্তিলভ্য ও সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। হয় ত আধুনিক হ্যাণ্ড-ব্যাগের মত পূর্ব্বকালে প্রবাসীর বহনোপযোগী ক্ষুদ্র 'পেটক'ই 'কাজ' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

সম্ভবতঃ, টীকাকারের সময়ে সাধারণতঃ চর্ম্মের দ্বারা পেটকের আবরণ করা হইত ; সুতরাং তাহা দেখিয়া তিনি 'কাজ'কে চর্ম্মনির্ম্মিত না বলিয়া চর্ম্মাবৃত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কঠিন শব্দের খনিত্রার্থ-গ্রহণের পরিবর্ত্তে দৃঢ় অর্থ গ্রহণ করিলে, ইহা 'কাজে'র বিশেষণরূপে অন্বিত হইয়া পেটকের দৃঢ়তা প্রতিপন্ন করিতে পারে, এবং এই অর্থই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। ব্যবহার্য্য বস্তুর সাময়িক পরিবর্ত্তনের ফলে পূর্ব্বতন অনেক বস্তুরই স্বরূপনির্ণয় হইয়া উঠে না। কোনও শব্দার্থের কষ্টকল্পনা দ্বারা তথ্যনির্ণয় সর্ব্বতোভাবেই অসম্ভব।

শ্রীগিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ।

বিদেশী গল্প।

প্রতারণা।

সমস্ত দিনের কঠোর পরিশ্রমে জিনি অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়াছিল। জামার কাপড় ভাঁজ করিয়া সীবন-যন্ত্রাদি সে যথাস্থানে তুলিয়া রাখিল। রাত্রিকালে আবার কাজ আরম্ভ করিবে।

তাকের উপর হইতে দোয়াত, কাগজ ও কলম পাড়িয়া লইয়া সে অধ্যবসায়সহকারে অভ্যস্ত পত্র লিখিতে বসিল। জিনি যে সকল পত্র রচনা করিত, তাহার মধ্যে এক বিচিত্র সাদৃশ্য দেখা যাইত। প্রত্যেক পত্রের সূচনায় "স্নেহময় পিতা" এবং শেষাংশে "আপনার স্নেহাকাঙ্ক্ষী পুত্র জিম্ কেল্‌সে" এইরূপ লিখিত হইত। দুই চারি ছত্রে পত্র সমাপ্ত হইত। লেখক সুস্থশরীরে আছে, এ কথাটা প্রতি পত্রেই থাকিত। জিনি জানিত যে, এইরূপ লেখা থাকিলেই, যাহার নামে পত্র, সে অত্যন্ত আনন্দিত হইবে। সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও লিখিতে বসিয়া জিনি বেশী কথা গুছাইয়া লিখিতে পারিত না। পরদিবস প্রাতঃকালে সে যখন আনন্দবিহ্বল বৃদ্ধের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহারই লিখিত পত্র পাঠ করিত, বৃদ্ধের সহস্র ব্যগ্র প্রশ্নের উত্তর দিত, তখন সে

অনেক কথা উদ্ভাবন করিয়াই বৃদ্ধকে শুনাইয়া দিত। সে কথাগুলি পত্রে লেখা না থাকিলেও জিনি এমনই ভাব প্রকাশ করিত যে, সত্যই পত্রে যেন সেগুলি লিখিত রহিয়াছে।

অন্য দিনের ন্যায় আজও পত্র লেখা সমাপ্ত করিয়া জিনি উহা অলক্ষ্যে ডাকঘরে ফেলিয়া দিতে গেল। চিঠির বাক্সে পত্রখানি ফেলিবার সময় সে অভ্যাসবশতঃ অনুচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "স্নেহময় বুড়াকে প্রতারণা করিতেছি, এ জন্য ভগবান্ আমার অপরাধ যেন ক্ষমা করেন।"

এই স্নেহময় বৃদ্ধটি অতিশ্রমে ও বাতরোগে পঙ্গু হইয়া নিতান্ত নিরাশ্রয় অবস্থায় কালযাপন করিত। দুনিয়ায় তাহাকে সাহায্য করিবার আর কেহ ছিল না। চিরকাল বৃদ্ধের এরূপ দুর্দ্দশা ছিল না। এককালে তাহার অবস্থা ভালই ছিল। অসমর্থ অবস্থাতেও বৃদ্ধ মাঝে মাঝে কয়েক ঘণ্টা বাতায়নসন্নিধানে বসিয়া জিনির সহিত আলাপ আলোচনার নির্ম্মল আনন্দে কালযাপন করিত। অপরাহ্নে জিনি যখন সীবন যন্ত্র লইয়া কাজে ব্যস্ত থাকিত, সেই সময় বৃদ্ধ পেন্সিলের দ্বারা নানাবিধ বিচিত্র ও অদ্ভুত ছবি আঁকিয়া জিনিকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিত। জিনি সে সকল অসম্ভব, বিচিত্র, অলৌকিক চিত্র দেখিয়াও বৃদ্ধকে আশ্বাস দিয়া বলিত যে, কালে এই চিত্রগুলি প্রতিবেশীদিগের নিকট সমাদৃত হইবে, এবং অর্থাগম হইবারও সম্ভাবনা।

সে মনে মনে বেশ জানিত, চিত্রগুলি মূল্যহীন, অবাস্তব এবং অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু মুখ ফুটিয়া সে কথা বলিয়া সে বৃদ্ধের মনে দুঃখ দিতে চাহিত না। সে ভাবিত, "বুড়ার মনে যদি এমন একটা ধারণা থাকে যে, তাহার চিত্রিত আলেখ্যগুলি বেচিয়া ভবিষ্যতে সে কিছু অর্থোপার্জ্জন করিতে পারিবে, তবে আমি কেন তাহার সে বিশ্বাস ভাঙ্গিয়া দি ?"

ইদানীং বৃদ্ধ বাতায়নসন্নিধানে বসিয়া আর পূর্ব্বের ন্যায় গল্পগুজব বা চিত্র অঙ্কন করিতে পারিত না। ক্রমশঃই তাহার অবস্থা শোচনীয় হইয়া আসিতেছিল। আগে জিনি সপ্তাহে একবার করিয়া পত্র লিখিত, কিন্তু অতঃপর সে বৃদ্ধকে সুখী করিবার জন্য, তাহার পাণ্ডুমুখে আনন্দের বিমলজ্যোতিঃ মুহূর্ত্তের জন্য ফুটাইয়া তুলিবার অভিপ্রায়ে সপ্তাহে তিন চারিখানি পত্র লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিল। বাতের যন্ত্রণা যতই প্রবল হউক না কেন, চিঠি পাইলেই বৃদ্ধের মুখ প্রসন্ন হাস্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত।

পর দিবস যথাসময়ে হরকরা জিনির হস্তে পত্রখানি দিয়া গেল। এক হস্তে চায়ের পেয়ালা ও অপর হস্তে পত্রখানি লইয়া জিনি কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল।

বৃদ্ধের হস্তে চিঠিখানি দিয়া সে বলিল, "আর একখানি পত্র আসিয়াছে। আজ কাল দেখিতেছি, সে পত্র লিখিবার জন্য অনেক সময় দিতেছে।"

বৃদ্ধ জিনির হস্তে চিঠিখানি ফিরাইয়া দিবার পূর্ব্বে কয়েক মুহূর্ত্ত উহা সগর্ব্বে ধরিয়া রাখিল। সে নিজে পড়িতে জানিত না। পত্র জিনিই পড়িত।

"চিঠি লিখ্‌তে জিম্ কখনই কাতর নহে। আমরা যেমন অনায়াসে দরজা খুলিয়া ঘরের বাহিরে যাই, জিমের পক্ষে চিঠি লেখাও সেইরূপ।" এই বলিয়া বৃদ্ধ অধীরভাবে জিনির পত্রপাঠের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। বহু বর্ষ হা-হুতাশে কালযাপন করিবার পর অকস্মাৎ একদিন সে নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের পত্র পাইয়াছিল। সে পত্র পাইয়া তাহার মনে কিরূপ আনন্দ, উল্লাস ও উত্তেজনা হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। তার পর সে কত পত্রই পাই-

য়াছে। কিন্তু প্রথম দিনের পত্রপাঠের সময় তাহার মুখে যেরূপ আগ্রহ, ব্যগ্রতা ও অসহিষ্ণুতা পরিলক্ষিত হইয়াছিল, আজিকার পত্রেও কি লেখা আছে, তাহা জানিবার জন্য বৃদ্ধের মুখে ঠিক সেইরূপ আগ্রহই পরিস্ফুট হইল।

জিনি চিঠি পড়িতে পড়িতে বলিল, "সে লিখেছে, সে ভালই আছে, তুমিও কুশলে আছ বলিয়া তাহার বিশ্বাস। তার পর—তার পর"—গাঢ় অভিনিবেশসহকারে চিঠি পড়িবার অভিনয় করিতে করিতে সে বলিয়া চলিল, "সে লিখেছে, তার কাজ কর্ম্ম বেশ চল্‌ছে।" জিনি কল্পনার সাহায্যে এতটা বলিয়া সহসা থামিয়া গেল। পুত্রের জনক বাকিটুকু নিজেই পূরণ করিয়া লইল। বৃদ্ধ বলিল, "জিম্ চিরকালই খুব চালাক ও পরিশ্রমী। তার গুণের কথা বলিয়া শেষ করা যায় না!"

জিনির সুবিধা হইল। সে বলিয়া চলিল, "যে নগরে সে আছে, সেখানকার লোক তাহাকে সেখানকার সেরিফের পদে নির্ব্বাচিত করিয়াছে।" জিনি আবার থামিল। তার পর উদ্ভাবনী শক্তির প্রভাবে সে বলিয়া উঠিল, "স্বর্ণখচিত পোষাকে যদি তুমি একবার তাহাকে দেখ, তাহা হইলে, তোমার অসুখ একেবারে সারিয়া যাইবে। বেশ ছেলেটি! নিজের চমৎকার উন্নতি করিয়াছে।"

বৃদ্ধ এমনই ভাবে চাহিল যে, নাগরিকগণ তাহার পুত্রকে যে পদে নিযুক্ত করিয়াছে, তাহা যেন তাহার যোগ্যই হয় নাই। শূন্য পেয়ালাটি সে জিনির হাতে ফিরাইয়া দিয়া বালিশের উপর মস্তক রক্ষা করিল। তাহার পাণ্ডুর মুখে মৃদু হাস্যরেখা সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বৃদ্ধের দিকে চাহিবামাত্র জিনির মনে হইল, এক রাত্রির মধ্যেই যেন বৃদ্ধের শীর্ণ দেহ শীর্ণতর হইয়া গিয়াছে। তাহার প্রাণটা যেন ইহাতে ব্যথিত হইল। কোমলস্বরে সে বলিল, "আজ তুমি শুইয়া থাক, উঠিবার চেষ্টা করিও না। কাল হয় ত আর একখানা পত্র পাইবে। আমার বিশ্বাস, এখন হইতে রোজই একখানা করিয়া পত্র আসিবে।" বৃদ্ধের আননে আগ্রহের চিহ্ন প্রকটিত হইল। সে বলিল, "জিম্ ত একবারও বাড়ী আসবার কথা লেখে না; কোথায় সে আছে, তাহাও জানায় না।" কথাটা বলিবার সময় বৃদ্ধ এমনই ভাব প্রকাশ করিল যে, সে যেন তাহার আকাঙ্ক্ষার অতিরিক্ত কামনা প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে।

জিনি শঙ্কিত হইল। পত্রে যে ঠিকানা দিবার প্রয়োজন আছে, এ কথাটা একবারও তাহার মনে হয় নাই। পিতাও এতদিন এই ত্রুটিটুকু লক্ষ্য করে নাই। পত্রখানির পাতা উল্‌টাইয়া চারি দিকে লক্ষ্য করিয়া জিনি বলিল, "সে এখন নগরের এক জন প্রধান ব্যক্তি; অনেক কাজ তাহার হাতে, কাজেই হয় ত চিঠি লিখিবার সময় ঠিকানা লিখিতে ভুলিয়া যায়। দিন রাত্রি তাহাকে পরিশ্রম করিতে হয়।" বৃদ্ধের মুখে আবার হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। সে প্রসন্নতার ভান করিয়া বলিল, "আমি জানি, সে ভাল ছেলে, তার এ রকম উন্নতি হবে, এ ত স্বাভাবিক।" জিনি আর বাক্যব্যয় না করিয়া ঘর পরিষ্কার করিতে লাগিল। কিন্তু মধ্যে মধ্যে সে এক একবার বৃদ্ধের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল; আর মনে মনে বলিতেছিল, "হায় বুড়া!"

কিন্তু রাত্রিকালে সে যখন আবার চিঠি লিখিতে বসিল, তখন কোনও মতেই লেখনী আর চলিতে চাহিল না। সে কি লিখিবে? লিখিবার মত আর কিছুই ত নাই! পত্রে কোন্ বিষয়ের অবতারণা করিলে বৃদ্ধের হৃদয়ে আনন্দের সঞ্চার হইবে, মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিবে, বহু

চিন্তা করিয়াও জিনি তাহা স্থির করিতে পারিল না। উর্দ্ধমুখে সে বহু চিন্তা করিতে লাগিল, কিন্তু আজ কোনও কথাই তাহার মনে আসিল না। কল্পনার অধিষ্ঠাত্রী দেবী আজ যেন তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। সহসা তাকের উপরে রক্ষিত একটী মলিন মুদ্রাধারের দিকে চাহিবামাত্র তাহার মুখমণ্ডল উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। এ মাসে তাহার কিছু বেশী আয় হইয়াছিল। মুদ্রাধারে একখানি পাঁচ ডলারের নোট ছিল। বাড়ী ভাড়া দিবে বলিয়া সে উহা রাখিয়াছিল; কিন্তু বাড়ী ভাড়া দিবার সময় এখনও হয় নাই; কিছু বিলম্ব আছে। মুদ্রাধারটি পাড়িয়া সে নোটখানি বাহির করিয়া লইল; তার পর খামে মুড়িয়া সে উপরে তাড়াতাড়ি শিরোনামা লিখিয়া ফেলিল। আগ্রহাতিশয়বশতঃ সে পত্রে টাকার কথা কিছুই লিখিতে পারিল না। ডাক-বাক্সে চিঠিখানি ফেলিবার সময়ও ভগবানের নিকট চিরাভ্যস্ত ক্ষমা-প্রার্থনা করিতে সে বিস্মৃত হইল।

প্রাতঃকালে যথাসময়ে পত্র আসিল; কিন্তু বৃদ্ধ তখনও শয্যাশায়ী, তাহার উঠিয়া বসিবার সামর্থ্য ছিল না। জিনি স্বয়ং পত্রখানি তাহার কাছে লইয়া গেল। জয়গর্ব্বে জিনি বলিল, "আমি ত বলেইছিলাম, আজ একখানা পত্র পাবে।" বৃদ্ধ মধুর হাস্য করিল। জিনি তখন খাম ছিঁড়িতেছিল, বৃদ্ধ সাগ্রহে তাহার দিকে চাহিয়া ছিল। জিনি বিস্ময়ের ভান করিয়া বলিয়া উঠিল, "জয় জগদীশ! এ কি? নোট! সত্যই ত! পাঁচ ডলারের নোট দেখিতেছি!"

বৃদ্ধ কম্পিত কর বাড়াইয়া নোটখানি গ্রহণ করিল। সে এমনই ভাবে নোটখানি পরীক্ষা করিতে লাগিল যে, জিনির প্রাণ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। পুত্র বেশ কাজ কর্ম্ম করিতেছে, তাহার অবস্থার উন্নতি হইয়াছে, তাহারই প্রমাণস্বরূপ বৃদ্ধ পিতাকে আজ সে টাকা পাঠাইয়াছে। এ অর্থ সামান্য, কিন্তু ইহাতে পিতৃভক্তি, স্নেহ, প্রেম, এবং পুত্র যে পিতাকে ভুলিয়া যায় নাই, তাহারই প্রকৃষ্ট পরিচয় বিদ্যমান। চিঠির ভাষায়, কথার বন্ধনীতে এ কথা প্রকাশ করা অসম্ভব, ইহা শুধু প্রাণ দিয়া অনুভব করিবার বিষয়। বৃদ্ধ পলকহীন, অশ্রান্ত দৃষ্টিতে নোটখানি দেখিতে লাগিল।

"আজ তাহার মা বাঁচিয়া থাকিলে তাহার গর্ব্ব ও আনন্দের সীমা থাকিত না।" বলিতে বলিতে বৃদ্ধের মুখে হাস্যরেখা কাঁপিয়া উঠিল। "উপযুক্ত সময়েই টাকাটা আসিয়াছে। কেমন? নয় কি? আঃ কি সুখ! নোটখানা খানিকক্ষণ আমার কাছে থাকুক্।" বৃদ্ধ অতি কোমলভাবে নোটখানির উপর তাহার শীর্ণ করপল্লব রক্ষা করিল, বুকের উপর উহা চাপিয়া ধরিল। জিনি পত্রখানি শয্যাপার্শ্বে রাখিয়া নীরবে কক্ষ ত্যাগ করিল। বৃদ্ধের ভাব-পরিবর্ত্তনে আজ জিনি বড়ই সুখী হইয়াছিল।

অপরাহ্ণে একটা অপ্রত্যাশিত ব্যাপার ঘটিল। হরকরা আর একখানি পত্র জিনির হাতে দিয়া গেল। সেই পত্রের চারি দিকে অসংখ্য ডাক-ঘরের মোহর অঙ্কিত, পেন্সিল ও লাল কালিতে নানাবিধ ঠিকানা লিখিত। ডাক-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ বহু আয়াসের পর পত্রের যথার্থ অধিকারীর নিকট পত্রখানি পাঠাইয়া দিয়াছেন। শিরোনামায় লিখিত ছিল, "মিঃ জর্জ্জ ফেলসে।" জিনি এবার সত্যই অত্যন্ত ভয় পাইল। সে চিঠিখানা বেশ করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল। কে এই পত্র লিখিল, সে কিছুতেই বুঝিতে পারিল না। তাহার বিশ্বাস ছিল, চিঠিতে বড় একটা

সুখবর থাকে না। জীবনের অর্দ্ধেক কাল জিনি কখনও কোনও পত্র পায় নাই। সে যা দুই একখানা চিঠি পাইয়াছিল, তাহাতে কেবল দুঃসংবাদই ছিল।—হয় কোনও আত্মীয়ের বিয়োগ, নয় ত অন্য কোনও প্রকার অমঙ্গলের সংবাদ। নানা বিতর্কের পর জিনি স্থির করিল যে, সে চিঠিখানি না পড়িয়া উহা বৃদ্ধের নিকট লইয়া যাইবে না।

পত্রখানি খুবই সংক্ষিপ্ত, ছাপার অক্ষরে লিখিত। সে অনায়াসে সমস্ত চিঠিখানি পাঠ করিতে পারিল।—কোনও বহুদূরবর্ত্তী অপরিচিত নগরের কারাগার হইতে চিঠিখানি লিখিত। কারাগারের অধ্যক্ষ মিঃ জর্জ্জ কেল্‌সেকে জানাইয়াছেন যে, তাঁহার পুত্র কোনও গুরুতর অপরাধে বহুদিন হইতে কারাদণ্ড ভোগ করিতেছে, সংপ্রতি সে কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া তাহার পিতাকে সংবাদ দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছে। জিনি পত্র পড়িয়া স্তম্ভিতভাবে বসিয়া রহিল। সে ভাবিল, ভগবান্ আজ তাহার পাপের কঠিন শাস্তি দিয়াছেন। বহুক্ষণ সে নিশ্চল প্রতিমার ন্যায় বসিয়া রহিল। তার পর হল-ঘরের বহির্ভাগে পদশব্দ শুনিয়া সে এক লম্ফে দরজার কাছে ছুটিয়া গেল। যিনি আসিতেছিলেন, তিনি ধর্ম্মযাজক। এই পল্লীর নরনারীর মধ্যে ধর্ম্মভাবসঞ্চারের জন্য তিনি প্রায়ই সকলের বাড়ীতে যাতায়াত করিতেন। জিনি কোনও দিন ধর্ম্মযাজকের নিকট ধর্ম্মকথা শুনিয়া আত্মাকে পবিত্র করিবার প্রয়োজন বোধ করে নাই। কিন্তু মহাদুঃখে অভিভূত হইয়া আজ সে তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিবার সংকল্প করিল। আজ যদি তিনি তাহাকে উদ্ধারের পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারেন!

ধর্ম্মপ্রাণ, উদারহৃদয়, যুবক ধর্ম্মযাজক সাগ্রহে জিনির সমস্ত কাহিনী শ্রবণ করিলেন। "তুমি নিজে চিঠি লিখিয়া টাকা পাঠাইয়া বৃদ্ধকে বুঝাইয়া দিতে যে, সে পত্র ও টাকা তাহার ছেলে পাঠাইয়াছে ?"

জিনি ঈষৎলজ্জিতভাবে আত্মদোষক্ষালনের জন্য বলিল, "যাহার হৃদয়ে একটু দয়া মায়া আছে, যাহার প্রাণ আছে, এমন যে কোনও লোক এ অবস্থায় পড়িলে আমার মত প্রতারণা করিত। আহা! বেচারা তাহার ছেলের সংবাদ না পাইয়া দিন দিন যে কি কষ্ট ভোগ করিত, তাহা ভগবান্ই জানেন। জিম্ তাহার একমাত্র সন্তান, বৃদ্ধবয়সে জিম জন্মগ্রহণ করে, সুতরাং জিম যে তাহার নয়নের পুত্তলী হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? বুড়া ভাবিত, তাহার পুত্র ক্ষণজন্মা, এমন ছেলে আর হয় না। সেই ছেলের যখন বহু দিন কোনও সংবাদ পাওয়া গেল না, তখন বুড়ার যে কি দুঃখ, তা একবার অনুমান করে' দেখুন দেখি। আমি বুড়ার কষ্ট দেখিতে না পারিয়া শেষে ঐ রকম ভাবে পত্র লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। ভেবেছিলাম যে, এ রকম চিঠি লেখার কোনও দোষ ত নাই, বরং বুড়া শান্তি পাবে। সে নিজে পড়িতে বা লিখিতে জানিত না, কাজেই অতি সহজে আমি তাহাকে প্রতারিত করিতে পারিয়াছিলাম। ভগবন্! আমায় ক্ষমা কর!"

অশ্রুসিক্তনয়নে জিনি আবার বলিয়া চলিল, "হায়! আমার জন্যই বুড়া আজ প্রাণে বেশী বেদনা পাইবে। এ সংবাদ শুনিলে সে আর প্রাণে বাঁচিবে না।" রমণী করে কর ঘর্ষণ করিতে লাগিল।

ধর্ম্মযাজক জিজ্ঞাসা করিলেন. "ইনি কি তোমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়,—তোমার সহোদর ?"

জিনি বিস্ফারিতনেত্রে বলিল, "না, না, আমার কেহ নয়। ছেলেবেলায় আমরা এক সঙ্গে খেলা করিতাম, এইমাত্র। বাতরোগে বুড়া পঙ্গু হইবার পর যখন দেখিলাম, তাহাকে সাহায্য করিতে কেহ নাই, তাহাকে আতুরাশ্রমে যাইতে হইবে, তখন আমি তাহার ভার লইলাম। যাহার সহিত একদিন খেলা করিয়াছি, যে আমার বাল্যসঙ্গী, আজ তাহাকে অন্নের জন্য আতুরাশ্রমে যাইতে হইবে, ইহা আমি সহ্য করিতে পারিলাম না। সেই দিন হইতে আমি উহার ভার লইয়াছি।"

ধর্ম্মযাজক নীরবে সমস্ত শুনিলেন। তিনি জানিতেন, এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। দরিদ্রই যে দরিদ্রের বন্ধু, ইহা তিনি অনেকবার দেখিয়াছেন; কিন্তু তবু কয়েক মুহূর্ত্ত তাঁহার বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইল না। অবশেষে তিনি বলিলেন, "বৃদ্ধকে আমি সংবাদটা জানাই, এই কি তোমার অভিপ্রায়?" জিনি সাগ্রহে বলিল, "তাই করুন। এই ঘরে সে আছে; কিন্তু খুব নরম করিয়া কথাটা বলিবেন; ব্যথাটা যত কম লাগে, তাহার চেষ্টা করিবেন।" এই বলিয়া সে ঘরের দরজা খুলিয়া দিল।

অন্ধকার কক্ষমধ্যে দিনান্ত-সূর্য্যের একটি রশ্মিরেখা দ্বারপথে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। শয্যাশায়ী বৃদ্ধের শরীরে রশ্মিরেখা নিপতিত হইল। বৃদ্ধ, স্মিতবিকশিতমুখে দ্বারের দিকে ফিরিয়া শুইয়া ছিল। সূর্য্যকরলেখা তাহার প্রসন্নমুখমণ্ডলে নৃত্য করিতে লাগিল।

দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া জিনি অনুকম্পাস্নিগ্ধহৃদয়ে মৃদুগুঞ্জনে বলিল, "জয় জগদীশ! বুড়ার মুখে এখনও সুখের আলোকরেখা জ্বল্‌-জ্বল্ করিতেছে।"

ধর্ম্মযাজকের চিকিৎসা-শাস্ত্রেও কিছু অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি অবস্থা দেখিয়াই সমস্ত বুঝিলেন; স্পন্দহীন হৃৎপিণ্ড আর পরীক্ষা করিতে হইল না। পাঁচ ডলারের নোটখানি তখনও তাহার বুকের উপর রক্ষিত ছিল। বৃদ্ধের নয়নপল্লব দুটি ঢাকিয়া দিয়া তিনি প্রশান্তকণ্ঠে বলিলেন, "ভগবন, বৃদ্ধকে শান্তি দান কর!" *

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

উজ্জয়িনী।

উজ্জয়িনী মালবের, এমন কি, সমগ্র ভারতের মুকুটমণি। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জানুয়ারী ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৌদ্ধস্তূপ সাঞ্চী দর্শন করিয়া, শেষরাত্রে ভূপালে আসি। সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হয় নাই, তাই পর দিন ভূপালে বিশ্রাম করিয়া, ৬ই জানুয়ারী ১২—১৫ মিনিটের ট্রেনে উজ্জয়িনীর অভিমুখে যাত্রা করিলাম। ভূপাল হইতে একটি স্বতন্ত্র রেলপথ উজ্জয়িনীতে গিয়া শেষ হইয়াছে। ইহার নাম ভূপাল-উজ্জয়িনী রেলওয়ে। ভূপাল হইতে উজ্জয়িনীর দূরত্ব ১১৪ মাইল। মধ্যশ্রেণী নাই। কাজেই তৃতীয় শ্রেণীতে উঠিলাম। ভাড়া এক টাকা সাত আনা।

* অড্‌ মার্কার রচিত কোনও ইংরেজী গল্প হইতে অনূদিত।

যাহা হউক, গবাক্ষের ধারে বসিয়া, চোখে কালো চশমা লাগাইয়া, চুরুট টানিতে টানিতে, নগর গ্রাম দেখিতে দেখিতে, উজ্জয়িনীর অভিমুখে চলিলাম। উজ্জয়িনী ভারতের প্রাচীনতম নগরী। রাজা বিক্রমাদিত্যের বিশ্ববিশ্রুত রাজধানী। ভূতলে জন্মলাভ করিয়া অবধি উজ্জয়িনীর নাম শুনিয়া আসিতেছি। মহাকবি কালিদাসের অমরকাব্য 'মেঘদূতে' তাহার মনোহারিণী বর্ণনা পাঠ করিয়াছি। ভগবানের ইচ্ছায় আজ আমি সেই চিরস্মৃতিময়ী উজ্জয়িনীর পথে যাত্রী।

উজ্জয়িনীর পূর্ব্ব গৌরবের কথা চিন্তা করিতে করিতে আমি এরূপ তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, আমার আর কোনও কথা মনেই ছিল না। সমস্ত পথেই উজ্জয়িনীর নানা কথাই ভাবিতেছি—পথে তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনাও ঘটে নাই, বা তেমন কিছু চিত্তাকর্ষক দৃশ্যও ছিল না, কাজেই স্মৃতিঘোরে বিভোর হইয়াছিলাম।

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। বেশ শৈত্য অনুভূত হইল—অলষ্টারটি পরিলাম ও কম্ফর্টারে কণ্ঠ ও কর্ণ ঢাকিলাম। রাত্রি হইয়া গেল—ভাবিলাম, অপরিচিত নগরে রাত্রে কোথায় যাইব? অম্বাপ্রসাদ পাণ্ডার নামে একখানি পরিচয়পত্র ভূপালের একটি ব্রাহ্মণের নিকট হইতে আনিয়াছিলাম। মনে কেবল এইটুকুমাত্র ভরসা ছিল।

এ স্থলে প্রসঙ্গতঃ একটি কথা বলিয়া রাখি। ভ্রমণকারীদিগের প্রতি আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ যে, তাঁহারা রাত্রে কোনও অপরিচিত সহরে উপস্থিত হইলে সম্ভবমত ষ্টেশনে থাকিবারই ব্যবস্থা করিবেন। কারণ, বাসা না পাইলে বিষম অসুবিধায় পতিত হইতে হয়, এবং দুষ্টলোকের খর্পরে পড়িয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনাও বড় অল্প নহে।

রাত্রি ৮টা ১৫ মিনিটের সময় ট্রেন উজ্জয়িনী পঁহুছিল। আমি দ্রব্যাদি লইয়া গাড়ী হইতে অবতরণ করিলাম। কতকগুলি পাণ্ডা আসিয়া আমাকে ঘেরাও করিল। আমি অম্বাপ্রসাদের নাম করায় তাহারা বলিল, সে উপস্থিত নাই। অনেকে চলিয়া গেল, কিন্তু ২।৩ জন আমাকে ছাড়িল না। এক জন বলিল,—'ষ্টেশনের কাছেই অম্বাপ্রসাদের দ্বিতল ভবন যাত্রীদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে। আপনি রাত্রে তথায় থাকুন। অম্বার বাড়ী সিংপুরী অর্থাৎ সিংহপুরী; ষ্টেশন হইতে প্রায় দেড় ক্রোশ হইবে। তাহার শরীরও অসুস্থ। এত রাত্রে সে ঘুমাইয়া পড়িয়া থাকিবে। এখানে থাকুন, আমরা আপনার আহারাদির ব্যবস্থা

করিয়া দিতেছি।' তাহাদের কথার সারবত্তা বুঝিতে পারিলেও, আমার কেমন ষ্টেশনের নিকট থাকিতে ইচ্ছা হইল না ; যাহার নামে পরিচয়পত্র আছে, আমি তাহার নিকটে যাওয়াই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলাম।

আমার অনুরোধে তাহারা আমাকে একখানি টাঙ্গা ভাড়া করিয়া দিল। সিংপুরীর ভাড়া বোধ হয় ছয় আনা। টাঙ্গায় আরোহণ করিয়া নগরীমধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম। অপ্রশস্ত অন্ধকারময় রাজপথ দিয়া টাঙ্গা চলিতে লাগিল। রজনী ঘোর অন্ধকারময়ী—নগরীর অলোক নিবিয়া গিয়াছে। পথের উভয় পার্শ্বে দ্বিতল হর্ম্ম্যশ্রেণী, উপরের ছাদ খর্পরময়। ইহারই মধ্যে নাগরিকেরা নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছে—সৌধমালার দ্বার ও গবাক্ষ অবরুদ্ধ। গবাক্ষরন্ধ্র হইতে দীপ-রশ্মির ক্ষীণরেখাও নির্গত হইতেছে না। জনকোলাহল নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছে।—এই কি সেই কীর্ত্তিকিরীটিনী হর্ম্ম্যশালিনী উজ্জয়িনী? কোথায় সেই জনকোলাহলমুখরিত রাজপথ? কোথায় বা সেই দীপহারা উজ্জ্বল সৌধশ্রেণী—কোথায় গৃহে গৃহে নৃত্য-গীত-ঝঙ্কার! কোথায় বা গবাক্ষপথে দোদুল্যমান কুসুমমালার গন্ধ! কোথায় বা প্রজ্বলিত সর্জ্জরস-অগুরু-ধূপগন্ধে সুরভি কক্ষে বসিয়া সুন্দরী ললনা বীণাবাদিনীর ন্যায় বীণা বাদন করিতেছে? আর কোথায়ই বা ধীরনূপুরমঞ্জীর রণণে অভিসারিকা অঙ্গনা সঙ্কীর্ণ গলির পথে নিশাভিসারে গমন করিতেছে? কোথায় বা মহাকবি কালিদাসের জনপদবধূ তাহাদের চঞ্চল অপাঙ্গের নর্ত্তনে—বিদ্যুদ্বিলাসি নয়নে—পথিককুলের হৃদয় মন হরণ করিয়া, তাহাদের গতি স্তম্ভিত করিয়া দিতেছে?—হায়! কোন্ দূর—সুদূর—অতীত যুগ কালের আবর্ত্তে কোথায় চলিয়া পড়িয়াছে,—আর এই চিরনীরব পুরীতে চির-অন্ধকারে সেই অতীত স্মৃতি ভ্রাম্যমান্ প্রেতাত্মার ন্যায় আজ কোথায় লুকোচুরি খেলিতেছে!

টাঙ্গা নিবিড় আঁধারে ঘুরিয়া ফিরিয়া অবশেষে একটি সঙ্কীর্ণ গলিপথের মুখে আসিয়া থামিল। টাঙ্গাচালক নামিয়া পাণ্ডাপ্রবরের অনুসন্ধানে আমাকে পথে একাকী রাখিয়া গেলেন। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে তাঁহার ঘুম ভাঙ্গাইয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া আনিলেন। কুলী না পাওয়ায়, শকটচালককেই কিছু দিতে অঙ্গীকার করিয়া, তাহার দ্বারাই আমার দ্রব্যাদি লইয়া গলির মধ্যে একটি ত্রিতল বাড়ীর দ্বিতল প্রকোষ্ঠে লইয়া গেলেন। পাণ্ডামহাশয় সেই গৃহে একটি Lamp জ্বালিয়া দিলেন। শকটচালক তাহার প্রাপ্য লইয়া প্রস্থান করিলে পর, তিনি বলিলেন, 'এত রাত্রে ত পাকের সুবিধা হইবে না—তাঁহার শরীরও অসুস্থ—

দোকানও সব বন্ধ হইয়া গিয়াছে—কি করা যায়? যাহা হউক, কিছু খাদ্য সংগ্রহ করিয়া দিতেছি।' এই বলিয়া আমার নিকট হইতে চারি আনা লইয়া বাহির হইয়া গেলেন। সে চটীতে আর জন প্রাণী নাই—আমিই একাকী। অৰ্দ্ধ ঘণ্টা পরে পাণ্ডা মহাশয় কাঁচা শালপত্রে জড়াইয়া স্বহস্তে খানকতক রুটী ও কিছু মিষ্টান্ন লইয়া প্রত্যাগত হইলেন। সঙ্গে একটি ভৃত্য সে দেশের তামার চেপ্টা ঘড়ায় করিয়া এক ঘড়া জল ও একটি ঘটী লইয়া আসিল। আমি উপর্য্যুক্ত খাদ্যসামগ্রী উদরস্থ করিয়া ঘড়া হইতে জলপান করিয়া শান্ত হইলে পাণ্ডা মহাশয় ভৃত্য সহ বিদায় চাহিলেন। আমি বলিলাম, 'এই বাড়ীতে রাত্রে একাকী কি করিয়া থাকিব?' তিনি বলিলেন 'কোনও ভয় নাই। আপনি ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়া স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যান—কোনও চিন্তা নাই। কল্য প্রভাতেই আমি উপস্থিত হইব।' এই বলিয়া পাণ্ডা মহাশয় সঙ্গী সহ প্রস্থান করিলেন। আমি অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া সেই নিঃসঙ্গ প্রবাসের জনশূন্য ভবনের দ্বার বন্ধ করিয়া শয়ন করিলাম।

আমি শ্রান্ত হইয়াছিলাম; শীঘ্রই নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম। স্বপ্নঘোরে রাত্রি প্রভাত হইল। শীতকাল, লেপমুড়ি দিয়া পড়িয়া ছিলাম। চক্ষু চাহিয়া দেখি, গবাক্ষরন্ধ্র ভেদ করিয়া সূর্য্যরশ্মি গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে। তখনই উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া অপেক্ষা করিতেছি, এমন সময় অম্বাপ্রসাদ আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং আমাকে শিপ্রা নদীতীরে কতকগুলি তীর্থক্রিয়া সম্পন্ন করিতে উপদেশ দিলেন। আমি দেশভ্রমণে আসিয়াছি, তীর্থ কার্য্য আমার উদ্দেশ্য নহে, এ কথা বলায় তিনি বড়ই নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলেন। আমি শিপ্রায় অবগাহন-স্নানের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে, তিনি উৎসাহশূন্য হইয়া আমার সহিত গমন করিলেন, এবং নদীকূলে বসিয়া অন্যান্য পাণ্ডা ও লোকদিগের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন।

প্রভাতে শিপ্রার দৃশ্য বড়ই মধুর। শিপ্রার নীর নির্ম্মল স্থিরতরঙ্গে প্রবাহিত হইতেছে—জল এমনই নির্ম্মল যে, নদীর তলদেশ পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হইতেছে—নদীতীর প্রায় এক মাইল প্রস্তর দিয়া বাঁধান,—সুন্দর সুন্দর ঘাট ও অনেকগুলি দেবমন্দির তীরের শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। বিশাল ধর্ম্মশালা ও নয়নরঞ্জন সৌধ-মালা নদীকূলে সুশোভিত। উজ্জয়িনীর শিপ্রাতটশোভা বারাণসীর গঙ্গাতীরের ন্যায় সমৃদ্ধ নহে, মথুরার যমুনাকূলের ন্যায় মনোহর নহে—কিন্তু শিপ্রাতীর বড়ই স্নিগ্ধ, বিনম্র, শান্ত ও মধুর!—কেমন এক প্রশান্ত শান্তি আনিয়া হৃদয় সমাচ্ছন্ন

করিয়া ফেলে। কি এক করুণ স্বর্গীয় রসে চিত্ত ডুবিয়া যায়! আমি ক্ষৌরকার্য্য শেষ করিয়া শিপ্রার হিম-স্নিগ্ধ জলে নামিয়া পড়িলাম—অনেক নরনারী বালক বালিকা যুবক যুবতী প্রফুল্লচিত্তে স্বচ্ছদর্পণনিভনীরে স্নান করিতেছে! অনেক সাধু সন্ন্যাসীও তীরে উপবিষ্ট হইয়া হর হর বোম্ বোম্ শব্দে দিগন্ত মুখরিত করিতেছেন। পাণ্ডাগণ মুণ্ডিতমস্তক যাত্রীদিগকে লইয়া তীর্থকার্য্য, শ্রাদ্ধ, পূজা প্রভৃতি করিতে বসিয়া গিয়াছেন। অনেক ভিক্ষুকও ভিক্ষার নিমিত্ত যাত্রিগণকে উত্যক্ত করিতেছে। নদীর কূল প্রভাতে কোলাহলময়—ধর্ম্মের জীবন্ত জাগ্রত চিত্রে সমুদ্ভাসিত।

নদীতীরের মধ্যস্থলে মুসলমান নরনারীদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট ঘাট। সে ঘাটে হিন্দু অথবা অন্য কোনও জাতি স্নান করে না।

আমি সানন্দে শিপ্রায় স্নান করিতে লাগিলাম—সমস্ত দেহ নিমজ্জিত করিয়া বহুক্ষণ বসিয়া রহিলাম। যদিও নীর অত্যন্ত শীতল, তবুও যেন অপূর্ব্ব তৃপ্তি বোধ করিতে লাগিলাম। অনেকদিন স্নানে এমন শান্তি উপলব্ধি করি নাই। পুণ্যতীর্থের পুণ্যস্নানে আমার পাপতপ্ত দেহ যেন জুড়াইয়া গেল!—শিপ্রার অপর নাম গন্ধবতী—কবি যথার্থই লিখিয়াছেন;—'গন্ধবতীর বায়ু পদ্মের গন্ধ মাখিয়া, পদ্মের রজ সর্ব্বাঙ্গে অঙ্কিত করিয়া, আর যুবতীরা যে গন্ধতৈল মাখিয়া নামিতেছেন, তাহার গন্ধ অপহরণ করিয়া, বাগানের প্রত্যেক ফুলগাছ—প্রত্যেক লতা কাঁপাইতেছে। * * * সেখানে রমণীরা কেলিলীলায় ক্লান্ত হইয়া পড়িলে শীতলস্পর্শ শিপ্রানদীর বায়ু তাহাদের ক্লান্তি দূর করিয়া দেয়। শিপ্রা-বায়ু ফুটন্ত পদ্ম হইতে সৌরভ গায়ে মাখিয়া সুরভি হইয়া উঠে।'

মহাকাল।—স্নানে পরম শান্তি উপভোগ করিয়া আমি ভারতের অন্যতম জ্যোতির্লিঙ্গ, উজ্জয়িনীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্ন—মহাদেব মহাকালের মন্দিরাভিমুখে চলিলাম। কিছুক্ষণ পরে মন্দিরের একটি প্রবেশদ্বারের নিকট উপনীত হইয়া প্রবেশপথের বাম দিকে একটি মন্দিরপ্রকোষ্ঠে শ্বেতমর্ম্মরনির্ম্মিত একটি গণেশের মূর্ত্তি দেখিলাম। এই শুভ্রসুন্দর মূর্ত্তিটি বাস্তবিক চক্ষু শীতল করিয়া দেয়।

প্রবেশদ্বার অতিক্রম করিয়াই মহাকালের প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণে উপনীত হইলাম। প্রাঙ্গণতল প্রস্তরমণ্ডিত। প্রস্তরনির্ম্মিত উত্তুঙ্গ শুভ্র মন্দিরের স্বর্ণমণ্ডিত কলস গগন চুম্বন করিতেছে।—শুনিলাম, উত্তর-পশ্চিম ভারতে এক সোমনাথের মন্দির ভিন্ন এত বড় উচ্চ মন্দির আর ছিল না। ফেরিস্তায় লিখিত আছে—'এই মন্দিরের সুদীর্ঘ স্তম্ভসমূহ মণিমাণিক্যে খচিত ছিল। গর্ভগৃহে একটি দীপ প্রজ্বলিত করিলে সেই রশ্মি অতুলনীয় হীরকখণ্ডে প্রতিফলিত হইত;—সমগ্র

মন্দির যেন সমুজ্জ্বল সূর্য্যকিরণে সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিত।' মন্দিরে প্রবেশ করিয়াই তাম্রমণ্ডিত শিবলিঙ্গ দর্শন করিয়া পুলকে প্রণত হইলাম। কিন্তু ইনি মহাকাল নহেন—ইনি তাঁহার অন্যাংশ ওঙ্কারনাথ। মহাকাল মন্দিরের নিম্নতলে মহাগর্ভে অবস্থান করেন। আমরা মন্দিরের পশ্চাদ্‌ভাগের বাপাতটস্থ অলিন্দ অতিক্রম করিতে করিতে মহাকাল-দর্শনে চলিলাম। দ্বারের নিকটে, অলিন্দে ডালা ভরিয়া স্তূপাকার বিল্বদল, পুষ্পসম্ভার, মালা, ধূপ, চন্দন প্রভৃতি পূজোপকরণ বিক্রীত হইতেছে। বিবিধ-বর্ণ-রঞ্জিত-উজ্জ্বল-বসনা ললনাগণ দেবাদিদেবের পূজাসম্ভারে ডালা সজ্জিত করিয়া, পূর্ণ-জলপাত্র-হস্তে মন্দিরাভিমুখে চলিয়াছেন। আমিও মহাদেবের পূজার নিমিত্ত কিছু বিল্বদল ও পুষ্প ক্রয় করিয়া মন্দিরে চলিলাম। দেখিলাম, প্রস্তরনির্ম্মিত সোপানাবলীর সাহায্যে, পূর্ব্বোক্ত মন্দিরের নিম্নতলে—মহাগর্ভে অবতরণ করিতে হইবে। সেদিন দর্শনার্থীরা জনতা হেতু বহুকষ্টে মহাগর্ভে নামিতে হইল। নামিতে নামিতে নিঃশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। কোনও প্রকারে নিম্নে অবতীর্ণ হইয়া দেখিলাম, বিরাট শিবলিঙ্গ স্নানান্তে চন্দন-বিল্বপুষ্পভারে সজ্জিত হইয়া রহিয়াছেন। চতুর্দ্দিকে সৌম্যদর্শন দীর্ঘশ্মশ্রুসমন্বিত সন্ন্যাসী পূজকেরা মহাদেবকে পরিবেষ্টন করিয়া পূজা করিতেছেন—অসংখ্য নরনারী তাঁহাদের পূজোপহার মহাদেবের মস্তকে অর্পণ করিতেছেন। আমিও দেবাদিদেব মহাকালকে পুষ্পবিল্বদল অর্পণ করিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম। মন্দিরের অদূরে পুরাতন মহাকালের ভগ্নমন্দির—ইহাকে মহাকালের জুনা মন্দির বলে।

প্রায় এগারটার সময় বাসায় আসিয়া পাণ্ডাগৃহে ভোজনার্থ উপনীত হইলাম। তাঁহার বাটী একটি গলির মধ্যে ; আমার বাসা হইতে পাঁচ মিনিটের পথ। বাটীটি ত্রিতল। যে গৃহটীতে আমাকে বসাইলেন, সে গৃহটি চিত্রদর্পণে ও নানা চিত্রাঙ্কিত প্রাচীরে বিশেষরূপে সজ্জিত। পাণ্ডা মহাশয় আমার জন্য অন্ন, দাউল, দুইপ্রকার তরকারী, ভাজি, টক্‌, মিষ্টান্ন ও দুগ্ধের ব্যবস্থা করিলেন। আমি আহারান্তে বাসায় আসিলে, তিনি আমাকে তাঁহার কনিষ্ঠভ্রাতা বিনায়কের জিম্মা করিয়া দিলেন। তদবধি বিনায়কই আমার তত্ত্বাবধান করিয়াছিল।

আমি বিনায়ককে বলিলাম, 'আমার সময় অতি সংক্ষিপ্ত। তুমি ঠিক দুইটার সময় আসিবে ; তোমার সহিত দ্রষ্টব্য স্থানসমূহ দেখিতে যাইব।' সদানন্দ সরলপ্রকৃতি যুবক বিনায়ক সহাস্যে সম্মতিজ্ঞাপন করিয়া প্রস্থান করিল। আমিও বিশ্রামার্থ শয়নে পদ্মনাভ স্মরণ করিলাম।

হর্ষদ্বীপ ; ১৭ই জানুয়ারী ; ১৯১৪।—বেলা প্রায় আড়াইটার সময় বিনায়ক আসিয়া উপস্থিত। আমিও প্রস্তুত ছিলাম। প্রথমেই হর্ষদ্বীপের কালীদর্শনে যাত্রা করিলাম। যাইতে যাইতে পথিমধ্যে এক স্থানে প্রায় দশ হস্ত উচ্চ এক বিরাট গণেশমূর্ত্তি দর্শন করিলাম। এত বড় গণেশ কখনও দেখি নাই। হেমন্তের রৌদ্রতাপ মন্দীভূত হইয়া আসিতেছিল; বেশ বাতাস ছিল। চলিতে কোনও কষ্ট হইতেছিল না।

প্রথমে সহরের মধ্য দিয়া, মহাকালের মন্দির ছাড়াইয়া, একটা উন্মুক্ত স্থানের জলাভূমির পার্শ্ব দিয়া যাইতে লাগিলাম। ভূমিটা নাবাল। মধ্য দিয়া পথ। উভয় পার্শ্বের প্রান্তর নিম্ন—রক্তাভ। প্রান্তরমধ্যে অল্প জল সঞ্চিত রহিয়াছে—তাহার মধ্যে রাঙ্গা রাঙ্গা ছোট ছোট হেলা ফুল (নলিনী) ফুটিয়াছে। তাহাতে মাঠের বড় বাহার খুলিয়াছে—এই অর্দ্ধশুষ্ক সরোবরের প্রান্তদেশেই হর্ষদ্বীপ। চারি দিকে সুন্দর প্রাচীরে পরিবেষ্টিত, পাষাণ-নির্ম্মিত প্রাচীন মন্দিরে প্রবিষ্ট হইলাম। এই মন্দিরের প্রাঙ্গণও প্রস্তরমণ্ডিত। প্রাঙ্গণের উভয় প্রান্তে প্রস্তরনির্ম্মিত দুইটি সুদীর্ঘ দীপস্তম্ভ। স্তম্ভগাত্রে প্রদীপ রাখিবার জন্য ছোট ছোট চতুষ্কোণ প্রস্তর কাটিয়া বাহির করা হইয়াছে। এই দীপস্তম্ভযুগল দীপান্বিতার প্রজ্বলিত দীপমালায় মণ্ডিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে। প্রাঙ্গণে বিশাল প্রাচীন বটবৃক্ষ স্থানটিকে ছায়াশীতল করিয়া রাখিয়াছে।

দেবীমন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া কালিকা ও অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি দর্শন করিলাম। এই কালীমূর্ত্তি আমাদের দেশের ন্যায় নহেন। ইনি দেখিতে কতকটা আমাদের শীতলাদেবীর ন্যায়—রক্তবর্ণা। মন্দিরের অভ্যন্তরে আস্তরণে—অপূর্ব্ব শিল্পে নানা মূর্ত্তি সুশোভিত। কালীমন্দিরের পশ্চাদ্‌ভাগেই অগস্ত্যেশ্বর মহাদেবের মন্দির। প্রাঙ্গণে আরও অন্যান্য দেবদেবীর মূর্ত্তি বিরাজমান। অগস্ত্যেশ্বরের মন্দিরের পশ্চাতেই শিপ্রা প্রবাহিতা। আমরা নদীকূলে উপনীত হইয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলাম।

উজ্জয়িনী-প্রান্তবাহিনী শিপ্রার উপকূলে সারি সারি প্রস্তরনির্ম্মিত ঘাটশ্রেণী। তন্মধ্যে দশাশ্বমেধ, দত্তাত্রেয়, পিশাচমুক্তেশ্বর, গন্ধর্ব্ববতী, সিদ্ধনাথ, মঙ্গলাঘাট ও রামঘাটই প্রসিদ্ধ। মুসলমানদিগের নিমিত্ত কল্পিত, পূর্ব্বোক্ত ঘাটের উপরেই একটি মসজীদ্।

আমরা বহুক্ষণ একটি প্রস্তরনির্ম্মিত সোপানের উপর বসিয়া শিপ্রার স্নিগ্ধ-সলিলসম্পৃক্ত সান্ধ্যসমীরণে হৃদয় মন শীতল করিতে লাগিলাম। সেদিন আর

কোথাও যাইতে পারিলাম না। ক্রমে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। ভাবিলাম, এমন একদিন ছিল, যে দিন এই শিপ্রার তীরভূমি বিপুল-কোলাহলে মুখরিত হইত। স্বয়ং রাজা বিক্রমাদিত্য অসংখ্য রাজপুরুষ ও নবরত্ন লইয়া এই নদীতীরে কবিত্বসুখ উপভোগ করিতেন। কোন্ সুদূর অতীতে সেই দিন বিলীন হইয়াছে।—সেই কীর্ত্তিদীপ্ত, মহাসমুজ্জ্বল স্মৃতির ক্ষীণ—ক্ষীণতর—অস্ফুট প্রতিবিম্ব আজি শিপ্রাসলিলে সন্ধ্যার অন্ধকারে প্রতিবিম্বিত হইতেছে।

আমরা নদীতীর হইতে উঠিয়া নদীর পূর্ব্বপ্রান্তবর্ত্তী সেতু পার হইয়া একটি মন্দিরে কেদারেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ দর্শন করিলাম। হিমালয়ের কেদারনাথ যেমন বারাণসীতে আছেন, ভক্তের বাঞ্ছা-পূরণের নিমিত্ত তেমনই অবন্তীতেও বিরাজ করিতেছেন। এ সম্বন্ধে অনেক কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে—সে সকলের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

কেদারেশ্বর দেখিয়া বাসায় প্রত্যাগত হইলে, বিনায়ক বলিলেন, 'চলুন, মহাকালের আরতি দেখিবেন, চলুন।' মহাকালের আরতির কথা মহাকবি কালিদাসের 'মেঘদূত' নামক অমরকাব্যে ও অন্যান্য পুস্তকে পাঠ করিয়াছিলাম। কিন্তু সে আরতি, সে সমারোহ, সেই অতীত যুগের মহাত্মারাই দেখিয়াছিলেন। মেঘদূতের যক্ষ মেঘকে সম্বোধন করিয়া, মহাকালের আরতি ও অন্যান্য বিষয় বলিতেছে;—সে সময় কিরূপ আরতি হইত, কিরূপ সমারোহ ছিল,—মহাদেবের তাণ্ডব-নৃত্যের ভঙ্গী,—গভীর নিশীথে নিবিড় তিমিরে রমণীদিগের অভিসার—প্রভৃতির বর্ণনার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল;—যদিও বর্ত্তমানে ভক্তিমূলক দৃশ্যের অভাব নাই—কিন্তু পূর্ব্বদৃশ্য তিরোহিত হইয়াছে।—

'সেই পুণ্য মহাকাল অন্য কালে গিয়ে পড় যদি,
তিষ্ঠি রহ, দিনমণি অস্ত নাহি যায় যে অবধি—
সন্ধ্যাপূজা হয় যবে ছাড়ি দিয়ে দুন্দুভি নিঃস্বন,
ধন্য হবে মেঘরাজ, সার্থক সে তোমার গর্জ্জন।
'নূপুর-সিঞ্জনে সেথা তালে তালে চারু পা ফেলিয়ে,
নৃত্য করে গণিকারা রত্নদণ্ড চামর দুলায়ে,
নখপদে পেয়ে, আহা, বরিষার নব বারিধারা,
সুদীর্ঘ স্নেহের দৃষ্টি তোমা পরে দিবে গো তাহারা।
'মণ্ডল আকারে লীন উচ্চভুজ-তরুবন 'পরি,
ঘননীল দেহে তব জবারক্ত সান্ধ্যতেজ ধরি;

হরনৃত্যে হবে তাঁর রক্তমাখা নাগাজিনখানি,
স্তিমিত প্রসন্নদৃষ্টি ভক্ত পরে দিবেন ভবানী।
'রমণ-বসতি চলে রমণীরা, রজনী গভীর,
পথঘাট দিশি দিশি সূচীভেদ্য দুস্তর তিমির ;
স্নিগ্ধ বিদ্যুতের আলো ঝিকিমিকি যেয়ো পথময়,
তর্জ্জন গর্জ্জন করি' বালাদের দেখাও না ভয়।'

পূর্ব্বকালের মহাকালের আরতির সহিত বর্ত্তমান আরতির কোনও সাদৃশ্য নাই, তবে বর্ত্তমান সময়ের আরতিও বিশেষ রমণীয়। আমরা যথাসময়ে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, মুকুটপরিহিত মহাকাল পুষ্পচন্দনে অপূর্ব্বশোভা ধারণ করিয়াছেন। নরনারীর জনতায় মন্দির পরিপূর্ণ। মহাগর্ভে ঘৃত-কর্পূর-অগুরুর দীপ জ্বলিতেছে। গন্ধামোদে চৌদিক ভরিয়া গিয়াছে। যথাসময়ে গম্ভীর বাদ্যধ্বনি সহকারে প্রজ্বলিত পঞ্চপ্রদীপে মহাদেবের আরতি আরব্ধ হইল। অন্যান্য পুরোহিতেরা দেবাদিদেবকে চামর ব্যজন করিতে লাগিলেন। ক্রমে শঙ্খ প্রভৃতি উপকরণে আরতি শেষ হইল। আমিও বাসায় প্রত্যাগত হইয়া কয়েকখানি রুটী, তরকারী ও কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন উদরস্থ করিয়া শয়ন করিলাম।

৮ই জানুয়ারী; ১৯১৪।—পরদিন প্রভাতেই কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া, বিনায়ককে সঙ্গে লইয়া, বাজারে আসিয়া একখানি টাঙ্গা ভাড়া করিলাম। টাঙ্গাচালকের সহিত দেড় টাকা ভাড়া ধার্য্য হইল। সে উজ্জয়িনীর যাবতীয় দর্শনীয় স্থান আমাকে দর্শন করাইবে।

অঙ্কপাত।—আমি ও বিনায়ক বস্ত্রাদি সঙ্গে লইয়া টাঙ্গায় আরোহণ করিলাম। প্রথমে টাঙ্গা সহরের মধ্য দিয়া উত্তরাভিমুখে চলিতে লাগিল। রাজপথের প্রস্থ প্রায় ৩০ ফিট; কিন্তু সকল স্থানে সমান নহে। উভয় পার্শ্বে দ্বিতল সৌধ-শ্রেণী। সম্মুখভাগে কাষ্ঠনির্ম্মিত অলিন্দ, গবাক্ষ ও দ্বারের শিল্প-শোভা চিত্ত আকৃষ্ট করিতেছে। মধ্যে মধ্যে ত্রিতল সৌধও দৃষ্ট হইতে লাগিল। রাজপথ জনপূর্ণ—দু'ধারে পণ্যপূর্ণ বিপণীশ্রেণী নয়নরঞ্জন করিতেছে। বর্ত্তমান উজ্জয়িনী দৈর্ঘ্যে সর্ব্বসমেত প্রায় ৫ মাইল হইবে। আমরা চলিতে চলিতে মধ্যে মধ্যে এক একটি তোরণ অতিক্রম করিতে লাগিলাম। প্রথমেই আমরা অঙ্কপাত নামক স্থানে উপনীত হইলাম। এই অঙ্কপাতে (বর্ত্তমানে একটি অট্টালিকা) পূর্ব্বে সান্দীপণি মুনির পাঠশালা ছিল। এখানে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম অঙ্কশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এখানে শ্রীকৃষ্ণের বৈঠক, গদী ও একটী কাষ্ঠনির্ম্মিত দ'লানে সান্দী-

পণি মুনির ও বিশ্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি আছে। অট্টালিকা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, দক্ষিণ দিকে একটি প্রাচীন ছাউনী দেখিয়া, একটি প্রস্তরনির্ম্মিত সমুচ্চ তোরণ পার হইয়া, গোমতী কুণ্ড দেখিলাম। এত বড় প্রকাণ্ড কুণ্ড কচিৎ দৃষ্ট হয়। চারি দিকে প্রস্তরনির্ম্মিত সোপান। ইহাতে জল নাই। কুণ্ড জীর্ণ, ভগ্নদশায় উপনীত। এখানে একটি শিবমন্দির ও একটি ধর্ম্মশালা আছে। অঙ্কপাত হইতে প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে গোবিন্দরাম নাথুরামের রমণীয় উদ্যানে পরিবেষ্টিত দেবালয়ে রাধাকৃষ্ণের সুন্দর যুগলমূর্ত্তি বিরাজিত।*

মঙ্গলেশ্বর।—অঙ্কপাত হইতে এক মাইল উত্তরে শিপ্রার পূর্ব্ব তীরে মঙ্গলেশ্বর মহাদেবের মন্দির। মন্দিরের সম্মুখেই একটি পুরাতন প্রস্তর-নির্ম্মিত প্রকাণ্ড ঘাট। ঘাটের উপরেই একটি প্রস্তরনির্ম্মিত বৃত্তাকার চাঁদনী শোভিত। চাঁদনীতে একটি মহাদেব ও কৃষ্ণমূর্ত্তি আছেন। তদূর্দ্ধে সোপান অতিক্রম করিয়া মন্দিরমধ্যে মঙ্গলেশ্বর দর্শন করিলাম। পশ্চাদ্ভাগে কুলঙ্গীতে ধরিত্রী দেবীর চতুর্ভুজা মূর্ত্তি। তাহার নিকটে মর্ম্মররচিত সুগঠিত পার্ব্বতী দেবী করযোড়ে বসিয়া আছেন।

সিদ্ধবট।—মঙ্গলেশ্বর হইতে প্রায় দুই মাইল রাস্তা ঘুরিয়া, অনেক স্থলে কণ্টকাকীর্ণ প্রান্তর-পথ অতিক্রম করিয়া, শিপ্রা নদীর পশ্চিম-উপকূলে সিদ্ধবটে উপনীত হইলাম। স্থানটি সুরম্য। চারিটি প্রস্তরনির্ম্মিত সুন্দর ঘাট পাশাপাশি অবস্থিত। তন্মধ্যে একটি ঘাট স্ত্রীলোকদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট। এখানে অনেকে স্নান করিতেছে—অনেকে পিণ্ডদান করিতেছে। আমরা এখানে শিপ্রার নির্ম্মল স্নিগ্ধজলে অবগাহন স্নান করিলাম। অনেকটা পথ ঘুরিয়া আসিয়াছি। স্নানে কি তৃপ্তিই যে বোধ করিলাম, তাহা বলিবার নহে।

সিদ্ধনাথ বট—একটী মধ্যাকৃতি বটবৃক্ষ। বৃক্ষটী তত প্রাচীন বলিয়া বোধ হইল না। তরুবর না কি মনস্কামনা সিদ্ধ করেন, তাই বহু নর নারীর নিকট পূজা প্রাপ্ত হয়েন। সিদ্ধবট-তীর্থে অনেকগুলি শিবমন্দির ও সাধু সন্ন্যাসী-দের নিমিত্ত ধর্ম্মশালা আছে। অদূরে গবর্মেণ্টের কারাগার। ইহার বুরুজ-সমন্বিত অত্যুচ্চ প্রাচীর ও বিরাট অবয়ব দেখিলে একটী দুর্গ বলিয়া মনে হয়।

স্থানীয় লোকে বলে যে, সিদ্ধবট ঘাটের দক্ষিণ দিকের উন্মুক্ত প্রান্তরে মৃচ্ছকটিক নাটকের জীর্ণোদ্যান ছিল। আজি সেই উদ্যানের একটি তৃণও নাই—ভূপৃষ্ঠ হইতে তাহার শেষ চিহ্নও মুছিয়া গিয়াছে। তাহার স্থাননির্ণয় বর্ত্তমানে কল্পনারও অসাধ্য।

কালভৈরব।—সিদ্ধবট হইতে অর্দ্ধ মাইল দক্ষিণে মধুজী সিন্ধিয়ার নির্ম্মিত ভৈরবগড়। এই ভৈরবগড় এককালে অপূর্ব্ব-শ্রী-সমন্বিত ছিল। অতি সুন্দর দক্ষিণদ্বারী তোরণ অতিক্রম করিয়া চতুর্দ্দিকে উচ্চ প্রাচীরে পরিবেষ্টিত প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে উচ্চবেদিকার উপর নির্ম্মিত মন্দিরে কালভৈরব বিরাজ করিতেছেন। চারি দিকে দুই স্তবক কাষ্ঠস্তম্ভ-সমন্বিত অলিন্দশ্রেণী। মন্দিরের পশ্চাতে একটি কাষ্ঠনির্ম্মিত সুন্দর বারদ্বারী। ইহাও জীর্ণ—ভগ্ন। কালভৈরবের মস্তকে সিন্ধিয়ার ন্যায় পাগড়ী শোভিত। এমন প্রখরকূটদৃষ্টিসমন্বিত মূর্ত্তি আর কোথাও দেখি নাই। শুভ্র মর্ম্মররচিত গণেশ পশ্চাতে অবস্থান করিতেছেন।

পূর্ব্বোক্ত প্রাঙ্গণের দক্ষিণে একটি কক্ষে দত্তাত্রেয়ী বিরাজিত। চব্বিশটি স্তম্ভ-সমন্বিত নাটমন্দির। এখানে শ্বেত মহাদেব ও চতুর্ভুজ কৃষ্ণের মূর্ত্তি আছে।

ভৈরবগড়ের পশ্চিমে শিপ্রার উপকূলে প্রস্তরনির্ম্মিত প্রকাণ্ড ঘাট। এই স্থানটি অতিশয় মনোহর। বড় বড় বট, তিন্তিড়ী প্রভৃতি বৃক্ষ স্থানটীকে ছায়াময় করিয়াছে। অনেক বালিকা, যুবতী কুম্ভকক্ষে জলার্থ সমাগত। নদীর পরপারে কাননপ্রান্তে শ্মশান। শ্মশানের নিকটেই ধর্ম্মশালা। ভৈরবগড়ের সম্মুখেই প্রাচীন উজ্জয়িনীর তোরণ ও প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ। তৎপরে ক্রমান্বয়ে শৈলরাজির ন্যায় মৃত্তিকাস্তূপ তরঙ্গায়িত হইয়া দিগ্বলয় চুম্বন করিতেছে—যেন সমুদ্রতটবর্ত্তী বালিয়াড়ি ধূ-ধূ করিতেছে। বিশ্বব্যাপিনী কীর্ত্তির কি ভীষণ মহাশ্মশান! কোন্ অতীত যুগের ভয়ঙ্কর ভূকম্পনে অমরাবতীসদৃশী মহানগরী উজ্জয়িনী অতল মৃত্তিকাগর্ভে বিস্মৃতির গাঢ় অন্ধকারে লুকাইয়া গিয়াছে—অতুলনীয় প্রাসাদ, সৌধ, মন্দির, অলিন্দ, স্তম্ভ প্রভৃতি শীতল মৃত্তিকার গভীরতলে চিরবিশ্রামে বিলীন হইয়া গিয়াছে, তাহার ক্ষীণ চিহ্নাবশেষও নাই। নিয়তির কি কঠোর বিধান!

কালীস্থান।—ভৈরবগড় হইতে আমরা উজ্জয়িনীর কালীস্থানে ভীষণ-দর্শনা কালীমূর্ত্তি দেখিতে চলিলাম। ইহা দূরত্বে ভৈরবগড় হইতে প্রায় এক মাইল হইবে। আমাদের টাঙ্গা প্রাচীন উজ্জয়িনীর মহাশ্মশানের মৃত্তিকাস্তূপমধ্যস্থ পথ অতিক্রম করিয়া চলিল। যেন একটী সঙ্কীর্ণ রৌদ্ররশ্মিহীন গিরিসঙ্কটের ভিতর দিয়া চলিয়াছি। মধ্যে মধ্যে নিবিড় কণ্টকিত বনগুল্ম আমাদের গাত্রে গণ্ডে আঁচড় দিতে লাগিল। এইরূপে নানা উচ্চ নিম্ন ভূমির উপর দিয়া আমাদের টাঙ্গা প্রান্তরপার্শ্বস্থিত, প্রাচীরে পরিবেষ্টিত, তিন্তিড়ীবৃক্ষবহুল চতুষ্কোণ স্থানে উপস্থিত হইল। এই তিন্তিড়ী-উদ্যানের মধ্যস্থলে গণেশের মন্দির। গণেশবাহন মূষিকরাজ

সম্মুখস্থ মণ্ডপে নতজানু হইয়া উপবিষ্টভাবে প্রভুর অর্চ্চনায় নিরত। এখানে একটি খর্পরাচ্ছাদিত ধর্ম্মশালা আছে।

উল্লিখিত গণেশমন্দিরের পশ্চাদ্ভাগেই কালীমন্দির। এই মন্দির সাধারণ মন্দিরাকারে নির্ম্মিত নহে। ইহা বিকট-দর্শন দুর্গ-প্রাকারের অংশবিশেষ। ইহার উপরিভাগ গম্বুজ অথবা কূর্ম্মের পৃষ্ঠবৎ। প্রবেশদ্বারও তদ্রূপ। মন্দিরাভ্যন্তরে ভীষণ-দর্শনা কালিকাদেবী বিরাজ করিতেছেন। দেবীর বিশাল মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ; চক্ষু কাচনির্ম্মিত, ভয়ঙ্কর। মূর্ত্তি প্রাচীরসংলগ্ন। আমাদের দেশের প্রচণ্ডা শীতলা মূর্ত্তির অনুরূপ। নাকে নাকছাবি অঙ্কিত। কিন্তু অতি ভীতিপ্রদ ভীষণ-ভাবব্যঞ্জক। অকস্মাৎ দেখিলে শরীর শিহরিয়া উঠে। * স্থানটি মহাগম্ভীর—মহা নির্জ্জন। মন্দিরের চতুর্দ্দিকে প্রস্তরনির্ম্মিত ধর্ম্মশালার অলিন্দশ্রেণী সুশোভিত। আমরা মহাদেবীকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া কিঞ্চিৎ প্রণামী দিয়া মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম। শুনিলাম, এই ভয়ঙ্কর স্থানে মহারাজ বিক্রমাদিত্য শক্তিসাধনায় সিদ্ধ—তাল-বেতাল-সিদ্ধ হইয়াছিলেন। এখানে অনেকগুলি সতী-চবুতারা বা সতী-মঠ দেখিলাম। সহমৃতা সতী ললনাদিগের স্মৃতিরক্ষার্থ এই বেদিকাগুলি নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার উপর একটী প্রস্তরখণ্ডে পতি-পত্নীর মূর্ত্তি অঙ্কিত। ব্রাহ্মণদম্পতীর পার্শ্বে বৃষ ও ক্ষত্রিয়দম্পতীর পার্শ্বে অশ্বমূর্ত্তি অঙ্কিত। এতদ্দেশীয় রমণীরা এই সতী-স্তম্ভের পূজা করিয়া থাকেন।

ভর্ত্তৃগুহা।—কালীস্থান হইতে আমরা ভর্ত্তৃগুহা দেখিতে চলিলাম। কতক দূর যাইয়া টাঙ্গা আর চলিল না। আমাদিগকে পদব্রজে যাইতে হইল। ভর্ত্তৃ-গুহা শিপ্রার তটে একটি অতি নিম্নভূমে অবস্থিত। ইহা পার্ব্বত্য গুহা নহে, বা ভূগর্ভে খনিত কোনও সুড়ঙ্গপথও নহে। একটি প্রস্তরনির্ম্মিত দ্বিতল অতি প্রাচীন অট্টালিকা; পূর্ব্বে বৌদ্ধ মঠ ছিল। সৌধের অভ্যন্তরে কয়েকটি স্থান গুহার আকারে নির্ম্মিত হইয়াছে, বোধ হইল। এক জন প্রদর্শক সন্ন্যাসী একটি জ্বলন্ত বর্ত্তিকা লইয়া অট্টালিকার অভ্যন্তরস্থ গুহার মধ্যের মূর্ত্তিগুলি দেখাইতে লাগিল। অধি-কাংশই বুদ্ধের ধ্যানী মূর্ত্তি। রাজা বিক্রমাদিত্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভর্ত্তৃহরি পর-বর্ত্তিকালে এই গুহায় তাঁহার পত্নী পিঙ্গলা দেবীর সহ তপস্যা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের যুগলমূর্ত্তি ও গোরক্ষনাথ নামক তাঁহাদের গুরুর চিত্র আছে। অনেক

* দুই জন বিশিষ্ট বঙ্গীয় ভ্রমণকারী উজ্জয়িনীর কালিকা দেবীকে বঙ্গদেশের কালীমূর্ত্তির ন্যায় বলিয়াছেন। ইহা আদৌ সত্য নহে। আমাদের দেশের মূর্ত্তির সহিত ইঁহাদের কোনও সাদৃশ্য নাই। ইঁহারা রক্তবর্ণা লোলজিহ্বা নহেন, পরন্ত অর্দ্ধাকৃতি।

প্রত্নতত্ত্ববিৎ এই গোরক্ষনাথকে লইয়া বাদানুবাদ করেন। আমরা কিন্তু একেবারে সে পর্য্যায়ের বহির্ভূত।

দেখিতে দেখিতে ১॥০ টা বাজিয়া গেল। সেই বেলা আটটায় কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন খাইয়া বাহির হইয়াছি। আর কিছুই আহার হয় নাই। কিন্তু এই সকল প্রাচীন দেবস্থান দেখিতে দেখিতে এতই তন্ময় হইয়া গিয়াছিলাম যে, আহারের কথা একেবারেই মনে ছিল না। বিনায়ক বেচারা ক্ষুধায় কাতর হইয়াছে। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, তাহার অধর শুষ্ক হইয়া ধূলিবৎ হইয়াছে, চক্ষু বুজিয়া আসিতেছে! তখন আমি তাহাকে বলিলাম, 'চল, বাসায় ফেরা যাক।' আমার কথা শুনিয়া তাহার যেন জীবনসঞ্চার হইল। সে এক লম্ফে টাঙ্গায় উঠিয়া বসিল। আমি আরোহণ করিলে, চালক অশ্ব ছুটাইয়া দিল।

অশ্ব সহরাভিমুখে ছুটিতে লাগিল। চলিতে চলিতে কত ভগ্নাবশেষ যে দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? কত অরণ্যমধ্যে কত মন্দির, কত মঠ, কত স্তম্ভ, কত অট্টালিকা, কত দালান যে দীর্ণ জীর্ণ হইয়া ধূল্যবলুণ্ঠিত হইতেছে, কে তাহার সংখ্যা করিবে? দিগন্তব্যাপী ধ্বংসস্তূপতরঙ্গ মহাকালের মহালীলার অভিনয় করিতেছে—শিপ্রাকূলের কত ঘাট, কত বুরুজ, কত চবুতারা, কত চাঁদনী, কত মন্দির যে নদীগর্ভে লীন হইয়াছে, ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয়! কত দেবালয় দেবশূন্য—কত মহাদেব মন্দিরশূন্য, তাহা প্রত্যেক পলকেই নেত্রে নিপতিত হইতেছে। অনাবৃত প্রান্তরে, অরণ্যে, নদীকূলে, ঘাটে শিবলিঙ্গ অর্দ্ধপ্রোথিত, প্রোথিত, লুণ্ঠিত, ভগ্ন ও উন্মূলিত অবস্থায় দৃষ্ট হইতেছে। কত দেবদেবীর মূর্ত্তি বিকৃত ও বিকলাঙ্গ হইয়া জঙ্গলে কান্তারে লুটিতেছে। কালের কি বিশ্ববিধ্বংসিনী লীলা! ধরাপৃষ্ঠে কি মানবকীর্ত্তি কিছুই থাকিবে না? কে জানিত, মহারাজ বিক্রমাদিত্যের 'স্বর্ণসৌধকিরীটিনী' উজ্জয়িনী ধ্বংসের মহাশ্মশানে পরিণত হইবে?

বেলা তৃতীয় প্রহর। হেমন্তের শীতরৌদ্র কান্তারে, প্রান্তরে, ঘাটে, বাটে, মাঠে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আমরা দেখিতে দেখিতে নগরে প্রবিষ্ট হইলাম। সেই জনাকীর্ণ রাজপথ বাহিয়া বাসায় আসিয়া, টাঙ্গাচালককে বিদায় দিয়া, অম্বাপ্রসাদের গৃহে অন্ন রুটী ভোজনে তৃপ্ত হইয়া, বিশ্রামার্থ নিজ বাসায় আসিয়া শয়ন করিলাম।

নিদ্রাভঙ্গে উঠিয়া দেখি, পাঁচটা বাজিয়া গিয়াছে। সে দিন এত ক্লান্ত হইয়াছিলাম যে, আর কোথাও যাইতে ইচ্ছা হইল না। কেবল স্নিগ্ধ-

স্বচ্ছসলিলা শিপ্রার উপকূলে বসিয়া সন্ধ্যা-যাপনের আশায় একাকী গমন করিলাম।

দেখিলাম, সন্ধ্যার স্নিগ্ধ মধুর ছায়া নদীবক্ষে পতিত হইয়াছে—পুরবাসিনী রমণীগণ নদীতীর প্রজ্জলিত দীপমালায় শোভিত করিতেছেন। দীপমালিনী শিপ্রা যেন রত্নকণ্ঠহারে ভূষিতা হইয়াছেন—প্রজ্জলিত প্রদীপের প্রতিবিম্ব নীর-মুকুরে প্রতিফলিত—যেন স্বর্ণোজ্জ্বল জ্যোতি বিকীর্ণ করিতেছে। কোনও কোনও সন্ন্যাসী শিবনাম গাহিতেছেন—প্রফুল্লমুখী সুবেশা সুন্দরীগণ দীপ প্রজ্জলিত করিতেছেন, পরস্পর হাস্য-পরিহাসে, কথোপকথনে গৃহাভিমুখে প্রতিগমন করিতেছেন। আমার চিত্ত কি এক অনির্ব্বচনীয় হর্ষে পূর্ণ হইয়া উঠিল। বহুকাল-অন্তর্হিত শান্তির জ্যোতিঃকণা ক্ষণকালের নিমিত্তও আমার অন্ধকার হৃদয়ে বিভাসিত হইয়া উঠিল। শিপ্রার পরপারে নিবিড় বনে নৈশ অন্ধকার ঘনাইয়া আসিলে আমি বাসায় প্রত্যাগত হইলাম। পূর্ব্বরাত্রের ন্যায় রুটী, তর-কারী ও কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন আহারে পরিতুষ্ট হইয়া সেই নির্জ্জন নিঃশব্দ ভবনের দ্বার রুদ্ধ করিয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম।

৯ই জানুয়ারী; ১৯১৪।—প্রভাতে উঠিয়া জিলাপী-ভোজনে তৃপ্ত হইলাম। পাঠক! বলিতে কি, উজ্জয়িনীতে আমার নৈশ ভোজনের তাদৃশ সুবিধা নাই। পরমুখাপেক্ষী হইলে মানুষের যে দুর্দ্দশা ঘটে, আমারও অদৃষ্টে তাহাই ঘটিয়াছিল। আমি যদি একটি ভৃত্য নিযুক্ত করিয়া আপনার পাকের ব্যবস্থা করি-তাম, তাহা হইলে এত অসুবিধা হইত না। কিন্তু আমি চির-অকর্ম্মণ্য; অসুবিধা ভোগ করিয়াও আমার সন্তুষ্ট থাকা উচিত। সঙ্গে হ্যাণ্ড-ব্যাগের মধ্যে চা ছিল—কিন্তু এক স্থানে পেয়ালা, চামচে প্রভৃতি হারাইয়া আসিয়াছি—এমন কি, একটি ষ্টেশনে একবার রেলে উঠিবার সময় তাড়াতাড়িতে কুলীর নিকট ছাতা ছড়ি লইতেও ভুলিয়া গিয়াছিলাম—৩।৪টি ষ্টেশন্ ছাড়াইয়া গেলে হঠাৎ ছাতা ছড়ির কথা মনে পড়িল, তখন আর উপায় কি!

ক্রমে বিনায়ক আসিয়া উপস্থিত। ছয় আনা দিয়া একখানি টাঙ্গা ভাড়া করিয়া আমরা নগরীর দক্ষিণ দিকে অতি প্রাচীনকালে নির্ম্মিত মানমন্দির (observatory) দেখিতে চলিলাম। কত রমণীয় বিটপবল্লরীসমাচ্ছন্ন কানন, কুঞ্জ, ভগ্ন মন্দির, মঠ, তোরণ ছাড়াইয়া—কত শ্রমজীবী ব্যবসায়ীদিগের গৃহের সম্মুখ দিয়া শিপ্রাতীরে মানমন্দিরের নিকট উপস্থিত হইলাম। ইহাই সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথমনির্ম্মিত মানমন্দির। প্রত্নতত্ত্ববিদের চোখে কি অমূল্য রত্ন! কত

কালের মানমন্দির! জয়পুরের মহারাজ জয়সিংহের নির্ম্মিত। এখনও দণ্ডায়মান রহিয়াছে। বর্ত্তমানে সর্ব্বসমেত সাতটি (জ্যোতির্ব্বিদ্যার প্রণালী মতে) যন্ত্রসৌধের গঠন (structure) বিদ্যমান। আমি সোপান দ্বারা একটি প্রাচীরের উপর উঠিলাম। সোপানটি প্রাচীরগাত্রে সংলগ্ন। কোনও প্রকার বেষ্টনী নাই। প্রাচীরের উপরে কিয়ৎকাল বসিয়া ভয়ে ভয়ে নামিয়া আসিলাম। আরও একটির উপর উঠিয়াছিলাম। একটি বৃত্তাকার গঠনের নির্ম্মাণচাতুর্য্য দেখিয়া মোহিত হইলাম। পাঠক! এ সকল আমি আপনাদিগকে বুঝাইতে পারিলাম না বলিয়া দুঃখিত। জ্যোতির্ব্বিদ্যায় আমার অধিকার নাই। এখানে দ্বাদশটি তিন্তিড়ী-তরুবর রহিয়াছেন—যন্ত্রসৌধগুলির যেমন দশা, ইহাদের দশাও তদ্রূপ! কঙ্কালের উপর স্থানে স্থানে কে যেন পত্রগুচ্ছ বসাইয়া দিয়াছে। বহুকালের রোগজীর্ণ রোগীর মস্তকের স্থানে স্থানে কেশগুচ্ছ থাকিলে যেমন দেখায়, এই মহাস্থবির তরুগুলিও দেখিতে সেই প্রকার।

অদূরে শিপ্রাতীরে একটি প্রকাণ্ড ঘাট জীর্ণভগ্নদশায় উপনীত। এ স্থলে নগর-প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ বিশেষরূপে পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল। শিপ্রার গর্ভে দুই প্রকাণ্ড সেতুস্তম্ভ (Piers) জীর্ণ অবস্থায় দণ্ডায়মান; পাঠক! এই দুইটি স্তম্ভ নহে! পূর্ব্বে শিপ্রাতটস্থ কূপ ছিল। এক্ষণে কালে শিপ্রা সরিয়া আসিয়া তাহাদিগকে বক্ষে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে। কূপদ্বয় এক্ষণে জলমধ্যে বিরাজিত। ইহারা যে কত দূর গভীর ছিল, ইহাদের স্তম্ভের ন্যায় দণ্ডায়মান-অবস্থা দেখিয়া তাহা অনুমান করা যায়।—নদীতীরে, প্রাচীরপ্রান্তে, ঘাটের উপর, উন্মুক্ত প্রান্তরে অসংখ্য শিবলিঙ্গ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও প্রোথিত রহিয়াছে! হায়, রাজা বিক্রমাদিত্যের শিবময়ী উজ্জয়িনী আজ মহাশিবশ্মশানে পরিণত!

আমরা এ স্থান হইতে 'কালীর দীঘী' নামক একটী প্রাচীন প্রাসাদ দেখিতে চলিলাম। ইহা বহু দূরে অবস্থিত। অনেক ভ্রমণকারী ইহা না দেখিয়া ইহার বৃত্তান্ত লিখিয়া গিয়াছেন। ইহা যে কি ছিল, তাহাও অনেকে বলিতে পারেন না। আমি যত দূর অনুসন্ধানে জানিতে পারিয়াছি, বলিতেছি।—ইহা মুসলমান বাদশাহদিগের পথ-বিশ্রাম-ভবন (Halting Stage) ছিল। ইহার সহিত পৌরাণিক কোনও সম্বন্ধই নাই। পৌরাণিক সৌধশিল্প দেখিয়া অনেকে হিন্দু সৌধ মনে করেন বটে, কিন্তু তাহা ভ্রম। অনেক মসজীদে আমি হিন্দু পৌরাণিক মূর্ত্তি দেখিয়াছি। প্রাচীন দীঘীর মধ্যস্থলে দ্বীপবৎ উচ্চভূমিতে প্রাচীন জলপ্রাসাদ (Water palace) বিরাজিত। পূর্ব্বশ্রী আর নাই! ফোয়ারা প্রস্রবণ বিলুপ্ত হইয়াছে। অনেকে

বলেন,—মহারাজ বিক্রমাদিত্য ইহার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহাও কি কখনও সম্ভব হইতে পারে যে, বিক্রমাদিত্যের প্রাসাদ এখনও বর্ত্তমান? এই দীর্ঘী সংস্কারাভাবে কুমুদ-কহ্লার-পদ্মদামে সমাচ্ছন্ন—নিবিড় জলে বজ্রবৎ সুদৃঢ় প্রাসাদের ছায়া প্রতিবিম্বিত হইতেছে!

আমরা নগরাভিমুখে প্রত্যাগমনের পথে কয়েকটি প্রাচীন স্থান সন্দর্শন করিলাম। দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে যোগসিদ্ধ নামে একটি টিলাভূমি আছে। তাহাকে যোগসিদ্ধ পর্ব্বত বলে। শুনিলাম, বিক্রমাদিত্যের বত্রিশ-সিংহাসন তদুপরি স্থাপিত ছিল। অনেক স্থানে টাঙ্গা দূরে রাখিয়া পদব্রজে যাইতে হইয়াছে। সকল স্থানে টাঙ্গা চলে না। উজ্জয়িনীর বাহিরে উচ্চভূমিখণ্ডের উপর হইতে নগর-দৃশ্য কি চমৎকার! তরুরাজিসমাকীর্ণ বিশাল নগরী, হর্ম্ম্যরাজি, মঠ, মন্দিরের কি বিচিত্র সৌন্দর্য্য নয়নে প্রতিভাত হইতেছে! হরিৎপত্রপল্লব-পাদপ-সমাচ্ছন্ন কানন ভেদ করিয়া মহেশ্বর মহাকালের উজ্জ্বল হেমকুম্ভকিরীটী অভ্র-ভেদী শুভ্র মন্দির নীল নির্ম্মল আকাশে কি ত্রিদিব-শোভারই বিস্তার করিয়াছে!

আমি বেলা প্রায় ১১টার সময় বাসায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া স্নানাহার-সমাপনান্তে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া, বিনায়কের সহিত নগর-দর্শনে চলিলাম। প্রথমে মহারাজ সিন্ধিয়ার প্রাসাদভবনে, তাঁহার কাছারী, সৈন্যাবাস, ইংরেজী বিদ্যালয়, সংস্কৃত পাঠশালা প্রভৃতি দর্শন করিয়া একটি প্রাচীন তোরণ পরিদর্শন করিলাম। এ দেশের নরনারী ইহাকে রাজা বিক্রমাদিত্যের তোরণ বলে। সিন্দুর-লেপনে পুষ্পচন্দনে সকলে এই তোরণের পূজা করিয়া থাকে। স্মৃতির পবিত্র পূজা মানবের নশ্বর জীবনে কি মধুর!

চলিতে চলিতে দেখিলাম, একটি সংস্কৃত-পাঠশালায় কতকগুলি ছাত্র সংস্কৃত স্তোত্র পাঠ করিতেছে। কিয়ৎকাল স্তব্ধ হইয়া শুনিতে লাগিলাম। উজ্জয়িনীতে বালককণ্ঠে আর্য্য ভাষার স্তোত্র শুনিয়া আমাদের মধুসূদনের একটি কবিতা মনে পড়িল!—

'রাজাশ্রম আজি তব! উদয় অচলে,
কনক-উদয়াচলে, আবার, সুন্দরি,
বিক্রম-আদিত্যে তুমি হের লো হরষে,
নব আদিত্যের রূপে! পূর্ব্বরূপ ধরি,
ফোট পুনঃ পূর্ব্বরূপে, পুনঃ পূর্ব্ব-রসে!

এতদিনে প্রভাতিল দুখ-বিভাবরী ;
ফোটে মনানন্দে হাসি মনের সরসে।'

নগরীমধ্যে মহামান্য সিন্ধিয়ার মর্ম্মররচিত 'দ্বারকাধিপে'র উত্তুঙ্গ মন্দির, উজ্জয়িনীর মুকুটমণিস্বরূপ প্রতিভাত হইতেছে। ভিতরে প্রবেশ করিলাম। মন্দিরাভ্যন্তর নানা চিত্রে, ঝাড় লণ্ঠনে, বিচিত্র কারুকার্য্যে, শিল্পচাতুর্য্যে ঝলমল করিতেছে। দ্বারকার দেবতা দ্বারকাধিপের মূর্ত্তি অবিকল গঠিত করিয়া, মহামান্য সিন্ধিয়া, দ্বারকাধিপকে এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

উজ্জয়িনীতে বহু দেবতা অধিষ্ঠিত। সকলের উল্লেখ সম্পূর্ণ অসম্ভব। নগরীমধ্যে রামমন্দির, নৃসিংহ-মন্দির, শেষশায়ী মন্দির, সরস্বতী-মন্দির, নাগচন্দ্রেশ্বর প্রভৃতি কয়েকটি দেবস্থান উল্লেখযোগ্য। এতদ্ভিন্ন কয়েকটি সুদৃশ্য জৈন মন্দিরও আছে। ইহা এক সময়ে একাধারে হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন তীর্থের সম্মিলন-ক্ষেত্র হইয়াছিল। এককালে উজ্জয়িনী অসংখ্য বৌদ্ধ মঠ, সংঘারাম ও বিহারে পরিপূর্ণ ছিল। বহু বৌদ্ধ-কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ নগরীর চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে।

পদব্রজে বিনায়কের সঙ্গে মহল্লায় মহল্লায় ঘুরিতে লাগিলাম। পথ জনাকীর্ণ —নানাজাতীয় নরনারী বিচিত্র বসনে ভূষিত হইয়া রাজপথে চলিয়াছে—বিপণীসমূহ ক্রেতার ভিড়ে জীবন্ত।

স্থানীয় শিল্পজাত দ্রব্যের মধ্যে কাষ্ঠনির্ম্মিত চিরুণী। নানা প্রকারের কাষ্ঠনির্ম্মিত চিরুণী বিক্রীত হইতেছে। অনেক চিরুণীর উপর দর্পণ বিন্যস্ত। সোনার গিল্‌টি করা ও ফুলের ন্যায় ফ্রেমে আঁটা। আমি কয়েকখানি অতি সুলভ মূল্যে ক্রয় করিয়াছিলাম। চৌকে, সারাপায়, জীবনগঞ্জে, দৌলতগঞ্জে, বড়বাজারে, উর্দ্দুপুরায়, সবজীমণ্ডীতে—সকল স্থানই লোকে লোকময়—মধ্যে মধ্যে টাঙ্গাচালক 'হটো' 'হটো' করিতে করিতে টাঙ্গা হাঁকাইয়া যাইতেছে। পথিপ্রান্তে অনেক মণিহারীর দোকান বসিয়াছে—তাহাতে ছুরী, কাঁটা, কাঁচি, কৌটা, খেলনা, ছবি প্রভৃতি বিক্রীত হইতেছে—বিবিধ শাক সবজী ফল মূল তরিতরকারী পথিপ্রান্তে সজ্জিত রহিয়াছে ; সুপক্ক কমলার স্তূপে যেন পথ আলো করিয়াছে! কাবুলের বিবিধ মেওয়া ভারে ভারে ঢালা রহিয়াছে! বর্ত্তমান নগরে প্রায় ৪০০০০ হাজার লোকের বসতি। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ, বেণিয়া, মরাঠা, চহরা, হিন্দুস্থানী, কায়স্থ, মালী, মুসলমান, ছত্রী প্রভৃতি জাতিই অধিক। শুনিলাম, একটি বাঙ্গালী বাবু সপরিবারে বাস করেন। কিন্তু তিনি অতিথিসৎকারের ভয়ে সতত লুকাইয়া

থাকেন। বেচারার দোষই বা কি? বঙ্গীয় পরিব্রাজকের উৎপীড়নে প্রবাসী বাঙ্গালী ভদ্রলোকেরা সতত উৎপীড়িত ও সন্ত্রস্ত!

এ দেশে গুজরাথী বেণিয়া, ব্রাহ্মণ ও মরাঠার সংখ্যাই সমধিক। গুজরাথী ললনারা অপূর্ব্ব সুন্দরী। তাহাদের বর্ণের প্রভায় চক্ষু ঝলসাইয়া যায়। কিন্তু আমার মহারাষ্ট্রললনাদিগকে অতিশয় সৌষ্ঠবময়ী ও স্নিগ্ধসৌন্দর্য্যশালিনী দেবীমূর্ত্তি বলিয়াই বোধ হইল। গুজারাথীরা ব্যবসায়ী; দাসত্ব ঘৃণা করে। কাজেই বাণিজ্যপ্রভাবে গুজরাথী বণিক্ সম্প্রদায় কুবেরতুল্য ধনশালী হইয়াছে।

এইবার কেবল উজ্জয়িনীর কথা বলিয়াই আমার এই ভ্রমণবৃত্তান্ত সমাপ্ত করিব। ঐতিহাসিক তথ্য ও প্রত্নতত্ত্বের আলোচনা করিব না।

বর্ত্তমান উজ্জয়িনী সুদৃশ্য, সুগঠিত, নয়নরঞ্জন প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। বহু স্থলে প্রাচীর ভূমিসাৎ হইয়া যাইতেছে। পূর্ব্বে ছত্রিশটি তোরণদ্বার ছিল। তাহার অনেকগুলি নাই।

চিরস্মৃতিময়ী উজ্জয়িনীর স্মৃতিশ্মশানে, স্মৃতির ভস্ম অঙ্গে মাখিয়া, স্মৃতির রজে লুটাইয়া, মহাকালের বিশ্ববিধ্বংসিনী লীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ধর্ম্ম, জ্ঞান ও বিদ্যার এমন অপূর্ব্ব সাধনা আর কোথায় হইয়াছে? নবরত্নের সভা ভূমণ্ডলে আর কোথায় ছিল? কালিদাস, বররুচি, বরাহমিহির, অমরসিংহ, ধন্বন্তরি, বেতালভট্ট, ঘটকর্পর, ক্ষপণক ও শঙ্কুর ন্যায় মহামনস্বীদিগের সম্মিলন আর কোথায় হইয়াছিল? এমন অপূর্ব্বসৌন্দর্য্যশালী দেবমন্দির—যাহার বর্ণনা নানা শাস্ত্রে, পুরাণে, কাব্যে, ইতিহাসে বর্ণিত আছে—পৃথিবীর আর কোন স্থানে আছে?

মেঘদূতে কবিগুরু কালিদাসের উজ্জয়িনী-বর্ণনা পাঠ করিয়া কে না আত্মহারা হইবেন? আমি তাহার কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া আমার উজ্জয়িনী-ভ্রমণ শেষ করিলাম।

'সিন্ধুনদী পার হইয়াই অবন্তী। সেখানে সকলেই বৃহৎকথা পড়িয়াছে। গ্রামবৃদ্ধেরা বৃহৎ-কথার গল্প—উদয়নের গল্প লইয়া দিনযামিনী যাপন করে। অবন্তীর রাজধানী বিশালা বা উজ্জয়িনী। এত সম্পদ আর কোথাও নাই। * * তুমি উজ্জয়িনী যাও। সে ত পার্থিব নগর নয়—সে যে স্বর্গের একটা খণ্ড—বড় শোভাময় খণ্ড—স্বর্গের খণ্ড পৃথিবীতে আসিল কিরূপে? যে সকল স্বর্গবাসী লোক পৃথিবীতে আসিয়াছেন, তাঁহাদের যে পুণ্যটুকু এখনও ক্ষয় হয় নাই, সেই পুণ্যটুকুর জোরে ঐ স্বর্গটুকু পৃথিবীতে আসিয়া পড়িয়াছে।'

হায়! এই কি সেই রত্নমালিনী উজ্জয়িনী?

অপরাহ্ণে উজ্জয়িনী পরিত্যাগ করি। অন্তর্হিত অম্বাপ্রসাদ বিদায়কালে আবির্ভূত হইলেন। বিনায়ক ত ছিলই। তিনি তাঁহার খাতায় আমার দ্বারা এক সার্টিফিকেট লিখাইয়া লইলেন। আমার চিত্ত এমনই আবেগে পূর্ণ ছিল যে, কোনও বিবেচনা না করিয়াই তাঁহাকে চারি টাকা দিয়া ফেলিলাম। তাহাতেও তিনি সন্তুষ্ট হইলেন না। তাঁহাকে আমার যৎসামান্য দিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু বিনায়ক আমার অনেক কাজ করিয়াছিল। কি করি, তাহার অনুরোধে আর এক টাকা দিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিলাম। পাণ্ডা মহাশয় পাগড়ী চাপকান পরিয়া, আমার টাঙ্গায় উঠিয়া, আমাকে ষ্টেশনে ট্রেনে তুলিয়া দিয়া গেলেন। এইটুকুই তাঁর ভদ্রতা। আমি ইন্দোরের অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম।

কথার দুই দিক।

১

প্রাণের মধ্যে যাহা কিছু আছে, তাহা কথায় ঢালিয়া দিয়া আমরা চলিয়া যাই। আমরা সংসারে আসিয়া কি করি? কেবল কথার সমুদ্রে নাড়া দিয়া তরঙ্গের সৃষ্টি করি।

কথা জগতেই ছিল, কিন্তু বক্তার অভাব দেখিয়াই বোধ হয় বিধাতা মানবের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কথা হইতেই মানবের উৎপত্তি, এবং কথাতেই তাহার লয়।

আপনার নাম কি? রামধন? 'রামধন' একটা কথা। তাহার কোনও অর্থ নাই। আপনার বিশেষত্ব কি? জগতে যদি সকলকে একত্র করা যায়, তবে সকলের মধ্যেই আপনার বিশেষত্ব কিছু না কিছু পাওয়া যাইবে। হয় ত আপনার কটা কেশের ন্যায় শ্যামের কেশ, আপনার কণ্ঠস্বরের ন্যায় যদুর কণ্ঠস্বর, বিনোদ আপনার ন্যায় কৃপণ, এবং নিধিরাম আপনার ন্যায় প্রাতঃকালে উঠিয়া মিছরী এবং বাদাম চূর্ণ করিয়া খায়। এই সকল গুণের আধারস্বরূপ হইয়া হয় ত আপনার অশীতি বৎসর কাল বাঁচিবার দাবী দাওয়া আছে, কিন্তু সৃষ্টির মধ্যে আপনার নিজস্ব কোন্‌টা? তাহার উত্তর শীঘ্র দেওয়া সুকঠিন।

হয় ত আপনি বলিবেন, জগতের একটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। বিধাতা কোনও অজ্ঞাত আদর্শের দিকে বিশ্বকে লইয়া যাইতেছেন। সেই প্রক্রিয়ার

মধ্যে 'রামধন' একটা সরঞ্জাম। বেশ। তাহাই যদি হয়, তবে 'রামধন' কি রকম সরঞ্জাম? দশ জনে বলিবে, 'তাহা রামধনকেই জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন'। 'রামধন'কে জিজ্ঞাসা করিলে, সে কথা কহিবে। হয় ত গদ্যে, নয় ত পদ্যে, কিংবা উভয় মিশাইয়া। সেই কথাগুলি অন্য লোকের কথার সঙ্গে মিলাইয়া দেখিলে উপকরণ একটু তফাৎ বলিয়া বোধ হইবে। রামধন সবই স্বীকার করিতে পারে, কিন্তু অন্য লোকের কথা সহিতে পারে না। ইহাই রামধনের বিশেষত্ব।

জীবজন্তুর সঙ্গে যেমন মানুষের কথা লইয়া তফাৎ, মানুষের সঙ্গে মানুষেরও কথা লইয়া তেমনই তফাৎ। ঠিক এক রকম কথা যদি দুই জনে কহে, তবে এক জনের অস্তিত্ব অনাবশ্যক। তাহাকে সংহার করিলেও পাপ নাই। এই জন্য কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, কথা ফুরাইয়া গেলেই মানুষ মরিয়া যায়। কথার মধ্যেই মানব প্রাণবায়ু বিসর্জ্জন দিয়া থাকে।

কথার তারতম্য আছে। কথা সচরাচর দ্বিবিধ। 'প্রাণের কথা' ও 'শেখা বুলি'। প্রাণের কথা যাহারা কহে, তাহারা বেশীদিন জগতে থাকে না। তাহারা আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া কেবল কথা কহিতে চাহে, কিন্তু কহিয়া উঠিতে পারে না। হয় ত বনে বনে, গ্রামে গ্রামে, কিংবা লোকালয়ে পরিভ্রমণ করিয়া, জীর্ণ শীর্ণ হইয়া পড়ে। হয় ত প্রাণের কথা প্রাণের মধ্যেই বদ্ধ হইয়া থাকে। সেও ভয়ানক! কহিলেও হয় ত তাহার কথা কেহ বিশ্বাস করে না; কিংবা সকলের নিকট এত নূতন বোধ হয় যে, গলা টিপিয়া সকলে তাহাকে পৃথিবী হইতে দূর করিয়া দেয়, মারিয়া ফেলে, যন্ত্রণা দেয়। প্রাণের কথা কহিবার লোক জগতে যেমন বিরল, শুনিবার লোক ততোধিক বিরল। হয় ত শুনিবার কর্ণ নাই, কিংবা থাকিয়াও বধির। চতুর্দ্দিকে এত কোলাহল যে, তাহার মধ্যে সে কথাটুকু ছোট বুদ্বুদের মত মহাসমুদ্রের বক্ষে মিশাইয়া যায়।

কিন্তু এই যে বিরাট কোলাহল, তাহা 'শেখা বুলি'। 'শেখা বুলি' সহজ ও প্রাকৃতিক। এক একটা কণ্ঠ হইতে বাহির হইয়া অন্য কণ্ঠে প্রতিধ্বনিরূপে আবির্ভূত হয়। কিংবা এক একটা লেখনী হইতে বাহির হইয়া অন্য লেখনী অবলম্বন করে। ইহারই ঘাত প্রতিঘাতে সংসারতরঙ্গ চিরকালই উত্তাল। তাহার মধ্যে প্রাণের কথা কোথায় প্রচ্ছন্নভাবে থাকে, তাহা অনুভূত হয় না। মনুষ্যত্ব-প্রাপ্তির পূর্ব্বে এই শেখা বুলিই আমাদের হীনত্বের আবরণ-

স্বরূপ। যে সকল কথা সচরাচর আমরা শুনিতে পাই, তাহার মধ্যে জ্ঞানের কথা, ভক্তি ও প্রেমের কথা, কিংবা কর্ম্মের কথা, এই তিন জাতীয়ই প্রধান। জ্ঞানের কথা হয় ত বিদ্যালয়ে, কিংবা পুরাতন ও নূতন পুঁথির মধ্যে পাওয়া যায়। জগতে গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ লুপ্ত হইবার পর জ্ঞানের কথা মুখে মুখে বাহির হইতে আর দেখা যায় না। ভক্তির কতকগুলি কথা একত্র করিয়া 'সেতুবন্ধ রামেশ্বরে'র মত একটা সোজা পথ আমরা তৈয়ারী করিয়াছি। তাহা দিয়া অনেকে পার হইয়া যায়। প্রেমের কথার খুব ছড়াছড়ি; অগণন সন্ধ্যাতারকার মত মিটি-মিটি জ্বলিতেছে; তাহার বিরাম কিংবা বিশ্রাম নাই।

কর্ম্মের কথা বোধ হয় বেশী বলা অনাবশ্যক। এটা যদি একটা 'যুগ' হয়, তবে 'কর্ম্মকথা'র যুগই এ যুগের নাম। কর্ম্মের সহিত কথার বিশেষ সম্বন্ধ। কথা বলিতে গেলে কর্ম্ম হয় না, এবং কর্ম্মে রত হইলে কথার বাঁধুনী থাকে না, এমন কি, কহাই দুষ্কর। ইহা স্বাভাবিক। আরতি ও মন্ত্রোচ্চারণ, উভয় এক সঙ্গে করা দুঃসাধ্য। অনেকে বলেন,—অকর্ম্মা কিংবা নিষ্কর্ম্মা পুরুষের 'বাক্যই সার'। ইহা দোষের নহে, ক্রমিক আবর্ত্তনের লক্ষণ। কর্ম্মের যুগ চলিয়া গিয়াছে। কথার যুগ আসিয়াছে। সত্যযুগের কর্ম্ম বেদের কথাতেই শেষ। দ্বাপরের কর্ম্ম রামায়ণের কথায়, এবং ত্রেতার কর্ম্ম—'অমৃত সমান' মহাভারতের কথাতেই শেষ। কলির কর্ম্ম এখন কথায় বিবৃত হইতেছে। দ্বাপরের শেষে—

'উত্তরা কাণ্ডেতে ছয় কাণ্ডের বিশেষ—
সীতাদেবী করিলেন পাতালে প্রবেশ'

ইহাই ঘটিয়াছিল। উত্তরা কাণ্ডের পূর্ব্বে 'জ্ঞান, ধর্ম্ম এবং পুণ্য' কাহিনী সকল উপনিষদ, দর্শন, এবং স্মৃতি প্রভৃতিতে লিপিবদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। যদিও তাহার প্রতিধ্বনি 'শেখা বুলি'তে পাওয়া যায়, কিন্তু কলিকালের সারগর্ভ কথা এখনও উক্ত হয় নাই। সীতাদেবীর পাতালে প্রবেশ যে যুগে হইয়াছিল, তাহার পরবর্ত্তী যুগে আরও কয়েকটা ভয়ানক কাণ্ড হয়; যেমন, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ, এবং পঞ্চপাণ্ডবের স্বর্গারোহণ। ইহারাও সেই যুগের উত্তরা কাণ্ডের সামিল। ফলে, কলির প্রধান কর্ম্মটা কি, তাহার আভাস পাইলে কথার আভাস পাওয়াও দুঃসাধ্য নহে।

আত্মসাব্যস্ত করাই কলির মানব-কর্ম্মের প্রধান লক্ষণ বলিয়া বোধ হয়।

'আমি' যে কি, তাহা কথা দ্বারা ও কর্ম্মের দ্বারা পূর্ব্বকালে ঋষিগণ সাব্যস্ত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু তখনকার 'আমি' ও একালের 'আমি'র মধ্যে অনেক তফাৎ। 'আমি' ছাড়া অন্য পদার্থ সকলই অপদার্থ, এই যে একটা বিরাট দার্শনিক ভাব, তাহা প্রত্যেক মানবকে অধিকার করিয়াছে। কলিকালের আমি কি পদার্থ, তাহাই বুঝানোর জন্য একালের কথা।

২

আমাদের মেসের রামবাবু খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে অনেক কথা জানেন। তিনি আমেরিকা প্রভৃতি পরিভ্রমণ করিয়া, এবং আটলান্টিক হইতে প্রশান্ত মহাসাগর প্রভৃতি পর্য্যন্ত তিন চারিবার অতিক্রম করিয়া একটা সার সত্যে উপনীত হইয়াছেন। তাহা এই যে, বহুবার চর্ব্বণ করা ভিন্ন মানবের পক্ষে জীবনধারণের কোনও উপায় নাই। তাঁহার বক্তব্য ইহাই যে, এখনকার খাদ্য ও কথা, উভয়ই খুব নীরস। পরিপাক করা সুকঠিন। পূর্ব্বে সামান্য পরিশ্রমে লোক খাদ্য পরিপাক করিত, এবং কথা বুঝিত। এখন তাহা হইবার যো নাই। যুগ যতই অন্তের দিকে যাইতেছে, ততই খাদ্য ও কথা, উভয়ই 'পাকা' রকম দাঁড়াইতেছে। কচি, কাঁচা, রসাল সরলতা, এবং মধুর জলীয় ভাব এখন আর নাই। বহুকাল পূর্ব্বে অন্তর্হিত হইয়াছে। ফলে অগ্নিমান্দ্যের প্রাচুর্য্য।

রামবাবুর মতে, এক একটা কথা, কিংবা একটা খাদ্যদ্রব্য লইয়া অন্ততঃ দশ মিনিট চর্ব্বণশীল হওয়া উচিত; নচেৎ তাহার কোনও আস্বাদন পাওয়া যায় না। সকল জিনিসেরই স্বাদ গভীর স্তরে পড়িয়া গিয়াছে, এবং অনেক স্থলে চর্ব্বণ করিয়াও রস পাওয়া যায় না। দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে।

বিরিঞ্চি বাবু, যিনি পার্শ্বের ঘরে থাকেন, এবং ঘণ্টায় দশ বারো বার তামাকু সেবন করেন, তাঁহার মতে, রামবাবুর কথায় কোনও সারবত্তা নাই। জিনিসের মধ্যে রস সেই প্রকারই আছে; কিন্তু আমাদের আস্বাদন-যন্ত্র বিগড়াইয়া গিয়াছে। খুব কটু, ঝাল, তিক্ত ও তীক্ষ্ণ পদার্থ ভিন্ন অন্য কিছুরই অস্তিত্ব আমরা অনুভব করিতে পারি না। কথার সম্বন্ধেও তাহাই। প্রেম একটা চিরবিখ্যাত রসাল জিনিস। কিন্তু খুব চোখাভাবে আজকাল তাহার বর্ণনা করিতে না পারিলে হৃদয়ঙ্গমই হয় না। আজকালকার গদ্যে এবং পদ্যে, লয় অত্যন্ত দ্রুত, এবং ভাব অতিশয় তীব্র। দোকানের যত রকম জলখাবার আমরা কিনিয়া খাই, সেগুলির ভাব এবং আস্বাদনও সেই রকম। সুতরাং তাহারই মধ্যে যেটা পছন্দ হয়, তাহা লইয়া অনর্থক চর্ব্বণ না করিয়া

শীঘ্র গলাধঃকরণ করাই ভাল। কর্ম্মক্ষেত্রেই যখন কোনও ছন্দ নাই, গদ্যে পদ্যে ছন্দ থাকিবে কি করিয়া? ইহা লইয়া তর্ক করা ঘোর মূর্খতা।

উভয়ের মতের মধ্যে পার্থক্য থাকিলেও একটা বিষয়ে তাঁহারা একমত ছিলেন। জগতে এখন যে ছাঁদ দাঁড়াইয়াছে, তাহার সংশোধন করিতে হইলে জিনিসটাকে কিছুদিনের জন্য উল্টাইয়া দেওয়া উচিত। যে দেশে ধোপা এক মাস অন্তর ধৌতবস্ত্র লইয়া আবির্ভূত হয়, সে দেশের লোক বালিশের খোল কিংবা বিছানার চাদরের কালো দিক্‌টা উল্টাইয়া দুই পক্ষ নির্ব্বিবাদে মনের সুখে রাত্রিযাপন করিতে পারে। খাদ্য দ্রব্য সম্বন্ধেও দেখা যায় যে, ভাজিতে গিয়া লুচি কিংবা কচুরীর এক দিক লাল হইয়া উঠিলে তাহা উল্টাইয়া বহির্ভাগে আনিতে হয়। কথা সম্বন্ধেও তাহাই। কোনও কথা অগ্নিময় কিংবা কলঙ্কিত হইয়া উঠিলে তাহাকে বহির্ভাগে আনা, এবং তাহার বাহিরের শীতল এবং শুভ্রদিক্‌টা ভিতরে লইয়া যাওয়া, বিশেষ কর্ম্মনৈপুণ্যের দৃষ্টান্ত।

ইতিহাসে দেখা যায় যে, ধর্ম্ম এবং স্ত্রীলোক প্রভৃতি পবিত্র জাতি; পুরাতন যুগে বাহিরে থাকিত; ক্রমে তাহারা উল্টাইয়া অন্দর-মহলে পড়িয়া গিয়াছে। এখন যদি তাহাদিগকে আবার বাহিরে আনা যায়, হয় ত পাশ্চাত্য জাতির ন্যায় আমরা গৌরবান্বিত হইয়া উঠিতে পারি। দার্শনিক ভাবে বিচার করিয়া দেখিলেও তাহাই বোধ হয়। 'আমিত্বে'র প্রসার বাহিরে এত দূর দাঁড়াইয়াছে যে, একবার উল্টাইয়া না দিলে খণ্ডপ্রলয়ের সম্ভাবনা।

যাহা পূর্ব্বে অন্তরে ছিল, তাহা বাহির করিয়া দেওয়া একটা বৈজ্ঞানিক বাহাদুরী। ডাক্তারী শাস্ত্রে ইহার অন্যতম নাম 'পোষ্টমর্টেম্'। কাটিয়া কুটিয়া অভ্যন্তরের যন্ত্রতন্ত্রগুলিকে বাহিরে আনা ও বিশ্লেষণ করাই 'পোষ্টমর্টেম'।

ভূগর্ভ খনিয়া আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, তাহার মধ্যে পুরাকালে ভয়ঙ্কর লম্বা চৌড়া জীবজন্তু সকল বাস করিত। চন্দ্রমণ্ডলের কলঙ্ক যে একটা পাহাড়, তাহাও জানিতে পারিয়াছি। পুরাতন সমাজতন্ত্রের মৃত ত্বক্ ভেদ করিয়া আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, তাহার মধ্যে ভগবানের বাসযোগ্য ভূমি ছিল। এখনকার ত্বক্ দূরে থাকুক, হৃদয় পর্য্যন্ত কাটিয়া দেখিলেও, তাঁহার কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না, এবং একালের হৃৎপিণ্ডের মধ্যে যাহারা প্রণবের ধ্বনি শুনিবার জন্য বসিয়া থাকে, তাহারা স্ফটিক-সভার মধ্যে বিভ্রান্ত দুর্য্যোধনের ন্যায় হস্তিমূর্খ। তবে অঙ্গভঙ্গী দেখিয়া পূর্ব্বের খানিকটা পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে।

জ্ঞান ও ভক্তির যত কথা শুনিতে পাই, তাহার অধিকাংশই সমালোচনা। গীতার অস্থির মধ্যে কোনও সার পদার্থ আছে কি না? অদ্বৈতবাদ কি? বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ কি?—ঈশ্বরের অর্থ কি? ধর্ম্মের কোনও অর্থ থাকিতে পারে কি না? এ সকল কথার মীমাংসা লইয়া সকলেই ব্যস্ত। যাহারা অত ঊর্দ্ধে উঠে না, তাহাদের কথা হয় ত সমাজ লইয়া। স্ত্রীলোকদিগকে কত দূর শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য? তাহারা মাথায় উঠিতে পারে কি না? বিধবার বিবাহ শাস্ত্রবিরুদ্ধ কি না? বহুবিবাহ সময়োপযোগী কি না? যাগযজ্ঞ প্রভৃতির অনুষ্ঠান বেফায়দা কি না? এই রকম অনেক ধরণের কথা লইয়া সকলে প্রাতঃকালে এবং সন্ধ্যার সময় ছুটাছুটি করে।

যাহারা শরীরপালন এবং আহার লইয়া ব্যস্ত, তাহাদেরও কথার সীমা নাই। স্নানটা প্রত্যহ করা উচিত কি না? নিরামিষভক্ষণের কোনও উপকারিতা আছে কি না? রাত্রিকালে শয়নগৃহের বাতায়ন খুলিয়া দিয়া 'ভেন্টিলেশন্' বর্দ্ধিত করা উচিত কি না? খাঁটী দুগ্ধ, তৈল, ঘৃত, মধু প্রভৃতি সংগ্রহের উপায় কি? কোন্ রোগ হইলে হোমিওপ্যাথিক, এবং কোন্ রোগে আলোপ্যাথিক ডাক্তার ডাকা ভাল, এ সকল বিষয় লইয়া ঘোর তর্ক আহোরাত্র চলিতেছে।

সোজা কথায়, সকলেই খুব সন্দিগ্ধ-চিত্ত। কেহ বুঝাইতে গেলে তাহার কথা বাস্তবিক কেহ শুনে না; অথচ সকলেই নিজের মত প্রতিপন্ন করিতে ব্যস্ত। কোনও বিচক্ষণ উপন্যাসলেখক বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, বিংশ শতাব্দী অন্ধের রাজ্য। কেহ কিছু দেখিতে পায় না। দুর্দ্দম্য বিশ্বকর্ম্মচক্রে অন্ধগণ আবর্ত্তিত হইতেছে, এবং তাহারই সঙ্গে নিজের মতামত প্রচার করিতেছে। সকলেই পরস্পরের অবস্থা জানে। কাহারও চক্ষু নাই, সুতরাং কাহাকেও বিশ্বাস করা অসম্ভব। ঘটনাক্রমে যদি কাহারও চক্ষু খুলিয়া যায়, তাহার কথাও কাহারও বিশ্বাস হয় না। কারণ, তাহার চক্ষু বাস্তবিক খুলিয়া গিয়াছে কি না, অবশিষ্ট অন্ধের দল স্বীয় দৃষ্টিহীনতার জন্য তাহা বিশ্বাস করিতে চাহে না।

৩

এই অন্ধের দলের নেতারা মধ্যে মধ্যে একটা প্রশ্ন তুলিয়া থাকেন, 'বর্ত্তমান সমাজের অবস্থা কি রকম? শৈশব না বার্দ্ধক্য?' অলঙ্কারোক্তি ভিন্ন সমাজকে মানুষের দলের মধ্যে ফেলিয়া দেওয়ার কোনও অধিকার আমাদিগের নাই। যদি পাঁচটা আবালবৃদ্ধবনিতা অবলম্বন করিয়া সমাজ হয়, কিংবা পাঁচ রকম নূতন ও পুরাতন মতামত যদি সমাজের থাকে, তবে তাহা হইতে ইহাই বুঝা যাইতে

পারে যে, একটা পুরাতন অশ্বত্থবৃক্ষের গোটাকতক ডালে পক্ব পত্র ঝরণোন্মুখ হইয়াছে, এবং গোটাকতক শাখায় কচিপত্রের উদ্গম হইতেছে। তুলনা খুব ব্যাপৃত করিয়া ফেলিলে দেখা যাইবে যে, এক একটা ডাল এক একটা যুগের, এবং প্রত্যেকের সঙ্গেই এক এক দল ছোট ছোট শাখা আছে। ছোট ছোট শাখার মধ্যেও পুরাতন পত্র খসিয়া যায়, এবং কচি সবুজ পত্র বাহির হয়। সুতরাং সমাজের কতখানি বার্দ্ধক্য, কত অংশ যৌবন, এবং কতটুকু শৈশব, তাহার 'অর্গানিক এনালিসিস্' না করিয়া উত্তর দেওয়া সুকঠিন।

তবে বলিতে পারেন যে, অন্যের ও বহির্দৃষ্টি না থাকুক, অন্তর্দৃষ্টি আছে, কিংবা যদি অন্তর্দৃষ্টিকেই বহির্দৃষ্টি ধরিয়া লন, তবে অন্ততঃ একটা দৃষ্টি আছে। সেই দৃষ্টির গুণেও, আমরা কি করিতেছি, তাহা বোধ হয় অনেকটা বুঝিতে পারি। আমরা পূর্ব্বের ন্যায় খাইতে পাই না, তাহার জন্য বিশেষ দুঃখও নাই। কারণ, আমাদিগের পরিপাকশক্তি ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িয়াছে। যাহারা খাইতে পারে, অথচ খাইতে পায় না, তাহাদেরই দুঃখ বেশী। সংসার বিলক্ষণ আহারের যায়গা। পরলোকে আহারের বন্দোবস্ত থাকিলে আমরা ইহলোকে কখনই আসিতাম না, এবং অন্নপূর্ণাও আমাদের লইয়া কৈলাসে অবতীর্ণা হইতেন না। এখন সমস্যা এই যে, বুভুক্ষু ব্যক্তিগণকে লইয়া আমরা কি করিব? আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, এই সমস্যার পূরণ করিবার জন্য প্রকৃতি এই যুগে আমাদের আহার বদলাইয়া দিয়াছেন। যাহা এখন প্রচুররূপে পাওয়া সম্ভব, তাহাই খাদ্য। মানুষ যদি চিরকাল শিশুর ন্যায় দুগ্ধ খাইত, তবে পৃথিবী গো-ময় হইয়া পড়িত। এই অস্বাভাবিক বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্যই গোবৎসের যেমন শষ্পপ্রাশন হয়, আমাদেরও তেমনই অন্নপ্রাশন হয়। সোজা কথা, কিছুদিন কাটিয়া গেলে বাছুর সকল গরু হইয়া ঘাস খায়, এবং আমরা মানুষ হইয়া মৎস্যের ঝোল এবং কাঁটালতা, শিকড় প্রভৃতি সিদ্ধ করিয়া খাই। এই রকম করিয়া রোগীর জন্য মেলিন্স্ ফুড্, ভোগীর জন্য হরিতকীর মোরব্বা প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিশেষ বিশেষ খাদ্যের প্রাচুর্য্য কিংবা অভাব হইলেই, অন্যপ্রকার খাদ্য সকল আবির্ভূত হইয়া পড়ে। এমন সময় খাদ্যাখাদ্য লইয়া তুলনায় সমালোচনা করা মূঢ়ের কার্য্য। সৌরজগতে এমন একটা সময় আসিতে পারে যে, দগ্ধ মৃত্তিকা ছাড়া অন্য খাদ্য থাকিবে না। যদি কোনও শ্রেণীর মানব সে পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকে, তবে জঠরে ভবিষ্যৎ যুগের ভ্রূণ ধারণ করিয়া তাহাদিগকেও পোড়ামাটী খাইতে হইবে। কথারূপ খাদ্যেরও সেই অবস্থা দাঁড়াইয়াছে।

প্রেমের রসালো কথা, ভক্তির কথা, করুণার কথা, এখন সেগুলা দগ্ধমৃত্তিকার মত। এতদিন ধরিয়া যে দিকটা পুড়িয়া গিয়াছে (কপালেরও এক দিক পুড়িয়া যায়) তাহা আমরা খাইতে বাধ্য হইতেছি। মনে করুন, এই ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের সন্ধ্যাকালে যদি কেহ আপনাকে 'প্রাণনাথ' কিংবা 'জীবনসর্ব্বস্ব' বলিয়া ডাকে, তবে খুব সম্ভব আপনার দারুণ আতঙ্ক এবং সঙ্গে সঙ্গে হৃৎকম্প হইয়া পড়িবে। ইহার কারণ অতি সামান্ত। পূর্ব্বে এ সব কথা খাঁটী দুগ্ধের মত ছিল; এখন নষ্ট হইয়া কিংবা পুড়িয়া গিয়াছে। এ সম্বন্ধে উভয় পক্ষে তর্ক করিতে পারেন, কিন্তু কিছুই সাব্যস্ত হইবে না। যদিও আমরা 'হা! হতোস্মি' বলিতে নারাজ, কিন্তু অন্ততঃ 'কি হৈল! কি হৈল!'—এ কথাটা সকলেই বলিতে চাহে। ইহার সহজ উত্তর, কথার এক দিকটা আমরা ভাজিয়া ফেলিয়াছি। উত্তরা কাণ্ডের অবস্থা।

এক জন জ্যোতির্ব্বিদ্ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—'সূর্য্য স্বীয় উত্তাপে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে পারে কি না?'

হয় ত পারে। কিন্তু আমরা জ্বলিয়া পুড়িয়া যে শান্তিবারির অন্বেষণ করিতেছি, তাহা কথায় পাওয়া যায় না। দীর্ঘনিঃশ্বাস এবং হৃদয়ের ব্যথা উল্টা দিকে পড়িয়া গিয়াছে। যতদিন ধরিয়া জ্বলিয়াছিলাম, তাহার কথা খানিকটা মনে আছে। সেইটুকু 'ড্রামাটিক'। স্মৃতিটুকুই এখনকার কাব্য; বিজ্ঞান তাহার ইতিহাস লইয়া ব্যস্ত।

আমি তোমাকে স্পর্শ করিতে পারি না, তোমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে পারি না। তুমি দূরে থাক! তুমি দগ্ধ। আমাদের নিঃশ্বাস প্রশ্বাস অগ্নিময়, অশ্রু বাষ্পহীন, কাব্য রসহীন, বাক্য অর্থহীন। হয় ত মেঘ আসে, বর্ষায় না। হয় ত বসন্তবায়ু বহে, কিন্তু প্রাণের জ্বালা আরও বাড়িয়া উঠে। জল, বায়ু, আকাশ, পৃথিবী, সকলেই আমার শত্রু। কেহই শান্তি দিতে পারিতেছে না। তোমার কথা কেবল তাহাদেরই লইয়া।

আমি যখন অর্দ্ধদগ্ধ শরীর লইয়া ভূমিতে লুটাই, যখন রুগ্ন হইয়া পড়িয়া থাকি, তখন তুমি কেবল বলিয়া থাক,—'এটা খাওয়া উচিত হয় নাই', 'ওটা করা উচিত নয়', 'এটা তোমার পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল', 'ওটা তোমার ইহজন্মের কর্ম্মফল'। এই সকল দগ্ধজ্ঞানের কথা শুনিলে তোমাকে কসিয়া চড় মারিবার ইচ্ছা হয়। খুনাখুনি হইয়া যাইতেছে এই জন্য।

এই সকল পুরাতনকালের কথা, যাহা আমরা বুঝাইতে চেষ্টা করি, এবং যাহার সমালোচনা নানাপ্রকারে বাহির হয়, তাহা কাব্যে স্মৃতিমধুর হইলেও,

বাস্তবিক কোনও কাজে লাগে না। বোধ হয়, আমাদেরই জ্ঞানাধিক্যবশতঃ আমরা জ্বলিয়া উঠিয়াছি, এবং সেই উত্তাপে মায়া মমতার শেষভাগটুকু বাষ্প হইয়া উড়িয়া গিয়াছে।

৪

কথার দুই দিক। একটা কর্ম্মের দিক, আর একটা ভাবের দিক। কতকগুলি সন্ন্যাসী দেখিয়াছি, তাহারা কথায় খুব সাবধান। 'আমার নাম ভবতোষ', এই ভাবে কথা না কহিয়া, 'এই শরীরের নাম ভবতোষ', ইহাই তাঁহারা কহিয়া থাকেন। ইহার মধ্যে প্রথম নম্বরের আধ্যাত্মিক ভাব আছে। অদ্বৈতভাবও বলিতে পারেন। এ ভাবটা খুব বৈজ্ঞানিক। এই রকম ভাবকে কর্ম্মবাচ্য হইতে ভাববাচ্যে বদলাইয়া দিলে আরও মধুর হয়। অমুকের মুখ দ্বারা ইহা উক্ত হইয়াছে', কিংবা 'অমুকের হস্ত দ্বারা এই চড় কিংবা চাপড় এই শরীরের উপর পতিত হইয়াছে'। এগুলি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। নারীজাতির পক্ষে এই ভাব সোজা। যে ভাববাচ্যের উদাহরণ দেওয়া হইল, তাহার প্রথমটা নিরুক্তে তৃতীয়া। অনেকের মতে, উহাই আসল বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। অপরটি দ্বৈতাদ্বৈতভাব। খুব চটিয়া উঠিলে মানুষ অদ্বৈতভাব অবলম্বন করে। তাহার হাত, পা এবং মুখ চলিতে থাকে, কিন্তু আত্মা রণক্ষেত্র হইতে সরিয়া পড়ে। আত্মা যদি জগৎ দেখিয়া ভাবগ্রস্ত হইয়া পড়ে, তখন দ্বৈতভাবের সঞ্চার হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের মধ্যে এইটুকু বিশিষ্টতা যে, যাহাকে দেখিয়া ভাব হয়, আত্মা তাহার মধ্যে মিশিতে চাহে। যদিও সে জানে যে, তাহাদিগের মধ্যে অভেদ ঐক্য বর্ত্তমান, অথচ রসের খাতিরে সেটুকু ভুলিয়া যাওয়া উচিত।

যদি বিজ্ঞানের সখ্ থাকে, তবে ইহার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। শক্তি ও কর্ম্ম একই জিনিস, কিন্তু দ্বৈতভাবে তাহারা স্বতন্ত্র। নচেৎ লেখা-পড়ার দরকার থাকে না। 'ফোর্স' এবং 'এনার্জ্জি' উভয়কে স্বতন্ত্রভাবে স্থাপিত না করিলে কর্ম্মের কোনও কূল কিনারা পাওয়া যায় না। মনে করুন, একটা বিরাশী ওজনের লৌহখণ্ড পথে পড়িয়া আছে। আপনি যদি সেটাকে ছাতের উপর লইয়া যান, তবে নিশ্চয় একটা বিখ্যাত কর্ম্ম করা হইল। লৌহ জড় পদার্থ। তাহার মধ্যে যে ভারত্ব অর্থাৎ 'গ্র্যাভিটী' বর্ত্তমান, তাহা 'ফোর্স', এবং আপনি যে শক্তি দ্বারা তাহাকে ছাতের উপর লইয়া গেলেন, তাহা 'এনার্জ্জি'। মাধ্যাকর্ষণের বিরুদ্ধে এই যেটুকু ক্রিয়া করা হইল, তাহার মূল্য আছে। ছাত হইতে সেই গোলা ফেলিয়া আপনি কাহারও মস্তক চূর্ণ করিয়া দিতে পারেন।

এখন যদি আপনি জিজ্ঞাসা করেন যে, 'ফোর্স' এবং 'এনার্জি'র মধ্যে সম্বন্ধ কি, তখনই দ্বৈতবাদের মধ্যে আসিয়া পড়িতে হয়। শক্তি সাব্যস্ত করিবার জন্যই কর্ম্ম, এবং কর্ম্ম সাব্যস্ত করিবার জন্যই শক্তি। মূলে তাহারা কোনও সময় এক ছিল কি না, তাহা সপ্রমাণ হয় না। মনে করুন, লৌহ-গোলকের পরিবর্ত্তে এক জন প্রেমিকা মানভরে রন্ধনশালায় বসিয়া থাকেন, এবং প্রেমিক তাঁহাকে সসম্মানে নানাবিধ ভাব দ্বারা ভুলাইয়া দ্বিতলে লইয়া যাইতে সক্ষম হন। এটার মধ্যেও সেই দ্বৈতভাব। এই জন্য দ্বৈতবাদে উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্ম মায়া অবলম্বন না করিলে দ্বৈতভাব আসে না, এবং কর্ম্মও থাকে না, জগৎ মিথ্যা হইয়া পড়ে। জীব কর্ম্ম করিয়া ভাবময় হয়, ব্রহ্ম তাহা যোগাইতে থাকেন।

আমাদের কথার মধ্যেও সেই লীলা। একটা দিকে ভাব নিশ্চয় আছে। সেটাকে টানিয়া বাহির করিতে পারিলেই আমরা মনে করি যে, বিলক্ষণ একটা কর্ম্ম হইল। এই মায়ার ভাব খুব বিস্তৃত, তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহারা ঝাঁকা বহিয়া চাঁদনী হইতে আমাদের পূজার বাজার নারিকেলডাঙ্গায় লইয়া যায়, এবং যাহারা গদ্যে কিংবা পদ্যে ভাবগুলি টানিয়া বাহির করে, সকলেই কর্ম্মবীর। আমি এক জন জড়ভরত শয্যায় পড়িয়া হরিনাম জপ করি, এবং পেন্সন খাই। আপনি যদি আমার কান ধরিয়া বহুবাজারের চৌমাথায় দাঁড় করাইয়া অপমান করেন, কিংবা আমাকে দিয়া মোট বহাইয়া লন, তবে ণিজন্ত প্রকরণ হইলেও, তাহা আপনারই কর্ম্মের বাহাদুরী। আমি ব্রহ্মের এক অংশ, কেবল মায়া অবলম্বন করিয়া ছিলাম। আপনি অন্য এক অংশ, মায়াটার খানিকটা ঘুচাইয়া দিলেন। কর্ম্মক্ষেত্রে আপনার জয়জয়কার পড়িয়া গেল, তাহা সত্য; কিন্তু ব্রহ্মলোকের লৌহবর্ত্তুলাংশে আপনাকে ঘুরিয়া আমার দশা অবলম্বন করিতে হইবে, এবং হয় ত এক সময় আমি আপনার কান ধরিয়া লইয়া আসিব। এই যে শক্তিটুকু, আপনারই কর্ম্মের বলে আমি পাইয়াছি, এবং আপনি অনর্থক আমার অপমান করিয়া তাহা হারাইয়াছেন।

গদ্যে কিংবা পদ্যে যখন আমরা জগতের মায়াভাব টানিয়া বাহির করি, তখন একটা মস্ত কাজ করা হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাতে যে বৈজ্ঞানিক বাক্যবাণের উৎপত্তি হয়, তাহা বিষাক্ত হইয়া পড়িলে, আমাদের একটা দায়িত্ব আছে। আমাদের কথা জীবের দুঃখদায়ক হইয়া পড়িলে, তাহা না কহাই ভাল। যে কথার দ্বারা সংসারের শান্তি, পবিত্রতা এবং সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়া যায়, তাহা

মনে কেবল দুঃখের উৎপত্তি হয়। তাহাদিগের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিলেও তাহারা সেই কথা বুঝিতে পারে, অথচ তাহাদের দুঃখ হয় না।

সংহার সৃষ্টির ন্যায় জগতের একটা অঙ্গ। তাহাতে আমাদের কোনও হাত নাই। কিন্তু ভাবের সংহার আমাদের আয়ত্ত। ইহাই জীবের অস্তিত্বের প্রমাণ। আমি তোমাকে কেবল কথায় দুঃখ দিতেও পারি, সুখ দিতেও পারি। তোমাকে হাসাইতেও পারি, কাঁদাইতেও পারি। হয় ত আমি দুঃখী, তুমি আমার অবলম্বন। কিন্তু যদি তুমি আমার স্কন্ধে আরোহণ করিয়া শাস্ত্রীয় কর্ম্মফল প্রচার কর, তবে একপদ স্খলিত হইবে। অপরের কর্ম্মফলের দুঃখ নিজে সহ্য করাই ধীরের লক্ষণ, মনুষ্যত্বের পরিচায়ক।

পুরাণে বলে যে, ভগবান জগতে অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্মহীন দৈত্যদানবের সঙ্গে ঘোর যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহারা তরিয়া যায়, মুক্ত হইয়া যায়; ভগবান এবং তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী দুঃখ সহিয়া থাকেন। এই বাক্য শুনিয়া অনেকে মনে করে, তাহারাই ভগবানের শিষ্য, এবং বাকী সব দৈত্যদানব। একটা ঘোর যুদ্ধের সূত্রপাত করিয়া বসে। উভয় পক্ষেই, যাহারা দেহত্যাগ করে, তাহারা মনে করে,—'স্বর্গে চলিলাম'। এ স্থলে আমরা বলিয়া থাকি, 'একটা ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপিত হইয়া গেল'। কিন্তু বাস্তবিক ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপিত হইয়াছে কি না, তাহার প্রমাণ বিজেতৃগণের দুঃখ। যদি জয় করিয়া দুঃখ কেহ পায়, যদি পরের পাপ ঘাড়ে লইয়া কেহ আত্মশোণিত বিসর্জ্জন করে, তবে সেখানেই ধর্ম্মরাজ্যের আরম্ভ। লঙ্কাধ্বংস করিয়া রামচন্দ্রের যে দুরবস্থা হইয়াছিল, এবং সরযূর খরস্রোতে লক্ষ্মণ যে জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন, তাহাই ভবিষ্যতের ধর্ম্ম-বেদী। দুর্য্যোধনের সংহারে এবং যদুবংশের ধ্বংসে দ্বাপরের রাজ্যাবসান, কিন্তু বিজেতৃগণের অবস্থা ভাবিয়া দেখুন। আমার সুখের যে কণ্টক, তাহাকে পাপী সাব্যস্ত করিয়া গলা টিপিয়া ধরিলে ধর্ম্মরাজ্য-সংস্থাপন হয় না। ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপিত হইলে, আপনার সেখানে স্থান নাই। আপনার কপালে সুখ নাই। কোমল শয্যা, তরুণী স্ত্রী, বীণাধ্বনি, এবং বসন্তের সুরভি, এ সকল সংস্থাপকের কপালে ভগবান কখনই লিখেন নাই। সোজা কথায়, ধর্ম্মরাজ্যের ভিত্তি আত্মবিসর্জ্জন।

ধর্ম্মরাজ্য-সংস্থাপন এবং মিউনিসিপালিটীর ময়লা ঘাড়ে করিয়া ধাপায় লইয়া যাওয়া, অনেকটা এক রকম। যাহারা ময়লা করে, তাহারা কৃষ্ণের জীব তাহাদের গলা টিপিয়া মারিতে ভগবতী কখনও মন্ত্রণা দেন নাই। তিনি

নিজেই মাতৃরূপে ময়লা ফেলিয়া দেন। মানবের মধ্যে যেটুকু ময়লা আছে, তাহাই দৈত্য। অনেকে মনে করে, মশা মারিলে ম্যালেরিয়া যায়, এবং ইন্দুর মারিলে প্লেগ পালায়। ইহাদেরও অবস্থা ভ্রান্ত ধর্ম্মরাজ্য-সংস্থাপকের ন্যায়। তন্ত্র, মন্ত্র, ছিটা, ফোঁটা, যোগ যাগ, কাব্য এবং ব্যাকরণ, কিংবা ইতিহাস পুরাণ যত আওড়ান যাউক না কেন, কথার ভাল দিক্‌টা সম্মুখে আনাই পুণ্যকর্ম্ম। আমার বিশ্বাস এই যে, যত ব্যাধি জন্মিতেছে, তাহা কথার মধ্য দিয়া। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, মানুষ এ যুগে এত কথা কহে যে, তাহার নিঃশ্বাসত্যক্ত প্রাণবায়ু, কিংবা তাহার ছন্দ বা স্পন্দন, যাহাই বলুন না কেন, অধিকাংশ কথার মধ্যে ব্যাপ্ত হয়, এবং সেই কথা শুনিয়া প্রজাসমূহ পীড়িত হইয়া পড়ে। আদালতের মামলা মোকদ্দমা, ফৌজদারী এবং দেওয়ানী, সব এই কথার গুণে। কেহ নীরবে সহিয়া মরিয়া যায়, কেহ বা তাহার প্রতিধ্বনি করিয়া মামলা টানিয়া আনে।

জগতের কথার ভাল দিক্‌টা যদি টানিয়া বাহির করিতে পারেন, তবেই আপনি ধন্যবাদের পাত্র। কথার মধ্যে বিষ থাকিলে, জন্মভূমির জন্য অশ্রুপাত বৃথা। যাহারা ঘরে বসিয়া দেশের জন্য অশ্রুপাত করে, অথবা অপরের প্রতি মমতাশূন্য, তাহাদিগের দশা মুমূর্ষু পশুর ন্যায়।

নিধিরাম।

ভাগা।

১

রামচরণ বলিল, "আর ত চলে না।"

রামচরণের স্ত্রী বলিল, "জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি। তুমি অত ভাবিও না।"

রামচরণের শীর্ণ বিবর্ণ ওষ্ঠাধরে একটু হাসি ফুটিয়া উঠিল। রামচরণ এক-দৃষ্টে স্ত্রীকে দেখিতে লাগিল। তাহার কোটরগত নিষ্প্রভ চক্ষু দুটি একটু দীপ্ত হইয়া উঠিল। বোধ হয়, আবার চারি চক্ষুর মিলন হইল। দু'জনে দু'জনের অন্তর দেখিতে পাইল। রামচরণ বলিল, "না ভাবিয়া ত থাকা যায় না। ভাবনা ত আমার; কোন অধিকারে তোমাকে ভাবাই? দুধের ছেলেটাও এই বয়সেই ভাবিতে শিখিল। এ ভাবনার ত শেষ নাই।"

এলোকেশী ধীরে ধীরে রামচরণের রুক্ষ কেশে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে লাগিল, কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল, "ভাবিয়া ত কূল পাইব না। আমার সিঁথের সিঁদুর বজায় থাক্‌, আবার সব হবে। তুমি সেরে ওঠ—"

রামচরণ বলিল, "আর কি সারিতে পারিব? কেবল ভাবি, তোমাদের কি হবে—থেকেই বা কি করিলাম?—তবু মনে হয়, ভগবান্‌ যদি দিন দিতেন, তোমাদের একটা গতি করে' যদি মরিতে পারিতাম—"

এলোকেশী স্বামীকে বাধা দিয়া কাতরকণ্ঠে বলিল, "মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দিও না। তোমার এই শরীর—" এলোকেশীর চোখে জলধারা বহিতে লাগিল—"ডাক্তার তোমাকে কত বার বলেছেন, ভাবনায় তোমার রোগ বাড়িতেছে। বুকের ব্যামো, একটু শব্দ হ'লে তুমি চম্‌কে ওঠো—রাত দিন ভেবে' ভেবে' রোগ বাড়াও কেন? তাঁকে ডাকো, যিনি অগতির গতি, তিনি কূল দেবেন।"

রামচরণ বলিল, "প্রিভিলেজ লীভ শেষ হয়েছে। আঠারো মাসের সিক্‌ লীভ, তাও ত শেষ হয়। তার পর?"

এলোকেশী চোখের জল মুছিতে মুছিতে বলিল, "তার পর তুমি সেরে উঠ্‌বে, আবার চাকরী করতে যাবে।"

বলিতে বলিতে এলোকেশী একটু প্রফুল্ল হইল! আশা যেন তাহাকে দেখাইতে লাগিল,—তাহার স্বামী সারিয়া উঠিয়াছে; আফিসে যাইতেছে; এলোকেশী তাহার হাত হইতে হুঁকাটী লইয়া পানের বাক্‌সটি দিতেছে।

রামচরণ বলিল, "তার পর বিকালে আফিস হইতে ফিরিয়া আমি তোমাকে বলিব—'তোমার জন্যে একটা জিনিস এনেছি।' তুমি বলবে, 'কি?—দেখি। আমার জন্যে পয়সা নষ্ট করা কেন?' আমি বলব, 'বল দেখি, কি?' তুমি বলবে, 'কি জানি বাবু! আগে তুমি মুখে চোখে জল দাও, ঠাণ্ডা হও।' আমি বলব, 'পারলে না!' তার পর—"

এলোকেশী স্বামীর ভাবান্তর দেখিয়া আনন্দিত হইল। বোধ হয়, দুঃখিনীর মনে হইতেছিল, এমন দুর্দ্দশা অনেকের হয়। সুখের পর দুঃখ, তাহা ত আমাদের কপালে ফলিয়াছে। দুঃখের পর সুখ—তাও না হইবে কেন?

এলোকেশী বলিল, "এখন কিছু খাও।"

রামচরণ বলিল, "শোন, আগে শেষ করি। তার পর তুমি আমাকে জল খেতে দেবে; শেষে ইতস্ততঃ করে' বলবে,—'কই, কিছু ত আন নি! ঠাট্টা

হচ্ছিল বুঝি?' তখন আমি বল্‌ব, 'ঠাট্টা নয় গুরু ম'শায়, আমার কি বেতের ভয় নেই?—তোমার জন্যে আজ সুখবর এনেছি। পকেট খুঁজে' কি সুখবর পাওয়া যায়?' তুমি কল্‌কেয় ফুঁ দিতে দিতে বল্‌বে, 'শীগ্‌গির বল, নয় ত কল্কের আগুন ফেলে দিয়ে চ'লে যাব।' আমি বলবো, 'শোন শোন, রাগ ক'রে যেও না; আজ সাহেব ডেকে বল্‌লেন, 'দেখ রামচরণ, শুনলুম, তোমার স্ত্রীটি বড় লক্ষ্মী; তোমার অসুখের সময় দিন রাত সেবা করেছে, দুঃখের সীমা ছিল না, কিন্তু হাসিমুখে সব সয়েছে। তাই তাকে কিছু বকসিস্‌ দেব মনে করেছি। কি দি, তাই ভাবছি।' আমি বল্‌লুম, 'সাহেব! আপনার বড় দয়া! হয় এক যোড়া বালা, নয় একটি সতীন দিন। শেষটি পেলে তার সুখের সীমা থাকবে না।' সাহেব বল্লেন, 'না রামচরণ, আমরা বহুবিবাহ ঘৃণা করি। আর বালা দিলে তুমি আবার বেচে খাবে। আমি তোমাকে দেড়'শ' টাকার গ্রেডে তুলিয়া দিলাম।' এখন বুঝলে লক্ষ্মী, কুড়ি টাকা মাইনে বেড়েছে, তখন তুমি হরির লুট দিতে ছুটবে। আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি!"

রামচরণ এক সঙ্গে অনেকগুলা কথা কহিয়া একটু শ্রান্ত হইয়া পড়িল। এলোকেশী রুগ্ন স্বামীর পথ্য আনিতে গেল।

২

আশা-বৃন্তই জীবন-ফুলটি ধরিয়া রাখে। এই দারুণ নিরাশা, এই নূতন আশা, আবার তখনই আশাভঙ্গ। তবু মানুষ আশা করে। নিরাশা ও আশা—ছায়া ও আলো নহিলে জীবনের ছবি সম্পূর্ণ হয় না।

রামচরণের আশার অবকাশ ছিল না। কিন্তু ভবিষ্যৎ সুখের আশা কাহার না ভাল লাগে? রামচরণ কি সুখের কল্পনায় সুখী হইয়াছিল? না, এই সহজ স্বল্প সুখও তাহার অদৃষ্টে নাই ভাবিয়া, যাহা হইলে গরীবের সংসারে সুখের সীমা থাকিত না, বিধাতা তাহার অদৃষ্টে তাহা লেখেন নাই বুঝিয়া নিরাশায় ডুবিয়াছিল? স্ত্রীকে সুখের দিনের অসম্ভবতা বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছিল?

রামচরণের আশা সেকেন্দরের জগদ্বিজয়ের আশা নয়; বলাইচরণ সাধুখাঁর ক্রোরপতি হইবার দুর্ভাবনা নয়। প্রত্যহ উদয়াস্ত পরিশ্রম ও কায়ক্লেশে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার আশা। তাহাও দুনিয়ায় অনেকের পক্ষে দুরাকাঙ্ক্ষা।

রামচরণের পরিবার ক্ষুদ্র। অভাবের তাড়না ছিল না। দেশে সামান্য

ভূসম্পত্তি ছিল। শৈশবে তাহার পিতৃবিয়োগ হইয়াছিল। বিধবা মা তাহাকে মানুষ করিয়াছিলেন।

রামচরণ কখনও মার কথার উপর কথা কহে নাই। কেবল জীবনে একবার মাতা পুত্রে মতভেদ হইয়াছিল। রামচরণের বিবাহের সময় একবার, একদিনের জন্য, রামচরণ বিদ্রোহী হইয়াছিল। মা গরীবের মেয়ের সহিত পুত্রের সম্বন্ধ স্থির করিয়াছিলেন; কিন্তু একটি ছোট খাটো ফর্দ্দ পাঠাইয়াছিলেন। ষাট ভরী সোনার দাবী করিয়াছিলেন। রামচরণ তাহাতে আপত্তি করিয়াছিল। মা সে আপত্তি কাণে তুলিলেন না; রামচরণও গোঁ ছাড়িল না। মা বলিলেন, "তবে তুই নিজে দেখে শুনে গণ পণ না নিয়ে বিয়ে কর, আমি দেশে যাই। সেখান থেকে কাশী চলিয়া যাইব। কর্ত্তা কখনও তোর ঠাকুরমার মুখের দিকে চাহিয়া কথা কহিতেন না, আর তুই আমাকে চোখ রাঙ্গাস্?"

তবু রামচরণ সমস্ত দিন তাহার ধনুর্ভঙ্গ পণ রক্ষা করিয়াছিল। কিন্তু যখন দেখিল, সূর্য্যদেব পাটে বসিলেন, তবু মা হবিষ্য করিতে উঠিলেন না, ঠাকুরঘরে জপ করিতে লাগিলেন, তখন সে পরাজয় স্বীকার করিল; ঠাকুরঘরের দ্বারে দাঁড়াইয়া ডাকিল, "মা!" মা উত্তর দিলেন না। রামচরণ অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "মা! আজ কি উপোস করিয়া থাকিবে?" মা মালা ঘুরাইতে ঘুরাইতে বলিলেন, "দেশে গিয়া হবিষ্য করিব। তা, তোর সে ভাবনা কেন রামচরণ?" রামচরণ বলিল, "মা, আমার ঘাট হইয়াছে। তুমি ক্ষমা কর। তোমার যা ইচ্ছা, তাই কর। কিন্তু আমি শ্বশুরবাড়ীতে মুখ দেখাইতে পারিব না।"

রামচরণের সেই মেয়ের সঙ্গেই বিবাহ হইল।

রামচরণের মেজো মামা বরকর্ত্তা। তিনি গহনাগুলি ওজন করিয়া লইলেন। মামা দেখিলেন, চৌদ্দ ভরী কম হইতেছে। তিনি বর লইয়া চলিয়া আসিবার ভয় দেখাইলেন। কন্যাকর্ত্তা হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া দিতে চাহিলেন। কিন্তু দুঁদে মামা বলিলেন, "তাহার পর কি বউমাকে হ্যাণ্ডনোট পরাইয়া দিব? না, ধুইয়া খাইব?"

কনের বাপ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। বর অধোবদনে বরাসনে বসিয়া রহিল।

রামচরণের ভাবী শ্বশুরের এক জন অন্তরঙ্গ বন্ধু বলিলেন, "আচ্ছা, আমি ব্যবস্থা করিতেছি। ক' ভরী? কি গয়না বাকী?"

রামচরণের মামা বলিলেন, "চৌদ্দ ভরীর তাগা।"

বন্ধু কনের বাপকে আড়ালে ডাকিয়া লইয়া গিয়া কি বলিলেন। কনের

বাপ বলিলেন, "জাত যায়, কি করিব ? মেয়ের জন্য চোর হইতে পারিব না।"

বন্ধু তাঁহাকে ধমক দিয়া ঠাণ্ডা হইতে বলিয়া চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় বলিলেন, "বর লইয়া চলিয়া না যায়। চৌদ্দ ভরীর জন্য আটকাইবে না। কালনিমে মামা বেটাকে নজরবন্দী করিয়া রাখো। বরকে পাহারা দাও। আমি এখনই আসিতেছি।"

ঘণ্টা খানেকের মধ্যে বন্ধু তাগা লইয়া ফিরিলেন। বলিলেন, "মামা! চৌদ্দ ভরী হইল না। বারো ভরী; বাকী দুই ভরীর দাম ধরিয়া দিব।"

মামা তাহাতেই সম্মত হইলেন। বলিলেন, "যা দিলেন, আপনাদের মেয়েরই তোলা রহিল। কনের গহনা লইয়া কেহ বড়মানুষ হয় না।"

বিবাহ হইয়া গেল। কন্যাকর্ত্তা স্বয়ং কন্যা সম্প্রদান করিলেন। কিন্তু তাঁহার অপ্রসন্ন গম্ভীর মুখ আর প্রসন্ন হইল না।

বিবাহের বৎসর শেষ না হইতেই রামচরণের মাতা ইহলোক ত্যাগ করিলেন।

পরে রামচরণের শাশুড়ী অনেকবার সেই বারো ভরীর তাগা ভাঙ্গিয়া চৌদ্দ ভরীর নূতন তাগা গড়াইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। এলোকেশী স্বামীর মন জানিত। সে এ কথা শুনিয়া রাগ করিত। মা একবার তাগা খুলিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এলোকেশী বলিয়াছিল, "অমন করিলে আমি তোমার বাড়ীতে আসিব না। তুমি এখনও সে কথা ভুলিতে পারিলে না?"

এলোকেশী আর তাগা পরিয়া বাপের বাড়ী যাইত না।

রামচরণ এক রকম সুখে কাল কাটাইতেছিল। কিন্তু সহসা তাহার ভাগ্য-বিপর্য্যয় ঘটিল। সে অসুস্থ হইল। প্রথমে ডিস্‌পেপ্‌সিয়া, তার পর বাত, তার পর রক্তাল্পতা। ক্রমে রামচরণ শয্যাশায়ী হইল।

গরীবের গৃহেও যতক্ষণ কিছু থাকে, ততক্ষণ চিকিৎসার ঘটা হয়। রামচরণেরও ঘটা করিয়া চিকিৎসা হইল। ফলে সব গেল, কিন্তু রোগ গেল না। অবশেষে রামচরণ হৃদ্রোগে আক্রান্ত হইল।

তখন সংসার প্রায় অচল হইয়াছে। রামচরণের মা জুলুম করিয়া যে গহনাগুলি আদায় করিয়াছিলেন, সে গহনাগুলি প্রথমে বাঁধা পড়িল; পরে অন্য ভাগ্যবানের ঘরে চলিয়া গেল।

কেবল তাগা যোড়াটি ঘরে ছিল। রামচরণ স্ত্রীকে দিব্য দিয়া বারণ করিয়াছিল। এলোকেশী স্বামীর ভয়ে তাগা তুলিয়া রাখিয়াছিল।

অবশেষে তাহাও বাঁধা দিতে হইল। রামচরণের অজ্ঞাতে, রামচরণের আফিসের বন্ধু লালবিহারী সেই তাগা যোড়াটি তাহাদের আফিসের বড় বাবুর মাতার নিকট রাখিয়া দেড় শত টাকা আনিয়া দিয়াছিল।

আমরা যে দিনের কথা বলিতেছি, সেই দিন রামচরণ তাগার কথা শুনিয়াছিল। তাহার পর স্ত্রী পুরুষে ভাবনার বৈধতা লইয়া বৃথা ভাবিয়া মরিতেছিল।

৩

মধ্যাহ্নে ঘরের মেজেয় বসিয়া এলোকেশী একখানি চিঠি পড়িতেছিল। চিঠিখানি পড়িতে পড়িতে তাহার বিষণ্ণ মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। সে এক এক বার নিদ্রিত স্বামীকে দেখিতেছিল। এলোকেশী চিঠিখানি স্বামীকে দিতে আসিয়াছিল। তাহাকে নিদ্রিত দেখিয়া চিঠিখানি হাতে করিয়া ভাবিতেছিল, কি চিঠি? কাহার চিঠি? যদি কোনও দুঃসংবাদ থাকে? আগে পড়িয়া দেখিব? কি করি? যদি উনি রাগ করেন?

কি ভাবিয়া এলোকেশী বাহিরে গেল। চিঠিখানি খুলিয়া পড়িল। সুবর্ণপুরের চিঠি। দেশের সম্পত্তি রেল-কোম্পানী কয় হাজার টাকায় কিনিতে চাহিয়াছে। সে সম্পত্তির কোনও আয় ছিল না। উপরন্তু ব্রহ্মোত্তরের সেস্‌ ও মৌরসীর খাজনা যোগাইতে হইত। তাহাও বাকী পড়িতেছিল।

এই দুঃসময়ে সেই সম্পত্তির ক্রেতা উপস্থিত! তবে, ভিটাটুকুও থাকিবে না, এই যা দুঃখ। ষ্টেশনের পার্শ্বেই রামচরণের পৈত্রিক ভদ্রাসন। এলোকেশী যখনই দেশে যাইত, ছাত হইতে রেলগাড়ী দেখিত। সে বাড়ীও এখন বেমেরামতে পড়ো-পড়ো হইয়াছে।

এলোকেশী স্বামীর ঘরে আসিয়া আবার চিঠিখানি গোড়া হইতে পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, এমন সময়ে রামচরণের ঘুম ভাঙ্গিল। রামচরণ পাশ ফিরিয়া এলোকেশীকে দেখিতে পাইয়া, বলিল, "তুমি একটু শোও নি?—কার চিঠি?"

এলোকেশী বলিল, "ভগবান মুখ তুলে' চেয়েছেন।—মাঝের পাড়ার ঠাকুরপোর চিঠি। এবার সত্যি সত্যি কোম্পানী তোমাদের জমী কিনবে। নোটিস্‌ পড়ছে। হ্যাঁগা, ভিটাটুকু ছাড়বে না?" রামচরণ সাগ্রহে বলিল, "কই চিঠি, দেখি—দেখি!"

রামচরণ একনিঃশ্বাসে চিঠিখানি পড়িল। সে আনন্দে উত্তেজিত হইয়া উঠিল; বলিল, "এখন আমি সুখে মরিতে পারিব।"

এলোকেশী বলিল, "অমন কথা মুখে এনো না—টাকার ভাবনায় তোমার

রোগ বাড়ছে। ঠাকুর মুখ তুলে' চেয়েছেন, আর ভাবনা কি ?—টাকাটা পেলেই আমি তোমাকে নিয়ে হাওয়া বদলাতে যাবো।"

রামচরণ বলিল, "গাছে কাঁটাল, গোঁপে তেল, জান ত ? ততদিন ?"

এলোকেশী বলিল, "আমার বলিতে ভয় হয়। এক কাজ করিলে হয় না ? সেই তাগা ঘোড়াটা বেচে' ধার শোধ করে' বাকী টাকায় এ ক' দিন চলবে না ?"

রামচরণ বলিল, "তা হবে না। সে তাগা তোমারই থাকিবে। বরং তোমার ঠাকুরপোর কাছ থেকে খতে কিছু টাকা লইব। জমীর এখন খদ্দের হইয়াছে। ভায়াও এক জন সরিক। তাঁহার হাতেই টাকা পড়িবে।"

এমন সময়ে খোকা আসিয়া বলিল, "লালুবাবু আসিয়াছেন।"

এলোকেশী সরিয়া গেল।

৪

খোকা লালুবাবুকে লইয়া আসিল। দু' একটা কথার পর লালুবাবু বলিল, "বড়বাবু জানিতে পারিয়া তাঁর মাকে বড় বকিয়াছেন। তাগাটা ওধরাইয়া লইতে হইবে। এ দিকে ত আপনার এই অবস্থা। কি করা যায় ? না বলিলে নয়, তাই আপনাকে বলিয়া ফেলিলাম। আমার অবস্থা ত জানেন ? অভ-ভক্ষ্য ধনুর্গুণ। কি করা যায় !"

মানুষ গড়ে। বিধাতা ভাঙ্গেন। স্যাকরা তাগা ঘোড়াটা গড়িয়াছিল। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে বিধাতা পুরুষ যাহা গড়িয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাও ত তুচ্ছ নয় ! সুতরাং রামচরণ বাবুর তাগা রাখিবার অচল অটল পণ কোথায় ভাসিয়া গেল !

রামচরণ বলিল, "লালু বাবু ! আপনি তাঁহাদের মত করিয়া বেচিয়াই ফেলুন। আর সুদ বাড়াইয়া কোনও লাভ নাই।"

লালু বাবু বলিল, "তা হ'বে হ'বে—আপনি অত ব্যস্ত হবেন না। তাগাটা বেচে—তা, কি করা যায় ? রামচরণ বাবু, মাপ করবেন, কোনও উপায় থাকলে আমি আপনাকে এ সময়ে—"

রামচরণ বলিল, "আপনি কুণ্ঠিত হবেন না লালু বাবু। আপনি আমার যে উপকার করেছেন, তা আমি কখনও ভুলবো না।—আপনি কি করবেন ?—আপনি আমার জন্যে ভাববেন না,—এই চিঠিখানা পড়ুন,—একটু যেন সুরাহা হয়ে আসছে।"

লালু বাবু চিঠিখানি পড়িয়া বলিলেন, "তবে থাক না—এই কথা বলে' যদি আর কিছু দিন রাখা যায়—"

দরজার পাশ হইতে খোকা বলিল, "না ; আপনি বেচে দিন। বাবার কষ্ট হচ্ছে। আবার আপনি ভাল করে' তাগা গড়িয়ে দেবেন।"

রামচরণ আবার রাখিতে চাহিতেছিল। কিন্তু দরজার পাশ হইতে এলোকেশী খোকার মারফৎ জিদ করিতে লাগিল। অল্পবিস্তর তর্ক-বিতর্কের পর তাগা বেচাই সাব্যস্ত হইল।

৫

বড় বাবু বড় খাস্তা লোক। তিনি বলিলেন, "যার যেমন খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, বাড়ীতে বসে' পোদ্দারী কচ্ছেন। টাকাগুলো সব গুড়িয়ে হাতে এনে একখানা কাগজ কি ভালো শেয়ার কিনে দেব, মনে করছি।"

লালবিহারী বলিল, "আপনার স্যাকরা ত কাছেই থাকে—একবার ডেকে পাঠান না। তাগা ঘোড়াটা বেচে—"

বড় বাবু বলিলেন, "তা হবে না লালু বাবু, আমার বাড়ীতে গোলমাল করে' কাজ কি? আপনি বেচে টাকাটা এনে দিন।—যান না একটা পোদ্দারের দোকানে নিয়ে, কত ক্ষণের মামলা? বলি, রামচরণ কেমন আছে হ্যা?—আর উঠ্‌তে টুট্‌তে পারবে? এ দিকে ত মাইনে বন্ধ হয়ে এলো। গবমেণ্ট-আফিস, তাই এত দিন চল্‌ল।—এমন গবমেণ্ট কি আর কি হয়?"

লালু বাবু বলিল, "সেই রকম।—তবে এক জন লোক দিন, দু'জনে যাই।"

বড় বাবু বলিলেন, "তুমিই যাও না লালু বাবু। আর লোক ফোক্ কেন? ভারি ত মামলা! দু' শ'—আড়াই শ' টাকা। তুমি কি নিয়ে পালাবে না কি? যাও—যাও—দেরী করো না—বেলা পড়ে এল। রোদ পড়ে গেলে যাচ্‌বে কেমন করে'? দুর্গা বলে' বেরিয়ে পড়ো—বুঝলে লালু বাবু?"

কিন্তু লালু বাবু তাহা শুনিল না। অগত্যা বড় বাবু তাঁহার সরকারকে সঙ্গে দিলেন।

উভয়ে রাস্তায় বাহির হইয়া দেখিল, দিনের আলো নিভিয়া আসিতেছে। লালুবাবু চারি আনা ভাড়ায় একখানি 'ছ্যাকড়া' গাড়ীর সন্ধান করিতে করিতে প্রায় অর্দ্ধেক পথ শেষ করিয়া একখানি গাড়ী ভাড়া করিল।

লালু বাবু ও বড় বাবুর সরকার সোনাপটীর এক পোদ্দারের দোকানে উঠিল।

৬

সমস্ত দিনের উত্তেজনায় রামচরণ বড় দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। সন্ধ্যার সময় সে খুব হাঁপাইতে লাগিল।—খোকা ডাক্তার বাবুকে ডাকিয়া আনিল।

ডাক্তার বাবু সমস্ত শুনিয়া বলিলেন, "রামচরণ বাবু, সমস্ত দিন এত হাঙ্গাম করিলে সুস্থ শরীর ব্যস্ত হয়,—আপনার ত এই অবস্থা। কাজটা ভাল হয় নি।"

ডাক্তার বাবু ব্যবস্থা করিয়া চলিয়া যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, "আপনি চুপ করিয়া শুইয়া থাকুন। কথা কহিবেন না। যদি প্যালপিটেশন্ বাড়ে, আমাকে তৎক্ষণাৎ খবর দেবেন।"

লালবিহারী তাগা বাহির করিল। পোদ্দার একবার তাঁহাদের দিকে চাহিয়া দেখিল। সরকারের ময়লা পিরান, কাপড়ে হাঁটুর কাছে শেলাই দেখা যাইতেছে। ধূলিধূসরিত চটী; তাহার এক পাটী হাঁ করিয়া আছে।—লালু বাবুর কাপড়খানি ময়লা। জামাটি দামী আদ্ধির, কিন্তু আধ-ময়লা। সিল্কের চাদরখানি পরিপাটী। হয় শাদা চামড়া, নয় ক্যাম্বিসের জুতা; কিন্তু এমন অবস্থা যে, আসলে কি, তাহা সহসা ঠিক করিবার উপায় নাই। এই অসঙ্গতির উপর, লালু বাবুর চেহারাটাই যেন ঝড়ো কাকের মত।

পোদ্দার তাগা যোড়াটি লইয়া দেখিতে লাগিল।

লালু বাবু বলিল, "ওজোন করে' ফেলুন।"

পোদ্দার একবার লালু বাবুর দিকে, আর একবার সরকারের দিকে চাহিল। তার পর একগাছা তাগা নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়া, সে গাছা রাখিয়া, আর এক গাছা লইয়া দেখিতে দেখিতে অর্দ্ধস্ফুটস্বরে বলিল, "পীরের কাছে মামদোবাজী—"

লালবিহারী ভাল শুনিতে পাইল না; সে জিজ্ঞাসা করিল, "কি?"

পোদ্দার তাগা যোড়াটি একত্র করিয়া কষ্টিপাথরে ঘষিতে ঘষিতে বলিল, "তাই বলছি—"

তার পর সে উঠিল; দোকানের সম্মুখভাগে আসিয়া অস্তগামী সূর্য্যের আলোকে কষ্টিপাথরে তাগার কষ্ দেখিতে দেখিতে বলিল,—"ঠকাবার কি আর যায়গা পাওনি? খুব বুকের পাটা ত?—এ যে গিল্টি।"

লালবিহারী হাসিয়া উঠিল। সরকার বিস্মিত হইয়া একবার লালবিহারীকে, একবার পোদ্দারকে দেখিতে লাগিল।

লালবিহারী বলিল, "শালুক চিনেছেন গোপালঠাকুর! তুমি দাও—আমি—"

পোদ্দার বলিল, "দিচ্ছি;—তাগা নয়, তোদের দু' বেটাকেই পুলিসে দিচ্ছি।"

কিছু প্রণামী দিলে পোদ্দার হয় ত অত হাঙ্গামে যাইত না। প্রণামীর সংস্থানও লালবিহারীর সঙ্গে ছিল না। আর, তাহার দৃঢ় বিশ্বাস হইল,—চতুর

পোদ্দার ঠকাইবার চেষ্টায় আছে। গিল্টি হইতে ক্রমে মরা সোনা, তার পর তের টাকা ভরী, তার পর খাদ বাদ,—এই ভাবে পর্দ্দায় পর্দ্দায় উঠিয়া যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্যে হাতাইবার মতলব। বোধ হয়, চোরাই-মাল ভাবিয়াছে।

ফলে কথায় কথায় গোল বাড়িয়া গেল। পাহারাওয়ালা আসিল। সে লালবিহারী, সরকার ও পোদ্দারকে লইয়া থানায় গেল।

সরকার থানায় বলিল, "তাগা কাহার, তাহা জানি না। আমার বাবুর বাড়ীতে তাগা বাঁধা ছিল।"

লালবিহারী বলিল, "তাগা আমার। বড় বাবুর বাড়ী গিয়া লাভ কি? আমি ত স্বীকার করিতেছি।"

কিন্তু তবু বড় বাবুর বাড়ীতে যাইতে হইল। থানা হইতে এক জন জমাদার তাহাদিগকে লইয়া বড় বাবুর বাড়ীতে চলিল।

৮

বড় বাবু অবাক্! কেবল বলিতে লাগিলেন, "কলিকালে কাহারও ভাল করিতে নাই। কি হে লালবিহারী, ব্যাপারখানা কি?"

লালবিহারী বেশ সপ্রতিভভাবে বড় বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "বড় বাবু! একটা কাজ করে' ফেলেছি—আমিই বাঁধা দিয়েছি, তা ত জানেন?—পুলিসকে তাই বলে' দিন, আমি দুর্গা দুর্গা বলে' শ্রীঘরে যাত্রা করি।"

বড় বাবুর বিস্ময় সীমা অতিক্রম করিল। তিনি বলিলেন, "লালু! কি করছ? তাগা কি তোমার? এখনও ভেবে দেখ—"

লালু বলিল, "আপনি বাড়ীর ভিতর গিয়ে মাকে জিজ্ঞাসা করুন—আমিই—"

জমাদার বলিল, "বড়া বাবু! গোস্তাকী নেবেন না। আসামী জেনানা জড়াচ্ছে। আমাদের কসুর নেই—একবার মা'জীকে—"

বড় বাবু তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন। কিন্তু উপায় কি? মাজী বৈঠকখানার পাশের ঘরে আসিয়া দরজার সম্মুখে পরদার আড়ালে দাঁড়াইলেন। জমাদারের প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন, "লালু তাগা রাখিয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু বলিয়াছিল,—তাগা রামচরণ বাবুর। লালুর তাগা নয়।"

তখন জমাদার সাহেব পোদ্দার, লালু বাবু ও তাগা যোড়াটি লইয়া রামচরণ বাবুর বাড়ীতে চলিল।

৯

রামচরণ বাবুর বাড়ীর দরজায় ডাক্তারের গাড়ী দাঁড়াইয়া ছিল। এলোকেশী বেপমান-হৃদয়ে রোগীর শয্যায় বসিয়া ভাবিতেছিল, লালু বাবু এখনও ফিরিলেন না কেন? তিনি টাকা লইয়া ফিরিলে ডাক্তারের ভিজিট দু'টা বাকী রাখিতে হয় না।—ভগবান্ যদি মুখ তুলিয়া চাহিলেন ত ওঁর অসুখ আবার বাড়িল কেন?—ঠাকুর! শেষ রক্ষা কর।—আমি বড় অভাগিনী!—তীরে আনিয়া তরী ডুবাইও না।"

এমন সময়ে নীচে কে চীৎকার করিল, "রামচরণ বাবু কাঁহা?—রামচরণ বাবু!"

এলোকেশী চমকিয়া উঠিল।

এমন সময়ে খোকা ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "এক জন পাহারাওয়ালা, লালু বাবু, আর সব কে—উপরে আসছে—"

ডাক্তার বাবু বলিলেন, "সে কি?"

এমন সময়ে জমাদার রোগীর কক্ষে প্রবেশ করিল।

ডাক্তার বাবু বলিলেন "রামচরণ বাবু, ব্যস্ত হবেন না,—স্থির হোন,—জমাদার সাহেব, বাহিরে চল,—রোগীর অবস্থা ভাল নয়——"

জমাদার ডাক্তারের কথায় কাণ না দিয়া তাগা যোড়াটি বাহির করিল।

রামচরণ উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিল। ডাক্তার বাবু তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন, "উঠিবেন না, উঠিবেন না—"

জমাদার বলিল, "এই গিল্‌টীর তাগা আপনি সোনা বলে' বন্ধক দিয়েছেন? এ তাগা আপনার?"

শুনিয়াই রামচরণ চীৎকার করিয়া উঠিল—ধড়্‌ফড়্‌ করিয়া উঠিয়া বসিল,—বলিল, "অ্যাঁ!—তাগা—তাগা? গিল্‌টীর?—আমার বিয়ের—তাগা—গিল্‌টী—শ্বশুর—"

ডাক্তার বাবু রামচরণকে শোয়াইয়া দিলেন। রামচরণের মুখের কথা আর শেষ হইল না!

এলোকেশী কিছু বুঝিবার পূর্ব্বেই রামচরণ দুঃখিনীর তাসের প্রাসাদ ভাঙ্গিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি।

সাহিত্য ও স্বদেশ।

"সবুজ পত্রে"র মাঘ-সংখ্যায় শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় আমার "সাহিত্যে বাস্তবতা" প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া তাহার প্রতিবাদে "বস্তুতন্ত্রতা বস্তু কি ?" বলিয়া নিজেই একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি গোড়াতেই বলিয়াছেন,—"পৃথিবীর অপর সকল বিষয়ের ন্যায় সাহিত্য সম্বন্ধেও কোন মীমাংসায় উপস্থিত হইতে হইলে বাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষেরই উক্তি শুনাটা দরকার।"

প্রমথবাবুর হাতে মোকদ্দমাটা আসাতে এমন একটা সংশয় উপস্থিত হইয়াছে যে বাদী-প্রতিবাদী উভয় পক্ষই এখন আপনাদের দাবী খুঁজিয়া পাইতেছেন না। বোধ হয়, অন্য কোনও বিষয় সম্বন্ধে মীমাংসায় উপস্থিত হইতে হইলে এরূপ করিতে হয়; কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, সাহিত্য সম্বন্ধে ইহা প্রশস্ত নহে।

এইরূপে বাদ প্রতিবাদ আরম্ভ হয়; "প্রবাসী"র আষাঢ়-সংখ্যায় "লোকশিক্ষক বা জননায়ক" প্রবন্ধে আমি বলিয়াছিলাম,—বর্ত্তমান সাহিত্য, বিশেষতঃ রবীন্দ্র-সাহিত্য দেশে লোকশিক্ষার ভার লয় নাই; সাহিত্যে শুধু শিল্পনৈপুণ্যের অনুশীলন হইতেছে; এই কারণে সাহিত্য ক্রমশঃ কৃত্রিম হইয়া পড়িতেছে। রবীন্দ্র বাবু শ্রাবণ মাসেই "সবুজ পত্রে" "বাস্তব" নামক প্রবন্ধ লিখিলেন; তাহাতে তিনি বলিলেন, "সাহিত্য লোকশিক্ষার ভার লয় নাই;" "ইস্কুল মাষ্টারী" সাহিত্যের কাজ নহে, ইস্কুল মাষ্টারী করিতে হইলে সাহিত্যকে বাস্তবকেই আশ্রয় করিতে হইবে, আর বাস্তবের হট্টগোলের মধ্যে পড়িয়া কবির কাব্য হাটের কাব্য হইবে। এই মতের প্রতিবাদ করিয়া আমি "সাহিত্যে বাস্তবতা" প্রবন্ধ লিখি।

প্রমথ বাবু তাঁহার "বস্তুতন্ত্রতা বস্তু কি ?" প্রবন্ধে আমার আসল কথাটাই মানিয়া লইয়াছেন। রবীন্দ্র বাবু বলিয়াছিলেন, সাহিত্যের সৃষ্টি আনন্দের সৃষ্টি, সে যাহা তাহাই, লোকসাধারণের শিক্ষা বা সমাজের আর কোনও উদ্দেশ্যের সঙ্গে তাহার কোনও সম্বন্ধ নাই। প্রমথ বাবু তাহা স্বীকার করেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন, "ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক, কবি, আর্টিষ্ট্ প্রভৃতিই মানবের যথার্থ শিক্ষক—কেন না, তাঁরাই মানবসমাজে যথার্থ প্রাণের সঞ্চার করেন।" উহাই আমার আসল কথা। বাদীর পক্ষের উকীল প্রতিবাদীর সহায়।

কিন্তু মতদ্বৈধ হইল আর এক বিষয় লইয়া। সাহিত্য মানব-সমাজের শিক্ষকের কাজ করে, তাহা মানিয়া লইয়া প্রমথ বাবু বিশদভাবে কবির মন ও মানব-সমাজের সম্বন্ধ নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি এ সম্বন্ধে আমার

একটা মত কল্পনা করিয়া লইয়া, সেই কল্পিত মতের খুব আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—"রাধাকমল বাবুর বস্তুতন্ত্রতা ইউরোপের গত শতাব্দীর materialismএর অস্পষ্ট প্রতিধ্বনি বই আর কিছু নয়।" প্রথমতঃ বলিয়া রাখা উচিত, 'বস্তুতন্ত্রতা' কথাটা আমি এই আলোচনা-প্রসঙ্গে ব্যবহার করি নাই; সে যাউক; কারণ, প্রমথ বাবু বিষ্ণুপুরাণ, রামানুজ-ভাষ্য, শঙ্কর-ভাষ্য হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া বস্তুতন্ত্রতার আলোচনা করিয়া, শেষে Realismএরই পরিচয় দিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি যে ভাবে বাস্তবকে দেখিয়াছেন, তাহার সঙ্গে আমার মিল তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। পক্ষান্তরে, রবীন্দ্র বাবু যে বাস্তবকে 'হট্টগোল' বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন, তাহার সঙ্গে প্রমথ বাবুর সম্পূর্ণ মতবিভিন্নতা! এ ক্ষেত্রেও বাদীর উকীল প্রতিবাদীর সহায়।

কিন্তু প্রমথ বাবু এই প্রসঙ্গে ভাবিয়াছেন, আমি বলিয়াছি, কবির মন বাস্তবের সম্পূর্ণ অধীন; এবং কবি সামাজিক মন ও যুগের সম্পূর্ণ বশবর্ত্তী হইয়াই আপনার সাহিত্য রচনা করেন। আমি তাহা কোথাও বলি নাই; বরং আমি ইহাই বলিয়াছি যে, কবির সাহিত্যের সাধনা—আপনার জীবনের দ্বারা বাস্তবকে নবজীবন দেওয়া, বাস্তবকে আশ্রয় করিয়া বাস্তবের অতীত হওয়া। কবি যে শুধু সমাজের ফরমায়েস খাটিবেন, ইহা আমি বলি নাই; আমি বলিয়াছি যে, কবি সমাজের মনিব হইয়া শুধু হুকুম করিতে পারিবেন না। কবির সঙ্গে সমাজের জীবনের সম্বন্ধ। কবির সহিত সমাজের প্রেমের আনন্দযোগ। এক দিকে কবি যেমন পারিপার্শ্বিক সমাজের বাহ্য শক্তি হইতে আপনার জীবনীশক্তির সংগ্রহ করেন, আর এক দিকে সমাজও তেমনই কবিপ্রতিভা হইতে আপনার প্রাণশক্তি সঞ্চয় করে। কবির সঙ্গে সমাজের দেনা-পাওনার সম্বন্ধ নহে। কবি ও সমাজের প্রাণের সম্বন্ধ; দেনা-পাওনার হিসাব, হুকুম ফরমায়েসের দিক্ হইতে এ সম্বন্ধের বিচার হয় না।

আমি যখন বলিয়াছি, "সাহিত্যের চরম সাধনা হইতেছে যুগধর্ম্ম প্রকাশ করা, নবযুগ আনয়ন করা", তখন আমি যে সাহিত্যকে সমাজের হুকুম তামিল করিতে বলিতেছি, তাহা নহে। অথচ প্রমথ বাবু, আমি তাহাই বলিয়াছি, এ কথা কেন ভাবিয়াছেন, বুঝিতে পারিতেছি না। প্রমথ বাবু লিখিয়াছেন, আমি সাহিত্য-তত্ত্বকে সমাজতত্ত্বের একবারে অন্তর্ভূক্ত করিতে চাহিয়াছি, "কবিপ্রতিভাকে কেবলমাত্র স্বদেশ নয়, স্বকালের অধীন করিতে চাহিয়াছি।" যুগধর্ম্ম প্রকাশ করার অর্থ,—যুগস্রোতে গড্ডলিকা-প্রবাহের মত ভাসিয়া যাওয়া; প্রমথ-

বাবু ইহা কোথা হইতে পাইলেন? তাহা ছাড়া "নবযুগ আনয়ন করিতে হইলে নূতন-পুরাতন স্বদেশ-বিদেশের অনুকূল ও প্রতিকূল আদর্শের যে সমন্বয়বিধান আবশ্যক, তাহা "স্বদেশ ও স্বকালের সম্পূর্ণ অধীন" থাকিলে কিরূপে সম্ভব? প্রমথ বাবু কি তাহা ভাবিয়া দেখিয়াছেন?

আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি, "সাহিত্যের কর্ত্তব্য তখনই সম্পাদিত হইবে, যখন সাহিত্য যুগের প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবনিচয়ের মধ্যে আপনার নিজের শক্তি ও ভাবুকতার দ্বারা একটা সমন্বয়বিধান করিতে পারে; অনুকূল শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ও প্রতিকূল শক্তিকে ত্যাগ করিয়া যুগধর্ম্ম ইঙ্গিত করিতে পারে, এবং সামাজিক নব-যুগের উপযোগী নূতন শিক্ষা ও দীক্ষায় ব্রতী করিতে পারে।" নবযুগের উপ-যোগী নূতন শিক্ষা ও দীক্ষা দিতে গেলেই বর্ত্তমান বাস্তব ও বর্ত্তমান যুগকে বাধ্য হইয়া খানিকটা অতিক্রম করিতেই হইবে। সুতরাং আমার এই মতের সঙ্গে ইউরোপের গত শতাব্দীর materialism-প্রসূত সমাজতত্ত্বের অন্তর্ভূত সাহিত্য-তত্ত্বের মিল তিনি কি করিয়া বাহির করিলেন, তাহা বুদ্ধির অগম্য। এ যে Irelandএ সাপ নাই, ইত্যাদি সমালোচনার পরাকাষ্ঠার মত!

প্রমথবাবু এই প্রসঙ্গে আরও দুই একটি কথার অবতারণা করিয়াছেন। সে-গুলির আলোচনা আবশ্যক। প্রথমতঃ, তিনি যুগধর্ম্ম বলিয়া যে কিছু আছে, তাহা স্বীকার করেন না। তিনি বলিয়াছেন, একই যুগে নানা পরস্পর-বিরোধী মতামতের পরিচয় পাওয়া যায়। একটিমাত্র বিশেষ ধর্ম্ম নাই। ইহার উত্তর দিতে গেলে বলিব, মানুষে যেমন একই কালে নানা পরস্পরবিরোধী ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাদের সকলেরই আধার ও আশ্রয়স্বরূপ যেমন তাহার চরিত্র, সেইরূপ সমাজের বিভিন্ন মতামত ও প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবনিচয়ের মধ্যে এরূপ একটা সামান্য ধর্ম্ম আছে, যাহা সকলেরই আধার ও আশ্রয়, অথচ সকলেরই অতীত। ব্যক্তির চরিত্রগঠনের মত দেশের পক্ষে যুগধর্ম্মবিকাশ তাহার সাধনার লক্ষ্য। চরিত্রগঠন না হইলে ব্যক্তি-জীবন যেমন চাঞ্চল্য হইতে রক্ষা পায় না, ঠিক সেইরূপ যে সমাজ তাহার যুগধর্ম্ম এখনও ধরিতে পারে নাই, সে সমাজও বিভিন্ন ভাব ও চিন্তার আলোড়নের মধ্যে আপনার ধ্রুব আদর্শ লাভ করিতে না পাইয়া অশান্তি ও চাঞ্চল্যের মধ্যেই জীবন কাটায়। যুগধর্ম্ম প্রকাশিত হইলে সমাজ সহজ ও সরল ভাবে সংশয় ও চাঞ্চল্যের অতীত হইয়া তাহার গন্তব্য-পথে চলিতে থাকে। সমাজ অনেক সময়েই প্রবৃত্তি চালিত হইয়া একটা পথে অগ্রসর হয়, নানা ভাবের বিপরীত শক্তির মধ্যে সে অত্যন্ত সংশয় ও অনিশ্চয়তার

মধ্যে সে পথে ধাবিত হয়। প্রতিভাই যুগধর্ম্মের ইঙ্গিত করিতে পারে। যাহা সমাজের অন্তরে ও বাহিরে চলিতেছে, অথচ যাহা অস্পষ্ট, তাহাদের একটা পূর্ব্ব স্ফুট মূর্ত্তি প্রকাশ করা, বাহিরের আবরণ দূর করিয়া তাহাদের আসল প্রাণকে প্রকাশ করা, প্রতিভা ভিন্ন অন্য কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে। প্রতিভা আত্মশক্তির দ্বারা যুগের বিপরীত ভাবকে অতিক্রম করিয়া, প্রতিকূল ভাব-সমূহের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া, সমাজকে সন্দেহ, অনিশ্চয়তা ও অবিশ্বাসের অতীত করিয়া দিতে পারে। যুগধর্ম্মের ভিতর যুগের সমস্ত অস্ফুট শক্তি প্রকাশ প্রায়; আসল সত্যসমূহ তাহাদের আবরণ খুলিয়া আপনাদের সহজ ও সরল মূর্ত্তি খুঁজিয়া পায়। এইরূপে যুগধর্ম্ম প্রকাশ করিয়া সমাজকে তাহার সোজা ও সহজ আদর্শের পথ দেখাইয়া দিয়া তাহার জীবন-গঠনের সহায় হয়।

দ্বিতীয়তঃ, প্রমথবাবু সামাজিক মন বলিয়া কিছুর অস্তিত্ব একবারেই স্বীকার করেন না। সামাজিক মন একটা abstraction—অলীক কল্পনা নহে; ইহার একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। ইহা ব্যক্তির মনের সমষ্টি নহে। ইহাও ব্যক্তির মনের মত সত্য। যিনি অয়কেন হইতে এতবার বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তিনি আর একটু অধিক খুঁজিলেই সামাজিক মনকেও সেখানে পাইতেন।

আসল কথা হইতেছে, যাঁহারা সাহিত্যের বন্ধনবিহীনতার ধুয়া ধরিয়াছেন, তাঁহারা যুগধর্ম্ম, সমাজধর্ম্ম, সামাজিক মনের প্রতি এতই বীতশ্রদ্ধ যে, তাহাদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত স্বীকার করিতেছেন না!

রবীন্দ্রবাবুর—(ক) সাহিত্য লোককে শিক্ষা দিবার জন্য কোনও চিন্তাই করে না; কোনও দেশেই সাহিত্য স্কুলমাষ্টারীর ভার লয় নাই, এবং (খ) সাহিত্যের সৃষ্টি সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি; শিক্ষা, ধর্ম্ম, নীতি, সমাজের মৎলবে সে আর কিছু হইতে পারে না; এবং প্রমথ বাবুর—(ক) যুগধর্ম্ম বলিয়া কিছুই নাই, এবং সামাজিক মন—সে ত একটা mere abstraction, এবং (খ) সাহিত্য-জগতে দেশভেদ নাই, কেন না, মনোজগতের ভূগোল পরিচিত ভূগোলের অনুরূপ নয়; "দেশমাতার স্তনে যদি দুগ্ধ না থাকে, তাহা হইলে কবিপ্রতিভা বিদেশ হইতেই স্তন্য পাইবে" এই কয়টা কথা মিলাইলেই আমাদের সন্দেহ থাকিবে না যে, সমাজের সহিত যুগযুগান্তকালের বন্ধন ছিঁড়িয়া সাহিত্য সম্বন্ধে এই মতের উৎপত্তি হইয়াছে। কাব্য বল, দর্শন বল, নীতি বল, ধর্ম্ম বল, সকলেরই আধার ও আশ্রয় সামাজিক মন। সামাজিক মনকেই আশ্রয় করিয়া তাহাদের উৎপত্তি ও বিকাশ; অথচ সামাজিক মন তাহা-

দিগকে চাপিয়া রাখে না, তাহাদের আত্মশক্তির বিকাশসাধন করিয়া বরং তাহাদিগকে আপনাকে অতিক্রম করিতে শিখাইয়া সার্থক হয়। এই সত্য উপেক্ষা করিয়া তাঁহারা সাহিত্য সম্বন্ধে একটা সৃষ্টিছাড়া মত গড়িয়া তুলিতেছেন,—"সাহিত্য হইতেছে নির্লিপ্ত মনের ধর্ম্ম, সেখানে দেশভেদের ব্যবধান অত্যন্ত ক্ষুদ্র,এবং সমাজ, সে ত অচল নিগড়বদ্ধ কারাগার। সাহিত্যের উদ্দেশ্যই হইতেছে মানুষের হাতে গড়া সমাজের প্রাচীর কারাগার অচলায়তন প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া একবারে ধূলিসাৎ করা, এবং ভগবানের ও ইতিহাসের হাতে গড়া ভৌগোলিক ব্যবধান সব দূর করিয়া ফেলা। শুধু মত গড়িয়া তোলা নহে, সাহিত্যও এরূপ গড়িয়া উঠিতেছে, কারণ, সাহিত্য হইতেছে জীবনের প্রকাশ।"

এরূপ সাহিত্যে কি সমাজের প্রকৃত মঙ্গল হইতে পারে? এরূপ সাহিত্য কি আসল সাহিত্য? এরূপ সাহিত্যের জীবন কি আসল জীবন,—সত্য, সরল, অকৃত্রিম? তর্কের দ্বারা এ সকল প্রশ্নের মীমাংসা হওয়া কঠিন। এ সকল প্রশ্নের ঠিক মীমাংসা করিবেন দেশমাতা। বর্ত্তমান যুগের দেশমাতা নহেন, যাহা তিনি হইবেন, যাঁহার স্তন্য-পীযূষ বর্ত্তমান কবিপ্রতিভা পরিত্যাগ করিল। *

শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়।

সহযোগী সাহিত্য।

সমর-সাহিত্য।

সাহিত্যের অগ্নিপরীক্ষা-শীর্ষক প্রবন্ধে ইয়ুরোপের এই বিষম বিপ্লবের সময় ইয়ুরোপের সাহিত্য কি ভাবে পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তাহার একটু পরিচয় দিয়াছি। সমাজতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব এবং সমাজ-ধর্ম্ম বা নীতিকথা লইয়াই পরিবর্ত্তনের সূচনা হইয়াছে। গ্যালিঘেনী ফেরেরো, মসিয়ে রেমণ্ড, জীন বেঞ্জ্যামিন, মেটার লাবরি, অধ্যাপক জ্যাকস্, মিস্ মাষ্টারম্যান প্রমুখ লেখক ও লেখিকা-গণই ভাবী পরিবর্ত্তনের কথা লইয়া অধিক আন্দোলন করিতেছেন। জার্ম্মাণীতে নিজ্‌সের সিদ্ধান্ত সকল লইয়া নূতন ভাবে সমাজতত্ত্বের আলোচনা চলিতেছে। ফরাসী লেখক জীন বেঞ্জ্যামিন তাঁহার লিখিত যুদ্ধের অপূর্ব্ব উপন্যাস Gaspard (গ্যাস্‌পার্ড) নামক গ্রন্থে এই দুইটি তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন—

(১) There is no such thing as absolute morality. সমাজ-শাসনের জন্য নিত্য-সিদ্ধ নীতিপদ্ধতি কিছু নাই; সকল নীতিপদ্ধতিই উপযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত; প্রত্যেক নর-

---

* এই প্রতিবাদ যথাসময়ে 'সবুজ পত্রে' প্রকাশার্থ প্রেরিত হইয়াছিল। প্রকাশিত না হওয়ায় লেখক 'সাহিত্যে' প্রকাশার্থ প্রেরণ করিয়াছেন।—সাহিত্য-সম্পাদক।

সমাজের জন্য সেই সমাজের প্রতিবেশ-প্রভাব অনুসারে সুনীতি সকল রচিত হইয়া থাকে ; এ রচনা মনুষ্যবিশেষের স্বেচ্ছাকৃত নহে, বিশেষ বিশেষ অবস্থায় পড়িয়া, বিশেষ বিশেষ সমাজে বিশিষ্ট নিয়ম সকল প্রচলিত হইয়া থাকে; কাজেই বাইবেলের দোহাই দিয়া কোনও সামাজিক নিয়মকে নিত্য-সিদ্ধ বলা ঠিক নহে।

(২) শান্তির সময় সভ্যতার বন্ধনে সমাজ প্রায় ষোল আনাই অস্বাভাবিক হইয়া উঠে। সৌজন্য, শিষ্টাচার, সমাজে আদানপ্রদানের বাঁধাধরা নিয়ম, এ সবই artificial বা অপ্রকৃত হয় ; তাই শান্তির সময় যে সাহিত্যের সৃষ্টি হয়, মনুষ্য-চরিত্রের বিশ্লেষণ করিয়া যে গদ্য পদ্যের সৃষ্টি হয়, তাহা সহজ বা স্বাভাবিক নহে। যাহা সহজ বা স্বাভাবিক নহে, রুশো বলিয়াছেন, তাহা কোনও সমাজেই চিরস্থায়ী হইতে পারে না। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে ফ্রান্সে, ইংলণ্ডে ও জার্ম্মাণীতে যে সাহিত্যের, যে নীতিতত্ত্বের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা এই যুদ্ধের প্রথম তাপেই উড়িয়া গিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য ও সভ্যতা এই যুদ্ধের পরে আর ইয়ুরোপ-সমাজে গ্রাহ্য হইবে না ; তবে যেটুকু থাকিয়া যাইবে, সেটুকু মানবসমাজে সনাতন সাহিত্য ও ধর্ম্ম।

জীন বেঞ্জামিনের এই দুই তত্ত্ব লইয়া ফ্রান্সে এবং মার্কিণ দেশে খুব আলোচনা চলিতেছে। ইহার উপর ইটালীয় মনীষী গাল্লিয়েনী ফেরেরো আরও যে সকল নূতন তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহারও একটু পরিচয় দিব। যুদ্ধের প্রথমেই ফেরেরো যে অপূর্ব্ব সন্দর্ভ লিখিয়াছিলেন, তাহা ভাষান্তরিত করিয়া 'সাহিত্যে'র পাঠকগণকে উপঢৌকন দিয়াছি। তাহার পর তিনি অনেকগুলি নূতন কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন—(ক) ইহা রাজায় রাজায় যুদ্ধ নহে, শতাধিক বৎসরের পরে ইহা ইয়ুরোপের আর একটা সর্ব্বব্যাপী রাষ্ট্রবিপ্লব; ফরাসী বিপ্লবের সময় সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার ধ্বজা তুলিয়া জাতির নিম্নস্তরের সকলে মাথা তুলিয়াছিল, ইয়ুরোপের সামাজিক স্তরবিন্যাসের একটা উলট-পালট ঘটিয়াছিল। রুশো, ভল্‌টেয়ার, ডিডেরো প্রভৃতি Encyclopœdist এন্‌সাইক্লোপিডিষ্টগণ ফ্রান্সকে যে নূতন শিক্ষায় প্রমত্ত করিয়াছিলেন, তাহার ফলে ফরাসী জাতির নিম্নস্তরের সকলে সর্ব্ব সমন্বয়ের সাধন করিবার জন্য মাথা তুলিয়া উঠিয়াছিল—সেই সমন্বয় সাধিবার জন্য নেপোলিয়ানের উদ্ভব। শক্তি ছাড়া কর্ম্ম হয় না ; শক্তি না ফুটিলে পুরাতন স্তরকে তুলিয়া ফেলিয়া নীচের নূতন স্তরকে উপরে রাখা যায় না। সমীকরণের জন্য সেই শক্তির অবতারস্বরূপ নেপোলিয়ানের উদ্ভব হইয়াছিল—নেপোলিয়ান ফরাসী বিপ্লবের শক্তিধর পুরুষ ; পরিণামে নেপোলিয়ান পরাজিত হইয়াছিলেন বটে ; কিন্তু যে সমীকরণের মহামন্ত্র লইয়া ইয়ুরোপকে ভাঙ্গিয়া গড়িবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, সে মন্ত্র নিষ্ফল হয় নাই। ফরাসী বিপ্লবের মহামন্ত্রে ইংলণ্ড, জার্ম্মাণী, অষ্ট্রীয়া, ইটালী, সবই সজীব হইয়া উঠিয়াছিল। শত বৎসরের শান্তির পরে সে সমন্বয়ে বৈষম্য দেখা দিয়াছে, তাই আবার নূতন যুগবিপ্লব উপস্থিত।

(খ) ফরাসী বিপ্লবের যেমন মন্ত্রদাতা গুরু ছিলেন রুশো ভল্‌টেয়ার প্রভৃতি, তেমনই জার্ম্মাণ 'কুলটুরে'র মন্ত্রদাতা গুরু ক্লজউইচ, ভন রূণ, ত্রিৎস্কে, নীজ্‌স্ প্রভৃতি। নীজ্‌স্ বলেন—শক্তি সকলের সার, শক্তিধর পুরুষ মনুষ্যত্বের সার। অতিমানুষপ্রভাবশালী পুরুষই সমাজের নেতা হইবার যোগ্য; সমন্বয় বা সমীকরণ, এ সব বাজে কথা, ধোঁকার টাটীমাত্র। কেবল মনুষ্য-সমাজ কেন, জীব-সমাজেও অসাধারণ শক্তিশালীরই প্রভাব অধিক। শক্তিধরের দ্বারাই সমাজ

শাসিত হইয়া থাকে, সমাজ নূতন আকার ধারণ করে। ডিমক্রেসী বা গণতন্ত্রবাদ বাজে কথা, যাহাকে আমরা ডিমক্রেসী বলিয়া সম্মান করি, তাহাতেও শক্তিধরের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়; কারণ, যিনি রাষ্ট্রপতি বা প্রেসিডেণ্ট হন, তিনি শক্তিধর না হইলে এ.পদ পাইতেই পারেন না—তার পর পার্লামেণ্টে, ক্যাবিনেটে, সর্ব্বত্রই শক্তিধরের আদর ফুটিয়া উঠে। জাতি-বর্ণ-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে শক্তিধরের আদর ফুটিবার জন্যই ফরাসী বিপ্লব হইয়াছিল। এক এক যুগে, এক এক কালে, এক এক রকমের শক্তির আদর হইয়া থাকে; কখনও বা ব্রাহ্মণ-শক্তির আদর হয়, তখন ব্রাহ্মণ বা পাদরী সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করে; কখনও বা ক্ষাত্র-শক্তির আদর হয়, তখন বীর যোদ্ধা শক্তিশালী পুরুষের আদর হইয়া থাকে, তাঁহারাই দেশের রাজা ও নেতা হন; কখনও বা বৈশ্য-শক্তির আদর বাড়ে, তখন ধনবান্ ও ব্যবহারাজীবের পদগৌরব বাড়িয়া যায়। এ সবই একটা ঢংমাত্র, এক একটা আবরণ দিয়া শক্তির আদরমাত্র—সকল আবরণের ভিতরেই শক্তি-পূজা রহিয়াছে—যিনি শক্তিধর, তিনিই পূজ্য; যিনি সর্ব্বশক্তিধর—তিনি Super-man বা অতি-মানুষ। সুতরাং যাহাতে সমাজে Super-manএর সৃষ্টি হইতে পারে, তাহাই করিতে হইবে। যে পদ্ধতি অনুসারে Super-manএর উদ্ভব হয়, নীজস্ তাহাকেই 'কুলটুর' বলিয়া থাকেন—এই কুলটুরই স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিবার জন্য জার্ম্মণজাতির ঘাড়ে চাপিয়া ইয়ুরোপকে নূতন পথ দেখাইতে উদ্যত হইয়াছে।

এখানে জিমারম্যানের তিনটি সিদ্ধান্তের আবৃত্তি করিতে হইবে। জিমারম্যান সংস্কৃতজ্ঞ,জার্ম্মান পণ্ডিত; তিনি তন্ত্রের সিদ্ধান্ত সকল উদ্ধৃত করিয়া, এমন কি, ভাগবতের শ্লোকও তুলিয়া, বলিয়াছেন যে—(ক) একের দ্বারায় বহু পরিচালিত হয়; অর্থাৎ, এক একটা মানুষের মত মানুষ জন্মিয়া সমাজের কোটী কোটী নরনারীকে এক একটা নূতন ভাবে নূতন রকমে গড়িয়া তুলিয়াছে। এইখানে জিমারম্যান একটি মজার কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন, যাহাকে তোমরা জাতি বা জনসঙ্ঘ বল, তাহা ত শূন্যগর্ভ all-cyphers; এক জন তাহাদের মধ্য হইতে ঠেলিয়া উঠিয়া digit বা অঙ্কে পরিণত হয়। সেই একের দক্ষিণে বা বামে এই শূন্য সকল সাজাইলে এক হইতে এক কোটী দশ কোটী শতকোটী হইয়া যায়, কিন্তু শূন্যের বাম ভাগে এক পড়িলে একও শূন্য হইয়া যায়—এই শূন্য সকলকে বামে বা দক্ষিণে রাখিবার পদ্ধতির উপরই একের পুরুষকার ফুটিয়া উঠে। শ্রীকৃষ্ণ ভারতবর্ষের এক ও অদ্বিতীয় পুরুষ; তিনি বাম কৌরবগণকে নষ্ট করিয়া অনুকূল পাণ্ডবগণকে দক্ষিণে রাখিয়া নিজেকে শতকোটীতে পরিণত করিয়াছিলেন। এই বাম শূন্যগুলিকে অপসারণ করাই পুরুষার্থের পরিচায়ক। এই পুরুষার্থের পরিচয় দিবার জন্যই, জিমারম্যান বলেন, জর্ম্মান জাতির উদ্ভব হইয়াছে।

(খ) ফরাসী বিপ্লবের পর মুখে বহুর আদর করিয়া, বাম ও দক্ষিণের বিচার না করিয়া, যে শূন্যগর্ভ লোকসঙ্ঘকে ফুলাইয়া তোলা হইয়াছিল, তাহার ফলে slave civilisation, slave morality, slave literatureএর সৃষ্টি হয়; উহাতে মানববিশিষ্টতার উন্মেষ সম্ভবপর হয় নাই; কিন্তু তবুও মাঝে মাঝে মানুষের স্বাভাবিক বিশিষ্টতা ফুটিবার চেষ্টা করিয়াছিল। স্বভাব নিজের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য Browning, Grant Allen, Ibsen, Zola,ব্যালজ্যাক প্রভৃতির মনীষার মধ্য দিয়া কাজ করিয়াছিলেন। পরে Biology বা জীবতত্ত্বের আলোচনা করিয়া ভারত-

এ সকল কথা ফ্রান্স ও ইংলণ্ড মুখে গ্রাহ্য না করিলেও, রকমফের করিয়া ইহার অনেকটা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। অধ্যাপক জ্যাকস্ স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, এই যুদ্ধের পর ইংরেজ ও ফরাসী পক্ষ জয়ী হইলেও, জার্ম্মান কুলটুরের অনেক সিদ্ধান্ত তাঁহাদিগকে অবলম্বন করিতে হইবে। একটা দৃষ্টান্তের কথা বলি—একে ত যুদ্ধের পূর্ব্বেই ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে নর অপেক্ষা নারীর সংখ্যা পঞ্চাশ লক্ষেরও অধিক ছিল; তখনই সকল নারীর বিবাহ হইতেছিল না। যুদ্ধের পর খুব কম করিয়া ধরিলেও প্রত্যেক পাঁচটী নারীর নিমিত্ত একটী নর সরবরাহ করা যাইবে কি না সন্দেহ। এই যুদ্ধে একটা কথা স্পষ্টীকৃত হইয়াছে যে, সৃষ্টিধর বংশধরের সংখ্যা অধিক না হইলে, প্রত্যেক গৃহস্থ বহু পুত্রের পিতা না হইলে, জাতিকে বিশিষ্টতাসমন্বিত করিয়া রক্ষা করা কঠিন হইবে। অতএব বংশবৃদ্ধির জন্য, জাতির বিশিষ্টতা-রক্ষার জন্য, বহু-বিবাহ প্রয়োজন হইবে। বহুবিবাহ যে কর্ত্তব্য, এইটুকু বুঝাইবার জন্য ইহারই মধ্যে বহু পুস্তক পুস্তিকা রচিত হইতেছে; সুতরাং পরে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জার্ম্মানীতে বহুবিবাহ প্রথা অবলম্বন করিতেই হইবে। তখন খৃষ্টান ধর্ম্মের অনুশাসন কোথায় থাকিবে? তখন মর্ম্মানদের মত বাইবেলের উক্তির নূতন ব্যাখ্যা করিয়া সমাজে বহুবিবাহ চালাইতে হইবে। হিন্দু নীতিশাস্ত্রে লিখিত আছে, মনুর ধর্ম্ম-শাস্ত্রে সে কথার সমর্থন করিয়া প্রতিধ্বনি করা হইয়াছে যে, পুত্রের জন্যই ভার্য্যার প্রয়োজন—এ কথাটা ইয়ুরোপ এত দিন হেয় বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছিল; নীজস্ প্রেয় বলিয়া অবলম্বন করিয়াছিলেন, এবং জার্ম্মান জাতিকে ঐ নীতি-অবলম্বনে শিক্ষা দিয়াছিলেন। এই যুদ্ধের পর ফ্রান্স ও ইংলণ্ডকেও এই নীতি অবলম্বন করিতে হইবে। তখন খৃষ্টান সভ্যতার অনুশাসন কোথায় থাকিবে? এই রকমে এই যুদ্ধের পর পুরাতন অনেক ভাবের ওলট-পালট ঘটিবে। যাহা নিত্য সত্য, যাহা মনুষ্যের স্বভাবজ, যাহা সমাজরক্ষার জন্য অতি প্রয়োজনীয়, মুখ ফুটিয়া সেই সব কথা বলিবার চেষ্টা ইয়ুরোপ এইবার করিবে; সে চেষ্টার ফলে সাহিত্যের আকারও পরিবর্ত্তিত হইবে।

এই যুদ্ধের পরে ইয়ুরোপের সভ্য-সমাজে নীজস্-ব্যাখ্যাত বিভূতিবাদের আদর হইবে—যাহার বিভূতি আছে, যিনি শক্তিধর পুরুষ, তিনিই সমাজের শ্রেষ্ঠ হইবেন। সমাজ artificiality ছাড়িয়া, লেফাফা-দুরস্ত ভব্যতার আবরণ ছাড়িয়া, যাহা সহজ ও সরল, সেই পন্থা অবলম্বন করিবার চেষ্টা করিবে। সে পন্থা অবলম্বন করিতে হইলে পুরাতন বিধি-নিষেধের বন্ধন ছিন্ন করিতে হইবে; তাহা হইলেই ইয়ুরোপ নূতন আকার ধারণ করিবে। সে নূতন আকারে পুরাতন সাহিত্য টিকিবে না; কারণ, সে নূতন আকারে পুরাতন সভ্যতা রহিবে না। কতটা পুরাতন যাইবে বা নষ্ট হইবে, কতটা পুরাতন নূতন আকারে থাকিবে, তাহা ঠিক করিয়া এখন বলা যায় না। তবে ১৯১৪ সালের অগষ্ট মাস পর্য্যন্ত যে ইয়ুরোপ ছিল, জগতের আদর্শ হইয়াছিল, যুদ্ধের পরে সে ইয়ুরোপকে আর কোথাও খুঁজিয়া পাইবে না। এইটুকু বুঝিয়াই ফরাসী মনীষী 'লাবোরী' সাহিত্যের মূলতত্ত্ব-অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তিনি বলেন যে, সেক্সপিয়রের যুগ হইতে জোলার যুগ পর্য্যন্ত যে ধর্ম্মশূন্য নবীন সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, যাহার ভিতরে ভিতরে খৃষ্টান-নীতি অনুস্যূত থাকিলেও, প্রকাশ্যে ধর্ম্মকর্ম্ম হইতে স্বতন্ত্র ছিল, তাহার অনেকটাই বোধ হয় সত্বরই নষ্ট হইয়া যাইবে। লাবোরী বলেন—Iconoclasm এর উপর, ধ্বংসবাদের উপর যে সাহিত্য যে সমাজ প্রতিষ্ঠিত, তাহা এত বড় ধাক্কা সহিতেই পারিবে না। প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম

Iconoclasm বা ধ্বংসবাদের নামান্তরমাত্র। সেই প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মের প্রভাবে যাহা সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা টিকিতেই পারে না ; কারণ, প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম is a negation of religion, উহা প্রকৃত ধর্ম্মের অপহ্নবমাত্র। ত্রিৎসকে হইতে নীজ্‌স্‌ পর্য্যন্ত জার্ম্মান মনীষিগণ এই Iconoclasm বা ধ্বংসবাদের দোষ লক্ষ্য করিয়া একটা Positive কিছু রচিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। কম্‌তের Positivism বা কোমত-তন্ত্র লোকসংঘের কল্যাণের উপর প্রতিষ্ঠিত; নীজ্‌সের Positivism অতিমানুষ, সর্ব্বশক্তিধর পুরুষের উন্মেষ-পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত। নীজ্‌স্‌ স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, লোকসংঘের কল্যাণ, লোকসংঘের দ্বারা সাধিত হয় না ; কল্যাণদর্শী পুরুষের দ্বারাই সাধিত হয়। যেমন দূরবীন না হইলে অতি দূরের জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর গতি দেখিতে ও বুঝিতে পারা যায় না, দূরবীনধারী মনুষ্য গণিতাধ্যাপক না হইলে সে দূরস্থ জ্যোতিষ্কের গতি হিসাব করিয়া বলিতে পারে না, তেমনই আত্মবিৎ, সমাজতত্ত্ববিৎ পুরুষ না হইলে, শক্তিসাধনার সাহায্যে সমাজের কল্যাণসাধন করিতে পারে না। কম্‌তে তেত্রিশ কোটী দেবতার পূজা করিয়াছেন ; নীজ্‌স্‌ একমেবাদ্বিতীয়ম্‌ অব্যয় অদ্বয় পুরুষের নিকট হেটমুণ্ড হইয়া তাঁহার শক্তি যাচ্‌ঞা করিয়াছেন। নীজ্‌সের সিদ্ধান্তের প্রভাব কতকটা অপরিহার্য্য ; কারণ, নীজ্‌সের শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া আজ আট কোটী জার্ম্মান নরনারী শস্ত্রপাণি হইয়া জগৎ জয় করিতে উদ্যত হইয়াছে—ইহারা পরাজিত হইলেও নেপোলিয়ানের মত ইয়ুরোপে নূতন ভাব ছড়াইয়া দিতে ভুলিবে না। ইংলণ্ড ফ্রান্স সমবেত চেষ্টায় জার্ম্মানীকে ধূলিসাৎ করিলেও জার্ম্মানীর কুলটুরকে মাথায় করিয়া লইতে বাধ্য হইবে। তাই সে অঘটন ঘটিবার পূর্ব্বে পুরাতন যাহা ছিল, তাহার পরিচয় লইবার জন্য মনীষী লাবোরী ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সাহিত্যের বিশ্লেষণ করিতেছেন। এখন তিনি আমাদের একটা পুরাতন নীতিকথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলেন যে, পুরাতনকে পরিহার করিবার পূর্ব্বে তাহার সম্যক পরিচয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। নূতনকে অবলম্বন করিবার পূর্ব্বে তাহারও পরিচয়-গ্রহণ কর্ত্তব্য ; কারণ, প্রতিবেশপ্রভাব ছাড়া সমাজে কোনও রীতিপদ্ধতি দীর্ঘকালস্থায়ী হইয়া প্রচলিত থাকে না। যে প্রতিবেশপ্রভাবে নূতন সমাজে প্রচলিত হইয়াছিল, ঠিক সে প্রতিবেশপ্রভাবে সেই নূতন পুরাতনের আকার ধারণ করিয়া পরিহারযোগ্য হয় নাই—অতএব দুই প্রতিবেশপ্রভাবের তুলনায় সমালোচনা করিতে হইবে, তবে পুরাতনকে পরিহার করা চলে। তেমনই যিনি নূতন, নবীনতার মনোমোহন আকার ধারণ করিয়া সমাজে প্রবেশ লাভ করিবার চেষ্টা করিতেছেন, কোন অবস্থায় পড়িয়া তাঁহাকে এতটা নূতন দেখিতেছি, তাঁহার নবীনতায় এতটা আকৃষ্ট হইতেছি, তাহা বুঝিতে হইবে। এই যুদ্ধ শেষ হইবার পূর্ব্বে, এই বুঝাপড়াটা শেষ করিতে পারিলে, নূতন অবস্থায় পুরাতন দেবতার বিসর্জ্জন ও নূতন দেবতার বোধন করিতে আমরা সম্যক্‌ পারিব। আধুনিক War literatureএর ইহাই মূল তত্ত্ব।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী। চৈত্র।—প্রথমেই শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "দেনা পাওনা"—শালতামামীর গান; চৈত্রের উপযোগী বটে। এ ক্ষেত্রে মহাজন সার্ রবীন্দ্রনাথ, খাতক—দুর্ভাগ্য শ্রীমান্ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর। কবি বলিতেছেন,—

"পাখীরে দিয়েছ গান, গায় সেই গান,
তার বেশী করে না সে দান।
আমারে দিয়েছ স্বর, আমি তারো বেশী করি দান,
আমি গাই গান।"

খুব বদান্যতা, সন্দেহ কি? কিন্তু কবির অনুকরণে, বিধাতা যাহাকে যাহা দান করিয়াছেন, সে যদি তাহার অতিরিক্ত দান করিতে চাহে, তাহা হইলে দুনিয়ার অবস্থাটা সম্ভবতঃ সঙ্গীন হইয়া উঠিবে। দ্বিতীয় স্তবকে কবি বলিতেছেন,—

"বাতাসেরে করেছ স্বাধীন,
সহজে সে ভৃত্য তব বন্ধনবিহীন।
আমারে দিয়েছ বোঝা,
তাই নিয়ে চলি পথে কভু বাঁকা, কভু সোজা।"

কিন্তু আমাদের মনে হয়, কবিবরের বাতাসের উপর হিংসা করিবার কোনও কারণ নাই। নিজের চলনটুকু যখন লক্ষ্য করিয়াছেন, তখন তাহার কারণটুকু তলাইয়া দেখিলে আর এতটা আক্ষেপের অবকাশ থাকিত না। আজকাল 'ঘরে বাইরে' তাঁহার কবিত্বের যেরূপ বিকাশ দেখা যাইতেছে, তাহাতে—ঘরের লোক না হউক—বাহিরের অনেকেই বুঝিয়াছে, যিনি 'আলোকে আঁধারে মিলাইয়া এ ধরণীরে' গড়িয়াছেন, তিনি সম্প্রতি কেবল 'একটি স্বাধীন বাতাসেরে' নয়—উনপঞ্চাশটি বায়ুকেই তাঁহার কবিত্বের ও সংস্কারের খিদ্‌মতে নিযুক্ত করিয়াছেন। এই গানেই তাহার প্রমাণ আছে—

"আর সকলেরে তুমি দাও।
শুধু মোর কাছে তুমি চাও।"

তোমাকে, আমাকে, তাহাকে, ইহাকে, উহাকে—সকলকে খয়রাৎ করিয়া, ফকীর হইয়া, জগৎপাতা অবশেষে সার্ রবীন্দ্রনাথের সিংহদ্বারে দাঁড়াইয়া বলিতেছেন,—'জয় রাধে কৃষ্ণ! দুটি ভিক্ষে পাই বাবা!' সাধকের এমন স্পর্দ্ধা ভারতের তপোবনের অন্তর্গত বঙ্গ নামক শান্তরসাস্পদ আশ্রমপদেই সম্ভব! এই বাঙ্গালার হালিসহরের জঙ্গলে বসিয়া রামপ্রসাদ গায়িয়াছিলেন, বা চাহিয়াছিলেন,—

'আমায় দাও মা, তবিলদারী!'

যেমন সাধক, তেমনই প্রার্থনা! এই কয়েক বৎসরে বাঙ্গালী সাধনার ক্ষেত্রে কত দূর অগ্রসর হইয়াছে, রবীন্দ্রনাথই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। দিন-দুনিয়ার মালিক 'সিংহাসন হতে

মেমে' নাইট্‌-দাতার দান লইয়া যাইতেছেন! আর তাই কি সোজা দান?—এক রাশি সবুজ পত্র! বাস্তবিক, এই বহুরূপী বিধাতার উপর রাগ হয়। এই শস্যশ্যামল দেশের সমস্ত সবুজ পাতায় পেট ভরিল না, হ্যাংলার মত, ক্যাংলার মত কতকগুলি অকালপক্ক কৃষ্ণের জীবের একমাত্র ভরসা—খোরাক সবুজ-পত্র ভিক্ষা করিতে আসেন! যাহা হউক, এত দিনে সার্ রবীন্দ্রনাথের হাত খুলিয়াছে। ব্যোমকেশ নাই; রামেন্দ্র আছেন। পরিষদের চাঁদার খাতাখানি এই সময়ে সম্মুখে ধরুন না!—শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী "সেকেলে কথা" আরম্ভ করিয়াছেন। কেমন করিয়া কি ভাবে যোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন। গল্প শুনিবার সময় কেবল 'হুঁ' দিয়া যাইতে হয়; যদি কেহ 'খুঁট' ধরে, তাহা হইলে গল্প হয় না। অতএব, আমরা খুঁট ধরিয়া রসভঙ্গ করিব না। কিন্তু উপসংহারে যে দুইটি 'সত্য'—একটি ধ্রুব ও একটি সার,—দেখিতেছি, গল্পের খাতিরেও তাহা বেমালুম গেলা অসম্ভব।—(১) "তাঁহার (শ্রীযুত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের) প্রাণপণ উদ্যম এখন সার্থক, আশৈশব জীবনের উদ্দেশ্য সফল, সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে মহিলোন্নতিতে বঙ্গদেশ আজ সর্ব্বপ্রধান।" (২) "এইখানে একটি কথা না বলিলে সত্যের অবমাননা ঘটে। যদি স্বামী মেজদাদার সহায়তা না করিতেন, তাহা হইলে এত শীঘ্র স্ত্রীজাতির এত উন্নতি হইত কি না সন্দেহ।"—'মহিলোন্নতি'তে বঙ্গদেশ আজ সর্ব্বপ্রধান কি না, সে বিষয়ে অবশ্য নানা মুনির নানা মত সম্ভব। সেন্সসের রিপোর্টে স্ত্রীশিক্ষার যে অবস্থা দেখা যায়, তাহাতে এই 'মহিলোন্নতি'র বিশেষ কোনও প্রমাণ নাই। 'আশৈশব জীবন' অবশ্য বাঙ্গালা দেশের নব-ভারতীর নিজস্ব।—সত্যের সম্মান বজায় থাকুক, কোন্ পাষণ্ড এমন সদিচ্ছায় সহানুভূতি না করিবে? কিন্তু 'স্বামী মেজদাদার সহায়তা' করিলেও, 'এত শীঘ্র' আমাদের স্ত্রীজাতির যে 'এত উন্নতি' হইয়াছে, তাহা ত স্বীকার করিতে পারি না। যে দেশের বালিকা, কিশোরী, যুবতী প্রৌঢ়া, প্রভৃতি অকারণে, স্বল্প কারণে, বা তুচ্ছ কারণে, জীবনের উদ্দেশ্য ভুলিয়া, শাড়ীতে কেরোসিন ঢালিয়া পুড়িয়া মরিতেছে, সে দেশে স্ত্রীজাতির কতটুকু উন্নতি হইয়াছে? শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর সাক্ষ্যে আশ্বস্ত হইয়া আমরা হাল ছাড়িয়া না দি, এই জন্য এইটুকু বলিতে হইল। আর এক কথা, এক জন মহিলা 'দড়বড়ি ঘোড়া চড়ি কোথা তুমি যাও রে' বলিবার অবকাশ দিলে, বা দশ জন মহিলা স্বাধীনতা লাভ করিলে, অবশিষ্ট পনের আনা তিন পাই তিন কাক তিন ক্রান্তি নারীরও উন্নতি হইয়াছে, এমন কল্পনা করা যায় না। এই হিন্দুর দেশে উহাই নারীজাতির উন্নতির কষ্টি-পাথর কি না, সে কথা এ ক্ষেত্রে নাই বা তুলিলাম। সত্যের অনুরোধে আর একটি কথাও বলিতে হইতেছে;—ব্রাহ্মসমাজে প্রতীচ্য ভাবটা প্রথমে বোধ হয় কেশবচন্দ্রই আমদানী করিয়াছিলেন। সে সমাজে অন্য factorsও হয় ত ছিল। প্রথম আলোকে দিশাহারা হইবার কথাও বটে, এবং অনভ্যাসের ফলেও বটে, দেখিবার অবকাশ থাকিলেও, বাড়ীর বাহিরের কিছু,—এমন কি, কেশবচন্দ্রের মত বিরাট পুরুষকেও, লেখিকা দেখিতে পান নাই। এই আট কোটী অধিবাসীর দেশে দুই দশটি পরিবারে স্ত্রী-শিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতার আদর্শ চরিতার্থ হইলেই, সমগ্র দেশ তাহার ফলভাগী হয় না, পিরালী-সমাজেই তাহার প্রমাণ আছে। পাথুরিয়াঘাটার ও দর্পনারায়ণ ঠাকুরের ষ্ট্রীটের ঠাকুরবাড়ীতে এখনও 'অবরোধ' লাল পাগড়ী বাঁধিয়া, বেগুনী মখমলে মোড়া ভোঁতা তরোয়ালের

খাপখানি সদর্পে ধরিয়া, যোড়াস াঁকো হইতে নির্ব্বাসিত ঘেরাটোপ-ঘেরা পালকীর পাশে দাঁড়াইয়া আছে। সুতরাং বলিতে হইতেছে, চ্যারাগের নীচেই অন্ধকার। দেবীর গল্পটি বেশ, কিন্তু 'অন্তার্থঃ'-টুকু নিতান্তই টানিয়া বোনা।—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নিক্রমণ' নিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে, ইহাই মঙ্গল। মাথায় সঞ্চিত থাকিলে একটা 'বিতিকিচ্ছি কাণ্ড হতো'। অবনীন্দ্র বাবু আমাদের সেই চিরপরিচিত, 'ধুনুরী'-ইত্যভিহিত নিপুণ আর্টিষ্টদের মত ভাব, ভাষা ও অলঙ্কার—তথা প্রচলিত রচনারীতিকে মহাপরাক্রমে একেবারে তুলো ধুনিয়া দিয়াছেন। গেটের মত আমরাও বলিতে পারি,'ইহা বলিলেই সকল বলা হইল।' শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ মিত্রের 'ভারতের আয়-ব্যয়' ভারতের আর্থিক অবস্থার বিবরণ। যেন পথ ভুলিয়া 'ভারতী'র আত্মীয়-সভার বৈঠকখানায় আসিয়া পড়িয়াছে। শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার 'পরিচয়ে' প্রশ্ন করিয়াছেন,'কোথায় তোমার সঙ্গে আমার কবে প্রথম পরিচয়?' সর্ব্বনাশ! তাহা কি এতকাল পরে সহসা বলা যায়? যদি বলি, 'রামচন্দ্র যখন লঙ্কা জয় করিয়া অযোধ্যায় ফেরেন, তখন তাঁহার পুর-প্রবেশ-উৎসব দেখিবার জন্য অযোধ্যার দশরথ পার্কের দক্ষিণে, রামচন্দ্র রোর ফুটপাথে দাঁড়াইয়াছিলাম। আপনি পশ্চাৎ হইতে আমাকে বেজায় রকম ধাক্কা দিয়া কোশল মিলিশিয়ার সৈন্যদের বল্লমের উপর ফেলিয়া দিবার চেষ্টায় ছিলেন; অগত্যা বচসা, এবং মূলে ভাবী বাঙ্গালী-জন্মের ধাতু-প্রকৃতি নিহিত থাকায়, উভয় পক্ষেরই সুবিধার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা দেখিয়া, অবশেষে আপোষে সন্ধি। তৎসূত্রেই আপনার সহিত আমার প্রথম পরিচয়। তখন আপনার নাম ছিল, বামদেব। আমার নাম কি ছিল, বলুন দেখি?' তাহা হইলে বিজয়বাবু কি উত্তরে আর একটা কবিতা লিখিবেন?—তার পর, "মন ভুলায়ে, হাত বুলায়ে, কোথায় কাকে সেধেছি?' এ প্রশ্ন কি মাসিক পত্রে করিতে আছে? এ যে বরযাত্রী-ঠকানো প্রশ্নকেও লজ্জা দিতেছে! বড় বড় 'ইন্‌ফর্ম্মার', এমন কি, খোদ টেগার্ট সাহেবও আপনার এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিবেন না, তাহা আমরা শপথ করিয়া বলিতে পারি। শ্রীকালিদাস রায়েরও চন্দ্রের মত দুই পক্ষ আছে। কবিত্বের হ্রাস বৃদ্ধি হয়। এটা কৃষ্ণপক্ষের কবিতা। যতি পর্য্যন্ত নাই। 'যবনীরে চুম্ব দিলে' 'আদর্শ মহারাজ' হওয়া যায়। গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ যদি আশমানীকে কোনও গতিকে একটা 'চুম্ব' দিতে পারিত, তাহা হইলে আদর্শ মহারাজ হইত। 'যবনেরে বক্ষে নিলে' আদর্শ সম্রাট্ হওয়া উচিত। কিন্তু কবি বোধ হয়, কবিতায় তাহা বসাইয়া দিবার 'বাগ' পান নাই।—শ্রীনলিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় "ফাল্গুনী"তে রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীকে মনের সাধে ভ্যাংচাইয়া লইয়াছেন। যথা, "মৃত্যুর দিক্‌টা সত্য হ'ত যদি আমি একা আমার মধ্যে বেঁচে থাকতুম।" বাস্তবিক, এ বাড়ীর বারান্দা থেকে ও বাড়ীর লোকদের ভ্যাংচাবার সৌভাগ্য বাহিরের লোকের ভাগ্যে পড়ো অবস্থাতেও প্রায়ই ঘটে না। নলিনী বাবু বাহাদুর বটে। শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের "সমসাময়িক ভারতের নৈতিক সভ্যতা"য় বিদেশীয়া আমাদের কি চোখে দেখে, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। বাঙ্গালা সাহিত্যে এমন কর্ম্মযোগী আর দ্বিতীয় নাই। যথাসাধ্য মাতৃভাষার সেবাই যাঁহার জীবনের ব্রত, এবং আত্মবিস্মৃত হইয়া চিরজীবন যিনি সেই সাধনায় মগ্ন, তাঁহার আদর্শ এ দেশে উজ্জ্বল হইয়া থাকুক। এই অহং-ক্ষেত্রে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিনয়ের মাধুর্য্যটুকু অমূল্য বলিয়া মনে হয়। শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের "মণি-প্রদীপ" বোধ হয় একটি গল্প। আখ্যানবস্তু অত্যন্ত অল্প। রচনা-রীতি

ঈশা-অনুসরণের ন্যায় শ্বশুর-অনুসরণে চলিয়াছে; ভবিষ্যতে টেক্কা দিতে পারিবে। "সে যদি হঠাৎ একদিন প্রভাতে এই বসন্তের নব মল্লিকার মত তার সমস্ত রূপ-রস-গন্ধ-আনন্দ নিয়ে আমার চোখের সামনে দক্ষিণে বাতাসে ফুটে উঠত"—বাস্তবিক, 'তা হলে কতো মজাই হোতো'; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, শব্দ স্পর্শ দুটি বাদ গেল কেন?—"সেই হঠাতের ধাক্কায় সেই একটুখানির মধ্যে তার সবটুকু আমার হৃদয় দেখতে পেত।" হঠাতের ধাক্কাই ত সাংঘাতিক, তার উপর আবার হৃৎপিণ্ডের চক্ষুদান! কি হৃৎপিণ্ড-মথিনী বর্ণনা! শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "পূর্ণের অভাব" বিষম সমস্যা বটে, কিন্তু চর্ব্বিতচর্ব্বণ। শ্রীবিনয়কুমার সরকারের "আমেরিকায় ভারতীয় শ্রমজীবী" সুখপাঠ্য, তথ্যপূর্ণ সন্দর্ভ। শ্রীপঞ্চানন নিয়োগীর "মান্দ্রাজ বিজ্ঞান-সম্মিলন" উল্লেখযোগ্য। লেখক ইচ্ছা করিলে অনেক কাজের কথা শুনাইতে পারিতেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানের দিক্ মাড়ান নাই। শুনিতে পাই, শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকেই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কবিযশের ও সাহিত্য-সাম্রাজ্যের কবিতা প্রেসিডেন্সীর উত্তরাধিকারী করিয়াছেন। "জর্দ্দা পরী" ও "নীল পরী" পড়িয়া মনে হইল, 'শিষ্যবিদ্যা গরীয়সী', এবং 'বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়'। সুকুমার ছবির এমন জবাই আর কোথাও দেখি নাই! "নীল-পরী"তে 'কাণে সুনীল অপরাজিতা পাপড়ি চুলে জাফরাণের'—আবার 'পিন্ধনে মেঘ-ডম্বরী'ও আছে! 'বিদায়ে নীলকণ্ঠ পাখী ক্লান্ত আঁখির শর্ব্বরী' কি কবি-কূট? ক্ষমতার এমন অপব্যবহার শোচনীয়। রবিবাবু বহুকাল পূর্ব্বে একখানা বই পড়িতে দিয়াছিলেন, তার নাম বোধ হয়—'Is Genius Insanity?' বইখানি আর একবার পাই ত বাঙ্গালা দেশে মিলাইয়া দেখি।

উদ্বোধন। চৈত্র।—"শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গে" শ্রীস্বামী সারদানন্দ 'ঠাকুর ও নরেন্দ্রনাথে'র প্রসঙ্গ বিবৃত করিতেছেন। ভগিনী নিবেদিতার "আচার্য্য শ্রীবিবেকানন্দে" লেখিকার অন্তর্দৃষ্টি, গভীর অনুভূতি, অতুলনীয় গুরুভক্তি ও অপূর্ব্ব ভারতপ্রীতির পরিচয়ে মুগ্ধ হইতে হয়। বিধাতা কি রত্নই হরণ করিলেন! ফুটিবার পূর্ব্বেই বিবেকানন্দ-কল্পতরুর পারিজাতটি তুলিয়া লইলেন। "স্বামী বিবেকানন্দের পত্র" হইতে একটু উদ্ধৃত করিলাম,—

'আমার গুরুদেব বল্তেন, হিন্দু, খ্রীষ্টান এই সকল বিভিন্ন নাম মানুষের ভিতর পরস্পর ভ্রাতৃভাব বিকাশ করবার বিশেষ প্রতিবন্ধক হবে। আগে আমাদিগকে ঐগুলো ভেঙ্গে ফেল্‌বার চেষ্টা করতে হবে।

'সেই জন্যই ত আমার একটা কেন্দ্র স্থাপন করবার জন্য এতটা আগ্রহ। সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার অনেক দোষ থাক্‌তে পারে, সন্দেহ নাই, কিন্তু উহা না হলে কিছু হবার যো নাই। আর এইখানেই আমার আশঙ্কা—আপনার সঙ্গে মতভেদ হবে। সেই বিষয়টী এই যে, কেউ কখন সমাজকেও সন্তুষ্ট করবে, অথচ বড় বড় কায করবে, তা হতে পারে না।

'লোকের ভিতর থেকে যেরূপ প্রেরণা আসে, সেইরূপ কায করা উচিত, আর যদি সেই কাযটি ঠিক ঠিক ও ভাল কায হয়, সমাজকে নিশ্চিতই—হয় ত তিনি মরে যাবার শত শত শতাব্দী পরে—তাঁর দিকে ঘুরে আস্‌তেই হবে। আমাদিগকে দেহ মন প্রাণ দিয়ে সর্ব্বান্তঃকরণে কাযে লেগে যেতে হবে। আর যত দিন পর্য্যন্ত না আমরা আর যা কিছু সব একটা—কেবল একটা

ভাবের জন্য ত্যাগ করতে প্রস্তুত হচ্ছি, ততদিন আমরা কোনও কালে আলোক দেখতে পাব না।

'যাঁরা মানবজাতিকে কোন প্রকার সাহায্য করতে চান, তাঁহাদিগকে এই সকল সুখ-দুঃখ, নাম-যশ আর যত প্রকার স্বার্থ আছে, সেইগুলির একটা পোঁটলা বেঁধে সমুদ্রে ফেলে দিতে হবে, এবং ভগবানের কাছে আসতে হবে। সকল আচার্য্যেরাই এই কথা বলে গেছেন ও করে গেছেন।'—ভাষা অবশ্য স্বামীজীর নয়, ইহা ইংরেজী পত্রের অনুবাদ।

কৈফিয়ৎ।

'সাহিত্যে'র বৈশাখ-সংখ্যা সময়মত প্রকাশ করিতে পারি নাই—তজ্জন্য আমরা দুঃখিত; কিন্তু এই বিলম্বের জন্য অপরাধী নহি। 'সাহিত্যে'র জন্য প্রসিদ্ধ গল্পলেখক শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'আধুনিক রোমিও' নামক একটী গল্প উপযুক্ত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে পূর্ব্ব হইতে আমাদের সংগ্রহ করা ছিল। ঐ গল্পটি বৈশাখের 'সাহিত্যে'র প্রায় আড়াই ফর্ম্মা হইয়াছিল। মুদ্রিত হইবার পর দেখা গেল, গল্পলেখক মহাশয় 'নিষিদ্ধ ফল' এই পরিবর্ত্তিত নামে ঐ গল্পটি চৈত্রের 'মানসী'তে প্রকাশ করিয়াছেন। প্রভাত বাবুর কার্য্য অসঙ্গত ও আইনবিরুদ্ধ হইয়াছে কি না, অন্যত্র তাহার বিচার হইবে। এ স্থলে আমাদের নিবেদন এই যে, 'মানসী'তে গল্পটি ঐ ভাবে প্রকাশিত হইবার পর আমরা ঐ মুদ্রিত ফর্ম্মাগুলি নষ্ট করিতে বাধ্য হই, এবং কয়েকটি ফর্ম্মা নূতন করিয়া ছাপিতে হইয়াছে। ইহাই আমাদের কৈফিয়ৎ। আশা করি, গ্রাহকবর্গ বিলম্বের ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।

সাহিত্য-সম্পাদক।

প্রিণ্টার—শ্রীরাধাশ্যাম দাস "ভিক্টোরিয়া প্রেস"
২নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে চিঠি লিখিবার সময় 'সাহিত্যে'র উল্লেখ করিলে অনুগৃহীত হইব।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে চিঠি লিখিবার সময় 'সাহিত্যে'র উল্লেখ করিলে অনুগৃহীত হইব।

মালদহ-জাতীয়-শিক্ষাসমিতি-গ্রন্থাবলী।

(এজেণ্টস্—চক্রবর্ত্তী চাটার্জ্জি এণ্ড কোং, ১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।)

১। অনুসন্ধান (প্রবন্ধ-গুচ্ছ) বিধুশেখর, হরিদাস, রাধাকুমুদ, রাধেশচন্দ্র, কুমুদনাথ প্রভৃতির রচনা হইতে সঙ্কলিত। মূল্য ১৲ টাকা। ২। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, ইতিহাস-শিক্ষা-প্রণালী, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য। মূল্য ৵০।

৩। শ্রীরাজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী (ক) মালদহ জেলার ভৌগোলিক বিবরণ। মূল্য ৵০। (খ) বস্তু-পরিচয় ও ইন্দ্রিয়-পরীক্ষা।

৪। শ্রীহরিদাস পালিত (ক) মালদহের গম্ভীরা—বাঙ্গালার ধর্ম্ম ও সামাজিক ইতিহাসের এক অধ্যায়। মূল্য ২৲ টাকা। (খ) মালদহের রাধেশচন্দ্র। মূল্য ।০ (গ) মালদহের কৃষি-শিল্প ও বাণিজ্য, (ঘ) বাঙ্গালার প্রাচীন পুঁথির বিবরণ।

৫। ৺রাধেশচন্দ্র শেঠ বি, এল—(ক) ঐতিহাসিক প্রবন্ধ।

(খ) মালদহ-রত্নমালা (প্রাচীন গৌড় ও পৌণ্ড্র দেশের প্রসিদ্ধ নৃপতি, সাধু, ধর্ম্মপ্রচারক, বণিক্ প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ। (গ) সেকশুভোদয়া, পাণ্ডুয়ার বড় দরগায় প্রাপ্ত শাহ জালালুদ্দিন তাব্রেজির জীবনবৃত্তান্তমূলক সংস্কৃত গ্রন্থ ; হলায়ুধ মিশ্র প্রণীত।

৬। শ্রীবিপিনবিহারী ঘোষ, বি এল—মালদহে ঐতিহাসিক অনুসন্ধান-কার্য্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

৭। নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, ভূতপূর্ব্ব 'জাহ্নবী' ও 'যমুনা' সম্পাদক—কান্তকবি রজনীকান্ত (যন্ত্রস্থ)।

৮। শ্রীভীমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ বি এ, বি এস-সি, অধ্যাপক বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট। (ক) The Economic Botany of India—২৲ টাকা। (খ) অর্থকরী উদ্ভিদ্-বিদ্যা।

৯। শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী—(ক) সৌন্দরনন্দ অশ্বঘোষ প্রণীত সংস্কৃত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ, (খ) মিলিন্দপঞ্‌হ—দ্বিতীয় ভাগ, (গ) ভিক্ষুপ্রতিমোক্ষ।

১০। শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এম্ এ (ক) অন্ন-সংস্থান (খ) ভারতের বৈষয়িক তথ্যসংগ্রহ।

শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার প্রণীত বিবিধ প্রবন্ধ

সাধনা

শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার 'সাধনা' সম্বন্ধে বলেন—"এমন গুরুতর বিষয়ে, এমন সর্ব্বজনের প্রয়োজনীয় বিষয়ে, এমন আড়ম্বরশূন্য, অলঙ্কারশূন্য, নিরেট ভাষায়, এত কথার আলোচনা,—বোধ হয় বাঙ্গালায় আর নাই। 'বাহ্য বস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচারে' নাই—'অনুশীলনতত্ত্বে' নাই—'ভক্তি-যোগে' নাই—বোধ করি আর কোথাও নাই।"

বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে চিঠি লিখিবার সময় 'সাহিত্য'র উল্লেখ করিলে অনুগৃহীত হইব।

ডোয়ার্কিনের ফোল্‌ডিং অর্গেন।

(আমেরিকান্ প্রণালীমতে প্রস্তুত হারমোনিয়ম)



যাঁহারা বক্স-হারমোনিয়ম চান না, অথচ বড় টেবিল হারমোনিয়ম যাঁহাদিগের পক্ষে তত সুবিধাজনক নহে, তাঁহাদিগের জন্যই ডোয়ার্কিনের ফোল্‌ডিং অর্গেন বাহির হইয়াছে। যন্ত্রগুলির আওয়াজ অতি মধুর, বাঁশীর আওয়াজের ন্যায় গোল। রীড উৎকৃষ্ট, ভাঙ্গিয়া বা বেসুরা হইয়া যায় না। Bellows-গুলি Rubber clothএর, সহজে খারাপ হয় না। টেবিল হারমোনিয়মের ন্যায় বাজাইতে হয়, কিন্তু আবশ্যক হইলে মুহূর্ত্তমধ্যে মুড়িয়া ফেলিয়া ছোট করা যায়। অনেক থিয়েটার ও কনসার্ট-পার্টীতে ডোয়ার্কিনের ফোল্‌ডিং অর্গেন সম্পূর্ণ সন্তোষের সহিত ব্যবহৃত হইতেছে। প্রত্যেক যন্ত্রের সহিত একটি মজবুত বাক্স দেওয়া হয়। ৩ অক্টেভ, এক সেট রীড মূল্য ৫৫ টাকা; ৩ অক্টেভ, দুই সেট রীড মূল্য ৭০ টাকা; ৪ অক্টেভ এক সেট রীড মূল্য ৭৫ টাকা; ঐ দুই সেট রীড মূল্য ৯০ টাকা। অর্ডারের সহিত অগ্রিম ২০৲ টাকা পাঠাইবেন। দক্ষিণাচরণ সেন প্রণীত হারমোনিয়ম-শিক্ষা—মূল্য দুই টাকা।

DWARKIN & Son
8, Dalhousie Square, Calcutta.
Illustrated Catalogue free on Application.

বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে চিঠি লিখিবার সময়, 'সাহিত্যে'র উল্লেখ করিলে অনুগৃহীত হইব।

সভাপতির অভিভাষণ। *

সমবেত সুধীমণ্ডলি—

আজ সাহিত্য-সভার পঞ্চদশ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে সভার সভাপতি-রূপে আপনাদিগকে সম্ভাষণ করিবার সুযোগ পাইয়া আমি আপনাকে ধন্য মনে করিতেছি। আপনারা আমাদের জাতীয় সাহিত্যের রক্ষক ও পরিপোষক। যে বাঙ্গালা সাহিত্য প্রায় পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ব্বে পল্লী-সাহিত্য বলিয়া পরিগণিত হইত, যাহার গতি পল্লীপ্রান্তবাহিনী ক্ষীণকায়া তটিনীর ন্যায় মন্থর ও তরঙ্গলীলাবিহীন ছিল, সেই সাহিত্য আজ বর্ষার উদ্দাম তরঙ্গিণীর ন্যায় কূল ছাপাইয়া ছুটিয়াছে; দরিদ্র পল্লীবাসী বঙ্গবাণীর পূজার জন্য যে ক্ষুদ্র দেউল নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, আজ তাহা গগনচুম্বী বিরাট্ মন্দিরে পরিণত হইয়াছে। আপনারা সেই বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবক। বঙ্গবাণীর একনিষ্ঠ সাধক, বঙ্গীয় সুধীবৃন্দ! সাহিত্য-সভার সভাপতিরূপে আজ আমি আপনাদের সাদর সংবর্দ্ধনা করিতেছি।

সাহিত্যসেবীদিগের সংবর্দ্ধনা।

জীবনের 'গণা' দিন অলক্ষ্যে নিঃশব্দে চলিয়া যাইতেছে—আমরা ভ্রূক্ষেপও করি না। কিন্তু যেমনই একটি বর্ষ অতীত হইয়া নূতন বর্ষের সূত্রপাত হয়, অমনই যেন আমাদের চেতনা হয়; আমরা জাগিয়া উঠি, আর গত বর্ষের লাভালাভের হিসাব করিতে বসি। আমাদের সভাসমিতির বার্ষিক উৎসব, জন্মতিথির উৎসব, এই চেতনা, এই জাগরণ। হায়, এই আয় ব্যয়ের সমাধান করিয়া কয় জনের ওষ্ঠাধরে হাস্যের রেখা পরিস্ফুট হয়? কয় জনের আয়ের অঙ্ক ব্যয়ের অঙ্ক ছাপাইয়া উঠে? লাভের আনন্দ অপেক্ষা ক্ষতির দুঃখ ও লজ্জাতেই অনেকের মস্তক অবনত ও চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া আসে, সাফল্যের উৎসাহ অপেক্ষা বিফলতার অবসাদেই অনেকের হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়ে। আমরা বন্ধুবান্ধব লইয়া উৎসব করিয়া সেই দুঃখ ও অবসাদ ভুলিতে চাহি।

সাহিত্যসভার লাভ লোকসান।

সাহিত্য-সভার ভাগ্যেও অনাবিল আনন্দ ভগবান্ লিখেন নাই। আলোচ্য

---

* সাহিত্য-সভার পঞ্চদশ বার্ষিক উৎসবে সভাপতি মাননীয় মহারাজ সার্ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে সি আই ই কর্ত্তৃক পঠিত।

বর্ষে আমরা মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন, অধ্যাপক কালীপদ বসু, সাহিত্যসংহিতার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক পণ্ডিত নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন, বাবু বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়, রায় বাহাদুর নবীনচন্দ্র দাস কবিগুণাকর, রায় হরিচরণ চৌধুরী বাহাদুর ও বাবু বটকৃষ্ণ পাল, এই কয় জন সভ্যকে হারাইয়াছি। ইঁহা-দিগকে হারাইয়া সভা যে নিরতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, তাহা বলা বাহুল্য। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন ও ৺বটকৃষ্ণ পালের ন্যায় কর্ম্মবীর আমাদের দেশে প্রকৃতই বিরল। ঢাকার সারস্বত-সমাজ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের অক্ষয় কীর্ত্তি; আর বটকৃষ্ণ পাল মহাশয়ের কর্ম্মজীবনের নিদর্শন বঙ্গের সর্ব্বত্রই বিদ্যমান। কর্ম্মের দিনে প্রকৃত কর্ম্মীর সংখ্যার হ্রাস হইতে দেখিলে হৃদয়ে স্বতঃই নিরাশা ও আতঙ্কের উদয় হয়।

নববর্ষের সঙ্গে সঙ্গে সভা তাহার চিরপোষিত আশাগুলি হৃদয়ে লইয়া কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছিল। নূতন আবার পুরাতন হইয়া চিরবিদায় গ্রহণ করিল; কিন্তু সেই আশার অধিকাংশই অপূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। অতীত আশার শেষ লইয়া নববর্ষে আবার নবীন উৎসাহে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। বৎসরান্তে আবার তাহার হিসাব নিকাশের দিন আসিবে। ভগবান্ করুন, তখন যেন আমরা লাভের কথা বলিয়া গৌরব অনুভব করিতে পারি।

আমাদের বার্ষিক সাহিত্যিক সম্মিলনীসমূহ বর্ষব্যাপী সাহিত্যিক লাভ ক্ষতির বিবরণী। ব্যবসায়িগণ যেমন বৎসরান্তে লাভক্ষতির সমাধানের ফল দেখিয়া আগামী বর্ষের জন্য কার্য্যপ্রণালী নিরূপণ করেন, সেইরূপ এই সকল সম্মিলনীতে অতীত বর্ষের সাহিত্যের নিরপেক্ষ সমালোচনা দেখিয়া সাহিত্যিকগণ ভবিষ্যতের জন্য স্ব স্ব কর্ত্তব্য নিরূপণ করিবেন, এইরূপ আশা স্বতঃই মনে উদিত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ পর্য্যন্ত কোন সম্মিলনেই বাঙ্গালা সাহিত্যের লাভ লোকসানের আলোচনা হয় নাই। হইলে বোধ হয় বুঝিতে পারা যাইত যে, এই সকল সম্মিলন প্রকৃতই সাহিত্যের উন্নতির পরিচায়ক কি না। কিন্তু আমার সন্দেহ এই যে, বোধ হয় সম্মিলনের সাহিত্যরথী সভাপতিগণ ইচ্ছা করিয়াই বাঙ্গালা সাহিত্যের লাভ লোকসানের আলোচনা করিতে বিরত হইয়া থাকেন। লাভের অপেক্ষা ক্ষতির ভাগ অধিক আশঙ্কা করিয়াই কি তাঁহারা এই অপ্রীতিকর প্রসঙ্গের আলোচনায় হস্তক্ষেপ করেন না?

কিন্তু অপ্রীতিকর হইলেও ইহার আলোচনা করিতে হইবে। যদি প্রকৃতই দোষ থাকে, তাহা ঢাকিয়া রাখিবার চেষ্টা করিলে সংশোধনের সম্ভাবনা অল্প।

এক জন তীক্ষ্ণদর্শী, সুবিজ্ঞ সাহিত্য-সমালোচক বলিয়াছেন, সাহিত্যে যাহা দেখিব, বিনা বিচারে তাহাই ভাল বলিয়া করতালি দিলে সাহিত্যের গৌরব-বৃদ্ধি ত হইবেই না, বরং তাহার অবনতি হইবে।

"তোমরা সবাই ভাল,
কেউবা দিব্যি গৌর বরণ, কেউবা দিব্যি কাল—"

এ কথা অন্য যেখানেই সুসঙ্গত হউক, সাহিত্যে শোভনীয় নহে।

কিন্তু আমার শক্তি ক্ষুদ্র। সাহিত্যরথিগণ যে গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছেন, সে বিষয়ে কোনও কথা বলিতে যাওয়া আমার পক্ষে ধৃষ্টতা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। কিন্তু তাহা হইলেও আমি যে বাঙ্গালা সাহিত্যকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসি, তাহার অনিষ্টকর কোনও কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতে দেখিলে বা তাহার উন্নতির পরিপন্থী কোনও চেষ্টা বা প্রভাবের প্রাবল্য দেখিলে, যথাজ্ঞান যথামতি তাহার প্রতিবাদ না করিয়া নীরব থাকিতে পারি না। সে বিষয়ে নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিলে, আমার আশঙ্কা অমূলক প্রতিপন্ন হইলে, আমার অপেক্ষা কেহই অধিকতর আনন্দিত হইবেন না।

দুই দিক্ হইতে আমি আজ বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব। প্রথম, ভাষার দিক্; দ্বিতীয় ভাবের দিক্। আমার মনে হয়, বাঙ্গালা সাহিত্যে এমন একটি প্রভাবের সূত্রপাত হইয়াছে, যাহা অচিরে বিনষ্ট না হইলে, তদ্দ্বারা এই উভয় দিকেই সাহিত্যের বিশেষ ক্ষতি হইবে। বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাষা কিরূপ হইবে, এই লইয়া নানা জল্পনা কল্পনা চলিতেছে। কলিকাতার এক দল লেখক স্থির করিয়াছেন যে, বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাষা বাঙ্গালী জনসাধারণের বোধগম্য নহে; অতএব তাহাকে এমন ভাবে গড়িতে হইবে, যাহাতে তাহা আপামর সাধারণের পক্ষে সুগম হয়। ইহা কিরূপে সম্ভব, তাহা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝিতে পারি না। যে দেশে শতকরা নব্বই জনেরও অধিক লোক নিরক্ষর বলিলে অত্যুক্তি হয় না; যে দেশে প্রধানতঃ হিন্দু মুসলমান জাতি ভেদে দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্নপ্রকৃতির মৌখিক ভাষা প্রচলিত; আবার প্রদেশভেদে এই দুই শ্রেণীর ভাষার প্রত্যেকের মধ্যে নানা প্রাদেশিক বিভিন্নতা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, সেই দেশে শিক্ষিত অশিক্ষিত সর্ব্বসাধারণের সুগম বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাষা কিরূপ হইবে, তাহা ভাবিয়া পাই না। এত দিন বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাষাকে এক আদর্শের অনুযায়ী করিয়া গঠন করা হইতেছিল। শিক্ষার

উন্নতির প্রতিকূল প্রভাব; সাহিত্যের ভাষা।

বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সেই আদর্শ বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বত্র নির্ব্বিবাদে গৃহীত হইয়া আসিতেছিল। তাহার ফলে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বা অক্ষয়কুমার দত্তের ভাষা সুদূর চট্টগ্রামের অধিবাসীদিগের যেরূপ বোধগম্য হইয়াছিল, সেইরূপ নবীনচন্দ্র সেনের ভাষাও কলিকাতায় আদৃত হইয়াছিল; এখন সাহিত্যের ভাষাকে সেই আদর্শ হইতে বিচ্যুত করিয়া প্রাদেশিকতাদুষ্ট করা হইতেছে। আমার মনে হয়, ইহা হইতে উদ্দেশ্যের বিপরীত ফলই ফলিবে। সাহিত্যের সার্ব্বজনিকতা বিনষ্ট হইয়া এক বিরাট্ সাহিত্যের স্থলে এতগুলি প্রাদেশিক সাহিত্যের সৃষ্টি হইবে যে, এক প্রদেশের সাহিত্য অন্য প্রদেশের অধিবাসীদিগের পক্ষে আদৌ সুগম হইবে না।

যাহা কোনও দেশে কখনও হয় নাই, তাহা আমাদের দেশে হইবে, এরূপ মনে করা কত দূর সঙ্গত, তাহা সুধীগণ বিচার করিবেন। কোনও দেশে কোনও কালে সাহিত্যের ভাষা আপামর সাধারণের সহজবোধ্য হয় নাই। Milton, Locke, Burke, Carlyle প্রভৃতির ভাষা ইংলণ্ডের এই অপূর্ব্ব শিক্ষা-বিস্তারের দিনেও কি কর্ণওয়ালের শ্রমজীবীদিগের অনায়াসবোধ্য? কতকটা শিক্ষা না হইলে সাহিত্য আয়ত্ত করা যায় না। কেবল আমাদের দৈনন্দিন জীবন ধারণের উপযোগী শিক্ষা দিবার জন্য সাহিত্যের সৃষ্টি নহে। তাহা হইলে, Milton, Shakespeare, Tennyson, কালিদাস, ভবভূতি, বাণভট্ট, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের কোনই প্রয়োজন ছিল না। সাধারণ কৃষককে আলু পটোলের চাষ শিক্ষা দিবার জন্য যদি গ্রন্থ লিখিতে হয়, তাহাতে প্রাদেশিক মৌখিক ভাষার ব্যবহার দূষণীয় নহে। কিন্তু সাহিত্যের উদ্দেশ্য আরও উচ্চ। স্থূলভাবে বলিতে গেলে হৃদয়ে উচ্চভাব উদ্বুদ্ধ করা, সৌন্দর্য্য-বুদ্ধির বিকাশ করা, রসের সৃষ্টি করা প্রভৃতি সাহিত্যের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য বিবিধ Style বা রচনা-পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়া থাকে; যাহা সাধারণ, তাহা কোথাও অসাধারণভাবে বর্ণিত হয়; যাহা এক কথায় বলা যায়, তাহা প্রকাশ করিবার জন্য বিবিধ শব্দবিন্যাস করা হয়; যাহা স্পষ্ট, তাহা হয় ত অস্পষ্ট করিয়া বলিবার প্রয়োজন হয়। এই art বা লিপিকৌশল বহুকালব্যাপিনী একনিষ্ঠ শিক্ষা ও সাধনার ফল। শক্তিশালী লেখকদিগের প্রত্যেকেরই Style বা রচনা-পদ্ধতি স্বতন্ত্র। তাহা সুশিক্ষিত ব্যক্তিরাও সহজে আয়ত্ত করিতে পারেন না, ইতর লোকের ত কথাই নাই। আবার ভাষার অন্তরালে যে ভাব রহিয়াছে, তাহা বুঝিতে হইলেও শিক্ষার প্রয়োজন। সাধারণ লোকের শিক্ষাদৈন্য হেতু যে বিশেষ ভাবদৈন্যও আছে, এ

কথা কি কেহ অস্বীকার করিবেন? তার পর ভাষার কথা। ভাষা ভাবেরই বাহ্য আকৃতি। মানবের আকৃতির যেমন একটি standard বা সাধারণ আদর্শ আছে, যাহার ন্যূন হইলে আকৃতি নিন্দনীয় বা উপহসনীয় হয়, সাহিত্যের ভাষারও সেইরূপ একটি আদর্শ আছে, যাহা হইতে হীন হইলে ভাষা নিন্দনীয় ও উপহসনীয় হইয়া থাকে। স্বাভাবিক নিয়মে বাঙ্গালা ভাষার সেই আদর্শ ধীরে ধীরে গঠিত হইয়া উঠিয়াছে। স্বাভাবিক নিয়মে সেই আদর্শে অল্পবিস্তর পরিবর্তনও ঘটিয়াছে; কিন্তু তাহা প্রকৃতির নিয়মে এমনই নিঃশব্দে অনাড়ম্বরে হইয়াছে যে, তাহা গ্রহণ করিতে কেহ আপত্তি করেন নাই।

মোট কথা, উপযুক্ত শিক্ষা ভিন্ন কেহ উচ্চাঙ্গের সাহিত্যের রস গ্রহণ করিতে পারে না। সুতরাং মৌখিক ভাষা ব্যবহার করিলেই যে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে, এরূপ মনে করা যায় না।

আমি দৃষ্টান্তের দ্বারা আমার বক্তব্য বিশদ করিবার চেষ্টা করিব—

"লাভ করবার স্বাভাবিক অধিকার আছে বলেই লোভ করা স্বাভাবিক। কোনো কারণেই কিছু থেকে বঞ্চিত হব প্রকৃতির মধ্যে এমন বাণী নেই। মনের দিক থেকে যেটা চাচ্চে, বাইরের দিক থেকে সেটা পেতেই হবে, প্রকৃতিতে ভিতরে বাইরে এই রফাটাই সত্য। এই সত্যকে যে শিক্ষা মান্‌তে দেয় না তাকেই আমরা বলি নীতি, এই জন্যেই নীতিকে আজ পর্য্যন্ত কিছুতেই মানুষ মেনে উঠতে পারছে না।

"যারা কাড়তে জানে না, ধরতে পারে না, একটুতেই যাদের মুঠো আলগা হয়ে যায়, পৃথিবীতে সেই আধ-মরা একদল লোক আছে নীতি সেই বেচারাদের সান্ত্বনা দিক্। কিন্তু যারা সমস্ত মন দিয়ে চাইতে পারে, সমস্ত প্রাণ দিয়ে ভোগ করতে জানে, যাদের দ্বিধা নেই সঙ্কোচ নেই, তারাই প্রকৃতির বরপুত্র। তাদের জন্যই প্রকৃতি যা-কিছু সুন্দর যা-কিছু দামী সাজিয়ে রেখেচে। তারাই নদী সাঁৎরে আস্‌বে, পাঁচিল ডিঙিয়ে পড়বে, দরজা লাথিয়ে ভাঙবে, পাবার যোগ্য জিনিস ছিনিয়ে কেড়ে নিয়ে চলে যাবে। এতেই যথার্থ আনন্দ, এতেই দামী জিনিসের দাম। প্রকৃতি আত্মসমর্পণ কর্ব্বে,—কিন্তু সে দস্যুর কাছে। কেন না চাওয়ার জোর নেওয়ার জোর, পাওয়ার জোর সে ভোগ কর্‌তে ভালবাসে—তাই আধ-মরা তপস্বীর হাড়-বের-করা গলায় সে আপনার বসন্ত-ফুলের স্বয়ম্বরের মালা পরাতে চায় না। নহবৎখানায় রসনচৌকি বাজচে—লগ্ন বয়ে যায় যে, মন উদাস হয়ে

গেল। বর কে? আমিই বর—যে মশাল জ্বালিয়ে এসে পড়তে পারে, বরের আসন তারই। প্রকৃতির বর আসে অনাহূত।”

উপরি-উদ্ধৃত অংশে লেখক তাঁহার যথাসাধ্য সহজ ভাষা প্রয়োগের চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ঐ ভাষার অন্তর্নিহিত ভাব চাষা মজুরেরা বুঝিতে পারে কি? তাহা যদি না পারিল, তবে সাহিত্যকে এরূপে প্রাদেশিকতা-দুষ্ট করা কেন? ঐ ভাষা ও ভাব লেখকের ভাষা ও ভাবদৈন্যের সূচক। অশিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা একটা ভাণমাত্র।

ভাষা এত সহজ হইলেও ভাব সাধারণের বোধগম্য হইল না। কিন্তু বাঙ্গালা দেশের জনসাধারণ আদরের সহিত কালীপ্রসন্ন সিংহের সাধুভাষায় অনূদিত মহাভারত পাঠ করিয়া থাকে। এখানে ভাষা সহজ নহে, কিন্তু ভাবের সহিত পাঠক বা শ্রোতার পূর্ব্ব পরিচয় আছে। তাই ভাষার কঠিন আবরণে ভাব সম্পূর্ণরূপে আত্মগোপন করিতে পারে না।

নব্যসম্প্রদায় এই কথার উত্তরে বলেন—

“মৌখিক ভাষার অনুসরণ করিলে সাহিত্যে প্রাদেশিকতা এসে পড়বে—এ ভয় অনেকেই পান; এবং সাহিত্যকে এ দোষ হতে মুক্ত রাখবার অভিপ্রায়ে তাঁরা প্রস্তাব করেন যে, সমস্ত বঙ্গদেশের জন্য এমন একটি ভাষা রচনা করতে হবে, যা বাঙ্গালার কোন প্রদেশেরই ভাষা নয়। সাধুভাষার স্বপক্ষে এই হচ্ছে সর্ব্বপ্রধান যুক্তি। সাহিত্যের রাজ্য অধিকার করবার জন্য নানা প্রাদেশিক ভাষার ভিতর প্রথমে লড়াই চলে। সে লড়াইয়ে যে প্রাদেশিক ভাষার রসনা-বল সব চেয়ে বেশি, সেই ভাষা জয়লাভ করে—বাদবাকি সব উপভাষা হয়ে পড়ে। পৃথিবীর সকল দেশেই সাহিত্যের ভাষা তার কোন একটি বিশেষ প্রদেশের মৌখিক ভাষার উপর প্রতিষ্ঠিত। এবং সেই মৌখিক ভাষার সঙ্গে যোগ রক্ষা করেই সাহিত্যের ভাষা পুষ্টি এবং শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে। যুগে যুগে মৌখিক ভাষার অল্প বিস্তর পরিবর্ত্তন ঘটে, এবং সঙ্গে সঙ্গে লিখিত ভাষারও রূপান্তর ঘটে। বঙ্গদেশে সাহিত্যের ভাষা দক্ষিণ বঙ্গের মৌখিক ভাষা ব্যতীত আর কিছুই নয়। সুতরাং কালক্রমে দক্ষিণ বঙ্গের মুখের কথায় যে বদল হয়েছে, আমাদের নব সাহিত্যের ভাষাকেও সেই বদল অল্পাধিক পরিমাণে অঙ্গীকার করতে হবে—নইলে আমাদের সাহিত্য রসরক্তহীন হয়ে পড়বে।”

বেশ কথা। তাহা হইলে নব্যপন্থীরাও স্বীকার করিতেছেন যে, সাহিত্যের

ভাষা প্রত্যেক প্রদেশের মৌখিক ভাষার অনুসরণ করে না, সেই সমস্ত উপভাষার মধ্যে যাহার রসনাবল বেশী, অর্থাৎ যাহা সর্ব্বাপেক্ষা পরিপুষ্ট ও ভাবপ্রকাশে সমর্থ, সেই ভাষার উপরই সাহিত্যের ভাষা প্রতিষ্ঠিত হয়। দক্ষিণবঙ্গের বা কলিকাতার ভাষার এ পরিপুষ্টি কোথা হইতে আসিল? একটু অনুধাবন করিলেই বুঝা যাইবে যে, কলিকাতাবাসীরা বঙ্গদেশের অন্যান্য প্রদেশের অধিবাসীদিগের অপেক্ষা অধিকতর শিক্ষিত ও সভ্য বলিয়া তাঁহাদের ভাষাও সংস্কৃতশব্দবহুল ও বহুপরিমাণে গ্রাম্যশব্দবর্জ্জিত। ভাবপ্রকাশে অধিকতর সমর্থ বলিয়া সাহিত্যের ভাষা স্বভাবতঃ সেই ভাষাকেই আশ্রয় করিয়াছে, এবং স্বাভাবিক নিয়মে নিজের পরিপুষ্টির জন্য নানা স্থান হইতে, বিশেষতঃ সংস্কৃতের অক্ষয় রত্নভাণ্ডার হইতে শব্দ সংগ্রহ করিয়া পরিপুষ্ট হইয়াছে। ইহাই বাঙ্গালা সাধুভাষা নামে পরিচিত। তার পর কথা হইতেছে যে, মৌখিক ভাষার পরিবর্ত্তনের সহিত সাহিত্যের ভাষার পরিবর্ত্তনের কত দূর সম্বন্ধ? আমরা সকল দেশেই দেখিতে পাই, সাহিত্যে উন্নতির স্রোতোবেগের সহিত মৌখিক ভাষা প্রতিযোগিতা করিতে পারে না। গত পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার মৌখিক ভাষা যেমন ছিল, আজও তেমনই আছে; কিন্তু এই কালের মধ্যে বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাষার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সাহিত্যের সহিত জনসাধারণের পরিচয়বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মৌখিক ভাষারও উন্নতি হইবে; কিন্তু সাহিত্যের ভাষাকে ছোট হইয়া মৌখিক ভাষার সঙ্গে মিশিতে হইবে, এবং তাহা না করিলে সাহিত্য "রসরক্তহীন" হইয়া পড়িবে, এ কথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না।

যাহা হউক, প্রাদেশিকতার পক্ষপাতী লেখকগণ আমাদের দেশের জনসাধারণকে সাধু ভাষায় যতটা অনভিজ্ঞ মনে করেন, প্রকৃতপ্রস্তাবে তাহারা তত দূর অনভিজ্ঞ নহে। ১৩২০ সালের মাঘ মাসের সাহিত্য-সংহিতায় প্রকাশিত "বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাষা" শীর্ষক প্রবন্ধের লেখক যথার্থই বলিয়াছেন—"জীবনের উষাকাল হইতেই যে দেশের আপামর সাধারণের কর্ণে সংস্কৃত ভাষা ও ছন্দ ধ্বনিত হইতে থাকে, যে দেশের পূজা ও উৎসবের ভাষা সংস্কৃত, যে দেশের গৃহে গৃহে ব্যাস বাল্মীকির সমাদর, যে দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা যাত্রা ও কথকতায় সংস্কৃতশব্দবহুল ভাষায় পুরাণের আখ্যায়িকা শ্রবণ করিয়া অতুল আনন্দ উপভোগ করে, যে দেশে ভিখারীরা পর্য্যন্ত জয়দেব, বিদ্যাপতির সাধু ভাষায় রচিত পদাবলী গান করিয়া লোকের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হয়, যে দেশে গ্রাম্য পাঠশালায় পর্য্যন্ত চাণক্য শ্লোক পঠিত হইয়া থাকে, সে দেশের লোক

হঠাৎ কিরূপে এমন মূর্খ হইয়া পড়িল যে, আর তাহারা সাধু ভাষা বুঝিতে পারে না?"

আর এক কথা, প্রাদেশিক ভাষার দৈন্য সর্ব্ববাদিসম্মত—সকল প্রকার ভাব-প্রকাশে ইহার শক্তি নাই। এই জন্যই আমরা দেখিতে পাই, সাধারণের বোধগম্য ভাষায় গ্রন্থ লিখিব বলিয়া যাঁহারা লেখনী ধারণ করেন, তাঁহাদিগকেও বাধ্য হইয়া সাধু ভাষার শরণাপন্ন হইতে হইয়াছে। কেবল "হচ্চে" "যাচ্চে" "হলুম" "গেলুম" এইরূপ কয়টি ক্রিয়া পদের প্রয়োগ করিয়াই তাঁহারা প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁহাদের নেতৃস্থানীয় কোনও লেখকের একটি রচনার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম:—

"জগতে সৎ চিৎ ও আনন্দের প্রকাশকে আমরা জ্ঞানের ল্যাবরেটরিতে বিশ্লিষ্ট করিয়া দেখিতে পারি, কিন্তু তাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া নাই। কাষ্ঠ বস্তু গাছ নয়, তার রস টানিবার ও প্রাণ ধরিবার শক্তিও গাছ নয়; বস্তু ও শক্তিকে একটি সমগ্রতার মধ্যে আবৃত করিয়া যে একটি অখণ্ড প্রকাশ তাহাই গাছ—তাহা একই কালে বস্তুময়, শক্তিময়, সৌন্দর্য্যময়। গাছ আমাদিগকে যে আনন্দ দেয় সে এই জন্যই। এই জন্যই গাছ বিশ্ব পৃথিবীর ঐশ্বর্য্য। গাছের মধ্যে ছুটির সঙ্গে কাজের, কাজের সঙ্গে খেলার কোনো বিচ্ছেদ নাই। এই জন্যেই গাছ পালার মধ্যে চিত্ত এমন বিরাম পায়—ছুটির সত্য রূপটা দেখিতে পায়। সে রূপ কাজের বিরুদ্ধ রূপ নয়। বস্তুত তাহা কাজেরই সম্পূর্ণ রূপ। এই কাজের সম্পূর্ণ রূপটিই আনন্দরূপ সৌন্দর্য্যরূপ। তাহা কাজ বটে, কিন্তু তাহা লীলা, কারণ তাহার কাজ ও বিশ্রাম এক সঙ্গেই আছে।"

ইহা হইতে কি বুঝা যায় না যে, বিষয়-ভেদে ভাষার তারতম্য হইয়া থাকে, এবং সমস্ত প্রকার ভাবপ্রকাশে প্রাদেশিক বা মৌখিক ভাষা অক্ষম?

যাহা হউক, নবীন সম্প্রদায় তাঁহাদের এই সাধুভাষাবিদ্বেষের দ্বারা এক ভীষণ রাক্ষসের সৃষ্টি করিয়াছেন। এখন তাহাকে নিবারণ করিবেন কিরূপে? অথচ নিবারিত না হইলে সে ভীষণ অনর্থপাত করিবে। নবীন সম্প্রদায় প্রচলিত সাধুভাষাকে বাঙ্গালা ভাষা বলিয়া স্বীকার করিতেছেন না; দক্ষিণবঙ্গের মৌখিক ভাষাকেই বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাষা বলিতেছেন। কিন্তু অন্য প্রদেশের লোকেরা দক্ষিণ বঙ্গের প্রাদেশিক ভাষাকে সে প্রাধান্য দিতে চাহিতেছেন না। তাহার উপায় কি? আসাম ত অনেক দিন আমাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছে। 'মুসলমানেরা বলিতেছেন,—এতদিন আমরা বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রচলিত ভাষাকে স্বীকার

করিয়া চলিতাম—সেই ভাষায় গ্রন্থ লিখিতাম—কোনও আপত্তি করিতাম না; কারণ, তাহাতে সকল প্রদেশের সমান অধিকার ছিল। কিন্তু এক্ষণে তোমরাই যখন সেই সর্ব্ববাদিসম্মত ভাষাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া প্রাদেশিক মৌখিক ভাষাকে সেই সিংহাসনে বসাইতে চাহিতেছ, তখন আমাদের মৌখিক ভাষাকে উপেক্ষা করিবে কেন? তোমরা যতদিন "হইতেছে" লিখিতে, ততদিন আপত্তি করি নাই, কিন্তু এখন যদি "হচ্ছে" বা "হচ্চে" লেখ, তবে আমরাই বা "হবার লাগছে" লিখিব না কেন? ক্রমে প্রত্যেক প্রদেশের উপভাষাই এইরূপ এক একটী দাবী উপস্থিত করিবে। তখন তাহার কি উত্তর দিবে?

আমার নিবেদন এই যে, যে সকল লেখক এইরূপ নূতন করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাষা গড়িবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাদের লেখনী সংযত করুন। আমি প্রবীণ, সুতরাং সংশয়াকুল ও বিধিনিষেধের শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত, সবুজের লেশমাত্রহীন, "আধমরা", বিষম "পাকা" হইতে পারি, কিন্তু, হে নবীন, আমি যে অনেক নবীনের উচ্ছৃঙ্খলতার ফল মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছি। অতীতের অভিজ্ঞতা উন্নতির সোপানপংক্তি; তোমরা তাহাকে নিশ্চিহ্ন করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিতে চাহ।

তোমরা "মনঃ" না লিখিয়া "মন" লেখ, কোনও আপত্তি করি নাই—করিবও না; "মনঃকষ্ট" না লিখিয়া "মনকষ্ট" লেখ—সহ্য করিব; কিন্তু "মনো-কষ্ট" লিখিলে সহ্য করিব না। তখনই বিধিনিষেধের কথা তুলিব। সহজ সরল ভাষায় লেখ, আপত্তি নাই, যদি অযথা গ্রাম্য শব্দের ব্যবহার বা বিজাতীয় রচনা পদ্ধতি অবলম্বন না কর। যদি লেখ—"মাগো, আজ মনে পড়চে তোমার সেই সিঁথের সিঁদুর, চওড়া সেই লাল পেড়ে সাড়ি, সেই তোমার দুটি চোখ—শান্ত, স্নিগ্ধ, গভীর। সে যে দেখেছি আমার চিত্তাকাশে ভোর-বেলাকার অরুণরাগরেখার মত। আমার জীবনের দিন যে সেই সোণার পাথেয় নিয়ে যাত্রা করে বেরিয়েছিল। তার পরে? পথে কালের মেঘ কি ডাকাতের মত ছুটে এল? সেই আমার আলোর সম্বল কি এক কণাও রাখ্‌ল না? কিন্তু জীবনের ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে সেই যে উষা সতীর দান, দুর্য্যোগে সে ঢাকা পড়ে তবু সে কি নষ্ট হবার? আমাদের দেশে তাকেই বলে সুন্দর যার বর্ণ গৌর। কিন্তু যে আকাশ আলো দেয় সে যে নীল। আমার মায়ের বর্ণ ছিল শামলা, তাঁর দীপ্তি ছিল পুণ্যের।"—তবে এই রচনা-পদ্ধতির নিন্দা করিব।

আর এক কথা, যেমন সম্মুখে অত্যুচ্চ আদর্শ না থাকিলে, মানুষ সর্ব্বপ্রযত্নে

আত্মোন্নতি করিতে পারে না, সেইরূপ লেখকের সম্মুখে ভাষারও একটি অত্যুচ্চ আদর্শ না থাকিলে ভাষা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারে না। সকল লেখকেরই ভাষা সেই আদর্শে উপনীত হইতে পারিবে, এমন আশা করা যায় না; তবে সেই আদর্শে উপস্থিত হইবার জন্য যদি সকলেই চেষ্টা করেন, তাহা হইলে ভাষার অধোগতি নিবারিত হইয়া অবিচ্ছিন্ন ঊর্দ্ধগতির টান আসিয়া পড়িবে। কিন্তু আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইলে অথবা এক আদর্শ ভাঙ্গিয়া খণ্ড খণ্ড হইলে, সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত না হইয়া নানা দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িবে। হে নবীন, এই বিক্ষিপ্ত শক্তি লইয়া তুমি কি বঙ্গবাণীর বিরাট্ স্বর্ণমন্দির-নির্ম্মাণে সমর্থ হইবে?

সাহিত্যে নূতন ভাব।

নবীন সম্প্রদায় আমাদের সাহিত্যে যে নূতন idea বা ভাব আনিতেছেন, এবার আমি তৎসম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব। তাঁহারা তাঁহাদিগের স্বদেশবাসিগণকে স্বতঃ পরতঃ এই শিক্ষা দিতেছেন যে, শাস্ত্রোক্ত বিধান সকল তাঁহাদিগের মনুষ্যত্ব-বিকাশের প্রধান অন্তরায়। শাস্ত্র তাঁহাদিগকে চিরকাল অপরিণত শিশুর ন্যায় রাখিতে ভালবাসে এবং "পল্‌তেয় করে ফোঁটা ফোঁটা পুঁথির বিধান খাইয়ে তাকে বাঁচ্‌য়ে রাখ্‌তে" চায়। এই জন্য তাঁরা উপদেশ দেন—শাস্ত্রের বিধি নিষেধ ও সেই সঙ্গে সেই বিধি-নিষেধ-শাসিত সমাজের বিধি নিষেধ চরণে দলিত করিয়া তোমরা উচ্ছৃঙ্খল ও উন্মত্তভাবে চল। "যারা নীতির উপবাসে শুকিয়ে শুকিয়ে অনেক কালের পরিত্যক্ত খাটিয়ার ছারপোকার মত একেবারে পাৎলা সাদা হ'য়ে গেছে, তাদের চী—চী—গলার ভৎর্সনা কাণে করিও না।" সমাজ পুরুষদিগকেই যখন এত উৎপীড়ন করে, তখন নিশ্চয়ই স্ত্রীলোকদিগের উপর তাহার অত্যাচারের সীমা নাই! তাই তাঁহারা বলেন—"সমস্ত সমাজ চারিদিক থেকে আমাদের মেয়েদের মনকে যেন ছোট করে বাঁকিয়ে রেখে দিয়েছে। ভাগ্য ওদের জীবনটাকে নিয়ে জুয়ো খেল্‌ছে—দান পড়ার উপরই সমস্ত নির্ভর, নিজের কোন্ অধিকার ওদের আছে!" হায় সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী! শাস্ত্র ও সমাজের কি অযথা অত্যাচার ও উৎপীড়নই তোমরা সহ্য করিয়া বাঁকিয়া ছোট হইয়া গিয়াছ! যে পতি তোমাকে নিষ্কলঙ্ক জানিয়াও বনে দিয়াছিলেন, জনকনন্দিনি, তুমি তাঁহার প্রতি ক্রোধের লেশমাত্র না করিয়া অনন্যমনে তাঁহারই চরণ ধ্যান করিয়াছ! যখন সভাস্থলে বিশাল জনতার সমক্ষে নিজ পবিত্রতার প্রমাণ দিবার জন্য আহূত হইয়াছিলে, তখন নিদারুণ মর্ম্মপীড়ায় কাতর হইয়াও বলিয়াছিলে—

যথাহং রাঘবাদন্যং মনসাপি ন চিন্তয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি॥
মনসা কর্ম্মণা বাচা যথা রামং সমর্চ্চয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি॥

হা ধিক্! তুমি নিতান্ত নির্বুদ্ধির কার্য্য করিয়াছিলে! তুমি বৃদ্ধ বাল্মীকির রামায়ণের নায়িকা হইতে পার; কিন্তু সাহিত্যের নব্যপন্থী "ঘরে বাইরে" তোমার নিন্দা করিবেন। তাঁহারা বলিবেন—"স্ত্রী পুরুষের পরস্পরের প্রতি সমান অধিকার, সুতরাং তাদের সমান প্রেমের সম্বন্ধ।" সুতরাং স্ত্রী স্বামীকে পূজা করিবে কেন? "তীর্থের অর্থপিশাচ পাণ্ডা পূজার জন্য কাড়াকাড়ি করে কেন না সে পূজনীয় নয়; পৃথিবীতে যারা কাপুরুষ তারাই স্ত্রীর পূজা দাবী করে থাকে। তাতে পূজারি ও পূজিত দুইয়েরই অপমানের এক শেষ।" সমাজ-স্থিতির প্রধান সহায় দাম্পত্যপ্রেম ও পতিভক্তির অত্যুন্নত আদর্শকে এইরূপে ক্ষুণ্ণ করার মার্জ্জনা আছে বলিয়া মনে হয় না। কেবলই কি পতিভক্তি? গুরুজন-মাত্রেরই প্রতি ভক্তিকে এইরূপে অবজ্ঞা করা হইয়াছে। যে আদর্শ সহস্র সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া কোটী কোটী লোকের জীবনপথের প্রধান অবলম্বনস্বরূপ হইয়া আসিতেছে, স্তনন্ধয়ী হিন্দুবালিকা প্রত্যহ মাতৃস্তন্যের সহিত যে আদর্শকে গ্রহণ করিয়া পরিপুষ্ট হইয়া উঠিতেছে, সেই আদর্শকে এইরূপে নষ্ট করিবার অধিকার নবীন প্রবীণ কাহারও নাই। এই আদর্শ দূরীভূত বা ক্ষুণ্ণ হইলে সমাজ পিশিতপিণ্ড-প্রিয়তার তাণ্ডবনৃত্যে টলটলায়মান হইবে। তাহার পরিণাম চিন্তা করিয়াছ কি?

এই সকল মহান্ আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করিবার চেষ্টা আজই যে হইতেছে, তাহা নহে। জগতের ইতিহাসে কখনও কালাপাহাড়ের অভাব হয় নাই। কালাপাহাড়-দিগের চেষ্টা সম্পূর্ণ ফলবতী হয় নাই বটে; কিন্তু তত্তৎ সমাজের অঙ্গে এমন কলঙ্কের রেখাপাত করিয়া গিয়াছে যে, তাহা পরবর্ত্তী শত চেষ্টাতেও অপনীত হইতেছে না।

হে নবীন! বিধিনিষেধের উপর তোমার এত বিরাগ কেন? জগৎ একে-বারেই প্রবীণ হইয়া উঠে নাই—সেও একদিন নবীন ছিল, সেও একদিন কোনও বিধি নিষেধ না মানিয়া উচ্ছৃঙ্খল ভাবে ছুটাছুটি করিয়াছে; সংযমকে কাপুরুষতার নামান্তর ভাবিয়া পদদলিত করিয়াছে। কিন্তু তাহাতে সুখ পায় নাই—শান্তি পায় নাই। তখন আপনি ইচ্ছা করিয়া বিধি নিষেধের লৌহশৃঙ্খল গঠন করিয়া পায়ে পরিয়াছে। সেই দিনই তাহার উন্নতির ইতিহাসের প্রথম পৃষ্ঠা।

বলিতে পার, বিধিনিষেধের মাত্রা দিন দিন বাড়িয়া উঠিতেছে। কিন্তু তোমাদের অযথা উচ্ছৃঙ্খলতাবৃদ্ধিই ইহার প্রধান কারণ নহে কি? হস্তিপক দুর্ব্বিনীত হস্তীকে প্রয়োজনাতিরিক্ত শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া থাকে। হস্তী বিনীত হইলে বন্ধনেরও প্রয়োজনাভাব হয়। যতই চেষ্টা কর না কেন, সংসারে প্রবীণের অত্যন্তাভাব কখনও ঘটিবে না। এই অকালমৃত্যুর দেশেও তোমাদিগকে প্রবীণের উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইতেছে। কালে তোমরাই যে প্রবীণের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবে। তখন যে মুখে "চেঙ্গমুড়ী-কাণী" বলিয়াছ, সেই মুখেই "জয় বিষহরি" বলিবে।

আমি অতিরিক্ত বিধিনিষেধের পক্ষপাতী নহি। এস নবীন প্রবীণ মিলিয়া, একই উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া, সমাজের মঙ্গলের পক্ষে কোন্‌টা প্রয়োজনীয়, কোন্‌টাই বা অপ্রয়োজনীয়, তাহার বিচার করি। দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে ব্যবস্থা প্রবীণই ত করিয়াছে। কিন্তু এ কার্য্যে পরস্পরের সহানুভূতি চাই—অসহিষ্ণুতা একেবারে বর্জ্জন করিতে হইবে। তোমরা "টিকি-মঙ্গল" কাব্য লিখিলে আমরা "টেড়ী-মঙ্গল" লিখিব। তাহাতে কলহ বাড়িবে—কাজ হইবে না। আমরা প্রবীণ স্বভাবতঃ কলহপ্রিয় নহি। যত দূর সম্ভব, মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতে পারিলে আমরা অন্য পথ অবলম্বন করি না। শাস্ত্রে ইহার দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি পাওয়া যায়। শাস্ত্র এক মহান্ উচ্চ আদর্শ সম্মুখে ধরিয়াছেন, বলিয়াছেন, যদি প্রকৃত মনুষ্যপদবাচ্য হইতে চাহ, এই আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উঠিতে থাক। কিন্তু সকলেই সে আদর্শের অনুসরণ করিতে পারিবে না, বা চাহিবে না; তাই শাস্ত্র অধিকারিভেদে উন্নতির অন্য বহু পথেরও নির্দ্দেশ করিয়াছেন; কারণ, যে উঠিতে না চায়, তাহাকে নিশ্চয়ই পড়িতে হইবে, উন্নতি অবনতির মধ্যবর্ত্তী কোনও পথ নাই। ভূয়োদর্শন ও গভীর চিন্তার ফলে শাস্ত্র দেখিয়াছেন যে—

প্রাচীন ও নূতন শিক্ষার মধ্যে প্রভেদ।

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥

তাই শাস্ত্র ভোগের মধ্যেও সংযমের শিক্ষা দিয়াছেন। এই শিক্ষা ও নূতন শিক্ষার মধ্যে প্রভেদ আমি একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

সন্দীপচন্দ্র ও বিমল আধুনিক শিক্ষা প্রণালীতে সুশিক্ষিত। বিমল প্রথমে প্রাচীন পদ্ধতিতেই শিক্ষিতা হইয়াছিল। তাই সে প্রথম প্রথম শ্বশুরবাড়ীতে

আসিয়া স্বামী নিখিলেশের পদধূলি লইয়া শয্যাত্যাগ করিত। স্বামী বলিলেন—ছি ছি ও কাজও করে, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে পূজ্য পূজকের সম্বন্ধ নাই, উভয়েরই যে সমান অধিকার। তিনি স্ত্রীকে বলিলেন—তোমাকে বাহির হইতে হইবে, কারণ "তোমাকে বাইরের দরকার থাকৃতে পারে। এখানে আমাকে দিয়ে তোমার চোখ কান মুখ সমস্ত মুড়ে রাখা হয়েছে,—তুমি যে কাকে চাও তাও জান না, কাকে পেয়েচ তাও জান না।" স্বামীর নিকট এইরূপ শিক্ষা পাইয়া বিমলের চরিত্র গঠিত হইতে লাগিল। এমন সময় স্বামীর বন্ধু সন্দীপচন্দ্রের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ। সন্দীপচন্দ্রের শিক্ষাও আধুনিক—তাহা এইরূপ—"আমি যা চাই তা আমি খুবই চাই। তা আমি দুই হাতে করে চটকাব, দুই পায়ে করে দল্‌ব। সমস্ত গায়ে তা মাখ্‌ব, সমস্ত পেট ভরে তা খাব। চাইতে আমার লজ্জা নেই, পেতে আমার সঙ্কোচ নেই। যারা নীতির উপবাসে শুকিয়ে শুকিয়ে অনেক কালের পরিত্যক্ত খাটিয়ার ছারপোকার মত একেবারে পাৎলা সাদা হয়ে গেছে তাদের চীঁ চীঁ গলার ভৎর্সনা আমার কানে পৌঁছবে না।" কি উৎকট ভোগলালসা! নিখিলেশ স্ত্রীর চরিত্ররক্ষার প্রধান সহায় পতি-ভক্তির মূলে কুঠারাঘাত করিয়া তাহাকে নিতান্ত অবলম্বনহীন করিয়াছিলেন। সন্দীপচন্দ্রের নীতির বালাই একেবারেই ছিল না। তাই পরস্পরের সাক্ষাৎমাত্র উভয়েই মরিল। বন্ধুর স্ত্রীকে দেখিবামাত্র মাংসলোলুপ মার্জ্জারের ন্যায় সন্দীপ লাফাইয়া উঠিল। সে বলিল—"আমি যে স্পষ্ট দেখ্‌ছি ও আমাকে চায়—ওই ত আমার স্বকীয়া। গাছে ফল বোঁটায় ঝুলে আছে—সেই বোঁটার দাবীকেই চিরকালের বলে মান্‌তে হবে না কি? ওর যত রস, যত মাধুর্য্য সে যে আমার হাতে সম্পূর্ণ খসে পড়বার জন্যেই—সেই খানেই একেবারে আপনাকে ছেড়ে দেওয়াই ওর সার্থকতা,—সেই ওর ধর্ম্ম, ওর নীতি। আমি সেইখানেই ওকে পেড়ে আনব, ওকে ব্যর্থ হতে দেব না।"

এই চিত্রের সহিত ব্যাধ কালকেতুর চিত্রের তুলনা করুন। অশিক্ষিত ব্যাধ হাটে মাংস বেচিয়া খায়, বনে বাস করে। পুরাণ-পাঠ ও কথকতায় যে শিক্ষা সমাজের বাতাসে মিশিয়া আছে, নিঃশ্বাসের সহিত সেই শিক্ষাই তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তাহার চরিত্র গঠন করিয়াছে। তাহার কুটীরে অনিন্দ্য-সুন্দরী যুবতী আসিয়া অযাচিতভাবে তাহাকে আত্মসমর্পণ করিতে চাহিল। মূর্খ ব্যাধ ত বলিল না—"ও আমাকে চায়—ওই ত আমার স্বকীয়া।" সে তাহার মজ্জাগত শিক্ষার প্রেরণায় বলিল—

"ত্যজিয়া ব্যাধের বাস, চল বন্ধুজন পাশ,
থাকিতে থাকিতে দিননাথে।
যদি হয় পাপনিশা, লোকে ঘোষিবে দুর্ভাষা,
রজনী বঞ্চিলে কার সাথে।"

তাহাতেও যখন কোনও ফল ফলিল না, তখন সে মাতৃসম্বোধন করিয়া নিতান্ত বিরক্তভাবে বলিল—

"বুঝিতে না পারি গো তোমার ব্যবহার।
যে হোক সে হোক, মোর আগে নমস্কার॥
ছাড় এই স্থান মাতা, ছাড় এই স্থান।
আপনি রাখিলে রহে আপনার মান॥"

এখানে সন্দীপ ও কালকেতু—কাহাকে উচ্চ আসন দিব?

এক শ্রদ্ধাস্পদ লেখক লিখিয়াছেন—"আজ পর্য্যন্ত আমাদের সাহিত্যে যদি কবিকঙ্কণ চণ্ডী, ধর্ম্মমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, মনসার ভাসানের পুনরাবৃত্তি নিয়ত চল্‌তে থাক্‌ত তাহলে কি হত? পনেরো আনা লোক সাহিত্য পড়া ছেড়েই দিত।......বঙ্কিম আন্‌লেন সাত সমুদ্র পারের রাজপুত্রকে আমাদের সাহিত্য রাজকন্যার পালঙ্কের শিয়রে। তিনি যেমন ঠেকালেন সোণার কাঠি, অমনি সেই বিজয়বসন্ত লয়লামজনুর হাতির দাঁতে বাঁধানো পালঙ্কের উপর রাজকন্যা নড়ে উঠ্‌লেন, চল্‌তি কালের সঙ্গে তাঁর মালা বদল হ'য়ে গেল, তার পর থেকে তাঁকে আজ আর ঠেকিয়ে রাখে কে?"

বিদেশ হইতে সোনার কাঠী আনিয়া রাজকন্যার চেতনা-সঞ্চার করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র ভালই করিয়াছেন। কিন্তু তিনি সেই সাত সমুদ্র পারের বিদেশী রাজপুত্রের সহিত রাজকন্যার যে বিবাহ দেওয়াইয়াছেন। স্ত্রী যে তাহার গোত্র হারাইয়া বিদেশীর সগোত্রা হইয়া গেল। যত গোল যে এইখানে। প্রাচীন শিক্ষার যত দোষই থাকুক, সে শিক্ষায় নারীজাতিকে কেবলমাত্র ভোগের বস্তু বলিয়া জ্ঞান হয় না—সে শিক্ষায় নারীর মাতৃত্বকেই অধিকতর পরিস্ফুট করিয়া তুলে। আধুনিক শিক্ষা তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। বঙ্কিমচন্দ্রের রাজকন্যা চিরদিনই বিলাসপর্য্যঙ্কশায়িতা ভোগসন্ধুক্ষিত-হৃদয়া রাজকন্যাই রহিলেন—মাতৃত্বের স্বর্ণসিংহাসনে ভুবনেশ্বরী মূর্ত্তিতে সন্তানকে ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া তাহার মুখে হৃদয়ক্ষীরোদের পীযূষধারা ঢালিয়া দিবার গৌরব অনুভব করিতে পারিলেন না!

আমি আর আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইব না। এই প্রীতিসম্মিলনে বন্ধুবর্গকে লাভ করিয়া হৃদয়ের আবেগে অনেক কথা বলিয়াছি, বিদ্বেষবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া নহে, কেবলমাত্র মাতৃভাষার মঙ্গলকামনায়। যদি অন্যায় বলিয়া থাকি, আপনারা ক্ষমা করিবেন। শক্তির দৈন্যে বিষয়গুরুত্বের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারি নাই। যদি উপযুক্ত সাহিত্য-সমালোচকগণ এ বিষয়ে অসঙ্কোচে হস্তক্ষেপ করিতেন, তাহা হইলে আমার এ নীরস শক্তিহীন অভিভাষণের উৎপীড়ন আপনাদিগকে সহ্য করিতে হইত না। আমি প্রবীণ হইলেও, অথবা প্রবীণ বলিয়াই, নবীনকে ভালবাসি—সে যে আমাদেরই পুত্র, কন্যা, জ্ঞাতি, বন্ধু। নবীনের উপরে কি আমার কোনও বিদ্বেষ থাকিতে পারে? বিদ্বেষ নাই—দুঃখ আছে। তাই উপসংহারে তাঁহাদেরই কথায় তাঁহাদিগকে বলি—

উপসংহার।

"গড়ে তোল্‌বার কাজে তোমার সমস্ত শক্তি দাও, অনাবশ্যক ভেঙে ফেলবার উত্তেজনায় তার সিকি পয়সা বাজে খরচ করতে নেই।"

শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী।

গঙ্গবংশানুচরিতম্‌।

তিন বৎসর পূর্ব্বে "বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি"র সদস্যগণ উৎকলে ও কলিঙ্গ-দেশে তথ্যানুসন্ধানে ব্যাপৃত হইয়া, একখানি সংস্কৃত পুঁথির সন্ধান লাভ করিয়াছিলেন। তাহাতে অনেক ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক বিবরণ সন্নিবিষ্ট থাকায়, পুঁথিখানি নকল করাইবার চেষ্টা করা হয়। পুরাতন উড়িয়া অক্ষরে লিখিত তালপত্রের পুঁথির পাঠোদ্ধারে অভ্যস্ত, সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞ ও বঙ্গাক্ষরে নকল করিতে সিদ্ধহস্ত, সুযোগ্য লেখক বড় দুর্ল্লভ বলিয়া, তিন বৎসরের অধ্যবসায়ে নকল কার্য্য কোনও রূপে সমাপ্ত হইয়াছে। একখানিমাত্র মূল পুঁথির এইরূপ অশুদ্ধিবহুল নকল হইতে প্রকৃত পাঠ নির্ণয় করা সহজ নহে। প্রথম চেষ্টায় যত দূর জানিতে পারা গিয়াছে, তাহার উপর নির্ভর করিয়া এই পুঁথিখানির কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রদান করা যাইতেছে। ধারাবাহিক ইতিহাসের অভাবে এই শ্রেণীর গ্রন্থ হইতেই বিবরণ সঙ্কলন করিতে হয়; সুতরাং এই শ্রেণীর যত গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইতেছে, সকলগুলিই সাহিত্য-সমাজে উপস্থাপিত হইবার যোগ্য।

গ্রন্থখানি দশ অধ্যায়ে বিভক্ত, সংস্কৃতভাষানিবদ্ধ গদ্যপদ্যাত্মক চম্পূ কাব্য; গ্রন্থের নাম,—"গঙ্গবংশানুচরিতম্"। গ্রন্থকার আপনার পরিচয়দানের জন্য লিখিয়া গিয়াছেন,—তিনি রাজগুরু ছিলেন; তাঁহার নাম "বাসুদেবরথ সোমযাজী"।

গোদাবরী-দক্ষিণতীর-নিবাসী মাগধেন্দ্র রায়োপাধিক বিদ্যার্ণব নামক কোনও স্তুতিপাঠক তদীয় প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণী লীলাবতী দেবীকে লইয়া শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে তীর্থদর্শনে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের গমনাগমন-পথের বর্ণনা করিতে গিয়া কবি কাব্যচ্ছলে নানা ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক সমাচার লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাহার প্রধান কথা গঙ্গবংশীয় নৃপতিগণের কীর্ত্তিকথা বলিয়া, গ্রন্থখানি "গঙ্গবংশানুচরিতম্" নামেই অভিহিত হইয়াছে।

গঙ্গবংশীয় নরপতিগণ কলিঙ্গদেশ হইতে অভ্যুত্থান লাভ করিয়া, কালক্রমে সমগ্র উৎকলের ও বঙ্গভূমিরও কিয়দংশের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। আবার অধঃপতনের দিনে তাঁহারা কলিঙ্গের শেষ সীমায় তাড়িত হইয়াছিলেন। এই রাজবংশের পুরুষোত্তম নামক নরপতির শাসন-সময়ে গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছিল! ইহাতে প্রসঙ্গক্রমে শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রের বিচিত্র মন্দিরাদির অনেক উল্লেখ-যোগ্য বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহার আলোচনা ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া দিয়া, সম্প্রতি অল্প কয়েকটি কথারই অবতারণা করিব।

কাব্যোক্ত তীর্থযাত্রী দম্পতী মহেন্দ্র নামক কুলাচলের উপকণ্ঠে "কূর্ম্মক্ষেত্রে" উপনীত হইয়া, তথা হইতে মহেন্দ্রতনয়া-নদীর সহিত সাগর-সঙ্গমের পুণ্যতীর্থে আসিয়া, পোতারোহণ করেন। লীলাবতী দেবী পোতের আন্দোলনে বিব্রতা হইলে, বিদ্যার্ণব তাঁহার স্থৈর্য্যসম্পাদনচেষ্টায়, প্রাকৃতিক শোভার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার আশায়, অনেক কবিতার অবতারণা করিয়াছিলেন। একটি কবিতায় সমুদ্রবক্ষে সন্ধ্যার বর্ণনা কবির রচনা-লালিত্যের নিদর্শনস্বরূপ উদ্ধৃত হইবার যোগ্য।—

"এতদ্বারিধিবারি হীরকঘটা-কান্তচ্ছটাচ্ছাদিতং
ভূয়ো ভাতি(?) সুধাবদেব ধবলং গঙ্গাম্বুভঙ্গাদিব।
মাণিক্যোপল-বিক্রমাঙ্কুর-করশ্রেণীবিভিন্নোদরং
সন্ধ্যাংশু-প্রতিবিম্ব-চুম্বিত মিবারক্তীকৃতং রোচ্যতে।

লীলাবতী ও বিদ্যার্ণব পোতারোহণে পুরীধামের "স্বর্গদ্বার" নামক বেলাভূমির উপকণ্ঠে উপনীত হইয়া, "প্রতিপোতারোহণে" সমুদ্রতটে পদার্পণ করিবার পর

"তন্ত্রমন্ত্রানুসারে" স্নান-তর্পণাদি সমাপ্ত করিয়া তথায় অনেক প্রস্তর-চৈত্য দেখিতে পাইয়াছিলেন। মহাসমুদ্রতটের মহাশ্মশানে যাঁহাদের নশ্বর দেহ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় ভস্মীভূত হইত, তাঁহাদের চিতার উপরে সেই সকল চৈত্য নির্ম্মিত হইত। কেন হইত, তাহার কারণনির্দ্দেশের জন্য কবি লিখিয়া গিয়াছেন,—

"যেঽত্র ক্ষেত্রবরে পুরা কৃতপরীপাকান্তনুত্যাগিনো
দহ্যন্তে কিল যত্র যত্র বিধিবত্তত্তৎস্থলে সত্বরম্।
প্রাসাদা বিপুলোপলৈর্ব্বিরচিতাঃ সম্যক্‌সুধাশালিনঃ
স্থাপ্যন্তে মলমূত্রদূষণভিয়া তৎপুত্রপৌত্রাদিভিঃ॥"

এখনও এই শ্রেণীর দুই চারিটি চৈত্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল চৈত্যের অনতিদূরে, শ্মশানভূমির সান্নিধ্যে, "শ্রীচৈতন্য-মণ্ডলী" নামক "পরম ভাগবতগণে"র আবাস দেখিয়া, তাঁহারা পুরী ছাড়িয়া শ্মশানবাসী হইয়াছেন কেন,—তাহা জানিবার জন্য লীলাবতী দেবীর স্বাভাবিক কৌতূহল উপস্থিত হয়। তাহা চরিতার্থ করিতে গিয়া বিদ্যার্ণব উৎপ্রেক্ষার সাহায্যে একটি গুপ্ত রহস্যের দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া গিয়াছেন। তখনও "চৈতন্য-মণ্ডলী" নগরমধ্যে স্থান-লাভ করিতে পারেন নাই। কারণ, তখনও তাঁহারা "নিঃশ্রেণিক" বলিয়া সামাজিকগণের প্রতিবেশী হইবার অধিকার লাভ করেন নাই। যথা,—

"লোকানা মভিযোগিনাং সুরপুরাদুচ্চৈঃ পদারোহণে
তৎকার্য্যেপ্যবলম্বনায় কিমপি প্রায়ো ন সংপশ্যতা।
মন্যে দৈন্যবশীকৃতেন বিধিনা স্বর্গার মারোপি কিং
শ্রীচৈতন্য-মতানুসারি-সুজন-শ্রেণীতি-নিঃশ্রেণিকা॥"

অতঃপর তীর্থযাত্রী দম্পতী পুরীধামের বিভিন্ন দেবমন্দির-দর্শনোপলক্ষে নানা তথ্যের আলোচনায় অনেক ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক সমাচার বিবৃত করিয়া তীর্থযাত্রাবসানে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আরম্ভ করেন। লীলাবতী দেবীর সাগরভীতিই বোধ হয় প্রত্যাবর্ত্তনকালে স্থলপথের দিকে বিদ্যার্ণবকে আকৃষ্ট করিয়া থাকিবে। কিন্তু স্থলপথে প্রত্যাবর্ত্তন করিববার সময়েও চিল্কা হ্রদ উত্তীর্ণ হইতে হইয়াছিল। তাহা সাগরও নহে, নদীও নহে, তাহা কি ও তাহার নাম কি, লীলাবতী দেবী তদ্বিষয়ে প্রশ্ন করায় বিদ্যার্ণব চিল্কা হ্রদের নামোৎপত্তির একটি নিরুক্তির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। উহার নাম "চিল্লিখা",—তদ্দেশের লোকে এখনও উহাকে "চিলিখা" বলিয়াই অভিহিত করিয়া আসিতেছে,—তাহাই ইংরেজী গ্রন্থের "চিল্কা"। তাহার নিরুক্তি এইরূপ,—

"পঙ্কং যস্মাচ্চিল্লিখং প্রাহুরার্য্যাঃ
মত্বর্থীয়াকারযোগেন তস্ত।
স্ত্রীত্বং লোকাদ্দান্ত ইত্যাদিবত্তু
তস্মাল্লোকে চিল্লিখেতি প্রসিদ্ধা ॥"

নৌকাযোগে "চিল্লিখা" উত্তীর্ণ হইয়া, লীলাবতী ও বিদ্যার্ণব যে স্থানে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহার নাম "খল্লিকোট্ট" ;—তাহাই এক্ষণে "কালিকট" নামে রম্ভা ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী চিল্কা হ্রদের দক্ষিণতটে অবস্থিত সুপরিচিত রাজবাটী। সেকালেও তথায় রাজবাটী ছিল। তথায় পীতাম্বর নামক নরপতি পিতৃবৎ প্রজাপালন করিতেন। যথা,—

"শশ্বদ্ধর্ম্মধরো নৈকনন্দনঃ শৌটীর্য্য-শৌর্য্যাশ্রয়ো
ধৈর্য্যৌদার্য্য-বিবেককেলি-নিলয়ঃ কারুণ্য-পণ্যাপণঃ।
ষড়্গুণ্যার্থবিচারবারিধি-গলৎ-সারাংশ-পীযূষভাক্
প্রেম্না পালয়তি প্রজাঃ পিতৃসমঃ পীতাম্বরঃ পার্থিবঃ ॥"

"খল্লিকোটে"র নগর-শোভা এখনও বড় রমণীয়; তৎকালে আরও রমণীয় ছিল। নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যের সঙ্গে নগর-রচনার শিল্পকৌশল মিলিত হইয়া, তাহাকে "কাঞ্চনশালিনী কাঞ্চী" হইতে,—"বিকাশবতী কাশী" হইতে—"সিদ্ধস্তনী হস্তিনা" হইতে,—অধিক রমণীয় করিয়া রাখিয়াছিল। "রঘুনাথ-সাগর" নামক সরোবর ও রঘুনাথ-নির্ম্মিত একটি সমুচ্চ দেবমন্দির নগরশোভাকে অত্যুজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিল। কোনও স্থানে "হিরণ্য-পরীক্ষা", কোনও স্থানে "কুশাদি-প্রণয়ন", কোনও স্থানে "চিত্রকম্বলসঞ্চয়"; কোনও স্থানে "ভোজনভাজন" ইত্যাদি "পণ্য-পরিপাটি" আপণশ্রেণীকে রমণীয় করিয়া রাখিয়াছিল।

এই নগর হইতে লীলাবতী ও বিদ্যার্ণব "ঋষিকুল্যা"-নদীতীরে "পণ্ডিল" গ্রামে উপনীত হইয়াছিলেন। "ঋষিকুল্যা" উৎকল প্রদেশের দক্ষিণ সীমায় অবস্থিত। তাহা "গঙ্গা-প্রতিরূপা", পুণ্যতোয়া স্রোতস্বতী বলিয়া, লীলাবতী সাষ্টাঙ্গপ্রণতা হইয়াছিলেন। ঐ প্রদেশ তৎকালে জয়সিংহ নামক নরপতির "ধরাকোট" নামক বিষয়ের অন্তর্গত ছিল। জয়সিংহ কেবল দোর্দ্দণ্ডবিক্রমশালী "নলরাজ-কুলপ্রসূত" প্রভূতগুণশালী নরপাল ছিলেন না; তিনি "ভব্যকাব্যনির্ম্মাণপটু" সুপণ্ডিত বলিয়াও পরিচিত ছিলেন।

এই স্থান হইতে তাঁহারা "খিমুণ্ডী" নামক জনপদের "পাঠপুর গ্রামোপবনে" প্রবেশ করিয়াছিলেন। তৎকালে তাহা "গঙ্গবংশকরীরাঙ্কুরাবতার" পুরুষোত্তম

নামধেয় "চক্রবর্ত্তি-চূড়ামণি" অনঙ্গ ভীমদেব নৃপতির অধিকারভুক্ত ছিল। লীলাবতীর প্রশ্নে গঙ্গবংশের আমুল কাহিনী কীর্ত্তন করিয়া, বিদ্যার্ণব গ্রন্থ শেষ করিয়াছেন। ওড্রদেশের "কটকরাজধানীনিবাসী" নরপতিগণের পরিচয়-প্রদানের জন্য বিদ্যার্ণব বলিয়াছেন,—

> "গঙ্গান্বয়ে প্রথমতোঽজনি দেবষট্‌কং
> সংজজ্ঞিরে তদনু ষড় বলিতো নৃসিংহাঃ।
> ষড়্‌ভানবোপ্যুদয়সম্পদ মাপুরেব-
> মষ্টাদশাঽজনি ততঃ ক্ষিতিপাঃ ক্রমেণ॥"

এই বংশ "গঙ্গবংশ" নামে পরিচিত হইয়াছিল কেন, লীলাবতী দেবীর এই প্রশ্নের উত্তরে বিদ্যার্ণব একটি ঐতিহাসিক তথ্যের অবতারণা করিয়া বলিয়া গিয়াছেন,—

> "দেবেষু চাবিরভবৎ প্রথমং কুড়ঙ্গো
> যং চৌড়গঙ্গ ইতি কেচন নির্দ্দিশন্তি।
> ধীমানসৌ সহজবুদ্ধি-বলোদয়েন
> সিংহাসনং গজপতেঃ স্বয়মধ্যুবাস॥"

চৌড়গঙ্গ হইতে গঙ্গবংশের উৎপত্তি, তিনিই গজপতির সিংহাসনে প্রথমে আরোহণ করিয়াছিলেন। ইতিহাস-পাঠকের নিকট চৌড়গঙ্গের পরিচয় অবিজ্ঞাত নাই। তিনি বঙ্গবিজয়ী রাজেন্দ্র চোড়ের দৌহিত্র। উত্তরকালে গঙ্গবংশের উৎপত্তি-কাহিনী জনশ্রুতির অত্যাচারে একটি অলৌকিক কাহিনীতে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। "গঙ্গবংশানুচরিতম্" রচিত হইবার সময়েও সে কাহিনী প্রচলিত ছিল। গ্রন্থকার তাহার উল্লেখ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন,—

> "বিধবায়া গঙ্গাভিধেয়ায়াঃ কস্যাশ্চিৎ ব্রাহ্মণ্যাঃ মহাদেববরপ্রসাদাৎ যঃ পুত্রোঽভূৎ তদ্বংশো গঙ্গবংশঃ।"

এই কাহিনী লোকসমাজে প্রচলিত থাকিলেও, ইহা যে প্রকৃত কাহিনী নহে, তাহার পরিচয়-প্রদানের জন্য কবি স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া গিয়াছেন,—"তদসৎ।" গঙ্গবংশীয় নরপতিগণের অনেকগুলি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার সাহায্যে উৎকলের ইতিহাস কিয়দংশে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে; বাঙ্গালার ইতিহাসেও কোনও কোনও বিলুপ্ত তথ্য উদ্‌ঘাটিত হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং এই কাব্যে গঙ্গবংশের যে সকল কীর্ত্তিকাহিনী উল্লিখিত আছে, তাহা সযত্নে আলোচিত হইবার যোগ্য। আপততঃ সে আলোচনায় হস্তক্ষেপ না করিয়া, কাব্যোক্ত গঙ্গবংশের বিবরণ উদ্ধৃত করিয়াই নিরস্ত হইব।

এই কাব্যে বংশাবলী যে ভাবে বিবৃত হইয়াছে, তাহার সূচী প্রথমেই প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এই বংশে ছয় জন "দেব", ছয় জন "নৃসিংহ", ছয় জন "ভানু" এই অষ্টাদশ নৃপতি; এবং তৎপরে অন্যান্য "ক্ষিতিপতি" জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের নাম যথাক্রমে এইরূপে উল্লিখিত হইয়াছে :—(১) কুড়ঙ্গ, (২) চুড়ঙ্গ, (৩) রাজরাজেশ্বর, (৪) অতিরথ, (৫) একজটী কামদেব, (৬) মদন কামদেব, (৭) অনঙ্গ ভীম, (৮) নৃসিংহ, (৯) ভীম নৃসিংহ, (১০) পুরুষোত্তম নৃসিংহ, (১১) কবি নৃসিংহ, (১২) অকটাসরটা নৃসিংহ, (১৩) প্রতাপ নৃসিংহ (১৪) নিশঙ্ক ভানু, (১৫) বাতুল ভানু, (১৬) বীর ভানু, (১৭) রুচিক ভানু, (১৮) মধর ভানু (১৯) কজ্জল ভানু, (২০) স্বর্ণ ভানু, (২১) কালযণ্ড, (২২) চুড়ঙ্গ, (২৩) নৃসিংহ, (২৪) অনন্ত, (২৫) পদ্মনাভ, (২৬) পীতাম্বর, (২৭) পীতাম্বর-বৈমাত্রেয়-বাসুদেবের পুত্র পুরুষোত্তম।

কবি প্রসঙ্গক্রমে এই সকল নরপালের শাসনকালের সংখ্যা ও কীর্ত্তিকলাপ কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়,—অনঙ্গ ভীম কর্ত্তৃক শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির ও প্রথম নৃসিংহদেব কর্ত্তৃক কোণার্কের সূর্য্যমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। শ্রীশ্রীজগন্নাথ-মন্দির-নির্ম্মাণের সময় এইরূপে উল্লিখিত আছে; যথা—

"অব্দক্ষোণী-শশাঙ্কেন্দু-সম্মিতে শকবৎসরে।
অনঙ্গভীমদেবেন প্রাসাদঃ শ্রীপতেঃ কৃতঃ।"

ইহাতে ১১১৯ শকাব্দা—১১৯৭ খৃষ্টাব্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়। মন্দির-রচনার শিল্পরীতির সহিত ইহার সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। তখন বঙ্গভূমির জীবন-সন্ধ্যা,—উৎকলের জীবন-প্রভাত।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

সীতারাম-প্রসঙ্গ।

ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রত্যেক বড় বড় কুঠীতে বা ফ্যাক্টারিতে দৈনিক কার্য্যের এবং পরামর্শের বিবরণ (Dairies and consultations) লিখিয়া রাখা হইত। বাঙ্গলাদেশের মধ্যে হুগলী, কলিকাতা, কাশীমবাজার, মালদহ এবং ঢাকা, এই পাঁচ স্থানে কোম্পানীর কুঠীর এই প্রকার বিবরণ-সংবলিত

প্রাচীন খাতাপত্র লণ্ডনের ইণ্ডিয়া আফিসের মহাফেজখানায় রক্ষিত হইয়াছে। * পরলোকগত উইলসন সাহেব (C. R. Wilson) বাঙ্গালার ইংরেজের প্রাচীন ইতিহাস (Early Annals of the English in Bengal নামক দুই খণ্ডে প্রকাশিত গ্রন্থে কলিকাতায় (Fort William) দুর্গে রক্ষিত ১৭০৪ হইতে ১৭১৭ খৃষ্টাব্দের দৈনিক বিবরণের সারভাগ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। এই বিবরণে কোম্পানীর ব্যবসায়-বাণিজ্যের ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে দেশের শাসনকর্ত্তৃগণের ও জনসাধারণের ইতিহাসেরও কোনও কোনও কথা পাওয়া যায়। এই সকল কথা ঘটনার ঠিক সমসময়ে কার্য্যানুরোধে লিখিত। সুতরাং ইতিহাস-সেবকের নিকট এই শ্রেণীর উপকরণের মূল্য খুব বেশী। উইলসন সাহেবের গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে (১৬৬—১৬৮ পৃঃ) সীতারাম রায়ের ও তাঁহার পরিজনের এই বিবরণ পাওয়া যায়,—

১৭১৩ (আধুনিক হিসাবে ১৭১৪) খৃষ্টাব্দের ৫ই মার্চ্চ তারিখে ফোর্ট ইউলিয়মের দৈনিক বিবরণপুস্তকে লেখা হইয়াছে,—"ভবিষ্যতে যদি সীতারামের পরিবারবর্গের ও ভৃত্যগণের কথা লইয়া আমাদিগের প্রতি (কোম্পানীর প্রতি) কেহ উৎপাত করে, তাহা হইলে, সেই ঘটনার স্মরণার্থ এবং তদনুসারে কৈফিয়ৎ দিবার নিমিত্ত এই বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করা হইল।

"১১ই ফেব্রুয়ারী।—হুগলীর ফৌজদার মীর নাসির পত্র দ্বারা এবং লোকমুখে বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে, দেওয়ান জাফর খাঁ (তৎকালের সুবাদার নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁ) খবর পাইয়াছেন, এবং মনে করেন,—ভূষণার ভূতপূর্ব্ব জমীদার সীতারামের পরিবারবর্গ আমাদের সহরে (কলিকাতায়) লুকাইয়া আছে। তাঁহাদের সঙ্গে নাকি ত্রিশ লক্ষ টাকা আছে। আমরা যদি তাঁহাদিগকে লুকাইয়া রাখি, এবং রক্ষা করি, তাহা হইলে, তিনি এই টাকা বাদশাহের পক্ষ হইতে আমাদের নিকট দাবী করিবেন। মীর নাসির বন্ধুভাবে আমাদিগকে পরামর্শ দিয়াছেন, সীতারাম নরহত্যার ও রাজদ্রোহের অপরাধে দেওয়ানের (অর্থাৎ নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁর) আদেশে নিহত হওয়ায়, তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি এখন বাদশাহের প্রাপ্য। সুতরাং ভাল করিয়া খুঁজিয়া বাহির করিয়া সীতারামের পরিবারবর্গকে টাকা-কড়ি সহ পাঠাইয়া দেওয়া আমাদের কর্ত্তব্য। নতুবা এই অছিলায় দেওয়ান আমাদের নিকট হইতে অনেক টাকা আদায় করিবার চেষ্টা করিবেন। এই সংবাদ পাইয়া আমরা আমাদের পাটোয়ারী, শিকদার, কোতো-

* Birdwoods *Report on the Old Records of the India Office.* London, 1891, pp. 90—92.

য়াল প্রভৃতি সমস্ত কৃষ্ণকায় (black) কর্ম্মচারিগণকে তলব দিয়া আনিয়া মীর নাসিরের বার্ত্তাবহগণের মোকাবেলায় জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহারা সীতারামের পরিজনগণ সম্বন্ধে কিছু জানে কি না? তাহারা সকলেই অস্বীকার করিল। তখন মীর নাসিরের প্রেরিত লোকদিগের মধ্যে এক জন বলিল যে, সে দেওয়ান (নবাব) কর্ত্তৃক সীতারামের পরিবারবর্গকে গ্রেফ্‌তার করিবার জন্য নিয়োজিত হইয়াছিল, এবং আমাদের সহরে (কলিকাতায়) সীতারামের পরিবারের অনেককে গ্রেফ্‌তারও করিয়াছিল। তার পর উহাদিগকে তাহার নিকট হইতে ছিনাইয়া লইয়া হ্যারী মুরের (Harry Moor) নিকট হাজির করা হয়। পরে যে সীতারামের পরিবারের লোকদিগকে কোথায় রাখা হইয়াছে, তাহা সে জানিতে পারে নাই। মুর (Harry Moor) বলিল, কয়েক জন অপরিচিত লোক একদিন নদীতে (গঙ্গায়) স্নান করিতেছিল, এবং ইহারা সীতারামের পরিজন, এই সন্দেহে, উঁহাদিগকে তাঁহার কাছে হাজির করিয়াছিল। কিন্তু তিনি ইঁহাদিগের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা নিরাপদ মনে করেন নাই। সুতরাং যাহারা উঁহাদিগকে তাঁহার নিকট আনিয়াছিল, তাহাদের সঙ্গে উঁহারা চলিয়া গিয়াছিলেন। তার পরে যে কি হইয়াছে, তাহা তিনি জানেন না। আমাদের গোবিন্দপুরের পাটোয়ারী রামনাথ বলিল যে, দেওয়ানের ভৃত্যেরা সীতারামের পরিজনগণকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল। তখন আমরা মীর নাসিরকে লিখিয়া পাঠাইলাম, সীতারামের পরিজনগণের মধ্যে কেহ যদি আমাদের সহরে লুকাইয়া থাকে, তবে তাঁহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য যথাসাধ্য যত্ন করিতেছি।

"৩রা মার্চ্চ।—১০০৲ পুরস্কার ঘোষণা করায় দুই জন দরিদ্র লোক আসিয়া খবর দিল, সীতারামের পরিজনগণকে আমাদের গোবিন্দপুরের পাটোয়ারী রামনাথই লুকাইয়া রাখিয়াছে। পুরুষগণ তাহার নিজের বাড়ীতে আছে, স্ত্রীলোকেরা আর এক স্থানে আছে। এই সংবাদ পাইয়া কলিকাতার অধ্যক্ষ (President) উহাদিগকে ধরিয়া আনিবার জন্য দুই জন বিশ্বাসী কর্ম্মচারী এবং দশ জন পেয়াদা পাঠাইলেন। তাহারা সীতারামের দুটি শিশু পুত্র, একটি শিশু কন্যা, তাঁহার পরিবারের ছয় জন স্ত্রীলোক, চারি জন ভৃত্য ও পাটোয়ারী রামনাথকে গ্রেফ্‌তার করিয়া আনিল। এই সংবাদ মীর নাসিরকে লিখিয়া পাঠান হইল।

"৫ই মার্চ্চ।—বন্দিগণকে হুগলীতে পাঠান হইয়াছিল। পরিণামে যে হতভাগ্যগণের কি দশা হইয়াছিল, কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষ তাহা লিখিয়া রাখিয়া যান নাই। ষ্টুয়ার্টের বাঙ্গালার ইতিহাসে লিখিত আছে,—নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁ বকৃস আলি

খাঁকে সীতারামের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলেন। বক্স আলি সীতারামকে, তাঁহার পরিবারের স্ত্রীলোকগণকে, শিশুসন্তানগণকে ও অনুচরগণকে ধরিয়া লৌহশৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া মুর্শিদাবাদে প্রেরণ করিয়াছিলেন। সেখানে সীতারামকে ও তাঁহার অনুচর ডাকাতগণকে শূলে দেওয়া হইয়াছিল, এবং স্ত্রীলোক ও শিশুগণকে দাস-দাসী-রূপে বিক্রয় করা হইয়াছিল। (১) এই বিবরণ যে সকল অংশে সত্য নহে, বক্স আলি খাঁ যে অন্ততঃ সীতারামের তিনটি শিশুসন্তানকে ও তাঁহার পরিবারের ছয় জন স্ত্রীলোককে ভূষণা হইতে বরাবর মুর্শিদাবাদে পাঠাইতে পারেন নাই, কোম্পানীর দৈনিক বিবরণী তাহার সাক্ষ্য দান করিতেছে।

আর একটি বিষয়ে সীতারাম সম্বন্ধে ষ্টুয়ার্টের ইতিহাসে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। ষ্টুয়ার্টের গ্রন্থানুসারে সীতারাম ডাকাতের সর্দ্দার ছিলেন। কতকগুলি ডাকাতকে তিনি মাহিনা করিয়া রাখিয়াছিলেন, এবং উহাদিগকে লইয়া রাস্তায় এবং নদীতে নৌকায় ডাকাতী করিতেন, এবং পল্লীগ্রাম হইতে গরুও চুরি করিতেন। সীতারামের অনুচরেরা তাঁহার অজ্ঞাতসারে ভূষণার ফৌজদার সৈয়দ আবু তোরাবকে হত্যা করিয়াছিল। এই অপরাধে নবাব তাঁহাকে ধ্বংস করিবার জন্য বক্স আলি খাঁকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। (২) সুতরাং ষ্টুয়ার্টের বিবরণ-অনুসারে সীতারামের অপরাধ ছিল--নরহত্যা ও ডাকাতী (murder and robbery)। কিন্তু উপরে উদ্ধৃত কোম্পানীর দৈনিক বিবরণ অনুসারে সীতারামের অপরাধ;—নরহত্যা ও রাজদ্রোহ (murder and rebellion)। ষ্টুয়ার্ট গ্লাড়ুইন- Gladwin) প্রণীত ও ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত "বাঙ্গালার ঘটনাবলীর বিবরণ" (*Narrative of the Transactions of Bengal*) নামক গ্রন্থ অবলম্বনে মুর্শিদ কুলি খাঁর ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন। (৩) এই ইংরেজী গ্রন্থ "তোয়ারিখ-ই-বাঙ্গালা" নামক ফারসী গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ। এই ফারসী

---

(১) "The Zemindars raised their *posse comitatus*, and hemmed the robbers in every side, until Buksh Ali Khan arrived, who seized Sittaram, his women, children and accomplices, and sent them in irons to Moorshudabad, when Sittaram and the robbers were impaled alive, and the women and children sold as slaves.—Stewart's *History of Bengal*, Calcutta, 1847, p. 240.

(২) *History of Bengal*, p. 239.

(৩) *Ibid* p. 252 and

গ্রন্থ ভান্‌সিটার্ট সাহেবের আদেশ অনুসারে মুন্সী সলিমুল্লা কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল। (১) সলিমুল্লা সীতারামের মৃত্যুর অর্দ্ধ শতাব্দ পরে প্রধানতঃ জনশ্রুতি অবলম্বন করিয়া এই বিবরণ সঙ্কলন করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার কথা বিনা বিচারে বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না। অধ্যাপক শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ সমদ্দার যথার্থই লিখিয়াছেন,—সীতারাম সম্বন্ধে এখনও যে সকল কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, তাহার বিচার করিলে, এবং তাঁহার রাজধানী মহম্মদপুরের সুবিশাল ভগ্নাবশেষ দেখিলে মনে হয়, সীতারাম ডাকাতের সর্দ্দার অপেক্ষা বড় দরের লোক ছিলেন। (২) কোম্পানীর দৈনিক বিবরণে উক্ত "রাজদ্রোহ" (rebellion) শব্দ ইহাই সপ্রমাণ করিতেছে। ভান্সিটার্টের সময়ে "তোয়ারিখ-ই-বাঙ্গালা"র লেখক অপেক্ষা ১৭১৩-১৪ খৃষ্টাব্দে কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষের সংবাদদাতা হুগলীর ফৌজদারের প্রকৃত ঘটনা জানিবার অনেক অধিক সুযোগ ছিল। সুতরাং নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণই সীতারামের সবংশে ধ্বংস প্রাপ্ত হইবার কারণ, এইরূপ মনে করাই সঙ্গত।

সীতারাম ভূষণার জমীদার ছিলেন, এ কথা সকলেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। কথিত আছে, ভূষণার মুকুন্দ রায় বাঙ্গলার বার ভুঁইয়ার একতম ভুঁইয়া ছিলেন, এবং ভূষণার জমীদাররূপে সীতারামও সেইরূপ পদারূঢ়ই ছিলেন। এই শ্রেণীর জমীদারের মুর্শিদ কুলি খাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইবার তখন যথেষ্ট কারণ ছিল। ১৭০১ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদ কুলি খাঁ সুবে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ান অর্থাৎ রাজস্বের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়া দেখিতে পান, সারা বাঙ্গালাদেশ জমীদার ও জায়গীরদারগণের মধ্যে বিভক্ত। ইহাঁরা অল্প রাজস্ব প্রদান করিতেন। সুতরাং তৎকালে বাঙ্গালার আয়ের দ্বারা বাঙ্গালাদেশের শাসনসংরক্ষণের খরচ চলিত না। মুর্শিদ কুলি খাঁ জমীদারগণের রাজস্ববৃদ্ধি করিয়াছিলেন, এবং এ যাবৎ একরূপ স্বাধীন জমীদারগণকে আপনার বশীভূত করিয়াছিলেন। (৩) এই বর্দ্ধিত হারে রাজস্ব না দিতে পারিলে, তিনি জমীদারগণকে কারারুদ্ধ করিতেন, এবং অবস্থাবিশেষে জমীদারী বাজেয়াপ্ত করিতেন। রাজস্ব আদায়ের জন্য মুর্শিদ কুলি খাঁর নাৎজামাই সৈয়দ রেজা খাঁ জমীদার

(১) Ethe's *Catalogue of Persian manuscripts in the India office*, Vol. I, p. 186, No. 478.

(২) Bengal: Past and Present, Vol. V (April—June, 1910), p. 236.

(৩) "By this means the whole of the Zemindars, or Hindu landholders

গণকে "বৈকুণ্ঠ" নামক দুর্গন্ধময় পুকুরে ডুবাইয়া রাখিতেন। (১) ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাঙ্গালার দেওয়ানী পাইয়া ভূসম্পত্তি সম্বন্ধে দেওয়ান মুর্শিদ কুলির নীতির অনুসরণ করিতে গিয়া অনুযোগের ভাগী হইয়াছিলেন। গভর্ণর-জেনরেলের পদ ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে ফিরিয়া যাইবার সময় ওয়ারেণ হেষ্টিংস জাহাজে বসিয়া স্বীয় শাসনপ্রণালীর যে বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে বাঙ্গালার জমীদারগণ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"The Public in England have of late years adopted very high ideas of the rights of the Zemindars in Hindustan; and the prevailing prejudice has considered every occasional dispossession of a Zemindar from the management of his lands, as an act of oppression.……I do not contest their right of inheritance to the lands, whilst I assert the right of Government to the produce thereof. The Mahommedan rulers continually exercised, with a severity unknown to the British administration in Bengal, the power of dispossessing the Zemindars on any failure in the payment of their rents, not only pro tempore but in perpetuity. The fact is notorious; but lest proof of it should be required, I shall select one instance out of many that might be produced, and only mention that the Zemindary of Rajshahy, the second in rank in Bengal, and yielding an annual revenue of about twenty-five lacks of rupees, has risen to its present magnitude during the course of the last eighty years, by accumulating the property of a great number of dispossessed Zemindars, although the ancestor of the present possessor had not by inheritance a right to the property of a village within the whole Zemindary." (২)

মোগল বাদশাহের যে সকল সেনানী দাউদকে পরাজিত করিয়াছিলেন, কতলু খাঁর ও ওসমানের বিদ্রোহ দমন করিয়াছিলেন, এবং বিক্রমপুরের কেদার রায়ের ও যশোহরের প্রতাপাদিত্যের ধ্বংস করিয়াছিলেন, তাঁহারা বঙ্গবিজেতা বলিয়া অভিহিত হইতে পারেন কি না সন্দেহ। প্রকৃত বঙ্গবিজেতা মুর্শিদ কুলি খাঁ। কারণ, মুর্শিদ কুলি খাঁই বাঙ্গলার মাটীকে মোগলের পদানত করিয়াছিলেন। এইরূপ বৃহৎ কার্য্য নির্ব্বিবাদে সম্পন্ন হইতে পারে না। এই সূত্রেই বোধ হয় সীতারাম বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। কথিত আছে, দিনাজ-

---

were placed under the immediate control of the Dewan, who, by this authority, enforced a very considerable rise on their rents, and thereby much augmented the revenue of the state."—Stewart's *History of Bengal*, P. 222.

(১) *Ibid.* PP. 232, 237.

(২) Forvest, *Selections from the State Papers of the Governors-General of India, Warren Hastings*, II. (Oxford, 1910). PP. 72-73.

পুরের মহারাজ রামনাথও মুর্শিদ কুলি খাঁর বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইয়াছিলেন। সীতারামের আত্মোৎসর্গ যে বিফল হইয়াছিল, তাহাও মনে হয় না। এই আত্মোৎসর্গের ফলেই বোধ হয় বিষ্ণুপুর, বর্দ্ধমান, নদীয়া, চন্দ্রদ্বীপ, দিনাজপুর প্রভৃতি জমীদারীগুলি মুর্শিদ কুলি খাঁর হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছিল।

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ।

নথির সামিল।

১

রমাকান্ত সেরেস্তাদার মহাশয়ের আরও গোটা কতক বৎসর কাটিয়া গেলে পেন্সনের হক্ জন্মিত। বেশী নয়, দশ বৎসর। কিন্তু হঠাৎ তাঁহার জ্যেঠামহাশয় শ্রীযুক্ত কালীকান্ত সিংহ নিঃসন্তান অবস্থায় দেহত্যাগ করাতে, রমাকান্ত উত্তরাধিকারিস্বরূপ বেড়গ্রাম নামক জমীদারীর মালিক হইয়া পড়িলেন। জমীদারীর বাৎসরিক আয় দশ হাজারের কম নয়।

এমত অবস্থায় চাকুরী এবং জমীদারী একত্র চালানো সম্পূর্ণ অসম্ভব। বিশেষতঃ, বীরভূমের কালেক্টরী হইতে বেড়গ্রাম অনেক দূর। কাজেই চাকুরীতে ইস্তফা দিয়া রমাকান্ত বেড়গ্রামে চলিয়া যাইতে প্রস্তুত হইলেন। বীরভূমে রমাকান্তের মত 'পাকা' সেরেস্তাদার এ পর্য্যন্ত কেহ হইতে পারে নাই। আপিসের নথিপত্র রাখিতে, এবং 'ফাইল' দোরস্ত করিতে, হিসাবমত ফিতা বাঁধিয়া দরকারী চিঠিখানির মাথায় 'পতাকা' লাগাইতে, এবং সাহেবের মনের মত 'নোট' দিতে রমাকান্ত অসাধারণ পণ্ডিত। রমাকান্ত যাহা লিখিতেন, কালেক্টর সাহেব কখনও তাহা কাটিতেন না ; কেবল, 'আমি ইহার সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করি'—ইহাই লিখিয়া দিতেন। রমাকান্তের অসাধারণ প্রতিপত্তি দেখিয়া সকলে তাঁহাকে ভয়ঙ্কর মান্য করিয়া চলিত।

রমাকান্তের 'ইস্তফা' প্রস্তাবে সাহেব নিতান্ত বিমর্ষ হইয়া বলিলেন, 'রমা বাবু! তুমি এখন একটা বড় জমীদারীর মালিক। আমি তোমাকে আর সেরেস্তাদারীতে বদ্ধ করিতে পারি না। তবে তুমি আপিসের কাজে যে অসাধারণ জ্ঞান লাভ করিয়াছ, তাহার জন্য শীঘ্রই একটা খেতাব পাইবে। আপাততঃ আমার বিশেষ অনুরোধ যে, তুমি ইস্তফা না দিয়া এক বৎসরের ছুটী লও, এবং নিজের জমীদারীতে একটা ভাল আপিস খাড়া কর। আমার বেশ বিশ্বাস যে, কাগজপত্র ঠিক থাকিলে

জমীদারীর কোনও বেবন্দোবস্ত হইতে পারে না। যদি সুবিধা বোধ কর, সরকারী কর্ম্মে ইস্তফা দিও; নচেৎ পুনর্ব্বার সেরেস্তাদারীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিও।'

রমাকান্তের নিজেরও তাহাই মত। দুঃখের বিষয়, রমাকান্ত নিঃসন্তান। প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে রমাকান্ত শ্বশুরালয় হইতে স্ত্রীবিয়োগের সংবাদ পাইয়াছিলেন, কিন্তু পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহের দুর্দ্দম্য ইচ্ছা থাকিলেও, খরচের অকুলান ভয়ে বিবাহের কথা কাহাকেও পাড়িতে দিতেন না। বেড়গ্রামে গিয়া জমীদারীর তত্ত্বাবধান করিতে রমাকান্তের প্রায় এক বৎসর লাগিল। তিনি তাহারই মধ্যে যত দূর সম্ভব একটা ছোট খাটো আপিস খাড়া করিলেন।

আপিস প্রতিষ্ঠা করিয়াই রমাকান্ত যত রকম ফাইল এবং 'কলেক্‌সন' ছোট জমীদারীর মধ্যে সম্ভব, তাহার একটা নির্ঘণ্ট তৈয়ারি করিয়াছিলেন। সেটা তাঁহার টেবিলের উপর দিনরাত্রি থাকিত। মোটামুটি ধরিতে গেলে নির্ঘণ্টটা খুব হুঁসিয়ারীর সহিত তৈয়ারী করা হইয়াছিল। একটা আংশিক তালিকা দিলে বুঝা যাইবে:—

বিষয় নং ১। জমাবন্দি।
২। খসড়া ও দাগ প্রভৃতির বিবরণ।
৩। জমা ওয়াশীল বাকি, প্রত্যেক প্রজার।
৪। মামলা মোকদ্দমার বিবরণ।
৫। আয়-ব্যয়ের বজেট।
৬। জমীদারীর উন্নতি সম্বন্ধে।
৭। চাঁদা এবং দানশীলতার বিবরণ।
৮। কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

কিন্তু এগুলি অপেক্ষা উল্লেখযোগ্য আরও কয়েকটি:—

৯। ধর্ম্ম কর্ম্মের বিবরণ।
১০। বিপন্ন আপদের বিবরণ।
১১। পূর্ব্বপুরুষের ইতিহাস।
১২। সংক্রামক রোগ প্রভৃতি।

জমীদারী আপিসের প্রধান মুহুরী 'ঘনশ্যাম'। তাঁহার একটা চক্ষু খুব ছোট। দ্বিতীয় মুহুরী—বনমালী হালদার। তাহার নাসিকা খুব বড়। উভয়েই খুব বিচক্ষণ মুহুরী। বনমালী মনে করিত, 'ঘনশ্যাম' পরলোকে গেলে তাহার মাহিনা নির্ঘাত পঞ্চাশে দাঁড়াইবে। ঘনশ্যাম মনে করিত, বনমালী যদি হঠাৎ মরিয়া যায়, তবে তার ভাগিনেয়কে সেইখানে ভর্ত্তি করিয়া দিবে। এই জন্য

উভয়ের মধ্যে খুব সদ্ভাব, এবং কোনও বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইলে উভয়ে পরস্পরকে জিজ্ঞাসা না করিয়া মনিবকে 'নোট' দিত না।

উভয়েরই মালিকের নিকট খুব প্রতিপত্তি। তবে রমাকান্ত বাবু অত্যন্ত সন্দিগ্ধচিত্ত, এবং অতি সামান্য কারণেই তাঁহার সন্দেহ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া ভীষণ আকার ধারণ করিত, সেই জন্য তিনি কোনও মুন্সীকেই বিশ্বাস করিতেন না। মফঃস্বলের তহসিলদারদিগের প্রতিও তাঁহার সেই ভাব। সুতরাং সকলে মিলিয়া মিশিয়া একটা নির্দ্দিষ্ট রকমের চুরীর বন্দোবস্ত করিয়াছিল, তাহা রমাকান্ত বাবু জানিতে পারিয়াও রহিত করা অসম্ভব মনে করিতেন। 'যখন কালেক্টরীতেই দিবা দ্বিপ্রহরে এ সব চলিয়া থাকে, তখন সামান্য একটা জমীদারীতে ইহা থামানো কি সোজা কথা ?'

তবে আপিস পত্তন করিয়া এই একটা সুবিধা হইয়াছিল যে, কোনও রকম জুয়াচুরী হইলে কাগজে কলমে তাহার আলোচনা হইয়া যাইত, এবং ভবিষ্যতে সে রকম জুয়াচুরী যাহাতে না হয়, তাহার রীতিমত মন্তব্য প্রকাশিত হইত।

কোনও একটা বিষয় সম্পূর্ণরূপে আলোচিত হইয়া গেলে, এবং তাহার সম্বন্ধে মালিকের মন্তব্য প্রকাশ হইলে, সেটা অবশেষে নথির সামিল্ হইয়া যাইত, এবং দরকার হইলে তাহার নকল বাহির করিয়া প্রতিপক্ষের নিকট পাঠানো হইত। এই রকম সুব্যবস্থা হওয়াতে রমাকান্তের জমীদারী অল্পদিনের মধ্যেই একটা অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিবার উপক্রম করিল।

২

গ্রীষ্মাতিশয্যবশতঃ তখন প্রাতঃকালে ৭টা হইতে এগারটা পর্য্যন্ত আপিস হইত। দশটার ডাক খুলিয়াই রমাকান্ত বাবু চিঠিগুলি আপিসে পাঠাইয়া দিলেন। 'সংসার' এবং 'বাটীর মধ্যে' বলিয়া কোনও স্থানবিশেষ না থাকাতে, তাঁহার যত চিঠি সবই আপিসে যাইত, এবং যথাযোগ্য ভাবে 'ফাইলে' আলোচিত হইত।

সেদিনকার সব চিঠিগুলি 'ডকেট্' করিবার পর বনমালী দেখিল যে, একখানি চিঠিতে মনিবের হাতের 'জরুরি' মার্কা আছে। চিঠিখানি উল্লেখযোগ্য বলিয়া উদ্ধৃত করা গেল :—

মহিমাবরেষু। যদি দারপরিগ্রহ সম্বন্ধে কোনও কথাবার্ত্তা থাকে, তবে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিলে আমরা তাহার সরবরাহ করিয়া দিয়া থাকি। বিজ্ঞাপন-প্রকাশক স্থানীয় তদন্ত, এমন কি, দরকার হইলে পাত্র এবং পাত্রীকে কোনও আত্মীয় কুটুম্বের বাটীতে লইয়া আসিয়া পরিদর্শন, তাহারও বন্দোবস্ত হয়।

বশংবদ শ্রীকুলদাচরণ ভৌমিক নং ৩৭৬ গ্রে ষ্ট্রীট্—কলিকাতা—(পাত্র-পাত্রী-সন্ধান-সংঘ আপিস।)

পত্রখানি কিছু নূতন, এবং পূর্ব্বে কখনও এ বিষয়ের ফাইল খোলা হয় নাই। বিষয়টা 'বিবাহ'। কিন্তু রমাকান্তবাবুর কড়া হুকুম যে, তাঁহার অনুমতি না লইয়া কোনও নূতন 'ফাইল' খোলা হইবে না। অনেক চিন্তিয়া বনমালীর বোধ হইল যে, বিবাহটা ধর্ম্মকর্ম্মের মধ্যে, সুতরাং 'ধর্ম্মকর্ম্মের বিবরণ' নামক ফাইলের মধ্যে চিঠিখানি রাখিয়া নোট লিখিল।

নোট এবং মন্তব্য (ক্রমশঃ)— পত্রাঙ্ক (১)

ক্রমিক নম্বর	
১	ঘনশ্যাম বাবু!— কুলদাচরণের চিঠি দেখুন। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে কোনও ফাইল খোলা হয় নাই। সুতরাং 'ধর্ম্মকর্ম্মে'র মধ্যে রাখিয়া দিলাম। ৯নং জরুরি মার্কা কর্ত্তার নিকট পেশ করিবেন। ১০।৩।১৫ বোনমালি বনমালী বাবু! (এটা ভুল ফাইলে রাখা হইয়াছে। 'বিবাহ' সম্বন্ধে কোনও কাগজপত্র ১১নং 'পূর্ব্বপুরুষের ইতিহাস' ফাইলভুক্ত করা উচিত। এ সম্বন্ধে তোমার ভ্রম অমার্জ্জনীয়। যাহা হউক, 'জরুরি' মার্কা থাকাতে অদ্যই পেশ করিলাম।) কর্ত্তার নিকট পেশ—১০।৩।১৫—ঘনেশ্যাম হেডমুহুরী ঘনশ্যাম বাবু! আপিসের মধ্যে এ রকম তর্ক বিতর্ক করা ক্ষোভণীয়। বিষয়টা 'বিবাহসম্বন্ধে বিজ্ঞাপন' প্রভৃতি লইয়া। ইহা ৮নং 'কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন' প্রভৃতির শ্রেণীভুক্ত, কিন্তু আপাততঃ চিঠিখানি 'সংক্রামক রোগ' নামক ফাইলে রাখিয়া দেও (১২ নং)। উত্তর দেও :—'মহাশয়ের পত্র পাইয়া প্রীত হইয়াছি। যদিও এ পক্ষে 'সহধর্ম্মিণী'র স্থান খালি আছে, কিন্তু বয়োবাহুল্য প্রযুক্ত 'পাত্রী অন্বেষণ' করা আমার পক্ষে ধৃষ্টতামাত্র। যদি কেহ 'প্রাইভেট্ সেক্রটারী' স্বরূপ ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত হইতে বাঞ্ছনা করেন, তবে আমি সহধর্ম্মিণী ভাবে গ্রহণ করিতে পারি। এই ভাবে বিজ্ঞাপন দিবেন।'—রমাকান্ত। ১০।৩।১৫

এই মন্তব্যের পর সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন বাহির হইল।—

'উত্তররাঢ়ী কায়স্থ। সুপুরুষ। বয়স প্রায় ৪৫। নিঃসন্তান। জমীদারীর আয় প্রায় বার হাজার টাকা। ৩৪৫ নং তৌজী। বীরভূম কালেক্টরীর অন্তর্ভুক্ত। দেনা পাওনা শূন্য।— সুশিক্ষিতা এবং বয়ঃস্থা কোনও পাত্রী যদি 'প্রাইভেট্ সেক্রেটারী' রূপে অধিষ্ঠিতা হইতে চাহেন, তবে পাণিগ্রহণ করিতেও প্রস্তুত। আফিসের সময় এখন সাতটা হইতে এগারটা (প্রাতঃকাল)। শীতকালে দ্বিপ্রহর হইতে বেলা পাঁচটা পর্য্যন্ত। হিন্দুধর্ম্মপরায়ণ। পূজা অর্চ্চনার সময় প্রত্যূষে ৫—৬টা এবং প্রদোষে ৭—৮টা। বাটীতে বিগ্রহ আছে।—কুলদাচরণ ভৌমিকের আপিসে অনুসন্ধান করুন। ৩৭৬ নং গ্রে ষ্ট্রীট্।'

এই বিজ্ঞাপন বাহির হইবার কিয়দ্দিবসের পরে প্রায় এক শত পঁচিশখানা দরখাস্ত ফটোগ্রাফের সহিত ভৌমিক মহাশয়ের আপিসে উপস্থিত হইল। অনেকগুলিতে পাত্রীর রচনা—গদ্য এবং পদ্য সংবলিত।

ভৌমিক মহাশয় সেইগুলি পার্শেল করিয়া বেড়গ্রামে পাঠাইলেন, এবং তৎসঙ্গে লিখিলেন,—'মহিমাবরেষু।—আপনার ১০।৩।১৫ তারিখের রেজষ্টারি নং ২৩৫ (সংক্রামক রোগ) চিঠির মোতাবিক আমরা যে বিজ্ঞাপন দিয়াছিলাম, তাহা সাতিশয় ফলদায়ক হইয়াছে। যে সব দরখাস্ত পাঠান গেল, তাহার মধ্যে যেগুলি আপনার পছন্দ হয় তাহা লিখিয়া পাঠাইলে বিশেষ তদন্ত করা যাইবেক। বশংবদ শ্রীকুলদাচরণ ভৌমিক ১৪।৪।১৫'

নোট এবং মন্তব্য (ক্রমশঃ)— পত্রাঙ্ক (২)

ক্রমিক নম্বর	
২	আমাদের ২৩৫ নং-এর উত্তর। কুলদা বাবুর—১৪।৪।১৫ এবং তাহার সঙ্গে ১২৫ দফা দরখাস্ত। ৩৪ খানা আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার ফটোগ্রাফ (পতাকা—ক হইতে ব্যঞ্জন বর্ণের ক্ষ পর্য্যন্ত) কর্ত্তার নিকট পেশ হইবে। বোনমালী—১৫।৪।১৫ ফটোগ্রাফ আল্‌বমে রাখিয়া দিলাম (নীলবর্ণের ফিতাসংযুক্ত)। পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে, ফটোগ্রাফগুলি একই ব্যক্তির, চৌত্রিশ রকম করিয়া তোলা হইয়াছে, নানাবিধ ভাবভঙ্গী ও পরিচ্ছদের পরিবর্ত্তনবশতঃ বোধ হইতেছে অনেক লোকের। আমার বিবেচনায় দরখাস্তগুলিও একই লোকের। রূপলাল কর্ম্মকার যে হুজুরের সেরেস্তায় পট টানে এবং জীবনকৃষ্ণ বিশ্বাস (সদর আমীন) তাহাদেরও এই মত।

নোট এবং মন্তব্য ক্রমশঃ পত্রাঙ্ক—২

ক্রমিক নম্বর	
	যথাযোগ্য হুকুম বাঞ্ছনীয়। ঘনেশ্যাম, হেডমুহুরী। ১৬।৪।১৫
	মন্তব্য :—হেড মুহুরী! তোমার নোটে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। অদ্য হইতে ৫৲ টাকা মুশারা বৃদ্ধি হইল (ইহার নকল থাজাঞ্চীর নিকট পাঠাও।)। আমি তোমার মত সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। কুলদা বাবুকে 'মিস্ বসন্তকুমারী' নামক পাত্রীর অনুসন্ধান করিতে বল। আমি রাজি আছি। ১৭।৪।১৫। রমাকান্ত।
৩	কুলদাবাবুর উত্তর। পাত্রী এবং তাঁহার পক্ষীয় এক জন লোক পাত্রকে দেখিতে আসিবেন। দিন স্থির করিতে আজ্ঞা হয়। বোনমালী এবং ঘনেশ্যাম।
৫	২০।৪।১৫ দিন স্থির কর। রমাকান্ত।

৩

নির্দ্দিষ্ট দিনে বেড়গ্রামে পাত্রকে দেখিবার জন্য পাত্রী শ্রীমতী বসন্তকুমারী নিতাইচরণের সঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রমাকান্ত বাবু বেলা ৯টার সময় আপিসে বসিয়া জমীদারীর কাগজপত্র দেখিতেছিলেন। দরওয়ান আসিয়া তাঁহাদের 'কার্ড' দিয়া গেল।

রমাকান্ত বাবু সসম্ভ্রমে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিয়া চেয়ারে বসাইলেন। পাত্রীর বয়স ৩৪।৩৫ আন্দাজ, খুব সুশ্রী। নিতাই বাবু হাস্য করিয়া বলিলেন, 'আমরা পরম আপ্যায়িত হইলাম'।

বসন্তকুমারী। নিশ্চয়। বেড়গ্রাম স্থানটি খুব ভাল বলিয়া বোধ হয়।

রমাকান্ত। গত বৎসরের মৃত্যুতালিকা দেখুন।—

লোকসংখ্যা	১২৩,৩৫
স্বাভাবিক মৃত্যু	৪০
জ্বরে মৃত্যু	৩০
ওলাউঠায়	১৫
পুরাতন রোগে	৫
জলে ডুবা, সর্পাঘাত প্রভৃতি	৩
মনের দুঃখে আত্মহত্যা	৪
মোট—	৪৫৮

বসন্তকুমারী। খুব কম বলিতে হইবে। তবে আত্মহত্যার শতকরা একটু বেশী বলিয়া বোধ হয়।

রমাকান্ত। এ সম্বন্ধে আপনার সহিত একটু নির্জ্জনে কথা কহিতে চাহি।

নিতাই বাবু। অবশ্য। (বাহিরে প্রস্থান)।

বসন্তকুমারী। আপনার পাগলের ছিট নাই ত?

রমাকান্ত। মোটেই না। আত্মহত্যার প্রাদুর্ভাব নানা কারণে হয়। তাহাই বক্তব্য। অবস্থা দেখুন—

বাৎসরিক।

আয়।	ব্যয়।	
১১৩৩৫৲	রাজস্ব ও সেস্	৭৩১৫৲
	কর্ম্মচারিগণের বেতন ও জমীদারী সংক্রান্ত খরচ	২০১৬৲
	চাঁদা ও দাতব্য ঔষধালয়	১০০৪৲
	সাংসারিক খরচ	১০৩০৲
	মোট	১১৩৬৫৲

অর্থাৎ, আয় হইতে ৩০৲ টাকা ব্যয় বেশী।

এমত স্থলে কি কর্ত্তব্য? আপনি এক জন বিচক্ষণ এবং বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোক, বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, আমার বিজ্ঞাপন দেওয়ার উদ্দেশ্য কি?

বসন্তকুমারী। উদ্দেশ্য অনেকটা বুঝিয়াই আমি দরখাস্ত করিয়াছি। তাহাও বোধ হয় আপনি জানেন। জগতে পরস্পরের সহানুভূতি এবং সহায়তাই মানবজীবনের উদ্দেশ্য।

পাত্রীর করুণভাব দেখিয়া রমাকান্তের চক্ষে অশ্রুকণার সঞ্চার হইল। পাত্রী তাহা দেখিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া পাত্রী বলিলেন, 'যত দূর দেখিতেছি, আপনার কর্ম্মস্থলে ফিরিয়া যাওয়াই কর্ত্তব্য।'

রমাকান্ত আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন, 'তবে আপনি এই জমীদারীর তত্ত্বাবধান করুন।'

বসন্তকুমারী। আমি রাজি, কিন্তু কেবল ম্যানেজার স্বরূপে। 'মোক্তার আম' প্রভৃতি যাহা দরকার, নিতাই বাবু ঠিক করিয়া দিবেন। নিতাই বাবু এক জন বিচক্ষণ উকীল। *

নিতাই বাবু গৃহে পুনঃপ্রবেশ করিলে বসন্তকুমারী তাঁহাকে সব কথা বুঝাইয়া দিলেন।

নিতাই বাবু। আমার বোধ হয় আপনার কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডসের শরণাপন্ন হওয়া উচিত ছিল।

বসন্তকুমারী। নাবালক কিংবা পাগল বলিয়া?

নিতাই বাবু। না, বিষয়-পরিচালনে অক্ষম।

রমাকান্ত। আমি যে সেরেস্তাদারী করি।

নিতাই বাবু। অনেকে সরকারী কার্য্য করে, কিন্তু নিজের বিষয় চালাইতে পারে না। ইহার অনেক নজীর আছে! কিন্তু যখন স্থির হইয়া গিয়াছে, তখন আপনি পাত্রীর উপর ভারার্পণ করিতে পারেন।

রমাকান্ত। বিবাহের দিনটা?

নিতাই বাবু। আপনি বোধ হয় ভুল বুঝিয়াছেন। জমীদারীর অবস্থা সচ্ছল না হইলে বিবাহের কল্পনা বৃথা। এ অবস্থায় কেহই আপনাকে বিবাহ করিতে চাহিবে না।

পাত্রী। এবং আমার উপর যতদিন বিশ্বাস না জন্মিবে, ততদিন এ সম্বন্ধে আলোচনা গর্হিত কাজ।

রমাকান্ত। আপনারা এখনও অপরিচিত।

নিতাই বাবু। যদি আপনি দশ হাজার টাকার জামীন চাহেন, তবে দিতে পারি। আপনার ভয় কিসের? কলেক্‌টরীতে বৎসর বৎসর রাজস্ব আদায় হইলেই জমীদারী বহাল থাকিবে। জমীদারীতে রাইয়তি ছাড়া আর কোনও স্বত্ব দেখিতে পাইতেছি না। কোনও রকম গোলমাল হইবার সম্ভাবনা নাই। যদি সন্দেহ হয়, তবে রেজেষ্টরি আফিসে মধ্যে মধ্যে অনুসন্ধান করিবেন। আপনি যাহা হিসাব দিয়াছেন, তাহাতেই বুঝিতে পারিতেছেন যে, হস্তান্তর করিবার কোনও উপায় নাই। মোট কথায় ইহার মূল্য একেবারেই নাই। ইহাতে যদি রাজি না হন, তবে, বোধ হয়, আপনাকে কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডসে যাইতে হইবে। যদি আপনি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক না যান, তাহা হইলে হয় ত সরকার বাহাদুর নিজে আপনাকে ওয়ার্ড করিয়া লইবেন।

রমাকান্তের বিলক্ষণ একটা আতঙ্ক হইল।

বসন্তকুমারী। আপনি যে নাবালক কিংবা পাগল নহেন, ইহা সাব্যস্ত করিতে আপনার অনেক সময় লাগিবে, বিশেষতঃ তাহার সহিত আপনার

আচরণ এত জঘন্য এবং নিষ্ঠুর ছিল যে, কেহই আপনার পক্ষে এজেহার দিবে না।

রমাকান্ত। আপনি আমার ভূতপূর্ব্ব স্ত্রীর কথা বলিতেছেন?

বসন্তকুমারী। বুঝিয়া দেখুন।

রমাকান্ত। আচ্ছা, তবে আপাততঃ আমি লেখা পড়া করিয়া দিতে স্বীকার। আমি কর্ম্মস্থানে চলিলাম। প্রথম বৎসরের আয় সম্পূর্ণ আপনার।

৪

রমাকান্ত সেরেস্তাদার বীরভূমে প্রত্যাগত হইলে সকলেই খুব খুসী হইল। সাহেব জমীদারীর অবস্থা জিজ্ঞাসা করাতে রমাকান্ত বলিলেন, এখনও আয় হইতে ব্যয় বেশী, তবে এক জন স্ত্রীলোকের হাতে দিয়া আসিয়াছি, অল্প দিনের মধ্যেই ব্যয় অপেক্ষা আয় বাড়িয়া যাইবে।

সাহেব। কি রকম স্ত্রীলোক?

রমাকান্ত। বিষয়বুদ্ধিতে খুব পাকা। আয় বাড়িয়া গেলেই তাহার সহিত আমার বিবাহ হইবে।

সাহেব। খুব ভাল বন্দোবস্ত হইয়াছে। তোমাদের দেশে এ রকম স্ত্রীলোক পাওয়া যায়?

রমাকান্ত। বিজ্ঞাপন না দিলে পাওয়া যায় না, এবং তাহার মধ্যে বাছিয়া লইবারও বাহাদুরী চাই।

সাহেব। বিজ্ঞাপনে বঙ্গদেশের উত্তরোত্তর উন্নতি হইতেছে।

আপিসের সকলেই জানিত যে, রমাকান্ত একটা নূতন রকম এবং অদ্ভুত কিছু না করিয়া ফিরিবে না। রমাকান্ত চার্জ্জ লইবামাত্র সকলে ইসারায় জানাইল যে, বিবাহটা যেন একটু ধুমধামের সহিত হয়, এবং তাহারা যেন জানিতে পারে।

রমাকান্ত। তোমরা নিশ্চিন্ত থাকিও। খাবার জিনিস সকলই কলিকাতা হইতে আসিবে। তবে বাদ্য বাজনা আমি ভালবাসি না, তাহা ত তোমরা সকলেই জান, এবং পূর্ব্বে যত বয়স ছিল, এখন হিসাবমত তাহা অপেক্ষা বেশী হইবার কথা। ও সব ভাল লাগে না।

এ দিকে বেড়গ্রামের জমীদারী, বাটী এবং আপিসের ভার শ্রীমতী বসন্তকুমারী হাতে লইয়াই প্রথমতঃ বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে বনমালী মুহুরী চলিল।

বসন্ত। এ বাটীতে লোকসংখ্যা কত?

বনমালী। (ফাইল খুলিয়া) সাড়ে তিন জন। পূর্ব্বে চারি জন ছিল। শত-করা পঁচিশ জন কমিয়া গিয়াছে। পিসীমার প্রায় সত্তর বৎসর বয়স, তাই অর্দ্ধেক সংখ্যা ধরা গিয়াছে।

বসন্ত। সংখ্যা বাড়ে নাই কেন?

বনমালী। পিসীমা কোনও বিবাহিত লোককে এ বাড়ীতে ঢুকিতে দেন না। ইহার সম্বন্ধে পরলোকগত কর্ত্তার নোট আছে।

অন্দর-মহলে হঠাৎ নূতন ম্যানেজারকে দেখিয়া দাস দাসী তিন জনই খুব সাদরে অভ্যর্থনা করিল। পিসী বারান্দায় বসিয়া মালা জপ করিতেছিলেন। বসন্ত প্রণাম করিয়া বলিল, 'পিসীমা, ভাল আছেন?'

পিসীমা চক্ষে কম দেখিতে পান, তবে তাহার অভাব কর্ণ দ্বারা পূর্ণ হইত। তিনি শব্দ শুনিয়াই চমকিয়া উঠিলেন।

'হ্যাঁরে, তুই কমলা না?'

কমলা (ওরফে বসন্তকুমারী) পিসীমার স্মরণশক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইল।

তার পরেই পিসী কান্না জুড়িয়া দিলেন। 'ওরে আমার সে কৈ রে?—সোনার বৌ কৈ রে—ওরে আমার সাধের সরলা কৈ রে—তাকে হতভাগা রমা মেরে ফেলেছে রে—বেঁচে থাকৃতে খেতে দেয় নাই রে—দশ বৎসরের মধ্যে একবারও নিয়ে আসে নাই রে—

পিসীমার একাদিক্রমে ক্রন্দন দেখিয়া দাস দাসী ও বনমালী মুহুরীও কাঁদিতে আরম্ভ করিল। বসন্তকুমারী অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া পিসীমার কাণে কাণে বলিলেন, 'আপনি আর কাঁদবেন না, অনেক কথা আছে।'

দাস দাসী এবং বনমালী সরিয়া যাওয়ার পর, বসন্ত বলিল, 'সিঙ্গি মশায়ের মাথা আরও খারাপ হয়ে পড়েছে।'

পিসী। তার কি সন্দেহ আছে বাছা? আপিসের কাজে মাথা খারাপ হয়েছে। একে আপিসের কাজ, তার উপর জমীদারীর ভার; বাছা আমার বদ্ধ পাগল এখন। (ক্রন্দন) এই তিন চার বৎসর কেবল খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখ্‌ছে। বিবাহের বিজ্ঞাপন দেখ্‌লেই বাছা লাফিয়ে উঠে। যে সব হতভাগারা বিজ্ঞাপন দেয়, তাদের মুখে আগুন দেবার কি লোক নাই? ওরে আমার সোনার বৌ সরলা রে'—(ক্রন্দন)।

বসন্ত পিসীমার চক্ষু মুছাইয়া বলিল, 'ছি!'

পিসীমা। তুই একটু কাছে আয় বাছা। তোর মুখখানি দেখে বৌকে

মনে পড়ছে। তোরা দুই বোনই এক রকমের মানুষ, তবে তোর চেহারা তার মতন নয়। তোকে দেখে রমা কি বল্লে?

বসন্ত। আমাকে ত চিনিবার কথা নয়। একবারমাত্র দেখেছিলেন। যার স্ত্রীর উপরই মায়া নাই, তার কি বড় শালীকে মনে থাকে? আর সে ত পনের বৎসরের কথা।

পিসী। তোর স্বামী এখন কোথায়?

বসন্ত। রামপুরহাটে কারবার করেন। আমাদের ছোট বোনেরও সেখানে বিবাহ হয়েছে, তিনি নিতাই মোক্তারের স্ত্রী।

পিসী। আহা সুখে থাক্। এখন আমার রমার কি হবে মা?—আর ত ভাবিতে পারি না—মরণ হলেই ভাল হয় মা—

বসন্ত। আপনি নিশ্চিন্ত হইয়া থাকুন। আমি তিন মাসের মধ্যে সারাইয়া দিব। আচ্ছা পিসীমা, বেড়গ্রাম ছাড়াও বড় কর্ত্তা কালীকান্ত বাবুর জমীদারীর মধ্যে আর একখানা গ্রাম ছিল, তাহার কি হইল?

পিসীমা। তার কথা ঘনেশ্যাম জানে। তাঁর বংশে পাগলের ছিট আছে বলিয়া, কর্ত্তা সেখানা কি রকম বন্দোবস্ত করেছেন, সে সব কি ছাই আমি বুঝি? তোরা দেখে শুনে নে।

৫

ম্যানেজারীতে অধিষ্ঠিতা হইয়া বসন্তকুমারী জমীদারীর অবস্থা সম্পূর্ণ ফিরাইয়া দিল। যত জুয়াচুরী বন্ধ করিল, পতিত জমী বন্দোবস্ত করিল, কিছু পত্তনী দিয়া জমার টাকা বাড়াইল, এবং যে গ্রামখানি বন্ধক ছিল, তাহা উদ্ধার করিয়া আয় বাড়াইল। পরলোকগত ৺কালীকান্ত সিংহের ব্যাঙ্কে এবং অন্যান্য স্থানে যে সব টাকা ছিল, তাহা সংগ্রহ করিয়া জমীদারীর উন্নতিতে ব্যয় করিল।

ঘনশ্যাম এবং বনমালীর মুহুরীগিরি বজায় থাকিয়া গিয়াছে। তাহারা প্রত্যহ কেবল হিসাব দেখে, এবং পুরাতন ফাইলগুলি আলমারীর মধ্যে গণিয়া আবার রাখিয়া দেয়। একদিন হঠাৎ বাটীর মধ্যে ঘনশ্যামের ডাক পড়িল। ঘনশ্যাম উপস্থিত হইয়া করযোড়ে কহিল, 'হুজুরের কি আজ্ঞা?'

বসন্ত। তোমাদের কাজকর্ম্ম বড় কম, বোধ হয় বেতন কমাইয়া দিলে হয়।

ঘনশ্যাম। (কম্পিতকলেবরে) তাহা হইলে স্ত্রীপুত্র মরিয়া যাইবে। হুজুর মা বাপ।

বসন্ত। আমাদের বাটীতে কল্য এক জন স্ত্রীলোক আসিয়াছেন, জান?

তাঁহার জন্য ঔষধ লইয়া আইস, এবং বনমালীকে সংক্রামক রোগের ফাইল আনিতে বল।

১৯১৬

নোট এবং মন্তব্য ক্রমশঃ পত্রাঙ্ক ৩

ক্রমিক নং	
৫	কুলদাচরণ ভৌমিকের নিকট পত্র—'এই বিজ্ঞাপনটি কর্ত্রী ঠাকুরাণীর হুকুম মোতাবেক প্রকাশিত হইবে।' 'কায়স্থবংশজাতা সুশ্রী ও সুশিক্ষিতা পাত্রী—সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী—বয়ঃস্থা—পাত্রের বয়ঃক্রম অন্ততঃ ৪০-৪৫ হওয়া চাহি, এবং আপিসের কার্য্যে দক্ষ হওয়া চাহি—নগদ দশ হাজার টাকা প্রাপ্ত হইবেন, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। পাত্রী দেখিতে হইলে ৩৭৬ নং গ্রে ষ্ট্রীটে খবর দিবেন।' বোনমালী ১০।৩।১৬ ঘঃ ১০।৩।১৬
৬	কুলদাবাবুর উত্তর।—'যে সকল দরখাস্ত পড়িয়াছে, তাহার মধ্যে বীরেন্দ্রবাবুই সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত। লোকটি আপিসের কার্য্যে পাকা, এবং দেখিতে সুপুরুষ।' বোনমালী ১৬।৩।১৬ কর্ত্রীঠাকুরাণীর নিকট ফাইল সমেত পেশ হয়। দরখাস্তকারী আমাদের বাবু ছাড়া আর কেহই নহেন। হস্তের লেখা দেখিলেই ধরা পড়িবেক। এ সম্বন্ধে "খ" পতাকাযুক্ত পূর্ব্ব সালের ফাইলের ২ সংখ্যার পত্র দেখিতে আজ্ঞা হয়। ঘনেশ্যাম – হেডমুহুরি। দেখিলাম। তোমার পাঁচ টাকা মাসহারা বৃদ্ধি হইল। বীরেন্দ্র বাবুকে খবর দেও যে, পুরন্দরপুরে জগাই মণ্ডলের বাটীতে ১লা এপ্রিলে পাত্রীকে পাত্র দেখিতে পারেন। বসন্ত ২০।৩।১৬

বিজ্ঞাপন যখন প্রকাশিত হয়, তখন স্বভাবের বশবর্ত্তী হইয়া রমাকান্ত তৎক্ষণাৎ দরখাস্ত দিয়াছিলেন। আপিসের সকলেও বলিয়াছিল, 'অনিশ্চিত জায়গায় কথা দেওয়ার চেয়ে দশ হাজার টাকার কিনারা করাই পুরুষের কাজ।'

রমাকান্ত। ঠিক! ইহাতে যদি বসন্তকুমারী চটিয়া যান, তবে চারা নাহি। রূপকে রূপ, এবং টাকাকে টাকা। বিশেষতঃ যখন ভৌমিক মহাশয় মধ্যস্থ, তখন এর চেহারা নিশ্চয় আমার ম্যানেজারের চেয়ে ভাল।'

বাটওয়ারা আপিসের হেড বাবু বলিলেন, (জনান্তিকে)—সেরেস্তাদারের মাথাটা পূর্ব্ব হইতে অনেক ভাল।

৩০এ মার্চ্চে রমাকান্ত 'সিঙ্গি' গ্রে ষ্ট্রীটে পঁহুছিয়া ভৌমিকের বহির্দ্বারে আঘাত করিবামাত্র, তাহার বিকট শব্দ শ্রবণ করিয়া কুলদাচরণ ভৌমিক সসম্ভ্রমে 'সিঙ্গি' মহাশয়কে একটা নির্জ্জন ঘরে লইয়া গেলেন। রমাকান্ত অতিশয় আহ্লাদ-সহকারে বলিলেন, 'আমার মেজাজ্‌টা পূর্ব্বের চেয়ে অনেক ভাল।'

কুলদাচরণ। তবে ১লা তারিখে আপনি যাইতে প্রস্তুত? পাত্রী পুরন্দরপুরে।

রমাকান্ত। পাত্রী কি বিধবা?

কুলদাচরণ। ঠিক তাহা নয়, তাঁহার ভূতপূর্ব্ব স্বামী অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়াতে তিনি পূর্ব্বেও একবার বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন। এখন ভূতপূর্ব্ব স্বামী একেবারে নিরুদ্দেশ, অতএব আইনমত তিনি বিবাহ করিতে পারেন।

রমাকান্ত। কি আশ্চর্য্য! আপিসে ইহার কোনও কাগজপত্র আছে?

কুলদাচরণ। সম্পূর্ণ।

তখন ভৌমিক মহাশয় তাঁহার আপিসের ফাইল খুলিয়া সকল কাগজপত্র, মায় উকীলের মত পর্য্যন্ত—সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া দেখাইলেন।

রমাকান্ত। কি আশ্চর্য্য! এটা খুব রোম্যাণ্টিক্!

কুলদাচরণ। খুব। এমন কি, ইহাতে আপনার নাম এত বাড়িয়া যাইবে যে, একটা মেডল্ আপনি না পাইয়া যান না।

রমাকান্ত। খুব সম্ভব। এখন টাকাটার সম্বন্ধে কোনও গোলমাল নাই ত?

কুলদাচরণ। টাকা প্রস্তুত, বিবাহের আসরেই প্রথমে আপনাকে টাকা দেওয়া হইবে। ইহার জন্য আমরা দায়ী। এখন আপনি পাত্রী মনঃস্থ করিলেই হয়।

৬

পুরন্দরপুর বেড়গ্রাম জমীদারীরই অন্তর্গত। ৺কালীকান্ত সিংহ এটাকে লুকাইয়া হস্তান্তর করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহার কারণ, তাঁহার বংশের মধ্যে একমাত্র উত্তরাধিকারী রমাকান্তের মাথার একটু গোলমাল থাকাতে কালীকান্তের মনে হইয়াছিল যে, সহসা কোনও বিপদ আপদ ঘটিলে এই গ্রামের আয়ে রমাকান্তের ভরণপোষণ হইবে।

জগাই মণ্ডল সেই গ্রামের পত্তনীদার। খুব বৈষ্ণব প্রকৃতির লোক, এবং কর্ত্তাদিগের হিতে সর্ব্বদা মনোযোগী।

বেলা তিনটার সময় জগাই মণ্ডলের বাটীর মধ্যে পাত্রী দেখিবার বন্দোবস্ত সুচারুরূপে করা হইয়াছে।—একটা রঙ্গীন কার্পেটের উপর পাত্রপক্ষীয় লোকদের আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এবং খুব ধুমধামপূর্ব্বক জলখাবার প্রভৃতিরও আয়োজন হইয়াছে।

রমাকান্তের সঙ্গে কেবল ভৌমিক মহাশয়। পাল্কী হইতে অবতীর্ণ হইবামাত্র উভয়কে জগাই মণ্ডল বাটীর মধ্যে লইয়া গেল। গবাক্ষ এবং কপাটের ফাঁক হইতে স্ত্রীলোকেরা রমাকান্তকে দেখিয়া কাণাঘুষা করিয়া বলিল, 'সুপুরুষ বটে।'

এটা রমাকান্তের কর্ণে যাওয়াতে তিনি খুব সানন্দচিত্তে বসিয়া পড়িলেন।

অনেক কথাবার্ত্তার পর ভৌমিক মহাশয় বলিলেন, 'পাত্রীকে দেখাইবার এই বেলা যোগাড় করিলে হয়, নচেৎ ফিরিতে আমাদের রাত্রি হইয়া যাইবে।'

জগাই। একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। পাত্রীর কল্য হইতে খুব জ্বর। এখানে ডাক্তার নাই, তাই বেড়গ্রামে পাঠাইয়া দিয়াছি। সেখানে বাবুদের বাটীতেই তিনি আছেন।

রমাকান্ত। সর্ব্বনাশ! আমার ম্যানেজার বসন্তকুমারী সেখানে থাকে, তাহা জান?

জগাই। তাঁহার পরামর্শ লওয়া হইয়াছিল। তিনি বলেন, ইহাতে তাঁহার কোনও আপত্তি নাই। তিনি সর্ব্বদাই আপনার হিতকাঙ্ক্ষিণী।

রমাকান্ত। কিন্তু আমার সঙ্গে তাঁহার একটা চুক্তি আছে, তাহার বিরুদ্ধে কিছু করা ন্যায়সঙ্গত কি না, ভৌমিক মহাশয় বিবেচনা করিয়া দেখুন।

ভৌমিক মহাশয় বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে, ইহাতে কোনই দোষ জন্মিতে পারে না; কারণ, তিনি নিজেই যখন নবীনা পাত্রীকে স্থান দিয়াছেন, তখন তিনি পূর্ব্ব চুক্তি উঠাইয়া লইয়াছেন, এমন বিবেচনা করিতে হইবে।

অতএব রমাকান্তকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বেড়গ্রামে যাইতে হইল। বেড়গ্রাম তিন ক্রোশ দূরে। সন্ধ্যার সময় তিনি ও ভৌমিক মহাশয় বাবুদের বাড়ীতে উত্তীর্ণ হইলেন।

বসন্তকুমারী রমাকান্তকে দেখিয়াই অভ্যর্থনা করিয়া বাড়ীর মধ্যে লইয়া গেল। 'আজ আমাদের শুভদিন, আপনার জমীদারীতে আপনি ফিরিয়া আসিয়াছেন, এটা খুব মঙ্গলের ও আনন্দের কথা।'

রমাকান্ত। হিসাবপত্র সব ঠিক ?

বসন্ত। হাঁ।

রমাকান্ত। ফাইলগুলি সেই রকম রাখা হইতেছে ?

বসন্ত। নিশ্চয়। আপনি পাত্রীকে দেখিবেন চলুন।

রমাকান্ত একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বুঝাইলেন যে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও পাত্রীকে দেখিতে যাইতেছেন, এবং বসন্তকুমারী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া তাহাতে সহানুভূতি করিলেন।

যে ঘরে পাত্রী বসিয়াছিল, সে ঘরটা অতি পূর্ব্বকালের; বাতায়নের পার্শ্বেই আমবাগান, এবং অন্য ঘরের চেয়ে সেটা কিছু বেশী অন্ধকার। যাইবার সময় পিসীমা মালা জপ করিতে করিতে কহিলেন, 'বাবা রমা! তোর মাথাটা আগেকার চেয়ে ভাল ত ?'

রমাকান্ত। নিশ্চয়।

পিসী। তবে যাও। ভয় পেও না।

রমাকান্ত ভয় পাইবার লোক নহেন, কিন্তু বাতায়নপার্শ্বে যে রমণী বসিয়াছিল, তাহাকে দেখিবামাত্র ঘোর পাণ্ডুবর্ণ হইয়া পড়িলেন। রমণী বাতায়নের নিকট বসিয়া কাঁদিতেছিল। মলিনবেশা রুক্ষকেশা হইলেও তাহার রূপে ঘর আলোকিত।

বসন্তকুমারী রমাকান্তের অবস্থা দেখিয়া কঠিন স্বরে বলিলেন, 'রমা! সরলার নিকট মাফ চাও। যে দশ বর্ষ ধরিয়া অনাহারে রোগক্লিষ্টা, তাহার নিকট মাফ চাও, যে সকল সুখ ছাড়িয়া তোমারই মঙ্গলের জন্য সংসারে রহিয়াছে, তাহার নিকট মাফ চাও।'

রমাকান্ত ধীরে ধীরে কহিল, 'আমার অপরাধ হইয়াছে।' তাহার পর মেজের উপর লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল। বসন্তকুমারী কপাট বন্ধ করিয়া বাহিরে আসিলেন।

ঘনশ্যাম বাহিরে দাঁড়াইয়াছিল; বলিল, 'ভৌমিক মহাশয় রাহা-খরচের ৩২৲ টাকার বিল পেশ করিতে বলিতেছেন।'

বসন্ত। নথির সামিল করিয়া দাও।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

হরিশচন্দ্র।

স্বর্গীয় হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—"হিন্দু পেট্রিয়টে"র স্বনামধন্য হরিশ মুখুয্যে, জাতির ইতিহাসে চিরস্মরণীয়। বাঙ্গালীর গৌরব, স্বদেশভক্ত, রায়তের বন্ধু, অন্যায়ের শত্রু হরিশচন্দ্র নবযুগের প্রবর্ত্তক। বাঙ্গালায় কে হরিশচন্দ্রের নাম কৃতজ্ঞহৃদয়ে স্মরণ না করিবে?

হরিশচন্দ্র খাঁটী বাঙ্গালী ছিলেন। মনীষী, হৃদয়বান, ন্যায়পরায়ণ, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ হরিশচন্দ্র দেশচর্য্যায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। দেশের ও দশের সেবায় তাঁহার বিরাম ছিল না, বিশ্রাম ছিল না; বুঝি অন্য ভাবনাও ছিল না।—দেশচর্য্যা ব্রতের পালনে সাধনার আসনেই তাঁহার নশ্বর দেহের অবসান হইয়াছিল।

ত্যাগ ও নিষ্ঠাই তাঁহার চরিত্রের ধর্ম্ম ছিল। কর্ত্তব্য-পালনে অকুতোভয়তা, কর্ম্মফলে নিষ্কামতাই অনাসক্ত হরিশচন্দ্রের দেশহিতৈষণার মূল-মন্ত্র ছিল।—বাঙ্গালার সম্পাদক-সম্প্রদায়ের গুরু হরিশচন্দ্র সংবাদপত্র-সম্পাদনে যে অপূর্ব্ব সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতেও তাঁহার অতুলনীয় 'ব্যক্তিত্ব'ই অভিব্যক্ত হইয়াছিল। রাজা ও প্রজার সমান বিশ্বাসভাজন, নিরপেক্ষ, ধীরবুদ্ধি, বিচক্ষণ হরিশচন্দ্র 'সুখে দুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ' সম্পাদকের পুণ্য ব্রত পালন করিয়াছিলেন। তাই 'পেট্রিয়টে'র অভিধান অন্বর্থ ও জীবন সার্থক হইয়াছিল।

বাঙ্গালায় রায়ত ও তাহার কল্যাণ তাঁহার প্রাণের বস্তু ছিল। আজ কাল রায়তের সহিত নেতার সম্বন্ধ—

'তারে চোখে দেখিনি,
শুধু বাঁশী শুনেছি,
মন প্রাণ যাহা ছিল, দিয়ে ফেলেছি'—

এই টপ্পার প্রেমের মত অহেতুক হইয়া উঠিয়াছে। চাষার কুঁড়ে—তাহার শূন্য হাঁড়ি ও ভাঙ্গা কলসী, ছিন্ন কন্থা ও মলিন কৌপীন দূরে রাখিয়া আমরা কাগজে-কলমে তাহাকে ভালবাসি, তাহাদের দুঃখে কাঁদি! রায়তের সহিত হরিশের সম্বন্ধ এরূপ 'চোখে দেখিনি' শ্রেণীর অহেতুক অনুরাগে প্রতিষ্ঠিত ছিল না।

তিনি বাঙ্গালার রায়তকে চিনিতেন, জানিতেন। তাঁহার প্রজা-প্রীতি ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের, অনাবিল সমবেদনার, সাধনা-লব্ধ দেশাত্মবোধের ফল। বাঙ্গালার দুঃখী কৃষাণ তাঁহার অন্তরঙ্গ আত্মীয় ছিল। নীলবিদ্রোহের সময় তিনিই বাঙ্গালার প্রজাকে রক্ষা করিয়াছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। হরিশচন্দ্র শুধু লিখিয়াই নিশ্চিন্ত হইতেন না। তিনি দরিদ্র, নিপীড়িত, নিঃসম্বল প্রজার আশ্রয় ছিলেন। দরিদ্র ব্রাহ্মণ হরিশচন্দ্রের ভবানীপুরের আবাস বাঙ্গালার 'নীলকর-বিষধর-দংশন-কাতর-প্রজানিকর-ক্ষেমঙ্কর' সেবাশ্রমে পরিণত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ্যসংস্কারে পূর্ণ দরিদ্র হরিশচন্দ্র করুণার গঙ্গোত্রী ছিলেন। তিনি নির্বিচারে কলিকাতায় সমাগত রায়তদিগকে অন্নদান করিতেন। আজ বাঙ্গালী যাঁহার সংবাদও জানে না, রাখে না, সেই ব্রাহ্মণী—হরিশ্চন্দ্র-বনিতা অন্নপূর্ণার মত দু' হাতে অন্ন বিলাইতেন। আমরা ম্যাজিনীর দেশভক্তি ও ডেমস্থিনিসের বাগ্মিতা লাভ করিয়া থাকিব, কিন্তু সেই স্বর্গীয় সমবেদনা, সেই দেবদুর্ল্লভ সহৃদয়তা, সেই পুণ্য সদাব্রত, সেই দরিদ্র-নারায়ণের অন্নকুট, সেই অষ্ট-বিভূতির অধীশ্বর মহাদেবের অন্নভিক্ষা ও করুণাময়ী অন্নপূর্ণার অন্নদান হারাইয়াছি।

হরিশচন্দ্র জীবন সার্থক করিয়া সাধনোচিত ধামে চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু শিখাইয়া গিয়াছেন,—মনে মুখে এক না হইলে কেহ দেশভক্তি চরিতার্থ করিতে পারে না। জীবন উৎসর্গ না করিলে দেশচর্য্যাব্রত উদ্‌যাপিত হয় না। খবরের কাগজে লিখিয়া ও বক্তৃতায় কাঁদিয়া প্রজার বন্ধু হওয়া যায় না। তাহাদিগকে আপনার বলিয়া আলিঙ্গন করিতে হয়; আপনার মুখের গ্রাসের ভাগ দিয়া, আপনার চরিত্রে 'প্রাণা যথাত্মনোঽভীষ্টা ভূতানামপি তে তথা' চরিতার্থ করিতে হয়। শুধু মৌখিক সাম্যের গানে, মৈত্রীর তানে ও স্বাধীনতার ভানে প্রজাশক্তির উদ্বোধন হয় না। উভয়ে মিশিয়া মিলিয়া একাত্ম হইতে হয়। দেশকে আপনার করিতে হয়; আপনাকে দেশের করিতে হয়। তবে বল আসে; তবে দেশচর্য্যা সফল হয়; তবে প্রজা-শক্তির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানাগুলি সংহত—সম্বদ্ধ হইয়া মিছরীর কুঁদোর মত 'একটা'য় পরিণত হয়। সেই 'একে'র হুঙ্কারে অত্যাচার অন্তর্হিত হয়; সেই 'একে'র শক্তির উচ্ছ্বাসে নিপীড়ন গঙ্গা-স্রোতে ঐরাবতের মত ভাসিয়া যায়। এক যেমন বহু হন, বহুকেও তেমনই এক হইতে হয়। হরিশচন্দ্র জীবনে ইহাই প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন।

হরিশচন্দ্র সহানুভূতি ও প্রেমের রসায়নে বাঙ্গালার নিরক্ষর রায়তকে গলাইয়া মিশাইয়া মনুষ্যত্বের ছাঁচে ঢালিয়া তাহাদিগকে একটা বিরাট শক্তি-সমবায়ে

পরিণত করিয়া দেশে প্রজাশক্তির প্রতিমা গড়িয়াছিলেন, আপনার প্রাণ দিয়া সেই প্রতিমার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এ দেশের রাজনীতিক সাধক-সমবায়ের তিনিই স্বায়ম্ভুব মনু।

তিনি নিজের জীবনেও ইহাই বাঙ্গালীকে বুঝাইয়া গিয়াছেন। নিজের সাধক-জীবনে সেই 'তাদাত্ম্যে'র আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। সে আদর্শ আর কত কাল ধূলায় লুটিবে? তুলিয়া লও, মাথায় তুলিয়া লও, মুক্তি-পথের যাত্রী! সে আদর্শ ভিন্ন তোমার দুর্গম পথে আর কোনও নিয়ামক—নিয়ন্তা নাই। হরিশের আলোয় 'আগে চল্, আগে চল্ ভাই!' 'পড়ে থাকা পিছে মরে থাকা মিছে'—আগে চল্!

এত কাল পরে যদি তাঁহাকে মনে পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে, তাঁহার পূজার মত পূজা কর। কে আছ সব্যসাচী, তাঁহার গাণ্ডীব কুড়াইয়া লও। কে আছ যুগাবতার, কে আছ তাঁহার অংশাবতার, পার্থসারথির যে পাঞ্চজন্য হরিশের প্রাণ-পূরকে নিনাদিত হইয়া বাঙ্গালার শ্মশানে জীবন্মৃত রায়তের শবে নব-জীবনের সঞ্চার করিয়াছিল, সেই পাঞ্চজন্য তুলিয়া লও। এই মৃতের দেশে আবার জীবনের গভীর আরাব বাজিয়া উঠুক।

কথার পুষ্পাঞ্জলি হরিশের যোগ্য নয়—পার যদি, সেই মহাবীরের শুচি স্মৃতির হোমানলে হৃৎ-পদ্ম ছিঁড়িয়া আহুতি দাও। যদি হরিশের স্মরণে মতি হইয়া থাকে, তাঁহার মত অনাসক্ত হইয়া নিষ্কাম-ধর্ম্মে দেশচর্য্যাকে প্রতিষ্ঠিত কর।—আবার মরা গাঙ্গে বান ছুটিবে। তখন এই জরাজীর্ণ জাতি আবার নব-যৌবন লাভ করিবে,—তখন আত্মশক্তি-বোধে উদ্দীপ্ত, পূর্ণ শক্তির প্রভাবে সংযত, শান্ত, সমাহিত বাঙ্গালী কোটি-কণ্ঠে গায়িবে,—"এ যৌবন-জল-তরঙ্গ রোধিবে কে? হরে মুরারে! হরে মুরারে!" বল বাঙ্গালী, সেই ভাবে মাতিয়া লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে গগন পবন কাঁপাইয়া বল,—"হরে মুরারে, হরে মুরারে!" হরিশের আত্মা তৃপ্ত হইবেন;—তাঁহার আশীর্ব্বাদে তোমার সাধ পূরিবে, তোমার জাতি অভীষ্ট সিদ্ধি লাভ করিবে।

---

* গত ৩২শে জ্যৈষ্ঠ হরিশচন্দ্রের স্মরণ-সভায় পঠিত।

'ঋষি' রবীন্দ্রনাথ।

কবি রবীন্দ্রনাথ এক দল ভক্ত কর্ত্তৃক 'ঋষি' নামে উক্ত হইতেছেন। শ্রীযুত রমাপ্রসাদ চন্দ এই দলের প্রতিষ্ঠাতা ও অগ্রণী। গত ১৩২০ সালের পৌষ মাসের 'সাহিত্যে' 'রবীন্দ্রনাথের কাব্য-রহস্য' নামক এক প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়া তিনি রবীন্দ্রনাথের 'ঋষিত্ব' প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। রবীন্দ্র বিলাতের 'নোবেল' পুরস্কার পাইবার পরেই এই প্রবন্ধ লিখিত হয়। সে কারণ মনে হইয়াছিল, রমাপ্রসাদ বাবুর এই ঋষিত্ব-খ্যাপন সাময়িক উত্তেজনামাত্র। কিন্তু নূতন পত্র 'সবুজপত্রে'র উদ্গমকালেও তিনি তাহার সবুজ পাতায় রবীন্দ্রের এই নূতন মূর্ত্তি পুনরঙ্কিত করিয়াছেন। আর, এখন কথায় কথায় ভক্তগণ আরাধ্যকে 'ঋষি' করিতেছেন। সুতরাং এই অভিনব মতের সমালোচনা আবশ্যক হইয়াছে। রমাপ্রসাদই যুক্তিবাদের সাহায্যে এই তত্ত্ব বিবৃত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। অতএব তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই তাহার বিচার করিতেছি।

'সাহিত্যে' প্রকাশিত উক্ত প্রবন্ধে রমাপ্রসাদ বাবু বলিতেছেন—

'রবীন্দ্রনাথ ঋষি, তাঁহার গীতিকাব্য ঋষির দৃষ্ট মন্ত্র সংহিতা। অন্য কোনও শ্রেণীর কাব্যের সহিত রবীন্দ্রনাথের উৎকৃষ্ট গীতি-কবিতার তুলনা করিলে—তাহার প্রতি অবিচার করা হইবে।...রবীন্দ্রনাথের গীতিকাব্যে যাহা মন্ত্র, তাহাতে আমরা অতীন্দ্রিয় জগতের আলেখ্যের সন্ধান লাভ করি—ইহা শোনা বা শেখা কথার প্রতিধ্বনিমাত্র নহে, ইহা দেখা কথা, গানে গাঁথা।"

এই অভিনব উক্তি ও যুক্তির ভিত্তিস্থাপনের জন্য প্রবন্ধ-কার মানব-সাহিত্যকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যথা—

'প্রথম, ঋষিদিগের দৃষ্ট মন্ত্রময়ী চতুর্ব্বেদ-সংহিতা; দ্বিতীয়—রামায়ণ মহাভারতাদি ইতিহাস পুরাণ; তৃতীয়—অশ্বঘোষ কালিদাস ভবভূতি প্রভৃতির কাব্য। প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য বা মন্ত্র স্বভাব-কবি ঋষির সম্পূর্ণ আত্মোপলব্ধিমূলক; তৃতীয় শ্রেণীর কাব্য অলঙ্কারশাস্ত্ররূপ বিজ্ঞানানুসারে কল্পনাবলে সৃষ্ট; (দ্বিতীয় শ্রেণীর সাহিত্য) ইতিহাস পুরাণে দৃষ্ট মন্ত্র ও দৃষ্টকাব্য এই দুই প্রকার রচনার লক্ষণই পাশাপাশি বিদ্যমান রহিয়াছে। বাঙ্গালার প্রাচীন কাব্যসাহিত্য দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্রের কাব্য তৃতীয় শ্রেণীর। ... রবীন্দ্রনাথের গীতিকাব্য এই দুই শ্রেণীর অন্তর্গত নহে। তাহার অধিকাংশই মন্ত্র-সাহিত্য; আধুনিক যুগের ঋষির দৃষ্ট নব মন্ত্র-সংহিতা।'

প্রবন্ধকারের এই যুক্তিবলে রবীন্দ্রনাথের গীতিকাব্য পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইতেছে। বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, গিরিশচন্দ্রের কথা ছাড়িয়া দাও—বিহারীলাল,

মধুস্থদন, ভারতচন্দ্রের কথা ছাড়িয়া দাও—বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, মুকুন্দরামের কথা ছাড়িয়া দাও—জয়দেব ভবভূতি কালিদাসের কথাও দূরে রাখ—স্বয়ং বাল্মীকি ব্যাসও 'দৃষ্টমন্ত্র'-গ্রথিত কাব্য রচনা করিতে পারেন নাই! কোথায় তোমার সেক্সপীয়র মিল্টন্—কোথায় তোমার ওয়ার্ডসোয়ার্থ বায়রন্—কোথায় তোমার শেলী স্থইন্‌বরন্—কোথায় তোমার ব্রাউনিং টেনিসন্! কোথায়ই বা তোমার হিউগো হুইট্‌ম্যান্—কোথায়ই বা তোমার হায়্‌নে গেটে—কোথায়ই বা তোমার হাফেজ সাদে—আর কোথাই বা তোমার হোমার্ ড্যাণ্টে! 'ঋষি' রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর এ সকল কবিকেই পরাজিত করিয়াছেন। ই'হারা ত কেহই 'ঋষি' নহেন। ই'হারা সকলেই 'শোনা' বা 'দেখা কথা' লইয়া কাব্য রচিয়াছেন। 'দেখা কথা গানে গাঁথা' এক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কাহারও কাব্যে ত নাই। কারণ, 'ঋষি' না হইলে সে শক্তি জন্মে না; আর 'আধুনিক যুগে' 'রবীন্দ্রনাথ ঋষি'!

রবীন্দ্রনাথের এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্বের কারণ যে তাঁহার ঋষিত্ব, তাহা রমাপ্রসাদ বাবু স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের গীতিকাব্য যে 'ঋষিদৃষ্ট মন্ত্র', ইহা সপ্রমাণ করিবার জন্য তিনি 'দৃষ্টান্তস্বরূপ জয়দেবের একটি প্রসিদ্ধ গান স্মরণ' করিয়া ও তৎসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি'র একটি গান আবৃত্তি করিয়া, উভয় গানেই তন্ময় হইয়া বলিতেছেন—'এই তুইটী গীতিই গীতিকাব্যের চরমোৎকর্ষের নিদর্শন। কিন্তু দুয়ের প্রভেদও বিস্তর। জয়দেবের গীত পৌরাণিক কথা লইয়া স্থষ্ট; রবীন্দ্রনাথের গীত যেন সাক্ষাৎ-দৃষ্ট। এ যুগে···ঋষি-শ্রেণীর কবির অভ্যুদয় একটা অভাবনীয় ব্যাপার। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে প্রণালীতে শিক্ষিত হইয়াছিলেন, তাহাই এই অভাবনীয় ব্যাপারকে সম্ভব করিয়া তুলিয়াছিল।' আবার, যে অভূতপূর্ব্ব শিক্ষার ফলে রবীন্দ্রনাথ 'ঋষি' হইয়াছেন, তাহার বর্ণন ও সমর্থন করিতে করিতে লেখক কহিতেছেন—'যদি তিনি (রবীন্দ্রনাথ) ইউনিভার্সিটীর পাঠ সাঙ্গ করিতে পারিতেন, তবে রবীন্দ্রনাথ মন্ত্র দেখিতে পাইতেন কি না সন্দেহ।···আমার মনে হয়, তাহা হইলে রবীন্দ্রনাথ মানব-সমাজের এক জন শ্রেষ্ঠ কবি, ভারতের গেটে (Goethe) হইতে পারিতেন, কিন্তু ঋষিত্ব বিকাশ লাভ করিবার অবসর পাইতেন বলিয়া বোধ হয় না।' ভাগ্যে—রবীন্দ্রনাথ 'ছাত্রবৃত্তি ক্লাসের এক ক্লাস নীচে পর্য্যন্ত পড়া'র পর ইংরাজি স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া 'নানা ছল করিয়া স্কুল পলাইতে সুরু' করিয়া 'সতর বৎসর বয়সের সময় বিলাত' গিয়া 'পাব্‌লিক স্কুলে,' শেষে 'প্রাইভেট

শিক্ষকের নিকট' 'শিক্ষার উদ্যোগ' করিয়া, 'কোনখানেই উদ্যোগ পর্ব্বের অধিক অগ্রসর হওয়া সম্ভব' না হওয়ায় 'ভগ্ন হৃদয়' পত্তন করিয়া দেশে ফিরিয়া'—লেখাপড়া ছাড়িয়া 'কবিতা লেখা সুরু' করিয়া, 'আপনার মধ্যে আপনি ছাড়া পাইয়া' যথেচ্ছাচারের পথে চলিয়া এবং তৎপূর্ব্বে 'নূতন ব্রাহ্মণ হওয়ার পরে গায়ত্রী মন্ত্রটা জপ করিবার দিকে খুব একটা ঝোঁক পড়াতে······ ভূর্ভুবঃস্বঃ এই অংশকে অবলম্বন করিয়া মনটাকে খুব প্রসারিত করিতে চেষ্টা' * করিয়া ও বাল্যকালে 'বুঝিতে না পারিলেও' 'একধার হইতে বই পড়িয়া' যাইয়া—ইত্যাদি এবং অসাধারণ 'সাধনভজনে' ও তপশ্চরণে—ভাগ্যে 'ঋষি'ত্ব লাভ করিয়াছিলেন, তাই ত তিনি আজ শ্রীযুত রমাপ্রসাদের কীর্ত্তনগুণে জয়দেব ও গেটের অপেক্ষা উচ্চতর পদ ও পদবী পাইলেন!

রবীন্দ্রনাথ যে সত্য সত্যই 'ঋষি', তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য রমাপ্রসাদ বাবু যত প্রকার যুক্তিস্থাপনা করিয়াছেন, তাহাদের একত্র সমাবেশে, সুধীগণের কৌতুক ঘনীভূত হইবে। তদ্‌যথা—

১। 'রবীন্দ্রনাথের গীতিকাব্যের অধিকাংশই মন্ত্র-সাহিত্য; আধুনিক যুগের ঋষির দৃষ্ট নব মন্ত্র-সংহিতা···রবীন্দ্রনাথ ঋষি, তাঁহার গীতিকাব্য আমাদের সাহিত্য-ভাণ্ডারের মন্ত্র।'

এই প্রস্তাবের অবলম্বিত যুক্তি এইরূপ:—সাহিত্য তিন প্রকার। বেদ, পুরাণ ও কাব্য। 'বেদ-সংহিতা, ঋষিদিগের দৃষ্টমন্ত্রময়ী'। কাব্য, অলঙ্কার-শাসিত কাল্পনিক সৃষ্টি। আর পুরাণ, 'দৃষ্ট-মন্ত্র ও সৃষ্ট-কাব্য এই দুই প্রকারের' দো-আঁশলা। রবীন্দ্রনাথের গীতিকাব্য প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত। প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য ঋষিগণ-রচিত। অতএব, রবীন্দ্রনাথ 'ঋষি'।

বেদ 'অলৌকিক ও অপৌরুষেয়' বলিয়া 'প্রাচীন মন্ত্রসাহিত্যের সহিত রবীন্দ্রনাথের গীতিকাব্যের তুলনায় অনেকে শিহরিয়া উঠিতে পারেন'—এই আশঙ্কার উত্থাপন করিয়া তাহার নিরাসের জন্য প্রবন্ধকার বলিতেছেন—'অলৌকিকতা বা অপৌরুষেয়তা সাহিত্যের ইতিহাসের বিচার্য্য বিষয় হইতে পারে না, লৌকিক রচনা হিসাবেই সাহিত্যের ইতিহাসে মন্ত্রের স্থান।' সুতরাং প্রাচীন ঋষির রচিত মন্ত্রের সহিত এই 'নবীন ঋষি'র রচিত মন্ত্রের তুলনা সম্পূর্ণ সঙ্গত ও ইহাতে কাহার অঙ্গ 'শিহরিলে' তাহা নিতান্ত অসঙ্গত হইবে। তাহা ছাড়া, বেদ যে 'অলৌকিক ও অপৌরুষেয়', এ কথার প্রকৃত অর্থ প্রবন্ধকার যাহা স্বীয় প্রতিভাবলে আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা বুঝিলেই

* রবীন্দ্রনাথের আত্মকথা ('জীবনস্মৃতি') হইতে আলোচ্য প্রবন্ধে উদ্ধৃত।

বৈদিক মন্ত্র ও রাবীন্দ্রিক মন্ত্রের সৌসাদৃশ্য সম্বন্ধে আর কোনও সংশয় থাকিতে পারে না। তিনি বুঝাইতেছেন—'প্রাচীন ঋষির দৃষ্ট মন্ত্র অতি মহান্। কালের সুবিস্তীর্ণ ব্যবধান সেই মহিমাকে অলৌকিক ও অপৌরুষেয় করিয়া রাখিয়াছে।' অর্থাৎ, বেদ-মন্ত্রগুলি অতি দীর্ঘকাল পূর্ব্বে রচিত বলিয়াই আধুনিক লোকে মনে করে, সেগুলি অলৌকিক ও অপৌরুষেয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেগুলি পুরুষ-প্রসূত! বেদের অপৌরুষেয়ত্বের এই নূতন অর্থে বুঝিতে হইবে, রমাপ্রসাদ বাবুর বেদাক্রমণ সার্থক হইয়াছে। পুরাণের মধ্যেও যে ঋষিদৃষ্ট মন্ত্র বিদ্যমান, ইহাও তাঁহার বেদাধিকারের অন্যতম প্রমাণ। বৈদিক মন্ত্রগুলি 'অপৌরুষেয়', ইহার শাস্ত্রসঙ্গত ও আচার্য্যগণ-ব্যাখ্যাত প্রকৃত অর্থ এই যে, এই সকল মন্ত্র আপ্ত-বাক্য, পরমাত্মভগবৎকর্ত্তৃক উপদিষ্ট। কোনও মনুষ্যের মানস-সৃষ্ট নহে। তপস্যাকালে ও তপস্যাবলে ঋষিগণ যে সকল ভগবদ্বাক্য জ্বলদক্ষরমালাবৎ অন্তর্লোচনে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহাই 'মন্ত্র' নামে অভিহিত। বৈদিক মন্ত্রের অপর নাম 'শ্রুতি'। তপোমগ্ন ঋষিগণ যে সকল ভগবদুক্তি আকাশবাণীর ন্যায় স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়াছিলেন, সেই পরমাত্ম-বাক্যগুলির নামই 'শ্রুতি', বা 'মন্ত্র'। 'মন্ত্র' শব্দটি যে ধাতু (মন্ত্র + অচ্) হইতে উৎপন্ন, তাহার অর্থই গুপ্তভাষণ। নির্জ্জন তপোবনে তপোযোগযুক্ত ঋষিগণসমক্ষে পরমাত্মার জ্ঞান-ভাষণই 'মন্ত্র'। এই কারণেই বৈদিক মন্ত্র আপ্ত বা অপৌরুষেয়। যে সমস্ত তাপস এই মন্ত্র প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই 'ঋষি' নামে অভিহিত। যাঁহারা ঋষি নহেন, মন্ত্র তাঁহাদের প্রত্যক্ষ হয় না। এ সম্বন্ধে নিরুক্তাদি শাস্ত্রের বাক্য সুস্পষ্ট। যথা (১) ঋষিদর্শনাৎ। স্তোমান্ দদর্শ। তৎযদেনাংস্তপস্যমানান্ ব্রহ্ম স্বয়ম্ভ্যানর্ষৎ তে ঋষিয়োঽভবন্। (২) ন প্রত্যক্ষমনৃষেরস্তি মন্ত্রম্।

এই সকল শাস্ত্রোক্তি ও আচার্য্যগণের উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া রমাপ্রসাদবাবু 'মন্ত্র', 'অপৌরুষেয়' ও 'ঋষি', এই তিন শব্দেরই কদর্থ ও অপব্যবহার করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথকে 'ঋষি' করিতে হইলে 'ঋষি', ঋষির 'তপস্যা', 'ঋষিদৃষ্ট মন্ত্র', এই তত্ত্বগুলিরও অভিনব মতে ব্যাখ্যা না করিলে চলিবে কেন?

অতঃপর—

২। পাছে লোকে 'মন্ত্র' ও 'কাব্য', এই দুয়ের পার্থক্য বুঝিতে না পারিয়া রবীন্দ্রের গীতিকাব্যকে 'কাব্যমাত্র' মনে করিয়া তাঁহার ঋষিত্ব অস্বীকার করে, এই ভয়ে প্রবন্ধকার মন্ত্র ও কাব্যের সংজ্ঞা-নির্দ্দেশ-করিয়াছেন—

'যে গীত দেখা কথার উপর প্রতিষ্ঠিত, শোনা বা শেখা কথার সম্পর্কবর্জ্জিত, তাহা মন্ত্র; যে গীতে শেখা কথার ও শোনা কথার প্রাধান্য, তাহা কাব্যমাত্র।'

কাব্যের এমন সহজ লক্ষণ স্বয়ং 'কাব্য-প্রকাশ'-কার বা 'সাহিত্য-দর্পণ'-কারও দিতে পারেন নাই। মন্ত্রের এমন অর্থ-মন্থন কোনও নিরুক্ত-নিঘণ্টু-কারও করিতে পারেন নাই। এই অভিনব লক্ষণানুসারে জয়দেব-কালিদাসাদির ও সেক্সপীয়র গেটে প্রভৃতির রচনা কাব্যমাত্র, এবং একমাত্র রবীন্দ্রনাথের গীতি-কবিতাই 'দৃষ্টমন্ত্র'।

৩। যে হেতু 'ঋষি মন্ত্রদ্রষ্টা', যে হেতু 'ঋষিরা ধর্ম্মের সাক্ষাৎদ্রষ্টা ছিলেন', যে হেতু 'পরবর্ত্তী কালের লোকেরা পড়িয়া বা শুনিয়া যে অতীন্দ্রিয় জগতের সন্ধান পাইয়া থাকেন, ঋষি তাহা প্রত্যক্ষ করেন, এবং মন্ত্র গান করিয়া অপরকে প্রত্যক্ষানুভূতির পূর্ব্বাস্বাদ প্রদান করেন'—আর যে হেতু—

'রবীন্দ্রনাথের গীতিকাব্যে যাহা মন্ত্র, তাহাতে আমরা অতীন্দ্রিয় জগতের যে আলেখ্যের সন্ধান লাভ করি, তাহার দিকে চাহিলেই স্বতঃ মনে হয়, ইহা শোনা বা দেখা কথার প্রতিধ্বনি-মাত্র নহে, ইহা দেখা কথা, গানে গাঁথা'—

রবীন্দ্রনাথের এই পরোক্ষ-প্রত্যক্ষীকরণ ব্যাপার সাহিত্য-ক্ষেত্রে শ্রীযুত রমাপ্রসাদ চন্দের নূতন আবিষ্কার! সেই হেতু রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই এক জন 'ঋষি'!

৪। আবার যদি কাহারও 'ঋষি সম্বন্ধে ধারণা' এরূপ থাকে যে, 'ঋষি সংসারী নহেন—সন্ন্যাসী', আর তিনি যদি বলেন, 'রবীন্দ্রনাথ বিলাসী জমীদার', রবীন্দ্রনাথ পাটের ব্যবসা ও চাম্‌ড়ার বা হাড়ের ব্যবসা করিয়াছিলেন, তিনি 'ঋষি' কিরূপে হইতে পারেন, তবে তাহা খণ্ডন করিবার জন্য রমাপ্রসাদবাবু বলিতেছেন—

'ইতিহাসে দেখা যায়, সন্ন্যাস-প্রথার প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বেই ঋষির অভাব হইয়াছিল।…ঋষি বিরাগী নহেন, ঘোর সংসারী; দানস্তুতি গান করিয়া দক্ষিণা-সংগ্রহে সুনিপুণ।'

ঋষিচরিত্র ও ঋষি-তত্ত্ব এমন গভীর ভাবে না বুঝিলে কি কেহ রবীন্দ্রনাথের 'ঋষিত্ব' বুঝিতে পারে!

কিন্তু এত বুঝিয়াও বুদ্ধিমান রমাপ্রসাদবাবু এইখানে একটা জালে পড়িয়া গিয়াছেন। 'ঋষি বিরাগী নহেন' 'সন্ন্যাস-প্রথার প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বেই ঋষির অভাব হইয়াছিল'—এই কথা প্রতিপন্ন করিবার জন্য তিনি আচার্য্য আপস্তম্ব ও আচার্য্য যাস্কের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া অর্থ করিতেছেন—

'(ব্রহ্মচর্য্যের) নিয়ম প্রতিপালিত হয় না বলিয়া আধুনিক কালের লোকের মধ্যে ঋষিগণ প্রাদুর্ভূত হয়েন না'…'ঋষিরা ধর্ম্মের সাক্ষাৎ দ্রষ্টা ছিলেন। তাঁহারা ধর্ম্মসাক্ষাৎকারে অসমর্থ

অবর বা আধুনিক কালের লোকদিগকে উপদেশের দ্বারা মন্ত্রনিচয় শিক্ষা দান করিয়া গিয়াছেন।'

এই প্রমাণোদ্ধারে প্রবন্ধকারের প্রতিপাদ্য দুইটী বিষয়েরই একেবারে মূলোচ্ছেদ হইতেছে। যদি ব্রহ্মচর্য্যের সংযম নিয়মাদি প্রতিপালিত হয় না বলিয়া আধুনিক কালের লোকের মধ্যে ঋষিগণ প্রাদুর্ভূত হয়েন না', তবে 'ঋষি বিরাগী নহেন', 'ঘোর সংসারী', এ সব কথা সঙ্গত হইতে পারে কি? উক্ত কারণে আধুনিককালে ঋষির আবির্ভাব যদি বাস্তবিকই অসম্ভব হইল, তবে 'বিলাসী' রবীন্দ্রনাথ 'ঋষি' হইলেন কিরূপে? এই প্রকারে মনীষী রমাপ্রসাদ বাবু যে ডালে বসিয়াছেন, সেই ডালই কাটিয়াছেন!

৫। সে যাহা হউক, কেহ যদি এরূপ তর্ক করেন যে, রবীন্দ্রনাথ যদি ঋষি, তবে তাঁহার রচনা ঋষি-প্রণীত বেদের সর্ব্বাবয়ব-লক্ষণযুক্ত নহে কেন, ইহার খণ্ডনের জন্য 'ঋষি'-শিষ্য বলিতেছেন—

'যে নব মন্ত্র-সংহিতায় রবীন্দ্রনাথের (কাব্যরচনার) এই পালা নিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা ঋক্, সাম, অথর্ব্ব, অথবা শুক্লযজুর্ব্বেদসংহিতার মত কেবল মন্ত্রময়ী নহে, কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের মত ব্রাহ্মণ-ভাগ-সমন্বিত। ব্রহ্মসঙ্গীতশ্রেণীর অধিকাংশ সঙ্গীত ও অনেক গীতিকবিতা রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টমন্ত্র; এবং বিধি ও অর্থবাদপূর্ণ আর আর রচনা রবীন্দ্রনাথের প্রোক্ত ব্রাহ্মণ।.. ব্রাহ্মণভাগে আর আর যাহা থাকে—ইতিহাস, পুরাণ, নারাসংসী-গাথা-প্রভৃতি—(তাঁহার রচনায়) তাহারও অভাব নাই।'

যখন রবীন্দ্রনাথের 'পদ্য' বেদের 'মন্ত্র'ভাগসদৃশ, আর তাঁহার 'গদ্য' বেদের 'ব্রাহ্মণ'ভাগসদৃশ—যখন তাঁহার 'পদ্যগদ্য' সমস্ত রচনাই চতুর্ব্বেদের সমস্ত-লক্ষণবিশিষ্ট, তখন তাঁহার রচনা-সমষ্টিকে 'বেদ' বলিতে ও তাঁহাকে 'ঋষি' বলিয়া জানিতে কাহার আর কি দ্বিধা থাকিবে! পূজনীয় পুরাণকারগণ অশেষ জ্ঞানের আকর মহাভারত গ্রন্থকে 'পঞ্চমবেদ' বলিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের রচনা যখন পুরাণ-শ্রেণীর অন্তর্গত না হইয়া সাক্ষাৎকল্পে বেদ-সংহিতাই হইতেছে, তখন তত্ত্বদর্শী রমাপ্রসাদবাবু মহর্ষি ব্যাসের প্রতি একটু অনুগ্রহ করিয়া রবীন্দ্রনাথের মহা-সংহিতাকে 'ষষ্ঠ বেদ' বলিবেন কি?

৬। আবার, যদি এমন কথা উঠে যে, রবীন্দ্রনাথ যদি 'ঋষি', আর তাঁহার গীতিকাব্য যদি 'ঋষি-দৃষ্ট মন্ত্র', তবে প্রত্যেক বৈদিক মন্ত্রের যেমন এক এক জন দেবতা আছেন, তেমনই ঋষি রবীন্দ্রনাথের মন্ত্রের দেবতা কই? ইহার উত্তর-প্রকাশে নবীন নিরুক্ত-কার বুঝাইতেছেন—

'রবীন্দ্রনাথের...কাব্যের যাহা প্রাণবস্তু, তাহা...ছন্দোবন্ধ কথার কথামাত্র নহে, তাহা দৃষ্ট

মন্ত্রের প্রত্যক্ষ দেবতা। বিশ্বসাহিত্যের প্রথম মন্ত্রসংহিতা ঋগ্বেদের সূক্তমালা। সূক্তমালার দেবতা তথাকথিত ৩৩টি বৈদিক দেবতা। কিন্তু বেদমন্ত্রের দেবতা…প্রত্যক্ষ দেবতা।…ঋষির সাধনার যাহা চরম লক্ষ্য, পুরুষ সূক্তের সেই পুরুষ নারায়ণও প্রত্যক্ষ বিষয় ; সীমার মধ্যে অসীমের—বহুর মধ্যে একের অনুভব।…সীমার ও অসীমের মিলনক্ষেত্র নর-নারায়ণই রবীন্দ্র-নাথের সকল মন্ত্রের দেবতা।'

রবীন্দ্রনাথের পদ্য-মন্ত্রের যখন 'দেবতা' পাওয়া গিয়াছে ও প্রত্যেক 'মন্ত্রে'র যখন 'ছন্দঃ' আছে, তখন সে দেবতামন্ত্রের 'দ্রষ্টা' অবশ্যই 'ঋষি' হইবেন !

তার পর যদি বল—বেদ ত মোক্ষলাভের মার্গ। রবীন্দ্রের বেদে তাহা কি আছে ? যদি না থাকে, তবে তাঁহার কাব্য বেদ নহে—তিনিও 'ঋষি' নহেন।

এই সামান্য আপত্তি তুলিয়া তুমি লেখককে হঠাইতে পারিবে না। তিনি এ সম্বন্ধে কি বলিতেছেন, তাহা মনোযোগ দিয়া শোন—

'রবীন্দ্রনাথ (তাঁহার) 'জীবন-স্মৃতিতে লিখিয়াছেন, "আমার ত মনে হয় আমার কাব্যরচনার এই একটিমাত্র পালা। সেই পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে—সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন সাধনের পালা।" ইহা অপেক্ষা মহান্ পালার উদ্ভাবন অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথের গীত-পালা বিংশ শতাব্দের ভীষণ জীবনযুদ্ধে আহত পীড়িত সংশয়াচ্ছন্ন নরনারীর জীবন-ব্যাধির অমৃতোপম ঔষধ—জীবন্মুক্তির পথের মঙ্গলোজ্জ্বল আলো।'

অতএব, রবীন্দ্রনাথের কাব্য বিংশ শতাব্দীর মোক্ষমার্গ। বঙ্গ-সাহিত্যে 'ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত' রচিত হইয়াছে কি না, সে বিষয়ে তর্ক করিতে পার, কিন্তু ঋষি রবীন্দ্রনাথের কাব্য যে 'বিংশ শতাব্দীর বেদ', ইহাতে কোনও সংশয় করিও না।

রবীন্দ্রনাথের 'কাব্য-রচনা'র যে 'এই একটিমাত্র পালা', যাহার 'নাম' কবি নিজেই দিয়াছেন—'সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন সাধনের পালা', ইহা যদি বুঝিতে না পারিয়া থাক, তবে তাঁহার 'কড়ি ও কোমল', 'মানসী', 'সোনার তরী', চিত্রা, 'চিত্রাঙ্গদা' ইত্যাদি প্রধান কাব্যগ্রন্থগুলি ভাল করিয়া আর একবার পড়িও। তাঁহার এই 'পালা'র গোটাকত ছড়া—তাঁহার 'মন্ত্র-সংহিতা'র গোটাকত 'মন্ত্র' পাঠককে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইতেছে।

(১) দুটি চুম্বনের ছোঁয়াছুঁয়ি মাঝে যেন সরমের হাস
দুখানি অলস আঁখি-পাতা মাঝে সুখ-স্বপন আভাস। (কড়ি ও কোমল)

(২) নারীর প্রাণের প্রেম মধুর কোমল
বিকশিত যৌবনের বসন্তসমীরে
কুসুমিত হ'য়ে ওই ফুটেছে বাহিরে
সৌরভ সুধায় করে পরাণ পাগল। (ঐ গ্রন্থে 'স্তন' কবিতা)

(৩) অধরের কোণে যেন অধরের ভাষা
দোঁহার হৃদয় যেন দোঁহে পান করে।
গৃহ ছেড়ে নিরুদ্দেশ দুটি ভালবাসা
তীর্থযাত্রা করিয়াছে অধরসঙ্গমে!

* * *

ব্যাকুল বাসনা দুটি চাহে পরস্পরে
দেহের সীমায় আসি দুজনের দেখা
প্রেম লিখিতেছে গান কোমল আখরে
অধরেতে থরে থরে চুম্বনের লেখা। (কড়ি ও কোমল)

(৪) কাহারে জড়াতে চাহে দুটি বাহুলতা
কাহারে কাঁদিয়া বলে যেও না যেও না।

* * *

লতায়ে থাকুক বুকে চির আলিঙ্গন
ছিঁড়ো না ছিঁড়ো না দুটি বাহুর বন্ধন। (কড়ি ও কোমল)

(৫) প্রতি অঙ্গ কাঁদে তব প্রতি অঙ্গ তরে
প্রাণের মিলন মাগে দেহের মিলন।
হৃদয়ে আচ্ছন্ন দেহ হৃদয়ের ভরে
মুরছি পড়িতে চায় তব দেহ পরে। (কড়ি ও কোমল)

(৬) ওই তনুখানি তব আমি ভালবাসি
এ প্রাণ তোমার দেহে হয়েছে উদাসী।

* * *

ওই দেহখানি বুকে তুলে নেব বালা
চতুর্দ্দশ বসন্তের একগাছি মালা। (কড়ি ও কোমল)

(৭) কোমল দুখানি বাহু সরমে লতায়ে
বিকশিত স্তন দুটি আগুলিয়া রয়।

* * *

তারি মাঝে আমারে কি রাখিবে যতনে
হৃদয়ের সুমধুর স্বপন শয়নে। (কড়ি ও কোমল)

(৮) উরসে পড়ি যূথির হার বসনে মাথা ঢাকি
বনের পথে নদীর ধারে অন্ধকারে বেড়াবে ধীরে
গন্ধটুকু সন্ধ্যা-বায়ে রেখার মত রাখি।
বাজিবে তার চরণধ্বনি বুকের শিরে শিরে,
কখন্, কাছে না আসিতে সে পরশ যেন লাগিবে এসে
যেমন করে দখিন বায়ু জাগায় ধরণীরে। (মানসী)

(৯) আমি, কুন্তল দিব খুলে।
অঞ্চল মাঝে ঢাকিব তোমায়
নিশীথ নিবিড় চুলে।
দুটি বাহুপাশে বাঁধি নত মুখখানি
বক্ষে লইব তুলে। (মানসী)

(১০) বীণা ফেলে দিয়ে এস মানস-সুন্দরী,
দুটি রিক্তহস্ত শুধু আলিঙ্গনে ভরি'
কণ্ঠে জড়াইয়া দাও * *
চুম্বন মাগিব যবে, ঈষৎ হাসিয়া
বাঁকায়ো না গ্রীবাখানি ফিরায়ো না মুখ—
* * *
রেখো ওষ্ঠাধরপুটে, ভক্ত ভৃঙ্গ তরে
সম্পূর্ণ চুম্বন এক। (সোনারতরী)

(১১) হে বঁধু এ স্বচ্ছ বাস করে মোরে পরিহাস
সতত রাখিতে নারি ধরিয়া।
চাহিয়া আঁখির কোণে তুমি হাস মনে মনে
আমি তাই লাজে যাই মরিয়া। (সোনার তরী।)

(১২) ফেল গো বসন ফেল—ঘুচাও অঞ্চল,
পর শুধু সৌন্দর্য্যের নগ্ন আবরণ। (কড়ি ও কোমল)

(১৩) নীলাম্বরে কিবা কাজ তীরে ফেলে এস আজ,
ঢেকে দিব সব লাজ সুনীল জলে। (সোনার তরী)

(১৪) আয় রে ঝঞ্ঝা, পরাণ বধুর
আবরণরাশি,করিয়া দে দূর,
করি লুণ্ঠন অবগুণ্ঠন বসন খোল্। (সোনার তরী)

(১৫) হের আজি নিদ্রিত মেদিনী
ঘরে ঘরে রুদ্ধ বাতায়ন। আমি একা
আছি জেগে, তুমি একাকিনী দেহ দেখা
এই বিশ্বসুপ্তি মাঝে। * * *
বক্ষ হতে লহ টানি
অঞ্চল তোমার, দাও অবারিত করি
শুভ্র ভাল * * * একটি চুম্বন
ললাটে রাখিয়া যাও * * আলিঙ্গন-স্মৃতি
অঙ্গে তরঙ্গিয়া দাও। * * (চিত্রা)

(১৬) যদি হেথা খুঁজে পাই মাথা রাখিবার ঠাঁই
বেচা কেনা ফেলে যাই এখনি,
যেখানে পথের বাঁকে গেল চলি নত-আঁখে
ভরা ঘট লয়ে কাঁখে তরুণী!
এই ঘাটে বাঁধ মোর তরণী! (চিত্রা)

(১৭) কালি, মধুযামিনীতে জ্যোৎস্না নিশীথে
কুঞ্জকাননে সুখে
ফেনিলোচ্ছল যৌবন সুরা
ধরেছি তোমার মুখে।
তুমি, চেয়ে মোর আঁখি পরে
ধীরে, পাত্র লয়েছ করে,
হেসে করিয়াছ পান চুম্বন ভরা
সরস বিম্বাধরে।

* * *

তব অবগুণ্ঠনখানি
আমি খুলে ফেলেছিনু টানি
আমি কেড়ে রেখেছিনু বক্ষে, তোমার
কমল-কোমল পাণি।

* * * *

আমি শিথিল করিয়া পাশ
খুলে দিয়েছিনু কেশরাশ,
তব আনমিত মুখখানি
সুখে থুয়েছিনু বুকে আনি,
তুমি সকল সোহাগ সয়েছিলে, সখি,
হাসি-মুকুলিত মুখে,
কালি মধুযামিনীতে জ্যোৎস্না-নিশীথে
নবীন মিলন-সুখে! (চিত্রা)

—ইত্যাদি—

এমন 'ঋষি'র দৃষ্ট 'মন্ত্রসংহিতা' জগতের আর কোনও কবির কাব্যে আছে কি? 'সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন সাধনের পালা'র এরূপ সুস্পষ্ট গানে 'ঋষি' রবীন্দ্রের 'ঋক্-যজুঃ-সাম' আদ্যন্ত মুখরিত! তাঁহার কাব্য-প্রতিভার অথর্ব্ব-দশার 'অথর্ব্ব-বেদে'র ভূতের মন্ত্র, সাপের মন্ত্র প্রভৃতি তাঁহার মূল-পালার সং-মাত্র।

৮। অতঃপর রবীন্দ্রনাথের ঋষিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার আর কি আছে? 'ঋষি'র শিক্ষা, সাধনা ও তপস্যার কথা তুলিবে? তাহার আভাস ত পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের সেই অসাধারণ শিশু-শিক্ষা, সেই 'না বুঝিয়া একধার থেকে বই পড়িয়া যাওয়া', সেই 'গায়ত্রী জপা', সেই 'আপনার মধ্যে আপনি ছাড়া' পাওয়া ইত্যাদির কথার প্রসঙ্গে প্রবন্ধকার বলিয়াছেন—

'প্রাচীন কালের ঋষিবালকের ন্যায় উপনয়ন-সংস্কারেই এই নবীন ঋষির শিক্ষার সূত্রপাত।... বৈদিক সাহিত্যও যে প্রণালীতে রবীন্দ্রনাথের মনটাকে প্রসারিত করিবার অবসর পাইয়াছিল, লৌকিক সাহিত্যও সেই ভাবেই তাঁহার আত্মশিক্ষায় সাহচর্য্য করিয়াছিল।.. পুরাপুরি বুঝিয়া পুস্তক পড়া রবীন্দ্রনাথের প্রয়োজন হয় নাই।...ভাষ্য টীকা অভিধানের সাহায্যে পুস্তক ভাল করিয়া পড়ার যতই গুণ থাকুক, তাহা মনকে বহির্মুখ করে। রবীন্দ্রনাথের সেরূপ শিক্ষার প্রয়োজন ছিল না।'

'ঋষি' হইতে হইলে যে কিরূপ ভাবে পুস্তক পাঠ করিতে হয়, পাঠক তাহা এখান হইতে শিক্ষা করুন। সম্যক্‌ভাবে অর্থ বুঝিয়া 'ভাল করিয়া পুস্তক পড়ার যতই গুণ থাকুক', তাহার মহদ্দোষ এই যে, 'তাহা মনকে বহির্মুখ করে!' মনকে অন্তর্মুখ করিতে হইলে, 'না বুঝিয়া একধার থেকে বই পড়িয়া যাইতে হয়!' পুস্তকের প্রকৃত অর্থ ছাড়িয়া নিজের মনগড়া 'একটা কিছু খাড়া করিয়া' 'নিতান্ত আবছায়ার মত মনের মধ্যে কি একটা তৈরি করিয়া' * যাওয়ার 'অভ্যাস' করিলেই মন অন্তর্মুখ হইয়া শেষে ঋষিশক্তিসম্পন্ন হইবে!

না বুঝিয়া বা 'অল্প স্বল্প বুঝিয়া' পুস্তক-পাঠের অভ্যাসে, মস্তিষ্কের বিকাশ না হইয়া অবসাদ জন্মে। ধৃতি, ধীরতা, সূক্ষ্মদর্শিতা প্রভৃতি উচ্চ মানসিক শক্তির পরিবর্ত্তে মনে চপলতা, অসহিষ্ণুতা, পল্লবগ্রাহিতা প্রভৃতি অপকৃষ্ট বৃত্তিই জন্মিয়া থাকে। মনস্তত্ত্বের (Psychology শাস্ত্রের) এই সত্য অগ্রাহ্য করিয়া স্বয়ং শিক্ষক রমাপ্রসাদবাবু রবীন্দ্রনাথের পাঠ-প্রথার প্রশংসা ও সমর্থন করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। অধিকতর কৌতুকের কথা এই যে, রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এরূপ পঠন-রীতির কুফল হৃদয়ঙ্গম করিয়া 'এই অভ্যাসের ভাল মন্দ দুই প্রকার ফলই আমি আজ পর্য্যন্ত ভোগ করিয়া আসিতেছি'—এ কথা বলিলেও, তাঁহার অনুরাগী রমাপ্রসাদ বাবু তাহা স্বীকার না করিয়া, পুস্তক-পাঠের প্রকৃষ্ট পদ্ধতিরই নিন্দা করিয়াছেন! রবীন্দ্রনাথকে 'ঋষি' করিতে হইলে শিক্ষার ক্রম, নীতি, রীতি—সবই ত বিপর্য্যস্ত করিতে হইবে!

---

* রবীন্দ্রনাথের আত্মকথা ('জীবনস্মৃতি') হইতে প্রবন্ধে উদ্ধৃত।

৯। রবীন্দ্রনাথের ঋষিত্ব-প্রতিপাদক উল্লিখিত যুক্তি-অষ্টক অগ্রাহ্য করিয়া যদি কেহ তাঁহার কাব্যকে 'ঋষি-দৃষ্ট' 'মন্ত্রসংহিতা' বলিয়া স্বীকার করিতে না চাহেন—যদি কেহ রবীন্দ্রনাথের অতীন্দ্রিয় বিষয়-দর্শন ও তাঁহার 'অরূপের রূপ দেখা' কথার 'কথা'মাত্র বলেন, তবে প্রবন্ধকার তাঁহাকে 'রবীন্দ্রনাথের কাব্য-রহস্য'-রসে অরসিক বলিয়া নিশ্চিন্ত হইবেন। কেন না, তিনি বলিতেছেন—

'রবীন্দ্রনাথের কোন একটি মন্ত্র একমনে গাহিয়া বা শুনিয়া যে বলিতে পারে ইহা শুধু কথার কথা, এমন লোক দুর্লভ। যদি এমন লোক থাকে, তবে বলিতে হইবে, তাহার হৃদয়-বীণার তারগুলি ছিঁড়িয়া গিয়াছে।'

রবীন্দ্রনাথকে 'ঋষি' প্রতিপন্ন করিবার জন্য রমাপ্রসাদ বাবুর এই সর্ব্বশেষ যুক্তিটি সর্ব্বাপেক্ষা কৌতুকজনক। তোমার বাঁধা গান শ্যামের ভাল লাগিল না বলিয়া বুঝিতে হইবে, শ্যামেরই সুরবোধ নাই! তোমার প্রিয় আমলকী রামের জিহ্বায় সুমধুর রসাল নহে বলিয়া স্থির করিতে হইবে, রামের রসনার স্বাদ-শক্তি লোপ পাইয়াছে! তোমার ঠাকুর যদুর ইষ্টদেব হইলেন না বলিয়া সিদ্ধান্ত হইবে, যদু দেব-পূজা জানে না! রবীন্দ্রনাথের ঋষিত্বে বিশ্বাস, শ্রীযুত রমাপ্রসাদের মতে, কাব্যালোচনার কষ্টি-পাথর নাকি?

'রবীন্দ্রনাথ ঋষি', 'রবীন্দ্রনাথের গীতিকাব্য ঋষিদৃষ্ট মন্ত্রসংহিতা', তাঁহার 'আর আর রচনা বিধি ও অর্থবাদপূর্ণ ব্রাহ্মণ'—ইত্যাদি অসঙ্গত উক্তি ও অতিরঞ্জিত স্তুতি রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত গৌরবের হানিকর। ভক্তেরা তাঁহাকে যাহা সাজাইতে চাহিবে, তিনি কি বিনা বাক্যব্যয়ে তাহাই সাজিতে সম্মত হইবেন? অযথা নিন্দা হইতে যেমন আত্মরক্ষা করিতে হয়, তেমনই অযথা প্রশংসা হইতেও আত্ম-রক্ষা করা উচিত। রবীন্দ্রনাথের প্রতি উক্ত ঋষিত্বারোপের প্রতিবাদ করা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেরই কর্ত্তব্য। তিনি যদি রমাপ্রসাদ বাবুর এই অতিরঞ্জন-পূজায় আপনার চিত্তরঞ্জন করিয়া নীরবে 'ঋষি'র জটা-টোপর মাথায় দিয়া বসিয়া থাকেন, আত্মসম্মানরক্ষার জন্য প্রকাশ্যভাবে এই অতিপূজার প্রতিবাদ না করেন, তবে তিনি ভক্তের চক্ষে 'ঋষি' হইলেও, সুধীসমাজ তাঁহাকে কি মনে করিবে? সম্প্রতি 'বিবেচনা ও অবিবেচনা'তে যিনি মন দিয়াছেন, তাঁহার এ বিষয়টা একবার বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত।

শ্রীযুত রমাপ্রসাদ বাবু প্রবন্ধের নাম 'রবীন্দ্রনাথের কাব্য-রহস্য' দিয়াছেন বটে, কিন্তু ইহাতে রবীন্দ্রের 'কাব্য-রহস্য' অপেক্ষা তাঁহার 'ঋষি'-রহস্যই সবিশেষ বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। কবির কাব্যের প্রতিষ্ঠা-করণ

অপেক্ষা তাঁহাকে 'ঋষি'-রূপে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টাই প্রাণপণে সাধিত হইয়াছে। ইহা দেখিয়া কবিবর হেমচন্দ্রের একটি মনোহর কথা মনে পড়িতেছে—'হয় কি মানুষ, মাটীর পুতুল তুল্লে উঁচু করে!'

সে যাহা হউক, প্রবন্ধকার প্রবন্ধের শেষভাগে আসিয়া 'রবীন্দ্রনাথের কাব্যের রহস্য' যে কি, তাহা এক কথায় বলিয়া দিয়াছেন—'অরূপের রূপের সুমধুর লীলা দেখা—ইহাই রবীন্দ্রনাথের কাব্যের রহস্য।' রবীন্দ্রনাথের এই 'অরূপের রূপ দেখা'কে 'সত্য বলিয়া মানিতে' হইবে; কারণ, 'রবীন্দ্রনাথ ঋষি,' আর এ রূপ দেখার—'আদালতগ্রাহ্য প্রমাণ মাসিকের পৃষ্ঠায় মুদ্রিত করা কখন সম্ভব কি?' এবং 'যে অরূপের রূপ দেখিয়া তাহার কথা ভিন্ন সেই দেখার আর কোনও প্রমাণ এ পর্য্যন্ত কেহ হাজির করিতে পারেন নাই।' তবুও যদি রাবীন্দ্রিক দর্শনে তোমার 'হৃদয়ে সংশয়' আসে, তবে প্রবন্ধকারের মতে, তাহার কারণ, তোমার 'হৃদয়-বীণা'র ছিন্নতারতা, বা তোমারই 'হৃদয়ের দারিদ্র্য'। রবীন্দ্রনাথের ঋষিত্বে অবিশ্বাসী 'দেশের' লোকের এই 'হৃদয়ের দারিদ্র্য' দূর করিবার জন্য প্রবন্ধকার উপদেশ দিতেছেন—'যে ধনে এই দারিদ্র্য ঘুচিবে, রবীন্দ্রনাথের কাব্য সেই ধনের অলঙ্কারভাণ্ডার।' এই কথা কহিয়াই শ্রীযুত রমাপ্রসাদ বাবু ভাবের আবেগে—'জয় রাধে গোবিন্দ' অবশ্য না বলিয়া—'ধন্য ঋষি!' এই কথা বলিয়া যেন 'বেহালাখানা উঁচু ক'রে' দড়িতে টান দিয়া—

'তোমারি রাগিণী জীবন-কুঞ্জে
বাজে যেন সদা বাজে গো!'

এই গীত 'এক মনে গাহিয়া' পাঠকের নিকট হইতে বিদায় লইলেন! অতএব সিদ্ধান্ত হইল—'রবীন্দ্রনাথ ঋষি!'

শ্রীযতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

অমরনাথ।

অমরনাথ মহাদেব। এই অমরনাথ কাশ্মীর হিমালয়ের বিশ্ববিশ্রুত অমরনাথ নহেন। ইনি পশ্চিম-ভারতে অবস্থান করিতেছেন। ইঁহাকে কেহ কেহ আবার অম্বরনাথ বলিয়া থাকেন। আমরা এই প্রবন্ধে অমরনাথের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত প্রদান করিব। আমি দেবাদিদেবকে কখনও বা 'অমরনাথ' আবার কখনও বা 'অম্বরনাথ' বলিয়া সম্বোধন করিব।

অমরনাথ বোম্বাই হইতে ৩৮ মাইল দূরে পূণার পথে অবস্থিত। আমরা বেলা দশটার সময় বোম্বাই হইতে অমরনাথ-দর্শনে যাত্রা করিলাম। একটি বাঙ্গালী বন্ধু ও তিনটি মহারাষ্ট্র যুবক আমাদের সঙ্গী হইলেন। বোম্বাই হইতে পূণায় যাঁহারা গিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, এ পথের শোভা কি বিচিত্র, সুন্দর! শোভার বৈচিত্র্যে মনে হয় যে, এ পথ কোন্ স্বর্গ-সদৃশ সুরম্য প্রদেশের অভিমুখে চলিয়াছে! প্রথমেই সমুদ্রের খাড়ির উপরে নির্ম্মিত সুদীর্ঘ সেতুর উপর দিয়া ট্রেণ চলিতে লাগিল। বিস্তৃত নীল তরঙ্গায়িত জলরাশির উপর দিয়া লৌহশকট তড়িতবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে, দূরে চিত্রপ্রতিম অনিন্দ্যসুন্দরী বোম্বাই নগরীর 'তমালতালীবনরাজিনীলা' সমুদ্র-চুম্বিতা সৈকতভূমি দৃষ্ট হইতে লাগিল। নয়ন-রঞ্জন রম্য-দৃশ্যে হৃদয় গলিয়া যাইতে লাগিল। কিছু ক্ষণ পরে সমুদ্রের খাড়ি পার হইয়া দেখিলাম, ট্রেণ সুদূর-বিস্তৃত নারিকেল-পাদপ-সমাচ্ছন্ন প্রদেশের মধ্য দিয়া গমন করিতেছে। নারিকেলকুঞ্জের এমন গম্ভীর সৌন্দর্য্য এক দক্ষিণ-ভারত ও মালাবার প্রদেশ ভিন্ন আর কোথাও নাই। নিবিড় নারিকেলনিকুঞ্জবক্ষে খচিত, নানা রঙ্গে রঞ্জিত সুচারু চিত্রপটের ন্যায় হর্ম্ম্যরাজি অতুল শোভায় দণ্ডায়মান। এতদ্ভিন্ন অসংখ্য নারিকেল-উদ্যানের ব্যবচ্ছেদে ফল-ফুল-বহুল বিটপবল্লরীভূষিত উদ্যানহর্ম্ম্য শোভা পাইতেছে। এই সকল অতুলনীয় অট্টালিকাশ্রেণী বোম্বাই প্রদেশের ধনকুবের বণিকৃদিগের বিশ্রামবাস।

ক্রমে ট্রেণ পার্ব্বত্য-প্রদেশে প্রবেশ করিল। এ প্রদেশের শোভা বড়ই চিত্তহারিণী। রেলপথের উভয় পার্শ্বে ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত নিবিড় বন। বন পার হইয়া প্রায় অর্দ্ধক্রোশ দূরে উভয় দিকে গিরিশ্রেণী। কোনও কোনও স্থলে অর্দ্ধক্রোশেরও অল্প দূরে শৈলরাজি শ্যামল পত্র পল্লবে সমাচ্ছন্ন। এই শৈলশ্রেণীর শীর্ষদেশে

সারি সারি তালতরুশ্রেণী অপূর্ব্ব শোভায় শ্রেণীবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। এ শোভা বড়ই বিচিত্র ও হৃদয়স্পর্শী! এ শোভা অভিনব; বঙ্গদেশে নিতান্ত দুর্ল্ভ। বঙ্গদেশে ক্বচিৎ কোথাও দুই চারিটি তালতরু শৈলশিখরে শোভিত আছে বটে, কিন্তু এমন শ্রেণীবদ্ধভাবে নাই। যত দূর পাহাড় চলিয়াছে, শিখরশোভিত 'দীর্ঘপত্রধারী' তালশ্রেণী তত দূর প্রসারিত।

প্রত্যেক ষ্টেশনই লোকে লোকারণ্য। কত শ্রেণীর লোক যে উঠানামা করিতেছে, তাহা ইয়ত্তা করা কঠিন। পারসী, ভাটিয়া, হিন্দুস্থানী, মাদ্রাজী, মহারাষ্ট্রী, তাহাদের দেশীয় পরিচ্ছদে সুশোভিত। এ দেশে নারীগণের অবরোধ-প্রথা নাই। অনিন্দ্যসুন্দরী মহারাষ্ট্রললনাগণ তাঁহাদের পতি-পুত্র-ভ্রাতাদিগের সহিত জাতীয় মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ করিতেছেন। ষ্টেশনে নানা-প্রকার ফলমূল, মিষ্টান্ন, পান, চুরুট প্রভৃতি বিক্রীত হইতেছে। ফলের মধ্যে কমলালেবু (সান্ত্রা) অতি উৎকৃষ্ট। নয়নরঞ্জন গাঢ়গোলাপী রঙ্গের শর্করাবৎ সুমিষ্ট তরমুজের ফালি, বিবিধ প্রকার কদলী, বোম্বাই ও নারিকেল কুল, নারিকেলের শাঁস, ফোঁপল, টেপারি প্রভৃতি কয়েক প্রকার মুখরোচক সুস্বাদু ফল,—কাগজ-মণ্ডিত ডালভাজা, সখের জলপান, চতুষ্কোণ পাতলা এক প্রকার মিষ্টান্ন, জিলাপী, বরফী প্রভৃতি নানা উপাদেয় খাদ্য-দ্রব্যে বিক্রেতারাই বড় বড় ষ্টেশনগুলি সরগরম করিয়া রাখিয়াছে। বালক বালিকা, যুবক যুবতী ও অন্যান্য নরনারী সকলে খাদ্যদ্রব্যাদি ক্রয় করিতেছে—খাইতেছে। ফেব্রুয়ারী মাসের প্রায় শেষ। ইহারই মধ্যে রৌদ্রের উত্তাপ এই চিরবসন্তময় প্রদেশে বিলক্ষণ অনুভূত হইতেছে। আমরাও ক্ষুধিত ও তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া পড়িয়াছি। আমার মহারাষ্ট্র যুবক সঙ্গীরা তরমুজ, লেবু, কলা, ডালভাজা, চানাচুর ও চতু-ষ্কোণ কাগজে মোড়া পাতলা মিষ্টান্ন (আমাদের দেশে কাগজে মোড়া যেমন বাজীর পটকা, এই মিষ্টান্নও দেখিতে ঠিক সেই রকম, কাগজে মোড়া; তবে সেটা প্রায় এক ইঞ্চি পুরু, ইহা পাতলা, দুইখানি সরভাজার ন্যায় পুরু।) প্রভৃতি নানা সুখাদ্য ক্রমাগত ষ্টেশনে ষ্টেশনে পর্য্যাপ্তপরিমাণে ক্রয় করিতে লাগিলেন, এবং আমাকে দিতে লাগিলেন। আমি প্রথম প্রথম তাঁহাদের প্রদত্ত খাদ্যদ্রব্যাদি আত্মসাৎ করিতে একটু লজ্জা বোধ করিতে লাগিলাম; কিন্তু সেই প্রিয়দর্শন বাঙ্গালী বন্ধু পাঁচুবাবু ও রমেশচন্দ্র বলিতে লাগিলেন, "খান্ না সোম মশাই, এতে আর লজ্জা কি?" কাজেই তাঁহাদের সঙ্গে অল্পে অল্পে যোগদান করিয়া শেষে তাঁহাদের সঙ্গে সমানে, সবেগে ও সটানে চলিতে লাগিলাম। চারি পাঁচ ফালা

তরমুজ খাইয়া ফেলিলাম। এই অমৃতোপম ফলরাজ রৌদ্রতাপে তৃষিত রসনাকে অসীম সুখ ও তৃপ্তিদান করিয়াছিল। প্রবাসের অনেক স্মৃতির সহিত এই ফল-স্মৃতিটিও আমার মনে বহুদিন থাকিবে।

এইরূপে পথে যাইতে যাইতে, নানা নয়ন-মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিতে দেখিতে, আমরা বেলা প্রায় ১২টার সময় অম্বরনাথ ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। সকলে তাড়াতাড়ি গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলাম। এই ষ্টেশনটি ঠিক্ কল্যাণ জংসন নামক প্রসিদ্ধ ষ্টেশনের পরবর্ত্তী।

ষ্টেশনমাষ্টারের মুখে শুনিলাম যে, মন্দির ষ্টেশন হইতে পশ্চিম দিকে এক মাইলের একটু বেশী হইবে। কি করা যায়, সকলেই পদব্রজে মন্দিরের উদ্দেশে চলিতে লাগিলাম। এই স্থানটি উঁচু-নীচু পার্ব্বত্যভূমি। চলিতে চলিতে কখনও বা নিম্নপ্রদেশে নামিয়া যাইতেছি; কখনও বা উপরে উঠিতেছি। কিছু দূর অগ্রসর হইয়া দেখি, পথের দু'ধারে নিবিড় বন। কিয়ৎকাল বনের মধ্য দিয়াই চলিতে লাগিলাম। এই সময়ে বনের ঠাণ্ডা বাতাসে ও বনফুলের গন্ধে বেশ আরাম বোধ করিলাম। খানিক পরে বন পার হইয়া আমরা খোলা ঢেউখেলান মাঠে আসিয়া পড়িলাম। পথের বাম দিকে একটু দূরেই নীল পাহাড় শ্রেণী। কল্যাণ জংসন হইতে বরাবর জলের পাইপ ঐ পাহাড়ের পাদদেশ অবধি চলিয়া গিয়াছে। ঐখান হইতে কল্যাণে জল সরবরাহ হইয়া থাকে। মাঝে মাঝে একটু দূরে বিল পুষ্করিণীও দেখা যাইতে লাগিল। সূর্য্যকিরণে রৌপ্যশঙ্খশুভ্র জলরাশি ঝক্ মক্ করিতেছে; জোর বাতাসে জলে ঢেউ উঠিতেছে। আবার মাঝে মাঝে চতুষ্কোণ শস্যক্ষেত্রগুলির উজ্জ্বল মরকত-হরিত-শোভায় চক্ষু মুগ্ধ করিয়া দিতেছে!

আমরা পূর্ব্বের মতই কখনও ঢালুপথে, কখনও সোজা পথে চলিয়াছি। মহারাষ্ট্র বন্ধুগণ চলিতে চলিতে কতই আমোদ প্রমোদ, কতই খোস্ গল্প, কতই ঠাট্টা তামাসা করিতেছেন, কিন্তু আমার মনে একটু চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এত দূর যে চলিয়াছি, কিসের জন্য? অমরনাথের মন্দির কোথায়? তাহার ত কোনও নিদর্শনই নাই। যখন যে স্থানেই দেবমূর্ত্তি দর্শন করিতে গিয়াছি, বহু দূর হইতেই অভ্রভেদী মন্দিরচূড়া নেত্রপথে প্রকটিত হইয়াছে। সেই দূর হইতেই দেবতার উদ্দেশে প্রণাম করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। কিন্তু অম্বরনাথের মন্দিরের ত কোনও চিহ্নই দেখিতেছি না। পথে আমরা কয়টি বন্ধু ব্যতীত আর কোনও পথিকই নাই। অদূরে

পাহাড়ের প্রান্তভাগে গোমহিষাদি চরিতেছে ; তাহাদের গলঘণ্ট শ্রুত হইতেছে। কিন্তু রাখাল বালক-বালিকা পাহাড়ের বনে বনফুল-সংগ্রহে রত, কেই বা তাহাদের নিকটে গিয়া 'মন্দির কত দুর' জিজ্ঞাসা করে? কাহারও সে মতি হইল না। সকলেই বলিল, যাওয়া যাক্ না, মন্দির নিশ্চয়ই পাইব! এইরূপ বলিতে বলিতে যেমন আমরা উচ্চভূমির উপর উঠিলাম, অমনই দু' এক জন বলিয়া উঠিলেন, 'ঐ মন্দির! ঐ মন্দির!' এই কথা শুনিবামাত্র দূরে একটি ভগ্নজীর্ণ মন্দিরের কিয়দংশ তরঙ্গায়িত ভূমির পার্শ্বদেশ হইতে উঁকি মারিতেছে, দেখিলাম। যেমন মেঘাচ্ছন্ন পর্ব্বতগাত্রের অন্যাংশ মেঘাভ্যন্তর হইতে দৃষ্ট হয়, ঠিক তেমনই দেখা যাইতে লাগিল! যেমন কোনও বিশাল শুষ্ক সরোবরের মধ্যভাগে কোনও সৌধ থাকিলে, তাহার নিকটবর্ত্তী না হইলে সৌধ-অবয়ব দৃষ্ট হয় না, তেমনই এই মন্দিরের অতিনিকটস্থ না হইলে, মন্দিরাবশেষ চোখে পড়ে না।

আমরা আরও কিছু দূর অগ্রসর হইলেই একটি পার্ব্বত্য স্রোতস্বিনীর মৃদু কলস্বর কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। ক্ষণপরে দেখিলাম, নিম্নভূমিতে ক্ষুদ্রগিরি-প্রবাহিণী দেবাদিদেব অম্বরনাথের মহাপ্রাচীন, অর্দ্ধলুপ্ত, জরাজীর্ণ, স্থবির মন্দিরের পাদচুম্বন করিয়া প্রবাহিতা। আমরা সকলেই পাদুকা খুলিয়া উন্মুক্তপদে ক্ষুদ্র-পরিসর গিরিনদীটি পার হইয়া অমরনাথের মন্দিরে উপস্থিত হইলাম। এ কোন্ যুগের মন্দির? মন্দিরের উপরিভাগের অর্দ্ধাংশ ত কোন্কালে কালের বাতাসে উড়িয়া গিয়াছে! অর্দ্ধভগ্নাবশেষ অপূর্ব্ব শিল্পসম্ভারে ভারাক্রান্ত মন্দিরখণ্ড এই জনশূন্য পার্ব্বত্য-প্রান্তরে এখনও পড়িয়া আছে! সেই সুদূর অতীতের সাক্ষ্য দিতে দেবাদিদেব আজও বসিয়া আছেন,—তিনি মন্দির হইতে অন্তর্হিত হন নাই!

আমি ও এক জন সঙ্গী মন্দিরে প্রবিষ্ট হইলাম। মহারাষ্ট্র যুবকেরা মহাদেবকে অর্ঘ্যপ্রদানের নিমিত্ত বিল্বদল ও পুষ্পসংগ্রহ করিতে গেলেন। মন্দির-প্রবেশের তিনটি দ্বার আছে। মন্দির পশ্চিমমুখবর্ত্তী; কিন্তু উত্তর-দক্ষিণ দিক্ দিয়াও মণ্ডপে প্রবিষ্ট হওয়া যায়। জগমোহনের ছাদ এত জীর্ণ হইয়াছে যে, স্থানে স্থানে কাঠের চাড়া দেওয়া হইয়াছে। এত প্রাচীন শিল্প-শোভায় জগমোহনের ছাদ অলঙ্কৃত যে, দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। চারিটি ভিন্ন ভিন্ন সুদৃশ্য স্তম্ভে মণ্ডপের ছাদ অবস্থিত। সুন্দর স্তম্ভচতুষ্টয় ও ছাদের অন্যান্য শিল্প চাতুর্য্য অতুলনীয়। মণ্ডপের পরই গহ্বরে অবতীর্ণ হইয়া দেবদর্শন করিতে হয়। কিন্তু দেবগৃহের আভ্যন্তরীণ শিল্পসৌন্দর্য্য অন্তর্হিত হইয়াছে! গহ্বর অর্থাৎ গৃহতলে দেবাদিদেব অমরনাথ বিরাজ করিতেছেন। আমরা রৌদ্রদগ্ধদেহে

মহাগর্ভে অবতরণ করিয়া মহাদেবের চারি পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া, ভূতলে ললাটস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলাম। পূজক পাত ও আকন্দ পুষ্পে দেবার্চ্চনা করিয়া চলিয়া গিয়াছে। ক্ষুদ্র শিবলিঙ্গ পীতপুষ্পে সমাচ্ছাদিত! গৃহমধ্যে কি স্নিগ্ধতা! বিরাজিত! তাহাতে আবার শীতলসমীর-সঞ্চার! কি মধুর শান্তিই জীবনে ক্ষণকাল উপভোগ করিলাম!

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মন্দির-চূড়া কালের ফুৎকারে অর্দ্ধেক উড়িয়া গিয়াছে। মহাদেব একটি ছাদহীন কক্ষে উন্মুক্ত নীলাম্বরতলে অবস্থান করিতেছেন! নিদাঘের নির্দ্দয় সূর্য্যকিরণে তাপিত, বর্ষার অবিশ্রান্ত বারিধারায় সিক্ত ও হেমন্ত-শিশিরে স্নাত মহামৌন মহাদেব ধ্যানমগ্ন! আমরা বহুক্ষণ দেবসন্নিধানে যাপন করিয়া প্রণামান্তে মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম।

এই ভগ্নাবস্থায় মন্দিরের উচ্চতা প্রায় ষাট ফুট হইবে। মন্দিরের সর্ব্বাঙ্গ (কি ভিতরে কি বাহিরে) নিবিড় শিল্পজালে সমাচ্ছন্ন। যেমন বনলতা বন-পাদপের আপাদমস্তক ঢাকিয়া ফেলে, তেমনই মন্দিরগাত্রের সকল স্থানই অপূর্ব্ব শিল্পসাধনে আবৃত রহিয়াছে! মহাদেব, পার্ব্বতী, কালী—যোগী, রাক্ষস, মানব, মানবী ও নানাবিধ জীবজন্তুর মূর্ত্তি নানারূপে ক্ষোদিত হইয়াছে—দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। ত্রি-মস্তক শিব সতীকে অঙ্কে লইয়া বসিয়া আছেন। কত পৌরাণিক চিত্রে যে বিমান শোভিত, তাহা যিনি না দেখিয়াছেন, তাঁহাকে বুঝান দুঃসাধ্য।

এই মন্দিরের প্রস্তরফলকে, শক ৯৮২ এবং খৃষ্টাব্দ ১০৬০ লক্ষিত হয়। পুরাতত্ত্ববিদেরা বলেন যে, দাক্ষিণাত্যের চালুক্য-বংশীয়দিগের অধীন কঙ্কণ প্রদেশের করদ-ভূপতি বা মহামণ্ডলেশ্বর চিত্র যাদবের পুত্র সন্তরিরাজ কর্ত্তৃক এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল! বোম্বাই প্রদেশের কোনও দেবমন্দিরই শিল্পনৈপুণ্যে এই মন্দিরকে অতিক্রম করিতে পারে নাই।

গবর্মেণ্ট বহুযত্নে এই অনিন্দ্য-শিল্পসৌন্দর্য্য-সমন্বিত বহুপ্রাচীন অর্দ্ধভগ্ন শিবমন্দিরের রক্ষাকল্পে চেষ্টা করিতেছেন। মন্দিরের বহু অংশ পতনোন্মুখ অবস্থায় দণ্ডায়মান। দেখিলেই মনে হয়, কোনও প্রবল ঝটিকায় বা ভূকম্পনে ভূমিসাৎ হইয়া যাইবে। মণ্ডপের উপর গুচ্ছ গুচ্ছ তৃণদল শ্যামায়িত হইয়া রহিয়াছে: ইহার পূর্ণসংস্কার নিতান্ত আবশ্যক।

আমরা ষ্টেশনের অভিমুখে যাত্রা করিলাম। কিছু কাল চলিতে চলিতে আমার বোধ হইতে লাগিল, আমরা বুঝি মৃগের ন্যায় পথভ্রান্ত হইয়াছি।

মন্দির হইতে ষ্টেশন পূর্ব্বমুখে। সে দিক্ না ধরিয়া আমরা পশ্চিম দিক্ ধরিয়াছি, তাই নূতন নূতন দৃশ্য চক্ষে পড়িতেছে। ক্রমাগত চলিতেছি, তবু পথ আর ফুরায় না, ষ্টেশন আর আসে না। আমার কথায় তখন সঙ্গীদের চৈতন্য হইল; সকলেই বুঝিলেন যে, প্রকৃত পথ হারাইয়া বিপথে চলিয়াছেন। আমার মনে ভয় হইল, বুঝি বা ট্রেণ ফেল হই। দু এক জন সঙ্গী বলিল, 'ভয় কি? না হয় রাত্রে যাইব। এ স্থান বড়ই মনোরম। দিনটা ভাল করে' enjoy করা যাক্। জনশূন্য পার্ব্বত্য প্রদেশে একটি লোকও দেখা যাইতেছে না, কাহাকে পথের কথা জিজ্ঞাসা করি! কেবল দূরে দূরে রৌদ্রছায়াময় পাহাড়ের তলে তলে গো মহিষাদি চরিতেছে; রাখাল যে কোন্ গাছতলায় পড়িয়া ঘুমাইতেছে, তাহা কে বলিবে? চিত্ত বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠিল। ভগবান্ অম্বরনাথকে স্মরণ হইল। অকস্মাৎ আমাদের মধ্যে এক জনের দৃষ্টি বাঁধের অন্তরালে একটি ঘোর কৃষ্ণকায় মনুষ্যমূর্ত্তির উপর পড়িল। তাহাকে ষ্টেশনের কথা জিজ্ঞাসা করায়, সে সেই প্রদেশের গ্রাম্যভাষায় বলিল, 'ষ্টেশন এ দিকে নয়, ঐ ও দিকে। এক ক্রোশেরও বেশী।' শুনিয়াই চক্ষুঃ স্থির! সে ব্যক্তি ধীবর, জাতিতে ভীল, পার্ব্বত্য ঝিলে পত্নীর সহিত মৎস্য ধরিতেছিল। আমাদের আহ্বানে কিয়ৎকাল ইতস্ততঃ করিয়া নিকটে আসিল। আমরা তাহাকে পুরস্কারের অঙ্গীকার করিয়া ষ্টেশনে লইয়া যাইবার জন্য পাকড়াও করিয়া ফেলিলাম। কিন্তু সে পত্নীকে ছাড়িয়া যাইতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক। পুরস্কারের কথা বলিলেও, সে কাজের বায়না করিয়া যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিল। আমাদের নিতান্ত পীড়াপীড়িতে ও আমরা বিপন্ন হইয়াছি বুঝিয়া, সে ঝিল-জলে অর্দ্ধনিমজ্জিতা জালধারিণী পত্নীকে একাকিনী রাখিয়া বিমর্ষচিত্তে আমাদের সঙ্গে যাইতে স্বীকৃত হইল। আমরা তাহাকে লইয়া দৌড়াইতে দৌড়াইতে হাঁপাইতে হাঁপাইতে রৌদ্রে পুড়িতে পুড়িতে গলদ্ঘর্ম্ম হইয়া ষ্টেশনে পঁহুছিতে না পঁহুছিতে ট্রেণ আসিয়া পড়িল। সকলেই বিষম তাড়াতাড়িতে যে যে গাড়ীতে পারিল, উঠিয়া পড়িল। কেবল এক জন ষ্টেশনমাষ্টারের নিকট হইতে কোনও গতিকে টিকিটগুলি ক্রয় করিয়া ভীলের হস্তে একটি আধুলী দিয়া চলন্ত ট্রেনে লাফাইয়া উঠিয়া পড়িলেন। আমরাও ট্রেন হইতে দেখিলাম যে, আমাদের পথপ্রদর্শক সেই কৃষ্ণবর্ণ ভীল ঝিলের অভিমুখে ঊর্দ্ধ্বশ্বাসে ছুটিতেছে।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম।

সহযোগী সাহিত্য।

জাতিতত্ত্ব ও শিক্ষাতত্ত্ব।

গত এপ্রেল মাসের যে সকল উচ্চাঙ্গের সাময়িক পত্র মার্কিণ দেশ হইতে এ দেশে আসিয়াছিল, তাহাদের অনেকগুলিতে এই যুদ্ধের ফলে জাতিতত্ত্বের সিদ্ধান্ত সকল কি ভাবে পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তাহার আলোচনা আছে। হার্ভার্ডের এবং কলম্বিয়ায় দুইখানি পত্রে জার্ম্মাণীর শিক্ষাতত্ত্বের পুনরালোচনা হইয়াছিল। যুদ্ধের পূর্ব্বে এই 'সাহিত্য' পত্রেই আমি জার্ম্মাণীর শিক্ষা-পদ্ধতির আলোচনা করিয়াছিলাম। যাহা তখন 'থিয়োরী' বা মতবাদে পরিণত ছিল, তাহা এখন সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রাহ্য হইয়াছে। হার্ভাডের লেখক সেই সিদ্ধান্ত যে সর্ব্বজনসম্মত, তাহাই খ্যাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আজ তাই জাতিতত্ত্বের ও সমাজতত্ত্বের ইয়ুরোপমান্য সিদ্ধান্তের কথাই আবার বলিব।

ত্রিৎস্কে বলিয়াছিলেন যে, আত্মপ্রসার জীবের প্রধান ধর্ম্ম। বংশবৃদ্ধির সাহায্যে, শক্তি-প্রয়োগের সাহায্যে, সকল জীবই স্বজাতীয় প্রভাব বাড়াইয়া থাকে। নীজস্ বলেন যে, আমি বাঁচিব, আমি থাকিব, আমার যাহা, তাহাই প্রবল হইয়া থাকিবে, ইহাই মানবজীবের সাধারণ ধর্ম্ম। মনুষ্য এই ধর্ম্ম-প্রকাশের জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। সেই সকল উপায়;—(১) সংহতিসাধন, (২) প্রজনন, (৩) বাহুবলের প্রকটন, (৪) এবং মনীষার বিস্তার। পৃথিবীর ইতিহাসের আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, জগতের সর্ব্ব যুগের সর্ব্বকালের প্রবীণ ও নবীন মনুষ্য জাতি এই কয়টা উদ্দেশ্যের সাহায্যে অভ্যুদয়ের আকাঙ্ক্ষা করিয়াছে, কদাচিৎ বা অভ্যুদয় লাভ করিয়াছে। যখন যে জাতি বড় হইয়াছে, তখন সেই জাতি নিজের বিশিষ্টতার প্রভাবে জগৎকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। এই উদ্দেশ্য যদি জাতিগত উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে, এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির পক্ষে যে শিক্ষা পথ প্রশস্ত করিয়া দেয়, সেই শিক্ষাই শ্রেষ্ঠ শিক্ষা। হার্ভাডের লেখক বলিতেছেন, ইয়ুরোপে এই ভীষণ যুদ্ধ বাধিবার পূর্ব্বে এই মত থিয়োরী হিসাবেই গ্রাহ্য হইত। এই থিয়োরী কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য জার্ম্মাণীতে যে সকল চেষ্টা হইতেছিল, তাহা তখন ইয়ুরোপ দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল। এই যুদ্ধে দুই বৎসরের মধ্যেই সে শিক্ষার সার্থকতা সম্বন্ধে আর কাহারও সন্দেহ নাই। তাই থিয়োরী এখন সিদ্ধান্ত-রূপে গ্রাহ্য হইয়াছে। সেই সকল নীজ্সের ভাষায় ব্যক্ত করিব—(১) Help thyself; then every one else helps thee; অর্থাৎ, যখন সমাজের ছোট ছোট কাঠীগুলি বাঁধিয়া আঁটী তৈয়ার হয়, তখন প্রত্যেক কাঠীটি শক্ত না হইলে, নির্দ্দোষ না হইলে ভাল আঁটী তৈয়ার হয় না। মনুষ্যসমাজের মজা এই, সংহতির বৈশিষ্ট্যই এই যে, যাহাদের সমবায়ে সংহতির সৃষ্টি, তাহাদের প্রত্যেকেই প্রত্যেকের উপর নির্ভর করে। অতএব, প্রত্যেকেই মজবুৎ হইলে, defined and definite units হইলে, নির্দ্দিষ্ট এবং নির্দ্দেশযোগ্য ব্যষ্টি হইলে, তবে ত সমষ্টির বাহার ফুটে.

হইতে পারে, সেই শিক্ষাই সকল ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্য জাতিরই গ্রাহ্য ও মান্য। (২) What is good? All that increases the feeling of power—the will to power—power itself—in man! সৎ কি? সৎ শক্তিরই নামান্তরমাত্র। মনুষ্যসমাজে যে ব্যক্তির শিক্ষার সাহায্যে শক্তির অনুভূতি না হয়, শক্তির প্রয়োগের সামর্থ্য সঞ্চিত না হয়, সে ব্যক্তিকে সমাজে স্থান দিতে নাই। প্রত্যেক মনুষ্য-দেহই শক্তি-বিকাশের একটা ক্ষেত্র; সেই শক্তি ক্ষেত্রানুযায়ী পূর্ণাঙ্গে বিকশিত হইলে মনুষ্যদেহধারণ সার্থক হয়। সে শক্তির বিকাশ সমাজের বৈশিষ্ট্য অনুসারেই হইয়া থাকে। বাঙ্গালী ইংরেজ হয় না, ইংরেজ বাঙ্গালী হয় না। যদি বাঙ্গালী ইংরেজ হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, সে বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্ব নষ্ট হইয়াছে। বাঙ্গালীর পক্ষে সৎ তাহাই, যাহা বাঙ্গালার অতীত ইতিহাসে পরম্পরার সহিত সংবদ্ধ থাকিয়া বাঙ্গালার মনুষ্যবিশেষে পূর্ণায়তনে প্রকট হয়। তেমনই, জার্ম্মাণীর সৎ তাহাই, যাহা জার্ম্মান মানবতার পুষ্টিকল্পে শক্তিরূপে প্রকাশিত হয়। সেই শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা, যে শিক্ষা দ্বারা এই শক্তির উন্মেষ সম্ভবপর হইতে পারে। (৩) Let us have, not contentedness, but more power—not peace at any price but more power—not virtue but efficiency. অর্থাৎ, তুষ্টি আমরা চাহি না; চাহি কেবল শক্তি, সে শক্তি আমাতে দিনে দিনে উপচিত হউক, সে শক্তি আমাকে দিনে দিনে মহাপুরুষ বা অতিমানবে পরিণত করুক; আমি তুষ্টি চাহি না। চাহি কেবল তোমাকে—শক্তিময়ীকে। আমি শান্তি চাহি না, চাহি অনবরত যুদ্ধ; চাহি অহর্নিশ সাধনা—যে সাধনার প্রভাবে আমি সর্ব্বজয়ী হইতে পারিব। আমি সাধুতা চাহি না; চাহি যোগ্যতা—কারণ, যোগ্যতা-লাভ হইলে সাধুতাও আমার করামলকবৎ হইয়া থাকিবে। যে শিক্ষার দ্বারায় মনুষ্যদেহে শক্তির এতটা উপচয় ঘটে, সেই শিক্ষাই জাতির প্রকৃত শিক্ষা।

(৪) The weak must perish! That is the first principle of our charity. And we must help them to do so. যাহাতে শক্তি নাই, যাহাতে শক্তির অত্যন্তাভাব, তাহাই দুর্ব্বল; সুতরাং দুর্ব্বল যে, শক্তিহীন যে, তাহাকে মরিতেই হইবে। শক্তিহীন শক্তিপ্রবাহের সম্মুখে থাকিলে শক্তিবিকাশের বাধাই ঘটাইয়া থাকে। বীর সাধক দুর্ব্বলকে মারিয়া তাহার স্থবির দেহের উপর বসিয়া শবসাধনা করিয়া থাকেন। অতএব, দুর্ব্বলের নাশই অনুকম্পার পরাকাষ্ঠা। দুর্ব্বলকে সরাইতে না পারিলে সমবায়ে জাতি প্রবল হইতে পারে না। জাতিকে প্রবল বা শক্তিধর করাই সকল শিক্ষার উদ্দেশ্য। অতএব দুর্ব্বলের নাশই শিক্ষা-সাধনার প্রধান ও প্রথম অঙ্গ।

(৫) Small units of power are sacrificed to create large units. ক্ষুদ্র শক্তিধর ব্যষ্টির সাহায্যে বিরাট শক্তির কেন্দ্র সৃষ্ট হয়। ইহাই সমাজের নিয়ম। ক্ষুদ্র ব্যষ্টিকে সমষ্টির কাজ করিতে যে শিক্ষা পারে, তাহাই প্রকৃষ্ট শিক্ষা। অর্থাৎ, আমি যে সমাজে আছি, যে সমাজের পরিচয়ে আমার পরিচয়, সে সমাজের পুষ্টিকল্পে আমি যদি আমার শক্তি প্রয়োগ করিতে না পারি, তাহা হইলে আমার শক্তিধারণই ব্যর্থ হইবে। আমি শক্তিধর হই কেন? যে হেতু আমার শক্তির সাহায্যে আমি আমার জাতিকে শক্তিমান করিতে পারি। তাই নীজ্‌স্ এখানে বড় একটি মিষ্ট কথা বলিয়াছেন,—সেই মরণই মানুষের মরণ, যে মরণ voluntary, conscious, not acci-

dental or by surprise, অর্থাৎ, যাহা ইচ্ছামৃত্যু, তাহাই প্রকৃত মৃত্যু। দেহটা যখন থাকে না, কিছুকাল পরে নষ্ট হয়ই, তখন দেহত্যাগটা সমাজের কল্যাণের জন্য করিলেই সে দেহত্যাগ মানুষের মত দেহত্যাগ করা হয়। কারণ, দেহত্যাগের পদ্ধতি দেখিলেই বুঝা যায়, যে মানুষটা বাঁচিতে জানিত, বাঁচার মত বাঁচিয়া থাকিতে পারিত, সে মানুষটা মরিতেও জানে। তাই অহঙ্কার করিয়া, স্পর্দ্ধা করিয়া, নীজস্ বলিয়াছেন—I sing unto you my death, my free death, which cometh because I will it. আমি তোমাদের আমার মরণের গান শুনাইতেছি, আমার স্বাধীনভাবে মরণের গাথা শুনাইতেছি, কেন না, সে মরণ যে আমার স্বেচ্ছামৃত্যু। স্বেচ্ছামৃত্যুটা কি জান? He who hath a goal and an heir wisheth death to come at the right time for goal and heir. অর্থাৎ, যাহার জীবনে একটা উদ্দেশ্য আছে, যাহার কার্য্য যোগ্যতার উত্তরাধিকারসূত্রে যোগ্য ব্যক্তিতে ন্যস্ত হইতে পারে, সেই সময় বুঝিয়া উপযোগিতার বিচার করিয়া সময়মত মরিতে জানে; এই মরণের পদ্ধতিটা যে বিদ্যা শিখাইতে পারে, যে বিদ্যার সাহায্যে আমরা ঠিকমত এবং ঠিক সময়ে মরিতে পারি, সেই বিদ্যাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা। আমাদের সে কালের বাঙ্গালীর মুখেও এই ভাবের একটা কথা প্রচারিত ছিল; তাহা এই—'জপ তপে করে কি, মরতে জানলে হয়'। যেমন বাঁচিতে জানিতে হয়, তেমনই মরিতেও জানিতে হয়। সুশিক্ষা যেমন বাঁচিতে শিখায়, তেমনই মরিতেও শিখায়। আমাদের পুরাণে এক ভীষ্মদেবই ইচ্ছামৃত্যুসম্পন্ন শক্তিধর পুরুষ। নীজস্ সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু আদর্শ দেখাইতে পারেন নাই। মরণের আদর্শ এত দিন ইয়ুরোপে ছিল না; এইবার এই যুদ্ধের চাপে সে আদর্শ ফুটিবে কি না, জানি না।

শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য Super-man বা মহাপুরুষের সৃষ্টি। মানুষ সভ্যতার স্তরে স্তরে উঠিয়া ক্রমে অতিমানুষে পরিণত হয়। তাই নীজস্ বলিয়াছেন—Man is a rope connecting animal and Super-man—a rope over a precipice; the greatness of man lies in this: that he is a bridge and not a goal. The thing that can be loved in man is this: that he is a transition and an exit. বানর হইতে মানুষ, মানুষ হইতে অতি-মানুষ; অতি-মানুষ ও বানরের মধ্যে মানুষ একটা দড়া বা শৃঙ্খলের মত। আমরা যে মনুষ্যজীবন অতিবাহন করিতেছি, তাহা ত কেবল মর্কটের জীবন। যাহা জীবসামান্য ধর্ম্ম, তাহারই তুষ্টি-পুষ্টির জন্য আমরা সদা ব্যস্ত; কাজেই মনুষ্যত্ব, পশুত্ব এবং দেবত্বের মধ্যে শৃঙ্খলামাত্র—একটা সেতু। যে মানুষ অতিমানুষ-প্রসবের জন্য হেলায় দেহ বিসর্জ্জন দিতে পারে, সে মানুষের জীবনও সার্থক, মরণও সার্থক। অতএব Let the hope be in your heart; "Would that I might give birth to the super-man"—এই আশাই প্রত্যেক মানুষের মধ্যে থাকা উচিত। শিক্ষার প্রভাবে এই সাধনাই মানুষের জীবনের অবলম্বন হওয়া উচিত যে, সবাই যেন বসুদেব হইতে পারে। কারণ, তাহা হইলে প্রত্যেক দেহবদ্ধ আত্মা হইতে এক একটি বাসুদেবের সৃষ্টি হইবে। বাসুদেব বা অতি-মানুষ বা মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিলে, জাতি, দেশ, সবই সার্থক হয়, সবই ধন্য হয়। অতএব সকল শিক্ষার পর্য্যবসান বাসুদেব-সৃষ্টিতেই হওয়া কর্ত্তব্য। ইহাই আধুনিক জার্ম্মাণীর শিক্ষাতত্ত্ব ও জাতিতত্ত্বের সার সিদ্ধান্ত। নীজস্ স্পষ্টই

বলিয়াছেন—Man should be educated for war and woman for re-creation of the warrior. Everything else is folly; অর্থাৎ, মানুষ কেবল সাধনা করিতেই শিক্ষিত হইবে, বাধা বিঘ্ন উত্তীর্ণ হইবার জন্য যুদ্ধ করিতে শিক্ষা করিবে, এবং নারী যোদ্ধা প্রসব করিতেই শিখিবে। নীজসের নরনারীর এই সম্বন্ধতত্ত্ব আজ জার্ম্মাণীর সর্ব্বজনমান্য। নীজসের এই সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া জার্ম্মানদেশে আজ দশ বৎসর কাল শিক্ষা-পদ্ধতি পরিচালিত হইতেছে। নীজস্ আরও অনেক কথা জার্ম্মাণ জাতিকে শিখাইয়াছেন। তাঁহার ব্যাখ্যা ও বিবৃতি বড় বড় কয়েকখানা Volumeএ সঙ্কলিত হইয়াছে।

জার্ম্মাণ মনীষিগণ ত্রিৎস্কে ও নীজ্সের শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হইয়া প্রথমে নির্দ্ধারণ করেন যে, জার্ম্মাণ জাতির বিশিষ্টতা কিসে ও কেমন? সেই বিশিষ্টতা নির্দ্দিষ্ট হইলে, তাহাকেই শিক্ষার সাধ্য বলিয়া তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন। পরে জার্ম্মাণীর বালকবালিকাগণকে সেই শিক্ষা দিয়া তাহাদিগকে মানুষ করিয়া তুলিয়াছেন। ধর্ম্মে জার্ম্মাণজাতি এখন আর খৃষ্টান নহে, জার্ম্মান এখন শক্তিসাধক। সে শক্তিসাধনা পক্ষে যাহা যাহা সহায়, তাহাই জার্ম্মাণদিগের শিক্ষণীয় বলিয়া গ্রাহ্য হইয়াছে। সে কালে আমাদের মেয়েদের যেমন ধূলা-খেলার মধ্য দিয়া ঘর-গৃহস্থলীর কার্য্য শিখান হইত, জননী হওয়া নারীজন্মের সার বলিয়া বুঝান হইত, এ কালে জার্ম্মাণীতেও নারীদিগকে সেই ভাবে শিখান হইতেছে। যে যুবতী পুত্রবতী নহে, সমাজে তাহার তেমন আদর নাই। তাই ইয়ুরোপের অন্য দেশ অপেক্ষা জার্ম্মাণীতে নরনারীর অল্প বয়সে বিবাহ হয়, এবং অল্প বয়সেই জার্ম্মাণ যুবক পুত্র কন্যার পিতা হইয়া থাকে। জার্ম্মাণীতে Erotics, অর্থাৎ প্রজননতত্ত্ব বিজ্ঞানের হিসাবে সকলকেই শিখান হয়। অধ্যাপক Schenk (সেঙ্কের) সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া নরনারীর সম্মেলন ঘটান হইয়া থাকে। আমাদের যেমন স্মৃতিশাস্ত্রে জারজ পুত্রের উল্লেখ নাই, পুত্রের পিতার নির্দ্দেশ থাকিলে, সে জনক স্বজাতীয় এবং স্বসমাজভুক্ত হইলে যেমন কানীন, সহোঢ়জ, কামপুত্র প্রভৃতি নানাবিধ পুত্রের শ্রেণীবিভাগ করা হয়, জার্ম্মাণজাতিও সেই হিসাবে Bastardismটা উঠাইয়া দিয়া নানাবিধ পুত্রের শ্রেণীবিভাগ করিয়া দিয়াছেন। ইহার ফলে জার্ম্মাণীতে লোকসংখ্যা অত্যধিক হইয়াছে, সাজাত্য প্রবল হইয়াছে। সংসার-ধর্ম্মে, ঘরগৃহস্থলীর ব্যাপারে জার্ম্মাণজাতি প্রেম বা loveকে একেবারে বাদ দিয়া রাখিয়াছে। সেটাকে Morbid sentimentality বা ক্লিন্নভাবুকতা বলিয়া পরিহার করিয়াছে। এই শিক্ষার ফলে জীবতত্ত্বের বিশ্লেষণ অনুসারে সাজাত্যের পুষ্টিপ্রভাবে আজ জার্ম্মাণী দুই বৎসর কাল একক ইয়ুরোপের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছে। এই অপূর্ব্ব ঘটনা দেখিয়া ইহার ভিতরকার তত্ত্ব বুঝিবার জন্য ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকার বড় বড় লেখকগণ নানা বিষয়ের অবতারণা করিতেছেন, এবং অনেক নূতন সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা করিতেছেন। সে সকল সিদ্ধান্ত পড়িলে আমাদের পুরাণ ও তন্ত্রের সিদ্ধান্তের সহিত নিকট সাদৃশ্য দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়।

আমাদের শাস্ত্রে আছে—'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্রঃ পিণ্ডপ্রয়োজনম্'—পুত্রের জন্যই ভার্য্যা গ্রহণ করিতে হয়; কেন না, পুত্রের সাহায্যে পিণ্ডের প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। অধ্যাপক জিমারম্যান এই শ্লোকটি তুলিয়া এক বিশাল সন্দর্ভ লিখিয়াছেন। তিনি বলেন, এই কথাই সামাজিকগণের পক্ষে নিত্য সত্য ও সর্ব্বদেশমান্য। তিনি বলেন, বংশধর না থাকিলে যেমন বংশনাশ হয়,

তেমনই সঙ্গে সঙ্গে জাতিরও নাশ হইয়া থাকে। কুলতিলক পুত্র হইলে জাতির ধারা ও বংশের ধারা বজায় থাকে; এই ধারাকেই পৌরাণিকগণ পিণ্ড বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এইখানে অধ্যাপক জিমারম্যান গর্ভধারণের পদ্ধতিটুকু তুলিয়া পুত্রের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন; শেষে পুন্নামনরকের এক অদ্ভুত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলেন, জাতি নির্ব্বংশ হইবার উপক্রম হইলে, জাতির বিশিষ্টতার সঙ্কোচ-সম্ভাবনা হইলে, সমাজে যে ত্রাসের উৎপত্তি হয়, সেই ত্রাসই নরক। ত্রাস জন্য বিভীষিকা হইতেই যে নরকের উৎপত্তি, তাহা ইয়ুরোপের ভাবুকগণ বহুকাল হইতেই স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন। তাহার সহিত এই পুন্নামনরকের অর্থসঙ্গতি ঘটাইয়া অধ্যাপক জিমারম্যান একটা বড় হাসির কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন, ফরাসীদিগের মধ্যে যাহারা পুত্র আকাঙ্ক্ষা করে না, যে নারী পুত্রবতী হইতে পারে না, তাহারা নারকী; এই যুদ্ধের মধ্যেই তাহাদিগের সত্য সত্যই নরকদর্শন হইবে। যখন সৃষ্টিধর বংশধরের অভাবে জাতির বিশিষ্টতা রক্ষা করিবার সামর্থ্যহীনতা দেখিয়া ফরাসী দশ দিক্ অন্ধকারময় দেখিবে, তখনই ফরাসী বাবু-সমাজের নরকদর্শন হইবে।

দ্বিতীয় কথা; Bastardism বা জারজতা। হিন্দু, বৌদ্ধ এবং মুসলমানদের মধ্যে এ জিনিসটি নাই। বিজাতীয় পুরুষসংস্পর্শে যে পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহাই জারজ বা 'হারামজাদ'; সাজাত্য-সংস্পর্শজন্য পুত্র জারজ নহে; তেমন নারী অসতীও নহে। এ পক্ষে উদাহরণস্বরূপ ব্যাস কর্ত্তৃক কৌরববংশ-রক্ষার গল্প তুলিয়া অধ্যাপক জিমারম্যান নিজের সিদ্ধান্ত প্রবল করিয়াছেন। জনকের নির্দ্দেশ থাকিলেই, পুত্রের জনক বলিয়া স্বীকার করিবার স্বজাতীয় পুরুষ থাকিলেই, সে পুত্র জার্ম্মাণ। জার্ম্মাণ জনক ও জার্ম্মাণ জননী হইলেই হইল—যে অবস্থায় পুত্র উৎপন্ন হউক না কেন, তাহার প্রতি দৃষ্টি দিবার প্রয়োজন নাই। সাজাত্যের এই তত্ত্ব পুরাণের অনেক গল্প তুলিয়াই জিমারম্যান পুষ্ট করিয়াছেন। তন্ত্রের অভিজাততত্ত্ব, শৈববিবাহপদ্ধতি এবং জাতিবিচারের কথা তুলিয়া অধ্যাপক মহাশয় খৃষ্টান ধর্ম্ম ও সমাজবিন্যাসের প্রতিবাদস্বরূপ স্বমতের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই দুইটি তত্ত্ব আধুনিক জার্ম্মাণীর সমাজশিক্ষার মূলে আছে। মার্কিনের অধ্যাপক জ্যাকস্ ইহার যৌক্তিকতা স্বীকার করিয়াছেন, তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন, এই সিদ্ধান্ত দুইটি অবলম্বন করাতেই আজ জার্ম্মাণী এত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। তাহার উপর জার্ম্মাণ জাতির এক-নিষ্ঠ সাধনা—সবাই জানে যে, আমি জার্ম্মাণীর এক জন, এ দেহের দ্বারা জার্ম্মাণ জাতির বিশিষ্টতার রক্ষাপুষ্টি করিতে পারিলে আমার জীবনধারণ সার্থক হইবে।—এই যে সমাজকেন্দ্রীকৃত সাধনা—এই যে জীবন ও মরণের সার্থকতাসম্পাদনের চেষ্টা, ইহাই জার্ম্মাণীর প্রাবল্যের মূল হেতু। দুইবৎসরব্যাপী অগ্নিপরীক্ষার পর আজ জার্ম্মাণী জগৎপূজ্য হইয়াছে। যদি প্রবল হইতে চাও, যদি আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়া সংসারে বিচরণ করিতে চাও, যদি জাতির বিশিষ্টতা ও প্রাধান্য দ্বারা জগৎকে আচ্ছন্ন করিতে চাও, তবে আমার শিক্ষা-পদ্ধতি অবলম্বন কর—আমার সাধনার পথে বিচরণ কর। ফ্রান্সের পক্ষ হইতে লাবোরী এ কথা স্বীকার করিয়াছেন। প্রত্যেক ফরাসী বুঝিতেছে যে, আজ যদি জার্ম্মাণ জাতির মতন একনিষ্ঠ সাধক হইয়া, সৃষ্টিধর বংশধরগণে পরিবৃত থাকিয়া, এই মহারণপ্রাঙ্গণে নামিতে পারিতাম, তাহা হইলে এই যুদ্ধবিগ্রহে অনায়াসে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়া জয়ী হইতে পারিতাম। ফ্রান্সে বুদ্ধির অভাব নাই, তেজোবীর্য্যের অভাব

নাই—অভাব কেবল মানুষের। ইংলণ্ড পাকেপ্রকারে Compulsion Act চালাইয়া জার্ম্মাণীর শিক্ষা-পদ্ধতি অবলম্বন করিতেছেন—আমার জীবন জাতির জন্য, আমার মরণ জাতির কল্যাণ-হেতু; ইহাই Compulsion আইনের মূল নীতি। এ নীতি যত দিন ইংলণ্ডে সর্ব্ববাদিসম্মত ছিল না, ততদিন ইংরাজমাত্রই যুদ্ধবিদ্যা শিখিত না। জার্ম্মাণীর সহিত দেড় বৎসর কাল যুদ্ধ করিয়া ইংরাজ মর্ম্মে মর্ম্মে এ তত্ত্বের সারবত্তা অনুভব করিয়াছে; তাই Compulsion Act চালাইতে বাধ্য হইয়াছে। ডাক্তার ডিলন তাঁহার নানা সন্দর্ভে স্পষ্ট বলিয়াছেন, যখন জার্ম্মাণীর পন্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছ, তখন পুরাদস্তুর উহা অবলম্বন কর। Lord Kitchener জার্ম্মাণ-পদ্ধতিকে ইংলণ্ডের মোড়কে মুড়িয়া স্বদেশে চালাইয়া গিয়াছেন, ইহাই লর্ড কিচনারের কৃতিত্ব। ভাইকাউণ্ট হলডেন, সেনাপতি সিলি পূর্ণমাত্রায় এই পদ্ধতি অবলম্বন করিতে বলেন; তবে তাঁহারা ইংরাজ জাতির রোচক করিয়া এই কথাটা বলিতে পারেন নাই বলিয়াই তাঁহাদের কথায় ইংরাজ সাধারণ তেমন কর্ণপাত করিতেছে না। কিন্তু এই যুদ্ধে আত্মরক্ষা করিবার চেষ্টায় ইংরেজ জাতি বেমালুম জার্ম্মাণীর শিক্ষা-পদ্ধতি ও জাতিতত্ত্ব হজম করিয়া লইয়াছে। জাতির ৫০ লক্ষ যুবক যুদ্ধবিশারদ হইলে, সে জাতির যে আমূল পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী, ইহা অধ্যাপক জ্যাকস স্পষ্টই বলিয়াছেন। সে পরিবর্ত্তন যে জার্ম্মাণীর ছাঁচে হইতেছে, ডাক্তার ডিলন এ কথাটা খুলিয়া লিখিয়াছেন।

মার্চ্চ ও এপ্রেলের ইয়ুরোপের সাহিত্য এই সকল আলোচনাতেই পূর্ণ। সবাই এখন জাতির মেদমজ্জার অন্বেষণে বিব্রত; সবাই এখন মনুষ্য জাতির সনাতন সামাজিক নিয়ম সকল খুঁজিয়া বাহির করিতে ব্যস্ত। সনাতনের দিকে দৃষ্টি দিতে এই যুদ্ধ ইয়ুরোপকে শিখাইতেছে। এই যুদ্ধের ফলে ইয়ুরোপ বুঝিয়াছে যে, স্থিতি সকল জাতির সাধ্য, গতি ও উন্নতি সাধনার পর্য্যায়, বা ক্রম-মাত্র, সাধ্য নহে; যে জাতি রহিতে ও সহিতে পারে, সেই জাতিই দীর্ঘজীবী হয়—বুঝি বা অমর হইয়াও থাকে। এই স্থিতিতত্ত্ব বা Conservation জার্ম্মাণী যে ভাবে বুঝিয়াছে, ফ্রান্স সেই ভাবে বুঝিবার চেষ্টা করিতেছে, কতকটা বুঝিয়াছেও। ফ্রান্স হইতে এই তত্ত্ব ইংলণ্ডে আমদানী হইয়াছে। ইংলণ্ডে উহার কিরূপ বিকাশ হয়, তাহা এখনও বলা যায় না; আরও কিছুকাল না যাইলে বলিতে পারা যাইবে না। এই সকল নূতন কথায় মত্ত হইয়া ইংরেজ ও ফরাসী অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের কতকটা বর্জ্জন করিতে উদ্যত হইয়াছে।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

সবুজ পত্র।—বৈশাখ।—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী কর্তৃক সম্পাদিত। তৃতীয় বর্ষের নবম সংখ্যা হইতে আমরা 'সবুজ পত্র' প্রাপ্ত হইতেছি। তেত্রিশ মাস পরে সম্পাদক আমাদের স্মরণ করিয়াছেন। সেই পুরাতন টপ্পাটি মনে পড়িতেছে,—'মনে কি পড়েছে আজি—?' এ জন্য আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে প্রমথ বাবুকে ধন্যবাদ দিতেছি।—'সবুজ পত্র' রবীন্দ্রনাথের খাসমহল; তাই ইহাতে রবীন্দ্রনাথের খাস খোস-খেয়ালের এত ছড়াছড়ি। রবীন্দ্রনাথ আজকাল প্রহেলিকায় সিদ্ধ হইয়াছেন। যা লেখেন, তাই প্রায় হেঁয়ালি হইয়া যায়। সর্ব্বত্রই এইরূপ, কিন্তু খাসমহলের হেঁয়ালি সকলের সেরা। বৈশাখে রবীন্দ্রনাথের 'নববর্ষের আশীর্ব্বাদ' পড়িয়া মনে হয়, যেন বর্দ্ধমানের গোলাপবাগের গোলোকধাঁধায় ঢুকিয়াছি!

'দূর হ'তে দূরে
বাজে পথ শীর্ণ তীব্র দীর্ঘতান সুরে,
যেন পথহারা
কোন্ বৈরাগীর একতারা!'

পথ বাজিতেছে! ঢাক বাজে, ঢোল বাজে; বাঁয়া বাজে, তবলা বাজে; কাড়া বাজে, নাকাড়া বাজে; মাদোল বাজে, দামামা বাজে; পথ বাজিবে না কেন? সানাই বাজে, বাঁশী বাজে; তুরী বাজে, ভেরী বাজে; সাপুড়ের তুবড়ী বাজে; রবীন্দ্রনাথের 'পথ' বাজিবে না কেন? বেহালা বাজে, ভাস্ বাজে; সেতার বাজে, সুরবাহার বাজে,—আজকাল হারমোনিয়ম বাজে, পিয়ানো বাজে; বাউল রবীন্দ্রের পথ,—জলপথ ও স্থলপথ ও ব্যোমপথ বাজিবে না কেন? দুঃখের বিষয় এই যে, রবীন্দ্র নাথের পথও বেতালা বাজিয়াছে! কবি সুর বলিয়া দিয়াছেন,—তাহার নাম 'দীর্ঘতান!' কিন্তু তালটি খ্যামটা, না কাওয়ালী, না ঠুংরী, অথবা দশকুশী, তাহা প্রকাশ নাই। এই দীর্ঘতান সুরের বাজনা দীর্ঘকাল শ্রোতাদের কর্ণে মধু ঢালিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই!—পথ ত বাজিতে লাগিল, সুতরাং 'কোন্ বৈরাগীর একতারা পথ হারাইল'! অনেক উৎকট সমস্যা শোনা গিয়াছে, কিন্তু এমন উদ্ভট কল্পনা রবীন্দ্রনাথের অথর্ব্ববেদেও ইতিপূর্ব্বে দেখি নাই।—'চলার অঞ্চলে তোর ঘূর্ণাপাকে বুক্ষেতে আবরি' যে বুঝিতে না পারিবে, তাহার কণ্ঠী কি অটুট থাকিবে?—'নহে প্রেয়সীর অশ্রু-চোখ!' অর্থাৎ, কখনও নৌকার উপর গাড়ী, কখনও গাড়ীর উপর নৌকা! এত দিন চোখে অশ্রু ঝরিত, এখন অশ্রুর চোখ ফুটিল! রবীন্দ্রনাথ যে ছেলেবেলায় লিখিয়াছিলেন,—'জানই আমার সকল কাজে originality', তাহা সত্য। আশ্চর্য্য এই যে, প্রমথনাথের মত শ্যেনদৃষ্টি সমালোচকও এই 'আশীর্ব্বাদ' শিরোধার্য্য করিয়াছেন! রবীন্দ্রনাথের ভাবের দৈন্য, ভাষার দৈন্য, রচনায় কষ্টকল্পনার প্রাচুর্য্য দেখিয়া দুঃখ হয়। মনে হয়, এ যেন তাঁহার পথ নয়। 'সবুজ পত্রে' দুইখানি পত্র আছে। একখানি রবীন্দ্রনাথের, একখানি বীরবলের। কেন সবুজ পত্র ঝরিবে না, কেন হলুদে হইয়া ধরণীকে চুম্বন করিবে না, তাহারই কৈফিয়ৎ। অবশ্য, তাহার সঙ্গে 'আমাদের যুবকেরা পর্য্যন্ত স্থবির হয়ে উঠেছে' বলিয়া আক্ষেপ আছে। তারা যদি শাস্ত্রের নৈবেদ্য ছাড়িয়া সবুজ পত্র চিবাইয়া স্থবিরতা বর্জ্জন করিতে পারে, করুক। কিন্তু, ঘরে বসিয়া আপনারা যাহাদের স্থবিরতার স্বপ্ন দেখিতেছেন, তাহারা কি সত্যই স্থবির? মেসোপোটেমিয়ায় ফ্রান্সে যাহারা জীবন

লইয়া খেলিতে যাইতেছে, তাহারা কি জড়তার ক্রীতদাস? ষ্টেশনে দুইখানি ট্রেণ পাশাপাশি দাঁড়াইয়া আছে। একখানি চলিল। নিশ্চল স্থবির ট্রেণের যাত্রী ভাবে, আমরা চলিতেছি, চলন্ত ট্রেণই দাঁড়াইয়া আছে! রবীন্দ্রনাথেরও সেই অবস্থা। তিনি 'স্বদেশী' হাটে গলদ্ঘর্ম্ম ও জব্দ হইয়া, ঘরে ফিরিয়া, ভালমানুষ হইয়া বসিয়া আছেন। যাহারা চলিতেছে, তাহাদের গতি আপনাতে আরোপ করিয়া ভাবিতেছেন, তাঁহাদের অচল আয়তনই চলিতেছে, আর সচল আয়তন দাঁড়াইয়া আছে!—'বীরবলে'র পত্রে চিরপরিচিত রেলোয়ারী বুক্‌নীর অভাব। দর্শনের কসরৎ, শিরো-বেষ্টনপূর্ব্বক নাসিকাস্পর্শ, সাবানের ফেনা তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। 'সুতরাং সবুজপত্র যে জীবনের মেয়াদ বাড়িয়ে নিতে স্থিরসঙ্কল্প [সংস্কৃত নহিলে কুলায় না!] তার জন্য কোনও প্রাণীর নিকট আপনার কোনরূপ জবাবদিহি নেই।' ইহা আমরাও স্বীকার করি। এই জন্য 'সুতরাং'-এর পূর্ব্ববর্ত্তী ও 'নেই-র পরবর্ত্তী সমস্ত অংশ নিতান্ত বাজে হইয়া পড়িতেছে। বীরবল এতটা পণ্ডশ্রম না করিলে কোনও ক্ষতি ছিল না। যখন 'প্রাণীর নিকট কোনরূপ জবাবদিহি নেই', তখন কোন অ-প্রাণীর জন্য এমন প্যাঁচালো ভাষার জিলিপী ভাজিলেন?—শ্রীপ্রমথ চৌধুরীর 'চার-ইয়ারী কথা' সবুজ পাতার মধ্যে ফুলের মত ফুটিয়া আছে। এমন উজ্জ্বল কথোপকথন, এমন ভাবের লোফালুফি, রচনার এমন বৈচিত্র্য বাঙ্গালা সাহিত্যে দুর্লভ। লেখক একটু মাজিয়া ঘষিয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিলে বাঙ্গালা সাহিত্য সমৃদ্ধি লাভ করিবে। রবীন্দ্রনাথের 'জাপান-যাত্রীর পত্র' দর্শনের—তত্ত্বের—প্রহেলিকার 'দুই-চোলাই-করা কড়া আরক'। সাধ হয়, পান কর। এ রবীন্দ্রনাথ কুক্কুটমিশ্র শর্ম্মা। 'বেদান্তশাস্ত্রাণি দিনত্রয়ঞ্চ'—'আত্রায় চ তর্ক-বাদান্' বোধ হয় বলা চলে না—সামান্য ঘটনা হইতে বিরাট দর্শন-কূটের সৃষ্টি করিতেছেন। আমাদের যৌবনকালের রবীন্দ্রনাথ ইউরোপ-যাত্রীর ডায়েরীতে কবিত্বের সুষমা ঢালিয়া দিতেন। এ দর্শন দেখিয়া আমাদের ভয় করে, মনে হয়, 'তে হি নো দিবসা গতাঃ।' জগতে ফুল শুকায়, ফল পচে, তেমনই কবিত্বও ঝুনো 'তত্ত্ব' হইয়া উঠে। আহা! যদি পারিজাতের মত চিরকাল টাট্‌কা থাকিত!

উদ্বোধন। এই বৈশাখে 'উদ্বোধন' অষ্টাদশ বর্ষে পদার্পণ করিল। যিনি উদ্বোধনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, আজ তাঁহাকে মনে পড়িতেছে। তিনি সুদূর কর্ম্মক্ষেত্রে দেহ রাখিয়াছেন। সন্ন্যাসী বাঙ্গালা সাহিত্যের একটা দিক্ খুলিয়া দিয়া গিয়াছেন। তিনি 'উদ্বোধনে'র বীজ বপন না করিলে, প্রাণপণে তাহার চারাটিকে জীবন-যুদ্ধের উপযোগী করিয়া না দিলে, মহাপুরুষ বিবেকানন্দের বাণী ভারতের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত এত শীঘ্র ধ্বনিত—প্রতিধ্বনিত হইত না; এমন কি, বাঙ্গালী তাহার নবজীবনের নূতন বেদ লাভ করিত না; জীবনের স্বাদ পাইত না। স্বামী ত্রিগুণাতীত সাধনোচিত ধামে স্বীয় কর্ম্মের ফল প্রত্যক্ষ করিতেছেন। আশীর্ব্বাদ করুন, তাঁহার প্রারব্ধ যেন শুভাবহ হয়; বাঙ্গালী যেন এই প্রচেষ্টা সফল করিবার সৌভাগ্য লাভ করে।—'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গে' ঠাকুর ও নরেন্দ্রনাথের কাহিনী চলিতেছে। স্বর্গীয়া নিবেদিতার 'আচার্য্য বিবেকানন্দ' নানা তথ্যের আলোকে বিবেকানন্দ-জীবনের বিশ্লেষণ। নিবেদিতা অনেক তত্ত্বের উদ্ধার করিয়া গিয়াছেন। যেমন গুরু, তেমনই শিষ্যা! নিবেদিতা নহিলে বিবেকানন্দের অন্তঃপ্রকৃতি বাঙ্গালীর অজ্ঞাত থাকিত। অনুবাদক ভাষায়

আর একটু অবহিত হইলে ভাল হয়। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার কাব্যার্ণবের 'যোগের সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ' উল্লেখযোগ্য। শ্রীঅতুলকৃষ্ণ দাসের 'রামেশ্বর-দর্শন' সুখপাঠ্য।

অর্চ্চনা। বৈশাখ।—শ্রীঅমূল্যচরণ সেনের 'সাহিত্য-প্রসঙ্গ' উপাদেয়, উপভোগ্য। আশা করি, 'সাহিত্য-প্রসঙ্গে'র ধারা ক্ষুণ্ণ হইবে না। লেখক 'বাঙ্গালী' হইতে উদ্ধৃত করিয়া 'অর্চ্চনা'র পাঠককে গুপ্ত কবির ভিটার দুর্দ্দশার কাহিনী শুনাইয়াছেন। তাহা পুনরুদ্ধৃত করিলাম। ইহা বাঙ্গালীর শুনিবার কথা। শুনিয়া লজ্জায় অধোবদন হইবার কথা।—

'কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের পৈতৃক ভিটাটুকু এতকাল পরে কুম্ভকারের হস্তগত হইল। বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা গৌরবের বিষয় নহে।

'গুপ্ত কবি বাঙ্গালীর নিতান্ত আপনার জন। তিনি খাঁটী বাঙ্গালী কবি। তিনি গত যুগের-ভাবের স্বরূপ তাঁহার রচনার ফটোগ্রাফে ধরিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালায় গুপ্ত কবির সাধনার ক্ষেত্রে নব যুগে নূতন ভাবের আবির্ভাব হইয়াছে। তিনি নব্য বাঙ্গালার সাহিত্যগুরু অমর বঙ্কিমচন্দ্রের ও রসরাজ করুণাসিন্ধু দীনবন্ধুর গুরু; সুতরাং বাঙ্গালীর গুরুর গুরু।

'সে যুগে ঈশ্বর গুপ্ত বাঙ্গালীর দেশাত্মবোধকে কবিতায় যে অভিব্যক্তি দিয়াছিলেন, তাহারই ফলে বাঙ্গালার সুপ্রভাতে নব-জীবনের নূতন স্পন্দন সম্ভব হইয়াছে।

'তাঁহার—"মাতৃসম মাতৃভাষা" ও চিরস্মরণীয় অনুশাসন,—

"ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে　　দেখ দেশবাসিগণে
　　প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।
কতরূপ স্নেহ করি　　দেশের কুকুর ধরি'—
　　বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া॥"

কি ভুলিবার? বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীকে এই কয় ছত্র মুখস্থ করিতে বলিয়া গিয়াছেন। * *

'ঈশ্বর গুপ্তের "প্রভাকর" আজ অস্তমিত, কিন্তু সে সূর্য্যের দীপ্তি, তেজ বাঙ্গালীর সমাজে যে জীবনীশক্তি ঢালিয়া দিয়াছিল, জাতীয় জীবনে তাহার প্রভাব এখনও সুস্পষ্ট।

'ঈশ্বর গুপ্ত এক হিসাবে যুগান্তের কবি, অন্য হিসাবে যুগ-প্রবর্ত্তক। ঈশ্বর গুপ্ত বাঙ্গালীর জীবনের প্রত্যক্ষ বিষয়ে জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালী তাঁহার নিকট ঋণী। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন,—"মহাত্মা রামমোহন রায়ের কথা ছাড়িয়া দিলে, রামগোপাল ঘোষ ও হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে বাঙ্গালা দেশে দেশবাৎসল্যের প্রধান নেতা বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর গুপ্তের দেশবাৎসল্য তাঁহাদিগেরও কিঞ্চিৎ পূর্ব্বগামী। ঈশ্বর গুপ্তের দেশবাৎসল্য তাঁহাদের মত ফলপ্রদ না হইয়াও তাঁহাদের অপেক্ষাও তীব্র ও বিশুদ্ধ। * * * * তখনকার লোকের কথা দূরে থাক, এখনকার কয় জন লোক ইহা বুঝে? এখনকার কয় জন লোক এখানে ঈশ্বর গুপ্তের সমকক্ষ? ঈশ্বর গুপ্তের কথায় যা, কাজেও তাই ছিল। তিনি বিদেশের ঠাকুরদিগের প্রতি ফিরিয়াও চাহিতেন না, দেশের কুকুর লইয়াও আদর করিতেন।"

'তাঁহার ভিটাটুকু তাঁহার বংশধরগণের হস্তচ্যুত হইল, দুঃখের বিষয় নয়?—কিন্তু ঈশ্বর গুপ্ত কি কেবল গুপ্ত-পরিবারের কুলপাবন?

'আবার বলি, তিনি বাঙ্গালীর অন্তরঙ্গ—স্বজন। তাঁহার ভিটাটুকু বাঙ্গালী কিনিয়া ভবিষ্য-দ্বংশের তীর্থ করিয়া রাখুন।

'শুনিলাম, দুই তিন শত টাকায় খাঁটী বাঙ্গালী কবি ঈশ্বচরেন্দ্রর ভিটা বিক্রীত হইয়াছে। সাহিত্য-পরিষৎ ও সাহিত্য-সভা প্রভৃতি চেষ্টা করিলে ঈশ্বর গুপ্তের ভিটাটুকু কি উদ্ধার করা যায় না? গুপ্ত কবি "চাঁদিনী যামিনী"কে চিনিতেন না; "শুধু সৌরভ" লইয়া কারবার করিতেন না; ইংরেজীতে লিখিতেন না; শুধু এই অপরাধে তিনি কি সারস্বত বাঙ্গালার—সাহিত্য-পারিষদ-গণের পূজা পাইবেন না?'

শ্রীশরচ্চন্দ্র সিংহের কীর্ত্তন-কাহিনী উল্লেখযোগ্য, কিন্তু অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। তত, বিতত, ঘন ও শুষির কি, লেখক সাধারণ পাঠককে তাহা বুঝাইয়া দিলে ভাল হইত। বর্ত্তমান প্রবন্ধে সূত্রাকারে তিনি যে আভাস দিয়াছেন, বিস্তৃতভাবে তাহার পরিচয় দিলে আমরা উপকৃত হইব। সম্পাদকের 'কটাক্ষ', বলা বাহুল্য, উপভোগ্য। শ্রীঅপূর্ব্বমণি দত্তের 'অভ্যাগত' একটি গল্প,—চলনসই। আরও সংক্ষিপ্ত হইলে ভাল হইত; বাহুল্যে গল্পটি 'পান্সে' হইয়া গিয়াছে। শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেনের 'প্রেম-স্পর্শ' 'অর্চ্চনা'য় মানান-সহি হয় নাই; ভারতীর কুঞ্জে অথবা প্রবাসীর মোসাফিরখানায় পাঠাইয়া দিলে 'যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ' সার্থক হইতে পারিত।

'বলি নাই যেই কথা, এত দিন হায়,
রেখেছিনু লুকাইয়া অন্তর গুহায়—
মেঘ যথা রাখে বারি, সেই কথা আর
পারি না চাপিতে, প্রিয়,'

এ কৈফিয়তের উপর আর কথা নাই। কিন্তু যে অবস্থায় কথা চাপিয়া রাখা যায় না, সে অবস্থায় একটু তত্ত্বাবধান দরকার হয়। কবিতাটি যদি কবির আত্মীয় স্বজনের চোখে পড়ে, তাহা হইলে আমরা সম্পাদক কেশবচন্দ্রকে 'দয়াল' বলিতে পারিব।—'মেঘ যথা রাখে বারি' বলিয়াই কবি ক্ষান্ত হইলেন কেন? (১) 'ডাব যথা রাখে জল', (২) 'তালশাঁস-সন্দেশে যথা গোলাপী-সুরস', (৩) 'গ্যাসের পাইপ যথা বক্ষে ধরে গ্যাস', ইত্যাদি মালোপমা কি মাঠে মারা গেল?

কৈফিয়তের জের।

শ্রীযুত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাদিগকে নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিয়াছেন,—

'৬৫ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা
১৭.৬.১৬

'সবিনয় নিবেদন,

'আপনার দুইখানি পত্রই পাইলাম। ১৩২১ আশ্বিন সংখ্যার পর আর কোনও "সাহিত্য" অদ্যাবধি আমি পাই নাই। শুনিয়াছিলাম, "সাহিত্য" আর বাহির হইবে না। "আধুনিক রোমিও" গল্পটি আপনার কাছে দেড় বৎসর ধরিয়া পড়িয়া থাকিবার পর "সাহিত্য" আর বাহির হইবার আশা নাই মনে করিয়া গল্পটি "মানসী"তে ছাপিয়াছিলাম।

'যাহা হউক, ঐ গল্পের পরিবর্ত্তে আর একটি গল্প আপনাকে দিব—উহা এক পক্ষ কাল মধ্যে আপনাকে পাঠাইব। আপনার প্রাপ্য বাকী দুইটি গল্প দুই মাস মধ্যে আপনাকে দিব।

'বিনীত

'শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়'

পল্লী-সমাজ।

১

সেনেদের বড় গিন্নী যখন গাঙ্গুলীদের বড় তরফের একমাত্র উত্তরাধিকারী শচীনন্দনকে ভিক্ষাপুত্র রূপে গ্রহণ করিলেন, তখন তাহার বয়স দশ বৎসর। সেই বৎসর শচীনন্দনের উপনয়ন হয়। উপনয়নের কয়েক মাস পরেই শচীনন্দনের মাতৃবিয়োগ হইল। শচীনন্দনের জননী ভুবনমোহিনী দেবীর ঐ একটিমাত্র পুত্র ভিন্ন অন্য সন্তান সন্ততি ছিল না। তাঁহার স্বামী স্বর্গীয় যদুপতি গাঙ্গুলী পারিবারিক সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের মালিক ছিলেন।

ভুবনমোহিনী মৃত্যুকালে শচীনন্দনকে তাহার ধর্ম্মমায়ের হস্তেই সমর্পণ করিয়া যান। গ্রামের মধ্যে গাঙ্গুলীরা ও সেনেরা প্রতিদ্বন্দ্বী জমীদার; কিন্তু ভুবনমোহিনী দেবী জ্ঞাতির অত্যাচারে ও শত্রুতায় বিব্রত হইয়া সেন-গিন্নীর সহিত আত্মীয়তা করিয়াছিলেন। এ জন্য সেন-গিন্নী ও ভুবনমোহিনী উভয়েই স্ব স্ব সরীকগণের চক্ষুঃশূল হইয়াছিলেন। কিন্তু এই শূল যে ভবিষ্যতে মুষলে পরিণত হইবে, তাহা কোনও পক্ষই কল্পনা করিতে পারেন নাই।

সেন-গিন্নী জমীদারীর কার্য্যে যেরূপ দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন, সচরাচর পল্লী অঞ্চলে সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার বয়স যখন সতের বৎসর, সেই সময় তাঁহার স্বামীর লিভার পাকিয়া কাঁচা বয়সেই লোকান্তর হয়; তদবধি সেন-গিন্নী অসাধারণ দক্ষতার সহিত জমীদারী পরিচালিত করিয়া আসিতেছিলেন। প্রৌঢ়াবস্থায় সংসারধর্ম্মে বিরাগ জন্মিলে, তিনি মনে করিয়াছিলেন, দত্তক গ্রহণ করিয়া তাহারই হস্তে সম্পত্তি সমর্পণপূর্ব্বক শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া জীবনের অবশিষ্ট দিন কয়টি কাটাইয়া দিবেন। এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তিনি কিছুদিন হইতে বংশীবদন নামক একটি অনাথ বালককে স্বগৃহে প্রতিপালন করিতেছিলেন; কিন্তু কি কারণে বলা যায় না, বাঁশীকে আর তিনি দত্তক-রূপে গ্রহণ করিলেন না; বাঁশীর সে জন্য আক্ষেপ ছিল না; কারণ সে সেন-গিন্নীর সংসারে পুত্র-নির্ব্বিশেষেই প্রতিপালিত হইতেছিল।

যাহা হউক, ক্রমে বয়োবৃদ্ধিসহকারে বাঁশীর কিঞ্চিৎ রসবোধ হইলে, সে গ্রামের 'আর্য্য রঙ্গালয়' নামক সখের থিয়েটারে যোগদান করিল; এবং সোলার ফুলের 'টায়রা' মাথায় দিয়া, পায়ে ঘুঙ্গুর বাঁধিয়া রঙ্গমঞ্চে এমন নৃত্যলীলা

দেখাইতে লাগিল যে, তাহাতে তাহার ইয়ার বন্ধুগণের মুণ্ড ঘুরিয়া যাইবার উপক্রম হইল! পল্লীরমণীগণ গণ্ডদেশে তর্জ্জনী স্থাপন করিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিল!

এ দিকে ভুবনমোহিনীর মৃত্যুর পর সেন-গিন্নী রাইরঙ্গিণী 'দেবী' শচীনন্দনের মাতৃস্থানীয় হইয়া উঠিলেন। পাড়ার লোক, বিশেষতঃ সেনেদের অন্যান্য সরিকেরা রাইরঙ্গিণীকে 'রায়বাঘিনী' বলিত; কারণ, তাঁহার সুতীক্ষ্ণ বাক্যরূপ নখর-দন্তাঘাতে অনেক পুরুষকে পর্য্যন্ত জর্জ্জরিত হইতে হইত! গ্রামে এমন স্ত্রীলোক কেহই ছিল না, যে তাঁহার খরধার জিহ্বাকে সুশাণিত বল্লম অপেক্ষা অধিক ভয় না করিত। তাঁহার সদর নায়েব অনন্ত গুপ্ত আক্ষেপ করিয়া বলিত, 'গিন্নীমা কেন যে পুরুষের মত কাছা আঁটিয়া কাছারী করেন না; তা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। তাঁহার কথা শুনিয়া ও দাপট দেখিয়া মনে হয় তিনি পুরুষ, আমরা দাড়ী গোঁফ কামাইয়া ঘোমটা দিয়া অন্দরে বসিয়া পান সাজিবার যোগ্য!'

সুতরাং বলা বাহুল্য, সেন গিন্নী নাবালক শচীনন্দনের পৈত্রিক বিষয় সম্পত্তিরও রক্ষণাবেক্ষণে মনঃসংযোগ করিলেন। শচীনন্দনের সম্পত্তিলুব্ধ জ্ঞাতিরা মনে করিয়াছিল, পিতৃমাতৃহীন নাবালকের সম্পত্তির কিয়দংশ এই সুযোগে গ্রাস করিয়া নির্ব্বিঘ্নে পরিপাক করিবে। কিন্তু তাহাদের সুখস্বপ্ন স্থায়ী হইল না। তাহারা দেখিল, সেন-গিন্নী তাহাদের উপর পর্য্যন্ত হুকুম চালাইতেও কুণ্ঠিতা নহেন! ভুবনমোহিনীর জীবিতাবস্থায় তাঁহার অংশের দুই পাঁচটা আম কাঁঠাল হস্তগত করা তাহাদের পক্ষে তেমন কঠিন ছিল না; কিন্তু 'রাইবাঘিনী'র প্রভুত্বে নাবালকের একগাছি খড়ের দিকেও তাহাদের দৃষ্টিপাত করিবার উপায় নাই! তাহারা শচীনন্দনকে তাঁহার প্রভাব হইতে মুক্ত রাখিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। বুদ্ধিমান শচীনন্দন বুঝিয়াছিল, সে তাহার 'ধর্ম্মমা'র অনুগত হইয়া থাকিলে তাঁহার বার্ষিক সাড়ে তিন হাজার টাকা মুনফার সম্পত্তি লাভ করিতে পারিবে। এই সাড়ে তিন হাজারের সহিত তাহার পৈত্রিক দেড় হাজার যোগ করিলে, সে হরিহরপুরের কিরূপ প্রবল পরাক্রান্ত জমীদার হইবে, তাহা কল্পনা করিয়া, কিছু দিনের মধ্যেই শচীনন্দন কৌলীন্যগর্ব্বে তিন গুণ ফুলিয়া উঠিল; এবং গ্রাম্যস্কুলের হেড্‌মাষ্টারের সহিত ঝগড়া করিয়া স্কুল ছাড়িয়া দিল। কিন্তু বাঁশীর মত সে থিয়েটারে না মিশিয়া কয়েকটি মোসাহেব লইয়া একটি সংকীর্ত্তনের দল বাঁধিল; এবং নদীতীরে 'মেয়ের ঘাটে'র অদূরে তাহার পৈত্রিক আটচালাখানি মেরামত করিয়া তাহার

নাম দিল,—'শচীকুটীর'। শচীনন্দন সেখানে সঙ্গোপাঙ্গ লইয়া 'চৈতন্যচরিতামৃত' ও 'মোহমুদ্গর' পাঠ করিত, এবং প্রত্যহ সায়ংকালে পল্লীবধূরা যখন কলসী-কক্ষে গা ধুইতে ঘাটে যাইত, তখন মৃদঙ্গের 'বুজ্‌তা বুজাং বুজাং বুজাং' শব্দে নদীতীর প্রকম্পিত হইয়া উঠিত। তাহার পর ভক্তবৃন্দ যেমন সমস্বরে গান ধরিত,—

'শ্রীবাসের আঙ্গিনা মাঝে—আমার 'গৌর' নাচে!'

সেই মুহূর্তেই শ্রীমান্ শচীনন্দন হর্ষে উচ্ছ্বসিত ও ভাবে রোমাঞ্চিত হইয়া, উভয় বাহু ঊর্দ্ধে তুলিয়া অশ্রুবিগলিতনেত্রে উদ্দাম নৃত্য আরম্ভ করিত! নাচিতে নাচিতে তাহার কাছা খুলিয়া যাইত, এবং সে তাহার লম্বমান কোঁচায় পা বাধিয়া সতরঞ্চির উপর যেমন ধপাস্ করিয়া পড়িত, অমনই সেই সঙ্গে তুমুল শব্দে মৃদঙ্গ বাজিয়া উঠিত, আর পার্শ্বচরেরা তাহাকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক দ্বিগুণ উৎসাহে মুখব্যাদান করিয়া গায়িত,—

'গৌর নাচে রঙ্গে ভঙ্গে, নিতাই ভাসে প্রেমতরঙ্গে—
মুখে হরিবোল হরিবোল বোলে রে!'

সেন-গিন্নী বড় কৃষ্ণপরায়ণা ছিলেন। কালীপূজাকে তিনি 'ভূষোপূজা' এবং বিল্বপত্রকে 'তে ফ্যাড়াঙ্গার পাতা' বলিতেন। কৃষ্ণপদে তাঁহার এতই মতি ছিল যে, দৈবাৎ কোনও দিন 'ধর্ম্মের ষাঁড়' দেখিলে তিনি বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু আবৃত করিতেন; কারণ, ষাঁড় যাঁহার বাহন, সেই মহাদেবের 'গৃহিণী' হর-মনোমোহিনী নৃমুণ্ডমালিনী কালীর পূজায় পাঁঠা বলি হয়। সুতরাং ষাঁড় দেখিলেই পাঁঠাবলির কথা তাঁহার মনে পড়িত। সেই স্মৃতিকে পরদা-চাপা দিবার জন্যই এই অনিন্দ্যসুন্দর ব্যবস্থা!—সেন-গিন্নী যখন জানিতে পারিলেন, শচীনন্দনের কৃষ্ণপ্রেম বিলক্ষণ প্রগাঢ় হইয়াছে, এমন কি, কীর্ত্তনে তাহার ভাব লাগিতে আরম্ভ হইয়াছে, তখন তিনি ভাবিলেন, তাহার হাতেই সমস্ত সম্পত্তি সমর্পণ করিয়া তিনি শ্রীবৃন্দাবনে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিবেন। ঠাকুর-সেবার কার্য্য শচীনন্দনকে দিয়া যেমন সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইবে, 'পোষ্য কুষ্মাণ্ড' দ্বারা তেমন চলিবে না। ইহা বুঝিতে পারিয়া তিনি বাঁশাকে দত্তক-গ্রহণ করিবার সঙ্কল্প চিরদিনের মত পরিত্যাগ করিলেন।

সেন-গৃহিণী হরিনামের মালা লইয়া তাঁহার গৃহবিগ্রহ মদনমোহনের 'দ্বারে' জপে বসিয়া, মদনমোহনের অলকা-তিলক-ভূষিত মুখের দিকে ভক্তিবিহ্বলনেত্রে চাহিয়া বলিলেন, 'দীনবন্ধু, ভবসিন্ধু পার কর; আমি শচীর উপরেই তোমার

সেবার ভার দিয়া যাই। শচীনন্দনই কর্ত্তাদের ভিটায় প্রদীপ দিবে। আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে; উইলখানা তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেল্‌তে পারলে বাঁচি।'

২

সেন-গিন্নী যে দিন তাঁহার উকীল গঙ্গাধর চৌধুরীকে ডাকিয়া উইলের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন, সেদিন হরিহরপুর গ্রামের পক্ষে স্মরণীয় দিন!—সেন-গিন্নী পূর্ব্বে অনেকের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি শচীনন্দনকেই প্রদান করিবেন; সে ঠাকুর-সেবা ও পূজা পার্ব্বণ যথা নিয়মে চালাইতে থাকিবে। কিন্তু কথাটা সকলে বিশ্বাস করে নাই। তিনি যে স্বজাতীয় অনাথ বালকটিকে দত্তক লইবার উদ্দেশ্যে গৃহে আশ্রয় দিয়াছিলেন, এবং পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতেছিলেন, তাহাকে বঞ্চিত করিয়া সমস্ত সম্পত্তি প্রতিদ্বন্দ্বী জমীদার-বংশীয় এক 'ভিক্ষাপুত্রকে' দান করিয়া যাইবেন, ইহা কি বিশ্বাসযোগ্য কথা? সুতরাং অনেকের ধারণা হইল, বাঁশীর বদ্‌চালে বিরক্ত হইয়াই তিনি এই জনরব রটাইয়াছেন। বাঁশী থিয়েটারে মিশিয়া নর্ত্তকী সাজিয়া মুখে খড়ি ও পায়ে নূপুর দিয়া, কখনও চিবুক কখনও কক্ষ স্পর্শ করিয়া নৃত্য করে,—শুনিয়া তাহার উপর রাইরঙ্গিণী ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, এ কথা সত্য। কিন্তু তাহার ফল এত দূর গুরুতর হইবে, ইহা কেহ কল্পনাও করে নাই। ইহাতে অন্যে ক্ষুব্ধ হইলেও বাঁশীর মন সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার ছিল; কারণ, সে রাইরঙ্গিণীর সম্পত্তি অপেক্ষা নর্ত্তকীর পরিচ্ছদকেই অধিকতর আকাঙ্ক্ষণীয় মনে করিত।

গ্রাম্য উকীল-মহলেও এই বিধবার সম্পত্তির অপব্যবহার সম্বন্ধে আন্দোলন আলোচনা উপস্থিত হইয়াছিল। মহকুমার আদালতে যে সকল উকীলের তেমন পশার নাই, তাঁহারা মধ্যাহ্নে স্থানীয় 'উকীল-ঘরে' বসিয়া, ডাবা হুঁকা হাতে লইয়া, সেন-গিন্নীর সম্পত্তির পরিণাম কিরূপ শোচনীয় হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে কলিকার আগুন নিভাইয়া ফেলিতেন। গ্রামে আরও যে অনেক বিশিষ্ট ভদ্রলোক না ছিলেন, এরূপ নহে; কিন্তু গ্রামের এই কয় জন উকীলের বিশ্বাস, গ্রামে তাঁহারা কয় জন শামলাধারীই মানুষ, অন্য সকলে অমানুষ, নগণ্য; কারণ, তাঁহারা মধ্যাহ্নে ধড়াচূড়া—সংপ্রতি সবুজ 'গাউন' পরিয়া মুন্সেফ বাবুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া, তোরাপ বিশ্বাস, নকড়ি দফাদার, কেফাতুল্লা হাল্‌দানা প্রভৃতি মাতব্বর মক্কেলগণের পক্ষ সমর্থন করেন, এবং হরিদাস ঘোষ থাইলে ডিক্রীজারী দ্বারা মাধাইয়ের সম্পত্তি নিলাম করাইয়া লন; সুতরাং এ কলিযুগে তাঁহারাই সর্ব্বশক্তিমান! এ অবস্থায় সেন-গিন্নী তাঁহাদের প্রত্যেককে

ডাকিয়া তাঁহার সম্পত্তি সম্বন্ধে সুব্যবস্থার পরামর্শ গ্রহণ করিলেন না কেন, এ কথা চিন্তা করিয়া গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে তাঁহারা গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতে লাগিলেন।

অবস্থা যখন এইরূপ সঙ্কটাপন্ন, সেই সময় প্রবীণ উকীল গদাধর চৌধুরী এজলাস্‌ হইতে উকীলঘরে প্রবেশপূর্ব্বক হুঁকা হাতে করিয়াই বলিলেন, 'শুনেছ হে, সেন-গিন্নী উইল করছে!'

তিন চারি জন উকীল এক সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন, 'বটে বটে, কার নামে?'

গদাধর হুঁকায় দম দিয়া বলিলেন, 'ঐ যে কি বলে—তার ভিক্ষেপুত্তুর শচী গাঙ্গুলীর নামে! তেলা মাথাতেই লোক তেল ঢাল্‌তে চায়। গরীবের ছেলেটাকে এতদিন প্রতিপালন করে' শেষে এই ব্যবস্থা! সেনেদের সাতপুরুষের সম্পত্তি শেষে গাঙ্গুলীদের হাতে গিয়ে পড়্‌লো!'

শচীনন্দনের ঘরের উকীল সর্ব্বেশ্বর প্রামাণিক এ কথা শুনিয়া একটু চটিলেন। তিনি বলিলেন, 'তা অন্যায়টা হয়েছি কি? জমীদারীর ভার জমীদারের ছেলের হাতে দিলেই ত জমীদারী রক্ষা হবে, বারো মাসে তের পার্ব্বণ বজায় থাক্‌বে। কোথাকার একটা হাঘরে হাভাতেকে তার মালিক করে' গেলে তিন দিনেই জমীদারীর মুনফা শুঁড়ীর ঘরে উঠ্‌বে।'

গদাধর বিরক্ত হইয়া বলিলেন, 'আহা! বড় চমৎকার কথা বল্লে! মক্কেল কি না, অমনই আঁতে ঘা লেগেছে। সেনেদের সম্পত্তি স্বজাতির হাতে থাক্‌লে দশটা স্বজাতি প্রতিপালিত হয়। আশ্রিত পাঁচ জনের আশা ভরসা থাকে; সেন-গিন্নীকে আমি এ কথা বুঝিয়ে বলেছি, কিন্তু তিনি অটল; অগত্যা তাঁকে উইলের খসড়া লিখে দিয়ে এসেছি।'

উকীল শ্যামাচরণ চক্রবর্ত্তীর পিতা সেনেদের আত্মীয় জমীদার রসরাজ গুপ্তের পিতার পৌরোহিত্য করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন।—রসরাজ শ্যামাচরণের পৃষ্ঠপোষক ও মুরুব্বী। বাঁশী সম্পত্তি পাইলে শ্যামাচরণের কিছু লাভের সম্ভাবনা ছিল। অন্ততঃ, আমমোক্তারীটাও জুটিত।—শ্যামাচরণ গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, 'আমাদের অগ্রাহ্য করে' সেন গিন্নী এ রকম কাজ করবে? কর সেন-গিন্নীকে একঘরে!—গোপলা, তামাক সাজ।'

৩

পরদিন ঘাটে পথে, সেই একই কথা! স্নানের ঘাটে গ্রামের স্ত্রীলোক-দের 'কমিটী' বসিয়া গেল। সকলেই বলিতে লাগিল, সেন গিন্নীর কি বিবেচনা! 'সোনা ফেলে আঁচলে গেরো!' বাঁশী অমন সোনার চাঁদ ছেলে, যেমন নাচ্‌তে,

তেমনই গাইতে বাজাতে। ওকে কি না বঞ্চিত ক'রে জমীদারী দিলে ঐ ঘাটে-পড়া অলপ্পেয়ে শচে ছোঁড়াকে! ড্যাকরা কতকগুলো 'উতো' জুটিয়ে ঘাটের পথে এ রকম হৈচে করে যে, নাইতে আসা দায়!'

শ্যামাচরণের পিসী বাঁশীর মাসীকে বলিলেন, 'শাম আমাদের কি অল্পে ছাড়বে? আহা, বাঁশীর কাকার সঙ্গে আমাদের শামের কত ভাব ছিল, দু'জনে এক সঙ্গে "লেখা পড়া" করতো কি না! বাঁশীর কাকা মারা গেলে শামই ত বাঁশীর তত্ত্বতল্লাস করে' আসছে। বাঁশী ফাঁকে পড়লো শুনে, শাম আমার বড়ই মনের কষ্টে আছে। তা তোমরা সকলে দেখ্‌তে পাবে, শাম কত দূর কি করে। শাম এখন আমাদের গাঁয়ের মাথা বল্লেই হয়।'

বাঁশীর মাসী মুক্তকেশী বলিলেন, 'সেন-গিন্নী তার নিজের বিষয় যদি বিলিয়ে দেয়, শাম তার কি করবে? আহা, বাঁশীর কি এত ভাগ্য হবে যে, জমীদারী পাবে।'

শ্যামাচরণের পিসী চক্ষু ঘুরাইয়া কথঞ্চিৎ নিম্নস্বরে বলিলেন, 'সেনগিন্নীকে একঘরে করা হবে।—শাম আর রসরাজ বাবু দু জনে কাল রাত্রে বৈঠকখানায় বসে' পরামর্শ করেছে। এ কথা কাকেও বলো না দিদি। বসে' বসে' মজা দেখ।'

কিন্তু স্নানের ঘাটের গোপনীয় কথা প্রকাশিত হইতে বিলম্ব হইল না। কথাটা সেনগিন্নীরও কানে গেল। শুনিয়া তিনি একটু হাসিলেন।

এই ভাবে কয়েক মাস চলিয়া গেল। সেনগিন্নীকে একঘরে করিবার বিশেষ কোনও সুযোগ ঘটিল না। অগ্রহায়ণ মাসে জগদ্ধাত্রীপূজা। শ্যামাচরণ উকীল হইয়া নূতন বৈঠকখানা-নির্ম্মাণের পর হইতে কয়েক বৎসর ধরিয়া মহা-সমারোহে জগদ্ধাত্রী পূজা করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার পূজায় বিশেষত্ব ছিল। যে সকল মক্কেল প্রণামী দিতে পারে, বাছিয়া বাছিয়া সেই সকল মক্কেলকেই তিনি নিমন্ত্রণ করিতেন। যে সকল ব্রাহ্মণ কায়স্থ মিউনিসিপাল-নির্ব্বাচনে তাঁহার জন্য ভোটভিক্ষায় অভ্যস্ত ছিল, তাহারাই তাঁহার গৃহে নিমন্ত্রিত হইত। তিনি পিতৃগোষ্ঠীর কাহারও সন্ধান না লইয়া শ্যালক, শ্যালকপত্নী, তস্য ভগিনী-পতি, এবং তৎসম্পর্কীয় অনেক সম্ভ্রান্ত কুটুম্বকে সমাদরে গৃহে আহ্বান করিতেন। আর যাহারা বলিত, শ্যামাচরণের মত উকীল হবে না, হবার নয়, তাহাদিগকেও শ্যামাচরণ ফলারে পরিতৃপ্ত করিতেন।

জগদ্ধাত্রীপূজার রাত্রে শ্যামাচরণের গৃহে মহা সমারোহ। এবার শ্যামা-

চরণের পূজার ঘটা কিছু অধিক। এবার টাট্‌কা ভাজা লুচির সঙ্গে কৃষ্ণনগরের সরপুরিয়া, বর্দ্ধমানের মিহিদানা, নাটুরে আধাছানার গোল্লা ভোক্তৃবৃন্দের পাতের শোভাবর্দ্ধন করিতে লাগিল। ভোক্তারা পরিতৃপ্ত হইয়া বলিল, 'না হবে কেন? কত বড় বাপের ছেলে! ফলনা চক্রবর্ত্তী সাক্ষাৎ সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। নৈলে কি এমন বংশ উজ্জ্বল করা ছেলে যার তার ঘরে জন্মায়? দেখ দেখি, বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ, কৃষ্ণনগরের মহারাজ, নাটোরের মহারাজ, বাঙ্গালার তিন জন প্রধান মহারাজের রাজ্যের যা কিছু সার পদার্থ, সমস্তই শ্যামাচরণ বাবাজীবনের ভাঁড়ারে মজুত!' এ কথা শুনিয়া ভুঁড়ির উপর গামছা জড়াইয়া পরিবেষণ কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে শ্যামাচরণ বলিলেন, "খুড়ো, বসে খাও; এর উপর খাগড়ার ছানাবড়াও আছে; খাগড়ায় লোক পাঠিয়ে আনিয়েছি।'

সঙ্গে সঙ্গে রব উঠিল, 'তাই নাকি! তাই নাকি! তা হ'লে কাশিমবাজারের মহারাজের রাজ্যের অমূল্য সামগ্রীটিও বাদ পড়েনি!'

কিন্তু শ্যামাচরণের এবার এরূপ ধূমধাম করিবার কারণ ছিল। তিনি যাহাদিগকে এবার পূজায় নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে প্রতিজ্ঞা করিতে হইয়াছিল, সেন-গিন্নী কোনও ক্রিয়া কর্ম্মে নিমন্ত্রণ করিলে তাহারা সেই নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিবে। ছিদাম চক্রবর্ত্তী শ্যামাচরণের মুহুরীর স্ত্রীর মামাতো ভাই, তিনি প্রত্যহ কিঞ্চিৎ 'গুলি' আহার করিতেন; তিনি সাড়ে তিন গেলাস ক্ষীর ক্ষুধানলে আহুতিপ্রদান পূর্ব্বক সতেজে বলিলেন, যে 'সেন-গিন্নীর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে, সে পরিবারের ভাই!' যথাসময়ে এ কথাও সেন-গিন্নীর কর্ণগোচর হইল। এবারও তিনি একটু হাসিলেন।

৪

আরও কয়েক মাস চলিয়া গেল। সেন-গিন্নী কাহারও অনুরোধ উপরোধ গ্রাহ্য না করিয়া তাঁহার 'ভিক্ষাপুত্র' শচীনন্দ গাঙ্গুলীকেই তাঁহার স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি লেখাপড়া করিয়া দিলেন। উইলের একটি সর্ত্ত থাকিল, শচীনন্দন ঠাকুর-সেবা ও পূজা পার্ব্বণ অক্ষুণ্ণ রাখিবে। বাঁশী তাঁহার সংসারে প্রতিপালিত হইবে, এবং ঠাকুরবাড়ীর কাজ কর্ম্ম দেখিবে; কিন্তু গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় ভিন্ন সে আর কিছু পাইবে না।

ফাল্গুন মাসে দোল। সেনেদের বাড়ী প্রতি বৎসর মহাসমারোহে দোলযাত্রা হইত। দোলযাত্রা উপলক্ষে সেন-গিন্নী গ্রামস্থ সমস্ত ভদ্রলোককে

নিমন্ত্রণ করিয়া লুচির ফলার দিতেন। ফলারে ব্রাহ্মণ শূদ্র কেহই বাদ পড়িত না। কিন্তু এবার দোলে ফলারের আয়োজন কিছু গুরুতর হইল!

সেন-গিন্নী তাঁহার নায়েব অনন্ত গুপ্তের ডাকিয়া বলিলেন, 'আমি দোলের পর তীর্থভ্রমণে যাইব; আর বাড়ী ফিরিব কি না, ঠিক নাই। সেই জন্য মনে করিতেছি, এবার মদনমোহনের দোলে কিছু ব্যয় ভূষণ করিব। তুমি খরচপত্রের একটা ফর্দ্দ কর।'

নায়েব বলিল, 'মা, আপনার আদেশের উপর আমার কোনও কথা নাই। কিন্তু আমার মনে হয়, এবার লোকজন খাওয়ান বন্ধ রাখিলেই ভাল হয়। পার্ব্বণটা কোনও রকমে শেষ করা যাউক। তবে যদি লোকজন না খাওয়াইলে উৎসবের অঙ্গহানি হইবে মনে করেন, তা হ'লে একটা জমকালো গোছের 'মচ্ছব' দেওয়া যাক্; দেশের অতিথ, ফকীর, গরীব দুঃখীদের সেবা চলুক। ব্রাহ্মণ কি স্বজাতি, এ সকল নিমন্ত্রণ করিয়া কাজ নাই।'

সেন-গিন্নী ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, 'কেন?'

নায়েব বলিল, 'শ্যামাচরণ উকীল জগদ্ধাত্রীপূজায় আপনাকে নিমন্ত্রণ করে নাই; সেই সময় সে বৈঠকে বসিয়া গ্রামস্থ ব্রাহ্মণদের দিয়া প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইয়াছে, যেন এক জনও কোনও ক্রিয়া উপলক্ষে আপনার বাড়ী ফলার খাইতে না আসে। অধিক কি, আপনি আপনার ভিক্ষাপুত্রকে সম্পত্তি সমর্পণ করায় আমাদের স্বজাতিরা পর্য্যন্ত আপনার উপর ভারি গোসা। আপনারই আত্মীয় জমীদার রসরাজ গুপ্ত সকল কুটুম্বকে আপনার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়াছে। আত্মীয় কুটুম্ব এক ছেলেও আপনার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিবে না।'

সেন-গিন্নী বলিলেন, 'তুমি যে কথা শুনিয়াছ, সে কথা কি আমার কাণে যায় নাই? তোমার মাথায় যে সকল কথা আসিয়াছে, তাহা কি আমার বুঝিবার শক্তি নাই? অনন্ত, আমি সব জানি, সব বুঝি। খোলাকাটা পুরুতের ছেলে শ্যামা চক্রবর্ত্তী মুন্সেফের উকীল হইয়া যদি একটা আকাট-মূর্খ অকালকুষ্মাণ্ডের সঙ্গে যোগ দিয়া আমাকে জব্দ করিতে পারিত, তাহা হইলে পরের ছেলেকে জমিদারী বিলাইয়া দিবার মত সাহস আমার হইত না। তুমি ফর্দ্দ কর। আমি এবারকার দোলের খরচ তিন হাজার টাকা মঞ্জুর করিলাম।'

নায়েব মাথা চুলকাইয়া বলিল, 'তিন হাজার টা—কা! প্রতি বৎসর দোলে

আড়াই শো তিন শো টাকার বেশী খরচ হয় না, এবার তিন হাজার! ব্যাপার কি, মা?'

সেন-গিন্নী বলিলেন, 'আমি দীর্ঘ কালের মত যাইতেছি। হয় ত এই আমার শেষ কাজ! এই জন্যই স্থির করিয়াছি, প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে আহার করাইয়া এক টাকা হিসাবে ভোজনদক্ষিণা, আর স্বজাতীয় প্রত্যেক স্ত্রী পুরুষকে এক যোড়া শাড়ী বা ধুতি মর্য্যাদা দিব। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরাও বাদ যাইবে না। এ কথাটা যেন এখন প্রকাশ না হয়। কত যোড়া ধুতি ও শাড়ী আবশ্যক, একটা ফর্দ্দ কর।'

নায়েব বলিল, 'ফর্দ্দ করিতে বিলম্ব হইবে না; কিন্তু হঠাৎ কাপড় গুলা কিনিবার দরকার নাই। আগে সমাজের ভাব গতিকটা ভাল করিয়া বুঝি।'

সেন-গিন্নী বলিলেন, 'সমাজের ভাব গতিক আমার বেশ বুঝা আছে; নূতন করিয়া বুঝিবার আবশ্যক নাই। জগদ্ধাত্রীপূজায় তিন জন লোককে ফলার দিয়া সমাজের মাথা কিনিয়া রাখা যায় না, ইহা অন্তে বুঝুক।'

নায়েব কাহারও নিকট কোনও কথা প্রকাশ করিল না; দোলের আয়োজন চলিতে লাগিল।

৫

কিন্তু এত বড় একটা ফলারের আয়োজনের কথা পল্লীসমাজে গোপনে থাকে না। দুই এক দিনের মধ্যে সকলেই শুনিতে পাইল, সেন-গিন্নী দোল শেষ করিয়া তীর্থভ্রমণে যাইবেন; এ জন্ত এবার দোল মহা সমারোহ হইবে। দীয়তাং ভুজ্যতাং সবেগে চলিবে। রাঢ় হইতে গণেশের কীর্ত্তন আসিবে। দশখানা গ্রামের গরীব দুঃখী কেহ অভুক্ত থাকিবে না।

কথাটি শুনিয়া স্বজাতীয় মহাত্মারা অবিশ্বাস করিতে পারিলেন না; তাঁহারা উদরে হাত বুলাইয়া ঢোক গিলিয়া বলিলেন, 'সেন-গিন্নীর হাত খুব দরাজ বটে! কিন্তু দলাদলির চোটে লুচি জল না হয়।'

এই গুরুতর ফলাহারের সংবাদ শ্রবণ করিয়া গ্রামস্থ ব্রাহ্মণসমাজের টিকি দারুণ উৎকণ্ঠায় কণ্টকিত হইয়া উঠিল। ভয়, দোলে গোল না বাধে! সেন-গিন্নী দোলে ব্রাহ্মণভোজনের নিমন্ত্রণ করিলে তাহা রক্ষা করা কি সহজ হইবে? শ্যামাচরণ উকীলের বাড়ী জগদ্ধাত্রীপূজার বৈঠকে প্রায় সকলেই মত দিয়া আসিয়াছে, সেন-গিন্নীর বাড়ী ক্রিয়া কর্ম্ম হইলে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা হইবে না। এখন উপায়?

সকলেই প্রমাদ গণিল। শ্যামাচরণ ও রসরাজ ঘনঘন গোপনে 'কমিটী' করিতে লাগিল। শেষে স্থির হইল, রসরাজ কুটুম্বদের 'মোহড়া' হইবে; আর শ্যামাচরণ গ্রামস্থ ব্রাহ্মণসমাজের টিকি মুঠার ভিতর ধরিয়া রাখিবে।—কেহ দড়ি না ছেঁড়ে!

স্বজাতীয় আত্মীয় কুটুম্বগণ রসরাজকে আশ্বাস দিল, সেন-গিন্নীর বাড়ী এক জনও পাতা পাড়িবে না; এক বেলা লুচি না খাইলে কি ক্ষতি?—গ্রামস্থ ব্রাহ্মণেরা শ্যামাচরণের বৈঠকখানায় বসিয়া সুগন্ধি 'অম্বুরী তামাক' ধ্বংস করিতে করিতে তাঁহাকে আশ্বাস দিলেন, গ্রামের এক জন ব্রাহ্মণও তাঁহাকে ছাড়িয়া সেনবাড়ী পদধূলি দান করিবে না।

গ্রামস্থ ব্রাহ্মণ, কুটুম্ব প্রভৃতির নিকট অভয়বাণী শ্রবণ করিয়া শ্যামাচরণ ও রসরাজ উভয়েই নিশ্চিন্ত হইলেন; এবং সেন-গিন্নীর দোলের উৎসব কিরূপ উৎকট ব্যসনে পরিণত হইবে, তাহা কল্পনা করিয়া উভয়েই সোৎসাহে 'গুড়গুড়ি' টানিতে লাগিলেন।

দোলের তিন দিন পূর্ব্বে গ্রামস্থ ব্রাহ্মণকুটুম্বগণ হঠাৎ শুনিতে পাইল, সেন-গিন্নী এবার দোলে ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে এক টাকা হিসাবে মর্য্যাদা দিবেন, এবং স্বজাতীয় স্ত্রীপুরুষ বালক বালিকা পর্য্যন্ত এক যোড়া করিয়া কাপড় পাইবে!

এই সংবাদে শ্যামাচরণ প্রমাদ গণিলেন। রসরাজকে বলিলেন, 'ভায়া, এখন উপায়? দড়ি ছেঁড়ে বুঝি!'

রসরাজ বলিলেন, 'এবার তুমি চৈত্রমাসে বাসন্তীপূজার আয়োজন কর।—গ্রামস্থ ব্রাহ্মণদের বল, যদি তারা পূর্ব্ব অঙ্গীকার বজায় রাখিয়া সেন-গিন্নীর নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করে, তাহা হইলে বাসন্তীপূজায় এক এক পেট্ লুচি সন্দেশ আর দুই দুই টাকা ভোজনদক্ষিণা।'

শ্যামাচরণ কাতরভাবে বলিল, 'জগদ্ধাত্রীপূজার দেনা এখনও মিটাইতে পারি নাই। বিশেষতঃ আজকাল কাজকর্ম্ম বড়ই মন্দা; কয়েক জন নূতন উকীল এক এক টাকা 'উকীল-ফি' নিয়েই কাজ করতে আরম্ভ করছে, ছুটো মক্কেলরা আর আমাকে দু' টাকা 'ফি' দিতে রাজী হচ্ছে না, কাজেই আমাকেও—নামতে হয়েছে! বাবা চারি আনা দক্ষিণা নিয়েই পূজো করতেন, তার চেয়ে ত ভাল! আমি ত কোনও উপায় দেখ্‌চি নে; তুমি যদি কিছু করতে পার। ঘুঁষ দিয়ে আর কাঁহাতক লোকজনকে বশে রাখা যায়?'

রসরাজ বলিলেন, "চেষ্টা করিয়া দেখা যাক, যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ!—শেষে একটা স্ত্রীলোকের কাছে অপদস্থ হতে হ'বে? সাত চোঙ্গার বুদ্ধি এক চোঙ্গায় ঢুক্‌বে!"

রসরাজ স্বজাতীয় প্রধান প্রধান লোককে ডাকিল; তাঁহারা সোৎসাহে বলিলেন, "সেন-গিন্নী ঘুষ দিয়ে আমাদের খাওয়াতে চায়? 'আস্পর্দ্ধা' ত কম নয়! এ রকম 'নোলা' আমরা রাখিনে; আপনাকে ছেড়ে আমরা কক্‌খন যাব না।"

শ্যামাচরণ, ব্রাহ্মণ-কুলভূষণ ঔদরিকশ্রেষ্ঠ গ্রামস্থ সুহৃদ্‌বর্গকে তাঁহার বৈঠকখানায় গোপনে আহ্বান করিয়া তাঁহার মনের কথা বলিলেন। তাহা শুনিয়া তাঁহারা টিকিসমেত মাথাগুলি প্রচণ্ডবেগে আন্দোলিত করিয়া বলিলেন, 'এ কি কাজের কথা! তোমাকে ছেড়ে সেন-গিন্নীর বাড়ী ফলার? পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিমে উঠ্‌লেও আমাদের কথার নড়-চড় হবে না। তুমি নিশ্চিন্ত থাক।'

৬

কিন্তু চারি দিকের অবস্থা দেখিয়া শ্যামাচরণ বা রসরাজ কেহই নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। ব্রাহ্মণেরা গোপনে সেন গিন্নীর নায়েব অনন্ত গুপ্তের সহিত সাক্ষাৎ করিতে লাগিল।—তাহারা শুনিল, টাকা টাকা দক্ষিণাদানের কথা সত্য; যিনিই পদধূলি দিবেন—তিনিই নগদ এক এক খণ্ড রজতচক্র দক্ষিণা পাইবেন।

গ্রামস্থ ফলারে ব্রাহ্মণেরা ফলারের পূর্ব্বদিন তাহাদের ভাগ্‌নে, ভাগ্‌নী-জামাই, শ্যালক, ভগিনীপতি প্রভৃতি আত্মীয় কুটুম্বগণকে নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহ হইতে সংবাদ পাঠাইয়া লইয়া আসিল। যত জন ব্রাহ্মণ ফলার খাইতে পাইবে, প্রত্যেকেই এক টাকা হিসাবে দক্ষিণা পাইবে; এরূপ দুর্ল্লভ সুযোগ যে নষ্ট করে, সে অব্রাহ্মণ!

দোলের পূর্ব্বদিন কলিকাতা হইতে রাশি রাশি ধুতি শাড়ী খরিদ হইয়া গরুর গাড়ীতে সেন-গিন্নীর দরজায় উপস্থিত! বস্ত্রের প্রাচুর্য্য দেখিয়া কুটুম্বসমাজে মহা কোলাহল উত্থিত হইল। সকলেই জানিতে পারিল, কুটুম্ব কুটুম্বিনীরা সেন-গিন্নীর গৃহে পদার্পণ করিয়া পাতা পাড়িলেই নূতন ধুতি শাড়ী মর্য্যাদা পাইবে। বালক বালিকা কেহই বাদ যাইবে না।

দোলের দিন সেন-গিন্নীর বাড়ীর 'দীয়তাং ভুজ্যতাং' শব্দে পল্লী মুখরিত হইয়া উঠিল। গ্রামের ফলারে ব্রাহ্মণগণ আত্মীয়-স্বজনে পরিবৃত হইয়া মধ্যাহ্নভোজনের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিল। কুটুম্ব-কুটুম্বিনীতে, বালক-বালিকায় সেন-গিন্নীর বাড়ী পূর্ণ হইল। উকীল শ্যামাচরণ ও জমীদার রসরাজ গুপ্তেরও নিমন্ত্রণ হইয়াছিল।

কিন্তু বলা বাহুল্য, তাঁহারা নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিলেন না। সন্ধ্যার পর দু' জনে হতাশভাবে পরামর্শ করিতে বসিলেন, এবং রসরাজ ক্ষুব্ধচিত্তে মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, 'পল্লীসমাজ একবারে অধঃপাতে গিয়াছে; এ দেশের আর মঙ্গল নাই।'

শ্যামাচরণ এখন ভাবিতেছেন, এই সকল নিমকহারামকে আগামী বৎসর জগদ্ধাত্রীপূজায় নিমন্ত্রণ করিয়া ফলার দেওয়া অপেক্ষা টাকাগুলি লোহার সিন্ধুকে মজুত করিয়া রাখাই বুদ্ধিমানের কার্য্য।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

ছন্দের জঞ্জাল।

ছন্দের সম্বন্ধে কোনও কথা উঠিলে ভয় হয়। বিশ্ব ছন্দে পরিপূর্ণ। হয় ত কেবল একটা ছন্দেই সকলের শেষ। কিন্তু নানাবিধ দৃশ্য ছন্দ, অদৃশ্য ছন্দগুলির সঙ্গে চিরকাল সত্যভাবে আবদ্ধ, এ কথা অনেকে স্বীকার করেন না। ছন্দে ছন্দে ঘোর সংগ্রাম বাধে, তাহা বিজ্ঞানে শুনিতে পাই। কেবল তাহাই নহে। অনেক কাব্যবিশারদ স্বীকার করেন যে, ছন্দের সঙ্গে কথার মারামারি হয়। ছন্দের হাত নাই, তথাপি চরণ দ্বারাই এ কার্য্য সম্পন্ন করে। এই রকম একটা খুনাখুনি হইলে, ছন্দের পদ পরীক্ষা করিয়া প্রলেপ ও 'ব্যাণ্ডেজ' প্রভৃতির ব্যবস্থা করিবার প্রথা আছে।

ছন্দ লইয়া পরিহাস করিলে কেহ কেহ চটিয়া যাইতে পারেন। ছন্দের মধ্যে হাসিবারও রাস্তা আছে, কাঁদিবার ত কথাই নাই। হাসিয়া লওয়া ভাল, তাহার পর ভক্তিরসাপ্লুত হইয়া কাঁদিলে আপনারা খুসি হইতে পারেন।

এ হাসির অর্থ যে 'আমি বড় বুঝি', তাহা নয়। অনেক চেষ্টা করিয়াও যে আমি বুঝিতে পারি নাই, এবং উপহাসাস্পদ হইয়া পড়িব, ইহাই সে হাসির গৌরচন্দ্রিকা। ইহাতে বুঝা উচিত যে, প্রবন্ধলেখকমাত্রেরই জাতীয় অহঙ্কারের গুণে গাত্র 'গস্'-'গস্' করে, এবং হাস্যাস্পদ হইবার পূর্ব্বে সে স্বভাবতঃ গম্ভীর হয়।

ছন্দের কথা গম্ভীরভাবে বলিতে গেলে প্রথমে বিজ্ঞানের কথা, দর্শনের কথা, এবং অনেক কথা, যাহাতে হাসিবার যো নাই, তাহাই পাড়িতে হয়। ছন্দ বিশ্বব্যাপী পদার্থ। শক্তিও ত বিশ্বব্যাপিনী। তবে ছন্দ এবং শক্তি কি একই জিনিস?

যদি একই জিনিস হইত, তবে কোনও গোলযোগ থাকিত না। কিন্তু কোনও পদার্থের লক্ষণ কিংবা চিহ্নকে আমরা সেই পদার্থ বলিতে পারি না। মানুষের কম্পজ্বরকে আমরা মানুষ বলিতে পারি না। রমণীর প্রণয়কে আমরা রমণী বলিতে পারি না। ছন্দ, শক্তির একটা লক্ষণ। গুণবাচক শব্দ। এই জন্য সংস্কৃত ব্যাকরণে ইহা ক্লীবলিঙ্গ। বিজ্ঞানের ভাষায় এটাকে স্পন্দনের ধারা বলিতে পারেন। স্পন্দনের পরিবর্ত্তে 'কম্পন' বলিলেও দোষ নাই। ত্রাসের ভাব না আসিলেই হইল। শুধু 'কম্পন' না বলিয়া কম্পনের 'ধারা' কিংবা 'ভঙ্গী' বলিলেও ক্ষতি নাই। গ্রাম্য ভাষায় সেই 'ভঙ্গী'কে ছাঁদ বলিতে পারেন। *

এখন, কথা উঠিতে পারে, 'যাহা স্পন্দিত হয়, তাহা শক্তি না জড়?' এ সম্বন্ধেও গাম্ভীর্য্যভাব অবলম্বন করিতে হইবে। কারণ, জড় বলিয়া কোনও পদার্থ আছে কি না, তাহার নির্ণয় হয় নাই। প্রথমে মনে করুন যে, জড় আছে। যদি থাকে, তবে তাহাকেই শক্তি নাচাইয়া তুলে, কিংবা তাহাকে স্কন্ধে করিয়া নাচে। সেই নাচিবার ভঙ্গীটুকু ছন্দ। কিন্তু যাঁহারা বিজ্ঞানের চরম প্রান্তে উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহারা বলেন, জড় নাই; স্পন্দনের সংখ্যা যত কম, জড়ের জড়ত্ব তত বেশী। একখণ্ড লৌহ বহুসংখ্যক-পরমাণুবিশিষ্ট। আবার সেই পরমাণুগুলিকে ভাঙ্গিয়া যদি কল্পনায় আরও ক্ষুদ্র করা যায়, সেটাকে আর জড় বলিয়া বোধ হয় না। প্রত্যেক পরমাণু ঘূর্ণ্যমাণ। মনে করুন, তাহাদের একটা মেরুদণ্ড আছে; এবং তাহাকে বেষ্টন করিয়া কোনও একটা শক্তি, কিংবা প্রাণবায়ুই বলুন, অহঃরহ ঘুরিতেছে। ইহা ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। তবে জড় বলি কাহাকে? আবার, লৌহখণ্ডের সঙ্গে একপাত্র জলের তুলনা করিয়া দেখিলে হয় ত বলিবেন যে, জলের জড়ত্ব লৌহ অপেক্ষা কম। লৌহ জলের মধ্যে ফেলিয়া দিলে ডুবিয়া যায়। লৌহের মধ্যে শক্তি যতটুকু ক্রিয়াশীল, জলের মধ্যে তার চেয়ে বেশী। দর্শনের কথায়, শক্তির তামসিক ভাব আমরা লৌহে বেশী দেখি। জলের মধ্যে রাজসিক ভাব বেশী। যদি আমরা গণিয়া বলিতে পারিতাম যে, প্রত্যেক মিনিটে লৌহের পরমাণু কত বার ঘুরিতেছে, এবং সেই পরিধি কতবার স্পন্দিত হইতেছে, কিংবা কত দূর ব্যাপ্ত হইয়া আবার আকুঞ্চিত হইতেছে, এবং জল সম্বন্ধেও তাহাই বলিতে পারিতাম, তবে 'লৌহ, এবং 'জল', এই শব্দগুলি অভিধান হইতে উঠাইয়া দিয়া, কতকগুলি নম্বর দ্বারা সঙ্কেতে বুঝাইলেও চলিয়া যাইত। কিন্তু নম্বর অপেক্ষা নাম মনে করিয়া রাখা সহজ; সুতরাং আমরা 'জল' এবং 'লৌহের' নাম লইয়া সেই ভ্রম হইতে দূরে থাকি।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, 'জড়' কথাটা আমরা তুলিয়া দিতে রাজি নহি। শক্তিকে যদি একাকী দাঁড় করান যায়, তবে তাহার জড়ত্ব 'ভাব'কে জড় বলিলেও আমাদের আশা মিটে না। জড়ত্বের সীমা নির্দ্দিষ্ট করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। হয় ত কথা বাড়াইতে গিয়া আমরা তাহাকে 'জড়প্রকৃতি' কিংবা অপরাপ্রকৃতি বলিতে পারি। কিন্তু তাহা হইলেও আপনি আবার জিজ্ঞাসা করিবেন,—'ধরা গেল, শক্তি স্পন্দিত হয়, এবং তাহার সংখ্যা যত কম, ততই জড়ত্ব বেশী; কিন্তু স্পন্দনের উদ্দেশ্য কি, এবং উৎপত্তি কোথা হইতে ?'

কেহ কেহ বলিবেন, ইহা স্বভাবতঃই হয়। কেহ কেহ বলিবেন, যে আর একটা জিনিস আছে, তাহার নাম চৈতন্য, কিংবা শুদ্ধচৈতন্য। প্রকৃতি সেই চৈতন্যের সংস্রবে ক্রিয়াশীলা হইয়া পড়ে। যদি এই চৈতন্যের সংবাদটুকু লুকাইয়া আমরা কেবল 'শক্তি' দ্বারা কথার আলোচনা করি, তাহা হইলে কত দূর চলে, দেখিলে হয়। যদি আমরা বলি, স্বভাবতঃ শক্তি দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পরস্পরের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, এবং তাহাদের আকর্ষণের ও বিপ্রকর্ষণের দ্বন্দ্বে স্পন্দনের উৎপত্তি হয়, তবে মোটামুটি একটা মীমাংসা হইতে পারে। কিন্তু বিনা কারণে ঠিক এক জিনিস দ্বিধা হইয়া রণক্ষেত্রের উভয়পার্শ্বের সীমায় দাঁড়াইয়া মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে, ইহা কেমন কেমন বোধ হয়। এই যেমন তড়িৎ সম্বন্ধে আপনি জিজ্ঞাসা করিতে পারেন 'পোলারিটির উদ্দেশ্য কি ?' তাহার উত্তরে হয় ত আপনাকে বলিতে হইবে যে, উহা দ্বারাই বিদ্যুৎ, অগ্নি, কিংবা আদিত্য প্রকাশিত হন।

এই সন্দেহ হইলে আমরা ভাবরাজ্যে আসিয়া পড়ি। আমরা মানুষ। আমাদের মধ্যে কল্পনা বলিয়া একটা ভাব আছে; তাহা শক্তির দ্বন্দ্বের বাহিরে। এই কল্পনার মধ্যে এক রকম উপাদান আছে; তাহার নাম 'ইচ্ছা'। 'অমুক রকম হইলে ভাল হইত, সুন্দর হইত' ইত্যাদি। আর একটা ভাব আছে, সেটার দ্বারা উভয় শক্তির দ্বন্দ্ব আমরা বুঝিতে পারি, এবং তাহা হইতে ভাবুকের স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি হয়। ইহা ছাড়াও আর একটা ভাব আছে, তাহা আমাদের 'আনন্দ' উৎপাদন করে। আমরা যেটা কল্পনা করি, তাহাতে আনন্দ না হইলে সে কল্পনায় কষ্ট হয়, এবং যে জ্ঞান দ্বারা সম্পূর্ণ একটা 'আমিত্বে'র ভাব না আসে, সে জ্ঞানও নিরানন্দময় হইয়া পড়ে। এ সকল ভাব স্পন্দনের সংখ্যা দ্বারা, কিংবা দ্বন্দ্ব-ফল দ্বারা যদি কেহ প্রতিপন্ন করিতে চাহে, আমরা তাহা সহজে বিশ্বাস করি না। আমরা বলি, এগুলি অসীম। অতএব দর্শনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমরা

জড়বিজ্ঞানকে সেখানে ছাড়িয়া দিই। যেটুকু লুকানো, সেই শুদ্ধ-চৈতন্যকে সাব্যস্ত করিতে ব্যস্ত হই। তখন বলিয়া থাকি যে, সৎ, চিৎ এবং আনন্দের ভাব সকলের মধ্যে ব্যাপিয়া আছে। কিংবা অন্য কথায় বলিয়া, একটা 'পরাশক্তি' কিংবা 'দৈবপ্রকৃতি'কে দাঁড় করাই। ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি, জ্ঞানশক্তি, মন্ত্র-শক্তি, এবং যত রকম শক্তি আমাদিগের জ্ঞান ও আনন্দের বিধান করে, তাহা-দিগকে দ্বন্দ্বক্ষেত্রে লইয়া আসি।

কেন? সমীকরণের জন্য। তবে এত গুলি শক্তি ও ভাব লইয়া বেশী গোল-মাল না করিয়া সাধারণ ভাষায় এক দিকে 'পুরুষ' এবং অন্য দিকে 'প্রকৃতি' নামক দুইটি কথা দাঁড় করাইলে, আলোচনা সহজ হইয়া পড়ে। যদি আমরা বলি, পুরুষের সচ্চিদানন্দ ভাবটুকু এক দিকে, এবং প্রকৃতির মধ্যে তাহার ক্রমিক বিকাশ অন্য দিকে, তাহা হইলে শক্তির দ্বন্দ্বসংবাদ সম্পূর্ণরূপে না দিয়া, ইহা বলা যাইতে পারে যে, সেই দ্বন্দ্বের মধ্যে আনন্দের আভাস যাহা দ্বারা পাওয়া যায়, সেই স্পন্দনধারার নাম ছন্দ।

কিন্তু ইহা বলিলেই কি ছন্দ বুঝান হইল?

আনন্দ হয় কিসে? বিজ্ঞান হয় ত পুরুষ না মানিতে পারেন। কি রকম ছন্দ হইলে আনন্দের উৎপত্তি হয়, তাহার কোনও তত্ত্ব আছে কি?

এ সমস্যা সর্ব্বাপেক্ষা বিষম। মাত্রাস্পর্শ, বর্ণ, শব্দ, অক্ষর, দেবতা, মন্ত্র, এবং তাহাদের প্রকাশক ঋষি, ইঁহারা সকলে যজ্ঞস্থলে একত্র না হইলে, এ কথা বলা বড় শক্ত।

বিজ্ঞানের প্রথম সৃষ্টি মেরুদণ্ডবিশিষ্ট গোলাকার কীট। গ্রহ উপগ্রহের ন্যায় তাহারাও ঘুরিতে থাকে। ঘুরিয়া ঘুরিয়া নিজের অংশ বাহির করিয়া দেয়। যাহারা বাহির হয়, তাহারাও ঘুরিতে থাকে, এবং কালক্রমে আরও বীজ বাহির হয়। ইহাও দেখিতে একটা বিরাট ছন্দের মত। কিন্তু আমাদের আনন্দ অত দূর পঁহুছায় নাই। যদি আমরা সে ছন্দের আনন্দ উপভোগ করিতে যাই, তবে ষট্‌চক্রের মধ্যে পড়িয়া প্রাণ বাহির হইবার সম্ভাবনা। কেবল অঙ্গভঙ্গীর দিকে লক্ষ্য করিলে প্রথম আনন্দের উচ্ছ্বাস ফড়িংএর মধ্যে দেখা যায়। মাধ্যা-কর্ষণ এক দিকে তাহাকে টানে; সে টক্ করিয়া খানিকটা লম্ফ দ্বারা আনন্দ উপভোগ করিয়া লয়। ঘূর্ণ্যমান কীটের ভাব তখনও তাহার অন্য পোকা মাকড়ের ন্যায় আছে। অগ্নি দেখিলে তাহারা বেষ্টন করিয়া ঘুরে। ভাবিয়া দেখিলে তাহার মধ্যে একটু নূতনত্ব আছে। সে নিজে চেষ্টা করিয়া একটু

লাফাইতে পারে। তাহার নিজের দেহের পরমাণু পূর্ব্বধর্ম্মাবলম্বী, কিন্তু পরমাণুর সমষ্টি ফড়িং মহাশয় নিজের একটা পদ খাড়া করিয়াছে। সেই পদভরে সে বসুন্ধরার মাধ্যাকর্ষণ-গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া দিতে চাহে। পরীক্ষা করিয়া দেখিলে, হয় ত তাহার অনেকগুলি পা আছে, দেখা যাইবে; কিন্তু সেগুলির ব্যবহার করিতে সে প্রথমে নারাজ। এক লাফেই সে দেখাইয়া দেয়, 'আমি পুরুষ'। প্রকৃতির সহিত আমার কিছুই 'সরোকার' নাই।' এই যে ভাবটুকু, তাহা 'একপদী' ছন্দের ভাব। প্রকৃতি তাহার স্বাধীনতা দেখিয়া মুখে কাপড় দিয়া হাসে। খুব খুসি হয়।

ছন্দের মধ্যে ফড়িং বাঁধা পড়িয়াছে। কিন্তু এই একটা লম্ফনের মধ্যেই কি সম্পূর্ণ ছন্দ আমরা দেখিতে পাই? তাই যদি হইবে, তবে সে গোটাকতক লুকানো পা মধ্যে মধ্যে বাহির করিয়া হাঁটিতে চাহে কেন? লম্ফনের মধ্যে যদি সে সম্পূর্ণ আনন্দ পাইত, তবে তাহার হাঁটিবার সাধ হইত না। তাহার লাফেই ইহা বুঝা যায়। একটা প্রকাণ্ড লাফ দিয়া সে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। সাহিত্যের ভাষায় আমরা বলিতে পারি যে, তাহার 'যতি' এত বড় যে, নাই বলিলেও হয়। সে যদি পরে আর একটা লাফ দেয়, তাহা হইলে প্রথম লাফের সঙ্গে তাহার যে বিশেষ কোনও সম্বন্ধ আছে, তাহা বুঝা যায় না। হয় ত প্রথম লাফ ও দ্বিতীয় লাফের মধ্যে, সে পা ফেলিয়া একটু হাঁটিয়া লইতে পারে। তাহার মধ্যে—চেষ্টা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে,—বেশ একটু ছন্দ আছে। এইটুকু তাহার নিজস্ব। 'নিরক্ষর গ্রাম্য কবি' ফড়িংএর জীবনে সেটুকু 'কাব্যে'র অংশ।

ব্যষ্টির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আমরা বিশ্বেও সেই রকম ধারা দেখিতে পাই। এক একটা যুগ লম্ফনের কিংবা আবর্ত্তনের মধ্যে কতকগুলি জীব-সৃষ্টি হইয়া এক একটা কাব্যছন্দের আভাস প্রবর্ত্তিত হয়। সাহিত্যের ভাষায় আমরা বলিতে পারি যে, ছন্দের পদ বাড়ে।

পোকা, মাকড়, পতঙ্গ প্রভৃতির অঙ্গভঙ্গীর তুলনায় পক্ষীর অঙ্গভঙ্গী আরও নূতন রকমের। পক্ষী দ্বিপদ, কিন্তু তাহাদের পক্ষপুটের বিকাশের মধ্যে ঘুরিবার ভাবটা কম, উড়িবার ভাবটা বেশী। পৃথ্বীতত্ত্বের কীটপতঙ্গ যে রকম অঙ্গভঙ্গী দেখায়, জলের মাছ ঠিক সে রকম দেখায় না। পাখীর আকাশের সহিত এবং বায়ুর সহিত বেশী ঘনিষ্ঠ ভাব। সকল তত্ত্ব একত্র করিয়া চতুষ্পদ পশুর আবির্ভাব হয়। অনেক পশু বিলক্ষণ লাফ দিতে পারে, যেমন বানর। অনেকের ল্যাজ আছে,

এই সময় পদগুলি পরীক্ষা করিয়া লইতে পারেন। যতদিন মুখ দিয়া কথা বাহির হয়, ততদিন অঙ্গভঙ্গীই জীব জন্তুর ছন্দ। এই অঙ্গভঙ্গীর মধ্যে পদই আসল মাল মশ্‌লা। চলাফেরা, লম্ফ এবং নৃত্য, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে লাঙ্গুল নাড়া, ইহাদের মধ্যে ভবিষ্যতের মানব-কাব্যচ্ছন্দের আভাস অনেকটা পাওয়া যায়। লাঙ্গুলের জোরে তাহারা যে লম্ফ দেয়, তাহার মধ্যে কল্পনার ভাব পাওয়া যায়। আপনি বলিতে পারেন যে, এটা অহঙ্কারের পরিচয়। কিন্তু 'অহং'কার কি কল্পনাসাপেক্ষ নয়? কোনও অজানা পদে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করার নাম 'অহং'কার। সে পদ কোথায়, ঠিক না জানা থাকিলেও, ন্যায়শাস্ত্রের সাহস কীট পতঙ্গেরও আছে। নিহিত বিবেক কিংবা প্রজ্ঞাবলে সে অন্ধকারে লাফাইতে ভয় করে না। এবং তাহাতে যে আনন্দ হয়, তাহা দ্বারা কর্ম্মের সার্থকতা প্রতিপন্ন হইয়া পড়ে। এক লাঙ্গুলেই, জ্ঞান এবং আনন্দ প্রবাহিত হইয়া তাহাকে সচ্চিদানন্দ ভাবে মত্ত করিয়া তুলে।

এই লাঙ্গুলের সঙ্গে দুই পদের সম্বন্ধ লক্ষ্য করিয়া দেখিলে নৃত্য এবং সাধারণ চলাফেরার তফাৎ বুঝা যাইতে পারে। লাঙ্গুলের ছন্দ একপদী, এবং লম্ফই তাহার ভঙ্গী। কিন্তু কেবল লাঙ্গুল দ্বারা কোনও ছন্দ দাঁড় করান শক্ত। মনে করুন, কেবল প্রণবোচ্চারণ দ্বারা যোগী মুক্ত হইয়া যাইতে পারেন, কিন্তু সাধনা-পথে ইড়া এবং পিঙ্গলা নামক দুইটি পদের সাহায্য তাঁহাকে লইতে হয়। আনন্দ-রস-তরঙ্গের মধ্যে হেলিয়া দুলিয়া নৃত্য কিংবা সন্তরণ করিতে, কিংবা মধ্যে মধ্যে ডুব দিয়া, এবং মধ্যে মধ্যে ভাসিয়া, নানাবিধ ছন্দের দ্বারা জীবজন্ম সার্থক করিতে পদের দরকার। তবে আপনার সন্দেহ হইতে পারে যে, দুই পদে যদি কাজ হয়, তবে বেশী পদের দরকার কি? আমি বলিব যে, যদি একযোড়া প্রেমিক ও প্রেমিকার দ্বারাই সংসার চলে, তবে ছেলে পুলের দরকার কি? এ সব কথার বিচার সৃষ্টির পূর্ব্বেই হইয়া গিয়াছিল। তর্ক করা বৃথা। দুই পদ ভাঙ্গিয়া যদি চারি পদ করি, তাহা হইলে হেলিবার ও দুলিবার একটু বেশী যায়গা পাওয়া যায়। চারি পদকে ছয় পদ কিংবা আট পদ করিলে আরও পাওয়া যায়। আসল সংখ্যা দুই। বিশ্বাস না হয়, আপনি নির্জ্জন একটা ঘরে চারি দিকের কপাট বন্ধ করিয়া, হস্তদ্বয়কে পদে পরিণত করিয়া, চারি পায় হাঁটিয়া দেখুন। আসল চরণের ঝোঁক দুইটি; তাহা অনেকবার বিস্তার করিলে পদ বাড়িয়া পড়ে। ইতর জীবগণের মত মানুষেরও পদবৃদ্ধির প্রাকৃতিক সাধ হয়; কিন্তু ক্রমে সে দেখিতে পায় যে, শেষ পদ লাভ করিবার জন্য দুই পদই খুব সুলভ

উপায়। যদি বিধাতার বিধানে চারি পদ দাঁড়াইয়া গিয়া থাকে, তবে দুইটিকে পদ এবং দুইটাকে হাত বলিলেও চলে।

যদি কোনও বন্ধু কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া আমার কানে কানে বলেন, 'ওহে! ইহার ভিতর দ্বৈতবাদ আছে না কি?' আমিও তাঁহার কানে কানে বলিব, 'ভায়া, অত দূর পঁহুছান শক্ত।' তবে দ্বৈতবাদ এবং অদ্বৈতবাদ একত্র করিয়া দেখিলে একটা আশ্চর্য্য রকম ছন্দ পাওয়া যায়। তাহা 'ত্রিপদী-ছন্দ'।

আমরা পূর্ব্বে যে একপদী ছন্দটাকে উড়াইয়া দিয়াছি, এবং লাঙ্গুলের মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছি, সেটা বড় সোজা জিনিস নয়। তবে, ফড়িংএর দৃষ্টান্তে দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল যে, একটা লাফের মধ্যে কাব্য ভাল করিয়া বুঝা যায় না। কিন্তু অজানা দেশের লাফটাকে একেবারে বাতিল করিয়া দিলে দেখিতে পাইবেন যে, দুই পদে চলাফেরা এবং লাফালাফি হয় সত্য, কিন্তু নৃত্য হয় না। নৃত্য-ছন্দে বেশ ঘুরিবার ভাব আছে। রাস-লীলা, দোল-লীলা প্রভৃতি দেখিলেই বুঝা যায়। আপনি বলিতে পারেন যে, একটা চরণকে কেন্দ্র করিয়া, এবং আর একটাকে ব্যাসের শেষে রাখিয়া বেশ ঘুরিতে পারা যায়। কিন্তু রাখে কে? সেই যে ব্যবধানটুকু, যাহা দুই পদে সীমাবদ্ধ করিয়া বসিয়া আছে, সে যায় কোথায়? এই যে অসাধারণ অদ্বৈত পদ, যাহার দর্পে বলি সসাগরা পৃথ্বী দান করিয়াও নিষ্কৃতি পান নাই, তাহা প্রচ্ছন্নভাবে দুই পদের মধ্যে থাকিয়া যায়। যুগ্মপদের মধ্যে, কিংবা দ্বৈত আনন্দের মধ্যে কোনও নিয়মের ব্যতিক্রম পাইলে সে এমন কষিয়া একটা চড় মারে যে, ছন্দের মাথা ঘুরিয়া যায়। সেই জন্য অনেক দেখিয়া শুনিয়া কবি টেনিসন বলিয়াছেন—'বাবা, আনন্দ করিয়া যাও, কিন্তু নিয়মের মধ্যে থেকো'; নিয়ম (Law) ছাড়া, আনন্দ পাইবে না। পদ ছোট বড় হইয়া যাইবে।

কথাটার মধ্যে সার আছে বলিয়া বোধ হয়। প্রাণায়ামের মধ্যেও নিয়ম আছে। নিয়মিত সাতটা সুরের মান না রক্ষা করিলে সঙ্গীত কোলাহলের মত বোধ হয়। পদ্য গদ্য হইয়া পড়ে। পুরাকালের ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ নিয়মের মধ্যে বসতি করিয়া সর্ব্বদা শান্তি এবং আনন্দ লাভ করিতেন। সেই নিয়মটা যত রাখা যায়, ততই ছন্দোবদ্ধ ললিত এবং মধুর হয়। এটা নৈতিক নিয়ম। কিন্তু সাতের সংখ্যার দিকে ঝুঁকিলেই একটা গোলযোগ বাধে। বিবাহ যে এত বড় একটা আনন্দময় ব্যাপার, তাহাও বেদের মতে সপ্তপদী। বর্ণ সাতটা, সুর সাতটা। এ সব কথার আলোচনা আমাদের [illegible] ভায়ারা প্রায়ই করিয়া

থাকেন, এবং তাহার যদি বৈজ্ঞানিক অর্থ জানিতে হয়, তবে কিছুদিন শিক্ষানবিশী করিতে হয়। সে জঞ্জালের মধ্যে না গিয়া হয় ত আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে, 'সাত' সংখ্যাটীর সহিত আমাদের একটা মধুর সম্পর্ক আছে। কিন্তু এই যে 'সাত', তাহা আমাদের সেই প্রচ্ছন্ন একপদ, প্রত্যেক কোঠায় দুই পদের সঙ্গে মিলিয়া বাহির হইতেছে, সেটাও বুঝিতে পারা যায়। দ্বিপদী ছন্দের মধ্যে সেই এক পদ আসিয়া উহাকে ত্রিপদী করিয়া তুলে। এই ত্রিপদী আবার চতুষ্পদীর মধ্যে গিয়া সপ্তপদী হয়। সঙ্গীত শাস্ত্র বলেন যে, এই সাতটা পদ যেন সাতটা 'মাত্রা', এবং ইহাই লইয়া স্বাভাবিক 'তাল'। অন্য সমস্ত কেবল 'মান' (measure) মাত্র। শুনা গিয়াছে, আমাদের হৃদয়ের শোণিতও নাকি (Systole and diastole) এই নিয়মের পক্ষপাতী।

সপ্তপদী ছন্দ পূর্ণছন্দ কি না, সে কথা লইয়া বৃথা সময় নষ্ট করিবার দরকার নাই। এই কথাটুকু মনে রাখিলেই হইবে যে, নৃত্য এবং সঙ্গীতে ইহা অতিশয় আনন্দবিধান করে। কাব্যে ইহা আনন্দবিধান করে কি না, পরে চেষ্টা করিয়া দেখিলেই হইবে। অসভ্য সাঁওতালদিগের নৃত্য-সঙ্গীতাদির মধ্যেও এই 'সাতে'র ঝোঁক খুব বেশী। কিন্তু এই সপ্তপদী ছন্দ, সুধাভাণ্ড সপ্তকাণ্ড রামায়ণের শেষ কাণ্ড। অরণ্য, কিষ্কিন্ধ্যা, কিংবা লঙ্কাকাণ্ডেও ইহার সম্পূর্ণ ভাব পাওয়া যায় না।

পাঞ্চভৌতিক পরমাণুর মাত্রা এবং তাহাদের স্পর্শে আনন্দসঞ্চার; সেই আনন্দের সাংযৌগিক সংখ্যা যদি কেহ বিশেষ করিয়া অনুসন্ধান করেন, তবে বেদ এবং তন্ত্রে পাইবেন। ছন্দের মূলে কি আছে, তাহা ঋষিগণ নিশ্চয় জানিতেন; নচেৎ সেটা বেদের একটা অঙ্গ হইত না। শুক্লযজুর্ব্বেদসংহিতা পৃথিব্যাদি সর্ব্ব পদার্থকেই 'ছন্দঃ' বলিয়াছেন। ঋগ্বেদের মতে, প্রজাপতি হইতে সকল ছন্দের আবির্ভাব। গায়ত্রী ছন্দে অগ্নির বিকাশ, উষ্ণিক্ ছন্দে সবিতার বিকাশ, অনুষ্টুভ ছন্দে সোমের, বৃহতী ছন্দে বৃহস্পতির, এবং বিরাট ছন্দে মিত্রাবরুণের। পঙ্‌ক্তি, ত্রিষ্টুভ্ ও জগতী লইয়া বিরাট্ ছন্দ। মোটের মাথায় বৈদিক তন্ত্রে সাতটা ছন্দ। এবং প্রত্যেকের আবার আর্ষ, দৈব, আসুর, প্রাজাপত্য, যাজুষ্, সাম, আর্চ্চ ও ব্রাহ্ম প্রভৃতি অষ্টরূপের উল্লেখ দেখা যায়। সপ্তছন্দের অনুপাত ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭।

মাত্রাস্পর্শে কি করিয়া আনন্দসঞ্চার হয়, তাহা সুরজ্ঞ গায়ক কতকটা বুঝিতে পারেন। "সা, রি, গ, ম, প, ধ, নি, প্রত্যেক সুরের স্পন্দন, মাত্রা

আলাদা। সেগুলিকে নানা ভঙ্গীতে বিন্যাস করিয়া আমরা আনন্দ লাভ করি। যদিও এই সুরের সম্পূর্ণ ব্যবধান সপ্তপদী, কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, ইহার মধ্যেও আসলে তিনটী পদ। সা, রি এবং গ। ম কেবল অর্দ্ধ মাত্রায় বিশ্রাম স্থান, যতির কাজ করে। প ধ নি এই তিনটি পদ সা, রি, ও গ র সংবাদী। সোজা কথায় 'সা'র সহিত প, 'রি'র সহিত ধ, 'গ'র সহিত নি মিশ্‌ খায়। 'কর্ড' দিয়া তাহা দেখিতে পারেন। কিন্তু আমরা কোনও সুরের সঙ্গে আর একটা মিশাইয়া ঐ সাতটার মধ্যে কোনোটা বিশুদ্ধরূপে খাড়া করিতে পারি না। স ও গ মিশাইয়া রি হয় না। প ও গ মিশাইয়া ম খাড়া করা যায় না। মিশাইলে একটা নূতন ছন্দ হয়, এবং সেই ছন্দের মধ্যে সব কয়টা সুরেরই 'রেশ' পাওয়া যায়। 'রেশ'কে আপনি 'রস' বলিতে পারেন। একটা তান্‌পুরা লইয়া ঝঙ্কার করিয়া দেখুন। 'স' এবং 'প', এই তার দুইটি ক্রমাগত আঘাত করিলে আপনি তাহার ভিতর দিয়া গান্ধার, কিংবা নিষাদ, কিংবা রিখবের রস পাইবেন।

সেই রকম পীত এবং লোহিত মিশাইয়া আপনি কমলালেবুর রস পাইতে পারেন। নীল এবং লোহিত মিশাইয়া বেগুনের রস নিশ্চয় লাভ করিবেন। কাব্যেও এই রকম রস ফেনাইয়া তোলা যায়। এই কৌশলে আমরা আনারস হাতে পাইলেও, ইথর ও ক্লোরিন মিশাইয়া সন্দেশের মধ্যে সেই রকম গন্ধ করিয়া দিতে পারি।

এতক্ষণ আমরা নিরক্ষর নির্ব্বাক্ জীবের আনন্দ লইয়া তাহাদের অঙ্গভঙ্গী-তত্ত্বের দিকে তাকাইয়াছি। কিন্তু জৈবস্তরে এমন সময় আসে যে, সেই অঙ্গভঙ্গীর মধ্যে 'কথা'র বিকাশ হয়।

ছন্দের যদি কোনও তন্ত্র থাকে, এবং তাহার মধ্যে যদি আবার কথা জুটিয়া যায়, তবে অত্যন্ত বিপজ্জনক হইয়া পড়ে। বিপদের প্রধান কারণ 'রসনা'। জিহ্বা দ্বারা আমরা কথাও কহি, রসও গ্রহণ করি।

আপনি জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, যদি মানব মূক হইয়া থাকিত (কোনও জৈব স্তরে তাহা নাকি ছিল) তবে কি জগতে রসের সম্পূর্ণ সঞ্চার হইত না? আমি বলি যে, তাহা হওয়া অসম্ভব। কেবল অঙ্গভঙ্গীর ছাঁদে বিশ্বের সমস্তটুকু দেখান যায় না।

যখন কোনও রামছাগল লাঙ্গূল নাড়ে, তখন বিজ্ঞানের অধ্যাপক মনে করিতে পারেন যে, সে আনন্দ প্রকাশ করে। কিন্তু কোনও বেদান্তবাগীশ থাকিলে বলিয়া

দিতে পারেন যে, সময় পাইলে সে লাঙ্গুল নাড়িয়া 'নেতি, নেতি' ভাবও প্রকাশ করিয়া থাকে।

অঙ্গভঙ্গী দ্বারা যত দূর সম্ভব, মূক চতুষ্পদ তাহার ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। কিন্তু যে সব ভাব রক্ত মাংসে গড়ায় না, কেবল স্নায়ু বাহিয়া কোনও অজ্ঞাত, অসীম, অদৃশ্য রাজ্যে গিয়া তাহার খবর লইয়া আসে, সে স্থলে অঙ্গভঙ্গী ও নৃত্যাদি, এমন কি, সঙ্গীত বিফল। 'ট্রান্‌স্সেন্‌ডেন্‌টালিজম্‌', 'আইডিয়ালিজম্‌', মিস্‌টিসিজম্‌' এবং যত প্রকার পাশ্চাত্য 'ইজ্‌ম্‌' আছে, ইহার সাধনা কি রকম, তাহা মধ্যে মধ্যে 'নাটের গুরু' কবি আসিয়া বলিয়া দেন। কবি যদি যোগী পুরুষের ন্যায় ধ্যানস্থ হইয়া বসেন, কিংবা বৈষ্ণবদিগের মত সেবা সংকীর্ত্তনে মন দেন, তবে আমরা বলি, 'লোকটা ভণ্ড'। কাজেই কবি বেচারা- কথা চুনিয়া, সুধা ছানিয়া, ছন্দ-কলা মথিয়া, পিণ্ডের মত এমন একটা কিছু করিয়া দিতে বাধ্য, যাহা আমাদের (সমালোচকের এবং প্রবন্ধলেখকের) শ্রাদ্ধে শাস্ত্রমতে ব্যবহৃত হইতে পারে। এই জন্য শাস্ত্র বলেন যে, অশরীরী দেবতাগণ 'বাকে'র মধ্যে প্রকাশ পাইয়া থাকেন।

কথা জিনিসটা অন্তরের। এই যে 'বাক্‌,' তাহা বাহিরে আসে কেন? আপনার গৃহের মধ্যে যদি ভূমিকম্প হয়, কিংবা বাহিরে যদি এক জন নর্ত্তকী আসিয়া নৃত্য গীত জুড়িয়া দেয়, কিংবা অভিনব ছন্দে কিছু হইতে থাকে, তবে আপনি ছুটিয়া বাহিরে আসেন কেন? শারীরিক ছন্দ প্রকটিত হইলে ভাষ্যকার স্বভাবতঃই স্বর ও ব্যঞ্জন লইয়া আসরে নামে। স্বরবর্ণ তাহার মাত্রা দিবার যন্ত্র, জড়ে আঘাত করিয়া সে ব্যঞ্জনবর্ণের ধ্বনি সৃষ্টি করে। বাহিরের ছন্দের সহিত অন্তরের ছন্দ মিলিয়া এই যে একটা নূতন ব্যাপারের উৎপত্তি হয়, তাহা অনেকটা বাদ্যযন্ত্রের 'বোলে'র মত। সাধারণ ভাষায় আমরা তাহাকে 'বুলি' বা 'কথা' বলি। সংস্কৃত ভাষায় তাহাকে অক্ষর বলিতে পারেন। এই মহাযজ্ঞের মধ্যে প্রাণের দেবতাবর্গের সঞ্চার দেখিয়া বৈদিক যুগের ঋষিগণ বিস্মিতমুখে স্তুতি করিয়াছিলেন। এক একটা অক্ষরের মাত্রা নির্ণয় করিয়া মাত্রা রচনা করিয়াছিলেন। এক একটা মন্ত্রের ছন্দ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। মন্ত্রপাঠ এবং মাত্রা দিবার যন্ত্রগুলি যৌবনের উদ্গমেই হৃৎপিণ্ড হইতে কোথায় সরিয়া পড়িয়াছে, তাহা খুঁজিয়া বাহির করিবার সাধ্য আমাদের নাই।

যে যুগের ছন্দের মধ্যে মন্ত্র-রচনার কর্ম্ম সাধিত হইয়াছিল, তাহার পরেও একটা রসের যুগ চলিয়া গিয়াছে। আবার একটা নূতন জাতি আসিয়াছে। ইহারা কেবল বিশ্লেষণে ব্যস্ত। এই সব ক্রমিক বিপ্লবে কথার মধ্যে বর্ণসঙ্করত্ব

এত প্রগাঢ় হইয়া গিয়াছে যে, কথাকে 'অক্ষর', এবং কোনও রচনাকে 'মন্ত্র' বলা যাইতে পারে না। এখনকার বুলির বার আনা প্রাকৃতিক, চারি আনা ধ্বন্যাত্মক। ঝোঁক, টান, এবং মাত্রার কূল কিনারা নাই। উচ্চারণ যাহার যেমন খুসি। কোন্ কথার কি অর্থ, তাহা অভিধানে দেখিতে হয়। আদিম ভাষা ভাঙ্গিয়া সহস্র ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে। একই শাশ্বত সনাতন বিশ্বগুরু পরমেশ্বরের এত অর্থ হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহা বুঝাইতে গিয়া দত্তজ মহাশয় ঘর্ম্মাক্তকলেবর হইয়াছেন। কালের বশে এ সকল হইয়া থাকে, অতএব আমরা হাল ছাড়িয়া দিতে পারি না। নূতন ঘর বাঁধিয়া নূতন সৃষ্টি করি।

এ যুগের কথাগুলিকে তিন ভাগ করিয়া ফেলিলে, কতগুলি জ্ঞানের দিকে যায়, কতগুলি ভক্তি কিংবা আনন্দরসের দিকে যায়, এবং কতগুলি কর্ম্মের দিকে যায়, তাহা অভিধানকর্ত্তার দ্রষ্টব্য। কথাগুলি এত মিশিয়া গিয়াছে যে, নিরুক্ত, ছন্দ, এবং ব্যাকরণ স্তম্ভিত হইয়া পড়েন। পাণিনি এবং পতঞ্জলি মূর্চ্ছিত হইয়া যাইবেন, সশিষ্য জৈমিনি ঠাকুর ব্রহ্মাবর্ত্ত ছাড়িয়া তিব্বত দেশে পলাইবেন। মাত্রা দূরে থাকুক, ব্যঞ্জনবর্ণ পর্য্যন্ত স্বরের মধ্যে ক্রমশঃ প্রবেশ করিতেছে। এমত স্থলে মাত্রার খাতিরে যত দূর হাত পা ছুঁড়িয়া আমরা ছন্দ নির্ণয় করিতে পারি, তাহারই মধ্যে অক্ষরগুলাকে বসাইয়া রসের অবতারণা ভিন্ন আর অন্য কোনও উপায় নাই। যেখানে অক্ষর আর জুটিয়া উঠে না, কিংবা ভাবিতে গেলে ভাব গলিয়া যায়, সেখানে জমাট বাঁধিবার উদ্দেশ্যে একটা নীরব মাত্রা রাখিয়া দিলেই যথেষ্ট। ইহা লইয়া পরস্পরকে গালি দিলে যুগধর্ম্মের অবমাননা করা হয়। বৈজ্ঞানিক যুগে সম্যক্‌রূপে রসের প্রচারের আশা করা মূর্খতা। অদ্বৈত জ্ঞান জ্বলন্ত চক্ষু লইয়া চাহিতেছে। কোনও ছন্দের মধ্যে কাব্যকথা বাঁধিতে বসিলেই বিজ্ঞান আসিয়া মাত্রাগুলিকে দগ্ধ করিয়া দেয়। আমার হৃদয়ের ভাবটা কি, তাহা বলিতে গিয়া আমরা কাব্যের মধ্যে তাহার দার্শনিক অর্থের সঞ্চার করিয়া দিই। খুব বড় বড় কবিরাও কাব্যের মধ্যে পুরুষ প্রকৃতির অর্থ, প্রেমের অর্থ, ধর্ম্মের অর্থ, বিজ্ঞানের ভাষায় বুঝাইবার মধ্যে মধ্যে প্রয়াস পাইয়াছেন। বেশীর ভাগ লোক এটা ভালবাসে। কিন্তু কতকগুলি লোক, যাহারা পুরাণো ছন্দে গঠিত, তাহারা এই নবীন ছন্দের মধ্যে কোনও অর্থ না পাইয়া মেজাজ গরম করিয়া তুলে। তাহারা ভক্তের বাঞ্ছাকল্পতরুকে দেখিতে চায়। কিন্তু বাঞ্ছা-কল্পতরু যে স্বয়ং একটা বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়া সমগ্র জগৎকে নূতন ছাঁচে ঢালিতেছেন, তাহা দেখিলেই বুঝা যায়।

এমন একটা সুন্দর কথা ‘প্রাণনাথ’, ‘জীবননাথ’, তাহারই কত তারতম্য হইয়া গিয়াছে, ভাবিয়া দেখুন। উৎকলের ‘প্রাঁড়নাথঅ’, বাঙ্গালার ‘প্রিয়তম্’, এবং বেহারের ‘সেঁইয়া’ একই শ্রেণীর (Genus) জিনিস; কিন্তু কথার উচ্চারণ-টার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে হঠাৎ বোধ হইতে পারে যে, উহারা খণ্ডশ্রেণীর (Species) অন্তর্গত।

এই রকমে অক্ষর, মাত্রা ও যতি প্রভৃতির গোলমাল হওয়াতে আমরা খ্যাতনামা কবিদিগের অনর্থক লাঞ্ছনা করিয়া মূর্খতার পরিচয় দিয়া থাকি। পুরাকালের ‘অক্ষর’ বিশুদ্ধাবস্থা হারাইয়া প্রাকৃতিক বুলির সঙ্গে মিশিয়া যায়। কাজেই আক্ষরমাত্রিক ছন্দের বিকার ঘটে। কিন্তু যদি ছন্দের অঙ্গসৌন্দর্য্যটুকু আমাদের মনে থাকে, এবং তাহার সঙ্গে হেলিয়া দুলিয়া বুলি বিন্যাস করিতে পারি, তবে সৌন্দর্য্য নষ্ট হইবার কোনও কারণ নাই। মা যদি শিশুকে কোলে করিয়া দুলিয়া দুলিয়া গান করে, এবং নিরক্ষর শিশু যদি তাহার সঙ্গে সঙ্গে আবোল তাবোল বকে, তবুও সেটা কেমন সুন্দর শুনায়!

উদাহরণস্থলে সঙ্গীতের একটা চতুর্দ্দশমাত্রিক তাল লইয়া দেখুন। ধামার তাল এই রকম একটা তাল। খুব ‘খট্‌মটে’, কিন্তু তন্ত্রের মতে ইহাই বিশ্বে সকলের চেয়ে সম্পূর্ণ, এবং স্বাভাবিক তাল। পুরুষ প্রকৃতিকে এই তালে আলিঙ্গন করেন। মহাদ্বন্দ্ব, রাগ, মান, অভিমান, সকলই এই তালে ঘুচিয়া যায়। ত্রৈমাত্রিক ছন্দ, চাতুর্মাত্রিক ছন্দের সহিত মিশিয়া সুন্দর ভাবে অগ্রসর হয়। সে গতির মধ্যে বিশ্রামের দরকার হয় না। গদ্যও পদ্য বলিয়া বোধ হয়।

তালের বোল্	ক ধে টে।	ধে টে ধা আ।	গ দে ন	দে ন তা আ।
কথা—(১)	পা খী স।	ব ক রে র॥	ব রা তি।	পো হা ই ল॥
(২)	পা খী ই।	স অ ব অ॥	ক রে এ।	র অ ব অ॥
(৩)	বি হ গ।	ক রে র ব॥	র জ নী।	পো হা ই ল॥
(৪)	ধী ই র।	স মী ই রে॥	য মু না।	আ তী ই রে।

ধামারের তালের মধ্যে যত দিলে এবং সমভাগে সপ্তমাত্রায় বিভক্ত করিলে দুইটি পদ পাওয়া যায়। তাহার একটি পদ ‘তেওরা’ বলিয়া বিখ্যাত। যেমন ‘বিহগ করে রব’। কিন্তু এই একটি পদের মধ্যেও গোলমাল। উহার সাতটি মাত্রা। এখন আপনাকে দেখিতে হইবে যে, মাত্রা গণিয়া আপনি নিজের চরণযুগল ভূমির উপর ফেলিতে পারেন কি না। সাত গণিয়া একটা পদ ফেলিয়া, আবার সাত গণিয়া দ্বিতীয় পদ ফেলিলে, কোনও বাহাদুরী নাই। সে হিসাবে এক একটা লাইনকেও এক একটা পদ বলিয়া কেহ কেহ মনে করিয়া থাকে। কিন্তু যাহারা

নৃত্যবিশারদ, তাহারা সাত মাত্রার মধ্যে দুইবার পা ফেলিয়া চলিতে চাহিবে। সাতকে ভাগ করিলে সার্দ্ধ তিন হয়। সাড়ে তিন মাত্রা গণিয়া যদি চলিয়া যান, তবে কথার ভাগ কি করিয়া হইবে? কোনও গজেন্দ্রগামিনী হেলিয়া দুলিয়া, অর্দ্ধ মাত্রাকে অঙ্গভঙ্গীর মধ্যে প্রকাশ করিয়া, ছন্দকে সুন্দরভাবে দেখাইতে পারেন, কিন্তু কাব্যবিশারদের উপায় কি?

হেলিয়া দুলিয়া যদি 'গহন-কুসুম-কুঞ্জ-মাঝে' চলিয়া যাই, তবে কেহ বলিবেন, 'এটা ত ত্রিপদী, মোটে দ্বাদশ মাত্রা, তোমার চতুর্দ্দশ ভুবন কোথায় গেল?' যদি 'পাখী সব, করে রব, রাতি পোহাইল' এই রকম করিয়া ছন্দ বাঁধি, তবে কেহ হয় ত বলিবেন, 'এটা ত চারিমাত্রার এক একটা চরণ, শেষে দুইটি মাত্রা বিশ্রামের জন্য কিংবা শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য নীরব রাখিয়া দিয়াছ।' যদি নম্বর (১) একের মত করিয়া ভাগ করি, তবে পাখীর সঙ্গে 'স' জুটিয়া যায়, এবং 'ব' গিয়া 'ক'এর সঙ্গে জুটিয়া 'বক' হইয়া যায়। যাঁহারা সঙ্গীতবিশারদ, তাঁহারা অক্ষর এবং মাত্রার যত দূর সামঞ্জস্য সম্ভব, তাহা করিয়া নম্বর (২)এর প্রণালী অবলম্বন করিবেন। যদি কোনও চালাক কবি থাকেন, তবে নম্বর (৩)এর মতন কথা বদলাইয়া অন্ধের যষ্টিস্বরূপ শব্দকে অবলম্বন করিতে পারেন। এক জন যদি চৌমাথায় ধামারের মাত্রা অবলম্বন করিয়া নৃত্য করে, তবে মুদীর দোকানের পয়ারছন্দপ্রিয় দাদা রামধন বলিবে, 'এ লোকটা মাতাল'। অথচ শাস্ত্র বলিতেছেন যে, সপ্তমাত্রা ভাগ করিয়া চলাই ছন্দের সম্পূর্ণতা।

পুরুষের তিন মাত্রা, এবং প্রকৃতির চারি মাত্রা, এই দুইটি বিবাদী চরণ একত্র মিশিয়া কি রকম ছন্দের উৎপত্তি হয়, তাহা গণিয়া বলা যায় না। যাঁহারা ভাবের মধ্যে রস দেখেন, তাঁহাদের নিকট কথা আপনিই ছন্দের মধ্যে বাঁধা পড়ে। কথার মাত্রা গণিয়া মাথা দোলানো একটা পাপের ভোগ। দুলিয়া কথা কহিলেই ছন্দের গৌরব থাকে।

বড় বড় কবিরা তাহাই করেন। উদাহরণস্বরূপ একটা কবিতা লউন।—

উড়ে কুন্তল উড়ে অঞ্চল,
উড়ে বনমালা বায়ু-চঞ্চল,
বাজে কঙ্কণ বাজে কিঙ্কিণী
মত্ত বোল!
দে দোল্ দোল্।
('মরণ' নামক কবিতা—রবীন্দ্রনাথের)

যদি সমালোচকমণ্ডলী অক্ষরের মাত্রা গণিতে বসিয়া যান্‌, তবে কুন্তলও উড়িবে না, বনমালা শুকাইয়া ঝরিয়া যাইবে, কঙ্কণের নিক্কণ ঢন্‌ ঢন্‌ করিয়া বাজিবে, রাত্রি দ্বিপ্রহর হইয়া যাইবে, শেষে প্রেমিকা চটিয়া বলিবেন, 'এরা সর্ব্বনেশে দস্যি, আমার কুন্তল এবং অঞ্চলের উড়িবার এবং দুলিবার মাত্রা গণিতে বসিয়াছে, এদের গলা টিপিয়া ঘরের বাহির করিয়া দে'।

যাহারা গুণী, তাহারা কবির ভাবটা আগে দেখে। এই 'মরণ' কাব্যটুকুর মধ্যে কি ভয়ঙ্কর ছন্দোমাধুর্য্য প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়াছে, যাহারা মরণভীতির মধ্যে প্রাণদেবতার মাধুরী দেখিতে পায়, তাহারাই তাহা বুঝিতে পারিবে। আমরা কেবল্‌ মাত্রা গণিয়া রাত্রি কাটাইব।

কথার ঝোঁকেও তাই। যাহার যেমন সঞ্চিত সংস্কার, সে তাহারই বশবর্ত্তী হইয়া অক্ষরের উপর ঝোঁক দেয়। ইহাতে ছন্দ খণ্ড হইয়া ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ে। আমরা ইংরাজী ভাষার 'সিলেব্‌ল'এর উপর এমন একটা ঝোঁক (accent) মধ্যে মধ্যে দিয়া ফেলি যে, 'বোধ হয় এক জন পঞ্জাবী পালওয়ান বাঙ্গালা কথা কহিতেছে। কিন্তু যদি কেহ ভাবের সঙ্গে কহে, 'এ মেইয়া! দু মুঠ্যি চাউল দিতে পাচ্ছেন?' তাহার উপর কেমন একটা মায়া হয়। আবার যদি হেদুয়ার ধারের কোনও পেশাদার ভিক্ষুক বাজখাঁই গলা ছাড়িয়া অভ্যস্ত দৈনিক কড়া ডাক ছাড়িয়া বলে, 'মা গো! দুটি ভিক্ষা দিয়া যাও', তবে পকেটে হাত দিতে প্রবৃত্তি হয় না। ভাব না থাকিলে পদ্য পড়া গদ্যের মত হয়।

এতগুলা যে বাজে বকা গেল, তাহাতে ছন্দোবিজ্ঞান বুঝাইবার কোনই উদ্দেশ্য নাই। যাঁহারা বিজ্ঞানের ভিতর দিয়া কাব্য এবং সঙ্গীতের চর্চ্চা করেন, তাঁহারা সময়ে সময়ে অত্যন্ত কষ্ট দেন; সে জন্য যৎকিঞ্চিৎ শোক প্রকাশ করাই আমাদিগের উদ্দেশ্য। দেখিতে পাই, ভোর বেলা ছেলেপুলেরা কথার মাথায় 'নোটেশন্‌' দিয়া এমন একটা বিকৃত ধারায় গান শেখে যে, বোধ হয় যেন জলের মধ্যে রাসায়নিক H_2O বাহির করিতেছে। কাব্যের মধ্যেও রসের ঘোর বিশ্লেষণ-তৎপরতা দেখা যায়। আমাদের স্মরণ আছে যে, এটা বৈজ্ঞানিক যুগ, এবং ইহাও স্মরণ আছে যে, গণ্ডির মধ্যে না গেলে কোনও শাস্ত্রই শেখা যায় না। কিন্তু যদি পাপিয়ার পিউ রব মাত্রায় গণিয়া এবং গ্রামোফোনে তাহা বাহির করিয়া বিরহিণীর সম্মুখে ধরেন, তবে বিরহের কিস্তি সেখানেই মাৎ! সরলতা, পবিত্রতা আমাদের দেশে ঘুচিয়া গিয়াছে। মর্ম্মও নাই, তাহার ব্যথাও নাই। যাঁহার সিংহাসনের সম্মুখে বসিয়া স্নেহবদ্ধ এবং প্রেমাকুলচিত্ত সন্তানের ন্যায় পূর্ব্বযুগের

ঋষিগণ সঙ্গীত ও কাব্যের অপূর্ব্ব বাণী প্রচার করিয়াছিলেন, সে সিংহাসনের দিকে আমাদের দৃক্‌পাতই নাই। আমরা অতীতের কাহিনী কহিয়া থাকি, কিন্তু সেটা নিজের বিদ্যাপ্রকাশের জন্য। কেবল বুঝিয়া গেলে কি ছাই হইল। যেখানে বুঝিতে পারি, সেখানে সৌন্দর্য্যের ধ্বংস হইয়া কেবল দগ্ধ কাষ্ঠখণ্ড থাকিয়া যায়। কিন্তু দগ্ধ কাষ্ঠগুলিকেও যদি ভাবে জড়াইয়া আবার মনের মতন করিয়া সাজাইতে পারি, তবে তাহারও মধ্যে সৌন্দর্য্য ফিরিয়া আসে। অট্টালিকায় থাকিয়াও আমরা গ্রাম্য কুটীরগুলি দেখিবার জন্য পয়সা খরচ করিয়া যাই, তৃণশয্যা ভালবাসি, নিরক্ষর গ্রাম্যকবির পুরাতন কথাগুলি লইয়া বহিতে ছাপাই। কেন? এ সব খাঁটী জিনিস, ইহাদের মধ্যে আপনার করিয়া লইবার একটা ধারা আছে, সেই ধারা ও ছন্দের মধ্যে রস্‌কিন্‌ প্রভৃতি মনীষিগণ যথার্থ সৌন্দর্য্য দেখিয়াছিলেন।

বোসন।

বেসিন পর্ত্তুগীজদিগের নগর। বোম্বাই হইতে ৩৪ মাইল। দুই শতাব্দীরও অধিক কাল ইহা ভারতবর্ষের একটি প্রধান য়ুরোপীয় উপনিবেশ ছিল। সেই সময় ইহার সমৃদ্ধি এত দূর বাড়িয়া উঠিয়াছিল যে, দেশদেশান্তর হইতে সমাগত জনমণ্ডলীর কোলাহলে ইহার রাজপথ, সরাই, বাজার সতত মুখরিত হইত। বহু সুদৃশ্য সৌধমালা নগরী অলঙ্কৃত করিয়াছিল। ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে, তিন মাস কাল অবরোধের পর, মহারাষ্ট্রেরা পর্ত্তুগীজশক্তি চূর্ণ করিয়া ফেলে। তদবধি বেসিন গৌরব-সমৃদ্ধি হারাইয়া বিজন পল্লীতে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্ব গৌরবের মহিম-চিহ্ন ইহার বক্ষ হইতে এখনও বিলুপ্ত হয় নাই।

অনেক বাঙ্গালী বোম্বাই-ভ্রমণে আসেন, কিন্তু বেসিন দেখিতে গিয়াছেন কয় জন? অধিকাংশই দেখিতে পাই, প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া, বিদেশে আসিয়া, আমোদ প্রমোদেই কালক্ষেপ করিয়া চলিয়া যান; সহরের দুই চারিটি বিখ্যাত স্থানমাত্র দেখিয়াই ভ্রমণের পর্য্যবসান করেন।

১১ই ফেব্রুয়ারী ১৯১৭।—মধ্যাহ্নভোজন সম্পন্ন করিয়া, বোম্বাইএর গ্রাণ্ট রোড রেলওয়ে-ষ্টেশন হইতে দুইটার ট্রেণে বেসিন দেখিতে যাত্রা করিলাম। পথের সেই বিচিত্র শোভা—সেই তাল নারিকেল খর্জ্জুরের শ্রেণী—সেই নীল

পীত হরিত পাহাড়-শ্রেণী। কিন্তু এই সকল পাহাড়ের উপরে, নীচে—মধ্যে, মধ্যে ছোট, বড়, মাঝারি রকমের গির্জ্জা দৃষ্ট হইতে লাগিল। কোনও কোনও গির্জ্জার উপরে ঘণ্টা ও তদুপরি ক্রুশ (Cross) রহিয়াছে। কিন্তু সব গির্জ্জার উপরই ক্রুশ আছে।

পর্ত্তুগীজরা এই প্রদেশের সকল শ্রেণীর অনেক লোককে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিল। সেই জন্য এই অঞ্চলের বহু নরনারী খ্রীষ্টান হইয়াছে। বিস্তর মেটে ফিরিঙ্গী হইয়া গিয়াছে। অনেক মহারাষ্ট্র নরনারী খ্রীষ্টান। পোষাক পরিচ্ছদের বাহার বড়ই বিচিত্র। পুরুষগণের অনেকের দেশীয় ফিরিঙ্গীর পোষাক—স্ত্রীলোকেরা মহারাষ্ট্র পোষাকের কতকটা রাখিয়াছে, কতকটা বদ্‌লাইয়া ফেলিয়াছে; তাহারা কচ্ছ (কাছা) ত্যাগ করিয়াছে—দুগ্ধধবল শ্বেতবস্ত্রে মস্তক আবৃত করিয়া, সাধারণ পোষাকের উপর শ্বেতবস্ত্রের ঘেরাটোপ দিয়া অঙ্গ মুড়িয়া রাখিয়াছে। বর্ণিত পোষাকপরিহিত অনেক নরনারী ট্রেণে আমার সহযাত্রী ছিল। ইহাদের মধ্যে অনেকে ইংরেজী ও হিন্দী ভাষায় কথা কহিয়া থাকে। ইহাদের কথার ভঙ্গী বড়ই বিচিত্র। আমি উহাদের কথা শুনিবার জন্য একটি গির্জ্জা দেখাইয়া এক ব্যক্তিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ওটা কি?' সে উত্তর করিল, 'হাম লোক্‌কা দেউল'। খানিক পরে আর একটি স্ত্রীলোককে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'উঠো কেয়া হ্যায়?' সে বলিল, 'দেউল হ্যায়।' আমি বলিলাম, 'উস্‌মে কা হোতা?' সে এ কথায় হাসিয়া উঠিল; পরে বলিল, 'তোম্ জান্‌তা নেহি? উস্‌মে পূজা হোতা!'

আমার পার্শ্বে একটি শুভ্রবস্ত্রবিমণ্ডিত যুবতী বসিয়াছিল; সেও খ্রীষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বিনী—জাতিতে মহারাষ্ট্র বলিয়া বোধ হইল। তাহার অঙ্কে একটি অতি সুন্দর শিশু। শিশুটি ঠিক যেন ইংরেজ, বর্ণ শঙ্খশুভ্র, মস্তকে স্বর্ণোজ্জ্বল কোঁকড়ান্ চুল। আমি শিশুটির সৌন্দর্য্য দেখিয়া মোহিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এ কিস্‌কো লেড়্‌কা হ্যায়?' যুবতী একটু উত্তেজিতস্বরে বলিল, 'এ হামারা লেড়কা হ্যায়, আউর কিস্‌কো হোগা?' আমি তাহার উত্তরে বিশেষ অপ্রতিভ হইয়াছিলাম! যুবতী ভাবিয়াছিল, অমন সুন্দর শিশুকে আমি তাহার পুত্র বলিয়া বিশ্বাস করি নাই। সে ঠিকই ভাবিয়াছিল। কারণ, আমি প্রথমে তাহাকে কোনও সাহেবের 'আয়া' মনে করিয়াছিলাম। কি ভ্রম! পার্শ্বেই ট্রেণের গবাক্ষে ঠেস দিয়া তাহার ফিরিঙ্গী পতি পাইপ টানিয়া ধূম ছাড়িতেছিল।

ট্রেণ ক্রমে অনেকগুলি ষ্টেশন পার হইয়া ভায়াণ্ডার (Bhayuder) নামক

ষ্টেশনে উপস্থিত হইল। ভায়াণ্ডারের পার্শ্বেই সমুদ্রের খাড়ি। অমিত জলরাশি প্রখরপবনে তরঙ্গায়িত হইতেছে। দূরে বেসিনের অভ্রভেদী গির্জ্জার চূড়া সৌরকরদীপ্ত উজ্জ্বল নীলাকাশ চুম্বন করিতেছে। বেসিন দুর্গের ভগ্ন-প্রাকার সমুদ্রবারি কর্ত্তৃক বিধৌত হইতেছে।

সমুদ্রবক্ষে পাল তুলিয়া নৌকা চলিতেছে। আমাকে ট্রেণে এক জন ভদ্রলোক বলিলেন, 'আপনি ভায়াণ্ডার হইতে নৌকাযোগে বেসিন দেখিতে গমন করুন। অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই দুর্গতলে পঁহুছিবেন। দেখুন, অনুকূল পবনে তরী কিরূপ দ্রুত চলিতেছে। মহাশয়! আপনি ভায়াণ্ডারেই অবতরণ করুন।' আমার কিন্তু অগাধ সমুদ্রনীরে ক্ষুদ্র নৌকায় গমন করিতে তখন সাহস হইল না।

প্রায় চারিটার সময় বেসিন রোড ষ্টেসনে ট্রেণ পঁহুছিল। আমিও চুরুট টানিতে টানিতে নামিয়া পড়িলাম।

বেসিনের বিরাট্ ধ্বংসাবশেষ ষ্টেশন হইতে প্রায় পাঁচ মাইল হইবে। ষ্টেশনের পূর্ব্ব দিকে গম্ভীর তুঙ্গ পাহাড়শ্রেণী। সূর্য্যকিরণে উদ্ভাসিত হইতেছে। আর কালবিলম্ব উচিত নহে ভাবিয়া, দেড় টাকায় যাতায়াতের একখানি টাঙ্গা ভাড়া করিয়া, দুইটি কমলালেবু পকেটে পুরিয়া, বেসিনের অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

চলিতে চলিতে পথিমধ্যে স্থানে স্থানে গির্জ্জা দৃষ্ট হইতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে ধান্যক্ষেত্রে পর্ত্তুগীজ পাদ্রীদিগের গোরও দেখিতে লাগিলাম। এই গোরগুলি বড়ই মনোহর। চতুষ্কোণ স্তম্ভ বা বেদিকার চতুর্দ্দিকে বিন্যস্ত নর-নারী বালকবালিকার প্রতিমূর্ত্তিগুলি ঊর্দ্ধমুখে করযোড়ে প্রার্থনা করিতেছে। বেদিকা বা স্তম্ভের উপর কুণ্ডলীকৃতকেশরাশি ও শ্মশ্রুজালশোভিত বিরাট্ পুরুষ-মূর্ত্তি ক্রুশ স্কন্ধে বহন করিয়া নতজানু হইয়া ঊর্দ্ধনেত্রে স্বর্গের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। পথিপার্শ্বে, ধান্যক্ষেত্রে, উদ্যানে, প্রান্তরে এইরূপ কত সমাধিই দেখিলাম। স্থানে স্থানে পল্লীচিত্রও মনোহর। তৃষ্ণার্ত্ত পথিক কূপ হইতে জল তুলিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিতেছে। এক স্থানে চা লেমনেড রহিয়াছে। দেখিতে দেখিতে বেসিনে উপস্থিত হইলাম। টাঙ্গা দুর্গমধ্যে আঁকিয়া বাঁকিয়া, ঘুরিয়া ঘুরিয়া, গির্জ্জা, কাছারী, প্রাসাদ, গৃহ প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষের মধ্য দিয়া ছুটিয়া চলিতে লাগিল। ক্রমে সমুদ্রতটের (খাড়ির) নিকট আসিয়া টাঙ্গা থামিল। চালক অশ্ব খুলিয়া, তাহাকে তৃণজল দিল। আমিও পদব্রজে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সুদূর অতীতের জীর্ণ নিদর্শন সেই ধ্বংসস্তূপ দেখিতে লাগিলাম।

আমি প্রথমেই সেণ্টপল গির্জ্জা দেখিলাম। ইহার চূড়া প্রায় ১৮০ ফুট উচ্চ। ইহাই ভাঁয়াণ্ডার হইতে দৃষ্ট হইয়াছিল। নিকটেই জেসুইট প্যাদ্রীদিগের মঠ (Monastery); একটি ভগ্ন গির্জ্জায় লিখিত আছে—Gonsalo Gaicia; কবাটে লিখিত 'Pray for us.'।

তাহার পরই সেণ্ট যোসেফের গির্জ্জা (The Cathedral of St. Joseph) দেখিলাম। ইহা ছাদশূন্য। রঙ্গমঞ্চের ন্যায় পাদ্রীগণের বক্তৃতাস্থান এখনও রহিয়াছে। ইহার প্রতি অঙ্গই পতনোন্মুখ। যুগান্তব্যাপী সুদীর্ঘ বার্দ্ধক্যে থর-থর করিয়া কাঁপিতেছে—নিকটে যাইতে ভয় হয়। স্থানে স্থানে প্রাচীরগাত্রে চতুষ্কোণ সিন্দুরবর্ণ টিনফলকের উপর বড় বড় শ্বেত অক্ষরে 'Dangerous' এই সতর্কতাসূচক কথা পথিককে সাবধান করিয়া দিতেছে।

তার পর পর্ত্তুগীজদিগের সেকালের কুঠী দেখিলাম। তৃণশৈবালাচ্ছাদিত ভগ্ন প্রাচীর নিবিড় লতাজালে সমাচ্ছন্ন। চতুর্দ্দিকে জীর্ণোদ্যান, বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ। উদ্যানমধ্যে প্রাচীন সরোবর। এ কি! সরসীবক্ষে অর্থাৎ মধ্যদেশে শিবমন্দির! মন্দিরটি ছোট হইলেও বেশ সুদৃশ্য। এখানে শিবপ্রতিষ্ঠা করিলেন কে? সম্ভবতঃ পর্ত্তুগীজ কুঠীতে কোনও হিন্দু দেওয়ান বা মুৎসুদ্দী ছিলেন। এ কীর্ত্তি তাঁহারই। তাঁহার প্রসার প্রতিপত্তিও অসীম ছিল। নচেৎ এই গির্জ্জারণ্যে শিবমন্দিররূপ বটবৃক্ষের অভ্যুদয় বড় সহজ ব্যাপার নহে।

তাহার পরই আবার একটি গির্জ্জা দেখিলাম। ইহা ঠিক যেন একখানি সু-অঙ্কিত ছবি। নাম Church of Nossa.। প্রাচীরগাত্রে লিখিত Senhara Da Vida.।

তাহার পরে বেসিনের কাপ্তেনের প্রাসাদ,—Palace of the Captain of Bassein.। সেকালের প্রাচীন অট্টালিকা—বড় বড় দরজা, জানালা। ইনি সম্ভবতঃ বেসিনের শাসনকর্ত্তা ছিলেন।

ইহা দেখিয়া কন্‌ভেণ্ট ও তৎসংলগ্ন গির্জ্জা দেখিলাম। ইহা পর্ত্তুগীজ সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদিগের আশ্রম ছিল। ইংরেজীতে লিখিত আছে—The Dominican Church and Convent। কি প্রকাণ্ড হল্! কত শত নরনারী যে ইহার অভ্যন্তরে স্থান পাইতেন, তাহার ইয়ত্তা কে করিবে?

আর কত লিখিব? এইরূপ ঘুরিতেছি, আর রঙ্গমঞ্চের দৃশ্যপট-পরিবর্ত্তনের ন্যায় প্রাচীন সৌধ, গির্জ্জা প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ নেত্রপথে পতিত হইতেছে।

এখানকার জেসুইট পাদ্রীগণের গির্জ্জা ১৫৪৮ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। আমার স্বদেশ চুঁচুড়ার বান্দেল গির্জ্জা (Bandel Church) ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত ; সুতরাং বঙ্গদেশের সর্ব্বপ্রাচীন গির্জ্জা। কিন্তু এখানকার গির্জ্জা তদপেক্ষা ৫১ বৎসরের অধিক প্রাচীন।

পর্ত্তুগীজ কীর্ত্তিগুলি দেখিতে দেখিতে আমি ক্লান্ত হইয়া একটি উদ্যানে প্রবিষ্ট হইলাম, এবং কমলালেবুর দ্বারা তৃষ্ণা শান্তি করিলাম। সেখানে কিয়ৎকাল বিশ্রামের পর ডাক বাঙ্গলোর নিকট সান্ আণ্টোনিওর গির্জ্জা দেখিলাম। ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন গির্জ্জা।

ইহার পর পর্ত্তুগীজদিগের প্রমোদভবন, ভোজনাগার (Banquet House) প্রভৃতি দেখিয়া একটি উদ্যানে এক প্রকার লম্বা লম্বা গাছ দেখিলাম। তথাকার একটি লোক বলিল, অনেক সাহেব এই বাগান দেখিতে আসেন। কিন্তু কেহই সেই বিচিত্র বৃক্ষের নাম বলিতে পারিল না।

আমি টাঙ্গাচালকের অনুসন্ধান করিতে করিতে দুর্গসীমার বাহিরে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, টাঙ্গাচালক অশ্ব বদলাইয়া লইল। সে চা পান করিল ; পরে সিগারেট ধরাইয়া, টাঙ্গা ছুটাইয়া, বেসিন রোডে যখন উপস্থিত হইল, তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। ট্রেণও আসিয়া উপস্থিত। আমি তাড়াতাড়ি ষ্টেশন হইতে কতকগুলি সুপক্ক কদলী ক্রয় করিয়া গাড়ীতে উঠিলাম। বেসিনের কলা খুব বিখ্যাত।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম।

টবী।

যাদু !

যে বিবর্ত্তসূত্র-বশে স্নেহের মূরতি ধরি'
এসেছিলে অঙ্কেতে আমার,
সে তোমার তুমি নও—জান তা বিশেষ করি',—
কত দিন হ'য়ে গেছে তা' নিয়ে বিচার।
রঙ্গভূমে নট এক—শত মূর্ত্তি করে সে গ্রহণ—

কখনো বালক বৃদ্ধ, কখনো নৃপতি-পুত্র,
কে সে, কিন্তু আপনারে জ্ঞাত সর্ব্বক্ষণ।
কেন তবে তোমা তরে করিব ক্রন্দন—
প্রাণাধিক হে মোর নন্দন!

হে পুত্র!
অনাদি অনন্ত কাল হ'তে তোমার জনম-ধারা
ছুটিয়াছে প্লাবি' তটভূমি,—
অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গের মাঝে (আমি একখণ্ড)
—তোমার জননী, জন্মভূমি!
বাছা! কত জন্ম অতিক্রমি' সঞ্চিত প্রারব্ধ রথে
এসেছিলে মোদের মাঝার,
কিছু দিন হাসিখুসি খেলাধূলা অবসানে
ভোগক্ষয়ে গতি পুনর্ব্বার।
বাছা!
আসিয়া আমার কাছে,
তোমার সঞ্চিত মাঝে
ভাল মন্দ কি হলো অর্জ্জন?
কে জানাবে সেই কথা, তাহাই আমার ব্যথা
হে মোর নন্দন!
মিথ্যা সে মায়ের স্নেহ, মিথ্যা সে অঙ্গজ নাম,
যদি পুত্রে কিছু না করে প্রদান।
ওরে! সৃষ্টির প্রবাহ-পথে পাথেয় তণ্ডুলকণা—
লক্ষ লক্ষ জননীর দান!

শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারীর বাল্যরচনা।

বিস্মৃতিপ্রবণ হইলেও বাঙ্গালী এখনও ৺প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারীর পাণ্ডিত্যের কথা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হন নাই। সুতরাং আশা করা যায়, তাঁহার ছাত্রাবস্থায় পরীক্ষাস্থলে লিখিত যে বাঙ্গালা রচনাটি আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি, তাহা 'সাহিত্যে'র পাঠকবর্গের প্রীতিপ্রদ হইতে পারে।

প্রবন্ধটি পড়িবার সময় পাঠকগণ স্মরণ রাখিবেন যে, তখনও বাঙ্গালা ভাষায় উৎকৃষ্ট গদ্যপুস্তকের অভাব ছিল।

কৃষ্ণমোহনের 'বিদ্যাকল্পদ্রুম' তখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। 'কলেজ অব্ ফোর্ট উইলিয়ম' নামক বিদ্যালয়ে তত্রত্য ছাত্রগণের প্রথম পাঠার্থ বাঙ্গালা ভাষায় হিতোপদেশ নামে যে পুস্তক নির্দ্দিষ্ট ছিল তাহার রচনা অতি কদর্য্য, বিশেষতঃ কোন কোন অংশ এমত দুরূহ ও অসংলগ্ন যে, কোন ক্রমেই অর্থবোধ ও তাৎপর্য্য গ্রহ হইবার বিষয় নহে।" সেই জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় 'বেতালপঞ্চবিংশতি' প্রণয়ন করেন; কিন্তু "দুই বৎসরের অনধিককাল মধ্যেই প্রথম মুদ্রিত ৫০০ পুস্তক নিঃশেষরূপে পর্য্যবসিত হয়।" * প্রসন্নকুমারের সময়ে বেতালের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় নাই, এবং হিন্দুকলেজের ছাত্রগণকে নবপ্রকাশিত 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' পাঠ করিতে উপদেশ দেওয়া হয়।

প্রসন্নকুমারের প্রবন্ধটি ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে সিনিয়র ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষাস্থলে লিখিত হইয়াছিল। পরীক্ষাপত্রে বর্ণাশুদ্ধি প্রভৃতি যে সকল দোষ ছিল, তাহা অবিকল রক্ষিত হইল।

পরীক্ষক রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দুকলেজের ছাত্রগণের বাঙ্গালা রচনা সম্বন্ধে শিক্ষাপরিষদের নিকট অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন; তাহার অনুবাদ করিয়া দিলাম,—

"বাঙ্গালা ভাষার বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া আমি হিন্দুকলেজের ছাত্রগণের বাঙ্গালা রচনা প্রশংসার যোগ্য বলিয়া স্বীকার করিতেছি। এতদ্দেশে একটি সংস্কার অত্যন্ত প্রবল যে, সংস্কৃত ভাষায় অধিকার না থাকিলে বাঙ্গালা সাহিত্যে সুপণ্ডিত হওয়া যায় না; ইহার ফলে, সংস্কৃত ব্যাকরণে কিঞ্চিৎ ব্যুৎপত্তি লাভ না করিয়া কেহই বিশুদ্ধ বাঙ্গালা রচনা লিখিবার প্রয়াস পান না। যাঁহারা মনে করেন যে, সংস্কৃত ব্যতীত বাঙ্গালা ভাষার অনুশীলন অসম্ভব, আমি তাঁহাদের যুক্তির সমর্থন করিতে অসমর্থ। যদিও এই দুইটী ভাষার মধ্যে ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ বর্ত্তমান, এবং সংস্কৃত ভাষার নিকট বাঙ্গালা ভাষা অশেষপ্রকারে ঋণী, তথাপি পূর্ব্বোক্ত ভাষার

---

* 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'র দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা।

অধিকার লাভ না করিয়া শেষোক্ত ভাষার অনুশীলন অসম্ভব নহে। যদি যথেষ্ট যত্ন লন, তাহা হইলে ছাত্রগণ সংস্কৃত ভাষায় একেবারে অনভিজ্ঞ হইয়াও বিশুদ্ধ বাঙ্গালা লিখিতে পারেন, তবে এই ভাষায় আদর্শ ব্যাকরণ ও কোষগ্রন্থের অভাবে প্রবন্ধ-লেখকগণকে মধ্যে মধ্যে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইতে হইবে। বাঙ্গালার জন্সন্ বা য্যরে এখনও জন্মগ্রহণ করেন নাই। কিন্তু প্রসন্ন-কুমার সর্ব্বাধিকারী এবং অন্য দুই এক জন ছাত্রের রচনা যদিও সম্পূর্ণরূপে নির্দ্দোষ নহে, তথাপি অত্যন্ত সন্তোষজনক, এবং তাঁহাদের পক্ষ হইতে এইরূপ ক্রটীর কারণ-প্রদর্শনের প্রয়োজন নাই।"

টাউনহলে পুরস্কার-বিতরণ-সভায় বঙ্গের তদানীন্তন ডেপুটী গবর্ণর মাননীয় সার হার্বার্ট ম্যাডক বাঙ্গালা রচনায় পারদর্শী, প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী প্রভৃতি ছাত্রগণকে কিরূপে উৎসাহিত করিয়াছিলেন, তাহাও এ স্থলে উদ্ধারযোগ্য ;—

"দেশীয় ভাষার অনুশীলনের প্রতি শিক্ষাপরিষদ এবং ইহার অধীনস্থ সকলে যে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর মনোযোগী হইয়াছেন, ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া আমি আনন্দ প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। মাতৃভাষার সবিশেষ ব্যুৎপত্তিলাভ নিজের এবং স্বদেশবাসীর পক্ষে অত্যন্ত উপকারী, এ কথা আমাদের বিদ্যালয়সমূহের ছাত্রগণের মনোমধ্যে আমি গাঢ়রূপে অঙ্কিত করাইয়া দিতে চাহি। আমাদের বর্ত্তমান স্কুল এবং কলেজসমূহে ভারতবাসিগণকে যে য়ুরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা অতি অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যেই বিতরিত হইয়া থাকে। ব্রিটিশ ভারতের কোটী কোটী প্রজার মধ্যে অধিকাংশই আমাদের ভাষা জানেন না, এবং তাঁহারা যে কোনও কালে জানিবেন, এরূপ আশাও নাই। কিন্তু তাঁহাদের মাতৃভাষার সাহায্যে আমাদের উচ্চতম বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ কর্ত্তৃক অর্জ্জিত জ্ঞানের অধিকাংশ কেন তাঁহা-দিগকে প্রদত্ত হইবে না, ইহার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই ; এবং ইংরাজীর সহিত যাঁহারা মাতৃভাষাতেও পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের দ্বারাই এই মহাকার্য্য সম্ভব। ছাত্রগণ যে এক্ষণে মাতৃভাষার অনুশীলনে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর মনোযোগী হইয়াছেন, এবং আচার্য্য কৃষ্ণ-মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় যে আমাদের নিকটে উপস্থাপিত পাঁচটী বাঙ্গালা প্রবন্ধ প্রশংসার যোগ্য বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন, ইহা যথার্থই অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। সংক্ষেপে আমি আমাদের স্কুল ও কলেজের সকল ছাত্রকে এই অত্যাবশ্যক বিদ্যার চর্চ্চা করিতে অনুরোধ করিতেছি ; কেবলমাত্র য়ুরোপীয় সাহিত্যজ্ঞানের অনন্যসাধারণ পরিচয়-প্রদান অপেক্ষা ইহাই অধিককাল স্থায়ী যশঃ ও প্রশংসার পথ। আমার আশা আছে যে, স্বদেশপ্রেম এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা ইঁহাদিগকে মাতৃভাষায় য়ুরোপীয় সদ্গ্রন্থাদির অনুবাদ এবং শিক্ষাপ্রদ মৌলিক গ্রন্থাদির প্রণয়ন দ্বারা দেশের মহদুপকারক বলিয়া সুখ্যাতি-অর্জ্জনে প্রণোদিত করিবে। আচার্য্য কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার 'বিদ্যাকল্পদ্রুমে' তোমাদিগকে যে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে অনুকরণীয়।"

"সত্যের মহিমা বর্ণনা কর।

"সত্যই সার পদার্থ। সত্যের উপর নির্ভর করিয়া পৃথিবীর সমুচয় কর্ম্ম সম্পাদন হইতেছে। অতি সামান্য গৃহকর্ম্ম অবধি পুরাবৃত্ত লেখক ও জ্যোতির্ব্বেত্তার নিগূঢ়ানুসন্ধান পর্য্যন্ত সত্যই সকলের আধার। পরম অনুকম্পা জগদীশ্বর যদ্যপি

মনুষ্যের মনোমধ্যে সত্যের প্রতি প্রেম সংস্থাপন না করিতেন তবে মনুষ্যসমাজ কুত্রাপি স্থায়ী হইতে পারিত না। কোন বিপুল বিসারদ গ্রন্থকর্ত্তা উল্লেখ করিয়াছেন যে এই পৃথিবীমণ্ডলস্থ অত্যন্ত মিথ্যাবাদী ব্যক্তিও জীবনকালের মধ্যে শতাংশের অধিক মিথ্যাবাক্য ওষ্ঠ হইতে নির্গত করে না। অতএব সত্য প্রতিপালন করা জগদীশ্বরের প্রধান আজ্ঞাবৎ জ্ঞান করিতে হইবেক এবং তদীয় আজ্ঞা উন্লঙ্ঘনে যে দোষ স্পর্শে মিথ্যাবাদী ব্যক্তি সেই দোষের অপরাধী।

"সত্যের অবহেলাই সকল পাপের মূল। সত্যের প্রতি আদর থাকিলে কোন পাপ প্রবেশ করিতে পারে না। মনুষ্য লজ্জা বশত আপন কৃত অপকর্ম্ম অন্য লোকের নিকটে প্রকাশকরণে অনেচ্ছু কিন্তু সত্যবাদী হইলে অবশ্যই প্রকাশ করিতে হয় এবম্বিধায়ে সত্যপরায়ণ ব্যক্তির নিকটে পাপ সমাগম করিতে পারে না।

"ঐহিক ও পারলৌকিক সুখের প্রতি যত্নবান হইলে সত্যের অনাদর কুত্রাপি শ্রেয়কর নহে। মিথ্যাবাদী ব্যক্তিকে সর্ব্বদা চিন্তাকুল থাকিতে হয় কি জানি কখন তাহার মিথ্যা কথা প্রকাশ হইয়া তাহার প্রতি লোকের অবিশ্বাস জন্মে এবং তদ্দ্বারা তাহার মনের ও সুখের হানি হয় কিন্তু সত্যবাদিকে এরূপ ভাবনায় কোন কালেই পতিত হইতে হয় না সত্য স্বয়ং সিদ্ধ কাহারও সাহায্য অপেক্ষা করে না। অপিচ 'অদ্য বা অব্দ সতান্তে' মনুষ্যের মরণই নিশ্চয় অতএব যদ্যপিও ইহলোকে মিথ্যাবাক্য প্রয়োগের দ্বারা কাহারো সুখ সম্ভাবনা হয় তথাপি জীবনান্তে বিশ্বকর্ত্তার বিচারাধীন হইয়া অনন্ত কাল পর্য্যন্ত দুঃখ ভোগ করিতে হইবেক ইহা বিবেচনা করিয়া তদ্বিষয়ে ক্ষ্যান্ত থাকা উচিত।

"সর্ব্বদেশেরই উত্তম উত্তম গ্রন্থে সত্যের শ্রেষ্ঠত্ব ও মিথ্যার অপকৃষ্ট স্বভাব বর্ণিত আছে। মহাভারতীয় স্বর্গারোহণ পর্ব্বে লিখিত আছে যে ধর্ম্মপরায়ণ রাজা যুধিষ্ঠিরকেও নরক দর্শন করিতে হইয়াছিল। কুরু পাণ্ডবের কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধকালীন কৃষ্ণ প্রভৃতি অনেকে দ্রোণাচার্য্যকে ম্লান এবং হতবল করিবার নিমিত্তে ধ্বনি করিতে লাগিলেন 'দ্রোণের পুত্র অশ্বত্থামার প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে' কিন্তু তাহাতে যুধিষ্ঠিরের বাক্য না শুনিয়া আচার্য্য বিশ্বাস না করাতে কৃষ্ণের পরামর্শে রাজা যুধিষ্ঠির উচ্চৈস্বরে কহিলেন 'অশ্বত্থামা হত' এবং অতি মৃদু মৃদুস্বরে কহিলেন 'ইতি গজ'। চিরকাল সত্যপরায়ণ রাজা যুধিষ্ঠির জীবনের মধ্যে এক মুহূর্ত্তকাল সত্যের প্রতিবন্ধক বাক্যপ্রয়োগ করিয়াছিলেন মহাকবি ব্যাসদেব বর্ণনা করিয়াছেন যে এ জন্যও তাঁহাকে নরকদর্শন করিতে হইয়াছিল।

"মহাত্মা লার্ড বেকন গ্রিক দেশীয় কবি লুকৃষিয়াস হইতে এই বচন উদ্ধৃত

করিয়াছেন যে 'জ্ঞানময় পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিয়া সত্যের উপর অবলম্বন করত যে ব্যক্তি নিম্নস্থ কুঝ্যাটিকা স্বরূপ অজ্ঞান ও অসত্যের সহিত সংশ্রব না করিয়া তদুপরি দৃষ্টি করেন তিনিই পরম সুখী' ফলত মানব জীবন ধারণ করিয়া সত্যের সহিত বিসম্বাদ করিলে সে জীবন কেবল বিষময়। তাহাতে সুখের লেশ মাত্র নাই।

"পরন্তু সত্যের আলোচনায় মনের স্ফূর্ত্তি জন্মে মানসিক গুণ সকল সুন্দররূপে বিকসিত হয় এবং স্বভাবের সৌন্দর্য্যের প্রভাব হয়। দর্শন শাস্ত্রের নিগুঢ় বিতর্ক জ্যোতির্ব্বিদ্যায় পারদর্শিতা ভূতত্ত্বের সম্যক্ জ্ঞান কেবল সত্যের মহিমাসূচক। সত্য মূলিভূত না হইলে সে সকল হইতে পারিত না।

"অবশেষে এই বক্তব্য যে সত্য পরিত্যাগ করিয়া অসত্যের উপাসনা কেবল বিচলিত মনের কর্ম্ম।

"শ্রীপ্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী।
"Prosunnocoomar Surbadhicaury
"1st Class Hindu College."
শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ।

খাসমুন্সীর নক্সা।

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।]

এ রাজ্যের এ পর্য্যন্ত কোনও নির্দ্দিষ্ট এজেন্ট ছিল না। কিন্তু গবর্মেণ্ট এ রাজ্যের যে সমস্ত অত্যাচার ও বিশৃঙ্খলা দেখিলেন, তাহাতে এখন হইতে এখানে এক জন স্থায়ী এজেণ্ট রাখা আবশ্যক মনে করিলেন। কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, রাজ্যটী অত্যন্ত ক্ষুদ্র; তজ্জন্য সন্নিহিত অপর আরও দুইটি রাজ্য একত্র করিয়া একটী এজেন্সী স্থাপিত হইল। নূতন এজেণ্টের প্রতি এই তিন রাজ্য-পরিদর্শনের ভার ন্যস্ত হইল। তিন রাজ্যের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড়টীর আয় ২৬।২৭ লক্ষ টাকা হইল। আমরা উহার নাম ২৬এর রাজ্য রাখিলাম। তথাকার নরপতি এক জন তীক্ষ্ণদৃষ্টি, প্রতিভাশালী, বিচক্ষণ ব্যক্তি। তিনি নিজ ক্ষমতায় আপন রাজ্য পরিরক্ষণ করিতেছিলেন। স্বীয় রাজ্যমধ্যে নিজ প্রাধান্য এবং একাধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তিনি সর্ব্বদা মনোযোগী ছিলেন।

সমস্ত মিত্র ও করদ রাজ্যে এই নিয়ম প্রচলিত যে, রাজপক্ষ হইতে এক এক

জন উকীল এজেণ্টেদের নিকট থাকে। এ একটা পুরাতন প্রথা; মোগল বাদশাহ-দিগের সময় হইতে চলিয়া আসিতেছে। উকীল অর্থে এ স্থলে ইংরাজরাজ্যের শামলাধারী ব্যবহারাজীব নহে। ইহাদের প্রধান কার্য্য, রাজা ও এজেণ্ট মহোদয়দের মধ্যস্থ হইয়া রাজ্যসংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ের সওয়াল জবাব নির্ব্বাহ। এজেণ্ট মহোদয় রাজ্যসংক্রান্ত কোনও বিষয়ের তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইলে, উকীল মারফত সেই কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত উকীলদিগকে সর্ব্বদা এজেণ্ট সাহেবদের নিকট তাঁহার ছায়ানুগামী হইয়া থাকিতে হয়। ২৬এর রাজ্যের এক জন উকীল আমাদের এজেণ্ট সাহেবের নিকট ছিলেন। ইনি এক জন পণ্ডিত-উপাধিধারী ব্রাহ্মণ, অতি বিচক্ষণ লোক। তাঁহার উপর রাজার এই আজ্ঞা ছিল, যেন এজেণ্ট সাহেব কোনও প্রকারে কোনও বিষয়ে অসন্তুষ্ট না হইতে পারেন।

আমাদের বৃদ্ধ রাজা স্বইচ্ছায় গবর্মেণ্টের হস্তে রাজ্য-পরিচালনের ক্ষমতা দিয়া বসিয়া আছেন। সুতরাং এজেণ্ট সাহেবকে এই রাজ্যেই অধিক কাল থাকিতে হইত, এবং রাজ্যের সমস্ত কার্য্য কৌন্সিলের মেম্বর দ্বারা সাহেবের পরামর্শে পরিচালিত হইত। সাহেব অপর দুটী রাজ্যে সময়ে সময়ে ২।৪ দিবসের জন্য পরিদর্শনার্থ যাইতেন মাত্র। এই উপলক্ষে এজেণ্ট মহোদয়ের ছায়ানুগামী ২৬এর রাজ্যের উকীলের এ রাজ্যে শুভাগমন হইতে লাগিল। পণ্ডিত-উপাধিধারী ব্রাহ্মণেরা সাধারণতঃ বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ হইয়া থাকেন। ইনি উকীল, ইঁহার কূটবুদ্ধি কিছু প্রবল ছিল। এখানে আসিবার কিছু কালের মধ্যেই তিনি এখানকার সমস্ত অবস্থা বুঝিয়া লইলেন। আবার সাহেব তাঁহার উপর বিশেষ সন্তুষ্ট বলিয়া নিজ ক্ষমতা-পরিচালনে তাঁহাকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইল না। এ রাজ্যের লোকের কার্য্য আটকাইলেই তাহারা তাঁহার শরণ লইত, এবং তিনিও যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন। এই প্রকারে এ রাজ্যে তাঁহার প্রসারবৃদ্ধি হইতে লাগিল, এবং কিছুকালের মধ্যে তিনি এখানে এক জন সর্ব্বজনপ্রিয় লোক হইয়া দাঁড়াইলেন। ইতিমধ্যে এই রাজ্যে ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ শূন্য হয়। উকীল মহাশয়ের জ্যেষ্ঠভ্রাতা অন্য এক পণ্ডিতজী নিষ্কর্ম্মা বসিয়া ছিলেন। উকীল মহাশয় সাহেবকে বলিয়া তাঁহাকে ঐ কর্ম্ম দেওয়াইলেন। তাঁহার একটী চর স্থায়িরূপে এ রাজ্যে প্রবেশলাভ করিল।

ও দিকে যুবরাজের অত্যন্ত বিপদ। খাওয়াস ত ইতিপূর্ব্বে দেশ-বহিষ্কৃত হইয়াছে। তাঁহার তিন উপগ্রহ যদিও দেশ-বহিষ্কৃত হয় নাই, কিন্তু তাঁহার নিকট তাহাদের যাতায়াত বন্ধ হইয়াছে। জায়গীর নিজ কর্ম্মদোষে নষ্ট; দেশীয় কোনও উত্তমর্ণই তাঁহাকে ঋণ দেয় না। প্রতিদিন গ্রাসাচ্ছাদন পর্য্যন্ত চলা ভার। এই

সময় তাঁহার বুদ্ধিমতী তেজস্বিনী জ্যেষ্ঠা স্ত্রী পরলোকে গমন করেন। তিনি নিজের বুদ্ধিবলে নানা উপায়ে সংসার চালাইতেছিলেন। যুবরাজ স্ত্রীরত্ন হইতেও বঞ্চিত হইলেন। কিন্তু তিনি এমনই 'খাওয়াস'-পাগল যে, সে দিকে তাঁহার দৃষ্টিপাত নাই। কি প্রকারে 'খাওয়াস'কে পুনরায় প্রাপ্ত হইবেন, কি করিয়া কৌন্‌সিলের মেম্বরদ্বয়কে উপযুক্ত শাস্তি দিয়া প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবেন, সর্ব্বদা এই চিন্তা। তিনটি উপগ্রহের যদিও তাঁহার নিকট যাতায়াত বন্ধ, তথাপি তাহারা অতি প্রচ্ছন্নভাবে রাত্রিকালে তাঁহার নিকট মধ্যে মধ্যে যাইত, এবং আপনাদের যত দূর বুদ্ধি বিবেচনার পরিসর, তদনুসারে পরামর্শ দিয়া আসিত। বিশেষতঃ, ব্রাহ্মণটি এই কার্য্যে অত্যন্ত পটু। তিনি এক দিবস যুবরাজকে ২৬এর উকীলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিতে ও শরণাগত হইতে পরামর্শ দেন। 'খাওয়াসে'র পুনঃপ্রাপ্তির আশায় যুবরাজ সম্মত হইলেন। লোক মারফত উকীল সাহেবকে ডাকাইয়া আনিলেন। উকীল বড়ই চতুর লোক। তিনি নিজে না গিয়া নিজ সহোদরকে পাঠাইলেন। কারণ, সহোদর এ রাজ্যের ভৃত্য, তিনি আসায় কেহ কিছুই বলিতে পারিল না।

বড় পণ্ডিতজীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে, যুবরাজ নিজ কষ্টের কথা সমস্ত তাঁহার গোচর করেন। পণ্ডিতজী তাঁহাকে সাহায্য করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া নিজ অনুজের নিকট আসিয়া সমস্ত জ্ঞাপন করিলেন। দুই ভ্রাতা পূর্ব্বাপর সমস্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেন, যদি উপকার করিয়া যুবরাজকে হস্তগত করা যায়, তাহা হইলে ভবিষ্যতের একটা পথ প্রশস্ত হইয়া থাকে। বৃদ্ধ রাজা আর কত দিন? পরে ইনিই রাজা হইলে, নিজেদের বিলক্ষণ কার্য্যসিদ্ধি ও প্রতিপত্তি বাড়িবার সম্ভাবনা। এই ভাবিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। এখন হইতে তিনি মধ্যে মধ্যে নবাগত সাহেবের নিকট কথাপ্রসঙ্গে যুবরাজের প্রশংসাবাদ করিতে লাগিলেন। ও দিকে তাঁহাকেও বলিয়া পাঠাইলেন যে, তুমিও মধ্যে মধ্যে সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে থাক। এই সূত্রে পাচক দাদাও পুনরায় অতি গোপনে যুবরাজ ও উকীল মহাশয়ের নিকট যাতায়াত করিতে লাগিলেন, এবং সংবাদবাহকের কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিলেন।

উকীল মহাশয় যুবরাজকে পরামর্শ দেন, এখন 'খাওয়াসে'র জন্য ব্যস্ত হইলে চলিবে না। যদি তুমি কখনও রাজা হও, এবং ক্ষমতা পাও, তখন তাহাকে আনিও। আপাততঃ গবর্মেণ্ট পর্য্যন্ত তোমার যে অনপনেয় কলঙ্ক হইয়াছে, তাহা ধৌত করিয়া জায়গীর পুনঃপ্রাপ্তির চেষ্টা কর; নতুবা হয় ত

তোমায় চিরকাল রাজ্য-ভ্রষ্ট অবস্থায় থাকিতে হইবে। এখন তোমায় সাহেবের নিকট এমন ভাবটী দেখাইতে হইবে, যেন 'খাওয়াসে'র প্রতি তোমার আদৌ মন নাই; যেন তুমি পূর্ব্ব দুষ্কার্য্যের জন্য অত্যন্ত অনুতপ্ত ও লজ্জিত। স্বকার্য্যসাধনোদ্দেশে যুবরাজ এই 'দোকানদারী' করিতে সম্মত হইলেন, এবং সাহেবের নিকট তদনুরূপ আচরণ দেখাইতে লাগিলেন। পণ্ডিত ভ্রাতাদের যুবরাজকে সাহায্য করিবার কাহিনী কৌন্‌সিলের মেম্বরদের জানিতে বাকী রহিল না। তাঁহারা বিলক্ষণ অবগত ছিলেন যে, যুবরাজের মঙ্গলার্থ পূর্ব্বকার সাহেব যে সকল কঠিন ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, কৌন্‌সিলের মেম্বরেরাই সেই সকল কার্য্যের মূল কারণ, ইহাই যুবরাজের ধারণা ছিল, এবং তজ্জন্য তিনি তাঁহাদিগকে পরম শত্রু জ্ঞান করিতেন। মেম্বরগণ বিচক্ষণ, তাঁহারা চিরকাল দেশী রাজ্যে কাটাইয়াছেন, এবং যুবরাজের চরিত্র বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছেন। তাঁহাদের দৃঢ়বিশ্বাস যে, ইঁহার সহিত যাহার একবার বৈরিভাব হইয়াছে, শতবার ক্ষমা প্রার্থনা করিলেও সে বৈরিভাব যাইবার নহে। সুতরাং তাঁহারাও যুবরাজকে শত্রুভাবে দেখিতেন। পণ্ডিতভ্রাতাদিগকে যুবরাজকে সাহায্য করিতে দেখিয়া তাঁহারা প্রমাদ গণিলেন, এবং তলে তলে সাহেবের নিকট সুবিধা পাইলেই যুবরাজের কুৎসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু গরজ এমনই বালাই যে, 'খাওয়াস'-রূপ অমূল্য রত্নের পুনঃপ্রাপ্তির আশায় যুবরাজ এখন সম্পূর্ণ শিষ্ট শান্ত বালকের মত হইলেন! পণ্ডিতদের পরামর্শ ব্যতীত আর এক পদও চলেন না। সুতরাং মেম্বরদের নিন্দাবাদ সাহেবের মনে স্থান পাইল না। এই প্রকার নূতন সাহেবের যত্নে যুবরাজ পুনরায় জায়গীর ফেরত পাইলেন। পণ্ডিতদ্বয় এই সতরঞ্চ খেলায় এক বাজী মাৎ করিলেন। যুবরাজও বুঝিলেন, দিব্য অস্ত্র পাইয়াছেন, ইঁহাদের দ্বারা স্বকার্য্য সাধন করিবেন, এবং মেম্বরদের নিরস্ত্র করিয়া কোনও সময়ে 'খাওয়াস'কে পুনরায় প্রাপ্ত হইয়া নিজ অন্তরের জ্বালা মিটাইতে পারিবেন। এবম্প্রকারে 'খাওয়াস'-প্রাপ্তির আশা তাঁহার মনে পুনরায় অঙ্কুরিত হইল।

ঠিক এই সময়ে কোনও একটী বৃহৎ রাজ্য হইতে আমাদের স্কুলের সেক্রেটারী মহাশয় বদলী হইয়া এখানে আসেন। তিনি ডাক্তার, গবর্মেণ্টের চাকর। তবে দেশী রাজ্যে সরকার বাহাদুর তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন, তজ্জন্য কতক পরিমাণে তিনি স্বাধীন। উক্তরাজ্যের একটী পণ্ডিতের সহিত তাঁহার অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ভাব ছিল। তিনি এখানকার দুই পণ্ডিতভ্রাতার অতি নিকট আত্মীয়।

এই সূত্রে ডাক্তার মহাশয়ের পণ্ডিত ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত বন্ধুত্ব হয়। সুতরাং এখন তিন জনে একজোট হইলেন। যুবরাজের জায়গীর-প্রাপ্তির পর উকীল মহাশয় সাহেবের নিকট একদিন এইরূপ প্রস্তাব করেন যে, যুবরাজ ভবিষ্যতে এ রাজ্যের অধিপতি হইবেন। সুতরাং এ সময় হইতে তাঁহার কিছু কিছু রাজকার্য্য অভ্যস্ত করিয়া রাখিলে ভাল হয়। আপাততঃ তাঁহাকে অন্য কোনও কার্য্যে প্রবৃত্ত করিবার সুবিধা না হইলে, মিউনিসিপালিটীর সভাপতি করিয়া দিলে ক্ষতি কি? ইহা দ্বারা তিনি কিছু না কিছু কার্য্য শিক্ষা করিবার সুবিধা পাইবেন। প্রস্তাবটী আপাতদৃষ্টিতে অত্যন্ত সরল ও স্বার্থশূন্য। কিন্তু অন্তরে একটু নিগূঢ়তত্ত্ব ছিল। সাহেব তাহা বুঝিলেন না। বাহ্য সারল্যে মুগ্ধ হইয়া সেই প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ সম্মতি দিলেন। কিন্তু উকীল মহাশয় অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া যে বড়েটি টিপিয়াছেন, তাহাতে ভবিষ্যৎ মাতের পথটি বেশ নিষ্কণ্টক হইয়া গেল। ডাক্তার স্কুলের ও মিউনিসিপালিটীর সেক্রেটারী। যুবরাজ প্রেসিডেণ্ট হইলেন। সুতরাং তাঁহার সহিত সর্ব্বদা সাক্ষাৎ ও যাতায়াতের পথ সুগম হইল। এখন হইতে ডাক্তার মারফৎ ভ্রাতৃদ্বয়ের যুবরাজের সহিত সকল পরামর্শ ও কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। 'পাচক দাদা'ও পৃষ্ঠপোষক রহিলেন।

দেশী রাজ্যে কার্য্য করিতে গেলে সাহেবের আমলাদের একটু সন্তুষ্ট রাখা চাই। এটা কিন্তু পুরাতন প্রথা। এখন আর আমলাদের তত ক্ষমতা নাই। তখন আমলাদের সহিত বন্ধুত্ব ভাব রাখিতে হইত। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন সাহেবের দপ্তরে দুই জন প্রধান আমলা; এক, ইংরাজীনবীশ হেড বাবু; অপর, ফারসীনবীশ মীরমুন্সী। হেডবাবু লোকটা কিছু সরলপ্রকৃতি; মীরমুন্সী এক জন এদেশস্থ কায়স্থ। ভয়ানক চতুর। সে সময়ে বেশী কার্য্য ফারসীতেই চলিত। সরল বলিয়া হেডবাবুকে পণ্ডিত ভ্রাতারা শীঘ্রই আপনাদের দলস্থ করিয়া লইলেন। মীর মুন্সীকে সেরূপ পারেন নাই। তিনি বিলক্ষণ ধূর্ত্ত বলিয়া কোনও দলেই মিশিতেন না। যখন যে দিকে সুবিধা দেখিতেন, তখন সেই দিকে গড়াইতেন। ভ্রাতৃদ্বয়ের এই বাসনা যে, তিনি তাঁহাদেরই পক্ষ অবলম্বন করেন। তাহাতে তিনি সম্মত ছিলেন না। এই জন্য তাঁহার সহিত পণ্ডিত ভ্রাতৃদ্বয়ের একটু মনোমালিন্য ছিল।

সাহেবের মেজাজটা একটু বাবু গোছের। তাঁহার পক্ষে জঙ্গলাকীর্ণ ও বন্ধুবান্ধবহীন স্থানে সর্ব্বদা কালক্ষেপ বড়ই কষ্টকর। আমারই এখানে এই কারণে অনেক কাল পর্য্যন্ত মন টেঁকে নাই—তাঁহার কিরূপে সম্ভব হইতে

পারে? এই জন্য তিনি মধ্যে মধ্যে বৃটিশরাজ্যে পলাইতেন, এবং অধিককাল সেই-খানেই কাটাইতেন। সাহেবের সহিত ঘনিষ্ঠতা-স্থাপনের জন্য যুবরাজের মধ্যে মধ্যে পত্র লিখিবার প্রয়োজন হইত। প্রথম প্রথম ফরাসীতেই পত্রাদি চলিতে লাগিল। পত্রগুলি কাজেই মীর মুন্সীর হাতে পড়িত। ভ্রাতাদের এরূপ সন্দেহ হয় যে, তিনি পত্র-লিখিত বিষয়গুলি মেম্বরদের ব্যক্ত করিতেন। ইহা তাঁহার অসহ্য, কিন্তু কি করেন, উপায় নাই। কিছু দিন ডাক্তার মহাশয় নিজ কদর্য্য ইংরেজীতে লিখিতে লাগিলেন। তাহাতেও সুবিধা হইল না। এই সূত্রে এক জন ইংরেজী-জানা লোক আবশ্যক হয়। কিন্তু কি করিয়া যোগাড় হয়? তাহার পথ তখন সরল হয় নাই। ইতিমধ্যে ডাক্তার মহাশয় স্কুলের সেক্রেটারী হইলেন। একদিন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট স্কুলের দুরবস্থার বিষয় উল্লেখ করেন, এবং তদানীন্তন হেডমাষ্টারের অযোগ্যতার উল্লেখ করিয়া প্রস্তাব করেন যে, এই স্কুলটীর উন্নতি ও সংস্কারের ব্যপদেশে এক জন ভাল ইংরেজী-জানা লোক আনাইয়া নিজ-দলস্থ করিলে হয় না? এই প্রস্তাব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার হৃদয়গ্রাহী হইল। তিনি কনিষ্ঠের সাহেবের সহিত ফিরিয়া পথ দেখিতে লাগিলেন।

কনিষ্ঠ ভ্রাতা সাহেবের সহিত পুনরাগমন করিলে, তাঁহার নিকট এই প্রস্তাব উত্থাপিত হইল। তিনিও ইহার অনুমোদন করিলেন, এবং সুবিধামত অতি শীঘ্রই সাহেব বাহাদুরকে একবার বিদ্যালয়ের অবস্থা-পরিদর্শন করিতে অনুরোধ করিলেন। অতি অল্পকালের মধ্যেই সে সুবিধা হইল, এবং সাহেব একদিন হঠাৎ বিদ্যালয়টী দেখিবার নিমিত্ত পূর্ব্বে কোনও সংবাদ না দিয়াই তথায় উপস্থিত হইলেন। উকীল মহাশয়ও তাঁহার দলস্থ লোকের এখন উচ্চ গ্রহ। তাঁহারা যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেছেন, তাহাতেই সফলকাম হইতেছেন। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এক জন চোবে ব্রাহ্মণ। বিদ্যা বুদ্ধি তথৈব চ। তবে জাতীয় প্রথানুসারে তিনি সিদ্ধি খাইতে বিলক্ষণ পটু। গ্রীষ্মকাল; প্রাতঃকালে স্কুল বসে। জন কয়েক ছাত্র লইয়া তিনি সেই প্যারী বাবুর ফাষ্টবুকের পাঠ দিতেছেন, এবং ছাত্র-গুলির মধ্যে এক জন তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার জন্য সিদ্ধি ঘুঁটিতেছে। এমন সময় সাহেব তথায় উপস্থিত! সুতরাং সাহেবের আর স্কুলের অবস্থা জানিতে বাকী রহিল না। উকীল মহাশয়ের ঔষধ বিলক্ষণ ধরিল। সাহেব সেই দিনই "Pioneer" পত্রে স্কুলের প্রধান শিক্ষকের জন্য বিজ্ঞাপন দিলেন।

এতক্ষণে বোধ হয় পাঠকগণ বুঝিতে পারিলেন, আমার কি কারণে এখানে

আসিবার সূত্রপাত হয়। এক দিকে যুবরাজ ও মেম্বরদের সহিত ঘোর শত্রুতা চলিতেছে, অপর দিকে যুবরাজের দুই চারিটি বন্ধু নিজ নিজ ভবিষ্যৎ স্বার্থসিদ্ধির জন্য বদ্ধপরিকর হইতেছেন। ঠিক এই সন্ধিস্থলে এখানে আমার আগমন। জানি না, বিপরীতগামী এই দুই স্রোতের মধ্যে পড়িয়া আমার কি দশা হইবে। একে নিজগৃহ ও স্বদেশ হইতে বহুদূরে, বন্ধুবান্ধবহীন স্থানে আসিয়া পড়িয়াছি, তাহার উপর এই রাজ্যের আভ্যন্তরীণ অবস্থা অত্যন্ত ঘনঘটাচ্ছন্ন। আমার অদৃষ্টে কি আছে, তাহা ভগবান্‌ই জানেন। বাহ্য ঘটনাবলী দেখিয়া আমার ভবিষ্যৎ কোনক্রমেই আশাপ্রদ বোধ হইল না, বরং তাহা অন্ধকারে আবৃত। একটু ক্ষীণালোকও আপাততঃ দৃষ্টিপথে পতিত হইল না।

এখন, বোধ হয়, পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন, আমি যুবরাজের সৌজন্য, সেক্রেটারী মহাশয়ের অকপট বন্ধুতা ও পরোপকারিতা ও পণ্ডিতজীর ভদ্রতাকে কেন একটু স্বার্থপ্রণোদিত বলিয়াছিলাম। এখন, বোধ হয়, পাঠক বুঝিতে পারিবেন, কেন 'খাঁ সাহেব' ও 'দেওয়ানজী' আমার সহিত প্রথম আলাপের সময় প্রচ্ছন্নভাবে একটু রুক্ষ ব্যবহার করিয়াছিলেন। এখন, বোধ হয়, সকলে বুঝিতে পারিবেন, কেন উক্ত মেম্বরদ্বয় আমার এক জন সহকারী দিতে এত বিতণ্ডা উপস্থিত করিয়াছিলেন। মেম্বরগণ যে চালে ভুলিয়াছিলেন, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। আমি তখন এখানে নবাগত। এখানকার দলাদলির বিন্দুবিসর্গও অবগত নহি। আমার পক্ষে তখন উকীল মহাশয়ের দলও যেমন, 'খাঁ সাহেবে'র দলও তেমনই। যে যখন আমার প্রতি দয়ার চক্ষে দেখিতেন, আমি তখন কৃতজ্ঞতা-বশতঃ তাঁহার নিকটই বিক্রীত হইতাম, এবং তাঁহার উপকারের প্রত্যুপকার সাধ্যমতে করিতাম। বোধ হয়, খাঁ সাহেব ও 'দেওয়ানজী' আমাকে সময়-মত নিজ পক্ষে টানিতে পারিলে পরবর্ত্তী ঘটনা অন্য রূপ ধারণ করিত, এবং এ রাজ্যে উত্তরকালে যে ভয়ঙ্কর অগ্নিকুণ্ড জ্বলিয়াছিল, তাহা তত ভীষণ হইতে পারিত না। যাহা ভবিতব্য, তাহা অবশ্যম্ভাবী, তাহাতে কাহারও হাত নাই। এ দীর্ঘ অধ্যায় এইখানেই শেষ করা যাউক।

ক্রমশঃ।

নীরবে।

[স্বর্গীয় বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত।]

যখনই তাহার কাছে যাই, সে ত কথা কহে না, কেবলই নিমেষহীন দৃষ্টিতে হৃদয় বিদ্ধ করিয়া নীরবনেত্রে মুখপানে তাকাইয়া থাকে। বসন্তের পর বসন্ত তাহার অধর-খসিত [?] কনক-কাহিনীর প্রতীক্ষায় বসিয়া আছি—কাননে কাননে ফুল ফুটিয়া উঠে, কুঞ্জে কুঞ্জে পাখী গাহিতে থাকে—সে কথা কহে না। তাহার হৃদয়ের সমস্ত আকুলতা যেন দুটি সুকোমল নলিন-নয়নে ঘনীভূত হইয়া সেখান হইতে নীরবে আপনাকে ব্যক্ত করিতেছে: আর ভাষা নাই, কথা নাই, কেবলই নীরবে চোখে চোখে। কিন্তু এ গভীর নীরবতায় কি হৃদয় তৃপ্তি মানে? এত দিন ধরিয়া সাথে সাথে ফিরিলাম, এত কথা বলিলাম, এত হাসি হাসিলাম, এত অশ্রু ফেলিলাম, তবু এক ক্ষুদ্র বালিকার একরত্তি হৃদয়ের দু'টী কথা শ্রবণে পশিল না? কিন্তু সে যে কি চোখে চায়, কি দৃষ্টিতে দেখে, নিকটে আসিলে সে কাতর নয়ন-নীরবতাতেই আচ্ছন্ন হইয়া পড়ি! তবু যদি একটী কথা কয়—অশ্রু ফেলিয়া কাজ নাই, বেদনা বলিয়া কাজ নাই—শুধু একটীমাত্র কথা, একবার— আর নয়। এত প্রেম, এত ভালবাসা, একটী কথা আর কহিবে না? তবে ত সকলই ব্যর্থ!

ওগো না, কিছুই ব্যর্থ নহে। নীরব-দৃষ্টিতে সে দুই হৃদয়ের বেদনা গাঁথিয়া শুভ্র প্রেম-কাব্য রচনা করিতেছে। এ প্রেম টুটিবার নয়। ভাষা আসিয়া মর্ম্ম-মথিত এ নীরব সম্মিলন-সুখ-মধ্যে প্রিয় ছলনা রচিতে পারে নাই। তবে দু'টী কথা শুনিবার জন্য এ অধীরতা কেন? সেই দু'টী কথার স্মৃতিতে সমাহিত হইয়া হৃদয় বুঝি কি সুগভীর আনন্দ লাভ করিবে। কিন্তু নয়ন যে ভাষা ব্যক্ত করিতেছে, রসনা কি তাহা পারে? শব্দ আকাশে মিলাইয়া যায়, এ সুকুমার রজতদৃষ্টি মর্ম্মের স্তরে স্তরে বিঁধিয়া থাকে। সে হয় ত কথা বলিতে চাহে, কিন্তু গভীর হৃদয়ে যে তরঙ্গ উথলিয়া উঠে, অধরের রাঙ্গা তটে আসিয়াই তাহা মিলাইয়া যায় বুঝি। তাই তাহার বলা আর হইল না। সে ক্ষুদ্র হৃদয়টুকুর মধ্যে না জানি কত কথাই গুমরিয়া মরে। নহিলে এত প্রেম কি কেবলই চোখে চোখে? বুকের বাঁধ ভাঙ্গিয়া হৃদয় বাহির হইতে চাহে না? ভাষা বাহির হইবার জন্য প্রাণ কেমন করে না? তাহার মুখ কিন্তু ফুটিল না। জানি, সে হৃদয় ভাষায় ব্যক্ত হইবার নহে—নীরবতাই তাহার একমাত্র ভাষা; কিন্তু মনে হয়, এ জীবনে যদি একদিনও তাহার অস্ফুট স্বর শুনিতাম!

তাহার মুখ হইতে কখনও প্রেম-আহ্বান শুনি নাই, তবে কি করিয়া বলি, এ হৃদয়ের সহিত সে হৃদয় একই সুরে বাঁধা? মুখপানে চাহিয়া স্থিরনেত্রে বসিয়া রহে বলিয়া? অর্দ্ধগ্রথিত মালা গাঁথা শেষ হয় না বলিয়া? কে জানে কেমন করিয়া জানি, সে কি ভাবে, সে কি চাহে। তাহার হৃদয়ের প্রত্যেক তরঙ্গভঙ্গ, মৃদুতর মৃদুতম শিহরণ কিন্তু অনুভব করি। তাহার সর্ব্বাঙ্গে প্রেম ধরা দেয়। চন্দ্রমার নীরব দৃষ্টিতে হৃদয় উথলিয়া উঠে কেন? কুসুমের মৃদু সৌরভে প্রাণ আকুল করে কেন? সে মর্ম্মনিঃসৃত ভাষাহীন ভাষা যে বুঝে, সে বুঝে। প্রেমের ভাষা ভাষাহীন। প্রেম কি কথা কহে না? কহিবে না কেন? কিন্তু প্রেম যত গভীর হয়, কথা নীরব হইয়া আসে। যে প্রেম সহিতে চাহে—সুখ চাহে না, যে প্রেম জ্বালায় কাতর নহে—তৃপ্তি খুঁজে না, কণ্ঠভাষায় সে ব্যক্ত হইবে কিরূপে? সে অধর-পল্লবে আপনার কাহিনী লিখিয়া রাখিয়া যায়, নয়নপ্রান্তে চকিত আকুলতা রচনা করে। কিন্তু প্রেম তাহা নিজেই হয় ত জানে না। না জানিয়াই তাহার ভাষার প্রকাশ। যে তাহা অনুভব করে, সেই দেখিতে পায়।

সন্ধ্যাছায়াময় নদীতীরে বসিয়া তাহাকে যখন জীবনের কাহিনী শুনাই, আমার এই সঙ্গিহীন সহায়হীন কঠোরতা-বেষ্টিত মরুজীবনের সুখদুঃখের কথা বলি, তখন সে কি প্রশান্ত আগ্রহের সহিত শুনিতে থাকে। চারি দিক্ হইতে অন্ধকার ঘনাইয়া আসে, নক্ষত্রে নক্ষত্রে আকাশ ছাইয়া ফেলে, অনন্যমনে সে শুনিয়া যায়। প্রেম না থাকিলে সে ভাবে কেহ শুনিতে পারে না। যখন আমার দুর্দ্দিনের কথা বলি, বিপদ্‌সঙ্কুল জীবনের বিপদের কথা বলি, তাহার আঁখিপাতা সিক্ত হইয়া আসে, সর্ব্বাঙ্গ দিয়া একটা শিহরণ বহিয়া যায়। সে কথা কহে না; কিন্তু আর কি তাহার কথা শুনিবার আবশ্যকতা আছে? কেবল আমার শ্রবণ-পরিতৃপ্তি—এ সুখটুকু না হয় নাই ঘটিল। হৃদয়বন্ধন ত আর ঘুচিবে না! প্রেমের এমন মধুর চির-মিলনময়ী ভাষা ছাড়িয়া কণ্ঠধ্বনির আহ্বান শুনিতে চাহে কে? তবু যদি রহিত! তাহা হইলে না জানি তাহাকে আরও কত সার্ব্বাঙ্গীন অনুভব করিতাম! এত করিয়া মনকে বুঝাই; তবু মনে হয়, তাহার একটী কথা জীবনে শুনিতে পাইলাম না!—একটী—একটীমাত্র কথা!

নীরবে—নীরবে। এমনি নীরবেই শরতের শুকতারা কাহার পানে চাহিয়া থাকে। এমনি নীরবেই চন্দ্রালোক সাগরহৃদয়ে তরঙ্গ তুলে। নীরবে সন্ধ্যারাগে আকাশে ধরণীতে সম্মিলন হয়। নীরবে ফুল পবন-হৃদয়ে সৌরভ ঢালিয়া দেয়।

নীরবে—নীরবে। সেও নীরবে—নীরবে চাহিয়া থাকে, নীরবে হৃদয় ঢালে, নীরবে এ শূন্য হৃদয় পূর্ণ করে।

কিন্তু সে যদি জানে যে, তাহার অধরসিক্ত দু'টী মধু-বাণী শুনিলে হৃদয় পুরিয়া উঠে, তাহা হইলে কি কথা কহে না? তাহাকে ত কখনও এমন কথা বলি নাই। সে ত জানে না, তাহার কথা শুনিতে এ হৃদয়ে কত আকাঙ্ক্ষা। সে হয় ত মনে করে, কি বলিতে কি বলিয়া হৃদয়ে ব্যথা দিবে। সে হয় ত আমার কথাতেই তন্ময় হইয়া থাকে, বলিবার অবসর পায় না।

কিন্তু এত প্রেমের মধ্যেও সদাই যেন ভয়, কোথায় কোন্ অজানা জ্যোৎস্না-লোকে এই নীরব মিলনের মত এমনি নীরবে বিরহ রচিত হইতেছে। এ ভাষাহীন নীরবতার সেইখানেই বুঝি চির-অবসান। দুইটি দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির হইয়াও হয় ত নীরবতা ভঙ্গ করিবে না। মনে হয়, বুকের মধ্য হইতে হৃদয়কে কেহ কাড়িয়া লয় যদি! হয় ত কেবল কুসুমচয়নে স্মৃতিমাত্র ছাইয়া রহিবে; নক্ষত্রে নক্ষত্রে কাতরদৃষ্টির কাহিনীমাত্র থাকিবে; কিন্তু সে ভাষাহীন ভাষার প্রতিমা—সে স্নেহ-সিক্ত কোমল নীরবতা বুঝি আর রহিবে না। ইহা কিন্তু শুধু মনে হয়। এত প্রেমের মধ্যে কি এ দারুণ শূন্যের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে? তবু যেন সমস্ত হৃদয়ের মধ্য দিয়া তরল বজ্রস্রোত বহিয়া যায়। সমস্ত হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়ে, চক্ষু অন্ধকার দেখে, প্রাণ বাহির হইতে চায়। তখন তাহার একটী কথা শুনিবার জন্য হৃদয় উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠে—তাহার একটী কথাতেই বুঝি জ্বালা জুড়াইয়া যায়। যতই বিরহ আসিয়া প্রাণ আচ্ছন্ন করিয়া তুলে, ততই তাহাকে সর্ব্বাঙ্গীন অনুভব করিতে চাহি।

তবে কি তাহাকে একবার শুধাইব, সে একটী কথা কহিবে কি না? নহিলে তাহাকে বুঝি সর্ব্বাঙ্গীন অনুভব করা আর হইল না। এমনি সন্ধ্যাময়, ছায়াময়, কুসুম-সৌরভময়, তরঙ্গভঙ্গীমান্ নদীতীরে মৃদু কল্লোলের মত তাহার সুকুমার হৃদয়ের মৃদু চাহনীটুকু দেখিয়া জীবন অবসান করিব। তাহার শুভ্র অশ্রুবিন্দুতে অশ্রু মিশাইয়া, তাহার বিমল হৃদয়ে হৃদয় রাখিয়া সমাপন-গান গাহিব, এমন ভাগ্য হইবে কি? কে জানে, অদৃষ্টে কি আছে? বুঝি বা এমনি নীরবে—নীরবে এ জীবনের অবসান হইবে।

প্রাচীন ভারতের রণপ্রসঙ্গ।

চমূ।

প্রাচীন ভারতে রাজশক্তি ছয় প্রকারে বিভক্ত ছিল। (১) দৈহিক শক্তি, (২) বীরভাব, (৩) সৈন্যবল, (৪) অস্ত্রশস্ত্র, (৫) বুদ্ধিমত্তা, ও (৬) দীর্ঘায়। বর্ত্তমানেও উল্লিখিত গুণাবলীর আবশ্যকতা সম্যক্ উপলব্ধ হইতেছে; কিন্তু মহাভারত-বর্ণিত পরস্পর সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধ করিবার রীতি লোপ পাওয়ায়, রাজার দৈহিক বলের আবশ্যকতা বড় দৃষ্ট হইতেছে না। প্রাচীন কালেও বর্ত্তমানের ন্যায় চমূ নিজ সৈন্য ও মিত্র সৈন্য, এই দুই ভাগে বিভক্ত হইত। শুক্রাচার্য্য রাজার স্বকীয় সৈন্যকে মূল ও সন্তস্ক, এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। রাজার অধীনে দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া সৈনিককার্য্যে লিপ্ত যোদ্ধাকে মূল ও স্বল্পকাল সৈনিককার্য্যে লিপ্ত যোদ্ধাকে সন্তস্ক নামে অভিহিত করা হইত। বর্ত্তমানেও প্রত্যেক রাজ্যেই স্থায়ী সৈন্য (Standing army) ও আপৎকালে বা নিজরাজ্য শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার সময়ে সন্তস্ক (militia) সৈন্য গ্রহণের বিধি আছে। সন্তস্ক সৈন্য কেবল দেশ হইতেই সংগৃহীত হইত, এমন নহে; ইহাতে দেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত সৈন্য থাকিত, এবং শত্রুপক্ষবর্জ্জনকারী সৈন্যদলও স্থান পাইত। পরন্তু গুপ্তচর দ্বারা শত্রুসৈন্যকে নিজদলে ভুক্ত করিবারও বন্দোবস্ত ছিল।

কামন্দকীয় অর্থশাস্ত্রে রাজার সৈন্যবল ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। (১) মূল বা দীর্ঘকালস্থায়ী সৈন্যদল, (২) বেতনভুক্ সৈন্যদল, (৩) শ্রেণী-সৈন্য, (৪) মিত্রসৈন্য, (৫) শত্রুপক্ষপরিত্যাগকারী সৈন্যদল, এবং (৬) পার্ব্বত্য জাতি। রাজা মূল সৈন্যের উপরই পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতেন। শুক্রনীতিতে উল্লেখ আছে, মূল সৈন্য কখনও নিজ রাজপক্ষ পরিত্যাগ করে না। বেতনভুক্ সৈন্যদলের রক্ষণ ও ভরণপোষণের ভার রাজা বহন করিতেন, এবং তাহাদের পরিবারবর্গ রাজতত্ত্বাবধানে থাকিত। শ্রেণীসৈন্য সাময়িক প্রয়োজনের জন্য সংগৃহীত হইত; ইহারা তত শিক্ষিত নয়, ইহাদিগকে নিজবশে রাখিবার জন্য যথাসময়ে ইহাদের প্রাপ্য বেতন দান করা হইত। পার্ব্বত্য জাতিকে রাজা প্রায়ই বিশ্বাস করিতেন না; উহাদিগকে স্বভাবতঃই অবিশ্বাসী, অর্থলোভী ও বিশ্বাসঘাতক বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

সাধারণতঃ রাজসৈন্য পদাতিক, অশ্বারোহী, গজারোহী ও রথী, এই অত্যাবশ্যক চতুরঙ্গ-বলে বিভক্ত থাকিত। আহতদিগকে রণক্ষেত্র হইতে শিবিরে স্থানান্তরিত করিবার জন্য শুশ্রূষাকারী লোকের বন্দোবস্ত ছিল। খাদ্যদ্রব্য ও অস্ত্রশস্ত্র বহন করিবার নিমিত্ত হস্তী প্রভৃতি নিযুক্ত হইত। প্রতি অক্ষৌহিণী সেনার মধ্যে ২১৮৭০ হস্তী, ২১৮৭০ খানি রথ, ৬৫৬১০ অশ্ব, এবং ১০৯৩৫০ পদাতিক সৈন্য থাকিত। প্রাচীন ভারতে যুদ্ধে হস্তীর স্থান অতি উচ্চ ছিল। কামন্দকীয় অর্থনীতিতে আছে, উপযুক্ত মাহুত-পরিচালিত, যুদ্ধে অভ্যস্ত একটী হস্তী ৬ হাজার অশ্ব-বিনাশে সমর্থ। বর্ত্তমান যুগে রণক্ষেত্রে হস্তীর ব্যবহার একপ্রকার উঠিয়াই গিয়াছে।

পদাতিকগণ সাধারণতঃ পথ পরিষ্কৃত রাখিত; সংবাদ চলাচলের সুবন্দোবস্ত করিত; রণলিপ্ত বাহিনীর অস্ত্রশস্ত্রাদি সরবরাহ করিত; এবং আহতদিগকে রণস্থল হইতে নিরাপদ স্থানে আনয়ন করিত। পদাতিক সৈন্যের অন্তর্গত অসিধারী যোদ্ধৃগণ প্রধান বাহিনীর রক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত; এবং পদাতিক সৈন্যের অন্তর্গত তীরন্দাজগণ দূর হইতেই শত্রু-আক্রমণকে প্রতিহত করিত। রথিগণ আহতদিগকে শিবিরে লইয়া যাইত, এবং শত্রুর পশ্চাদ্ভাগ আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করিত। অশ্বারোহী সৈন্যদল খাদ্যদ্রব্যাদি স্থানান্তরে প্রেরণসময়ে রক্ষিস্বরূপ প্রেরিত হইত; প্রত্যাবর্ত্তনকালে বাহিনীর পশ্চাদ্ভাগ রক্ষা করিত; এবং পলায়মান শত্রুসৈন্যের পশ্চাদ্ধাবন করিত। গজারোহী সৈন্যদল শত্রুর শ্রেণীভঙ্গ করিত; প্রাচীর, পরিখা ভেদ করিয়া শত্রুব্যূহমধ্যে প্রবেশ করিত; সৈন্যদলের যুদ্ধযাত্রাকালে সর্ব্বাগ্রে চলিত; এবং বিধ্বস্ত সৈন্যদল গজরাজির পশ্চাতে আসিয়া আবার নিজ নিজ দল নব সৈন্য দ্বারা পুনর্গঠন করিত। বর্ত্তমান সময়ে সুবৃহৎ কামানসমূহই প্রাচীনকালের হস্তীর কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে।

যুদ্ধোপকরণ।

যুদ্ধের উপকরণ, অস্ত্র ও শস্ত্র, এই দুই ভাগে সাধারণতঃ বিভক্ত ছিল। অস্ত্র দূর হইতে শত্রুর উপর নিক্ষিপ্ত হইত, এবং শস্ত্র হননের নিমিত্ত ব্যবহৃত হইত। অস্ত্র আবার সাধারণ ও দৈবীশক্তিসম্পন্ন, এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। তরবারি প্রভৃতি শস্ত্রের অন্তর্গত।

যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহার্য্য ধনু, অসি, নালিকাস্ত্র ও মন্ত্রশক্তি, এই চারিপ্রকার যুদ্ধোপকরণের কথাই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু অর্থশাস্ত্রে মন্ত্রশক্তির প্রয়োগের বিশদ

বিবরণ কিছু দৃষ্ট হয় না। এতন্মধ্যে নালিকাস্ত্রের উপরই বিশেষ আস্থা স্থাপন করিবার কথা আছে। লৌহ, সীস ও তাম্র দ্বারা গোলা প্রস্তুত হইত; সোরা, গন্ধক ও কয়লা ৫: ১: ১ এই অনুপাতে মিশ্রিত করিয়া বারুদ প্রস্তুত হইত; হাল্‌কা কাষ্ঠ অগ্নির মৃদু জ্বালে দগ্ধ করিয়া ভস্মে পরিণত হইবার পূর্ব্বেই নির্ব্বাপিত করিয়া কয়লা প্রস্তুত করা হইত। শত্রুসংহার ব্যাপারে নগর ও দুর্গধ্বংসের কার্য্যে কামানের তুল্য কার্য্যকর কিছুই ছিল না। কর্ণযুক্ত তীর বিষাক্ত করিয়া নিক্ষেপ করা হইত। যখন সৈন্যগণ দেহে বর্ম্ম ধারণ আরম্ভ করিল, তখন অসি ধীরে ধীরে ধনুর্ব্বাণের স্থান অধিকার করিল। যোদ্ধ‌্গণ ধাতুনির্ম্মিত বর্ম্ম ও শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করিত; অশ্ব হস্তী প্রভৃতির জন্য চর্ম্মনির্ম্মিত বর্ম্ম ব্যবহৃত হইত। ভারী বর্ম্মাবৃত অশ্বারোহী সৈন্যের প্রথা বহুকাল হইল উঠিয়া গিয়াছে, কিন্তু সম্প্রতি ফরাসী সৈন্যগণ পরিখাযুদ্ধে এলিউমিনম নামক ধাতুনির্ম্মিত শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করিতেছে।

যুদ্ধের সময়।

ধর্ম্মশাস্ত্রে উল্লেখ আছে যে, আত্মরক্ষার গত্যন্তর না থাকিলে যুদ্ধ আরম্ভ করিবে। অর্থশাস্ত্রে আমরা ইহার বিপরীত উপদেশ পাই। রাজার জয়ের নিশ্চিত সম্ভাবনা থাকিলে কালবিলম্ব না করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিবে। বর্ত্তমানে উভয় নীতিই অনুসৃত হইতেছে। যখন রাজার চতুরঙ্গ বল ক্রমশঃই বৃদ্ধি পায়, সামরিক উত্তেজনা ক্রমশঃই দেশমধ্যে জাগিয়া উঠে, তৎকালে তিনি দেশের একতা-রক্ষার জন্য কোনও বহিঃশত্রুকে আক্রমণ করিয়া থাকেন। গত ফ্রাঙ্কো-প্রুসিয়ান যুদ্ধের কারণ অনেকটা এইরূপ। যখন রাজা দেখিবেন, তাঁহার কর্ম্মচারীরা দক্ষ ও উপযুক্ত, এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে দেশের আভ্যন্তরীণ উচ্ছৃঙ্খলতার দমনে সমর্থ, কেবল সেই সময়েই তিনি পররাজ্য-আক্রমণে অভিযান করিবেন; শত্রুকে বিপজ্জালে পরিবেষ্টিত ও তাহার সৈন্যদলের মধ্যে অসন্তোষের ভাব দেখিলে তিনি অবিলম্বে শত্রুকে আক্রমণ করিবেন।

উদ্যোগপর্ব্ব।

যুদ্ধ করা স্থিরনিশ্চয় হইলে, রাজা জয়লাভের জন্য যত উপায় সম্ভব, তাহা অবলম্বন করিবেন। নিজ শক্তিবৃদ্ধির জন্য, নিজ রাজ্যমধ্যে কোনও গোলযোগ না ঘটে, তাহার প্রতি রাজা বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। যাহাতে শত্রু গুপ্তচর দ্বারা মিত্রশক্তিপুঞ্জের মধ্যে মনোমালিন্য ঘটাইতে না পারে, তাহার প্রতি তিনি খর-

দৃষ্টি রাখিবেন। নিজ সৈন্যদের মধ্যে বিদ্বেষভাব না জন্মে, তাহার সুবন্দোবস্ত করিয়া বিজয়যাত্রা করিবেন। শত্রুকে দুর্ব্বল করাই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য হইবে।

শত্রুরাজ্যের শান্তি নষ্ট করিতে হইবে; উৎকোচ কিংবা উৎকোচের বৃথা আশা দিয়া শত্রুর মিত্রশক্তিপুঞ্জকে স্বপক্ষে আনিবার চেষ্টা করিতে হইবে। রসদপত্রাদি যাহাতে শত্রুরাজ্যে প্রবেশ করিতে না পারে, তদ্বিষয়ে পূর্ব্ব হইতেই সতর্ক হইতে হইবে। শুক্রনীতিতে শত্রুসৈন্যকে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য বিশ্বাসঘাতকতা করিবারও উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। রাজা সামনীতিতে নিজ প্রজাকে সন্তুষ্ট করিয়া শত্রুর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান করাইবেন, এবং প্রচুরপরিমাণে খাদ্যসম্ভার নিজ দেশমধ্যে সঞ্চিত রাখিবেন। শুক্রনীতিতে উল্লেখ আছে—রণযাত্রাকালে রাজা উপযুক্ত চিকিৎসক, শুশ্রূষাকারী এবং ঔষধাদি সঙ্গে লইবেন।

রাজা নিজ সৈন্যযাত্রার পথ সুবিধাজনক, এবং শত্রুপক্ষের গমনাগমনের পথ বিপৎসঙ্কুল করিবেন। যেখানে জল, খাদ্য, তৃণ প্রচুরপরিমাণে পাওয়া যায়, সেখানে যুদ্ধশিবির স্থাপন করিবেন। রাজা শিবিরসন্নিহিত জনপদ হইতে আপন ইচ্ছায় খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিবেন। শস্যক্ষেত্র হইতে যাহাতে অন্য পক্ষ আহার্য্য সংগ্রহ করিতে না পারে, তজ্জন্য অগ্নিসংযোগে উহা নষ্ট করিতে হইবে। কিন্তু রাজা স্থানীয় দেব-মন্দিরের প্রতি যথোচিত ভক্তি প্রদর্শন করিবেন। শত্রুপক্ষের রাজ্যস্থিত সাধারণ প্রজাবৃন্দ যাহাতে অন্যায়রূপে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, তৎপ্রতি সুদৃষ্টি রাখিবেন। নিজরাজ্য অন্য কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে, প্রজাবৃন্দকে দুর্গমধ্যে আশ্রয় প্রদান করিবেন। পার্ব্বত্য পথ, নদীতীর ও অন্যান্য আবশ্যক স্থানসমূহ সুরক্ষিত করিতে হইবে। শত্রু যে যে পথ অতিক্রম করিবে, তাহার সন্নিহিত জলাশয়, কূপ প্রভৃতি জলশূন্য কিংবা বিষাক্ত করিতে হইবে। শত্রু যাহাতে স্বরাজ্যের সীমান্তে অবস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুর্গগুলি স্বাধিকারে আনিয়া নিজ আক্রমণের সুবিধাজনক কেন্দ্রের গঠন করিতে না পারে, সেই জন্য ঐ দুর্গগুলিকে ভূমিসাৎ করিতে হইবে। পবিত্র বৃক্ষাদি ভিন্ন অপর সকলের শাখা ছেদন করিতে হইবে, এবং হোমাদি যজ্ঞকার্য্য ব্যতীত দিবাভাগে কোনও বাটীতেই কেহ অগ্নি জ্বালাইতে পারিবে না।

মনুসংহিতায় শরৎ কিংবা বসন্ত ঋতু পররাজ্য-আক্রমণের কাল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই সময়ে আকাশ মেঘশূন্য থাকে, এবং ইহা ছাউনিতে বাসের

উপযুক্ত সময়। এই সময় ক্ষেত্র শস্যপূর্ণ, বৃক্ষাদি ফলসমন্বিত, এবং পানীয় জলও যথেষ্ট প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু নিজের সুযোগ ও শত্রুর দুর্ব্বলতা দর্শন করিলে, সেই সময়কেই উপযুক্ত সময় বলিয়া মনে করিতে হইবে।

অভিযানকালে পার্ব্বত্যজাতি সর্ব্বপ্রথমে অগ্রসর হইবে। তাহার পর হস্তী, রথ ও অশ্বারোহী সৈন্যদল পর্য্যায়ক্রমে অগ্রগমন করিবে। রাজা, কোষ ও অঙ্গনাগণসহ মধ্যভাগে অবস্থান করিবেন। সৈন্যাধ্যক্ষগণ বাহিনীর পুরোভাগে অবস্থান করিবেন; সেনাপতি মনোনীত যোদ্ধৃবর্গ কর্ত্তৃক পরিবৃত থাকিবেন। বাহিনীর উভয় পার্শ্ব অশ্বারোহী সৈন্য কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইবে। মধ্যস্থল হইতে শেষভাগ অশ্ব, রথ, হস্তী ও পার্ব্বত্যজাতি দ্বারা পর্য্যায়ক্রমে সুরক্ষিত থাকিবে।

অভিযানকালে পথিমধ্যে বিশ্রাম ও রাস্তাঘাটের বিবরণ অবগতির জন্য সুবিধাজনক স্থানে ছাউনি ফেলিতে হইবে। বনমধ্যে বিশ্রামস্থানই নিরাপদ বলিয়া বিবেচিত হইত। চতুর্ভুজ আকারে শিবির স্থাপন করা হইত। রাজ-শিবিরে অর্থ ও স্ত্রীলোকদিগের বাসস্থান নির্দ্ধারিত থাকিত। শিবিরমধ্যে কুচকাওয়াজের জন্য যথেষ্ট স্থান রাখা হইত। বৃত্তাকার বহু ধনুর্ধারী সতর্ক-ভাবে সর্ব্বদা শিবির রক্ষণে নিযুক্ত থাকিত। রাজার তাঁবুর নিকট সুদক্ষ গজা-রোহী সৈন্যেরা প্রহরা দিত। রাজা সর্ব্বদা সশস্ত্র থাকিতেন। গুপ্তভাবে কণ্টকাকীর্ণ পরিখা প্রস্তুত করিয়া শিবিরের চতুর্দ্দিক সুরক্ষিত করা হইত। খাদ্য-সংগ্রহ ও শত্রুর গতিবিধি-নির্ণয়ের জন্য অশ্বারোহী চর নিযুক্ত হইত।

রণক্ষেত্রে।

বিভিন্ন সৈন্যদল পরস্পরকে সাহায্য করিতে পারে, এমন অবস্থায় রণক্ষেত্রে অবস্থান করিবে। সুশিক্ষিত সৈন্যদল পুরোভাগে অবস্থান করিবে। বাহিনীর পশ্চাদ্ভাগের উপরও সুদৃষ্টি রাখিতে হইবে। প্রতি সৈন্যদলের সম্মুখে অসিধারী, তাহার পর ধনুর্ধারী, তদনন্তর অশ্বারোহী ও রথী অবস্থান করিবে। সকলের সম্মুখে সেনাপতি, সহকারী সেনাপতিগণে পরিবৃত হইয়া সৈন্যের গতিবিধি-নির্দ্দেশক পতাকা ধারণ করিয়া অবস্থান করিবেন। রাজা বাহিনীর পশ্চাদ্ভাগে অবস্থান করিয়া সৈন্যদিগকে উৎসাহিত করিবেন। তিনি সতর্কতার সহিত আত্মরক্ষা করিবেন; কারণ, তাঁহার বিনাশে সমুদয় সৈন্যের ধ্বংসের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

মনু বলেন,—শত্রুকে দুর্গমধ্যে আশ্রয় লইতে বাধ্য করিতে হইবে। দুর্গ

অজেয় ও দুর্ভেদ্য বোধ হইলে, তাহা অবরোধ করিতে হইবে। অবরোধের ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য নাগরিকগণের উপর কর ধার্য্য করিতে হইবে। পানীয় জল বিষাক্ত করিতে হইবে।

প্রয়োজনানুসারে মকর, অর্দ্ধচন্দ্র, বজ্র, সূচী, মণ্ডল প্রভৃতি ব্যূহ রচনা করিতে হইবে। কামন্দকীয় অর্থনীতিতে উল্লেখ আছে, ছলনাপূর্ব্বক পশ্চাদ্বর্ত্তন করিবে; জয়োল্লসিত শৃঙ্খলাহীন শত্রুসৈন্যকে সহসা আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করিবে; মধ্যে মধ্যে মিথ্যা জয়ধ্বনি উচ্চারণ করিয়া দূরস্থিত শত্রুর অপর বাহিনীর মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি করিবে।

ধর্ম্মযুদ্ধে রথী রথীর সহিত, অশ্বারোহী অশ্বারোহীর সহিত রণরঙ্গে লিপ্ত হইবে। পুরুষোচিত উদারতা রণক্ষেত্রে প্রদর্শিত হইবে, শত্রুকে যথাশক্তি যুদ্ধ করিবার পূর্ণ সুযোগ দান করিতে হইবে। কূটযুদ্ধের নিয়ম তাহা নহে; ছলে বলে কৌশলে কার্য্যসিদ্ধিই এই যুদ্ধের প্রধান নীতি। ধর্ম্মযুদ্ধে, বিষাক্ত তীর, যানভ্রষ্টের প্রতি অস্ত্রনিক্ষেপ, যুক্ত-করে "অহং তবাস্মি" উচ্চারণকারী রণবিমুখ ব্যক্তিকে আক্রমণ, উলঙ্গ, অস্ত্রহীন, নিরপেক্ষ, নিদ্রিত, ভীত, পলায়নপর, অস্ত্রশস্ত্রবাহী, যুদ্ধে অসমর্থ ব্যক্তির প্রতি অস্ত্রনিক্ষেপ বিশেষভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে।

বন্দীদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার করিতে হইবে; আহত সৈন্যের সুচিকিৎসা করিতে হইবে; অবিবাহিতা নারী বন্দিনী হইলে তাহার প্রতি বিশেষ সম্মান দেখাইতে হইবে; রাজার প্রস্তাবিত সৈনিকপুরুষের সঙ্গে বিবাহে অসম্মত হইলে, সাবধানে তাহাকে নিজরাজ্যে প্রেরণ করিবে। কোনও নগর অধিকৃত হইলে, কলাবিদ্যায় পারদর্শী, মোক্ষকামী, রুগ্ন ও বিকৃতমস্তিষ্কের প্রতি কোনও প্রকার অত্যাচার না হয়, তজ্জন্য রাজা বিশেষ আজ্ঞা প্রদান করিবেন। রণশেষে দক্ষ সৈন্যদিগের পুরস্কার রাজা ঘোষণাপত্রে প্রকাশ করিবেন। নিজ বাহুবলে শত্রুদমনকারী সৈনিকেরা বিপক্ষের রথ, অশ্ব, হস্তীর অধিকারী হইবেন। বহুমূল্য মণিমাণিক্যাদি ও অর্থ রাজকোষে যাইবে। পরাজিত রাজার স্ত্রীকে নিজ মাতার ন্যায় সম্মান করিতে হইবে। পরাজিত দেশের রীতি নীতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে হইবে। আহত ও মৃত সৈন্যের পরিবারবর্গের ভরণপোষণের ভার রাজা গ্রহণ করিবেন। বিজয়লব্ধ দ্রব্যসামগ্রী যথাসম্ভব প্রজাদিগের মধ্যে বিতরণ করা হইবে।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র রায়।

কঠোর কাব্য।

[স্বর্গীয় ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় লিখিত।]

যিশু খৃষ্ট খৃষ্টানের অবতার,—আংশিক নহেন, পূর্ণাবতার। খৃষ্টানী মতে, তিনি ঈশ্বরের পুত্র, প্রতিনিধি, পূর্ণস্বরূপ;—তিনি পাপীর পরিত্রাতা, পৃথিবীর পুণ্যশ্লোক, পৃথিবীতে একমাত্র সত্য ও প্রকৃত ধর্ম্ম—খৃষ্ট ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। খৃষ্টানের বিবেচনায়, খৃষ্টধর্ম্ম-গ্রহণ ও যিশুখৃষ্ট-ভজন ভিন্ন জীবের আদৌ গতি নাই; মুক্তির পথ একেবারেই অবরুদ্ধ; জীব অনন্ত কাল নরক ভোগ করিবে। সে যেমন তেমন নরক নয়, অতি ভীষণ দুরন্ত নরক,—গন্ধক দ্রাবকের নিদারুণ বাষ্পময়! যিনি খৃষ্টান না হইবেন, যিশু খৃষ্ট না ভজিবেন, তিনি নিশ্চয়ই সেই নরকের মৌরসী বাসিন্দা হইয়া, গন্ধক বাষ্পের পারাবারে ডুবিয়া থাকিবেন, কোনও কালেই কিছুতেই উদ্ধার পাইতে পারিবেন না। যিশু খৃষ্ট নিজের রক্ত দিয়া পরমেশ্বরের নিকট পৃথিবীর পাপের হিসাব পরিষ্কার করিয়াছেন; পৃথিবীর পাপের দরুণ পরমেশ্বরের আর এক কপর্দ্দকও পাওনা নাই; সে হিসাবে এখন যত কিছু পাওনা, সমস্তই যিশু খৃষ্টের। মানুষ মানুষীমাত্রই যিশু খৃষ্টের খাতক, যিশুর খাতায় পাপ খাতে সকলেই ঋণী; অতএব যিশু ভজিতে বাধ্য।

সংক্ষেপে খৃষ্টধর্ম্মের সার মর্ম্ম এই। কিন্তু মর্ম্ম ও মত যাহাই হউক, পসার ইহার খুব। পৃথিবীর অনেকটা জায়গা যিশু খৃষ্ট জুড়িয়া রাখিয়াছেন। আফ্রিকার কাফ্রিস্থানের মত, হিন্দুস্থানের বক্ষের উপরেও, খৃষ্টীয় পাদরী পঙ্গপালবৎ বিদ্যমান! পাপীর পাপের মূল্য আদায় করিবার জন্য বেত্রহস্তে অষ্ট প্রহর অলিতে গলিতে ঘুরিতেছেন। স্থান নাই, অস্থান নাই, কালাকাল পাত্রাপাত্র নাই, সর্ব্বত্র, সর্ব্বসমক্ষে এবং সর্ব্বক্ষণে পেশাদার খৃষ্টীয় পুরোহিত "মথি-লিখিত সুসমাচার" প্রচার-ব্যপদেশে, খৃষ্টধর্ম্ম ভিন্ন বিশ্ব সংসারের আর সমস্ত ধর্ম্মকেই দংশন করিয়া থাকেন। হিন্দু দেব দেবীর উদ্দেশে খৃষ্টান পাদরীর আক্রমণ স্মরণেও মহাপাতক জন্মে। কিন্তু খৃষ্ট যাজক যৎকালে এই প্রকার পুণ্যময় যাজন কার্য্যে নিযুক্ত, তৎকালে খৃষ্ট ধর্ম্মের অবস্থা কি? স্বয়ং যিশু খৃষ্ট কি অবস্থাপন্ন?

খৃষ্টীয় ভূমে, বিলাতে, মার্কিণে, ইংলণ্ডে লণ্ডনে, খৃষ্টধর্ম্ম ক্ষিপ্রহস্তে আক্রান্ত; যিশুখৃষ্ট প্রবঞ্চক পদবীতে নীত, তাঁহার প্রবঞ্চনা প্রমাণীকৃত; যিশুখৃষ্ট জুয়া

ক্ষেত্রের জীব অপেক্ষাও নিন্দিত! এক দিকে বিজ্ঞানের সুতীক্ষ্ণ কৃপাণে, অপর দিকে কাব্য সাহিত্যের মর্ম্মভেদী অগ্নিবাণে যিশুখৃষ্ট ক্ষত বিক্ষত, শোণিতাক্ত! অতি অপকৃষ্ট ও অসংখ্য অপরাধে তিনি অভিযুক্ত, ধৃত, অর্গলবদ্ধ, অবমানিত!

বিলাতী বিজ্ঞান, বহুদিন হইল, খৃষ্ট ধর্ম্ম 'খারিজ' করিয়াছেন। এখন, ইংরেজ কবি,—খৃষ্ট-মন্ত্রে দীক্ষিত, খৃষ্টধর্ম্মে শিক্ষিত, পালিত ও বর্দ্ধিত ইংরেজ কবি খৃষ্টভূমির বক্ষের উপর দাঁড়াইয়া, যিশুখৃষ্টকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, প্রতিভার প্রখর প্রবন্ধ শত ধারায় ছুটাইয়া, কবির কলকণ্ঠে গাহিতেছেন :—

> Humanity itself shall testify
> Thy kingdom is a dream, thy word a lie,
> Thyself a living canker and a curse
> Upon the body of the universe.

ইহা ভয়ঙ্কর! ইহা অতি মর্ম্মান্তিক আক্রমণ! এ সম্বোধন শোচনীয়। তেজিয়ান ইংরেজ কবির এই ইংরেজী কবিতার তীব্র তড়িৎ নিরীহ হিন্দুর নিস্তেজ ভাষায়, কৃশ বাঙ্গালীর কোমল বাঙ্গালায় ব্যক্ত হইতে পারে না। কিন্তু ইহা অপেক্ষা আরও ভয়ঙ্কর আছে।

আমরা হিন্দু। খৃষ্টান পাদরী আমাদিগকে অনেক গালি গালাজ দেন। আমাদের উর্দ্ধ এবং অধঃ অশীতি পুরুষের জন্য অনন্ত নরক ব্যবস্থা করেন। আমাদের দেবতাদিগকে দুর্ব্বাক্য বলিতে অগ্রপশ্চাৎ ভাবেন না। হিন্দুর উপর খৃষ্টান এত অত্যাচার সত্ত্বেও কিন্তু যিশুখৃষ্টের প্রতি উল্লিখিত উক্তিতে আমাদের হিন্দু হৃদয় বস্তুতই ব্যথিত হয়। যখন খৃষ্টান কবি যিশুখৃষ্টের প্রেতাত্মাকে জাগাইয়া, সশরীরে সম্মুখে খাড়া করিয়া, উগ্র কবিতার আগ্নেয় উচ্ছ্বাসে অন্তর্দগ্ধ করিয়া অবমাননার অভিষেক করিয়া বলেন :—

'সমগ্র মানব জাতি সমস্বরে সাক্ষ্য দিবে, একবাক্যে বলিবে, তুমি ভণ্ড, তুমি পাষণ্ড, তোমার বাক্য মিথ্যা, তোমার স্বর্গরাজ্য স্বপ্নবৎ অলীক! তুমি বিশ্ব সংসারের সাংঘাতিক ব্যাধি, তুমি জীবন্ত অভিশাপস্বরূপ।'

তখন হিন্দু হৃদয় স্তম্ভিত হয়, ব্যাকুল ও বিরক্ত হয়। মনোমধ্যে এইরূপ চিন্তার উদয় হয় যে, তবে খৃষ্টানের কি ব্যবহারই এই! খৃষ্টধর্ম্মের কি প্রকৃতিই এই! যে খৃষ্টান খৃষ্টে বিশ্বাসী, তিনি পরনিন্দা, পরকুৎসা ও পর-ধর্ম্মের উপর ময়লা মাটী নিক্ষেপ করেন। পক্ষান্তরে, যে খৃষ্টান খৃষ্টে অবিশ্বাসী, তিনি স্বয়ং যিশুখৃষ্টকেও জাহান্নমে পাঠাইতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয়েন না।

উল্লিখিত কবির উদ্দেশ্য যাহাই হউক, স্বধর্ম্মে বিশ্বাসী খৃষ্টানের অন্তরে এক বিন্দুও আঘাত করা অন্ততঃ আমাদের উদ্দেশ্য নয়। পরন্তু ইহাও আমরা জানি,—খৃষ্টান পাদরী জানেন না বটে, কিন্তু আমরা জানি যে, কাহারও আঘাতে আক্রমণে বিশ্বসংসারের কোনও বদ্ধমূল ধর্ম্ম কখনও বিনষ্ট হয় না। তবে ধর্ম্মের অভ্যন্তরে অন্ততঃ অল্পপরিমাণেও প্রকৃত পদার্থ থাকা চাই। খৃষ্ট-ধর্ম্মে তাহা আছে কি না, সে বিচার করা আমাদের অধিকারাধীন নহে। খৃষ্টীয় ভূমে খৃষ্ট ধর্ম্মের ইদানীং কি অবস্থা, তাহারই কেবল একটু আভাস দিবার জন্য ইংরেজ কবির ইংরেজী কাব্যের অবতারণা।

কিন্তু এই কবি কে? আধুনিক ইংরেজ কবিদিগের মধ্যে স্নইনবরণ এক সময়ে খৃষ্ট ধর্ম্মের সংহারার্থ স্বকীয় কবি-শক্তির প্রয়োগ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেটী সূক্ষ্ম শক্তি। সেই সূক্ষ্ম শক্তি অধুনা অপর এক শক্তিশালী কবি কর্ত্তৃক মাংস-মেদ-শোণিতে সুকঠিন শরীরযুক্ত হইয়া খৃষ্ট ধর্ম্মের সম্মুখে সদর্পে দণ্ডায়-মান। খৃষ্ট-রাজ্যের যাহাকে তাহাকে নয়, স্বয়ং যিশুকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতেছে! খৃষ্ট ধর্ম্মের অনাচার, অত্যাচার ও উদ্ধার-অকর্ম্মণ্যতার জন্য কৈফিয়ৎ চাহিতেছে,—কঠোর কাব্যে কঠিন কৈফিয়ৎ।

মিষ্টার রবার্ট বাচনান এখনকার ইংরাজী সাহিত্যের বর্দ্ধিষ্ণু কবি। এই কবি এক অভিনব কাব্য লিখিয়াছেন,—তাহার নাম "দি ওয়াণ্ডারিং জিউ।" ইহা বড়দিনের বই,—ক্রিষ্টমাসের আনন্দসঙ্গীত। আনন্দসঙ্গীতই বটে! এমন আনন্দসঙ্গীত কেহ কখনও শুনেন নাই। আহা! আনন্দে কেবল অন্ধকার আর সংহার;—শোণিত ও সন্তাপ!

মাথায় হ্যাট, মুখে চুরুট, চক্ষে চশমা, গলে কোরিয়ার ব্যাগের চর্ম্মোপবীত দোদুল্যমান, হস্তে 'মথি-লিখিত সুসমাচার'—পুণ্যবন্ত পাদরী সাহেব সগর্ব্বে বলিতে পারেন,—'উহা শয়টানকা সংগীট'। হইতে পারে, উহা শয়তানের সংগীত; হইতে পারে, উহা অপবিত্র পৈশাচিক কবিতা। কিন্তু পাদরী সাহেব নিজে যে ঐ হিন্দুর আরাধ্য ইষ্ট দেবতার উদ্দেশে অভদ্র বক্তৃতা করিতেছেন,—উহা কি? উহা কাহার? সম্ভবতঃ উহা কখনই শয়তানের নয়।

কবি 'ক্রিষ্টমাস্ ইভে' একাকী লণ্ডনে ভ্রমণ করিতেছেন। সহসা সম্মুখে এক বৃদ্ধ,—অতি বৃদ্ধ ইহুদীকে দেখিলেন। রুগ্ন, ভগ্ন, কুব্জ, কুৎসিত, অতিশয় বীভৎস-দর্শন এই ইহুদী। কবি প্রথমতঃ ইহাঁকে পৃথিবীর পরিত্যক্ত, অবমানিত, ঘৃণিত, বিশ্বসংসারে বাস্তভিটাবিহীন 'ভবঘুরে' ইহুদী, অর্থাৎ 'ওয়াণ্ডারিং জিউ' বলিয়া

মনে করিলেন; কিন্তু পরে চিনিতে পারিলেন যে, ইনি 'যিসস্ দি জিউ', অর্থাৎ ইহুদী যিশু খৃষ্ট।

কাব্যের এই প্রথম দৃশ্য কবি-প্রতিভায় প্রচণ্ডভাবে প্রস্ফুট। খৃষ্টধর্ম্মের অনুষ্ঠানে এবং আচরণে পৃথিবীর যে দুর্দ্দশা হইতেছে, কবি বিবেচনা করেন, ইহা তাহারই প্রতিলেখ্য।

কাব্যের অপর উচ্ছ্বাসে খৃষ্টধর্ম্মের শত্রু মিত্র সকলেরই সূক্ষ্মাত্মা সংমিলিত হইয়া সাধারণভাবে যিশু খৃষ্টের বিচারে বসিয়াছে। যিশু অতি দীনভাবে, মলিন-বেশে, অবনতবদনে, অসংখ্য অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া, নির্বাক্ নিশ্চেষ্টভাবে সাধারণ মতের ধর্ম্মাধিকরণে দণ্ডায়মান! খৃষ্টধর্ম্মে নিরাশ হইয়া জীবের নাস্তিক জীবাত্মা যিশুখৃষ্টকে বলিতেছে;—

That all thy promise was a mockery;
That fatherhood and Godhead there is none;
No Father in heaven and in earth no son;
That darkness never can be light, that still
Death shall be death, despite thy wish or will,
That death alone can comfort souls bereaven
And shed on earth the eternal sleep of heaven.

ইহা নৈরাশ্য এবং নাস্তিকতার অতি ভীষণ মূর্ত্তি। নিরাশ খৃষ্টান খৃষ্টকে বলিতেছেন;—

'তুমি যে সকল আশা দিয়াছিলে, সে সবই তামাসায় পরিণত; তোমার অঙ্গীকার উপহাসের আকর হইয়াছে। ঈশ্বরের পুত্র নাই, ঈশ্বরই বা কোথায়! পরলোকে পিতৃত্ব ও পৃথিবীতে পুত্রত্ব,—হায়! এ সব তোমার প্রবঞ্চনা! তোমার কথিত ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও তোমার পুত্রত্ব ও প্রতিনিধিত্বের অস্তিত্বমাত্র নাই! মৃত্যু মৃত্যু!! অন্ধকার, অন্ধকার! একমাত্র অনন্ত নিদ্রা! সেই নিদ্রাতেই কেবল জীব-যাতনা জুড়ায়! জগৎ শান্ত হয়।'

খৃষ্টধর্ম্মের জন্য যাঁহারা প্রাণ দান করিয়াছিলেন, যাঁহারা মনুষ্যশোণিতে জগৎ প্লাবিত করিয়াছিলেন, তাঁহারা যিশুর সম্মুখে আসিয়া তাঁহার অপরাধের সাক্ষ্য দিতে ধর্ম্মাধিকরণে দাঁড়াইলেন;—

A throng of martyrs slain,
Bloody and maim'd and worn, who wailed in pain,
Fixing their piteous eyes on that Jew.

ক্রমে তথায় বুদ্ধ আসিলেন, মোজেস ও মনু আসিলেন, জিরোষ্টার আসিলেন, মহম্মদ ও কনফিউসাস প্রভৃতি পৃথিবীর অনেকগুলি ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলেই যিশু খৃষ্টের প্রতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া একবাক্যে বলিলেন;—

'এই—এই ব্যক্তিই সংসারের সর্ব্বনাশ করিয়াছেন; পৃথিবীকে পাপ-পঙ্কে ডবাইয়াছেন; পৃথিবীর সর্ব্বত্র অভিশপ্ত করিয়াছেন, সর্ব্বত্র অভিশাপস্বরূপ হইয়াছেন। ইনিই পুণ্যময় সুখ-শান্তিময় মনুষ্যলোককে, সংক্রামকরোগপীড়িত-মনুষ্যপূর্ণ অন্ধকূপে পরিণত করিয়াছেন।'

This man hath been curse in every clime &c.

এই সময় সেই ধর্ম্মাধিকরণ সহস্র সহস্র শোণিতাক্ত, আপাদমস্তক ক্ষত-বিক্ষত, বিকলাঙ্গ, বিকটবদন, উলঙ্গ উলঙ্গিনী, মানুষ মানুষী, বৃদ্ধ বৃদ্ধা, যুবক যুবতী, বালক বালিকায় পূর্ণ হইল। মানুষ মানুষের মহাপ্রাণী ছিঁড়িল, রক্ত-কুম্ভ উপড়াইল। বায়ু পূতিগন্ধে বিষাক্ত হইল। দশ দিকে হত্যা ও হা হতোস্মি রব ছুটিল।

তখন,—যিশু অবাক্, অবসন্ন! জ্বলন্ত যাতনায় অধীর, কিন্তু অবাক্! তখন—

He the man, forlorn, stood mute in woe!

যিশু আত্মসমর্থনের জন্য অনুরুদ্ধ হইলেন। অতি কষ্টে, অর্দ্ধস্ফুট অস্পষ্টস্বরে বলিলেন,—

'হায়! আমার কিছুই বলিবার নাই! আমি বৃদ্ধ, বিপন্ন, রুগ্ন, অবসন্ন! আমার আসন্নকাল উপস্থিত! যাতনায় আমার জীবাত্মা ঝলসিতেছে! আমার হৃৎপিণ্ড ফাটিতেছে!'

'ভার্জ্জিন মাদার', 'জন দি ব্যাপ্‌টিষ্ট', 'সেণ্ট পল' প্রভৃতি এই সময়ে উত্থিত হইয়া যিশুখৃষ্টকে আশ্বস্ত করিলেন। অতি ক্ষীণস্বরে মঙ্গল-গীতি 'Hossannah to the Lord' গায়িলেন! যিশুকে বিনয় করিয়া বলিলেন,—

"আপনি স্বর্গের দ্বার উদ্‌ঘাটন করুন, আমরা পিতার পবিত্র মূর্ত্তি সন্দর্শন করি, সকলে আশ্বস্ত ও বিশ্বস্ত হউক।"

কিন্তু হায়! মঙ্গলগীতি সন্তাপকোলাহলে ডুবিয়া গেল; যিশু কোনও উত্তর করিলেন না; কাঁপিতে লাগিলেন, এবং কাঁদিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে একটু আত্মস্থ হইয়া যিশু বলিলেন, 'হা! আমার স্বপ্ন বৃথা হইয়াছিল,—বিফল হইয়াছে! ইহা আমি অতঃপর বুঝিয়াছি!'

'My dream was vain!
woe to ye all! and endless woe to me,
who deem'd that I could save Humanity.

'পরিতাপ! পরিতাপ! পরিতাপ-পারাবারে তোমরা সকলেই ডুবো,—অনন্ত সন্তাপ আমাকে গ্রাস করুক; অনর্থক আশা করিয়াছিলাম যে, আমি ভূভার-উদ্ধারে সমর্থ হইব।'

অতঃপর কবির কাব্যেও আর কোনও কথা চলে না। কিন্তু খৃষ্ট-শিক্ষায় শিক্ষিত কবি তবুও নিরস্ত হয়েন নাই। ইহার পরও যিশু খৃষ্টের আরও অনেক দুর্গতি করিয়াছেন। কিন্তু সে সব দৃশ্য আমরা দেখাইব না। যাহা দেখান হইয়াছে, তাহাতেই হিন্দু সন্তানের শরীর মন শিহরিবে। কিন্তু খৃষ্টান পাদরী বিদেশ ছাড়িয়া স্বদেশে যাইয়া কি খৃষ্ট-মহিমা প্রচার করিবেন না?

মহাকবি মধুসূদন।

১

আজ মহাকবি মাইকেল মধুস্থদন দত্তের মৃতাহ। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ২০শে জুন রবিবার বেলা দুইটার সময় আলিপুরের দাতব্যচিকিৎসালয়ে মধুস্থদন ইহলীলা সংবরণ করেন। তাহার পর বিয়াল্লিশ বৎসর অতীত হইয়াছে।

তাঁহার মৃত্যুকালে 'সমাজ-দর্পণ' নামক সংবাদপত্রের সম্পাদক লিখিয়াছিলেন,—'দুঃখের বিষয় এই, আমরা মাইকেলের অশৌচ গ্রহণ করিতে পারিলাম না। কারণ, ওরূপ করিলে তৎক্ষণাৎ জাত্যন্তর ও সমাজচ্যুত হইতে হইবে। * * * হা মাইকেল, তোমার অন্ত্যেষ্টির সময় তোমার নিকটে গিয়া তোমার আত্মীয়গণ রোদন করিতে পারিল না! তুমি পরের মত বিদেশী ম্লেচ্ছগণের হস্তে মস্তক প্রদান করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছ! তুমি কবরে যাইবার সময় বিজাতীয়েরা তোমার সঙ্গে সঙ্গে গমন করিয়াছিল, আমরা সজলনয়নে দূর হইতেই কিয়ৎকাল নিরীক্ষণ করিয়াছিলাম, নিকটে যাইবার ইচ্ছা করিলেও যাইতে পারিলাম না! হিন্দু ধর্ম্মের পারে গমন করিয়া তুমি যেন সমুদ্রপারবর্ত্তী জনের ন্যায় বহুদূরবর্ত্তী হইয়া পড়িলে!'

'সমাজ-দর্পণে'র এই খেদে তখনকার বাঙ্গালার ছবি প্রতিফলিত হইয়াছে। মাইকেলের প্রতি বাঙ্গালীর মনের ভাবও প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। আত্মরক্ষাকল্পে আত্মস্থ, অতিসাবধান, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, পরধর্ম্মভীরু সেকালের বাঙ্গালী মধুস্থদনকে জাতির মহাকবি বলিয়া বরণ করিয়াছিলেন, মধুস্থদনের প্রতিভার পূজা করিয়াছিলেন। কিন্তু তখনও 'স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ' ও 'পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ' হিন্দুর সমাজস্থিতির এই দুই পরস্পর-সাপেক্ষ মূলমন্ত্র, কাল-প্রবাহে প্রতিহত হইয়াও, সমাজে সমুজ্জ্বল ছিল। তাই মাইকেলের প্রতিভায় মুগ্ধ হিন্দু,

জাতীয় কবিকে 'আপনার হ'তে আপনার' বলিয়া ভাবিয়াও, 'সমুদ্রপারবর্ত্তী জনের ন্যায় বহুদূরবর্ত্তী' বিবেচনা করিয়া দূরে রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সমাজ-শাসন-নিয়ন্ত্রিত হিন্দুর শ্রদ্ধা তখন বাহিরে বিকশিত হয় নাই ;—কিন্তু হিন্দু খৃষ্টান মধুসূদনের জন্য কাঁদিয়াছিল ; তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিবার অধিকারে বঞ্চিত হইয়া কাঁদিয়াছিল।

২

তাহার পর বহু বর্ষ অতীত-সাগরে মিশিয়াছে। সমাজের সে দুর্গ ভূমিসাৎ হইয়াছে। এখন বাঙ্গালী অকুণ্ঠিতচিত্তে সমাধিক্ষেত্রে অন্যধর্ম্মাবলম্বীর শবের অনুসরণ করে ; গির্জ্জায় বিবাহের নিমন্ত্রণ রক্ষা করে। সে-কাল বিধানে শৃঙ্খলিত ছিল। এ-কাল মুক্ত ! এ-কালে দাঁড়াইয়া সে-কালের বিচার করিলে অনেক কথা বুঝা যায়।

পরধর্ম্মাশ্রিত, স্ব-সমাজচ্যুত পরসমাজভুক্ত মাইকেল, সর্ব্বপ্রকারে বাঙ্গালীর জাতীয়-জীবন-পরিধির বহির্ভূত হইয়াও, কোন্ গুণে, কোন্ অধিকারে, কিসের প্রভাবে বাঙ্গালীর হৃদয় জয় করিয়াছিলেন, আজ তাহা ভাবিয়া দেখিলে লাভ আছে। ব্যথিত পিতার মত যে হিন্দু সমাজ ভ্রুকুটীকুটিলমুখে উরগক্ষত অঙ্গুলীর ন্যায় স্বধর্ম্মত্যাগী মধুসূদনকে ত্যাগ করিয়াছিলেন, মাইকেল মধুসূদন কোন্ শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া সেই ক্রুদ্ধ সমাজের রুদ্ধ দ্বার ভাঙ্গিয়া হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া গরুড়ের মত সমগ্র জাতির প্রেমামৃত হরণ করিয়াছিলেন ?

ইহা ভাবিয়া দেখিবার কথা, বুঝিয়া দেখিবার কথা।

৩

বঙ্কিম বলিয়াছিলেন,—'স্মরণীয় বাঙ্গালীর অভাব নাই। কল্লুকভট্ট, রঘুনন্দন, জগন্নাথ, গদাধর, জগদীশ, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, রামমোহন রায় প্রভৃতি অনেক নাম করিতে পারি। অবনতাবস্থায়ও বঙ্গমাতা রত্নপ্রসবিনী। এই সকল নামের সঙ্গে মধুসূদন নামও বঙ্গদেশে ধন্য হইল।'

কবি মধুসূদন বাঙ্গালা সাহিত্যে নূতন রত্ন দান করিয়াছিলেন, সেই জন্য তাঁহার নামে বঙ্গদেশ ধন্য হইয়াছে, ধন্য হইতেছে। কিন্তু কাব্য, কবিতা ও কবিত্বই তাহার কারণ নয়। যে গুণে কাব্য, কবিতা ও কবিত্ব অমর হয়, যে ধর্ম্মে কাব্য, কবিতা ও কবিত্ব পবিত্র, সার্থক ও ধন্য হয়, মাইকেল সেই ধর্ম্মের অধিকারী ছিলেন। যাহার অভাবে কবিত্ব পুরীষ-লিপ্ত পুষ্পের মত শোচনীয়

সমবেদনা ও সহানুভূতিই কবির জীবন সার্থক করে। মাইকেল সেই সমবেদনা ও সহানুভূতির উৎস ছিলেন।

৪

আজন্ম বিদেশী তন্ত্রে শিক্ষিত, বিজাতীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত, বিদেশের ভাষায়, চিন্তায়, ভাবে, সাহিত্যে অনুপ্রাণিত হইয়াও মধুসূদন স্বদেশী তন্ত্র বিস্মৃত হন নাই। স্বদেশের ভাষায়, ভাবে তাঁহার—শুধু অনুরাগ নয়,—সহানুভূতি ও সমবেদনা ছিল। সেই সহানুভূতি ও সমবেদনার সঙ্গমে দেশবাৎসল্যের স্বর্গীয় কহ্লার সহস্র দলে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। সেই কহ্লারের সৌন্দর্য্যে, সৌরভে বাঙ্গালার সাহিত্য ও সমাজ মাতিয়া উঠিয়াছিল! মমতা-বুদ্ধির 'চোখের জলের বাঁধন দিয়ে' মাইকেল বাঙ্গালীকে 'মায়াডোরে বাঁধিয়াছিলেন!'

যৌবনে উন্মার্গগামী, দেশপ্লাবী নব-ভাবের আকস্মিক দীপ্তিচ্ছটায় অন্ধ মধুসূদন পর-ধর্ম্মের আশ্রয়-ভিক্ষা করিয়াছিলেন।—তাঁহার উত্তরজীবন দেখিয়া বোধ হয়, গতজীবনের মোহ শেষ-জীবনে ছিল না। পরধর্ম্মাশ্রিত মাইকেল স্বধর্ম্ম-নন্দনের কল্পতরু পুরাণ হইতে মেঘনাদ, তিলোত্তমা, ব্রজাঙ্গনা চয়ন করিয়াছিলেন; চতুর্দ্দশপদী কবিতায় বাঙ্গালার ভাব, ভাষা ও মহাপুরুষগণের পূজা করিয়াছিলেন; কৃষ্ণকুমারী ও শর্ম্মিষ্ঠায় ইতিহাসের ও পুরাণের ছবি আঁকিয়াছিলেন; বুড়ো শালিক ধরিয়া রঙ্গ করিয়াছিলেন; 'একেই কি বলে সভ্যতা'য় কলঙ্কের কালী দিয়া বানরের বিদ্রূপ-চিত্র টানিয়া 'চিন্তা করিয়া' বলিয়াছিলেন,—'বেহায়ারা আবার বলে কি যে, আমরা সাহেবদের মতন সভ্য হয়েছি। হা আমার পোড়া কপাল! মদ-মাস খেয়ে ঢলাঢলি কল্লেই কি সভ্য হয়? একেই কি বলে সভ্যতা?'

ইহা আত্ম-বিশ্লেষণের ফল কি না, সাহস করিয়া বলিতে পারি না। কিন্তু ইহা মাইকেলের সরলতা ও অকপটতার পরিচায়ক, সে পক্ষে সন্দেহ নাই।

মাইকেলের 'আত্মবিলাপে' তীব্র অনুশোচনার ও গভীর হতাশার আর্ত্তি ও অভিব্যক্তি দেখিয়া চোখে জল আসে।—

> 'আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু, হায়,
> তাই ভাবি মনে!'

পর-ধর্ম্ম-গ্রহণেও কি সে 'আশার ছলন' ছিল না?

৫

মাইকেল বিদেশী সাহিত্যের সৌখীন উদ্যান হইতে স্বদেশী সাহিত্যের মনোজ্ঞ

মালঞ্চে ফিরিয়াছিলেন। পর-তন্ত্রে সুপ্ত সিংহ সহসা জাগিয়া স্ব-তন্ত্রের জন্য লালায়িত হইয়াছিলেন। তাই তিনি মাতৃভাষাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন,—

'হে বঙ্গ! ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন
তা সবে, (অবোধ আমি) অবহেলা করি;
পরধনলোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।
কাটাইনু বহু দিন সুখ পরিহরি,—
অনিদ্রায় অনাহারে, সঁপি কায়, মন,
মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি;—
কেলিনু শৈবালে, ভুলি কমল-কানন।
স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী ক'য়ে দিলা পরে,—
'ওরে বাছা! মাতৃ-কোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি?
যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যা রে ফিরি ঘরে!
পালিলাম আজ্ঞা সুখে, পাইলাম কালে
মাতৃ-ভাষা-রূপে খনি, পূর্ণ মণিজালে।'

এমন স্বপ্ন ক' জনের ভাগ্যে ঘটে? এমন ভাবে পরদেশমুগ্ধ ভিক্ষুক-জীবন পদদলিত করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া মাতৃভাষারূপ মণিজালে পূর্ণ খনির অক্ষয় ভাণ্ডারে নূতন হীরা, মাণিক, মতি ঢালিয়া দিবার সৌভাগ্য কয় জন লাভ করে?

আবার ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের ভারসেলস্ নগরে প্রবাসী মাইকেল 'চতুর্দ্দশ-পদী কবিতাবলী'র 'সমাপ্তে' আত্ম-নিবেদন করিয়াছিলেন,—

'—নারিনু মা, চিনিতে তোমারে
শৈশবে, অবোধ আমি, ডাকিলা যৌবনে;
(যদিও অধম পুত্র—মা কি ভুলে তারে?)
এবে ইন্দ্রপ্রস্থ ছাড়ি যাই দূর বনে!'

ইহাও কি মহাকবির আত্মবিস্মৃতির পর উদ্বোধনের পরিচায়ক নহে? মোহের ফল বিস্মৃতি;—তাহার পর স্বপ্ন ও জাগরণ। মাইকেলের চিত্ত-নির্ঝরের 'স্বপ্নভঙ্গ' কি সুন্দর!

৬

প্রতিভার বরপুত্র মধুসূদন স্বদেশের বৈভবে অবহেলা করিয়া, পরধনলোভে মত্ত হইয়া, পরদেশে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া, 'অবরেণ্যে বরিয়া' বহুদিন 'বিফল তপে' মজিয়াছিলেন; নিরাশ হইয়াছিলেন। কিন্তু অনিদ্রায়, অনাহারে,

'সুখ পরিহরি' রত্নের অন্বেষণ করিলে, বরেণ্যের ধ্যান করিলে, সাধকের 'তপ' নিষ্ফল হয় না। বাঙ্গালার কুল-লক্ষ্মী মাইকেলের সাধনায় প্রসন্ন হইয়া স্বপ্নে তাঁহাকে পর-তন্ত্র ছাড়িয়া স্ব-তন্ত্র আশ্রয় করিবার ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। মাইকেল সংক্ষিপ্ত জীবনে কুল-লক্ষ্মীর ইঙ্গিত যথাসম্ভব পালন করিয়া গিয়াছেন। আজ তাঁহার মৃতাহে—পর-তন্ত্র, পর-ভাব-মত্ত, আত্মবিস্মৃত, মাতৃভূমির বৈভবে বঞ্চিত, স্ব-তন্ত্রের ঐশ্বর্য্যে অন্ধ বাঙ্গালী! আত্ম-অন্বেষণ জীবনের সার কর। 'অবরেণ্যে বরি' মানব-জীবন সার্থক—সফল—চরিতার্থ হয় না। তুমি কোন্ ছার—প্রতিভা-শালী পুরুষসিংহ মাইকেল পর-পথের পথিক হইয়া অনুশোচনায় মথিত হইয়া-ছিলেন। সেই মহাকবির অভিজ্ঞতার মহাফল আজ তোমার। স্মরণ কর আত্মগৌরব, বর্জ্জন কর 'পরদেশে' ভিক্ষাবৃত্তি, বরণ কর আত্ম-শক্তি। 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়'।

৭

স্বদেশী তন্ত্রে শ্রদ্ধাই দেশভক্তি। দেশভক্তি সোনার পাথর-বাটী নয়; কাঁঠালের আমসত্ত নয়। মাইকেলের বঙ্গভূমির প্রতি সম্ভাষণ দেশ-তন্ত্রের প্রথম গান—দেশভক্তির প্রথম উচ্ছ্বাস—স্বদেশী কবির প্রথম ঝঙ্কার। মাইকেলের বঙ্গ-স্তোত্র সৌন্দর্য্য-পুষ্পের গুচ্ছ নয়। সে গান—মিনতি—প্রার্থনা—মা'র কাছে আদুরে ছেলের আব্দার। তাহাতে বাঁচিবার সাধ আছে, কামনা আছে। আজ মধুসূদনের মৃতাহে বাঙ্গালী জাতীয় কবির 'কামনা' পাঠ কর—

'সাধিতে মনের সাধ,
ঘটে যদি পরমাদ,
মধুহীন করো না গো তব মনঃ-কোকনদে।
প্রবাসে দৈবের বশে
জীবতারা যদি খসে
এ দেহ-আকাশ হ'তে, নাহি খেদ তাহে।
জন্মিলে মরিতে হবে,
অমর কে কোথা কবে ?
চির-স্থির কবে নীর হায় রে জীবন-নদে ?
কিন্তু যদি রাখ মনে,
নাহি মা ডরি শমনে—
মক্ষিকাও গলে না গো পড়িলে অমৃত-হ্রদে!
সেই ধন্য নরকুলে,
লোকে যারে নাহি ভুলে,

কিন্তু কোন্ গুণ আছে,
যাচিব যে তব কাছে
হেন অমরতা আমি, কহ গো শ্যামা জন্মদে!
তবে যদি দয়া কর,
ভুল দোষ, গুণ ধর,
অমর করিয়া বর দেহ দাসে, সুবরদে!
ফুটি যেন স্মৃতি-জলে
মানসে, মা, যথা ফলে,
মধুময় তামরস, কি বসন্তে, কি শরদে!"

মাইকেল 'নূতন মালা গাঁথিয়া,' গৌড়জন-সুখাবহ 'মধুচক্র রচিয়া' বহুদিন নশ্বর সংসার ত্যাগ করিয়াছেন। আজ বিরোধ, বিদ্বেষ ও ঐহিক সুখ দুঃখের অতীত মহাকবি মধুসূদনের স্মৃতি সপ্রমাণ করিতেছে,—'কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি!' মধুসূদন বাঙ্গালীর মানসে, স্মৃতি-জলে, কি বসন্তে কি শরদে, মধুময় তামরসের মত দিব্যশ্রীমণ্ডিত হইয়া ফুটিয়া আছেন। নিন্দুকের,—পরকীর্ত্তিদ্বেষী প্রগল্ভের সাম্প্রদায়িক নিন্দার ঝড়ে সে তামরস ঝরে নাই, ঝরিবে না।

৮

যে মধুসূদন 'স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল—ত্রিভুবনের রমণীয় এবং ভয়াবহ প্রাণী ও পদার্থসমূহ সম্মিলিত করিয়া পাঠকের দর্শনেন্দ্রিয়লক্ষ্য চিত্রফলকের ন্যায় চিত্রিত' করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার কাব্য ও কবিত্বের বিশ্লেষণ ক্ষুদ্র পরিসরে সম্ভব নয়। তাই আজ মধুসূদনের শ্রাদ্ধবাসরে তাঁহার কাব্য কবিত্বের মূলমন্ত্র স্মরণ করিতেছি। মধুসূদন দেশবৎসল। 'সীন' তাঁহার স্মৃতি-পট হইতে কপোতাক্ষের ছবি মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই।—

'জুড়াই এ কাল আমি ভ্রান্তির ছলনে!
বহু দেশে দেখিয়াছি বহু নদ-দলে,
কিন্তু এ স্নেহের তৃষা মিটে কার জলে?
দুগ্ধ-স্রোতোরূপী তুমি জন্মভূমিস্তনে।'

দেশমাতার প্রতি প্রেম ভক্তির এমন সুন্দর ছবি, দেশাত্মবোধের এমন মমতা-পূত অভিব্যক্তি বাঙ্গালা সাহিত্যে আর আছে কি?

৯

মাইকেল সহানুভূতি ও সমবেদনার উৎস, এবং তাহাই মাইকেলের বিশেষত্ব, পূর্ব্বে তাহা বলিয়াছি। মাইকেল উদার, অকুতোভয়, সমবেদনায় নির্বিচার।

বীর কবি বীরের ভক্ত। ব্যথিতের বেদনায় কবির প্রাণ কাঁদে। স্বর্গে, মর্ত্তে, পাতালে মধুসূদনের মমতার অমৃতনদী বহিয়া যায়।

আদি-কবি বাল্মীকি হইতে লস্কর পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের সকল কবিই অযোধ্যার রাজ-বংশের সহিত সমবেদনা ও সহানুভূতির সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। সোনার লঙ্কা ছারখার হইল, রাবণের বংশ গেল। এ জন্য ভারতের কোনও কবির চিত্ত বেদনায় চঞ্চল হয় নাই,—কেহ এক বিন্দু অশ্রুজলে সে শোচনীয় নিয়তির বিধানকে স্নিগ্ধ করিবার চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু মাইকেল রাবণ-পরিবারেও সমবেদনা ও সহানুভূতির অমৃতধারা ঢালিয়া দিয়াছেন। ইন্দ্রজিতের বীরত্বে মুগ্ধ না হয়, এমন বাঙ্গালী কে আছে? প্রমীলার দুঃখে বিগলিত না হয়, এমন পাষাণ কে আছে? যুগযুগান্তর-সঞ্চিত বিরাগের হিমাচলকে যিনি সমবেদনার অশ্রুজলে ভাসাইয়া দিতে পারে, তাঁহার শক্তির গভীরতার পরিমাণ কে করিবে?

মাইকেল শুধু বীর-রসের কবি নন, তিনি করুণ-রসেও সিদ্ধহস্ত। মাইকেলের সমবেদনা, সহানুভূতি ও করুণায় বাঙ্গালার মরুক্ষেত্র স্নিগ্ধ হউক।

১০

মাইকেলের দুইটি উপদেশ যেন বাঙ্গালীর মনে যুগযুগান্তর দেদীপ্যমান থাকে। 'তিলোত্তমা-সম্ভবে' মধুসূদনের নিরাকারা দূতী বলিয়াছেন,—

'ভ্রাতৃ-ভেদে ক্ষয় আজি দানব দুর্জ্জয়।'

তুমি সু-জয় মানব বাঙ্গালী! ইহা স্মরণ রাখিও।

মেঘনাদবধের ষষ্ঠ সর্গ বাঙ্গালীর জীবন-বেদ হউক। অরিন্দম, কর্ব্বুরকুলগর্ব্ব, মেঘনাদ রাঘবের দাস বিভীষণকে যে তিরস্কার করিয়াছিলেন, তাহা বাঙ্গালীর মনে আগ্নের অক্ষরে লিখিয়া দাও। আর,—

'—শাস্ত্রে বলে গুণবান্ যদি
পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি
নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ; পর পর সদা।'

আজ মধুসূদনের মৃতাহে বাঙ্গালার গগনে পবনে এই 'লাখ কথার এক কথা' ছড়াইয়া দাও! প্রত্যেক বাঙ্গালীর—ভারতবাসীর হৃদয়ে এই কয়টি কথা যেন গাঁথা থাকে। তা যদি থাকে, তাহা হইলে এ দেশে মধুসূদনের জন্ম সার্থক। তা যদি না হয়, তাহা হইলে, বাঙ্গালায় মধুসূদনের আবির্ভাব নিষ্ফল।

কবি তুমি লিখিয়াছিলে, সন্দিগ্ধচিত্তে ভাবিয়াছিলে,—

'লিখিনু কি নাম মোর বিফল যতনে
বালিতে, রে কাল! তোর সাগরের তীরে?
ফেনচূড় জলরাশি আসি কি রে ফিরে,
মুছিবে তুচ্ছেতে ত্বরা এ মোর লিখনে?'

বাঙ্গালার মহাকবি, বাঙ্গালীর মধুসূদন! না, তোমার লেখা 'জলের লেখা' নয়; তোমার 'লিখন' মুছিবার নহে। অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে যে রচনা 'ক্লাসিক' হইয়াছে, মহাকালও তাহা মুছিতে পারিবেন না। আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন তোমার দান সার্থক করিতে পারি, আমরা যেন মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করি,—

'নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ, পর পর সদা।' *

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি।

কবিতা।

অনুমেয়।

এই যে বিরাট্ ধ্বংস—পর্ব্বতপ্রমাণ—
বক্ষ জুড়ি' মোর—অতীতের মরীচিকা;—
কত বড়—এই দেখে কর অনুমান—
ছিল সেথা প্রণয়ের স্বর্ণ-অট্টালিকা!

দীর্ঘায়ু।

কুসুম-কোরকে এক করিনু জিজ্ঞাসা,
'জান কলি! কার কত আয়ুর গরিমা?'
শুনি' সে ফুটিল হাসি';—সেই হাসিতেই
জীবন চুমিল তার মরণের সীমা!
নাহি ছিল অবকাশ পরে দৃষ্টি রাখে—
ব'লে গেল আপনার কথাটী আমাকে!

শ্রীরামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

* বাঙ্গালী; ১৪ই আষাঢ়; ১৩২৩ সাল।

† লক্ষ্ণৌ-রাজ আসফউদ্দৌলার সভাকবি মহাত্মা মীর প্রণীত কাব্য হইতে অনূদিত।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

সবুজ পত্র।—জ্যৈষ্ঠ।—'সবুজ পত্র' উদাসীন গ্রন্থকীট প্রমথ চৌধুরীকে স্বীয় মর্ম্মরে বা 'খস্-খসে' জাগাইয়া, সাহিত্যের আসরে নামাইয়া, রোমন্থনের 'আয়েস' ছাড়াইয়া, রচনার আয়াসে প্রবৃত্ত—বাধ্য করিয়াছে, ইহা তাহার অল্প বাহাদুরী নয়! গতানুগতিক বাঙ্গালা মাসিকে প্রায়ই জীবনের কোনও লক্ষণ দেখিতে পাই না। অধিকাংশ রচনাই যেন 'আহ্লাদী পুতুল'! মান্ধাতার আমোল হইতে একই ছাঁচে গড়া হইতেছে; সেই বিপুল দেহভার, সেই ফোলা গাল, সেই কুঁচের মত চোক, সেই রঙ্গ, সেই ঢঙ্গ। ছেলেবেলা যেমন দেখিয়াছি, এখনও তেমনই দেখিতেছি। এ পুতুল লইয়া কচি ছেলেরা, দুধের মেয়েরা খেলা করিতে পারে; আমরা শুধু সেই খেলা দেখিয়াই কৌতুক অনুভব করি! প্রমথনাথের মত ভাবুক ও মনীষীদের কলমে জীবনের লক্ষণ আছে। মুদ্রাদোষে, সাধু ও অসাধু সঙ্করে, মতের প্রভেদে সে জীবনধারা ক্ষুণ্ণ হয় না; রসভোগের আনন্দে কর্ম্মভোগের বিড়ম্বনা পোষাইয়া যায়। 'ফরাসী সাহিত্যের বর্ণপরিচয়' এই শ্রেণীর রচনা। অল্প পরিসরে তাহার পরিচয় দিবার উপায় নাই। প্রসঙ্গক্রমে লেখক অনেক জ্ঞাতব্য—অথচ আমাদের অজ্ঞাত বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। উপচীয়মান বাঙ্গালা সাহিত্যের ধাতু প্রকৃতির অদল-বদল করিবার জন্য যাঁহারা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, প্রকৃতির শক্তিকে স্বীকার না করিয়া কৃত্রিমতার হাতুড়ী পিটিয়া বাঙ্গালীর ভাবপ্রকাশের সাধনকে ভাঙ্গিয়া রাতারাতি আপনাদের খেয়ালের আদর্শে গড়িবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন, তাঁহারা প্রমথ 'গুরুম'শায়ে'র পাঠশালে হাতে-খড়ি করিয়া এই 'বর্ণ-পরিচয়' পড়িলে উপকৃত হইবেন। প্রতিভাশালীর শক্তি সাহিত্য গঠন করে। তর্কে—বাঁধা-ধরা নিয়মে সাহিত্য হয় না। মানুষের মত মানুষের সাহিত্যও পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে না, বোধ হয় কখনও পারিবে না।—প্রমথবাবু যদি ফরাসী সাহিত্যের এই সকল তথ্যের সহিত তুলনা করিয়া তাঁহাদের পক্ষ হইতে বাঙ্গালা সাহিত্যের গতি প্রকৃতির আলোচনা করেন, তাহা হইলে আমরা উপকৃত হইতে পারি। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়,—'ভাষার কৃত্রিমতা, বৃথা বাগাড়ম্বর, উপমার আতিশয্য, অনুপ্রাসের ঝঙ্কার' প্রভৃতি সম্বন্ধে খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে Beaulieu নামক বিখ্যাত সমালোচক অজস্র বাণ বর্ষণ করিয়াছিলেন। আমাদের সাহিত্যে এমনতর বাণবর্ষণের প্রয়োজন আছে কি না? আর, যদি থাকে, তাহা হইলে, 'আপাততঃ সমালোচনা অনাবশ্যক', রবীন্দ্রনাথের এই নূতন সিদ্ধান্তের মূল্য কি? প্রমথবাবু যে 'বঙ্গলু'র ওকালতী গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতেও কৃত্রিমতা, বাগাড়ম্বর, উপমার আতিশয্যই সর্ব্বস্ব কি না? কেবল কাদম্বরীই ধরা পড়িয়াছে; কিন্তু 'চলিত' ভাষার আড়ষ্ট রচনায় এই সকল বিড়ম্বনা অকুতোভয়ে আত্মপ্রকাশ করিতেছে কি না? প্রমথবাবু ফরাসী সাহিত্যের আলোকে এইরূপ দুই চারিটি আবশ্যক বিষয়ের আলোচনা করিলে মন্দ হয় না।—এই রচনাটির ভাষায় প্রমথবাবু কোন্ পথের পথিক, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। ৬৪ পৃষ্ঠায় দেখিতেছি,—'ফরাসী জাতির দুখের দুখী, ব্যাথার ব্যাথী'। 'ব্যথার ব্যথী' লিখিলে মহাভারত অশুদ্ধ হইত

না। 'ধ্বনির অনুকরণ' কি এই তুইটি শব্দকে বিকৃত করিবার পক্ষে পর্য্যাপ্ত? তাহা কি এত আবশ্যক?—এমন অপরিহার্য্য? প্রমথবাবু কথিত ভাষার এক জন অগ্রগণ্য পাণ্ডা, অথচ সরস্বতীর 'ভাণ্ডারেই' তাঁহার গতি, তিনি ভঁাড়ারে পা দেন নাই। তিনি 'ঐশ্বর্য্য' লইয়াই মত্ত, এ দিকে পৈতৃক ধন দৌলতে দৃষ্টি নাই। 'আদ্যোপান্ত'র পরিচয় 'নিবার' সুযোগ ঘটিয়াছে, কিন্তু আগাগোড়াকে আমোল দেন নাই। নিজে ফরাসী সাহিত্যের উদ্যানে 'শুধু পল্লব গ্রহণ করেছেন,' কিন্তু কচি পাতা অন্য লোকের পাতে চালাইয়া দিতেছেন। কুণ্ঠিত, স্বল্পপরিচয়, ঊনবিংশ, অদ্যাবধি, আন্তরিক, অবিরাম, শ্রোতৃমণ্ডলী, শুভার্থী, বিপুল, বিস্তৃত ও ঘনিষ্ঠতা যদি 'বাংলা' হয়, তাহা হইলে করিয়া, বলিয়া, কহিয়াছি প্রভৃতিই কি যত অপরাধ করিল? যাহাদিগকে ছাড়িয়া এক পা চলিবার যো নাই, তাহাদিগকে অভিধানের অন্ধকূপে বন্দী করিয়া রাখিবার চেষ্টা কি স্বাভাবিক? গাধা যেমন সকল ভার বহিতে পারে, কেবল ভাতের কাঠীটা ছাড়া, তেমনই কি বাঙ্গালী সব বুঝিতে পারিবে, কেবল সার্ব্বভৌমিক সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়াগুলি যথাযথ ব্যবহার করিলেই তাহারা গালে হাত দিয়া ভাবিতে বসিবে? তাহাদিগকে এতটা 'কৃপার পাত্র' ভাবিবার কারণ কি? আর একটি বিষয়ে প্রমথবাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিব।—'অন্ততঃ আমরা বাঙ্গালীরা যা কদাকার তাকে সুন্দর বলি নে।' ইহা কি ঠিক? বরং অনেক ক্ষেত্রে অন্য লোকে যাকে 'কদাকার' মনে করে, আমরা তাকে সুন্দর বলি, সুন্দর ভাবি, তাতে সৌন্দর্য্যের আরোপ করি, এইরূপ বলাই সঙ্গত। কালীর মূর্ত্তিকে সভ্য জাতিরা hedious বলে। বাঙ্গালী তাঁহাতে মৃত্যুর সৌন্দর্য্য দেখে। বাঙ্গালী কবি ও সাধকেরা এই মূর্ত্তিতে সৌন্দর্য্যসম্ভার ঢালিয়া দিয়াছেন। 'যা কদাকার, তাকে সুন্দর বলি নে', অতিব্যাপ্তি-দোষে দুষ্ট হইয়া পড়ে। 'কদাকার' সংস্কারসাপেক্ষ। চীন ভামিনীর ছোট পা আমার অনুভবে কদাকার; চীনের অনুভবে সুন্দর। 'কদাকার' একটা দার্শনিক সত্যের স্বরূপ হইতে পারে না। তোমার মতে যাহা কদাকার, অশ্বিনী বাঁড়ুয্যের মতে তাহা পরম সুন্দর হইতে পারে। যাহা হউক, প্রবন্ধটির পাপড়ী ছিঁড়িয়া কোনও লাভ নাই। সমগ্র ফুলটির সৌন্দর্য্যে আমরা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। 'চার-ইয়ারী' কথা শেষ হইল। 'আমার কথাটি ফুরুলো, নটে গাছটি মুড়ুলো।' ইহা অবশ্যম্ভাবী। তবু দুঃখ হয়! গল্পটির উপসংহারটি চমৎকার—অত্যন্ত নূতন। আমরা ছোটগল্প শেষ করিবার সময় হয় মারিয়া ফেলি, নয় মিল করিয়া দি; নয় ত গল্পটিকে বলি, 'আমার সঙ্গে এই পর্য্যন্ত, এখন তুমি চরিয়া খাও!' এ গল্পটির শেষ সে রকম মামুলী নয়। অস্বাভাবিক ব্যাপারটিকে লেখক এমন সুকৌশলে স্বাভাবিক পরিণতি দান করিয়াছেন যে, তাঁহার 'আর্টে' মুগ্ধ হইতে হয়। 'আনী'ও স্বপ্ন, প্রেমও স্বপ্ন, গল্পও স্বপ্ন! জর্ম্মাণ গোলা গল্পের 'আনী'কে চূর্ণ করিয়া থাকিবে, কিন্তু কবির আর্ট তাহার মানসীকে বাঁচাইয়া দিয়াছে। তাহার আত্মনিবেদন মৃত্যুর স্পর্শে পবিত্র। কবি বলিয়াছেন,—'সকলই বিচিত্র স্বপনের কাণ্ড, গোড়া নাই, আগা।' কিন্তু এ জীবন-স্বপ্নের গোড়াও আছে, আগাও আছে; অথচ ইহা স্বপ্ন—আলোক-লতার স্বপ্ন।—রবীন্দ্রনাথের 'জাপান-যাত্রীর পত্রে' যেখানে কবি সৌন্দর্য্য দেখিয়াছেন, তাহা উপভোগ্য। যেখানে কবি দার্শনিক হইয়াছেন, সেইখানেই উৎকট সমস্যা! 'জাপান-যাত্রীর পত্র', যেন

'অধৃষ্যশ্চাভিগম্যশ্চ,
যাদোরত্নৈরিবার্ণবঃ !'

রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধান্তগুলি প্রায়ই 'অদ্ভুতে'র রাজ্যের প্রজা। তাঁহার জাহাজী সিদ্ধান্তগুলিও এই সনাতন নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে পারে না। মুসলমান যাত্রীরা রবীন্দ্রনাথকে সেলাম করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের হাতে কোনও কাজ ছিল না, জ্যাঠার গঙ্গাযাত্রা করিবারও আর তাঁহার সুবিধা নাই। অগত্যা তিনি গুরু গম্ভীর গবেষণায় মন দিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন,—'একটু-মাত্র পরিচয় হলেই অথবা না হলেও তারা দেখা হলেই প্রসন্নমুখে সেলাম করে। বোঝা যায় তারা বাইরের সংসারটাকে মানে।' যারা 'দেখা হলেই' সেলাম করে, তারা যে 'বাইরের সংসারটাকে মানে'—এ অদ্ভুত তত্ত্বটি এত দিন জগতের কোনও দার্শনিক—বোলপুরের কোনও তপস্বীও আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। ভিতরের সংস্কারটার জন্য যাহারা বাহিরের ধড় ও মুণ্ডটাকে সম্পূর্ণ পৃথক্ করিয়া দিয়া ধমনীর রক্ত বাহির করিয়া পৃথিবীর বুকে ছড়াইয়া দিয়াছিল, শুধু 'সেলামে'র সাক্ষ্যে এত দিন পরে তাহাদিগকে 'বাহিরের সংসার'টাকে মানিতে হইল! 'কেবলমাত্র নিজের জাতের গণ্ডীর মধ্যে যারা থাকে, তাদের কাছে সেই গণ্ডীর বাইরের লোকালয় নিতান্ত ফিকে।' ইহাও ধ্রুব সত্য! সেই জন্য জগতের যত জাতি নিজের জাতির গণ্ডী কাটাইয়া বাহির হইয়া পড়িয়া যুদ্ধক্ষেত্রে মৃতদেহের প্রাচীর দিতেছে। 'তাদের সমস্ত বাঁধাবাঁধি জাত-রক্ষার বন্ধন। মুসলমান জাতে বাঁধা নয় বলে' বাহিরের সংসারের সঙ্গে তার ব্যবহারের বাঁধাবাধি আছে। এই জন্যে আদব কায়দা মুসলমানের। আদব কায়দা সমস্ত মানুষের সঙ্গে ব্যবহারের সাধারণ নিয়ম।' এত অল্প পরিসরে এমনতর সিদ্ধান্তের বাদলা প্রায় দেখা যায় না! যদি 'মুসলমান জাতে বাঁধা নয়', তবে জগতে জাতে বাঁধা কে? এমন 'বাঁধা জাতে'র গৌরব জগতে আর কোন জাতি করিতে পারে? এ জাতি এমন বাঁধা যে, তিব্বতে ঢেঁকি পড়িলে আবিসিনীয়ায় মুসলমানের মাথা নড়ে। আদব কায়দা সব জাতিরই থাকে। বাহিরের সঙ্গে অল্পবিস্তর ব্যবহার না করিয়া কোনও জাতিই এ দুনিয়ায় টিকিতে পারে না। একটি ছোট 'সেলামে'র মর্ম্মর-শৈল হইতে দর্শনের কি সুন্দর নর্ম্মদা-প্রপাত! কিন্তু এই দার্শনিক আবিষ্কারের মূল লক্ষ্য—'মনুতে পাওয়া যায় মা মাসী মামা পিসের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করতে হবে, গুরুজনের গুরুত্বের মাত্রা কার কত দূর, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের মধ্যে পরস্পরের ব্যবহার কিরকম হবে;—কিন্তু সাধারণভাবে মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহার কি রকম হওয়া উচিত, তার বিধান নেই। এই জন্য জাত বিচারের বাহিরে মানুষের সঙ্গে ভদ্রতা রক্ষার জন্য, পশ্চিম ভারত, মুসলমানের কাছ থেকে সেলাম শিক্ষা করেচে।' হিতোপদেশের পশু পক্ষীরাও যা জানে, দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ তা জানেন না! ঋষিরা সেলাম করিতে শিখান নাই, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু যে ভাবের উৎস হইতে সেলাম, কুর্নিশ, নমস্কার প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়াছে, সে ভাবটার কিরূপে কোন্ পথে সাধনা করিতে হয়, হিন্দু শাস্ত্রে তাহার উপদেশ আছে। তাহাই ত হিন্দুর সর্ব্বস্ব। আচ্ছা, তিব্বতে মুসলমান আছে, চীনে মুসলমান আছে, জাপানেও অনেক মুসলমান কবিবরের চোখে পড়িবে। তাহারা কি সেলাম করে? কাউ-টাউ চীনের ও নাক-ঘষাই ত তিব্বতীর আদব কায়দা। তাহা হইলে, তাহারা

'বাহিরের সংসারটাকে মানে না' ? চিন্তাসমুদ্রের এমন মন্থন প্রায় দেখা যায় না ; এমন কয়তামৃতও কখনও কোনও দেবাসুরের ভাগ্যে ঘটে নাই !

উদ্বোধন। জ্যৈষ্ঠ।—শ্রীস্বামী শুদ্ধানন্দের 'বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুজীবনে বেদান্তের প্রভাব ও উপযোগিতা' এবারকার 'উদ্বোধনে'র গৌরব-বর্দ্ধন করিয়াছে। চিন্তাশীল সন্ন্যাসী বেদান্তের আলোকে অনেক ক্ষেত্রে আমাদের গন্তব্য পথের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দেশকালপাত্রের উপযোগী বলিয়া আমরা এই উপাদেয় সন্দর্ভ হইতে একটু উদ্ধৃত করিলাম।—

'কর্ম্মজীবনে বেদান্তের প্রয়োগে নিঃস্বার্থতা বা স্বার্থবিসর্জ্জনই মূল অবলম্বন—এই নিঃস্বার্থতা হইতে সেবাধর্ম্মের অভ্যুদয় ও বিকাশ। সুতরাং বেদান্তের প্রচার ও অনুষ্ঠানের ফলে আমাদের হিন্দু সমাজে সেবাধর্ম্মের নানা আকারে অভ্যুদয় অবশ্যম্ভাবী। সকল নরনারী নারায়ণ—

'ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ॥"

'তুমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ, তুমি বালক, তুমি বালিকা, তুমি বৃদ্ধরূপে দণ্ডহস্তে বেড়াইতেছ, তুমি সমগ্র জগতে নানারূপে জন্মাইয়াছ।' সুতরাং আমাদিগকে বিরাট্‌রূপী নারায়ণের পূজায় নিযুক্ত হইতে হইলে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকল নরনারীর পূজায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

"এবং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভক্তিরব্যভিচারিণী।
কর্ত্তব্যা পণ্ডিতৈর্জ্ঞাত্বা সর্ব্বভূতময়ং হরিম্॥"

পণ্ডিতগণ হরিকে সর্ব্বভূতময় জানিয়া এইরূপে সর্ব্বভূতের প্রতি অব্যভিচারিণী ভক্তি করিবেন।'

নিবেদিতার 'আচার্য্য শ্রীবিবেকানন্দ' চলিতেছে। নিবেদিতা বলিতেছেন,—'সচরাচর দেখা যায়, যে বড় হইতে চায়, তাহাকে অনেক কষ্ট সহিতে হয়, এবং ইহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও অদৃষ্ট এরূপ যে, তাহাদের ইহ-জগতের সকল সুখ জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়—এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া স্বামিজী বলিলেন, "সারা জীবনটাই দুঃখের বিনিময়ে অল্প সুখভোগ! কখনও ভুলিও না—'সিংহ মর্ম্মান্তিক আঘাত প্রাপ্ত হইলে তবে সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণভাবে গর্জ্জন করে; সাপের মাথায় আঘাত লাগিলে তবে ফণা তুলিয়া দাঁড়াইয়া উঠে; আত্মার মহিমাও তেমনি, লোকে দারুণ মর্ম্মবেদনা পাইলে তবে সে প্রকাশ পায়।" 'স্বামী বিবেকানন্দের পত্রে' এবার যে কয়খানি চিঠি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা সারগর্ভ। প্রথম পত্রখানি একটি সুরচিত সন্দর্ভের মত। অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার সম্বন্ধে স্বামীজী লিখিয়াছিলেন—'ভারতবর্ষ ও বেদান্তের প্রতি তাঁহার ভালবাসার অর্দ্ধেক যদি আমার থাকিত!' শ্রীগোকুলচন্দ্র দের 'বুদ্ধদেবের দৈনিক কার্য্যবিবরণী' সুখপাঠ্য সন্দর্ভ।

স্বাস্থ্য-সমাচার। জ্যৈষ্ঠ। নব-প্রবর্ত্তিত 'আলোচনা'য় অনেক কাজের কথা আছে। 'পরশ পাথর' উল্লেখযোগ্য। এই নিবন্ধের প্রতিপাদ্য,—'মনের শক্তি অদ্ভুত ও অনুপম; চিন্তার দ্বারা অসম্ভব কার্য্য সাধিত হয়, চিন্তার শক্তিতে দীর্ণ জীর্ণ দেহ নবীন সতেজ যৌবনময় হয়। * * * মনের জোর নাই বলিয়া কত রোগীর ব্যাধি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত লাভ করিয়া থাকে, চিন্তাশক্তির

বিকারে, কত ভাবে ভরা স্বপ্নে গড়া রোগ, কত দুর্ভাগ্য জনকে চিরদুর্ব্বল ও চিরদুঃখী করিয়া রাখিয়া থাকে। রোগের অনুকূল চিন্তাই রোগকে সৃষ্টি করে, আবার তাহার প্রতিকূল চিন্তা রোগকে দূর করে। * * দেহের গঠনে চিন্তার শক্তি আশ্চর্য্যরূপে কার্য্য করে। বিষাদময়ী চিন্তা, কুচিন্তা, নিরাশার—হতাশ্বাসের চিন্তা, দেহকে ভগ্ন করে। কিন্তু দেহকে সুস্থ, সবল, সতেজ রাখিতে হইলে শুভ আশা চাই, আনন্দ চাই, সুচিন্তা চাই, আর মানসিক-শক্তি, স্বাস্থ্য ও বিশ্বাস চাই। চিন্তাশক্তির মূলই দৃঢ় বিশ্বাস। ** প্রতিদিন প্রভাতে জাগিয়া নব অরুণালোকে দাঁড়াইয়া আনন্দপূর্ণ মানসে বিশ্বাস করিতে হইবে, 'আমি সুস্থ, সবল ও শক্তিমান্।' *** 'স্বাস্থ্য-সমাচারে' আরও বিস্তৃত ও বিশদভাবে এই প্রসঙ্গের আলোচনা হইলে আমরা শিক্ষালাভ করিব। 'পল্লী-স্বাস্থ্যোন্নতির সূচনা' দেখিয়া গ্রামবাসীরা যদি প্রকৃত পথের পথিক হন, তাহা হইলে বাঙ্গালার শ্রী ফিরিবে। কিন্তু ইহার মধ্যেও 'কবিতা' দেখিয়া আমরা ভীত হইয়াছি! পল্লীস্বাস্থ্যের উন্নতি করিবার জন্যও যদি 'যা পদ্য যা মিলে যা' গোছ 'কাব্যি'র প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে আমাদের আর আশা নাই। ইহা ঘোর অস্বাস্থ্যের লক্ষণ। ডাক্তার বসু বরং আমাদের এই কাব্যি-রোগের নিদান নির্ণয় করুন। ইহা বায়ু রোগের কোন্ পর্য্যায়ের অন্তর্গত, তাহা জানা দরকার হইয়া উঠিয়াছে। 'স্বাস্থ্য-সমাচারে' এ রোগের প্রশ্রয় দিলে আমরা বলিব, 'বল্ মা তারা! দাঁড়াই কোথা?' 'বেড়েলা' সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা কি বিজ্ঞান-সম্মত সিদ্ধান্ত? পরীক্ষায় প্রতিপন্ন সত্য? ইহার সকল কথা কি সাধারণের পাঠ্য পত্রে আলোচিত হইবার যোগ্য?

প্রতিভা। জ্যৈষ্ঠ। 'প্রতিভা' সু-পরিচালিত সু-সম্পাদিত মাসিক। ইহার ক্রমোন্নতি দেখিয়া আমরা আনন্দিত ও আশান্বিত হইয়াছি। 'প্রতিভা'য় কয়েক জন সুশিক্ষিত লেখক নিষ্ঠাসহকারে সাহিত্যের সাধনা করিতেছেন। তাঁহাদের সাধনা সফল হউক। শ্রীকামিনী-কুমার সেনের 'স্বপ্নতত্ত্ব ও সাহিত্যে স্বপ্ন' সুলিখিত সন্দর্ভ। শ্রীমন্মথনাথ মজুমদারের 'সোসিয়া-লিজম' আমরা সকলকে পড়িতে বলি। যে সকল বিষয়ে বাঙ্গালা সাহিত্যে কখনও কিছু লেখা হয় নাই, অথচ না জানিলে দুনিয়ায় এক পদ অগ্রসর হইবার উপায় নাই, সেই সকল বিষয়ের পরিচয় দিবার চেষ্টাই আমাদের কর্ত্তব্য। 'ট্রাইট্স্কে' এই শ্রেণীর আর একটি প্রবন্ধ। নূতন লেখকগণের ভাষায় এখনও জড়তা আছে। বিষয়ের গুরুত্ব, বাঙ্গালা ভাষায় এই শ্রেণীর রচনার বিরলতা ও আদর্শের অভাবই তাহার কারণ, তাহা আমরা বুঝিতে পারি। তাঁহারা নূতন পথের পথিক। অভ্যাস ও চেষ্টার ফলে ভবিষ্যতে তাঁহাদের রচনা উপচয় লাভ করিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 'শূন্যপুরাণ' উল্লেখযোগ্য। শ্রীকালিদাস রায়ের 'সোহাগিনী' 'প্রতিভা'র কলঙ্ক। এমন কানা, খোঁড়া, রুগ্ন, 'কাব্যি' সচরাচর দেখা যায় না। কবি বলিতেছেন,—'উলটা রীতি তার মরিয়া যাই লাজে।' বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। লজ্জার সহিত সামান্য পরিচয় থাকিলেও কেহ এমন পদ্য ছাপিতে পারে না। 'উলটা' কি 'উল্টা'র কালিদাসী সংস্করণ? কালিদাস ত্র্যম্বকের বদলে 'ত্র্যয়ম্বকং সংযমিনং দদর্শ' লিখিয়াছিলেন! বাঙ্গালী কালিদাস যে ডালে বসিয়াছেন, সেই ডালটিও কাটিবেন না কি? শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেনের 'পাখীর কথা' অধিকমাত্রায় প্রকাশিত হইলে ভাল

হয়। 'বিবাহসমস্যা' অসার, অপদার্থ রচনা। শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দীক্ষা' পড়িয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। 'হৃন্‌মন ওঠে কেঁপে'ই বটে! 'কত দধীচির অস্থিরচিত অস্ত্রের নাগফণা' দেখিয়া দীক্ষাকে দূরে রাখিয়া পলাইবার ইচ্ছাই স্বাভাবিক। অবিনাশ বাবু সাহসী রোজা, তাই 'প্রতিভা'য় সাপ খেলাইয়াছেন! 'দীক্ষা'র বক্তব্য কি, প্রতিপাদ্য কি, 'অন্ধকারের নিগূঢ় রন্ধ্র' কি, তাহা 'হা কে বলে দেবে মোরে?' [—'রবিচ্ছায়া' হইতে উদ্ধৃত—রবীন্দ্রনাথের 'সেকেলে' গানের এক কলি।] কবি বলিতেছেন,—'ললাট হইতে উঠাও সবলে দুর্ভাবনার মসী।' তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই, সুতরাং প্রতিবাদ করিব না। কিন্তু ললাটের ঘর্ম্মে মিশাইয়া সেই মসী 'প্রতিভা'র বরাঙ্গে মাখাইয়া দিবার কারণ কি? আর কাজটি যে 'সবলে' করা হইয়াছে, প্রত্যেক চরণেই তাহা সুস্পষ্ট। ভাষা, ছন্দ, ভাব, এ সকলের উপর বল-প্রয়োগের দৃষ্টান্ত অবশ্য আজ কাল বাঙ্গালায় বিরল নয়; কিন্তু 'দীক্ষা'র বল-প্রয়োগের যুড়ী সহজে মিলিবে না। দীক্ষা পড়িয়া করুণানিধানকে বলিতে ইচ্ছা হয়, এত কালের পর নামটি ব্যর্থ করিলে। তোমার প্রাণে করুণার 'ক' থাকিলে কি তুমি কবিতার উপর, পাঠকের উপর নিষ্ঠুরভাবে এমন অত্যাচার করিতে! কবি বলিতেছেন,—'অগ্রসরিব নিষ্ফলতার কল্পনা যেথা নাই।' 'মাইকেলি'র কি সুন্দর নিদর্শন! সে যাহা হউক, দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, কবিবর যাহা সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। একবারে 'নিষ্ফলতা'র পগারেই তিনি 'অগ্রসরিয়াছেন'—মাথাটা একটু ঠাণ্ডা হইলে তাহা বুঝিতে পারিবেন। এই সংখ্যায় 'শশাঙ্ক' নামক সুলিখিত ঐতিহাসিক সন্দর্ভটি সমাপ্ত হইয়াছে।

গম্ভীরা। জ্যৈষ্ঠ।—'বর্ষ-আবাহন' একটি মামুলী অপচার। 'জড়তার কারা করিবারে হারা নরলোক আসি দর্শ' বুঝিতে পারি, ভগবান্ আমাদের এত বুদ্ধি দেন নাই। 'বরষার পাশে আভানি শরৎ' কি? 'আভানি'ই বা কি বস্তু? 'শীত-দংশনে কাটি' মোহপাশ' অসহ্য হইলেও মৌলিক বটে! এত কাল পরে কবিতা খুকীর দাঁত উঠিল। সাধু, সাবধান! কবি নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী! আপনি ধন্য। 'বিবিধ প্রসঙ্গে' 'সভ্যতার বিকাশ' উল্লেখযোগ্য। লেখক বিস্তৃত করিয়া লিখুন। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরীর 'বাণীপ্রশস্তি' কবিতায় পুরাতনের প্রতিধ্বনি ভিন্ন আর কিছু নাই। 'মঙ্গলঘটে'র সঙ্গে 'চরণতট' দিব্য মিলিয়া গিয়াছে। কিন্তু 'অরুণ' ঢালিয়া দিয়াও চরণ উজ্জ্বল করিবার উপায় নাই। পিক ডাকিয়াছে, কুসুম ফুটিয়াছে, নালন্দা জাগিয়াছে, 'উঠুক নাদিয়া মোহন যন্ত্র' শুনিয়া আমরা চমকাইয়া উঠিয়াছি, অনেকগুলি সুমিষ্ট শব্দের সমাবেশ আছে, কিন্তু 'কবিতা' হয় নাই। শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্তের 'বঙ্গীয় কবিপ্রতিভা', শ্রীরমেশচন্দ্র ঘোষের 'জন রাস্কিন' ও শ্রীখগেন্দ্রনারায়ণ মিত্রের 'বিবর্ত্তনবাদ ও তাহার প্রামাণিকতা' উল্লেখযোগ্য। কিন্তু 'গম্ভীরা' নিজের পথ ছাড়িল কেন? এক 'বিবিধ প্রসঙ্গে' 'গম্ভীরা-উৎসব' ভিন্ন মালদহের আর কোনও প্রসঙ্গ ত দেখিলাম না। তাহাই ত 'গম্ভীরা'র বিশেষত্ব ছিল।

জগজ্জ্যোতিঃ। জ্যৈষ্ঠ।—শ্রীপ্রভাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সাহিত্যভূষণ 'জননী' কবিতার উপসংহারে লিখিয়াছেন,—

'সংসারে সং সাজা সকলই ত ভুল,
সে সং সাজিতে মাগো না চাহি আবার।'

এ সঙ্কল্প সাধু। আমরা আশ্বস্ত হইলাম। কিন্তু তিনি আবার যদি কবিতা লেখেন, তাহা হইলে প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিবে! কিন্তু 'ন চলতি খলু বাক্যং সজ্জনানাং কদাচিৎ।' অতএব, আমরা শঙ্কিত হইবার কোনও কারণ দেখিতেছি না। শ্রীরায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুরের 'হারীতিকা-দমনাবদান' সুখপাঠ্য। শ্রীযুত গজেন্দ্রলাল রায় চৌধুরীর 'ভাব-বিপর্য্যয়' ব্যঙ্গ রচনা। তবে লেখক শিরোনামেই তাহা জানাইয়া দিয়াছেন। আজকাল মুদীর দোকানে যেমন লেখা থাকে,——মিশ্রিত তৈল। 'জন্মান্তরবাদ ও বংশানুক্রমে' লেখকের বক্তব্য আমরা বুঝিতে পারিলাম না। কোন্‌টা উচ্ছ্বাস, কোন্‌টা অনুমান, কোন্‌টা সিদ্ধান্ত, লেখক তাহা ধরিবার পথ রাখেন নাই। শ্রীরায় সাহেব ঈশানচন্দ্র ঘোষের 'শতধর্ম্মা জাতক' ক্ষুদ্র, কিন্তু সুন্দর। শ্রীমতী জ্যোৎস্নাময়ী ঘোষের 'আশ্বাস-বাণী'তে আশ্বাসের কোনও চিহ্ন নাই, 'হতাশ্বাস' আছে। তবে

'উত্তরে কহিলা বিভু,—হে মহিলা-কবি!
উদিবে অচিরে বঙ্গে সৌভাগ্যের রবি।'

শুনিয়া আশা হয়!—বিভু বেচারা বোধ হয় কবিতার ভয়ে তাড়াতাড়ি মহিলা-কবিকে 'স্বপ্ন' দিয়াছেন! বাস্তবিক, বাঙ্গালা দেশে ঈশ্বরের গতিবিধি ও কবিদের সঙ্গে তাঁহার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা দেখিয়া 'ধরায় অমরা ভ্রম' না হইয়া যায় না।

সহযোগী সাহিত্য।

লিপি, আলেখ্য ও বর্ণনা।

ইয়োরোপে ক্রীমীয় যুদ্ধের সময় হইতে সমর-লেখকগণের সৃষ্টি হইয়াছে। পরে ফ্রাঙ্ক-প্রুশীয় ও রুস-তুর্কী যুদ্ধে এই শ্রেণীর লেখকগণের লিপিচাতুর্য্য পরাকাষ্ঠা লাভ করে। আর্চিবল্ড ফর্ব্বস্‌, রসেল, ওডনোভান, লাবুশেয়ার প্রভৃতি এই শ্রেণীর লেখকগণের প্রধান হইয়া উঠেন। ফর্ব্বসের ফ্রাঙ্ক-প্রুশীয় যুদ্ধের বর্ণনা ইংরেজী সাহিত্যে অতুল্য বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। পরে আধুনিক যুদ্ধে সেনাপতিগণের মন্ত্রণাগুপ্তি যেন একটু মাত্রাধিক্যে বাড়িয়া উঠে। রুসো-জাপানী যুদ্ধে লায়নেল জেম্‌স্ প্রমুখ বড় বড় লেখকগণ যুদ্ধ-বর্ণনায় তেমন চাতুরী দেখাইতে পারেন নাই। ইহার হেতু এই, আধুনিক অস্ত্র শস্ত্রের প্রভাবে একটা যুদ্ধ এক দিনে শেষ হয় না, এবং দুই মাইল কি দশ মাইলের মধ্যে যুদ্ধক্ষেত্র নিবদ্ধ থাকে না। মুখ্‌দেনের যুদ্ধ দ্বাদশ দিন চলিয়াছিল; শতাধিক মাইল ভূমি ব্যাপিয়া, এই যুদ্ধ চলিয়াছিল। তখনও ট্রেঞ্চের প্রচলন এমন সাধারণভাবে হয় নাই। ইউরোপের বর্ত্তমান যুদ্ধে উভয় পক্ষই ট্রেঞ্চের ব্যবহার সাধারণ-ভাবে করিতেছেন, এবং এক একটা যুদ্ধ দুই শত মাইলের অধিক স্থান ব্যাপিয়া চলিতেছে। দুই দিন দশ দিনে একটা যুদ্ধ শেষ হইতেছে না; কোনও ক্ষেত্রেই তিন মাসের কম সময়ে একটা যুদ্ধের জয় পরাজয় নির্দ্ধারিত হইতেছে না। অতিমাত্রায় ট্রেঞ্চের ব্যবহার হওয়ায় যুদ্ধের সে দৃশ্য ভাগটা একেবারেই নষ্ট হইয়াছে। এখন যেন মূষিকের মতন বিবরে থাকিয়া সকল পক্ষই যুদ্ধ চালাইতেছে। ইহার উপর অত্যন্ত মন্ত্রগুপ্তি; কোনও সমর-লেখককে ট্রেঞ্চের

পার্শ্বে প্রকৃত যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিতে দেওয়া হইতেছে না; কাহাকেও কোনও একটা যুদ্ধের বর্ণনা প্রকাশ করিতে দেওয়া হইতেছে না। ইহার ফলে, এই দুই বৎসরের মধ্যে আজও এই যুদ্ধের একখানা বর্ণনা-পুস্তক বাহির হয় নাই; কোনও একটা যুদ্ধের তাৎকালিক বর্ণনা প্রকাশ করা হয় নাই। এই ত্রুটী কেন ঘটিল, ইহার দ্বারা সাহিত্যের কি ক্ষতি হইবে, এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়া লণ্ডনের একখানা উচ্চাঙ্গের সাহিত্যবিষয়ক মাসিক পত্রে এক সন্দর্ভ প্রকাশ করা হইয়াছে। তাহাতে অনেকগুলি নূতন কথা আছে।

রস্কিনের সিদ্ধান্ত যে, ভাবা চিত্রকলার প্রকারান্তরমাত্র। তাহাই অবলম্বন করিয়া লেখক বলিতেছেন যে, যাহা দেখিলাম, দেখিয়া কি বুঝিলাম,—যতদিন তাহাই অন্যকে ভাষার সাহায্যে বলিবার প্রয়োজন ছিল, ততদিন ভাষা আলেখ্যের রূপান্তরমাত্র ছিল। আমাদের সংস্কৃতে ইহাই নিত্য সিদ্ধান্ত বলিয়া গৃহীত। তাই অক্ষরকে সংস্কৃত ব্যাকরণে বর্ণ বলে। বর্ণের সাহায্যে রূপ ফুটিয়া উঠে; অক্ষরের সাহায্যে তেমনই একটা ভাবের রূপ ফুটিয়া উঠে। বর্ণ দৃশ্যরূপের উপাদান; অক্ষর ভাবরূপের উপাদান। তাই বর্ণবিন্যাসকে লিপি বলে। তুলির সাহায্যে বর্ণ ফুটাইয়া রূপের সৃষ্টি যে ভাবে করিতে হয়, লেখনীর সাহায্যে অক্ষরবিন্যাস করিয়া সেই উপায়ে ভাব-রূপকে ফুটাইতে হয়। যাহাতে এই ভাব-রূপ সম্যক্ ফুটিয়া উঠে, তাহাই আলেখ্য, বা শব্দ-চিত্র; যে আনুষঙ্গিক বিবরণের সাহায্যে ভাব-রূপ প্রকট হয়, তাহাই বর্ণনা। সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের পারিভাষিক শব্দগুলি প্রায় চিত্রকলার পারিভাষিক হইতে সংগৃহীত। যাঁহারা অলঙ্কার শাস্ত্র এবং চিত্র-শাস্ত্র এক সঙ্গে তুলনা করিয়া অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা এই সাদৃশ্যটুকু বেশ বুঝিতে পারিবেন।

ষ্টোর্ট সাহেব বলিতেছেন, যে উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য আদিম কাল হইতে মনুষ্যসমাজে যুদ্ধ প্রচলিত আছে, সে উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য বর্ত্তমান যুদ্ধ বাধে নাই। রূপ, যৌবন, বিদ্যাবল, বাহুবল, ধনবল ও জনবল জগতের সকলকে দেখাইয়া, কে বড়, কে প্রবলতর, তাহারই পরীক্ষা যুদ্ধক্ষেত্রে হইত। সকলকে দেখাইবার জন্যই যুদ্ধক্ষেত্রের বল-বিন্যাস হইত। সমর-শাস্ত্র অনাদিকাল হইতে একই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া আছে; উহার আমূল পরিবর্ত্তন এতকাল ঘটে নাই। নূতন নূতন অস্ত্রের উদ্ভাবনে একটা আধটা চালের পরিবর্ত্তন কোনও যোদ্ধ্‌বিশেষ ঘটাইয়া থাকিতে পারেন, এবং তাহার প্রভাবে তিনি সমরবিজয়ী হইয়া থাকিতে পারেন; পরন্তু আসলে রণশাস্ত্র সকল সভ্যজাতির মধ্যেই এক ও অখণ্ড ভাবে রহিয়াছে। পূর্ব্বে বলাবলের পরীক্ষা শেষ হইলে প্রবল জাতি দুর্ব্বল জাতিকে আত্মসাৎ করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিত; অথবা পরাজিত-গণকে দাসবৃত্তি অবলম্বন করাইয়া চিরপরাধীন রাখিবার প্রয়াস পাইত। অতি বর্ব্বর অবস্থায় প্রবল দুর্ব্বলকে খাইয়া ফেলিত। সেই আদি বর্ব্বরতার কালে দুই জাতি যে উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করিত, এখন ঘোরতম সভ্যতার কালে একটু রকম ফের করিয়া সেই উদ্দেশ্যসাধন জন্য সমগ্র ইয়োরোপ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে। আদি বর্ব্বরতার কালের কোনও যুদ্ধের বর্ণনা নাই; কেন না, সে যে বীভৎস ব্যাপার, সে বর্ণনায় সমরচিকীর্ষা অন্য মানুষের মনে জাগিয়া উঠে না। এখন-কার যুদ্ধও তাহাই, এক অপরকে মারিয়া নির্ম্মূল করিয়া নিজে সর্ব্বজয়ী হইবে। এখন নরমাংসভোজনের পদ্ধতি প্রচলিত নাই। তাই ভোজনটা চলিতেছে না, পরন্তু ভোজন করিয়া

যে উদ্দেশ্য সাধন করা হইত, এখন অদ্ভুত অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে সেই উদ্দেশ্যসাধন হইতেছে—এক অপরকে নির্ম্মূল করিবার চেষ্টা করিতেছে। বালক-বালিকা, বৃদ্ধ বৃদ্ধা, যোদ্ধা অযোদ্ধার বিচার নাই। আকাশ হইতে বোমা ফেলিয়া, জাহাজের তলা ফুটা করিয়া এক অপরের সর্ব্বনাশ-সাধনচেষ্টায় উদ্যত।

সাহিত্য মনুষ্যজাতির কল্যাণের পথে উদ্ভূত। সাহিত্যের সাহায্যে মনুষ্য জাতির কল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে। এখন যুদ্ধের বর্ণনায় মনুষ্যজাতির কল্যাণসাধন সম্ভবপর নহে। কারণ, ইহাতে বীরত্ব নাই, সংযম নাই, সন্ন্যাস নাই, ক্ষমা নাই, তিতিক্ষা নাই। আছে কেবল বুদ্ধি-বলে, বিজ্ঞানবলে এক কর্ত্তৃক অপরের সর্ব্বনাশসাধন। উভয় পক্ষের চোখোচোখী হইলে লজ্জা, ক্ষমা, দয়া প্রভৃতি ভাবের উদ্রেক হইতে পারে। এ যুদ্ধে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ খুব কমই ঘটে; দশ মাইল দূরে বসিয়া তোপ সাজাইয়া এক অপরের দলবলকে একেবারে নির্ম্মূল করিবার চেষ্টা করিতেছে। যন্ত্রের দয়া নাই, ক্ষমা নাই; উহা নির্ম্মমভাবে কাজ করে। মানুষের হাতের তরবারী দৃষ্টির সাহায্যে ব্যবহৃত হয়; সে ক্ষেত্রে দয়া ও ক্ষমার অনেক অবসর। আজ-কালকার বিষম তোপ কামানের দয়ামায়া নাই। তাই এ যুদ্ধে বাহুবলের দৈহিক রূপবলের প্রকাশ নাই। বুদ্ধিবলে কেহ বা মূষিকের মত বিবরে থাকিয়া, কেহ বা জলচর জন্তুর মত জলের মধ্যে ডুবিয়া, কেহ বা শকুনি গৃধিনীর মত আকাশে উড়িয়া, যন্ত্রের সাহায্যে কেবল মানুষ মারিতেছে। এ যুদ্ধে রণক্ষেত্রের শোভা নাই, জাঁক নাই, মাধুর্য্য নাই, মহিমা নাই। এমন যুদ্ধের বিবরণ লিখিতে মানুষের লেখনী কাঁপিয়া উঠিবেই। চিত্রকলার পদ্ধতিক্রমে এ যুদ্ধের বর্ণনা সম্ভবপর নহে। পরিশেষে লেখক বলিয়াছেন, পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুদ্ধের ফলে সাহিত্যের পুষ্টি হইয়াছে; এই যুদ্ধের পরিণামে সাহিত্যের অপচয় ঘটিবে। কেন না, এ যুদ্ধ ত কল্যাণ-জনক নহে। ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহার বর্ণনা লিখিতে মহা-ভারতের সৃষ্টি। পরন্তু যদুবংশধ্বংসকথা খিল হরিবংশে তেমন ভাবে প্রকট নহে; কেন না, যে আত্মদ্রোহে যদুবংশ ধ্বংস হইয়াছিল, তাহা ভারতবর্ষের হিন্দুসমাজের কল্যাণপ্রদ হয় নাই। এমন দিন আসিতে পারে, যখন জর্ম্মণ জাতির এই যুদ্ধকথা মানুষ চেষ্টা করিয়া ভুলিতে চাহিবে। অথবা এমন দিন আসিবে, যখন এই ভীষণ যুদ্ধের ফলে ইউরোপের সভ্যতা একে-বারেই নষ্ট হইয়া যাইবে, নূতন করিয়া ইউরোপকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। অতএব ভালই হইয়াছে যে, আমরা এ ভীষণ যুদ্ধের বর্ণনা সংগ্রহ করিতে পারিতেছি না। ইহাতে colour নাই; অর্থাৎ, বর্ণ নাই। Perspective বা পরিপ্রেক্ষিতের বিচার নাই। Ground work বা ক্ষেত্রচাতুরী নাই; সুতরাং এমন যুদ্ধকে ফুটাইবার প্রয়োজন নাই। কথাটা ভাবিবার কথা, তলাইয়া বুঝিবার কথা।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

বৃন্দ ও মাধব।*

আজকাল আমরা আয়ুর্ব্বেদের যতগুলি সংগ্রহ-গ্রন্থ দেখিতে পাই, তাহাদের মধ্যে 'রুগ্‌বিনিশ্চয়' বা 'মাধবনিদান' সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। আয়ুর্ব্বেদের বিভিন্ন সংহিতাগ্রন্থ হইতে চিকিৎসাঙ্গের নিদানভাগের সংগ্রহ করিয়া, এই গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে। ইহার অধ্যায়-সন্নিবেশের ক্রমও নূতন প্রণালীতে সন্নিবিষ্ট। বৈদ্যমহামহোপাধ্যায় মাধব কর এই গ্রন্থের প্রণেতা বলিয়া, আমাদের দেশে চিরপ্রসিদ্ধ জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। কিন্তু কোনও স্থলেই গ্রন্থকারের নামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। এখনকার মুদ্রিত নিদানের পরিশিষ্টাংশে 'ইন্দুকরাত্মজ মাধব এই গ্রন্থের কর্ত্তা' বলিয়া একটী শ্লোক দেখা যায়। (১) বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতিতে আহৃত, ১৭৩৪ সংবতে লিখিত একখানি নিদানেও এই শ্লোক উদ্ধৃত আছে। কিন্তু টীকাকার শ্রীকণ্ঠদত্ত এই শ্লোকটীর ব্যাখ্যা করেন নাই, বা পাঠও ধরেন নাই। এই শ্রীকণ্ঠদত্তই সিদ্ধযোগের টীকায় গ্রন্থকৃৎপরিচয়-শ্লোকটীর বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন; সুতরাং নিদানের ঐ পরিচয়-শ্লোকটীর ব্যাখ্যা করাও তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক হইত। এই ব্যতিক্রম দেখিয়াই আমরা অনুমান করি, এই শ্লোকটী শ্রীকণ্ঠদত্তের পরবর্ত্তিকালে কেহ যোগ করিয়া দিয়াছেন।

এই গ্রন্থের রচনা-পরিপাটীর অনুসরণ করিয়া, তাহারই ক্রমে, 'সিদ্ধযোগ' নামক একখানি চিকিৎসা-গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে। (২) উক্ত সিদ্ধযোগের প্রণেতা আপনাকে বৃন্দ নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই উভয় গ্রন্থ একই ক্রমে লিখিত হওয়ায় ও নিদান গ্রন্থের শেষে গ্রন্থকারের নাম না থাকায়, কেহ কেহ এই দুই গ্রন্থকে একই গ্রন্থকারের রচিত বলিয়া মনে করেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিত ডাঃ হর্ণ্‌লে মহোদয় এই মতের প্রধান প্রবর্ত্তক। তিনি দীর্ঘকাল আয়ু-

* রঙ্গপুরে উত্তর-বঙ্গ সাহিত্য-সম্মেলনের নবম অধিবেশনে পঠিত।

(১) সুভাষিতং যত্র যদস্তি কিঞ্চিৎ তৎ সর্ব্বমেকীকৃতমত্র যত্নাৎ।
বিনিশ্চয়ে সর্ব্বরুজাং নরাণাং শ্রীমাধবেনেন্দুকরাত্মজেন ॥

(২) নানামতপ্রথিতদৃষ্টফলপ্রয়োগৈঃ প্রস্তাববাক্যসহিতৈরিহ সিদ্ধযোগঃ।
বৃন্দেন মন্দমতিনাত্মহিতার্থিনাঽয়ং সং লিখ্যতে গদবিনিশ্চয়জক্রমেণ ॥

সিদ্ধযোগ, ২ পৃঃ।

বৈদীয় গ্রন্থনিচয়ের সাবধানে আলোচনা করিয়া, অসাধারণ পরিশ্রমে, গত ১৯০৬ খৃঃ অব্দ হইতে রয়াল এসিয়াটিক্ সোসাইটীর জর্ণ্যালে, চরকসুশ্রুতাদির বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। তিনি ঐ পত্রিকায় 'সুশ্রুতের টীকাকারগণ' শীর্ষক প্রবন্ধে প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন যে, রুগ্বিনিশ্চয়াখ্য নিদান গ্রন্থের বাস্তব নাম মাধব-কর নহে। সিদ্ধযোগ নামক চিকিৎসা-গ্রন্থের প্রণেতা বৃন্দই ঐ গ্রন্থের প্রণয়ন করেন। নিদানগ্রন্থ ঐ সিদ্ধযোগের প্রথমভাগমাত্র। (৩)

এই সিদ্ধান্ত ন্যায়ানুমোদিত কি না, তাহার বিচারের জন্য প্রথমতঃ গ্রন্থকারের একত্বে ডাঃ হর্ণলে মহোদয়ের প্রদর্শিত যুক্তিগুলির পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক। তাঁহার প্রথম যুক্তি এই যে ঃ—বৃন্দ সিদ্ধযোগ নামক যে চিকিৎসাগ্রন্থ সংগৃহীত করিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে, এই গ্রন্থ রুগ্বিনিশ্চয়ের ক্রমে রচিত হইল। (৪) কিন্তু সে স্থলে রুগ্বিনিশ্চয় অন্য গ্রন্থকারের রচিত হইলে, তাহার নাম উল্লিখিত হইত। কোনরূপ নামের উল্লেখ নাই দেখিয়া ডাঃ হর্ণলে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বৃন্দ 'গদবিনিশ্চয়ক্রমেণ' এই পদের দ্বারা, প্রথমে নিদান গ্রন্থ লিখিয়া, সেই অনুসারে চিকিৎসা-গ্রন্থ লিখিতেছেন, এইরূপই প্রকাশ করিয়াছেন। এই জন্যই তাঁহার কল্পিত গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের শেষে আত্মপরিচয় প্রদান না করিয়া, একেবারে গ্রন্থান্তে—সিদ্ধযোগের শেষে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন। (৫)

সিদ্ধযোগে রুগ্বিনিশ্চয়ের গ্রন্থকারের নামের উল্লেখ না করাতেই উভয় গ্রন্থ এক জনের অনুমান করা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। যৎকালে সিদ্ধযোগ বিরচিত হইয়াছিল, তৎকালে নিদান গ্রন্থ ও তাহার গ্রন্থকার সর্ব্বত্র প্রথিতই ছিলেন, এই জন্যই বৃন্দ গ্রন্থকারের নাম-উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়া থাকিতে পারেন। চক্রপাণিদত্ত স্বীয় চিকিৎসাসংগ্রহ গ্রন্থের শেষে বলিয়াছেন যে, 'এই গ্রন্থে "সিদ্ধযোগে"র অতিরিক্ত যে সিদ্ধযোগ লিখিত হইল', ইত্যাদি। কিন্তু সিদ্ধযোগের গ্রন্থকারের নামের উল্লেখ করেন নাই। (৬) উক্ত যুক্তি-অনুসারে সিদ্ধান্ত করিতে হইলে, চক্রদত্তকেও সিদ্ধযোগের দ্বিতীয় সংস্করণ বলা কর্ত্তব্য।

(৩) It seems quite clear, therefore, that the Rugvinishchaya was only the first part of larger work, the second part of which is Siddhayoga. I. R. A. S. 1906, P. P. 289.

(৫) Vide I R. A. S. 1906 P, P. 288

(৬) যঃ সিদ্ধযোগলিখিতাধিকসিদ্ধযোগান্। অত্রৈব নিক্ষিপতি কেবলমুদ্ধরেদ্বা।

চক্রদত্ত ; শেষপৃষ্ঠা।

সিদ্ধযোগের পৌনে ষোল আনা অংশই চক্রদত্তে অবিকল উদ্ধৃত হইয়াছে। আজকাল অনেক গ্রন্থকারই পরবর্ত্তী সংস্করণে অধিক বিষয় গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করিয়া তাহার কলেবর পরিবর্দ্ধিত করিয়া থাকেন।

গ্রন্থকারের একত্বে ডাঃ হর্ণলে মহোদয়ের দ্বিতীয় যুক্তি :—

রুগ্বিনিশ্চয় 'মাধবনিদান' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। এই সিদ্ধযোগ গ্রন্থও পরবর্ত্তী কালে 'বৃন্দমাধব' নামে খ্যাত হয়। (৭) এই মাধব নামটী বিজয়-রক্ষিত কর্ত্তৃক কবিত্বের হিসাবে (Poetically) কল্পিত হয়। উভয় গ্রন্থ একই গ্রন্থকারের রচিত; এই জন্যই কল্পিত নাম উভয় গ্রন্থের নামের সহিতই পরবর্ত্তী কালে বিজড়িত হইয়া পড়িয়াছে। (৮)

সিদ্ধযোগকে 'বৃন্দমাধব' নামে প্রথিত হইতে দেখিয়াই, বৃন্দ ও মাধবকে এক ব্যক্তি কল্পনা করা অপেক্ষা, বিভিন্ন ব্যক্তি অনুমান করাই আমরা যুক্তিসঙ্গত মনে করি। মাধবই প্রথম এই সংগ্রহ-রচনা-প্রণালীর আবিষ্কার করিয়াছিলেন। বৃন্দ তাঁহারই ক্রম অনুসারে, তাঁহারই ক্ষুণ্ণ সরণির অনুসরণ করিয়া, সিদ্ধযোগের রচনা করিয়াছেন; এই জন্য প্রণালীর উদ্ভাবনকর্ত্তার প্রতি কৃতজ্ঞতাবশতঃ, গ্রন্থের অপর নামে নিজের নামের সহ মাধবের নামও যোগ করিয়া দিয়াছেন। এইরূপ অনুমানই স্বাভাবিক; নতুবা মাধবনিদানের ন্যায় এই গ্রন্থের 'মাধব-সিদ্ধযোগ' নামে প্রথিত হওয়া উচিত ছিল। অপিচ, বৃন্দ কেবল মাধবের ক্রমই গ্রহণ করেন নাই; সম্ভবতঃ মাধবের যে চিকিৎসা-গ্রন্থ ছিল, তাহাও চক্র-পাণির ন্যায় স্বীয় গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছেন। মাধবের চিকিৎসাগ্রন্থ আজ কাল না পাওয়া গেলেও, তাহার দুই চারিটী বচন আজও দেখা যাইতেছে। সিদ্ধযোগের টীকায় নিম্নলিখিত কয়েকটী বচন দেখিতে পাওয়া যায় :—

শ্রীমাধবোপ্যাহ—

লঙ্ঘনঃ তদ্বিধা জ্ঞেয়ঃ শমনং শোধনঞ্চ তৎ।

* * * * * * *

বমনং লঙ্ঘন কুর্য্যাৎ কফেরক্ষন্ বলাদিকং॥—ইত্যাদি—সিদ্ধযোগ; ৯ পৃষ্ঠা।

মাধবোঽপ্যাহ—

আদিত্যেঽনুদিতে নৃণামঞ্জনং ন হিতং মতম্।—ইত্যাদি—৪৫১ পৃঃ।

শ্রীমন্মাধবঃ প্রাহ—

লব্ধাংশে (২) সমদোষত্বে সমাগ্নিত্বাদয়স্তদা।—ইত্যাদি—৬১৫ পৃঃ।

(৭) বৃন্দমাধবাপরনামক-সিদ্ধযোগ-ব্যাখ্যায়াম্।—সিদ্ধযোগ; ৬৪ পৃষ্ঠা।

(৮) Vide J. R. A. S. 1906, PP. 288.

উক্ত চিকিৎসার বিধানসূচক বচনগুলি কোনও চিকিৎসা গ্রন্থ ব্যতীত থাকিতে পারে না, এবং সিদ্ধযোগের মূলেও নাই। এতাবতা স্পষ্টই প্রতিভাত হয় যে, মাধবের একখানি চিকিৎসা-গ্রন্থ ছিল। কালের কুটিল আবর্ত্তে মাধবের অন্যান্য গ্রন্থের সহিত এখানিও লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এই গ্রন্থ অবলম্বন করিয়াই, অথবা চক্রপাণির ন্যায় মাধবের গ্রন্থের অধিকাংশই অন্তর্ভুক্ত করিয়া, বৃন্দ সিদ্ধযোগের রচনা করিয়াছিলেন। সুতরাং পরম্পরা সম্বন্ধে সিদ্ধযোগে মাধবেরও আংশিক কর্ত্তৃত্ব থাকায়, বৃন্দ ও মাধব, এই উভয় গ্রন্থকারের নাম যোগ করিয়া, গ্রন্থের অপর নাম নির্বাচিত হওয়াই স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়।

মাধব-নাম-কল্পনার স্বপক্ষে ডাঃ হর্ণলে মহোদয় এইরূপ যুক্তিপ্রদর্শন করিয়াছেন :—

নিদানের কোনও অংশেই গ্রন্থকারের নাম উল্লিখিত হয় নাই। এই মাধবকর নামটি বিজয় রক্ষিত তাঁহার টীকার অনুক্রমণিকার পঞ্চম শ্লোকে ধরিয়াছেন। ঐ টীকার নাম-ব্যাখ্যা মধুকোষ (Store of honey)। সুতরাং কবিত্বের রীতি অনুসারে (Poetically) গ্রন্থকারকে মাধব-কর অর্থাৎ মধুকর (Maker of honey) আখ্যা প্রদান করা হইয়া থাকিতে পারে। (৯)

উক্ত যুক্তির প্রতিকূলে আমরা তিনটী তর্ক দেখিতে পাই। প্রথমতঃ, পুষ্পরস বুঝাইতে মধু শব্দের পর্য্যায়ে মাধব শব্দ কোনও অভিধানে পরিদৃষ্ট হয় না। আর, মধু-শব্দে অনন্যার্থে 'ষ্ণ' প্রত্যয়েরও কোনও নিয়ম আমরা দেখিতে পাই না। সুতরাং মাধব-কর শব্দে Maker of honey অর্থাৎ মধুমক্ষিকা কল্পনা করা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, এই মাধবকর নামটী বিজয় রক্ষিতই প্রথম কল্পনা করেন নাই। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ডল্লনও তাঁহার সুশ্রুত-টীকায় শ্রীমাধবের নাম করিয়া গিয়াছেন। তৃতীয়তঃ, বিজয় রক্ষিত নিদানের কর্ত্তাকে মাধবনাম দিতে পারেন, কিন্তু যে স্থলে তাঁহাকে অন্য গ্রন্থের প্রণেতৃ-রূপে উল্লেখ করা হইতেছে, (১০) সে স্থলে তাঁহার নাম মধুকর-রূপে কল্পনা করা সমীচীন মনে হয় না।

সিদ্ধযোগের টীকাকার শ্রীকণ্ঠ দত্ত তাঁহার সিদ্ধান্তের সমর্থন করিয়াছেন,

---

(৯) Vide J. R. A. S. 1906, P. 289,

(১০) ভট্টার-জেজ্জট-গদাধর-বাপ্যচন্দ্র শ্রীচক্রপাণি-বকুলেশ্বর-সেন-ভোজৈঃ।
ঈশান-কার্ত্তিক-সুধীর-সুবীর-বৈদ্যৈ মৈত্রেয়-মাধব-মুখৈ লিখিতং বিচিন্ত্য॥
নিদানটীকা ; অনুক্রমণিকা। ২

ইহাই ডাক্তার হর্ণলে মহোদয়ের চতুর্থ তর্ক। তিনি বলেন,—সিদ্ধযোগের বৃদ্ধি-চিকিৎসাধিকারে বৃদ্ধিনিদান—(Diagonistic Statement of Hydrocele) উক্ত হইয়াছে। (১১) তাহার টীকায় শ্রীকণ্ঠদত্ত বলিয়াছেন যে, ব্রধ্নিদান রুগ্বিনিশ্চয়ে বলা হয় নাই; এই জন্য সিদ্ধযোগে বলা হইল। (১২) এই বাক্য গ্রন্থকারের একত্বই সূচিত করিতেছে; যে হেতু এক গ্রন্থকার হইলে, তাঁহার পূর্ব্বগ্রন্থের ন্যূনতা দ্বিতীয়-খণ্ডস্বরূপ অন্যগ্রন্থে বলা আবশ্যক হইয়া থাকে (১৩)

আজকাল মুদ্রাযন্ত্রের বহুল-প্রচারের যুগে, উক্ত তর্ক সমীচীন হইতে পারে। এখন কেহ যদি কোনও বৃহৎ গ্রন্থ খণ্ডে খণ্ডে মুদ্রিত করেন, এবং তাহার পূর্ব্বখণ্ডে কোনও বিষয় ভ্রমবশতঃ অনুল্লিখিত হয়, তাহা হইলে, তাহার কোনও সূত্র দ্বিতীয় খণ্ডে মুদ্রিত করা সম্ভব। কিন্তু প্রাচীন কালে, যখন পৃথক্ পৃথক্ পত্রে গ্রন্থসমূহ হস্তে লিখিত হইত, তখন গ্রন্থকার স্বয়ং যদি গ্রন্থে কোনও বিষয় প্রমাদবশতঃ লিপিবদ্ধ হয় নাই,—জানিতে পারিতেন, তবে যথাস্থানেই সেই পত্রের উপরে পাঠ তুলিয়া ন্যূনতা-পূরণ করিতেন। এইরূপ, রুগ্বিনিশ্চয়ে ব্রধ্নিদান লিখিতে ভুল হওয়ায়, যদি সিদ্ধযোগ-রচনাকালে ঐ বিষয় স্মৃতিপথে উদিত হইত, তবে এক গ্রন্থকার হইলে, অনায়াসে রুগ্বিনিশ্চয়ের বৃদ্ধিনিদানের পৃষ্ঠায় দুই পঙ্ক্তি পাঠ উপরে তুলিয়া লিখিতে পারিতেন। এরূপ সুগম উপায় থাকিতে, চিকিৎসাগ্রন্থে নিদান লিখিয়া অমার্জ্জনীয় অধিক দোষ (১৪) স্বীকার করা হইল কেন? শ্রীকণ্ঠ দত্ত বৃন্দ ও মাধবকে পৃথক্ ব্যক্তি বলিয়াই জানিতেন, এবং বৃন্দ যে মাধব অপেক্ষা পরবর্ত্তী কালের লোক, তাহাও স্পষ্টতঃ বলিয়া গিয়াছেন। সিদ্ধিযোগে স্নায়ুক রোগের নিদান-ব্যাখ্যায় শ্রীকণ্ঠ বলিয়াছেন যে, এই ব্যাধি মাধবের সময় না থাকায়, ইহার নিদান রুগ্বিনিশ্চয়ে উক্ত হয় নাই। (১৫) আরও অনেক স্থলে বৃন্দ ও মাধব উভয়ের নামের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। (১৬) এই সমস্ত প্রমাণ সত্ত্বে, শ্রীকণ্ঠ ডাঃ হর্ণলে মহোদয়ের মতের সমর্থক, এরূপ ধারণা কাহারও হইতে পারে না।

---

(১১) বাস্তবিক পক্ষে সিদ্ধযোগে ব্রধ্নিদান লিখিত হইয়াছে। তাহার অনুবাদ Hydrocele ঠিক নহে।

(১২) রুগ্বিনিশ্চয়ে অনুক্তত্বাৎ লক্ষণং লিখিতবান্ বৃন্দঃ। সিদ্ধযোগ; ৩২৫ পৃঃ।

(১৩) J. R. A. S. 1906. PP. 289.

(১৪) তন্তুনামাখ্যাতস্তু প্রায়ঃ পাশ্চাত্যপুরুষবিষয়স্তু।—ইত্যাদি। সিদ্ধযোগ; ৩৯৭ পৃঃ।

(১৫) সিদ্ধযোগ; ৬৪ পৃঃ; ২৪৯ পৃঃ।

(১৬) Vide J. R. A. S. 1906. PP. 289-90.

বৃন্দ ও মাধবের একত্বে ডাক্তার হর্ণলে মহোদয় শেষ যুক্তি দেখাইয়াছেন :— ডল্লন শ্রীমাধবকে যে টিপ্পণীকার আখ্যা প্রদান করিয়াছেন, তাহার মূল এই সিদ্ধযোগ। সিদ্ধযোগে অনেক স্থলে মূলের সহ টিপ্পনী দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ টিপ্পনী করিবার প্রবৃত্তি সিদ্ধযোগকর্ত্তারই দেখা যাইতেছে। এ অবস্থায় তাঁহাকে টিপ্পণীকার আখ্যা প্রদান করা অযৌক্তিক নহে। সুতরাং টিপ্পণকার শ্রীমাধব ও সিদ্ধযোগকার বৃন্দ অভিন্ন। (১৭)

টিপ্পনীর উদাহরণস্বরূপ ডাঃ হর্ণলে সিদ্ধযোগ হইতে কতকগুলি পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন। যদিও শ্রীকণ্ঠ দত্ত তাহাকে টিপ্পনী আখ্যা প্রদান করিয়াছেন, তথাপি তাহাকে সিদ্ধযোগের ব্যাখ্যা বলা যায় না। বৃন্দ নিজেই তাহার 'প্রস্তাববাক্য' (১৮) সংজ্ঞা দিয়াছেন। এইরূপ স্বমতসহকারেই প্রাচীন ঋষিদের পরিক্ষীতযোগসমূহ এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইবে, এইরূপই গ্রন্থকার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। চিকিৎসাগ্রন্থমাত্রেই এইরূপ পরিভাষা-দ্যোতক বচন থাকে ; নতুবা গ্রন্থ অসম্পূর্ণ হয়, এবং তাহা পাঠ করিয়া চিকিৎসা করা যায় না। আরও, সুশ্রুতগ্রন্থের মাধব-কৃত যে একটী ধারাবাহিক টিপ্পনী ছিল, তাহা আমরা অবগত হইতে পারিয়াছি। সিদ্ধযোগের টীকাকার শ্রীকণ্ঠ দত্ত অগস্ত্যহরীতকী নামক যোগের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে, প্রমাণস্বরূপ মাধবকরাচার্য্যের ব্যাখ্যা ধরিয়াছেন। (১৫) ঐ যোগ সুশ্রুতের উত্তর তন্ত্রের ৫২ অধ্যায় হইতে সিদ্ধযোগে উদ্ধৃত হইয়াছে। সুতরাং উক্ত মাধবকরাচার্য্যের ব্যাখ্যা সুশ্রুতের টিপ্পনী গ্রন্থের অন্তর্গত হওয়াই স্বাভাবিক ; আর, রুগ্বি-নিশ্চয়ের টীকাকার বিজয় রক্ষিতও মাধব-কৃত ধারাবাহিক টিপ্পনী দেখিয়া-ছিলেন ; তিনি পঞ্চনিদানের প্রাগ্রূপ-ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে জেজ্জটাদির সহিত মাধবের ব্যাখ্যারও উল্লেখ করিয়াছেন। (১৯) সুতরাং বৃন্দ ব্যতীত যে মাধবের একটী বিশিষ্ট সত্তা নাই, তাহা ডাঃ হর্ণলে মহোদয়ের যুক্তিসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় নাই ; বরং মাধবের পৃথক্ অস্তিত্বই প্রমাণিত হইয়াছে।

(১৭) নানামুনিপ্রথিতদৃষ্টফলপ্রয়োগৈঃ প্রস্তাববাক্যসহিতৈরিহ সিদ্ধযোগঃ।
সিদ্ধযোগ ; ১ পৃঃ।

(১৮) অত্র গুড়ভক্ষ্যমানং নোক্তং, তদ্ যোগান্তরদর্শনাৎ কল্পনীয়ম্, তথাহি ভার্গীগুড়ে— ভক্ষয়েদভয়ামেকাং লেহস্যার্দ্ধপলং লিহে দিত্যুক্তম্। তেনেহ দ্বিহরিতকীভক্ষণাৎ সিদ্ধং তাবদগুড়াৎ পলং ভক্ষ্যমিতি যোগব্যাখ্যায়াং মাধবকরাচার্য্যঃ।—সিদ্ধযোগ ; ১৪৮ পৃঃ।

(১৯) অব্যক্তবাতজ্বরবোধকত্বাদ্ অব্যক্তত্বমেব জৃম্ভাদীনামিতি জেজ্জটবাপ্যচন্দ্রমাধব-কার্ত্তিককুণ্ডাদয়ো ব্যাচক্ষতে।—নিদান ; ৮ পৃঃ।

এতদ্ব্যতীত, বৃন্দ ও মাধব এক ব্যক্তি হইলে, এবং সিদ্ধযোগকে রুগ্বিনিশ্চয়ের দ্বিতীয় খণ্ড বলিয়া স্বীকার করিলে, তাহাকে বহু দোষের আকরস্বরূপ স্বীকার করিতে হয়। প্রাচ্য শাস্ত্রে পুনরুক্তি অমার্জ্জনীয় দোষের মধ্যে পরিগণিত। যদি নিদান ও সিদ্ধযোগ একই গ্রন্থকারের গ্রন্থবিশেষের খণ্ডদ্বয়-রূপে পরিগণিত হইত, তবে একই বিষয় উভয়ত্র উল্লিখিত হওয়ায় গ্রন্থখানি শব্দ ও অর্থে পুনরুক্তিদোষে দুষ্ট হইয়া পড়িত। (২০) একই বিষয় কেন, একই শ্লোক উভয়ত্র উল্লিখিত হইয়াছে। (২১) ইহাই শব্দ-পুনরুক্তি। ইহা ব্যতীত বহু স্থলেই একই ব্যাধির ভিন্ন ভিন্ন শ্লোক দ্বারা উভয় গ্রন্থেই লক্ষণ লিখিত হইয়াছে। (২২) ইহাই আর্থ পুনরুক্তি। রুগ্বিনিশ্চয়কে সিদ্ধযোগের প্রথম খণ্ড স্বীকার করিতে হইলে, প্রথম সংগ্রহ-গ্রন্থের কর্ত্তা মহামতি বৃন্দ যে জ্ঞাতসারে এই প্রকার অমার্জ্জনীয় পুনরুক্তি দোষ করিয়াছেন, তাহা স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং উভয় গ্রন্থ বিভিন্ন গ্রন্থকারকের সিদ্ধান্ত করাই সঙ্গত।

আর একটী কারণে আমরা বৃন্দ ও মাধবকে শুধু অভিন্ন ব্যক্তিই বলি না, বৃন্দ তাঁহার চিকিৎসা-সংগ্রহ-প্রণয়নে মাধবের চিকিৎসা-গ্রন্থকেই প্রধান অবলম্বন পাইয়াছিলেন, এবং তদবলম্বনেই সিদ্ধযোগসমূহের নির্ব্বাচন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এরূপও অনুমান করিতে পারি। প্রথম সংগ্রহ-গ্রন্থের প্রণয়ন করিলে, বিভিন্ন সংহিতা-গ্রন্থ হইতে, বিক্ষিপ্ত বহুপ্রকার ঔষধসমষ্টির মধ্যে পরীক্ষিত যোগের নির্ব্বাচন করিতে গ্রন্থকর্ত্তার চিকিৎসায় বহুল অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক, এবং বহুক্ষেত্রে ঔষধ প্রয়োগ করিয়া, তাহার উপকারিতার তারতম্য প্রত্যক্ষ না করিলে, সিদ্ধযোগনির্ব্বাচন সম্ভব হয় না। কিন্তু বৃন্দ আদৌ চিকিৎসা-ব্যবসায়ী ছিলেন কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। তিনি আত্মহিতার্থী হইয়া এই গ্রন্থের প্রণয়ন করেন। (২৩) প্রাচীন কালে ব্রাহ্মণগণ পরোপকারার্থ, ক্ষত্রিয়গণ

(২০) বাক্যদোষো নাম * * * ন্যূনমধিকম্ * * *। অধিকং নাম * * * যদ্বা সম্বদ্ধার্থমপি দ্বিরভিধীয়তে তৎপুনরুক্তত্বাধিকম্। তচ্চ পুনর্দ্বিবিধং শব্দপুনরুক্তমর্থপুনরুক্তঞ্চ। —চরক, বিমান, ৮ অঃ।

(২১) স্বেদাবরোধঃ সন্তাপঃ সর্ব্বাঙ্গগ্রহণস্তথা।
যুগপদ্‌যত্র রোগে স্যাৎ স জ্বরো ব্যপদিশ্যতে॥—সিদ্ধযোগ ; ৮ পৃঃ ; নিদান (বম্বে) ২১ পৃষ্ঠা।

(২২) বিষমজ্বরের লক্ষণ, নিদান, ৩১ পৃঃ ; সিদ্ধযোগ ৫২ পৃঃ ; তৃতীয়ক ও চাতুর্থক জ্বরের লক্ষণ ৩১ পৃঃ ও সিদ্ধযোগ ৫৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(২৩) বৃন্দেন মন্দমতিনাত্মহিতার্থিনায়ং সংলিখ্যতে গদবিনিশ্চয়জক্রমেণ।—
সিদ্ধযোগ ; ২ পৃঃ।

আত্মহিতার্থ ও বৈশ্যগণ বৃত্ত্যর্থ আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিতেন। (২৪) এই 'আত্মহিতার্থিনা' বিশেষণ দেখিয়া মনে হয়, তিনি ক্ষত্রিয় ছিলেন, এবং চিকিৎসা তাঁহার ব্যবসায় ছিল না; তাঁহার দ্বারা ভেষজ-সমুদ্রের মধ্য হইতে পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধযোগের আহরণ সম্ভব ছিল না। সুতরাং তিনি কোনও পূর্ব্ববর্ত্তী সংগ্রহ-কারকের—সম্ভবতঃ মাধবের অনুসরণ করিয়াছিলেন। এইরূপ অনুমানই সঙ্গত, এবং এইরূপেই সিদ্ধযোগের বৃন্দ-মাধব এই অপর নামের সম্যক্ সার্থকতা সম্পাদিত হইতে পারে। মাধবের যে একখানি চিকিৎসাগ্রন্থ ছিল, তাহা আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে ও পূর্ব্বপ্রকাশিত 'পর্য্যায়রত্নমালা' নামক প্রবন্ধে প্রতিপন্ন করিয়াছি। (২৫)

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই যে, বৃন্দ ও মাধব বিভিন্ন ব্যক্তি। বৃন্দের এই সংগ্রহগ্রন্থ-প্রণয়নের বহুপূর্ব্বে আমাদের দেশের উজ্জ্বলরত্নস্বরূপ বাঙ্গালী মাধবকর, (২৬) তদানীন্তন সুধীবর্গের আকাঙ্ক্ষায়, এক বিরাট আয়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহগ্রন্থের প্রণয়ন করিয়াছিলেন; যাহার প্রথম খণ্ড নিদান বা রুগ্বিনিশ্চয় এখনও বৈদ্যবর্গের প্রথম পাঠ্যরূপে তাঁহার গৌরবঘোষণা করিতেছে। অভি-ধান ভাগ 'পর্য্যায়রত্নমালা' মুদ্রিত না হইলেও পাওয়া যাইতেছে। চিকিৎসা ও দ্রব্যগুণাধ্যায়ের সত্তা, বিক্ষিপ্ত দুই চারিটী বচন পাওয়ায়, অনুমান করিতে পারিতেছি। অনুসন্ধান করিলে, হয় ত, এক দিন তাহা কালের কঠোর আবরণ ভেদ করিয়া লোকলোচনগোচরে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে।

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র সরস্বতী।

---

(২৪) স চ অধ্যেতব্যো ব্রাহ্মণরাজন্যবৈশ্যৈঃ। তত্রানুগ্রহার্থং প্রজানাং ব্রাহ্মণৈঃ, আত্মরক্ষার্থং রাজন্যৈঃ, বৃত্ত্যর্থং বৈশ্যৈঃ।—চরক, সূত্র, ৩০ অধ্যায়।

(২৫) সাহিত্য; ১৩২১ সাল, শেষ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

(২৬) মাধব কর যে বাঙ্গালী ছিলেন, তাহা আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছি।—১৩২১ সালের শেষ সংখ্যা সাহিত্য দ্রষ্টব্য।

'পাক্ষিক সমালোচক'।

[স্বর্গীয় ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় রচিত।]

১৮৮৩—৮৪ খৃঃ অব্দে আমরা ভিন্ন ভিন্ন আপিসের কয়েকটী কেরাণী মিলিয়া এক কেরাণীদুর্লভ কঠিন কাজে হাত দিয়াছিলাম। সে বড়ই দুঃসাহসের কাজ,—কাগজ। আমরা বঙ্গদেশের বহির্ভাগে বিদেশে বসিয়া এক বাঙ্গালা কাগজ বাহির করিয়াছিলাম। কাগজ ত কাগজ, বড় 'কেও-কেটা' কাগজ নয়; বাঙ্গালার মফঃস্বল হইতে ক্ষুদ্র কলেবরের, ক্ষীণ স্বরের যেরূপ সচরাচর-দৃষ্ট সংবাদপত্র বাহির হইয়া থাকে; সেরূপ কাগজ নয়; আকাঙ্ক্ষায়ও নয়; উদ্দেশ্যেও নয়; আকৃতি প্রকৃতি কিছুতেই নয়। 'মারি ত গণ্ডার, লুটিত ভাণ্ডার'! কাজে কেরাণী ও শক্তিতে শফরী হইলেও, সাহিত্যে 'ছোট নজর' ছিল না। অসমসাহসিক কার্য্য,—আমরা বাহির করিয়াছিলাম এক বৃহৎ কাগজ, সাহিত্যাদি সমালোচনা বিষয়ক এক পাক্ষিক পত্রিকা। সেরূপ আকৃতির এবং প্রকৃতির পাক্ষিক পত্র এ দেশে তাহার পূর্ব্বে কখনও প্রকাশিত হয় নাই; তাহার পরেও অদ্যাবধি হয় নাই। সামান্য ও নগণ্য কেরাণী-কুলে জন্মিয়াও আমাদের ঐ পাক্ষিক সাহিত্য পত্র, কি জানি সৌভাগ্যের কি সিদ্ধিযোগে বা অনুকূল নক্ষত্রে, নেহাত কেরাণী-কলমের পরিচয় দেয় নাই। উহা সুবিজ্ঞ সমীচীন লোকের শ্রদ্ধা ও সাহিত্যসিংহদিগের সম্যক মনোযোগ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। তখনকার সংবাদ-পত্র ও সাময়িকপত্র-নিচয়ে উহা উচ্চ শ্রেণীর সন্দর্ভ বলিয়া স্বীকৃত ও সমালোচিত হইয়াছিল। উহা অতটা সম্মান উপার্জ্জন করিতে পারিবে, ইহা উহার অঙ্কুরে অনেকে স্বপ্নেও ভাবেন নাই। কেরাণীদের ঐ কার্য্যে কেবল কেলেঙ্কারীই হইবে,—লোকে ভাবিয়াছিল; এবং সেরূপ ভাবনাকে অসঙ্গতও বলা যাইতে পারে না। একা আমি ভিন্ন উহার অনুষ্ঠাতৃদিগের আর সকলেই উহার অব্যবহিত অদৃষ্ট সম্বন্ধে অত্যন্ত শঙ্কিত ও সন্দিহান ছিলেন। তথাপি আমাদের ঐ পাক্ষিক পত্র বেশ চলিয়াছিল; বহুকাল বেশ চলিতও বোধ হয়। কিন্তু, অনুষ্ঠাতৃদিগের মধ্যে বাঙ্গালী-সুলভ একটী আত্মবিরোধ উপস্থিত হইয়া উহার ভাবী অস্তিত্বের উপর আঘাত করে। আট মাস কাল সতেজে ও সম্মানের সহিত চলিয়া, সাহিত্যের সু-আহার্য্য অভাবে উহা এক বৎসর পরে এ দেশীয় অনেকানেক

পত্রিকারই মত পিতৃলোকে বিলীন হয়। পিতৃ-লোক-প্রস্থানের পথে উঠিবার পূর্ব্বেই আমি উহার সংস্রব ত্যাগ করিয়াছিলাম। অতিকষ্টেই সে কার্য্যটা করিতে হইয়াছিল। প্রথম আট মাসের অধিক কাল উহার সঙ্গে আমার লেখনীর ও সম্পাদকীয় কর্ত্তব্যের সংস্রব ছিল না।

বঙ্গীয় ১২৯০ সালের ফাল্গুন মাসে ঐ পাক্ষিক পত্র প্রথম প্রকাশিত হয়। এবং প্রতিপক্ষে সুন্দর রঙ্গিন-মলাটযুক্ত সুবৃহৎ পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইতে থাকে। বঙ্কিম বাবু বহু পূর্ব্বেই 'বঙ্গদর্শন' হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। বঙ্গদর্শনের তখন বিষম বিপন্নাবস্থা। 'আর্য্যদর্শন' একরূপ উঠিয়া গিয়াছে। 'বান্ধব' কখনও বাহির হয়; কখনও বা হয় না। কালে ভদ্রেই লোকে তাহা দেখিতে পায়। বান্ধব-সম্পাদক বাঙ্গালার এমার্সনাখ্য কালীপ্রসন্ন বাবুর লেখনীও যেন তখন ক্রমে খর্ব্ব-শক্তি হইয়া পড়িতেছে। 'ভারতী' তখন বয়ঃক্রমের অষ্টম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। উহা 'ভারতী'র সম্পাদক-পরিবর্ত্তনের অব্যবহিত নিকটবর্ত্তী কাল। উহার কিছু কাল পরেই, বোধ হয়, ১২৯১ সালের প্রথম মাসে, শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ বাবু 'ভারতী'র সম্পাদনকার্য্য এখনকার সম্মাননীয়া সম্পাদিকার হস্তে অর্পণ করেন। তখনও 'নবজীবন' ও 'প্রচার' ভবিষ্যতের ভ্রূণাভ্যন্তরস্থিত। 'পাক্ষিক' প্রকাশিত হইবার পরবর্ত্তী শ্রাবণ মাসে 'নবজীবন' ও 'প্রচার' প্রকাশিত হয়। সংক্ষেপতঃ, বাঙ্গালা সাময়িক পত্রের তখনকার অবস্থা এই। এই অবস্থার তৎকালোচিত উল্লেখ করিয়া এবং সাহিত্য-সহযোগী পূর্ব্ববর্ত্তী সাময়িকপত্র-নিচয়কে যথাযোগ্য অভিবাদন করিয়া, আমি 'পাক্ষিকে'র অবতরণিকার এক স্থলে লিখিয়াছিলাম ;—

'* * আমাদিগের ছয়খানি মাসিকপত্রের মধ্যে 'গড়ে' দুই তিনখানি যথাসময়ে প্রকাশিত হইয়া থাকে; অবশিষ্ট কয়েকখানির অস্তিত্বমাত্র আছে, কিন্তু, সে অস্তিত্ব আদৌ আশাপ্রদ বলিয়া বোধ হয় না। এমত অবস্থায় বঙ্গীয় সাহিত্য-ক্ষেত্রে আর দুই একখানি উন্নত অঙ্গের সাময়িক পত্রের আবির্ভাব হওয়া বাঞ্ছনীয় কি না, তাহা সহৃদয় পাঠক ও সুশিক্ষিত লোকদিগেরই বিবেচ্য। আমরা যখন আজি একখানি নূতন পত্র প্রকাশ করিতে ব্রতী, তখন এ কথা আমাদিগের দ্বারা সম্যকরূপে ও অপক্ষপাতিত্ব সহকারে মীমাংসিত হওয়া অসম্ভব। বঙ্গীয় পাঠকসমাজে এই পত্রের স্থান আছে কি না, জানি না; আর নিজের 'আবশ্যকতা' নিজে প্রতিপন্ন করিতে আমাদিগের তাদৃশ প্রবৃত্তিও নাই।

যখন প্রকাশিত হইল, তখন বলা বাহুল্য যে, আমরা ইহার আবশ্যকতা সৃষ্টি করিবার জন্য সর্ব্বোতোভাবে চেষ্টা করিব। কৃতকার্য্য হই, "সমালোচক" দীর্ঘজীবী হইবে ; তাহা না হই, স্বভাবের নিয়মানুসারে কালগ্রাসে নিপতিত হইবে ; ইহা অপেক্ষা সহজ কথা আর কি হইতে পারে, আমরা জানি না।'

বলিতে চাই, 'সমালোচক' অতি অল্পকাল মধ্যেই আত্ম-আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিতে সক্ষম হইয়াছিল। কয়েক মাসমাত্র পরে প্রসিদ্ধনামা লেখক-দিগের কর্ত্তৃক দুইখানা মাসিক পত্র ('নবজীবন' ও 'প্রচার') প্রকাশিত হইয়াও আমাদের পাক্ষিকের সবিশেষ ক্ষতি হয় নাই। উহার অন্যান্য অংশীরা ঐ দুই পত্রের প্রকাশে বিলক্ষণ শঙ্কিত হইয়াছিলেন, স্মরণ হয় ; কিন্তু, আমার কিছুমাত্র শঙ্কা হয় নাই ; সবিশেষ স্ফূর্ত্তিই হইয়াছিল। আমি সমালোচনার মহা সুযোগ দেখিয়া বলিয়াছিলাম, 'প্রতিযোগিতায় কাজ আরও উত্তম হইবে।' বস্তুতঃ কোনও নূতন পুস্তক, বিশেষতঃ নূতন পত্রিকা প্রকাশিত হইলে, চিরকালই আমার কেমন স্বাভাবিক আমোদ হয়। তাহা না দেখা পর্য্যন্ত আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারি না। এইরূপে তখন কত অকিঞ্চিৎকর পুস্তক ও পত্রিকার জন্যও আমার কেরাণী-গিরির কঠিন পরিশ্রম-লব্ধ সামান্য অর্থেরও অনেক বৃথাব্যয় হইয়া যাইত। সাহিত্যক্ষেত্রের প্রতিযোগিতা আমি যারপরনাই পছন্দ করি। তাহাতে আদৌ ক্ষতি হইতে পারে, এরূপ ভাব আমার মনে উদয়ই হয় না। পরন্তু, তাহাতে কাহারও বা নিজের আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা ও শঙ্কা থাকিলেও, আমার মহা আনন্দ হয়। শত্রুতে পুস্তক বা প্রবন্ধ লিখিলে সমালোচনার মহা সুযোগ ; সে সুযোগের অপেক্ষা আমি আর কিছুই অধিকতর মূল্যবান বিবেচনা করি না। প্রাচীন প্রবচন আছে—'শত্রু পুস্তক লিখিয়া প্রকাশিত করে, ইহা পরম সুখের বিষয়।' এ সুখও স্বভাবতঃ আমার কিঞ্চিৎ হইয়া থাকে ; অন্ততঃ তখন হইত! ফলতঃ সাহিত্য-ক্ষেত্রে যাঁহারা অত্যন্ত পয়সা-প্রিয় লোক, বা কাপুরুষ, তাঁহারাই প্রতিযোগী পত্র পছন্দ করেন না। কিন্তু যাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে সাহিত্য-প্রিয় লোক, তাঁহারা তাহাতে পুলকিত হন, দ্বিগুণিত উৎসাহের সহিত কার্য্য করেন ; ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। সন্দেহ, শঙ্কা ও সম্পাদনের নানা বিঘ্ন সত্ত্বেও, আমাদের সেই 'সমালোচকে'র কাজ আট মাস উত্তমই চলিয়াছিল ; 'সমালোচক' আত্ম-আবশ্যকতা প্রতিপন্নও করিয়াছিল। তবুও যে তাহা টিকে নাই ; সে অন্য কারণে। পূর্ব্বেই তাহা বলিয়াছি। কিন্তু, যাউক এ কথা।

'সমালোচকে'র অবতরণিকায় আমি তাৎকালিক প্রায় প্রধান অপ্রধান সকল সাময়িক পত্রের নাম ও কিছু কিছু সমালোচনা করিয়াছিলাম; করা হয় নাই কেবল একখানির। সেখানি (?) বঙ্গীয় সংবাদপত্র-সম্পাদক-কুলের শ্রেষ্ঠ ও 'সোম-প্রকাশ'-সম্পাদক পূজনীয় ৺দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত বা প্রবর্ত্তিত একখানি মাসিকপত্র। সে পত্রখানির কয়েক সংখ্যা আমি পূর্ব্বে দেখিয়াছিলাম বটে; কিন্তু আমাদের পত্রিকার অবতরণিকা লেখার সময়ে, কেমন এক অজ্ঞাত ভ্রান্তিবশতঃ তাহার নাম এবং অস্তিত্বের বিষয় আমার আদৌ স্মরণ ছিল না। স্মৃতির এই সাংঘাতিক ছলনায় আমি সে পত্রখানির উল্লেখ করি নাই। তবে তৎ-কালে সে পত্র নিয়মিতরূপে চলিতেছিল না; তাহার অবিলম্বেই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। পরন্তু, সে পত্রের যে কয়েক সংখ্যা দেখিয়াছিলাম, তাহাতে তৎপ্রতি আমার তাদৃশ শ্রদ্ধাও তখন আকৃষ্ট হয় নাই। কিন্তু এ কয়েকটী কারণ কিছুই নয়। প্রকৃত কারণ আমার স্মৃতিশক্তির প্রতারণা। সময়ে স্মরণ না হওয়াতেই সে পত্রের নাম করিতে পারি নাই। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী সমালোচকের চক্ষে এ প্রমাদ পতিত না হইয়া যায় না। 'সমালোচকে'র উপর সমালোচক চিরকালই বিদ্যমান। কলিকাতার তাৎকালিক কোনও নবীন সমালোচক, শুনিয়াছি, আমার ঐ প্রমাদের প্রতি কিঞ্চিৎ কটাক্ষ করিয়াছিলেন। অবতরণিকা-লেখককে নাকি 'অদূরদর্শী' আখ্যা দিয়াছিলেন। পরন্তু, আমাদের ঐ পত্রকে—শুনিয়াছি নাকি—'ভূইঁফোঁড় পত্র' বলিয়াছিলেন। কিন্তু, এ দুইটাই শোনা কথা। ছাপার অক্ষরে এ কথা কখনও প্রকাশিত হয় নাই। আমাদের শোনা কথা; তাও আবার অত্যন্ত দূর হইতে তৃতীয় ব্যক্তির মুখে শোনা। কলিকাতা হইতে কোনও বন্ধু আমাদিগকে ঐ কথা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। শুনিয়াছিলাম, আমাদের ঐ সমালোচনা নাকি করিয়াছিলেন স্বয়ং শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথবাবু তখন অধিকতর অল্পবয়স্ক হইলেও সাহিত্যক্ষেত্রে স্বকীয় প্রতিভার সবিশেষ চিহ্ন অঙ্কিত করিতেছিলেন। তাঁহার বা যাঁহারই কর্ত্তৃক হউক প্রদত্ত উপরি-উক্ত দুই আখ্যা তখন আমাদের গায়ে বিলক্ষণ বাজিয়াছিল বটে, কিন্তু নিরপেক্ষ বিচার করিলে আমাদের প্রতি ঐ দুই আখ্যা-প্রদানের সবিশেষ অবসর ছিল, ইহা আমি অবশ্যই বলিতে বাধ্য। সাহিত্যক্ষেত্রে নূতন পত্র লইয়া প্রবেশাধিকারের কোনও সার্টিফিকেটই আমাদের ছিল না। আমরা—সেই পত্রের অনুষ্ঠাতৃগণ একান্ত অজ্ঞাত ও অপরিচিত ব্যক্তি; কখনও কেহ একখানি পুস্তক বা একটী প্রবন্ধ লিখিয়া প্রকাশিত করি নাই। আমরা

এক দিন অকস্মাৎ যেন আকাশ হইতেই বাঙ্গালা সাহিত্যের সমালোচক হইয়া নামিলাম। মাটী ফুঁড়িয়া এক মস্ত লম্বা চওড়া কাগজ বাহির হইয়া বসিল। ব্যাপারটা দৃশ্যতঃ অবশ্যই বিসদৃশ। অতএব 'ভুঁইফোঁড়' আখ্যাটী যিনিই দিউন, অন্যায় দেন নাই। উক্ত শব্দটীর সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহারই করিয়াছিলেন।

কিন্তু সাহিত্যে পরিচিত না হইয়াও সৌভাগ্যক্রমে আমরা তাহার সমালোচনার্থ কিয়ৎপরিমাণে প্রস্তুত ছিলাম। সমালোচনা করিয়াছিলাম প্রচুর; এবং সে সমালোচনা নেহাত ছেলে-খেলাও হয় নাই। আমাদের তখনকার সম্পাদকীয় ইচ্ছার মূলে একটী অপ্রকাশিত উদ্দেশ্য নিহিত ছিল। সে উদ্দেশ্য বাঙ্গালা ভাষায় একটী সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন সমালোচন-সাহিত্যের সৃষ্টি করা। ইংরেজীতে যাহাকে Critical Literature বলে, তাহারই জন্য আমরা তখন মাতিয়া উঠিয়াছিলাম, এবং 'সমালোচকে'র অনুষ্ঠানে অন্যান্য বন্ধুদিগকে জুটাইয়া আমি তাহাতে যোগ দিয়াছিলাম। আমার আসল উদ্দেশ্যটী তখন তাঁহাদিগের নিকট একরূপ গোপনই ছিল। গরজে পড়িয়াই গোপন করিয়াছিলাম। কারণ, পত্রিকার প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁহাদের প্রায় সকলেরই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র একটী আব্ছায়া গোছের আদর্শ ছিল। সে আদর্শের উপর এক বিন্দুও আঘাত না করিয়া, তাহা সম্যক্ রূপে সম্মুখে রাখিয়াই, আমি আমার নিজের উদ্দেশ্যসিদ্ধির সঙ্কল্প করিয়াছিলাম। সহৃদয় সহযোগিবৃন্দের অল্লাধিক স্বতন্ত্র রকমের এক একটী আদর্শ থাকিলেও, তাহা কিছু অনির্দ্দিষ্ট রকমের ছিল। এ জন্য পত্রিকার পরিচালন সম্বন্ধে একটা 'পথ বাঁধিবার' জন্য অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে আদেশ করিয়াছিলেন।' 'আপনি আগে আঁকিয়া জুখিয়া দিউন, রকমটা কেমন হইবে; তখন আমরা সকলে মিলিয়া সেইরূপ করিব।' সহযোগীদিগের সকলেই আমার অপেক্ষা বড় চাকুরে ছিলেন; তাঁহাদের বুদ্ধি বিদ্যাও আমার অপেক্ষা ঢের বেশী ছিল। অথচ আমাকে এরূপ আদেশ করিয়াছিলেন; ইহা আমার সৌভাগ্যই বলিতে হইবে। আমি যারপরনাই আহ্লাদের সহিত তাঁহাদের অনুরোধ পালন করিয়াছিলাম। তাঁহাদের ইচ্ছা অনুধাবন করিয়া অল্পবিস্তর নিজের অভিলাষমত পত্রের প্রকৃতি প্রবর্ত্তিত করা গিয়াছিল। এ জন্য পরিশ্রমও করিতে হইত বড় কম নয়। সারাদিন চাকুরীর কলম-চালনার পর, এই পীরিতের ব্যাপারে একখানি রয়াল ৩২ পৃষ্ঠা পরিমিত পাক্ষিক পত্রের প্রায় অধিকাংশই লিখিতাম।

ইচ্ছা, সমালোচন-সাহিত্যের সৃষ্টি, বা পুষ্টি; সুতরাং তাহারই যথাসম্ভব সাধনা আরম্ভ হইয়াছিল। সিদ্ধিপথে 'সমালোচক' অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই।

'সমালোচকে'র সমালোচনা-শর পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ সকল দিকেই ছুটিত। সিংহ, শশক, মৃগ, মার্জ্জার, সকলেরই উপর সে শর কোমল বা কঠিন ভাবে পতিত হইত। বঙ্কিমবাবু হইতে আরম্ভ করিয়া অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিই তাহার বিষয়ীভূত হইয়াছিলেন। 'সমালোচকে'র সমালোচক রবীন্দ্রনাথবাবুও অবশ্য বাদ পড়েন নাই। প্রায় বঙ্কিমবাবুরই লেখার মত রবীন্দ্রবাবুর রচনা পড়িতে আমি ভালবাসিতাম। কেবল তাঁহার কবিতা বলিয়া নয়, তাঁহার গল্প প্রবন্ধ ও সমালোচনা আমাকে সবিশেষ আমোদিত করিত। এ জন্য তিনি তখন যেখানে যাহা কিছু লিখিতেন, তাহা দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইতাম। তাঁহার লেখায় আমার এত আমোদ ও ব্যগ্রতার কয়েকটী কারণ ছিল। এখনও অবশ্য আছে। প্রথমতঃ, তাহাতে আমার কেমন একটু অনির্ব্বচনীয় আরামের উদ্রেক হইত; দ্বিতীয়তঃ, তাহাতে ভাবিবার বস্তু থাকিত; এবং সর্ব্বোপরি তাহাতে বেশ দু' কথা বলিবার বিষয় পাইতাম। মানসিক ব্যায়ামের একটা জীবন্ত বস্তু পাওয়া নিজেই এক অনির্ব্বচনীয় আমোদ। রবীন্দ্রনাথ বাবুর লেখা পাইলেই আমি তখন তাহার কিছু না কিছু সমালোচনা করিতে ছাড়িতাম না। কখনও কখনও সে সমালোচনা কিছু কঠিন ও নির্দ্দয় হইয়াও দাঁড়াইত। ব্যঙ্গ বিদ্রূপের ছড়াছড়ি হইয়া পড়িত। সে সকল লেখা 'সমালোচকে' যত না প্রকাশিত করিতাম, তাহার অনেক অধিক কলিকাতার অন্যান্য পত্রে পাঠাইয়া দিতাম। কিন্তু নিজের প্রতি নিজের সুবিচারের অনুরোধে, ইহাও আমি বলিতে বাধ্য যে, ঐ সকল সমালোচনায় আমার একটী অবিমিশ্র সাহিত্যামোদ ও সমালোচ্য ব্যক্তি ও বিষয়ের প্রতি অনুরাগ ব্যতীত অসূয়ার লেশমাত্র ছিল না। তাহার কিছুমাত্র কারণেরও একান্ত অভাব ছিল। ফলতঃ, সাহিত্য-সমালোচনায় যাঁহারা ব্যক্তিগত বিদ্বেষ সংযুক্ত করেন, তাঁহারা কেবল সাহিত্যামোদে একান্ত বঞ্চিত নহেন; সেটী তাঁহাদের একটী সাংঘাতিক ভ্রম।

সঙ্গীতের ন্যায় সাহিত্যেও একঘেয়ে আওয়াজ আমার একান্ত অসহনীয় কর্ণশূল। এ কারণেও রবীন্দ্রনাথ বাবুর লেখা আমার ভাল লাগে; কারণ, তাহাতে কিছু না কিছু অভিনবত্ব থাকেই থাকে। আর সেই কারণেই ইন্দ্রনাথ বাবুর কোনও কোনও লেখা আমি পছন্দ করি। এরূপ স্থলে আমি মতের

ঐক্য অনৈক্য ধরি না; নিছক আমোদটুকু গ্রহণ করিয়া থাকি। মতের অনৈক্য হইলেই যে আমোদের ব্যাঘাত হইবে, এমন কিছু লেখা পড়া নাই। ইন্দ্রনাথবাবুর পঞ্চানন্দী নিন্দা, কুৎসা, বা বিদ্রূপের প্রায় অধিকাংশই আমার ভাল লাগে না। তাঁহার ব্যঙ্গ বিদ্রূপ বড় স্থূল এবং অসংযত। কিন্তু, তাঁহার প্রতিজ্ঞা,—প্রতিজ্ঞা বলিয়াই যেন বোধ হয়—যে, তিনি আত্মক্ষোদিত পথ ভিন্ন পরের পথে একেবারেই পা দিবেন না। এরূপ প্রতিজ্ঞা প্রলয়কর হইতে পারে, সত্যের বিপরীত বা অশুভদায়ক হইতে পারে; অনেক সময়ে প্রতিজ্ঞারূঢ় ব্যক্তির প্রতিভার ক্ষতিকারক—ক্ষয়জনক হইতে পারে; কিন্তু, তাহা হইলেও, সাহিত্যাংশে আমোদ-প্রদ। একটা মতের বা অনুষ্ঠানের, বা সমস্যার স্রোত অতি-বেগে একটানা চলিয়াছে; ইন্দ্রনাথ বাবুর রীতি সে মতে, বা সে স্রোতে কিছুতেই গা ঢালিবেন না; ঠিক তাহার বিপরীত দিকে দাঁড়াইবেন; ঠিক তাহার উজানে যাইবেন; তাহা ইষ্টই হউক, আর অনিষ্টই হউক। ইন্দ্রনাথ বাবুর বিদ্রূপ বাঙ্গে সবিশেষ বৈচিত্র্য এই। এই বৈচিত্র্য-উপভোগের জন্য, আমি তখন 'বঙ্গবাসী' প্রায়ই পড়িয়া দেখিতাম, ইন্দ্রনাথ বাবু তাহাতে আছেন কি না। পরন্তু, রবীন্দ্রনাথ বাবু লিখিতেছিলেন দেখিয়া, আমি গ্রাহক হইয়া 'হিতবাদী' গ্রহণ করিয়াছিলাম। তাহাতে রবীন্দ্রনাথ বাবুর লেখা বন্ধ হওয়ার পর আমি আর সে পত্র পড়ি নাই। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন আমি ইঁহাদের কাহাকেও দেখি নাই। পরে ইঁহাদিগকে দেখিয়াছি ও ইহাঁদের সহিত আলাপ করিয়াছি।

এই স্মৃতির অপর এক স্থলে ইন্দ্র বাবুর একটু কথা পড়িবে। এ স্থলেও একটু পড়িতেছে। আমাদের পাক্ষিক পত্রের জন্য ইন্দ্র বাবুর লেখা পাওয়ার চেষ্টা হইয়াছিল। আমাদের মধ্যে ইন্দ্র বাবুর এক পরিচিত বন্ধু ছিলেন; তিনি এ জন্য ইন্দ্র বাবুকে পত্র লিখিয়াছিলেন। ইন্দ্র বাবু লেখা দিতে অসম্মত ছিলেন না; তাঁহার নিজের মতানুরূপ পত্রের পরিচালন হইলে, প্রবন্ধ দিতে পারেন, লিখিয়াছিলেন। কিন্তু 'পাক্ষিকে'র অভিভাবকগণ তাহাতে সম্মত হয়েন নাই।

ইত্যগ্রে উল্লিখিত সমালোচনা ভিন্ন অপর এক স্থলে আমাদের পাক্ষিকের আর একটী কঠিন সমালোচনা হইয়াছিল। এই দুইটী ব্যতীত আর যা সমালোচনা হইয়াছিল, সে সমস্তই প্রশংসাসূচক। প্রশংসার কথা বলা শিষ্টাচারবহির্ভূত; কিন্তু নিন্দার কথা বলা নিশ্চয়ই নিন্দনীয় নয়। অপর কঠিন সমালোচনা

করিয়াছিলেন,—'রাইজ্ এণ্ড রায়তে'র গতায়ু সম্পাদক পূজনীয় ৺শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—তৎ-সম্পাদিত উক্তনামধেয় সাপ্তাহিক ইংরেজী সংবাদপত্রে। তিনি 'পাক্ষিক সমালোচক' নামে ভুল ধরিয়া বিদ্রূপ রসিকতার তুফান তুলিয়াছিলেন। তাঁহার সে সমালোচনাটী সুদীর্ঘ। আমি সেটী সম্যক আমোদের সহিত উপভোগ করিয়াছিলাম। শম্ভু বাবুর শক্তিময়ী ও রসময়ী রচনা, স্বপক্ষেই হউক, বা বিপক্ষেই হউক, সর্ব্বথা উপভোগ্য, ইহা কেবল অরসিকেই অস্বীকার করে। শম্ভুবাবু আমাদের প্রথম সংখ্যা পড়িয়া রাজনীতিক সমালোচনা shrued ও সুলিখিত বলিয়া সুখ্যাতি করিয়াছিলেন; কিন্তু নামকরণের অপরাধ তাঁহার অত্যন্ত অসহ্য হইয়াছিল। তাঁহার বিবেচনায়, 'পাক্ষিক সমালোচক' অর্থাৎ Fortnightly Reviewer অশুদ্ধ ও অসঙ্গত,—হওয়া উচিত ছিল; Fort-night review, বা 'পাক্ষিক সমালোচন'। তিনি, যদি বিস্মৃত না হইয়া থাকি, তাঁহার এরূপ বিবেচনার কোনও সবিশেষ কারণ প্রদর্শন করেন নাই; কেবল আমাদের ক্ষুদ্র প্রাণটুকুর প্রতি বিদ্রূপ-বাণ বর্ষণ করিয়াছিলেন। এই ঘটনার বহু বৎসর পরে শম্ভু বাবুর সহিত আমার সাক্ষাৎ এবং আলাপ হইয়াছিল। পরন্তু, তাঁহার পাণ্ডিত্যের পক্ষপাতী ও গুণগ্রাহীদিগের মধ্যে আমি এক জন অদ্বিতীয়। কিন্তু, তাহা সত্ত্বেও, তাঁহার এই সমালোচনাটী খুব সঙ্গত হইয়াছিল বলিয়া আমার আজও বোধ হয় নাই। 'সমালোচন' বা সমালোচকের ন্যায় 'সমালোচক' নামও পত্রাদির হইতে পারে; না পারার কোনও যুক্তি বা অর্থ দেখি না। যখন Spectator হইতে পারে; তখন Reviewar না হইতে পারার হেতু কি? যখন 'পরিদর্শক' হইতে পারে, তখন পত্রের নাম 'সমালোচক' না হইতে পারিবে কেন? তবে একটা কথা এই যে, উক্ত কোনও আখ্যার (পরিদর্শক, সমালোচক ইত্যাদি) পূর্ব্বে সময়ব্যঞ্জক কোনও বিশেষণ (যেমন মাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক ইত্যাদি) সংযুক্ত হওয়া সঙ্গত কি না? ইংরাজী হিসাবে ধরিলে উহা কতকটা অসঙ্গত না শুনায়, এমন নহে; কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় উহাতে কিছু অসঙ্গতি আছে বলিয়া বোধ হয় কি? 'সমালোচকে'র সমালোচক বোধ হয় ইংরেজী ভাবটাই গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কিন্তু আমাদের প্রথম পত্রিকা-প্রকাশের উল্লিখিত অনুষ্ঠানে কিছু আনাড়িত্ব না ঘটিয়াছিল, এমন নহে। উচিত কথা বলিতে গেলে সেটা বিলক্ষণই ঘটিয়াছিল। আমরা দশ জনে মিলিয়া ঐ অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম। দশ জনের অতিরিক্ত উৎসাহের উচ্ছ্বাসে এবং কিঞ্চিৎ মৌলিকতা-প্রদর্শনের অভিলাষে একাধিক

বিষয়ে আমাদের আনাড়ি-পণা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল। প্রথম, পত্রিকা-সম্পাদন; দ্বিতীয়, তাহাতে রাজনীতিক অভিমত-প্রকটন।—এই দুই বিষয়ে, (এক দিকে সাধারণ তন্ত্রের পক্ষপাতিত্ব ও অপর দিকে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অতিরিক্ত উচ্ছ্বাস,—মোটের উপর) মৌলিকতা দেখাইবার প্রয়াসে, আমরা সকলে মিলিয়া মহা মূর্খতা করিয়া বসিয়াছিলাম। পত্র-সম্পাদনে সাধারণ তন্ত্র, এবং রাজনীতিক সমালোচনে যদৃচ্ছাতন্ত্র,—এই দুই পরস্পর বিপরীত ও একান্ত অসম্ভব তন্ত্রের অনুবর্ত্তী হইয়া, আমরা খুব একটা তামাসার ব্যাপারের সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। তবে সৌভাগ্য এই যে, তামাসাটা অবতরণিকার অঙ্গীকারের গণ্ডীতেই একরূপ আবদ্ধ ছিল; বেশী রকম কার্য্যে পরিণত হইয়া আমাদিগকে অধিকতর হাস্যাস্পদ করে নাই। সাত জনে সাধারণতান্ত্রিক বৈঠকে বসিয়া একটা কাগজ সম্পাদন করা অসম্ভব; অথচ স্ব স্ব স্বার্থ বা সাধ মিটাইবার জন্য আমরা এই অসম্ভবকে সম্ভব করিবার আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলাম। পরন্তু, একটা কাগজের রাজনীতিক অভিমতের অকৃত্রিমতা ও দৃঢ়তার সৃষ্টি করিতে হইলে, সে সম্বন্ধে সম্পাদকীয় মতের স্থায়িত্ব ও অপরিবর্ত্তনশীলতা প্রয়োজন; কিন্তু আমরা স্ব স্ব স্বাধীন মতের ও স্বাধীনা লেখনীর স্বতন্ত্রতা-রক্ষার্থ ব্যস্ত হইয়া কালিদাস পণ্ডিতের মত সম্পাদকীয়-মত রূপ বৃক্ষের মূল কাটিয়া তাহার শাখা ধরিয়া ঝুলিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম! অতি অপূর্ব্ব বন্দোবস্ত! দুই দিকে দুই বিপরীত ও পরস্পরবিরোধী ভাবের চরমোৎকর্ষ! মনে হয়, 'মিরার' ইহাতে বেশ একটু মিষ্ট বিদ্রূপ করিয়াছিলেন।

পত্রের প্রত্যেক সংখ্যার উদ্বোধন হইতে বিসর্জ্জন পর্য্যন্ত (প্রুফ দেখা ব্যতীত) প্রায়ই সবই আমায় করিতে হইত। পত্র-পরিচালনার পথ ক্ষোদিত করার ভার পাইয়াছিলাম; কার্য্যতঃ তাহার সম্পাদনও করিতাম। কিন্তু সম্পাদকীয় ভার শাফ্ ও সটান ভাবে আমার উপর অর্পিত হয় নাই। অবতরণিকায় লিখিত হইয়াছিল,—সহযোগিবৃন্দের সাধ মিটাইবার জন্য আমি নিজেই লিখিয়াছিলাম;—

'* * এই পত্রের সম্পাদকীয় কার্য্যের ভার কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিবিশেষের হস্তে অর্পিত নহে। সম্পূর্ণ সাধারণ-তন্ত্র প্রণালীতে একটী সমিতি কর্ত্তৃক "সমালোচক" সম্পাদিত হইবে।'

বলা বাহুল্য, সমিতি দ্বারা পত্র-সম্পাদন সম্ভবপর হয় নাই। তবে তাহার জন্য আমাকে সময়ে সময়ে বিলক্ষণ কষ্টভোগ ও কর্ম্মভোগ করিতে হইয়াছিল বটে। সাহিত্যের নেশায় বা পীরীতে পড়িয়া এতাবৎকাল বিস্তর কর্ম্মভোগই করা যাইতেছে।

'পাক্ষিকে'ই বোধ হয়, আমার প্রবন্ধ লেখার প্রথম 'হাতে-খড়ি'। ইহার পূর্ব্বে আর কখনও বড় কিছু লিখিয়াছিলাম বলিয়া মনে হয় না। তবে মধ্যে মধ্যে ইংরেজী কাগজে কিছু কিছু মক্স করিতাম বটে। বাঙ্গালা প্রবন্ধ উহার পূর্ব্বে আর কখনও লিখি নাই। তখন আমার কেমন একটা সংস্কার ছিল যে, বাঙ্গালীর ছেলে ইচ্ছা করিলেই বাঙ্গালা গদ্য লিখিতে পারে। কিন্তু সে সংস্কারটা এখন ক্রমে ক্ষয় হইয়া যাইতেছে। দেখিতেছি, ব্যাপারটা যত সোজা মনে করিতাম, তত সোজা নয়ই ত, বরং বিলক্ষণ বাঁকা। অনেক বুদ্ধিমান ও বিদ্যাবান ব্যক্তিও সাধারণ গোছের বিশ লাইন বাঙ্গালা গদ্য লিখিতে গলদ্-ঘর্ম্মাক্ত হন। গোছাইয়া হয় ত লিখিয়া উঠিতেই পারেন না। একটা বিষয় বুঝাইয়া লেখা বস্তুতই কঠিন। কিন্তু লেখা আরম্ভ করার পূর্ব্বে আমি এ কাঠিন্য অনুভব করি নাই। কাজ না পড়িলে তাহার কাঠিন্য অনুভব করা যায় না। যাহা হউক, গদ্য লেখা সহজ ভাবিয়া বাল্যকাল হইতে বুড়া বয়স পর্য্যন্ত আমি তাহার গাত্র স্পর্শ করি নাই। বলিতাম, 'গদ্য লেখা অভ্যাস করিতে হইলে ইংরেজী লেখাই উচিত; বাঙ্গালাতে পদ্যই বরং প্র্যাক্‌টিসের বিষয়। বাঙ্গালা গদ্য গাধাতেও লিখিতে পারে।'

ফলতঃ, বাঙ্গালা গদ্য তখন অনেক গাধায়ও লিখিতেছিল; এখনও লিখে। কিন্তু তাই বলিয়া গদ্য গর্দ্দভ জাতিরই লাখরাজ জমী নহে। তাহাতে ভূম্যধিকারীদিগেরও স্বাভাবিক ও চিরস্থায়ী মালেকান স্বত্ব আছে। আমার এ জ্ঞানটা তখন ছিল না। কাজেই গদ্য লেখার অনেকটা অংশকে গাধা-খাটুনী মনে করিয়া তাহার নিকটে যাইতাম না। কিন্তু পূর্ব্বাবধি আমি পদ্য ঠাকুরাণীর কিঞ্চিৎ প্রণয়ে পড়িয়াছিলাম। কেরাণীগিরির কার্য্য হইতে কিছুমাত্র বিশ্রাম পাইলেই কাগজ পেন্সিলে কবিতা দেবীর মূর্ত্তি আঁকিতে বসিতাম। সে যে কি অপরূপ মূর্ত্তি হইত, কেহ কখনও দেখে নাই। এ যাত্রা তাঁরা অসূর্য্যম্পশ্যাই থাকিয়া গেলেন। আলয়ে, আপিসে, এমন কি—হস্তীর ও অশ্বের পৃষ্ঠেও পদ্য দেবীর পেন্সিল-পূজা চলিত। পূজাটা চালাইয়াছিলামও বহুকাল। কিন্তু এই 'অকৃতী অধম' জনের অদৃষ্টক্রমে কবিতা কাষ্ঠকঠিনা ও কঞ্জুস-কৃপণা হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। সাম্রাজ্ঞীর সাত-সমুদ্র-পূর্ণ সৌন্দর্য্যরস এ অভাগার নিঃশ্বাসে শুকাইয়া গিয়াছিল। অত কালের পূজায়, পুরশ্চরণে ও পেনসিল-প্র্যাক্‌টিসে তাঁর কণিকামাত্র প্রসাদ আমার পাতে পড়ে নাই। তবে আমরণ অর্থকৃচ্ছ্র যদি কবিতা রাণীর রাজপ্রসাদের একটা অবিচ্ছিন্ন অংশ হয়,

তবে সাদরে সে দ্রব্যটার পূরা ‘প্রাপ্তি-স্বীকার’ই করিতেছি। কিন্তু, তা’ ছাড়া এক কড়া কাণা কড়িও কাব্য-রাজ্য হইতে এ পক্ষের নিকট পৌঁছে নাই।

‘পাক্ষিকে’ই আমি আমার প্রবন্ধ লেখার প্রথম অধ্যায় আরম্ভ করি, এবং সর্ব্বপ্রথম লেখক বলিয়া জাহির হই। কেবল লেখক নয়; লেখক এবং সম্পাদক—এক দিনে দুইই যুগপৎ! পেটে কিছু দৈব বিদ্যা ছিল কি না, জানি না; কিন্তু সাহিত্যের পাঠশালায় দাগা না বুলাইয়াই আমি উক্ত দুই দুরন্ত পদ একত্র দখল করিয়াছিলাম।

‘হাতে খড়ি’র সঙ্গে সঙ্গেই সম্পাদক; সেই জন্যই বোধ হয়, আমার হাতের খড়ির আঁচড়কে সকল লোক বলিয়াছিলেন—‘পাকা অক্ষর’। ‘পাক্ষিকে’র অবতরণিকা আমার হাতে খড়ির প্রথম প্রবন্ধ। প্রবন্ধটা এক পণ্ডিতকে দেখাইয়া লইবেন কি না, কোনও বন্ধু জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। আমি তাহাতে ভয়ানক চটিয়াছিলাম। বলিয়াছিলাম, ‘আমার প্রবন্ধ যদি পাড়ায় পাড়ায় দেখাইয়া বেড়ান হয়, তা’ হলে, আমি একেবারেই লিখিব না।’ বস্তুতঃ আমি আমার লেখা ছাপা হওয়ার পূর্ব্বে, কখনও কাহাকেও স্বইচ্ছায় দেখিতে দিই নাই; অতি নিকট বন্ধুকেও কখনও পড়িয়া শুনাই নাই। আমার এ স্বভাবটা ভাল কি মন্দ, জানি না; কিন্তু, সম্পূর্ণরূপে সংশোধনের অতীত। আরম্ভ হইতেই এ বিষয়ে আমার কেমন একটা আত্ম-নির্ভরতা জন্মিয়া গিয়াছে; তাহা উলঙ্ঘন করিতে পারি না। সমালোচনার ভয় হয় না; ভয় হয় তথা-কথিত সংশোধনের। নিজের লেখায় অন্যের ‘নোক্তা’ দেখিতে আমি নিতান্তই নারাজ।

বুড়া বয়সে আরম্ভ; এই জন্য বোধ হয় হাতে খড়ির অক্ষরও ‘উতরাইয়া’ গিয়াছিল। নেহাৎ কাঁচা করকোচা রকম লিখি নাই। প্রবন্ধ লেখার ছন্দ বন্ধ, ঠমক, ভঙ্গী, রঙ্গ, পরন্ বহুকাল হইতে মনে মনে প্রস্তুত ও পরিপক্ক হইয়াছিল; কাজেই ‘পাততাড়ি’তে বসিয়াই পাকা লেখা লিখিয়া ফেলিয়াছিলাম। তা ছাড়া, এই ‘পাকা’র জন্য পরিশ্রমও হইত চূড়ান্ত। এক এক সময় এক একটা ‘সেন্‌টেন্স’ লিখিতে হয় ত আধ আধ ঘণ্টা যাইত। শ্লো—শ্লো—শ্লো—শ্লোর শিরোমণি! নিশীথ-শ্রমের দ্বারা এ ক্ষতির পূরণ করিতাম। তা এত পরিশ্রমেও যদি কিছু ‘পাকা’ না হয়, তা হ’লে পাততাড়ি পোড়াইয়া ফেলাই ত কর্ত্তব্য। ফলতঃ ক্ষিপ্রহস্তে ‘প্রতিভা’ প্রকাশ করিতে না যাইয়া লেখার জন্য একটু পরিশ্রম করা বিধেয়। ভাবিয়া চিন্তিয়া লিখিলে এক-রূপ-

না-এক-রূপ দাঁড়াইয়াই যায়। শ্রম ও যত্নের ফল নিশ্চয়ই আছে। এ কথাটা যুবক লেখক বন্ধুদিগকে আমি প্রায়ই বলিয়া থাকি। পুনশ্চ, আমার মত মূর্খ বা অল্প-স্বল্প-শিক্ষিত লোকদের পক্ষে একটু পাকা বয়সে লেখা আরম্ভ করা ভাল। তাঁদের পক্ষে কাঁচা বয়সে এ কাজ কিছু নয়। একটু বয়সে আরম্ভ করিলে বড় বেশী ঠকিতে হয় না। পড়ার মাত্রাটাও প্রবল রকম বাড়াইতে হয়। লেখকের পক্ষে ঐ ইদানীন্তন উপেক্ষিত দ্রব্যটা যে কত প্রয়োজনীয়, তা বলা যায় না। অনেক লেখক এক আধটু ফষ্টিনষ্টি ছাড়া আর কিছুই পড়েন না, দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য হই। তাঁরা বোধ হয় তাঁদের 'দৈবশক্তি'র উপরেই নির্ভর করেন। কিছু দিন হইল, কলিকাতার কোনও সংবাদপত্র-সম্পাদকের দৈবশক্তিতে অর্থশাস্ত্রসম্বন্ধীয় মৌলিক প্রবন্ধ অনর্গল আসিয়া গিয়াছিল। উক্ত সম্পাদকের মুখে শুনিয়া আমি তাহাতে সায় দিয়াছিলাম। তবুও আমি তাঁহাকে 'ইকনমিক সায়ান্স'টা একটু পড়িতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তিনি তাহাতে সম্মত হন নাই! কিন্তু এরূপ দৈবশক্তি সকলের পাওয়া কিছু সম্ভব নয়; পাওয়া উচিতও নয়। তাই বলিতেছিলাম, একটু পড়া শুনা করা ভাল।

'পাক্ষিক সমালোচক'কে আমি কিছু উঁচু সুরে ধরিয়াছিলাম। খুবই যে উঁচু, তা নয়; তবে ঈষৎ উঁচু বটে। তাই কেহ কেহ বলিতেন,—'ইনি অভিধান সামনে খুলিয়া লিখেন; অত কটমট দাঁতে কাটা যায় না।' আমি তখন সম্পাদকীয় কার্য্যে ব্রতী; সুতরাং সকলেরই অলিখিত শাস্ত্রানুসারে সকলেরই মন যোগাইতে বাধ্য। অগত্যা এক একটা লেখা খুব হাল্কা হাতে লিখিতাম। অগত্যা এখনও অনেক সময়ে লিখিয়া থাকি। কোনও কোনও লোকের মধ্যে, শুনিয়াছি, আমার হালকা লেখারই নাকি 'হাত-যশ' বেশী। তা, সাধারণতঃ হালকা লেখাটা লাগে ভাল বটে, খঞ্জন খঞ্জনীদের মধ্যে খাপেও ভাল। এগার ঘণ্টা কলম চালাইয়া আসিয়া কে তোমার কঠিন কঠিন শব্দ ও লম্বা লম্বা সেন্‌টেন্স্ চর্ব্বণ করার ক্লেশ স্বীকার করে? তোমার চিন্তাশীলতার লম্বাই-চওড়াই রাখিয়া, যাহা পান তামাকে চলে, পার ত তাই দাও; নহিলে চুলাও যাও। তুমি অচল; চর্ব্বণের অযোগ্য। অনেকে আবার চর্ব্ব্যমাত্রই চাহেন না; চাহেন কেবল চোষ্য ও পেয়। অম্লমধুর আনারসের চাটনী; অথবা সরল তরল সুগন্ধি শরবৎ। যা' চুমুকে চলে, এবং চক্ষুপুটে চোষা যায়, (যদি কেহ কখনও কিছু চায়) কেবল তাহাই

চায়। কাযেই হতভাগ্য লেখককে, কেবল চোষ্য পেয়ের চলনসই করিয়া হাল্কা হাতে লিখিয়া চুটকীর চটুলতা দেখাইতে হয়।

সংগীতের ন্যায় সাহিত্যের সুরও যে গুরু ও লঘু হয়; হওয়া উচিত;—এটা ইদানীং অনেকেই অনুধাবন করেন না। শ্মশানসৎকারেও আড়খেমটার আকাঙ্ক্ষা করেন। দেব-দেবীর উদ্বোধন আর্চ্চনাতেও ইয়ারকী চাই। সরস্বতী বন্দনাতে লেখা হয়,—

'থেকে থেকে কেন গো মা, বীণায় মার তান!'

অথবা এইরূপ কিছু। ফলতঃ বাঙ্গালীদের মধ্যে এখন আর প্রায়ই গভীর সুরের গীত শুনা যায় না। চুটকী অঙ্গেরই আদর বেশী। শুনিতে পাই, গানওয়ালারা নিজেও নাকি ইহাতে নারাজ। থিয়েটারের ম্যানেজারেরা উচ্চতর অভিনয়ের আয়োজন করিয়া, শুনিয়াছি, পদে পদে ঠকিয়াছেন। তাহাতে এক পয়সা আসে নাই; পক্ষান্তরে, বৃহৎ আয়োজনে বহুব্যয় করিয়া বিপদগ্রস্ত হইয়াছেন। সুতরাং তাঁরা প্রগাঢ়তার পথে যাইতে ভয় করেন। পৈশাচিক নৃত্যগীতে পয়সা না কুড়াইয়া পারেন না। সংকীর্ত্তনের গানও, এই কারণে, বোধ হয়, খেমটায় 'খেলো' করিয়া বাঁধিতে বাধ্য হয়। সংগীতের ন্যায় সাহিত্যের সুরও এখন সাধারণতঃ হালকা, পাতলা, খেলো, খেমটাময়। কারণ, তাহাই খাপন্ত। কিন্তু হালকা পাতলারও একটা পরিমাণ থাকা উচিত। হালকা হইলেই যে তাহা হেয় হয়, হেয় হইতে হইবে, এমন কিছু কথা নাই। ওস্তাদী হাতের হালকা লেখা হীন ও হেয় হয় না। তেমনতর হালকা লেখা সকল সময়ে স্বয়ং সেই লেখকের পক্ষেও বড় সোজা নয়। বরং সাধুভাষায় লেখা ঢের সহজ; কিন্তু হালকা লিখিতে বিলক্ষণ হয়রাণ হইতে হয়। গোল্ডস্মিথকে তাঁহার প্রাঞ্জল, লোকপ্রিয় ও অতিপ্রসিদ্ধ কবিতা 'পরিত্যক্ত পল্লী'র এক একটী পংক্তি পাঁচ পাঁচ দিন ধরিয়া সংশোধন ও পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল শুনিয়া আমি আশ্চর্য্য হই না। যাহা সরল, সরস ও সহজ, তাহা যে খুব সহজে হয়, এমন মনে করা ভুল। তরল, শীতল, সুমিষ্ট, সুগন্ধি শরবৎ এক চুমুকে পান করা যারপরনাই সহজ বটে; কিন্তু, তাই বলিয়া সে শরবৎটী প্রস্তুত করা নেহাত সোজা নয়। তাহাতে সময়, শ্রম ও শিল্প-নৈপুণ্য, এ সবই চাই। মিছরী, মিষ্ট হইলেও, গলিতে দেরী লাগে। তাহা সবিশেষ সাবধানে ছাঁকিয়া শাফ করিতে হয়। বরফ টুকু বিলক্ষণ বুঝিয়াই দেওয়া চাই। কেওড়া বা গুলাব মাত্রামত না পড়িলে সব মাটী। কাযেই দেখ, সহজ শরবতে

কত শ্রম, সময় ও সাবধানতা দরকার। তবে ঝোলা গুড় গুলিতে বড় দেরী হয় না বটে। কিন্তু সে দ্রব্যটী সচরাচর ইতরেই আহার করে; ভদ্রে প্রায় কদাচ স্পর্শ করেন না।

মনুষ্যমাত্রেরই বক্তব্য বিষয় বলিবার স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে এক একটী স্বাভাবিক ছন্দ আছে। রচনা-প্রণালীতে, অনুকরণের পরিবর্ত্তে, সেই স্ব স্ব স্বাভাবিক ছন্দের অনুশীলন করা ভাল। তাহাতে করিয়া, রচনার নিজস্ব একটী প্রণালী প্রস্তুত হইতে পারে। এ সম্বন্ধে যথাসম্ভব স্বতন্ত্রতা সর্ব্বদা প্রার্থনীয় বলিয়া আমি বিবেচনা করি। তবে বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা ও মনের অবস্থাবিশেষে লেখার ছন্দের ও সুরের তারতম্য, আকুঞ্চন, বা প্রসারণ, লঘুত্ব, বা গুরুত্ব হয়;—হওয়াই উচিত; ইহা চিন্তাশীল লেখকমাত্রেরই অভিজ্ঞতা।

এখন একটু বলিতে ইচ্ছা হইতেছে, 'পাক্ষিক'কে আমরা কি প্রকৃতির পত্র করিয়াছিলাম। সে এক পাঁচ মিশালি রকমের প্রকৃতি। প্রথমতঃ, প্রবন্ধ। সচরাচর সাময়িক পত্রে যে ছাঁচের প্রবন্ধ বাহির হইয়া থাকে, সেই রকমেরই। সকল বিষয়েরই; সন্দর্ভ ও সমালোচনা। পরন্তু সংবাদপত্রের একটা অঙ্গ উহাতে সংযুক্ত করা হইয়াছিল। সেটা রাজনীতিক আলোচনা। মাসের প্রথম পক্ষে 'মাস-সমালোচনা' বলিয়া একটা লম্বা চওড়া প্রবন্ধ থাকিত। তাহাতে সাময়িক রাজনীতিক ব্যাপারের বিবিধ কথা থাকিত। পুনশ্চ, দ্বিতীয় পক্ষে 'রাজনৈতিক প্রসঙ্গ' শিরস্ক কতকগুলি 'প্যারা'র রাজনীতির কথা লিখিত হইত। ইংরেজী পত্রের অনুকরণে (প্রধানতঃ তাৎকালিক "মাকমিলানস্ ম্যাগাজিন ও ইণ্ডিয়ান রিবিউ) আমরা 'মাস-সমালোচনা' প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলাম। তবে তাহাতে একটু অভিনবত্ব বা আনাড়িত্ব ছিল এই যে, 'মাস-সমালোচনা'র প্রত্যেক প্রবন্ধের মাথায় নিম্নলিখিত একটা করিয়া নোট থাকিত;—"

"মাস-সমালোচকে"র মতামতের জন্য এই পত্রের সম্পাদক-সমিতি দায়ী নহেন। "মাস-সমালোচনা" ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি কর্ত্তৃক লিখিত হইবে; অতএব একই বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা।'

'পক্ষিক সমালোচকে'র স্বত্বাধিকারীদিগের মধ্যে যিনি সর্ব্বপ্রধান ছিলেন, রাজনীতিক বিষয়ে তখন তাঁহার সবিশেষ ঝোঁক ছিল, এবং তিনি নিজে ঐ সকল কথাই লিখিতে অভিলাষী হইলেন। এই কারণেই ঐ পত্রে রাজনীতির অতটা

লম্বা স্থান মিলিয়াছিল। নহিলে আমার তখন ততটা রাজনীতিক মেজাজ হয় নাই। সেটা বরং এই বৃদ্ধ বয়সে কিছু কিছু হইয়াছে। পরন্তু ইদানীং সাহিত্যানুরাগী ও সাহিত্য-ব্রতে ব্রতী যত যুবক বন্ধু দেখিতেছি, তাঁহাদের প্রায় সকলেই ত একরূপ রাজনীতিক আলোচনা ও আন্দোলনে উদাসীন।

অপরাধে।

তব বাহ্য সম্পদে কোন্ অপরাধে
নয়ন রেখেছ ভরি!
ওহে! খোল খোল দ্বার,
হেরি একবার স্বরূপ তোমার হরি!

ওহে! এ আঁখে কি ফল, যাহে নিরমল
না ফুটিল তব ভাতি!
সে ডুবুক আঁধারে, না চাহি তাহারে
—লয়ে তার তারা-পাঁতি!

মোর ধন মান জ্ঞান ত্রিতল হইতে
—নামায়ে এনেছ রথে।
যদি কৃপা করি' মোর সব নিয়ে, হরি!
বাহির করেছ পথে;—

তবে ধর ধর হাত, ওহে জগন্নাথ!
মোরে অন্ধ করি' দিয়ে।
—তুমি থাক সাথে সাথে, ফিরি পথে পথে,
—দ্বারে দ্বারে তোমা নিয়ে।

শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

গোটেয়িক্ সেতু।

মেমিয়ো ব্রহ্মদেশীয় লাট সাহেবের গ্রীষ্মযাপনের শৈলাবাস। ৩৬০০ ফিট উচ্চ শাণ উপত্যকার মধ্যে ক্ষুদ্র সহরটী সুদৃশ্য ও স্বাস্থ্যকর। মেমিয়ো যাইতে হইলে রেঙ্গুনে ট্রেণে চড়িয়া মান্দালয়ের তিন মাইল দক্ষিণে মোহায়ং জংসনে ট্রেণ বদল করিতে হয়। রেঙ্গুন হইতে মেমিয়োর দুরত্ব ৪২৩ মাইল। মেমিয়ো হইতে গোটেয়িক ৪০ মাইল। উপস্থিত এই চল্লিশ মাইলই ভ্রমণের স্থান।

রেঙ্গুন হইতে গোটেয়িক পর্য্যন্ত তিন মাসের রিটার্ণ টিকিট লইলে ভাড়ার সুবিধা হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়া যথাক্রমে ৬০৷৷০ ও ৩৭৲ টাকা। এ দেশে মধ্যম শ্রেণীর গাড়ী নাই। তৃতীয় শ্রেণীর শুধু যাইবার ভাড়া ৮৷৷০ টাকা। এই টিকিটে সাগাইং, অমরপুরা, আভা, মান্দালয়, মেমিয়ো ও গোটেয়িক্ প্রভৃতি অনেকগুলি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ পরম রমণীয় স্থানে বেড়ান যাইতে পারে। ফিরিবার কালে পেগু সহরেও নামা উচিত। প্রাচীনকালে মেমিয়ো ও গোটেয়িক ব্যতীত সব স্থানগুলিই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রাজধানী ছিল। তন্মধ্যে পেগু, আভা ও অমরপুরার চিহ্ন লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে। তবে এখনও পর্য্যন্ত দেখিবার জিনিস সে সকল স্থানে অনেক আছে।

আহারাদি করিয়া বেলা ১১টার সময় মেমিয়ো সহর হইতে ষ্টেশনে গিয়া তৃতীয় শ্রেণীর একখানি টিকিট কিনিয়া যথাকালে গাড়ীতে উঠিলাম। মেমিয়োতে গাড়ী প্রায় এক ঘণ্টা অপেক্ষা করে। গাড়ী ছাড়ে ছাড়ে, এমন সময় এক জন বাঙ্গালী যুবক আমাদের কামরায় উঠিয়া পড়িলেন, এবং ভিড় ঠেলিয়া আমারই সম্মুখে একটু স্থান করিয়া বসিলেন। শুনিলাম, তিনি এই ল্যাসিও বিভাগের এক জন কর্ম্মচারী; ল্যাসিও পর্য্যন্ত যাইবেন।

ট্রেণ ছাড়িলে. উদ্যানসংলগ্ন কয়েকখানি সাহেবদের 'বাংলো' অতিক্রম করিয়া আমরা প্রান্তরের মধ্যে চলিলাম। দুইধারে ধান, তামাক ও কার্পাস তুলার ক্ষেত। গিরিমাটীর মত ক্ষেতে তখন ধান কাটা হইয়াছে। সরু খালের ধারে একটা উচ্চ মাচা। ধান কাটিবার কালে পশু পক্ষী তাড়াইবার জন্যই তাহার সৃষ্টি হইয়াছিল। রেলপথের নিকটে এক জন কৃষক লাঙ্গল

একটি মহিষ জোতা। আলের উপর এক জন রমণী বসিয়া কৃষকের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে।

উন্মুক্ত প্রান্তরে সোঁ-সোঁ শব্দে বাষ্পীয় শকট কৃষিক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া চিত্রের মত সুন্দর একখানি গণ্ডগ্রামে প্রবেশ করিল। বেড়ায় ঘেরা পল্লীর মধ্যে অশ্বত্থ, বট, আম, তেঁতুল, কলা, পেয়ারা, পেঁপে প্রভৃতি নানাপ্রকার ফলের গাছ, বাঁশের ঝাড়, মাচার মত গোলপাতার কুঁড়ে ঘর, কাঠের চঙ্ বা বৌদ্ধ মন্দির, ভিক্ষুকদের বিহার ও বাঁকা চোরা মেটে রাস্তা।

গ্রামের সীমার পরেই একটি শাখানদীর উপর সেতু। দক্ষিণে উচ্চ তীর-ভূমি হইতে বহুনিম্নে সেই কাকচক্ষুর মত নির্ম্মল জলে নামিবার জন্য একটি কাঠের সিঁড়ি। সিঁড়ির নীচে একখণ্ড বৃহৎ তক্তা, জেটীর মত জলের উপর ভাসমান। কলসীকক্ষে কত যুবতী জেটীর উপর দাঁড়াইয়া ট্রেণের দিকে চাহিয়া আছে। দুই জন বালক জলে সাঁতার কাটিতেছে। দূরে পাহাড়।

আমারই ডান দিকে এক দল শাণ বসিয়াছিলেন। তাঁহাদেরই সাহায্যে ভিড়ের মধ্যে 'বাঙ্গালী বাবু'র বসিবার স্থান হইয়াছিল। সেই পরিবারে এক বৃদ্ধ, এক বর্ষীয়সী রমণী, এক যুবতী ও দুটি বালক। বেঞ্চীর তলা হইতে কয়েকটি চীনামাটীর ও কাঠের পাত্রে ভাত, কয়েক প্রকার কাঁচা শাক সবজী, পায়রা মটর ভিজা, পেঁয়াজ, লবণ, মাছ ও নাপ্পি বাহির করিয়া বেঞ্চির উপর রাখিয়া, তাঁহারা ভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন। বড়ই মুস্কিলে পড়া গেল। আপত্তি করিবার যো নাই। এ দিকে নাপ্পির গন্ধে অস্থির! নাকে কাপড়ও দিতে পারি না। জানালার ধারে মুখ রাখিয়া তাঁহাদের খাওয়া দেখিতে লাগিলাম। ভোজনশেষে কাঠের হাঁড়ির জলে মুখ ধুইয়া তাঁহারা পান চুরুটের পালা ধরিলেন!

শাণ ও বর্ম্মী যাত্রীই অধিক। রঙ্গীন পোষাকপরা যাত্রীদের মধ্যে কেহ গাড়ীর ঝাঁকুনির সঙ্গে সঙ্গে নিজ অঙ্গ দোলাইয়া চক্ষু বুজিয়া ঢুলিতেছে; কেহ অন্যমনে চুরুট খাইতেছে; কেহ বা নিস্তব্ধ। বন্ধু তাঁহাদের সহিত গল্প করিতে-ছিলেন। তাঁহার মুখে শুনিলাম, এই যাত্রী পরিবারের গন্তব্যস্থান 'সিপা'। বৃদ্ধের একমাত্র পুত্র সেখানে শ্বশুরালয়ে থাকে। আজ সেখানে পুত্রের শ্যালি-কার কর্ণবেধ উপলক্ষে তাঁহাদের নিমন্ত্রণ। দুই মেয়ে ও বড় মেয়ের ছেলে দুইটিকে লইয়া বিপত্নীক বৃদ্ধ সেখানে দুই দিন থাকিবেন। ছোট মেয়ের বয়স হইয়াছে। কিন্তু মনোমত পাত্রাভাবে এখনও তাহার বিবাহ হয় নাই। প্রথম

স্বামীর সহিত বনিবনাও হইত না বলিয়া দশ বৎসর পূর্ব্বে বড় মেয়ে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করিয়াছে। পুত্রেরা তাঁহার দ্বিতীয় স্বামীর ঔরসজাত। জামাতাই তাঁহাদের অবর্ত্তমানে সংসার দেখিবে।

গভীর অরণ্য ভেদ করিয়া ট্রেণ 'নান্‌কিয়ো'য় পঁহুছিল। খানিকটা জঙ্গল কাটিয়া এই একহারা ষ্টেশন প্রস্তুত করিতে হইয়াছে। ষ্টেশনে 'প্লাটফরম্‌' নাই। কাঠের ক্ষুদ্র আফিস-ঘরের দুই পার্শ্বে কেরোসিন-ল্যাম্পের আলোক-স্তম্ভ। এই বিভাগে রাত্রিকালে ট্রেণ যাতায়াত করে না। প্লাটফরমের ধারে ধারে অগণ্য ফুলে সমাচ্ছন্ন লাল করবী ও কল্‌কে ফুলের গাছ। ষ্টেশন হইতে একটি কাঁচা রাস্তা কতকগুলি চালাঘরের পার্শ্ব দিয়া গ্রামের দিকে গিয়াছে। যাত্রীর সংখ্যা দশ পনর জন। কলকে গাছের তলে একটি টেবিলের উপর মৃন্ময় ও দারু-গঠিত পাত্রে ভাত, কপি, আলু ও মূলা সিদ্ধ, মাছ ভাজা ও নাপ্পি প্রভৃতি সজ্জিত। দোকানী টেবিলের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া কলা পাতার ঠোঙ্গায় খাদ্য বিক্রয় করিতেছে। পেঁপে, কলা, শশা, ডালিম, মরিয়ম্‌ ফল, পাঁউরুটী, চুরুট, দেশলাই, কাচের পুতুল, আরশী প্রভৃতি লইয়া শাণ রমণী ফেরী করিয়া বেড়াইতেছে। 'পাণি-পাঁড়ে'র প্রয়োজন নাই। ষ্টেশনের এক ধারে একটি ক্ষুদ্র চালা-ঘরের মধ্যে এক জালা জল ও দুইটা ভাঁড় রহিয়াছে। যাত্রীরা সেই জলসত্র হইতে আবশ্যকমত জল গ্রহণ করিতেছে। রেশমী লুঙ্গী ও বিলাতী কোটবুটধারী বর্ম্মী ষ্টেশনমাষ্টার হিন্দুস্থানী ভৃত্যকে ঘণ্টা বাজাইবার আদেশ করিলেন। বংশীধ্বনি করিয়া ট্রেন 'নান্‌কিয়ো' পরিত্যাগ করিল।

গহন অরণ্য ভেদ করিয়া চলিয়াছি। দুই ধারে এক শত ফিটের অপেক্ষাও উচ্চ বৃক্ষগুলি শাখা প্রসারিত করিয়া রেলপথকে খিলানের মত আচ্ছাদিত করিয়াছে। সূর্য্য-গ্রহণকালে যেরূপ নিষ্প্রভ আলোক দেখা যায়, এই স্থানের আলোক সেইরূপ ক্ষীণ। সেই তরল সবুজ আলোকে বিবিধ বর্ণের পত্রপুষ্পে শোভিত মহারণ্য চিত্রবৎ মনোহারী। যেন স্বপ্নের রাজ্য। উপরে গর্জ্জন, অর্জ্জুন, পাইন, শিমুল প্রভৃতি গগনভেদী মহাদ্রুমরাজি ও তাহার নিম্নে হরীতকী, কদম্ব, খদিরাদি মহাপাদপগুলি অরুণকিরণপথ রুদ্ধ করিয়া দণ্ডায়মান। কত লতিকা, কত অর্কিড ও কত নিবিড় বংশকুঞ্জ ও তাহার পার্শ্বে নাগেশ্বরী চাঁপার সারি। অন্তরালে লজ্জাবতী লতারা অসূর্য্যম্পশ্যা কুলললনার মত লজ্জায় জড়-সড়। তাহাদের

প্রকৃতই ব্রহ্মদেশের অরণ্য অদ্ভুত। Dr. sehimper তাঁহার অমূল্য গ্রন্থ 'Plant Geograph'তে বলিয়াছেন,—এসিয়াখণ্ডের একমাত্র ব্রহ্মদেশে ও যবদ্বীপেই, আমেরিকা ও আফ্রিকার অরণ্যের মত এই Torpical evergreen forest দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া দেখিয়াছি, অধিকাংশ অরণ্য শাল, দেবদারু প্রভৃতি একজাতীয় বৃক্ষে ও লতায় পরিপূর্ণ। শীতকালে তাহাদের সমস্ত পত্রই ঝরিয়া যায়; যথাকালে আবার নব পল্লব উদ্গত হয়। কিন্তু ব্রহ্মদেশের অরণ্যে একই সময়ে এক সঙ্গে ছোট বড় নানা জাতীয় বৃক্ষ লতার সম্মিলন—নানাবিধ বর্ণের সমাবেশ, অথচ তাহাদের অনন্ত যৌবন! ব্রহ্মদেশের নানা বিভাগের গহন কাননে পদব্রজে প্রবেশ করিয়া বনবাসীদের অবস্থা যাহা দেখিয়াছি, ভবিষ্যতে স্বতন্ত্র ভাবে তাহার আলোচনা করিব।

গম্ গম্ শব্দে পাহাড় কাঁপাইতে কাঁপাইতে এঞ্জিন দুইখানি ধীরে ধীরে একটি প্রকাণ্ড গিরিসঙ্কটে প্রবেশ করিল। ডিনামাইট দিয়া পর্ব্বত-বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া পথ প্রস্তুত হইয়াছে। উভয় পার্শ্বের প্রস্তরস্তূপ এতই উচ্চ যে, জানালার বাহিরে মুখ রাখিয়া উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিলেও, শিখরভাগ দেখা যায় না। লাভের মধ্যে কয়লার ধূমে নিঃশ্বাস রুদ্ধ হইবার উপক্রম হয়। ট্রেণ গিরিসঙ্কট হইতে নিম্নমুখে বাহির হইয়া দ্রুতবেগে একটি নির্ঝরিণী অতিক্রম করিল।

এই ভাবে, কখনও উচ্চ গিরিশিখরের অন্ধকারময় সুড়ঙ্গপথে, কখনও তাহার গাত্রবলম্বনে গোলাকারে ঘুরিতে ঘুরিতে, কখনও উর্দ্ধমুখে হাঁফাইতে হাঁফাইতে, কখনও নিম্নমুখে তীরবেগে—খগরাজভীত অজগরের মত—আমাদের ট্রেণ অরণ্যপথে উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া চলিল।

বাম দিকে একটি শ্যামলপল্লবমণ্ডিত শৈলমালা। মধ্যে নিবিড় বনে সমাচ্ছন্ন সুগভীর খাদ। সহযাত্রী বলিলেন, 'ঐ পর্ব্বতটীর সহিত আমাদের এই পর্ব্বতশৃঙ্গটীকে সংযুক্ত করিবার নিমিত্তই "গোয়েটিক সেতু" নির্ম্মিত হইয়াছে।' ধীরে ধীরে দুই তিনটি সুড়ঙ্গ অতিক্রম করিলাম, এবং ঘুরিয়া ফিরিয়া পর্ব্বতপ্রান্তে যেখানে উপনীত হইলাম, সেখান হইতে বাম কোণের নিম্নভাগে পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য্য—সেই বিরাট সেতু নয়নগোচর হইল!

প্রথম দর্শনেই নয়ন মন চরিতার্থ হইল। মনে হইল, যেন কৃষ্ণবর্ণ মেঘের

সুবিশাল বনরাজি; আর উভয়ের স্কন্ধসংলগ্ন এক হিমশুভ্র সেতু! উপরের সুনীল অনন্ত আকাশ নিম্নের সেই সুনীল অনন্ত অরণ্যসমুদ্রের সহিত মিশিয়াছে। বায়স্কোপের চিত্রের ন্যায় চকিতে এ স্বর্গীয় দৃশ্য অন্তর্হিত হইল। ট্রেণখানি দক্ষিণ দিকে ফিরিল। তাহার পর নিম্নপথে আরও দুইটি বৃহৎ সুড়ঙ্গ ভেদ করিয়া আধঘণ্টা পরে আমরা গোটেয়িক ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম।

আমার সঙ্গে আরও তিন জন মান্দ্রাজী ভদ্রলোক ট্রেণ হইতে নামিয়াছিলেন। শুনিলাম, তাঁহারা দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী; গোটেয়িক দেখিতে মেমিয়ো হইতে আসিয়াছেন। সুদে টাকা ধার দেওয়াই তাঁহাদের ব্যবসায়। মান্দ্রাজীরা ষ্টেশন-মাষ্টারকে rest-house দেখাইয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি তাঁহা-দিগকে টিকিট-ঘরে রাত্রিযাপন করিতে বলিলেন। সেই ঘরের পার্শ্বের ঘরেই আমার থাকিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

আশ্রয় জুটিল। এক জন প্রদর্শকের সহিত গুহাদর্শন করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে ষ্টেশনে ফিরিতে হইবে। অনুসন্ধানের প্রয়োজন হইল না। দুই জন মান্দ্রাজী বালক আসিয়া সোৎসাহে প্রশ্ন করিল, 'Babu, you want guide?' মাষ্টার মহাশয়কে পারিশ্রমিকের পরিমাণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, 'দুই টাকা।' এক টাকা পর্য্যন্ত উঠিলাম। তাহারা সম্মত হইল না। মনে করিলাম, আমার সহযাত্রীরা যে প্রদর্শক লইবেন, তাহাকে কিছু দিয়া, অথবা দূর হইতে তাঁহাদের অনুসরণ করিয়া, কাজ শেষ করিব। Field-glass লইয়া সেতুর দিকে অগ্রসর হইলাম।

সেতুর দুই পার্শ্বে দুইখানি বিজ্ঞাপনী। দক্ষিণ দিকের বিজ্ঞাপনে—'speed not to exceed three miles per hour', এবং বাম দিকের কাষ্ঠফলকে 'way to cave' লেখা আছে।

কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বুঝিলাম, সে দিন তাঁহাদের সাহচর্য্যলাভের সম্ভাবনা নাই। অগত্যা দুর্গানাম জপিতে জপিতে সেই নিম্ন ঢালু পথে অগ্রসর হইলাম। দুই ধারেই নিবিড় জঙ্গল। মধ্যে প্রায় চারি হস্ত প্রশস্ত একটি সঙ্কীর্ণ পথ। একটি গাছের ডাল সংগ্রহ করিয়া ক্ষিপ্রপদে সেই নীরব রাজ্যে প্রবেশ করিলাম। খর্-খর্ করিয়া একটা শব্দ হইল। আমি শিহরিয়া উঠিলাম। দুইটি বন্যকুক্কুট বনমধ্যে চকিতে অদৃশ্য হইল। ভাবিলাম, ফিরিয়া যাই। এক জন প্রদর্শক সঙ্গে লইয়া আসি। সকলেই যখন বনপথে একাকী যাইতে বারবার নিষেধ করিয়াছেন, তখন একাকী যাওয়া উচিত নহে। আবার মনে হইল,

একাকী বন-ভ্রমণ কখনও ঘটে নাই। যাওয়াই স্থির হইল। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, নিকটে মুক্ত ক্ষেত্রে শাণিতকুঠারধারী এক জন বলিষ্ঠ যুবা গাছ কাটিতেছে। জনশূন্য স্থানে এক জন মানুষের মুখ দেখিয়া আনন্দ হওয়া দূরে থাকুক, ভয় হইল। কাঠুরিয়ার সম্মুখীন হইলাম। সে বিস্মিতনেত্রে আমার দিকে চাহিয়া রহিল। প্রথমে হিন্দুস্থানী ও পরে ইংরাজী ভাষায় আমার উদ্দেশ্য জানাইবার চেষ্টা করিলাম। বেচারী কিছুই বুঝিল না। তাহার কথাও আমার পক্ষে হিব্রু! অগত্যা আকার ইঙ্গিতে বুঝাইতে হইল, আমি গুহা-দর্শনাভিলাষী। সে মৃদু হাসিয়া আমাকে নিম্নগামী পথ দেখাইয়া দিল। আমি ইঙ্গিতে তাহাকে আমার সঙ্গী হইতে বলিলাম। কাঠুরিয়া কুঠার ও বৃক্ষ দেখাইয়া বুঝাইয়া দিল যে, সে কাজ করিতেছে, এখন আমার সঙ্গে যাইতে পারিবে না। কতকগুলি পয়সা বাহির করিয়া পুরস্কারের লোভ দেখাইলাম। সে হাসিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে আমার নিরাশ ও কাতর ভাব দেখিয়া যুবক কুঠারখানি কাঁধের উপর তুলিয়া, আমাকে অনুসরণ করিতে ইঙ্গিত করিয়া অগ্রসর হইল।

সেই বক্র সঙ্কীর্ণ পথ ক্রমাগত নিম্নে চলিয়াছে। মধ্যে মধ্যে যাত্রীদের বিশ্রাম করিবার জন্য বেঞ্চ রাখা হইয়াছে। স্থানবিশেষে উৎরাই সঙ্কীর্ণ। পথ এতই ঢালু যে, প্রতি পদক্ষেপেই আশঙ্কা হয়, কখন গভীর গর্ত্তে পড়িয়া যাই। একবার স্থানভ্রষ্ট হইলে, সে গতির প্রতিরোধ করিবার সম্ভাবনা নাই; কোনও উপলখণ্ডের সংঘাতে সর্ব্বাঙ্গ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। যাত্রীদের সুবিধার জন্য সেই স্থানে গাছের ডালের রেলিং বসান হইয়াছে। এইরূপে কিয়দ্দূর এক দিকে চলিলাম। পরে একটু ঘুরিয়া ফিরিয়া পুনরায় তাহার বিপরীত মুখে সেই পর্ব্বতের প্রান্তভাগে আসিয়া পড়িলাম। বেঞ্চের উপর বসিয়া একটু বিশ্রাম করিলাম।

এই স্থানের শোভা অতি মনোরম। প্রায় ২০ ফিট ব্যবধানে দুইটী উচ্চ পর্ব্বত। উভয়ের মধ্যে Nam Hpa গিরিনদ আমাদের ডান দিকে, গোটেয়িকের নিম্নে, একটি প্রকাণ্ড গুহামধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। তবে এই স্থান হইতে গুহা দেখা যায় না। সম্মুখে প্রায় সহস্র ফিট উচ্চ পর্ব্বতের দুইটি শৃঙ্গ। শৃঙ্গ দুইটির মধ্যে সুড়ঙ্গ কাটিয়া রেলপথ বসান হইয়াছে। একটি ক্ষুদ্র সেতু দ্বারা সুড়ঙ্গ দুইটি সংযুক্ত। সেতুর ২০ ফিট নিম্নে একটি ফেনিল জলপ্রপাত প্রায় সাত শত ফিট উপর হইতে নদীবক্ষে পড়িয়াছে। ডান দিকে, প্রথম সুড়ঙ্গের পশ্চাতে, গোটেয়িকের শেষাংশ দৃশ্যমান। নামিবার পূর্ব্বে

গোটেয়িকের অন্য প্রান্তটি বিজ্ঞাপনীদ্বয়ের মধ্যে দেখিয়াছি। ষ্টেশনের চারি শত ফিট নিম্নে আসিয়াছি। অনুমান আরও পাঁচ শত ফিট নিম্নে নদী।

চারিদিকে নানাবিধ বর্ণের বিকাশ। নদীতীর হইতে সরলভাবে সমুত্থিত সম্মুখবর্ত্তী পর্ব্বতটীর অরণ্যসমাচ্ছন্ন শিরোভাগ রবিকরোজ্জ্বল,—নীলবর্ণ। যে অংশটী রেলপথের জন্য সিঁড়ির ধাপের মত কাটা হইয়াছে, সেই অংশটী জ্বলন্ত অঙ্গারের ন্যায় লোহিত। ক্ষুদ্র সেতুটী শুভ্র,—ফেনিল জলপ্রপাতটী পারদবৎ, এবং জলপ্রপাতের লতাগুল্মাবৃত উভয় তীর ঘনশ্যামলবর্ণ। নিম্নে, পর্ব্বতের নগ্ন গাত্রের কোনও অংশ তাম্র, কোনও অংশ ধূসর, এবং তাহার শৈবালসমাবৃত পাদদেশ মখমলের ন্যায় সবুজ ও পিঙ্গলবর্ণ। *

আমাদের দিকে সিংকাড়ো, দেবদারু প্রভৃতি বৃক্ষলতায় পূর্ণ ঈষৎ-অন্ধকারময় জঙ্গলটীর কাঁচা-পাকা পত্রগুলির কি বর্ণ-বৈচিত্র্য! বৃক্ষে বৃক্ষে বিজড়িত ডাঁটা গাছের ফুলগুলি রক্তবর্ণ, একহস্তপরিমিত পত্রগুলি লালকচুর ন্যায় সুন্দর। মনসা-জাতীয় লতার ফুলগুলি সূর্য্যমুখীর মত। লজ্জাবতীলতার উপর ক্ষুদ্র কাঁটা গাছের সুরভি ফুলগুলি জুঁইএর মত। মসৃণ ঢালু পথ ধূসর।। নীলাকাশতলে গোটেয়িক সেতু তুষারশুভ্র। পাতালের কোলে ক্ষীণা স্রোতস্বিনী ঈষৎনীলবর্ণ।

দুরবীক্ষণ-সাহায্যে দেখিলাম, সম্মুখের সেই লতাগুল্ম-শৈবাল-বিমণ্ডিত পর্ব্বতের লোহিতপীতাদিবর্ণরঞ্জিত গাত্র বহিয়া অসংখ্য গিরিনির্ঝরিণী নিম্নের সেই স্রোতস্বিনীর অভিমুখে ছুটিয়াছে।—শিখরের সুচিত্রিত পল্লবসমুদ্র সুনির্ম্মল নীলাম্বরতলে যেন এক রামধনুর সৃষ্টি করিয়াছে,—সেই স্ফটিকবিনিন্দিত বিরাট লৌহসেতু রবিকিরণে উজ্জ্বলতর হইয়া নয়ন ঝলসাইয়া দিতেছে।

এই সময়ে একখানি মালগাড়ী গোটেয়িক্ অতিক্রম করিয়া অতিসন্তর্পণে প্রথম সুড়ঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করিল, এবং কিয়ৎক্ষণ পরে সেই ক্ষুদ্র সেতু অবলম্বনে, মন্থরগমনে, দ্বিতীয় সুড়ঙ্গের গহ্বরে অন্তর্হিত হইল।

পুনরায় চলিলাম। এই পথ আরও দুর্গম। ক্রমশঃ নদীগর্জ্জন স্পষ্টতর শ্রুত হইল। বায়ু আর্দ্র বলিয়া বোধ হইল। পর্ব্বতগহ্বর দেখা গেল। পরপারে উপস্থিত হইলাম।

গুহা প্রায় সত্তর ফিট উচ্চ। তাহার মধ্যে নদী প্রবেশ করিয়াছে।

---

* পর্ব্বতটীর উপরিভাগ পরীক্ষা করিলে Laterite বলিয়াই অনুমান হয়। কিন্তু গুহার মধ্যে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, গুহাটী Lime stoneএর।

আমাদের ও পরে দাঁড়াইবার স্থান নাই। এদিককার প্রায় বার ফিট প্রশস্ত তটভাগ, ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণতর হইয়া, ধাপে ধাপে গুহার নিম্নে গিয়াছে। গহ্বর-মধ্যে নামিলে দেখিতে পাওয়া যায়, নদী ক্রমশঃ নিম্নগামিনী হইয়া, সহসা যেন এক গভীর কূপে পড়িয়া গিয়াছে!

জলরাশি দক্ষিণে রাখিয়া সিঁড়ির ধাপের ন্যায় নামিতে লাগিলাম। গুহার উপরে, প্রস্তর খিলানের ফাটলে ফাটলে অসংখ্য চামচিকা বাসা করিয়াছে, এবং উড়িয়া বেড়াইতেছে। স্থানে স্থানে রাশি রাশি প্রস্তরখণ্ডের মধ্যে পথ অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। 'নবীন-তপস্বিনী'র জলধরের পক্ষে সেই পথে যাতায়াত সহজ নয়! স্থানে স্থানে উপর হইতে অবিরাম জল পড়িতেছে। কোথাও বা কোনও শিলাখণ্ড বিন্দু বিন্দু বারিবর্ষণে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া ভস্মাচ্ছাদিত শিবলিঙ্গের মত দেখাইতেছে। কোথাও বা ফাটলের মধ্যে সেই জল আবদ্ধ রহিয়াছে। এক-স্থানে হাত ডুবাইয়া অনুভব করিলাম, জল বরফের মত শীতল। এক স্থানে একটি জীর্ণ বৃক্ষশাখা পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, শাখাটি প্রস্তরে পরিণত হইতেছে। নামিবার কালে দুইবার কাঠের সিঁড়ির সাহায্য লইতে হইয়াছিল।

একখণ্ড বৃহৎ প্রস্তরের উপর নামিলাম। সেইখানে নদী আমাদের পথরোধ করিল। প্রস্তরখণ্ডের পরেই প্রায় পঁচিশ ফিট চওড়া সেই কূপ! কূপের পারে, অর্থাৎ আমাদের সম্মুখে, গুহার অন্যপ্রান্তে একটি ক্ষুদ্র গহ্বর। গহ্বরটিকে গুহা-প্রবেশের দ্বিতীয় দ্বার বলা যায়। প্রথম গহ্বরদ্বার আমাদের পশ্চাতে প্রায় এক শত ফিট উপরে। দ্বিতীয় দ্বার হইতে গুহামধ্যে আলোক না আসিলে সেই স্থান অন্ধকারময় হইত। গহ্বরের দ্বারপথের পরেই প্রায় আট ফিট প্রশস্ত গিরিসঙ্কট।

কল্পনা করুন,—গোটেয়িকের পাদস্তম্ভগুলির নিম্নে প্রায় চারি শত ফিট পুরু খিলানের মত এই ঢাল গুহার পৃষ্ঠদেশ! গোটেয়িকের বাম দিক হইতে আমরা এই স্থানে নামিয়াছি;—গোটেয়িকের ডান দিকে, আমাদের সম্মুখের দ্বিতীয় গহ্বরটীর পশ্চাতে সঙ্কীর্ণ গিরিসঙ্কট। গিরিসঙ্কটের উভয় পার্শ্বের পর্ব্বতের উপরে দুর্গম অরণ্য। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সেই গিরিসঙ্কটে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই নদী কূপবৎ সুড়ঙ্গে পড়িয়া গিয়াছে!

কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরখণ্ডের উপর আরোহণ করিলাম। স্থান—সন্ধ্যাকালের মত অন্ধকারময়—ভয়াবহ! বহুদূর হইতে আসিয়া ফেনপুঞ্জময়ী নির্ঝরিণী তড়িৎ-বেগে নিম্নের সেই পাষাণকূপে পড়িতেছে! গুহামধ্যে সেই প্রবল প্রবাহের প্রলয়-গর্জ্জন সহস্রবার প্রতিধ্বনিত হইতেছে!

আমি তন্ময় হইয়া মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় এই মহান দৃশ্য দেখিতেছিলাম। কিছুক্ষণ পরেই সঙ্গী আমাকে ফিরিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিল; কারণ, বেলা অধিক ছিল না। আমি নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও ফিরিলাম।

ধীরে ধীরে সোজা চড়াই অতিক্রম করিয়া অপেক্ষাকৃত সরল পথ পাইলাম। চলিতে চলিতে দূর হইতে দেখিলাম, রাস্তার মাঝে একগাছি মোটা লাঠী পড়িয়া রহিয়াছে। তুলিয়া লইবার জন্য নিকটে গিয়া শিহরিয়া উঠিলাম। একটি অনতিবৃহৎ বিষধর ধূলিশয্যায় পরমসুখে নিদ্রিত! সভয়ে পশ্চাতে ফিরিয়া সঙ্গীকে দেখাইলাম। সে পাথর ছুঁড়িয়া তাহাকে বনমধ্যে তাড়াইয়া দিল, এবং আমাকে ইঙ্গিতে বলিল, তাহার এক ছোবলেই আমার ভবলীলা সাঙ্গ হইতে পারিত!

ক্রমে যেখানে কাঠুরিয়ার জীবিকাসম্বল কাষ্ঠরাশি পড়িয়া ছিল, সেখানে উপস্থিত হইয়া যুবক বিদায় প্রার্থনা করিল। তাহাকে একটি টাকা দিলাম। সে মৃদুহাস্যে করযোড়ে প্রত্যাখ্যান করিল। অনেক বলিয়া কহিয়া তাহাকে সেই টাকাটী লইতে বাধ্য করিলাম। যখন ষ্টেশনে ফিরিলাম, তখন সন্ধ্যা হইয়াছে।

মাষ্টার মহাশয় ও মান্দ্রাজী যাত্রি শ্রীমান দ্বয়, আমার গুহা-দর্শন হইয়াছে কি না, কি প্রকারে একাকী সেখানে যাইলাম, ইত্যাদি নানাবিধ প্রশ্নে আমাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিলেন। আহারের কি বন্দোবস্ত করা যায়, জিজ্ঞাসা করিলাম। ষ্টেশন-মাষ্টার বলিলেন, তাঁহাদের প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যই মেমিয়ো হইতে আনাইতে হয়। তবে একবার Rest-houseএ গিয়া খানসামাকে জিজ্ঞাসা কর, সেখানে দুগ্ধ কিনিতে পাওয়া যায় কি না। অবিলম্বে ছুটিলাম। সেখানে দুগ্ধ মিলিল না। তবে সন্ধান পাইলাম, নিকটেই এক জন হিন্দুস্থানীর ঘরে একটি দুগ্ধবতী গাভী আছে।

হিন্দুস্থানীর শরণাপন্ন হইলাম। দরিদ্র শ্রমজীবী পরমযত্নে একখানি খাটিয়া পাতিয়া আমাকে বসিতে বলিল। তাহার স্ত্রী খাটিয়ার উপর একখানি কম্বল বিছাইয়া দিল। সে ষ্টেশনের ভৃত্য। তাহার মুল্লুকের তুলনায় এই জঙ্গলদেশ কিছুই নয়, পেটের দায়ে এই পরদেশে দিন কাটাইতে হইতেছে, এবং আরও কত দুঃখের কাহিনী শুনাইয়া বেচারী যেন হৃদয়ের ভার কতকটা লঘু করিল। তাহারা আমাকে রুটী প্রস্তুত করিয়া ভোজন করিতে বার বার অনুরোধ করিল। কিন্তু তখন আর আমার রাঁধিবার ইচ্ছা ও উৎসাহ ছিল না। কাজে কাজেই এক লোটা নির্জ্জলা দুধ পান করিয়া বিদায় লইলাম।

ষ্টেশনের বেঞ্চিতে বসিয়া ষ্টেশনমাষ্টার ও সহযাত্রিগণ আমারই সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন। তাঁহারা পরদিন আমাকেই প্রদর্শকপদে নিযুক্ত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন! আমি বলিলাম, শরীর ভাল থাকিলে সাহায্য করিতে চেষ্টা করিব। কিয়ৎক্ষণ পরে ষ্টেশনমাষ্টার আমাদিগকে ভোজন শেষ করিয়া লইতে এবং দরজা জানালা বন্ধ করিয়া শয়ন করিতে উপদেশ দিয়া বলিলেন, 'রাত্রি আটটা বাজিয়া গিয়াছে। আর বাহিরে বসিয়া থাকা নিরাপদ নহে। এ স্থানে বাঘ ভালুকের খুব উবদ্রব। অনেকবার ষ্টেশন হইতে বাঘে কুলী লইয়া গিয়াছে। একটু পরেই তাহাদের গর্জ্জন শুনিতে পাইবেন। রাত্রে দরজা খুলিবেন না।' তিনি অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন।

ষ্টেশনের সম্মুখে দুইখানি কাঠের ঘর। পশ্চাতে, কাঠের প্রাচীরে ঘেরা মাষ্টার মহাশয়ের অন্তঃপুর। বড় ঘরখানি টিকিট্-আফিস, এবং অপরটি ভাঁড়ার-ঘর। টিকিট-আফিসে তাঁহাদের, এবং সেই কেরোসিনগন্ধামোদিত ভাঁড়ার-ঘরে আমার রাত্রিবাসের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। সে ঘরে আর কিছু না পাওয়া যাউক, অন্ততঃ তিন চারি ঝোড়া আবর্জ্জনা সংগৃহীত হইতে পারে। এক কোণে দুই তিনটি নূতন ও পুরাতন তৈলের টিন, কিছু দড়ি ও টেলিগ্রাফের তার; আর এক কোণে, সম্ভবতঃ বর্ম্মা-রেলওয়ে-সৃষ্টির প্রথম বৎসরেই ক্রীত দুই একটি 'হরিকর্ণ' লণ্ঠন ও অন্যান্য আলোকাধার। তদ্ভিন্ন অতিথির চিত্ত-বিনোদনের জন্য কতিপয় তেলা পোকা, টিকটিকি, গণেশবাহন ও মশকযূথেরও অভাব ছিল না। কিন্তু এ-হেন রাজগৃহে স্থান পাইয়া আপনাকে সৌভাগ্যবান মনে করিয়াছিলাম।

আসিবার সময় একটা ষ্টেশনে ছয় পয়সা দিয়া দুই ছড়া কলা ও দুইটি পেঁপে কিনিয়াছিলাম। বোঁচ্কা হইতে বাহির করিয়া কিছু উদরসাৎ করিয়া শয্যা বিছাইয়া শয়ন করিলাম। ভাবিয়াছিলাম, শয়নমাত্রই নিদ্রা আসিবে। কিন্তু অনেক স্তবস্তুতিতেও দেবীর দয়া হইল না। বিনিদ্র রজনীর দণ্ডের পর দণ্ড, প্রহরের পর প্রহর কাটিয়া গেল; ঘুম আর আসে না। বায়স্কোপের চিত্রের মত দিবসের সমস্ত দৃশ্যগুলি নয়নপটে ক্রমাগত উদিত ও তিরোহিত হইতে লাগিল। বাহিরে অরণ্যের চারি দিকে অবিশ্রাম ঝিল্লীরবের সঙ্গে ভল্লুক, হরিণ ও অন্যান্য দুই একটি বন্যজন্তুর সাড়া পাইতেছিলাম। কিন্তু ব্যাঘ্রের কোনও সাড়াশব্দ পাই নাই। অনুমান রাত্রি দুইটার সময় [illegible]

রজনী জ্যোৎস্নাময়ী। কুজ্ঝটিকা-সমাচ্ছন্ন উদ্ভিদসমুদ্রে শুভ্র চন্দ্রকিরণ প্রতিফলিত হইয়া অস্পষ্ট, ভয়াবহ, অথচ অতি সুন্দর চিত্রের সৃষ্টি করিয়াছে। সমীরণ নিস্তব্ধ। বৃক্ষপল্লবটী পর্য্যন্ত মৃতবৎ নিশ্চল—নীরব!

পুনরায় শয্যায় আশ্রয় লইলাম। শেষ রাত্রে ঘুমাইয়া পড়িলাম। মান্দ্রাজী বন্ধুদের কোলাহলে জাগিয়া দেখি, ভোর হইয়াছে। সন্নিহিত ঝরণার জলে হাত মুখ ধুইয়া সেতুর উপরে বসিলাম। তখনও সূর্য্যোদয় হয় নাই। শীতল বায়ুস্পর্শে মাথাটা হাল্‌কা হইল। ধীরে ধীরে সেতুর উপর অগ্রসর হইলাম।

হোকিট্ (Hokit) নামক নিকটবর্ত্তী একটি ক্ষুদ্র শাণ পল্লীর বর্ম্মী নাম,—গোটেয়িক। উভয় শব্দেই বুঝায়, যে স্থানে মৃত্তিকার নিম্নে নদী প্রবাহিত হয়। তদনুসারে ষ্টেশন ও সেতুর নামকরণ হইয়াছে।

লৌহ-সেতুটী দৈর্ঘ্যে ২২৬০ ফিট। পূর্ব্ববর্ণিত গুহারূপী প্রস্তর-খিলানের উপর তাহার পাদস্তম্ভগুলি স্থাপিত। পনেরটী স্তম্ভ আছে। সর্ব্বোচ্চ স্তম্ভের উচ্চতা ৩৬০ ফিট, এবং ওজন প্রায় ৭০০০ মন। বোম্বাই সহরের রাজা-বাঈ স্তম্ভের উচ্চতা ২৫০ ফিট, দিল্লীর কুতব-মিনার ও কলিকাতার মনুমেণ্ট্ যথাক্রমে ২৪০ ও ১৭১ ফিট উচ্চ। সুতরাং এই অনুপাতেই গোটেয়িকের বিশালত্ব উপলব্ধ হইতে পারে। নদীবক্ষ হইতে রেল-লাইন ৮৬০ ফিট উচ্চ।

প্রস্থে গোটেয়িকের উপরিভাগ প্রায় পনের ফিট। সেখানে একখানি ট্রেণ যাইবার জন্য এক যোড়া রেল-লাইন বসান হইয়াছে। সেখানে এক সুতা পরিমাণও একটি ছিদ্র দেখিতে পাই নাই। আগাগোড়া লৌহ-পাতে মোড়া। দুই ধারে তিন ফিট উচ্চ লৌহ-প্রাচীর। ডান দিকে মাঝে মাঝে এক একটি বারান্দা। ট্রেণ আসিয়া পড়িলে পথিক তাহার উপর আশ্রয় লইতে পারে। বারান্দাগুলি দৈর্ঘ্যে প্রস্থে যথাক্রমে ২০ ও ১০ ফিট, এবং সংখ্যায় পনেরটী।

ইহার নির্ম্মাণ করিবার জন্য আমেরিকা হইতে ইঞ্জিনীয়র ও কণ্ট্রাক্টর আনিতে হইয়াছিল। Pensylvania steel company সমস্ত উপকরণ নিউইয়র্ক হইতে এই স্থানে আনিয়া দেড় বৎসরে এই সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। প্রায় ১২০০০০ মণ লৌহ ও সর্ব্বসমেত বিশ লক্ষ টাকা খরচ হইয়াছিল। আমেরিকার যুক্ত-প্রদেশের এক Colorado gorge ব্যতীত ইহার সমকক্ষ উচ্চ সেতু পৃথিবীর কুত্রাপি নাই। প্রাকৃতিক শোভায় এ স্থান অতুলনীয়।

"It is said to be the highest viaduct in the world, Globe trotters visit the ghat which is really one of the most wonderful sights In Asia,"—

মান্দ্রাজী বন্ধুরা বলিলেন,—আমার সাহায্য ভিন্ন সেই বনমধ্যে তাঁহারা নামিতে পারিবেন না। শারীরিক অসুস্থতা জানাইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম, এবং এক জন প্রদর্শক লইয়া অবিলম্বে তাঁহাদের যাত্রা করিতে পরামর্শ দিলাম। কিন্তু তাঁহারা আমার কোনও কথায় কর্ণপাত না করিয়া, আমাকে ক্রমাগত বিরক্ত করিতে করিতে, আমার অনুসরণ করিতে লাগিলেন।

নদীটির মাঝখানে আসিয়া সাবধানে লৌহপ্রাচীর ধরিয়া দাঁড়াইলাম। নিম্নে চাহিতেই মাথা ঘুরিয়া গেল। কাঁপিতে কাঁপিতে পশ্চাতে হটিলাম। এক দিকে, ৯০০ ফিট নিম্নে স্রোতস্বিনী; অন্য দিকে ৩০০ ফিট নিম্নে দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্র-তরঙ্গের মত নিবিড় অরণ্যানী।

সেতু পার হইয়া প্রথম সুড়ঙ্গের নিকট আসিয়া একটি ক্ষীণ প্রস্রবণ দেখিলাম। সঞ্চারিণী দীপশিখার ন্যায় একটি শাণ-রমণী রূপের প্রভায় বনপ্রান্ত আলোকিত করিয়া, মাথায় বোঝা লইয়া, সেই সুড়ঙ্গ হইতে বাহির হইল, এবং বিস্মিতনেত্রে আমাদিগকে দেখিতে দেখিতে সেতুমুখে চলিয়া গেল।

সুড়ঙ্গ অতিক্রম করিয়া পরপারে যাইবার কথা বলিলে, বন্ধুরা আমাকে ভবিষ্যদ্বাণী শুনাইয়া দিলেন যে, আমার পরমায়ু শেষ হইয়াছে! শাণ-রমণীর দৃষ্টান্ত, দিবার আলো এবং আমাদের সংখ্যার পরিপুষ্টি দেখাইয়াও তাঁহাদের ভয় দূর করিতে পারিলাম না। তাঁহারা ষ্টেশনে ফিরিয়া গেলেন।

আমি লাঠী দ্বারা শব্দ করিতে করিতে সেই অনতিদীর্ঘ সুড়ঙ্গ অতিক্রম করিয়া সেতুর উপর উপস্থিত হইলাম।

গত অপরাহ্নে বেঞ্চির উপর বসিয়া দুইটি পর্ব্বতশৃঙ্গমধ্যে এই সেতুটিই দেখিতে পাইয়াছিলাম। ইহারই তলদেশে সেই জলপ্রপাত বহু উচ্চ হইতে নদীগর্ভে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে।

দ্বিতীয় সুড়ঙ্গটি পার হইয়া কিছু দূর অগ্রসর হইলে, চারি জন উড়িষ্যাবাসীর সাক্ষাৎ পাইলাম। তাহাদের নিবাস গঞ্জাম। তাহারা রেল কোম্পানীর ভৃত্য। তাহাদের কার্য্য,—রাস্তা নিরাপদ ও পরিষ্কৃত রাখা। কলিকাতা হইতে আসিয়াছি শুনিয়া এক জন সোল্লাসে বলিল, কয়েক বছর পূর্ব্বে সে বড়বাজারে কর্ম্ম করিত। কলিকাতা হইতে সে বর্ম্মাদেশে আসিয়াছে। তাহার ছোট ভাই এখনও বড়বাজারে চাকরী করে। এক মাস আগে সে একখানি পত্র পাইয়াছে। পরে অনেক অনুনয় করিয়া বলিল, 'বাবু! আপনি যখন সেখানে ফিরিয়া

যাইবেন, সদানন্দকে বলিবেন, আমি তাহাকে পত্র ও টাকা পাঠাইয়াছি।' বেচারীর সরল আগ্রহ দেখিয়া আমার বলিতে ইচ্ছা হইল না যে, অত বড় বাজারের মধ্যে তাহার সদানন্দকে খুঁজিয়া বাহির করা অসম্ভব। আমি বলিলাম, 'তুমি তাহাকে আর একখানি পত্র লিখিও। আমি যদি তাহার দেখা পাই, তোমার কথা বলিব।'

এক জন তাহাদের পর্ব্বতশৃঙ্গে নির্ম্মিত গৃহে গমন করিবে শুনিয়া, আমিও তাহার সাথী হইলাম। প্রাণ হাতে করিয়া পর্ব্বতশিখরে উঠিতে হইয়াছিল। পথে যেমন কাঁটা, তেমনই পিছল; উপরন্তু সাপের ভয়। ভিজা-কাপড়ে হাঁপাইতে হাঁপাইতে উপরে উঠিয়া ভাল পথ পাইলাম। কোমর পর্য্যন্ত ভিজা ঘাসের মধ্যে ডুবিয়া রহিল; হাত দুইটা জঙ্গল সরাইতেই নিযুক্ত রহিল। ঘড়িতে সাড়ে সাতটা বাজিলেও বনমধ্যে যেন ভোর! উপরের পত্র হইতে তখনও পর্য্যন্ত টস্-টস্ করিয়া শিশির পড়িতেছে। গাছগুলি এত ঘন বীন ও পথটি এমন বাঁকা চোরা যে, কুড়ি হাত সোজা রাস্তা মেলে না। অধিকাংশ গাছের গায়ে শোঁয়া পোকার মত কণ্টকাকীর্ণ এক রকম শ্যাওলা দেখা গেল। কতবার মোটা মোটা শিকড় মাড়াইয়া চলিতে হইল। সঙ্গী বলিল, প্রায়ই তাহাদিগকে জঙ্গল কাটিয়া রাস্তা পরিষ্কৃত করিতে হয়। নিকটের একটি দৃশ্য বর্ণনাযোগ্য। গাবের মত কি একটা গাছের পার্শ্বেই একটি বৃহৎ বটবৃক্ষ। বটের ঝুরিগুলি এরূপ নিবিড়-ভাবে সেই গাছটি জড়াইয়া জঙ্গলমধ্যে নামিয়াছে যে, তাহার অধিকাংশই দেখা যায় না। চারি দিক হইতে অন্যান্য বৃক্ষের অনেকগুলি শাখা প্রশাখাও বলপূর্ব্বক উভয়ের শাখা পল্লবের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। অধিকন্তু অর্কিড প্রভৃতি অগণ্য লতাগাছ মিলিয়া উপরের পুঞ্জীভূত পত্রাবলী হইতে নিম্নের জঙ্গল পর্য্যন্ত দুর্ভেদ্য জালের সৃষ্টি করিয়াছে। অনেকেই বটের ঝুরি আশ্রয় করিয়া উঠিয়াছে। সুপারি-গাছের মত মোটা একরকম ডাঁটা গাছ দেখিলাম। ভূতল হইতে উঠিয়া তাহারা শতাধিক ফিট উচ্চ গাছগুলির শিরোভাগ জড়াইয়া থাকে।

আধঘণ্টা পরে সেই বনরাজ্য হইতে বাহির হইয়া রেল-লাইনে পড়িলাম। লাইনের পরেই বিশ বিঘা আন্দাজ খোলা জমী। সূর্য্যদেব সেখানে অবাধে কিরণ বর্ষণ করেন। নিম্নের রেলপথ, ঘুরিয়া সেই শিখরে উঠিয়া, চীন-সীমান্তে 'ল্যাসিও' পর্য্যন্ত গিয়াছে। নিকটে আটটি বড় বড় খুঁটীর উপরে একটি মঠ। এই বনে ঐ গৃহটিই উড়িষ্যাবাসীদের একমাত্র আশ্রয়। পাশেই আর একখানি চালাঘর। তাহাদের পাকশালা। দিবাশেষে মাচার উপর উঠিয়া তাহারা

সিঁড়িখানি উপরে উঠাইয়া লয়, এবং সেইখানে রাত্রিযাপন করে। পাকশালা হইতে একখানি তক্তা আনিয়া পাতিয়া দিয়া আমাকে সে বসিতে বলিল।

পাশে কয়টা ফলন্ত পেঁপে, কুমড়া ও বেগুন গাছ। মনে মনে ব্রহ্মদেশীয় পার্ব্বত্যভূমির আশ্চর্য্য উর্ব্বরতার প্রশংসা করিতে লাগিলাম। কেবলমাত্র এই বনভূমিতেই যে উর্ব্বরতা লক্ষ্য করিয়াছি, তাহা নয়। রেঙ্গুন হইতে চীন-সীমান্তের সুদূর মিচিনা পর্য্যন্ত সকল স্থানেই এই উৎপাদিকা শক্তি দেখিয়াছি। পার্ব্বত্য জঙ্গল পোড়াইয়া সেই জমীতে ধানের চাষ হইতে দেখিয়াছি। এই জন্যই শুনিতে পাওয়া যায়, ব্রহ্মদেশে দুর্ভিক্ষের উৎপীড়ন নাই। আমাদের ফসলের রাণী ভারত-জননীকেও বহুবার রেঙ্গুন-চাউলে প্রাণ বাঁচাইতে হইয়াছে।

সেখানকার পাঁচ জনের মুখে শুনিলাম, সে বনে ব্যাঘ্র, ভল্লুক, হরিণ প্রভৃতি পশু ত অগণ্য বটেই, তদ্ভিন্ন হস্তিযূথের সংখ্যাও অল্প নহে। মধ্যে মধ্যে কোম্পানী বাহাদুর এখানে হস্তী ধরাইয়া থাকেন। এই প্রদেশ অসংখ্য ময়ূরের নিত্য ক্রীড়াভূমি। ট্রেণে যাতায়াতকালে ঝাঁকে ঝাঁকে ময়ূর ময়ূরী ও দলবদ্ধ উল্লুক-মণ্ডলী দেখা যায়। তাহাদের উৎপাতে শ্রমজীবীরা বাহিরে খাদ্য রাখিতে পারে না। রবারের আটা, তার্পিন ও গর্জ্জন তৈল, মধু, ও শাল, মেহগিনি, খয়ের, পিংকাডো, ওক প্রভৃতি প্রয়োজনীয় কাষ্ঠ ভিন্ন মহার্ঘ চন্দনও এই প্রদেশে প্রভূতপরিমাণে সংগৃহীত হয়।

এই শাণ শৈলমালা ক্রমশঃ উচ্চতর হইয়া উত্তর-পূর্ব্ব কোণে চীন সাম্রাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। সমুদ্রতীর হইতে ৭০০০ ফিট উচ্চে একটি নদীতীরে বহুকাল হইতে একটি রৌপ্যখনি বিদ্যমান। তাহার নিকটে একটি সীসার খনিও আছে। সেখানে শ্বেতাঙ্গদের স্থাপিত Great Eastern Mining Companyর অধীনে বহুসংখ্যক শাণ, চীনা, কাচিন, পঞ্জাবী ও উড়িয়া শ্রমজীবী পরিবার লইয়া জীবিকা উপার্জ্জন করে। পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাবও আছে। স্থানীয় এক জন ইঞ্জিনীয়র বলিয়াছিলেন, এই লাইন আরও খানিকটা বাড়াইবার কর্ত্তৃপক্ষের ইচ্ছা ছিল। কিন্তু ল্যাসিওর পরের পাহাড়টি তামা-পাথরের। সে পাহাড় কাটিয়া রাস্তা করিতে অত্যন্ত খরচ হইবে। তাই সে সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হয় নাই। এক সময়ে এই শাণ পর্ব্বতের মেমিয়ো প্রদেশে প্রচুরপরিমাণে কয়লা পাওয়া যাইত। Railway cuttingএ carboriferous Strata দেখিয়া তাহার প্রমাণ পাইয়াছি।

গোটেরিকের উত্তরে Man Sam নামে একটি বৃহৎ জলপ্রপাত আছে। সময়াভাবে সেখানে যাইতে পারি নাই।

এই রেলপথ-নির্ম্মাণে সকল প্রকার ইঞ্জিনীয়ারিং কৌশল অবলম্বন করিতে হইয়াছে। যে উপায়ে আমরা শাণ পর্ব্বতে আরোহণ করিয়াছি, Guide-book হইতে তাহা উদ্ধৃত হইল—

"The line seems on the level to the foot of the hills, and then rises by 3 zig-zags up a gradient of 1 in 25 to a height of 1009 feet and thence continues rising the whole way winding along the hill sides.'

প্রসিদ্ধ দার্জ্জিলিং-পথে তিন্‌দরিয়া হইতে গাইবারি ষ্টেশন পর্য্যন্ত লাইনের উচ্চতা প্রতি ২৮'৭০ ফিটে ১ ফিট। সেই স্থানটিই উক্ত রেলপথে সর্ব্বাপেক্ষ ঢালু। সুতরাং এই হিসাব হইতে সপ্রমাণ হয়, মেমিয়ো-পথের এই ভয়াবহ স্থানের নিকট দার্জ্জিলিং-লাইন পরাজয় স্বীকার করিয়াছে।

ঘড়ি দেখিয়া বিবেচনা করিলাম, অধিক বিলম্ব করা অসঙ্গত। লোকটি অরণ্য-মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাকে নিম্নের রেললাইন দেখাইয়া দিল। কৃতজ্ঞচিত্তে বিদায় লইলাম।

শ্রান্তদেহে বেলা দশটার সময়ে ষ্টেশনে ফিরিলাম। ট্রেণ আসিবার বিলম্ব আছে। অনিদ্রা ও পথশ্রমজনিত অবসাদে শরীর মাতালের ন্যায় টলিতেছিল। ঝরণার জলে হাতমুখ ধুইয়া বেঞ্চির উপর সটান শুইয়া পড়িলাম। একছড়া কলা ও একটা পেঁপেমাত্র খাবার সম্বল।

ট্রেণ আসিল। ষ্টেশনমাষ্টারকে অভিবাদন করিয়া গাড়ীতে উঠিলাম।

যখন মেমিয়োয় ফিরিলাম, তখন বেলা প্রায় ছয়টা। সেই রাত্রি সহৃদয় বীরেশ্বর বাবুর আবাসে কাটাইয়া পরদিন মান্দালয়ে যাইবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু বন্ধুদের অনুরোধে আরও কয়েক দিন মেমিয়োয় থাকিতে হইল।

বেশ মনে আছে, সন্ধ্যাকালে যখন মান্দালয় সহর দেখা গেল, তখন মনে হইল, যেন এক নূতন জগতে উপস্থিত হইয়াছি! বোধ হইল, বুঝি বা কলিকাতায় ফিরিলাম! দ্রুতপদে যখন 'ভারত-কুটীরে' প্রবেশ করিলাম, তখন চা-পানে রত বন্ধুমহলে হাসির কোলাহল পড়িয়া গেল।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

মুষ্টিযোগ।

১

রামবাবু। ছিদাম, এখনো, কি মীর্জ্জাপুর থেকে আসবার সময় হয় নি? সে আর কত দূর—আট মাইল বই নয়? ষ্টীমর কখন আসে রে?

ছিদাম। আজ্ঞে, এই আটটা সাড়ে আটটায় ষ্টীমার পৌঁছে।

রামবাবু। তবে আর কি? রাত থাকৃতেই ত পাল্কী গেল—ওরা হয় ত সাতটায় পৌঁছেছে। তবে আস্‌তে এত দেরী হচ্ছে কেন? বেলা ক'টা রে—দেখ ত।

ছিদাম। দশটা এখনো বাজে নাই কর্ত্তা।

রামবাবু। বলিস্ কি? অবাক্ কর্‌লি যে!—দেশ ভরা এমন কড়া রোদ—ঘরে বসে গা জ্বালা করে;—তুই হয় ত ঘড়ী দেখ্‌তে ভুল ক'চ্ছিস—বেলা বারটা বাজে।

ছিদাম। আজ্ঞে না কর্ত্তা। ভাদ্র মাসের রোদ—একটু চড়াই ত হয়।

'আচ্ছা ছিদাম! কাল রাত্রে কি বাতাস টাতাস উঠেছিল? না;—আমি ত টের পাই নি। প্রায় সারা রাতই ত জেগে বসেছিলুম—বাতাসের গন্ধও পাই নি। আচ্ছা—ষ্টীমার কি চড়ায়——'

'কি বলেন কর্ত্তা—ভাদ্র মাসে চড়া?'

'না—তা ঠিক নয়—তবে—তবে ভয় কচ্ছি এই যে, ষ্টীমার পথে দেরী না করে—'

'কর্ত্তা যা ভাব্‌ছেন—তা কিছু নয়—সময় হলেই ছোট কর্ত্তা এসে পৌঁছবেন। অত ভাব্‌ছেন কেন?'

'ভাব্‌ব না ছিদাম? শিবনাথ আমার প্রাণের আধখানা। আজ প্রায় চার বচ্ছর হলো—তার মুখ দেখিনি! যেতেও পারি না—লাহোর—কত দূর না জানি!'

'কর্ত্তা, শুন্‌ছি মানুষ বিলাত যায়—আরও কত দেশে কত দূরে থাকে। পাঁচ সাত বছর——'

তা তুই বুঝ্‌বিনি ছিদাম! মা-বাপ-মরা ভাইকে কচি বয়স থেকে বুকের মাঝে রেখে গড়ে তুল্‌লে, তার দেহে নিজের শরীর থেকে কতখান সার পদার্থ

যায়—তা তুই কি করে জানবি? যা, পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে দেখ ত—মাঠের মাথায় পাল্কী দেখা যায় কি না?'

'আজ্ঞে কর্ত্তা যাব অখন—একটু সময় হোক্ না—এখনো ঘণ্টা খানেক দেরী আছে।'

'ছিদাম, ঘড়ী কিন্তু সব দিন ঠিক চলে না। আজ ওটা শ্লো হবার কথা। গত রবিবার বোধ হয় চাবি দিই নি।'

'আজ্ঞে না কর্ত্তা, চাবি ঠিক দিয়েছিলেন,—আমি যখন——'

'তা হবেও বা—তবু কলের ঘড়ী ত; বিশ্বাস নাই—কল খারাপ হতে কতক্ষণ?—অই—রে!—ঐ—বেয়ারাদের কাঁই-মাই শুন্‌ছি—শিবু এয়েছে——'

'ও সব ছেলেদের গোলমাল—একটু বসুন কর্ত্তা—ছোট বাবু এলেন বলে।'

'তাই না কি—আচ্ছা—জানিস্ কি ছিদাম—মনটা এক একবার বড় অস্থির হয়ে উঠ্‌ছে। আচ্ছা, সুবোধ গেল কোথা রে?'

'সে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে খেল্‌ছে।'

'হুঁ—ওর কিছু হবে না—গাধা!'

'কি বলেন কর্ত্তা—সে যে খুব ভাল ছেলে।'

'আজ শিবু আস্‌বে—তার কি পাড়ায় খেল্‌তে যাওয়া উচিত? কিছু হবে না ওর—ঠিক্ বল্‌ছি,—তুই দেখে নিস্।

'ঠিক সময়ে সে এসে হাজির হবে। তার ভুল হবে না।'

'চল না ছিদাম, একটু এগিয়ে দেখি—পাল্কী দেখা যায় কি না! আমার মন কিন্তু বল্‌ছে—আমিও পুকুরপাড়ে যাব—শিবুর পাল্কীও এসে হাজির হবে। দে, খড়ম জোড়াটা এ দিকে;—না, দরকার নাই—খালি পায়েই ভাল। চল—তুই আর আমি যাই।'

২

'আজ তিন দিন ধরেই দেখ্‌ছি, তুই ছেঁড়া জামা গায়, খালি পায়, ময়লা কাপড় পরে ইস্কুলে যাস্—কেন রে সুবোধ?'

'কেন কাকাবাবু! আমি ত রোজই অমনই যাই।'

'রোজ?—কেন? তোর—'

'সুবোধ খাবে এসো—খুড়ী মার অন্য কাজ আছে।'

'দাঁড়াও ছিদাম দা—আস্‌ছি।'

'তা যাবি এখন—একটু বোস্‌ না—শুনি—'

'না কাকা বাবু, আগে খেয়ে আসি। কাকী মাকে আজ নাকি অনেক কাজ করতে হবে।'

'যা চট্‌ করে' খেয়ে আয়। তোকে নিয়ে আজ বেড়াতে যাব।—ওরে! একটা কথা শুনে যা ত—সকালে কি খাস্‌ তুঁই?'

'কাল্‌কের জল দেওয়া ভাত চাট্টিখানি আছে, তাই নুন লঙ্কা দিয়ে খাবো এখন।'

'বলিস্‌ কি ছিদাম! তুই যা ত, দেখে আয় গে। ওরে! ও সুবোধ! শুনে যা।'

'কি কাকা বাবু?'

'রোজই তুই পান্তা খাস্‌?'

'রোজ রোজ খাই না—মধ্যে মধ্যে চিঁড়া মুড়ি খাই। কোনো দিন একেবারে ইস্কুলের সময়——'

'ইস্কুল থেকে এসে কি খাস্‌?'

'ইস্কুল থেকে এসে আবার খাব কি? তোমার যে কথা কাকাবাবু, শুন্‌লে হাসি পায়।'

'কিছু খাস্‌ নে? আচ্ছা—খাস্‌ নে কেন?

'কি জানি, তখন খেল্‌তে যাই, নৈলে অঙ্ক কষি।'

'হুঁ,—রাত্রে কখন খাস্‌?'

'তা কি জানি। পড়ে' ঘুমিয়ে পড়ি—বাবা—রেঁধে আমায়——'

'বাবা রেঁধে কি রে?—অ্যাঁ!—বাবা রেঁধে—বলিস্‌ কি—তোর বাবা রাঁধেন—'

'যাও—তোমার সঙ্গে কথা কইব না—'

'সুবোধ খাও এসে, কাকী মা ডাক্‌ছেন—পরে কিন্তু—'

'ভাত পাবে না—এই ত? তা বেশ; তুই যা ত ছিদাম ও পাড়ায়। মুড়ি মুড়কী কিছু নিয়ে আয়, আমি খাব।'

'সুবোধ যাবে না এখন?'

'আঃ—তুই যা না!—আচ্ছা সুবোধ! তোর বাবা কি রোজই রাঁধেন?'

'হুঁ! তবে দিনের বেলায় মধ্যে মধ্যে কাকীমাও রাঁধে। কাকীমা

কিন্তু খুব ভাল টক্ রাঁধে কাকা বাবু, তুমি বুঝি খাও নি?—আজ বল্‌ব রাঁধতে।—'

'তা হবে এখন—তোর কাকী মা বুঝি অবসর পান না!'

'না। কত কাজ কর্‌তে হয়! তিনি কেমন সুন্দর কার্পেটের উপর কুকুর, ফুল, ঘোড়া, মানুষ আঁকেন। কত মোজা তৈরি করেন। নাম লিখে ডালা বানান। আর কত সুন্দর জামা শেলাই করেন।'

'আর কি করেন?'

'কি জানি! তুমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করো। যাই, আমি এখন, খাইগে—'

'না; আজ দু'জনে মুড়ি খাব। তোর কাকী মা আর কি করে, জানিস্ না?'

'আমি ত ইস্কুলে যাই। রবিবার সুরেদের বাড়ী তাস খেলে। আর কাকাবাবু! কাকীমা কেমন হার্ম্মোনিয়ম বাজায়—গুন্ গুন্ করে গান করে।'

'কাজ কর্ম্ম করে কে?'

'ছিদাম দা করে। কাকীমা যে একটু অবসর পায় না।'

'তোর বাবা কি করেন?'

'কিছু করে না। বৈঠকখানায় বসে গল্প করে, ভাগবত, মহাভারত পড়ে; কালী-কীর্ত্তন গায়—'

'আর রাঁধেন—কেমন? আর তামাক টানেন?'

'তামাক বাবা ছেড়ে দিয়েছে—খায় না।'

'তামাক খান না কেন?'

'জানি না; একদিন ছিদাম দা'কে বলছিল, তামাক কিনে আন্‌তে—ছিদাম দা বলেছিল, পয়সা দিন্—বাবার হাতে পয়সা নেই কি না—তাই।'

'টাকা পয়সা কার কাছে থাকে রে?'

'কাকীমার বাক্সে।'

'মণীঅর্ডারে যে টাকা আসে, তুই জানিস্?'

'জানি না বুঝি, পিয়ন এসে দিয়ে যায়—তুমি না কি পাঠাও! বাবা সে টাকা ছিদামকে দিয়ে কাকীমার কাছে পাঠিয়ে দেয়।'

'তোর বাবা যে তামাক ছাড়্‌তে পারেন—যাক্, গয়লা দুধ দেয় সকালে না বিকালে?',

'তা ঠিক জানি না।—এখন ছেড়ে দাও কাকা বাবু।'

'হুঁ—আমাদের ত অসুখ হয় নি! অসুখ না হলে বুঝি দুধ খায়?'

'হাঁ, তাও বটে! তোর বাবাও দুধ খান না?'

'না; তাঁর না দুধ খেলে অম্বল হয়।'

'হুঁ—দুধ খেলে অম্বল হয়—চল্লিশ বছরের পর দুধ অপথ্য!'

'তোর বেলছড়া কোথায় রে?'

'আমি যদি হারিয়ে ফেলি, তাই কাকীমা তুলে রেখেছে।'

'তোর ভাল জামা, কাপড়ও বুঝি তুলে রেখেছে?'

'জামা কাপড় পূজার সময় দেবে, কাকীমা বলেছে। এই ত পূজা এল বলে'।'

'তোরা ঘুমোস্ বুঝি ঐ বড় ঘরটায়?'

'ঐ ত আমাদের বিছানা।'

'ঐ তোদের বিছানা, এই ময়লা ছেঁড়া কাঁথা—এই মলিন বালিশ—এই শত তালি দেওয়া মশারি—আচ্ছা, তোর জন্যে পূজার সময় যে টুপী, কোট পাঠিয়েছিলাম—সেগুলি—'

'কাকীমা সেগুলি তুলে রেখেছেন। দিদির ছেলে বড় হলে তাকে দেবেন। তার বদলে ঐ জামাটা আমায় হাট থেকে কিনে দিয়েছেন। জামাটা তখন তুমি দেখনি কাকা বাবু, বড় সুন্দর ছিল—যেন ঠিক কুসুম পাখিটী!'

'হুঁ—তোর মার কথা মনে আছে সুবোধ?'

'না।'

'হুঁ—ছিদাম, মুড়ি এনেছে বুঝি—চল যাই, খাইগে।'

৩

'সুবোধকে নাকি স্কুলে মাইনে দিতে হয় না দাদা?'

'তোর সেই নেপালী চাকরটাকে এবার আন্‌লি না কেন রে শিবু?—কি তার নাম ছিল?—যেমন শক্তি—তেমনি সাহস—নামটা—'

'জঙ্গ্ বাহাদুর! ঈশান—পণ্ডিত গরীব মানুষ—তাকে বরং কিছু বেশী দিতে পারলে ভাল হতো—একটা ছেলে, চার আনা মাইনে—তাও ফ্রি—' কেন?'

'তোর বাসা থেকে বুঝি হিমালয় দেখা যায়, যায় না?—বুঝি খুব সুন্দর দেখ্‌তে—নয়?'

'প্রজাদের খাজ্‌না আদায় হয় না কি?'

'হাঁ—হয় বটে—সে কথায় তোর দরকার কি ?'

'দরকার নেই ?—ছেলেটা গেল কোথা ? ওর জামা কাপড় ছিঁড়ে গেছে বুঝি—আর বড্ড ময়লা—'

'তা হবে এখন। ছেলেটা বেজায় দুরন্ত—কাপড় জামা দু'দিনেই—'

'তবুও একটা ছেলে—তাই রক্ষে !'

'আজ না শৈলকে আন্‌তে পা'ল্কী পাঠাবার কথা ছিল ? বেয়ারারা এখনো আসেনি কেন ? ছিদাম গেল কোথা ? বেয়ারাদের—'

'তারা এসেছিল। আজ মানা করে দিয়েছি। শৈলকে এখন আনা হবে না।'

'কি বল্‌ছ ?—একটীমাত্র মেয়ে—এতদিন পরে বাবাকে দেখ্‌বে—তার মন কেমন কচ্ছে না ? তোমার শ্বশুরকে চিঠি দিয়েছ ?'

'পুকুরে মাছ আছে বুঝি খুব ! তা' জেলে ডেকে একটা মাছ ধরা যাক্‌ না।'

'তুমি ত ভাই নিরামিষভোজী। এ ক'দিন আমরা নিরামিষই খাব এখন। ইন্দ্রনাথের কাছে লোক পাঠাও—সে বলে গিয়েছিল, জামাই বাবু বাড়ী এলে—'

'কাকা বাবু, কাকা বাবু, ছোট মামা এয়েছে। ঐ দেখ—কত বড় ঘোড়া—'

'যা সুবোধ, ইস্কুলের সময় হয় নি ?'

'না, না ; ও একটু থাক্‌—আচ্ছা সুবোধ, তোর মামা বাবু তোকে ভালবাসে ?'

'যা না ছোঁড়া—অত বড় ছেলে,—তবু কোলে উঠে বসেছে—যা—যা—'

'না দাদা, একটু থাক্‌ ও। সুবোধ ! তোর মামা কেমন ?—কি ? কথা কচ্ছিস্‌ নে কেন ? কি রে, চোক ছল ছল কচ্ছে কেন ?'

'এই দেখ কাকা বাবু, পিঠে——'

'হতচ্ছাড়া গাধা—ইস্কুলের সময় হলো,—স্নান কর্‌বিনি ?—যা ; ছেড়ে দে ওকে শিবু !'

'স্কুলে যা'বার এখনো ঢের দেরী আছে—এই পিঠের স্থায়ী কালশিরে দাগটী মামা বাবুর দেওয়া ? কেমন রে সুবোধ ?'

'সুবোধও বড় সোজা ছেলে নয়। আবার দেখাতে আসে ! নির্লজ্জ ! এবার ওর পৈতে হলে হয়। তুই পৈতে দিয়ে যাবি। আট বছর হয়ে গেল।'

'বটেই ত, পরের বাড়ী থাকে, পরের খায়, পরে। আবার বয়সও সাত আট বছর! বিশেষ অমন ফুট্‌ফুটে রাঙ্গা চেহারাখানি। নৈলে ঐ দাগ ত অমন অক্ষত থাকৃত না।'

'তোদের সেখানে বুঝি সবাই রুটী খায়—না শিবু? ভাত বুঝি বড় একটা কেউ খায় না?'

'না। ছিদাম! ছিদাম!—দেখ্‌ত সুবোধ, ছিদাম গেল কোথায়?'

'মামা বাবু এয়েছেন। তাঁ'র ঘোড়া নিয়ে ছিদাম দা হয় ত পুকুরপাড়ে গেছে।'

'তুই ঘোড়ায় চড়্‌বি সুবোধ?'

'না কাকা বাবু।'

'এই যে ছিদাম। কোথায় ছিলে?'

'এই মামা বাবুর ঘোড়াটা বেঁধে রেখে এলাম। আর তাঁর জলখাবারের সুজি—'

'এত বড় ঘোড়া কিন্‌লে সে কি করে'? চাকরী বাকরী নেই—লেখাপড়া নেই—অবস্থাও তেমন নয়—'

'এই ছোট মা বুঝি পঞ্চাশ—'

'ছিদাম, দেখ্‌ত ব্রজসুন্দর কাকা বাড়ী আছেন কি না? শিগ্‌গীর যা—'

'আজ্ঞে—তাঁকে কি বল্‌ব?'

'মুখে মুখে জবাব করিস্‌ নি—তুই দেখে আয়।'

৪

'শিবু হঠাৎ চলে গেল? আমায় বলে পর্য্যন্ত গেল না! অর্থ কি? তিন মাসের ছুটী নিয়ে এল,—সাত দিন না যেতেই চুপি চুপি চলে গেল?'

'আমি ত কিছু জানিনি কর্ত্তা বাবু! আমায় বল্লেন বেয়ারাদের ডাকৃতে। যাবার সময় সুবোধ ভাইয়ের হাতে কতকগুলি কাগজ দিয়ে গেছেন। মুখখানি যেন একটু ভার দেখ্‌লাম।'

'গাই কিন্‌তে আমায় হাটে পাঠানো তবে একটা ছল।'

'হাঁ কর্ত্তা, তাই সম্ভব। আপনি যাবার ঘণ্টা খানেক পরেই তিনি চলে গেছেন।'

'সুবোধকে ডেকে দে ত।'

'সুবোধ খেল্‌তে গেছে। কাগজগুলি আমার হাতে দিয়ে গেল। এই নিন্‌।'

'কি রে—এ কি—এ যে দু'শো টাকার নোট! ছিদাম! শীগ্গির বাড়ীর ভিতর গিয়ে বৌমাকে জিজ্ঞাসা করে আয় ত, শিবু হঠাৎ চলে গেল কেন?'

'তাঁকে কিছু বলে যান নি। এমন কি, তাঁর সঙ্গে তিন দিনের মধ্যে দেখাটা পর্য্যন্ত নেই।'

'কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছিস ছিদাম? বল্ না বেটা—শিবু অমন করলে কেন?'

'আজ্ঞে—তা—আমিও ত তাই ভাব্‌ছি।'

'না, না, ছিদাম, ভাব্‌বার কথা নয়। ঘোড়ায় গেলে কি মীর্জ্জাপুরে ষ্টীমার ধরা যাবে?'

'বলেন কি কর্ত্তা? ছোট বাবু এতক্ষণ ট্রেণে উঠেছেন। বেয়ারারা কখন ফিরে এসেছে!'

৫

'ডাক্তার বাবু, আর কত দূর? দেখুন ত চেয়ে, একটা সাদা উঁচু মঠ দেখা যায় কি না? মঠটা আমাদের বাড়ীর সাম্‌নে খালের ধারে।'

'হাঁ বাবু, মঠ দেখা যাচ্ছে। আপনি ব্যস্ত হবেন না। এই ত নৌকা ঘাটে পৌঁছল বলে'। একটু চুপ করে থাকুন।'

'ডাক্তার বাবু, আজ বেশ ভালই আছি। কিন্তু—'

'কিন্তু কি বাবু?'

'আমার দাদাকে খবর দেওয়াটা ভাল হয় নি—তিনি সম্ভবতঃ পাগল হয়ে গেছেন। না হয় ত মাথা মুড় খুঁড়ে মর্‌ছেন।'

'খবর আমি দিই নি। ষ্টেশনের সিগ্‌নালার আপনার গ্রামের একটী লোককে দিয়ে খবর দিয়েছেন। তিনিই নৌকা করেছেন, তিনিই আমায় পাঠিয়েছেন। এই চাকর, পথ্য, সবই তাঁর।'

'এমন মহাশয় লোকও আছেন—জান্‌তাম না।'

'তিনি আপনাকে চেনেন—রাম বাবুকেও জানেন। আর আপনি যে অবস্থায় পড়েছিলেন, তাতে সাহায্য করা মানুষমাত্রেরই উচিত।'

'সম্ভব—সকলে তা করে না—সবাই হয় ত মানুষ নয়। ডাক্তার বাবু! মঠ কত দূর?'

'মাইল খানেক হবে। চিন্তা কর্ব্বেন না। হঠাৎ ক্ষত থেকে রক্ত ছুট্‌লে অসুবিধায় পড়্‌ব।'

'বড় বেশী কেটেছে ডাক্তার বাবু?'

'না—তেমন বেশী নয়। আর, দু' দিনের ঔষধে অনেকটা সেরে উঠেছে।'

'আমার ট্রঙ্কটা, বিছানাপত্র?'

'সব এসেছে। ভাব্‌বেন না।'

'ভাব্‌ছি না—ঐ ট্রঙ্কটাই আমার দুস্‌মন্—ওটা যদি ট্রেণে আগে উঠ্‌ত, তবে কি আর আমি পা পিছ্‌লে পড়ি—'

'ট্রঙ্কটা বুঝি ছিল—প্ল্যাট্‌ফরমে?'

''হাঁ—তাতে—দশটী হাজার টাকার নোট্—আমার জীবনের—'

'যাক্—ভাব্‌বেন না।'

'দাদার সঙ্গে দেখা না করে' আসার ফল। দাদা ত নয়—সাক্ষাৎ মহাদেব।—ডাক্তার বাবু! সবারই কি অমন দাদা হয়? হয় না—'

'আপনি বড় বেশী কথা কইছেন—অনর্থক।'

'আপনি বুঝবেন না ডাক্তার বাবু;—আমি যেন দেখ্‌ছি, দাদা ঐ মঠের তলায় ধুলোয় পড়ে গড়াগড়ি দিচ্ছেন।'

'আপনি উত্তেজিত হচ্ছেন। একটু থামুন।'

'একটামাত্র ছেলে—সেও কিছু নয়—আমিই তাঁর সব। টাকা রোজ-গারের জন্যে বাড়ী থেকে যখন পালাই, শুনেছি, দাদা দু হপ্তা খান নি—বিছানায় যান নি—আমার চিঠি পেয়ে তবে একটু——'

'ভাই ত বটে!'

'ভুল কর্‌ছেন ডাক্তার বাবু; ভাই নন;—মা, বাপ, ভাই, বন্ধু, আর ভগবান্, এই পঞ্চরত্নে আমার দাদা তৈরী। চতুর্ব্বর্গের চেয়ে মূল্যবান।'

'মাঝি! এখানে নৌকা ভিড়াও। নবীন, তুমি তীরে উঠে চলে যাও। ঐ মঠের ধারে রাম বাবু বলে কাউকে পাবে বোধ হয়—'

'বোধ হয় নয় ডাক্তার বাবু—নিশ্চয়ই—'

'চুপ করুন। তুমি রাম বাবুকে বলো—তাঁর ভাই নিরাপদে আস্‌ছেন। তিনি যদি অস্থির হয়ে উঠেন—তবে ভাইয়ের অনিষ্ট হবে। আর তিনি যদি হাসিমুখে স্বচ্ছন্দে ভাইয়ের শুশ্রূষা করেন, তবেই ভাল। যদি তাঁকে ব্যস্ত দেখ,—বলো—তা হলে ইনি সম্পূর্ণ আরোগ্য না হলে, তাঁর সঙ্গে দেখা হবে না।'

'দাদা! গ্রামের সবাই এসেছেন?'

'হাঁ ভাই, সকলেই এসেছেন।'

'শৈল এসেছে?'

'হাঁ ভাই, আসবে না? মা আমার পাগলের মত ছুটে এসেছে।'

'দেবীচরণ এসেছেন?'

'হাঁ, জামাই বাবাজীও এসেছে। ইন্দ্রনাথও—'

'থাক্—স্থবোধ কোথায়?'

'ঐ ত তোমার পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে.'

'কে—স্থবোধ পায়ের কাছে? আমার বংশের দুলাল—বুকে আয় বাবা!'

'বৌমা বলে পাঠিয়ে—'

'তর্কভূষণ কাকা কোথায়?'

'এই যে বাবা আমি। আহা বাবা, তুমি কি কষ্টই পাচ্ছ—সেরে ওঠ বাবা শীগ্‌গির! আচ্ছা, ডাক্তার বাবু! ওই পটীটা খুলে একবার দেখাবেন?'

'আজ্ঞে না—ওটা এখন খোলা যায় না।'

'ডান চোখেও বুঝি খুব লেগেছিল?'

'আজ্ঞে না—তবে চোখের পাশে—'

'আর ক' দিনে সেরে যাবে?'

'হপ্তা খানেক।'

'দাদা, দেখ ত আমার চাবিটা কোথায়?'

'কাকা বাবু, চাবিটা ছিদাম দা' কাকী মা'কে দিয়েছে।'

'শিবু—চাবি কি হবে ভাই?'

'হুঁ—'

'একটু চুপ করে থাক ভাই—সবাই আশীর্ব্বাদ করছেন।'

'দেবী!—চাবিটা আন ত, আমার ট্রঙ্কটা—'

'এখানেই আছে।'

'খোল।'

'ইন্দ্রনাথ বাবু চাবি দিলেন না।'

'হুঁ—ছিদাম—বাক্সটা ভেঙ্গে ফেল্।'

'উত্তেজিত হচ্ছেন শিববাবু—ভাল করছেন না

'শিবু! ব্যস্ত হচ্ছ কেন? একটু থাক। তোমার চাবি, বাক্স কোথা যাবে? একটু শান্ত হও ভাই।'

'হুঁ—আমার কথা রাখুন তবে—বাক্সের তালা ভেঙ্গে বাক্স খুলুন। দেবী!'

'দিদি বলে দিয়েছে, আমি চাবি দিয়ে বাক্স খুলে দেব। চাবি আমার হাতে থাকবে।'

'বেশ ত। এই ত ভাই শিবু—ইন্দ্রনাথ বাক্স খুলেছে। চাবি ওর হাতেই থাক্—কি যায় আসে।'

'হুঁ—তোমাদের কর্ম্ম নয়।—দীনেশ রায় আসে নি?'

'এসেছি কাকা। কেন কাকা?'

'দীনেশ! এ বাক্সটা তোমার হেপাজতে সম্প্রতি রাখ—কেউ না ছোঁয়। পার যদি ইন্দ্রর হাত থেকে—না দরকার নেই—'

'আচ্ছা কাকা, এ বাক্স কেউ নিতে পারবে না।'

'আমি কিন্তু চাবি দিব না দীনেশ। তোমাদের কাজ হলে চাবি বন্ধ করে বাক্স দিদির ঘরে—'

'এ বাক্স আমার হাতে থাকবে—কেউ পাবে না।'

'বাবা দীনেশ, বাক্সে একটা উইল আছে, খুলে পড়।'

'শিবু! শিবু! উইল কিসের? আমি ছিঁড়ে ফেলব—আমি জলে ডুবে মরব।'

'দাদা, উইল করলেই মানুষ মরে না। তুমি ব্যস্ত হয়ো না। দীনেশ, উইলখানি পড়।'

'আমি ত কাকা বাবু উইল দেখলাম—মোটামুটী যা, তা বল্লেই ত হয়।'

'তাই বল।'

'শিব কাকা উইলে লিখেছেন—তাঁর নগদ সম্পত্তি পঁচিশ হাজার টাকা। এর মধ্যে এক হাজার পাবেন তাঁর স্ত্রী উমাসুন্দরী দেবী, এক হাজার পাবেন কন্যা শৈলবালা, এক হাজার দেবসেবায়, এক হাজার মাতা পিতার কার্য্যে, এক হাজার গ্রামের দরিদ্রদিগের শিক্ষার্থ, এবং বাকী কুড়ি হাজার টাকা পাবেন—রামচরণ চৌধুরী মহাশয়। তাঁহার বাক্সে যে পাঁচ শত টাকা ও গহনা আছে—তাহা পাইবে শ্রীমান্ সুবোধ। আর স্থাবর সম্পত্তির যে অর্দ্ধাংশে শিব বাবুর স্বত্ব—তন্মধ্যে—দূরবর্ত্তী রামপুরের চিহ্নিত ভূমির অর্দ্ধেক শৈলবালা ও অর্দ্ধেক

উমাসুন্দরী পাইবেন। খানা বাড়ী বা তৎসংলগ্ন কোনও ভূমি, বা বাটীস্থ কোনও সম্পত্তিতে রাম বাবু ও সুবোধ ব্যতীত অপরের অধিকার নাই। উমাসুন্দরী এ বাড়ীতে থাকিতে চাহিলে নির্দ্দিষ্ট গৃহ জীবিতকাল পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইবেন। হাটের ধারে নির্দ্দিষ্ট স্থান বিদ্যালয়ের জন্য প্রদত্ত হইল।'

'দেবীচরণ, উইলে নাম সই কর। তুমি শিক্ষিত, তুমি বহু সম্পত্তির মালিক—শ্বশুরের সম্পত্তির ভরসা করা তোমার উচিত নয়।'

'আমার স্ত্রীকে যে এক হাজার টাকা দিয়েছেন, সেই টাকা আমি আপনার বিদ্যালয়ে দিলাম। আমি নিজে ঐ টাকা আমার স্ত্রীকে দিব।'

'আপনারা সকলে স্বাক্ষর করুন। দাদা কৈ?'

'তিনি ঠাকুরঘরের দুয়ারে ধূলোয় পড়ে কাঁদ্‌ছেন।'

'পাগল!—দাদাকে ডাক।'

'দেবী, এ উইল আমি পুড়িয়ে ফেল্‌ব—ওটা কিছু হয় নি। এ সব ঐ বুড়ো শকুনের ফন্দী—'

'কে ইন্দ্রনাথ?—বেরোও—বেরোও আমার বাড়ী থেকে। উঃ, আমার বাড়ী এসে আমার দুধের ছেলে সুবোধের গায়ে বেত মেরেছিলে—'

'চুপ করুন—শিব বাবু—বড় উত্তেজিত হয়েছেন—'

'সর ডাক্তার—আমার বুকের মধ্যে রক্ত টগ্‌বগ্‌ ক'রে ফুট্‌ছে। ইন্দ্রনাথ! আমার সুবোধের পিঠে তোমার বেত্রাঘাত—তাই ক্ষমা করেছি! আমি—সেই চের—সম্পত্তি আমার—দীনেশ—!'

'আপনারা সরে যান্‌—মাথার ক্ষতমুখে প্রবল রক্ত ছুট্‌ছে—হায় হায়—সর্ব্বনাশ!—আর বুঝি—শিব বাবু!—শিব!—'

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

খাস-মুন্সীর নক্সা।

অষ্টম অধ্যায়।—হঠাৎ অবস্থা-পরিবর্ত্তন।

পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এবং এখনও বলিতেছি, আমার চিত্ত এখানে কোনও মতেই স্থির হইতেছে না। যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই এ স্থল ত্যাগের জন্য আমার উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বিশেষতঃ, দলাদলি, শত্রুতা,

পরস্পর হিংসা, দ্বেষ, কুৎসা, 'বিষকুম্ভং পয়োমুখং'দিগের ব্যবহারে অত্যন্তই উত্যক্ত হইয়া উঠিলাম। তাহার উপর সারাদিন 'জনাব জনাবে'র জ্বালায় আরও বুদ্ধিবিপর্য্যয় ঘটিতে লাগিল। এমন একটী লোক নাই, যাহার সহিত প্রাণ খুলিয়া দুই দণ্ড মনের কথা কহি। ইস্কুলের কার্য্য করিয়া সমস্ত দিন একা বাটীতে পড়িয়া থাকি। সময় আর কাটে না। নানারূপ পুস্তকাদি-পাঠে সময় কাটাইবার চেষ্টা করি। মধ্যে মধ্যে ডাক্তার মহাশয় সৌজন্য প্রকাশ করিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। সেই সূত্রে খানিক মন খোলসা করিয়া লই। আবার তিনি মধ্যে মধ্যে আমাকে সঙ্গে করিয়া জ্যেষ্ঠ পণ্ডিতজীর কাছে লইয়া গিয়া থাকেন। ইতিমধ্যে একবার পুনরায় সাহেব আসিলেই তাঁহার সহিত কনিষ্ঠ ভ্রাতা উকীল মহোদয়ও আসিলেন। তাঁহার সহিত আমার এই প্রথম সাক্ষাৎ হইল। তিনিও আমার সহিত বেশ যত্নের সহিত আলাপ পরিচয় করিলেন। দেখিলাম, লোকটী বেশ বুদ্ধিমান্; প্রকৃতি ধীর, গম্ভীর। কথা যাহা কহেন, তাহা যেন বেশ ওজন করিয়া বলেন। তখন তাঁহাকে দেখিয়া আমার বেশ শ্রদ্ধা হইল। যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন, আমার সহিত তাঁহার সহৃদয়তা ছিল। তবে শেষাবস্থায় যেন একটু আত্মগরিমা হইয়াছিল; কিন্তু তখন আমাদের রাজ্যের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ একবারে বিচ্ছিন্ন।

ডাক্তার মহাশয় প্রায় সকল উচ্চপদবীস্থ লোকের সহিত আমার আলাপ পরিচয় করাইয়া দিয়াছেন। আমলা অথবা 'সরদারী' শ্রেণীস্থ কোনও লোকের সহিত পরিচিত হইবার আর বাকী নাই। তবে একটা মস্ত বকেয়া পড়িয়া আছে। এখন প্রায় জুলাই মাসের শেষ। কিন্তু এ পর্য্যন্ত বৃদ্ধ মহারাজের একবারও দর্শনলাভ হয় নাই। পণ্ডিতজী ডাক্তার বাবুকে তজ্জন্য দুই এক বার বলিয়াছিলেন যে, বাবুকে একবার মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া আন। তাহাতে ডাক্তার মহাশয় বলেন অতি শীঘ্রই যাইব। তবে আমাকে আবার সেই পগ্‌গধারী হইয়া ধড়া চূড়া বেশ ধারণ পূর্ব্বক যাইতে হইবে ভাবিয়া আমি আর তাঁহাকে ততটা উত্যক্ত করি নাই। যাচ্ছি, যাইব, এরূপ দীর্ঘসূত্রতায় জুলাই মাসটা কাটিয়া গেল। অগষ্ট মাসের প্রারম্ভে শুনিলাম, মহারাজের অসুখ হইয়াছে। 'মহারাজের অসুখ' আবার এ কথা এখানে বলিবার যো নাই; বলিতে হয়, 'মহারাজের শত্রু পীড়িত'—'হুজুরকা দুসমন বিমার হ্যায়।' যাহা হউক, তাঁহার শত্রুই পীড়িত হউক, বা তিনিই হউন, পীড়িত বটে। তদন্ত করিয়া জানিলাম, তাঁহার ব্রণ রোগ হইয়াছে। মনে মনে

বুঝিলাম, ব্যাপারটা কিছু কঠিন। আমার নৃপতির সহিত দেখা সাক্ষাতের কল্পনা জল্পনা আপাততঃ স্থগিত রহিল।

আমার বন্ধু ডাক্তার বাবু মিউনিসিপালিটী লইয়া তদ্গতচিত্ত। চিকিৎসালয় বা চিকিৎসার সহিত তাঁহার কোনও সম্পর্কই নাই। তিনি সহর পরিষ্কারের ভারে অবনত। এখানকার সদর-চিকিৎসালয়ের জন্য এক জন অন্য ডাক্তার আছেন, হস্পিট্যাল-এসিষ্টাণ্ট শ্রেণীর। বিদ্যাবুদ্ধি তাঁহার তথৈবচ। ক্রমশঃ জানিতে পারিলাম যে, তিনি কোনও মেডিক্যাল ইস্কুলের পাস করাও নহেন। আমি যখন এখানে আসি, তাঁহার বয়স তখন চল্লিশের উপর। পুরাকালে তিনি কোনও সিভিলসার্জ্জনের অধীনে কম্পাউণ্ডার ছিলেন। তৎপরে সাহেব বাহাদুর কৃপাপরতন্ত্র হইয়া তাঁহাকে হস্পিটাল-এসিষ্টাণ্ট করিয়া মানবসমাজভুক্ত করিয়া দেন। তদবধি তিনি ডাক্তার হইয়া এই ব্যবসায় দিব্য চালাইতেছেন, এবং কত রোগীকে যে রোগের যন্ত্রণা ও সাংসারিক যন্ত্রণা হইতে চিরকালের জন্য মুক্ত করিয়া পুণ্যধামে পাঠাইয়াছেন, তাহার সংখ্যা করা আমার সাধ্য নহে।

এই ভিষক্‌চূড়ামণি মহারাজের চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইলেন। এজেণ্ট সাহেব বাহাদুরের ইতিমধ্যে বদলী হইয়া যায়। অন্য এক সাহেব আসিয়াছেন, কিন্তু এখনও তাঁহার দর্শনলাভ হয় নাই। মহারাজের পীড়ার কোনও উপশম নাই; ক্রমশঃ বৃদ্ধিই শুনিতে পাই। মনে মনে বুঝিলাম, লক্ষণ ভাল নহে। পাদস্ফোট, পৃষ্ঠব্রণজাতীয় ফোড়া। সুতরাং রক্ষা পাওয়া কঠিন। ভিষক্‌চূড়ামণি একবার অস্ত্র চালাইলেন। চতুর্দ্দিকে মহা কোলাহল পড়িয়া গেল। ডাক্তারেই বুঝি অস্ত্র চালাইয়া নৃপতিকে সারিয়া দেয়। মধ্যে কিছু উপশমের উপক্রম হইল; কিন্তু তাহা সাময়িক। ক্রমে ভিতরে ঘা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পুনরায় অস্ত্র না করিলে চলে না। ভিষক্‌চূড়ামণি এবার আর অস্ত্র করিতে আগুয়ান হইতেছেন না। বলিয়া বসিলেন, আমি আর পারিব না; আমার হাত কাঁপে। যুবরাজ দিবারাত্র পিতৃসেবায় রত। ভক্তি ও শ্রদ্ধার একশেষ দর্শাইতে লাগিলেন। ভিষক্‌চূড়ামণি যখন পুনরায় অস্ত্র চালাইতে কোনও মতেই সম্মত হইলেন না, তখন যুবরাজ আমার বন্ধু ডাক্তারকে অস্ত্র করিতে অনুরোধ করেন। ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইনি কলিকাতার এক জন পাসকরা ডাক্তার, এবং যথেষ্ট বুদ্ধিমান্ ও বিবেচক। অগত্যা ইহাঁকেই অনুরোধ রক্ষা করিতে হইল। পুনরায় অস্ত্র করা হইল। কিন্তু পূঁয ও শোণিত তদবধি এত নির্গত হইতে লাগিল যে, বৃদ্ধ মহারাজ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া পড়িতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে জ্বর দেখা

দিল। ইতিমধ্যে নৃপতির জন্মদিন আসিয়া উপস্থিত। পূর্ব্বে ভাবিয়াছিলাম অন্য সূত্রে না হউক জন্মদিনে মহারাজের দর্শন লাভ করিব। কারণ, রাজাদের জন্মদিন এক তুমুল ব্যাপার। সেইদিন অতি সমারোহের সহিত আবাল বৃদ্ধ সমস্ত ভৃত্যবর্গকে রাজসন্নিধানে গিয়া যাহার যেরূপ সামর্থ্য, 'নজর' করিতে হয়। আমি ভাবিয়াছিলাম, এই সূত্রে 'নজর' করিব, এবং রাজদর্শনও ঘটিবে। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা হইল না। জন্মতিথির দরবার স্থগিত রহিল। মহারাজ অত্যন্ত পীড়িত, এমন কি, সে দিন তিনি মধ্যে মধ্যে সংজ্ঞাহীন হইতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে দান ধ্যান হইতে লাগিল। নানারূপ জপ, তপ, গ্রহ-শান্তি ইত্যাদি হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণগণ সময় বুঝিয়া বিলক্ষণ দশ টাকা উদরস্থ করিতে ভুলিলেন না। গোদান হইতে লাগিল। নগরের রাজপথের স্থানে স্থানে গাভীদের ঘাস খাওয়াইবার ধুম পড়িয়া গেল।

মানুষ সব করিতে পারে, কিন্তু পরমায়ু দিতে পারে না। শ্রাবণ মাসে বৃদ্ধ নৃপতি মানবলীলা সংবরণ করিলেন। নগরে হাহাকার পড়িয়া গেল। সে সমস্তই লোক-দেখান হাহাকার। বাস্তবিক, আন্তরিক হাহাকার মহারাণীর এবং মৃত মহারাজের শারীরিক সেবায় নিযুক্ত ভৃত্যবর্গের। পতিপ্রাণা মহারাণী পতিহীনা হইলেন। বিষম বৈধব্যযন্ত্রণায় ব্যাকুল, সুতরাং হাহাকার করিবারই কথা। আর রাজার মৃত্যুতে এই দুঃখী ভৃত্যদের অন্ন মারা গেল ; তজ্জন্য সে বেচারীরা আকাশ ফাটাইয়া রোদন করিতে লাগিল। বাস্তবিক তাহাদের দুঃখে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। রাজার মৃত্যুতে এ রাজ্যস্থ ইস্কুল, কাছারী, রাজকার্য্য, সমস্ত তিন দিবসের জন্য বন্ধ হইল। এমন কি, সহরে ঘড়ী ঘণ্টা বাদন পর্য্যন্ত বন্ধ। আমিও নিয়মানুসারে তিন দিবসের জন্য বিদ্যালয় বন্ধ করিলাম। সকলেরই মুখে শোকের চিহ্ন। আবার সেই সঙ্গে সঙ্গে আমার বন্ধু ডাক্তারটীর উপর অজস্র গালিবর্ষণ আরম্ভ হইল। কেহ বলে, যুবরাজের লোক, তাই সে রাজাকে মারিয়া ফেলিল। কেহ বলে, অস্ত্রের সহিত কোনরূপ বিষাক্ত পদার্থ মিশ্রিত করিয়া দিয়াছিল ; তজ্জন্য রাজার মৃত্যু ঘটিল। কেহ বলে, বিদেশীয়ের হস্তে এরূপ চিকিৎসার ভারটা দেওয়া ভাল হয় নাই। ইত্যাদি যাহার মুখে যাহা আসিতে লাগিল, সে তদনুরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিল। আমি এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া স্তম্ভিত।

এ প্রদেশের লোকের বদ্ধমূল বিশ্বাস এই যে, নৃপতিদের স্বাভাবিক মৃত্যু হয় না। এ ক্ষেত্রে তাহাই ঘটিল। দশ জনে মিলিয়া স্বাভাবিককে অস্বাভাবিক

করিয়া তুলিল। ডাক্তার বেচারী রোষে, ক্ষোভে ও লজ্জায় অবনতমস্তক। এ দেশবাসীদের চরিত্রে দ্বেষ, হিংসা, পরনিন্দা ও মিথ্যাকথা কিছু বেশী দেখিতেছি। দুই চারি মাস বাস করিয়াই উল্লিখিত দোষগুলি জনসাধারণের মধ্যে বিশেষভাবে দেখিলাম।

রাজার মৃত্যু উপলক্ষে একটী নবীন ও আশ্চর্য্য প্রথা দেখিতে পাইলাম। এখানে জনসাধারণের শবদাহ তিন দিবস ধরিয়া হইয়া থাকে। শ্মশানভূমিতে শব লইয়া গিয়া চিতা সাজাইয়া মুখাগ্নিক্রিয়া সুসম্পন্ন করিয়া সমবেত ব্যক্তিমণ্ডলী চিতায় অগ্নিদান করেন; তৎপরে চিতা বিলক্ষণ জ্বলিয়া উঠিলে সকলে স্নান করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন। তিন দিবস পর্য্যন্ত চিতা জ্বলিতে থাকে। তৃতীয় দিবসে মৃতের আত্মীয়বর্গ শ্মশানভূমিতে গমন করিয়া চিতা নির্ব্বাপিত করেন, এবং অস্থিসংগ্রহ করিয়া পুণ্যতোয়া জাহ্নবীর প্রবাহে অর্পণার্থ গৃহে লইয়া আসেন। তৎপরে সুবিধামত গঙ্গার জলে সমর্পণ করা হয়। নরপতির মৃত্যুতে কেবল এইমাত্র তফাৎ দেখিলাম যে, রাজপুরোহিত মস্তক মুণ্ডন করিয়া তৃতীয় দিবসেই গঙ্গায় অস্থিসমর্পণার্থ যাত্রা করিলেন। এই ক্রিয়াসমূহকে এতদঞ্চলে 'তিজা' বলে। আমার বোধ হয়, গঙ্গাহীন দেশ বলিয়া এবং এ প্রদেশে বৃহৎ নদী না থাকায়, তিন দিবস পর্য্যন্ত মৃতদেহ দাহ করা হয়। যাহাতে শবের দেহের কোনও অংশ অদগ্ধ থাকিয়া না যায়। বড় নদী থাকিলে সম্পূর্ণরূপে দেহ ভস্মীভূত না হইলেও বিশেষ কোনও ক্ষতি হয় না। কিন্তু যে সকল স্থলে ক্ষুদ্র নদী, তথায় সম্পূর্ণ ভস্মীভূত না হওয়া বিশেষ ভয়ের কারণ। যাহা হউক, বৃদ্ধ নরপতির 'তিজা'ও হইয়া গেল। Dust thou art to dust returnest। মাটীর শরীর মাটীতে মিশিয়া গেল।

সৃষ্টির দিন অবধি এই বিশ্ব সংসারে কত লোকই মরিয়াছে, এবং মরিতেছে। যে যায়, সে আর ফেরে না। সেই স্থির নিবাসে গমন করিলে পুনরাগমন কোথায়? কিন্তু তাহাতে সংসারের ত কোনও ক্ষতি বৃদ্ধিই দেখিতেছি না।' এ পৃথিবীতে সুখ দুঃখেরও কোনও হ্রাস বৃদ্ধি দেখিতে পাই না। দুই দিন পূর্ব্বে যখন নরপতি বাঁচিয়া ছিলেন, তখনও যেমন এ সংসার চলিয়াছে, আজ তাঁহার 'তিজা' হইয়া গেল, তাঁহার শরীরের অস্থিচূর্ণগুলি পর্য্যন্ত এখান হইতে লইয়া গেল। কিন্তু রাজসংসার আজও সেইরূপ চলিতেছে। এরই জন্য মহারাজ প্রলুব্ধ ও স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া এত কলঙ্করাশি মাথায় করিয়াছিলেন। আজ তাঁহার 'খাস বিভাগ'ই বা কোথায় রহিল, এবং সেই পর-

পীড়নোপার্জ্জিত প্রভূত অর্থরাশিই বা কোথায় রহিল? রহিয়া গেল কেবল অপযশটুকু।

যুবরাজ এখন মহারাজা। যদিও রাজগদীতে এখনও সমাসীন হয়েন নাই, তথাপি বৃদ্ধ রাজার প্রাণবায়ু যে মুহূর্ত্তে বাহির হইয়াছে, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই তিনি রাজা। চতুর্থ দিবসে একবার ভাবিলাম, তাঁহাকে রাজবাটীতে দেখিয়া আসি। বেলা চারিটার সময় মস্তকে 'পগ্‌গ' বাঁধিয়া চিরাশ্রিত ডাক্তার মহাশয়ের সহিত রাজবাটীতে গেলাম। এই আমার প্রথম রাজবাটী-দর্শন। তথায় গিয়া দেখিলাম, নবীন মহারাজ ভূমিতে একটা হাল্কা গদী পাতিয়া বসিয়া আছেন। গরুড় পুরাণ পাঠ হইতেছে। চতুর্দ্দিকে লোকারণ্য। কিন্তু নবীন মহারাজের বদনমণ্ডলে বিশেষ কোনও শোকের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইল না। তবে 'লোক দেখান' একটা গম্ভীর আকৃতি সমাজের খাতিরে না দেখাইলে চলে কই? শুনিয়াছি, কোনও কোনও রাজ্যে রাজাদের মৃত্যু হইলে উত্তরাধিকারী তৎক্ষণাৎ সিংহাসনে আরোহণ করেন। সেখানে অশৌচ মানিবারও ব্যবস্থা নাই। এক দিকে নবীন মহারাজ সিংহাসনে বসেন; অপর দিকে চোপদার রাজবাটীর বৃহৎ তোরণদ্বারে আসিয়া চীৎকার করিয়া বলে, 'রাজবাটীতে একটা বৃহৎ মত্ত হস্তী পতিত হইয়াছে; তাহাকে সরাইবার ব্যবস্থা কর।' পাঠকগণ দেখিলেন, কেমন সুন্দর ব্যবস্থা! এ ক্ষেত্রে আমাদের নবীন মহারাজ যে 'লোক দেখান' শোকের জন্য একটু গাম্ভীর্য্য ধারণ করিয়াছেন, তাহাতে নিন্দার কোনও কথা দেখিতে পাই না। বড় হইলে অনেক বিষয়ে কৃত্রিমত্ব চালাইতে হয়। সংসারের এই নিয়ম।

দেখিতে দেখিতে দশ দিন কাটিয়া গেল। একাদশ দিবসে শ্রাদ্ধাদি হইল। পাঠকগণ ভাবিতেছেন, এ সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ড মহারাজই করিলেন। বাস্তবিক তাহা নহে। এ সমস্তই কুলপুরোহিতের কার্য্য। ইতিমধ্যে আমার একটু অবস্থা-পরিবর্ত্তন ঘটিল। তাহার আভাস এইখানেই দিয়া রাখি। যখন বৃদ্ধ মহারাজের মৃত্যু হয়, তখন এজেণ্ট সাহেব এখানে ছিলেন না। মেম্বর মহাশয়েরা তারযোগে সংবাদ দিলেন। তাহার লেখা পড়া আমার ঘাড়েই পড়িল। নবীন মহারাজের আলাপী ও পরিচিত যে সকল ইংরাজ ছিলেন, তাঁহাদের এবং বড় সাহেবকে, কাহাকেও বা তারে, কাহাকেও বা পত্রাদি দ্বারা শোকসংবাদ জানান হইল। এ সমস্ত কার্য্য আমাকেই করিতে হইল। সুতরাং দেখিলাম, এখন হইতে মাষ্টারী কার্য্য ব্যতীত আমার উপর মহারাজের খাস-মুন্সীর কার্য্যও অতি মন্দগতিতে আসিতে লাগিল।

বৃদ্ধ মহারাজের মৃত্যুর তিন চারি দিবস পরে এজেন্ট সাহেব আসিলেন। আসিবার দুই এক দিবস পরে আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। লোকটা একটু কেমন কেমন বোধ হইল। আমাকে দেখিয়াই 'What are you Babu ?' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। আমি আত্মপরিচয় দিলাম, এবং অল্প দিন হইল এখানে আসিয়াছি, বলিলাম। সাহেব ইস্কুলের নানা কথার পর আমায় হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন, 'তোমার মতে এ রাজ্যের রাজগদী এখন কাহার পাওয়া উচিত ?' আমি প্রশ্ন শুনিয়া একটু বিস্মিত হইলাম। আমি পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিয়াছি, স্বল্প কাল হইল এখানে আসিয়াছি। তাহা জানিয়াও এই প্রশ্ন! উত্তর দিলাম, এখানকার লোকপ্রমুখাৎ যেরূপ শুনিয়াছি, তাহাতে অমুক 'যুবরাজে'র প্রাপ্য। তিনি আর কোনও উত্তর দিলেন না। তৎপরে আমি চলিয়া আসি।

গবর্মেণ্ট হইতে এখনও সিংহাসনারোহণের সনন্দ আসে নাই। মহারাজ প্রকাশ্যে গদীতে বসিতে অক্ষম। সুতরাং একাদশ দিবসে দিন ও মুহূর্ত্ত শুভ ছিল বলিয়া শুভক্ষণে গোপন ভাবে একটী ক্ষুদ্র রাজগদী পাতিয়া তাঁহাকে বসাইয়া দেওয়া হইল। রাজ্যস্থ সকলে সনন্দের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

আজ দ্বাদশ দিবস। লোকজন খাওয়ান হইবে। এ দেশে এরূপ বৃহৎ কার্য্যে লোক খাওয়ান অদ্ভুত প্রকারে সম্পন্ন হইয়া থাকে। ভোজন করাইবার দ্রব্য একই প্রকারের হইয়া থাকে। আজ পাঁচ দিন হইতে ক্রমাগত মতিচুরের বৃহৎ বৃহৎ লাড়ু প্রস্তুত করিয়া পর্ব্বতাকার করা হইয়াছে। এখানকার সের বড়। ১০০ তোলায় এক সের। এক সেরে চারিটী লাড়ু, এই হিসাব। একাদশ দিবসে রাত্রি আন্দাজ ১০টার সময় রাজসংসারের এক জন ব্রাহ্মণজাতীয় বিশিষ্ট লোক রাজপথের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া ঘোর চীৎকার রবে নগরবাসী সমস্ত লোকদের পরদিবসের বৃহৎ ব্যাপারে আহারার্থ নিমন্ত্রণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে নগরের প্রত্যেক পল্লীতে রাজপথে দাঁড়াইয়া নিমন্ত্রণ করা শেষ হইল। তাঁহার চীৎকারে মেদিনী কম্পিত। পর দিন প্রাতে আমি তামাসা দেখিবার জন্য রাজবাটীতে গমন করিলাম। উচ্চ রাজবাটীর ছাদ হইতে যে কাণ্ড দেখিলাম, তাহাতে যুগপৎ আমার বিস্ময় ও আনন্দ উৎপন্ন হইল। নগরে প্রবেশের যতগুলি তোরণদ্বার আছে, সেই সমস্ত দ্বার ও রাজপথ দিয়া পিপীলিকার সারির ন্যায় ক্রমাগত লোক আসিতেছে। জনস্রোতের আর বিরাম নাই। শুনিলাম, দশ ক্রোশ, পনের ক্রোশ অন্তর হইতেও লোক আসিতেছে। যিনি দেখিয়াছেন,

তিনিই সে জনতার ধারণা করিতে পারেন। চতুর্দ্দিকে কেবল উষ্ণীষধারী মনুষ্য-মস্তক ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। বহু দূর ব্যাপিয়া, যত দূর দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, কেবল জনসমুদ্র।

এত লোককে কি প্রকারে খাওয়ান হইবে? বসিবারই বা স্থান কোথায়? কেন? রাজপথে। লোক আসিতেছে, আর রাজপথের উভয় পার্শ্বে সারি দিয়া বসিতেছে। চারি পাঁচ স্থলে 'ভাণ্ডার' করা হইয়াছে। এক এক স্থলে একবারে দুই তিন সহস্র লোক বসিতেছে। তাহাদের পাতে চারিটি করিয়া লাড়ু এবং প্রত্যেকের হাতে একটী করিয়া সিকি দেওয়া হইতেছে, অমনই সকলে প্রস্থান করিতেছে! এইরূপে বেলা তৃতীয় প্রহরের মধ্যে ত্রিশ চল্লিশ সহস্র লোক খাওয়ান, অথবা প্রকৃতপক্ষে লাড়ু-বিতরণ শেষ হইয়া গেল।

এই সমারোহ ব্যাপারের দুই তিন দিবস পরে গদী-প্রাপ্তির সনন্দ আসিল। রাজবাটীতে আজ গদী পাইবার মহা সভা। রাজবাটী লোকে লোকারণ্য। রাজবাটীর বৃহৎ ফটক উত্তীর্ণ হইয়া অতিবিস্তৃত অঙ্গনে দুই সারি অশ্বারোহী ও দ্বিতীয় অঙ্গনে পদাতিক সকল দণ্ডায়মান। তৎপরে সভামন্দির। তথায় রাজকর্ম্মচারী ও সর্দ্দারগণ উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া পদমর্য্যাদানুসারে দুই সারি বসিয়া আছেন। এই সারের শেষভাগে বৃহৎ একটী 'কারচুপী'র কাজকরা মখমলের গদী। তাহার উপর সুদৃশ্য ও বহুমূল্য চন্দ্রাতপ। গদীর পার্শ্বে এজেণ্ট মহোদয়ের বসিবার আসন। পশ্চাতে 'চামর' ইত্যাদি ব্যজন করিবার স্থল। বেলা ১০টা অথবা ১১টার সময় এজেণ্ট সাহেব সনন্দ লইয়া আগমন করিলেন। তিনি আজ uniform পরিয়া আসিয়াছেন। নবীন মহারাজের আজ একটু নূতন ধরণের পরিচ্ছদ। পায়জামা পরিধান করিয়া উপরি-অঙ্গে এক চাপকান আঁটিয়াছেন। চাপকানের উপরিভাগ যেমন সচরাচর হইয়া থাকে, তদ্রূপ। কিন্তু কটীদেশের কিঞ্চিৎ উপরিভাগ হইতে পদদ্বয় পর্য্যন্ত দুই পার্শ্বে এরূপ ভাবে 'চুনট' করা হইয়াছে যে, ঠিক 'ঘাগরা'র মত দেখাইতেছে। রাজপুতদের বাদশাহী আমলের এই পুরাতন দরবারী বেশ। মস্তকে উষ্ণীষ। ললাটদেশে উষ্ণীষে বাঁধা একটী বহুমূল্য হীরকজড়িত শিরপেঁচ।

এজেণ্ট সাহেব আসিতেই মহারাজ তাঁহার প্রত্যুদ্গমনার্থ অগ্রসর হইলেন। এজেণ্ট সাহেব তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিয়া বরাবর গদী পর্য্যন্ত আসিলেন। তথায় আসিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন, এবং প্রথমে ইংরেজীতে স্বয়ং সনন্দ পাঠ করিলেন; তৎপরে মীরমুন্সীকে ইঙ্গিত করায় তিনি সনন্দের অনুবাদ

পাঠ করিয়া সকলকে শুনাইলেন। পাঠশেষে এজেণ্ট সাহেব মহারাজের দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিয়া তাঁহাকে গদীতে বসাইয়া দিলেন। অমনই চোপদার নবীন মহারাজের নাম লইয়া ফুকরাইয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ ঘোর রবে কামানের সেলামী হইতে লাগিল। মহারাজ পৈত্রিক রাজ্য-প্রাপ্তির সনন্দের জন্য গবমেণ্টকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিলেন, এবং এজেণ্ট সাহেবকেও নিজ কৃতজ্ঞতা জানাইলেন। এইরূপ কিছু কাল শিষ্টাচারের পর সভাভঙ্গ হইল। এ এ সভাভঙ্গটি সাহেবের। তৎক্ষণাৎ পুনরায় দ্বিতীয় সভা করিয়া রাজকর্ম্মচারী ও সর্দ্দারদের শুভ দিনে নবীন মহারাজকে 'নজর' দেওয়া আরম্ভ হইল। মহারাজ অন্য কৌন্‌সিলের দুই তিন জন মেম্বরকে প্রকাশ্য রাজসভায় খেলাৎ দিয়া তাঁহাদের সম্মানবৃদ্ধি করিলেন। তৎপরে শেষ সভাভঙ্গ হইল।

'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ !'

বহু দিন আমরা বহির্জগতের কর্ম্মক্ষেত্রে বড় কাজ করিবার অবকাশ পাই নাই। আবার, ভারতের বাহিরে যাহাকে বড় কাজ বলে, ভারতবর্ষে কর্ম্মের লক্ষণ সেরূপ ছিল না।

প্রত্যেক জাতির এক একটা বিভিন্ন আদর্শ থাকে। বহু যুগ ধরিয়া নানা ভাবে, নানা পথে জাতির সেই আদর্শ পরিণতি লাভ করে। প্রাচীন গ্রীসের আদর্শ ছিল সৌন্দর্য্য-সাধনা। তাহা বহিঃপ্রকৃতির অনুশীলনের ফল। ভারতের আদর্শ ছিল আত্মদর্শন। তাহা অন্তঃপ্রকৃতির বিশ্লেষণের ফল।

বিভিন্ন আদর্শের অনুসারী এই দুই দেশের বর্ত্তমান দেখ। প্রাচীন গ্রীসের ধর্ম্ম এখন ইতিহাসের বস্তু। প্রাচীন ভারতের ধর্ম্ম এখনও আসমুদ্রহিমাচল ভারত শাসন করিতেছে। ভারতের ঋষিদের চিন্তাধারা এখনও জগৎকে প্রভাবিত করিতেছে।

অন্তঃপ্রকৃতির বিশ্লেষণ ও আত্মদর্শন যাহাদের আদর্শ, তাহাদের মতে যাহা বড় কাজ, বহিঃপ্রকৃতির উপাসক জাতিরা তাহাকে বড় কাজ বলিবে না।

কর্ম্মের আদর্শে প্রভেদ আছে। কর্ম্মের অবকাশও দেশভেদে বিভিন্ন। অন্য দেশে জাতি যে কর্ম্মের অবকাশ পাইয়াছে, আমরা বহু দিন সে কর্ম্মের অবকাশ পাই নাই। এই কর্ম্মরাহিত্যের ফলে আমাদের মধ্যে জড়তার আবির্ভাব হইয়াছে। আমাদের মধ্যে যাঁহারা বড়, তাঁহারা অন্তঃপ্রকৃতির বিশ্লেষণে, আত্মানুসন্ধানে, আত্মদর্শনে বড় হইয়াছেন। এই শ্রেণীর বড়কেই আমরা বড় বলি। ইহাই আমাদের আদর্শ।

যাহার আদর্শ উচ্চ, এবং যাহাকে সাধনার বহু ক্রম অতিক্রম করিয়া উচ্চ আদর্শের সন্নিহিত হইতে হয়, নিম্নস্তরের সাধনা তাহার পক্ষে অসাধ্য নয়। যে বহিঃপ্রকৃতির প্রভাবকে বিজয় করিতে পারে, অধ্যাত্ম-রাজ্যের বাহিরে যাহাকে বড় কাজ বলে, তাহাও সে অনায়াসে করিতে পারে। যে কেউটে ধরিতে পারে, তাহাকে নূতন করিয়া হেলে ধরিতে শিখিতে হয় না।

কিন্তু আমরা বহুদিন বিপথে চলিয়া দিশাহারা—লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছি; তাই এই সত্য ভুলিয়া গিয়াছি। কর্ম্মেই আমাদের প্রবৃত্তি নাই। আমরা গতানুগতিক, চেষ্টারহিত ও উদ্যমশূন্য হইয়াছি। জগতে আসি, চলিয়া যাই। যত দিন সম্ভব, দুর্ব্বহ জীবন বহন করি। বিশ্বের সর্ব্বত্র বহিঃপ্রকৃতির সাধকগণের বহির্মুখ কর্ম্মের লীলা দেখি। আর মনে মনে ভাবি, আমাদের পথ স্বতন্ত্র। ও পথ আমাদের অগম্য।

আত্মবিস্মৃত হইয়াই আমাদের এই সর্ব্বনাশ হইয়াছে। আপনার ধর্ম্ম, আপনার কর্ম্ম, আপনার তন্ত্র, আপনার আদর্শ না ভুলিলে, আমাদের এমন দুর্দ্দশা হইত না। এই জন্যই আমাদের মনে ধারণা হইয়া গিয়াছে, জগতে আমরা 'অকেজো' হইয়াই আসিয়াছি!

এই জন্য কোনও কাজেই আমাদের প্রবৃত্তি নাই। ভাবিতে পারি, কিন্তু ভাবনাকে কাজে পরিণত করিতে পারি না। ব্রাহ্মণের আদর্শ, ক্ষত্রিয়ের আদর্শ, বৈশ্যের আদর্শ বর্ণ-চিত্রে আঁকিতে পারি; কিন্তু কোনও আদর্শেরই অনুসরণ করিতে পারি না। সত্ত্বগুণের বড়াই করি, কিন্তু তমোগুণেই মগ্ন থাকি।

আমাদের মধ্যে যাঁহারা তমের প্রভাব অতিক্রম করিয়া সত্ত্বে উপনীত হইয়া, সত্ত্বের প্রেরণায় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদের কর্ম্মের মহিমাও আমরা ধারণা করিতে পারি না।

গীতা ইহাকেই 'ক্লৈব্য' বলিয়াছেন। এই ক্লৈব্যে আমরা অবসন্ন হইয়াছি। তাই কর্ম্মক্ষেত্রে আমাদের দাঁড়াইবারও ভরসা হয় না। তাই সর্ব্বদাই শুনিতে পাই,—'পারিব না', 'আমাদের কর্ম্ম নয়', 'যার কর্ম্ম তারে সাজে, অন্য লোকে লাঠী বাজে!'

এই অধ্যারোপে আমাদের কর্ম্মশক্তির অপচয় হইতেছে। তাই আমাদের রজ্জুতে সর্প-ভ্রম হয়। সাধ্য কর্ম্মকে অসাধ্য বলিয়া মনে করি। তাই আমরা আপনাদিগকে 'অকেজো' ও 'কাজের বাহির' মনে করিতে করিতে ক্রমে ক্লীব হইয়াছি।

অর্জ্জুন যখন কুরুক্ষেত্রে জ্ঞাতিবধশঙ্কায় মুহ্যমান হইয়া কর্ম্ম-পরিত্যাগে উদ্যত হইয়াছিলেন, তখন ভগবান তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,—'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ!' সমগ্র ভারতের মুহ্যমান চাতুর্ব্বর্ণ্য-সমাজকেও আজ গীতার সেই মহামন্ত্র শুনাও।

ভগবান অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন,—'নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে।' 'তোমায় ইহা সাজে না।' মহাপুরুষ বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন,—'এই একটি শ্লোক পড়িলেই সমগ্র গীতাপাঠের ফল পাওয়া যায়; কারণ, এই শ্লোকের মধ্যেই গীতার সমগ্র ভাব নিহিত।'

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়া গিয়াছেন,—'তুমি সেই আত্মা, তুমি আপনাকে ভুলিয়া আপনাকে পাপী, রোগী, শোকী করিয়া তুলিয়াছ—এ ভাব তোমায় সাজে না। তাই ভগবান বলিতেছেন,—"ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ।" জগতে পাপ তাপ নাই, রোগ শোক নাই; যদি কিছু পাপ জগতে থাকে, তাহা এই "ভয়"। যে কোনও কার্য্য তোমার ভিতরে শক্তির উদ্রেক করিয়া দেয়, তাহাই "পুণ্য"। আর যাহা তোমার শরীর মনকে দুর্ব্বল করে, তাহাই "পাপ"। এই দুর্ব্বলতা পরিত্যাগ কর; "ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ"। তুমি বীর, তোমায় এ সাজে না। তোমরা যদি জগৎকে এ কথা শুনাইতে পার—"ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ, নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে", তাহা হইলে তিন দিনের ভিতর এ সকল রোগ শোক, পাপ, তাপ কোথায় চলিয়া যাইবে। এখানকার

বায়ুতে ভয়ের কম্পন বহিতেছে। এ কম্পন উল্‌টাইয়া দাও। তুমি সর্ব্বশক্তিমান্,—যাও, তোপের মুখে যাও, ভয় করিও না। মহাপাপীকে ঘৃণা করিও না, তাঁহার বাহির দিকে দেখিও না। ভিতরের দিকে যে পরমাত্মা রহিয়াছেন, সেই দিকে দৃষ্টিপাত কর—সমগ্র জগৎকে বল, তোমাতে পাপ নাই, তাপ নাই, তুমি মহাশক্তির আধার।'

কবে স্বামীজীর মুখে এই অভয়-বাণী উচ্চারিত হইয়াছিল! আজ মনে হইতেছে, মনীষী মহাপুরুষ যেন স্বর্গ হইতে প্রতীচ্য কুরুক্ষেত্রের যাত্রী বাঙ্গালী যুবকদিগকে ক্ষাত্র-ধর্ম্মের সাধনায় প্রেরণা দান করিতেছেন!

যে 'তোপের মুখে যাও' কয় বৎসর পূর্ব্বে কথার কথা, বাক্যের অলঙ্কার ছিল, তাহা আজ সত্যে পরিণত হইল! মহাপুরুষের বাণী ব্যর্থ হয় না, মিথ্যা হয় না। দেড় শত বৎসরের পর বাঙ্গালী বুঝিল,—'আমাতে ইহা সাজে না'। তাই তাহার জীবনে গীতার সত্য সফল হইল। তাই বাঙ্গালী সদাশয় সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের জন্য, সাম্রাজ্যের জন্য, ভারতের জন্য, আপনাকে সার্থক করিবার জন্য, তোপের মুখে চলিয়াছে। যদি চক্ষু থাকে, মীনের মত নির্নিমেষ হইয়া দেখ, ধ্রুবলোক হইতে স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেছেন,—

'তুমি সর্ব্বশক্তিমান্,—যাও;—তোপের মুখে যাও, ভয় করিও না।'

ভয় করিলে বাঙ্গালী অর্জ্জুনের মত ক্লৈব্য ত্যাগ করিতে পারিত না। দেড় শত বৎসরের অনভ্যাসের পর রণচামুণ্ডার পূজার জন্য জীবন-পদ্ম উপহার লইয়া রণক্ষেত্রে যাত্রা করিতে পারিত না। অভয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়া অগ্রসর হইলে ভরসা আসে; কর্ম্মের গহন পথও সহজ হইয়া যায়। শাস্ত্রের এই উপদেশ যে মিথ্যা নয়, তাহা যে ধ্রুব সত্য, বাঙ্গালীর জীবনে তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। এই অ-ভয় তোমার জীবনে প্রতিষ্ঠিত হউক, তুমি জগতের সকল ক্ষেত্রে—ধর্ম্মে, কর্ম্মে, শিল্পে, বাণিজ্যে, মানবতায়, জগদ্ধিতে সাফল্য লাভ করিবে। তমের জড়তা অতিক্রম করিয়া সত্ত্বের প্রভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিবে। *

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি।

ওঁ স্বস্তি!

এস, বাঙ্গালার কোলে ফিরে এসো।

মেসোপোটেমিয়ার রণক্ষেত্রে লুপ্ত রক্তের উদ্ধার করিয়া মার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছ। পুরাতনের অবদানকে নূতন করিয়াছ। ইতিহাসের সাক্ষ্যকে বর্ত্তমানের পরীক্ষাক্ষেত্রে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছ। মা গলদশ্রুলোচনে তোমাদের পথ পানে চাহিয়াছিলেন—নয়নে আনন্দের অশ্রু, আশার অশ্রু, স্নেহের অশ্রু ত্রিধারায় শঙ্কার সংশয়-লেখা মুছিয়া বাৎসল্যের সঙ্গমে যুক্তবেণীর মত মিশিতেছে—বুকে ক্ষীরোদসিন্ধু উথলিয়া উঠিতেছে! এস বাঙ্গালার নন্দদুলাল, এস বাঙ্গালীর আশা-কল্পলতার নবীন মুকুল, এস মার সুসন্তান, এস বাঙ্গালার শরীরী অবদান,—এস ভারতের গীতার দান, এস, মার কোলে ফিরে এস।

---

* বাঙ্গালী; ২৮শে বৈশাখ, বৃহস্পতিবার, ১৩২৩।

অতীতের গৌরব কাপুরুষ-কলঙ্কলাঞ্ছনায় মলিন—কলুষিত—প্রচ্ছন্ন হইয়াছিল। মর্ম্মের শোণিতে সে গাঢ় কলঙ্কলেপ মুছিয়া তাহাকে রণচণ্ডীর করাল করবালের মহাদ্যুতিতে ভাস্বর করিয়া জীবন ধন্য—সার্থক—সফল করিয়াছ। কর্ম্মহীন দেশে নিষ্কাম কর্ম্মের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়া অবসন্ন জাতিকে বুঝাইয়াছ—হিন্দু অমর, হিন্দুর ধর্ম্ম অমর, হিন্দুর গীতা সত্য; হিন্দুর আত্মা সুপ্ত হয়, কিন্তু জাগিতে পারে, জাগিতে জানে, জাগিয়া থাকে। তোমরা প্রত্যক্ষ প্রমাণে দেখাইয়াছ—হিন্দু আছে, হিন্দুর ভাব আছে। অবসাদ নিত্য নয়, নৈমিত্তিক। মায়ায় সমাচ্ছন্ন আত্মাকে সাধনায় জাগাইতে পারিলে তিনি জাগেন। জাগাইতে হয়।—কুলকুণ্ডলিনী জাগিলে জগৎ-জয় অসম্ভব নয়। জাগাইতে পারিলে তিনি স্বয়ং জাগিয়া 'আমি'কে ফুটাইয়া জাগাইয়া দেন। কর্ম্মশক্তির বীজ কারণে অনুস্যূত থাকে; উপযুক্ত অবসরে উপযুক্ত সাধনায় তাহা অঙ্কুরে আত্মপ্রকাশ করে। তোমাদের বহু পুণ্যে, আমাদের বহু পুণ্যে, পিতৃ-পিতামহগণের আশীর্ব্বাদে, তাঁহাদের সাধনার প্রভাবে যুগযুগান্তের পরে বাঙ্গালার উষর ক্ষেত্রে সেই অঙ্কুরের উদ্গম হইল।

যখন তোমরা বিবেকের অনুশাসনে কর্ত্তব্যের পথ বাছিয়া লও, তখন কে জানিত, তোমরা সেই ক্ষুদ্র সূচনা এত সাফল্যে মণ্ডিত করিবে? আজ বলিতে লজ্জা নাই—তোমরা সে লজ্জা পদদলিত করিয়া আজ আমাদের সংশয়কে ধিক্কার দিবার সৌভাগ্য দান করিয়াছ—তখন বাঙ্গালীর মনে সংশয়ের ছায়া পড়িয়াছিল। অগ্নিপরীক্ষার যাত্রী! তোমরা দেশের মান হাতে করিয়া যুদ্ধ-ক্ষেত্রে যাত্রা করিয়াছিলে। কামানের অগ্নিবৃষ্টি—মৃত্যুর ভীষণ ভ্রূকুটী—রণচণ্ডীর প্রচণ্ড তাণ্ডবে তোমরা নিশ্চল ছিলে। সংহার সহস্র মূর্ত্তি ধরিয়া সে মান হরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছে—তোমরা হেলায় তাহাকে উপেক্ষা করিয়া তাহা নব-গৌরবে মণ্ডিত করিয়া দেশে ফিরাইয়া আনিয়াছ। তোমাদের এ ঋণ কি বাঙ্গালী কখনও শুধিতে পারিবে?

তোমরা বিবেকানন্দের ভবিষ্যদ্বাণী সফল করিয়াছ।—কামানের মুখে অগ্রসর হইয়া, অগ্নি-তরঙ্গে ঝাঁপ দিয়া, আহতকে উদ্ধার করিয়াছ! অকুতোভয়ে অসঙ্কোচে মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়া, মৃত্যু বিতরণ না করিয়া,—জীবন দিয়াছ। কিন্তু প্রতিপন্ন করিয়াছ,—গীতা-রত্নাকরের বেলায় যে তুচ্ছ উপলও কুড়াইয়া পায়, সেও জানে—এ দেহ নশ্বর। দেহাত্যয়ে আত্মার বিনাশ নাই, জীর্ণ-বাস-পরিহারের ন্যায় অনায়াসে হাসিমুখে এ আধার ত্যাগ করা যায়—এ সংস্কার এই গীতার দেশে ভুলিবার উপায় নাই! ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে এই সত্য এই জীবনে পরিণত করিতে না পারিলে, তোমরা এত দিনের পুরুষপরম্পরাগত নিশ্চেষ্টতার পর এত সাহস ও এমন অকুতোভয়তার পরিচয় দিতে পারিতে না!

তোমরা তুচ্ছ নও, অকর্ম্মণ্য নও, সামান্য নও। ইউরোপ যাহাকে সাহস বলে, তোমরা তাহাতেও বঞ্চিত নও। তোমরা প্রতাপ, সীতারাম, মেনা হাতী, মোহনলালের বংশধর।

শক্তিপীঠে মানব-জন্ম গ্রহণ করিয়া কোন পাপে শক্তিশূন্য কর্ম্মশূন্য হইয়াছি, জানি না। কিন্তু বোধ হয় সে পাপের ক্ষয় হইতেছে। নতুবা মা তোমাদের মত সুসন্তান কোলে পাইতেন না।

এস ঘরের বাছা, ঘরে ফিরিয়া এসো। এই বর্ষায় বাঙ্গালীর আশা বাঙ্গালার ক্ষেতে ক্ষেতে বীজ বপন করিয়া ফলের প্রতীক্ষা করিতেছে। জগন্নাথ স্নানযাত্রায় বর্ষার আসার-ধারায় স্নাত

হইয়া শস্যশ্যামলা দেশমাতাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। বাঙ্গালার এই প্রাবৃট-উৎসবে তোমরা ঘরে ফিরিলে। ঐ শুন মেঘ-মন্দ্রে মঙ্গল-শঙ্খ!—এ শঙ্খ আজ যদি নীরব হয়, যে দিন তোমরা সোনার ধান ঘরে তুলিবে, সে দিন—কমলার পূজার উৎসবে আবার বাজিবে।—

আশীর্ব্বাদ করি, চিরজীবী হইয়া সেই সুখের দিনের প্রতীক্ষা কর। তোমাদের নবান্ন-উৎসবে আমরা থাকিব না, কিন্তু আমাদের প্রাণের আশীর্ব্বাদ থাকিবে। সাধনায় সিদ্ধ সুসন্তান! মার সেবায় জীবন সার্থক কর—ইহা অপেক্ষা বড় আশীর্ব্বাদ ত খুঁজিয়া পাইলাম না।—ওঁ স্বস্তি! *

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

নব্যভারত। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়।—'আমাদের সম্মেলন' যাঁহার রচনা, তিনি আর ইহলোকে নাই। ইহাই বোধ হয় স্বর্গীয় রসিকলাল রায় মহাশয়ের শেষ রচনা। ইহাতে অনেক সত্য ও তথ্য আছে। অনেক ঘটনা ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ মনে হইতে পারে, কিন্তু তাহা যে উপেক্ষণীয় নয়, গত ঘটনার ধারা দেখিয়া আমরা তাহা বুঝিতে পারি। এই রচনাটির বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে সত্য ভিন্ন আর কাহারও মুখাপেক্ষা নাই। আমরা আজ কাল অপ্রিয় ব্যাপার ঢাকিয়া রাখিবারই চেষ্টা করি; শাক দিয়া মাছ ঢাকা দি। রসিক বাবু তাহা করেন নাই। এই রচনায় তাঁহার প্রকৃতির পরিচয় আছে। 'প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও জীবন-সংগ্রাম' ও 'পৃথিবীর উৎপত্তি' উল্লেখযোগ্য। রচনায় বিশেষত্ব নাই বটে, কিন্তু এ সকল বিষয়ের আলোচনা বাঙ্গালায় হয় না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। 'নেই মামার চেয়ে কাণা মামা ভালো।' ইংরাজী সাহিত্যে বিশেষবিৎ লেখকেরা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও প্রকৃতির রহস্য সাধারণ পাঠককে বুঝাইবার জন্য যে রীতিতে গ্রন্থ রচনা করেন, এ দেশের লেখকগণ সেই আদর্শের অনুসরণ করিলে বাঙ্গালা সাহিত্যের এ অভাব দূর হইতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, অনেক লেখক লেখা জিনিসটাকে এত সহজ ও স্বভাবসিদ্ধ মনে করেন যে, ভাষার অনুশীলন ও রচনারীতি সরল করিবার প্রয়োজনীয়তা তাঁহাদের মনে আদৌ উদিত হয় না। রচনারীতির সাধনা না করিয়া কলম ধরিলে যাহা সম্ভব, আমাদের দেশে তাহার নমুনার অভাব নাই; প্রতি মাসে রচনার বান ডাকিয়া যায়, কার্য্যে কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেতে এক বিন্দু পলীও পড়ে না। শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামীর কবিতার নাম—'বৈশাখী সুধা।—রবিরস-রসিতা মাধবী কবিতা।' ইহার অর্থ কি, ইঙ্গিত কি, তাহা স্বয়ং কবি ভাঙ্গিয়া না দিলে এ হেঁয়ালী কে বুঝিবে? কবিতার নামকরণ দেখিয়া, 'বার হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীচি' মনে পড়ে। কবি লিখিয়াছেন,—

'ছাঁকিয়া লইব ভাবের ভাষা,
রচিব যতনে কবিতা খাসা,'

মিলে বাহাদুরী আছে! ভাষায় খাসায় দিব্য মিলিয়া গিয়াছে। কিন্তু 'খাসা'র বদলে 'খাসা'

---

* বাঙ্গালী; ৫ই আষাঢ়; সোমবার; ১৩২৩।

বসাইলে কবির প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইত না। 'জোছনা' বেচারীর আঁকারটি বেগোয়ারী করি কাড়িয়া লইয়াছেন। ফলে বাছা আমার 'জোছেন' হইয়া উঠিয়াছে। সখের খাতিরে কোনও কোনও নিষ্ঠুর সৌখীন কুকুরের কান ও ল্যাজ কাটিয়া দেয়। গোঁসাই কবি মিল খুঁজিয়া না পাইয়া কলমের করাত দিয়া আকারটি কাটিয়া দিয়াছেন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এইরূপ 'অ্যাম্প্যুটেসনে'র সমর্থন করি। এ দিকে জোছনীর রক্ত পড়িতেছে—ও দিকে কবি সোহাগ করিয়া আধ-আধ ভাষায় বলিতেছেন, 'ওগো-চাঁদ চুয়ে পড়া জোছন।' ওগো ও চাঁদ কি জুড়িয়া গিয়াছে? না ইহা কল্পনার কোনও নূতন সৃষ্টি? রবি বাবু জাপানে, এ সময়ে তাঁহার জোছনার এমন দুর্দ্দশা হইল। কেহ কথাটি কহিলেন না!

'সুধা-ঝরা মুখ কুসুম চুচুক
অলিনী গুঞ্জনে উঠিবে কাঁপি!'

নব্য-ভারতের বিজয় পতাকার যোগ্য বটে। আবার অলিনী! 'বিয়েপাগলা বুড়ো' রাজীব বলিয়াছিল, 'চাকের মধু মিষ্টি কি হৈত? মৌমাছি খোঁচা যদি না রৈত?' বাস্তবিক, শুধু অলি হইলে কি কুসুম চুচুক নব্যভারতে এমন মানানসহি ও 'মিষ্টি' হইত? তার পর, 'চুমনে মিরিতি'! 'চুম্বনে'র অ্যাম্প্যুটেশন করিলে না হয় 'চুমন' পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু 'মিরিতি' কি? 'আঙ্গুরের রসে পরাণ ভিজে' তাহা না লিখিলেও বুঝা যাইত। এই জন্যই মাইকেলের মত মহাকবিও ও অবস্থায় কলম ধরিতেন না। আমরা 'দীরঘ শ্বাস' ফেলিয়া বৈশাখী সুধার ভাঁড়টির নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম। 'বৈশাখে—' কি বলে—আর কাজ নাই। শ্রীঅকিঞ্চন দাসের 'সাহিত্য ও ভাষা-সমস্যা' নীতির দূতীয়ালী; আবোল-তাবোলের তোড়া। মামুলী মন্তব্যের কাঁড়ি। মধ্যে মধ্যে উদ্ভট ভূয়োদর্শনের পরিচয় আছে। আজ কাল বাঙ্গালা সাহিত্যে টলষ্টয়, ইবসেনের দুর্দ্দশা দেখিয়া দুঃখ হয়। ইঁহাদের প্রসঙ্গে বাঙ্গালা সাহিত্যে 'ছোট মুখে বড় কথা' শুনিতে শুনিতে আমাদের কান ঝালা পালা হইয়া গেল। শ্রীমান অকিঞ্চন দাস ভারতচন্দ্রে ও রাম-প্রসাদে 'একটা ভৈরবী শক্তি' বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়াছেন! নানা ফুলের মধু আহরণ করিলে কি হয়, চাকটি অকিঞ্চন গড়িয়া উঠিতে পারেন নাই। শুধু হুলে অবশ্য তাহা সম্ভবও নয়। ভাষা-সমস্যার সমাধান করিতে গিয়া লেখক তাহা আরও জটিল করিয়া তুলিয়াছেন। যথা, 'অন্তপ্রকৃতি'। 'বল মা তারা দাঁড়াই কোথা?' লেখক লিখিয়াছেন,—'প্রবন্ধান্তে বলিব, বাঙ্গালার একমাত্র দীনেশ বাবুই গল্প রচনায় সে আদর্শ রক্ষা করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।' এ দীনেশ বাবুকে ত আমরা চিনিতে পারিলাম না। তিনি যদি রায় সাহেব দীনেশ হন, তাহা হইলে আমরা বলিব, 'শালুক চিনেছেন গোপাল ঠাকুর!' সম্ভবতঃ রায় সাহেবও বলিবেন, 'ভগবান্ আমাকে এমন বন্ধুর হাত হইতে রক্ষা কর।' যাহারা হেলে ধরিতে পারে না, অথচ কেউটে ধরিতে যায়, তাহাদের অবস্থা এইরূপ শোচনীয় হয়! শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্তের 'সহরে সবুজ' হয় ত কবির সবুজ, কিন্তু ছাপিবার কারণ কি? শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী 'দেশভক্ত দ্বিজেন্দ্রলালে'র পরিচয় দিয়াছেন। দেবকুমার বহু কাল সাহিত্যের সাধনা করিতেছেন, সকল প্রকারে ক্ষুদ্র ও অসম্পূর্ণ এই রচনাটি তাঁহার লেখনীর

পাঠক করিতে পারে। শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাসের 'বাঁশী'তে সে পুরাতন তান নাই, লয় নাই, উন্মাদিনী সুধা নাই। এমন কি, অনেক স্থলে ছন্দে যতিও নাই।

সবুজপত্র। আষাঢ়। 'সমুদ্র-যাত্রা' প্রবন্ধে শ্রীপ্রমথ চৌধুরী সূচনা করিয়াছেন, কিন্তু তাহার সমাপ্তি খুঁজিয়া পাইলাম না। শুধু বৌদ্ধ সাহিত্যে কেন, সংস্কৃত সাহিত্যেও সমুদ্রযাত্রার অসংখ্য প্রমাণ আছে। 'মার্কিন-যাত্রা' নামক পুস্তকের মুখপত্র স্বরূপে লিখিত' নিবন্ধে এক নিঃশ্বাসে সাত কাণ্ড রামায়ণ পড়িবার চেষ্টা না করিলেই ভাল হইত। যে লেখকের 'চোখে কবির দিব্য দৃষ্টি নেই, এবং তাঁর হাতে চিত্রকরের নৈপুণ্যও নেই'—তাঁহার উপরোধে প্রমথ বাবুকে ঢেঁকি গিলিতে হইয়াছে। তাহার ফল এই অর্দ্ধপক রচনা। ইহাতেও প্রমথবাবু একটি 'মনোকল্পিত' চালাইয়াছেন। এ ব্যভিচারের কারণ কি? বিশারদের—

'একবার মনোসাধে,
ডাক বাঁশী রাধে রাধে,
শুনে ব্যাকরণ কাঁদে।'

মনে পড়ে। ব্যাকরণকে কাঁদাইবার দরকার কি? 'মনগড়া' ত পড়িয়া আছে। তবে আর 'মনঃকল্পিত'কে 'মনোকল্পিত' করিয়া সংস্কৃতে হাত বাড়াইবার দরকার কি? স্যর রবীন্দ্রনাথ 'জাপান-যাত্রীর পত্রে' লিখিয়াছেন,—'যে সমস্ত টুক্‌রো কথা আমার মনে মুঠোর ফাঁক দিয়ে গলে' ছড়িয়ে পড়ে' যায়।' ঠাট্টা করে' লেখা মনে করিবেন না। মনের মুঠো, তার ফাঁক, সেই রন্ধ্র পথে কথার টুকরোগুলোর বৃষ্টি! কি সহস্রছিদ্র কল্পনা! কি চালুনীবিনিন্দিনী উপমা! কিন্তু বাঙ্গালীর এমনই সৌভাগ্য যে, এত কথার টুকরো মনের মুঠোর ফাঁক দিয়ে গলে' পড়ে' গেল, কিন্তু মনের মুঠোর ফাঁকটি ঠিকরে' ঠিক সবুজ পাতার গাদায় এসে' পড়ল! অভিধানে লেখে—সাক্ষ্য। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, 'সাক্ষি'। স্মরণ কর কবির প্রাচীন ইস্তাহার—'জানই আমার সকল কাজে originality!' রচনার এক একটি দীপ্তি বেশ—'বাণিজ্য-লক্ষ্মী নির্ম্মম, তার পায়ের কাছে মানুষের মানস-সরোবরের সৌন্দর্য্য শতদল ফোটে না।' অবশ্য, সিদ্ধান্তটি বৈদিক। বাণিজ্য-লক্ষ্মীর পায়ের নীচেও ফোটে। 'নেই বলিলে সাপের বিষ থাকে না' বটে, কিন্তু ইতিহাসের সত্য থাকে। কিন্তু কবিত্বের উচ্ছ্বাসের সঙ্গে ঐতিহাসিক সত্যের লড়াই বাধাইবার এ স্থান নহে। রবীন্দ্রনাথের নিকট ঐতিহাসিক সত্যের আশাও অবশ্য কেহ করিবেন না। রবীন্দ্রনাথের একটি মন্তব্য প্রণিধান-যোগ্য, অত্যন্ত উপভোগ্য।—'সোমবার দিনে সকালে আমার বন্ধুরা এখানকার বিখ্যাত বৌদ্ধ মন্দিরে নিয়ে গেলেন। এতক্ষণে একটা কিছু দেখতে পেলুম। এতক্ষণ যার মধ্যে ছিলুম, সে একটা এব্‌স্‌ট্রাক্‌শন্‌, সে একটা অবচ্ছিন্ন পদার্থ। সে একটা সহর, কিন্তু কোনো একটা সহরই নয়। এখন যা দেখ্‌চি, তার নিজেরই একটা বিশেষ চেহারা আছে। তাই সমস্ত মন খুসি হয়ে, সজাগ হয়ে উঠ্‌ল। আধুনিক বাঙালীর ঘরে মাঝে মাঝে খুব ফ্যাশান্‌ওয়ালা মেয়ে দেখ্‌তে পাই; তারা খুব গট্‌গট্‌ করে চলে, খুব চটপট্‌ করে ইংরেজী কয়—দেখে মস্ত একটা অভাব মনে বাজে,—মনে হয় ফ্যাশানটাকেই বড় করে' দেখ্‌চি, বাঙালীর মেয়েটিকে নয়; এমন সময় হঠাৎ ফ্যাশান্‌বর্জ্জিত সরল সুন্দর স্নিগ্ধ বাঙালী-ঘরের কল্যাণীকে দেখ্‌লে তখনি বুঝতে পারি,

এ ত মরীচিকা নয়, স্বচ্ছ গভীর সরোবরের মত এর মধ্যে একটি তৃষাহরণ পূর্ণতা আপন পদ্মবনের পাড়টি নিয়ে টল টল করচে। মন্দিরের মধ্যে ঢুকতেই আমার মনে তেমনি একটি আনন্দের চমক লাগল; মনে হল, যাই হোক্ না কেন, এটা ফাঁকা নয়—যেটুকু চোখে পড়চে এ তার চেয়ে আরো অনেক বেশি। সমস্ত রেঙ্গুন সহরটা এর কাছে ছোট হয়ে গেল—বহুকালের বৃহৎ ব্রহ্মদেশ এই মন্দিরটুকুর মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করলে।' রবীন্দ্রনাথ এই পুরাতন মোহটুকুর জন্য আকুল, অথচ তাকেই ভাঙ্গিয়া চুরমার করিবার জন্য তিনি আড়ে-হাতে লাগিয়াছেন! কল্যাণী এত ভাল লাগে, অথচ তাহাদিগকে খাঁচার পাখী মনে করেন। নিজের বড় খাঁচাটি সহ্য হয়, টুনটুনীর খাঁচা দেখিয়া অধীর হন! ইহা আমাদের বিচিত্র সমস্যা বলিয়াই মনে হয়। 'রমণীর লাবণ্যে তারা যেমন প্রেয়সী, শক্তির মুক্তিগৌরবে তেমনই তারা মহীয়সী।' মুক্তির শক্তিগৌরব তোমারও যেমন, তাদেরও তেমনই! কার বন্ধনের গেরো একটু শক্ত, কার একটু আল্‌গা, তাহা লইয়া জল্পনা কবির পক্ষেই শোভা পায়, সাধারণের পক্ষে তাহা সময়ের অপব্যবহার—পণ্ডশ্রম। মুক্তিগৌরব কাহাকে দিবে? কোথায় তাহার আধার? তুমি স্বয়ং আগে মুক্তি পাও, তার পর খয়রাৎ করিও। 'স্বয়মসিদ্ধঃ কথমন্যান্ সাধয়তি?' এ কথা তুমি ভুলিতে পার, আমাদের তাহা মনে আছে! শ্রীকৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্যের 'পুস্তক-প্রশংসা' এক বিন্দু। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, কৃষ্ণকমল বাবুর প্রতিভার ফলে বাঙ্গালা সাহিত্য বঞ্চিত হইল। শ্রীপ্রমথ চৌধুরীর 'দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের হাসির গান' ও বীরবলের 'প্রত্নতত্ত্বের পারস্য-উপন্যাস' উল্লেখযোগ্য। 'আহুতি' উপভোগ্য। রবীন্দ্রনাথের একটি ও ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের একটি বাদ দিলে, আর সব রচনাই সম্পাদকের। রচনাগুলি পড়িলে মজুরী পোষায়। আষাঢ়ে 'সবুজ পত্র' বেশ উজ্জ্বল হইয়াছে।

সৌরভ। আষাঢ়।—শ্রীপ্রিয়গোবিন্দ দত্তের 'ধর্ম্ম, দর্শন ও নাস্তিকতা' চারি পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হইয়াছে। এত ক্ষুদ্র পরিসরে এরূপ বিস্তৃত বিষয়ের আলোচনা সম্ভব নয়। শ্রীবিমলানাথ চাকলাদার 'অভিনব রোগনির্ণয়-প্রণালী'তে চোখের তারা দেখিয়া রোগ-নির্ণয় করিবার নূতন পদ্ধতির পরিচয় দিয়াছেন। আমরা জানিতাম না, কলিকাতার ডাক্তার এন্ কে বসু এই পদ্ধতিতে রোগ-নির্ণয় ও 'ইলেক্‌ট্রোথিরেপী' চিকিৎসা করেন। প্রবন্ধে কয়েকখানি উৎকৃষ্ট চিত্র আছে। বাঙ্গালা ভাষায় এই শ্রেণীর রচনার অনুবাদ ও চুরী দেখিয়াছি। চাকলাদার মহাশয় স্বয়ং অনুসন্ধান করিয়া 'সৌরভে' একটি নূতন বিষয়ের পরিচয় দিয়াছেন। এ জন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদভাজন। 'সের সিংহের ইউগণ্ডা-প্রবাসে' বর্ণনায় আড়ম্বর নাই; তাই রসভঙ্গ হয় না। ঘটনার বৈচিত্র্যে কৌতূহল উদ্দীপ্ত হয়। তবে লিপিকৌশল নাই। ইহাও বাঙ্গালা সাহিত্যে নূতন। আমরা বরাহনগর ও উত্তরপাড়ার তথাকথিত ভ্রমণবৃত্তান্ত পড়িয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি। বিদেশের এই সহজ সরল ও স্বাভাবিক ভ্রমণচিত্র চাটনীর মত মুখরোচক। শ্রীবিজয়-নারায়ণ আচার্য্যের 'ময়মনসিংহের কবির গানে' অনুসন্ধিৎসার পরিচয় নাই। সমালোচনা পরে হইতে পারে। তথ্য সংগ্রহ না করিয়া একটি গানের সমালোচনায় ভাবুকতার পরিচয় দিবার চেষ্টা করিলে বিশেষ কোনও লাভের আশা নাই। এ জন্য খাটিতে হয়। আগে সংগ্রহ। পরে উপযুক্ত হস্তে সমালোচনা। ইহাই প্রকৃষ্ট পদ্ধতি। শ্রীহরিচরণ গুপ্তের 'খাদ্যে' সেই মামুলী 'থোড়-বড়ি-খাড়া' ও 'খাড়া-বড়ি-থোড়'! এ সকল বিষয়ে নিত্য নূতন তত্ত্বের ও তথ্যের আবিষ্কার হইতেছে। পুরাতন কাসুন্দী না ঘাঁটিয়া অন্ততঃ সে সকল কথার পরিচয় দিলেও লাভ হয়। শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী 'ভিখারিণী' সাজিয়া 'রিক্ততা' লইয়া পাঠকের দ্বারে উপস্থিত। আর কিছু নাই, তাই কবিতার রিক্ততা লইয়া আসিয়াছেন, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। সে রিক্ততাও আবার যোড়াসাঁকোর 'সার'-বাড়ীতে রবীন্দ্রনাথের নিকট ভিক্ষা করিয়া, বা না বলিয়া লইয়া আসিয়াছেন। এ সকল কবিতা পড়িয়া ভগবদ্ভক্তির উপরও অরুচি হইতে পারে, ন্যাকামী দেখিয়া রাগ হইতে পারে, গতানুগতিকতা দেখিয়া দুঃখ হইতে পারে, কবিতার দুর্দশা দেখিয়া চোখে জল আসিতে পারে। ইহা ভিন্ন আর কি প্রশংসা করিতে পারি? বাঙ্গালার ঘরে ঘরে তুলসীদাস দোঁহা লিখিতে বসিয়া গিয়াছেন। মীরা বাই গান বাঁধিতেছেন।

এমন সুজলা সুফলা ভূমি ত আর নাই। আমরা বলি, মা, এত কবি প্রসব না করিয়া চাট্টি ধান প্রসব কর, আমরা খাইয়া বাঁচি। 'বাহাদুর সঙ্গী' একটি চলনসই গল্প—অসমাপ্ত। সম্পাদক শেষটুকু লিখিবার জন্য পাঠকদিগকে অনুরোধ করিয়াছেন। 'উইলিয়ম কেরি' অনুবাদ।

স্বাস্থ্য-সমাচার।—আষাঢ়। 'ব্যাক্টেরিয়া' একটি উদ্ধৃত প্রবন্ধ। শ্রীসত্যশরণ চক্রবর্ত্তীর 'বিষ-চিকিৎসায় প্রাথমিক সাহায্য' সুলিখিত সন্দর্ভ; গৃহস্থের উপযোগী। জানিয়া রাখিলে কাজে লাগিতে পারে। শ্রীবেণীমাধব দের 'জলের ব্যবহার-প্রণালী' নানা তথ্যে পূর্ণ। 'শিশুপালনপদ্ধতি' অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ। শ্রীমাণিকলাল মল্লিকের 'নিরামিষ ভোজনে'র প্রতিপাদ্য,—নিরামিষ আহারেও পুষ্টি সম্ভব; এমন কি, আমিষ অপেক্ষা নিরামিষ সে পক্ষে অধিকতর উপযোগী। লেখক এই প্রতিপাদ্যের সমর্থনে বিবিধ তথ্যের সমাবেশ করিয়াছেন। রায় বাহাদুর ডাক্তার নবীনচন্দ্র দত্ত 'আমাদের দেশের কয়েকটি ফলমূল' সন্দর্ভে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা আমরা দেশের লোককে সযত্নে পড়িতে বলি। 'ম্যালেরিয়া নিবারণের উপায়' সময়োপযোগী হইয়াছে। মফস্বলের পাঠকগণ এই সকল উপায় অবলম্বন করিলে সম্পাদকের শ্রম সফল হইতে পারে। 'উচ্ছিষ্টে অনুরাগ' নামক ক্ষুদ্র রচনাটিতেও আমরা বাঙ্গালীর—বিশেষতঃ সহরবাসী বাঙ্গালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। 'স্বাস্থ্য-সমাচারে'র ও তাহাতে প্রচারিত হিতকারী ও মনোহারী সন্দর্ভনিচয়ের বহুল প্রচার হইলে দেশের অনেক কল্যাণ হইতে পারে। বাঙ্গালার শিক্ষিত সম্প্রদায় এ পক্ষে সম্পাদকের সহায় হইলে অনেক সুফলের আশা করা যায়।

প্রতিভা।—আষাঢ়। শ্রীমন্মথনাথ মজুমদারের 'সোসিয়ালিজ্‌মের বর্ত্তমান অবস্থা' এই সংখ্যায় সমাপ্ত হইল। প্রবন্ধটি 'প্রতিভা'র প্রথম স্থান অধিকার করিবার যোগ্য বটে। আশা করি, লেখক এই বিস্তৃত বিষয়ের অন্যান্য অংশেরও পরিচয় দিবেন। ইহা একটা কাজের মত কাজ। 'অবিমারক' চলিতেছে। শ্রীমোহিনীমোহন দাসের 'ভারতীয় অস্ত্রচিকিৎসা' বিশেষজ্ঞের বিচার্য্য। শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্তের 'অতসী ফুলে' বিশেষত্ব নাই। অতসীর বদলে মোরগ ফুল দেখিলেও কবি এইরূপ কাঁদুনী গাহিতে পারিতেন। 'অচেনা' দেশের 'অজানা' কাহিনী ও 'অদেখা' বীণার 'অশোনা' কাহিনী যে এই অ-ভাগা দেশের অ-ঢাকা কানের জন্য সঞ্চিত ছিল, তাহা কে জানিত? 'সাহিত্যে জয়দেবে' নূতন কথা নাই। 'বিদ্যালয়ে ইতিহাসশিক্ষা' খাটিয়া লেখা। বিশেষজ্ঞের আলোচ্য। 'বাঙ্গালা সাহিত্যে বৌদ্ধ যুগের অবসান' অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। কিন্তু উল্লেখযোগ্য। 'অনুপ্রাসে পরিহাস' 'প্রতিভা'র পক্ষে পরিহাসই বটে। কাঁদিয়া ককাইয়া 'কবিতা' লেখা যায়, কিন্তু রসিকতা 'জোরের যোগ্য নহে।' আখমাড়া কলে রস পাওয়া যায় বলিয়া শব্দ পিষিয়া রসিকতা বাহির করিবার চেষ্টা সুবুদ্ধির পরিচায়ক নহে। 'মধ্যযুগে বঙ্গদেশ' শ্রীযুত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের প্রদত্ত বক্তৃতার সার মর্ম্ম। বক্তৃতাটি 'হুবহু' তুলিয়া লইলে ভাল হইত। শ্রীকুলচন্দ্র দের 'কিশোরী উষা'য় কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের সুর বাজিয়াছে। হাত এখনও কাঁচা বটে, কিন্তু সৌন্দর্য্য আছে। 'স্বর্গ-নহবৎ' থাকুক, 'নিশিশেষে কে উর্ব্বশী ধুইলা চরণ পূর্ব্বাশার ঘাটে'ও আছে।

জেরের জের।

শ্রীযুত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে রেজিষ্টারী করিয়া যে পত্র লিখিয়াছিলাম, তাহা এই,—

'গত ১৭ই জুন তারিখে আপনি লিখিয়াছিলেন,—"এক পক্ষ কালমধ্যে" আমাকে একটি গল্প পাঠাইবেন। অদ্য ১৭ই জুলাই। দুই পক্ষ অতীত হইল। স্মরণার্থ লিখি। ইতি; ১৭।৭।১৬।'

তাহার পর আর দুই পক্ষ অতীত হইয়াছে। আমি গল্প বা পত্রের উত্তর পাই নাই।

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি।

ঋষি ও কবি

১৩২০ সালে যখন কবি রবীন্দ্রনাথের নোবেল-পুরস্কার-প্রাপ্তির সংবাদ এ দেশে প্রকাশিত হইয়াছিল, তখন 'রবীন্দ্রনাথের কাব্য-রহস্য' নামক একটি প্রবন্ধ লিখিয়া 'সাহিত্য' পত্রে প্রকাশিত করিয়াছিলাম। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথকে সাধারণ কবি না বলিয়া 'ঋষি' বলিয়াছিলাম, এবং রবীন্দ্রনাথের রচনা সম্বন্ধে উপমাস্থলে ঋষি-সংজ্ঞার অনুযায়ী অন্যান্য সংজ্ঞাশব্দের ব্যবহার করিয়াছিলাম। সাপ্তাহিকে এবং মাসিকে এই কথা লইয়া কিছু আলোচনাও হইয়াছিল। এবারকার জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার 'সাহিত্যে' শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় 'ঋষি রবীন্দ্রনাথ' নামক প্রবন্ধে সেই প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিয়াছেন। প্রতিবাদের প্রথম দফাতেই দেখান হইয়াছে,—'ঋষি' এবং 'ঋষি-দৃষ্ট মন্ত্র' আমি যে অর্থে গ্রহণ করিয়াছি, তাহা ভুল। যদি তাই হয়, তবে তার পরে লেখক আর ৯ পাতা লিখিয়া কেন পণ্ডশ্রম করিলেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু 'ঋষি' শব্দের ন্যায় প্রচলিত শব্দকে একটা অভিনব অর্থে ব্যবহার করা আমার কর্ত্তব্য হয় নাই, এ কথা আরও অনেকেই আমাকে বলিয়াছেন। সুতরাং ইহার একটা কৈফিয়ৎ দিতেছি।

যাঁহারা বেদমন্ত্রকে ইতিহাসের উপাদানের আকর মনে করেন, তাঁহাদের হিসাবে বেদমন্ত্র পুরুষরচিত গীত মাত্র। বেদমন্ত্রকে অপৌরুষেয় এবং নিত্য মনে করিলে, তাহার ভিতর ইতিহাসের উপজীব্য অনিত্য লৌকিক বিষয়ের অনুসন্ধান করা যাইতে পারে না। মীমাংসকগণ এ কথা বুঝিয়া তাহার বিধানও করিয়া গিয়াছেন। মীমাংসাদর্শনে বেদমন্ত্র সম্বন্ধে পূর্ব্বপক্ষ করা হইয়াছে, যদি মন্ত্র নিত্য হয়, তবে তাহার মধ্যে অনিত্য 'কীকটা' নামক দেশ এবং 'প্রমগন্দ' নামক মানুষের নাম উল্লিখিত হইল কেমন করিয়া? ইহার উত্তরে মীমাংসকেরা বলিয়াছেন, 'কীকটা' দেশের নাম নয়, 'কীকটা'র অর্থ কৃপণ, এবং 'প্রমগন্দ' মানুষের নাম নয়, 'প্রমগন্দে'র অর্থ কুসীদজীবী। কিন্তু যাঁহারা পাশ্চাত্য রীতিতে ইতিহাসের আলোচনা করেন, তাঁহারা এইরূপ মীমাংসায় সন্তুষ্ট হইতে পারেন না; তাঁহারা বেদমন্ত্রে অনিত্য লৌকিক ঘটনার বিবরণের সন্ধান করেন। যাঁহারা বেদমন্ত্রে অনিত্য লৌকিক বৃত্তান্তের সন্ধান করেন, এবং

তাহা কতটা বিশ্বাসযোগ্য, স্বাধীনভাবে তাহার বিচার করেন, তাঁহারা বেদমন্ত্রকে অপৌরুষেয় নিত্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না। ইতিহাসের হিসাবে বেদমন্ত্র পুরুষরচিত গীত। একান্ত স্বাভাবিকতা এই গীতের বিশেষত্ব। রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি গীতে এইরূপ স্বাভাবিকতা লক্ষ্য করিয়া আমি তাঁহাকে 'ঋষি' এবং তাঁহার সেই গীতগুলিকে 'মন্ত্র' বলিয়াছিলাম, এবং এই হিসাবে রবীন্দ্রনাথ কবিসমাজে স্বতন্ত্র আসন পাইবার যোগ্য, এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছিলাম। ইংরেজ কবি এবং সমালোচক মেথু আর্ণোল্ড, ইংরেজ কবি ওয়ার্ডসোয়ার্থ সম্বন্ধে এইরূপই বলিয়াছেন। যথা—

"I remember hearing him say that 'Goethe's poetry was not inevitable enough.' The remark is striking and true; no line in Goethe, as Goethe said himself, but its maker knew well how it came there. Wordsworth is right, Goethe's poetry is not inevitable; not inevitable enough. But Wordsworth's poetry, when he is at his best, is inevitable, as inevitable as Nature herself. It might seem that nature not only gave him the matter for his poem, but wrote his poem for him."

'আমার স্মরণ আছে, তিনি (ওয়ার্ডসোয়ার্থ) আমায় বলিয়াছেন, "গেটের কবিতা নেহাত অপরিহার্য্য রচনা নয়।" গেটে স্বয়ং বলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার রচিত প্রত্যেক পংক্তির রচনাশ্রমের কথা তাঁহার স্মরণ ছিল। এই মন্তব্য বিস্ময়কর, এবং স্বয়ং ওয়ার্ডসোয়ার্থ ঠিক কথা বলিয়াছেন, গেটের কবিতা অপরিহার্য্য রচনা নয়, নেহাত অপরিহার্য্য রচনা নয়। কিন্তু ওয়ার্ডসোয়ার্থের উৎকৃষ্ট কবিতা অপরিহার্য্য, প্রকৃতির লীলার মত অপরিহার্য্য। মনে হয়, প্রকৃতিদেবী কবিকে কবিতার বস্তু দান করিয়া ক্ষান্ত হয়েন নাই, স্বয়ংই যেন কবিতাটি লিখিয়া দিয়াছেন।'

যে ভাবটা প্রকাশ করিবার জন্য মেথু আর্ণোল্ড এতগুলি কথা খরচ করিয়াছেন, সেই ভাবটা আমাদের 'মন্ত্র' শব্দের দ্বারা অতি চমৎকার প্রকাশিত হয়। যে কবিতা inevitable, যে কবিতা স্বতঃবিকশিত অপৌরুষেয় মনে হয়, তাহা 'মন্ত্র'; তাহার রচয়িতা 'ঋষি'। কিন্তু কোনও কবিকে এই হিসাবে 'ঋষি' বলিলেই তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ কবি বলা হয় না। মেথু আর্ণোল্ড ওয়ার্ডসোয়ার্থকে গেটে অপেক্ষা খাট বলিয়া গিয়াছেন।

'মন্ত্র' বলিলেই যে রবীন্দ্রনাথের গীতকে উচ্চ করা হইল, তাহা আমার ধারণা ছিল না। 'মন্ত্র' এবং 'ঋষি' শব্দ ছাড়িয়া দিয়া রবীন্দ্রনাথকে 'কবি' এবং তাঁহার গীতকে 'কবিতা' বলিলেও ক্ষতি নাই; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গীত অতি উচ্চ অঙ্গের কল্যাণকর কবিতা নয়, এ কথা বলিয়া তাঁহার প্রতি লোকের অভক্তি জন্মাইয়া দিলে যথেষ্ট ক্ষতি আছে। সুতরাং দেখা যাউক, রবীন্দ্রনাথের গীত উচ্চ অঙ্গের কাব্য কি না? কাব্যের প্রয়োজন বা উপকারিতা

'সদ্যঃ পরিনির্বৃতয়ে কান্তাসম্মিততয়োপদেশযুজে।'

অর্থাৎ, কাব্য শ্রবণমাত্র পরমানন্দ দান করে, এবং উপদেশে প্রিয়তমার বচনের ন্যায় মনোহারিত্ব সঞ্চারিত করে।' কাব্যের উপদেশের 'কান্তাসম্মিততয়া' বা কান্তাতুল্যতা স্ফুটতর করিবার জন্য 'কাব্যপ্রকাশ'-কার কাব্যকে বেদাদির এবং পুরাণাদির সহিত তুলনা করিয়াছেন। বেদাদির অর্থাৎ শ্রুতিস্মৃতির উপদেশকে তিনি বলিয়াছেন, 'প্রভুসম্মিত'; অর্থাৎ, প্রভুর আদেশের তুল্য। পুরাণাদির উপদেশ 'সুহৃৎসম্মিত'; অর্থাৎ, সুহৃদের পরামর্শের তুল্য। পাশ্চাত্য মনীষীরাও কাব্যের উপদেশের এইরূপ লক্ষণই করিয়াছেন। ল্যাম্ব (Charles Lamb) ওয়ার্ডসোয়ার্থের একটি কবিতা সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—

'The instructions conveyed in it are too direct; they don't slide into the mind of the reader while he is imagining no such matter.'

'এই কবিতার উপদেশগুলি খুব সোজাসোজিভাবে দেওয়া হইয়াছে, এই উপদেশ অলক্ষিতে, পাঠক যখন কল্পনাও করে না যে, সে উপদেশ পাইতেছে, তখন তাহার মনে চুপি চুপি প্রবেশ করে না।'

'কাব্যপ্রকাশ'-কারের ভাষায় ইহাই কাব্যের উপদেশের 'কান্তাসম্মিততা'। যাহা হৃদয়ে পরমানন্দ সঞ্চারিত করে, এবং অলক্ষিতে আনন্দরসধারার সঙ্গে সংশিক্ষা সঞ্চারিত করিয়া হৃদয়কে পুষ্ট বলিষ্ঠ করিয়া তোলে, তাহাই প্রকৃত কাব্য। এই হিসাবে রবীন্দ্রনাথের অনেক গীতই উৎকৃষ্ট কাব্য। আমি নমুনাস্বরূপ 'গীতালি' হইতে একটি (৪৩ নং) গীতের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিব—

দুঃখ যদি না পাবে ত দুঃখ তোমার ঘুচবে কবে?
বিষকে বিষের দাহ দিয়ে দহন করে' মারতে হবে।
জ্বলতে দে তোর আগুনটারে, ভয় কিছু না করিস তারে,
ছাই হয়ে সে নিভবে যখন জ্বলবে না আর কভু তবে।

* * *

মরতে মরতে মরণটারে শেষ করে' দে একেবারে,
তার পরে সেই জীবন এসে আপন আসন আপনি লবে॥'

'কাব্যপ্রকাশ'-কারের ভাষায় কাব্যের যাহা 'সকলপ্রয়োজনমৌলিভূত'—'সদ্যঃ পরিনির্বৃতয়ে কান্তাসম্মিততয়োপদেশযুজে'—তাহা এই গীতে অতি সুন্দর সাধিত হইয়াছে। তার উপর এই গীতের ভাব এত সহজ, রচনা এতই স্বাভাবিক, এত inevitable, যেন কোনও মানুষ রচনা করে নাই, অপৌরুষেয় মন্ত্র। তার উপর পালার মহিমা রবীন্দ্রনাথের গীতকে দিব্য মহিমায় মণ্ডিত করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ এই পালার নাম দিয়াছেন, 'সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত

মিলনসাধনের পালা।' এই পালা ছাড়া রবীন্দ্রনাথ আরও কতকগুলি পালা বাঁধিয়াছেন। তার মধ্যে সম্ভোগের পালাও আছে। সম্ভোগের পালা আছে বলিয়াই রবীন্দ্রনাথের কাব্যের যাহা প্রধান পালা—'গীতাঞ্জলিতে', 'গীতিমাল্যে', 'গীতালি'তে যে পালা পূর্ণতা লাভ করিয়াছে, সেই পালাও যে কেন ফেলিয়া দিতে হইবে, তাহা বুঝিতে পারি না। কাব্য হিসাবে এই পালার অনেক গীত উচ্চতম শ্রেণীর কাব্য। মহাত্মা কারলাইল তাঁহার 'মহাপুরুষপূজা' (On Heroes, Hero-Worship and the Heroic in History) নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে কবির এবং কাব্যের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, প্রাচীনকালে একই শব্দ (Vates) প্রোফেট (Prophet) এবং কবি বুঝাইত। যিনি জনসমাজে ঈশ্বরের আজ্ঞা প্রচার করেন, তিনি প্রোফেট। আমরা এখন 'ঋষি' শব্দ যে অর্থে ব্যবহার করি, তদনুসারে এই শব্দ পাশ্চাত্য 'প্রোফেট' শব্দের প্রতিশব্দ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে। কারলাইল বলিয়াছেন, ঋষি (Prophet) এবং কবি (Poet), উভয়ের কার্য্য এক প্রকার।

'That they have penetrated both of them into the sacred mystery of the Universe; what Goethe calls "the open secret"......That divine mystery, which lies everywhere in all Beings, "the Divine Idea of the World that which lies at the bottom of Appearance", as Fichte styles it;...'

*　　　*　　　*　　　*

'But now, I say, whoever may forget this divine mystery, the *Vates*, whether Prophet or Poet, has penetrated into it; is a man sent hither to make it more impressively known to us...Once more, here is no Hearsay, but direct Insight and Belief; this man too could not help being a sincere man'.

অর্থাৎ, ঋষি (Prophet) এবং কবি, উভয়েই বিশ্বের রহস্য—গেটে যাহাকে 'প্রকট রহস্য' বলিয়াছেন,—সেই রহস্য ভেদ করিয়াছেন। ফিক্তের ভাষায়, বাহ্য জগতের, বাহ্য দৃশ্যের অন্তরালে যে দেবভাব, যে পরমাত্মা লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহাই এই প্রকট রহস্য। ঋষি (Prophet) এবং কবি, উভয়েই এই রহস্য ভেদ করেন, এবং তাহা জনসমাজে প্রচার করেন। তাঁহারা শোনা কথা প্রচার করেন না; অন্তর্দৃষ্টিবলে, বিশ্বাসের বলে, যাহা সাক্ষাৎ অনুভব করেন, তাহা প্রচার করেন। ঋষি (Prophet) এবং কবি কপট হইতে পারেন না।

এই পর্য্যন্ত ঋষির ও কবির পন্থা এক। তার পর কারলাইল উভয়ের পার্থক্য নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন, ঋষি (Prophet) বলিয়া দেন, কোনটি ভাল,

কোনটি মন্দ, মানুষকে কি করিতে হইতে হইবে, কি করিতে হইবে না ; পক্ষান্তরে, কবি দেখাইয়া দেন, কোনটি সুন্দর, কোনটি ভালবাসিতে হইবে। মূলতঃ, যাহা ভাল—যাহা সত্য, তাহাই প্রকৃতপক্ষে সুন্দর। কবি কীট্‌স বলিয়াছেন—

> Beauty is truth, truth beauty,—that is all
> Ye know on earth, and all ye need to know.

ঋষি এবং কবি উভয়েরই কার্য্য এক—রহস্যভেদ, বিশ্বের অন্তরে যে আনন্দস্বরূপ সত্য লুকায়িত আছে, তাহার প্রকাশ ; কিন্তু উভয়ের প্রকাশের রীতি পৃথক্। এক জন (ঋষি) সত্যকে ভাল, মঙ্গলময় বলিয়া প্রচার করেন ; আর এক জন (কবি) সত্যকে সুন্দর, আনন্দময়রূপে প্রকাশ করেন। কারলাইল কবি-প্রসঙ্গের সূচনায়ই বলিয়াছেন, এই বৈজ্ঞানিক যুগে ঋষির (Prophet) অভ্যুদয় আর সম্ভব নহে, কিন্তু কবির অভ্যুদয় সম্ভব।

"Divinity and Prophet are past. We are now to see our Hero in the less ambitious, but also less questionable, character of Poet ; a character which does not pass."

রবীন্দ্রনাথকে Prophet হিসাবে আমি ঋষি বলি না ; সেই প্রকার ঋষি এখন হইতেও পারে না, হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অনেক গীত এই দেশের প্রাচীন ঋষির মন্ত্রের মত ; এক দিকে inevitable, স্বতঃবিকশিত মনে হয় ; আর এক দিকে, সীমার মধ্যে যে অসীমতা Divine idea of the world লুকায়িত রহিয়াছে, তাহার একটা জীবন্ত আভাস দেয়। তাই রবীন্দ্রনাথকে ঋষি বলি। রবীন্দ্রনাথ গাইয়াছিলেন —

> ফুলের মত আপনি ফুটাও গান,
> হে আমার নাথ এই ত তোমার দান।
> ওগো সে ফুল দেখিয়া আনন্দে আমি ভাসি
> আমার বলিয়া উপহার দিতে আসি,
> তুমি নিজ হাতে তা'রে তুলে লও স্নেহে হাসি,
> দয়া করে' প্রভু রাখ মোর অভিমান।—গীতাঞ্জলি ; ৯৮।

এই গীতে যিনি কপটতা লক্ষ্য করেন, তিনি রবীন্দ্রনাথকে অবশ্য ঋষি বলিবেন না। কিন্তু যিনি এই স্বতঃ-বিকশিত সরল পংক্তি কয়টিকে অকপটোক্তি মনে করেন, তিনি এই গীতের রচয়িতাকে ঋষি বলিয়া অভিনন্দিত করিতে পারেন। যোগ, তপস্যা, সিদ্ধি, সাক্ষাৎকার প্রভৃতি সাধনমার্গের ভাবের হিসাবে কাব্যবিচার করা কর্ত্তব্য নহে। দর্শনের বা বিজ্ঞানের হিসাবে কাব্য সত্য কি মিথ্যা, তাহা নিরূপিত হইতে পারে না। সাধনমার্গের সাক্ষাৎকার কি, তাহা

যিনি সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তিনি ভিন্ন আর কেহ বলিতে পারেন না। প্রকৃত সত্যে উপনীত হওয়া দর্শনের এবং বিজ্ঞানের সাধ্যাতীত। দর্শনের এবং বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত 'অতএবে'র এবং 'সুতরাং'এর আশ্রিত। যে কোনও সময় নূতন যুক্তি বা নূতন প্রমাণ প্রকাশ লাভ করিয়া দার্শনিকের বা বৈজ্ঞানিকের দর্প চূর্ণ করিতে পারে। এই নিমিত্তই এ দেশের দার্শনিকেরা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণে তৃপ্ত না হইয়া আপ্ত বাক্যের উপর স্বীয় মত প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিতেন। আপ্তবাক্যের দিন চলিয়া গিয়াছে। আপ্তবাক্যের বক্তা বলিয়া আমি রবীন্দ্রনাথকে ঋষি বলি না। দর্শনের এবং বিজ্ঞানের বিচারে অতৃপ্ত হইয়া গেটে বলিয়া গিয়াছেন, 'The only form of truth is poetry', 'কাব্যই একমাত্র সত্য'। দর্শনের এবং বিজ্ঞানের প্রতিপাদ্য বিষয় 'বোধ হয়' বা 'হয় ত সত্য', কিন্তু প্রকৃত কাব্যের কথা অনুভূত, জীবন্ত সত্য। বুদ্ধি কাব্যকে যাই মনে করুক, প্রাণ তাহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করে। তাই কাব্য একমাত্র সত্য। দর্শন ও বিজ্ঞান যেখানে প্রাণ স্পর্শ করে, সেখানে তাহা আর দর্শন বা বিজ্ঞান থাকে না, তাহা কাব্যে পরিণত হয়, সত্য হয়। যাঁহারা সাধন ভজন ও সিদ্ধি সাক্ষাৎকারের হিসাবে অতীন্দ্রিয় সত্যের বিচার করেন, তাঁহাদের কাছে আমি পাশ্চাত্য মনীষিগণের যে সকল বচন উদ্ধৃত করিলাম, তাহা হেঁয়ালি বলিয়া মনে হইবে। কিন্তু তপস্যার এবং সাহিত্যের পথ স্বতন্ত্র। এই স্বাতন্ত্র্য যিনি লক্ষ্য করিতে পারেন না, তাঁহার কাব্যালোচনা বিড়ম্বনা; রবীন্দ্রনাথের 'স্তন'ই তাঁহার পক্ষে কাব্যের চরম।

রবীন্দ্রনাথ 'গীতাঞ্জলি', 'গীতালী' প্রভৃতি গ্রন্থে যে পালা গান করিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে একটি কথা উঠিতে পারে। এই পালাটি রবীন্দ্রনাথের নিজের, না ধার করা? যদি রবীন্দ্রনাথের কথা শোনা কথা হয়, তবে আর রবীন্দ্রনাথকে অত উচ্চে বসাইব কেন? নমুনাস্বরূপ আমি 'গীতালি' হইতে দুইটি গীত তুলিব।—

(১) ওরে ভীরু, তোমার হাতে নাই ভুবনের ভার।
হালের কাছে মাঝি আছে করবে তরী পার।
তুফান যদি এসে থাকে তোমার কিসের দায়—
চেয়ে দেখ ঢেউয়ের খেলা, কাজ কি ভাবনায়;
আসুক নাকো গহন রাতি, হোক না অন্ধকার—
হালের কাছে মাঝি আছে করবে তরী পার।

*   *   *

সাথী যারা আছে, তারা তোমায় আপন বলে'
ভাব কি তাই রক্ষা পাবে তোমারি ঐ কোলে? •
উঠবে রে ঝড়, দুলবে রে বুক, জাগ্‌বে হাহাকার—
হালের কাছে মাঝি আছে, করবে তরী পার। ৫৩॥

(২)

চোখে দেখিস্, প্রাণে কানা।
হিয়ার মাঝে দেখনা ধরে, ভুবনখানা।
প্রাণের সাথে সে যে গাঁথা, সেথায় তারি আসন পাতা,
বাইরে তারে রাখিস তবু অন্তরে তার যেতে মানা।

* * *

যে জন তোমার বেদনাতে লুকিয়ে খেলে দিনে রাতে,
সামনে যে ঐ রূপে রসে সেই অজানা হল জানা। ৫৪

এইরূপ ভাবের গান বাঙ্গালার বাউলের মুখে অনেক সময় শুনিতে পাওয়া যায়, এবং রবীন্দ্রনাথের অনেক গীত পাঠ করিলে মনে হয়, বাঙ্গালায় বাউল সম্প্রদায়ের ভিতর দিয়া যে ভাবের ধারা বহিয়া আসিয়াছে, তাহা আদি ব্রাহ্মসমাজের আবহাওয়ায় পরিবর্দ্ধিত রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ে পতিত হইয়া বিস্তার লাভ করিয়াছে। এই বিস্তারের কারণ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য অন্যান্য ধারার সহিত মিলন। তাই যদি হইল, তবে আর রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব কি? তিনি সাক্ষাৎ অনুভব করিলেন কি? তাঁহার মৌলিকতা কোথায়? যে দার্শনিক বা যে বৈজ্ঞানিক অন্যের মত প্রচার করেন, তাঁহার মৌলিকতার দাবী স্বীকার করা হয় না। কিন্তু কবির মৌলিকতা অন্য প্রকারের বস্তু। সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী সমালোচক সাঁ বুভ (Sainte Beuve) লিখিয়াছেন,—

I do not say with one of the most original poets of our time; "What is a great poet? He is a corridor through which the wind blows." No, the poet is nothing so simple, he is not a resultant, or even a mere reflecting focus; he possesses his own mirror, his unique individual *monad.* All that passes through his node and organ is transformed, and when it goes forth again, it is combined and created; for the poet only creates what he receives.

ঊনবিংশ শতাব্দের এক জন অত্যন্ত মৌলিকতাপূর্ণ কবি বলিয়াছেন, 'বড় কবি পদার্থটা কি? বড় কবি অট্টালিকার ভিতরকার পথের মত; তাহার ভিতর দিয়া (বাহিরের ভাবের) বায়ু বহিয়া যায়।' অর্থাৎ, কবি ভাবের স্রষ্টা নহেন, ভাবের বাহকমাত্র। সাঁ বুভ এ কথা সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, কবির মধ্যে তাঁহার নিজস্ব একখানি দর্পণ আছে, স্বতন্ত্র একটি শক্তি আছে। যে সকল ভাব কবির সেই অন্তরের বস্তুর সংস্পর্শে আসে,

তাহা মিলিয়া মিশিয়া নূতন আকারে সৃষ্ট হইয়া বাহির হয়; যাহা কবি বাহির হইতে প্রাপ্ত হয়েন, তাহা লইয়াই তাঁহার সৃষ্টি। বাউলের ভাব, বৈষ্ণবের ভাব, ব্রাহ্মের ভাব রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া নূতন আকারে সৃষ্ট হইয়া গীতে প্রকাশিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ লোকটির সম্বন্ধে আমরা রাগ দ্বেষ পোষণ করিতে পারি, রবীন্দ্রনাথের রচিত অন্যান্য পালা সম্বন্ধে আমরা নানা প্রকার মত পোষণ করিতে পারি, কিন্তু এইরূপ দ্বেষের, এই মত-ভেদের বশবর্ত্তী হইয়া যদি আমরা গীতাঞ্জলির, গীতালির পালা উপেক্ষা করি, তবে আমরা যে 'প্রাণে কানা', তাহাই প্রতিপাদিত হইবে। জীবনের যাহা চরম লক্ষ্য, তাহা এমন করিয়া কয় জনে শুনাইতে পারিয়াছে—

এই কথাটা ধরে' রাখিস মুক্তি তোর পেতেই হবে।
যে পথ গেছে পারের পানে সে পথে তোর যেতেই হবে।
* * *
পাকের ঘোরে ঘোরায় যদি ছুটি তোর পেতেই হবে।
চলার পথে কাঁটা থাকে দলে' তোমায় যেতেই হবে।
সুখের আশা আঁকড়ে লয়ে মরিস্‌নে তুই ভয়ে ভয়ে,
জীবনকে তোর ভরে' নিতে মরণ আঘাত খেতেই হবে।

এমন আশার বাণীই বা কয় জনে শুনাইয়াছে?

কারে ঐ যায় গো দেখা,
হৃদয়ের সাগরতীরে দাঁড়ায় একা?
ওরে তুই সকল ভুলে চেয়ে থাক নয়ন তুলে,—
নীরবে চরণমূলে মাথা ঠেকা॥

বিশ্বের 'প্রকট রহস্য'ই বা কয় জনে এমন করিয়া আঁকিয়া তুলিতে পারিয়াছে,—

ঐ যে সন্ধ্যা খুলিয়া ফেলিল তার
সোনার অলঙ্কার।
ঐ যে আকাশে লুটায়ে আকুল চুল
অঞ্জলি ভরি' ধরিল তারার ফুল,
পূজার তাহার ভরিল অন্ধকার।
ক্লান্তি আপন রাখিয়া দিল সে ধীরে
স্তব্ধ পাখীর নীড়ে
বনের গহনে জোনাকি-রতন জ্বালা
লুকায়ে বক্ষে শান্তির জপমালা
জপিল সে বার বার।

ঐ যে তাহার লুকানো ফুলের বাস
গোপনে ফেলিল শ্বাস।
ঐ যে তাহার প্রাণের গভীর বাণী
শান্ত পবনে নীরবে রাখিল আনি
আপন বেদনা ভার।
ঐ যে নয়ন অবগুণ্ঠনতলে
ভাসিল শিশিরজলে।
ঐ যে তাহার বিপুল জপের ধন
অজপ-আঁধারে করিল সমর্পণ
চরম নমস্কার॥

যে বাউলের গান এত কাল বাঙ্গলার পল্লীর কোণে কোণে গীত হইতেছিল—

By bards who died content on pleasant sward,
Leaving great verse unto a little clan ?—

তাহা আজ সমগ্র সভ্যজগৎ মাতাইয়া তুলিতে উদ্যত হইয়াছে। সুতরাং জমীদার রবীন্দ্রনাথকে, দোকানদার রবীন্দ্রনাথকে, বিলাসী রবীন্দ্রনাথকে, ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথকে, গোঁড়া ব্রাহ্ম রবীন্দ্রনাথকে, স্যার ডাক্তার রবীন্দ্রনাথকে, ভাল লাগে না বলিয়া কি ঋষি রবীন্দ্রনাথের, বাউল রবীন্দ্রনাথের, গান উপেক্ষা করা চলে ?

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ।

সাহিত্যে রুচি ও নীতি।

কাগজে কলমে আমরা ফিরিঙ্গীয়ানার খুবই নিন্দা করি। বাঙ্গালী হইয়া যাহারা পোষাকে-পরিচ্ছদে আচারে-ব্যবহারে সাহেব সাজে, তাহাদের যথেষ্টই ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিয়া থাকি। অথচ আমরা—এই লেখক-জাতিরাও যে এক দিক দিয়া সাহেবীয়ানার রীতিমত মক্স করিতেছি, তাহা একবারও ভাবিয়া দেখি না। সাহেব-বাঙ্গালীকে দেখিলেই আমাদের হাসি আসে, কিন্তু আমাদের লেখা যদি তাহারা পড়ে, তাহা হইলে তাহারাও যে আমাদের চেয়ে কম আমোদ পায়, এমন মনে করি না। তাহারা মুখে 'জাতীয়তা' 'জাতীয়তা' করিয়া চীৎকার করে, কিন্তু কাজের বেলায় তাহাদের আচরণ সম্পূর্ণ বিপরীত। আর আমরা

গদ্যে ও পদ্যে 'জাতীয়তা' শব্দের হরির-লুট করিয়া থাকি, অথচ আমাদের ভাব ও ভাষা বিলাতী বোট্‌কা গন্ধে ভরপুর!—এই ভাবের ঘরে লুকোচুরি করিয়া আমরা যেমন স্বদেশী হইতেছি, তেমনই সাহিত্যসেবীও হইতেছি। অনুকরণের মোহ ক্রমে ক্রমে আমাদিগকে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে!

কিন্তু আত্মদোষ আমরা কিছুতেই স্বীকার করিতে চাহি না।—সে দোষ কেহ দেখাইয়া দিলে, অত্যুক্তির নাম দিয়া সর্ব্বদাই তাহা চাপা দিবার চেষ্টা করি। কিন্তু চাপিয়া রাখাও আর চলে না,—দোষের পরিমাণ উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিতেছে। বাঙ্গালা রচনা বাঙ্গালীর নিকট ক্রমশঃই দুর্ব্বোধ হইয়া উঠিতেছে। 'ভারতী', 'প্রবাসী', বা 'সবুজ পত্র' পড়িয়া অনেক পাঠককেই অনেক সময় হাঁ করিতে দেখিয়া থাকি।

ভাষার দোষই যে ইহার একমাত্র কারণ, তাহা বলি না। ভাষার দোষ ত আছেই—সঙ্গে সঙ্গে ভাবও বিলক্ষণ ব্যভিচারের পথে ছুটিয়াছে। ভাষা যদি বা কষ্টে-স্ৃষ্টে বুঝা যায়, কিন্তু ভাব বুঝিতে, তাহার সৌন্দর্য্য আয়ত্ত করিতে অনেক সময়েই মাথা ঘুরে! কেবল তাহাই নহে। যদি কোনও ভাব বুঝা যায়—যদি তাহা ভাল লাগে, তাহা হইলে, সে ভাব দেখিয়াও অনেক সময় 'বোধ হয়—হউক সরল, হউক সুন্দর, কিন্তু এ বুঝি পরের, আমাদের নহে।' খাঁটী বাঙ্গালায় বাঙ্গালীর প্রাণের কথা শুনিলে যে আনন্দ হয়, ইহাতে তাহা হয় না।

তবে যাঁহারা বিদেশের মালে স্বদেশের সাহিত্য-ভাণ্ডার পূর্ণ করিতেছেন, তাঁহারা এ সব কথা স্বীকার করিতে চাহেন না। তাঁহারা বলিয়া থাকেন, 'ভাব-রাজ্য জগন্নাথ দেবের সার্ব্বজাতিক ভূমি। সেখানে জাতিভেদ নাই। সেখানে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য আসিয়া অনায়াসে তাহাদের ভাব-বৈভবের আদান-প্রদান করিতে পারে।'—কথা কয়টা শুনিতে বেশ উদার, সন্দেহ নাই; কিন্তু যুক্তি-সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। ভাবের উদয় হয়, বুঝি; ভাবের স্ফূর্ত্তি হয়, তাহাও জানি; কিন্তু ভাব উপার্জ্জন করা যায়, ভাষার আদান-প্রদান চলে, এ কথা ভাল বুঝিতে পারি না। ভাবরাজ্য জগন্নাথ-ক্ষেত্রের সহিত উপমিত হইলেও মনে রাখিতে হইবে, সে তীর্থস্থানও ভেদের হাত হইতে পরিত্রাণ পায় নাই। সেখানেও হিন্দুকে মুসলমান খ্রীষ্টানের সহিত জাতিভেদ মানিয়া চলিতে হয়। ইহা অপরি-হার্য্য। শুধু হিন্দু বলিয়া নহে, জগৎ জুড়িয়া ইহার রাজত্ব। ধর্ম্মের ভেদ, সমাজের ভেদ প্রত্যেক জাতির মাঝখানেই এমন একটা প্রাচীর গড়িয়া তুলিয়াছে যে, জাতিতে জাতিতে কিছুতেই এক হইয়া মিলিয়া মিশিয়া যাইতে পারে না।

ভেদে যাহার প্রতিষ্ঠা, ভেদকে পরিহার করা তাহার পক্ষে একেবারে অসম্ভব—আকাশ-কুসুমের মত অলীক।

তেমনই মানুষের ভাবরাজ্য হইতেও জাতিভেদকে কিছুতেই দূর করা যায় না। সেখানেও উহা প্রতিফলিত হইয়া থাকে। এবং ঐরূপ হওয়াটাই স্বাভাবিক। ধর্ম্মবিশেষের বন্ধন মানুষের যে মনকে গড়িয়া তুলে, সে মন সেই ধর্ম্ম বা সমাজের প্রভাব অতিক্রম করিয়া কোনও কাজই করিতে পারে না। যদি পারে, তবে জানিবে সেটা কৃত্রিম—সেটা ফরমায়েসী। মানুষের মন যেখানে শুধু মনের তাগিদে কার্য্য করিয়াছে—তা' সে শিল্পই হউক, সাহিত্যই হউক, আর ভাস্কর্য্যই হউক—সেখানে সে তাহার ধর্ম্ম বা সমাজকে লুকাইয়া রাখিতে পারে নাই। শুনিতে পাই, সেক্সপীয়র-মিল্টনের মত সার্ব্বভৌমিক কবি জগতে কখনও জন্মগ্রহণ করেন নাই; কিন্তু তাঁহাদের সৃষ্ট সাহিত্য পাঠ করিলে দেখা যায়, তাঁহারাও সমাজ-ক্ষেত্রেই সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহাদের কাব্যকলা সকল খৃষ্টানী ধর্ম্মে ওতঃপ্রোত। সহকারে মাধবীলতার মত খৃষ্টানী সভ্যতা তাহাতে জড়াইয়া আছে। আমাদের কিন্তু আধুনিক অধিকাংশ বাঙ্গালা পুস্তক পড়িয়া তাহার জাতির বা ধর্ম্মের নিরূপণ করা যায় না। মনে হয়, 'সবুজপত্র' বা 'প্রবাসী' পড়িয়া ভবিষ্যতে তর্ক উঠিতে পারে যে, এ সময়ে বাঙ্গালীজাতি বলিয়া কোনও জাতি ছিল কি না! বিশ্বজনীনতার দোহাই দিয়া যাঁহারা এখন এ দেশে সাহিত্যের সৃষ্টি করিতেছেন, তাঁহাদের সাহিত্য বিশ্বজনীন হইতেছে কি না, বলিতে পারি না; কিন্তু তাহা যে বাঙ্গালা সাহিত্যে হইতেছে না, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। জাতীয় অনুভূতির দৈন্য তাহার প্রতি পদে প্রকাশ পাইতেছে।

কিন্তু বাঙ্গালী লেখকের এই দোষটাকে গুণ বলিয়া পরিচয় দিবার জন্য জন কয়েক সমালোচক খুব জোরের সহিত কলম চালাইতেছেন। তাঁহাদের যুক্তি এই যে, যাহা সুন্দর, তাহা সর্ব্বত্রই সুন্দর। এই যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া তাঁহারা সমালোচনা জিনিসটারও একটা সার্ব্বভৌমিক মাপকাঠী করিয়া থাকেন। তাহাতে অবশ্য এই সুবিধা হয় যে, বিলাতী সমালোচকের বুলিগুলা আজ-কালকার দেশীয় পুস্তকের আলোচনার সময় বেশ চোখ বুজিয়া ব্যবহার করা চলে। কিন্তু তাহাতে সমালোচনা কি সত্য হয়?

প্রথম কথা, তাঁহারা যে যুক্তিকে ভিত্তি করিয়া সমালোচনার একটি 'সার্ব্বভৌমিক মাপকাঠী' করিতে চাহেন, সে যুক্তিটাই ঠিক বলিয়া মনে হয় না। ভেদের রাজত্বে বাস করিয়া সৌন্দর্য্যের রুচিভেদকে বর্জ্জন করা সম্ভবপর

নহে। সৌন্দর্য্য সম্বন্ধেও জগৎ দারুণ বৈষম্যপূর্ণ। George Payne তাঁহার "Elements of mental and Moral Science" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন,—"Where one sees beauty another perceives none, nay, recognises, it may be, hedious deformity. A Chinese lover would see no attraction in a belle of London or Paris, and a Bond Street exquisite would discover nothing but deformity in the venus of the Hotentots."—সব বিষয়েই এই রকম দেখা যায়। 'পাশ্চাত্যের গান, বাজনা, নাচের বাহ্যিক বিকাশগুলি (expression) সবই সূচ্যগ্রের ন্যায় তীব্র (pointed)। নাচিবার সময় যেন হাত পা ছুড়ে, বাজনাগুলির আওয়াজে যেন কানে সঙ্গীনের খোঁচা দেয়, গানের বেলাতেই তাই বোধ হয়। আর আমাদের দেশের নাচ যেন হেলে দুলে তরঙ্গের ন্যায় গড়িয়ে পড়ে; গানের গমক মূর্চ্ছনাতেও ঐরূপ চক্রনীতির অনুবর্ত্তন (rounded Movement) দেখা যায়।—বাজনাতেও তাই।' তার পর সাহিত্য-ক্ষেত্রেও এইরূপ বিভিন্নতা দেখা যায়। সভামধ্যে দুঃশাসন দ্রৌপদীর বস্ত্র আকর্ষণ করিতেছে—তাহা দেখিয়াও যুধিষ্ঠির স্থির, গম্ভীর। এ সহিষ্ণুতার দৃশ্য হিন্দুর নিকট মহিমময়। কিন্তু পাশ্চাত্যের নিকটে এ দৃশ্য অসহনীয়। তাঁহারা হইলে দুঃশাসনের তৎক্ষণাৎ মস্তকচ্ছেদন করাইতেন। 'বিল্বমঙ্গল' নাটকের বণিক অতিথিসৎকারের জন্য অতিথিকে স্বীয় পত্নীদানে উদ্যত,—এ দৃশ্য পাশ্চাত্যের নিকট হেয় ও ঘৃণ্য।

বিপিনচন্দ্রপ্রমুখ সাহিত্যরথিগণ বলিতেছেন যে, 'সাহিত্য-সমালোচনার একটা মাপকাঠী চাই।' এ কথার অর্থ বুঝিতে পারি না। এক দেশের কাব্য-সাহিত্যের অপর দেশের কাব্য-সাহিত্যের সহিত ঠিক তুলনায় সমালোচনা হইতে পারে না। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস পড়িয়া বিপিনবাবু যে রস উপভোগ করেন, সে রস-উপভোগ কি শেলী-বায়রণ-পাঠে অভ্যস্ত ইংরেজ-পাঠকের অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠা সম্ভব? পশু-যুদ্ধ-প্রিয় স্পেনবাসী তাহাদের নির্দ্দয়তাপূর্ণ নাটক পড়িয়া যে আনন্দ পায়, সে আনন্দ কি তাহারা 'শকুন্তলা' পড়িয়া লাভ করিতে পারে? 'সেক্সপীয়রের Tempest-নাটকের সহিত কালিদাসের শকুন্তলা নাটকের বহুবার তুলনা দেখিয়াছি বটে, কিন্তু সে তুলনা কি ঠিক হইয়াছে? Tempest বায়ুবিহারী দেহী ও কুহকের আশ্রয়ে রচিত, আর 'শকুন্তলা' ঋষির অভিশাপ ও অপ্সরার প্রণয়ভিত্তিতে স্থাপিত। এ দুইএর কি ঠিক মত তুলনায় সমালোচনা

হয়? বিপিন বাবু সাহিত্য-ক্ষেত্রে ‘বস্তুতন্ত্রতা’রও অন্বেষণ করেন, অথচ সাহিত্য-সমালোচনায় একটা মাপকাঠী করিতেও চাহেন। কিন্তু এই দুই কি একত্র পাওয়া যায়? সোনার পাথর বাটী কি সম্ভব?

আসল কথা, মুখস্থ কথাই আমাদের একমাত্র সম্বল বলিয়া এত বিভ্রাট ঘটিতেছে। ইংরাজী সমালোচনার সহিত আমাদের সমালোচনার মিল না হইলেও যে তাহা সত্য হইতে পারে, এ কথা আমরা ভাবিতে পারি না। ফলে, আমাদের রুচি বিকৃত হইতেছে, নীতি হইতেও আমরা ভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছি। রুচি যে বিগ্‌ড়াইতেছে, হাতে হাতে তাহার প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের আধুনিক রচনা। রবীন্দ্রনাথ এখন লোকোত্তর রাম-চরিত্রে বিদ্রূপ-বাণ বর্ষণ করিতেছেন; সতীশিরোমণি সীতা দেবীর চরিত্রে কুৎসিত কটাক্ষ করিতেছেন। শুধু তাহাই নহে। দেশ-মাতার রূপ বর্ণনা করিতে যাইয়াও কবি নিজের বিকৃত রুচি ঢাকিতে পারেন নাই। বলিতেছেন,—

“অয়ি ভুবনমনমোহিনী!”

জননীর রূপের কথা কি এমন করিয়া বলিতে আছে?

রুচি বিগ্‌ড়াইতেছে বলিয়া নীতিকেও আমরা সাহিত্য-সংসার হইতে বিদায় করিবার চেষ্টা করিতেছি। এ বিষয়েও অগ্রগণ্য সার রবীন্দ্রনাথ। তিনি বলিতেছেন, “কোন দেশেই সাহিত্য স্কুলমাষ্টারির ভার লয় নাই।” অথচ তাঁহার আধুনিক অধিকাংশ রচনাই স্কুলমাষ্টারি করিবার উদ্দেশ্যে রচিত হইতেছে! তাঁহার ‘গোরা’, ‘অচলায়তন’ ও ‘ঘরে বাহিরে’ প্রভৃতি গ্রন্থগুলি উদ্দেশ্যমূলক। কিন্তু তাঁহার এ সাহিত্য-সৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া অনেকেই তাঁহার কথাটা লইয়া লোফালুফি করিতেছেন। তাঁহারা বলিয়া থাকেন, নাটক-নভেল ‘with a purpose’ হইবে কেন? কিন্তু সাহিত্য-শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন,—“অধিকাংশ কাব্যে চিত্তরঞ্জন প্রবৃত্তিই লক্ষিত হয়—তাহাতে চিত্তরঞ্জন ভিন্ন গ্রন্থকারের অন্য উদ্দেশ্য থাকে না, এবং তাহাতে চিত্তরঞ্জনোপযোগিতা ভিন্ন আর কিছু থাকেও না। কিন্তু সে সকলকে উৎকৃষ্ট কাব্য বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না।…কবিরা জগতের শ্রেষ্ঠ শিক্ষদাতা।” তার পর গিরিশচন্দ্র বলিতেছেন,—“কেবল আনন্দদানে কলাবিদ্যাবিশারদের তৃপ্তি নহে। তাঁহার আজীবন উত্তম, কিরূপে আনন্দস্রোত মানব-হৃদয় স্পর্শ করিয়া মানবের উন্নতি সাধন করিতে পারে। গাম্ভীর্য্য ও মাধুর্য্যপূর্ণ দৃশ্য সকল অঙ্কিত করিয়া, দর্শকের চক্ষের সম্মুখে ধরেন।” পাশ্চাত্য কবি ডিকইন্স বলেন যে,—“উচ্চ অঙ্গের

কাব্য বা নাটক পড়িয়া আমরা আমোদ পাই—এ কথা বলিতে গেলে সে কাব্য বা নাটকের অবমাননা করা হয়।" তিনি বলেন, "আমাদের হৃদয়ের নিভৃত স্তরে অনেক মহান্ ভাব এমন সুষুপ্তভাবে অবস্থান করে যে, প্রাত্যহিক জীবনের কোনও ঘটনাই তাহাদিগকে জাগাইয়া দিতে পারে না, কিন্তু প্রকৃত কবিদের কাব্য পাঠ করিতে করিতে সেই সকল ভাব জাগরিত হইয়া উঠে, এবং আমরা ক্ষুদ্র নীচ হইতে যে প্রকৃতপক্ষে কত দূর উচ্চপদবীগত, তাহার প্রতি তখন আমাদের চেতন হয়।" ইংরেজ কবি ওয়ার্ডসোয়ার্থও উদ্দেশ্যমূলক রচনার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বলিতেন,—"I wish to be considered a teacher or as nothing."—কাজেই বলিতে হয় যে, 'সাহিত্য স্কুল-মাষ্টারী করে না'—এ কথা ঠিক নহে।

'art for art's sake' কথাটা এ দেশের নহে। পূর্ব্বে বিদেশেও উহার প্রভাব ছিল না। জোলাকে বাঁচাইবার জন্যই ঐ কথার প্রচার হয়। কিন্তু যে দেশের জাতীয় মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত, সে দেশে ও কথার স্থান নাই। সে দেশে 'art for art's sake' বলিয়া রুচির ও নীতির মাথায় পদাঘাত করিলে অন্যায় হইবে। সে দিন "ধর্ম্ম ও আর্ট" নামে একটি প্রবন্ধে দেখিলাম, শ্রদ্ধাস্পদ বিপিনচন্দ্র একটা জঘন্য বাঙ্গালা গল্পের একটা জঘন্য নায়িকাকে বাঁচাইতে গিয়া কুন্তীর কথা তুলিয়াছেন! দেখিয়া বিস্মিত হইলাম! যে কুন্তী-চরিত্র স্নেহ, দয়া, তুষ্টি, ভক্তি ও সেবাভাবের আধার, সেই চরিত্রের সহিত কি না একটা কামুকীর তুলনা? আমরা কথায় কথায় ব্যাস বাল্মীকির টিকি ধরিয়া টানাটানি করি, কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখি না যে, তাঁহারা কি মহান্ উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া তাঁহাদের মহাকাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের কাব্যে নিকৃষ্ট চরিত্র অনেক আছে, স্বীকার করি; কিন্তু মনে রাখিতে হইবে,সেগুলি উৎকৃষ্ট চরিত্রকে আরও উজ্জ্বল করিবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে। তাহাদিগকে বড় করিয়া দেখাইবার জন্য নহে। এ সম্বন্ধে 'সাহিত্য-দর্পণ'-কারের বেশ একটি চমৎকার কথা আছে। তিনি বলিয়াছেন,—"চতুর্ব্বর্গফলপ্রাপ্তিঃ কাব্যতো রামাদিবৎ প্রবর্ত্তিতব্যং ন রাবণাদিবদিত্যাদি কৃত্যাকৃত্যপ্রবৃত্তিনিবৃত্ত্যুপদেশদ্বারেণ সুপ্রতীতৈব।" কথাটা ঠিক। 'রামায়ণ' পড়িয়া রাম হইবার সাধ হয়, রাবণ হইতে ইচ্ছা করে না। কুৎসিত আঁকিয়া কুৎসিতের প্রতি ঘৃণার উদ্রেক করাই শ্রেষ্ঠ শিল্পীর কাজ। শুনিতে পাই, 'ইয়োরোপে এক জন উচ্চদরের শিল্পী কামের ছবি প্রস্তরে

হাব ভাব এত ঘৃণার উদ্দীপক যে, সে মূর্ত্তিদর্শনে কামুকের হৃদয় হইতেও কামভাব দূর হয়।' এ মূর্ত্তি আমরা দেখি নাই সত্য, কিন্তু এরূপ ঘৃণিত মূর্ত্তি ক্ষোদিত করা যে সম্ভব, তাহা গিরিশচন্দ্রের অঙ্কিত চিন্তামণি ও উজ্জ্বলার ছবি দেখিয়া সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি।

আসল কথা, সাহিত্য-সৃষ্টির পক্ষে সৌন্দর্য্য যেমন অপরিহার্য্য, নীতিও তাহার অপেক্ষা অল্প নহে। আমাদের দেশের অলঙ্কারশাস্ত্রে আছে যে, কাব্য-রচনার একটি প্রধান উদ্দেশ্য—"কান্তাসম্মিততয়োপদেশযুজে"—অর্থাৎ, কাব্য কান্তার ন্যায় মধুর ভাবে উপদেশ-দান করিতে পারে। অলঙ্কারশাস্ত্রের এই নিয়মটা আমাদের পালন করিয়া চলা উচিত। নহিলে হাজার কলা-কৌশল থাকিলেও ভারতীয় সাহিত্য হিসাবে যথেচ্ছাচারী সাহিত্যের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইবেই।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়।

'কোপারেশন'।

১

প্রথমবারের চেষ্টা।

আমাদের গ্রামে 'কোপারেশনে'র খুব ধুম। তিন চারিবার ইহার বিরাট চেষ্টা হইয়া গিয়াছে, এবং এত সুফল ফলিয়াছে যে, জগতে তাহা প্রচার না করা মহাপাপ। সত্যপ্রচার করিবার জন্যই বোধ হয় মানবের সৃষ্টি, নচেৎ তাহার কথা কহিবার এবং লিখিবার ক্ষমতা কেন হইল?

প্রথমে আমাদের গ্রামের ইতিহাসটা কিঞ্চিৎ বলা ভাল। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে এখানে অনেক গরু ছিল। ক্রমে তাহারা অনাহারে ও অনাদরে মরিতে আরম্ভ করিলে, তাহাদের সদ্গতির জন্য দুই চারি জন চামড়ার ব্যবসায়ী উপস্থিত হইল। ফলে এখন গোজাতি জুতায় পরিণত হইয়াছে। পুনর্জ্জন্ম হইলে জীব চেনা যায় না। তবে জুতার মুখ অনেকটা গরুর মুখের মতন, এবং ছিঁড়িয়া গেলে ঘাস খায়, এই দেখিয়া যতটুকু বুঝা সম্ভব, তাহা বুঝিতে পারা যায়।

গরু মরিয়া গেল কেন? উত্তর—কেহই চিরস্থায়ী নহে। ভূমণ্ডলে পূর্ব্বে অনেক জীব ছিল, যাহাদিগের বংশের এখন কোনও সন্ধান পাওয়া যায় না। আর একটা কারণ ঘাসের অভাব। হয় ত জঙ্গল, কিংবা চাষের জমীই বেশী। ঘাসের জমী এখন পাওয়া যায় না। আর একটা কারণ, খইল এবং অন্যান্য-

খাদ্যেরও অভাব। সর্ষপের চাষ কমিয়া গিয়াছে। পোয়ালি পাওয়া সহজ কথা নয়। যে সকল খাদ্য খাইয়া মানুষ ও গরু বাঁচে, সেগুলি কোন দিক দিয়া কোথায় চলিয়া যায়, তাহা বুঝা যায় না। শেষ কারণ এই যে, গরুর সেবা করিবার লোক নাই। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণকন্যাও গরুর সেবা করিত। এখন সকল কন্যাই সেবা করিতে নারাজ। গরু ছাড়িয়া এখন সকলে জন্মভূমির সেবা আরম্ভ করিয়াছে।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে গোবংশের শঙ্কাজনক হ্রাস দেখিয়া বিপিনবিহারী প্রামাণিক অনেক ঘোড়া ও ছাগলের আমদানী করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা তিষ্ঠিল না। গ্রামটি ছোট, এবং ঘোড়া ও ছাগল পলায়নপরায়ণ জানোয়ার। সুবিধা পাইলেই তাহারা খোঁয়াড়ে ঢুকিয়া পড়িত, কিংবা গ্রামান্তরে পলাইয়া যাইত। তিন চারি বৎসরের মধ্যেই সকলের পাঁঠা খাওয়া এবং ঘোড়ায় চড়া বন্ধ হইয়া গেল। শরীরে যেটুকু জোর হইয়াছিল, তাহা ১৯০১ খৃষ্টাব্দের জ্বরে অতিশয় কমিয়া গেল। প্রামাণিক মহাশয় বেশীর ভাগ লোককে সহরে যাইবার পরামর্শ দিলেন।

সহরে গিয়া প্রায় দশ বার বৎসরের মধ্যে তাহারা অনেক উপার্জ্জন করিয়াছিল। মধ্যে মধ্যে তাহারা অনেক টাকা 'মণীঅর্ডার' করিয়া পাঠাইত, এবং লিখিত, 'সহরে হাঁসের ডিম বড় দুষ্প্রাপ্য, যদি তোমরা ডিম পাঠাইতে পার, তবে আমরা একটা "কোপারেটিভ্" সমিতি স্থাপন করিতে পারি।' আমরা ইহার অর্থ তখন কিছু বুঝি নাই, কিন্তু অনেকগুলি হাঁস যোগাড় করিয়া পুষ্করিণীতে চরাইতে আরম্ভ করিলাম। পুষ্করিণীর জল কম, মৎস্যের অভাব, সুতরাং কীটে পরিপূর্ণ। কীট ও মৃণাল খাইয়া হাঁস বাড়িয়া গেল, এবং অপর্য্যাপ্তপরিমাণে ও নিঃস্বার্থভাবে ডিম পাড়িতে লাগিল। আমাদের সহরের বিজ্ঞ আত্মীয়গণ তাহার খুব প্রশংসা করিতেন, এবং মধ্যে মধ্যে জন্মভূমি পরিদর্শন করিয়া যাইতেন। সকলে বলিত, 'দাদা, কেবল এই ডিমের জোরেই কলিকাতা সহরে বাঁচিয়া আছি'। আমরা তাহা শুনিয়া জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিতাম।

মধ্যে এক জন ডাক্তার (অনুমান ১৯১৩ খৃঃ) আমাদের গ্রামে একটা তদন্তে আসিলেন। তিনি রয়েল ব্যাক্টিরিওলজিক্যাল্ সোসাইটীর মেম্বর। তাঁহার তদন্তের উদ্দেশ্য এই:—'মানব জাতি কত রকম ডিম খাইয়া জীবনধারণ করিতে পারে, এবং তাহার মধ্যে কত রকম ভারতবর্ষের গ্রামে গ্রামে পাওয়া যায়।' আমরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম যে, বিংশ

শতাব্দীতে মানবের খাদ্যাভাব হইয়া পড়িয়াছে। খাদ্যের মূল্য বাড়িয়া গিয়াছে, এবং খাঁটী খাদ্য পাওয়া অসম্ভব। অথচ প্রাকৃতিক নিয়ম যে, খাদ্যাভাব হইতে পাইবে না। যে যুগ যে রকম, প্রকৃতি তাহার খাদ্যও সেই রকম যোগাইয়া থাকেন। যে পরিমাণে এবং অনুপাতে নানাবিধ কীটপতঙ্গের ডিম বাড়িতেছে, তাহাতে বুঝা যায় যে, ভবিষ্যতে ইহাদের ডিমই মানবের প্রধান খাদ্য হইবে। যে সকল জন্তুর ও পতঙ্গের ডিম অপর্য্যাপ্তভাবে ও অনায়াসে বাড়ে, তাহার তালিকা ঠিক হইয়া গেলে আর খাদ্যাভাব থাকিবে না।

আমরা প্রায় এক মাস ধরিয়া খাটিয়া একটা তালিকা করিয়া দিলাম। যত রকম পশুপক্ষী, পোকামাকড় ও ডোবার মৎস্য মানুষের খাদ্যরূপে পরিণত হওয়া সম্ভব, তাহার তালিকা হইলে ডাক্তার বলিলেন, 'তোমরা এইগুলির তত্ত্বাবধান কর, এবং কলিকাতায় চালান্ দাও। ইহার মধ্যে যে ফস্‌ফোরাস্ ও নাই-ট্রোজেন্ পাওয়া যায়, তাহা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বাহির করিয়া লইয়া টিনের মধ্যে বন্ধ করিয়া দিলে অতি পুষ্টিকর ও সুস্বাদু হইয়া পড়িবে।' প্রায় দুই বৎসর ধরিয়া আমরা এই সকল ডিম সংগ্রহ করিয়া দিতেছি, এবং মূল্যও বেশ পাওয়া যায়।

তাহারই এক বৎসর পরে (১৯১৫ খৃঃ) কোনও 'ঘৃত ম্যানুফ্যাক্‌চারিং কোম্পানী'র এক জন এজেণ্ট্ মৃত মূষিক, সর্প, ভেক ও অন্যান্য চর্ব্বিযুক্ত পশুর দেহ-সংখ্যা নির্ণয় করিতে আসিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য যে, চর্ব্বি বাহির করিয়া ঘৃতের মধ্যে মিশাইয়া দিলে আর অভাব থাকিবে না। চর্ব্বি পদার্থ কখনও নষ্ট হয় না, এবং মৃতদেহের সহিত মাটীতে মিশিয়া গেলে তাহার অপব্যয় হয়। আমরা প্রায় ছয় মাস ধরিয়া বনবাদাড় অনুসন্ধান করিয়া নির্ণয় করিলাম যে, কেবল আমাদের গ্রাম্য জন্মভূমিতেই মাসে প্রায় ত্রিশ মণ চর্ব্বি-ঘৃত তৈয়ারি হইতে পারে, এবং চালান্ দিলে তাহার মূল্য পাইতে পারি। এই নূতন কারবারে আমরা মনঃসংযোগ করিয়া অনেক টাকা সঞ্চয় করিতেছি।

আমাদের গ্রামের উল্লেখযোগ্য ইতিহাসের মধ্যে এইটুকু। তবে বলা বাহুল্য, এখানে একটা বালিকাবিদ্যালয় আছে। বালকের বিদ্যালয় উঠিয়া গিয়াছে। ভট্টাচার্য্য মহাশয় ও গুরুমহাশয় (একই ব্যক্তি) এখনও সন্ধ্যা-আহ্নিকাদি করিতে-ছেন। পূর্ব্বাপেক্ষা প্রাণের আশঙ্কা কমিয়া গিয়াছে।

২

বিপিনচন্দ্র প্রামাণিকের নাম পূর্ব্বে বলিয়াছি। তিনিই আমাদের গ্রামের

এক জন বর্দ্ধিষ্ণু লোক। তাঁহার শ্যালকের নাম হারাধন। হারাধন সহরে থাকিত, এবং সম্প্রতি একটা নূতন চাকুরী পাইয়াছিল। সকলে বলিত, হারাধন 'কোপারেটিভ্ ইন্‌স্‌পেক্টর'। সে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইত, এবং কি করিয়া টাকা ধার লইলে দরিদ্র-সমাজে আর অন্নকষ্ট থাকিবে না, তাহা সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দিত।

একদিন প্রামাণিক মহাশয় বলিলেন, 'হারাধন এখানে লেকচর্ দিতে আসিবে। তোমরা স্ত্রীপুরুষ, বালকবালিকা, সকলে প্রস্তুত থাক। সে যে কথা বলিবে, তাহা মূল্যবান্, এবং তাহা যদি পালন কর, তবে ভবিষ্যতে আর দুঃখ থাকিবে না। ছেলেপুলে সকলে নাচিয়া উঠিল, এবং 'প্লাকার্ড' ছাপাইবার জন্য জন কতক কলিকাতায় চলিয়া গেল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় 'কোপারেশনে'র একটা তর্জ্জমা (অনুবাদ) সংস্কৃত ভাষায় করিয়া দিলেন—'রেন কিত্বা ঘ্রতপিপে' (ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ ?)

নির্দ্ধারিত দিনে হারাধন গরুর গাড়ীর উপর সওয়ার হইয়া গ্রামে উপস্থিত হইল। স্ত্রীপুরুষ বালকবালিকা সারি সারি তাহাকে দেখিবার জন্য পথে দাঁড়াইয়া গেল। প্রামাণিক মহাশয়ের বহির্বাটীতে প্রজাগণ একত্র হইয়া স্মিতমুখে পরস্পরের দিকে চাহিতে লাগিল। সন্ধ্যার সময় ঠাকুরদালানে আরতি হইবার পর হারাধন একতাড়া কাগজ লইয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিল।

হারাধনের বক্তৃতা।—'একত্র হইয়া আমাদের পরস্পরের দুঃখমোচনের ভার লইবার দিন আসিয়াছে। সকলে পরস্পরকে বিশ্বাস না করিলে সমাজ চলিতে পারে না। দায়িত্বগ্রহণ না করিলে বিশ্বাস জন্মে না। দায়িত্ব হয় কিসে? টাকা কড়িতে টান না পড়িলে দায়িত্ব হয় না। কতকগুলি লোক মিলিয়া যদি এক স্থানে টাকা রাখে, এবং দরকার হইলে সেই টাকা ধার লইয়া সৎ অর্থে খাটায়, এবং মেহনত করিয়া তাহাতে সুফল ফলায়, এবং যথাসময়ে তাহা সুদ সমেত আদায় করিয়া দেয়, তাহা হইলে অল্পদিনের মধ্যেই দৈন্যদশা ঘুচিয়া যায়। যদি কেহ সদর্থে না খাটায়, টাকা ধার লইয়া উড়াইয়া দেয়, কিংবা পরিশ্রম না করিয়া বসিয়া তাহা খায়, তবে তাহার জন্য সকলে দায়ী। এই রকম নিয়মে একটা সমিতি স্থাপন করিয়া পরস্পরের প্রতি লক্ষ্য রাখিলে নৈতিক উন্নতি, এবং অর্থসঞ্চয় অনায়াসে হইতে পারে। তবে ইহার মধ্যে অনেক শক্ত কথা আছে। প্রথম উদ্যমে বেশী কিছুই হয় না। অল্প লোক লইয়া আরম্ভ করিতে হয়; নচেৎ পরস্পরের প্রতি লক্ষ্য থাকে না। আর

সকলেরই প্রাণপণে পরিশ্রম করা চাহি। ইহা অনেকটা একান্নবর্ত্তী পরিবারের মত। মনে করুন, পরিবারের সঞ্চিত অর্থ সকলেরই, এবং যাহার যত শক্তি, মধ্যে মধ্যে পরিবারস্থ লোক তাহাতে আরও জমা করে, এবং সেই জন্য দরকার হইলে বাহির হইতেও ধার করিয়া আনে। এই রকম একটা মূলধনের সৃষ্টি হইলে ঋণের খাতা খোলা যাইতে পারে। আমরা এখন দরকার হইলে ঋণ করিতে মহাজনের নিকট যাই, তাহার সুদ অনেক। ঘরে টাকা ধার পাইলে বাহিরে যাইবার দরকার কি? তবে কথা উঠিতে পারে যে, একান্নবর্ত্তী পরিবার টেঁকে না কেন? উত্তর, চক্ষুলজ্জা এবং স্নেহমমতা। নিজের আত্মীয় স্বজন বসিয়া থাকে; অন্ন রাঁধিবার জন্য ব্রাহ্মণ ভাড়া করিতে হয়। সকলে এত অলস যে, এক তিল সাহায্য করিতে চাহে না, এবং কোনও কথা বুঝাইতে গেলে লগুড়-হস্ত হয়। টাকা যাহা উপার্জ্জন করা যায়, সকলে নেশায়, জুতায়, এবং অপদার্থ কাপড় চোপড়ে, কিংবা সহরে গিয়া, উড়াইয়া দেয়। দাস দাসী হইতে আত্মীয় স্বজন সকলেই চুরীর চেষ্টায় ফিরিয়া বেড়ায়। এ স্থলে আমাদের কথা কহিবার যো নাই। কিন্তু যদি পরিবার আত্মীয় স্বজনের গণ্ডীর বাহিরে গিয়া আমরা গ্রামের দশ জন মিলিয়া একত্র একটা কারবার করি, তথন এই চক্ষুলজ্জা থাকিবার কোনও কারণ নাই। কেহ ফাঁকি দিতে চেষ্টা করিলে তাহার টাকা তৎক্ষণাৎ নানা উপায়ে আদায় করা যাইতে পারে। সম্প্রতি এই রকম সমিতির জন্য আইন কানুন হইয়া গিয়াছে, এবং তাহা রেজেষ্ট্রী হইয়া গেলে আমরা পরিদর্শনে আসি, এবং গোলমাল হইলে তাহা প্রাণপণে সংশোধন করিয়া দিই। সমিতির মধ্যে যদি দুষ্ট মেম্বার থাকে, তবে তাহার মাল ক্রোক করিয়া, হয় তাহাকে বাহির করিয়া দিই, কিংবা উপযুক্ত শিক্ষার জন্য দেওয়ানী জেলে পাঠাই।'

যশোদা গয়লানী (এক জন বৃদ্ধা) বলিয়া উঠিল, 'বাবা, আইনকানুনের মধ্যে মেয়ে ছেলেদের ক্রোকের কোনও কথা আছে?'

হারাধন। না। স্ত্রীলোক লইয়া সমিতি হইতে পারে না, এবং স্ত্রীলোকরাও আপোষের মধ্যে এ রকম সমিতি করিলে চলিতে পারে না। স্ত্রীলোকদিগকে ক্রোক করিবার শক্তি কাহারও নাই, এবং তাহাদিগকে জেলেও দেওয়া যায় না।

বৃদ্ধা। (সতেজে) বাবা! তবে এ সমিতি চলিবে কিসে? টাকা যে তাদের হাতে। আর তোমাদের মধ্যে যদি কেহ ফাঁকি দিতে চাহে, স্ত্রীলোক ছাড়া তার সন্ধান দিবে কে?

হারাধন। নানা প্রকারে যোগাড় করিয়া লওয়া যাইতে পারে। তবে আসল কথা যে, আমরা এই যুক্ত কারবারের উপযুক্ত হইয়াছি কি না, তাহা অগ্রে দেখা উচিত। প্রথমেই রেজেষ্ট্রী করিয়া ও নাম লিখাইয়া হাস্যাস্পদ হওয়ার চেয়ে নিজে একটা ছোটখাট চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারেন। আপনারা বলিতে পারেন যে, যাদের নিজের পরিবারের উপর হাত নাই, এবং যাহাদের সংশোধন করিবার শক্তি নাই, তাহারা বাহিরের লোককে চালাইবে কি করিয়া? কিন্তু উহা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই বিবাদ মিটিয়া যাইবে। পূর্ব্বকার একান্নবর্ত্তী পরিবার এখন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এখন আমরা প্রত্যেকে কেবল স্ত্রীপুত্র লইয়াই ঘরকন্না করি, সুতরাং বেশী বেগ পাইবার কোনও ভয়ই নাই। এখন আপনারা ভাবিয়া দেখুন, কি রকম কারবার আরম্ভ করিলে আপনারা পরস্পরের দুঃখ দূর করিতে পারেন। শেষ কথা, প্রাণপণে পরিশ্রম করা চাই। বসিয়া থাকিলেই সর্ব্বনাশ।'

৩

হারাধনের বক্তৃতা আমাদের গ্রাম্য ইতিহাসের একটা নূতন পৃষ্ঠা খুলিয়া দিল। প্রথমে আমরা মনে করিয়াছিলাম যে, জিনিসটা 'ভুয়া'; কিন্তু পরে কারবার করিয়া ইহার সারত্ব বুঝিতে পারিলাম। অনেকে সন্দেহ করিয়াছিল যে, সম্প্রতি আমাদের ডিম ও পোকামাকড়ের কারবার বন্ধ হইয়া যাইবে। কিন্তু দেখা গেল যে, উভয়েই বেমালুম চলিতে পারে।

আমাদের প্রথম চেষ্টায় যে সকল বিঘ্ন ঘটিয়াছিল, তাহা উল্লেখযোগ্য, এবং পরে সেগুলি নিবারণ করিয়া আমরা যে উপায়ে 'কোপারেশন' চালাইয়াছিলাম, তাহাও লিখিবার জিনিস। আসরে নামিয়াই আমরা দেখিলাম যে, চাষ ভিন্ন খাদ্য যোগাইবার কোনও উপায় নাই; এবং চাষ করিতে হইলে লাঙ্গল এবং বলদ চাহি, এবং বলদ চালাইবার জন্য খুব কর্ম্মঠ এবং কষ্টসহিষ্ণু চাষীর দরকার। আমাদের দলের মধ্যে হাবু দিনকতক কোন কৃষি কলেজে 'মেস্‌টন' নামক বিরাট লাঙ্গল চালাইয়া কীর্ত্তি লাভ করিয়াছিল। সে বলিল, 'গ্রাম্য বলদ চালানো কি একটা শক্ত কাজ? আমাকে দাও।'

আমরা হৃষ্টচিত্ত হইয়া হাবুর চাষ দেখিতে গেলাম। প্রথমে দু চারি বার চলিবার পর বলদ থামিয়া গেল, এবং হাবু তাহাদের সাহায্য করিতে গিয়া গলদঘর্ম্ম হইল। বলদ বার বার এই রকম অভিনয় করাতে হাবু লগুড়াঘাত আরম্ভ করিল, এবং তাহা এড়াইবার জন্য বলদ চক্ষু উল্টাইয়া চিৎপাৎ হইয়া পড়িল!

হাবু সরোষে বলিল, 'এ সব চালাকী! দেশের অবস্থা বড় খারাপ, বলদ পর্য্যন্ত লাঙ্গলে ঘাড় দিতে চাহে না।'

আমরা তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম।

হাবু। বলদের সঙ্গে ও গরুর সঙ্গে এখন পৃথিবী জুড়িয়া একটা রেষারেষি চলিতেছে। তাহার কারণ, বলদ কেবল খাটে, এবং গরু বসিয়া খায়। বলদের পরিশ্রমে যে শস্য হয়, এবং যাহা খাইয়া আমরা বাঁচি, তাহা শ্রমজাত। গরুর কোনও পরিশ্রম নাই, তাহারা কেবল প্রকৃতিজাত দুগ্ধ দেয়। হেকেলের 'ইভলিউসন্ অফ্ ম্যান্' নামক বিখ্যাত পুস্তক পাঠ করিয়া দেখিতে পারেন যে, এক সময় পুরুষ মানুষও স্ত্রীলোকের ন্যায় সমানে দুগ্ধ দিত, এবং উভয়ে সমানে খাটিত। কিন্তু কাল ক্রমে সেটা উঠিয়া যাওয়াতে কেবল সন্তান প্রসব করিবার নিমিত্ত স্ত্রী রহিয়া গিয়াছে, এবং পুরুষ লাঙ্গল টানিতেছে।

আমাদের মধ্যে এক জন প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, 'যদি গরু লাঙ্গল টানে, তবে গোবৎসের সংখ্যা কম হইবার সম্ভাবনা।'

হাবু। ঠিক। আমরা কৃষিবিদ্যালয়ে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, এক যোড়া গাভী দিয়া লাঙ্গল চলে না, তাহারা কলহ করে। কিন্তু যদি একটা বলদ ও একটা গরু এক সঙ্গে লাঙ্গলে জুড়িয়া দেওয়া যায়, তবে সুচারুরূপে কৃষি-কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। হক্সলি ও ডারউইন্ প্রভৃতি বিখ্যাত মনীষিগণ বিচার করিয়া দেখিয়াছেন যে, বিবাহপ্রথার মূলে 'কোপারেশনে'র এই প্রথম সূত্র নিহিত। জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম, সকলই এই তত্ত্বের মধ্যে।

আমরা ক্রমে পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম যে, কথাটা ঠিক, এবং সেই অবধি একটা বলদ ও একটা গরু আমরা লাঙ্গলে জুড়িয়া দিতে লাগিলাম। এখন বলদও চিৎপাৎ হইয়া পড়ে না, এবং গাভীও যথাসাধ্য বলদকে টানিয়া লইয়া যায়। গোজাতির এই প্রকার উচ্চ দৃষ্টান্ত দেখিয়া কৃষকেরাও আর অলসভাবে বসিয়া থাকে না।

গ্রামে পুনর্ব্বার গোজাতির উন্নতি হওয়াতে ফসল বাড়িয়া গেল, এবং ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভেই আমাদের মূলধন প্রায় তিন হাজার টাকায় দাঁড়াইল। আমাদের মেম্বরের সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ জন।

হারাধন ইনস্পেক্টর আমাদের উন্নতি দেখিয়া খুব খুসী। তিনি প্রামাণিক মহাশয়ের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া একদিন বলিলেন, 'দেখ, মরা ইঁদুর প্রভৃতির চর্ব্বি ও পোকা মাকড় যোগাড় না করিয়া

কাতায় চালান দাও, তবে দেশের খুব উপকার হয়। কল-কারখানার খাদ্য ভয়ঙ্কর অপকারী।'

আমরা বলিলাম, 'এ গ্রামে গয়লার সংখ্যা বড় কম। মাখম তুলিয়া ঘৃত প্রস্তুত করা আমাদের অভ্যাস নাই।'

হারাধন বাবু হাবুর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া বলিলেন, 'যদি স্ত্রীলোকেরা ইহাতে যোগ দেয়, তবে কারবারটা অনায়াসে চলে। স্ত্রীলোকেরা গোষ্ঠ হইতে দুগ্ধ দুহিয়া আনিবে। দুগ্ধ বাড়াইতে হইলে গরুর সংখ্যা বাড়াইতে হইবে, এবং তাদের আহারের জন্য জমী 'রিজার্ভ' করিয়া রাখিতে হইবে। মেম্বরগণের মধ্যে যে গৃহস্থ প্রত্যহ যত দুগ্ধ লইবে, তাহার হিসাব সাবধানে রাখা উচিত, এবং যত ঘৃত তৈয়ার হইবে, তাহা বুঝিয়া লইয়া কেরোসিন তৈলের টিনে পুরিয়া কলিকাতায় চালান দিলে 'সেন্‌ট্রাল কোপারেটিভ্ ডেয়ারি ফারম' তাহা কিনিয়া লইবেন। কিন্তু আসল কথা, খাঁটী জিনিস হওয়া চাহি, এবং যাহাতে চুরি না যায়, তাহার প্রতি অনবরত দৃষ্টি না রাখিলে কারবার চলিবে না।'

ঘৃতের কারবার আমাদের বেশ পছন্দ হইল। প্রামাণিক মহাশয় বলিলেন, 'বালিকা-বিদ্যালয়ের সম্মুখে একটা প্রকাণ্ড গোষ্ঠ খুলিতে হইবে, এবং মেয়েদের দুগ্ধ দুহিবার, মাখন তুলিবার, এবং ঘৃত প্রস্তুত করিবার কৌশল শিখাইতে হইবে। যশোদা গয়লানীকে বিশ টাকা বেতনে গুরুমা রাখিয়া দাও। তৈল প্রস্তুত করিবার জন্য একটা ছোট কল লইয়া আইস, এবং গ্রামের যত বালক এবং বালিকা, যাহাদের লেখাপড়া শিখিবার ইচ্ছা নাই, কিংবা যাহারা পড়া মুখস্থ করিতে পারে না, তাহাদের কল ঘুরাইতে দাও। দৈনিক দুই আনা পড়তায় যে যত খাটে, তাহার হিসাব ভূতপূর্ব্ব গুরুমহাশয়কে কড়ায় গণ্ডায় রাখিতে হইবে। স্ত্রীলোকেরা যত দুগ্ধ গোষ্ঠ হইতে দুহিয়া লইয়া যায়, তাহার হিসাব ভট্টাচার্য্য মহাশয় রাখিবেন।' প্রথমে ভাবিয়াছিলাম যে, এই 'কোপারেটিভ গোষ্ঠ' একটা হাস্যকর ব্যাপার হইয়া পড়িবে। কিন্তু তাহা না হইয়া খুব আনন্দময় ও সুদৃশ্য ব্যাপার হইয়া পড়িল। প্রত্যূষে স্ত্রীলোকদের সারি সারি বসিয়া দুগ্ধ-দোহন, ছোট ছোট ছেলে ও মেয়েদের কলের ঘানি-আকর্ষণ, এবং শিক্ষার্থিনী বালিকাগণের মাখন ও ঘৃত প্রস্তুত করণ, এবং আনুষঙ্গিক হাস্য, কলরব ও কলহ, তথা স্নেহসম্ভাষণ প্রভৃতি একত্র মিলিয়া বৃন্দাবনের দৃশ্যের মত একটা অপূর্ব্ব শোভাময় দৃশ্য মানসপটে অঙ্কিত হইতে লাগিল।

টাকা বেতন হওয়াতে স্ত্রীমহলে আমাদের সমিতির উপর যে একটা আক্রোশ ছিল, তাহা ঘুচিয়া গেল। স্ত্রীলোকেরা ও ছেলেপুলেরা মিলিয়া প্রত্যহ দুই তিন আনা রোজগার করাতে, কাহারও আপত্তি রহিল না। যে সকল কৃষক লাঙ্গল টানিত, তাহাদের পরিবার ভদ্রলোকের পরিবারের সঙ্গে মিশিয়া দুগ্ধ-দোহনের সময় হাস্যপরিহাসে ও সুখ দুঃখের কথায় সময় কাটাইয়া দেওয়াতে উভয়ের মধ্যে সখ্যতা ও সহানুভূতির সঞ্চার হইয়া গেল। মুসলমান, ধোপা, কৈবর্ত্ত, ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যের মেয়ে সকলে একত্র হইয়া দুগ্ধ দুহিত, এবং যাদের শরীর খুব সতেজ ও বলিষ্ঠ, তাহারা মধ্যে মধ্যে তৈলের ঘানিও টানিত। দুই চারি দিনের মধ্যেই আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, জগতে কর্ম্মক্ষেত্র ছাড়া পরস্পরের মধ্যে প্রেমসঞ্চারের কোনও সম্ভাবনাই নাই। কর্ম্মক্ষেত্র সমতল হওয়া দরকার। উঁচু নীচু হইলেই অহঙ্কার আসিয়া দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে।

আপনারা হয় ত মনে করিতে পারেন যে, এই অশিক্ষিতা নিম্নশ্রেণীস্থা স্ত্রীর দল একদিনেই উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। কথাটা ঠিক তাহা নয়। দুগ্ধ, মাখন ও ঘৃতও যে মধ্যে মধ্যে চুরী না যাইত, এমন নয়। কিন্তু এক জন চুরী করিলে সকলকে তাহার ক্ষতিপূরণ করিবার নিয়ম থাকাতে চুরীর প্রবৃত্তি ক্রমশঃ কমিয়া গেল। 'কোপারেশনে' এইটুকু লাভ। এক জনের লাভে দশ জনের লাভ, এক জনের লোকসানে দশ জনের লোকসান। এক জনের সুকীর্ত্তিতে সকলেরই যশ, এক জনের নৈতিক অবনতিতে সমিতির অপমান। প্রথমে মনে হইত, সকলের বোঝা ঘাড়ে বহি কেন? কিন্তু যখন সকলে সকলের বোঝা বহিতে লাগিল, তখন সে ভাব অন্তর্হিত হইল।

কেহ পূর্ব্বাভ্যাসবশতঃ চুরী করিলে আমরা তাহার মজুরী কাটিয়া লইতাম। কিন্তু সেই পয়সা সমিতির নামে জমা হওয়াতে সকলেরই লাভ হইত। জগতে দুঃখের কথাই বলিবার বেশী থাকে, গৌরবের কম। কিন্তু ফলে যাহা দাঁড়াইয়াছিল, তাহা গৌরবেরই কথা। অল্পদিনের মধ্যেই যখন সকলের যুক্ত পরিশ্রমে অপর্য্যাপ্ত ঘৃত প্রস্তুত হইয়া গেল, তখন দোষগুলি ভুলিয়া গিয়া সকলেরই গুণ দেখিতে লাগিলাম। সেই ঘৃত বিক্রয় হইলে জানিতে পারিলাম যে, কারবারে গড়পড়তা শতকরা সাত টাকা লাভ হইয়াছে। কেবল তাহাই নহে। যখন মজুরীর পয়সা জমাইয়া অনেক স্ত্রীলোক প্রত্যেকে আট দশ টাকা করিয়া আবার জমা দিতে লাগিল, তখন 'সোনায় সোহাগা' আসিয়া মিলিত হইল।

৪

দ্বিতীয় বারের চেষ্টা।

'প্রথম বারের চেষ্টা সুফল প্রসব করাতে আমরা পূর্ব্বের অবস্থা হইতে যে অনেক উন্নত হইয়াছিলাম, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু সমাজ এমনই একটা জিনিস যে, তাহার মধ্যে থাকিলে পদে পদে সুখ স্বচ্ছন্দতায় বাধা পড়ে। অথচ সমাজে না থাকিলে চলে না, এবং চলিতে হইলে পুত্র কন্যার বিবাহ দিতে হয়। বিবাহ দিতে হইলে আজকাল অনেক টাকার দরকার, এবং সে টাকা ধার করিতে গেলে হয় ত মেলে না, কিংবা সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়।

আমাদের সমিতির মেম্বর দীনু ঘোষ জাতিতে গয়লা। যশোদা গয়লানীর ভাই। সে কন্যাদায়গ্রস্ত। দীনুর মেয়ের নাম ললিতা। ললিতা দেখিতে কালো। মুখশ্রী ছিল, কিন্তু তাহাতে কি হয়? চুল ছোট, চক্ষু ডাগর। মেয়েটি কিন্তু খুব শান্ত, এবং বালিকা-বিদ্যালয়ের মধ্যে সকলের চেয়ে বুদ্ধিমতী। গুরুমহাশয়ের গুণে না হউক, সে নিজের বুদ্ধির জোরেই অনেকটা লেখাপড়া শিখিয়াছিল। দীনুর ইচ্ছা, তাহার একটা ভালঘরে বিবাহ দেয়। গ্রামে পাত্র নাই, কাজেই দীনু কলিকাতায় এবং বরাহনগরে পাত্র খুঁজিতে গেল; এবং শুষ্কমুখে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, 'দু হাজার টাকার এক পয়সা কমেও তাহারা ছেলের বিবাহ দিতে রাজি নয়। সুন্দরী মেয়ে হইত ত এক হাজার কমাইয়া দিত। পাত্রের বাড়ী বরাহনগরে।'

আমরা ভাবিলাম, বরাহনগরের গয়লাদাদা কি বেয়াকুফ! সুন্দরী মেয়ে লইয়া তাহাদের লাভ কি? দীনু বলিল, তাহাদের বাটীতে খাটিবার লোক নাকি অনেক আছে। সংসারের কাজকর্ম্ম যে ভাল করিতে পারে, সে রকম মেয়ে তাহারা চাহে না। খুব সুন্দরী হওয়া চাই। ঘরে সুন্দরী ঝি বৌ না থাকিলে কলিকাতার সমাজে আদর হয় না। এ রকম ঘরের লোককে সকলে 'ছোট লোক' বলিয়া ডাকে। টাকা কড়ি ও সাজসজ্জার সঙ্গে যদি বাটীতে সুন্দরী থাকে, তবে সেই বাটীর পরিবারই সমাজে গণ্য মান্য হয়। হয় টাকা, নচেৎ সুন্দরী বৌ, অন্ততঃ একটা, ত নিশ্চয়ই দরকার।

প্রামাণিক মহাশয় বলিলেন, 'যদি লোকটা আমাদের সমিতির সঙ্গে কারবার করে, তবে আমরা দুই হাজার টাকা যোগাড় করিয়া দিতে পারি। তোমরা বুঝিয়া দেখ। মনে কর, আমরা দীনুকে ৭৲ টাকা সুদে টাকা ধার দিলাম; সে বৈবাহিককে সেই টাকা দিল; বৈবাহিক মহাশয় আমাদের সমিতিতে সেই টাকা

শতকরা সাত টাকা সুদে জমা দিলেন। আমরা সকলে তাহার জন্য দায়ী। সেই টাকা আমরা আবার দীনুকে ধার দিব। দীনুর সর্ব্বসমেত চারি হাজার টাকা ধার, কিন্তু প্রথমে তাহার মূলধন ছিল না; এখন হইল। আমরা তাহা দীনুর নিকট হইতে নয় টাকা সুদে লইয়া যদি তৈলের কারবার বাড়াইয়া দিই, তাহা হইলে তাহার লাভে এবং দীনুর নিজের প্রাপ্য সুদে তিন চারি বৎসরের মধ্যে টাকা শোধ হইয়া যাইবে।

এই প্রস্তাবনার গভীরতার মধ্যে যদিও আমরা প্রবেশ করিতে পারি নাই, তথাপি প্রামাণিক মহাশয়ের বিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া আমরা ঘোষজা মহাশয়কে প্রস্তাবটি পাঠাইয়া দিলাম। ঘোষজা মহাশয় তাহার উত্তরে লিখিলেন, 'আমার কোনও আপত্তি নাই, তবে বেশীভাগ আমার পুত্র গদাধরের উপর নির্ভর করিতেছে। যদি সে বিবাহের দিন রাজি হয়, তাহা হইলে সেই দিনই জমা করিয়া দিব। কিন্তু মেয়েটি যখন পছন্দসই নহে, তখন আমি কোনও বিষয়ে সম্পূর্ণ মত দিতে পারি না।'

আমরা কিছু ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলাম। দীনু কাঁদ-কাঁদ মুখে বলিল, 'আমার মেয়ে ডাগর, প্রায় পনের বৎসরের কাছাকাছি, এ সময় সে যদি এ সকল কথা শুনিতে পায়, তবে আত্মহত্যা করিবে।'

আমরা বলিলাম, 'তোমার কোনও ভাবনা নাই। বিবাহটা ঠিক করিয়া ফেল, টাকা কড়ির জন্য আমরা দায়ী রহিলাম।'

'কোপারেশন' এই ব্রত গ্রহণ করাতে আমাদের সুযশ চারি দিকে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িল। বাহির হইতে অনেক বিবাহের প্রস্তাবনা আসিতে লাগিল। আমরা তাহার উত্তরে ক্রমাগত বলিতে লাগিলাম, এই ব্যাপারটা কত দূর সিদ্ধ হয়, তাহা দেখিয়া অন্যান্য প্রস্তাবনাগুলির বিচার করিব। সেই মাসেই আমরা প্রথম সালের কার্য্যবিবরণী ছাপাইয়া প্রচার করিয়া দিলাম।

সেই মাসেই (অর্থাৎ আষাঢ় মাসে) আমরা বৈবাহিক 'ঘোষ' মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলাম। বৈবাহিকের চলতি নাম 'ঘোষ মিশ্র'। কারণ, খাঁটী ঘৃতের সঙ্গে চর্ব্বি মিশাইয়া তিনি অপূর্ব্ব সুস্বাদু ঘৃত প্রস্তুত করিতে পারিতেন। এই কল-কৌশলটুকু জানা থাকাতে তিনি কম পরিশ্রম করিয়া বড়মানুষ হইয়া পড়িয়াছিলেন।

সম্প্রতি আমাদের গোষ্ঠের খাঁটী ঘৃত প্রচার হওয়ায় তাঁহার কারবারে একটু বাধা পড়িয়াছিল। তিনি আমাদের সাদরে এবং সযত্নে অভ্যর্থনা করিয়া

বলিলেন, 'আপনারা পরিশ্রম করিয়া কম লাভে যে কারবার খুলিয়াছেন, তাহা চলা দুষ্কর। লোকে সস্তা খোঁজে। অল্প পরিশ্রমে তাহা হইতে বেশী লাভ করিয়া সস্তা জিনিস বাজারে ছাড়িয়া দিতে আপত্তি কি?'

আমরা বলিলাম, 'গয়লাদাদা! একে ত ধর্ম্ম বলিয়া একটা জিনিস আছে, এবং দেশের লোকের প্রাণটা যাহাতে রক্ষা পায়, তাহাও আমাদের দেখা কর্ত্তব্য। যদি এই জ্বর জ্বালার দুঃসময়ে ভেল জিনিস খাইয়া দেশের লোকগুলা মারা যায়, তবে শেষটা রক্ষা করিবে কে?'

বৈবাহিক ঘোষমিশ্র বলিলেন, 'ঐ রকম বড় বড় কথা বক্তৃতায় শুনিতে পাই বটে, কিন্তু কারবারী লোকদের কেবল লাভের দিকেই নজর থাকে। দেশের স্বাস্থ্য অস্বাস্থ্য সকলই জলবায়ুর উপর নির্ভর করে। মনে করুন, আমি জন্মাবধি কোনও খাঁটী জিনিস খাইয়াছি কি না সন্দেহ, অথচ আমার দেহ কিছুতেই কমে না। এই বিবাহে আপনাদের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠতা হইলে ঘৃত মিশালের কৌশল ভাল করিয়া শিখাইয়া দিব।'

আমরা আপাততঃ বৈবাহিক মহাশয়ের কথায় পরম আপ্যায়িত হইয়া বলিলাম, 'এটা আপনার পক্ষে মহা বদান্যতা প্রকাশ করা হইতেছে, আমরা যথাসাধ্য তাহার উপযুক্ত পাত্র হইতে চেষ্টা করিব।'

৫

'কোপারেটিভ্ ট্রেডিং ডেয়ারি ফারম্' নামক সমিতির কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তাহারা আমাদের ঘৃত খরিদ করিয়া ছোট ছোট টিনে বন্ধ করিত। এক টিনে এক সের ঘৃত থাকে, দাম ১৲ টাকা। জিনিস খুব খাঁটী বলিয়া খুব কাট্‌তি, কিন্তু পাছে অন্য স্থানে 'এজেন্সী' খুলিলে তাহারা জুয়াচুরী আরম্ভ করে, এই জন্য আমাদের ঘৃত বড়বাজারে কেবল তাহাদের দোকানেই বিক্রী হয়। যে লোকটা আমাদের গ্রাম হইতে ঘৃত পরীক্ষা করিয়া লইয়া যায়, এবং দোকানে 'টিন' করিয়া দেয়, সে এক জন বিখ্যাত লোক। সকলে তাহাকে 'মিষ্টার তিনকড়ি' বলিয়া ডাকে।

মিঃটার তিনকড়ি 'ছিপ্‌ছিপে', গৌরবর্ণ—যুবা পুরুষ। দেখিতে বেশ। সর্ব্বদাই সিগারেট্ মুখে, কিন্তু একটা সিগারেটেই তাহার দিন কাটিয়া যাইত। তিনকড়ির হ্যাট্ কোটের দামও সামান্য। কোটের মধ্যে একটা মস্ত পকেট, এবং তাহার মধ্যে ত্রিভুবনের জিনিস। সেই জিনিসের মধ্যে 'নোট'-বই সর্ব্বপ্রধান। কাহারও কোনও জুয়াচুরী দেখিলে, কিংবা কাহারও সৎপ্রবৃত্তি দেখিলে, তিনকড়ি

তৎক্ষণাৎ নোটবুকে টুকিয়া লইত। তিনকড়ি দেখিতে বেশ, এবং সকলে বলিত যে, তাহার চক্ষু বড় সুন্দর। কিন্তু তিনকড়ি প্রাণপণে সেই চক্ষু দুইটি নীল চসমার মধ্যে ঢাকিয়া রাখিত। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিত, 'রৌদ্রের বড় উত্তাপ, রাস্তায় বড় ধূলা, এবং চক্ষু বাহিরে রাখিলে জুয়াচুরী বুঝা ভার।'

মিঃ তিনকড়ি 'ডেয়ারি ফারমে'র সেক্রেটরী। তাহারই উপর সমস্ত নির্ভর। তিনকড়ির বেতন মাসে দুই শত টাকা।

প্রাতঃকালে বালিকা-বিদ্যালয়ে বসিয়া ছোট ছোট মেয়েরা মাখন তুলিতেছে। কোপারেটিভ গোষ্ঠের দুগ্ধ দুহিয়া স্ত্রীলোকেরা বড় বড় কলসীর মধ্যে রাখিয়া গিয়াছে।

ললিতা মাখন তুলিতে সকলের চেয়ে পটু। সে একটি বকুল গাছের তলে ফুল কুড়াইয়া আঁচলে বাঁধিতেছিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, 'ললিতা, আজ অনেক ঘৃতের দরকার, তুমি একটু হাত লাগাইয়া দাও। সাহেব (মিঃ তিনকড়ি) আজ এক মণ ঘৃত মাপিয়া লইবেন'।

ললিতা নিজে কিছু মাখন তুলিয়া এবং পূর্ব্বদিনের মাখন একত্র করিয়া জাল দিতে বসিল। এমন সময় ভট্টাচার্য্য মহাশয় একটা কলসী লইয়া ললিতাকে বলিলেন, 'এটুকু মিশাইয়া দাও।'

ললিতা কলসী পরীক্ষা করিয়া দেখিল যে, তাহা কেবল চর্ব্বিতে পরিপূর্ণ!

ললিতা। এটা চর্ব্বি বলে' বোধ হচ্ছে।

ভট্টাচার্য্য অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া পড়িলেন। 'তুই একটা অপগণ্ড মেয়ে, তোর এ সব কথায় কাজ কি? যাহা বলিলাম, তাহা শীঘ্র কর।'

ললিতা বলিল, 'আমি পারিব না। এটা জুয়াচুরী।

অন্য মেয়ে হইলে চীৎকার করিয়া কাঁদিত ও লোক জুটাইত। ললিতা হয় ত ভাবিয়াছিল যে, ইহাতে ব্রাহ্মণের অপমান করা হইবে, এবং কথাটা রাষ্ট্র হইয়া গেলে সকলের দুর্নাম হইবে। রক্তাক্ত বাহু অঞ্চলে ঢাকিয়া বালিকা বিদ্যালয়ের আড়ালে ছুটিয়া গেল, এবং সেখানে আঁচলে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

একটা লোক ঠিক সেইখানে লুকাইয়া এই ব্যাপার সমস্ত দেখিয়াছিল। সে মিষ্টার তিনকড়ি।

তিনকড়ি লুকায়িত স্থান হইতে হঠাৎ বাহির হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'এখানে বসিয়া কে?'

ললিতার কান্না থামিয়া গেল। ভয়ে তাহার মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল। সম্মুখেই তাহাদের সাহেব !

তিনকড়ি। তোমার কোনও ভয় নাই। আমার বাইসিক্‌লটা রাস্তায় ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে আমি এ বাদাড় ভাঙ্গিয়া আসিয়াছি। তুমি যদি এটাকে তোমাদের বাটীতে রাখিয়া দাও, তবে আমি একবার গোষ্ঠে গিয়া ঘৃত ওজন করি।

ললিতা বাইসিক্‌ল হাতে ধরিয়া আস্তে আস্তে লইয়া চলিল। তিনকড়ি তাহা খানিকক্ষণ দেখিয়া বলিল, 'বেশ হচ্ছে। দেখ, তোমার আঁচলে বকুল ফুলের গন্ধ পাচ্ছি ! যদি দুটো আমাকে দাও, তবে কৃতজ্ঞ হই। আমার নাকে বন-বাদাড়ের গন্ধ কষ্টকর বোধ হয়।'

ললিতা সভয়ে আঁচল হইতে বকুল ফুলগুলি লইয়া তিনকড়ির রুমালে ঢালিয়া দিল। তিনকড়ি গণ্ডায় গণ্ডায় সেগুলি গণিয়া বলিল, 'সর্ব্বশুদ্ধ বত্রিশটা ফুল। দেখি ললিতা ! তোমার হাতে রক্তের দাগ কেন ?'

ললিতা। আমি পড়িয়া গিয়াছিলাম।

তিনকড়ি। আচ্ছা ! তুমি প্রথমেই গিয়া জলপটী বাঁধ। তোমার বাইসিকল্ লইয়া যাইতে কষ্ট হইবে না ত ?

ললিতা বলিল, 'না।'

ললিতা চলিয়া গেল। মিষ্টার তিনকড়ি গোষ্ঠে গিয়া পঁহুছিলেন, এবং ভট্টাচার্য্যমহাশয়কে ডাকিয়া বলিলেন, 'আজকাল আপনাদের ঘৃতের উপর আমার একটু একটু সন্দেহ হচ্ছে।'

ভট্টাচার্য্যের মুখ শুকাইয়া গেল। 'কখনও তাহা হইতে পারে না। আপনি চাখিয়া দেখুন।'

তিনকড়ি লুক্কায়িত চর্ব্বির কলসীটি বাহির করিয়া তাহার ভিতর হইতে খানিকটা চর্ব্বি তুলিয়া লইল।

'আপনি এইটুকু আস্বাদন করুন।'

ভট্টাচার্য্যের বাকরোধ !

মিষ্টার তিনকড়ি তখন গম্ভীরভাবে বলিলেন, 'আপনি ধর্ম্ম হইতে পতিত হইয়াছেন। আপনার প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত। আমি নোট-বহিতে টুকিয়া

৬

ললিতার বিবাহ। গরীব লোকের বিবাহে যতটুকু উৎসব হওয়া সম্ভব, তাহা 'কোপারেটিভ্' গোষ্ঠ-সমিতির সাহায্যে যোগাড় করা হইয়াছে। ললিতার বিবাহে ভদ্রলোক এবং চাষাভূষার মেয়ে এবং পুরুষ সকলে নিমন্ত্রিত, এবং সকলেই ভাল কাপড় পড়িয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বেই চুল ও গোঁফদাড়ির পারিপাট্য বিস্তার করিয়া লইয়াছে। সকলেরই মুখ হর্ষোৎফুল্ল, কেবল ললিতাই যেন একটু শীর্ণা এবং আনন্দহীনা। ললিতার মা নাই, যশোদা পিসীই তাহার সব।

যশোদা বলিল, 'ললিতা, আজ তোর এত ভাবনা কিসের জন্য? আমরা ত বিয়ের দিন নাচিয়া খেলিয়া বেড়াইতাম।' ইহা বলিয়া যশোদা পূর্ব্বকালের স্মৃতির গৌরবার্থ দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। ললিতা বলিল, 'পিসী, তুমি কিছু মনে করিও না; বাবার এই টাকা ধারের জন্য ভাব্‌ছি। আমি ত সংসারে দু'দিনের জন্য এসেছি; কবে যাব, ঠিক নাই, কিন্তু বাবার যদি দুঃখ থাকিয়া যায়, তবে আমাকে পরলোকেও কাঁদিতে হইবে।' ইহা বলিয়া ললিতা কাঁদিল। স্নেহের বন্ধন, বড়ই মায়ার বন্ধন। নিজের সুখ তুচ্ছ করিয়া ভালবাসার জিনিস কষ্ট না পায়, এই কথাই সকলে ভাবে। কত বৎসরে বাবার ধার শোধ হইবে, তাহা ললিতা নির্জ্জনে বসিয়া দিবারাত্রি হিসাব করিত। কাহাকেও বলিত না।

যশোদা বলিল, 'মা, ও সব কথা ভাবিস্‌নে। সকলে মিলে' যখন আমাদের দুঃখ ঘাড়ে করেছে, তখন সকলেরই ভাবনা।' এই কথায় আশ্বস্ত হইয়া ললিতা আবার বলিল, 'আমাকে তারা নিয়ে যাবে, কিন্তু তাদের ত আমি জানি না। হয় ত কত দিনান্তর একবার পাঠাবে, তখন কে কোথায় থাক্‌বে, কে জানে?'

অলক্ষ্য জগতের দিকে ললিতার মন গিয়াছে দেখিয়া যশোদা একটু ত্রস্ত হইল। যশোদা বলিল, 'মা, তোমার সুখ দুঃখ আমাদেরই। এ সময় দুঃখের কথা বলা পাপ।'

যশোদা ললিতার চুল বাঁধিতে লাগিল। রাত্রি দ্বিপ্রহরে লগ্ন। সন্ধ্যার সময় বরযাত্রীর আগমনের সম্ভাবনা। 'কোপারেটিভ্ গোষ্ঠে'র সম্মুখে বালিকাবিদ্যালয়ে তাহাদের বসিবার স্থান হইয়াছে। বিপিন প্রামাণিক প্রাণপণে দেবদারু এবং বকুলের পাতা দিয়া স্থানটি সাজাইতেছে। হারাধন ইন্‌স্পেক্টর পেরেক ঠুকিয়া দেয়ালের গায় ছোট ছোট ছবিগুলি লাগাইয়া দিতেছে। মিষ্টার তিনকড়ি কলিকাতা হইতে মছলন্দ লইয়া আসিয়াছিল, তাহা বরের জন্য পাতিয়া তাহার সম্মুখে আতরদান গোলাপ পাশ প্রভৃতি রাখিয়া দিতেছে। গ্রামের

মেয়েছেলেরা 'ভগ্নী ললিতার শুভ-বিবাহ উপলক্ষে' একটা চব্বিশ লাইনের কবিতা ও দশ লাইনের গান বাঁধিয়াছিল। সেই গানটার সুর কেহ বাঁধিয়া দিতে না পারাতে তিনকড়ি নিজে সেটা হার্ম্মনিয়মের সঙ্গে গাহিয়া ছোট ছোট মেয়েদের শিখাইতেছে। তিনকড়ির গলা কি মিষ্ট!

ভট্টাচার্য্য মহাশয় কন্যার তরফের পুরোহিত। তিনি তালপাতার পুঁথি লইয়া কলাগাছ প্রভৃতি সরঞ্জাম ঠিক করিবার জন্য ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। ক্রমে সন্ধ্যার পরে আয়োজনাদি সব ঠিক হইয়া আসিল, এবং খাঁটী ঘৃতে বড় বড় লুচী ভাজা আরম্ভ হইয়া গেল। মিষ্টান্ন প্রভৃতি কলিকাতা হইতে আসিয়াছিল।

গ্রামের এক মাইল দূরে অন্য একটা গ্রামে সুদাম ঘোষদের বাটীতে বরযাত্রীরা রাত্রি আটটার সময় আসিয়া উপস্থিত হইল। সুদাম ঘোষ বৈবাহিক 'ঘোষ মিশ্রে'র আত্মীয়, এবং সেও ঘৃতে চর্ব্বি মিশাইতে খুব পরিপক্ক। সুদাম ঘোষের বাটী হইতে রসুনচৌকি ও 'ব্যাণ্ড' লইয়া এবং আলো করিয়া বরযাত্রা আসিবে। এমন সময় আকাশ ঘোর হইল, এবং মুহূর্ত্তের মধ্যে আকাশ ভাঙ্গিয়া শ্রাবণের বারিধারা ঝরিতে লাগিল।

বর গদাধর খুব স্থূলকায় যুবাপুরুষ। তাহার একে ত মোটেই বিবাহ করিবার ইচ্ছা নাই, তাহাতে আবার কালো মেয়ে। টাকার লোভে পড়িয়া পিতৃ-সত্যপালনার্থ সে কলিকাতা ছাড়িয়া এই রকম একটা পাড়াগাঁয় আসিয়া পড়াতে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া গেল। তাহার বন্ধুগণের পঞ্জাবী আস্তীন এবং দেলখোস-সিক্ত রুমালগুলি বৃষ্টিতে ভিজিয়া যাওয়াতে তাহারাও চটিয়া গিয়াছিল। তাহারা পরামর্শ করিল যে, নগদ দুই হাজার টাকা বিবাহের পূর্ব্বে সুদাম ঘোষের বাটীতে পাঠাইয়া না দিলে, এবং বরের জন্য এবং বরযাত্রীদিগের জন্য চতুর্দ্দোল না আসিলে তাহারা বিবাহে যাইবে না।

এক জন বলিল, 'যে রকম বৃষ্টি, তাহাতে আমাদের লুচী ও সন্দেশ এইখানে পাঠাইয়া দেওয়া উচিত। এই বৃষ্টিতে অনাহারে এতটা রাস্তা ভাঙ্গা অসম্ভব।

'ঘোষমিশ্রে'র অনুনয় বিনয় সত্ত্বেও তাহার পুত্র এবং বরযাত্রিগণ তাঁহার কথা না শুনাতে কন্যাপক্ষীয় লোক তাঁহাদের 'হুকুম' গোষ্ঠে আসিয়া সকলকে জানাইল।

সকলেই অবাক! এই একটা আসন্ন বিপদ্। কন্যার পিতা গিয়া বরকর্ত্তাকে বুঝাইলেন, কিন্তু নিষ্ফল হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। এই রকম যাতায়াতে রাত্রি নয়টা বাজিয়া গেল।

হারাধন বলিল, 'এ ব্যাটারা এত জুয়াচোর! যদি আমরা টাকাটা আগে পাঠাইয়া দিই, তবে লইয়া পলাইবে, এবং কোনও একটা ছুতা করিয়া পরে বিবাহ করিবে না।'

প্রামাণিক বলিলেন, 'কখনও টাকা পাঠাইব না। এটা কোপারেটিভের টাকা। এ কি চালাকী?'

দীনু ঘোষ কাঁদিয়া বলিল, 'তবে আমার জাতি যে যায়। লগ্ন উত্তীর্ণ হইয়া গেলে আমার অপমান, আমার বংশের অপমান, এবং আমার কন্যা লজ্জায় আত্মহত্যা করিবে।'

লগ্নের আর দেরী কি? আধ ঘণ্টাও নাই। স্ত্রী পুরুষ সকলেই নির্ব্বাক্ বসিয়া। এমন সময় তিনকড়ি প্রামাণিকের হাত ধরিয়া বলিল, 'দেখ বিপিন! হারাধন ও তুমি আমাকে জান। আমি ৺ বদন ঘোষের পুত্র তিনকড়ি। আমরা জাতিতে গয়লা হইলেও আমাদের বংশের সম্মান কলিকাতায় খুব। আমার বিবাহ হয় নাই, এবং তোমরাও এক সময় পাত্র খুঁজিতে গিয়া আমাকে তল্লাশ্ করিয়া পাও নাই। যদি আপত্তি না থাকে, তবে আমাকে বরের আসনে বসাইয়া বিবাহটা শেষ করিয়া ফেল।'

তখন সকলে একবাক্যে বলিল, 'তাহাই হউক!'

৭

কথাটা প্রচার হওয়াতে কোপারেটিভ্ গোষ্ঠ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, 'কার্য্যটা খুব ভাল হইয়াছে। এমন পাত্র আর তোমরা পাইবে না।'

বিবাহ হইয়া গেল।

সকলে লুচী খাইতে বসিয়াছে। বর বাসর-ঘরে গিয়াছে। মেয়েরা চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া বরের গান শুনিতেছে। বর কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'সে বাইসিকল্খানা আছে ত?' ললিতা নতমুখে বলিল, 'গোষ্ঠে রাখিয়া দিয়াছি।' বর পকেট হইতে কতকগুলি শুষ্ক বকুল ফুল বাহির করিয়া বলিল, 'এ বত্রিশটা ফুলের সৌরভ এখনও যায় নাই। তুমি বসিয়া মালা গাঁথ, আমি একবার বাহির হইতে আসি।'

রাত্রি প্রায় তিনটা।

সুদাম ঘোষের বাটী হইতে বরপক্ষীয় এক জন লোক খবর লইতে আসিয়া দেখিল যে, গোষ্ঠে বসিয়া মিষ্টার তিনকড়ি সিগারেট টানিতেছে। তিনকড়িকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, 'কে ললিত বাবু নাকি?'

ললিত। কে ননীলাল! এস!

ননিলাল। ব্যাপারখানা কি বল ত?

ললিত। গদাধর একটা জানোয়ার। এমন মেয়েকে বিবাহ করিতে দেরী করা তাহার পক্ষে মূর্খের কাজ হইয়াছে। তোমাদের দেরী দেখিয়া আমিই ক্যাণ্ডিডেট্ হইয়া পড়িয়াছিলাম।

ননীলাল। তার পর?

ললিত। একচোটে বিবাহ। এখন আমি বাহিরে আসিয়া জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিতেছি। এ সব পূর্ব্বজন্মের পুণ্যফল। নচেৎ তোমরা কাদায় পড়িয়া এই বৃষ্টির মধ্যে অনাহারে, এবং আমি বাসরশয্যায়!

ননীলালবাবু বলিলেন, 'দেখ ললিতবাবু, কাজটা ভাল হয় নাই। যখন উভয় পক্ষে চুক্তি হইয়া গিয়াছিল, তখন কর্ত্তা দুই হাজার টাকার দাবী করিয়া নালিশ করিবেন, এবং তাহার সঙ্গে রাহা-খরচা সাড়ে তিন শত টাকা ধরিয়া দেওয়া হইবে।' তিনকড়ি বলিল, 'সেটা আমি পূর্ব্বেই ভাবিয়াছি। তুমি কর্ত্তাকে বলিও যে, তিনি আমার পিতার নিকট ১৯০১ খৃষ্টাব্দে যে দুই হাজার টাকা ধার লইয়াছিলেন, এবং যাহা সুদে আসলে এখন তিন হাজার টাকায় দাঁড়াইয়াছে, সেই টাকাটা আমি লইব না, এবং কলিকাতায় গিয়া ওয়াশীল লিখিয়া দিব। আমি কিছু বেশী ছাড়িয়া দিতেছি; তাহার কারণ যে, আমার ইচ্ছা, তোমরা এ সম্বন্ধে কোনও গোলমাল না কর, এবং বরযাত্রীদিগের যাহা প্রাপ্য, ঐ টাকা হইতে লও।'

বরপক্ষের ননীলালবাবু চলিয়া গেলে তিনকড়ি বালিকাবিদ্যালয়ের বারান্দায় চাদর মুড়ি দিয়া একটা সুনিদ্রা সারিয়া লইল। প্রভাতে চতুর্দ্দিক হইতে অনেক লোক 'বর' দেখিবার নিমিত্ত উপস্থিত হওয়াতে তিনকড়ি বাহিরে আসিয়া সকলকে বলিল, 'আমিই বর। তোমরা পূর্ব্বে আমাকে সাহেবী পোষাকে দেখিয়াছ, এখন আমি সাদা-ধুতি-চাদর-বিশিষ্ট বর।

বেলা দশটার সময় কলিকাতার অনেক বন্ধু গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইল। সকলে কন্যার মুখ দেখিয়া আশীর্ব্বাদ করিল।

হারাধন ইন্স্পেক্টর ছোট ছোট মেয়েদের ডাকিয়া বলিলেন, 'দেখ! কালো মেয়ে হইলে কিছু যায় আসে না। যে সৎ হয়, এবং অলস হইয়া বসিয়া থাকে না, তাকে সকলেই ভালবাসে। তোমাদের এ কথা যেন মনে থাকে। ভবিষ্যতে এমন সময় আসিতেছে যে, রূপ অপেক্ষা গুণেরই অধিক আদর হইবে।

সন্ধ্যার সময় 'কোপারেটিভ গোষ্ঠে'র একটা বাৎসরিক অধিবেশন হইয়া গেল। হারাধন তাহাতে কণ্ঠস্বর সতেজ করিয়া অনেকক্ষণ বক্তৃতা করিলেন—'দেখ, "কোপারেশন" হইতে একটা সুফল ফলিয়াছে—সেটা নৈতিক ফল। তোমাদের কারবার ধর্ম্মের ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া গিয়াছে; সুতরাং ইহাতে লোকসান হইবার ভয় নাই, এবং সমগ্র সমাজ যদি ইহার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, তোমরা তাহা তুচ্ছ বলিয়া মনে করিতে পার।'

নিধিরাম।

প্রবাল।

ভারতবর্ষে প্রবাল রত্নবিশেষ বলিয়া পরিগণিত হয়। বিদ্রুম, রক্তাঙ্ক, হেমকন্দল প্রভৃতি ইহার প্রতিভাষা। কোটী কোটী ক্রোশ দূরে থাকিয়াও লোহিতাঙ্গ মঙ্গলগ্রহ কাহারও প্রতি অপ্রসন্ন হইয়াছেন, ইহা সিদ্ধান্ত হইলেই, জ্যোতিষাচার্য্য তাহাকে রক্তপ্রবাল ধারণ করিতে পরামর্শ দিয়া থাকেন। শুধু আমাদের কথাই বা বলি কেন, প্রাচীন রোমক জাতি আপনাদের সন্ততির কণ্ঠে প্রবাল হার পরাইত—তাহাদের বিশ্বাস ছিল যে, প্রবালহারে ভূষিত হইলে শিশুর কোনও অমঙ্গল ঘটে না। এমন কি, আধুনিক সভ্য ইটালীর অজ্ঞলোকের বিশ্বাস যে, প্রবালরত্ন ধারণ করিলে কুলোকের 'নজর' লাগে না, আর বিদ্রুমমণির মালা পরিলে বন্ধ্যা রমণী পুত্রবতী হয়। এখনও সকল দেশেরই বিলাসপ্রিয় ধনিগণের নিকট অন্যান্য রত্নের মত প্রবালের আদর আছে। সাঁওতাল কৃষক যখন তাহার অঙ্গারবরণী 'মায়জু' বা পত্নীর মনোরঞ্জন করিবার জন্য একটু বেশী ব্যস্ত হয়, তখন সে নয়া-দুম্‌কা, গিরিডি, বা মধুপুরের বাজার হইতে নকল পলা কিনিয়া আনে। শুনিয়াছি, নিগ্রো-সুন্দরীরাও নাকি লাল পলার পক্ষপাতিনী।

এই ভূষণের প্রবাল লোহিতবর্ণ। অবশ্য, বর্ণের গাঢ়তা-ভেদে সংস্কৃত গ্রন্থের এই হেমকন্দলমণির ব্রাহ্মণাদি আখ্যায় জাতিভেদ করা হইয়াছে। এই বংশের শ্বেতবর্ণ প্রতিনিধির নামের উল্লেখ পর্য্যন্ত কোনও সংস্কৃত গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না। ভূষণের প্রবালের বর্ণ লোহিত; তবে কেহ বা অরুণরাগপ্রভ, কেহ বা 'রক্তোৎপলদলাকার'। আমি যাহাকে শ্বেতপ্রবাল বলিতেছি, তাহার কোনও

সংস্কৃত নাম আছে কি না, জানি না। আমি কিন্তু বংশ ও উৎপত্তি-সম্বন্ধ হেতু শ্বেতবর্ণের বিদ্রুমরত্নকে শ্বেত প্রবাল বলিব।

শ্বেত প্রবাল বহুলপরিমাণে পাওয়া যায়। তাই বোধ হয় শ্বেত প্রবালের আদর কম। উহার আকৃতি অনেকটা গাছের মত। দেহটা যেন সাদা পাথরের। অনেক সৌখীন লোক লাল মাছের টবের মধ্যে ইহাদিগের এক একটা ডাল সাজাইয়া রাখেন। উভয়বিধ প্রবালেরই ইংরেজী নাম Coral (কোরাল)। এই শ্বেত কোরালের কোনটীর শাখা সরু; কোনটীর শাখা মোটা। যেগুলির শাখা সরু, সেগুলি ভঙ্গপ্রবণ। আমার প্রায় আট ইঞ্চি উচ্চ একটী শ্বেত কোরালের চাঁই বার দুই তিন আছাড় খাইয়া টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া গিয়াছে; কিন্তু একটী হৃষ্টপুষ্টকলেবর স্থূলশাখ কোরালের শক্তি বারংবার পরীক্ষা করিয়াও দুরন্ত শিশুরা তাহার অঙ্গহানি করিতে পারে নাই। এই কোরাল পদার্থগুলা কি, সে সম্বন্ধে আমি অনেক শিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত ব্যক্তির নিকট নানাপ্রকার গবেষণা শুনিয়াছি! আমার বিশ্বাস এই যে, ইহাদের প্রকৃত স্বরূপ কি, সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যতীত অনেকেই অজ্ঞ। তাই আমি ইহাদের জীবনকাহিনী লইয়া সাহিত্যের পাঠকবর্গের সম্মুখীন।

আমাদের অস্থিকঙ্কালের মত লাল ও শ্বেত প্রবালগুলা এক প্রকার জীবের কঙ্কালমাত্র। যেমন মাংস ও চামড়ায় ঢাকা, হাবভাব-বিলোলকটাক্ষযুক্ত সুন্দরীকে দেখিলে মোটেই মনে হয় না যে, তাহার বরবপুর অভ্যন্তরে একটা ভীমদর্শন অস্থিকঙ্কালের কাঠ্‌মা আছে, তেমনই কিঞ্চলুকের মত ক্লেদময় দেহের ভিতর রত্নকঙ্কাল অবস্থিত, এ কথাটা বিশ্বাস করিতে একটু সময় লাগে। কিন্তু এই শ্বেতকঙ্কালের দ্বারা ক্ষুদ্র নগণ্য প্রবাল-জীব কত কীর্ত্তি করিয়াছে, স্থানে স্থানে ধরিত্রীর রূপ কত পরিবর্ত্তিত করিয়াছে, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। একত্র মিলিয়া যৌথসাধনায় ক্ষুদ্রেরা কত মহৎকার্য্য করিতে পারে, প্রবাল শৈল তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ডারউয়িন, ডানা, হাক্স্‌লে প্রভৃতি প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌ মনীষিগণ কোরাল সম্বন্ধে অনেক পরিশ্রম করিয়া নানা তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন।

রক্তকন্দল ও শ্বেতবিদ্রুম একই প্রকার জীবের কঙ্কাল—প্রায় একই প্রণালীতে এই উভয়বিধ প্রবাল গাছের মত শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিয়া বাড়িয়া উঠে। লাল পলা অপেক্ষা শ্বেতপলা পৃথিবীতে অনেক অধিক কাজ করিয়াছে; নীরবে দৃষ্টির অন্তরালে বারিধির গর্ভে পরিশ্রম করিয়া জগতের অনেক হিত-

সাধন করিয়াছে. একটিমাত্র উদাহরণ লইলেই তাহাদের সাধনফলের আয়তন কতকটা হৃদয়ঙ্গম হইবে। অষ্ট্রেলিয়ার পূর্ব্বে প্রশান্তসাগরের গর্ভ হইতে দৈর্ঘ্যে এগার শত মাইল ও প্রস্থে বিশ হইতে ত্রিশ মাইল একটী শৈল আছে। ইহা কত গভীর, তাহা আমি ঠিক বলিতে পারি না। এই সমস্ত শৈলটী শ্বেত প্রবাল-জীবের কঙ্কাল। রক্তপ্রবাল এরূপ কোনও কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করে নাই; তবু তাহার দেহের লাবণ্য বিলাসী লোকের নয়নরঞ্জন করে বলিয়া, ইহারা রত্ন-শ্রেণীভুক্ত। পৃথিবীর সর্ব্বত্র একই নিয়ম—নীরব সাধনার পুরস্কার উপেক্ষা ও বিস্মৃতি; আর ঢক্কানিনাদী, স্বল্পবুদ্ধি ও হীনশক্তির কীর্ত্তিগরিমায় মেদিনী পরিপূর্ণা!

বলিয়াছি, শ্বেত ও লোহিত প্রবাল একপ্রকার জীবের কঙ্কাল। যে জীবের কঙ্কালে এক একটা দ্বীপের সৃষ্টি হয়, এক একটা বিপুল শৈল গঠিত হয়, সহজেই মনে হইতে পারে যে, সে জীব ভীম-কলেবর। অধুনা-লুপ্ত মাস্তোদন প্রভৃতি অতিকায় হস্তীর পাল ইহাদিগের তুলনায় কীটস্য কীট! এ ধারণাটা কিন্তু একেবারে ভুল। প্রবাল-জীব খুব ক্ষীণতনু; কোনটীর আকার ছোট হোমিওপ্যাথি ঔষধের শিশির মত; কোনটী কিছু বড়; আবার এক একটী মটরের মত ছোট।

আমাদের যাদুঘরের মেরুদণ্ডহীন জীবের প্রকোষ্ঠে sea-anemoni নামক একপ্রকার জীব দেখিতে পাওয়া যায়। আনিমোনি একপ্রকার বিলাতী ফুল। এই জীবের আকার সেই ফুলের মত, তাই ইহার নাম সামুদ্রিক আনিমোনি। ইহার দেহটী একটী সরু নলের মত; উপরের ছিদ্র বাদামী আকারের; আর সেই ছিদ্রের চারি দিকে ছোট ছোট শুঁড় আছে। ইহাদের দেহ কেঁচোর মত পিচ্ছিল। ইহাদের শরীর খুব সরল; নানাপ্রকার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বালাই নাই; কেবল সেই শুঁড়-বিশিষ্ট বাদামী মুখ, আর মুখব্যাদান করিলেই উদর-বিবর। সেই বিবরের মধ্যে আহার্য্য পরিপক্ক হইয়া সমস্ত দেহে রসসঞ্চার করে। ইহাদের এক জাতির নাকি চক্ষুর অনুরূপ ইন্দ্রিয় আছে; কিন্তু সাধারণতঃ ইহাদের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, বা জিহ্বার অনুরূপ কোনও ইন্দ্রিয় নাই। ইহাদের মধ্যে স্পর্শ-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়; কারণ, স্পর্শ করিলে ইহারা সঙ্কুচিত হয়। কিন্তু কোনও ছোটখাট পদার্থ সেই মুখের নিকট আসিলেই আনিমোনি তাহাদিগকে উদরস্থ করে। ইহারা সমুদ্রের ভিতর কোনও পদার্থে লাগিয়া থাকে; বিধাতা ইহাদের মুখের নিকট আহার্য্য আহরণ করিয়া আনিয়া না দিলে, ইহাদের

উদরপূরণের অন্য কোনও উপায় নাই। কিন্তু একবার ইহাদের মুখের কাছে আসিলে কোনও পদার্থের পক্ষে নিষ্কৃতিলাভ অসম্ভব।

এই আনিমোনি ও প্রবাল-জীব এক-জাতীয়। ইহাদের ভিতরটা ফাঁপা বলিয়া এ শ্রেণীর জীবকে celenterata (সিলেন্‌টেরাটা) বা ফাঁপা-দেহ জীব বলে। এই ফাঁপাদেহ জীবমাত্রই খুব ভোজনপটু; ইহাদের মধ্যে নানা শ্রেণী আছে। সবাই অবশ্য প্রবাল উৎপন্ন করে না।

এই ফাঁপাদেহ প্রবাল-জীবের একটা বড় বিশেষত্ব আছে। অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই ভোজনপটু প্রবাল-জীব মাঝে মাঝে এক একটা শুক্তিশঙ্খ বা অপর কঠিন পদার্থ ধরিয়া বড় বিপদে পড়ে। দেহ সঙ্কুচিত করিয়া ইহা যথাসাধ্য সেটীকে টানিবার চেষ্টা করে; কিন্তু 'থলির ভিতর হাতী' ঢোকে না; অথচ ফাঁপাদেহ জীবের এমন ক্ষমতা নাই যে, উহাকে উদ্গার করিয়া শান্তিলাভ করে। ইহারা কিন্তু উচ্চশ্রেণীর জীবের মত গলায় আঁটি বাঁধিয়া মরে না—বেগতিক দেখিলে সেই শক্ত দুষ্পাচ্য পদার্থটাকে মধ্যে রাখিয়া ইহারা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। এইরূপে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া ইহারা প্রাণত্যাগ করে না; প্রত্যেক খণ্ডিত অংশটী অচিরেই আবার পূর্ণাবয়ব জীব হইয়া উঠে। এইরূপে একটী জীব দ্বিধা-বিভক্ত হইয়া দুইটী পূর্ণাবয়ব জীবে পরিণত হইবার আশ্চর্য্য ক্ষমতা এই ফাঁপাদেহে আছে। অনেকটা গাছের কলমের চারার মত ব্যবস্থা। যাহা হউক, এই ফাঁপাদেহ জীবের সংখ্যাবৃদ্ধির এই একটা উপায়। কেবল যে কঠিন পদার্থ ধরিয়াই ইহারা খণ্ডিত হয়, তাহা নহে। সময়ে সময়ে ইহারা স্বতঃই বিভক্ত হইয়া নূতন কলেবরের সৃষ্টি করে।

এই প্রবাল-জীবের সংখ্যা-বৃদ্ধি-প্রণালীর অপর একটী বিশেষত্ব আছে। এই বিশেষত্বটুকু উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে, কোরালের দেহের গঠনটা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কোরাল-জীব যখন দ্বিখণ্ড হইয়া দুইটী প্রাণীতে পরিণত হয়, তখন সাধারণতঃ দুইটী খণ্ডই একই শিলায় বা মৃত কোরাল-কঙ্কালে লাগিয়া থাকে; এবং অনেক সময় দুইটী শাখায় পরিণত হয়। এবার যে বিশেষত্বের কথা বলিতেছি, তাহাতে তাহারা বহুমুখবিশিষ্ট হয়, অথচ জনক-জীবের সহিত যৌথভাবে বসবাস করিতে আরম্ভ করে। মাঝে মাঝে প্রবাল-জীবের সরু গাত্রে এক একটী মুকুল উদ্গত হয়। বলিয়াছি, সরু নলের মত জীব, উপরে মুখ। সেই নলের মত দেহের নানা স্থলে কুঁড়ি বাহির হয়।

অবশ্য, দেহ নলের মত বলিয়া, প্রত্যেক প্রবালদেহ যে গোল, তাহা নহে। কেহ গোল; কাহারও দেহ চোঙ্গার মত, কাহারও দেহ কোণা। শরীরের ঠিক কোন স্থলে মুকুলের উদ্গম হয়, তাহার আলোচনা করিতে গেলে অনেক পরিভাষা ও জীবদেহতত্ত্বের অনেক কূট-কথার অবতারণা করিতে হয়। মোটের উপর ইহাদের দেহে কুঁড়ি ধরে। সেই কুঁড়ি ক্রমশঃ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া নলাকার দেহে পরিণত হয়, এবং ঠিক প্রথম জীবটীর মুখের মত তাহার মুখ হয়। আবার কিছুদিন পরে অপর মুকুল জন্মে; তাহা ক্রমশঃ বিকশিত হয়; তাহার মুখ হয়; কালে তাহাদের আবার মুকুল হয়, তাহাদিগের দেহ হইতে নূতন জীবের সৃষ্টি হয়। প্রত্যেক জীবটী পরস্পরের সহিত লিপ্ত থাকে; কেবল প্রথম নলের উপর ছোট ছোট নল ও মুখ হয় মাত্র। যে মুখেই আহার্য্য প্রবিষ্ট হউক না কেন, তাহা সাধারণ যৌথ-দেহের পুষ্টিসাধন করে। পূর্ব্বের একানন জীব ক্রমশঃ রাবণের মত দশানন হইয়া উঠে, এবং ক্রমশঃ দশানন বহু মুখে পরিণত হইয়া থাকে। যেখানে পূর্ব্বে একটীমাত্র প্রবাল-জীব ছিল, অল্প দিনে সে স্থলে প্রবাল-জীবের ঝোপ হইয়া উঠে। এই জীব সাগরের জল হইতে কার্ব্বনেট্ অফ্ লাইম্ নামক খড়িমাটীর মত ক্ষার পদার্থ টানিয়া দেহের কঙ্কাল তৈয়ারী করে। যখন তাহারা মরিয়া যায়, তাহাদের মাংসগুলা শুকাইয়া খসিয়া পড়ে। তখন বহুশাখাবিশিষ্ট প্রবালের চাঙ্গড় দৃষ্টিগোচর হয়। সেই প্রবাল-কঙ্কালের গঠনের কথা পরে বলিব।

এই শ্রেণীর জীবের বংশ বা সংখ্যার বৃদ্ধি হইবার আর একটী—তৃতীয় উপায় আছে। মাঝে মাঝে প্রবাল-জীবের উদরবিবরে অণ্ড জন্মে। সেই ডিম্ব প্রবাল-জীব মুখ দিয়া প্রসব করে। জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ অনেক পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বুঝিয়াছেন যে, কোনও কোনও প্রবাল-জীবের মধ্যে স্ত্রী পুরুষ ভেদ আছে, আবার কোনও কোনও জীব একাধারেই স্ত্রী ও পুরুষ। এই অচল জীবের স্ত্রী-পুরুষের শোণিত ও শুক্রের ঠিক কিরূপ প্রকারে সংযোগ ঘটে, তাহা এখনও অভ্রান্তরূপে নির্ণীত হয় নাই। তবে ইহাদের দেহে উভয়-জাতীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, এবং ইহারা যে মুখ দিয়া অণ্ডপ্রসব করে, সে বিষয়ে জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ নিঃসন্দেহ। ইহাদের অণ্ডের আকার গোল হইলেও বিচিত্র। ডিম্বের গাত্রে কেশের মত অনেকগুলি শুঁয়া থাকে। সেই শুঁয়ার সাহায্যে পয়োধির তরঙ্গ-ভঙ্গের তালে তালে নাচিতে নাচিতে বিক্রমাণ্ড বহু দূর ভাসিয়া বেড়ায়; শেষে কোনও অনুকূল ক্ষেত্রে গিয়া শিলাগাত্রে সম্বদ্ধ হয়। তখন উহাদের শুঁয়া খসিয়া

যায়, এবং ক্রমশঃ উহারা পূর্ণাবয়ব প্রবাল-জীবের আকার প্রাপ্ত হয়। উচ্চ শ্রেণীর জীব কেবল এক উপায়ে জন্মলাভ করে। ইহারা জন্মে তিন প্রকারে। এ নূতন ক্ষেত্রে আসিয়াও প্রবাল-জীব কখনও বা বিভক্ত হইয়া, কখনও বা মুকুল হইতে ফুটিয়া বাহির হইয়া, কখনও বা অণ্ডভেদ করিয়া, সংখ্যায় বাড়িতে থাকে। মোটের উপর সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মের বাক্য 'একোঽহং বহু স্যাম:' সফল করিবার ক্ষমতাও ইহাদের অসীম। তাই অল্প সময়ের মধ্যে কোটী কোটী সামুদ্রিক প্রবাল-জীবের উদ্ভব হইয়া থাকে। তাহা না হইলে, তাহারা এত ক্ষুদ্র ক্ষীণ তনু লইয়া এমন অঘটন ঘটাইতে সমর্থ হইত না।

উপরের বর্ণনা মনে থাকিলে হেমকন্দলের শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট পক্কদাড়িম্বপ্রভ দেহের গঠন বুঝিয়া উঠা কষ্টকর হইবে না। একটী পুরাতন অতিবৃদ্ধ প্রবাল-জীবের উদরে জন্মিয়া প্রবালডিম্ব ভাসিতে ভাসিতে সাগরগর্ভের গুপ্তশিলা-খণ্ডে সম্বদ্ধ হয়; তাহার পর তাহার সরু নলের মত দেহ গজায়, মুখ ফোটে; আবার সেই দেহে এক পার্শ্ব দিয়া একটী কুঁড়ি বাহির হয়; সেই কুঁড়ি আবার পূর্ণদেহ প্রাপ্ত হয়; আবার তাহার দেহ হইতে বিভক্ত হইয়া, বা কুঁড়ি ফুটিয়া, নূতন দেহের বিকাশ হয়। ক্রমশঃ শাখা প্রশাখায় কোরাল-জীব বেশ পুষ্ট হইয়া উঠে। প্রত্যেক নলের মুখে এক একটী মুখ, কিন্তু সকলই মাংসে মাংসে যুক্ত—প্রকৃতপক্ষে মূলদেহ এক, মুখ ও শাখাদেহ বহু; দেখিতে শিলালগ্ন গাছ, আর প্রত্যেক শাখার মুখে আনিমোনির মত এক একটী ফুল।

কিন্তু প্রবাল-জীব যখন বহু শাখাপ্রশাখায় পরিণত হয়, তখন তাহাদের কেঁচোর মত নরম মাংসল দেহ উন্নত থাকিতে পারে না। তখন স্বভাবতঃই ইহাদের দেহের একটী কঠিন কঙ্কাল বা কাঠ্‌মা আবশ্যক হইয়া উঠে। রত্নাকরের গর্ভে যেমন রত্ন প্রচ্ছন্ন থাকে, তাহার বারিতেও তেমনই নানাপ্রকার রাসায়নিক পদার্থ দ্রবীভূত অবস্থায় মিশ্রিত থাকে। বলা বাহুল্য, সমুদ্রের জলে বহুলপরিমাণ লবণ পাওয়া যায়। সেইরূপ কার্ব্বনেট্ অফ্ লাইম্ নামক অঙ্গার ও চূণের সংমিশ্রণ—এক প্রকার পদার্থ থাকে। সে পদার্থ অনেকটা খড়িমাটীর মত। প্রবাল-জীব সাগরাম্বুর ভিতর হইতে এই ক্ষার পদার্থ টানিয়া বাহির করিয়া আপনাদের ফাঁপা দেহ পূর্ণ করিতে থাকে। রক্তপ্রবালজীব এই ক্ষারকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় লোহিতবর্ণে রঞ্জিত করিয়া দেহের কঙ্কাল গঠিত করে। ক্রমশঃ প্রবাল-জীব যত বাড়িতে থাকে, ভিতরের কঙ্কালও সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পায়। শেষে শাখাপ্রশাখাসমন্বিত রক্তপ্রবালের সৃষ্টি হয়।

রক্তপ্রবাল সাধারণতঃ ভূমধ্যোপসাগরে পাওয়া যায়। রক্তপ্রবালজীব খুব গভীর জলে জন্মে। উত্তর আফ্রিকা ও দক্ষিণ ইটালী প্রভৃতির উপকূলের ধীবরেরা জলের মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া এই প্রবাল বাহির করে। কিছুদিন রৌদ্রতপ্ত হইলে মাংসগুলা খসিয়া পড়ে, এবং রত্নকঙ্কাল বাহির হয়। ভূমধ্যসাগরের গভীরতার ভিতর হইতে ইহাদিগকে টানিয়া তুলিতে হয় বলিয়া এ রত্ন এত মূল্যবান্। সাধারণতঃ ভূখণ্ড হইতে দুই মাইল হইতে দশ মাইলের মধ্যে ১৮০ হইতে ৭৮০ ফিট নিম্নে এই রত্ন পাওয়া যায়। ইহারা ৪৮০ ফিট নীচেই বেশী জন্মে। উচ্চশ্রেণীর প্রবালের মূল্য প্রতি আউন্স্ বার শত হইতে দুই হাজার টাকা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। আবার চারি টাকাতেও এক আউন্স্ ছোট ছোট কোরালের টুক্রা পাওয়া যায়।

এই শ্রেণীর অশেষ প্রকার জীব ও জীবকঙ্কাল সমুদ্রে পাওয়া যায়। ইহাদের আকৃতি নানাবিধ। 'সামুদ্রিক যষ্টি' (sea-rod) নামক এক প্রকার কঙ্কাল, এবং 'সামুদ্রিক' কলম' (sea-pen) নামক অপর প্রকার কঙ্কাল দেখিতে বড় চমৎকার। এক প্রকার কৃষ্ণ প্রবাল পাওয়া যায়; ইহাদের দেহ শৃঙ্গের মত একপ্রকার পদার্থে নির্ম্মিত।

দ্বীপনির্ম্মাতা শ্বেত প্রবালের কঙ্কালগণের কথা বলিবার পূর্ব্বে ডারউয়িন্ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত দুই প্রকার দংশনক্ষম কোরাল জীবের উল্লেখ করিব। ডারউয়িন্ তাঁহার Beagle (বিগ্‌ল্) নামক জাহাজে চড়িয়া জীব ও উদ্ভিদের তথ্য আবিষ্কার করিয়া ঘুরিয়াছিলেন। তিনি ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের ১০ই এপ্রেল সুমাত্রার সন্নিহিত কিলিং নামক কোরাল-দ্বীপে দুই-জাতীয় প্রবাল-জীব দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। ইহারা দংশন করিতে পারে। এই শ্রেণীর অপরাপর জীবের মত ইহাদের দেহ পিচ্ছিল নহে; ইহাদের দেহ অপেক্ষাকৃত কঠোর, এবং দুর্গন্ধ। ইহাদের গাত্র স্পর্শ করিলে হাত কুট্-কুট্ করে। ডারউয়িন্ একটি জীব আপনার মুখে ঘষিয়া বহুক্ষণ যন্ত্রণাভোগ করিয়াছিলেন। ইহাদের স্পর্শে দেহে লাল দাগ হয়, এবং মিনিট কত জলবিছুটী-ঘর্ষণের মত জ্বালা করে। ওয়েষ্ট-ইণ্ডিয়া দ্বীপের দংশনক্ষম কোরালের কথাও তিনি শুনিয়াছিলেন। এই কিলিং দ্বীপের নিকট তিনি দুইপ্রকারের কোরালভোজী মৎস্য পাইয়াছিলেন। অন্যান্য অনেক-জাতীয় মৎস্যও নাকি কোরাল ভক্ষণ করে; কিন্তু তাহাদের মত আততায়ীর শত্রুতা উপেক্ষা করিয়া কোরাল জীব পৃথিবীতে অনেক কাজ করিয়াছে।

এই প্রবালের দ্বারা পৃথিবীতে কত দ্বীপের সৃষ্টি হইয়াছে। সমুদ্রের মধ্যে কিরূপ আকৃতির কোরালশৈল উৎপন্ন হইয়াছে, সে সকল বিষয়ের আলোচনা করিবার পূর্ব্বে, তাহাদের দেহের কঙ্কালগঠনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিব। পূর্ব্বে রক্তবিদ্রুমের গঠন-প্রণালী সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, ইহাদের গঠন-প্রণালীও অনেকটা সেই রকম। তবে কিছু পার্থক্য আছে। রক্তপ্রবালের কঙ্কাল যৌথ, আর প্রত্যেক শাখার উপরে এক একটী মুখ থাকে। শ্বেতপ্রবাল জীবের প্রত্যেক ছোট ছোট জীবের একটী করিয়া বিভিন্ন কঙ্কাল আছে। একই শাখার গায়ে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবের কঙ্কাল, অথচ প্রত্যেক কঙ্কাল একত্র সংবদ্ধ। রক্তপ্রবালের একটী সরু শাখা লইলে দেখা যায় যে, উহা অত্যন্ত মসৃণ। শ্বেতপ্রবালের শাখায় অসংখ্য ছোট ছোট স্ফোটকের মত উচ্চ অংশ দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রত্যেকটী এক একটী জীবের কঙ্কাল। রক্ত-প্রবাল যেখানে একমুখে কার্ব্বনেট্ অফ লাইম্ টানিয়া কঙ্কাল নির্ম্মাণ করে শ্বেতপ্রবাল সে স্থলে শতমুখে ক্ষার আহরণ করিয়া থাকে। অসংখ্য ছোট ছোট অংশ কোরালবৃক্ষের বেশ শোভা-সংবর্দ্ধন করে। আর কোরালের জীবদ্দশায় এই প্রত্যেক অংশের মুখে আনিমোনি পুষ্পের মত এক একটী মুখ থাকে। কতক স্থলে বিভক্ত হইয়া, কতক স্থলে মুকুল উৎপন্ন করিয়া, এই শ্রেণীর কোরালজীব খুব শীঘ্র বাড়িতে থাকে, এবং 'অল্পানামপি বস্তূনাং সংহতিঃ কার্য্যসাধিকা' নীতির মর্য্যাদা রক্ষা করে। আমার নিকট একটী কোরাল আছে। সেটী দেখিলে বুঝা যায় যে, কত শীঘ্র এবং কিরূপ বহুলপরিমাণে কোরালজীবের সংখ্যা-বৃদ্ধি হয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, শুক্তি-শঙ্খাদি কোনও কঠিন জীব প্রবাল-জীবের মুখে পড়িলে প্রবাল-জীব দ্বিখণ্ড হইয়া যায়। আমার এই প্রবালটি দেখিলে মনে হয় যে, একটী লম্বা নলাকার শামুক ধরিয়া ইহারা বিভক্ত হইয়াছিল, এবং এত শীঘ্র সংখ্যায় বাড়িয়াছিল যে, শামুকটীর কঠিন দেহে চারি দিকে এমন ভাবে ইহারা বেষ্টন করিয়াছিল যে, শামুকটী আর ইহাদের মধ্য হইতে চলিয়া যাইতে পারে নাই। শামুকটীর দুই মুখ এই কোরালের দুই শাখায় সংবদ্ধ হইয়া আছে, এবং তাহার কঠিন গাত্রে অসংখ্য ছোট ছোট সুজির দানার মত প্রবাল-জীবের কঙ্কাল সংলগ্ন আছে। সে শামুকের জীবটী মরিবার পর তাহার দেহটা ধুইয়া বাহির হইয়া গিয়াছে, এবং তাহার দেহনলীটী শূন্য হইয়া আছে।

শ্বেত কোরালজীবের ব্যাপকতা অসীম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ভারত

ও প্রশান্তমহাসাগরেই কোরাল-শৈল অধিকপরিমাণে দৃষ্ট হয়। অনেক সময়ে ছোট ছোট স্তূপ গাঁথিয়া প্রবাল-জীব আর বাড়িতে পারে না। তখন তরঙ্গাঘাতে তাহাদের কঠিন কঙ্কালও ক্রমশঃ চূর্ণ হইয়া সমুদ্রে কর্দ্দম বৰ্দ্ধিত করে।

শ্বেতপ্রবালজীব গভীর জলে জন্মিতে পারে না। দেড়শত ফিটের নিম্নে আর জীবিত কোরাল দেখা যায় না। যে প্রদেশ শীতকালে ৬৬ ডিগ্রী অপেক্ষা শীতল হয়, সে প্রদেশে শ্বেতপ্রবাল জন্মে না। বিষুবরেখার উভয় পার্শ্বে আঠার শত মাইলের পর আর কোরাল-পাহাড় দৃষ্ট হয় না। ইহার মধ্যে আবার আফ্রিকার পশ্চিমে আটলান্টিকের স্রোতের প্রবলতার জন্য সে প্রদেশ কোরালের পক্ষে অনুকূল নহে। আমি আগামী বারে কোরাল-শৈলসমূহের বর্ণনা করিব।

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।

প্রাচীন শিল্প-পরিচয়।

রত্ন।

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে পদে পদে রত্নের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। নৃপতিদিগের সিংহাসন প্রভৃতির প্রসাধন-রূপে, সাধারণের নিত্য নৈমিত্তিক ব্যবহারোপযোগী বস্তুবিশেষের উপাদান-রূপে, এবং অনেক বস্তুর শোভা-সম্পাদক-রূপে ব্যবহার্য্য রত্ননিচয়ের প্রভূত শ্রেণীবিভাগ পরিলক্ষিত হয়। আবার ধর্ম্মকর্ম্মের অঙ্গ-রূপেও বিভিন্ন জাতীয় রত্নের উপযোগিতার পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রহদোষপ্রশমনার্থ রত্নবিশেষধারণের ব্যবস্থা জ্যোতিষ শাস্ত্রে আছে। নানাপ্রকার রোগদূরীকরণেও রত্নের অচিন্ত্য প্রভাব শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং রত্নসম্বন্ধে অন্ততঃ কিছু জানা না থাকিলে বিবিধশাস্ত্রের অনেক স্থলই বিশদভাবে বুঝিবার উপায় নাই। সুতরাং রত্নপরিচয় আবশ্যক। তাই এই প্রবন্ধে রত্নের কিছু পরিচয় দিব।

রত্নের উৎপত্তি সম্বন্ধে বৃহৎ-সংহিতায় দুই প্রকার মত দেখিতে পাওয়া যায়। পৌরাণিকগণ বলেন, ইন্দ্র কর্ত্তৃক নিহত বল নামক দৈত্যের অস্থিপ্রভৃতি হইতে রত্নের উদ্ভব হইয়াছে। কাহারও মতে, দধীচি মুনির অস্থি হইতে রত্নের উৎপত্তি হইয়াছে। মনীষিগণ বলেন, পৃথিবীর স্বভাববশেই প্রস্তরের বৈচিত্র্য ঘটিয়া থাকে। (১) সুতরাং প্রস্তরবিশেষই রত্ন-নামে অভিহিত হয়।

"যুক্তিকল্পতরু" গ্রন্থে রত্নের বিস্তৃত বিবরণ কথিত হইয়াছে। ইহাতে অধিকাংশ স্থলেই পৌরাণিক বচন প্রমাণ-রূপে উপন্যস্ত হইয়াছে; অতএব ইহাতেও দৈত্যেন্দ্রের শরীরস্থ পদার্থ হইতে রত্নের উৎপত্তি স্বীকৃত হইয়াছে।

পৌরাণিক মতে নয়টি মণির নাম সুপ্রসিদ্ধ; যথা, বজ্র (হীরক), গারুত্মত, পুষ্পরাগ, মাণিক্য, ইন্দ্রনীল, গোমেদ, বৈদূর্য্য, মুক্তা, এবং প্রবাল। (২)

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরের মতে মুক্তা প্রভৃতি নয়টি মহামণি নামে অভিহিত হইয়াছে,—মুক্তা, হীরক, বৈদূর্য্য, পদ্মরাগ, গোমেদ, নীল, গারুত্মত, এবং প্রবাল, এই নয়টি মহারত্ন। (৩)

সারদাতিলকে নবরত্নের উল্লেখ আছে; তাহাতে মাণিক্যের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—মাণিক্য, গোমেদ, হীরক, মরকত, মুক্তা, প্রবাল, বৈদূর্য্য, নীলমণি, এবং পুষ্পরাগ।

বরাহমিহির রত্নের যে সকল নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তদনুসারে বাইশ প্রকার রত্নের পরিচয় পাওয়া যায়;—(১) বজ্র (হীরক), (২) ইন্দ্রনীল, (৩) মরকত, (৪) কর্ক্কেতর (৫) পদ্মরাগ, (৬) রুধিরাখ্য, (৭) বৈদূর্য্য, (৮) পৃণক, (৯) বিমলক, (১০) রাজমণি, (১১) স্ফটিক, (১২) চন্দ্রকান্ত, (১৩) সৌগন্ধিক, (১৪) গোমেদক, (১৫) শঙ্খ, (১৬) মহানীল, (১৭) পুষ্পরাগ, (১৮) ব্রহ্মমণি, (১৯) জ্যোতীরস, (২০) সম্যক্, (২১) মুক্তা ও (২২) প্রবাল। (৪)

---

(১) রত্নানি বলাদ্দৈত্যাদ্দধীচিতোঽন্যে বদন্তি জাতানি।
কেচিদ্ভুবঃ স্বভাবা দ্বৈচিত্র্যং প্রাহুরুপলানাম্ ॥—বৃ—সং।৭৯।১।

(২) রত্নং গারুত্মতং পুষ্পরাগো মাণিক্য মেব চ।
ইন্দ্রনীলঞ্চ গোমেদস্তথা বৈদূর্য্যমিত্যপি ॥
মৌক্তিকং বিদ্রুমশ্চেতি রত্নান্যুক্তানি বৈ নব।

(৩) মুক্তাফলং হীরকঞ্চ বৈদূর্য্যং পদ্মরাগকম্ ॥
পুষ্পরাগঞ্চ গোমেদং নীলং গারুত্মতং তথা।
প্রবালযুক্তান্যেতানি মহারত্নানি বৈ নব ॥

(৪) বজ্রেন্দ্রনীল-মরকত-কর্কেতর-পদ্মরাগ-রুধিরাখ্যাঃ।
বৈদূর্য্য-পুলক-বিমলক-রাজমণি-স্ফটিক-শশিকান্তাঃ ॥
সৌগন্ধিক-গোমেদক-শঙ্খ-মহানীল-পুষ্পরাগাখ্যাঃ।
ব্রহ্মমণি-জ্যোতীরস-সম্যক-মুক্তাফল-প্রবালানি ॥ ৭৯ । ৪—৫

পূর্ব্বে রত্নমাত্রেরই উপলত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। শঙ্খ ও মুক্তা, এই দুইটি মণিতে প্রস্তরত্ব নাই, ইহারা জান্তব পদার্থ। বোধ হয়, অধিকসংখ্যক রত্নের প্রস্তরত্ব দেখিয়া বরাহমিহির রত্নমাত্রকেই উপল নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

তিনি উল্লিখিত রত্নের মধ্যে কেবল বজ্র, মুক্তা, পদ্মরাগ ও মরকত, এই চারি প্রকার রত্নেরই লক্ষণাদি লিখিয়াছেন। টীকাকার ভট্টোৎপল বলেন,—রত্নসমূহের মধ্যে উক্ত চারি প্রকার রত্নই উৎকৃষ্ট; তাই আচার্য্য তাহাদিগেরই লক্ষণ করিয়াছেন। (৫)

"যুক্তিকল্পতরু"তে আরও অনেকগুলি রত্নের নাম কথিত হইয়াছে। বজ্র, মরকত, পদ্মরাগ, মৌক্তিক, ইন্দ্রনীল, মহানীল, বৈদূর্য্য, গন্ধ, চন্দ্রকান্ত, সূর্য্যকান্ত, স্ফটিক, বলক, কর্কেতর, পুষ্পরাগ, জ্যোতীরস, স্ফটিক, রাজবর্ত্ত, রাজমত, সৌগন্ধিক, গঞ্জ, শঙ্খ, ব্রহ্মময়, গোমেদ, রুধিরাখ্য, ভল্লাতক, ধূলীমরকত, তুত্থক, সীস, পীল, প্রবাল, গিরিবজ্র, ভুজঙ্গমামণি, বজ্রমণি, তিত্তিভ, পিত্ত, ভ্রামর, এবং উৎপল। (৬)

যুক্তিকল্পতরুতে বজ্র, পদ্মরাগ, প্রবাল, গোমেদ, মুক্তা, বৈদূর্য্য, ইন্দ্রনীল ও মরকত, এই আটটি রত্ন মুখ্য বলিয়া কথিত হইয়াছে। মরকত-পরীক্ষার পর গ্রন্থ-

---

(৫) উৎকৃষ্টানি চত্বারি বজ্র-মুক্তা-পদ্মরাগ-মরকতাখ্যানি।
তেষামেব লক্ষণ মাচার্য্যঃ করোতীতি সম্বন্ধঃ॥

(৬) বজ্রং মরকতঞ্চৈব পদ্মরাগঞ্চ মৌক্তিকম্।
ইন্দ্রনীলং মহানীলং বৈদূর্য্যং গন্ধসংজ্ঞকম্॥
চন্দ্রকান্তং সূর্য্যকান্তং স্ফাটিকং বলকস্তথা।
কর্কেতরং পুষ্পরাগং তথা জ্যোতীরসং দ্বিজ॥
স্ফাটিকং রাজবর্ত্তঞ্চ তথা রাজমতং শুভম্।
সৌগন্ধিকং তথা গঞ্জং শঙ্খং ব্রহ্মময়স্তথা॥
গোমেদং রুধিরাখ্যঞ্চ তথা ভল্লাতকং দ্বিজ।
ধূলীমরকতঞ্চৈব তুত্থকং সীসমেব চ॥
পীলং প্রবালকঞ্চৈব গিরিবজ্রঞ্চ ভার্গব।
ভুজঙ্গমামণিশ্চৈব তথা বজ্রমণিঃ শুভঃ॥
তিত্তিভঞ্চ তথা পিত্তং ভ্রামরঞ্চ তথোৎপলম্।
বজ্রান্যেতানি সর্ব্বাণি ধার্য্যাণ্যেব মহীভৃতা॥
হৈমমাতঙ্গসৌরাষ্ট্রাঃ পৌণ্ড্রকালিঙ্গকোশলাঃ।
বেণাতটাঃ সসৌবীরা বজ্রস্যাষ্টৌ বিহাকরাঃ।

কার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, অষ্টপ্রকার মুখ্য-রত্নের লক্ষণ প্রভৃতি নিরূপণের পর যথাক্রমে অমুখ্য-রত্ন সকলের লক্ষণ কথিত হইবে। (৭)

এই গ্রন্থে হীরক প্রভৃতি রত্নের ব্রাহ্মণাদি জাতি-বিভাগ কথিত হইয়াছে; যথা—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রভেদে হীরক চারিপ্রকার। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ-জাতি শ্বেতবর্ণ, ক্ষত্রিয়জাতি রক্তবর্ণ, বৈশ্যজাতি পীতবর্ণ, এবং শূদ্রজাতি কৃষ্ণবর্ণ। (৮)

বিভিন্নজাতীয় মণিধারণের অধিকারগত পার্থক্যও দেখিতে পাওয়া যায়। যুক্তিকল্পতরুতে পদ্মরাগপরীক্ষাপ্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র. এই চারিপ্রকার যে পদ্মরাগ কথিত হইয়াছে, সেইগুলি ব্রাহ্মণাদি চারি জাতি রাজগণ কর্ত্তৃক যথাক্রমে ধারণীয়। ইহাতে সম্পত্তি-লাভ হয়। অন্যথা করিলে, অর্থাৎ এক জাতির ধার্য্য রত্ন অপর জাতি ধারণ করিলে রোগ, শোক, ভয় ও ক্ষয় হয়। (৯)

অনেকগুলি মণির জাতিবিভাগ আছে। বরাহমিহির জাতিবিভাগের কোনও উল্লেখ না করিয়া কেবল শ্রেণীবিভাগ ও মূল্যাদির তারতম্য বিবৃত করিয়াছেন। তিনি হীরক প্রভৃতির আকরেরও উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার নির্দ্দেশানুসারে জানা যায়, বেনা নদীর তট, কোশল, সৌরাষ্ট্র, সৌপরিক, হিমালয়, মতঙ্গ, কলিঙ্গ ও পৌণ্ড্র, এই আটটি দেশ হীরকের আকর্। (১০) গরুড়পুরাণেও বজ্রের আটটি আকর কথিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে সৌপরিকের পরিবর্ত্তে সৌবীরের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

হৈমমাতঙ্গ সৌরাষ্ট্রাঃ পৌণ্ড্রকালিঙ্গ কোশলাঃ।
বেনাতটাঃ সসৌবীরা বজ্রস্যাষ্টা বিহাকরাঃ॥

---

(৭) অষ্টানাং মুখ্যরত্নানাং লক্ষণানি নিরূপ্য চ।
বক্ষ্যন্তে বান্যরত্নানাং লক্ষণানি যথাক্রমম্॥

(৮) শ্বেতা রক্তা তথা পীতা কৃষ্ণা ছায়া চতুর্বিধাঃ।
ব্রহ্মক্ষত্রিয়বিট্‌শূদ্রজাতে র্বজ্রস্য চ ক্রমাৎ।

(৯) ব্রহ্মক্ষত্রিয়-বৈশ্যান্ত্যাশ্চতুর্দ্ধা যে প্রকীর্ত্তিতাঃ।
চতুর্বিধৈর্নৃপতিভি র্ধার্য্যাঃ সম্পত্তিহেতবে।

(১০) বেনাতটে বিশুদ্ধং শিরীষকুসুমপ্রভঞ্চ কোশলজম্।
সৌরাষ্ট্রে মাতাম্রং কৃষ্ণং সৌপরিকং বজ্রম্॥
ঈষত্তাম্রং হিমবতি মতঙ্গজং বল্লপুষ্পসঙ্কাশম্।
আপীতং চ কলিঙ্গে শ্যামং পৌণ্ড্রেষু সম্ভূতম্॥ বৃ-সং। ৭৯

পৌণ্ড্রদেশে হীরক-খনির উল্লেখ সকল প্রমাণেই দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান সময়ে পৌণ্ড্রের হীরক কোথায় লুকাইল, এই প্রশ্নের উত্তর যুক্তিকল্পতরুতে প্রদত্ত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থের মতে, সত্যযুগে ও কলিযুগে কোশলদেশে হীরক জন্মিত; হিমালয় ও মতঙ্গ পর্ব্বতে ত্রেতাযুগে হীরক উৎপন্ন হইত; পৌণ্ড্রদেশে ও সুরাষ্ট্রে দ্বাপরযুগে হীরক হইত। (১২) বরাহমিহির এ সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই।

তিনি হীরকের দেবতাবিশেষের নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং কোন জাতির পক্ষে কোন বর্ণের হীরক ধারণীয়, তাহাও বলিয়াছেন। তাঁহার মতে, শুক্লবর্ণ ষট্‌কোণ হীরক ঐন্দ্রং; অর্থাৎ, এই জাতীয় হীরকে ইন্দ্র দেবতার অধিষ্ঠান আছে। সর্প-মুখাকৃতি কৃষ্ণবর্ণ হীরক যাম্য (যম ইহার দেবতা)। যে হীরক সর্ব্বসংস্থান, অর্থাৎ সমস্ত-আকার-যুক্ত, এবং কদলীকাণ্ডের মত নীলপীতবর্ণ, সেই হীরক বৈষ্ণব। কর্ণিকারপুষ্পসদৃশ হীরক বারুণ (বরুণ-দৈবত)। ত্রিকোণ অথচ ব্যাঘ্রনেত্রসদৃশবর্ণ হীরক আগ্নেয় (অগ্নি ইহার দেবতা)। এবং যবসদৃশাকার অশোকপুষ্পসমানবর্ণ হীরক বায়ব্য; অর্থাৎ বায়ু ইহার দেবতা। (১৩)

বরাহমিহির হীরকের তিনপ্রকার আকরের উল্লেখ করিয়াছেন,—"স্রোত খনি ও প্রকীর্ণক, বজ্রের এই তিন প্রকার আকর।' (১৪) টীকাকার ভট্টোৎপল বলেন, যে স্থান হইতে জল স্রুত হয়, তাহা 'স্রোত'। 'খনি' শব্দ 'খাত' ও 'প্রকীর্ণক' যে ভূমিতে মণি জন্মে; যেমন সমুদ্র। (১৫) বরাহমিহিরের মতে,

---

(১২) কৃতযুগে কলিযুগে কোশলে বজ্রসম্ভবঃ।
হিমালয়ে মতঙ্গাদ্রৌ ত্রেতায়াং কুলিশোদ্ভবঃ॥
পৌণ্ড্রকে চ সুরাষ্ট্রে চ দ্বাপরে পরিসম্ভবঃ।
ঐন্দ্রং ষড়স্রি শুক্লং যাম্যং সর্পাস্থ রূপমসিতম্॥

(১৩) ঐন্দ্রং ষড়স্রি শুক্লং যাম্যংসর্পাস্য-সদৃশমসিতঞ্চ।
কদলীকাণ্ডনিকাশং বৈষ্ণবমিতি সর্ব্বসংস্থানম্॥
বারুণমবলাগুহ্যোপমং ভবেৎ কর্ণিকারপুষ্পনিভম্।
শৃঙ্গাটকসংস্থানং ব্যাঘ্রাক্ষিনিভঞ্চ হৌতভুজম্।
বায়ব্যঞ্চ যবোপম মশোককুসুমপ্রভং সমুদ্দিষ্টম্। বৃ সং। ৭৯।৮।১০

(১৪) স্রোতঃ খনিঃ প্রকীর্ণক মিত্যাকরসম্ভব স্ত্রিবিধঃ।

(১৫) স্রোতো যতো জলং স্রবতি। খনিঃ খন্যতে ইতি খনিঃ খাতম্। প্রকীর্ণকং যস্যাং ভূমৌ মণয়ো ভবন্তি। সমুদ্রো যথা।

রক্ত ও পীত হীরক ক্ষত্রিয়ের, শুভ্র হীরক ব্রাহ্মণের, শিরীষপুষ্পসদৃশ হীরক বৈশ্যের, এবং কৃষ্ণবর্ণ হীরক শূদ্রের পক্ষে প্রশস্ত। (বৃ সং। ৭৯।১১)

বরাহমিহির ও যুক্তিকল্পতরু-কার পৌরাণিক মতের অনুসরণ করিয়া হীরক প্রভৃতি রত্নের মূল্য নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এ স্থলে তাহার নির্দ্দেশ অনাবশ্যক। যুক্তিকল্পতরুতে যে সমস্ত রত্নের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তদতিরিক্ত ভীষ্মমণি প্রভৃতির বিবরণও উক্ত গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়।

বরাহমিহির স্থূলতর হীরকের শুভ ও অশুভ লক্ষণ প্রভৃতির নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যুক্তিকল্পতরুতে এই সমস্ত বিষয় অতি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

বৃহৎসংহিতায় হীরকের পরেই মুক্তার লক্ষণ প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতঃভাবে বর্ণিত হইয়াছে। মুক্তার সহিত অলঙ্কারের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। মুক্তা-প্রসঙ্গেই মুক্তারচিত ভূষণের সংজ্ঞা বৃহৎ-সংহিতায় কথিত হইয়াছে। তাহা হইতে জানা যায়, হস্তী, সর্প, শুক্তি (ঝিনুক), শঙ্খ, মেঘ, বাঁশ, তিমি ও শূকর, এই সপ্ত পদার্থ হইতে মুক্তার উৎপত্তি হইয়া থাকে। তন্মধ্যে শুক্তিজাত মুক্তাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সিংহল, পরলোকদেশ, সুরাষ্ট্র, তাম্রপর্ণী নদী, পারশব দেশ, কৌবেরদেশ, পাণ্ড্যবাটকদেশ ও হিমালয় প্রদেশ, এই আটটি দেশ মুক্তার আকর বলিয়া প্রসিদ্ধ। (১৬)

ভাবপ্রকাশে কথিত হইয়াছে, মৎস্য ও ভেক, এই দুই জন্তু হইতেও মুক্তার উৎপত্তি হয়। (১৭)

পরীক্ষকগণ বিচারপূর্ব্বক মুক্তার আটটি গুণ স্থির করিয়াছেন,—সুতার, সুবৃত্ত, স্বচ্ছ, নির্ম্মল, ঘন, স্নিগ্ধ, সচ্ছায় ও অস্ফুটিত। যাহা নক্ষত্রের দ্যুতির মত ঝক্‌ঝক্ করে, তাহা সুতার। যাহা সর্ব্বদিকে গোলাকার, তাহা সুবৃত্ত। যাহাতে কোনও প্রকার দোষ নাই, তাহা স্বচ্ছ। যাহা মলসম্পর্করহিত, তাহা নির্ম্মল। তুলনায় যাহার গুরুত্ব প্রমাণিত হয়, তাহা ঘন। যাহা তৈলাদি স্নেহ পদার্থের দ্বারা লিপ্তের মত বোধ হয়, তাহা স্নিগ্ধ। যাহা ছায়াসমন্বিত, অর্থাৎ

---

(১৬) দ্বিপ-ভুজগ-শুক্তি-শঙ্খাভ্র-বেণু-তিমি-শূকর-প্রসূতানি।
মুক্তাফলানি তেষাং বহু সাধু চ শুক্তিজং ভবতি।
সিংহলক-পারলৌকিক-সৌরাষ্ট্রক-তাম্রপর্ণী-পারশবাঃ।
কৌবের-পাণ্ড্যবাটক-হৈমা ইত্যাকরা হ্যষ্টৌ॥ বৃ সং ৮০।১।২

(১৭) শঙ্খো গজশ্চ ক্রোড়শ্চ ফণী মৎস্যশ্চ দর্দ্দুরঃ।
বেণুরেতি সমাখ্যাতা স্তজ্জ্ঞৈর্মৌক্তিকযোনয়ঃ।

প্রতিবিম্বযুক্ত, তাহা সচ্ছায়। যাহাতে কোনও প্রকার ক্ষত-চিহ্ন নাই, তাহা অস্ফুটিত। (১৮)

মুক্তার দোষ দশ প্রকার। যথা—যাহার একদেশে শুক্তিখণ্ড লাগিয়া রহিয়াছে বলিয়া বোধ হয়, তাহা শুক্তিলগ্ন নামে কথিত। সেই দোষ কুষ্ঠরোগ-কারক। মুক্তাতে মাছের চক্ষুর মত যে চিহ্ন দেখা যায়, সেই দোষ মৎস্যাক্ষ নামে কথিত, এবং তাহা পুত্রবিনাশকর। দীপ্তিরহিত ও ছায়াশূন্য মৌক্তিক জঠর নামে কথিত। এই মৌক্তিক ধারণ করিলে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। প্রবালের আভাযুক্ত মৌক্তিক অতিরিক্ত নামে অভিহিত। উহা দারিদ্র্যজনক; অতএব পরিত্যজ্য। যে মুক্তাতে উপর্য্যুপরি রেখা বিদ্যমান থাকে, সেই মুক্তা ত্রিবৃত্ত নামে কথিত। তাহা ধারণ করিলে সৌভাগ্যক্ষয় হয়। যে মুক্তা গোলাকার নহে, সেই মুক্তা চিপিট; ধারণ করিলে কীর্ত্তিনাশ হয়। ত্রিকোণ মৌক্তিক ত্র্যস্র নামে কথিত। ধারণ করিলে সৌভাগ্যনাশ হয়। দীর্ঘাকার মুক্তার নাম কৃশ; ধারণ করিলে বুদ্ধিনাশ হয়। যে মুক্তার এক দিক্ ভুগ্ন, তাহা কৃশপার্শ্ব নামে কথিত। দোষযুক্ত মুক্তা নিন্দনীয় ও উদ্যমনাশক। (১৯)

মুক্তার কান্তি সাধারণতঃ চারিপ্রকার। হীরকাদির ন্যায় ইহারও জাতিবিভাগ

---

(১৮) সুতারঞ্চ সুবৃত্তঞ্চ স্বচ্ছঞ্চ নির্ম্মলং তথা।
ঘনং স্নিগ্ধঞ্চ সচ্ছায়ং তথা ঽস্ফুটিত মেব চ॥
অষ্টৌ গুণাঃ সমাখ্যাতা মৌক্তিকানামশেষতঃ।
তারকাদ্যুতিসঙ্কাশঃ সুতারমিতি গদ্যতে॥
সর্ব্বতোবর্ত্তুলং যচ্চ সুবৃত্তং তন্নিগদ্যতে।
স্বচ্ছং দোষ-বিনির্ম্মুক্তং নির্ম্মলং মলবর্জ্জিতম্॥
গুরুত্বং তুলনে যস্য তদ্ ঘনং মৌক্তিকং বরম্।
স্নেহেনেব বিলিপ্তং যত্তৎ স্নিগ্ধমিতি গদ্যতে॥
ছায়াসমন্বিতং যচ্চ সচ্ছায়ং তন্নিগদ্যতে।
ব্রণরেখাবিহীনং যত্তৎ স্যাদস্ফুটিতং শুভম্॥

(১৯) যত্রৈকদেশে সংলগ্নঃ শুক্তিখণ্ডো বিভাব্যতে।
শুক্তিলগ্নঃ সমাখ্যাতঃ সদোষঃ কুষ্ঠকারকঃ॥
মীনলোচন-সঙ্কাশো দৃশ্যতে মৌক্তিকে তু যঃ।
মৎস্যাক্ষঃ স তু দোষঃ স্যাৎ পুত্র-নাশকরঃ ধ্রুবঃ॥
দীপ্তিহীনং গতচ্ছায়ং জঠরং তদ্বিদুর্বুধাঃ।
তস্মিন্ সংধারিতে মৃত্যুর্জায়তে নাত্র সংশয়ঃ॥

দেখিতে পাওয়া যায়। যুক্তিকল্পতরুতে কথিত হইয়াছে যে, রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ কর্তৃক মুক্তার পীতা, মধুরা, সিতা ও নীলা, এই চারি প্রকার ছায়া অর্থাৎ কান্তি কথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে 'পীতচ্ছায়া লক্ষ্মীদায়িনী ; মধুরা ছায়া বুদ্ধিবৃদ্ধিকরী ; শুক্লচ্ছায়া যশস্করী ; এবং নীলচ্ছায়া সৌভাগ্যদায়িনী। শুক্লচ্ছায় মৌক্তিক ব্রাহ্মণ ; সূর্য্যের মত রক্তচ্ছায় মৌক্তিক ক্ষত্রিয় ; পীতচ্ছায় মৌক্তিক বৈশ্য ; এবং কৃষ্ণচ্ছায় মৌক্তিক শূদ্র বলিয়া পরিচিত।' (২০)

মুক্তার বিবরণ অতিবিস্তৃত। তাহা বিশেষ করিয়া লিখিতে গেলে কেবল মুক্তার বিবরণেই একখানি গ্রন্থ হইতে পারে। বরাহমিহিরও বিস্তৃতির দিকে না যাইয়া সাধারণতঃ দোষগুণাদির বর্ণনা করিয়াছেন। আমরাও সেই রীতির অনুসরণ করিলাম।

পদ্মরাগ।

পদ্মরাগ শব্দের ব্যুৎপত্তি অনুসারে বুঝা যায় যে, ইহার বর্ণ পদ্মের মত। কিন্তু বৃহৎসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে পদ্মরাগের ভিন্ন ভিন্ন কান্তির উল্লেখ আছে। আকরের প্রভেদানুসারে উহার দ্যুতিগত পার্থক্য ঘটিয়া থাকে। সৌগন্ধিক ও কুরুবিন্দ, এই দুই প্রকার ধাতু ও স্ফটিক প্রস্তর, এই তিন বস্তু হইতে,

---

মৌক্তিকং বিদ্রুমচ্ছায় মতিরক্তং বিদুর্বুধাঃ।
দারিদ্র্যজননং যস্মাত্তস্মাত্তৎ পরিবর্জয়েৎ॥
উপর্য্যুপরি তিষ্ঠন্তি বলয়ো যত্র মৌক্তিকে।
ত্রিবৃত্তং নাম তৎপ্রোক্তং সৌভাগ্যক্ষয়কারকম্॥
অবৃত্তং মৌক্তিকং যচ্চ চিপিটং তন্নিগদ্যতে।
মৌক্তিকং ধ্রিয়তে যেন তস্যাকীর্ত্তির্ভবেদ্ ধ্রুবম্॥
ত্রিকোণং ত্র্যস্র মাখ্যাতং সৌভাগ্যক্ষয়কারকম্।
দীর্ঘং যত্তৎ কৃশং প্রোক্তং প্রজ্ঞাবিধ্বংসকারকম্॥
নির্ভুগ্ন মেকতো যচ্চ কৃশপার্শ্বং তদুচ্যতে।
সদোষং মৌক্তিকং নিন্দ্যং নিরুদ্যোগকরং পরম্॥

(২০) চতুর্দ্ধা মৌক্তিকে ছায়া পীতা চ মধুরা সিতা।
নীলা চৈব সমাখ্যাতা রত্ন-তত্ত্ব-পরীক্ষকৈঃ॥
পীতা লক্ষ্মীপ্রদা চ্ছায়া মধুরা বুদ্ধিবর্দ্ধিনী।
শুক্লা যশস্করী চ্ছায়া নীলা সৌভাগ্যদায়িনী॥
সীতচ্ছায়ো ভবেদ্বিপ্রঃ ক্ষত্রিয়শ্চার্করশ্মিবান্।
পীতচ্ছায়ো ভবেদ্বৈশ্যঃ শূদ্রঃ কৃষ্ণরুচিমতঃ॥

অর্থাৎ, ইহাদের খনি হইতে পদ্মরাগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। তন্মধ্যে সৌগন্ধিক-জাত পদ্মরাগ ভ্রমরবর্ণ, অঞ্জনবর্ণ, পদ্মবর্ণ ও জম্বূরস-বর্ণ হয়। কুরুবিন্দোৎপন্ন শবল, অর্থাৎ মিশ্রবর্ণ; ইহাদের দ্যুতি অল্প, এবং ইহাদের সহিত গৈরিক প্রভৃতি মিশ্রিত থাকে। স্ফটিকোৎপন্ন পদ্মরাগ অত্যন্ত দ্যুতিশালী, নানাবর্ণ ও নির্ম্মল। (২১) ইহারও নানাপ্রকার দোষগুণ ও শ্রেণীবিভাগ কথিত হইয়াছে।

মরকত।

যুক্তিকল্পতরুতে মরকত মণির পৌরাণিক উৎপত্তি-বিবরণ, জাতিভেদ ও দোষ গুণ প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। বৃহৎসংহিতায় কেবল ইহার চারি প্রকার বর্ণের উল্লেখ আছে। ইহাতে কেবল শুভলক্ষণ মরকতেরই বর্ণ কথিত হইয়াছে,—

শুক-বংশপত্র-কদলী-শিরীষ-কুসুমপ্রভং গুণোপেতম্।
সুরপিতৃকার্য্যে মরকতমতীব শুভদং নৃণাং বিহিতম্।

অর্থাৎ, যে মরকত মণি শুকপক্ষীর পক্ষের সমানবর্ণ, অথবা বংশ পত্রের মত বর্ণযুক্ত, অথবা কদলীর মত বর্ণান্বিত, কিংবা শিরীষ পুষ্পের সমানবর্ণ, অর্থাৎ শ্বেত-পীতবর্ণ, সেইরূপ মরকত মানবদিগের দেবপিতৃকার্য্যে অত্যন্ত শুভফল-প্রদ। যুক্তিকল্পতরুতে উহার আট প্রকার ছায়ার উল্লেখ আছে। এই আটপ্রকার ছায়া ময়ূরপিচ্ছতুল্য, বাসপক্ষীর পক্ষতুল্য, হরিকোচতুল্য, শৈবালতুল্য, খদ্যোতপৃষ্ঠতুল্য শুকশিশুর তুল্য, নূতনতৃণাবৃত ভূমির তুল্য, এবং শিরীষপুষ্পের সমানবর্ণ। (২২) যে মরকত মণি হস্তে ন্যস্ত হইয়া সূর্য্যকিরণসংস্পর্শে

---

(২১) সৌগন্ধিক-কুরুবিন্দ-স্ফটিকেভ্যঃ পদ্মরাগসম্ভূতিঃ।
সৌগন্ধিকজা ভ্রমরাঞ্জনাব্জজম্বূরসদ্যুতয়ঃ॥
কুরুবিন্দভবাঃ শবলা মন্দদ্যুতয়শ্চ ধাতুভির্বিদ্ধা।
স্ফটিকভবা দ্যুতিমন্তো নানাবর্ণা বিশুদ্ধাশ্চ॥—বৃ সং। ৮১।

টীকাকার ভট্টোৎপল অব্জ শব্দের উৎপলার্থও গ্রহণ করিয়াছেন। 'অব্জবর্ণা—উৎপলবর্ণা বা তত্তুল্যকান্তয়ঃ।' জম্বূরসসমানকান্তি বলায় ভট্টোৎপলের মতে লোহিতবর্ণ অভিপ্রেত হইয়াছে। 'জম্বূর্বৃক্ষবিশেষঃ তদ্রসসমানকান্তয়ো লোহিতবর্ণাঃ।'

(২২) ভবে দষ্টবিধা চ্ছায়া মণের্ম্মরকতস্য চ।
বর্হিপিচ্ছসমা ভাসা চাসপক্ষসমাপরা॥
চাস পক্ষী স্বর্ণচাতক বা স্বর্ণচূড় নামে প্রসিদ্ধ।

নিজ রশ্মির দ্বারা (হস্তকে) রঞ্জিত করে, সেই মণি মহামরকত নামে অভিহিত হয়। (২৩)

বৈদূর্য্যমণি।

বৈদূর্য্যমণির উৎপত্তি সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে যে, প্রলয়কালে ক্ষুভিত-সমুদ্রনাদসদৃশ দৈত্যাধিপতির ভীষণ শব্দ হইতে নানাবর্ণ বৈদূর্য্যমণির উৎপত্তি হইয়াছে। (২৪) পদ্মরাগ মণিতে যে সমস্ত বর্ণ সম্ভব, বৈদূর্য্যমণিতেও সেই সমস্ত বর্ণের সমাবেশ হইয়া থাকে। তন্মধ্যে ময়ূরকণ্ঠের মত নীলবর্ণ, অথবা বিল্বপত্রের

হরিকোচ-(হরিৎকাচ)-নিভা চান্যা তথা শৈবালসন্নিভা।
খদ্যোতপৃষ্ঠসঙ্কাশা বালকীরসমা তথা॥
নবশাদ্বলসচ্ছায়া শিরীষকুসুমোপমা।
এবমষ্টৌ সমাখ্যাতা চ্ছায়া মরকতস্য চ॥

যুক্তিকল্পতরুতে এবং শব্দকল্পদ্রুমে 'হরিকোচ' শব্দের উল্লেখ আছে, ইহা লেখকের প্রমাদসম্ভূত বলিয়া মনে হয়। হয় ত 'হরিৎ' শব্দের খণ্ড-তকার 'কাচ' শব্দের ককারের পশ্চাতে যুক্ত হইয়া এই অভিনব শব্দের সৃষ্টি করিয়াছে। যুক্তিকল্পতরুতে বিভিন্ন-বর্ণ কাচের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

(২৩) যস্তু ভাস্করসংস্পর্শাৎ হস্তন্যস্তো মহামণিঃ।
রঞ্জয়েদাত্মপাদৈস্তু মহামরকতং হি তৎ॥

(২৪) কল্পান্তকালক্ষুভিতাম্বুরাশিনির্হ্রাদতুল্যাদ্দিতিজস্য নাদাৎ।
বৈদূর্য্যমুৎপন্নমনেকবর্ণং শোভাভিরামদ্যুতিবর্ণবীজম্॥
পদ্মরাগমুপাদায় মণিবর্ণা হি যে ক্ষিতৌ।
সর্ব্বাংস্তান্ বর্ণশোভাভি বৈর্দূর্য্য মনুগচ্ছতি॥
তত্রপ্রধানং শিখিকণ্ঠনীলম্ যদ্বা ভবেদ্বিল্বদলপ্রকাশম্।
চাসাগ্রপক্ষপ্রতিমশ্রিয়ো যে ন তে প্রশস্তা মণিশাস্ত্রবিদ্ভিঃ॥
ব্রহ্মক্ষত্রিয়বিট্‌শূদ্রজাতিভেদাচ্চতুর্বিধম্।
সিতনীলো ভবেদ্বিপ্রঃ সিতরক্তস্তু বাহুজঃ।
পীতনীলস্তু বৈশ্যঃ স্যান্নীল এব হি শূদ্রকঃ।
মার্জ্জারনয়নপ্রখ্যং রসোনপ্রতিমং হি বা।
কলিলং নির্ম্মলং ব্যঙ্গং বৈদূর্য্যং দেবভূষণম্॥
সুতারং ঘনমত্যচ্ছং কলিলং ব্যঙ্গমেব চ।
বৈদূর্য্যাণাং সমাখ্যাতা এতে পঞ্চ মহাগুণাঃ॥
উদ্গিরন্নিব দীপ্তিং যোহসৌ সুতার ইতীর্য্যতে॥
প্রমাণতোহল্পং গুরু যদ্ঘনমিত্যভিধীয়তে॥

সমানবর্ণ বৈদূর্য্যই প্রধান। চাস পক্ষীর পক্ষ্যাগ্রতুল্যবর্ণ বৈদূর্য্য প্রশস্ত বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। বর্ণভেদে ইহারও ব্রাহ্মণাদি জাতিভেদ কল্পিত হইয়াছে। মার্জ্জারের নয়নসদৃশবর্ণ অথবা রসোনসদৃশ কলিল নির্ম্মল, এবং ব্যঙ্গ বৈদূর্য্য দেবতার ভূষণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সুতার, ঘন, অত্যচ্ছ, কলিল ও ব্যঙ্গ, বৈদূর্য্যের এই পাঁচটী মহাগুণ কথিত হইয়াছে। যাহা দেখিলে বোধ হয় যেন দীপ্তি উদ্গিরণ করিতেছে, তাহা সুতার। যাহা পরিমাণে অল্প হইয়াও গুরুত্বযুক্ত, তাহা ঘন। যাহা কলঙ্কাদিদোষরহিত, তাহা অত্যচ্ছ। যাহাতে ব্রহ্মশস্ত্রশলাকার চঞ্চল চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কলিল নামে পরিচিত। ইহা রাজার সমস্ত-সম্পত্তি-কারক। যে বৈদূর্য্যের অঙ্গ বিশ্লিষ্ট, তাহা ব্যঙ্গ নামে কথিত।

ইন্দ্রনীল।

পৌরাণিক বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, বল নামক দৈত্যের নেত্রদ্বয় সিংহল দেশে পতিত হইয়াছিল; তাহা হইতেই ইন্দ্রনীল মণির উৎপত্তি হইয়াছে। ইহার বর্ণ নীলপদ্মের সদৃশ, ভগবান্ বলদেবের বসনের মত, ইন্দ্রধনুর মত, মহাদেবের কণ্ঠের মত, কলায় পুষ্পের মত, এবং কৃষ্ণবর্ণ গিরিকর্ণিকা পুষ্পের তুল্য। কতকগুলির বর্ণ সমুদ্রের নির্ম্মলজলসদৃশ, কতকগুলির বর্ণ ময়ূরের কণ্ঠের মত, এবং একপ্রকার ইন্দ্রনীলের বর্ণ নীলরসোৎপন্ন বুদ্বুদের মত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে একপ্রকার সুস্পষ্টবর্ণশোভান্বিত ইন্দ্রনীলমণি মহাগুণযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। ইহারও বর্ণানুসারে জাতিবিভাগ হইয়াছে। ইন্দ্রনীলেরই একশ্রেণী মহানীল নামে অভিহিত। যে নীলমণির মধ্যে ইন্দ্রধনুর ছায়া পরিলক্ষিত হয়, তাহা ইন্দ্রনীল নামে, এবং যে মণি বর্ণের বাহুল্যনিবন্ধন শতগুণ দুগ্ধে নিহিত হইয়া সমস্ত দুগ্ধকে নীলবর্ণ করিতে পারে, সেই মণি মহানীল নামে অভিহিত হইয়া থাকে। (২৫)

কলঙ্কাদিবিহীনং য দত্যচ্ছ মিতিকীর্ত্তিতম্।
ব্রহ্মশস্ত্রশলাকার শ্চঞ্চলো যত্র দৃশ্যতে।
কলিলং নাম তদ্রাজ্ঞঃ সর্ব্বসম্পত্তিকারকমং।
বিশ্লিষ্টাঙ্গস্তু বৈদূর্য্যং ব্যঙ্গমিত্যভিধীয়তে ॥—যুক্তিকল্পতরু ॥

তত্রৈব সিংহলবধূকরপল্লবাগ্রব্যালূন কললবলীকুসুমপ্রবালে।
দেশে পপাত দিতিজস্য নিতান্তকান্তং প্রোৎফুল্লনীরজসমদ্যুতিনেত্রযুগ্মম্।
তৎপ্রত্যয়াদুভয়শোভনবীচিভাসা বিস্তারিণী জলনিধে রুপকচ্ছভূমিঃ।
প্রোদ্ভিন্নকেতকবনপ্রতিবদ্ধরেখা সান্দ্রেন্দ্রনীলমণিরত্নবতী বভূব ॥
তত্রাসিতাব্জহলভৃদ্বসনাভিযঙ্গ শক্রায়ুধাঙ্গহরকণ্ঠকলায়পুষ্পে।
শুক্লেতরৈশ্চ কুসুমৈ র্গিরিকর্ণিকায়া স্তস্মিন্ ভবন্তি মণয়ঃ সদৃশাভভাসঃ ॥

শিশুপালবধ কাব্যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দেহ মহানীল মণির সমানকান্তি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, এবং সেই স্থলে টীকাকার মল্লিনাথ ভগবান্ অগস্ত্যের বচন প্রমাণস্বরূপ উপন্যস্ত করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, সিংহল দ্বীপ-সম্ভূত ইন্দ্রনীলমণিই 'মহানীল' নামে অভিহিত হয়। (২৬) কিন্তু যুক্তিকল্পতরুর প্রদর্শিত গরুড়পুরাণীয় বচনানুসারে সিংহলোৎপন্ন সমস্ত ইন্দ্রনীল মহানীল নামে কথিত হয় না।

যুক্তিকল্পতরুতে ইন্দ্রনীল-প্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে যে, 'ইন্দ্রনীল' মণি নীলবর্ণ; 'পদ্মরাগ' মণি লোহিতবর্ণ; ঈষন্নীল শুক্লবর্ণ স্নেহলিপ্তবৎ প্রতীয়মান মণি 'মানবক' নামে কথিত; ঈষদ্রক্তবর্ণ পীতবর্ণভিন্ন স্বচ্ছ মণি 'কাসায়' নামে পরিচিত; ঈষৎপীতপাণ্ডুবর্ণ প্রস্তর 'পুষ্পরাগ' নামে অভিহিত, এবং পুষ্পরাগই লোহিতাকার হইলে, কৌরণ্ডক নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। (২৭)

যুক্তিকল্পতরুতে ইন্দ্রনীলের বিস্তৃত বিবরণ আছে।

শ্রীগিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ।

অন্যে প্রসন্নপয়সঃ পয়সাং নিধাতু রম্বুত্বিষঃ শিখিগণপ্রতিমা স্তথান্যে।
নীলীরসপ্রসববুদ্বুদভাশ্চ কেচিৎ কেচিত্তথা শমনকোকিলকণ্ঠ (কাক্ষ) ভাসঃ॥
একপ্রকারবিস্পষ্টবর্ণশোভাবিভাসিনঃ।
জায়ন্তে মণয়স্তস্মি ন্নিন্দ্রনীলা মহাগুণাঃ॥
শ্বেতনীলং রক্তনীলং পীতনীলমথাপি বা।
কৃষ্ণনীলং তথা জ্ঞেয়ং ব্রাহ্মণাদিক্রমেণ তু॥
যস্য মধ্যগতা ভাতি নীলস্যেন্দ্রায়ুধপ্রভা।
তমিন্দ্রনীলমিত্যাহু র্মুনয়ো ভুবি দুর্লভম্॥
যস্য বর্ণস্য ভূয়স্ত্বা ক্ষীরে শতগুণে স্থিতম্।
নীলতাবং নয়েৎ সর্ব্বং স মহানীল উচ্যতে॥

(২৬) মহামহানীলশিলারুচঃ পুরো নিষেদিবান্ কংসকৃষঃ সবিষ্টরে।
শ্রিতোদয়াদ্রে রভিসায় মুচ্চকৈ রচূচুর চন্দ্রমসোঽভিরামতাম্॥
সিংহলস্থাকরোদ্ভূতা মহানীলাস্ত তে স্মৃতাঃ—ইতি ভগবানগস্ত্যঃ॥

(২৭) ইন্দ্রনীলস্তু নীলাভো পদ্মরাগস্তু লোহিতঃ।
অনীলশুক্লস্নিগ্ধস্তু মণি র্মানবকো মতঃ॥
আলোহিতমপীতঞ্চ স্বচ্ছং কাসায়কং বিদুঃ।
আপীতপাণ্ডুপাষাণঃ পুষ্পরাগোঽভিধীয়তে॥
তমেব লোহিতাকার মাহুঃ কৌরণ্ডকং বুধাঃ।

ইন্দোর।

ইন্দোর হোলকারবংশীয়দিগের রাজধানী। রাজপুতানা-মালোয়া রেলওয়ের একটি ষ্টেশন উজ্জয়িনী হইতে ইন্দোর উনচল্লিশ মাইল।

৯ই জানুয়ারী; ১৯১৪; শুক্রবার।—উজ্জয়িনী হইতে ইন্দোরে আসি। ফতেয়াবাদ জংশনে গাড়ী বদল করিয়া ছোট গাড়ীতে উঠিলাম। সন্ধ্যার পরে ষ্টেশনে নামিলাম। ষ্টেশনের নিকটেই একটি সুন্দর ধর্ম্মশালা আছে। আমি পূর্ব্ব হইতেই ইন্দোরে থাকিবার একটি স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলাম। কাজেই ধর্ম্মশালায় না থাকিয়া, টাঙ্গা ভাড়া করিয়া, গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইলাম। সে দিন আর কোথাও যাওয়া হইল না। আহারাদি শেষ করিয়া যামিনী যাপন করিলাম।

১০ই জানুয়ারী।—পরদিন প্রভাতে উঠিয়া বাহিরে আসিয়া দেখি, সূর্য্য-কিরণে নবনির্ম্মিত অট্টালিকাসমূহ সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। ইন্দোর আধুনিক সহর, কাজেই ইহার অঙ্গে অঙ্গে নবশ্রী বিকশিত। আমি চা-পানান্তে সহর-ভ্রমণে বহির্গত হইলাম। সহর আমার বাসার পশ্চিমে। কাহান নামক একটি নদীর সেতু পার হইয়া সহরে প্রবিষ্ট হইতে হয়। আমি প্রথমে মহারাজের হাইকোর্ট ও কাছারী দেখিলাম। হাইকোর্ট নবনির্ম্মিত, বেশ সুদৃশ্য। কাছারী প্রকাণ্ড হরিদ্রাবর্ণ সেকেলে অট্টালিকা। তুকাজীরাও হাঁসপাতাল দেখিলাম। বিস্তৃত বাগানের মাঝখানে ইহাও সেকেলে বাঙ্গলোর ন্যায় বিরাজিত। বাম দিকে বৃদ্ধ তুকাজীরাও হোলকারের শুভ্রপ্রস্তরনির্ম্মিত অর্দ্ধমূর্ত্তি (Bust) শোভিত। প্রস্তর-সেতু পার হইয়া নদীকূলে প্রথমে তিনটি মনোহর ছত্রী দেখিলাম। ইহা দক্ষিণ দিকে নদীর ঘাটের উপর সংস্থাপিত। নদীজলে অসংখ্য নরনারী স্নান করিতেছে। ছত্রী অর্থে স্মৃতিমন্দির। মন্দিরাভ্যন্তরে চিতাভস্মের উপর মহাদেব প্রতিষ্ঠিত। পরলোকগতা কৃষ্ণা বাঈর মূর্ত্তি কুলঙ্গীতে শোভিত। অন্য দুইটির মধ্যে একটি পরলোকগত বৃদ্ধ তুকাজীরাও হোলকারের স্মৃতিমন্দির। মধ্যে তুকাজীর মূর্ত্তি ও তাঁহার পার্থিব ভস্মাবশেষের উপর শুভ্র শিবলিঙ্গ বিরাজিত। অন্যটি অপর একটি নৃপতির; তাঁহার নামটি কেহ বলিতে পারিল না। স্মৃতি-মন্দির-ত্রয়ের বহুস্তম্ভবিশিষ্ট কারুকার্য্যময় অলিন্দ অতীব সুন্দর।

নদীর পূর্ব্বপারে বোলা সাহেবের বৃহৎ স্মৃতি-মন্দির। ইনি এক জন সাধু

ছিলেন। এ ছত্রী দেখিবার জিনিস। গম্বুজ-সদৃশ একটি চাঁদনীর উপর আর একটি চাঁদনী রচিত। সমুচ্চ বেদিকার চতুঃপার্শ্বে বিবিধ শিল্পচাতুর্য্যে বহুবিধ পশুপক্ষীর ও নরনারীর মূর্ত্তি উৎকীর্ণ। ভিতরে শুভ্রমর্ম্মররচিত গৌরীপট্ট ও বৃষভ-মূর্ত্তি অবস্থিত। মহাদেব নাই।

ছত্রীগুলি দেখিয়া সহরে ঢুকিলাম। রাস্তার প্রথম কতকাংশ খুব চওড়া। এই চওড়া রাস্তার উভয় পার্শ্বে নানাবিধ দ্রব্যের বিপণীশ্রেণী ও দ্বিতল অট্টালিকা সারি সারি শোভা পাইতেছে। এ খণ্ডে বস্ত্র-রঞ্জনের দোকানই বেশী। দোকানের সম্মুখে দ্বিতলে নানা রঙ্গে রঞ্জিত বস্ত্র শুখাইতেছে—চঞ্চল পবনে পীত, হরিত, লাল, নীল, বাসন্তী রঙ্গের বসন পতাকার ন্যায় উড়িতেছে! পথি-পার্শ্বেই ধান্য, গোধূম, দাল প্রভৃতি স্তূপে স্তূপে ঢালা রহিয়াছে—এক স্থানে ভুট্টা তরীতরকারীর হাট বসিয়াছে—ঘেসেড়া ও ঘেসেড়ানীরা তাহাদের মাথা হইতে দড়ী-বাঁধা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঘাসের বোঝা নামাইয়া তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ক্রেতার অপেক্ষা করিতেছে। কাঁসা-পিতলের দোকানেও নানাবিধ বাসন-বর্ত্তন সজ্জিত রহিয়াছে। রাস্তায় লোকের খুব ভিড়। এ সময়টা প্রত্যহই সরগরম।

উল্লিখিত বিপণিমালা দেখিতে দেখিতে আমরা রাজপ্রাসাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। ইহার উচ্চতা দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। এটা কাষ্ঠনির্ম্মিত—সপ্ততল! দেখিলেই মনে হয়, দৈত্যদের নবহৎখানা! তেমন চিত্তমুগ্ধকর কারুকার্য্য কিছুই নাই—কেবল উচ্চতাই উল্লেখযোগ্য। এমন অদ্ভুত প্রাসাদ-তোরণ আর কোথাও দেখি নাই।

১১ই জানুয়ারী; রবিবার।—অদ্য প্রভাতে চা পান করিয়া রাজকুমার বাবুর সহিত ডেলী কলেজ অর্থাৎ রাজকুমার কলেজ দেখিতে গেলাম। ইহা তাঁহার বাটী তুকাগঞ্জ হইতে দুই মাইলের কিছু বেশী। বিদ্যালয়টি একখানি মনোহর চিত্রের ন্যায় শোভা পাইতেছে। কলেজের এক পার্শ্বে মুসলমান ছাত্রগণের উপাসনার জন্য মসজীদ, এবং পার্শ্বে হিন্দু ছাত্রগণের পূজার নিমিত্ত শিবমন্দির! সুন্দর দৃশ্য! শুনিলাম, এমন সৌধসৌন্দর্য্যসম্পন্ন বিদ্যালয় ভারতে আর নাই।

কলেজে কেবলমাত্র মধ্য-ভারতের রাজপুত্রগণ অধ্যয়ন করেন। সাধারণ শ্রেণীর ছাত্রগণের নিমিত্ত অন্য বিদ্যালয় আছে।

এখান হইতে মধ্যভারতের গবর্ণর জেনেরেলের এজেণ্টের বাটী দেখিতে

গেলাম। বিরাট অট্টালিকা বহু বিঘা ভূমি অধিকার করিয়া রহিয়াছে। ইহার চতুর্দ্দিকে উদ্যান। সৌধচূড়ে বিটিশ নিশান উড়িতেছে। এই বাটীর নাম রেসীডেন্সী।

ইহার পর পরই রেসীডেন্সী গার্ডেন। ইহাই ইন্দোরের প্রধান দর্শনীয় স্থান। এই বিশাল ভ্রমণ-উদ্যানের ভিতর সুন্দর প্রশস্ত ভ্রমণ-পথ। উদ্যানের মধ্য দিয়া কাহান নদী প্রবাহিত। নদীর উপর মধ্যে মধ্যে দৃষ্টি-রম্য সেতু আছে। নদীর দু'ধারে নিবিড় বংশারণ্য ও অন্যান্য তরু-রাজি স্বচ্ছ সলিল-মুকুরে প্রতিবিম্বিত হইয়া অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক্ সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে। উদ্যানমধ্যে একটি বট বৃক্ষের ঝুরি এমনই ভাবে নামিয়াছে যে, দেখিলে ঘন শ্মশ্রুজাল বলিয়া বোধ হয়! ইহা বড়ই বিচিত্র-দর্শন! উদ্যান দর্শন করিয়া আমরা ক্লান্তদেহে বেলা এগারটার পর বাসায় প্রত্যাগত হইয়া স্নানাহারে পরিতৃপ্ত হইলাম।

যে মহল্লায় আমি ছিলাম, তাহার নাম তুকাগঞ্জ। এখানে প্রায় এক মাইল ধরিয়া রাজপথের উভয় পার্শ্বে আধুনিক সাহেবী ফ্যাশানে নির্ম্মিত উদ্যান-পরিবেষ্টিত চিত্রপ্রতিম দ্বিতল, ত্রিতল হর্ম্ম্যমালা। ইহার দৃশ্য বড়ই মনোমুগ্ধকর! অট্টালিকাগুলি দেখিলে প্রকৃতই চক্ষু জুড়াইয়া যায়! শুনিলাম, এগুলি বিশিষ্ট রাজকর্ম্মচারী ও ধনকুবের বণিকগণের আবাসবাটী। প্লেগের ভয়ে তাঁহারা সহর ছাড়িয়া এই অনিন্দ্য-সুন্দর অলকা-পুরীর সৃষ্টি করিয়াছেন।

১৪ই জানুয়ারী; ১৯১৪।—প্রভাতে লালবাগ নামক নূতন উদ্যান-প্রাসাদ দেখিতে যাত্রা করিলাম। ইহা আধুনিক প্রণালীতে রচিত মহারাজের গ্রীষ্মাবাস। ইহা সহর হইতে এক মাইলের কিছু বেশী। বিশাল-বিস্তৃত, নানাজাতীয়-তরুরাজিপূর্ণ উদ্যানের মধ্যে প্রাসাদ অবস্থিত। ইহা চিত্তা-কর্ষক নহে।

লালবাগ দেখিয়া ছত্রীবাগ দেখিতে গমন করিলাম। এই ছত্রীবাগ দর্শনযোগ্য স্থান। ইহা হোলকার-রাজবংশের পরলোকগত মহারাজগণ ও মহারাণীবৃন্দের স্মৃতিমন্দিরমালায় পরিপূর্ণ। এক একটি মন্দিরের প্রাচীরসংলগ্ন বেদিকায় এক এক মহারাজ এবং তদীয় মহারাণীদিগের প্রতিমূর্ত্তি অবস্থিত। মধ্যস্থলে শিবলিঙ্গ বিরাজিত। যে মন্দিরে প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী অহল্যাবাঈ ও তদীয় পতি খাণ্ডেরাও হোলকারের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত, সেই মন্দিরে আমি বহুক্ষণ উপবিষ্ট রহিলাম। স্বর্গীয়া মহারাণীর পবিত্রতামাখা মুখমণ্ডল

দেখিয়া আমার নেত্র অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। আমি বার বার ভক্তিভরে তাঁহার চরণতলে প্রণত হইয়া প্রণাম করিতে লাগিলাম। কি সুন্দর মহিম-ব্যঞ্জক মূর্ত্তি! আমার মনে হইল, এই মূর্ত্তিটি দেখিয়াই আমার ইন্দোর-ভ্রমণ সার্থক হইল! আর কিছু না দেখিলেও আমার মনে কোনও ক্ষোভ থাকিত না। বাস্তবিক, অহল্যাবাঈএর ন্যায় মহিয়সী মহিলা শুধু ভারতবর্ষে কেন, সমগ্র পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কি না সন্দেহ। ভারতবর্ষে এমন কোনও প্রসিদ্ধ নগর বা তীর্থ নাই, যেখানে অহল্যাবাঈএর কোনও না কোনও কীর্ত্তি নাই। হিমালয় হইতে কুমারিকা, সোমনাথ হইতে পুরুষোত্তম পর্য্যন্ত ভারতে এমন স্থান নাই, যেখানে অহল্যানির্ম্মিত কোনও মন্দির, মঠ, ছত্র, ঘাট, কুঞ্জ, ধর্ম্মশালা নাই।

পূর্ব্বে নর্ম্মদাতীরে নিমারের মহেশ্বরনগরে মল্‌হররাও হোলকারের প্রাচীন রাজধানী ছিল। অহল্যাবাঈ বর্ত্তমান ইন্দোরে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। পূর্ব্বে ইহার নাম ছিল 'ইন্দ্রপুর'। সেই ইন্দ্রপুর গ্রাম ইন্দোর রাজধানীরূপে পরিণত হইয়াছে।

আমি অহল্যার উদ্দেশে নিম্নলিখিত কবিতাটি মনে মনে আবৃত্তি করিয়া ছত্রীবাগ পরিত্যাগ করিলাম।—

হে দেবি, জনম তব জনমের সার,
রয়েছে পবিত্র স্মৃতি উজলি' ভুবন;
মর্ত্ত্যরাজ্যে নারীজন্মে কীর্ত্তি এত কার?
কি সাধনা-পূর্ণ ওই অপূর্ব্ব জীবন!

ইহার অল্প দূরে আরও একটি ছত্রীবাগ আছে। সেখানে ঘাট-সংবলিত একটি সুন্দর কুণ্ড আছে। একটি ছত্রীর তোরণ-দ্বার অতি মনোহর।

তৎপরে ইন্দোর ছাউনি, বিটিশ টাউন, দোকান-পসার, গলিপথ, গৃহশ্রেণী, হাটবাজার দেখিতে দেখিতে মধ্যাহ্নে প্রত্যাগত হইয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিলাম। এই দিনেই বেলা দুইটার ট্রেণে ইন্দোর পরিত্যাগ করিয়া ওঙ্কার-দর্শনের অভিপ্রায়ে মর্ত্তকাভিমুখে যাত্রা করিলাম।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম।

নিমন্ত্রণ।

পৌরুষের পুণ্যতীর্থে, ত্যাগের শ্মশানে,
মৃত্যুর মহিমদীপ্ত কর্ম্মক্ষেত্র মাঝে,—
লক্ষ অসি-রসনায় নিত্য যথা বাজে
রুদ্রের গরিম-গীতি মহা-বলিদানে!

অজস্র হৃদয়-রক্ত—বন্দন-চন্দন
দেশভক্তি বেদীমূলে ঢালে যথা বীর,
অগ্নিযন্ত্রে অগ্নিমন্ত্রে, অর্দ্ধ-পৃথিবীর
ঐশ্বর্য্য আহুতি দিয়া, রাজ-সিংহগণ

যেখানে মাগিছে নিত্য চণ্ডীর প্রসাদ,—
মরণ অমৃত যথা, সর্ব্বস্ব পণ—
সেই তীর্থে তোমাদের আজি নিমন্ত্রণ!
শুন শুন মেঘমন্দ্রে তীব্র তূর্য্যনাদ!

অমৃতের বংশধর, শক্তির সন্তান;
উপনিষদের দিব্য সুধায় পালিত,
নিষ্কাম কর্ম্মের মন্ত্রে দীক্ষিত—মিলিত,
শুন শুন বরদার উদাত্ত-আহ্বান!

জাগ বাঙ্গালার আশা, দেশের দুলাল,
রক্ত অরুণিম-দীপ্ত যুগান্ত-প্রভাতে,
জাগ বজ্রবহ্নি-তেজে; বীরেন্দ্র-সভাতে
ইঙ্গিতে মঙ্গল-পথ দেখাইছে কাল।

অগ্নিহোত্র-বহ্নিতপ্ত মার ব্রত-দাস,
সেবা-ধর্ম্ম আচরিয়া মৃত্যুর ছায়ায়,
ত্যাগপূত পদ্ম-হস্তে পূজিয়াছ মায়,
অমৃত দিয়াছ মৃতে, নিরাশে আশ্বাস।

মার আশীর্ব্বাদে ভরা নির্ম্মাল্য সুন্দর
না শুকাতে যশোদীপ্ত পুণ্যপূত শিরে,
আবার পড়েছে ডাক,—সিদ্ধ সেবাবীরে
ডাকিছেন রণচণ্ডী প্রসন্ন-অন্তর।

রণরক্তে বীরত্বের কর অভিষেক,
মুছে ফেল হৃদিরক্তে ললাট-লাঞ্ছনা,
দেখাও সে লুপ্ত শক্তি, গুপ্ত বীরপণা—
সুপ্ত সিংহ ন'হে কভু কূপগত ভেক !

রণ-রত্নাকর হ'তে আন কুড়াইয়া—
রুধিরাক্ত—দিব্য দীপ্ত পৌরুষ-মাণিক ;
দেশের দশের গর্ব্বে পূর্ণ হো'ক্ দিক্,
মিথ্যা অপবাদ-জ্বালা—যাক্ জুড়াইয়া।

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

'ভারতী'র ওকালতী।

জ্যৈষ্ঠের 'সাহিত্যে' প্রকাশিত 'ঋষি রবীন্দ্রনাথ' নামক প্রবন্ধের এক প্রতিবাদ ভাদ্রের 'ভারতী'তে বাহির হইয়াছে। এই প্রতিবাদের প্রধান লক্ষ্য, যুক্তি নহে—ব্যক্তি। প্রতিবাদ-লেখক, রবীন্দ্রনাথের ঋষিত্ব-সমর্থনের জন্য এই ক্ষুদ্র সমালোচকের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করিয়াই সন্তুষ্ট হন নাই—রবীন্দ্রনাথের সকল সমালোচক এবং (আপনাদের সম্প্রদায় ছাড়া) সমস্ত বঙ্গ-দেশবাসীকেই সাধারণতঃ আক্রমণ করিয়াছেন। 'সাহিত্য'-সম্পাদক মহাশয়ের প্রতিও ভ্রূকুটী করিয়াছেন। 'ভারতী'র এ ওকালতীর তর্কের ধারাটা এইরূপ—

১। 'ঋষি রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধের লেখক ('তাঁহার নাম করিয়া কোন লাভ নাই') 'বঙ্গ-সাহিত্যে অজ্ঞাতকুলশীল'। অতএব তাঁহার কোন কথা গ্রহণযোগ্য নহে। রবীন্দ্রনাথ 'ঋষি'-বলিয়া অভিহিত হওয়াতে তাঁহার 'দ্বিতীয় রিপু জাগিয়া উঠিয়াছে' সেই জন্য 'তিনি রবীন্দ্র-নাথকে মনের সাধে যা-ইচ্ছা-তাই গালি দিয়া হালফ্যাসানের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন' মাত্র। অতএব রবীন্দ্রনাথের ঋষিত্ব অক্ষুন্ন !

২। 'ঋষি সত্যদর্শী', এই সত্যদর্শনের পরিচয় যাঁহার মধ্যে পাওয়া যাইবে তিনিই ঋষি ; তিনি কবিই হোন্, বৈজ্ঞানিকই হোন্ বা আর কিছুই হোন্। আমাদের সাধারণের একটা ধারণা ঋষি বুঝি আমাদের মত হাত-পা-ওয়ালা মানুষ নন, তাঁহারা শুধু (!) কল্পনার জীব, সেই জন্য কোন চাক্ষুষ ব্যক্তিকে ঋষি নাম দিলে তাঁহারা চমকাইয়া উঠেন। এ দিকে কিন্তু উপনিষদাদিতে সকল ঋষির আরাধ্য ব্রহ্মকে কবি বলা হইয়াছে। সুতরাং ঋষিত্ব কবিত্বের চেয়ে বড় বলিয়া মনে করা যায় না। সে ক্ষেত্রে কবিকে ঋষি বলিলে মহাভারত অশুদ্ধ হইবে না।.........আমরা এখানে আচার্য্য শিবনাথের ('ঋষিত্ব ও কবিত্ব' প্রবন্ধ হইতে) দু একটি সিদ্ধান্ত তুলিয়া দিলাম—"সত্যের সাক্ষাৎকারটা বড় জিনিস। ইহাকেই প্রকৃতপক্ষে জ্ঞান বলা যায়। মাধ্যা-কর্ষণের নিয়ম চিরদিনই ছিল, আজও রহিয়াছে, আর কেহ কখনও লক্ষ্য করে নাই, লক্ষ্য করিয়াছিলেন নিউটন, এজন্য তিনি একজন ঋষি। সাক্ষাৎদর্শন বিষয়ে ঋষি ও কবি—দুই সমান"—কাগজ কালি ও সময়ের অপচয় না করিয়া প্রবন্ধলেখক যদি (আচার্য্যের) এই

প্রবন্ধটি একবার পড়িয়া দেখিতেন, তবে তাঁহারও চোখ ফুটিত এবং 'সাহিত্যে'রও কয়েকখানি পাতা ছাঁকা রাবিশে ভরিয়া উঠিত না।'

৩। 'সাহিত্যে'র লেখক রবীন্দ্রনাথের কাব্য আলোচনা করিয়া তাঁহার "অ-ঋষিত্ব" প্রতিপন্ন করিবার জন্য শুধু (!) প্রেমের কবিতা তুলিয়াছেন, কিন্তু "নৈবেদ্য" ; "খেয়া" "গীতাঞ্জলি", "গীতিমাল্য" প্রভৃতির দিকে ভুলিয়াও ফিরিয়া চান নাই। কারণ সেটা ভয়ের দিক—সে দিকে ফিরিয়া চাহিলে লেখকের নিজের অবস্থা কাহিল হইয়া উঠিতে পারে। সেই জন্য বলিতে হয়, এই সব সমালোচকের উদ্দেশ্য আলোচনা করা নয়—শুধু (!) গালপাড়া। যাঁহাদের শক্তির অভাব গালাগালিই তাঁহাদের সম্বল। সমালোচন-বিজ্ঞানের প্রথমভাগও যদি সাহিত্যের এই ভুঁইফোড় লেখকের পড়া থাকিত, তবে তিনি রবীন্দ্রনাথকে লইয়া আনাড়ির মতন এমন এক-বগ্গা আলোচনা করিতে পারিতেন না।'

৪। 'এই স্বয়ং হাস্যাস্পদ লেখক আবার ঠাট্টার ফুল ফুটাইতেও জানেন! লেখকের ঘটে যদি "সিকিছটাক বুদ্ধিও" থাকিত, তবে বুঝিতে পারিতেন, এখানে যার তার কথা হইতেছে না। কথা হইতেছে প্রতিভার অবতার রবীন্দ্রনাথের। "রামশ্যামে"র লেখা লোকের ভাল না লাগিতে পারে, কিন্তু কালিদাস, ভবভূতি, মাইকেল, বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতিকে যাহারা উড়াইয়া দিতে চায়, তাহাদের বিরুদ্ধে সব চেয়ে ভদ্র বিশেষণ যদি কিছু থাকে তবে তাহা "অরসিক"।'

৫। পৃথিবী জুড়িয়া আজ যাঁহার নামে জয়ধ্বনি উঠিয়াছে যখন দেখি আপনার দেশবাসী চারি দিক হইতে তাঁহাকেই অপদস্থ করিবার ফিকিরে আছে, তখন সপেনহয়রের ভাষায় বলিতে হয়, বাঙ্গালাদেশের "Public has no sense for exellence." আর সেই জন্যই তাহারা (!) ভালো কাব্য বুঝিতে না পারিলেও, আপনার বুদ্ধিকে দোষ না দিয়া, দোষী করে কবিকেই!'

উপরি-উদ্ধৃত প্রতিবাদ-পঙ্ককে রবীন্দ্রনাথের ঋষিত্বের সমর্থন কেমন সুন্দরভাবে ও কি পরিমাণে হইয়াছে, তাহা সুধীগণ সহজেই বুঝিতে পারিবেন। এই প্রতিবাদে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিবার কিছু নাই। কয়েকটি আনুষঙ্গিক কথা সংক্ষেপে বলা যাইতেছে।

প্রথমতঃ—'লেখক-বঙ্গসাহিত্যে অজ্ঞাতকুলশীল বলিয়া তাঁহার নাম করিয়া কোন লাভ নাই'—এই জ্ঞানগর্ভ বাক্যটি 'ভারতী'র 'মাসকাবারী'-লেখকের হিসাবী কথা বটে। ইহা কোনও সাময়িক পত্রের সম্পাদকের উপযুক্ত কথা নহে। সম্পাদক হইতে হইলে মহৎ ও ক্ষুদ্র, পুরাতন ও নূতন, সর্ব্বপ্রকার লেখকেরই সংবাদ রাখিতে হয়; তাঁহাদের মতের আলোচনা করিতে হয়। নানাপ্রকার ক্ষতি স্বীকার করিয়াও নিকৃষ্ট বা নূতন লেখকের লেখা পড়িতে হয়, সংশোধন করিতে হয়, মুদ্রিত করিতে হয়। ফলতঃ নবীন লেখককে উৎসাহদান ও তদ্দ্বারা লেখক-সম্প্রদায়ের গঠন, সম্পাদকের একটি বিশেষ কর্ত্তব্য। ভারতীর বর্ত্তমান 'কোঁড়ক'-সম্পাদকের * যদি ইহা জানা থাকিত, পত্র-সম্পাদন-বিজ্ঞানের প্রথমভাগও যদি এই ভুঁই-ফোঁড় সম্পাদকের পড়া থাকিত; তবে তিনি 'আনাড়ির মতন এমন' কথা কহিতেন না।

* 'শ্যামাসুন্দরীর পত্র'—নায়ক, ১৯শে ভাদ্র, ১৩২৩, দ্রষ্টব্য।

আর, 'দ্বিতীয় রিপু'র উত্তেজনার কথা তিনি যাহা বলিয়াছেন, সে সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, যে কবির কাব্য ষড়্‌রিপুর প্রথম রিপুর মোহে পরিপূর্ণ, তাঁহার কাব্যের শ্রেষ্ঠতাবাদের সমালোচনা-প্রসঙ্গে সমালোচকের 'দ্বিতীয় রিপু'র উত্তেজনা কতকটা স্বাভাবিক—কতকটা আবশ্যকও বটে।

দ্বিতীয়তঃ—'ঋষি সত্যদর্শী' বলিয়া 'সত্যদর্শনের পরিচয় যাঁহার মধ্যে পাওয়া যাইবে তিনিই ঋষি'—প্রতিবাদকারের এই বাক্যটি স্পষ্টতঃ প্রমাদদুষ্ট। প্রত্যেক ঋষি কবি বলিয়া, প্রত্যেক কবি ঋষি নয়। সেই জন্য রবীন্দ্রনাথের মত 'কবিকে ঋষি বলিলে মহাভারত অশুদ্ধ হইবে' বৈ কি। লেখক আবার বলিয়াছেন, "ঋষিত্ব কবিত্বের চেয়ে বড় বলিয়া মনে করা যায় না'; কারণ, শাস্ত্রে 'সকল ঋষির আরাধ্য ব্রহ্মকে কবি বলা হইয়াছে।' প্রতিবাদকের এই অপূর্ব্ব 'সত্যদর্শনে'র জন্য তিনিও এক জন ঋষি বটেন! ঋষিত্ব ও কবিত্বের সাদৃশ্য দেখাইবার জন্য শাস্ত্রী শিবনাথের প্রবন্ধাংশ উদ্ধৃত করাতে রবীন্দ্রের ঋষিত্ব প্রতিপন্ন ত হয় নাই, বরং শাস্ত্রী মহাশয়েরই বিপন্ন হইবার কারণ ঘটিয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয় নিউটনকে ঋষি করিলেন—কিন্তু সেই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে ঋষি বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন না কেন? ইহা তাঁহার বিষম ভ্রম হইয়াছে। তবে বুঝি সে সময় রবীন্দ্রে ঋষিত্বের আবির্ভাব হয় নাই। সে যাহা হউক, নিউটনকে ঋষি করিতে গিয়া পণ্ডিত শিবনাথ ঘোর প্রমাদে পতিত হইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—'মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম চিরদিনই ছিল, আজও রহিয়াছে, আর কেহ কখনও লক্ষ্য করে নাই, লক্ষ্য করিয়াছিলেন নিউটন, এ জন্য তিনি এক জন ঋষি।" হায় শাস্ত্রী! তুমি এমন কথা কেমন করিয়া বলিলে! তুমি কি প্রশ্নোপনিষদের কৌশল্য-পিপ্পলাদ-সংবাদ—যাহাতে 'পৃথিবী-দেবতা'র আকর্ষণশক্তি কথিত হইয়াছে—তাহা ভুলিয়া গিয়াছ? তুমি কি ভাস্করাচার্য্যের "আকৃষ্টশক্তিশ্চ মহী, তয়া যৎ খস্থং গুরু স্বাভিমুখং" ইত্যাদি মাধ্যাকর্ষণ সম্বন্ধে সুস্পষ্টোক্তিও ভুলিয়া গিয়াছ? নিউটনের প্রায় আট শত বৎসর পূর্ব্বে ভাস্করার্য্য যে সত্যের আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, তাহা তুমি শাস্ত্রী হইয়া ভুলিলে কি প্রকারে? এ স্থলে আর একটি কথা লক্ষ্য করিবার আছে। শাস্ত্রী শিবনাথ প্রমুখ পাশ্চাত্যালোকদীপ্ত আধুনিক কয়েক জন পণ্ডিতের মতে সত্যের আবিষ্কর্ত্তা হইলেই ঋষি আখ্যা পায়। কিন্তু আমাদের দেশীয় শাস্ত্রসঙ্গত প্রাচীন মতানুসারে ঋষিত্বের লক্ষণ স্বতন্ত্র বলিয়া আর্য্যভট্ট, ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতির মত পদার্থবিৎ পণ্ডিতও কখনও ঋষি নামে বাচ্য হয়েন নাই। যখন ভাস্করাচার্য্য ঋষি নহেন, কালিদাস ঋষি নহেন, যখন শঙ্করাচার্য্য ঋষি নহেন, রঘুনাথ শিরোমণি ঋষি নহেন—তখন 'ভারতী'র ওকালতীতে বা রমাপ্রসাদ চন্দের স্তুতিতে রবীন্দ্রনাথ ঋষি হইবেন না।

তৃতীয়তঃ,—রবীন্দ্রের 'নৈবেদ্য' প্রভৃতি শেষ যুগের গ্রন্থ হইতে কোনও কবিতা 'ঋষি রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে যে উদ্ধৃত হয় নাই, তাহার কারণ এই যে, তাঁহার শেষ যুগের এই রচনাগুলি তাঁহার মত শ্রেষ্ঠ কবির নিতান্ত অনুপযুক্ত। এই সকল রচনা দ্বারা তাঁহার কবিত্ব-মহিমার হ্রাস হইয়াছে, 'ঋষিত্ব'-বিকাশ ত দূরের কথা। রবীন্দ্রনাথ বঙ্গসাহিত্যের 'রবীন্দ্রনাথ' হইয়াছেন—'নৈবেদ্য' সাজাইয়া নয়—'খেয়া' জমাইয়া নয়—'গীতাঞ্জলি' দিয়া নয়—'কণিকাকঙ্কণিকা'র সৃষ্টি

করিয়াও নয়! রবীন্দ্রনাথ বঙ্গসাহিত্যের রবীন্দ্রনাথ 'মানসী' গড়িয়া—'সোনার তরী' ভাসাইয়া—'চিত্রা' চিত্রিয়া—'চৈতালি' তুলিয়া। পক্ষান্তরে, ঋষি হইতে হইলে তাহার পূর্ব্বসূচনা—আত্মগঠন-ক্ষেত্র থাকা চাই। আযৌবন নারীপ্রেমকণ্ঠ রবীন্দ্রনাথের সে আত্মক্ষেত্রের ঐকান্তিক অভাব দৃষ্ট হয়। 'The child is father of the man'—মহাকবির এই মহাবাক্য নিরর্থক নহে।

চতুর্থতঃ—'সিকি ছটাকে'র ও কম বুদ্ধি ঈশ্বরানুগ্রহে পাইয়া এবং এ ক্ষেত্রে প্রতিবাদকারের বুদ্ধির দোষে সেটুকুরও অধিকারী থাকিতে পাইয়া, এই ক্ষুদ্র সমালোচক বুঝিয়াছে যে, রবীন্দ্রনাথ ঋষি অথবা 'প্রতিভার অবতার' নহেন! প্রতিবাদকারকে তাঁহার 'পাঁচ সিকা' বুদ্ধি শিকায় তুলিয়া রাখিতে পরামর্শ দিতেছি। কারণ, বাস্তবক্ষেত্রে এই অতিবুদ্ধির চালনায় তাঁহার পদে পদে প্রমাদ ঘটিবে। সে যাহা হউক, শেষে তিনি বুদ্ধিমানের মত একটা কথা বলিয়াছেন—'কালিদাস, ভবভূতি, মাইকেল, বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতিকে যাহারা উড়াইয়া দিতে চায় তাহাদের বিরুদ্ধে সব চেয়ে ভদ্র বিশেষণ যদি কিছু থাকে, তবে তাহা "অরসিক"।' ঠিক কথা, প্রকৃত রসিকের মত কথা বটে। তবে এখানে দু' তিনটা কথা উঠিতেছে। একটা কথা এই, সুরসিক লেখক কালিদাস ভবভূতি বঙ্কিমকে উড়াইবার কথা তুলিলেন কেন? ইঁহাদের কেহই ত ঋষি নহেন! রবীন্দ্রের ঋষিত্ব যাঁহারা বঙ্গের সাহিত্যাকাশে উড়াইয়াছেন, তাঁহাদের সেই ভ্রমবিম্বই সংসমালোচনার মার্জ্জনমারুতে উড়িয়া গিয়া আকাশে বিলীন হইবে। আর এক কথা—রসিক প্রতিবাদকার নিজে কালিদাসাদি রবীন্দ্রান্ত পর্য্যায় হইতে কবি হেম-চন্দ্র ও নবীনচন্দ্রকে উড়াইয়া দিয়াছেন কেন? তাঁহার 'প্রভৃতি'র অবরোধের মধ্যে কি এই দুই শ্রেষ্ঠকবির অজ্ঞাতবাস নির্দ্দেশ করিয়াছেন? তৃতীয় কথাটা এই, প্রতিভাবান্ রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং যে তাঁহার 'আলোচনা' কুলার বাতাসে মাইকেল মধুসূদনকে 'উড়াইয়া' দিয়াছিলেন! রবীন্দ্রনাথ কি ইহাতে 'অরসিক'-চূড়ামণি হন নাই? শেষে, সুধীসমাজে মান থাকে না দেখিয়া কোলের দিকে উল্টা বাতাস টানিয়া মধুসূদনকে আবার যথাস্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন। এ প্রকার মহতী ভ্রান্তি কি অভ্রান্ত 'ঋষি'র হইতে পারে? উত্তরে কথা এই যে, এই 'আলোচনা'র সময়ে রবীন্দ্র ঋষি হইয়া উঠেন নাই—শুধু কবি ছিলেন, তাই এতটা 'অরসিক' হইয়াছিলেন। রসিক রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের গায়েও দূর হইতে ফুঁ দিয়া দেখিয়াছিলেন; কিন্তু সে বিরাট্ অটল পুরুষের কিছু করিতে পারেন নাই—তাঁহার তীব্র কটাক্ষপাতে ভয়ে সরিয়া আসিয়াছিলেন। সম্প্রতি 'ঋষি' হইয়া রবীন্দ্রনাথ মহর্ষি বাল্মীকি, ব্যাস ও রাজর্ষি জনকাদিকে 'উড়াইয়া' দিয়া 'রসিকতা'র পরিচয় দিতেছেন।

পঞ্চমতঃ—প্রতিবাদকার সর্ব্বশেষে বলিতেছেন—'পৃথিবী জুড়িয়া আজ যাঁহার নামে জয়ধ্বনি উঠিয়াছে' তাঁহার 'আপনার দেশবাসী চারি দিক হইতে তাঁহাকেই অপদস্থ করিবার ফিকিরে আছে'; এবং সেই জন্যই 'বাঙ্গালা দেশের সাধারণ লোকের গুণগ্রহণের শক্তি নাই'—নিজেদের বুদ্ধির দোষে 'ভালো কাব্য বুঝিতে না পারিয়া দোষী করে কবিকেই!'

বাঙ্গালী কবির বাঙ্গালা কাব্য যদি বাঙ্গালা দেশের অধিবাসিগণ বুঝিতে না পরিয়া থাকে, তবে তাহা ইউরোপ, আমেরিকা বা জাপানের জনসমাজের বুঝিবার সাধ্য নাই। 'নোবেল'-পুরস্কার ত আরও অনেকে পাইয়াছেন; তাঁহাদের ত 'পৃথিবী জুড়িয়া

জয়ধ্বনি হইয়াছিল'; তাঁহাদের দেশবাসী সকলে ত গুণগ্রহণে সমর্থ; কিন্তু কই, তাঁহাদের কেহ ত 'ঋষি' বা Saint হন নাই! 'নোবেল'-পুরস্কারের লাভে রবীন্দ্রনাথ সভ্যজগতে আপনার গৌরবের সহিত বঙ্গদেশ, বঙ্গভাষা ও বঙ্গজাতির যে অসাধারণ গৌরব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহার জন্য কি তাঁহার স্বদেশবাসী জয়োল্লসিত নহে! এই উপলক্ষে তাঁহার সংবর্দ্ধনার জন্য বঙ্গের সুধীসমাজ যখন তাঁহার বোলপুর নিকেতনে সমবেত হইয়াছিল, তখন রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের কোন্ অপরাধে তাঁহাদের প্রতি সেই ঘোরতর অশিষ্ট ব্যবহার করিয়াছিলেন? তাঁহার সর্ব্বসময়ের সর্ব্বরচনাই শ্রেষ্ঠ—এ কথা তাঁহার সমগ্র দেশবাসী কখনও স্বীকার করে নাই—তখনও করেন নাই—এখনও করে না—কখনও করিবে না। দেশের সুধীসমাজ রবীন্দ্রনাথের মন্ত্রশিষ্যও নহেন, স্তাবকও নহেন। সমালোচনার দ্বারা তাঁহারা রবীন্দ্রের যে যে রচনা শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিবেন, তাহাই তাঁহারা শ্রেষ্ঠ বলিতে পারেন। তাঁহার অলৌকিক শক্তি বা আর্ষ জ্ঞান তাঁহারা স্বীকার করেন না। বস্তুতঃ তাঁহার 'দেশবাসী তাঁহাকে অপদস্থ করিবার ফিকিরে' নাই—তাঁহার অতিভক্ত শিষ্য ও স্তাবকেরাই তাঁহাকে 'ঋষি-পদে বসাইয়া দিয়া সুধীসমাজে তাঁহাকে অপদস্থ করিবার' আয়োজন করিতেছে। স্তাবকের স্তুতি ও স্বসম্প্রদায়ের ওকালতীর দ্বারা রবীন্দ্রনাথ 'ঋষি' হইবেন না, এই সামান্য সত্যটুকু রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বুঝিয়া পদক্ষেপ করিলে তাঁহাকে কখনই অপদস্থ হইতে হইবে না। রবীন্দ্রনাথের স্তাবক অপেক্ষা, তাঁহার সমালোচকগণ রবীন্দ্রনাথের উৎকর্ষ ও মর্য্যাদা অধিক বোঝেন।

শ্রীযতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

প্রতিভা। শ্রাবণ।—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেনের "পাখীর বিবাহপদ্ধতি" সুরচিত নিবন্ধ; নানা তথ্যে পূর্ণ। বহুকাল পূর্ব্বে পূজ্যপাদ আচার্য্য শ্রীযুত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয় 'যৌন-নির্ব্বাচন' প্রবন্ধে এই প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছিলেন। সুরেন্দ্র বাবু দেশের পাখীর উদাহরণ দিয়া প্রবন্ধটিকে বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর নিজস্ব করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই ভাবেই স্বদেশী সাহিত্যের সৃষ্টি করিতে হয়। তিনি একবার পূর্ব্বাচার্য্যগণের সঙ্কলিত, সাধারণ পাঠকগণের জন্য কল্পিত, বৈজ্ঞানিক নিবন্ধগুলি পড়িয়া লইলে ভাল হয়। অক্ষয়কুমার দত্ত ও বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে যাহার পত্তন করিয়াছিলেন, চন্দ্রশেখরের প্রতিভা তাহার প্রসাধন করিয়াছিল। অমন প্রাঞ্জল মধুর ভাষায় বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের বিশদ বিবৃতি বাঙ্গালা ভাষায় আর নাই। আমাদের জীবনে কি আর সে অতুলনীয় রচনা-নীতির পুনরাবৃত্তি দেখিতে পাইব? বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য, চন্দ্রশেখর নিভৃতবাসী উদাসীন। অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র তাঁহার উপযুক্ত উত্তরাধিকারী। তাঁহার বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভ-সমূহের বিবৃতি-কৌশল দেখিয়া গ্রান্ট অ্যালেনকে মনে পড়ে। আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের ১৩০২ সালের 'সাহিত্যে'র বৈশাখ-সংখ্যায় প্রকাশিত 'আকাশস্পন্দন ও আকাশ-সম্ভব জগৎ' বৈজ্ঞানিক রচনা-রীতির আদর্শস্থানীয়। কবে 'ভারতী'তে শ্রীযুত প্রমথ-

'কেঁচো'র কাহিনী ছাপা হইয়াছিল। তাহার পর বত্রিশ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। ইউরোপে 'কেঁচো'র জীবনচরিত এত দিনে সম্পূর্ণ হইয়া থাকিবে; কিন্তু আমরা সেই পুরাতন 'কেঁচো'-কেও ভুলিয়া গিয়াছি! পূর্ব্বাচার্য্যগণের রচনায় মনোহারী করিয়া বলিবার যে চেষ্টা ছিল, এখনকার লেখকগণের রচনায় তাহার অত্যন্ত অভাব দেখিয়া দুঃখ হয়। নূতন লেখক-গণের মধ্যে 'অর্চ্চনা'র সম্পাদক কেশবচন্দ্র গল্পের মত মনোরম করিয়া বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ লিখিতে পারেন। জগদানন্দ রায় বৈজ্ঞানিক সাহিত্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। তাঁহার নিকট আমরা অত্যন্ত ঋণী। কিন্তু তাঁহার ভাষা ও রচনা-রীতি চিরকালই 'আড়ষ্ট' হইয়া রহিল। যাহাকে 'popular lileraturе' বলে, তাহার প্রথম ও প্রধান উপাদান, বিষয়ের বিশদ বিবৃতি; দ্বিতীয় উপাদান, ভাষার সৌষ্ঠব। এক জন নৈয়ায়িক বলিয়াছিলেন, 'অস্মাকূণাং নৈয়ায়িকেষাং অর্থনি তাৎপর্য্যং শব্দনি কো শ্চিন্তা?' আমাদের দেশে যাঁহারা দুরূহ বিষয় লিখিবার জন্য কলম ধরেন, তাঁহাদেরও 'অর্থনি তাৎপর্য্যং', তাহা আমরাও স্বীকার করি। কিন্তু তাঁহারা যদি 'শব্দনি কোশ্চিন্তা' মূলমন্ত্র করেন, তাহা হইলে 'অর্থ'—প্রতিপাদ্য ও মূল উদ্দেশ্য, দুই বেচারীই যে মাঠে মারা যায়! আশার বিষয় এই যে, সুরেন্দ্র বাবুর মত সুশিক্ষিত বিশেষবিদ্‌গণ বৈজ্ঞানিক রচনায় ব্রতী হইয়াছেন। নমুনা দেখিয়া মনে হয়, এ বিষয়ে সুরেন্দ্র বাবুর স্বাভাবিক পটুতা আছে। তিনি যদি ভাষার সৌষ্ঠবের জন্যও একটু চেষ্টা করেন, তাহা হইলে সোনায় সোহাগা হয়। শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র গুহের 'অদ্বৈতমঙ্গল পুথি ও অদ্বৈতাচার্য্যের কাল নিরূপণ' খাটিয়া লেখা। এখনও সমাপ্ত হয় নাই। শ্রীভূপালকুমার দত্তের 'পাশ্চাত্য প্রভাবে বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের উদ্ভব' নামটির গর্জ্জন যেরূপ, প্রবন্ধে সেরূপ বর্ষণ দেখিলাম না। কেবল কতকগুলি উদাহরণের সমষ্টি। তাহা দ্বারা 'ফাঁকির প্রভাবে বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যে "বারো হাত কাঁকুড়ের তের হাত বীচি"র মত নামের উদ্ভব' ভিন্ন আর কিছুই প্রতিপন্ন হয় না! শ্রীযোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত 'পুরাতন গান' সংগ্রহ করিতেছেন। রচয়িতাদের নাম নাই। চেষ্টা করিলে কি জানা যায় না? তিনটি গান আমরা গায়কের মুখে শুনিয়াছি। শেষ গানটির শেষ---

'কি নিয়ে কৈলাসে যাব;
কৈলাসনাথকে কি বলিব,
কারে মোরা মা বলিব?
জগতের মা চলে যায়!'

এখনকার কবির দলে কল্‌কে পাইবে না। ইহার তর্জ্জমা হয় নাই, হইতে পারে না। কিন্তু বাঙ্গালীর প্রাণ এই ক'টি কথাকে সজীব করিয়া রাখিয়াছে। 'জগতের মা চলে যায়' এখনকার কবির কলমে আসিবে না। এখন মা 'ভুবনমনোমোহিনী' হইয়াছেন; কিন্তু আর ঘরের ছেলের কাছে 'জগতের মা' হইতে পারিবেন না! কোন্‌টা বড়? শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের 'ভাল মন্দের জন্মকথা' সুচিন্তিত সন্দর্ভ। কিন্তু একটু অতি বিস্তৃত। অনায়াসে সংক্ষিপ্ত হইতে পারিত। মুন্সীয়ানার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। 'মানুষের বিশ্বাসে একটা দ্বৈত ঢুকিয়াছে, যার জন্মকথা আলোচনা দার্শনিকের পক্ষে দুষ্কর কর্ত্তব্য' ভট্টাচার্য্য দার্শনিকের রচনায় শোভা পায় না! লেখকের কঠিন বিষয় বুঝাইবার শক্তি আছে। রমেন্দ্রসুন্দরের পদ্ধতি মন্দ নয়; কিন্তু

সে রীতি বোধ করি তাঁহার নিজস্ব। আর আজকাল ত্রিবেদী এক কথা এক শ' বার বলিবার যে ধারার আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা অতিবিস্তৃতির উদাহরণ বলিয়াই গণ্য হইতে পারে, আদর্শ স্থানীয় নহে; বরং বর্জ্জনীয়। Brevity is the Soul of wit সকল ক্ষেত্রেই সত্য। এক বাটী দর্শনে এক কলসী জল ঢালিয়া 'পান্সে' করিয়া লাভ কি? শ্রীকালিদাস রায়ের 'ক্ষুরধাথাল' নামক প্রহেলিকায় মৌলিকতা আছে। যাহারা ভিক্ষা করিয়া উপাধি সংগ্রহ করে, আপনারাই 'বিদ্যামহার্ণব' হয়, অথবা বুকের রক্তের মত প্রিয় টাকা ঢালিয়া খেতাব আদায় করিয়া স্বর্ণগর্দ্দভ-জন্ম সার্থক করে, তাহারাও নিজের স্বাক্ষরের নীচে খেতাব লেখে না। কিন্তু কালিদাস লিখিয়া দিয়াছেন,—কবিশেখর! মৌলিকতা নয়? আর কবিতায় অন্বয় নাই, অর্থ নাই, বক্তব্য নাই। তবে 'বাঁশী-স্বরে ঘর, বার, পথ, ঘাট, মাঠ—সব পাগল' হইয়া গিয়াছে! কবির ঘর বারের—ঘাট মাঠের খবর রাখি না, তবে কবিতাটি দেখিয়া কবির সম্বন্ধে একটু সন্দেহ হয় বটে। কিন্তু গঙ্গাধর কবিরাজের দেশে কি বৈদ্য নাই? পলাশীর যুদ্ধের সময় ক্লাইবের গোলাগুলিতে ও অঞ্চলের কোলা-ব্যাঙএর বংশও কি একবারে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে? 'অন্তর্য্যামী' সমালোচনা;—'ছেলের চেয়ে ছেলের কি ভারী' বলে, তাই। ক'টাই বা ব্রহ্মসূত্র, তার ভাষ্যের সংখ্যা হয় না। আর এক একটা ভাষ্যের বহর দেখিলে ঘোড়ার-ডিম তত্ত্বভূষণ ভিন্ন মানবদেহধারী সকলকেই বোধ করি চমকাইয়া উঠিতে হয়। চতুষ্পদের মত ভাষ্যের যখন ধারাই এই, তখন আর কাহাকে কি বলিব? অগত্যা 'যাহা দাও তাহা ঘরে লয়ে যাই, রঞ্জন মন ভুলাতে!'

নারায়ণ। শ্রাবণ। শ্রীভুজঙ্গভূষণ রায় চৌধুরীর 'মহাধ্যান' মন্দ নয়। কিন্তু রাধা কি 'দাসী'র মত তাঁহার 'চরণ দুটি সেবিয়াছিলেন'? 'ধ্যানভঙ্গ' মহাধ্যানের যোড়া, কিন্তু যুড়ী মেলে নাই। প্রথমটা তালিকা, শেষটা কি, বুঝিতে পারিলাম না।

'ধ্যানভঙ্গে দেখে রাই—বঁধু-রূপ বিশ্ব-রূপ,
ঝলমল করে তাহে নদ নদী সিন্ধু কূপ।'

বিস্ময়সূচক চিহ্নটি দিবার দরকার ছিল না, আমরা অমনই বিস্মিত হইতাম! বিশ্বরূপ এত জলময়, তাহা কে জানিত? আর, ইহাতে মৌলিকতা নাই, সত্যের অনুরোধে তাহাও বলিতে হইতেছে। এ কবিত্বটুকু বিদ্যাসাগরের। তিনি তাঁহার 'বোধোদয়' নামক মহাকাব্যে 'জল—সমুদ্র—নদী' নামক জলময় সর্গে এই কবিত্ব ঢালিয়া দিয়া গিয়াছেন! তবে 'কূপ'টি কবির নিজস্ব বটে। বিষ্ণুপুরাণে আছে,—

'আপো নার ইতি প্রোক্তাঃ আপো বৈ নরসূনবঃ।
অয়নং তস্য তাঃ পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ।'

অতএব, এই জলময়ী কবিতা 'নারায়ণে'র 'যোগ্যং যোগেন যোজয়েৎ' হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। শ্রীসারদাচরণ মিত্র সাত পৃষ্ঠায় 'বঙ্গদেশীয় মহাকাব্য' সম্বন্ধে কিছু বলিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু ছয় পৃষ্ঠায় রোমের ভার্জিল, ইতালীর দান্তে, ইংলণ্ডের মিল্টন, এমন কি, পর্ত্তুগালের ডিকামিরণের নামাবলী ছাপিয়াছেন, এবং হোমার, বায়রণ প্রভৃতির রচনাও তুলিয়াছেন। ইহাও লিখিয়াছেন যে, 'গ্রীস দেশের পুরাতন ভাষা, হোমারের ভাষা, আমাদের প্রায়ই Greek (গ্রীক) অর্থাৎ দুর্ব্বোধ্য। তজ্জন্য আমরা ইংরাজি

অনুবাদ দিতে বাধ্য হইলাম।' সাধু। কিন্তু 'প্রশ্ন ইহাই এখন'—এখনকার গ্রীক কি সারদা বাবুর ও দাস মহাশয়ের, এবং আমাদের সকলের প্রায়ই বাঙ্গালা, অর্থাৎ সুবোধ্য? শেষ পৃষ্ঠায় বাঙ্গালা কাব্যের কথা পড়িয়া সারদাবাবু আইন বাঁচাইয়াছেন! তাও বোধ হয় C. R. Dasএর কাগজ বলিয়া! তাহা না হইলে সম্ভবতঃ 'গোবিন্দের মহাকাব্য ইন্তার ও ইজড়্ভোগ' এবং ফন্দো্নীতেই শেষ করিতেন! কিন্তু দুঃখ এই যে, এত বড় আইনের হুনুরী হইয়াও তিনি তামাদী মানিলেন না! শুনিয়াছি, ফৌজদারী আইনেও দিন কতক পরে আসামীর নামে নালিশ চলে না। কিন্তু সারদা বাবু এতকাল পরে মাইকেলের নামে নালিশ জুড়িয়া দিয়াছেন! 'তাঁহার কাব্যের জন্য বঙ্গভাষা গৌরবান্বিত; কিন্তু প্রাচ্য রীতির বিপর্য্যয় কেন?' সারদা বাবু আগে মাইকেলকে সমন ধরান, মাইকেল জবাব দিন, আমরা তার পর একটা উকীল দিব। সারদা বাবু বলিয়াছেন,—'লর্ড বায়রণ যাহা লিখিয়াছেন, তাহার ভাল মন্দর বিচার আলঙ্কারিকেরা করিবেন।' তবে হাইকোর্টের এক জন জজ মাইকেলের রীতি-বিপর্য্যয়ের বিচার করিবেন কেন? 'তিনি মহাকবি ছিলেন এবং তাহার [চিত্তরঞ্জন ভায়া এখনও চন্দ্রবিন্দুর সঙ্গে ভাব করিতে পারিলেন না, না সারদা বাবুই প্রাচ্য রীতির মোহে মজিয়া চন্দ্রবিন্দু বেচারাকে পুলি-পোলাও চালান দিলেন?] লেখনী হইতে অমৃতময় কাব্যরস প্রচুর-পরিমাণে নিঃসৃত হইয়াছিল।' পূয, রক্ত নিঃসৃত হয় বটে. কিন্তু কাব্যরসও কি দুই ব্যবহারা-জীবের পাল্লায় পড়িয়া 'নিঃসৃত' হইতে লাগিল? গোরের ভিতর মাইকেল নড়িয়া উঠিয়াছেন, তত্র সন্দেহো নাস্তি। ফুদে গোরটি যদি ভাঙ্গে, চিত্তরঞ্জন বাবু মেরামত করিয়া না দিলে আমরা ছাড়িব না। শ্রীনলিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের 'অনন্তরূপে' অনেক গুলি সুমধুর শব্দ ও বাক্য আছে; কিন্তু কাহারও সহিত কাহারও মিল নাই।—তবে কবি প্রথমেই বলিয়া দিয়াছেন, 'অম্বরে তব ধ্যান।' একে ধ্যান, তাহাতে আবার অম্বরে; সুতরাং সমস্তটাই ফাঁকা। শ্রীননীগোপাল মজুমদার 'চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে' নামক একখানি চমৎকার প্রহসনের সূত্রপাত করিয়াছেন! মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ বোধ হয় রাজেন্দ্রলালের কেরাণী পণ্ডিত ছিলেন। তখন তাঁহার বয়স ও বিদ্যা এত পাকে নাই। অন্ততঃ 'ভারত-মহিলা'র শান্তাকে লোমপাদের বনিতা বানাইবার মত বিদ্যা হয় নাই। তবু নবীন শাস্ত্রী সেই রাশভারী বুড়োর গুরুমশায় হইয়া উঠিয়াছিলেন! আবার যে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ মহাশয়ের স্কুলপাঠ্য ভারত-ইতিহাসের ইংরেজী আজও অমর হইয়া আছে, তুলসী দিয়া যাহা শুদ্ধ করিয়াও আবার যাহাকে 'ইংলিশম্যান' আফিসে সংস্কারের জন্য পাঠাইতে হইয়াছিল, সেই ইংরেজীর লেখক, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত হর-প্রসাদ শাস্ত্রী রাজেন্দ্রলালকে ইংরেজী লেখার জন্য সার্টিফিকেট দিয়াছেন—'ইংরেজী রচনায় তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল।' বটে! ইহার পর আমরা আর কখনও রাজেনের ইঞ্জিরী বিদ্যায় সন্দেহ করিব না! এমন 'গগনস্পর্দ্ধিনী স্পর্দ্ধা' আর কখনও দেখিয়াছেন কি? 'চল্লিশ বৎসরে'র শেষে শাস্ত্রীর উদ্দেশ্য—'এক ঢিলে দুই পাখী মারা' সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী 'পেট্রিয়টে'র চিনির বলদ ছিলেন, 'রাজেন্দ্র-লাল উহার প্রকৃত সম্পাদক ছিলেন।' এটা নির্জ্জলা মিথ্যা। আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, রাজকুমার বাবু দিন রাত্রি খাটিতেন, তিনিই সম্পাদকতা করিতেন। কৃষ্ণদাসের সম্পাদকতার

কালেও রাজেন্দ্রলাল পেট্রিয়টে নিয়মিতভাবে লিখিতেন। শেষ ও আসল কথাটি এই যে, 'রাজেন্দ্রলাল মিত্রের প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক অধিকাংশ মতামতই এখন নূতন নূতন গবেষণার ফলে অসার বলিয়া প্রমাণ হইয়া গিয়াছে।' সেই ভয়েই বোধ হয় এখনকার শাস্ত্রী প্রভৃতিরা কেবল প্রমাণ সঞ্চয় করিতেছেন, 'শতং বদ, মা লিখ' সার করিয়াছেন, এবং প্রমাণগুলি লোহার সিন্দুকে তুলিয়া রাখিতেছেন! এত বড় মহামহোপাধ্যায়ের প্রবন্ধে এ কথাটা নাই যে, রাজেন্দ্রলালের 'অধিকাংশ মতামত' না থাকিলে, 'এখনকার নূতন নূতন গবেষণা' সহজ ও সম্ভব হইত না; রাজেন্দ্রলাল পায়ের ধূলা না দিলে এখনকার অনেক পণ্ডিতকে এরণ্ড-ফল ভর্জ্জন করিতে হইত! 'প্রমাণ' হইয়া গিয়াছে? সপ্রমাণও নয়, প্রমাণিতও নয়? সাহিত্য-পরিষদের বার্ষিক সভায় কেশব গুপ্তের বাঙ্গালার ভুল ধরিয়া চাপল্যের পরিচয় দিতে কুণ্ঠা হয় নাই, তাই একটা দেখাইয়া দিলাম। শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর 'মধুস্মৃতি ও সুভদ্রাহরণে' অলৌকিক ব্যাপারের বর্ণনা আছে। সাহিত্যের একটা Curiocity বটে। বিপিন বাবুর 'তদুচিত গৌরচন্দ্র' চলিতেছে। শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'বৌদ্ধ-ধর্ম্মে'র চতুর্দ্দশ কিস্তিতে হোমিওপ্যাথিক মাত্রায় জাতকের কথা আছে। 'নারায়ণে' কবিতার ছড়াছড়ি। 'কাব্যি' নয় বটে, তবে অধিকাংশই ছড়া। কথায় বলে, 'ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়।' চিত্তরঞ্জন ভাগ্যবান্, তাঁহার সঙ্কলিত ছড়ার বোঝা ভগবান নারায়ণকে অগত্যা বহিতে হইতেছে। শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্তের 'জীবন্মুক্ত' পঞ্চাশ পৃষ্ঠায় শেষ হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রাণী'র 'হাড়-গোড়-ভাঙ্গা' অমিত্রাক্ষরের ভ্যাংচানী আছে, নাটক আছে—ইত্যাদি। নারায়ণের বিভূতি থাকিলে আমরা পাঁচ সাত ফর্ম্মা পরিচয় দিতে পারিতাম। কিন্তু আমরা মাস্তোদন নহি, আধ সের কাগজের দাম ছয় আনা,—অথচ এখনও আট আনায় এক সের বাগবাজারের রসগোল্লা পাওয়া যায়—জীবনও শেষ হইয়া আসিয়াছে, যেটুকু অবশিষ্ট আছে, তাহাও সত্যেন্দ্রকৃষ্ণকে সঁপিয়া দেওয়া যায় না,—ইত্যাদি কৈফিয়তে আমরা আপাততঃ পাশ কাটাইতে রাখিয়া অবশেষে 'মধুরেণ সমাপয়েৎ'—'কিশোর—কিশোরী'। নমুনা,—

> 'কল্পনা-গগনালোকে উড়ে উড়ে ভাসিতাম!
> সত্য বলে ধরিতাম সেই কল্পনারে—'

কি ভয়ানক! কবিতা লিখিবার জন্য কত কাণ্ডই করিতে হয়! এই অধ্যবসায়টা অন্য দিকে প্রযুক্ত হইলে সোনা ফলিত। আবার—

> 'স্বপন মন্থন করা ফুলে ফুলে সাজাতাম।'

ঘোল মন্থন হইয়া থাকে; সমুদ্র মন্থন হইয়া গিয়াছে। স্বপন মন্থনও হইয়া গেল। ননীর বদলে উঠিল ফুল। কবিতায় অরুচি হইয়া গেল। ভগবান্ দ্বাপরে একটি ভৃগুপদচিহ্ন বক্ষে ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রিয়তমার বরপুত্র চিত্তরঞ্জনের খাতিরে বহু বহু কবির ক্ষুর-চিহ্ন বক্ষে ধরিয়াছেন! নারায়ণ! কালীঘাটে কেন এলে ঠাকুর? ওরা যতই বৈষ্ণব হউক, বৈষ্ণবী মমতা কোথায় পাইবে! তাহা থাকিলে কি তোমার শ্রীঅঙ্গে এমন দাগা দিতে পারে? শ্রাদ্ধের ষাঁড়ও একটা দাগায় নিস্তার পায়, কিন্তু ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু! তোমার বক্ষে কবি-পদ-চিহ্নের যে সংখ্যা হয় না!



মা

“(আমি) তোর বিরহে কাতর হয়ে
থাকি মা তোর চিহ্ন লয়ে,
(মা তোর) চিহ্ন দেখেই চিত্ত বাঁধি,
(আর) কাঁদি কেবল “মা”, “মা” ক’রে !”

বেদান্তবক্তা।*

দেখ ভক্তি, আমি আমার কথা বলিয়া লই। পরে তোমার কথা শুনিব। আমি আমার আমিটাকে সুস্পষ্ট করিয়া বুঝাইব। ইহার উপর যত পোষাক আচ্ছাদন আছে, সকল হইতে পৃথক করিয়া নগ্ন সুন্দর আমিটাকে দেখাইব; পরে তুমি তোমার যে সুন্দর দেবতা, যাহাকে তুমি 'তুমি' সম্বোধন কর, তাহার কথা আমাকে শুনাইবে, তাহাকে তুমি আমাকে দেখাইবে। অনেক অপর লোক বলিয়াছে যে, 'আমি'টা বাক্য মনের অগোচর। তাহারা বলুক; আমি যখন তাহা বলি না, তখন তুমি তাহাদের কথায় কর্ণপাত করিও না। অবশ্য আমিটাকে দেখান আমার পক্ষেও কঠিন; তোমার পক্ষে দেখা আরও কঠিন। আমার আমিটা রাহুর শিরোবৎ। রাহুর শির ব্যতীত শরীরের অন্য কোনও অংশ নাই; শিলাপুত্রের শরীরবৎ—নোড়ার শরীরটাই নোড়া। সচরাচর কিন্তু 'আমি' শব্দে কেবল শুদ্ধ 'আমি'টা না বুঝিয়া তৎসহ অনেক বস্তু সংযোগ করিয়া একটা মোটা আমি বুঝা হয় ও সেই আমি লইয়া জগতের অধিকাংশ ব্যবহার হইতেছে। আমি কানা বলিলে আমার বেবাক শরীরটাকে আমি বলা হইল। আমার শরীর কানা বলিলে ইঙ্গিতে যে আমির কথা হইল, তাহা শরীর হইতে পৃথক্। তবেই হাত পা কাটিয়া ফেলিয়া চক্ষু অন্ধ করিয়া যদি বাঁচিয়া থাকি, তথাপি বলি, আমি আছি; আমার দেহটা বিকল হইয়াছে বটে। ভাবিয়া দেখ, বাল্যে আমি, যৌবনে আমি ও বৃদ্ধশরীরবাসী আমি। এই আমিটার ঠিকঠাক্ রূপটা কি,

* যাঁহারা পরিণত বয়সে জ্ঞান পরিপাক করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন, ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাদিগের অন্যতম। তিনি বেদান্তের অনুশীলন করিয়া বেদান্তের কথা 'অভয়ের কথা'য় বুঝাইয়াছিলেন—বৈষ্ণব ধর্ম্মের মূল তত্ত্ব 'ঠাকুরাণীর কথা'য় বুঝাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য, তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যকে যে রত্ন দান করিতে পারিতেন, তাহা দিবার পূর্ব্বেই তাঁহার তিরোভাব হইয়াছে। তিনি 'অভয়ের কথা'য় যে কথা বিশদভাবে বুঝাইয়াছিলেন, এই প্রবন্ধে তাহার মূল লক্ষিত হইবে। 'বেদান্ত-বক্তা'র যে বীজ রোপিত হইয়াছিল, 'অভয়ের কথা'য় তাহাই শাখাপল্লবিত তরুতে পরিণতি লাভ করিয়াছিল। তিনি 'সাহিত্যে'র জন্য এই প্রবন্ধটি পাঠাইয়াছিলেন; পাণ্ডুলিপির সঙ্গে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাও এই সঙ্গে মুদ্রিত হইল। ইহাই তাঁহার সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা রচনা। বাঙ্গালা সাহিত্যে ক্ষেত্রমোহনের এই প্রথম দান রক্ষিত হওয়া উচিত মনে করিয়া আমরা ইহা মুদ্রিত করিলাম।—সাহিত্য-সম্পাদক।

তাহাই বুঝিতে হইবে। ইহা বুঝাইবার পন্থা একমাত্র আরোপ অপবাদ ন্যায়। 'আমি'তে নানা বস্তু সংযোগ করিয়া একটা বস্তু খাড়া করা হইবে, সেই প্রস্তুত বস্তু হইতে সেই সেই নানা বস্তু বিয়োগ করিতে হইবে। তাহা হইলেই আমিটাকে পাওয়া যাইবে। সংক্ষেপে হইবে না, বিস্তর বাক্যব্যয় করিতে হইবে। বাক্য তিন প্রকার—রোচক, ভয়ানক, যথার্থ। বালক রোগীকে বলা হয়, নিম্ব পান কর, লাড়ু দিব ; দান কর, পুনর্জ্জন্মে শতগুণ পাইবে ; ইহা রোচক। হিতৈষিণী জননী শিশুকে বলেন, জলাশয়ের নিকট যাইও না ; তত্র যক্ষ বা কুম্ভীর আছে ; পরের দ্রব্য হরণ করিও না, নরকে উত্তপ্ত তৈলকটাহে নিক্ষিপ্ত হইবে। ইহা ভয়ানক রোচক। ভয়ানক বাক্য যথার্থ হইতেও পারে, নাও পারে। আমি আছি, বা আমি আছে, ইহা যথার্থ। এই তিন প্রকার বাক্যেরই সাহায্য লওয়া যাইবে। বাক্য, পদের সমষ্টি। যথা, রাম বড় ভাল রাজা ছিলেন। অত্র সমগ্রটী বাক্য রাম একটী, বড় একটী, ভাল একটী, ইত্যাদি পাঁচটী পদের মেলনে বাক্যটী হইয়াছে। প্রতিপদে এক বা বহু শব্দ আছে ; রাম পদে র আ ম্ অ চারটী ধ্বনি বা শব্দ আছে। আমরা শব্দ অর্থে বাক্যও বুঝিব, পদও বুঝিব ও ধ্বনিমাত্রও বুঝিব, তাহা এই স্থলেই বলিয়া রাখা গেল। শব্দগুলি আমরা বৃদ্ধগণের নিকট হইতে পাইয়াছি। শব্দগুলিতে শক্তি আছে। শক্তি এই যে, মনের ভাব, যাহা শব্দ নহে, তাহা শব্দ নিজশক্তি দ্বারে সম্পূর্ণরূপে না হউক, অনেকটা প্রকাশ করে, অপরের গোচর করে, মনে মনে মালতী ও বকুলের গন্ধের পার্থক্য অনুভব করা যায়। কিন্তু এমন শক্তিমান্ শব্দ আমরা বৃদ্ধগণের নিকট হইতেও পাই নাই, আমরাও এ পর্য্যন্ত নিজে তৈয়ার করিতে পারি নাই। তথাপি জগতের সমগ্র ব্যবহারই শব্দের শক্তিতে হইতেছে। ব্যবহারে গণ্ডগোল অনেক স্থলে শব্দশক্তির প্রয়োগ-ভেদে হয়। বক্তার শব্দে শ্রোতার অধিকারভেদে বা যোগ্য অধিকার থাকিলেও তাৎকালিক অন্যমনস্কতাবশতঃ, বা কর্ণের অল্পবিস্তর বধিরতাবশতঃ শ্রোতার উপর বক্তার অভিপ্রেত শক্তি কার্য্য করে না। বলা গেল, পার্ব্বতীসুত লম্বোদর, ঈষৎ-বধির শ্রোতা পাক দিয়া সুতা লম্বা করিতে গেল। ভোজনসময়ে সৈন্ধব আন বলিলে শ্রোতা ঘোটক আনিল ; সালিয়ানা খরচ অর্থে সহধর্ম্মিণীর ভগিনীকে আনয়ন করিবার ব্যয় বুঝিল। পৃথিবী কমলা লেবুর মত শুনিয়া পৃথিবীকে অম্লরস ধারণা করিল ; দুগ্ধ বকের মত শুভ্র ও বক কাস্তের মত শুনিয়া অন্ধ পাছে গলা কাটিয়া যায় ভয়ে দুগ্ধ খাইতে অস্বীকার করিল। বক্তা পুত্রকে বলিল যে, সূর্য্য অস্ত গিয়াছে ; বক্তার অভিপ্রায় ছেলে পড়িতে যাউক ; ছেলে বুঝিল যে, সময়

হইয়াছে, দাদাকে ঔষধ খাওয়াইতে হইবে। বাবু বলিলেন, কাল কোর্ত্তা লেয়াও; হিন্দুস্থানী ভৃত্য পথ হইতে কাল কুকুর ধরিয়া আনিল। মাষ্টার মহাশয় বলিলেন, My head মানে আমার মাথা; বালক বাড়ীতে "My head মানে মাষ্টারের মাথা" ইহা পুনঃপুনঃ আবৃত্তি করায় পিতা বলিয়া দিল, My head মানে আমার মাথা। পরদিন বালক পাঠশালায় গিয়া My head মানে বাবার মাথা বলিলে মাষ্টার মহাশয় তাড়না করিলেন। তাহাতে বালকের চৈতন্য হইল; বুঝিল যে, My head মানে পাঠশালায় মাষ্টারের মাথা ও বাটীতে বাবার মাথা। এরূপ ব্যবহার-বিপর্য্যয়ের উদাহরণ শত শত দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু প্রকৃত বিষয়ের বিশেষ আনুকূল্য হইবে না। উক্তরূপ বিপর্য্যয় সত্ত্বেও শব্দ ব্যতীত গত্যন্তর নাই। শব্দশক্তির সাহায্যেই ব্যবহার চলিবে। এই শব্দ ও শব্দশক্তির কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিলে লাভ ব্যতীত ক্ষতি নাই। এই শব্দ-সাহায্যে নিতান্ত পরিচিত বস্তুর বিরোধী বস্তুতে বিশ্বাস জন্মাইয়া দেওয়া যায় ও দেওয়া হইবে। বক্তা শক্তিমান্ শব্দে মন্ত্র পড়িবেন, শ্রোতা মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। হয় ত চিরকাল যত্নে লালিত পালিত মতগুলি, যে জগৎ একটা নিয়মশৃঙ্খলা পরিপাটীতে চলিতেছে—যে কার্য্য থাকিলেই তাহার একটা কারণ আছেই, যে সাকার বস্তু সাকারই, নিরাকার নহে, যে অভাব বস্তু ভাবরূপ হইতেই পারে না, যে গুরুই বড়, শিষ্য ছোট, ইত্যাদি বহু বিষয়ে মতগুলি মন্ত্রমুগ্ধ শ্রোতা নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও অবশ হইয়া পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিবেন, ফেলিয়া পরে আশ্চর্য্য সুখানুভব করিবেন। দেখিবেন যে, অমৃতপানে দেবতারা অমর হন নাই, বিষপানেই নীলকণ্ঠ মৃত্যুঞ্জয়। প্রচুর ধনসম্পত্তিতে সুখ নাই, সুখের জন্য পিতামহ ব্রহ্মার নিকট প্রার্থনা করিলে তিনি নিরুপায় হইয়া সাধককে দদ্রু দিয়া চুলকাইবার সুখে অধিকার দেন। অন্নপূর্ণাকে সহধর্ম্মিণী করিয়া দিলেও শিবজীর তৃপ্তি না হওয়ায়, ব্রহ্মা তাঁহাকে ভিক্ষায় নিযুক্ত করিয়া সুখী করেন। পরিচ্ছদে মাধুর্য্যের তিরস্কার করে বলিয়া নগ্নসুন্দর মঙ্গলময় সস্ত্রীক মহাদেবকে নিরাবরণ করা হইয়াছে। এ সকল অত্যাশ্চর্য্য বিষয়ে সম্যক আলোচনা অল্পে হয় না; বিশেষরূপ বিস্তারিত বিচার আবশ্যক। যে সকল শক্তিমান্ শব্দের দ্বারা যোগ্য বক্তা ও যোগ্য শ্রোতার পরস্পর আনন্দদায়ী কথালাপ হইবে, সেই শব্দশক্তির কিঞ্চিৎ পরিচয় আবশ্যক। শব্দের শক্তি আমরা অল্পই জানি। ইহা বহু ও বিচিত্র। যাহা জানা আছে, তাহাতেই স্তব্ধ বিস্মিত হইতে হয়। শব্দের শক্তির বিভাগ, স্বার্থ ও জহৎ-অজহৎ ভাগত্যাগ ব্যঞ্জনাদিরূপে করা হইয়াছে। এই সকল শক্তি পরস্পর সম্পূর্ণ পৃথক্ না হইলেও, ইহাদের উদাহরণ

হইতে উল্লাস পাওয়া যায়। বালক যখন আচার্য্যের শব্দোপদেশে বুঝে যে, ধরণী সমতল নহে, বর্ত্তুল; সূর্য্য স্থির, পৃথিবীই পশ্চিম হইতে পূর্ব্বাভিমুখে ঘুরিতেছে; চন্দ্রের আলো তাহার নিজস্ব নহে; তখন তাহার আনন্দবোধ—রসবোধ হয়। শব্দের স্বার্থ, শক্তি; যথা, জল এই শব্দের নিজ শক্তিতে জল বুঝায়। জল আন বলিলে পাথর আনা হয় না, জল আনা ব্যবহারই হয়। সৈন্ধব শব্দের স্বার্থে লবণও বুঝায়, ঘোটকও বুঝায়; ভোজনসময়ে বা বহির্গমনসময়ে সৈন্ধব আন বলিলে লবণ বা ঘোটক আনা ব্যবহার সম্পাদিত হয়।

শব্দের জহৎলক্ষণাশক্তির নিদর্শন:—ঘোষজা গঙ্গাবাস করিয়াছে বলিলে, শ্রোতা গঙ্গা শব্দের স্বার্থ পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়া সন্নিহিত তটভূমি জহৎলক্ষণাশক্তি-বশে বুঝিয়া লইয়া ঘোষজার সহিত সাক্ষাৎকার বা আদালতের সমন ধরান কার্য্য সাধন করে। অজহৎলক্ষণায় শব্দের স্বার্থ পূর্ণ গৃহীত হয় ও অধিক অর্থ তত্র আরোপিত হয়। আম্রকানন শুনিয়া আম্র শব্দের স্বার্থ ও বৃক্ষসমূহের অর্থারোপ উভয় লইয়া, আম্রবৃক্ষের কানন বুঝিয়া, তত্র আম্রবৃক্ষের শাখাচ্ছেদন বা ফলসংগ্রহ-রূপ ব্যবহার সম্পন্ন করা হয়।

ভাগত্যাগ লক্ষণা এই যে, শব্দের স্বার্থ কিয়দংশ পরিত্যক্ত ও বক্রী অংশ সংগৃহীত হয়। কল্যদৃষ্ট দেবদত্ত অদ্য-দৃষ্ট এই ব্যক্তি। অত্র দেবদত্তকে গ্রহণ করা হয়; ইহার কল্য-দৃষ্টত্ব ও সম্মুখে দণ্ডায়মানত্ব ত্যক্ত হয়। ব্যঞ্জনাশক্তি নানাশক্তির সমাবেশে এক অপূর্ব্ব শক্তি। কোনও এক ব্যক্তি আমার উদ্যানে প্রত্যহ প্রাতে পুষ্পচয়ন করে; তাহার প্রতি সাক্ষাৎ স্বার্থশক্তিযুক্ত নিষেধবাচক শব্দ প্রয়োগ করা হইল না, বলা গেল না যে, তুমি অত্র পুষ্পচয়ন করিও না। তাহার শ্রুতি-গোচরে ভৃত্যকে বলা হইল যে, গরুটাকে নিরাপদ স্থানে রক্ষা করিও। গত রাত্রে ব্যাঘ্র উদ্যানে আসিয়া গোবৎকে হত্যা করিয়াছে। পুষ্পচয়ন করিও না বলিলে যে ফল যে ব্যবহার সুসম্পন্ন হইত, ঠিক তাহাই হইল; সে ব্যক্তি ব্যাঘ্রভয়ে উক্ত উদ্যানে আর আসিল না।

ধ্বনিশক্তি উহু শব্দে কাতরতা, হাহা শব্দে উল্লাস ব্যক্ত করে; হাততালিতে বাহবা হয়, দুও-ও হয়। সুপ্ত ব্যক্তির নিকটে বজ্রনাদ, ভেরীধ্বনি, বা চীৎকার সহ তুমি উঠ, বা তুমি ঘুমাও, যাহাই বল, উঠ বা জাগ শব্দের স্বার্থশক্তি দ্বারা জহদাদি-শক্তিনিরপেক্ষ ধ্বনিশক্তি হইতে সুপ্তোদ্বোধন ক্রিয়া সাধিত হয়। শুনিয়াছি, শুদ্ধ চিত্তের দ্বারা অজপা অনাহত শ্বাসপ্রশ্বাসমধ্যে গূঢ় কিছু শব্দ অতি নিস্তব্ধতার মধ্যে শ্রুত হইয়া সাতিশয় সুখোৎপত্তি হইয়া শ্রোতাকে চরিতার্থ করে।

সোনার পাথরবাটী হয় না, ইহা বুঝা যায় বলিয়া, সোনার পাথরবাটী, এরূপ প্রয়োগ করা চলে না। কিন্তু যাহা হয় না, কিন্তু পূর্ব্বে বুঝা নাই যে, হয় না, এরূপ বাক্যের প্রয়োগ দ্বারা ফাঁকি দিয়া সত্য ব্যবহার ঘটান যাইতে পারে। অশ্বডিম্ব, কচ্ছপীর দুগ্ধ বলিলে বালক মনে করিতে পারে যে, যেমন হংসডিম্ব, তেমনই অশ্বডিম্ব; যেমন গোদুগ্ধ, তেমনই কচ্ছপীর দুগ্ধ; কচ্ছপী ডিম্ব প্রসব করে; তাহার স্তন ও স্তন্য নাই, বালক জানে না। এমন বালককে গুপ্ত মন্ত্রণার সময় দীর্ঘকাল দূরে রাখা আবশ্যক হইলে, দুইটি পয়সা দিয়া বাজার হইতে কচ্ছপীর দুগ্ধ আন বলিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। যাত্রার রাক্ষস, খড়ের রাক্ষস যে নিরীহ, তাহা বালক জানে না; কিন্তু দুষ্ট বালককে ভয়ভীত করিয়া শান্ত করিবার প্রয়োজন হইলে উক্তরূপ রাক্ষস দেখান হইতে পারে। তদ্বৎ একটি শব্দশক্তির উল্লেখ করিব। ইহা ধ্বনি নহে, অথচ নাম দেওয়া গেল অচিন্ত্যধ্বনি। তুমি বিবাহিত অপুত্রক। তুমি স্বপ্নে আছ, তত্র নায়ক পুত্র বহু চিকিৎসার পর মরিয়াছে, তুমি ক্রন্দন করিতেছ। এক সাধু আসিল, বলিল, তুমি কেন শোক করিতেছ? শোকের কোনও কারণ বর্ত্তমান নাই। তুমি বলিলে, ওহে চিরকুমার উদাসীন! তোমার পুত্র নাই, পুত্রশোকের মর্ম্ম কি বুঝিবে? সাধু বলিল, তুমিও অপুত্রক, সুতরাং পুত্র মরে নাই, তুমি স্বপ্ন দেখিতেছ। উঠ; জাগ। এই স্বপ্নগত উঠ জাগ শব্দে ধ্বনি আছেও বটে, স্বপ্নের বলিয়া নাইও বটে। অচিন্ত্য অনির্ব্বচনীয় ধ্বনি আছে, তাহার শক্তিতে সুপ্ত ব্যক্তি জাগিয়া দেখে, কোথায় বা সাধু ও তদুপদেশ, কোথা বা পুত্র ও তাহার মৃত্যু! অত্র শোকমোহ-উচ্ছেদরূপ ফল পাওয়া গেল।

আরও আশ্চর্য্য শব্দশক্তির উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। একটী শিশু অত্যন্ত মিষ্ট খাইত। মাতার ভয় যে, শিশুর কথা ফুটিবে না। মাতা শব্দ-প্রয়োগে তাহা পুনঃ পুনঃ করিল যে, তুমি মিষ্ট খাইও না। উক্ত শব্দে শক্তি ছিল না, ফল হইল না। একদা এক সাধুর নিকট শিশুকে লইয়া মাতা সাধুকে অনুরোধ করিল যে, ইহার একটা উপায় করুন। সাধু বলিল, সাত আট দিন পরে আসিও। যথাসময়ে শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া আদর করিয়া সাধু বলিল, বৎস! মিষ্ট খাইও না। বালক বাটীতে গিয়া একেবারে মিষ্ট ত্যাগ করিল। মাতা মায়াবশতঃ শিশুকে অল্প কিছু কিছু উত্তম মিষ্ট দ্রব্য খাইতে বহু অনুরোধ করিল; বালক শুনিল না। মাতা ক্রুদ্ধ হইল, ভাবিল যে, আমার ছেলে আমার কথা শুনিবে না? একটা অপরিচিত ব্যক্তির কথাতে এত আস্থা! সে সাধুর নিকট গিয়া রহস্য জিজ্ঞাসা করিল। প্রথম সাক্ষাতেই

বালককে নিষেধোপদেশ না দিয়া সাত আট দিন অপেক্ষারই বা কি তাৎপর্য্য? সাধু বলিল, প্রথম দিনের কথা এই যে, আমি তৎকালে মিশ্রি ও দুগ্ধ পান করিতাম। পরে মিশ্রি ত্যাগ করিয়া কেবল দুগ্ধ পান করিতে আরম্ভ করি। দুই চারি দিন আমার কষ্ট বোধ হইয়াছিল। পরে ক্রমে মিশ্রিতে প্রয়াস ছিলই না, দুগ্ধে মিশ্রি দেওয়া নাই, এরূপ চিন্তাও মনে উদয় হইত না। মনের যখন মিশ্রি-চিন্তা-রহিত অবস্থা, সেই সময়ে দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎকারে বালককে মিষ্ট-ত্যাগ উপদেশ করায় ফল হইয়াছে। নিষেধবাক্য মাতার ও সাধুর একরূপ হইলেও, কি একটা অধিক অচিন্ত্য শক্তি সাধু শব্দে যোজনা করায় ফল হইল; কেবল স্বার্থাদি শব্দ-শক্তি অকিঞ্চিৎকর হইয়াছিল। মন্ত্রের শক্তি কতকটা ঐরূপ। এক ব্যক্তির মেদ-বৃদ্ধি রোগ হয়। নানা ঔষধপ্রয়োগে অকৃতকার্য্য হইয়া আত্মীয়বর্গ মন্ত্র-প্রয়োগ ব্যবস্থা করে। পৃথক পৃথক জ্যোতির্বেত্তাগণকে রোগীর বয়ঃক্রমাদি সব বলিয়া রাখিয়া, রোগীকে কি বলিতে হইবে, তৎপ্রতি কি মন্ত্রপ্রয়োগ করিতে হইবে, শিক্ষা দিয়া, ভিন্ন ভিন্ন দিনে রোগীর নিকট লইয়া যায়। এক ব্যক্তি কোষ্ঠী দেখিয়া মুখ বিষণ্ণ করিয়া রোগীকে জিজ্ঞাসা করিল যে, আপনি কি উইল করিয়াছেন? অপর ব্যক্তি করতলপরীক্ষান্তে বলিল, ৪৩ বৎসর ৭ মাস ৫ দিনে ফাঁড়া আছে; গ্রহযাগ করুন। রোগীর বয়ঃক্রম ৪৩ বৎসর ৪ মাস ১৭ দিন। আপনি উইল করিয়াছেন কি না, করুন, গ্রহযাগ ইত্যাদি মন্ত্রে রোগী মৃত্যু নিকট বুঝিল ও ক্রমে ক্ষীণকলেবর হইয়া মেদবৃদ্ধি-রোগ-মুক্ত হইল।

আশা করি, পাঠকমাত্রই উপলব্ধি করিয়াছেন যে, একই কথা ভিন্ন লোকের মুখে শুনিয়া ভিন্ন রকমে চিত্তকে ক্ষুব্ধ করিয়া থাকে। শব্দেই জগৎ চলিতেছে। হয় ত বা শব্দই জগতের উপাদান। যথা মৃৎই ঘট-শরাবাদির উপাদান। মনই স্বপ্নদৃশ্য যাবতীয় বস্তুর উপাদান। যদি অত্যন্ত দুঃখদ বলিয়া কাহারও জগৎ উচ্ছেদ করিবার অভিপ্রায় হয়, তাহা হয় ত লাঠী মারিয়া বা গর্ত্ত খুঁড়িয়া বা হত্যা করিয়া হইবে না; কণ্টক দ্বারা কণ্টক-উদ্ধারবৎ শব্দময় জগৎকে শব্দ দ্বারাই তাড়াইতে হইবে। কাহারও বা জগৎকে বহুদিনপরিচিত প্রীতির সামগ্রী বোধ হইবে। তাহাকে লোহার হাতুড়ী দ্বারা লৌহকে চূর্ণ বিচূর্ণ না করিয়া শুভ্র কটাহ খনিত্রাদি প্রয়োজনীয় বস্তুনির্ম্মাণবৎ শব্দ দ্বারা শব্দময় জগতের পুষ্টি ও শোভা বর্দ্ধন করিয়া জগৎকে অমর করিয়া রাখিতে হইবে। কাহারও বা জগৎ সুখদ দুঃখদ উভয়-রূপী বোধ হইলে, দারুণ সংশয়ান্বিত হইয়া ইহার উচ্ছেদ

বা রক্ষা, কোনটায় মঙ্গল, সে তাহার মীমাংসা শব্দ-সাহায্যেই করিতে থাকিবে। শব্দশক্তির ইয়ত্তা নাই। শালাকে শালা বলায় ক্রুদ্ধ হইয়া আদালতে অভিযোগ করে যে, আমি শালা বলিয়া আমাকে শালা বলে নাই; অপরকে অপমান করিবার জন্য যেমন শালা বলে, সেইরূপ বলিয়াছে। রসিক স্ত্রী রসিক স্বামীকে শালা বলিলে পুরুষ আপ্যায়িত হয়, সন্দেহ নাই। এই শক্তিশালী শব্দের সুপ্রয়োগ দ্বারা গোটা সাবয়ব আমিটার অবয়ব ঘুচাইয়া নিরবয়ব আমিটাকে খাড়া করিতে হইবে। বক্তাতে নিরতিশয় নিপুণতা, অপ্রমাদ ও শ্রোতাতে অবিকল প্রতিবিম্ব-গ্রহে শুদ্ধদর্পণবৎ ধৌত-মালিন্যলবলেশ অন্তঃকরণ থাকা আবশ্যক। পূর্ব্ব হইতে মনোমালিন্যনাশের জন্য সদুপায় আছে। তাহা কৃচ্ছ্রসাধ্য, তবে পূর্ণরূপে তাহার অনুষ্ঠান না করিতে পারিলেও অল্পবিস্তর অনুষ্ঠান চাই, এবং বেদান্তবাক্য সঙ্গে সঙ্গে শ্রবণ-মননাদি করিলে, বেদান্তবাক্যের নিজ মহিমায় চিত্তনির্ম্মলতা-রূপ দুঃসাধ্য ব্যাপার সুখে সম্পন্ন হয়।

পাঠক মহাশয়কে একটী অনুরোধ করিয়া রাখি। প্রকৃত বিষয় কঠিন বলিয়া কোনও এক দৃষ্টান্ত ও যুক্তির পুনঃপুনঃ উল্লেখ দেখিলে, অরুচি বা অপরিতোষ না হয়। শেষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। তখন সকল যুক্তির পর্য্যবসান-রূপ অভাব হইতে নিরতিশয় স্ফূর্ত্তি পাওয়া যাইবে। আমার বক্তব্য ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে। শেষের কথা না শুনিয়া আমার বক্তব্য সম্বন্ধে কোনও ধারণা করিবেন না। বাঙ্গালা ভাষায় যাহা কেহ কখনও বলে নাই, এমন কথা বলিবার অভিপ্রায় আছে। একদিন প্রধান মন্ত্রীর পদপ্রার্থী কেহ ভোট-সংগ্রহের জন্য বক্তৃতা করেন। এ বক্তৃতা শেষ হইলে এক জন বিলাতী তন্তুবায়-সম্প্রদায়ের মুখপাত্র হইয়া বলিল যে, ভোট পরে দিব; আপনি বলুন যে, প্রধান মন্ত্রী হইলে আমাদের সমিতির ধনাধ্যক্ষকে ফরেন সেক্রেটরী করিবেন কি না? তিনি বলিলেন, I will। কিন্তু কথা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বে তন্তুবায়গণ আনন্দে ঘোর করতালি দিল। কিন্তু বিস্কুটওয়ালারা দুঃখে ম্রিয়মাণ হইল। তাহাদের আশা ছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ ফরেন সেক্রেটরি হইবেন। করতালি শেষ হইলে ভোটপ্রার্থী বলিলেন, not; I will not যোজনা হওয়ায় তন্তুবায়গণ নিষ্প্রভ ও বিস্কুটওয়ালাগণ আহ্লাদে চীৎকার করিল। চীৎকার শান্ত হইলে, দুই দলই শুনিল, tell you। অসমাপ্ত বাক্য শুনিয়া নানা ধারণা সবই বৃথা হইল; সমাপ্ত বাক্য I will not tell you চরম ধারণা করাইয়া দিল। পাঠক মহাশয় প্রবন্ধসমাপ্তির পরে যাহা

হউক বুঝিবেন, উপস্থিত চাঞ্চল্যে কোনও ফল নাই। হয় ত মনে করিতেছেন, আমার অবিনয় হইতেছে, আমি গুরুগিরি করিতেছি; শ্রোতাকে খাট করিতেছি, শিষ্য করিতেছি। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি যে, আমার প্রতীয়মান অবিনয়টী অবশেষে বিনয়ের—আত্মত্যাগের পরাকাষ্ঠা হইবে। ব্যস্ত হইবেন না।

অন্তঃকরণের শুদ্ধতা-সম্পাদক যে সকল অনুষ্ঠানের উল্লেখ সচরাচর হইয়া থাকে, তাহার কয়েকটী নমুনার মত দিব ও প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ হইতে ভিন্ন অথচ দেখিতে তাহারই মত, যথা বিম্ব ও প্রতিবিম্ব তুল্যরূপ হইলেও ভিন্ন পরোক্ষাপরোক্ষানুভব প্রমাণদ্বয় আছে: তাহাদের কথা এবং প্রতিবিম্ব মিথ্যা না হউক, অর্দ্ধমিথ্যা হইয়াও যথাকাজে লাগে—বিম্বের পরিচয় দেওয়া সেইরূপ প্রত্যক্ষাদি যথা পরোক্ষাপরোক্ষ প্রমাণের সহায়তা করে, তাহা অন্য প্রবন্ধে বিবৃত হইবে।

শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রিয় সুরেশ, উপরি-লিখিত প্রবন্ধটী ইচ্ছা করিলে সাহিত্যে মুদ্রিত করিতে পার। প্রবন্ধের বক্রী অংশ পরে দিব। যদি মুদ্রিত কর, তবে আমাকে আমার প্রতি প্রবন্ধের মুদ্রিত পত্র পঁচিশখানি দিতে হইবে। যদি মুদ্রিত না কর, তবে অনুরোধ করি যে, এই হস্তলিপি আমাকে ফিরাইয়া দিবে। আমাকে পত্র লিখিলেই আমি স্বয়ং গিয়া লইয়া আসিব। তাহাতে তোমার কোন লজ্জা কুণ্ঠা করিতে হইবে না। আমার লেখা অভ্যাস নাই। প্রথম প্রথম লেখা মন্দই হবে, তাহাতে আমারও লজ্জা নাই। তুমি লজ্জা ত্যাগ করিয়াই আমার পাণ্ডুলিপি আমারই হস্তে দিবে। আমি লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়া বুঝিয়াছি, অগ্রে বুঝি নাই, যে কোনও বিষয় মনে বেশ বুঝা যায়, কিন্তু বলা কঠিন, তথাপি তৈয়ার শ্রোতা যদি নিপুণ ও ছলগ্রহণে সমর্থ হয় ও বলধান্ পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করে, তবে বক্তাও উৎসাহিত হইয়া তৎকালেই উৎসাহিত শব্দশক্তি দ্বারা সিদ্ধান্তপক্ষ স্থাপন করিতে পারে। কিন্তু লেখকের কার্য্য আরও গুরুতর; সমক্ষে শ্রোতা না থাকায় কাল্পনিক নিপুণ শ্রোতা খাড়া করিয়া তদুক্ত প্রতিবাদ মনে ভাবিয়া লইয়া তাহার সদুত্তর সঙ্গে সঙ্গে দিয়া লিখিতে হয়। এমন হয় যে, যে আপত্তি খুব যোগ্যও হইতে পারে, তাহা মনে উদয় হইল না, তাহার উত্তরও লেখা হইল না। তাহাতে গ্রন্থ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। ইহা আপশোষের বিষয়। বোধ হয় লিখিতে খুব পাকা না হইলে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর প্রবন্ধ লেখা

যায় না। প্রারম্ভে দোষসম্ভাবনা থাকিয়াই যায় ও স্ব-পরের অপরিতোষ হয়। যদি আমার প্রবন্ধ মুদ্রিত কর, তবে আমার এই ভয় দুঃখ কাতরতা দীনোক্তি পাকে প্রকারে তোমার কথায় প্রকাশ করিয়া প্রবন্ধের অবতরণিকা লিখিয়া দিও।

আশীর্ব্বাদক—

শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩৮ নং চড়কডাঙ্গা রোড বেলেঘাটা।

পোঃ—কলিকাতা।

২১৷২৷১৯১৩

পুঃ—

Spelling mistake দেখিয়া দিও; আর জানিও যে, লেখার পর প্রবন্ধটী আমি দ্বিতীয়বার পড়ি নাই। কোনও para স্থানান্তরিত করিয়া যথাযোগ্য বিন্যাসও করিতে পার।

'পঞ্চ্'।

[স্বর্গীয় ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় লিখিত।]

ভাঁড়-বৃত্তি-জীবী বা হাস্য-রস-ব্যবসায়ী এক শ্রেণীর সাময়িক পত্র, এ যুগের বিগত কতক কাল হইতে জন্মিয়াছে, যাহার নাম 'পঞ্চ্'। বিলাতী 'পঞ্চে'র অনুকরণে বাঙ্গালা ভাষার 'পঞ্চানন্দ'। হাস্যরসের রচনা-প্রসঙ্গে, ইহাদের কিছু না কিছু উল্লেখ না করিলে, আলোচনা নিশ্চয়ই নেহাৎ অঙ্গহীন হইবে।

'পঞ্চ' শব্দটা ইংরেজী ভাষায় নানা অর্থে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়; তাহার একটা বা দুইটা সাক্ষৎসম্বন্ধে ভাঁড়ামিপনার প্রতিনিধি হইলেও, সব কয়টাকেই ভাণ্ডের ভিতর পুরিয়া, প্রহসনের রঞ্জন ও পীড়নার্থে প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

প্রথমতঃ, 'পঞ্চ' বলিতে এক প্রকারের পাঁচ-মিশালী পানীয় দ্রব্য। শরাপ, শর্করা, জল, লেমন বা লেবু-রস, মশলা, এই পঞ্চ উপাদান-দ্রব্য একত্র মিশাইয়া যে এক উদ্ভট পেয় পদার্থ প্রস্তুত হয়, তাহারই নাম 'পঞ্চ'। ইদানীং এই অপূর্ব্ব আরকে জল বা মশলার বদলে চায়ের

জলও দেওয়া হইয়া থাকে। এ স্থলে 'পঞ্চ' আমাদের স্বগৃহেরই 'পঞ্চ' বা 'পাঁচ' হইতে উদ্ভূত বটে। সাহেবরা এ শব্দটার ও সামগ্রীটার ব্যবহার সম্ভবতঃ হিন্দুস্থানেই মুসলমানদের কাছেই শিখিয়াছিলেন। হিন্দু হইলে, হয় ত, 'আরক' বা শরাপের বদলে 'ভাঙ্গ' দিয়া 'পঞ্চ' করিত। আবার শুনিয়াছি, পাঁচ রকমের মদ একত্র করিয়াও নাকি সাহেবরা,—বাবুরাও কোন নয়,—'পঞ্চে'র পাঞ্চভৌতিক অদ্ভুত রস ভেয়াইয়া থাকেন। যাহা হউক, পঞ্চের এই অদ্ভুত অর্থ ভাঁড়ামি পত্রে খুবই খাটিতে পারে। রঙ্গ তামাসার পঞ্চ কেন, পঞ্চষষ্টি ভূত ভাঁড়ামির ভাণ্ড হইতে বাহির হয় ও পরকুৎসার পাঞ্চজন্য প্রচণ্ডবেগেই বাজিয়া থাকে। থিয়েটারী 'পঞ্চরঙ্গ' এই পঞ্চেরই একটা পরিণতি। যাহা হউক, তবুও এটা কমিক পত্রের গৌণার্থ-বোধক, মুখ্য নয়।

তাহার পর 'পঞ্চ' Puncheon হইতে উদ্ভূত;—অর্থ বেঁধান, ফোটান, ইত্যাদি। Punch Plier এক রকমের শাঁড়াসী। সকলেই জানেন যে, পরপীড়ন, পরগ্লানি, পরের ঘাড়ে ও হাড়ে হুল বেঁধান, সুতীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ বিদ্রূপের শাঁড়াসী চালান, পঞ্চ-নামা বা পঞ্চ-প্রকৃতির পত্র সকলের একটা সহজাত স্বরূপ। অতএব এ অর্থটাও খাটে। কিন্তু, এটাও গৌণার্থ।

পঞ্চর প্রকৃত প্রয়োগ বা মুখ্যার্থ Punchinells হইতে সংক্ষেপীকৃত যে Punch, এই পঞ্চের আসল অর্থই 'বফুন' বা ভাঁড়, পুঁতুল-নাচের নক্সাদার সঙ্। পুনশ্চ, পঞ্চ মানে ছোট-খাট বেঁটে গুজ্‌কুটে অতিশয় স্থূলকায় পেটমোটা লোক। পঞ্চের এই অর্থেই বোধ হয় পঞ্চ পত্রের ছবি ও 'কার্টুন' সকলে বেঁটে স্থূলকায় পেটমোটা মূর্ত্তিই অঙ্কিত হইতে প্রায়ই দেখা যায়। এবং এই বিলাতী অনুকরণে এ দেশে আবির্ভূত 'পঞ্চানন্দ' বা পেঁচো চোয়ালের চেহারা চিত্র করা হইয়াছে। কিন্তু, এ অনুকরণ না করিয়া পেঁচোর পৌরাণিক মূর্ত্তি লইলে মন্দ ছিল না। পৌরাণিক 'পেঁচো চোরা' চোয়াল তোলা, শির ছোরকোটা, হাড় পাঁজড়া হাঁ করা, হাত পা সরু, মুখ পোড়া, খোল-পেটা জীব। বিদেশী উচ্ছিষ্ট ও নকল চেহারার চেয়ে, দেশী পেঁচোর স্বদেশী আসল মূর্ত্তি বেশী মানানসই হইতে পারিত। পেঁচোর কার্য্য ও কীর্ত্তিকলাপের সঙ্গেও সেটা খুব খাপিত। কেন না, পরের কচি ছেলে পুলে চুরি করা ও নানা রকমের রোগ বালাই, বিভীষিকা হইয়া কচি ছেলের হাড়মাস কুরিয়া ও রক্ত চুষিয়া খাওয়াই পেঁচো চোরার প্রধান কার্য্য। পৌরাণিক বা এ দেশের লোক ব্যাবহারিক পেঁচোর, অনিষ্টের, উৎপাতের, বৈসাদৃশ্যের ব্যঙ্গ বিদ্রূপ, বিঘ্ন

বিভীষিকা ও বীভৎসের কুটিলতা ও হিংসা দ্বেষের নানাবিধ স্বরূপ প্রযুক্ত হইয়া সংযুক্ত রহিয়াছে। স্বদেশের সামাজিক ইতর শ্রেণীর অতীত সংস্কার ও স্বাভাবিক বা চিরাভ্যস্ত ভাব-যোগের সঙ্গে সেগুলা অল্পাধিকপরিমাণে দৃঢ়বদ্ধও বটে। আধুনিক পেঁচো যদি আবশ্যকই হইয়াছিল, তাহার প্রহসনে অনুসরণ করিয়া ঐগুলার 'ক্যারিকেচার' ও 'কার্টুন' করিলে, হয় ত স্বাভাবিক ও সঙ্গত ও জনসাধারণের অধিকতর বোধগম্য হইত। সে কালে, বেশী নয়, ৩০।৩২ বৎসর পূর্ব্বে, 'পঞ্চানন' বিগ্রহের মূর্ত্তির পার্শ্বে পেঁচো চোরার মূর্ত্তি গঠিত হইয়া গৃহস্থবাড়ীতে পূজিত হইতে দেখা যাইত। এবং পঞ্চানন-মঙ্গলগানে, পেঁচো চোরার চৌর্য্যবৃত্তির ও নানান রকম দুষ্কৃতির নক্সাদার কাহিনী, গীত ও ছড়া শুনা যাইত। পেঁচো ছিল সূতিকা-গৃহের পরম শত্রু। সেই সূত্রেই তাহার লাঞ্ছনা ও পঞ্চানন ঠাকুরের অর্চ্চনা করা হইত। সূতিকাগারে বা তাহার বাহিরে শিশু রোগাক্রান্ত হইলে রোগের আরোগ্যের জন্য, রোগ না হইলেও রোগ হইতে রক্ষার জন্য, গৃহিণীগণ ঐ অনুষ্ঠান অর্থাৎ পঞ্চাননের পূজা ও গান 'মানসিক' করিতেন; এবং তদনুসারে যথাসময়ে উহা সম্পন্ন হইত। দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে, সম্ভবতঃ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বা স্থানীয় লোকাচারানুসারে এ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইত। এখনও সর্ব্বত্র, বোধ হয়, ইহা একেবারে বিলুপ্ত না হইয়াও থাকিবে। যাহা হউক, পেঁচো চোয়ালের প্রতিমা ও প্রহসন, এ দেশে কিছুই নূতন নয়; পঞ্চানন দেবের পারিবারিক পূজাঙ্গস্বরূপ উহার নক্সা, ছড়া ও গান পুরাতনপদ্ধতিগত হইয়া পালাকে পালা বিদ্যমান ছিল। উহার আধুনিক নকলটাই যা কিছু নূতন। নকলের নানা দোষ। 'পঞ্চানন্দ' নামক আধুনিক প্রহসন-সাহিত্যে বা ঐ নকলী নক্সার মূলেই একটা অতি গুরুতর ও অমার্জ্জনীয় অপরাধ দেখা যায় এই যে, উহাতে পঞ্চানন দেবতা ও পেঁচো চোরা প্রেতকে, কেবল একই পর্য্যায়ে নয়, একই অভেদ-স্বরূপে ও সত্তায় পরিণত করিয়া, একই দেহের অভিন্ন আত্মা করা হইয়াছে। 'পঞ্চানন্দ'-প্রবর্ত্তক ও পরিচালক অত্যুগ্র ধাতুর স্বধর্ম্ম-নিরত ও স্বদেশ-হিত-ব্রত হিন্দুগণের পক্ষে অন্ততঃ এমনতর অপরাধটা হওয়া উচিত হয় নাই। জানি না, তাঁদের জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে, অনাবধানতা বা অপর কোনও বিশিষ্ট ব্যবস্থা-মতে এরূপ ঘটিয়াছে কি না। ফলতঃ, অপরের পক্ষে যাহাই হউক, নকল-বিদ্বেষিগণের দ্বারা নিছক নকল, দেবতা-ব্রাহ্মণ-ভক্তদের পক্ষে দেবতার দুরন্ত অবমাননা, 'বিলাতী'-বৈরীদের দ্বারা বিলাতীর

আপাদমস্তক অর্চ্চনা, এবং স্বদেশাহঙ্কারী লোকাচারের ধ্বজ-পতাকাধারী ও অনবরত আসল-প্রচারীদের পক্ষে আত্মবিস্মৃত হইয়া লোকাচারের পৃষ্ঠে প্রচণ্ড পদাঘাত ও বিদেশজ জঘন্য বস্তুর নকলের লোভপরতন্ত্র হইয়া স্বদেশে জাত ও পুরুষপরম্পরাগত, পুরাতন এবং পুরাতন নিবন্ধন অল্পাধিক মাত্রায় পবিত্র ও প্রকৃত খাঁটী জিনিসের প্রত্যাখ্যান ও দুর্গতি যথার্থ বড় বিসদৃশ দেখায় ও লজ্জা ঘৃণার উদ্রেক করে।

সাহিত্যানুশীলন সভ্যদেশমাত্রেই, বিশেষতঃ সভ্যতা ও সর্ব্ববিদ্যার আকরস্থান য়ুরোপ আমেরিকায়, সর্ব্বত্র এখন অন্যান্য বিদ্যাবিষয়ক অসংখ্য সাময়িক পত্রের ন্যায় জনসাধারণকে নিয়মিতরূপে হাস্য কৌতুক রঙ্গ তামাসা যোগাইবার জন্য 'পঞ্চ' বা পঞ্চ-প্রকৃতির নানা নাম ও অভিধানের বহু সংখ্যক সচিত্র সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হইয়া থাকে। এক ইংলণ্ডে বা খাস লণ্ডনেই অনেকগুলি কৌতুকপ্রদ কমিক পত্র প্রচারিত হয়। ইহাদের সর্ব্বাগ্রগণ্য ও সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও শক্তিশালী, এমন কি, পৃথিবীর মধ্যে প্রথম ও প্রধান স্থানীয় কৌতুক পত্রিকা লণ্ডন 'পঞ্চ'। রাজনীতি ও সমাজনীতি প্রভৃতি গুরু বিষয়নিচয়ে গম্ভীর আলোচনার পথে 'লণ্ডন টাইম্‌স্' যেমন সর্ব্বপ্রধানতম ও প্রভূতশক্তিশালী দৈনিক সংবাদপত্র, কৌতুক-ক্ষেত্রে লণ্ডনের 'পঞ্চ'ও তেমনই সর্ব্বপ্রধান ও সবিশেষপ্রভাবশালী সাপ্তাহিক সচিত্র পত্র। শক্তি-ক্ষমতায়, মতামতের গুরুত্বে, ধনে ও সম্মানে, এই 'পঞ্চ' বোধ হয় 'টাইমসে'রই অব্যবহিত পরস্থানীয়। হাস্য-কৌতুকের কাগজ বলিয়া যে কেবল-মাত্র হাস্যকৌতুকপ্রদ হালকা পাতলা যৎসামান্য বিষয় বা রঙ্গ তামাসার তরল অকিঞ্চিৎকর প্রসঙ্গ ও আমোদের ইতর উপকরণ লইয়া ইহার কার্য্য কারবার, তাহা নয়। কৌতুকের দিক দিয়া, সাধারণতঃ সমগ্র পৃথিবীর ও বিশেষতঃ বহু-বিস্তৃত বৃটিশ সাম্রাজ্যের ও ইংরেজ-সমাজের যাবতীয় সাধারণ ব্যাপার, রাজনীতির গভীর ও জটিল প্রসঙ্গ, স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্রসংক্রান্ত নীতি, 'পলিসি' বা নিগূঢ় মন্ত্রণা, তথ্য ও তত্ত্বকথা; পরন্তু, সমাজরহস্য, লোকাচার, বিবিধ ব্যবহার-বাণিজ্য-বিষয়ক প্রশ্ন, সাময়িক সমস্যা; এবং তদ্ভিন্ন যাবতীয় শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও সুকুমারকলা-সম্বন্ধীয় সময়োপযোগী ও সমসাময়িক বিশেষ বিশেষ তত্ত্ব ইহাতে বিবৃত, চিত্রিত ও সমালোচিত হইয়া থাকে। কিন্তু, এখনই বলা হইয়াছে, এ সবই হয় কৌতুকের কক্ষ হইতে, কৌতুকছলে ও আমোদোদ্দীপনের কৌশলে। যে 'পলিসি' ও যে প্রসঙ্গ যতই প্রগাঢ় ও গুরুতর হউক, তাহা নক্সাদার ও

কৌতুককর করিয়া চিত্রে এবং গদ্য বা পদ্যময় সরস ও সংক্ষিপ্ত বাক্যে, 'পঞ্চ' তাহার বিষয় অঙ্কিত, বিবৃত ও সমালোচিত করিয়া, আত্মাভিমত প্রদান করেন। সময়ে সময়ে হাস্য কৌতুক কঠিন ব্যঙ্গ বিদ্রূপে গিয়াও দাঁড়ায়। রাজসভা, এমন কি, রাজ-সিংহাসন হইতে আরম্ভ করিয়া, রাজমন্ত্রী সম্প্রদায়, পার্লামেণ্টের 'মাননীয়' কুলীন ও মৌলিক লোক-পতিগণ সমষ্টি বা ব্যষ্টিভাবে, এবং তদ্ভিন্ন যিনি যত উচ্চপদস্থ, পদবীস্থ ও শক্তি-সম্ভ্রম ও সম্পদের অধিকারী হউন না, আবশ্যক স্থলে, সাধারণ কার্য্যের সম্বন্ধ-সংযোগ-সূত্রে, সকলকেই হাস্য কৌতুক ও ব্যঙ্গ বিদ্রূপের বিষয়ীভূত হইতে হয়। 'পঞ্চ' কাহাকেও ছাড়েন না; 'কার্টুনে'র নানা রকমের ও নব রসের কৌতুক-চিত্রে বিচিত্র চিত্রিত করিয়া, চর্চ্চিত ও চর্ব্বিত করিয়া, এবং বাছা বাছা বাক্যবাণে বিদ্ধ ক্ষত-বিক্ষত করিয়া 'তছনছ' করিয়া দেন। সভ্য স্বাধীন রাজ্যে, কেবল ইংলণ্ড, মার্কিন ও ফরাসী ভূমেই অবশ্য এমন সম্ভবে। তবুও এই অসমসাহসিক সমালোচনার ও ভীষণ ভাঁড়ামীর বোধ হয় একটা সীমান্তবিন্দু থাকিতে পারে, যাহা অতিক্রম ও উল্লঙ্ঘন করিলে বিপদে পড়িতে হয়; কিন্তু সেই সীমা-নির্দ্দেশক বিন্দু কিরূপ ও কোথায় কত দূরে অবস্থিত, তাহা আমরা রহস্যানভিজ্ঞ বিদেশীয় বাহিরের লোক আদৌ বুঝিতে ও বলিতে পারি না। যাহা দেখি, যে বিচিত্র বিপর্য্যয় ব্যাপার 'পঞ্চে'র পৃষ্ঠায় অবলোকন করি, তাহাতে আমরা অনন্ত-অধীন, আজন্ম-পর-পাদুকাবাহী ক্ষীণপ্রাণী—প্রায় প্রতি পদক্ষেপে-পেনাল আইনের অভিযোগ্য অপরাধী, আতঙ্কে আত্মহারা হই। স্বাধীন রাজ্যের ঐ সকল রস-রসিকতা দেখিয়া আমাদের কেবল হৃৎকম্পই হয়; তথাপি মনুষ্য বড় আত্ম-বিস্মৃত জীব। বিলাতী পঞ্চের ঐ সকল প্রচণ্ড প্রহসন ও অপরাপর বিলাতী পত্র পত্রিকার সুতীব্র অবাধ সমালোচন সর্ব্বদা পাঠ করিয়া আমাদের কেহ কেহ সময়ে সময়ে সংবিৎশূন্য হইয়া সাহসী হইয়া উঠি, ও উন্মাদের ন্যায় উহার এক আধ মাত্রা অভিনয় করিতে যাইয়া, আলোক-প্রলুব্ধ পতঙ্গবৎ সহসা জ্বলন্ত দীপ-শিখায় গিয়া পতিত হই।

পঞ্চের আলোচনা, উক্তি ও অভিমত কৌতুকের কক্ষ হইতে উত্থিত ও রঙ্গ তামাসার নানা রঙ্গে রঞ্জিত হইলেও, উহা রাজশক্তির, মন্ত্রি-সম্প্রদায়ের, প্রতিনিধি-সভার ও জনসাধারণের সবিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে। উহার প্রত্যেক পংক্তি ও প্রসঙ্গ-প্রকাশক চিত্রাবলী সযত্নে বিশ্লিষ্ট ও বিবেচিত হইয়া যথাসম্ভব ফলোৎপাদক হয়। উহার এমনই গুরুত্ব যে, উহা দ্বারা বিশাল সাম্রাজ্য-সৌধের

টনক নড়ে। সময়ে সময়ে উহা দ্বারা রাজনীতি প্রভাবিত ও মন্ত্রভবনের মন্ত্রণা ও কার্য্যকলাপাদি নিয়মিত হইয়া থাকে। সাধারণ মতের প্রতিনিধি ও প্রতিভাশালী পরিচালক-স্বরূপ উহা জনসাধারণকে চালিত ও উত্তেজিত করে; তাহা মতামত গঠন ও উদ্দীপন করিয়া, সাম্রাজ্য-শাসন-পলিসির ও প্রক্রিয়ার এবং বিধি-ব্যবস্থা-প্রবর্ত্তন ও সংশোধনের সহায়তা, সমর্থন বা প্রতিবাদ ও প্রত্যাখ্যান করে। উহার প্রভাব প্রতিনিধি-সভার নির্ব্বাচন ও মন্ত্রীদলের গঠন প্রভৃতি অতি গুরু ব্যাপার সকল সঞ্চালিত,—প্রসারিত, বা আকুঞ্চিত করে। সামাজিক ও ব্যাবহারিক ব্যাপার সকলেও উহার ঐরূপ প্রভাব। আমাদের পক্ষে, ইহা কেবল বিপুল বিস্ময়েরই বিষয় যে, হাস্য-কৌতুক-ভাঁড়ামী-উপজীবী একখানা কমিক কাগজের এত শক্তি ও এত প্রতিপত্তি!

খাস্‌-মুন্সীর নক্সা।

নবম অধ্যায়।

মহারাজার গদী পাইবার পূর্ব্বে যে সাহেব এখান হইতে বদলী হইয়া অন্য রাজ্যে গিয়াছিলেন, সেই বাবুসাহেব পুনরায় আসিয়াছেন। গদী দিবার সময় যে সাহেব উপস্থিত ছিলেন, তিনি চলিয়া গিয়াছেন। আমরা বাবুসাহেবের আগমন উদ্‌গ্রীব হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছি। শুনিয়াছি, তিনি একটু সৌখীন। তাহা ছাড়া, তাঁহাকে সকলে যেন একটু ভয় করে, এরূপ বোধ হইল। আমি ভাবিতেছি, দেখি, আমার সহিত কিরূপ ব্যবহার করেন।

কিছুদিন পরে তিনি আসিলেন। তাঁহার সহিত বিলাতের অতি সম্ভ্রান্ত-বংশীয় অপর একটী সাহেব সস্ত্রীক আসিয়াছেন। সাহেব মহাশয় রাত্রি ৮টার সময় আসিলেন। আমাদের নবীন মহারাজ অবশ্য তখনই গিয়া তাঁহাদের সহিত শিষ্টাচার ও মিষ্টালাপ করিয়া আসিলেন। পরদিন সময়মত আমিও গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। মনে প্রথম হইতে একটু যে সন্দেহ ছিল, তাহা আলাপ পরিচয়ের পর সম্পূর্ণ মিটিয়া গেল। দেখিলাম, বাবু বটে, তবে মেজাজ খুব নরম, এবং চরিত্রে যথেষ্ট সৌজন্য বিদ্যমান্। আমার প্রতি বিশেষ কৃপাদৃষ্টি পরিলক্ষিত হইল। স্কুল সম্বন্ধেও অনেক কথাবার্ত্তা হইল। আমায় নানারূপ উৎসাহবাক্যে তুষ্ট করিলেন।

দ্বিতীয় দিবস শিকারের মহাধুম পড়িয়া গেল। এ রাজ্যে ব্যাঘ্রের শিকার যথেষ্ট হইয়া থাকে। শিকারের আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা পরে দিবার ইচ্ছা রহিল। শুনিলাম, সম্ভ্রান্তবংশীয় সাহেবের পত্নী এক জন বিশিষ্ট শিকারী। মহারাজ শিকার করিতে সঙ্গে লইয়া গেলেন। সন্ধ্যার সময় এক বৃহৎ ব্যাঘ্র মারিয়া সকলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সাহেব-মহলে আজ মহা আনন্দ, বিশেষ সম্ভ্রান্ত রমণীর গুলি খাইয়া ব্যাঘ্রটি পপাত ধরণীতলে হইয়াছে।

পরদিন বেলা ৯৷১০ টার সময় আমার ডাক পড়িল। আমি ত ভাবিয়া অস্থির, এ হঠাৎ ডাক কেন? কোনও গোলযোগ ত নহে? সাহেবের নিকট যথাসময়ে উপস্থিত হইলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, বাবু, তোমার হাতের লেখা কেমন? আমি নিজে আর কি উত্তর দিব। বলিলাম, চলনসই বটে। তৎপরে একটু লিখিয়া দেখাইলাম। সাহেবের পছন্দ হইল। বলিলেন, 'দেখ, ব্যাঘ্র-শিকারের আমি কবিতা লিখিয়াছি। তোমায় দুই তিনখানি নকল করিতে হইবে।' এই বলিয়া মূল কাগজগুলি আমার হস্তে সমর্পণ করিলেন। পরদিন বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত সমস্ত নকলগুলির সময় দিলেন। কবিতাগুলি কতক পরিমাণে Doggerel বলিলেই হয়। সাহেব এক জন পাকা মুন্সী; কিন্তু মুন্সী হইলেই ভাল কবি হইবেন, তাহার কোনও নিয়ম নাই। অনেক দিনের কথা, সে কবিতার এক স্থল ব্যতীত আদবে মনে নাই। কবিতাগুলি ইংরাজী বর্ণমালার একটী একটী অক্ষর লইয়া coupletএ লিখিত। যথা:—

A is for Alice (আর মনে নাই)
G is for Gobra with pugree green.
Marshalls his men and cheers for the queen.

এইরূপ A হইতে Z পর্য্যন্ত ২৬ coupletএ সম্পূর্ণ। নমুনা উপরে দিলাম।

সাহেবের বৃদ্ধাবস্থা। কারণ, এখন তিনি Lt. colonel.। কবিতা-রচনা রূপ বিষম ব্যাপারে হস্তক্ষেপ কেন? অবশ্যই কোনও কারণ আছে। নবাগত সাহেবটি বিলাতীসমাজে অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ও ক্ষমতাশালী। সুতরাং তাঁহার পত্নীকে তুষ্ট করিবার জন্য কাব্য-দেবীর আহ্বান। ইহাতে অবশ্যই কোনও নিগূঢ় তত্ত্ব আছে। পাঠকগণ পরে জানিবেন। পরদিন আমার নিকট হইতে কাপী-গুলি লইয়া সস্ত্রীক নবাগত সাহেবের সহিত এজেণ্ট মহোদয় এখান হইতে প্রস্থান করিলেন।

নবীন মহারাজ সরকার হইতে রাজ্যশাসনের এখনও কোনও ক্ষমতা প্রাপ্ত

হন নাই। তবে কৌন্সিলে গিয়া বসেন। পুরাতন প্রধান দুই মেম্বরই সমস্ত কার্য্যই করিয়া থাকেন। আমার উপর এখন রীতিমত খাস-মুন্সীর কার্য্য-ভার পড়িয়াছে। সাহেবলোকদের প্রায়ই পত্রাদি লিখিতে হয়, এবং মধ্যে মধ্যে এজেণ্ট সাহেবকেও মহারাজ পত্রাদি লিখিয়া থাকেন। সে সমস্ত বিষয়ের লেখা-পড়া আমাকেই করিতে হয়। আকাশ সুনির্ম্মল, কোনও দিকেই মেঘের লেশ-মাত্র নাই। বেশ সুবাতাসও চলিতেছে। সমস্ত কার্য্যই বেশ সুশৃঙ্খলার সহিত হইতেছে। আমাদের পণ্ডিত ও ডাক্তার মহাশয়ের এখন আপাততঃ কোনও বিশেষ চিন্তা নাই; তবে একমাত্র ভবিষ্যৎ চিন্তা, কি করিয়া মহারাজকে প্রবল শত্রুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ করাইয়া গবমেণ্ট হইতে রাজ্যশাসনক্ষমতা দেওয়ান যায়। আমরা সকলেই এই সকল বিষয়ের কল্পনা জল্পনা সর্ব্বদাই করিয়া থাকি। আমরা কিছুমাত্র জানিতে পারি নাই যে, একটী ভয়ঙ্কর ঝঞ্ঝাবাত আগত-প্রায়। আমরা কিছুমাত্র জানিতে পারি নাই যে, মেম্বরদিগের মধ্য হইতে কেহ কেহ অতি গুপ্তভাবে এক মহা কঠিন চাল চালিয়া বসিয়াছেন, এবং নবীন মহারাজকে সম্পূর্ণরূপে অপদস্থ করিয়া সর্ব্বনাশসাধনে উদ্যত। এ চালে তাঁহারা কৃতকার্য্য হইলে অত্যন্ত অনর্থ ঘটিত, এবং নবীন মহারাজের রাজ্যশাসন-ক্ষমতা-প্রাপ্তির আশা একেবারে আকাশকুসুমবৎ হইয়া যাইত। মেম্বরদের মধ্যে একজন খাওয়াসের সহিত অতি গোপনে পত্রাদির চালনা আরম্ভ করিয়াছেন, এবং বৃদ্ধ স্বর্গীয় মহারাজের বিধবা পত্নীকেও এই পরামর্শে নিজদলভুক্ত করিয়াছেন। বিধবা রাণীকে কিরূপে নিজদলভুক্ত করিয়াছিলেন, তাহা আমি অবগত নহি; তবে বোধ হয় তিনি একটু হিংসাপরবশ হইয়া এ কার্য্যে সম্মতি দিয়া থাকিবেন। ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। মহারাজ তাঁহার গর্ভজাত সন্তান নহেন।

শুনিলাম, 'খাওয়াস'কে এরূপ লেখা হইয়াছে যে, তোমার প্রণয়াস্পদ এখন নবীন রাজা; তুমি এখানে এখন চলিয়া আইস। আমরা কৌনসিলের মেম্বরগণ তোমার সাহায্যে ও পরিচর্য্যায় সতত প্রস্তুত আছি ও থাকিব। রাজমাতারও এ বিষয়ে সম্মতি আছে। অতএব তুমি কোনও বিষয়ে সন্দেহ না করিয়া এখানে নিঃশঙ্কচিত্তে চলিয়া আসিবে। লেখক মহাশয় পাকা লোক। পত্রগুলি স্বহস্তে লেখেন নাই। অনুগত এক কর্ম্মচারীর দ্বারা উল্লিখিত মর্ম্মে লিখাইয়া লোক মারফৎ সেই স্ত্রীলোকটীর নিকট পাঠাইতে আরম্ভ করেন।

শীতকালে সাহেব পুনরায় এখানে আসিলেন। তিনি যে দিবস আসিয়া

পঁহুছিলেন। তাহার পরদিবস নগরে মহা হুলুস্থূল পড়িয়া গেল। চতুর্দ্দিকে এই রব—'খাওয়াস আসিতেছেন।' গভমেণ্ট বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু নবীন মহারাজ জেদ করিয়া তাহাকে আসিতে লিখিয়াছেন। তজ্জন্য তিনি আসিতেছেন। অথচ নবীন মহারাজ বেচারী এ বিষয়ের বিন্দু বিসর্গও অবগত নহেন। এ রাজ্যের কিছু দূরে একটী প্রধান স্থলে সেই স্ত্রীলোকটী আসিয়া পঁহুছিলে, তাহার আগমনবার্ত্তা এজেণ্ট সাহেব ও মহারাজের কর্ণগোচর হইল। নবীন মহারাজ সংবাদ শুনিয়া অবাক্! তিনি ভয়বিহ্বলচিত্ত কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মস্তকে যেন অকস্মাৎ বজ্রপাত হইল। ও দিকে সাহেব এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া একেবারে উগ্রমুর্ত্তি ধারণ করিলেন, এবং কৌন্‌সিলের প্রধান সদস্যগণকে ডাকিয়া তদন্ত করিলেন। তাঁহারা এরূপ প্রকাশ করিলেন যে, তাঁহারা এ বিষয়ের কিছুই অবগত নহেন। উত্তর শুনিয়া নগরে যে রব উঠিয়াছিল, সেই সন্দেহটি সাহেবের মনে একেবারে বদ্ধমূল হইয়া গেল। অথচ নবীন মহারাজ বেচারী সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। কুচক্রীরা তাঁহাকে বিলক্ষণ বিপদজালে ফেলিয়া দিল। এ রাজ্যের সীমান্ত-প্রদেশে যে সকল পাহারা আছে, তাহাদের নিকট দ্রুত সংবাদ প্রেরণ করা হইল, তাহারা যেন খাওয়াসকে এ রাজ্যের সীমার ভিতর আসিতে না দেয়। এক মহামারী ব্যাপার উপস্থিত।

উল্লিখিত আজ্ঞা প্রচার হইবার পর স্ত্রীলোকটা যেখানে অপেক্ষা করিতেছিল, তথায় মেম্বর পক্ষের এক গুপ্তচর গিয়া বলিয়া আসে, সে যেন আপাততঃ সেই-খানেই অপেক্ষা করে। সুতরাং খাওয়াস পরশুরামের স্বর্গবাসের ন্যায় সেই-খানেই রহিলেন। ইতিমধ্যে মেম্বর-পক্ষীয় কোনও লোক রমণীকে গিয়া শিখাইয়া আসিল যে, তুমি রাজাকে বলিয়া পাঠাও যে, 'আমি পথের ধারে আর কতদিন এরূপ ভাবে পড়িয়া থাকিব? হয় আমাকে গ্রহণ কর, এবং ডাকিয়া লও, নচেৎ আমি তোমার আশা ত্যাগ করিয়া নিজের পথ দেখি ও পর্দ্দা হইতে বাহির হই। তুমি আমার নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, তজ্জন্য তোমার নিকট আসিয়াছি। তুমি আমায় গ্রহণ না করিলে আমার পর্দ্দায় থাকিবার আবশ্যকতা কি?'

পর্দ্দা হইতে বাহির হইবার কথা শুনিয়া রাজবাটীতে নবীন মহারাজ অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল শুষ্ক হইয়া গেল। অশেষবিধ কষ্ট পাইয়া পরে গদী পাইয়াছেন; চতুর্দ্দিক শত্রু-বেষ্টিত। এ অগ্নিকুণ্ড কে জ্বালিল? তাহা তিনি কিছুই জানেন না। সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ মনুষ্য হঠাৎ বিপদে পড়িলে যেরূপ দিশাহারা হয়, নবীন মহারাজ পর্দ্দা হইতে বাহির হইবার কথা শুনিয়া

তদ্রূপ হইলেন। শরীর পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল। লোকে মহারাজকে যতই বুঝাইতে লাগিল যে, আপনি একটু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উহাকে ফিরিয়া যাইতে আজ্ঞা দিলেই সে চলিয়া যাইবে, ততই মহারাজ সে পর্দ্দা হইতে বাহির হইবে বলিয়া চঞ্চলচিত্ত হইতে লাগিলেন। নিতান্ত অস্থির হইয়া বলিলেন, 'পর্দ্দা হইতে বাহির হইলে আমাদের সকলকার নাক কাটা যাইবে। ইহা কখনই হইতে পারে না। আমি জীবিত থাকিতে ইহা কখনই হইতে দিব না। সাহেবকে তোমরা সকলে মিলিয়া অনুরোধ কর। উহাকে আসিতে দাও। রাজবাটীর কোনও অংশে নগণ্যভাবে না হয় পড়িয়া থাকিবে। অথবা আমার রাজ্যে কোনও দুর্গমধ্যে উহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখ।'

মহারাজের এই চিত্তচাঞ্চল্য দেখিয়া সেই কুলটার নিকট হইতে পর্দ্দা-ভীতি দেখাইয়া ঘন ঘন লোক আসিতে লাগিল। সময় বুঝিয়া যে মেম্বর এই বীভৎস কাণ্ড করিয়াছিলেন, তাঁহার অনুচরেরা মধ্যে মধ্যে মহারাজের নিকটে গিয়া করযোড়ে বলিতে লাগিল, 'অন্নদাতা! পর্দ্দা হইতে বাহির হইলে এই নিষ্কলঙ্ক রাজপুত-বংশে মহা কলঙ্ক স্পর্শ করিবে।' মহারাজ এই সকল কথা শুনিয়া ভয়ে ও চিন্তায় বিহ্বল হইতে লাগিলেন। আমাদের ছুটাছুটি করিয়া প্রাণান্ত হইতে লাগিল। পাচক দাদা ও অন্য দুটী উপগ্রহ এখন নবীন মহারাজের নিকট আবার আসিয়াছেন। তাঁহাদের এখন ভয় হইল, যদি এই কুলটা আসে, তাহা হইলে মহারাজ আর কোনও মতেই কোনও কালে রাজ্যশাসনক্ষমতা পাইবেন না। চিরকাল বিষমশত্রু মেম্বরদের পদানত হইয়া থাকিতে হইবে। তাহারাও নানারূপে মহারাজকে সাহস দিয়া তাহা বুঝাইতে লাগিল।

রাজবাটীতে ত এই বিষম গোলযোগ। ও দিকে সাহেব যদি ক্রুদ্ধ হইয়া সরকার বাহাদুরকে রিপোর্ট করেন, তাহা হইলেও অত্যন্ত বিপদ। উকীল মহাশয় সাহেবকে প্রকৃতিস্থ রাখিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। কঠিন সমস্যা উপস্থিত। ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারি না। দুই দিন কাটিয়া গেল। কি করা যায়, কি উপায় অবলম্বন করিলে এ বিপদ হইতে উদ্ধার হইতে পারা যায়? নানারূপ পরামর্শ হইতেছে। কিন্তু কিছুই স্থির হইতেছে না। দুই দিবস অত্যন্ত দুর্ব্বিষহ চিন্তায় কাটিল। শত্রুপক্ষীয়দের মধ্যে দিব্য আনন্দধ্বনি হইতেছে। তাঁহারা ভাবিতেছেন, যে ব্রহ্মাস্ত্র চালাইয়াছেন, তাহা একেবারে অকাট্য হইয়াছে। মহারাজ এইবার নিশ্চয়ই জীবনে মৃত হইবেন।

পুনরায় দুর্নাম হইলেই ক্ষমতা-প্রাপ্তির আশা একবারে নির্ম্মূল হইয়া যাইবে। রাজগদীতে তিনি পুত্তলিকাবৎ থাকিবেন।

ভগবানের লীলা অপার। রাখে কৃষ্ণ মারে কে? তিনি যাহাকে রক্ষা করিতে ইচ্ছুক, কাহার সাধ্য তাহাকে মারে? পূর্ব্বে বলিয়াছি, খাওয়াসের সহিত পত্রাদির চালনায় বিধবা রাণীর সম্মতি ছিল। এই সময়ে মেম্বর একখানি পত্র লিখাইয়া কোনও স্ত্রীলোক মারফৎ রাজমাতাকে দেখাইবার নিমিত্ত তৃতীয় দিবস তাঁহার নিকট পাঠান। রাণীর তখন স্নান করিবার সময়। তিনি পত্রখানি পাঠ করিয়া যে আসনে বসিয়াছিলেন, তাহারই নিম্নে লুকাইয়া রাখিয়া স্নান করিতে গমন করেন। প্রায় সমস্ত দেশী রাজ্যে রাজান্তঃপুরে ভিতর বাহিরের খবরাখবরের জন্য কতকগুলি ক্লীব ভৃত্য থাকে। এ রাজ্যেও তদ্রূপ। ক্লীব ভৃত্যদিগের মধ্যে এক জন গোপনে এই ব্যাপার দেখিতে পায়। সৌভাগ্য-বশতঃ সে মহারাজের পক্ষে। পত্রখানি গোপনে হস্তগত করিয়া সে মহারাজের হস্তে সমর্পণ করে। মহারাজ পাঠ করিয়া পাচক দাদার হস্তে আমাদের নিকট পাঠাইয়া দেন। আমরা তখন জানিতে পারি, ভিতরে কি কাণ্ড হইতেছে। উকীল সাহেবের দ্বারা এখন সমস্ত ব্যাপার এজেণ্ট মহোদয়কে জানান হইল।

উকীল সাহেব পত্রের মর্ম্ম সাহেবের গোচর করিয়া বলিলেন যে, এখন বিলক্ষণ প্রমাণিত হইতেছে, মেম্বর মহাশয়রাই সকল উৎপাতের মূল। সময় ও সুবিধা বুঝিয়া ইহাও বলিলেন যে, মহারাজের কোনও দোষ নাই, তিনি এ গোলযোগে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। যৌবনসুলভ চাপল্যবশতঃ তিনি যাহা একবার করিয়াছিলেন, তজ্জন্য এখন অত্যন্ত অনুতপ্ত। তাঁহার প্রতি অযথা সন্দেহ করা হইয়াছিল। তবে আত্মমর্য্যাদা ও রাজপুতের জাতীয় মর্য্যাদার জন্য কলঙ্কের হাত এড়াইবার নিমিত্ত তিনি এরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, খাওয়াসকে হয় রাজবাটীতে আনিয়া রাখ, নচেৎ কোনও দুর্গমধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখ। পত্র দ্বারা বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইতেছে যে, ঐ স্ত্রীলোকের আগমন সম্বন্ধে মহারাজ কিছুই অবগত নহেন। মহারাজের নির্দ্দোষিতা সাহেবকে মানিতে হইল। কৌন্সিলের প্রধান সভ্যদ্বয়কে ডাকিয়া সাহেব একটু কর্কশভাবে বলিলেন, 'দেখ, আমি তিন দিন ধরিয়া ক্রমাগত বলিয়াছি, "খাওয়াস যাহাতে ফিরিয়া যায়, তাহার ব্যবস্থা শীঘ্র কর।" তোমরা আমার কথায় কর্ণপাত করিতেছ না। আমার জন্য ডাক বসাইয়া দাও, আমি এই মুহূর্ত্তে এ রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া গিয়া গব-

মেণ্টকে রিপোর্ট করিব যে, কৌন্সিলের সদস্যবর্গ আমায় কোনও বিষয়ে সাহায্য করেন না। যদি নিজের মঙ্গল চাহ, অদ্যই সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যেন 'খাওয়াসে'র চলিয়া যাইবার সংবাদ পাই।'

সদস্য মহারাজদের এখন জ্ঞান হইল। তাঁহারা দেখিলেন, রজ্জু আর বেশী টানিলে ছিন্ন হইবার সম্ভাবনা। তাঁহাদের গুপ্তচর খাওয়াসকে গিয়া বুঝাইয়া আসিল, আর বেশী টানাটানি করিও না; সাহেব ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। তুমি এখন ফিরিয়া যাও। এখন আর সুবিধা নাই। তোমার পক্ষে আমরা সকলেই আছি, এবং সময়মত বিধিমতে তোমার সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি ও রহিলাম। সুবিধা হইলেই পুনরায় তোমায় সংবাদ দিয়া এখানে আনয়ন করিব। এই দলের পরামর্শে তিনি আসিয়াছিলেন। এখন তাঁহাদের পরামর্শে তিনি যাইতে প্রস্তুত। পরদিবস যাত্রা করিলেন। এবার সাহেবের পরামর্শে মহারাজের সম্পর্কীয় একটী নিকট কুটুম্ব ও ফৌজের এক জন উচ্চ কর্ম্মচারী তাঁহার সঙ্গে গিয়া গন্তব্য-স্থানে তাঁহাকে পঁহুছাইয়া আসিলেন।

গন্তব্যস্থানে পঁহুছিবার পর খাওয়াসজী এক তাড়া পত্র ফৌজের কর্ম্মচারীকে দিয়া বলিলেন যে, মহারাজকে এই পত্রগুলি দিয়া বলিবে, আমি স্বইচ্ছায় আসি নাই। তাঁহার উচ্চ কর্ম্মচারীরা আমায় ঘন ঘন যাইবার জন্য লিখিয়াছিলেন বলিয়া আমি গিয়াছিলাম।

খাওয়াসের যাইবার পর সাহেব জেলার কর্ত্তৃপক্ষকে পত্র লিখিয়া দেন, যেন ভবিষ্যতে সেই স্ত্রীলোক সেখানকার কর্ত্তৃপক্ষ অথবা পুলিসের অগোচরে সে নগর ত্যাগ করিতে না পারে। এই ব্যাপারের পর খাওয়াস কিছুদিন জীবিত ছিল; কিন্তু আর কখনও এখানে আসিবার চেষ্টা করে নাই। এখন সে স্বর্গে না নরকে, তাহা বলিতে পারি না। তবে ইহজগতে আর নাই। তাহার ফিরিয়া আসিবার পর সাহেব এখান হইতে চলিয়া গেলেন। তদবধি এ নাটকের শেষ।

উপরি-উক্ত ঘটনার কিছুদিন পরে সাহেব পুনরায় আসিলেন। এবার চির-বিদায় লইতে। এখন তিনি ভারত হইতে আট মাসের অবকাশ লইয়া বিলাত গমন করিতেছেন। পরে তথা হইতে ভারতের কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অন্য এক মহাপ্রদেশে এক অতি উচ্চপদে অভিষিক্ত হইয়া যাইবেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই, উচ্চপদলাভ সেই সম্ভ্রান্তবংশীয় ইংরাজ, যাঁহার উল্লেখ পূর্ব্বে করিয়াছি, তাঁহারই কৃপার কারণ। আমার স্কুলটি শেষ পরিদর্শনার্থ আসিলেন। বালকদিগের উৎসাহার্থ পারিতোষিক দিয়া গেলেন।

দুই দিবস এখানে অবস্থিতির পর এই বাবু সাহেব চিরকালের জন্য ভারত পরিত্যাগ করেন। এখন তিনি ইহজগৎও ত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার দয়া ও সৌজন্য এ রাজ্যের সমস্ত কর্ম্মচারীর হৃদয়পটে বিশিষ্টরূপে অঙ্কিত রহিয়াছে।

বিবাহে চ ব্যতিক্রমঃ।

১

ফণিভূষণ ষোল বৎসর বয়সে মাইনার স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠিয়া কেশের পারিপাট্যে মনঃসংযোগ করিল। তাহার কালো কেশের মাঝে লম্বা সিঁথি দেখিয়া রমণীসমাজ তাহাকে কার্ত্তিক বলিয়া ভ্রম করিলে তাহার আনন্দের সীমা থাকিত না। সে তাহার পড়া ছাড়িয়া কাগজ কলম লইয়া কবিতা লিখিতে বসিত, এবং সেই কবিতায় চাঁদের আলো, কোকিল পক্ষীর গান, ভ্রমরের গুণগুণানি ও বিরহীর ফোঁস্ফোঁসানী এত অধিকমাত্রায় থাকিত যে, তাহা পাঠ করিয়া তাহাদের গ্রামের গুরুমহাশয় নরহরি সরকার বলিয়াছিলেন, 'এ ছেলে বেঁচে থাক্‌লে কালে ভারতচন্দোরকে ঝক্ মারবে।' সুতরাং ফণিভূষণ বিবাহের জন্য হঠাৎ ক্ষেপিয়া উঠিবে, ইহা বিচিত্র নহে।

ফণি পিতৃমাতৃহীন বালক। শৈশব কাল হইতে পিসীমা তাহাকে মানুষ করিয়াছিলেন—সে পিসীমাও গত। ফণির পিসী ফণিকে ছেলের মত দেখিত, ফণি সেই অপত্যহীনা বন্ধ্যার অপত্য-স্নেহের ক্ষুধা পূর্ণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। মায়ের মত আদর যত্ন পাইয়া সে মায়ের অভাব ভুলিয়াছিল। সেই পিসীমার মৃত্যুতে সে জগৎ অন্ধকার দেখিল। ফণির মাতামহী বর্ত্তমান; কিন্তু তিনি অন্য কন্যার সংসারে প্রতিপালিতা। ফণি সেখানে মধ্যে মধ্যে যাইত, এবং দিদিমার ও মাসীমার স্নেহযত্নে পিসীমার কথা ভুলিবার চেষ্টা করিত। কিন্তু তাহার হৃদয়ের হাহাকার দূর হইত না। তাহার দিদিমা একদিন বলিলেন, 'ফণে, বিয়ে কর্‌বি?'

ফণি বলিল, 'পাগলা ভাত খাবি? না, হাত ধোবো কোথা? বিয়ে দিয়ে দেখ না, আমি বিয়ে কর্ত্তে পারি কি না!'

দিদিমা বলিলেন, 'বৌকে ভালবাস্‌তে পারবি? বৌ কাঁদ্‌লে চোখের জল মুছিয়ে দিতে পার্‌বি?'

ফণি বক্ষঃস্থল প্রসারিত করিয়া নবোদ্গত গুম্ফরেখা মর্দ্দনপূর্ব্বক বলিল, 'খু—উ—উ—ব—দেখ দিদিমা, ভালবাসার কথা যদি বল, ত সে দিন আমি যে পয়ারটা লিখেছি, তা শুন্‌লেই সব বুঝ্‌তে পারবে! আমার পকেটেই আছে—পড়ি শোন,—

"ভালবাসি আমি তারে
ভালবাসি প্রাণ ভোরে ;
বাঁধিয়াছি বাহু-ডোরে—
নয়নে নয়নে রাখি।
তারে না দেখিলে পরে,
ঝর-ঝর ঝরে আঁখি।
ওরে, আমার পরাণ-পাখী!
তোরে, নয়নে নয়নে রাখি।"

বুঝ্‌লে দিদিমা, "ভালবাসি" মানে জান ত?'

ইতিমধ্যে ফণির মাসী হরিপ্রিয়া আসিয়া বলিল, 'ফাজিল ছোঁড়া, দিদিমাকে ভালবাসার মানে জানাতে এসেছ? বেহায়া ভূত!'

দিদিমা হাসিয়া বলিলেন, 'ও একটা পেত্নী জুটিয়ে দিতে বল্‌ছে। হরিপ্রিয়া, ফণির জন্যে একটা টুক্‌টুকে মেয়ে খোঁজ্‌ না, মা!'

হরিপ্রিয়া অভিমানভরে বলিল, 'আমাদের মেয়ে খুঁজ্‌তে হবে কেন? ওর পিসীই ত সেবার 'গঙ্গাচ্ছ্যান' করতে গিয়ে পলাশীপাড়ার মহেশ মণ্ডলের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে ঠিক করে রেখে এসেছে!—ফণে সেই মেয়ে বিয়ে করুক গে।'

ফণি বলিল, 'মাসীমা, পিসীমা ত নেই, তা যা কর্‌তে হয়, তুমিই কর। মাও যে, মাসীও সেই। তুমি আর দিদিমা যা করবে, তার উপর কি কেউ কথা বল্‌তে পারবে? সাধ্যি কি?—আমার কর্ত্তা মা আছে, বাবার সৎমা বৈ ত নয়, আমার উপর তার কি 'দুখ্‌দরদ' হবে? তার কথা ছেড়ে দাও; তোমরাই ঠিক কর।'

হরিপ্রিয়া হাসিয়া বলিল, 'একবারে বিয়ে বিয়ে করে ক্ষেপ্‌লি! তোর মেসো মশাশয় বলেন, "ফণেটা ভারি বিয়ে পাগ্‌লা হয়েছে"!'

ফণি বলিল, 'মাসীমা, বিয়ে পাশ না করলে আজকাল আর কেউ পোঁছে না। আমাকে মানুষ হতে হবে ত? লোকে যে শেষে বকাটে বাহাত্তুরে ব'লে চোক রাঙ্গাবে, তা আমার সহ্য হবে না; তার চেয়ে আমি পাঁচটা বিয়ে করতে

রাজি!—আমাদের সাইকেল্ রেশ্ আছে, এখন আসি, মাসীমা! দিদিমা, পিসেমশাইকে পাঠিয়ে দেব?'

দিদিমা বলিলেন, 'দিস্ সন্ধ্যায়।'

২

ফণির পিসীহীন পিসে শ্রীযুক্ত গোবর্দ্ধন দাস কবিচিন্তামণি ফণির পিতৃগৃহে ঘরজামাই-গিরি চাকরী করিতেন; অর্থাৎ, ফণির পিতামহ স্বর্গীয় মহাদেব পালের 'ইষ্টাটে'র ম্যানেজার ছিলেন। ক্ষুদ্র সম্পত্তি; মহাদেব পাল সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করিলে, তাঁহার দ্বিতীয় সংসার নিঃসন্তান বচাননী (ডাক্‌নাম বুঁচি, নাসিকার হ্রস্বতাবশতঃ) তাঁহার উইল অনুসারে নাবালক ফণির অভিভাবিকা নিযুক্তা হন, এবং সপত্নীর জামাতা গোবর্দ্ধনকে বিদায় দান করিয়া স্বীয় সহোদর স্বরূপচাঁদকে ম্যানেজারীতে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হন। কিন্তু সে সময় ফণির পিসী কাত্যায়নী জীবিতা ছিলেন। সে তাহার বিমাতাকে এরূপ কতকগুলি অপ্রিয় কথা শুনাইয়াছিল যে, বচাননীকে অগত্যা সেই সাধু সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে হইল। কাত্যায়নীই সংসারের কর্ত্রী ছিলেন; তাঁহার বিমাতার বয়স তাঁহার বয়স অপেক্ষা অল্প ছিল। পিতা কন্যার বশীভূত ছিলেন; সুতরাং বিমাতা তেমন মাথা তুলিবার সুবিধা পাইতেন না।

কাত্যায়নী কিছু দিন পূর্ব্বে দশহরার গঙ্গাস্নান উপলক্ষে পলাশীপাড়ায় গিয়াছিলেন। সেখানে তাহাদের কুটুম্ব ছিল। তাহার মাসতুত ভগিনীর ভাসুর মহেশ মণ্ডলের মেয়ে সুকুমারীকে দেখিয়া তাঁহার এতই ভাল লাগিয়াছিল যে, যোগের সময় নদীতে স্নান করিতে নামিয়া এক-গলা জলে দাঁড়াইয়া মণ্ডল-পত্নীর সহিত কেবল 'গঙ্গাজল' পাতাইয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, তাহাকে দিয়া প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইয়াছিলেন, ফণির সঙ্গে সুকুমারীর বিবাহ দিবে। সুন্দরী মেয়েটি পাছে হাতছাড়া হয়, এই ভয়েই তিনি এই উপায়ে মেয়েটিকে হাতে রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাহার পর গঙ্গাজলকে 'বেয়ান' বলিয়া মনের সাধ মিটাইনে, এই আশা করিয়া তিনি বাড়ী ফিরিয়া গেলেন। কিন্তু তিন মাস না যাইতেই কাত্যায়নী মনের সাধ অসম্পূর্ণ রাখিয়া পরলোকে যাত্রা করিলেন। মৃত্যুকালে স্বামীকে বলিয়া গেলেন, ফণির আপনার বল্‌তে আর কেউ নেই,—তুমি ওকে দেখো, আর পলাশীপাড়ার মহেশ মণ্ডলের মেয়ের সঙ্গে ওর বিয়েটা দিও। আমি 'সত্তিবন্দি' হয়ে আছি।'

গোবর্দ্ধন দাস কবিচিন্তামণি কোঁচার খুঁটে আর্দ্রচক্ষু মুছিয়া ভাবি

গলায় বলিল, 'তা হবে! এখন আমিই কোথায় যাই, তার ঠিক নেই, তুমি ত গেলে, আমাকে একেবারে অকূল পাথারে ভাসিয়ে চল্লে!'

কাত্যায়নী বলিল, 'আমার গহনাগুলা ফণির বৌ এসে পর্‌বে। আমার ছেলে থাক্‌লে ত তার বৌ পরতো, ফণিই আমার পেটের ছেলের মত।'

কবিচিন্তামণি বলিল, 'বিকারের ঘোরে প্রলাপ বক্‌চো! নকড়ি কবরেজ আট গণ্ডা পয়সা ঠকিয়ে নিয়ে গেল, ওষুদে কোনও ফল হলো না।' সেই দিন সন্ধ্যাকালে কাত্যায়নীর মৃত্যু হয়।

৩

সন্ধ্যার সময় ফণির দিদিমার সহিত দেখা করিতে আসিয়া কবিচিন্তামণি প্রথমে নিজের সময়াভাব, হাত পোড়াইয়া রাঁধিয়া খাওয়ার অসুবিধার ও সাংসারিক অবস্থার বিস্তারিত আলোচনা করিয়া পরে তাঁহাকে জানাইয়া রাখিল, সে 'ছিবিন্দাবনে' গমন করিয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিবে; সংসারে আর তাহার সুখ কি? ফণির বিবাহ দিয়াই সে তাহার দোকানপাট তুলিবে।

ফণির দিদিমা বলিলেন, 'না; তুমি না থাক্‌লে কি চলে? ফণির কর্ত্তামা অবুঝ মেয়েমানুষ; তুমি না থাক্‌লে সংসারটা পাঁচ ভূতে লুটেপুটে খাবে। ফণি সাবালক হোক, বিষয় হাতে নিক, তার পর তুমি মক্কায় গেলেও আমরা কোনও কথা বলবো না।'

গোবর্দ্ধন বলিল, 'তা আপনারা আছেন, ফণির একটা বিয়ে দিয়ে দিন না। মেয়ের ত আর অভাব নেই, এমন ছেলে হাজারে একটা পাওয়া যায়; ফণি আজ কাল যে রকম পয়ার লিখচে, তা দেখে সরকার মশায় বলেছেন, কালে ফণি রায়গুণাকরের উপর যাবে।'

ফণির দিদিমা বলিলেন, 'সেই জন্যেই ত তোমাকে ডেকেছি। তোমার খোঁজে ভাল মেয়ে নেই?'

গোবর্দ্ধন বলিল, 'হাঁ—ইয়ে—তা, দেখুন মাউইমা, ফণির পিসী কি বলে—ঐ পলাশীপাড়ায় একটা মেয়ে পছন্দ করে' রেখে' এসেছিল। সে মেয়েটী শুনিছি মন্দ নয়।'

ফণির দিদিমা বলিলেন, 'সেই মেয়েটিই না হয় দেখ। আর দেরী করে' ফল কি? এই মাসেই ল্যাঠা চুকিয়ে দাও।'

গোবর্দ্ধন বলিল, 'আপনি সে মেয়ে দেখেছেন?'

ফণির দিদিমা বলিল, 'হাঁ, সে মেয়ে আমার দেখা আছে। সে যে আমার বোনের দেওর-ঝির মেয়ে! তুমি দেখতে যাও।'

গোবর্দ্ধন বলিলেন, 'আমার যাওয়া না যাওয়া সমান; পনের দিনের মধ্যে আমার নড়বার শক্তি নেই; এক জন প্রজার নামে তিন আনা সাড়ে আঠার গণ্ডার দাবীতে, এক জনের নামে দু আনা সাড়ে সাত গণ্ডার দাবীতে, আর এক নম্বর সাড়ে তের পাইর দাবীতে নালিশ রুজু করেছি। মামলার দিন নিকট। পার্ব্বতীবাবু কেবল আমার খাতিরে এক এক টাকা উকীল-ফি নিতে রাজী হয়েছেন।' গোবর্দ্ধন কবিচিন্তামণি মামলা মোকর্দ্দমা ফেলিয়া মেয়ে দেখিতে পলাশীপাড়ায় যাইতে অসম্মত হইল।

ফণিভূষণ পিসে মহাশয়ের আক্কেল দেখিয়া হাড়ে চটিয়া গেল; তাহার বিবাহ অপেক্ষা মামলাই বড় হইল? সে একদিন প্রভাতে তাহার পিতামহীর নিকট পাঁচ টাকা চৌদ্দ আনা লইয়া গরুর গাড়ীতে পলাশীপাড়ায় যাত্রা করিল।

পলাশীপাড়ায় ফণিভূষণের এক মাস্‌তুত ভাই বাসনের দোকান করিত। সে তাহার বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করিল। তাহার দাদা ভূতনাথ তাহাকে দেখিয়া বড় খুসী। অনেক দিন পরে ফণির সহিত সাক্ষাৎ, কিন্তু ভূতনাথ ফণির আকস্মিক আবির্ভাবের কারণ বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'চিঠি চাপাটী লেখা নেই, হঠাৎ কি মনে করে' এলি বল দেখি?

ফণি কোঁচার অগ্রভাগ দ্বারা তাহার বার্ণিশ জুতার ধুলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে বলিল, 'গঙ্গাস্নান করতে এলাম দাদা! আসবার ত কথা ছিল না, তাই চিঠি চাপাটি লিখি নি।'

ভূতনাথ বলিল, 'তোর ঠাকমার সঙ্গে ঝগড়া টগ্‌ড়া করে আসিস্‌ নি ত?'

'উঁহু' বলিয়া ফণিভূষণ নতমস্তকে জুতার ফিতে খুলিতে লাগিল।

সমস্ত রাত্রি গরুর গাড়ীতে পথে কাটিয়াছিল; মেঠো পথে হট্টর হট্টর করিয়া সারা রাত্রি গাড়ী চলিয়াছিল। ফণি রাত্রে ঘুমাইতে পারে নাই। বার ক্রোশ পথ গরুর গাড়ীতে পড়িয়া থাকায় ঝাঁকুনীর চোটে তাহার সর্ব্বাঙ্গে বেদনা হইয়াছিল; স্নানাহারের পর সে কয়েক ঘণ্টা ঘুমাইয়া শরীর জুত করিয়া লইল। অপরাহ্নে ভূতনাথের স্ত্রী ভবসুন্দরী তাহাকে একবাটি মুড়ী, গণ্ডা দুই নারিকেলের নাড়ু, খানিক ক্ষীর ও দুইটি রসগোল্লা জল খাইতে দিয়া বলিল, 'ঠাকুরপো! অজ-পাড়াগাঁয়ে এসেছ, এখানে ত ভাল জলখাবার কিছু মেলে না, যা জুটলো, দিলাম; বাড়ী গিয়ে নিন্দে টিন্দে করো না।'

ফণিভূষণ গব্যঘৃতবাসিত টাটকা মুড়িগুলি চর্ব্বণ করিতে করিতে বলিল, 'এ ত আর পরের বাড়ী নয় বৌ-দিদি। মধ্যে মধ্যে আমাকে এখন আসতেই হবে যে!'

ভবসুন্দরী বিস্মিত হইয়া বলিল, 'সে আমাদের ভাগ্যি! তোমার ত নিত্যি আসবারই কথা। আসো না, এই জন্যেই দুঃখ হয়। তা 'গঙ্গাস্নান' ত এত কালও ছিল, হঠাৎ মা গঙ্গার উপর এত ভক্তি উথলে উঠ্‌লো যে?'

ফণি বলিল, 'বৌদি, বাড়ীর সকলে আমাকে ধরে' বেঁধে পাঠিয়ে দিলে; আমি কিছুতেই আস্‌তে রাজী হইনে দেখে ঠেলে গুঁজে গোরুর গাড়ীতে তুলে দিলে, তখন আর না এসে করি কি?'

ভবসুন্দরী বলিল, 'মতলবটা কি শুনি?'

ফণি বলিল, 'একটা মেয়ে দেখতে আসা গেল বৌদিদি!'

ভবসুন্দরী বলিল, 'ও আমার কপাল! এতক্ষণ কথাটা বলতে হয়! বুঝেছি এখন; ও পাড়ার মহেশ মণ্ডলের মেয়ের সঙ্গে সে বছর তোমার পিসীমা বিয়ের কথা বলে' গিয়েছিল বটে। সেই মেয়ে দেখতে এসেছ? আচ্ছা, আমি মণ্ডল-বাড়ী খবর দিচ্ছি। বেশ মেয়ে, খাসা বৌ হবে।'

ফণি পরদিন মেয়ে দেখিয়া খুসী হইল; এতই খুসী হইল যে, সে তাহার আঙ্গুল হইতে অঙ্গুরীটি খুলিয়া মহেশ মণ্ডলের মেয়ে সুকুমারীর আঙ্গুলে পরাইয়া দিয়া আসিল। বাড়ীর সকলে তাহাকে 'জামাই'-সম্বোধনে আপ্যায়িত করিল। মহেশ মণ্ডলের স্ত্রীকে পল্লী-রমণীরা বলিল, 'তোমার সুকুমারী বিস্তর তপিস্যে করেছে, তাই এমন সোনার চাঁদ বর জুটলো; এ ছেলে যেন হাতছাড়া না হয়।'

কেবল বৃদ্ধা ঝি গণ্ডদেশে তর্জ্জনী স্থাপন করিয়া বলিল, 'কি লজ্জার কথা! ছোঁড়া নিজে এসেছে কনে পছন্দ কর্‌তে? কালে কালে আরও কত দেখবো!'

৪

ফণিভূষণ কয়েক দিন পর বাড়ী ফিরিলে দিদিমা বলিলেন, 'কেমন মেয়ে দেখে এলি রেঁ ফণে?'

ফণি বলিল, 'মন্দ কি? তবে ডানা-কাটা পরী নয় দিদিমা, চলনসই বটে।'

দিদিমা বলিলেন, 'তা হ'লেই হোলো। বৌ ত আর বাজারে বিক্রী কর্‌তে যাবি নে। পছন্দ হয়েছে ত?'

ফণি বলিল, 'খু-উ-উব!'

দিদিমা বলিলেন, 'তবে মেয়ের বাপকে কথাবার্ত্তা ঠিক করবার জন্যে আসতে লেখা যাক?'

ফণি বলিল, 'সে তোমাদের ইচ্ছা। ও সব কথা আমি কিছু জানি নে।'

দিদিমা কবিচিন্তামণিকে ডাকিয়া পলাশীপাড়ায় মহেশ মণ্ডলকে পত্র লিখিতে অনুরোধ করিলেন। মহেশ মণ্ডলের নিকট পরদিন ডাকযোগে পোষ্টকার্ড প্রেরিত হইল।

মহেশ মণ্ডল পলাশীপাড়ার এক জন মাতব্বর বাসন-বিক্রেতা। অতি সামান্য অবস্থা হইতে পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের বলে সে ব্যবসায়ে উন্নতি করিয়াছিল। প্রথমে সে কুলীর মাথায় বাসনের মোট দিয়া গ্রামে গ্রামে বাসন ফেরী করিয়া বেড়াইত; এবং নগদ টাকায় কারবার না করিয়া পুরাতন পিতল কাঁসার বাসন লইয়া তাহার পরিবর্ত্তে গৃহস্থরমণীগণকে নূতন বাসন দিয়া আসিত। এই কার্য্যটি অত্যন্ত লাভজনক। সে দুই সের ওজনের পুরাতন বাসন লইয়া এক সের নূতন বাসন দিত। সেই পুরাতন বাসন গলাইয়া যে কাঁসা পিতল হইত, তাহা দিয়া নূতন বাসন প্রস্তুত করাইয়া লইত; এই উপায়ে কয়েক বৎসরের মধ্যে মহেশ মণ্ডল বিলক্ষণ দশ টাকা সঞ্চয় করে; তাহার পর পলাশীপাড়ার বাজারে এক দোকান খুলিয়া ব্যবসায় চালাইতে থাকে। ভাগ্যলক্ষ্মীর অনুগ্রহে মহেশ এখন প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছে; এখন সে তাহার স্বজাতীয় সমাজের এক জন প্রধান ব্যক্তি। কিন্তু বকেয়া চাল সে ছাড়িতে পারে নাই। এখনও সে এক জোড়া চটীজুতায় তিন বৎসর পদগৌরব রক্ষা করে।

মহেশের কন্যাটি পরমসুন্দরী। কোনও কোনও স্থান হইতে পূর্ব্বেই সুকুমারীর বিবাহের সম্বন্ধ আসিয়াছিল। কিন্তু যেরূপ দিন কাল পড়িয়াছে, মেয়ে সুন্দরী হইলেও গা-ভরা অলঙ্কার ও উপযুক্ত বরাভরণ, দানসামগ্রী প্রভৃতি দিতে না পারিলে আজকাল সুপাত্র মিলিয়া উঠা কঠিন। মহেশ মণ্ডল অত্যন্ত কৃপণ, অধিক অর্থ ব্যয় করিয়া কন্যার বিবাহ দিবার তাহার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। বিশেষতঃ, তাহার স্ত্রী কালিদাসী বলিত, 'আমার সুকুমারী রাজরাণী হবার যুগ্যি, আমি টাকা খরচ করে' মেয়ের বিয়ে দেব? কত বড় লোক সেধে' আমার মেয়ে নিয়ে যাবে।'

ফণির পৈত্রিক অবস্থা স্বচ্ছল, কিঞ্চিৎ জমীদারী আছে, কোনও সরিক নাই, ছেলেটিও ভাল; বিশেষতঃ, ফণি সুকুমারীকে বিবাহ করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়া আসিয়াছে। এ ক্ষেত্রে বরপক্ষ হইতে কোনও রকম দাবী দাওয়ার

আশঙ্কা নাই বুঝিয়া, মহেশ মণ্ডল শুভদিন দেখিয়া কানে বিল্বপত্র গুঁজিয়া কন্যার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিতে খয়রামাটী যাত্রা করিল। কিন্তু সে সেখানে একাকী যাওয়া সঙ্গত মনে করিল না; বাসন-বিক্রয়ে সে সুনিপুণ হইলেও, বর-ক্রয়ে তাহার বিন্দুমাত্র অভিজ্ঞতা ছিল না। বাসন অপেক্ষা বর যে মূল্যবান্ পণ্যদ্রব্য, তাহা সে জানিত। সুতরাং সে তাহার শ্যালক রামবসু দে ও তাহার শ্যালীপতিভাই দুর্গতি প্রামাণিক, এই দুই জন মাতব্বর কুটুম্বকে সঙ্গে লইয়া চলিল।

খয়রামাটীতে মহেশ মণ্ডলের কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রীর এক ভগিনীর বিবাহ হইয়াছিল; মহেশ কুটুম্বদ্বয় সহ সেইখানে উঠিল; এবং প্রথমেই ফণির পিসে পূর্ব্বোক্ত গোবর্দ্ধন কবিচিন্তামণির সহিত সাক্ষাৎ করিল।

মহেশ গোবর্দ্ধনের নিকট যথারীতি বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপিত করিল। গোবর্দ্ধনের সহিত মহেশের পূর্ব্ব হইতেই আত্মীয়তা ছিল; বিশেষতঃ, গোবর্দ্ধনের স্ত্রী মহেশের কন্যার সহিত ফণির বিবাহের প্রস্তাব করিয়া রাখিয়াছিল, এবং যাহাতে এই বিবাহ হয়, সে জন্য মৃত্যুকালেও সে স্বামীকে অনুরোধ করিয়া গিয়াছিল। সুতরাং গোবর্দ্ধন এ জন্য যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করিল; দেনা পাওনা সম্বন্ধে কোনও প্রকার দাবী দাওয়া করিল না। ইহাতে মহেশ যথেষ্ট আশ্বস্ত হইল।

গোবর্দ্ধন বলিল, 'দেখ ভাই, আমার পরিবার আজ বেঁচে থাক্‌লে তোমাকে আর কারও কাছে যেতে হতো না। আমিই শেষ কথা দিতে পারতাম। আমার শাশুড়ী আছেন বটে, কিন্তু তিনি গোলমালের লোক নন, দেনা পাওনা নিয়ে তাঁর কোনও আপত্তি হবে না; মেয়েটি ভাল হলেই তিনি খুসী, তা তোমার মেয়ে কিছু 'অমন্দ' নয়; কিন্তু ফণির মামা, মেসো, দিদিমা বর্ত্তমান; ফণি এখন তাঁদেরই বেশী বশ, তাঁদের রাজী করাই আগে দরকার। চল, তোমাকে হালদার মশায়ের কাছে নিয়ে যাই।'

গোবর্দ্ধন মহেশকে লইয়া হালদার-ভবনে উপস্থিত হইল। ফণির মেসো কামিনীকান্ত হালদার মহকুমার এক জন বড় মোক্তার। অল্পদিন পূর্ব্বে তিনি মহাসমারোহে তাঁহার কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। তিনি পুরোহিত ডাকিয়া ছেলে-মেয়ের ঠিকুজী মিলাইয়া ফণির সহিত সুকুমারীর বিবাহের প্রস্তাবে মত প্রকাশ করিলেন।

মহেশ সহর্ষে বলিল, 'তবে বিবাহের দিন স্থির হোক্।'

রুক্মিণী হালদার সুবৃহৎ ভুঁড়িতে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, 'হ্যাঁ,

ত দিন স্থির করাই কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু আজ কাল সমাজে কি এত বদ্ চাল ঢুকেছে—দেনা পাওনা সম্বন্ধে একটা মীমাংসা না করে' দিন স্থির করতে কেউ রাজী হয় না। তা আপনি স্বনামধন্য কৃতী ব্যক্তি; মেয়ে জামাইকে কি দিচ্ছেন—সেটা ত একবার জানা দরকার। বিশেষ ফণির দিদিমা—আমার শাশুড়ী বল্‌ছিলেন, "তোমার বেয়াই হচ্ছেন সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি, তিনি অবশ্যই দশ তোলা দেবেন, কি দেবেন; সেটা জেনে নিয়ে পরে বাদবাকী গহনার জন্য সেকরা ডেকে ফরমাস্ দিতে হবে।" আপনারা যা যা দেবেন, তা বাদ আমরা অন্য গহনা গড়তে দেব কি না।'

মহেশ ঢোক গিলিয়া বলিলেন, 'আমি আর দেব কি ?—আমি দেব মেয়েটি। খাসা পরীর মত মেয়ে, রাজসংসারের যোগ্য।' (ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ হুঁকায় টান)।

রুক্মিণীকান্ত বলিলেন, 'আরে রেখে দেন মশায় পরী, ঢের ঢের পরী দেখেছি। পরীর সঙ্গে টাকা ঢালতে না পারলে সুপাত্র মেলে না। বরের বাজার কি রকম চড়া! মেয়ের বিয়ে দিতে বসেছেন, ক্যাঙ্গলাকাচ সাজবে না।'

মহেশ টিকিতে হাত বুলাইয়া বলিলেন, 'আমার যা সাধ্য দেব; নলক দেব, হাতে পলাকাঁটি দেব, গলায় দেব কণ্ঠমালা, কানে দুটো কান্‌বালা, আর একগাছা রূপোর রেট; তা পায়ের কথা বল্‌তে পারেন; পায়ে না, হয়, গুজরী-পঞ্চম দেব।'

রুক্মিণী চটিয়া বলিলেন, 'আপনি যে সত্যযুগের গহনার কথা বল্‌ছেন দেখ্‌ছি! পলাকাটী—কণ্ঠমালা কি আর একালে চলে? বহুদিন ও ফ্যাশান বদ্‌লে গিয়েছে। রূপোর রেট আর গুজরীপঞ্চমের কথা বল্‌তে আপনার লজ্জা হলো না?—সোনার বিছে আর গলায় সোনার বিস্কুট-প্যাটার্ণ নেকলেস্ ত দিতেই হবে; তা ছাড়া ডায়মনকাটা চুড়ী ও তাগাও দিতে হবে; আর বালা কান না হয় আমরাই দেব।'

মহেশ শ্যালক সঙ্গে লইয়া দরবারে গিয়াছিল; সে তাহার ভগিনীপতির কানে কানে বলিল, 'উনি পৈতৃক সম্পত্তি মেয়েকে দেবেন!'

কিন্তু সে কথার উল্লেখ করিলে আর্জ্জি দাখিলমাত্র মাম্‌লা ডিস্‌মিস্ হয়, এই ভয়ে মহেশ উচ্চবাচ্য করিল না। গম্ভীরভাবে বসিয়া হুঁকা টানিতে লাগিল। গহনার ফর্দ্দ শুনিয়া কলিকার আগুন পূর্ব্বেই ঠাণ্ডা হইয়াছিল।

রুক্মিণী বলিলেন, 'কথা কচ্ছেন না যে! মেয়ে জামাইকে কিঞ্চিৎ দিতে হ'বে শুনে কি হঠাৎ শ্রবণশক্তি লোপ হলো?'

মহেশ বলিলেন, 'বাড়ীতে পরামর্শ না করে' আপনাকে কোনও জবাব দিতে পারবো না।'

রুক্মিণী বলিলেন, 'পরামর্শটা আগে করে' এলেই হোত। আর এক কথা বল্‌তে ভুলে গিয়েছি, ছেলের জন্য দুশো টাকা ঘড়ি চেনের জন্য নগদ, আর চস্‌মার পঁচিশ টাকা, বাইসিক্‌ল একখানা—সেও ধরুন—লড়াইয়ের জন্যে সাইকলের দাম বেজায় চড়ে গিয়েছে,—সে জন্যে ধরুন, দেড় শো টাকা।—আড়াই শো টাকার কমে ত আর ভাল সাইকেল বিক্রী হচ্ছে না, কি বল হে শিবু!'

শিবু কর্ম্মকার একখানি বঁটী গড়িয়া দিয়া মূল্যের জন্য রুক্মিণীকান্তের উমেদার।

শিবু তৎক্ষণাৎ বলিল, 'আজ্ঞে, আমার মামার ছোট সম্বন্ধী—সাইকেলের দোকানের মিস্ত্রী, তিনি বল্‌ছেলো, ভাল সাইকেল তিন শো টাকার কমে পাবার যো নেই ;—কর্ত্তা, আমার বঁটীর দামটা!'

কর্ত্তা হুঙ্কার দিলেন, 'দূর বেটা কামার! সময় নেই, অসময় নেই, যখন তখন তাগাদা। এখন যা।'

শিবু সবিনয়ে বলিল, 'কর্ত্তা, আমার বঁটী ত ভাল, আপনি যে খাঁড়া ধরেছেন! এক কোপেই দু' টুক্‌রো!'

মহেশ বিদায়গ্রহণের জন্য উঠিল।

রুক্মিণীকান্ত দন্ত বহির্গত করিয়া বলিলেন, 'এ বেলাটা থেকে গেলে হতো না? ওরে নফরা, কল্‌কেটা বদ্‌লে দে। কাছারীর সময় হয়ে এলো!'

মহেশ বলিল, 'গরীব মারা যাই ; কন্যাদায়। আপনি একটু বিবেচনা করে' দেখ্‌বেন।'

রুক্মিণী বলিল, 'আমি কি দোকানদারী করছি? মশায়! সে দিন আমার মেয়ের বিয়ে দিয়েছি, বিহাই শালা তিনটি হাজার টাকার গহনা বসান দিয়েছে!'

মহেশ বলিল, 'আপনি আর আমি?—আপনি রাজা লোক, আমি সামান্য পিতল কাঁসার দোকানদার।'

রুক্মিণী বলিলেন, 'তা হ'লে দোকানদারের ঘরেই যেতে হয়, রাজার কাছে আস্‌তে নেই।'

মহেশ। নমস্কার।

রুক্মিণী। 'নমস্কার।' [illegible]

মহেশ। কাকে? আমাকে?

রুক্মিণী বলিলেন, 'রামঃ! ঐ নফরা বেটাকে বল্‌ছি, কখন বলেছি—এক কল্‌কে তামাক দিয়ে যেতে।—তা তিন ঘণ্টা ধরে "আজ্ঞে আসি"!'

মহেশ সপার্ষদ প্রস্থান করিল। রুক্মিণীকান্ত বলিলেন, 'শুনেছি, পরিবারের গা-ভরা গহনা, আর গুজরীপঞ্চম দিয়ে মেয়ে বিদেয় কর্ত্তে চায়! ভয়ঙ্কর কঞ্জুষ।'

৫

মহেশ মণ্ডল বাড়ী ফিরিয়া বড় বিপদে পড়িল। ফণির মেসো ছুরী শাণাইয়া তাড়া করিয়াছিল, এ কথা সহজে কেহ বিশ্বাস করিতে চাহিল না; এমন কি, তাহার স্ত্রী পর্য্যন্ত তাহার কথা অবিশ্বাস করিল; 'বলিল, এও কি কাজের কথা!—বেয়ান গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে বলে' গিয়েছেন, তাঁর ভাইপোর সঙ্গে খুকীর বিয়ে দেবেন; আজ তিনি নেই বলে' কি কথার নড়চড় হবে? ফণি নিজে খুকীকে পছন্দ ক'রে তার আঙ্গুল থেকে আঙ্‌টী খুলে দিয়েছে, আর তুমি বলছো—তাদের মত নাই!'

মহেশ বলিল, 'রুক্মিণী হালদার গহনা ও দানসামগ্রীর যে ফর্দ্দ দিয়েছে, তা শুন্‌লে দাঁতকপাটী লাগ্‌বে।—হাজার তিনেক টাকা ঢাল্‌তে পার ত এ বিয়ে হয়; নয় ত সে দিকে ঘেঁষবার যো নেই!'

মহেশের স্ত্রী বলিল, 'তবেই ত মুস্কিল! এখন ভাল ছেলে কম দরে কোথায় পাওয়া যায়? বিয়ে ত দিতে হবে।'

মহেশ নানা স্থানে চিঠিপত্র লিখিতে লাগিল। কিন্তু কোথাও আশা ভরসা পাইল না। শেষে নারায়ণগঞ্জ হইতে তাহার জ্যেঠতুতো ভাই ভজহরি মণ্ডলের এক পত্রে জানিতে পারিল, নারায়ণগঞ্জের সুবিখ্যাত পেটো মহাজন রূপলাল খাঁর এক বিবাহযোগ্য পুত্র আছে; রূপলাল বাবু এ পর্য্যন্ত শতাধিক মেয়ে দেখিয়াছেন, কিন্তু কোনও মেয়ে পছন্দ হয় নাই। যদি তাঁহারা সুকুমারীকে পছন্দ করেন, তাহা হইলে অনায়াসেই বিবাহ হইতে পারে। তাঁহারা দানসামগ্রীর প্রত্যাশা করেন না। অধিকন্তু বিবাহে যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে।

মহেশ সাহ্লাদে মেয়ে দেখাইতে সম্মত হইল।

সুকুমারীকে দেখিয়া বরপক্ষের পছন্দ হইল। রূপলাল বাবু স্বয়ং মেয়ে দেখিতে আসেন নাই, তাঁহার দুই জন কর্ম্মচারী ও এক জ্ঞাতিভ্রাতা মেয়ে দেখিতে

আসিল। মহেশ মহাসমাদরে তাহাদের অভ্যর্থনা করিল। রূপলালের অগাধ সম্পত্তি। মহেশের স্ত্রীর আনন্দ ধরে না।

কথাবার্ত্তা স্থির হইলে মহেশ মণ্ডল রূপলাল বাবুকে লিখিল, তাহার অবস্থা স্বচ্ছল নহে। তিনি যদি বিবাহে সমারোহ করেন ও বরযাত্রী আনেন, তাহা হইলে সে ভার বহন করা তাহার সাধ্যাতীত।—রূপলাল বাবু লিখিলেন, সে জন্য চিন্তা নাই; বিবাহ-রাত্রির সমস্ত ব্যয় তিনি বহন করিবেন; এ জন্য মহেশ মণ্ডলকে যথাসময়ে টাকা পাঠানো হইবে।—কন্যা-আশীর্ব্বাদ শেষ হইলে মহেশ মণ্ডলকে বিবাহের ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য হাজার টাকা দেওয়া হইল। মহেশ বুঝিল, বিবাহের খরচপত্র বাদে তাহার বিলক্ষণ দশ টাকা লাভ হইবে। সে মহা-উৎসাহে বিবাহের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইল।

এ দিকে মহেশের কোনও পত্রাদি না পাইয়া ফণি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইল; তাহাকে ব্যাকুল দেখিয়া তাহার দিদিমা, পিসে মশায়, এমন কি, তাহার মাসীমা পর্য্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিল। অগত্যা রুক্মিণী মোক্তার মহেশকে পত্র লিখিলেন, 'মহাশয় বাড়ী পৌঁছিয়া বিবাহ সম্বন্ধে শেষ কথা জানাইবেন লিখিয়াছিলেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত আপনার কোনও পত্র পাওয়া গেল না। যদি বিবাহ দেওয়ার ইচ্ছা থাকে, তবে আমরা যে প্রস্তাব করিয়াছি, তাহাতে আপনি সম্মত কি না, সত্বর জানাইবেন। আমরা আষাঢ় মাসের মধ্যে শুভকার্য্য শেষ করিব জানিবেন, ইতি।'

মহেশ নিশ্চিন্তমনে উত্তর লিখিল, 'মহাশয়ের পত্র পাইলাম। আপনার শালীর ছেলের সঙ্গে আমার কন্যার বিবাহ দিতে হইলে আমাকে ঘর বাড়ী ও ইষ্টাটপত্র সমস্তই বন্ধক দিয়া বিবাহের খরচ যোগাইতে হইবে। কিন্তু মেয়ের বিবাহের জন্য আমি সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া পথে বসিতে পারিব না; এ কারণ আমার অক্ষমতা জানাইলাম।'

এই পত্র পাইয়া রুক্মিণী হালদার তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন, 'এত অপমান! মহেশ মণ্ডলের মেয়ে ছাড়া কি ভূভারতে মেয়ে নাই? কিছুতেই ওখানে ফণির বিয়ে দেওয়া হবে না।'

কিন্তু তাঁহার এ জিদ বজায় থাকিল না। স্ত্রী ও শাশুড়ীর সহিত তাঁহার বিরোধ উপস্থিত হইল। তাহারা বলিল, 'তুমি কেন এত দাবী দাওয়া কর? তোমার কিছু ছেলে নয়। বিয়ে করে' ফণে কিছু পায়, তারই থাকবে; না পায়, তারই ক্ষতি। তোমার ঘরে ত এ পয়সা আসবে না। ফণির একান্ত ইচ্ছা,

ঐ মেয়েটিকে বিয়ে করে। মধ্যে থেকে তুমি কেন বাঁধা দাও? ফণি বলে' বেড়াচ্চে, মেশো মশাই টাকার লোভ করে' অমন টুকটুকে মেয়েটির সঙ্গে আমার বিয়ে হতে দিচ্ছে না।'

এ সকল কথা শুনিয়া মরদেব ভয়ানক রাগ হইল। 'যার জন্তে চুরী করি, সেই বলে চোর!'—রুক্মিণী মোক্তার মহেশ মণ্ডলকে লিখিলেন, 'আপনি কুটুম্ব ব্যক্তি, বিশেষতঃ আমাদের নিকট আত্মীয়। আপনার নিকট গহনাপত্র ও দানসামগ্রীর দাবী দাওয়া বড়ই দৃষ্টিকটু, অতএব আমি আমার দাবী পরিত্যাগ করিলাম; আপনি স্বইচ্ছায় মেয়ে জামাইকে যাহা দিতে পারিবেন, তাহাতেই আমরা রাজী। আগামী ১৫ই আষাঢ় বিবাহের উত্তম দিন আছে। আপনি এখানে আসিয়া তৎপূর্ব্বে পাত্র আশীর্ব্বাদ করিয়া যাইবেন। আশা করি, ফণির সঙ্গে আপনার কন্যার বিবাহ দিতে এখন আর কোনও আপত্তি হইবে না।'

রুক্মিণী মোক্তার এই পত্রের উত্তরে লালকালীতে ছাপানো প্রজাপতি-মার্কা-বিশিষ্ট একখানি নিমন্ত্রণপত্র পাইলেন; তাহা পাঠ করিয়া রুক্মিণী মোক্তার জানিতে পারিলেন, নারায়ণগঞ্জের শ্রীযুক্ত রূপলাল খাঁর পুত্রের সহিত ঐ তারিখে মহেশের কন্যার বিবাহ!

রূপলাল বাবুর নাম কে না জানে? তাঁহার ন্যায় লক্ষপতির পুত্রের সহিত মহেশ মণ্ডলের ন্যায় সামান্য ব্যক্তির কন্যার বিবাহ হইবে, ইহা স্বপ্নের অগোচর!—পত্রখানি পাঠ করিয়া লজ্জায় অপমানে মোক্তার মহাশয়ের মাথা মাটীতে মিশিয়া গেল।—তিনি নিমন্ত্রণপত্রখানি তাঁহার স্ত্রীকে দিয়া বলিলেন, 'এই নাও, পঁ্যাজ পয়জার দুই-ই হয়েছে; আমি আর ও হতভাগার বিয়ের মধ্যে নেই।'

বিবাহ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় ফণির মনে ভয়ানক বৈরাগ্যের সঞ্চার হইল। সে প্রতিজ্ঞা করিল, আর বিবাহ করিবে না।—

* * *

মহেশ মণ্ডলের কন্যার বিবাহের পর তিন মাস কাটিয়া গিয়াছে। ফণি স্কুল ছাড়িয়া এখন কেবল প্রেমের কবিতা লেখে; আর পূর্ণ-চন্দ্রের দিকে চাহিয়া হা-হুতাশ করে।

দেখিতে দেখিতে পূজা আসিয়া পড়িল। সপ্তমীর দিন তাহাদের বাড়ীতে কত ধুম। সন্ধ্যার পর তাহাদের পূজামণ্ডপে মহা আড়ম্বরে ঢাক ঢোল বাজিয়া থামিয়া গেল। সানাই বাজিয়া বাজিয়া নীরব হইল। গ্রাম্য স্ত্রী পুরুষেরা দলে

দলে তাহাদের বাড়ীতে ঠাকুর দেখিতে আসিতে লাগিল। শারদ-সপ্তমীর চন্দ্রকিরণে নৈশ প্রকৃতি অপরূপ শোভা ধারণ করিল। কিন্তু ফণিকে কেহ দেখিতে পাইল না! সে তখন ছাদে বসিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া গুন্ গুন্ করিয়া গায়িতেছিল,—

'অরে দুষ্ট দেশাচার! কি করিলি অভাগার,
কার ধন কারে দিলি, আমার সে হলো না!'

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

খাণ্ডোয়া।

মর্ত্তাকা হইতে ১৬ই জানুয়ারী ৫-৪৫ মিনিটের ট্রেণে খাণ্ডোয়াতে যাই। রাত্রিতে সেখানে পঁহুছিয়া তথাকার প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত প্যারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে অতিথি হইলাম। প্যারী বাবু সে সময় অন্যত্র গিয়াছিলেন। তদীয় পুত্র (তিনিও উকীল) আমার অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি তখন জ্বরে পীড়িত হইয়া শয্যাশায়ী ছিলেন, তবুও আমাকে বাটীর ভিতরে ডাকাইয়া অনেক কথাবার্ত্তা কহিয়া, আমার আহারাদির বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। বাস্তবিক, তাঁহার ভদ্রতায় ও সৌজন্যে আমি বিমোহিত হইয়াছিলাম। তাঁহাকে দেবাত্মা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

১৭ই জানুয়ারী, ১৯১৪।—প্রভাতে চা পান করিয়াই সহর দর্শন করিতে গেলাম। খাণ্ডোয়া একটি জংসন ষ্টেশন। এখানে দীর্ঘপথযাত্রী পথিকেরা বিশ্রাম করেন। ক্ষুদ্র সহর। কিন্তু বাণিজ্য ব্যবসায়ের কোলাহলে মুখরিত। সহরের রাস্তার দু' ধারে কূপ হইতে জল তুলিবার লৌহনির্ম্মিত বড় বড় ডোল, জলপাত্র, টব (Bucket) এবং নানাবিধ লৌহনির্ম্মিত রন্ধনের তৈজসপাত্র প্রভৃতি বিক্রীত হইতেছে। সহরে হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যাই বেশী। বাজারের মধ্যে একটি প্রকাণ্ড মসজীদ। রাস্তার দু' ধারে নানাবিধ তরিতরকারী, শাকশবজী, ফলমূল বিক্রীত হইতেছে। মৎস্য-বিক্রয়ের স্থান খুব জমিয়া গিয়াছে। সহরের একপ্রান্তে তুলার কল হইতে রাশি রাশি তুলা-বোঝাই গরুর গাড়ীর শ্রেণী পিপীলিকাশ্রেণীর ন্যায় চলিয়াছে—ইহা আর ফুরায় না। ক্রমাগতই চলিয়াছে।—কি বিস্তৃত তুলার কারবার!

আমি সহর ছাড়াইয়া বাহিরে আসিয়া উন্মুক্ত প্রান্তরে পড়িলাম। ঠাণ্ডা বাতাস বহিতেছে। এখানে একটি বৃক্ষতলে বসিয়া চুরুট খাইতে লাগিলাম। ইহাই রামপর তীর্থ। পঞ্চবটীগমনকালে সীতাদেবী পথিমধ্যে তৃষ্ণা-কাতরা হইলে শ্রীরামচন্দ্র তীক্ষ্ণশরে পাতালভেদ করিয়া উৎস-নীরে সীতাদেবীর তৃষ্ণা দূর করেন। সেই স্থলে একটি নদ হইয়া যায়। কালে সেই নদ বিশুষ্ক হইয়া কূপ-রূপে বর্ত্তমান রামপদ-তীর্থে পরিণত হইয়াছে!

খাণ্ডোয়াতে অনেকগুলি কুণ্ড বিদ্যমান। তন্মধ্যে পদ্মকুণ্ড, কুলালকুণ্ড, ভীমকুণ্ড, সূর্য্যকুণ্ড, ভৈরবতাল প্রভৃতি জলাশয় ও অনেকগুলি দেবদেবীর মন্দির আছে।—দূরে মুসলমানের ইদ্‌গা।

এই স্থানই মহাভারত-বর্ণিত প্রচীন খাণ্ডববন। সে বন ত অর্জ্জুন কোন্ কালে ভস্মসাৎ করেন। প্রসিদ্ধ দানবশিল্পী ময় এইখানে বহুদিন বাস করিয়াছিলেন।

খাণ্ডোয়াতে দেখিবার কিছুই নাই।

আমি বাসায় প্রত্যাগত হইয়া ১০—১৫ মিনিটের ট্রেণে প্রাচীন মুসলমান নগরী বুরহানপুরে যাত্রা করিলাম।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম।

পূজার খরচ।

সে দিন অপরাহ্ণে যোগেশের কলিকাতার বাসায় তুমুল তর্ক চলিতেছিল। এক পক্ষে যোগেশ, অন্য পক্ষে যোগেশের স্ত্রী প্রভাবতী ও কনিষ্ঠ সহোদর রমেশ। যোগেশ বলিল—'পিতৃ-পিতামহের আমল হইতে বাটীতে পূজা চলিয়া আসিতেছে, মাঝে কয়েক বৎসর অবস্থা হীন হওয়ায় বন্ধ হয়। এখন যা' হ'ক মায়ের কৃপায় অবস্থার কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে; সুতরাং মা'কে আবার আনা উচিত নয় কি?'

রমেশ বলিল—'আমার ত উচিত মনে হয় না, দাদা। পূজা পার্ব্বণে অতিরিক্ত খরচেই ত আমাদিগকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইয়াছিল। বাস্তু ভিটাটুকু ছাড়া যা' কিছু ছিল, সমস্তই গিয়াছে। ওকালতীতে তোমার এই পশার আরম্ভ হইয়াছে। এখন একটু চাপিয়া না চলিলে অবস্থা ফিরিবে না।'

প্রভাবতী দেবরের কথার সম্পূর্ণ সমর্থন করিয়া বলিল—'আমিও ঠিক ঐ

কথাই বলি। আজ উপায় হইতেছে, কা'ল যদি পড়িয়া থাক, তাহা হইলে সকলকে অন্ধকার দেখিতে হইবে। যখন এমন অবস্থা হইবে যে, ঘরে বসিয়া থাকিলেও সংসার অচল হইবে না, পূজাও বন্ধ করিতে হইবে না, তখন পূজা আরম্ভ করাই ভাল।'

যোগেশ ঈষৎ হাসিয়া বলিল—'দেখ, আয়বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমরা এত অভাবের সৃষ্টি করিয়া ব্যয়বাহুল্য করিয়া বসি যে, আমার মত লোকের সে অবস্থা কখনও হইবে বলিয়া আমার মনে হয় না; সুতরাং মা'কে আনাও আর হইবে না।'

প্রভাবতী ভ্রূ ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া বলিল—'কেন, তোমার সংসারে আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কি এতই অন্যায় খরচ হচ্ছে?'

যোগেশ বলিল—'সে কথা বলিলে আমার নিতান্ত অকৃতজ্ঞতা হইবে। আমি কি জানি না, তুমি বড় লোকের মেয়ে হইয়াও, এই বার তের বৎসর, সহাস্যমুখে সংসারের সমস্ত দৈন্য-দুঃখের বোঝা মাথায় লইয়া আমাদের এই নিরাশ্রয় ভাই দুইটীকে কি অশান্তির হাত হইতে রক্ষা করিয়া আসিতেছ? তোমার ন্যায় সুগৃহিণীর হাতে অপব্যয় অসম্ভব।'

রমেশ বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিল—'বাস্তবিক, বৌদি', তুমি না থাক্‌লে আমাদের কি দশাই হ'ত! তোমার তের বছর বয়সে মা' তোমার হাতে সংসারের ভার দিয়ে চ'লে যান, তুমি সেই অবধি কি কষ্টেই—'

প্রভাবতী ঈষৎ হাসিয়া বাধা দিয়া বলিল—'হাঁ, আমি ছিলাম বলিয়াই তোমরা রাজপদ পাইয়াছ, না থাকিলে—'

রমেশ বলিল—'না থাকিলে আমাদের অনন্ত দুর্গতি হ'ত, বৌদি', তাতে কি আর সন্দেহ আছে? আমার চারি বছর বয়স থেকে তুমি আমাকে মানুষ ক'রেছ, বৌদি। আমার মত দুষ্ট ছেলেকে মানুষ করা যে কি কষ্ট, তা' কি সব ভুলে গেলে?'

প্রভাবতীর চক্ষু সজল হইয়া আসিল। সস্নেহে দেবরকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া তাহার কেশরাজির মধ্যে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে করিতে ঈষৎ হাসিয়া বলিল—'আর আমার মারগুলাও বুঝি ভুলে গেলি রমু!'

এমন সময় যোগেশের কনিষ্ঠা কন্যা শিবানী ছুটিয়া আসিয়া কাকার পিঠের উপর উঠিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিল। তিন বৎসরের মেয়েটি—অরুণ-রাগ-রঞ্জিত একটি ক্ষুদ্র নদী-তরঙ্গের ন্যায়, যোগেশের ক্ষুদ্র বাসাটিকে উজ্জ্বল ও

আনন্দ-চঞ্চল করিয়া রাখিয়াছিল। শিবানী অভিমানে ঠোঁট ফুলাইয়া ক্রন্দনের সুরে বলিল—'কাকা, দাদা দিদি আমায় মেরেছে, ওবেল বে দিও না।' রমেশ তাহাকে কোলে লইয়া তাহার চক্ষু মুছিয়া দিল ও মুখ চুম্বন করিতে করিতে বলিল—'ওরা দুষ্টু ছেলে, ওদের আবার কে বে দেবে? আগে তোমার বে হ'ক্—' বলিয়াই দাদার দিকে চাহিয়া বলিল—'দেখ দেখি, তুমি পূজার জন্য এত টাকা খরচ করবে চাও, কিন্তু মেয়েদের বিবাহের কি সংস্থান ক'রেছ? বড়লোকের বাড়ীতে শিবানীর বে দিতে হ'বে।'

শিবানী বলিল—"হেঁ বাবা, বল বাড়ীতে।"

যোগেশ হাসিয়া বলিল—'তাই হবে; কিন্তু রমেশ, ওদের যখন বিবাহ হবে, তখন তুইও যে উপায় কর্‌বি। এক জনের উপায়ে সংসার চল্‌বে, পূজা পার্ব্বণ হবে, আর এক জনের উপায়ে সংস্থান হবে।'

প্রভাবতী বলিল—'সেই বেশ কথা। আর দু'বছরে বি এ, এক বছরে এম্ এ, আর এক বছরে ওকালতী পাশ। এই চা'র বছর তুমি অপেক্ষা কর, তার পর পূজার কথা হবে।'

যোগেশের মন কিন্তু এ কথায় আশ্বস্ত হইল না। মা'কে আনিবার জন্য তাহার হৃদয় বড় ব্যাকুল হইয়াছিল। বহুদিন হইতেই তাহার এ সঙ্কল্প ছিল। তিন বৎসর পূর্ব্বে সপ্তমীপূজার দিন শিবানী ভূমিষ্ঠ হয়। যোগেশ ইহাতে মা'য়ের ইঙ্গিত দেখিল। সেই দিন হইতে তাহার এই চিন্তা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে। কিন্তু তখনও পৈতৃক পাঁচ ছয় হাজার টাকা দেনা শোধ করিতে বাকি ছিল। গত বৎসর তাহা শোধ হইয়াছে। এ বৎসর হাতে কিছু টাকাও জমিয়াছে। কথাটা চাপা পড়িয়া গেল দেখিয়া, সে প্রকারান্তরে তাহা উত্থাপন করিবার চেষ্টা করিল। রমেশকে সম্বোধন করিয়া বলিল—'রমেশ, তোর কি দেশে যেতে ইচ্ছা হয় না রে?'

রমেশ বলিল—'না দাদা। চার পাঁচ বছর বয়স থেকেই কল্‌কেতায় আছি, দেশের জন্যে কখনও ত প্রাণ কাঁদে না। আর দেশে গেলেই ত জ্ঞাতি মহাশয়দের সঙ্গে আলাপ কর্‌তে হবে! দেশ থেকে যাঁরা মধ্যে মধ্যে বাসায় আসেন, তাঁদের আকৃতি প্রকৃতি দেখলে—কথাবার্ত্তা শুন্‌লে ত শ্রদ্ধার লেশমাত্র হয় না। তুমি আবার পুরাতন পৈতৃক বাড়ীটা মেরামত কর্‌তে অতগুলো টাকা খরচ কর্‌লে!'

প্রভাবতী বলিল—'শ্বশুরের ভিটে, বজায় রাখ্‌তে হবে; কিন্তু তা' বলে আর দেশে বসবাস করা হবে না। এইখানেই একটু বাড়ীর চেষ্টা দেখ।'

যোগেশ একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—"কিন্তু তোমরা যত সহজে ভুলিতে পারিবে, আমি তত সহজে ভুলিতে পারিব না। দেশের প্রত্যেক গৃহ, প্রত্যেক বাগান, প্রত্যেক পুষ্করিণী, প্রত্যেক বৃক্ষের সহিত আমার বাল্য, কৈশোর ও প্রথম যৌবনের স্মৃতি বিজড়িত। সে দিন রাখাল খুড়ো বল্লে, দীঘির পাড়ের প্রকাণ্ড তেঁতুল গাছটা রায়েরা কাটিয়েছে। শুনে আমার যেন চোখে জল এল। ঐ গাছের তলায় প্রত্যহ বৈকালে আমাদের ছেলের হাট বস্‌ত। যে দিন হনুমান্ এসে ঐ গাছে উঠ্‌ত, সে দিন যে আমাদের কত আমোদ হ'ত, তা আর কি ব'ল্‌ব! চক্রবর্ত্তীদের কালীর এমন সাহস ছিল যে, সে গাছে উঠে হনুমান্‌কে তাড়া ক'র্‌ত। আহা, বেচারী আজ দারুণ ম্যালেরিয়ায় শয্যাগত! খোঁড়া গুরুমশাই মরে গেছেন, তাঁর ছেলে পাঠশালাটি নিয়ে আছে; বেচারীর অবস্থা বড় খারাপ। সে দিন আমাকে এক চিঠি লিখেছে, কিছু কিছু মাসিক সাহায্যের জন্য। ঘোষেদের পাকা প্রাচীর আমাদের ঘড়ী ছিল। গ্রীষ্মকালে ও শীতকালে দেওয়ালের কোথায় কখন রোদ এলে ক'টা বাজ্‌ত, তা আমরা দাগ কেটে ঠিক ক'রে রেখেছিলাম। সে দিন দেখে এলুম, আমার সেই ছুরির দাগ এখনও ঠিক আছে! আহা আমিও যদি সেই রকম ঠিক থাক্‌তুম্! শিবতলায় সয়লার দিন কত আমোদ। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসের দিনে আমাদের কি আহার নিদ্রা থাক্‌ত?—বাগানে বাগানে ঘুরে বেড়াতুম্। গ্রামে আমাদের বাড়ীতেই পূজা হ'ত। পূজার তিন দিন গ্রামে কারও বাড়ীতে হাঁড়ি চ'ড়ত না। কোমরে কাপড় বেঁধে থালা থালা অন্নব্যঞ্জন পরিবেশন করার সে কি আনন্দ! যারা খেত তাদের কি তৃপ্তি! মোড়ল জ্যেঠা সে দিন কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে ব'ল্‌লে—"বাবা, তোমাদেরও পূজা গেছে, আমারও খাওয়া গেছে!" বুড়াকে বাজার থেকে মনোহরা কিনে খাওয়ালেম, তা এই সত্তর বৎসর বয়সে সাত পোয়া মনোহরা খেলে! খেয়ে কত আশীর্ব্বাদ! এখন রায়েরা পূজা কর্‌তে আরম্ভ ক'রেছে বটে, কিন্তু শুনি, তাদের এমনি অহঙ্কার, বড়মানুষি চা'ল ও অশ্রদ্ধার ভাব যে, তাদের বাড়ীতে মার প্রসাদ পেতেও অনেকে ইচ্ছা করে না।"

যোগেশ অতীত স্মৃতির উচ্ছ্বাসে স্তব্ধ হইয়া শরতের শুভ্র আকাশের দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া বসিয়া রহিল। কেহ কোনও কথা কহিল না।

২

এমন সময় নীচে সহস্র করতালের শব্দকে ধিক্কার দিয়া যতন দাসীর গলা বাজিয়া উঠিল। প্রথমে সকলেই চমকিয়া উঠিল; কিন্তু তাহারা ইহাতে

অভ্যস্ত ছিল বলিয়া কেহ কারণানুসন্ধানে ব্যগ্রতা প্রকাশ করিল না। যতন দাসী অসুরের মত খাটিতে পারিত, আবার অসুরের মতই কলহ করিতে পারিত। যে দিন কলহের কোনও কারণ না পাইত, সে দিন 'মুখপোড়া কাক' বা 'হতভাগীদের বেরাল'কে উপলক্ষ্য করিয়া দুই এক ঘণ্টা কাল বেশ এক তরফা কলহ চালাইত। এ সংসারে তাহার একমাত্র দুঃখ যে, সে কলহের কারণ খুঁজিয়া পায় না। যেমন কর্ত্তা, তেমনই গৃহিণী, তেমনই ছোট বাবু, আর তেমনই কি ছেলেমেয়েগুলা! সকলের মুখে যেন হাসি লাগিয়া আছে! তাহার কলহে কেহ যোগ দেয় না। গৃহিণী প্রথম প্রথম দুই এক কথা বলিতেন, কিন্তু এখন আর তাহাও বলেন না। এমন অবস্থায় একতরফা ঝগড়া কতক্ষণ চালান যায়? পূর্ব্বে যে ঠাকুরটা ছিল, সেটা বরং ছিল ভাল— কথার জবাব করিত। এই নূতন ঠাকুরটির মুখে সাত চড়ে কথা নাই! এ কি কম দুঃখ!

আজ সে ঠাকুরের এক ত্রুটী পাইয়াছে। ঠাকুর সংসারের সাবানে নিজের কাপড় কাচিতেছে। যতন দাসী দেখিয়া রাগে জ্বলিয়া গেল। বলিল— 'বাবুরা না হয় চোখ কাণ দেন না, তাঁরা বড় লোক; বড়লোক হ'লে এমনি ক'রেই টাকা পয়সা নষ্ট করতে হয়। তা' আমরা দাসী বাঁদী, আমাদের তাতে নজর দিয়ে কি হবে? খাট্‌তে এয়েছি, খেটে যাব; গরীব দুঃখীর কথায় কি বড়লোকে কাণ দেয়? কিন্তু তোমার কি আক্কেল বল দেখি, ঠাকুর! আজ ছ' মাস এয়েছ, এক কাপড়ে আর এক গামছায় চালাচ্ছ। মনীবের কাছ থেকে গামছা কাপড় পাওনা গণ্ডা বুঝে নিলে; কিন্তু ছেঁড়া টেনা ঘুচ্‌লো না। তাই না হয় হ'ল, কিন্তু নিজের গাঁটের একটি পয়সা খরচ ক'রে সাবান পর্য্যন্ত কিন্‌তে পার না! এত বড় স্পর্দ্ধা তোমার, মনিবের সাবানে হাত দাও?' যতন ভাবিল, ঠাকুর এবার একটা উত্তর করিবে। কিন্তু ঠাকুর নিতান্ত কুণ্ঠিতভাবে সাবানটি যথাস্থানে তুলিয়া রাখিয়া মাথা হেঁট করিয়া কাপড় কাচিতে লাগিল।

যতন বলিল— 'ছোঁড়ার আক্কেল দেখ — যেন কত বড়মানুষ! দাসী বাঁদীর কথার একটা জবাব পর্য্যন্ত দেওয়া হ'ল না! বলি, এত অহঙ্কার কিসের? আমার মত তোরও ত দেশে ভাত নেই ব'লে গতর খাটিয়ে খেতে এয়েছিস্!'

যাহারা জীবনে স্বয়ং অন্নকষ্ট ভোগ করিয়াছে, তাহারা পরের অন্নকষ্ট বুঝিতে পারে। তাই যতন অন্নকষ্টের কথা তুলিয়া বিদ্রূপ করায় ঠাকুরের মনে

কত ব্যথা লাগিয়াছে ভাবিয়া, যোগেশ প্রভাবতীকে বলিল—'যতনকে ঝগড়া করিতে নিষেধ করিলে হয় না?'

প্রভাবতী উঠিয়া বারান্দায় আসিয়া, ঠাকুরকে বলিল, 'ঠাকুর, দোকান থেকে ছেলেদের খাবার নিয়ে এস ত।'

ঠাকুর চলিয়া গেল। এ অপমান যতনের সহ্য হইল না। সে ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল—'বাবা গো! মাগো! আমায় তোমরা নাও গো! পেটের জ্বালায় কত অপমান সহ্য করতে হয় গো!'

যথাক্রমে উদাত্ত, স্বরিত ও অনুদাত্ত স্বরে মর্ম্মবেদনা প্রকাশ করিয়া পরিশেষে যতন থামিল। কেহ কোনও কথা কহিল না।

৩

কথাটা ঠিক। বামুন ঠাকুর নিজে যার-পর-নাই কষ্ট স্বীকার করিয়া থাকিয়া পরিধানের কাপড়খানি পর্য্যন্ত দেশে পাঠাইয়া দেয়, অথচ বলে, তাহার কেহ নাই। ইহার কারণ কি? রাত্রে খাইতে বসিয়া রমেশ এই কথাই ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিতেছিল। যোগেশ পার্শ্বের ঘরে বসিয়া মক্কেলের brief দেখিতেছিল। কথাটা শুনিয়া সেও কাজ ফেলিয়া তাহাই শুনিতে লাগিল।

ঠাকুর বলিল—'টাকা পাঠাই আমার জ্ঞাতি দাদাকে।'

'কেন?'

'বাবা তাঁহার নিকট দেনা রাখিয়া গিয়াছেন।'

'কত টাকা?'

'এখন এক শ' পঁচিশ টাকা নয় আনা।'

'তোমাদের কিছু জমী জমা নাই?'

'না; বাবা গুরুমহাশয়গিরি করিতেন।'

'তাতে সংসার চল্‌ত না?'

'কষ্টে স্বষ্টে চল্‌ত।'

'তবে এত দেনা কেন?'

'আজ্ঞে, আমাদের বাড়ীতে লক্ষ্মী-জনার্দ্দন—পৈতৃক ঠাকুর আছেন; প্রত্যহ তাঁহাদের ভোগ হয় ও এক জন করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করান হয়। গত বৎসর যখন আমরা পৃথক্ হই, তখন সরকারী ঠাকুরঘর মেরামতের খরচ অর্দ্ধেক আমাদের অংশে পড়ে। সে প্রায় দেড় শ' টাকা। বাবার হাতে এক পয়সা ছিল না; তার উপর তাঁর বড় অসুখ। তিনি ক্রমে ক্রমে শোধ করিব বলেন।

তাহাতে জ্ঞাতিরা অসম্মত হয়; ঠাকুরের ভাগ আমাদের দিলে না। বল্‌লে, টাকা না দিলে ঠাকুরের ভাগ পাবে না।'

'বেশ ত, ভাগ নাই বা দিলে, তারাই পূজা করুক; তোমরা ত একটা দায় এড়ালে।'

ঠাকুর বিস্মিতনেত্রে ছোট বাবুর মুখের দিকে চাহিল। পরে মুখ নত করিয়া বলিল,—'সে কি ছোট বাবু! যে ভিটেয় ঠাকুর রইলেন না, ব্রাহ্মণ-ভোজন হ'ল না, সে ভিটেয় কি গৃহস্থ জলগ্রহণ কর্‌তে পারে? সে ভিটে যে শ্মশান!'

বলিতে বলিতে তাহার চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইল। সে বলিল—'পৃথক্ হবার ঠিক এক মাস পরে এই দুঃখেই বাবা মারা যান। তারই কয়েক দিন পরে মা মারা যান। মা মর্‌বার সময় আমার হাত ধ'রে ব'লে গেছেন—"বাবা! যেমন ক'রে পার, ঘরের ধনকে ঘরে এন।" তাঁরা যে কয় দিন বেঁচেছিলেন, ভিটেয় জলগ্রহণ করেন নি, আমাদের এক প্রতিবেশীর বাড়ীতে রেঁধে খেতেন। তাঁদের মৃত্যুর পর আমিও ভিটে ছেড়েছি। লক্ষ্মী-জনার্দ্দনকে আন্‌তে পারি, ফিরে যাব, নইলে নয়।'

ঠাকুর নীরব হইল। রমেশ ও প্রভাবতী কোনও কথা কহিল না। কিয়ৎ-কাল পরে রমেশ আচমন করিয়া বৌদিদিকে সঙ্গে লইয়া যোগেশের গৃহে প্রবেশ করিল। যোগেশ বালিশে ঠেস্ দিয়া নিমীলিতনেত্রে ঠাকুরের কথা ভাবিতেছিল। এমন সময় রমেশ কম্পিতকণ্ঠে ডাকিল—'দাদা!'

যোগেশ উঠিয়া বসিল, বলিল—'কি রমু!'

'মা'কে আন।'

যোগেশ পত্নীর দিকে চাহিয়া বলিল—'তোমারও কি সেই মত?'

'হাঁ। আর আমার চুড়ি গড়াবার জন্যে যে টাকা আছে, তা থেকে এক শ পঁচিশ টাকা নয় আনা ঠাকুরকে দাও। ইহা পূজার খরচের মধ্যে ধরিতে হইবে।'

শ্রীসরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।

'প্রতিমা' নাটক।

মহাকবি ভাসের 'প্রতিমা' নামক নাটকখানিও সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। বিগত বৎসরের ফাল্গুন মাসের 'ভারতবর্ষে' আমরা ভাসের 'অভিষেক' নাটক সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম। সেই প্রবন্ধে বলিতে হইয়াছিল যে, রামায়ণের কথা অবলম্বন করিয়া যে সকল মহাকবি নাটক রচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে মহাকবি ভাসকেই সম্প্রতি সর্ব্বপ্রথম বলা যাইতে পারে। ভাস 'অভিষেক' নাটকে 'কিষ্কিন্ধ্যা', 'সুন্দর' ও 'যুদ্ধ'-কাণ্ডে বর্ণিত রামচরিতের অভিনয় দেখাইয়াছেন। 'প্রতিমা' নাটকে 'অযোধ্যা' ও 'অরণ্য' কাণ্ডে বর্ণিত বিষয়ের অভিনয়। 'প্রতিমা' নাটক সপ্তাঙ্কে বিভক্ত। ধর্ম্মবীর রামচন্দ্র ইহার নায়ক—পিতৃসত্য পালন করিয়া তিনি জগৎসমক্ষে পুত্রধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। এই নাটকে করুণরসের বাহুল্য যথেষ্ট বিদ্যমান। রাম-বনবাস, ভরতমিলন, সীতা-হরণ ও অবশেষে রাবণান্তক রামচন্দ্রের পিতৃরাজ্যে অভিষেক—এই বিষয়-গুলিই 'প্রতিমা' নাটকের প্রধান কথা। নাটকের নাম 'প্রতিমা' হইল কেন, তাহা ইহার তৃতীয় অঙ্ক পাঠ করিলেই অবগত হওয়া যায়। নাটকের গর্ভ-সন্ধিতে বর্ণিত বিষয়ের প্রকাশকরূপেই নামটি রক্ষিত হইয়াছে। পিতার অসুস্থতার কথা শুনিয়া মাতুলালয় হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে, ভরত অযোধ্যার উপকণ্ঠে প্রতিষ্ঠিত প্রতিমা-গৃহে প্রবেশ করিয়া তথায় পিতার পাষাণময়ী প্রতিমা দর্শন করিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, রামচন্দ্রকে বনে যাইতে আজ্ঞা করিয়া পুত্রবিরহে পিতার কি দশা হইয়াছিল; এবং এই প্রতিমা-দর্শন হইতেই তিনি অনুমান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন যে, মহারাজ দশরথ আর ইহলোকে নাই—পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

কবি এই নাটকে অনেক কল্পিত বিষয়ের অপূর্ব্ব সমাবেশে নিজের কবিত্ব-শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। সাধারণ বিষয়কে কল্পনা-প্রভাবে কিরূপে অভিনয়ের উপযোগী করা যাইতে পারে, মহাকবি ভাস 'প্রতিমা' নাটকে তাহার সুন্দর নিদর্শন প্রদান করিয়াছেন। এই নাটকের কথাবস্তু লিখিবার পূর্ব্বে কয়েকটি অবান্তর কথার আলোচনা করা যাইতেছে।

১

কেবল ব্যাস-বাল্মীকির রচিত মহাভারত রামায়ণকেই পরবর্ত্তিকালের কবিগণ উপজীব্যরূপে গ্রহণ করেন নাই; পূর্ব্ববর্ত্তী অন্যান্য প্রাচীন কবিগণের রচিত

দৃশ্য শ্রব্য কাব্য হইতেও পরবর্ত্তী কবিগণ নানা বিষয়ে সহায়তা লাভ করিয়াছেন। কাব্যনির্ম্মাণে হেতুত্রয়ের মধ্যে 'লোক-শাস্ত্র-কাব্যাদি'র বিমর্শন হইতে যে 'নিপুণতা' লাভ হয়, তাহাও একটি হেতুরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তিকালে রচিত কাব্য, ইতিহাস প্রভৃতির পুনঃ পুনঃ আলোচনা না করিলে, কবি কাব্যরচনায় পটুতা লাভ করিতে পারেন না। এই নিপুণতার অভাবে, কাব্যসংসারে তাঁহার স্থান হওয়াও কঠিন। এই হিসাবে মহাকবি কালিদাস মহাকবি ভাসের নিকট নানা বিষয়ে ঋণী ছিলেন। অন্ততঃ 'প্রতিমা' নাটক হইতে কালিদাস কোনও কোনও ভাব লইয়া স্বকাব্যে অনুরূপ-ভাব-রূপে প্রকাশ করিয়াছেন। এ স্থলে তাহাই কথঞ্চিৎ প্রদর্শিত হইতেছে। 'প্রতিমা'র প্রথম অঙ্কে সীতার যে বল্কল-পরিধান ব্যাপার বর্ণিত আছে, 'শকুন্তলা'র প্রথমাঙ্কে তাহার ছায়া দৃষ্ট হয়। এই দৃশ্যে ভাসের প্রধান ভাব—'সর্ব্বসোহণীয়ং সুরূবং ণাম'—'সুরূবের সবই শোভা পায়'। শকুন্তলাতেও [প্রথমাঙ্কে] কালিদাস—'কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্' লিখিয়া সেই ভাবই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। 'মৈথিলি! কিন্নিদমিক্ষাকূণাং বৃদ্ধালঙ্কারস্ত্বয়াধার্য্যতে'—'প্রতিমা'তে সীতার প্রতি রামের এই উক্তির সহিত, 'কুমারসম্ভবে'র পঞ্চম সর্গের ৪৪শ শ্লোকে 'কিমিত্যপাস্যাভরণানি যৌবনে, ধৃতং ত্বয়া বার্দ্ধক-শোভি বল্কলম্' পার্ব্বতীর প্রতি মহাদেবের এই উক্তির সাদৃশ্য নাই কি? প্রতিমার দ্বিতীয় অঙ্কে [১০ম শ্লোকে] 'রামো রঘুকুলশ্রেষ্ঠশ্ছায়য়েবানুগম্যতে।' লক্ষ্মণ ছায়ার ন্যায় রামের অনুগমন করিতেছেন। 'রঘুবংশে'র দিলীপও নন্দিনীকে 'ছায়েব তাং ভূপতিরন্বগচ্ছৎ।' [২য় সর্গ, ৬ষ্ঠ শ্লোকে] ছায়ার ন্যায় অনুগমন করিয়াছিলেন। 'প্রতিমা'র তৃতীয়াঙ্কে আমরা দেখি যে, রামের পিতৃপুরুষগণের পৌর্ব্বাপর্য্য এইরূপ—দিলীপ, রঘু, অজ ও তৎপর দশরথ। কালিদাসও রঘুবংশে এই ক্রমই রক্ষা করিয়াছেন। 'প্রতিমা'র পঞ্চমাঙ্কে সীতার বৃক্ষসেচন-দৃশ্য পাঠ করিলে শকুন্তলার বৃক্ষ-সেচন-কথার স্মরণ হয়। তবে বনবাসকালে 'স নৈতি খেদং কলসং বহন্ত্যাঃ'—কলস-বহন-কারিণী সীতার হস্ত খিন্ন হয় নাই, এবং রামচন্দ্রকেও এই জন্য অদূরদর্শী বলিয়া বর্ণিত দেখা যায় না; কিন্তু কণ্বাশ্রমবাসিনী শকুন্তলার 'অব্যাজ-মনোহর বপুঃ'কে যে ঋষি 'তপঃক্ষম' করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তিনি অকার্য্যকারী অদূরদর্শী। 'প্রতিমা'র পঞ্চমাঙ্কে (১১শ শ্লোক) রামচন্দ্র সীতাকে 'পুত্রকৃতক' হরিণ, দ্রুম, বিন্ধ্য বন ও সখীভূতা লতাদির নিকট বিদায় লইতে বলিতেছেন। শকুন্তলাকেও স্বামিগৃহে যাইবার সময় ('জহাতি সোঽয়ং ন পত্রকৃতকঃ পদবীং মৃগস্তে' চতুর্থাঙ্কে) তাঁহার পুত্র-

রোধকারী 'পুত্রকৃতক' মৃগের নিকট ও 'তপো কৃ'রাজির ও অং যাচনশীলা 'বনলতা'দির নিকট বিদায় লইতে হইয়াছিল। তমা'র সপ্তমাঙ্কে রামচন্দ্র সীতাদেবীকে একটি স্থান দেখাইয়া বলিতেছেন যে, সেখানে মৃগকুল অপরিচিত শুক্লবাস। ভরতকে দেখিয়া পরিত্রস্ত হইয়াছে। 'শকুন্তলা'র ষষ্ঠাঙ্কেও আমরা নায়িকাকে দুষ্যন্তের প্রতি মৃগশিশুর ('সব্বো সগন্ধেসু বিস্সসদি') অবিশ্রম্ভের কথা বলিতে শুনিয়াছি। 'প্রতিমা'র সপ্তমাঙ্কে ভরত কৃতাভিষেক রাজা রাম-চন্দ্রকে দর্শন করিয়া বলিতেছেন—'গুরুমধিগতলীলং বন্দ্যমানং জনৌঘৈর্ন্ব শশিনমিবার্ঘ্যং পশ্যতো মে ন তৃপ্তিঃ'; নবোদিত শশীকে দেখিয়া নয়নের যাদৃশী অতৃপ্তি, তাঁহাকে দেখিয়াও তাঁহার (ভরতের) তাদৃশী অতৃপ্তি।—রঘুবংশেও [দ্বিতীয় সর্গের ৭২ শ্লোকে] দিলীপের প্রজাকুল বহুকাল রাজার অদর্শনে আকুল থাকিয়া, পরে রাজা যখন রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, তখন তাঁহাকে পাইয়া 'নেত্রৈঃ পপুস্তৃপ্তিমনাপ্নুবদ্ভির্নবোদয়ং নাথমিবৌষধীনাম্", নবোদিত চন্দ্রের ন্যায় তাঁহাকে অতৃপ্তনয়নে দর্শন করিয়াছিল। কেবল ভাব সম্বন্ধে নয়, ভাসপ্রযুক্ত কতকগুলি বিশিষ্ট উপমাদি ও কতকগুলি বিশিষ্ট শব্দাদিও কালিদাসের হৃদয়ে কত দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন হইয়া ছিল, তাহাও প্রমাণিত হইতে পারে।

২

'প্রতিমা' নাটক হইতে প্রাচীনকালে ভারতীয় জনসমাজের কয়েকটি রীতি নীতির কথা ও অবশ্যজ্ঞাতব্য অন্যান্য কয়েকটি বিষয় উদ্ধৃত হইতেছে।

(ক) প্রাচীনকালে প্রত্যেক রাজবাড়ীতেই এক একটি 'সঙ্গীতশালা' থাকিত [প্রথম অঙ্ক]। উৎসবের সময় তথায় অভিনয়ের প্রয়োগ হইত।

(খ) কুলবধূগণ বিশিষ্ট সময়ে সর্ব্বজন-দৃশ্য হইতে পারিতেন; যথা,

'নির্দোষদৃশ্যা হি ভবন্তি নার্য্যো
যজ্ঞে বিবাহে ব্যসনে বনে চ।'—১ অঙ্ক। ১১ শ্লোক

যজ্ঞে, বিবাহে, বিপদে ও বনে নারীগণ দৃশ্য হইলে, তাহাতে দোষের কথা হইত না। অন্যান্য ব্যাপারে দৃশ্য হইলে দোষ হইত বলিয়া বোধ হইতেছে। তবে 'অসূর্য্যম্পশ্যা' ভাবটা অনেক পরবর্ত্তিকালের ভাব।

(গ) মহিলাগণ, অন্ততঃ কবি-সম-সময়েও অবগুণ্ঠন ব্যবহার করিতেন, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। রামচন্দ্র বনগমন সময়ে মৈথিলীকে সম্বোধন করিয়া ['অপনীয়তামবগুণ্ঠনম্'] তাঁহার অবগুণ্ঠন অপনীত করিতে বলিতেছেন।

(ঘ) রাজপ্রাসাদে 'সমুদ্রগৃহ' [চিত্র বিচিত্র ঘর] থাকার প্রমাণ পাওয়া

যায়। চিত্তব্যাক্ষেপসময়ে রাজগণ চিত্তবিনোদনের জন্য তথায় যাইয়া বিশ্রাম করিতেন। চিত্র-শিল্প ভাসের সময়ে কত উচ্চ পদবীতে আরোহণ করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ 'স্বপ্নবাসবদত্তম্' নাটকেও স্পষ্টভাবে প্রদত্ত আছে।

(ঙ) অতি প্রাচীনকালে না হইলেও, অন্ততঃ দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে, রাজাদিগের এক একটি 'প্রতিমা-গৃহ' থাকিত—সেখানে রাজবংশের উপরত পূর্ব্বপুরুষগণের পাষাণময়ী প্রতিমা রক্ষিত হইত। সেকালের ভাস্কর কত দূর দক্ষতার সহিত মানুষের আকৃতি-সংবাদিনী মূর্ত্তি গঠন করিতে পারিত— 'প্রতিমা'র তৃতীয়াঙ্কে কবি তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ প্রদান করিয়াছেন। হায়! ভারতের সেই ভাস্কর্য্য-শিল্প এখন কোথায় লুপ্ত হইল! ভরতের দিলীপ প্রভৃতি পূর্ব্বপুরুষগণের প্রতিমার বর্ণনা পাঠ করিয়া কে বলিবেন যে, ভারতীয় আর্য্যগণ শিল্পবিষয়ে কেবল ভাবতন্ত্রতারই [Idealism] পরতন্ত্র থাকিতেন, বস্তুতন্ত্রতা [Realism] প্রদর্শন করিতে পারিতেন না। তাঁহারা যে কেবল অর্চ্চনার জন্য 'অর্চ্চা' নির্ম্মাণ করিতেন, তাহা নহে; বিলাসভোগাদির জন্যও স্বভাবের অনুকরণ করিয়া বর্ণ দ্বারা প্রতিকৃতি ও পাষাণ দ্বারা প্রতিমাদির গঠন করিতেন। বাস্তুশাস্ত্রের অস্তিত্বও এই কথার প্রমাণ দিতে পারিবে। ভারতবাসিগণ কেবল পারমার্থিক [Spiritual] দিক লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন, তাহা কথনই সত্য নহে; লৌকিক বা ব্যাবহারিক [Secular] দিকেও যথেষ্ট লক্ষ্য রাখিতেন। প্রথমতঃ ত্রিবর্গের সাধনই করা হইত—চতুর্ব্বর্গসাধন সকলের ভাগ্যে ঘটিত না।

(চ) সেকালে উৎসাহের সহিত 'সাঙ্গোপাঙ্গ বেদ', 'মানবীয় ধর্ম্মশাস্ত্র', 'মাহেশ্বর যোগশাস্ত্র', 'বার্হস্পত্য অর্থশাস্ত্র', 'মেধাতিথির ন্যায়শাস্ত্র' ও 'প্রাচেতস শ্রাদ্ধকল্পাদি'র পঠন পাঠন হইত [পঞ্চমাঙ্ক]।

(ছ) পিতৃশোকাপন্ন পুত্রের শুক্লবাস-পরিধান একটি প্রাচীন প্রথা। 'শুক্লবাসসং ভরতং দৃষ্ট্বা পরিত্রস্তং মৃগযূথমাসীৎ' [সপ্তমাঙ্ক] এই বাক্যে তাহার প্রমাণ আছে। ভরত পিতৃশোকে অভিভূত হইয়া রামকে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য অনুরোধ করিতে যাইবার সময়ে শুক্লবস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন।

৩

রূপকাদি রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া কবিগণকে অলঙ্কারশাস্ত্রের ও নাট্যশাস্ত্রের নিয়মাবলী মানিয়া চলিতে হইত সত্য; কিন্তু আলঙ্কারিকগণ কবিগণকে নাটকীয় রসের সুব্যক্তির জন্য স্বকল্পনা-প্রয়োগে বিশ্রুত ইতিবৃত্তেরও অন্যথাভাব ঘটাইবার স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছেন। কেবল 'শাস্ত্র-স্থিতি-সম্পাদনেচ্ছা' থাকিলে

কবি নাটক-রচনায় সকল সময়ে সফলতা লাভ করিতে পারেন না। সাহিত্য-দর্পণকার লিখিয়াছেন যে,—

অবিরুদ্ধং তু যদ্বৃত্তং রসাদিব্যক্তয়েঽধিকম্।
তদপ্যন্যথয়েদ্ ধীমান্ ন বদেদ্বা কদাচন॥ ৬।১২১

'যে ব্যাপার বিরোধ-বিরোহিত, তাহাও রসাদিপ্রকাশে অনুপযোগী হইলে, কবি তাহার অন্যথাভাব ঘটাইতে পারেন, কিংবা তাহার উল্লেখ নাও করিতে পারেন।' আবার—

যৎ স্যাদনুচিতং বস্তু নায়কস্য রসস্য বা।
বিরুদ্ধং তৎ পরিত্যাজ্যমন্যথা বা প্রকল্পয়েৎ॥ ৬।৫০

'নায়কের যাহা অনুপযোগী বা রসের যাহা বিরোধী, কবিকে তাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে; অথবা কবি তাহা [রসোপযোগী করিয়া] অন্যথা কল্পনা করিতে পারেন।' বিষয়-বর্ণনে কবির কত দূর স্বাধীনতা থাকা আবশ্যক, তৎসম্বন্ধে মত প্রকাশ করিতে গিয়া রাজানক আনন্দবর্দ্ধনাচার্য্য 'ধ্বন্যালোকে' লিখিয়াছেন—

অপারে কাব্যসংসারে কবিরেব প্রজাপতিঃ।
যথাস্মৈ রোচতে বিশ্বং তথেদং পরিবর্ত্ততে॥
শৃঙ্গারী চেৎ কবিঃ কাব্যে জাতং রসময়ং জগৎ।
স এব বীতরাগশ্চেন্নীরসং সর্ব্বমেব তৎ॥
ভাবানচেতনানপি চেতনবচ্চেতনানচেতনবৎ।
ব্যবহারয়তি যথেষ্টং সুকবিঃ কাব্যে স্বতন্ত্রতয়া॥

'অপার কাব্যসংসারে কবিই একমাত্র স্রষ্টা প্রজাপতি। বিশ্ব তাঁহার নিকট যেমন প্রতিভাত হইবে, ইহা তেমনই পরিবর্ত্তিত হইবে। কবি যদি কাব্যে শৃঙ্গার-রস-বর্ণয়িতা হন, তাহা হইলে সমস্ত জগৎ রসময় হইয়া উঠিবে; আর তিনি যদি শান্তরস-বর্ণয়িতা হন, তাহা হইলে তাহা নীরস হইয়া উঠিবে। কাব্যে স্বতন্ত্রতাবশতঃ সুকবি যথেষ্টভাবে অচেতন ভাবকে চেতনবৎ ও চেতনভাবকে অচেতনবৎ ব্যবহার করিতে পারেন।' কোন্ মহাকবি নাটক-কাব্যে স্বতন্ত্রতা না দেখাইয়াছেন? 'যথেষ্ট ব্যবহারে' স্বাধীনতা ছিল বলিয়াই মহাকবি ভবভূতি 'উত্তর-রামচরিতে' 'ছায়া'র সৃষ্টি করিয়া করুণ-রসের সাক্ষাৎমূর্ত্তি সীতাদেবীর শোকে জগৎকে শোকাভিভূত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই স্বাধীনতার মাহাত্ম্যেই মহাকবি কালিদাস 'বিক্রমোর্ব্বশীয়' নাটকে রাজাকে উন্মত্তবেশে উর্ব্বশীর অনুসন্ধানে ব্যাপৃত রাখিয়া মদন-শর-জর্জ্জরিত হৃদয়ের কিরূপ শোচনীয় অবস্থা হইতে পারে, জগৎকে তাহা বুঝাইয়া দিতে পারিয়াছেন।

রামায়ণের কথা মূলরূপে অবলম্বন করিয়াও, মহাকবি ভাস 'প্রতিমা' নাটকে অনেক স্থলে তাহার অন্যথাভাব ঘটাইয়াছেন। প্রেক্ষাগৃহের চমৎকারাতিশয় উৎপাদন করিবার জন্যই তিনি অনেক বিশ্রুত বৃত্তান্তের পরিহার করিয়াছেন, আবার অনেক বৃত্তান্তের বিভিন্নতা ঘটাইয়া বর্ণনা করিয়াছেন। রামায়ণ-বর্ণিত কোন্ কোন্ প্রধান ঘটনার সহিত 'প্রতিমা'তে বর্ণিত ঘটনার অনৈক্য বা বিপর্য্যয় দৃষ্ট হয়, তাহাই নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

(ক) 'প্রতিমা'র প্রথমাঙ্কে দেখা যায় যে, রামচন্দ্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবার জন্য মহারাজ দশরথ যে উদ্যোগ করিয়াছিলেন, সীতাদেবী তাহা অবগত ছিলেন না। কিন্তু রামায়ণে [অযোধ্যাকাণ্ডের চতুর্থ সর্গে ৩৩ শ্লোকে] দেখা যায় যে, কৌশল্যা—'সীতা চানয়িতা শ্রুত্বা প্রিয়ং রামাভিষেচনম্'—রামাভিষেকের প্রিয় সংবাদ শুনিয়া, সীতাকে নিজান্তঃপুরে আনাইয়াছিলেন ;- এবং রামচন্দ্রও ভার্য্যা-সকাশেই মাতার সহিত আগামী দিবসে সম্পাদ্য অভিষেকের কথা আলাপ করিয়াছিলেন।

(খ) এই নাটকে, ভরত প্রতিমা-গৃহে প্রবেশ করিয়া পিতার পাষাণময়ী প্রতিমা দর্শন করিয়া তাঁহার স্বর্গপ্রাপ্তির কথা অনুমান করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু রামায়ণে ও পরবর্ত্তী কালে রচিত অন্যান্য কাব্যাদিতে পাঠ করা যায় যে, ভরতের মাতুলালয় হইতে আগমন প্রতীক্ষা করিয়া অমাত্যবর্গ ও বন্ধুগণ পূতি-নিবারণের জন্য রাজার মৃতদেহ তৈলদ্রোণীতে রাখিয়া দিয়াছিলেন ; ভরতও তাহা সেইরূপ রক্ষিতই দেখিয়াছিলেন ; এবং তৎপরে তিনি সেই দেহের সংকারসাধন করিয়াছিলেন। 'প্রতিমা'র তৃতীয়াঙ্কে বর্ণিত প্রতিমা-গৃহাদির কথা ভাসের স্বকপোলকল্পিত সুন্দর সৃষ্টি।

(গ) পঞ্চমাঙ্কে রামচন্দ্র পিতৃতর্পণের জন্য কাঞ্চনপার্শ্ব মৃগের অনুধাবন করিয়াছিলেন। কিন্তু রামায়ণে তাড়কা-সুত মারীচ মৃগরূপ ধারণ করিয়া সীতার প্রলোভন উৎপাদন করায়, সীতার অনুরোধে রামচন্দ্র তাহাকে ধরিয়া আনিবার জন্য বহির্গত হন, এবং সেই সুযোগেই রাবণ সীতার কুটীরে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে হরণ করেন।

(ঘ) 'প্রতিমা'র ষষ্ঠ অঙ্কে আমরা দেখিতে পাই যে, ভরত রামদর্শনার্থ আর একবার সুমন্ত্রকে জনস্থানে পাঠাইয়াছিলেন, এবং সুমন্ত্র রাবণ কর্ত্তৃক সীতা-হরণের কথা তথায় জানিয়া আসিয়া, তাহা ভরতের নিকট সভয়ে নিবেদন করিতেছেন ; এবং কুমার ভরতও তাহা রাজভবনে সকলের নিকটই প্রকাশ

করিয়া, কৈকেয়ীর উপর পুনরায় রোষ প্রকাশ করিতেছেন। রামায়ণে এরূপ কোনও ঘটনার কথা উল্লিখিত নাই।*

অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক ঘটনা সম্বন্ধেই অভিনয়োপযোগিতার জন্য ভাসের বর্ণনা রামায়ণের বর্ণনা হইতে বিভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। পাঠক নিম্নোদ্ধৃত কথাবস্তু হইতেই, উভয়ের অনৈক্যস্থল স্বয়ং ধরিয়া লইতে পারিবেন।

৪

এই উপোদ্‌ঘাতের উপসংহারের পূর্ব্বে আর একটি গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসায় 'প্রতিমা' নাটক কত দূর সাহায্য করিতে পারে, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। প্রশ্নটি এই, রামাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠত্ব-ক্রম কিরূপ ছিল? প্রায় ছয় সাত শত বৎসর পূর্ব্বেও এই প্রশ্ন উত্থিত হইয়াছিল, এবং মনীষিগণ তাহার মীমাংসার চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য পণ্ডিতগণ নানাপ্রকার পরীক্ষার পর সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, রামায়ণ প্রথম হইতেই সপ্তকাণ্ডাত্মক ছিল না;—অযোধ্যাকাণ্ড, অরণ্যকাণ্ড, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, সুন্দরকাণ্ড ও যুদ্ধকাণ্ড (বা লঙ্কাকাণ্ড)—এই পঞ্চকাণ্ডই মূল রামায়ণ ছিল। আদিকাণ্ড ও উত্তরকাণ্ড পরবর্ত্তী কালের রচনা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। প্রায় দুই হাজার বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী মহাকবি ভাসের সময়ে এই শেষোক্ত কাণ্ডদ্বয় রচিত হইয়াছিল কি না, তাহা একটি তর্কসঙ্কুল কথা। কিন্তু এই মহাকবি রামবৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া, 'অভিষেক' ও 'প্রতিমা' নামে যে দুইখানি নাটকের রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে বর্ণিত ঘটনার মূল কেবল পঞ্চকাণ্ডাত্মক রামায়ণেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই নাটকদ্বয়ে আদি বা উত্তরকাণ্ডের কোনও ঘটনাই উল্লিখিত হয় নাই। কালে ভাস-রচিত রামায়ণীয় অন্য কোনও নাটকাদি আবিষ্কৃত হইবে কি না, তাহা বলা যায় না। সে যাহা হউক, মহাকবি ভাসের পর কালিদাসের আবির্ভাবসময়ের মধ্যে সেই অতিরিক্ত কাণ্ডদ্বয়ের বর্ত্তমান থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। উত্তরকাণ্ডের সীতার বনবাস পরিজ্ঞাত না থাকিলে, কালিদাস রঘুবংশের সীতা-পরিত্যাগ-নামক চতুর্দ্দশ সর্গের সৃষ্টি করিয়াছিলেন কেমন করিয়া? আরও পরবর্ত্তী কালের মহাকবি ভবভূতির রচিত 'উত্তর-রাম-চরিত' নাটকের নাম হইতেই, কবির রামায়ণীয় উত্তরকাণ্ডে বর্ণিত বিষয়ের অবগতি অনুমিত হইতে পারে।

পঞ্চকাণ্ডাত্মক মূল রামায়ণ হইতে ইহা সপ্রমাণ করা যাইতে পারে যে, ভ্রাতৃ-চতুষ্টয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠত্ব-ক্রম এইরূপ—রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন। ভাসের 'প্রতিমা' নাটকেও এই ক্রম লক্ষিত হয়। কিন্তু রামায়ণের আদিকাণ্ডে দেখা

যায় যে, ভরত লক্ষ্মণের জ্যেষ্ঠ। কালিদাস রঘুবংশের দশম সর্গে আদিকাণ্ডোক্ত ক্রম রক্ষা করিয়াছেন—ভবভূতি ও ভট্টিকাব্য-কারও তাহাই করিয়াছেন। আবার, কালিদাস রঘুবংশের ত্রয়োদশ সর্গে মূল রামায়ণে উল্লিখিত ও ভাস কর্তৃক গৃহীত ক্রমই রক্ষা করিয়াছেন। মূলোদ্ধার-পূর্ব্বক এই বিষয়ের বিচার করা আবশ্যক মনে করিয়া, তাহাই করা হইতেছে। রামায়ণে [আদিকাণ্ডের অষ্টাদশ সর্গে] উক্ত হইয়াছে—

কৌসল্যা জনয়দ্রামং দিব্যলক্ষণ-সংযুতম্। ১০।
ভরতো নাম কৈকেয্যাং জজ্ঞে সত্যপরাক্রমঃ। ১৩।
অথ লক্ষ্মণশত্রুঘ্নৌ সুমিত্রাজনয়ৎ সুতৌ। ১৪।

ইহা হইতে বুঝা যায়, রামায়ণ-কার এই স্থলে মনে করিতেছেন যে, সর্ব্বজ্যেষ্ঠ রাম, তদনু ভরত, তৎপর লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন। কালিদাসও রঘুবংশের দশম সর্গে এইরূপ লিখিয়াছেন, যথা,

অথাগ্রমহিষী রাজ্ঞঃ প্রসূতি-সময়ে সতী।
পুত্রং তমোপহং লেভে নক্তং জ্যোতিরিবৌষধিঃ ॥ ৬৬ ॥
রাম ইত্যভিরামেণ বপুষা তস্য চোদিতঃ।
নামধেয়ং গুরুশ্চক্রে জগৎপ্রথমমঙ্গলম্ ॥ ৬৭ ॥

* * * * * *

কৈকেয্যাস্তনয়ো জজ্ঞে ভরতো নাম শীলবান্। ৭০।

* * * * * * *

সুতৌ লক্ষ্মণ-শত্রুঘ্নৌ সুমিত্রা সুষুবে যমৌ। ৭১।

উপরি-উদ্ধৃত বর্ণনা হইতেও ভরতকে লক্ষ্মণের অগ্রজ-রূপে পাওয়া যাইতেছে। ভট্টিকাব্য-কার আরও স্পষ্ট করিয়া এই ক্রমই রক্ষা করিয়াছেন ; যথা,—

কৌশল্যয়াসাবি সুখেন রামঃ প্রাক্ কেকয়ীতো ভরতস্ততোঽভূৎ।
প্রাসোষ্ট শত্রুঘ্নমুদারচেষ্টমেকা সুমিত্রা সহ লক্ষ্মণেন ॥ ১।১৪

ভবভূতিও এই পৌর্ব্বাপর্য্যই অবলম্বন করিয়াছেন। 'উত্তর-রাম- চরিতে'র প্রথমাঙ্কে চিত্রদর্শন-সময়ে লক্ষ্মণ সীতাদেবীকে চিত্রপট দেখাইয়া বলিতেছেন,—

'ইয়মার্য্যা, ইয়মপ্যার্য্যা মাণ্ডবী, ইয়মপি বধূঃ শ্রুতকীর্ত্তিঃ।'

ভরত-পত্নীর নামোল্লেখ-কালে, লক্ষ্মণ পূজা-সূচক 'আর্য্যা' উপপদ প্রয়োগ করিতেছেন। কাজেই কবি লক্ষ্মণকে ভরতের অনুজ মনে করিতেছেন, ইহা বলা যাইতে পারে। এই গেল এক পক্ষ। অন্য পক্ষে আবার কালিদাস রঘুবংশেরই ত্রয়োদশ সর্গে যেরূপ ভাবে ঘটনার বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি লক্ষ্মণকে

ভরতের অনুজ না মনে করিয়া, তাঁহার অগ্রজ বলিয়াই মনে করিয়াছেন,—এইরূপ প্রমাণিত হয়। যথা,

দুর্জ্জাতবন্ধুরয়মৃক্ষহরীশ্বরো মে পৌলস্ত্য এষ সমরেষু পুরঃপ্রহর্ত্তা।
ইত্যাদৃতেন কথিতৌ রঘুনন্দনেন ব্যুৎক্রম্য লক্ষ্মণমুভৌ ভরতো ববন্দে॥ ৭২॥
সৌমিত্রিণা তদনু সংসসৃজে স চৈনমুত্থাপ্য নম্রশিরসং ভৃশমালিলিঙ্গ।
রূঢ়েন্দ্রজিৎপ্রহরণ-ব্রণ-কর্কশেন ক্লিশ্যন্নিবাস্য ভুজমধ্যমুরঃস্থলেন॥ ৭৩॥

প্রস্তুত বিষয় হইতে দেখা যাইতেছে যে, ভরত রাবণবধান্তে সীতা ও লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া অযোধ্যাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তনকারী রামচন্দ্রকে প্রত্যুদ্গমন করিয়া লইতে আসিয়াছেন। রামচন্দ্র ভরত-সমীপে তাঁহার লঙ্কা-সমর-সুহৃৎ সুগ্রীব ও বিভীষণকে সাদরে পরিচিত করিয়া দিতেছেন। 'ঋক্ষবানরাধিপতি এই ব্যক্তি [সুগ্রীব] আমার আপদ্‌বন্ধু ; এই পৌলস্ত্য [বিভীষণ] যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রযোদ্ধা ছিলেন—এইরূপে সাদরে রঘুনন্দন [রাম] উভয় ব্যক্তিকে ভরতের নিকট পরিচিত করিয়া দিলে, ভরত লক্ষ্মণকে ব্যতিক্রম করিয়া তাঁহাদিগকেই নমস্কার করিলেন।' উপরি-উদ্ধৃত প্রথম শ্লোকটির এরূপ অনুবাদ প্রদত্ত হইতে পারে। বন্দন-ক্রিয়া সম্বন্ধেই ভরত কর্ত্তৃক লক্ষ্মণের ব্যতিক্রম বুঝা যাইতেছে। লক্ষ্মণ অগ্রজ হইলেও, ভরত তাঁহাকে প্রথমতঃ প্রণাম না করিয়া, নব-পরিচিত রামের পরম সহায় সুগ্রীব ও বিভীষণকেই প্রণাম করিয়াছিলেন, ইহাই শ্লোকের তাৎপর্য্য। কিন্তু প্রসিদ্ধ টীকাকার মল্লিনাথ [হয় ত, ভরতকেই লক্ষণের অগ্রজ মনে করিয়া] ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—'লক্ষ্মণমনুজমপি ব্যুৎক্রম্য আলিঙ্গনাদিভিরসম্ভাব্য ভরতো ববন্দে'—অর্থাৎ, লক্ষ্মণ কনিষ্ঠ হইলেও, তাঁহাকে আলিঙ্গনাদি দ্বারা সম্মানিত না করিয়া, ভরত তাঁহাদিগকেই প্রণাম করিয়াছিলেন। একটি অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াও টীকাকার চারিত্রবর্দ্ধন যে একটি বিকল্প ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন, তাহাই ঠিক বলিয়া মনে হয় ;—যথা, "লক্ষ্মণং ব্যুৎক্রম্য লক্ষ্মণপ্রণতিং পরিত্যজ্য তৌ ববন্দে ইতি ব্যাখ্যায়াং লক্ষ্মণস্য জ্যেষ্ঠত্বং প্রতীয়তে ইতি'—অর্থাৎ, লক্ষ্মণের প্রতি বিধেয় প্রণতি পরিত্যাগ করিয়া, ভরত তাঁহাদিগকেই বন্দনা করিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা লক্ষ্মণের জ্যেষ্ঠত্ব প্রতীত হয়। উদ্ধৃত দ্বিতীয় শ্লোকটির ব্যাখ্যায়ও মল্লিনাথ অকারণে অনেকটা কষ্টকল্পনা করিয়াছেন। ব্যাখ্যাকালে তিনি একটি বিচারের অবতারণা করিয়া ও রামায়ণের টীকাকারের মতোদ্ধার করিয়া নিজ বিশ্বাসের অনুগামিনী ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। শ্লোকটির স্বাভাবিক অর্থের অনুসরণ করিয়া নিম্নলিখিতরূপ অনুবাদ প্রদত্ত হইতে পারে। 'তৎপর

[সুগ্রীবাদির বন্দনার পর] তিনি [ভরত] লক্ষ্মণের সহিত সঙ্গত হইলেন। আর তিনিও [লক্ষ্মণও] নমিত-মস্তক উঁহাকে [ভরতকে] উঠাইয়া লইয়া, ইন্দ্রজিতের আয়ুধপ্রহারে সংজাতব্রণ নিজের কর্কশ বক্ষঃস্থল দ্বারা তাঁহার [ভরতের] বক্ষঃস্থল সংপীড়িত করিয়া তাঁহাকে অত্যর্থ আলিঙ্গন করিলেন।' এ স্থলে 'নম্রশিরাঃ' ভরত। 'এনং' পদ ভরতকে, এবং 'সঃ' পদ ও 'অস্য' পদ ভরতকে বুঝাইতেছে। মল্লিনাথ ভরতকে লক্ষ্মণের জ্যেষ্ঠ ধার্য্য করিয়া, ব্যাখ্যায় লক্ষ্মণকে "নম্রশিরাঃ' [প্রণত] মনে করিয়াছেন। তাঁহার মতে, ভরতই ['সঃ'] প্রণত লক্ষ্মণকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। মল্লিনাথ এ স্থলে যে বিচারের অবতারণা করিয়াছেন, তাহাও এখানে উল্লেখযোগ্য। তিনি প্রশ্ন তুলিয়াছেন, 'নমু রামায়ণে—

ততো লক্ষ্মণমাসাদ্য বৈদেহীং চ পরন্তপঃ।
অভিবাদ্য ততঃ প্রীতো ভরতো নাম চাব্রবীৎ॥

ইতি ভরতস্য কানিষ্ঠ্যং প্রতীয়তে। কিমর্থং জ্যেষ্ঠমবলম্ব্যানার্জবেন শ্লোকঃ ব্যাখ্যাতঃ।'—'প্রশ্ন এই যে, রামায়ণে উক্ত হইয়াছে যে "পরন্তপ ভরত তৎপরে লক্ষ্মণ ও বৈদেহীকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলেন, তৎপরে প্রীত হইয়া স্বনাম কীর্ত্তন করিলেন।" ইহা হইতে ভরতের কনিষ্ঠতা প্রতীত হইতেছে না কি? তবে কেন তাঁহার জ্যেষ্ঠত্ব কল্পনা করিয়া অসরলভাবে শ্লোকটি ব্যাখ্যাত হইল?' নিজ ব্যাখ্যাকেও মল্লিনাথ কথঞ্চিৎ অসরল বলিয়া স্বীকার করিলেন। সে যাহা হউক, এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়া তিনি তাহার মীমাংসা করিতে উদ্যত হইয়া এইরূপ লিখিয়াছিলেন,—'সত্যম্। কিন্তু রামায়ণ-শ্লোকার্থঃ টীকাকৃতোক্তঃ শ্রূয়তাম্। "ততো লক্ষ্মণমাসাদ্য"—ইত্যাদি শ্লোকে আসাদনং লক্ষ্মণবৈদেহ্যোঃ অভিবাদনং তু বৈদেহ্যা এব। অন্যথা পূর্ব্বোক্তং ভরতস্য জ্যৈষ্ঠ্যং বিরুধ্যেতেতি।'—'যাহা আপত্তিরূপে উপস্থাপিত হইল—তাহা সত্য। টীকাকার রামায়ণ-শ্লোকের যে অর্থ প্রদান করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর—'ততো লক্ষ্মণমাসাদ্য'—ইত্যাদি শ্লোকে যে 'আসাদন' [প্রাপ্তি] ক্রিয়ার উল্লেখ আছে, লক্ষ্মণ ও বৈদেহী উভয়েই সেই ক্রিয়ার কর্ম্ম, কিন্তু 'অভিবাদন' ক্রিয়াটির কর্ম্ম কেবল বৈদেহী—অর্থাৎ ভরত, লক্ষ্মণ ও বৈদেহী, উভয়কেই প্রাপ্ত হইলেন—অভিবাদন করিলেন কেবল বৈদেহীকে। এরূপ ব্যাখ্যা না করিলে, পূর্ব্বোক্ত [আদিকাণ্ডে উক্ত] ভরতের জ্যেষ্ঠত্বের সহিত এ স্থলে বিরোধ উপস্থিত হয়।' রামায়ণের টীকাকারের এইরূপ ব্যাখ্যা দেখিয়া মনে হয় যে, তিনি আদিকাণ্ডকে মূল রামা-

য়ণের অংশরূপেই গণ্য করিতেন; তাই তিনি এই ভাবে পূর্ব্বাপর-বিরোধের ভঞ্জনে ব্যস্ত হইয়াছিলেন। রঘুবংশের অন্য দুই টীকাকার—হেমাদ্রি ও চারিত্রবর্দ্ধনও ৭৩ শ্লোকে ভরতই লক্ষ্মণকে অভিবাদন করিয়াছিলেন বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডেও দেখা যায় যে, লক্ষ্মণই ভরতের অগ্রজ। চিত্রকূট পর্ব্বতে ভরত রামসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া এক স্থলে বলিতেছেন—

ইতি[[লোক-সমাকৃ[ক্রু]-ষ্টঃ পাদেষদ্য প্রসাদয়ন্।
রামং তস্ক পতিষ্যামি সীতায়া লক্ষ্মণস্য চ ॥—অযোধ্যাকাণ্ড; ৯৯।১৭

'এইরূপে লোক-নিন্দিত হইয়া, অদ্য আমি রামকে প্রসন্ন করিয়া, তাঁহার, সীতার ও লক্ষ্মণের পদতলে পতিত হইব।' সুপ্রাচীন মহাকবি ভাসের প্রতিমা নাটকের চতুর্থ ও সপ্তম অঙ্ক হইতে আমরা বহুল প্রমাণ পাইতে পারি যে, মহাকবি লক্ষ্মণকে ভরতের জ্যেষ্ঠরূপে পরিচয় দিয়াছেন। ভরত লক্ষ্মণকে—'আর্য্য! অভিবাদয়ে' বলিয়া প্রণাম করিতেছেন; আর অগ্রজ লক্ষ্মণও অনুজ ভরতকে 'বৎস, স্বস্ত্যায়ুষ্মান্ ভব' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। পাঠকগণ অবগত থাকিতে পারেন যে, বঙ্গদেশেও মৌখিক ক্রমটি এইরূপ—রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, [ও] শত্রুঘ্ন। অতঃপর 'প্রতিমা' নাটকের কথাবস্তু প্রদত্ত হইতেছে।

কথাবস্তু।

দেবাসুরযুদ্ধে অপ্রতিহত-মহারথ, অযোধ্যাধিপতি দশরথ বৃদ্ধবয়সে মনে মনে স্থির করিলেন,—জ্যেষ্ঠপুত্র রামচন্দ্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া, স্বয়ং ইক্ষ্বাকুদিগের কুলব্রত বানপ্রস্থধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বনে যাইবেন। মহারাজের আদেশ প্রচারিত হইল,—'অভিষেকের উপযোগী দ্রব্যসম্ভার আনীত হউক।' রামচন্দ্র রাজ্যে অভিষিক্ত হইবেন,—এই বার্ত্তা রাজ্যে প্রচারিত হইলে পর, প্রজাকুল কৃতকৃত্য বোধ করিতে লাগিল। সমস্ত অযোধ্যারাজ্য আজ উৎসব-ময় হইয়া উঠিল। অভিষেকের জন্য সভামধ্যে রাজছত্র স্থাপিত হইল; নন্দি-পটহ-নিনাদ-সহকারে ভদ্রাসন রচিত হইল। দর্ভ-কুসুম-সংবলিত, তীর্থোদক-পরিপূর্ণ, সুবর্ণময় কলস স্থাপিত হইল। নিমন্ত্রিত রাজন্যবর্গ ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের আনয়নের জন্য পুষ্পরথ যুক্ত হইল। রাজভবনে মন্ত্রিগণ ও পুরবাসিগণ উপস্থিত হইয়াছেন। সর্ব্বমঙ্গলাস্পদ ভগবান্ বশিষ্ঠ বেদীতে উপবিষ্ট। রাজকঞ্চুকী রাজপুরোহিতকে ডাকিয়া আনিতে ত্বরমান। রাজভবনের কোনও পরিচারিকা সঙ্গীতশালায় গমন করিয়া, অভিষেককালোপযোগী নাটকের অভিনয় করিবার জন্য নটদিগকে সজ্জিত হইতে বলিতে যাইতেছে। সভাস্থলে পৌর-জানপদ সকলে উপস্থিত।

অভিষেকক্রিয়া প্রায় আরব্ধ। রাজধানী পটহধ্বনিতে নিনাদিত হইল। গুরুজনেরা রাজ্যাভিষেকসময়ে রামচন্দ্রকে আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য তথায় উপস্থিত হইলেন। রামচন্দ্র ভদ্রাসনে উপবিষ্ট হইয়া বদন আনমিত করিয়া রহিয়াছেন। লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন অভিষেক-ঘট তাঁহার মস্তকোপরি উত্তোলিত করিয়াছেন। আনন্দাশ্রুপরিপ্লুতনেত্র মহারাজ দশরথ স্বয়ং রাজচ্ছত্র ধারণ করিয়া রহিয়াছেন! এমন শুভমুহূর্ত্তে মধ্যমা মহিষীর পরিচারিকা মন্থরা কেন অমন্থরগতিতে হঠাৎ ক্রিয়াক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া, মহারাজের কর্ণে কি বলিয়া গেল। আর তৎক্ষণাৎ রামচন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া মহারাজ দশরথ 'হে পুত্র! সম্প্রতি বিশ্রাম অনুভব কর', এই বলিয়া অভিষেক রহিত করিয়া দিলেন। হঠাৎ পটহধ্বনি স্তব্ধীভূত হইল। সভাস্থ সকলেই নির্ব্বাক্। রামচন্দ্রের ধৈর্য্যে সকলেই বিস্মিত; কিন্তু রামচন্দ্র মনে মনে হাসিয়া ভাবিলেন:—

'স্বঃ পুত্রঃ কুরুতে পিতুর্যদি বচঃ কস্তত্র ভো বিস্ময়ঃ।'

'নিজপুত্র যদি পিতার বচন প্রতিপালন করেন, তাহাতে বিস্ময়ের কথা কি?' বরং রাজ্যভার স্কন্ধোপরি উপনীত না হইতেই অপনীত হওয়ায়, তাঁহার মন যেন উচ্ছ্বাস লাভ করিল। তাঁহার মনে এই সুখ যে, 'দিষ্ট্যা স এবাস্মি রামঃ, মহারাজ এব মহারাজঃ।'

'সৌভাগ্যক্রমে আমি সে রামই রহিলাম; মহারাজই মহারাজ থাকিলেন।' রামচন্দ্র এখন সীতার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন, মনে করিলেন। এ দিকে সীতাদেবী কিন্তু রাজপুরীর ঘটনার বিষয় সম্যক্ অবগত ছিলেন না। তিনি অন্তঃপুরে পরিচারিকা অবদাতিকার সহিত পরিহাসে রত ছিলেন। এই পরিচারিকা পরিহাসচ্ছলে রাজসঙ্গীতশালার নেপথ্যশালিনী রেবাকে না বলিয়া, সেই স্থান হইতে একখানি বল্কল লইয়া আসিয়াছে। 'সর্ব্বসোহনীয়ং সুরূবং নাম'—'সুরূপের সবই শোভা পায়।' সীতাদেবীও পরিহাসপূর্ব্বক এই বল্কল পরিধান করিয়া, এক পার্শ্বচারিণীকে আদর্শ আনিতে আদেশ করিলেন। এমন সময়ে এক চেটী সসম্ভ্রমে তথায় উপস্থিত হইয়া, রামচন্দ্র রাজ্যে অভিষিক্ত হইবেন—এই প্রিয়বার্ত্তা দেবীসমীপে নিবেদন করিল। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া সীতাদেবী প্রথমতঃ বৃদ্ধ শ্বশুরের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া চেটীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'অবি তাদো কুসলী।' 'তাত (দশরথ) কুশলে আছেন ত?' চেটী উত্তরে জানাইয়া দিল যে, মহারাজ স্বয়ংই রামচন্দ্রের অভিষেক সম্পাদিত করিতেছেন। শুনিয়া সীতার আনন্দ ধরে না; তিনি বলিলেন—'জই এব্বং

দ্বদীয়ং মে পিয়ং সুদং'—'যদি তাহাই হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমি দ্বিতীয় প্রিয়বার্ত্তা শুনিলাম'।' সন্তুষ্ট হইয়া তিনি স্বশরীরের আভরণ খুলিয়া লইয়া চেটীকে পুরস্কারস্বরূপ তাহা প্রদান করিলেন। পাঠক স্মরণ রাখিবেন, কবি কি কৌশলে সীতাকে পূর্ব্ব হইতেই বল্কলপরিহিতা ও নিরাভরণা রমণী সাজাইয়া রাখিলেন।

সাধারণবেশে রামচন্দ্র তথায় উপস্থিত। রামচন্দ্রের এই বেশ দেখিয়া সীতাদেবী ভাবিলেন, অভিষেকের বার্ত্তা নিশ্চয়ই অলীক হইবে; এবং পরিচারিকা অবদাতিকার নিকট—'বহুবুত্তাণি রাজউলাণি নাম'—'রাজকুলে কত ঘটনাই [কত ভাবে] ঘটিয়া থাকে' এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতেছিলেন। সীতা কুতূহলাক্রান্তহৃদয়া হইয়া আর্য্যপুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে নাথ, 'অভিষেক' 'অভিষেক' বলিয়া এই পরিচারিকাগণ কি বলিতেছে?' রামচন্দ্র বলিলেন, 'যাহা শুনিতেছ, তাহা অলীক নহে। অভিষেক হইতেছিল বটে; অদ্যই মহারাজ স্বয়ং আমাকে বাল্যাভ্যস্ত অঙ্কে তুলিয়া লইয়া, আমার মাতৃগোত্র উল্লেখ করিয়া, উপাধ্যায়, মন্ত্রী ও প্রকৃতিজনের সমক্ষে, "পুত্র রাম! প্রতিগৃহ্যতান্ রাজ্যম্"—"হে পুত্র রাম! রাজ্য গ্রহণ কর" এই বলিয়া আমাকে রাজ্য দিতে চাহিয়াছিলেন।' তদুত্তরে তিনি পিতাকে কি বলিয়াছিলেন, সীতাদেবী তাহা জিজ্ঞাসা করিলে পর, রামচন্দ্র প্রশ্ন করিলেন,—'আমি পিতাকে কি বলিয়াছিলাম, তৎসম্বন্ধে 'মৈথিলি! ত্বং তাবৎ কিং তর্কয়সি?' 'হে মৈথিলি! তুমি কি মনে কর?' সীতা রামের মনোভাব জানিতেন, তাই তিনি উত্তর করিলেন—

'তক্কেমি অজ্জউত্তেন অভনিঅ কিঞ্চি, দিগ্ঘং নিস্সসিঅ, মহারাজসস্ পাদমূলেসু পড়িঅং ত্তি"—'আমার মনে হয়, যে আর্য্যপুত্র তখন কিছু না বলিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, মহারাজের পাদমূলে পতিত হইয়াছিলেন।' সীতার তর্ক ঠিক। ভগবানের রাজ্যে—

অল্পং তুল্যশীলানি দ্বন্দ্বানি সৃজ্যন্তে।

'তুল্য চরিত্রের যুগল অল্পই সৃষ্ট হয়।' যখন পিতা নিজ প্রাণ শপথ করিয়া রামকে অভিষিক্ত হইবার জন্য অনুরোধ করিলেন, তখন রামচন্দ্র অভিষেক গ্রহণ করিতে স্বীকার করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি বলিলেন যে, তখনই—

সম্ভ্রান্তয়া কিমপি মন্থরয়া চ কর্ণে
রাজ্ঞঃ শনৈরভিহিতং চ ন চাস্মি রাজা।

'সম্ভ্রান্তা মন্থরা রাজার কানে কানে ধীরে ধীরে কি বলিয়া গেলেন; আর তখনই আমি আর রাজা হইতে পারিলাম না।' সীতাদেবীও ভাবিলেন,

'পিঅং মে মহারাও্যো এব্ব মহারাও্যো, অজ্জউত্তো এব্ব অজ্জউত্ত।' প্রিয় সংবাদ বটে—মহারাজই মহারাজ থাকিলেন, আর আমার আর্য্যপুত্রও আর্য্যপুত্র থাকিলেন। রামচন্দ্র সীতাকে অচির-সংঘটিত অলঙ্কার-ত্যাগের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বল্কলধারণের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, এমন সময়ে হঠাৎ 'হাহা মহারাজঃ' নারীপুরুষকণ্ঠোত্থিত এইরূপ নির্ম্ম্যাদ শোকধ্বনি শ্রুত হইল। কঞ্চুকী আসিয়া সংবাদ দিলেন যে, মহারাজকে রক্ষা করিতে হইবে। কাহার দোষে মহারাজের বিপদ উপস্থিত হইল, রামচন্দ্র কঞ্চুকীকে তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। কেন অভিষেক বিসর্জ্জিত হইয়াছিল, রামচন্দ্র এতক্ষণ কিছুই জানিতে পারেন নাই। মহারাজের বিপদ কিন্তু স্বজনের দোষে সংঘটিত; রামচন্দ্র 'স্বজন' কথা শুনিয়া বড়ই লজ্জিত বোধ করিতে লাগিলেন; কারণ—

শরীরেঽরিঃ প্রহরতি হৃদয়ে স্বজনস্তথা।

'শত্রু যেমন শরীরে প্রহার করে, স্বজন তেমনই হৃদয়ে প্রহার করে।' কঞ্চুকী নাম-নির্দ্দেশপূর্ব্বক বলিলেন যে, দেবী কৈকেয়ী রাজার বিপদের কারণ হইয়াছেন। রামচন্দ্র ভাবিলেন, তবে ইহার ফল দোষযুক্ত হইতে পারে না—ভবিষ্যতে ইহা গুণ বলিয়াই প্রতীত হইবে। তিনি কঞ্চুকীকে বুঝাইয়া দিলেন যে—

যস্যাঃ শক্রসমো ভর্ত্তা ময়া পুত্রবতী চ যা।
ফলে কস্মিন্ স্পৃহা তস্যা যেনাকার্য্যং করিষ্যতি।

'যাঁহার স্বামী ইন্দ্রতুল্য, যিনি আমার মত পুত্র দ্বারা পুত্রবতী—তাঁহার কোন ফলে স্পৃহা হইতে পারে, যাহার জন্য অকার্য্যে ব্রতী হইবেন?' উপহত স্ত্রীবুদ্ধিতে রাম-হৃদয়ের ঋজুত্ব প্রতিফলিত হইতে দেখিয়া, কঞ্চুকী রামকে জানাইলেন যে, কৈকেয়ীর বচনেই অভিষেক নিবৃত্ত হইয়াছে। অভিষেক-নিবৃত্তিতে যে কত উপকার সাধিত হইয়াছে, তাহা বুঝাইবার জন্য সরলাশয় মনস্বী রামচন্দ্র কঞ্চুকীকে বলিলেন—

বনগমননিবৃত্তিঃ পার্থিবস্যৈব তাব-
ন্মম পিতৃপরবত্তা বালভাবঃ স এব।
নবনৃপতিবিমর্শে নাস্তি শঙ্কা প্রজানা-
মথ চ ন পরিভোগৈর্বঞ্চিতা ভ্রাতরো মে।

মহারাজের বনগমন নিবৃত্ত হইল; আমি পিতৃপরাধীনই থাকিলাম; আমার সেই বালভাবই বিদ্যমান রহিল; নূতন রাজার কার্য্যকলাপে প্রজাদের শঙ্কার কারণ উপস্থিত হইল না; অথচ আমার ভ্রাতৃগণকে পরিভোগ-বঞ্চিত হইতে

হইল না।' কঞ্চুকী রামকে দেখাইয়া দিলেন যে, অনাহূত উপস্থিত হইয়া 'ভরতোঽভিষিচ্যতাং রাজ্যে'—'ভরত রাজ্যে অভিষিক্ত হউক,' কৈকেয়ীর এরূপ বলা অলোভের কারণ হইতে পারে না। রামচন্দ্রের কি মহৎ উত্তর! তিনি স্বপক্ষপাতের দোষ দেখাইয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, কৈকেয়ী,

শুল্কে বিপণিতং রাজ্যং পুত্রার্থে যদি যাচ্যতে।
তস্যা লোভোঽত্র নাস্মাকং ভ্রাতৃরাজ্যাপহারিণাম্॥

'যদি শুল্ক-বিপণিত রাজ্য পুত্রের জন্য যাচ্ঞা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার লোভ হইল! আর আমরা ভ্রাতৃরাজ্যাপহারী হইলে তাহাতে আমাদের অলোভ?' ইহার পর আর রামচন্দ্র মাতৃপরিবাদ শ্রবণ করিতে চাহিলেন না, পিতার অবস্থা শ্রবণ করিতে চাহিলেন। তিনি শোকে বচনশূন্য হইয়া মোহ প্রাপ্ত হইয়াছেন—ইহাই মহারাজের অবস্থা। অক্ষোভ্য ধৈর্য্যসাগর লক্ষ্মণ আজ পিতার অবস্থা জানিয়া ক্ষুব্ধ ও রুষ্ট হইয়া ধনুর্ব্বাণহস্তে তথায় উপস্থিত—পৃথিবীকে তিনি যুবতীরহিত করিতে কৃতনিশ্চয়—এ বিষয়ে দয়ার কোনও কথাই হইতে পারে না। রামের ক্রমপ্রাপ্ত রাজ্য হৃত হইল—মহারাজের এই শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত—ইহাতেই লক্ষ্মণের এত রোষ। রাম লক্ষ্মণকে বুঝাইয়া দিলেন যে, ভরতের রাজা হওয়া আর তাঁহার রাজা হওয়া সমান কথা; ধনুঃশ্লাঘা থাকিলে সেই নূতন রাজা ভরতের পরিপালন করাই তাঁহার কর্ত্তব্য। রামচন্দ্র লক্ষ্মণের স্থৈর্য্য-উৎপাদনের জন্য তৎসমীপে তিনটি প্রশ্ন উপস্থাপিত করিলেন—(১) সত্যরক্ষণশীল পিতার উপর ধনুঃ আনমিত করা বিধেয় কি? (২) স্বধন-হরণকারিণী মাতার উপর শরত্যাগ অবিধেয় নহে কি? (৩) নির্দ্দোষ অনুজ ভরতের প্রাণবিনাশ কর্ত্তব্য কি?—এই পাতকত্রয়ের কোনটি লক্ষ্মণের নিকট রুচির বোধ হয়—রামের তাহাই জিজ্ঞাস্য। রাজ্য গিয়াছে, তাহাতে লক্ষ্মণের কোনও খেদ নাই—খেদ কেবল,

বর্ষাণি কিল বস্তব্যং চতুর্দ্দশ বনে ত্বয়া।

'রামের (আপনার) চতুর্দ্দশবর্ষব্যাপী বনবাসের বিধান হইল কেন?' এই জন্য। মহারাজ আত্মপ্রভুত্ব হারাইয়া মোহবশতঃ এইরূপ আদেশ দিয়া থাকিবেন—ইহাই রামের বিশ্বাস। রাম মৈথিলীকে বল্কলাংশ দিতে বলিয়া তাঁহাকে শ্বশ্রূ-শ্বশুরের শুশ্রূষার জন্য রাজধানীতে অবস্থান করিতে অনুরোধ করিলেন, এবং তিনি একাকী বনে যাইবেন, স্থির করিলেন। কিন্তু সীতাদেবী রামের সহধর্ম্মচারিণী—তিনি বনবাসকে প্রাসাদ-বাস-সম মনে করিয়া স্বামীর

অনুগমনে কৃতসংকল্প হইলেন। রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলিলেন, সীতাকে বারণ কর। লক্ষ্মণ মনে মনে নিজে রামসীতার অনুগমন করিবেন স্থির করিয়া, বলিয়া উঠিলেন—

আর্য্য নোৎসহে শ্লাঘনীয়ে কালে (কার্য্যে বা) বারয়িতুমত্রভবতীম্। কুতঃ

অনুরেতি শশাঙ্কং রাহুদোষেঽপি তারা
পততি চ বনবৃক্ষে যাতি ভূমিং লতা চ।
ত্যজতি ন চ করেণুঃ পঙ্কলগ্নং গজেন্দ্রং
ব্রজতু চরতু ধর্ম্মং ভর্তৃনাথা হি নার্য্যঃ।

'আর্য্য, এই শ্লাঘনীয় কার্য্যে আমি মাননীয়া দেবীকে বারণ করিতে সাহস করি না; কেন না, রাহুদোষেও তারা শশাঙ্কের অনুসরণ করিয়া থাকে; বনবৃক্ষ ভূমিপতিত হইলে [তৎসংলগ্ন] লতাও ভূমিসাৎ হয়—করেণু পঙ্কলগ্ন করীকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় না; [অতএব দেবী আপনার সহিত] যাউন,—তাঁহাকে ধর্ম্মাচরণ করিতে দিউন—যেহেতু নারীগণ ভর্ত্তার অধীন।' এমন সময় নেপথ্য-শালিনী রেবা কতকগুলি অনতুভূত বল্কল সীতাদেবীর নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন। প্রয়োজনের সময় রাম সেই রেবা-প্রেরিত বল্কল পরিধান করিলেন। সমস্ত অলঙ্কার মাল্যাদি হইতে সর্ব্বদাই লক্ষ্মণ অর্দ্ধভাগ প্রাপ্ত হইতেন; তাই তিনি অগ্রজকে বলিলেন, সমস্ত বস্তুর অর্দ্ধভাগ আমাকে দিয়া আপনি কেবল

চীরমেকাকিনং বদ্ধং চীরে খল্বসি মৎসরী।

'একাকী চীরধারণ করিলেন, এবং চীরদান বিষয়ে এতটা মৎসরী হইলেন।' রামের কথায় সীতাও লক্ষ্মণকে বারণ করিলেন; কিন্তু সীতাদেবী একাকিনী গুরুর পাদশুশ্রূষা করিবেন কেন, তাই লক্ষ্মণ দেবীকে বলিলেন, না হয় শুশ্রূষায়,

তবৈব দক্ষিণঃ পাদো মম সব্যো ভবিষ্যতি।

'দক্ষিণপাদ আপনারই হউক, আমি বামপদ লইয়াই থাকিব।' সীতা-দেবী লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইবার জন্য রামচন্দ্রকে অনুরোধ করিলেন। রাম লক্ষ্মণকে তপঃসংগ্রামে কবজসদৃশ, নিয়মগজের অঙ্কুশসম, ইন্দ্রিয়হয়ের খলীনতুল্য, ধর্ম্ম-সারথিরূপী বল্কল ধারণ করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। পৌরজনেরা এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া রাজপথ সন্নিরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন—যেন সভার্য্য রাম-চন্দ্র লক্ষ্মণকে লইয়া বনে না যাইতে পারেন। কিন্তু লক্ষ্মণ সমস্ত লোক-জনদিগকে উৎসারিত করিয়া দিলেন।

নির্দ্দোষদৃশ্যা হি ভবন্তি নার্য্যো
যজ্ঞে বিবাহে ব্যসনে বনে চ॥

'যজ্ঞে, বিবাহে, বিপদে ও বনে নারীগণ বিনাদোষে লোকদৃশ্য হইতে পারেন'—এই মনে করিয়া রামচন্দ্র সীতাদেবীকে অবগুণ্ঠন অপনীত করিতে বলিলেন, যেন পুরবাসিগণ স্বচ্ছন্দে তাঁহাকে এই বিপৎসময়ে অবলোকন করিতে পারে। রাজকঞ্চুকী অতি ত্বরায় আসিয়া বধূসহায় লক্ষ্মণানুগম্যমান রামচন্দ্রকে বনগমনে নিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিয়া বলিলেন যে, বৃদ্ধ মহারাজ তাঁহাদের বনগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, ক্ষিতিতলে ধূলিলুণ্ঠিত হইতেছেন। কিন্তু তাঁহারা আর এই অবস্থায় মহারাজকে আত্মদর্শন দিতে চাহিলেন না।

বধূসহায় ভ্রাতৃদ্বিতীয় রামচন্দ্রকে বনগমনে নিবর্ত্তিত করিতে না পারিয়া, আজ মহারাজ দশরথের কি শোচনীয় অবস্থাই হইয়াছে! পুত্রবিরহশোকাগ্নিতে তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইয়া যাইতেছে। তিনি সর্ব্বদাই উন্মত্তের ন্যায় প্রলাপ করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিলে মনে হয়, যেন যুগক্ষয় উপস্থিত হওয়ায় মেরু-পর্ব্বত সঞ্চালিত হইতেছে, অপ্রমেয় মহাসাগর শুষ্ক হইতেছে, দিনকর যেন ভূপতিত হইতেছেন। রাজার দেহ এখন শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। তিনি "সমুদ্র'গৃহে শয়ান। মহাদেবী কৌশল্যা ও সুমিত্রা নিজ নিজ দুঃসহ পুত্রবিরহ-দুঃখ নিগৃহীত রাখিয়া, রাজার এই দীনদশাদর্শনে ব্যথিত হইয়া তাঁহার শুশ্রূষায় মনোনিবেশ করিলেন। আজ অযোধ্যাবাসিগণের অবস্থাও নিতান্ত শোচনীয়। সমগ্রপুরী যেন শূন্য বলিয়া বোধ হইতেছে—গজশালায় গজরাজগণ যবসগ্রাসে অভিলাষবিমুখ, হয়শালায় বাজিগণ সাশ্রুনেত্র হইয়া হ্রেষারবশূন্য,—পুরবাসি-বালবৃদ্ধ-বনিতা সকলেই আহারকথা পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়াছেন, এবং তাঁহারা সকলেই যে দিক দিয়া রামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া গিয়াছেন—উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে সেই দিকে দৃষ্টি বিন্যস্ত রাখিয়াছেন। মহারাজ দশরথ একবার ভূপতিত হইতেছেন, পুনরায় উত্থিত হইতেছেন—আবার 'হা সর্ব্বজন-হৃদয়-নয়নাভিরাম রাম, তুমি সত্যসন্ধ। তাই রাজ্যৈশ্বর্য্য তৃণবৎ তুচ্ছ গণিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছ;—হা লক্ষ্মণ! তুমি ভ্রাতৃস্নেহ দেখাইবার জন্য পিতৃস্নেহ পরিত্যাগ করিলেও তোমাকে দেখিতে ইচ্ছা হইতেছে—তুমি কোথায় আছ? হা বৈদেহি! তোমার চিত্তবৃত্তি সর্ব্বদাই নিজ প্রভুতে স্থিত—তুমি, মাতঃ, শোকার্ত্তের অনুকম্পা; তুমিও কি আমাকে সমাজে অযশোভাজন মনে করিয়া চলিয়া গিয়াছ। সূর্য্য গেল, দিবসও গেল, সূর্য্যদিবসের অবসানে ছায়াও আর দেখা যায় না। হে কৃতান্ত-হতক, তুমি কি আমাকে অনপত্য করিতে পার নাই? রামকে কি অন্য কোনও মহীপতির গৃহে জন্মপরিগ্রহের

ব্যবস্থা করিতে পার নাই ? আর কৈকেয়ীকে কি বনের ব্যাঘ্রীরূপে সৃষ্টি করিতে পার নাই ?'—ইত্যাদিরূপ বিলাপ করিতে করিতে প্রায় লুপ্তেন্দ্রিয় হইয়া পড়িতেছেন। সন্নিহিতা মহাদেবী কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে পর্য্যন্ত চিনিতে পারিতেছেন না। এই অসহ্য শোকযন্ত্রণার সময়ে মহারাজের সারথি সুমন্ত্র রামকে রাখিয়া, শূন্য রথ লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন—এই সংবাদ শুনিয়া রাজা বলিলেন—

শূন্যঃ প্রাপ্তো যদি রথো ভগ্নো মম মনোরথঃ।
নূনং দশরথং নেতুং কালেন প্রেরিতো রথঃ॥

'যদি (রাম)-শূন্য রথ ফিরিয়া আসিয়া থাকে, তাহা হইলে আমার মনোরথ ভগ্ন হইল—নিশ্চিতই [আজ] দশরথকে লইবার জন্য কৃতান্ত রথ পাঠাইয়াছেন।' রাজপুরীতে প্রবেশ করিবার সময় সুমন্ত্র উপলব্ধি করিলেন যে, রাজভৃত্যগণ স্ব স্ব নিয়োগ পরিত্যাগ করিয়া, রামের প্রতি অনুরাগবশতঃ এই অকার্য্যের জন্য বাষ্পাকুলনয়নে মহারাজের নিন্দাবাদ করিতেছে। রাজা সুমন্ত্রকে অতি দীনভাবে রাম-লক্ষ্মণ-সীতার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া, তাঁহারা স্ব-মুখে কোনও সংবাদ তৎসমীপে প্রেরণ করিয়াছেন কি না, জিজ্ঞাসা করিলেন। সুমন্ত্র তাঁহাদের নামনির্দ্দেশ ব্যতিরেকে বলিতেছেন যে, 'সর্ব্ব এব মহারাজম্'—'তাঁহারা সকলেই মহারাজকে'— ; অমনই দশরথ বলিলেন—'সুমন্ত্র—ন ন। শ্রোত্ররসায়নৈর্ম্ম হৃদয়াতুরৌষধৈস্তেষাং নামধেয়ৈরেব শ্রাবয়।' 'না, না ; আমার কর্ণরসায়নতুল্য হৃদ্রোগের ঔষধসদৃশ তাহাদের নাম উচ্চারণ করিয়া [বার্ত্তা] শুনাও।' রাজার অনুরোধ রক্ষা করিয়া সুমন্ত্র বলিলেন যে, আয়ুষ্মান্ রাম, আয়ুষ্মতী জনকরাজপুত্রী ও আয়ুষ্মান্ লক্ষ্মণ শৃঙ্গবেরপুরে রথ হইতে অবতরণ করিয়া, অযোধ্যার দিকে স্ব স্ব মুখ ফিরাইয়া দণ্ডায়মান হইয়া মহারাজকে উদ্দেশে প্রণাম করিলেন ; এবং তৎপরে কি জানি, বিজ্ঞাপন করিতে আরম্ভ করিয়াও, অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া, বলিবার উপক্রম করিয়াও, বাষ্পস্তম্ভিতকণ্ঠে আর সেই কথা না বলিয়াই বনে চলিয়া গেলেন। 'কথমনুক্ত্বৈব বনং গতাঃ!' 'কি! তাহারা আমাকে কিছু না বলিয়াই বনে চলিয়াই গেল ?'—এই বলিয়াই মহারাজ দ্বিগুণ-মোহগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। অমাত্যগণের নিকট সংবাদ প্রেরিত হইল,—মহারাজ অপ্রতিকারদশায় উপস্থিত হইয়াছেন। রাজার মৃত্যু আসন্নপ্রায়। অন্তিমকালে তিনি কৌশল্যাকে অঙ্গ সংস্পর্শ করিতে বলিলেন। রামকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—'হে পুত্র রাম! মনে করিয়াছিলাম যে, তোমাকে শ্রেষ্ঠ

নরপতিরূপে অভিষিক্ত করিয়া প্রজাবর্গকে কৃতার্থ করিব, এবং তোমাকে বলিব যে, অন্যান্য ভ্রাতৃত্রয়কে সমানবিভব করিয়া রাখিও, এবং তৎপরে আমি স্বয়ং বনে চলিয়া যাইব ; কিন্তু কৈকেয়ী এক মুহূর্ত্তে সব নষ্ট করিয়া দিল।' শেষ কথা তিনি এই বলিলেন—

সুমন্ত্র উচ্যতাং কৈকেয্যাঃ—

গতো রামঃ প্রিয়ং তেঽস্তু ত্যক্তোঽহমপি জীবিতৈঃ।

ক্ষিপ্রমানীয়তাং পুত্রঃ পাপং সফলমস্ত্বিতি ॥

'হে সুমন্ত্র! কৈকেয়ীকে বলিও, রাম গিয়াছে—তোমার প্রিয়ই হইয়াছে; আমিও প্রাণত্যাগ করিতেছি—শীঘ্র নিজপুত্রকে আনাইয়া লও—পাপ সফল হউক।' তৎপর রাজা দেখিতেছেন যে, তাঁহাকে রামকথাশ্রবণে সন্দগ্ধহৃদয় দেখিয়া, পিতৃগণ তাঁহাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছেন। তিনি বলিলেন—

অয়মমরপতেঃ সখা দিলীপো রঘুরয়মত্রভবানজঃ পিতা মে।

কিমভিগমনকারণং ভবদ্ভিঃ সহ-বসনে সময়ো মমাপি তত্র ॥

'এই যে দেবেন্দ্রের সখা দিলীপ! এই যে মাননীয় রঘু! এই যে আমার পিতা অজ উপস্থিত! কেন অভিগমন করিতেছি? আপনাদের সহিত সেখানে একত্র বাসের সময় আমার উপস্থিত।' 'হা রাম! হা বৈদেহি! হা লক্ষ্মণ! আমি পিতৃগণসকাশে চলিয়া যাইতেছি—হে পিতৃগণ! আমি আসিতেছি।' এই বলিয়াই মহারাজ দশরথ শেষ মূর্চ্ছাক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। চতুর্দ্দিকে 'হা! হা মহারাজ!' বলিয়া ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হইল।

রাজ্যবিভ্রষ্ট হইয়া রামচন্দ্র বনে গমন করায়, দশরথ পুত্রের বিরহে নিরতিশয় সন্তপ্ত হইয়া স্বর্গগমন করিলেন। আজ অন্তঃপুরস্থ রমণীগণ কৌশল্যা প্রভৃতি মহিষীগণের সহিত নগরোপকণ্ঠে প্রতিষ্ঠিত প্রতিমাগৃহে স্বর্গীয় মহারাজের প্রতিমা দর্শন করিবার জন্য যাইতেছেন। এ দিকে ভরত পিতার অসুস্থতার সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া, মাতুলালয় হইতে অতিবেগে প্রধাবিত রথে আরোহণ করিয়া, সূত সহ অযোধ্যার সন্নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজপুরীর বৃত্তান্ত ভরতের অবিজ্ঞাত। সূতকে পিতার ব্যাধি-বিষয়ে প্রশ্ন করিয়া ভরত তাঁহার নিকট এইমাত্র জানিতে পারিলেন যে, হৃদয়-পরিতাপ মহারাজের ব্যাধি, এবং ভিষগ্‌-জনেরা তৎপ্রতীকারে অসমর্থ। পিতা মাতার চরণ-দর্শনে আপনাকে কৃতার্থ করিয়া ভরত ভ্রাতৃবর্গের কিরূপ সমাদর লাভ ও ভৃত্যকুলের সেবা প্রাপ্ত হইবেন—তাহা ভাবিতে ভাবিতে অযোধ্যার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সূত সর্ব্ব-

বৃত্তান্ত জানিয়াও কিরূপে মহারাজ-পুত্রের নিকট পিতার প্রাণত্যাগ, মাতার ঐশ্বর্য্যলুব্ধতা ও জ্যেষ্ঠভ্রাতার প্রবাস—এই ত্রিদোষের কথা নিবেদন করিবেন? অযোধ্যায় এখনও তাঁহারা প্রবেশ করেন নাই—রাজধানীর উপকণ্ঠেই আছেন—এমন সময়ে, রাজকুলের উপাধ্যায়গণ সংবাদ পাঠাইলেন যে, সম্প্রতি ভরতকে অযোধ্যায় প্রবেশ না করিয়া, নগরোপকণ্ঠেই কিছুক্ষণ অবস্থান করিতে হইবে। তাঁহাদের আদেশ এইরূপ—'কৃত্তিকা নক্ষত্রের বিষয় আরও এক নাড়িকা-কালস্থায়ী—তৎপরে রোহিণীনক্ষত্রের আধিপত্য আরম্ভ হইলে, কুমার অযোধ্যায় প্রবেশ করিবেন।' ভরত গুরুবচনের অতিক্রম না করিয়া, বৃক্ষান্তরাবিষ্কৃত এক দেবকুলে মুহূর্ত্তকাল বিশ্রাম করিবেন, স্থির করিলেন। ফলে, দেবপূজা ও বিশ্রাম, উভয়ই সংঘটিত হইবে। রথ তথায় স্থাপিত হইল। রথ হইতে অবতরণ করিয়া ভরত দেখিলেন, স্থানে স্থানে পুষ্প লাজ প্রভৃতি বলি নিক্ষিপ্ত রহিয়াছে; কোথাও বা ভিত্তিতে চন্দন-পঞ্চাঙ্গুল প্রদত্ত হইয়াছে; কোথাও বা দ্বারদেশ মাল্যদামশোভাযুক্ত দৃষ্ট হইতেছে; আর অন্য কোথাও বা বালুকাপ্রকীর্ণ লক্ষিত হইতেছে। কোনও প্রহরণ বা ধ্বজা বা অন্য কোনও বহিশ্চিহ্ন না দেখিয়া ভরত ঠিক করিতে পারিলেন না, ইহা কোন্ দেবতার স্থান। মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেবতা চিনিয়া লইবেন স্থির করিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলেন; যাহা দেখিলেন, তাহাতে তিনি অতীব বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বলিলেন—

অহো ক্রিয়ামাধুর্য্যং পাষাণানাম্। অহো ভাবগতিরাকৃতীনাম্। দৈবতোদ্দিষ্টানামপি মানুষ-বিশ্বাসতাসাং প্রতিমানাম্।

'অহো পাষাণের কি ক্রিয়া-মাধুর্য্য! আকৃতির কি ভাবগতি! দেবোদ্দিষ্ট হইলেও এই প্রতিমাগুলির কিরূপ মানুষ-বিশ্বাসতা!' প্রতিমাগুলিকে মানুষ বলিয়া বিশ্বাস করিবার কারণ বুঝিয়াও, তিনি মনে করিলেন, এগুলি দেবতার প্রতিমা। প্রতিমা-চতুষ্টয়কে তিনি মস্তক আনত করিয়া বিনামন্ত্রেই বার্ষল প্রণাম করিলেন। প্রতিমাগুলির অম্লান্তরাকৃতিবিশিষ্ট ভরতকে তথায় প্রবিষ্ট হইয়া প্রণাম করিতে দেখিয়া, প্রতিমাগৃহের দেবকুলিক দূর হইতেই বলিলেন, যেন তিনি সেখানে প্রণাম না করেন। প্রণামপ্রতিষেধের কারণ এই যে, প্রতিমা-চতুষ্টয় দেবতার প্রতিমা নহে—ক্ষত্রিয়ের—ইক্ষাকুবংশীয় ক্ষত্রিয়ের। ভরত বুঝিলেন যে, এইগুলি তাঁহাদেরই প্রতিমা,—যাঁহারা সুরাসুর বিগ্রহে সুরসহায় হইতেন, যাঁহারা স্বসুকৃতবলে ইন্দ্রলোকে গমন করিতেন, যাঁহারা স্বভুজ-বলে নিখিলবসুমতী জয় করিয়াছিলেন, যাঁহারা রাজধর্ম্ম পালন করিয়া অমরকীর্ত্তি-

লাভ করিয়াছেন। যদৃচ্ছায় সমাগত পুণ্যফল লাভ করিয়া ভরত কৃতার্থ হইলেন,—ক্রমে ক্রমে তিনটি প্রতিমা কাহার কাহার প্রতিকৃতি তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া, দেবকুলিকের নিকট হইতে অবগত হইলেন যে, প্রথমটি বিশ্বজিৎযজ্ঞের প্রবর্ত্তয়িতা, প্রজ্বলিত ধর্ম্মপ্রদীপ দিলীপের প্রতিমা; দ্বিতীয়টী শয়নোত্থান-সময়ে কীর্ত্তিতনামধেয় রঘুর প্রতিমা; এবং তৃতীয়টি প্রিয়াবিয়োগ-জনিত নির্ব্বেদে পরিত্যক্ত-রাজ্যভার প্রশান্তরজাঃ অজের প্রতিমা। এই তিনটি প্রতিমাকেই তিনি বহুমানপূর্ব্বক প্রণাম করিলেন। বহুমান-প্রদর্শনে হৃদয় ব্যাক্ষিপ্ত হওয়ায় তিনি চতুর্থপ্রতিমাটির প্রতি তত লক্ষ্য করেন নাই। দেবকুলিক কর্ত্তৃক নিবেদিত পরিচয় শুনিয়া, ভরত মহারাজের পিতৃ-পিতামহ দিলীপের, মহারাজের, পিতামহ রঘুর ও মহারাজের পিতা অজের প্রতিমা দর্শন করিয়া, চতুর্থ প্রতিমার পরিচয়ের জন্য কুতূহলাক্রান্ত হইয়া প্রথমতঃ দেবকুলিককে জিজ্ঞাসা করিলেন—

ধরমাণানামপি প্রতিমা স্থাপ্যন্তে ?

'জীবিত ব্যক্তিদিগের প্রতিমাও কি স্থাপিত হয় ?' দেবকুলিক উত্তর দিলেন—

ন খলু, অতিক্রান্তানামেব।

'তাহা কথনই নয়, কেবল উপরত ব্যক্তিগণের প্রতিমাই স্থাপিত হয়।' ভরতকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করিতে না দিয়া দেবকুলিক বলিয়া ফেলিলেন—

যেন প্রাণাশ্চ রাজ্যং চ স্ত্রীশুল্কার্থে বিসর্জ্জিতাঃ।
ইমাং দশরথস্ত ত্বং প্রতিমাং কিং ন পৃচ্ছসে (?)॥

'যিনি স্ত্রীশুল্কের জন্য প্রাণ ও রাজ্য বিসর্জ্জন দিয়াছেন, তুমি কি সেই দশরথের প্রতিমার কথাই জিজ্ঞাসা করিতেছ না ?' যাঁহার জন্য চিত্তে এত আশঙ্কা ছিল, ভরত তাঁহারই মরণবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক কেবল এই ভয় করিতে লাগিলেন যে, এই নীচ শুল্ক শব্দটি তাঁহাকে স্পর্শ না করে। ভরতের ইক্ষ্বাকু-কুলালাপ শ্রবণ করিয়া দেবকুলিক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি কৈকেয়ীর পুত্র ভরত নন কি ? ভরত উত্তরে বলিলেন—

দশরথপুত্রো ভরতোঽস্মি ন কৈকেয়্যাঃ।

'আমি দশরথের পুত্র ভরত, কিন্তু কৈকেয়ীর নহে।' অত্যন্ত অনুরুদ্ধ হইয়া দেবকুলিক বলিলেন যে, দশরথ উপরত হইয়াছেন; সীতা লক্ষ্মণকে সঙ্গে করিয়া রাম কোন বনে গমন করিয়াছেন, তাহা তিনি জানেন না। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া, ভরত দ্বিগুণতর মোহ প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু বিস্তর-শ্রবণে উৎসুক হইলে

পর, দেবকুলিক যেই বলিলেন যে, রামচন্দ্রকে রাজা রাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন, এমন সময় আপনার জননী বলিয়াছিলেন——। ভরত আর তাঁহাকে বলিতে না দিয়াই বাক্যপূরণ করিয়া লইয়া বুঝিলেন যে, তাঁহার জননী বলিয়াছিলেন, 'আমার পুত্র রাজা হউক, রামচন্দ্র বনে যাউক,' এবং তাঁহাকে বন্ধচীর দেখিয়া রাজা অসদৃশ নিধন প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভরত পুনরায় মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন। এমন সময়ে সুমন্ত্র কৌশল্যা প্রভৃতি দেবীগণকে সঙ্গে লইয়া প্রতিমাগৃহে উপস্থিত হইলেন। প্রতিমাগৃহে প্রবেশ করিবার সময়ই তাঁহারা দেখিলেন যে, বয়ঃস্থ মহারাজের ন্যায় কে যেন ভূপতিত হইয়া রহিয়াছেন। দেবকুলিক পরিচয় বলিয়া দিলেন।—

পরশঙ্কামলং কর্ত্তুং গৃহ্যতাং ভরতোহয়ম্।

'উঁহার সম্বন্ধে অন্য শঙ্কা করিবার প্রয়োজন নাই, গ্রহণ করুন, উনি ভরত।' দেবকুলিক চলিয়া গেলেন। মোহবিগমের পর ভরত মাতৃগণের তদানীন্তন অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিলে পর, দেবীগণ অবগুণ্ঠন অপনীত করিয়া আপনাদের বৈধব্যাবস্থা দেখাইলেন। ভরত এতক্ষণে দেখিলেন যে, সম্মুখে শূন্যরথের সারথি সুমন্ত্র তাঁহার নিকট দণ্ডায়মান। রামজননী কৌশল্যাকে তিনি 'অনপরাদ্ধোঽহমভিবাদয়ে'—'নিরপরাধ আমি প্রণাম করিতেছি'—বলিয়া অভিবাদন করিলেন; লক্ষ্মণজননীকেও তিনি অভিবাদন করিলেন। তৎপরে সুমন্ত্র দেখাইয়া দিলেন—'ইয়ং তে জননী'—'এই তোমার জননী।' ভরত রুষ্ট হইয়া মাতাকে 'আঃ পাপে' বলিয়া সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন—

মম মাতুশ্চ মাতুশ্চ মধ্যস্থা ত্বং ন শোভসে।
গঙ্গাযমুনয়োর্মধ্যে কুনদীব প্রবেশিকা॥

'আমার এই মাতার [কৌশল্যার] ও এই মাতার [সুমিত্রার] মধ্যবর্ত্তিনী হইয়া—তুমি গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তিনী কুনদীর মত শোভা পাইতেছ না।' পুত্রের নিন্দাবাক্যে জননী দুঃখিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমি কি করিয়াছি, বৎস?' ভরত উত্তরে বলিলেন—'তুমি আমাকে অপযশঃ দ্বারা, আর্য্য রামচন্দ্রকে চীর দ্বারা, মহারাজকে মৃত্যু দ্বারা, লক্ষ্মণ ও অযোধ্যাবাসিজনগণকে রোদন দ্বারা, প্রিয়সুতা জননীগণকে শোক দ্বারা, তোমাদের পুত্রবধূকে অধ্বপরিশ্রম দ্বারা এবং আপনাকে ধিক্ ধিক্ বচন দ্বারা সংযোজিত করিয়াছ।' ভরত কৌশল্যাকে বলিলেন যে, তিনি ভর্ত্তৃদ্রোহিণী জননীকে আর প্রণাম করিবেন না, তাঁহার মাতা অমাতা হইয়াছেন। মহারাজের সত্যবচন-রক্ষার জন্যই তিনি এরূপ

করিয়াছিলেন—কৈকেয়ী এই প্রকার বলিলে পর, ভরত মাতাকে বলিলেন, যদি তুমি রাজমাতা হইতে ইচ্ছা করিয়া থাক, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি—

বদতু ভবতি ! সত্যং কিং ত্বার্য্যো ন পুত্রঃ ?

'মাতঃ ! সত্য করিয়া বল দেখি, আর্য্য [রামচন্দ্র] কি তোমার পুত্র নহেন ?' পিতাকে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া, জ্যেষ্ঠপুত্রকে বনে গমন করিতে দেখিয়া, জনক-তনয়াকে বল্কল-পরিহিতা দেখিয়া, কৈকেয়ীর বজ্রকঠিন হৃদয় কি দ্বিধা ভিন্ন হয় নাই ?—ইহাই ভরতের আক্ষেপ ! ভরতকে এত দূর সন্তপ্ত দেখিয়া সুমন্ত্র, বশিষ্ঠ ও বামদেবের নাম করিয়া বলিলেন যে, তাঁহারা প্রকৃতিজনসহকারে তোমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবার জন্য প্রত্যুদ্‌গমন করিতেছেন, কারণ—

গোপহীনা যথা গাবো বিলয়ং যান্ত্যপালিতাঃ।
এবং নৃপতিহীনা হি বিলয়ং যান্তি বৈ প্রজাঃ॥

'গোপহীন গোকুল যেমন অপালিত হইয়া বিলয়প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ নৃপহীন প্রজাকুলও বিলয়প্রাপ্ত হয়।' এই অবস্থায় ভরতের পক্ষে অভিষেক ত্যাগ না করিয়া গ্রহণ করাই বিধেয়। কিন্তু ভরত জননীকে দেখাইয়া বলিলেন—'অভিষেকমিতি ইহাত্রভবত্যৈ প্রদীয়তাম্।' 'অভিষেক ! ইহা তাঁহাকে [মাতাকে] প্রদান করা হউক।' যেখানে লক্ষ্মণপ্রিয় রামচন্দ্র আছেন—ভরত সেইখানে যাইবার জন্য কৃতসংকল্প হইলেন—তাঁহার নিকট—

নাযোধ্যা তং বিনাযোধ্যা সাযোধ্যা যত্র রাঘবঃ।

'রামচন্দ্র বিনা অযোধ্যা অযোধ্যাই নহে, যেখানে রাঘব, সেই স্থানই অযোধ্যা।' প্রকৃতিজনাহৃত অভিষেকসম্ভার তুচ্ছ করিয়া, রাজপুত্র ভরত কুলসারথি সুমন্ত্রের সহিত রথে চড়িয়া, তপোবনে রামানুসন্ধানে বাহির হইলেন। মহারাজ দশরথের প্রতিনিধি, সারবানদিগের সন্নিদর্শন, রাজ্যলুব্ধা কৈকেয়ীর প্রত্যাদেশকারী, যশোভাজন, নরপতির সুপুত্র, নিজের অগ্রজ, মুনিব্রতধারী রামচন্দ্র আজ তপোবনের কোন স্থানে পতিব্রতা-ধর্ম্মের মূর্ত্তি সীতাদেবীকে ও ভক্তির সাক্ষাৎ বিগ্রহ লক্ষ্মণকে সঙ্গে করিয়া অবস্থান করিতেছেন, ভরত সূত সুমন্ত্রকে তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছেন। সূত রামের আশ্রমস্থান দেখাইয়া দিয়া রথ স্থাপিত করিলেন। ভরত সুমন্ত্রকে রামসমীপে আপনার গমন নিবেদন করিতে বলিয়াও, নিজেই সেই কার্য্যে ব্রতী হইলেন। তিনি সেই পিতৃবচন-পালনকারী রাঘবকে নিবেদন করিবার জন্য উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—

নির্ঘৃণশ্চ কৃতঘ্নশ্চ প্রাকৃতঃ প্রিয়সাহসঃ।
ভক্তিমানাগতঃ কশ্চিৎ কথং তিষ্ঠতু যাত্বিতি॥

'নির্দ্দয়, কৃতঘ্ন, সাধারণ, সাহসকারী, কিন্তু ভক্তিমান্ কোনও ব্যক্তি [দ্বারে] উপস্থিত হইয়াছে—থাকিবে? কি চলিয়া যাইবে?' এই স্বরে স্বর্গগত পিতার কণ্ঠধ্বনির সাদৃশ্য অনুভব করিয়া, রামচন্দ্র লক্ষ্মণ ও সীতাকে বলিলেন যে, এই কণ্ঠধ্বনি নিশ্চিতই অবান্ধবের কণ্ঠধ্বনি নহে। তাঁহার মন যেন স্নেহপ্রবণ হইতেছে। লক্ষ্মণও তাহাই ভাবিলেন। রামের কথায় লক্ষ্মণ বাহিরে গমন করিয়া দূর হইতে দেখিলেন যে, দেবেন্দ্রদ্যুতি, মধুসূদনকান্তি, পীনবক্ষাঃ, শশাঙ্ক-মনোহর, রামানন-তুল্য-বদন, প্রিয়দর্শন কে আশ্রমের দিকে আসিতেছেন। প্রথমতঃ রূপসাদৃশ্যে তাঁহার ভ্রম হইল যে, বোধ করি রামচন্দ্রই বাহিরে গমন করিয়াছেন। কিন্তু সুমন্ত্রকে সঙ্গে দেখিয়া এবং তাঁহার নিকটে পরিচয় শুনিয়া তিনি বুঝিয়া লইলেন যে, তাঁহারই অনুজ কৈকেয়ীপুত্র কুমার ভরত আসিয়াছেন। ভরতকে তথায় অবস্থান করিতে বলিয়া, লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের নিকট ভ্রাতৃবৎসল ভরতের আগমন নিবেদন করিলেন। ভ্রাতৃস্নেহের আতিশয্য দেখিয়া রামচন্দ্র ভাবিলেন—আজ পিতৃস্নেহের পরাভব হইল। ভরতকে অবলোকন করিবার জন্য বিশালীকৃতনয়নে জনকরাজপুত্রী আদর করিয়া তাঁহাকে আশ্রমমধ্যে আনয়ন করিলেন। সূতকে পশ্চাৎ আগত দেখিয়া রামচন্দ্র বুঝিলেন যে, মহারাজ স্বর্গগত হইয়াছেন। সকলেই রোদন করিতে লাগিলেন। তৎপরে সমাশ্বস্ত হইয়া, রামচন্দ্র ভরতকে অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিয়া, অভিষিক্ত হইয়া, রাজ্যপালনে ব্রতী হইতে আদেশ করিলেন। ভরত অস্বীকার করিলে, রামচন্দ্র তাঁহাকে রঘুকুলের সত্যধনত্বের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া, নীচপথে প্রবৃত্ত হইতে নিষেধ করিলেন। ভরত রামচন্দ্রকে বলিলেন, 'আমার প্রসূতি কৈকেয়ী তোমারও প্রসূতি, আমার পিতা তোমারও পিতা—সুপুরুষগণ মাতৃদোষকে দোষ বলিয়া গণ্য করেন না; অতএব প্রসন্ন হইয়া আর্ত্ত ভরতের প্রতি সুদৃষ্টি করুন।' এরূপ গুণনিধি নিষ্কল্মষাত্মা ভ্রাতার বচনে পরিতুষ্ট হইয়া, তদীয় বাক্যের বশানুগত হইয়াও রামচন্দ্র ভরতকে বলিলেন—

> কিন্ত্বেতন্নৃপতের্বচস্তদনৃতং কর্ত্তুং ন যুক্তং ত্বয়া
> কিঞ্চোৎপাদ্য ভবদ্বিধং ভবতু তে মিথ্যাভিধায়ী পিতা।

'কিন্তু নরপতির সেই বাক্য মিথ্যা করা তোমার উচিত নহে। তোমার মত পুত্র প্রাপ্ত হইয়াও কি তোমার পিতা মিথ্যাভিধায়ী হইবেন? সর্ব্বশেষে ভরত যতদিন রামের নিয়মাবসান না হয়, ততদিন তাঁহার পাদমূলে অবস্থান করিতে চাহিলেন। কিন্তু, রামচন্দ্র কর্ত্তৃক স্বরাজ্যপালনে আদিষ্ট হইয়া, ভরত

নিরুত্তর হইলেন। রামচন্দ্র ভরতের অনুরোধে স্বীকার করিলেন যে, ভরত-হস্তে নিক্ষিপ্ত রাজ্য তিনি চতুর্দ্দশবর্ষান্তে পুনরায় গ্রহণ করিবেন। তৎপরে ভরত রামসন্নিধানে আর একটি বর প্রার্থনা করিলেন—

পাদোপভুক্তে তব পাদুকে মে এতে প্রযচ্ছ প্রণতায় মূর্দ্ধা।
যাবদ্ভবানেষ্যতি কার্য্যসিদ্ধিং তাবদ্ভবিষ্যাম্যনয়োর্বিধেয়ঃ॥

'আপনার চরণোপভুক্ত এই পাদুকাদ্বয় শিরঃপাতপূর্ব্বক প্রণত আমাকে প্রদান করুন। যতদিন আপনি কার্য্যসিদ্ধি লাভ না করেন, ততদিন আমি এই পাদুকাদ্বয়ের বিধেয় থাকিব।' রামচন্দ্র ভরতের এই ভ্রাতৃবিধেয়তা অনুভব করিয়া ভাবিলেন যে, তিনি বহুকালের পর যে যশঃ অর্জ্জন করিতে পারিয়াছেন, ভরত তাহা এত অল্প কালের মধ্যেই সঞ্চয় করিয়াছে। ভরত অযোধ্যায় নহে, সেইখানেই অভিষিক্ত হইতে ইচ্ছা করিলেন। তাঁহার মনোরথ পূর্ণ হইল। মুহূর্ত্তের জন্যও রাজ্য উপেক্ষণীয় নহে; সেই জন্য রামচন্দ্র ভরতকে তখনই প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আদেশ করিলেন। ভরত তাহাই করিতে প্রস্তুত হইলেন। স্নেহবশতঃ সীতা কথঞ্চিৎ দুঃখিত হইলেন। রামচন্দ্র সুমন্ত্রকে বলিয়া দিলেন যে, তিনি যেন মহারাজের ন্যায় কুমার ভরতকেও পরিপালন করেন। লক্ষ্মণ ও সীতাকে লইয়া রামচন্দ্র আশ্রমদ্বার পর্য্যন্ত ভরতের অনুগমন করিয়া, তাঁহাকে বিদায় দিলেন।

ভরত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে রাজ্যাভিষিক্ত করিবার জন্য অযোধ্যায় লইয়া যাইতে আসিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাতে বিফলমনোরথ হইয়া তাঁহাকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল। মহারাজ দশরথ যাহা স্বয়ং বহন করিতেন, অল্পবয়স্ক ভরত—

কষ্টং ভো! নৃপতের্ধুরং সুমহতীমেকঃ সমুৎকর্ষতি।

'বড়ই কষ্টের বিষয়! রাজার সেই সুমহৎ রাজ্যভার একাকী বহন করিতে-ছেন,'—ইহা ভাবিয়া রামচন্দ্র বনমধ্যে বড়ই দুঃখিত হইয়াছেন। আবার যে সীতা হস্তে দর্পণ বহন করিতেও ক্লেশ অনুভব করিতেন, তিনিই আশ্রমের বৃক্ষালবাল-পূরণের জন্য বৃহদাকার কলস বহন করিতেছেন। রামচন্দ্রের মনে বড়ই ব্যথা,—

কষ্টং বনং স্ত্রীজনসৌকুমার্য্যং
সমং লতাভিঃ কঠিনীকরোতি॥

'কষ্টবহুল বনলতাসমূহের ন্যায় স্ত্রীজনের সুকুমারতাকেও কঠিন করিয়া তোলে।' সীতার প্রধান তপঃ এখন আশ্রমকে পরিষ্কৃত রাখা, এবং বালবৃক্ষমূলে জলাভি-ষেক। রামের হৃদয়ব্রণে পুনঃ পুনঃ শোকশরের অভিঘাত পতিত হইতেছে। দুঃখের

পর দুঃখ অনুধাবিত হইতেছে। সীতার নিকট তিনি নূতন চিত্তসন্তাপের কথা বলিতেছেন—'আগামী দিবসে উপরত মহারাজের সাংবাৎসরিক শ্রাদ্ধবিধি।'

কল্পবিশেষেণ নিবপনমিচ্ছন্তি পিতরঃ।

'বিশিষ্ট বিধি অনুসারে পিতৃগণ নিবপন [পিতৃদান] ইচ্ছা করেন।' রামচন্দ্র কি ভাবে তাহা সম্পাদিত করিবেন,—তাহাই তাঁহার সন্তাপের কারণ। অথবা তিনি ভাবিলেন—

গচ্ছন্তি তুষ্টিং খলু যেন কেন
ত এব জানন্তি হি তাং দশাং মে।
ইচ্ছামি পূজাং চ তথাপি কর্ত্তুং
তাতস্য রামস্য চ সানুরূপ্যাম্ (?)॥

'পিতৃগণ যাহাতে তাহাতেই তুষ্টিলাভ করিবেন, কারণ, তাঁহারা আমার এই দশা অবগত আছেন। তথাপি পিতার ও রামের অবস্থানুরূপ পূজাবিধান করিতে ইচ্ছা হইতেছে।' সীতা রামকে এই বলিয়া আশ্বস্ত করিলেন যে—

অজ্জউত্ত! নিব্বত্তইস্সদি সদ্ধং ভরদো রিদ্ধীঅ, অবথানুরূবং ফলোদএণ বি অজ্জউত্তো। এদং তাদস্স্ বহুমদঅরং ভবিস্সদি।

'আর্য্যপুত্র, ভরত সম্পদে শ্রাদ্ধ সম্পাদন করিবে: আপনি অবস্থানুরূপ ফলোদক দিয়া তাহা সম্পন্ন করুন। স্বর্গীয় পিতার তাহাই অধিকতর অনুমত হইবে।' রামচন্দ্রের দুঃখ—দর্ভোপরি স্বহস্তরচিত ফল দর্শন করিয়া স্বর্গগত মহারাজ তাঁহাদের বনবাসবৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া অশ্রুমোচন করিবেন। কোন্ কল্পবিশেষে উপরত পিতার মনস্তুষ্টি সাধন করিবেন, রামচন্দ্রের এই চিন্তা দূর করিবার জন্যই যেন অধিগতসর্ব্বশাস্ত্র এক ব্রাহ্মণ পরিব্রাজক সেই সময়ে তথায় অতিথি-রূপে উপস্থিত হইলেন। অতিথি দেবতা—তাই রামচন্দ্র সস্ত্রীক ভগবান্ অতিথির শুশ্রূষায় অভিনিবিষ্ট হইলেন। এই পরিব্রাজক একটু আত্মাভিমানী ছিলেন। ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য অধ্যয়ন ব্যাপারে তিনি কত দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা রামচন্দ্রকে জানাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া তিনি বলিলেন—

সাঙ্গোপাঙ্গং বেদমধীয়ে মানবীয়ং ধর্ম্মশাস্ত্রং মাহেশ্বরং যোগশাস্ত্রং
বার্হস্পত্যমর্থশাস্ত্রং মেধাতিথের্ন্যায়শাস্ত্রং প্রাচেতসং শ্রাদ্ধকল্পং চ।

'আমি অঙ্গ-উপাঙ্গ-সহিত সমস্ত বেদ, মনুপ্রোক্ত ধর্ম্মশাস্ত্র, মাহেশ্বর-রচিত যোগশাস্ত্র, বৃহস্পতি-কথিত অর্থশাস্ত্র, মেধাতিথির ন্যায় ও প্রচেতার বিহিত শ্রাদ্ধকল্প অধ্যয়ন করিয়াছি।' অতিথির শ্রাদ্ধকল্পে পাণ্ডিত্য আছে শুনিয়া রামচন্দ্র তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভগবন্ নিবপন-ক্রিয়াকালে পিতৃগণকে

কোন বস্তু দ্বারা আমি তৃপ্ত করিতে পারি?' ব্রাহ্মণ বলিলেন—'সর্ব্বং শ্রদ্ধয়া দত্তং শ্রাদ্ধম্।' যাহা কিছু শ্রদ্ধাপূর্ব্বক প্রদত্ত হয়, তাহাই শ্রাদ্ধ।' তথাপি রামচন্দ্র বিশেষভাবে পিতৃতৃপ্তির সাধন-ভূত বস্তুর নাম জানিতে উৎসুক হইলে, অতিথি বলিয়া দিলেন, 'মানুষের জন্য এই বিধান আছে যে, বিরূঢ় দ্রব্যের মধ্যে দর্ভ, ওষধির মধ্যে তিল, শাকের মধ্যে কলায়, মৎস্যের মধ্যে মহাশফর, পক্ষীর মধ্যে বাধ্রানস, পশুর মধ্যে গো, খড়্গী, অথবা—।' এই বলিবামাত্রই রামচন্দ্র কুতূহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, 'অথবা' শব্দ দ্বারা, হয় ত অন্য কোন পশুও শাস্ত্রে বিহিত হইয়া থাকিবে, এবং যদি তাহাই হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার জন্য রামচন্দ্র তাঁহার ধনুঃশক্তি ও তপঃশক্তির প্রয়োগ করিতে ইচ্ছুক হইবেন। অতিথি বলিয়া দিলেন যে, হিমালয়ের সপ্তম শৃঙ্গে প্রত্যক্ষ মহাদেবের মস্তক হইতে পতিত গঙ্গাজল পান করিয়া ধৃতজীবন, পবন-সম-বেগ, বৈদূর্য্য-শ্যামল-পৃষ্ঠ, কাঞ্চনপার্শ্ব নামক মৃগকুল বাস করে; বৈখানস, বালখিল্য, নৈমিশীয় প্রভৃতি মহর্ষিগণ চিন্তামাত্রোপস্থিত ও বিপন্ন মৃগ দ্বারাই সর্ব্বদা শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়া থাকেন। এবং—

তৈস্তর্পিতাঃ সুতফলং পিতরো লভন্তে
হিত্বা জরাং খমুপযান্তি হি দীপ্যমানাঃ।
তুল্যং সুরৈঃ সমুপযান্তি বিমানবাস-
মাবর্ত্তিভিশ্চ বিষয়ৈর্ন বলাদ্ধ্রিয়ন্তে॥

'তদ্দ্বারা তর্পিত হইলে, পিতৃগণ পুত্রপ্রাপ্তি-ফল লাভ করেন, জরাত্যাগ করিয়া দীপ্যমান হইয়া আকাশে গমন করেন, দেবগণের ন্যায় বিমান-[দেবরথ]-বাস উপভোগ করেন, এবং আবর্ত্তনশীল বিষয়ক্রিয়া দ্বারা বলপূর্ব্বক আকৃষ্ট হন না।' রামচন্দ্র তৎক্ষণাৎ সীতাদেবীকে তাঁহার প্রাণ-প্রিয় বিন্ধ্যপর্ব্বতস্থিত বন, হরিণ, দ্রুম, লতা প্রভৃতির নিকট বিদায় লইয়া, তাঁহার সহিত হিমালয়-কাননে বাস করিতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে বলিলেন। কিন্তু অতিথি বলিয়া দিলেন, তাঁহার মনোরথ পূর্ণ হইবে না; কারণ, সেই কাঞ্চনপার্শ্ব মৃগ 'ন তে মানুষৈর্দৃশ্যন্তে'—'মানুষের দৃষ্টিগোচর হয় না!' রামচন্দ্র আত্ম-ভুজ-পরাক্রমের কথা স্মরণ করিয়া অতিথিকে জানাইলেন যে,

সৌবর্ণান্ বা মৃগাংস্তান্ মে হিমবান্ দর্শয়িষ্যতি।
ভিন্নো মদ্বাণবেগেন ক্রৌঞ্চত্বং বা গমিষ্যতি॥

'হয় হিমালয়কে সেই সুবর্ণ-মৃগ আমাকে দেখাইয়া দিতে হইবে, নয় তাহাকে আমার বাণবেগে ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতের দশা প্রাপ্ত হইয়া ভিন্ন হইতে হইবে।' তৎ-

ক্ষণাৎ বিদ্যুৎসম্পাতের ন্যায় আলোক দৃষ্ট হইল। অতিথি দেখাইয়া দিলেন, 'হিমবান্ তোমাকে পূজা করিবার জন্যই যেন, ঐ দেখ, কাঞ্চনপার্শ্ব মৃগ পাঠাইয়া দিয়াছেন।' রামচন্দ্র ভাবিলেন, অতিথির প্রভাবেই কাঞ্চনমৃগ নিকটবর্ত্তী হইয়াছে; অথবা, পিতার সৌভাগ্যবশতঃ মৃগ স্বয়ং হিমালয় হইতে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। অতিথির বিশিষ্ট পূজা করিবার জন্য রামচন্দ্র সীতাদেবীকে নিযুক্ত করিলেন। লক্ষ্মণ তীর্থযাত্রা হইতে উপাবর্ত্তমান আশ্রম-কুলপতির প্রত্যুদ্গমনের জন্য চলিয়া গিয়াছেন; সেই জন্য রামচন্দ্র সীতাকে অতিথির শুশ্রূষায় রাখিয়া, স্বয়ং কাঞ্চনপার্শ্ব মৃগকে ধরিয়া আনিবার জন্য বহির্গত হইলেন। এই অতিথি কাশ্যপগোত্রীয় ব্রাহ্মণ নহেন;—পরিব্রাজকবেশধারী লঙ্কাপতি রাবণ! রামচন্দ্র রাবণের আত্মপক্ষীয় খরাদির বধসাধন করিয়া তাঁহার শত্রু হইয়াছেন; মায়াবলে তাঁহাকে বঞ্চনা করিয়া জনকরাজ-নন্দিনী সীতাদেবীকে অপহরণ করিবার জন্যই রাবণ সেই বেশে তথায় অতিথিরূপে উপস্থিত হইয়াছেন। মৃগানুসরণে রামের বল, বীর্য্য, সত্ত্ব ও বেগ দর্শন করিয়া রাবণ বিস্মিত হইয়াছেন। তাঁহার প্রশংসা এই যে,—

রাম ইত্যক্ষরৈরল্পৈঃ স্থানে ব্যাপ্তমিদং জগৎ।

'এই জগৎ যে 'রাম' এই অল্পাক্ষরবিশিষ্ট শব্দ দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, তাহা উপযুক্তই হইয়াছে।'

রাম মৃগের অনুধাবন করিতে করিতে ধনুতে বাণ আরোপিত করিলেন, কিন্তু এক উল্লম্ফন দ্বারাই মৃগ বনগহনে প্রবিষ্ট হইল। রাম সীতার দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলেন। রাবণ মনে মনে ভাবিলেন, এই উপযুক্ত সময়—মায়াবলম্বনে রামকে দূরে পাঠাইয়াছি; তপোবনে সীতা সম্প্রতি একাকিনী—এই সময়েই তাঁহাকে হরণ করিতে হয়। সীতা পতিবিরহিতা হইয়া তাঁহার অনুপস্থিতিতে শঙ্কিত হইয়াছিলেন, তাই তিনি উটজে প্রবেশ করিতে উদ্যতা হইলেন—এই মুহূর্ত্তেই অতিথি তাঁহার স্ব-রূপ ধারণ করিয়া সীতার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন! সীতা ভয়-চকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'হং কো দাণি অঅং ?'—'ওমা, এ আবার কে!' রাবণ সীতাকে নিজ পরিচয় ও তাঁহার আগমনের কারণ বুঝাইয়া বলিলেন,—

কিং ন জানীষে—

যুদ্ধে যেন সুরাঃ সদানবগণাঃ শক্রাদয়ো নির্জ্জিতা

দৃষ্ট্বা শূর্পণখা-বিরূপ-করণং শ্রুত্বা হতৌ ভ্রাতরৌ। *

দর্পাদ্ দুর্মতিমপ্রমেয়বলিনং রামং বিলোভ্যচ্ছলৈঃ
স ত্বাং হর্ত্তুমনা বিশালনয়নে প্রাপ্তোঽস্ম্যহং রাবণঃ ॥

'কি, জান না—সদানব শক্রাদি সুরগণ যুদ্ধে যাহা দ্বারা নির্জ্জিত হইয়াছিলেন, হে বিশালনয়নে, সেই আমি রাবণ শূর্পনখার বিরূপ-করণ দর্শন করিয়া ও তাহার ভ্রাতৃদ্বয়ের নিধন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, দর্পবশতঃ দুর্মতি ও অপ্রমেয়বল রামকে ছলপূর্ব্বক বিলুব্ধ করিয়া, তোমাকে হরণ করিবার ইচ্ছায় এখানে উপস্থিত হইয়াছি।' সীতা প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন; আর্য্যপুত্রকে ও সৌমিত্রিকে আত্মপরিত্রাণের জন্য ডাকিতে লাগিলেন। কিন্তু রাবণের চক্ষুর্বিষয়ে পতিত হইয়াছেন—তাঁহার আর উদ্ধার কোথায়? রাবণ ভাবিলেন, পৃথিবী ধন্যা—'বর্ত্ততে যত্র সীতা'—'যেখানে সীতাদেবী বর্ত্তমান।' তিনি সীতাকে বলিলেন যে, রাম হউক, লক্ষ্মণ হউক, বা স্বর্গস্থ রাজা দশরথ হউক—যিনিই সীতার আশ্রয় হইবেন—রাবণ তাঁহাকেই পরাভূত করিতে পারিবেন। মৃগশিশুগণ ব্যাঘ্রের কি করিতে পারে? ইহাই রাবণের বিশ্বাস! তিনি দর্পবশতঃ সীতাকে নির্লজ্জভাবে বলিলেন—

বিলপসি কিমিদং বিশাল-নেত্রে
বিগণয় মাং চ যথা তবার্য্যপুত্রম্ ॥

'হে বিশালনেত্রে! বিলাপ করিয়া কি হইবে? আমাকেও তোমার আর্য্যপুত্রের মত ভাবিয়া লও।' পতিব্রতা সীতা এই অপমানসূচক বাক্য শ্রবণ করিয়া সহ্য করিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'সন্তোসি'—'তুমি আমার অভিশাপ-গ্রস্ত হইলে।' পতিব্রতার তেজ সহ্য করে, এমন সাধ্য কাহার! তাই রাবণ বলিলেন যে—

যোঽহমুৎপতিতো বেগান্ন দগ্ধঃ সূর্য্যরশ্মিভিঃ।
অস্যাঃ পরিমিতৈর্দগ্ধঃ সন্তোঽসীত্যভিরক্ষরৈঃ ॥

'যে আমি [গগনে] বেগে উৎপতিত হইয়াও সূর্য্যকিরণে দগ্ধ হই নাই, সেই আমি উহার "সন্তোঽসি" এই অক্ষর কয়েকটি দ্বারা দগ্ধ হইলাম।' সীতা—আজ্জউত্ত! পরিত্তাঅহি'—'আর্য্যপুত্র! পরিত্রাণ কর, পরিত্রাণ কর' বলিতে লাগিলেন। রাবণ জনস্থান-নিবাসী তপস্বিগণকে ডাকিয়া বলিয়া গেলেন যে, তিনি বলপূর্ব্বক সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গেলেন, যদি রামের ক্ষাত্রধর্ম্মে স্নেহ থাকে, তাহা হইলে পরাক্রম প্রদর্শন করুক। রাবণ পথের মধ্যে দেখিতে পাইলেন যে, চণ্ডচঞ্চু জটায়ু স্বপক্ষবাতে বনরাজি সংক্ষোভিত করিয়া, তাঁহার

দিকে ধাবমান হইতেছে। কিন্তু তিনি স্বখড়্গাপাতে তাহার পক্ষবিচ্যুতি ঘটাইয়া তাহাকে যমালয়ে প্রেরণ করিতে কৃতসংকল্প করিলেন।

ময়ি স্থিতে ক যাস্যসি?--

'আমি বিদ্যমান থাকিতে তুমি কোথায় যাইবে?'—এইরূপ রোষবাক্যে রাবণকে আহ্বান করিয়া, জটায়ু তাঁহাকে সবেগে আক্রমণ করিল। উভয়ের তুমুল যুদ্ধ বাধিল। জটায়ুর প্রহরণ তাহার পক্ষ, তুণ্ড ও লৌহকণ্টকতুল্য তীক্ষ্ণ নখ। রাবণের প্রহরণ তাঁহার অসি। রাবণাস্ত্রে আহত হইয়া জটায়ু সীতার উদ্ধারকল্পে স্ববীর্য্য-সদৃশ প্রযত্ন প্রদর্শন করিয়াও, পর্ব্বত-ভগ্ন বনবৃক্ষের ন্যায় ভূপতিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল।

জনস্থানে এত ঘটনা ঘটিয়া যাইতেছে; তাহার সংবাদ অযোধ্যায় ভরতের গোচর হয় নাই। কিছুকাল পরে ভরত রামদর্শনার্থ সুমন্ত্রকে আর একবার জনস্থানে পাঠাইয়া দিয়া বড়ই পর্য্যাকুলচিত্তে তাঁহার প্রত্যাগমনের অপেক্ষা করিতেছিলেন। সুমন্ত্র ফিরিয়া আসিয়াছেন। শোকাগ্নি-শোষিতবদন সুমন্ত্র বড়ই ব্যথিতহৃদয়ে ভরত-সমীপে অগ্রসর হইতেছিলেন; তিনি মনে মনে ভাবিতেছিলেন—'নরপতির নিধন ও নৃপতিপুত্রের বিপদ স্বয়ং দর্শন করিয়াছি; এখন জনস্থান হইতে জনক-নন্দিনীর প্রণাশ-বার্ত্তাও শুনিয়া আসিয়াছি।' সন্তাপবশতঃ সুমন্ত্র শূন্য-হৃদয়। ভরত কর্ত্তৃক রাম-লক্ষ্মণ-সীতার কুশল-জিজ্ঞাসিত হইয়াও তিনি নিরুত্তর। ভরত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তবে কি গুরুজনেরা ক্রোধে বা লজ্জায় আপনাকে দর্শন দেন নাই? অতি-দুঃখে সুমন্ত্র উত্তর করিলেন—

কুতঃ ক্রোধো বিনীতানাং লজ্জা বা কৃতচেতসাম্।
ময়া দৃষ্টং তু তচ্ছূন্যং তৈর্বিহীনং তপোবনম্॥

'বিনীতজনদিগের ক্রোধ, আর সংযতচিত্তদিগের লজ্জা কেমন করিয়া সম্ভবে? তাঁহাদের অনুপস্থিতিতে আমি সেই বন শূন্য দেখিয়াছি।' তাহার পর সুমন্ত্র নিবেদন করিলেন যে, তিনি জনস্থানে শুনিয়া আসিয়াছেন, 'রামচন্দ্র সম্প্রতি বানর-নিবাস কিষ্কিন্ধ্যাতে চলিয়া গিয়াছেন।' ভরত এই বার্ত্তা-শ্রবণে দুঃখিত হইলেন; কারণ, বানরগণ বিশিষ্টপুরুষকে চিনিতে পারিবে না—তাঁহাদিগকেও অতিকষ্টে সেই স্থানে বাস করিতে হইবে। কিন্তু তির্য্যগ্-যোনি হইলে কি হইবে? বানরেরাও উপকার করিলে তাহা বুঝিতে পারে। সুমন্ত্র বলিলেন—

সুগ্রীবো ভ্রংশিতো রাজ্যাদ্ ভ্রাত্রা জ্যেষ্ঠেন বালিনা।
হৃতদারো বসন্ ছৈলে তুল্যদুঃখেন মোহিতঃ॥

'জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বালি কর্ত্তৃক সুগ্রীব রাজ্য হইতে ভ্রংশিত হইয়াছিলেন, [তৎপরে] হৃত-দার সুগ্রীব শৈলে বাস করিবার সময় তুল্য-দুঃখ [রামচন্দ্র] কর্ত্তৃক মোক্ষিত হইয়াছিলেন।' রামচন্দ্র তুল্য-দুঃখ কি প্রকারে? প্রথমতঃ সুমন্ত্র বিপদ্ গণিয়া সত্য বিষয় গোপন করিয়া বলিলেন যে, ঐশ্বর্য্যভ্রংশতায় রামচন্দ্র সুগ্রীবের তুল্য-দুঃখ। কিন্তু সত্য কথা বিজ্ঞাপন না করিলে, স্বর্গীয় মহাজনের পাদমূল উদ্দেশ্য সুমন্ত্রকে তাপিত হইতে হইবে—ভরত এইরূপ বলিলে পর, সুমন্ত্রকে অনন্যোপায় হইয়া বলিতে হইল যে,

বৈরং মুনিজনস্যার্থে রক্ষসা মহতা কৃতম্।
সীতা মায়ামুপাশ্রিত্য রাবণেন ততো হৃতা॥

'মুনিজনের মঙ্গলার্থ, রাক্ষসের সহিত মহান্ বিরোধ সংঘটিত হইয়াছিল; তৎপরে মায়ার উদ্ভাবন করিয়া, রাবণ সীতাকে হরণ করিয়াছেন।' এই দুঃসহ সংবাদ শ্রবণ করিয়া, ভরত মোহগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। পিতা স্বর্গগত; বান্ধবজন কেহই সঙ্গে যাইতে পারেন নাই; বনপ্রদেশে কত প্রকারের দুঃখ; তদুপরি পত্নীবিয়োগ —রামচন্দ্রের কি শোচনীয় অবস্থা! ভরত ক্রোধে অধীর হইয়া সুমন্ত্রকে সঙ্গে লইলেন। তিনি জননীর চতুঃশালার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পুত্রের আগমন কৈকেয়ীর নিকট নিবেদিত হইল। কৈকেয়ী প্রতিহারীর নিকট এই-মাত্র শুনিয়াছেন যে, রামসকাশ হইতে সুমন্ত্র আসিয়াছেন! সুমন্ত্র রামাদির কুশলবৃত্তান্ত শুনাইবেন, এই ভাবিয়া কৈকেয়ী, কৌশল্যা ও সুমিত্রাকেও ডাকিয়া আনাইতে চাহিলেন। ভরত নিষেধ করিলেন। কৈকেয়ী ভীতা হইয়া ভরতকে বৃত্তান্ত বলিতে বলিলেন। কৈকেয়ীকে উত্তরে শুনিতে হইল—

যঃ স্বরাজ্যং পরিত্যজ্য ত্বন্নিয়োগাদ্ বনং গতঃ।
তস্য ভার্য্যা হৃতা সীতা পর্য্যাপ্তস্তে মনোরথঃ॥

'যিনি তোমার নিয়োগে স্বরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন করিয়াছেন, তাঁহার ভার্য্যা সীতা অপহৃতা হইয়াছেন। তোমার মনোরথ পূর্ণ হইল ত? হায় হায়! মনস্বী ইক্ষাকু রাজকুলে,

বধূপ্রধর্ষণং প্রাপ্তং প্রাপ্যাত্রভবতীং বধূম্।

'তোমার মত বধূ থাকাতে বধূহরণ ঘটিল!'' কৈকেয়ী এখন ভরতকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিবার জন্য উপক্রম করিয়া, সুমন্ত্রকে আজ্ঞা করিলেন, যেন তিনিই মহারাজের শাপগ্রস্ত হইবার কথা ভরতসমীপে নিবেদন করেন। ভরত সুমন্ত্রমুখে শুনিলেন যে, 'একদা মৃগয়ায় বহির্গত হইয়া মহারাজ দশরথ সরো-বরে জল দ্বারা কলস পূর্ণ হইবার সময় সমুত্থিত বনগজ-বৃংহিত-তুল্য শব্দ শ্রবণ

করিয়া দূর হইতে বনগজশঙ্কায় শব্দবেধী শরনিক্ষেপ করেন। তাহাতে বিপন্ন-চক্ষু কোনও মহর্ষির চক্ষুভূত মুনিতনয় হত হন। পুত্রের এই ভাবে নিধন-বার্ত্তা জানিয়া, পিতা রোদন করিতে করিতে পুত্র হন্তাকে এই বলিয়া শাপ দিলেন যে,

যথাহং ভোস্তমপ্যেবং পুত্রশোকাদ্ বিপৎস্যসে।

'আমার ন্যায় তুমিও যেন পুত্রশোকে বিপন্ন হও।' মহর্ষির শাপ অপরি-হরণীয়, অতএব অব্যর্থ। কৈকেয়ী ভরতকে বুঝাইয়া দিলেন যে, তাঁহার রাজ্যলাভের কথা বৃথা, সেই শাপেই রামের বনবাস সংঘটিত হইয়াছে। ভ্রাতৃ-বৎসল ভরত মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

অথ তুল্যে পুত্রবিপ্রবাসে কথমহমরণ্যং ন প্রেষিতঃ ?

'আচ্ছা। পুত্র-বিপ্রবাস [সকল-পুত্র সম্বন্ধে] সমান—অতএব, আমি কেন বনে প্রেরিত হইলাম না?' ভরত তখন মাতুলকুলে বাস করিতেছিলেন—অতএব তাঁহার যে সেই সময়ে বাস্তবিকই বিপ্রবাস ছিল, কৈকেয়ী তাহাই নিবেদন করিলেন। চতুর্দ্দশ-বৎসর-ব্যাপী বিপ্রবাস কেন নির্দ্ধারিত হইল? কৈকেয়ী তদুত্তরে আত্ম-দোষক্ষালন করিবার জন্য বলিলেন যে, চতুর্দ্দশ দিবস বলিতে গিয়া তিনি পর্য্যাকুল-হৃদয়ে চতুর্দ্দশ বৎসর বলিয়া ফেলিয়াছিলেন। গুরুজনেরা সকলেই তাহা জানিয়াছিলেন কি না? এইবার সুমন্ত্র বলিলেন যে, বশিষ্ঠ ও বামদেব প্রভৃতি সকলেই তাহা জানিতেন, এবং অনুমতি প্রদান করিয়া-ছিলেন। পাঠক দেখিবেন যে, কবি কৈকেয়ীকে রামবনবাসের কলঙ্ক হইতে নির্মুক্ত করিয়া দিতেছেন। ভরতও মাতাকে নির্দ্দোষা বলিয়া গণ্য করিলেন। ভরত, 'অম্ব যদ্ ভ্রাতৃস্নেহাৎ সমুৎপন্ন-মন্যুনা ময়া দূষিতাত্রভবতী, তৎ সর্ব্বং মর্ষয়িতব্যম্। অম্ব! অভিবাদয়ে।' 'মাতঃ! ভ্রাতৃস্নেহবশতঃ কুপিত হইয়া আমি যে তোমাকে দোষ দিয়াছি, সেই সব পাপ যেন মর্ষিত হয়। মা, প্রণাম করিতেছি।' এই বলিয়া মাতৃপাদমূলে ক্ষমাপ্রার্থী হইলেন। 'কা ণাম মাদা পুত্তঅসস্ অবরাহং ন মরিসদি'—'কোন মাতা পুত্রের অপরাধ ক্ষমা না করেন।' এই বলিয়া কৈকেয়ী ভরতকে ক্ষমা করিলেন। ভরত সসৈন্যে সমুদ্র পার হইয়া রাবণের বধসাধন করিবার জন্য রাম-সহায়ার্থ সমস্ত রাজমণ্ডলকে উদ্যুক্ত হইতে আদেশ করিবেন, স্থির করিলেন। এ দিকে কৌশল্যা দেবী সীতাহরণ-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অন্তঃপুরে মূর্চ্ছিতা হইলেন। ভরত মাতাকে সঙ্গে করিয়া তাঁহার শুশ্রূষার্থ চলিয়া গেলেন।

রাম-ভার্য্যাপহারী ত্রৈলোক্যবিদ্রাবণ রাবণ নিহত হইয়াছেন। রাক্ষস-বিরুদ্ধ-চরিত্র-গুণগণ-বিভূষণ বিভীষণ রাক্ষসরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছেন। শরচ্চন্দ্রাভিরাম রাম বিমল-চরিত্রা সীতাদেবীকে সঙ্গে লইয়া ঋক্ষ-রাক্ষস-বানর প্রভৃতি মিত্রগণে পরিবৃত হইয়া অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন। ভরত যেখানে রামচন্দ্রকে অযোধ্যায় ফিরাইয়া লইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিতে আসিয়াছিলেন, আজ রামচন্দ্র সভার্য্য সানুজ সেই আশ্রমপদে পুনরায় আসিয়া উপস্থিত।

মুনিজনেরা রামচন্দ্রকে নানাভাবে স্তবস্তুতি করিয়া আদর করিতেছেন। বয়সানুসারে তপস্বিপত্নীগণ সীতাদেবীকে কেহ 'সখী', কেহ 'সীতা,' কেহ 'জানকী', কেহ 'স্নুষা' বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন। শুক্লবাসা ভরতকে দেখিয়া যে স্থানে মৃগযূথ পরিত্রস্ত হইয়াছিল—সেই স্থান ; যাহার সমীপে বসিয়া তাঁহারা মহারাজের সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধবাসরে নিবপন-ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন, এবং যেখানে কাঞ্চনপার্শ্ব মৃগ ধাবিত হইয়া আসিয়াছিল, তাঁহাদের তপস্যার সাক্ষীভূত সেই মহাকচ্ছ ; এবং জনস্থানের যে যে স্থানে সীতাদেবী স্বহস্তাবর্জ্জিত কলস-জল দ্বারা আশ্রমবৃক্ষ অভিষিক্তিত করিয়াছিলেন ; সেই সকল প্রদেশ রামচন্দ্র সীতাকে পুনরায় দেখাইতেছিলেন। লক্ষ্মণ সংবাদ আনিলেন যে, ভ্রাতৃবৎসল ভরত মাতৃগণ-সমভিব্যাহারে সৈন্যপরিবৃত হইয়া, রামদর্শনার্থ তথায় পুনরায় উপস্থিত হইয়াছেন। উপযুক্তকালেই ভরতের আগমন হইয়াছে। রামচন্দ্র মাতৃত্রয়-পাদপ্রান্তে প্রণাম করিলেন। রাম অবসিত-প্রতিজ্ঞ হইয়া সভার্য্যানুজ কুশলী আছেন। ইহাই মাতৃগণের আহ্লাদের বিষয়। শত্রুঘ্ন ও ভ্রাতৃগণের আহ্লাদের বিষয়। ভরতকে আলিঙ্গন করিয়া রাম ও লক্ষ্মণও কৃতার্থ হইলেন। শত্রুঘ্নও ভ্রাতৃচরণ-রজঃস্পর্শে কৃতকৃতার্থ হইলেন। তিনি রামচন্দ্রকে নিবেদন করিলেন যে, বশিষ্ঠ ও বামদেব প্রজাবর্গকে সঙ্গে লইয়া অভিষেকদ্রব্যসম্ভারের সহিত তথায় রামচন্দ্রের দর্শনাভিলাষী হইয়া অবস্থান করিতেছেন। এবার কৈকেয়ী রামকে আদেশ করিলেন—'গচ্ছ জাদ ! অভিলসেহি অভিসেঅং'—'যাও বৎস ! অভিষেক লইতে ইচ্ছা কর।' রাম মাতৃবচন লঙ্ঘন করিলেন না। রাজপুরোহিতগণ বিজয়ঘোষণাপূর্ব্বক সম্পাদিতাভিষেক রাবণান্তক রামচন্দ্রকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। রামের রাজ্যাভিষেকে ভরতের ও শত্রুঘ্নের অপরিমিত আনন্দ উচ্ছলিত হইল। লঙ্কাসমরসুহৃৎ সুগ্রীব নীল, মৈন্দ, জাম্ববৎ, হনুমৎ প্রভৃতি সকলেই রামচন্দ্রকে অভিনন্দন করিলেন। কৈকেয়ী এই রামাভ্যুদয় পুনর্ব্বার অযোধ্যায় দেখিবার ইচ্ছা করিলেন। এমন

অতর্কিতভাবে রাবণের পুষ্পক তথায় উপস্থিত হইল। সেই রথে আরোহণ করিয়া সকলেই অযোধ্যায় চলিয়া যাইবেন, স্থির হইল। রামচন্দ্র বলিলেন—

অদ্যৈব যাস্যামি পুরীমযোধ্যাং সম্বন্ধিমিত্রৈরনুগম্যমানঃ।

আত্মীয় বন্ধুগণ কর্ত্তৃক অনুগম্যমান হইয়া আমি অদ্যই অযোধ্যাপুরীতে যাত্রা করিব। লক্ষ্মণ উত্তর করিলেন—

অদ্যৈব পশ্যন্তু চ নাগরাস্ত্বাং চন্দ্রং সনক্ষত্রমিবোদয়স্থম্॥

'নগরবাসিগণও উদয়পর্ব্বতস্থিত সনক্ষত্র চন্দ্রের ন্যায় আপনাকে অদ্যই দর্শন করুক।'

শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

গৃহস্থ।—ভাদ্র।—'আলোচনা'য় অনেক কাজের কথা আছে। কিন্তু ভাষার জড়তায় ভাব এত ক্ষুণ্ণ যে, অনেক স্থলে অর্থগ্রহ করিবার উপায় নাই। 'দেশ, ধর্ম্ম, সমাজ, রাষ্ট্র, এই-গুলিকে আমাদের আশ্রয় করিয়াছি। আমরাই সুবিধার নিমিত্ত এইগুলিকে টানিতেছি, অপ্রয়োজনে সরাইয়া দিতেছি।' ভাষাকে রবারের মত টানা যায় বটে, কিন্তু পাঠকের বোধ-শক্তিকে যত্র তত্র যা তা 'টানিতে' বলিলে, সে হুকুম তামিল হয় না। বড় কথা ও কাজের কথাও নিশ্চয়ই শুনাইবার ও বুঝাইবার জন্য লেখা হয়। সমাজকে 'টানিতেছি', রাষ্ট্রকে 'টানিতেছি'—বলিলে বাঙ্গালী কি বুঝিবে? 'এই শক্তির মধ্যে ডিগ্রির তারতম্য দেখিতে পায়।' ডিগ্রির বাঙ্গালা তর্জ্জমা কি অসম্ভব? ইহা কি সকলে বুঝিবে? লোক-সাহিত্যের সৃষ্টি যাঁহাদের লক্ষ্য, তাঁহাদের ভাষা বাঙ্গালা ভাষার শব্দশক্তি ও রচনা-রীতির এতটা পরিপন্থী হইলে 'মূলে হাবাৎ' হইবার সম্ভাবনা।—সে যাহা হউক, 'হিন্দু পরিবারে ছাত্রাবাস' ও 'উড়িষ্যার সাহিত্যসাধন' আমরা সকলকে পড়িতে বলি। শ্রীবিনয়কুমার সরকারের 'চীনা কবিদের প্রকৃতিনিষ্ঠা' তাঁহার 'হিমাচলের অপর পার' নামক গ্রন্থের এক অধ্যায়—তাই বোধ করি ইহাতে সম্পূর্ণ নিবন্ধের পরিণতি নাই। বিনয় বাবু আজ কাল কুক্কুট মিশ্র শর্ম্মার মত সকল বিষয়েই ব্যুৎপত্তির পরিচয় দিতেছেন। দুই চারি পৃষ্ঠায় নিগ্রো জাতির অতীত হইতে ভবিষ্যৎ পর্য্যন্ত সমগ্র কোষ্ঠী কাটিয়া দিতেছেন; ইউরোপ ও আমেরিকার নাড়ী টিপিয়া তাহাদের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ বলিয়া দিতেছেন। এত অল্প দিনের মধ্যে এত অসংখ্য বিষয়ে এত ফতোয়া ইতিপূর্ব্বে আর কোনও মৌলবী দিয়াছেন, তাহা ত মনে হয় না। 'মূর্খেতে চাহিয়া থাকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে'। আমরা কেবল সম্ভ্রমে স্তব্ধ হইয়া থাকি—বিনয় বাবুকে সজীব বিশ্বকোষ বলিয়া প্রশংসা করি।—'চীনা কবিদের প্রকৃতিনিষ্ঠা'র ভণিতা পড়িয়া যে আশা হয়, পরিচয়ে তাহা পূর্ণ হয় না। নমুনাগুলির পদ্যে অনুবাদ—যেন 'বেল্লিক-বাজারে'র সেই 'আকু-মাকু কাঁচু-কাঁচু'কে ভ্যাঙ্চাইতেছে। বিনয় বাবুও সহসা কবিযশঃ-প্রার্থী হইয়া উঠিলেন! এ রোগ সংক্রামক। চীন পর্য্যন্ত বিনয়কুমারকে তাড়া করিয়াছে।

'বাঁধা থাক্‌তে পার্‌ল না আর
দপ্তরখানায় কেতাব নিয়ে
নীল আকাশের মরকত ছুঁয়ে
চোখের চটক রঙ্‌বেরঙে
হৃদয় তাদের আকুল আজি
ভাণ্ডার হ'তে প্রকৃতি মায়ের
ছাড়্‌ল তারা পুথি পত্র,
বেরুল তারা ছুটাছুটি কর্‌তে'

কবিতার ভাষা নয়। বিনয় বাবু অসঙ্কোচে নিঃশঙ্কে নির্দ্দয়ভাবে চীন কবিকে জবাই করিয়াছেন; বাঙ্গালা ভাষাকে ভ্যাঙ্গচাইয়াছেন; এবং অধুনাতন শিক্ষিত সাহিত্যসেবীরাও কিরূপ খাতির-নাদারং, স্পর্দ্ধাসহকারে জয়ডঙ্কা বাজাইয়া তাহার পরিচয় দিয়াছেন। রবি-রাহুর ছড়া মনে পড়ে—

'তাও ছাপালি পদ্য হ'ল,
নগদ মূল্য এক টাকা।'

তবে এ পদ্যের—এ ভাষার মূল্য এক পয়সাও নয়। গদ্যে অনুবাদ করিলে বরং রস থাকিত। অনুবাদে এক আধার হইতে অন্য আধারে ঢালিতে ঢালিতেই কবিতার সৌরভ ও গৌরব অনেকটা উপিয়া যায়। তাহার উপর কবির দুর্ভাগ্যক্রমে অনুবাদক যদি নাপ্তির হাঁড়ী ভিন্ন আর কোনও আধার খুঁজিয়া না পান, তাহা হইলে কবিতার দুর্দ্দশার সীমা থাকে না। একেই ত 'কবিতা-রসমাধুর্য্যং কবির্বেত্তি ন তৎকবিঃ।' তাহার উপর, খুব সম্ভব, ইহা অনুবাদের অনুবাদ। তাহার উপর অপভাষার অত্যাচার। এ ত্র্যহস্পর্শে কি কোনও কবিতা এক দণ্ড বাঁচিতে পারে? 'শ্রাদ্ধ ও স্মৃতি' প্রবন্ধে শ্রীশশিভূষণ পাল লিখিয়াছেন,—'মৃত ব্যক্তির জন্ম বা মৃত্যুতিথিতে স্মৃতি-সভার অনুষ্ঠান করার প্রথাটা বোধ হয় খাঁটি ইউরোপীয়।' সভাটা ইউরোপীয়। প্রাচীন ভারতে যাহার তাহার স্মৃতিসভা হইত না; ভাগ্যবান্ পিতার বোঝা বহিবার জন্য পুত্র 'ভগবান্' সাজিত না, মই ঘাড়ে করিয়া রাস্তায় সভার বিজ্ঞাপন অাঁটিত না, বাপের গুণগান করিবার জন্য পুত্র বক্তাদের—সভাপতিদের—বিদেশীদের পায়ে ধরিত না! কিন্তু স্মৃতিরক্ষার অন্য ধারা ছিল। মেলায় উৎসবে জনসাধারণ—সমাজ সমবেত হইয়া মহানুভবের—পুণ্য-চরিতের স্মৃতি রক্ষা করিত। লেখক যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্য। আমরাও বলি, স্বর্গীয় মহাপুরুষগণের ভাবের অনুশীলনই তাঁহাদের স্মৃতিরক্ষার একমাত্র পথ। এ ক্ষেত্রেও 'তস্মিন্ প্রীতি স্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনং চ তদুপাসনমেব।' আমাদের প্রীতিও নাই, প্রিয়কার্য্য-সাধনেরও প্রয়োজন হয় না। সভায় যাই, বক্তাদের ভাঁড়ামো শুনি, হাততালি দি, পায়রা ওড়াই! যেমন জাতি, তেমনই স্মৃতি। বিদ্যাসাগরের স্মৃতিসভায় এই প্রবন্ধটি পঠিত হইয়াছিল। বিদ্যাসাগরের স্মৃতিসভা যাহারা করে, তাহারা নবীন। সংসারের কলুষে তাহাদের হৃদয় আবিল হয় নাই, তাই তাহারা যথাশক্তি বিদ্যাসাগরের প্রিয়কার্য্যসাধন করিয়া 'তস্মিন্ প্রীতি'র পরিচয় দিতে পারে। বিদ্যাসাগরের সভায় দেশের মোড়লদের ত প্রায় দেখিতে পাই না। যাহাদের পায়ের নখ হইতে মাথার চুল পর্য্যন্ত বিদ্যাসাগরের নিকট ঋণী, তাহাদের কাহারও ত সাড়া পাই না! যে জাতির জীবনীশক্তিই ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে, তাহাদের স্মৃতি ত প্রখর হইতে পারে না; শ্রদ্ধাবুদ্ধি সভার দিন সহসা সহস্রদল পদ্মের মত ফুটিয়া উঠিয়া

সমাজে সৌন্দর্য্য ও সৌরভ বিতরণ করিবে, এমন আশাও করা যায় না। বৎসরান্তে একবার এই শিবরাত্রির শলিতা জ্বালিয়া যাঁহারা মহাপুরুষগণের স্মৃতিপূজার অবকাশ দেন, তাঁহারা আমাদের নমস্ত। এই স্মৃতিপূজার অনুষ্ঠান হইতে 'সভা'র ভাবটা যথাসম্ভব কমাইয়া প্রাচ্য ভাবের অনুরূপ করিবার চেষ্টা আমরা অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। দেশের তন্ত্রে দেশের লোকের মন ফিরিলে এই সকল জাতীয় অনুষ্ঠান যেমন উপচয় লাভ করিবে, তেমনই ইহাদের শ্রীও ফিরিবে। শ্রীহরিদাস পালিতের 'পুণ্ড্র জাতির ইতিহাস' ও 'দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহের ইতিহাস' চলিতেছে। শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক কবিতায় যে 'প্রার্থনা' করিয়াছেন, তাহা যদি বা দেবতার কানে উঠে, যতই অন্তর্যামী হউন, তিনিও ইহার 'মানে করিতে' পারিবেন না! এই সকল কবির 'তিনি'-ভক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়! 'তিনি' গড্, কি জিহোবা, ঈশ্বর কি খোদা, বিষ্ণু কি ব্রহ্মা, চান্দো কি বোঙ্গা, শীতলা কি মনসা, তাহা বলিতে পারি না। তবে 'তিনি' যে এই পর্য্যায়ের কেহ, তাহা অনায়াসে অনুমান করা যায়। রবীন্দ্র প্রভৃতি 'আধুনিক' ভক্ত কবিদের এই 'তিনি'-পদবাচ্য দেবতাটির প্রতি অত্যন্ত অনুগ্রহ। যেমন এক-কান-কাটা গ্রামের বাহির দিয়া যায়, কিন্তু দু'-কান-কাটা গ্রামের ভিতর দিয়াই পথ চলে, তেমনই ইঁহাদের মধ্যে যিনি যত অক্ষম, তাঁহার 'তৎ'-প্রতি অনুগ্রহ তত অধিক! কুমুদরঞ্জন 'তাঁহাকে' নিজের 'মিত্র' বা মিতের চাকরী দিতেও প্রস্তুত! কারণও এমন গুরুতর নয়—'মিত্র যিঁনি বিপদে সুখে দুঃখে।' যিঁনি'র চন্দ্রবিন্দুটি সম্মানের মাত্রা বাড়াইবার জন্য কবিই দান করিয়াছেন, আমাদের খয়রাৎ মনে করিবেন না। আমরা জানি, পরের ধনে পোদ্দারী করিতে নাই। কিন্তু ভক্ত-সাধক কবি দুনিয়ার মায়া ও বিধান অতিক্রম করিয়াছেন, তাই রবীন্দ্রনাথের কবিতার ছায়া লইয়াই নিরস্ত হন নাই, থানকে থান পাচার করিয়াছেন। নিজস্বও আছে।—

> 'ডাকিলে দীনবন্ধু বলে' উদে পুলক রবি
> ঝরিয়া পড়ে শান্তিধারা বুকে।'

'উদে পুলক রবি' বুঝিলেন কি? 'পুলক' উদিত হয়! কেন না, সে যে রবি! কিন্তু লেখক তাহাকে কুক্ষিগত করিয়াছেন; আশা করি, আর সে উদিবে না। এ আশা কি নিতান্ত দুরাশা? শ্রীবিনয়কুমার সরকারের 'পোচুইয়ের বীণাওয়ালী' চীনে কবির চৈনিক কবিতার পরিচয়। 'চীনা কবিদের প্রকৃতিনিষ্ঠা'র মাথায় যে টোপর পরাইয়া দিয়াছি, তাহা বীণাওয়ালীর মাথাতেও বেমানান হইবে বলিয়া মনে হয় না।

সবুজ পত্র।—ভাদ্র।—সার্ রবীন্দ্রনাথের 'জাপানযাত্রীর পত্র' সুখপাঠ্য। বাণিজ্য-দানব এ পথেও আবির্ভূত হইয়াছে, কিন্তু নিপুণ তুলিকার রমণীয় রেখা-চিত্রে পত্রখানি খচিত। চীনা-মজুরদের ছবি—'প্রথমেই চোখে পড়ল জাহাজের ঘাটে চীনা মজুরদের কাজ। তাদের একটা করে নীল পায়জামা পরা এবং গা খোলা। এমন শরীরও কোথাও দেখি নি, এমন কাজও না। একেবারে প্রাণসার দেহ, লেশমাত্র বাহুল্য নেই। কাজের তালে তালে সমস্ত শরীরের মাংসপেশী কেবলি ঢেউ খেলাচ্চে। এরা বড় বড় বোঝাকে এমন সহজে এবং এমন দ্রুত আয়ত্ত করচে যে, সে দেখে আনন্দ হয়। মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত কোথাও অনিচ্ছা, অবসাদ বা জড়ত্বের লেশমাত্র লক্ষণ দেখা গেল না। বাইরে থেকে তাদের তাড়া দেবার কোন দরকার নেই। তাদের দেহের বীণাযন্ত্র থেকে কাজ যেন সঙ্গীতের মত বেজে উঠচে। জাহাজের ঘাটে মাল তোলা-নামার কাজ

দেখতে যে আমার এত আনন্দ হবে, এ কথা আমি পূর্ব্বে মনে করতে পারতুম না। পূর্ণ শক্তির কাজ বড় সুন্দর ; তার প্রত্যেক আঘাতে আঘাতে শরীরকে সুন্দর করতে থাকে, সেই শরীরও কাজকে সুন্দর করে তোলে। এইখানে কাজের কাব্য এবং মানুষের শরীরের ছন্দ আমার সামনে বিস্তীর্ণ হয়ে দেখা দিলে। এ কথা জোর করে বলতে পারি, ওদের দেহের চেয়ে কোন স্ত্রীলোকের দেহ সুন্দর হতে পারে না,—কেননা শক্তির সঙ্গে সুষমার এমন নিখুঁৎ সঙ্গতি মেয়েদের শরীরে নিশ্চয়ই দুর্লভ। আমাদের জাহাজের ঠিক সামনেই আর একটা জাহাজে বিকেলবেলায় কাজকর্ম্মের পর সমস্ত চীনা মাল্লা জাহাজের ডেকের উপর কাপড় খুলে ফেলে স্নান করছিল,—মানুষের শরীরে যে কি স্বর্গীয় শোভা, তা এমন করে আর কোনদিন দেখতে পাই নি।'

১৬ই পৌষের পত্রে কবিবর লিখিয়াছেন,—'এখানকার ঘরকন্নার মধ্যে প্রবেশ করে' সব চেয়ে চোখে পড়ে জাপানী দাসী! মাথায় একখানা ফুলোওঠা (?) খোঁপা, গাল দুটো ফুলো ফুলো, চোখ দুটো ছোট, নাকের একটুখানি অপ্রতুলতা, কাপড় বেশ সুন্দর, পায়ে খড়ের চটি ; কবিরা সৌন্দর্য্যের যে রকম বর্ণনা করে থাকেন, তার সঙ্গে অনৈক্য ঢের ; অথচ মোটের উপর দেখতে ভাল লাগে ; যেন মানুষের সঙ্গে পুতুলের সঙ্গে, মাংসের সঙ্গে মোমের সঙ্গে মিশিয়ে একটা পদার্থ ; আর সমস্ত শরীরে ক্ষিপ্রতা, নৈপুণ্য, বলিষ্ঠতা। গৃহস্বামী বলেন, এরা যেমন কাজের, তেমনি এরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আমি আমার অভ্যাসবশতঃ ভোরে উঠে জানালার বাইরে চেয়ে দেখলুম, প্রতিবেশীদের বাড়ীতে ঘরকন্নার হিল্লোল তখন জাগতে আরম্ভ করেচে—সেই হিল্লোল মেয়েদের হিল্লোল। ঘরে ঘরে এই মেয়েদের কাজের ঢেউ এমন বিচিত্র বৃহৎ এবং প্রবল করে সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্তু এটা দেখলেই বোঝা যায় এমন স্বাভাবিক আর কিছু নেই। দেহযাত্রা জিনিসটার ভার আদি থেকে অন্ত পর্য্যন্ত মেয়েদেরই হাতে,—এই দেহযাত্রার আয়োজন উদ্যোগ মেয়েদের পক্ষে স্বাভাবিক এবং সুন্দর! কাজের এই নিয়ত তৎপরতায় মেয়েদের স্বভাব যথার্থ মুক্তি পায় বলে শ্রীলাভ করে। বিলাসের জড়তায় কিম্বা যে কারণেই হোক্, মেয়েরা যেখানে এই কর্ম্মপরতা থেকে বঞ্চিত হয়, সেখানে তাদের বিকার উপস্থিত হয়, তাদের দেহমনের সৌন্দর্য্যহানি হতে থাকে, এবং তাদের যথার্থ আনন্দের ব্যাঘাত ঘটে। এই যে এখানে সমস্তক্ষণ ঘরে ঘরে ক্ষিপ্রবেগে মেয়েদের হাতের কাজের স্রোত অবিরত বইচে, এ আমার দেখতে ভারি সুন্দর লাগচে। মাঝে মাঝে পাশের ঘর থেকে এদের গলার আওয়াজ এবং হাসির শব্দ শুনতে পাচ্চি, আর মনে মনে ভাবচি মেয়েদের কথা ও হাসি সকল দেশেই সমান। অর্থাৎ সে যেন স্রোতের জলের উপরকার আলোর মত একটা ঝিকিমিকি ব্যাপার, জীবনচাঞ্চল্যের অহেতুক লীলা।'

শ্রীপ্রমথ চৌধুরীর 'বড়বাবুর বড় দিন' একটি গল্প, কিন্তু আখ্যানবস্তু অত্যন্ত অল্প। আবার, ব্যাখ্যানের বাহুল্যে গল্পটি অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হইয়াছে। মূলের অপেক্ষা টীকার বহর অধিক। 'চার-ইয়ারী কথা'র দীপ্তি বড়বাবুর বড়দিনে নাই। 'মৌক্তিকং ন গজে গজে' বটে, কিন্তু একবারে পটেশ্বরী! 'একটি জরুরী প্রস্তাব' পড়িয়া মনে হইল, 'তোমার বোঝা যায় না কান্না হাসি!' ইহা বোধ হয় রসিকতা, বা তাহার চেষ্টা। তাহার সঙ্গে পাণ্ডিত্যের ফোড়ন ও

আছে। শ্লেষ নাই, বিদ্রূপ যদি বা চোখে পড়ে, তাহা অত্যন্ত নিরেট। রস-রচনা শুধু সাধিলে হয় না—ভিতরে কিছু থাকা চাই।

জগজ্জ্যোতিঃ।—ভাদ্র।—শ্রীশরচ্চন্দ্র দাসের 'মৈত্র-কন্যকাবদান', শ্রমণ শ্রীঅগ্রবংশ বিদ্যা-বিনোদের 'আর্য্যমার্গদীপিকা', শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষের 'সুহনুজাতক', শ্রমণ শ্রীধর্ম্মরত্নের 'মহাগোবিন্দ-সূত্র', শ্রমণ শ্রীঅগ্রবংশের 'সংযুক্ত-নিকায়',—কয়টিই অনুবাদ। অপচারে কাগজ পূর্ণ না করিয়া সুনিবন্ধের অনুবাদে বৌদ্ধ সাহিত্যের পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়া সম্পাদক মহাশয় সমীচীনতার পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু কবিতা জটাইবুড়ী তবু 'জগজ্জ্যোতিঃ'কে ছাড়ে নাই! শ্রীসন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'স্মৃতি' নামক পদ্য বৌদ্ধপত্রে বাঙ্গালার যুগ-ধর্ম্মের ছাপ দাগিয়া দিয়াছে। নমুনা, 'শীতের সারা জাগিয়ে গেল অঙ্গে কাঁটা।' সারা—পদ্মাতীরবর্ত্তী স্থানবিশেষ নিশ্চয়ই নয়—'র-ড়য়োরৈক্যং' স্মরণ করুন। শ্রীপ্রভাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পদ্যে প্রশ্নোত্তর লিখিয়াছেন। কবির বক্তব্য,—সৃষ্টির রহস্য সম্বন্ধে যখন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই, তখন 'শুভ কাজে মন দাও, এবং শেষ হলে সব ফেলে অসীমত্বে মিশে যাও।' তথাস্তু। কিন্তু তিনিও পদ্য লেখা 'ফেলে শুভ কাজে মন দিন'। 'অসীমত্বে মেশা'র কথা এখন ধামা-চাপা থাক। শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মুচ্ছদ্দী 'নারায়ণে বৌদ্ধধর্ম্ম' প্রবন্ধে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের বৌদ্ধধর্ম্ম-বিবৃতির প্রতিবাদ করিতেছেন। অনুবাদের মাত্রা কমাইয়া প্রতিবাদের মাত্রা বাড়াইলে হানি কি? তিন কিস্তিতে তিন রতি ছাপা হইয়াছে। শ্রীসন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় দেখিতেছি, বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর-সভার দ্বার-কবি! ইনি আবার 'বিজয়-সঙ্গীত'ও রচিয়াছেন। আমরা নাচার। শৈশবে পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছিলাম, 'অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ' বৌদ্ধদের মত। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর-সভা কবিতার হিংসায় কুণ্ঠিত নন! কবিত্বকে জবাই করিলে রক্ত পড়ে না, অন্ততঃ চোখে দেখা যায় না, তাই কি তাঁহাদের করুণা হয় না?

সৌরভ।—ভাদ্র। শ্রীরসিকচন্দ্র বসু দেড় পৃষ্ঠায় 'রঘুনাথ গোঁসাই'র চরিত লিখিয়াছেন। না লিখিয়া সুখ, না পড়িয়া সুখ। তবে ছাপিয়া কি ফল? 'সের সিংহের ইউগণ্ডাপ্রবাস' চলিতেছে। শ্রীসুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের 'বন্দনা'য় দেখিলাম,—

'আঁখি জল-ঝরা অর্ঘ্য ডালা!'

জল-ঝরা আঁখিই যদি অর্ঘ্য ডালা হয়, তাহা হইলেও নিস্তার। কিন্তু আঁখি-জল হইতে যদি অর্ঘ্য-ডালা ঝরিয়া থাকে, তাহা হইলে? সেকালে উপকথার রাজকন্যা হাসিলে মাণিক ও কাঁদিলে মুক্তা ঝরিত। একালে অর্ঘ্য-ডালা ঝরিবে, তাহা অবশ্য বিচিত্র নয়। কিন্তু আঁখি-জলের সঙ্গে ঝরিয়া আক্কেল নামক বস্তুটিও কি কবিদের মাথা হইতে নিষ্কাশিত হইয়া যাইতেছে? ইহার উপর আবার 'তুমিই' নামক একটি পদ্যের অপচার আছে। লাইনবন্দী লেখা, সুতরাং কবিতা। ন্যাকামীর চূড়ান্ত। বাঙ্গালা দেশ হইতে লজ্জা কি লজ্জায় পলাইয়া গেল! 'আলোচনা—বিশুদ্ধ ভাষা বনাম প্রাদেশিক ভাষা' প্রবন্ধে আমরা পাঠক সম্প্রদায়কে অবহিত হইতে বলি। সুখের বিষয় এই যে, প্রাদেশিক মাসিকে এই প্রসঙ্গের অবতারণা হইতেছে। বীরবল কি বলেন, দেখা যাউক।

গম্ভীরা।—আষাঢ়। 'বিবিধ প্রসঙ্গ' হইতে আমরা 'পণ্ডিত রজনীকান্তে'র সংক্ষিপ্ত পরিচয় উদ্ধৃত করিলাম,—'গৌড়ের ইতিহাস-প্রণেতা পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী আর ইহধামে নাই। পণ্ডিত মহাশয় মালদহের গৌরব ছিলেন। বর্ত্তমান মালদহের শিক্ষিতসমাজের মধ্যে

অনেকেই তাঁহার ছাত্র। সাহিত্য-জগতে পণ্ডিত মহাশয় বেশ সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন। পণ্ডিত মহাশয়ের সাহিত্য-সাধনা সখের ছিল না। দুঃখ দৈন্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া তাঁহাকে সাহিত্য-চর্চ্চা করিতে হইত। তিনি পাঠ্যাবস্থায় শিক্ষার সুযোগ লাভ করেন নাই। নর্ম্মাল স্কুলের ত্রৈবার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সংসারে প্রবেশ করেন। অত্যল্প আয়ে তাঁহাকে সংসার প্রতিপালন করিতে হইত। নিজের চেষ্টায় সংস্কৃতভাষায় প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। সাধারণতঃ ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধান, ঐতিহাসিক গবেষণা ও আলোচনায় তিনি আমোদ অনুভব করিতেন। ইতিহাস লইয়া আলোচনা করিতে গেলেই ইংরেজী-ভাষা-শিক্ষা দরকার; তাই পণ্ডিত মহাশয়, ঐকান্তিক যত্নের সহিত, অপরের সাহায্য ব্যতিরেকেও ইংরেজী-ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। মফঃস্বলে থাকিয়া তাঁহাকে ইতিহাসচর্চ্চা করিতে হইত। পণ্ডিত লোকের সাহায্য পাওয়া ত দূরের কথা—তিনি অত্যাবশ্যকীয় (!) পুস্তক পড়িবারও সুযোগ পাইতেন না। এজন্য তিনি সর্ব্বদাই দুঃখ করিতেন। এই সকল অসুবিধা সত্ত্বেও তিনি নিরুৎসাহ হন নাই। অদম্য উৎসাহের সহিত অধ্যয়নে নিরত থাকিয়া আপনার কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাহারই ফলে তিনি গৌড়ের ইতিহাস লিখিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। রংপুর সাহিত্য-পরিষদ্ এই পুস্তক-প্রকাশের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন,—অন্যথা পুস্তকখানি লোক-লোচনের গোচরীভূত হইত কি না সন্দেহ। শুনিতে পাই, পণ্ডিত মহাশয় আরও কয়েকখানি পুস্তকের পাণ্ডুলিপি রাখিয়া গিয়াছেন। অর্থাভাবে ঐ সকল পুস্তক প্রকাশ করিয়া যাইতে পারেন নাই। পণ্ডিত মহাশয়ের বহুসংখ্যক শিষ্যমণ্ডলীর কেহ অথবা সাহিত্যানুরাগী ধনী ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ এই সকল পুস্তক-প্রকাশের ভার গ্রহণ করিলে ভাল হয় না কি?'

স্বর্গীয় পণ্ডিত মহাশয় প্রথমে 'সাহিত্যে'ই লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। 'সাহিত্য' তাঁহার নিকট ঋণী; সাহিত্য-সম্পাদক কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ। আমরা তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি। শ্রীকালিদাস রায়ের 'মায়াবিনী' কবিতায় ছন্দের ও শব্দের ঝঙ্কার শুনিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। কিন্তু সবই প্রহেলিকা। তবে এমন হেঁয়ালি ভাঙ্গিতে ইচ্ছা হয় বটে। ভাষার ঝঙ্কারে, শব্দের টঙ্কারে প্রাণ নাচিয়া উঠে। কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। যিনি এমন রচনা করিতে পারেন, তিনি দুর্ব্বোধ হেঁয়ালি ও ছাইভস্ম ছাপিয়া হাস্যাস্পদ হন কেন, তাহা কে বলিবে? পিণ্ডখর্জ্জুর কি এত গিলিয়াছেন যে, ক্রমাগত তেঁতুল খাইতেছেন? শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্তের 'ইউরোপের দানে'র বিশেষত্ব আমরা বুঝিতে পারিলাম না। 'গম্ভীরা'র এই সংখ্যায় 'ভাষা-বিজ্ঞানে'র সূচনা হইয়াছে শ্রীখগেন্দ্রনারায়ণ মিত্রের 'বিবর্ত্তনের কারণনির্দ্দেশ' উচ্চ শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক বিবৃতি। সুখের বিষয় এই যে, শিক্ষিত বিশেষবিৎগণ মাতৃভাষার এই শোচনীয় অভাব দূর করিবার জন্য কলম ধরিয়াছেন। শ্রীসুরেশচন্দ্র রায় চৌধুরীর 'মানব ও ঈশ্বর' এই শ্রেণীর আর একটি উৎকৃষ্ট নিবন্ধ। 'ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত শক্তি', 'জন রস্কিন ও তাঁহার শিক্ষানীতি' ও 'হিন্দুশাস্ত্র' প্রভৃতি চলিতেছে। দ্বৈমাসিক পত্রে এতগুলি ক্রমশঃপ্রকাশ্য প্রবন্ধ দিয়া পাঁচ ফুলে সাজি সাজাইবার চেষ্টা না করিয়া দুই একটি বিষয় অধিকমাত্রায় দিলে ও শীঘ্র শেষ করিবার চেষ্টা করিলে, লেখকগণের পরিশ্রম সার্থক হইতে পারে। গুরুতর নিবন্ধের অবতারণা যে পত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য, সে পত্রে বৈচিত্র্য না থাকিলেও ক্ষতি নাই। আর, এমন বিন্দু-বৈচিত্র্যে পাঠকের তৃপ্তির আশাও করা যায় না। আশা করি, সম্পাদক মহাশয় আমাদের এই নিবেদনে উদাসীন হইবেন না।

'বাউল রবীন্দ্রনাথ'।

গত ভাদ্র মাসের 'সাহিত্যে' শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ 'ঋষি ও কবি' নামক এক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা জ্যৈষ্ঠের 'সাহিত্যে' প্রকাশিত 'ঋষি রবীন্দ্রনাথ' নামক প্রবন্ধের উত্তর। রমাপ্রসাদ বাবুর যে মূল প্রবন্ধের প্রতিবাদকল্পে আমি 'ঋষি রবীন্দ্রনাথ' লিখি, সেই মূল বা প্রথম প্রবন্ধের নাম 'রবীন্দ্রনাথের কাব্যরহস্য।' তাঁহার এই দ্বিতীয় প্রবন্ধ উক্ত প্রতিবাদের খণ্ডন করিয়া তাঁহার প্রথম প্রবন্ধেরই সমর্থন করিবে, আমরা প্রথমে এইরূপ ভাবিয়াছিলাম। কিন্তু প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া দেখা গেল, লেখক আপনারই মূল আপনিই খণ্ডিত করিয়াছেন। মূল প্রস্তাবের সমর্থনে অসমর্থ হইয়া তিনি প্রস্তাবের পরিবর্ত্তনে আত্মরক্ষায় প্রয়াসী হইয়াছেন। এই দ্বিতীয় প্রবন্ধে তিনি তাঁহার মূল প্রবন্ধের অনেক কথার উলট-পালট করিয়াছেন—এমন কি, তাঁহার মূল প্রস্তাব স্পষ্টতঃ পরিহারই করিয়াছেন। ইহা যে বুদ্ধিমানের কার্য্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে তিনি মূলকথার মায়া একেবারে ত্যাগ করিতে পারেন নাই—তাহার ধূয়া দ্বিতীয় প্রবন্ধেও মাঝে মাঝে আছে।

রমাপ্রসাদবাবু তাঁহার প্রথম প্রবন্ধে সর্ব্বতোভাবে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথ 'ঋষি'—বৈদিকযুগের ঋষিরই মত ঋষি—তাঁহার গীতিকাব্য, প্রাচীন বেদ-সংহিতারই মত 'ঋষির দৃষ্ট নব মন্ত্রসংহিতা'। কিন্তু এক্ষণে 'ঋষি ও কবি' নামক দ্বিতীয় প্রবন্ধে তিনি বলিতেছেন—'ইংরেজ কবি ও সমালোচক মেথু আর্নেল্ড (Matthew Arnold) ইংরেজ কবি ওয়ার্ডসোয়ার্থ সম্বন্ধে' যেরূপ বলিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সেইরূপ 'আমি নির্দ্দেশ করিয়াছিলাম।'...'কিন্তু কোন কবিকে এই হিসাবে 'ঋষি' বলিলেই তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ কবি বলা হয় না...'মন্ত্র' বলিলেই যে রবীন্দ্রনাথের গীতকে উচ্চ করা হইল, তাহা আমার ধারণা ছিল না। 'মন্ত্র' এবং 'ঋষি' শব্দ ছাড়িয়া দিয়া, রবীন্দ্রনাথকে 'কবি' ও তাঁহার গীতকে 'কবিতা' বলিলেও ক্ষতি নাই; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গীত অতি উচ্চ অঙ্গের মঙ্গলকর কবিতা নয়, এ কথা বলিয়া তাঁহার প্রতি লোকের অভক্তি জন্মাইয়া দিলে যথেষ্ট ক্ষতি আছে।'—এই উদ্ধৃত অংশ হইতে পাঠকগণ স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছেন, রমাপ্রসাদবাবু তাঁহার মূল কথার

কিরূপ ভাবে পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, এবং তাঁহার সেই মূল কথা 'ছাড়িয়া' দিতে কোনও 'ক্ষতি'ও বোধ করিতেছেন না। যখন পূর্ব্বপক্ষ আপনার প্রস্তাব আপনিই খণ্ডন করিয়া দিলেন, তখন আমাদের—উত্তরপক্ষের তর্ক এই স্থলেই শেষ হইতে পারে। কিন্তু রমাপ্রসাদবাবু তাঁহার দ্বিতীয় প্রবন্ধে যে কয়েকটি অবান্তর কথা উত্থাপিত করিয়াছেন, সেগুলির সম্বন্ধে আলোচনা না করিলে তাঁহার প্রতি অবিচার করা হয়। অতএব তাঁহার প্রবন্ধের যথাসম্ভব সবিস্তার আলোচনা করা যাইতেছে।

প্রথম প্রবন্ধের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায়, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ তাঁহার দ্বিতীয় প্রবন্ধের টানা-পোড়েন সম্পূর্ণ নূতন করিয়া বুনিয়াছেন। এই বুনানির পোড়েনে প্রথম ক্ষেপের মোটা সুতা মাঝে মাঝে মিশাল দেওয়া হইয়াছে। প্রবন্ধকারের মূল-প্রস্তাব-পরিবর্ত্তনের এই ব্যাপার কয়েকটি উদাহরণে সুস্পষ্ট হইবে। প্রথমতঃ—'রবীন্দ্রনাথের কাব্য-রহস্য' নামক মূল প্রবন্ধে যে যে স্থলে রবীন্দ্রনাথের রচনাকে 'মন্ত্র-সংহিতা', 'ঋষিদৃষ্ট নব মন্ত্র সংহিতা', 'মন্ত্র-সাহিত্য' ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হইয়াছে, তাহার সর্ব্বস্থলেই রবীন্দ্রের 'কাব্য', 'গীতিকাব্য', 'গীতি-কবিতা', এই তিনের অন্যতম শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। মূলপ্রবন্ধের নামকরণেও সামান্যার্থে 'কাব্য' শব্দ ব্যবহৃত। কিন্তু লেখক তাঁহার এই দ্বিতীয় প্রবন্ধে রচনার নির্দ্দেশ করিতে কুত্রাপি রবীন্দ্রনাথের 'কাব্য', 'গীতিকাব্য', 'কবিতা', এই তিনটি শব্দের কোনটিই ব্যবহার করেন নাই! সবিশেষ সতর্কতার সহিত তিনি এই তিনটি শব্দ বর্জ্জন করিয়া—প্রয়োজনীয় স্থল-মাত্রেই 'গান' ও 'গীত' এই দুই শব্দের অন্যতরটির ব্যবহার করিয়াছেন! প্রথম প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের 'কাব্য'কেই 'মন্ত্র' বলা হইয়াছে; আর দ্বিতীয় প্রবন্ধে তাঁহার শুধু 'গান'গুলিকেই 'মন্ত্র' বলা হইতেছে। 'রবীন্দ্রনাথের কাব্য-রহস্য'-প্রকাশকের এই প্রস্তাব-পরিবর্ত্তন-রহস্য যথার্থই কৌতুককর। ইহার উদ্দেশ্য সহজেই অনুমেয়। যে কাব্য রচনা করিয়া রবীন্দ্রনাথ বঙ্গ-সাহিত্যের এক জন বিশিষ্ট ও অতি মনোহর কবি-রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহার সেই কাব্যকে 'ঋষির দৃষ্ট মন্ত্র' বলিয়া ব্যাখ্যান করিয়া, এবং তাহার রচয়িতা রবীন্দ্রনাথকে 'ঋষি'-রূপে প্রতিপন্ন করিতে যাইয়া শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ সুধীসমাজে হাস্যাস্পদ হইয়াছেন। তাই, এখন তিনি কথা পাল্‌টাইয়া বলিতেছেন—'রবীন্দ্রনাথের অনেক 'গীত' এই দেশের প্রাচীন ঋষির মন্ত্রের মত·· তাই (আমি) রবীন্দ্রনাথকে ঋষি বলি।' চন্দ্রবাবুর

এ কথাও যে ভ্রান্তিমূলক, তাহা পরে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিব। তাঁহার প্রস্তাব-পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে দ্বিতীয় কথা এই—

তিনি প্রথম প্রবন্ধে বলিয়াছেন—'রবীন্দ্রনাথের 'কাব্যের' যাহা প্রাণবস্তু, তাহা…দৃষ্ট মন্ত্রের প্রত্যক্ষ দেবতা…সীমার ও অসীমের মিলন-ক্ষেত্র নর-নারায়ণই রবীন্দ্রনাথের সকল মন্ত্রের দেবতা।' তাঁহার এই উক্তির সমর্থনের জন্য তিনি রবীন্দ্রনাথের 'জীবন-স্মৃতি' হইতে কবির নিজ বাক্য—'আমার ত মনে হয়, আমার কাব্য-রচনার (গান-রচনার নহে!) এই একটিমাত্র পালা। সেই পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে—সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন-সাধনের পালা।' ইহা উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন, 'ইহা অপেক্ষা মহান্ পালার উদ্ভাবন অসম্ভব।' কিন্তু দ্বিতীয় প্রবন্ধে তিনি সুর বদলাইয়া বলিতেছেন—'এই পালা ছাড়া রবীন্দ্রনাথ আরও কতকগুলি পালা বাঁধিয়াছেন। তার মধ্যে সম্ভোগের পালাও আছে। সম্ভোগের পালা আছে বলিয়াই রবীন্দ্রনাথের কাব্যের যাহা প্রধান পালা,—'গীতাঞ্জলিতে,' 'গীতিমাল্যে', 'গীতালি'তে যে পালা পূর্ণতা লাভ করিয়াছে—সেই পালাও যে কেন ফেলিয়া দিতে হইবে, তাহা বুঝিতে পারি না।' এ স্থলে পাঠক লক্ষ্য করিবেন—প্রথম প্রবন্ধে 'সম্ভোগের পালা'র নামগন্ধও নাই। ঐ 'একটি পালা' ছাড়া 'আরও কতকগুলি'র কোনও পালার কোনও উল্লেখ নাই। লেখকের আহূত সাক্ষী কবি রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বলিতেছেন—'আমার কাব্যরচনার এই একটিমাত্র পালা।' কবির নিজের কথা ঠেলিয়া ফেলিয়া চন্দবাবুর স্বকপোলকল্পিত কথা বসাইবার অধিকার নাই—এবং এরূপ সাহস করিলেও বিচারক্ষেত্রে তাহার স্থান ও মূল্য নাই। আবার, কবি তাঁহার 'জীবন-স্মৃতি'তে তাঁহার 'কাব্য-রচনা'র যে 'একটিমাত্র 'পালা'র কথা কহিয়াছেন, তাহা তাঁহার 'গীতাঞ্জলি' প্রভৃতি নিতান্ত আধুনিক রচনা সম্বন্ধে প্রযুক্ত করা ন্যায়-সঙ্গত হইবে না। কারণ, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'জীবনস্মৃতি' ও 'ছিন্নপত্র', 'নোবেল'-পুরস্কার-প্রাপ্তির বহুপূর্ব্বে, 'গীতাঞ্জলি' প্রভৃতি গ্রন্থ-রচনার বহুপূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছেন! এ স্থলে রমাপ্রসাদবাবুর 'ঋষি' সাক্ষী তাঁহার নিজেরই বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদান করিতেছেন!

তৃতীয়তঃ—চন্দ বাবু তাঁহার দ্বিতীয় প্রবন্ধে Matthew Arnold এর একটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, ইংরাজ কবি Wordsworthকে যে 'হিসাবে ঋষি' বলা যাইতে পারে, রবীন্দ্রনাথকেও তিনি 'সেই

হিসাবে ঋষি' বলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার মূল প্রবন্ধে এই 'হিসাবে ঋষি'র কথা ছিল না। সে ক্ষেত্রে তিনি রবীন্দ্রনাথকে সর্ব্বতোভাবে বৈদিক ঋষির মতই এক জন ঋষি বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই প্রথম প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছেন—'রবীন্দ্রনাথ ঋষি, তাঁহার গীতিকাব্য ঋষির দৃষ্ট মন্ত্র-সংহিতা…এ যুগে ঋষি শ্রেণীর কবির অভ্যুদয় একটা অভাবনীয় ব্যাপার। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে প্রণালীতে শিক্ষিত হইয়াছিলেন, তাহাই এই অভাবনীয় ব্যাপারকে সম্ভব করিয়া তুলিয়াছিল…প্রাচীন কালে ঋষিবালকের ন্যায় উপনয়ন সংস্কারেই এই নবীন ঋষির শিক্ষার সূত্রপাত।…পূরাপূরি বুঝিয়া পুস্তক পড়া রবীন্দ্রনাথের প্রয়োজন হয় নাই…যদি তিনি ইউনিভার্সিটির পাঠ সাঙ্গ করিতে পারিতেন, তবে তিনি 'মন্ত্র' দেখিতে পাইতেন কি না সন্দেহ …তাহা হইলে রবীন্দ্রনাথ মানবসমাজের এক জন শ্রেষ্ঠ কবি, ভারতের গেটে (Goethe) হইতে পারিতেন, কিন্তু 'ঋষিত্ব' বিকাশ লাভ করিবার অবসর পাইতেন. বলিয়া বোধ হয় না।…(তাঁহার) সংহিতা ঋক্, সাম, অথর্ব্ব অথবা শুক্লযজুর্ব্বেদসংহিতার মত কেবল মন্ত্রময়ী নহে, কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের মত ব্রাহ্মণভাগসমন্বিত।…'

যে রবীন্দ্রনাথের এই অভিনব প্রকার শিক্ষাদীক্ষা হইয়াছিল, এবং যিনি সেই জন্যই এই 'আধুনিক যুগে ঋষি কবির অভ্যুদয় অভাবনীয় ব্যাপার' হইলেও, 'অভাবনীয়কে সম্ভব করিয়া' 'ঋষি' হইয়াছেন, তাঁহাকে এখন আবার আধুনিক যুগের ম্লেচ্ছকবি Wordsworth এর সহিত সমতুল করা কিরূপে ন্যায়সঙ্গত হইবে? ইউনিভার্সিটির শিক্ষা পূর্ণ করিতে গেলে যদি 'মন্ত্র' দেখিতে না পাওয়া যায়—ঋষিত্বের বিকাশ না হয়, তবে ইউনিভার্সিটি-শিক্ষার পারগামী, ইউনিভার্সিটির উচ্চোপাধিধারী Wordsworth কোন হিসাবে 'ঋষি' হইতে পারেন? এবং তাঁহার সহিত রবীন্দ্রনাথেরই বা তুলনা হইবে কিরূপে? বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ সাঙ্গ করিতে পারিলে রবীন্দ্রনাথ যদি Goethe হইতে পারিতেন, 'ঋষি' হইতেন না, তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করিয়া Wordsworth গেটে না হইয়া 'ঋষি' হইয়া গেলেন কিরূপে?

আবার ঋষি হওয়া ও শ্রেষ্ঠ কবি হওয়া, এই দুইয়ের মধ্যে ঋষিত্বই মহত্তর, সন্দেহ নাই। কারণ, ঋষিমাত্রই—মন্ত্রদ্রষ্টা বৈদিক ঋষিমাত্রই শ্রেষ্ঠ কবি; কিন্তু শ্রেষ্ঠ কবিমাত্রই ঋষি নহেন। চন্দবাবুও প্রথম প্রবন্ধে এই উদ্ধৃত অংশে

তিনি যে বলিয়াছেন—'কোন কবিকে "ঋষি" বলিলেই তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ কবি বলা হয় না। মেথ্ আর্নোল্ড ওয়ার্ডসোয়ার্থকে গেটে অপেক্ষা খাট বলিয়া গিয়াছেন।' —তাঁহার এই কথা যুক্তিসঙ্গত নহে। কোনও কবিকে ঋষি বলিলে তাঁহাকে মহাকবি অপেক্ষা মহত্তর বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। অপিচ, Matthew Arnold কবি Wordsworthকে কুত্রাপি 'Vates' বা ঋষি বলেন নাই, এবং সর্ব্বত্রই তাঁহাকে 'শ্রেষ্ঠ কবি' বলিয়াছেন। 'গেটে অপেক্ষা খাট' বলিলেও তিনি Wordsworthকে দান্তে (Dante) প্রমুখ কবি-পঞ্চক ব্যতীত সকল আধুনিক কবির উপরে স্থান দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

'Dante, Shakespeare, Moliere, Milton, Goethe, are altogether larger and more splendid luminaries in the poetical heaven than Wordsworth. But I know not where else, among the moderns, we are to find his superiors.'

কবি Wordsworthএর এই অসাধারণ শ্রেষ্ঠত্ব শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ অস্বীকার করিয়াছেন! কারণ, 'ওয়ার্ডসোয়ার্থকে শ্রেষ্ঠ কবি' বলিলে তিনি রবীন্দ্রনাথকে 'ঋষি' প্রতিপন্ন করিতে পারেন না; রবীন্দ্রনাথের ঋষিত্ব-প্রতিপাদনে রামপ্রসাদ বাবুর দ্বিতীয় প্রবন্ধে অবলম্বিত যুক্তি এইরূপ—'রবীন্দ্রনাথের অনেক গীত এই দেশের প্রাচীন ঋষির মন্ত্রের মত; রচনা এত স্বাভাবিক, এত 'inevitable', যেন কোনও মানুষ রচনা করে নাই; অপৌরুষেয় মন্ত্র।' 'মেথ্ আর্নোল্ড কবি ওয়ার্ডসোয়ার্থ সম্বন্ধে এইরূপই বলিয়াছেন।' 'যে কবিতা inevitable—অপরিহার্য্য, যে কবিতা স্বতঃবিকশিত অপৌরুষেয় মনে হয়, তাহা 'মন্ত্র'—তাহার রচয়িতা 'ঋষি'। এতএব কবি ওয়ার্ডসোয়ার্থ 'ঋষি'। রবীন্দ্রনাথও 'এই হিসাবে ঋষি।' (কিন্তু প্রথম প্রবন্ধে কথিত হইয়াছে যে, রবীন্দ্রনাথ, তাঁহার অভিনব প্রণালীর শিক্ষার ফলে আধুনিক যুগে অসম্ভবের সম্ভবরূপে আবির্ভূত, বৈদিক যুগের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। 'ইউনিভার্সিটির পাঠ সাঙ্গ করিতে পারিলে তিনি মানবসমাজের এক জন 'শ্রেষ্ঠ কবি'—ভারতের গেটে হইতে পারিতেন।' কিন্তু 'মন্ত্র দেখিতে পাইতেন না'—'ঋষিত্ব বিকাশ লাভ করিবার অবসর পাইতেন না।' অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথ 'ঋষি' হইয়াছেন বলিয়াই Goetheএর মত 'মানব-সমাজের শ্রেষ্ঠ-কবি' হইতে পারেন নাই। 'ঋষি' হইতে গেলে 'শ্রেষ্ঠ কবি' হওয়া যায় না, প্রথম প্রবন্ধের এই কথার সহিত সঙ্গতি রাখিবার প্রয়াসে অতঃপর কথিত হইতেছে,—'রবীন্দ্রনাথ ও ওয়ার্ডসোয়ার্থ উভয়েই এক হিসাবে ঋষি। কিন্তু 'ঋষি' হইতে গেলে 'শ্রেষ্ঠ কবি' হওয়া যায়

কারণেই ওয়ার্ডসোয়ার্থও শ্রেষ্ঠ-কবি নহেন। 'মেথু আর্নোল্ড ওয়ার্ডসোয়ার্থকে গেটে অপেক্ষা খাট বলিয়া গিয়াছেন।' 'কোন কবিকে 'ঋষি' বলিলেই তাঁহাকে 'শ্রেষ্ঠকবি বলা হয় না।' রমাপ্রসাদ বাবুর এই যুক্তির কৌতুক সুধীগণ উপভোগ করিবেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, রমাপ্রসাদ বাবুর মত এক জন সুশিক্ষিত ব্যক্তি, নিজের একটি ভ্রান্ত মতের সমর্থনের অনুরোধে সত্যের শিরশ্ছেদ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। আপনার 'জেদ্' বজায় রাখিবার জন্য তিনি রবীন্দ্রনাথকে শ্রেষ্ঠ কবি বলিতেও প্রস্তুত নহেন। তাঁহার রবীন্দ্রনাথ 'ঋষি' হইলেই হইল! তিনি রবীন্দ্রের কাব্যের আলোচনা করিয়া এই 'রহস্যে'র আবিষ্কার করিয়াছেন যে, রবীন্দ্রনাথ 'ঋষি';—'শ্রেষ্ঠ কবি' নহেন! আমরা রবীন্দ্রের কাব্য সবিশেষ আলোচনা করিয়া এই বুঝিয়াছি যে, রবীন্দ্রনাথ এক জন শ্রেষ্ঠ কবি—ঋষি নহেন।

আবার, চন্দবাবু তাঁহার ঐ জেদ্ও মাঝে মাঝে ছাড়িয়া দিয়াছেন—'ছেড়ে দিয়ে তেড়ে ধরা'র পরিচয়ও এই দ্বিতীয় প্রবন্ধে আছে। প্রবন্ধের প্রথমাংশেই (পূর্ব্বে ইহা উল্লিখিত হইয়াছে) তিনি বলিয়াছেন—'মন্ত্র বলিলেই যে রবীন্দ্রনাথের গীতকে উচ্চ করা হইল, তাহা আমার ধারণা ছিল না। 'মন্ত্র' এবং 'ঋষি' শব্দ ছাড়িয়া দিয়া রবীন্দ্রনাথকে 'কবি' এবং তাঁহার গীতকে 'কবিতা' বলিলেও ক্ষতি নাই।' এইরূপে আপনার মূল কথা ছাড়িয়া দিয়া, চন্দবাবু প্রবন্ধের শেষে 'তেড়ে ধরিয়া' বলিতেছেন—'জমীদার রবীন্দ্রনাথকে—দোকানদার রবীন্দ্রনাথকে, বিলাসী রবীন্দ্রনাথকে, ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথকে, গোঁড়া ব্রাহ্ম রবীন্দ্রনাথকে, স্যার্ ডাক্তার রবীন্দ্রনাথকে ভাল লাগে না বলিয়া কি ঋষি রবীন্দ্রনাথের, বাউল রবীন্দ্রনাথের গান উপেক্ষা করে চলে?'

'বাউল রবীন্দ্রনাথে'র কথা পরে হইবে। রমাপ্রসাদ বাবুর মূল প্রবন্ধের সহিত দ্বিতীয় প্রবন্ধের এত অসঙ্গতি, এবং এই দ্বিতীয় প্রবন্ধের অংশপরম্পরার মধ্যে এত অসামঞ্জস্য যে, তাঁহার চিত্তচাপল্য দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। প্রথম প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছেন—'রবীন্দ্রনাথ ঋষি—তাঁহার গীতিকাব্য ঋষির দৃষ্ট মন্ত্রসংহিতা। অন্য কোনও শ্রেণীর কাব্যের সহিত রবীন্দ্রনাথের উৎকৃষ্ট গীতিকবিতার তুলনা করিলে, তাহার প্রতি অবিচার করা হয়।...ইহা শোনা বা শেখা কথার প্রতিধ্বনিমাত্র নহে—ইহা দেখা কথা, গানে গাঁথা।' রমাপ্রসাদ বাবুর কথিত এই 'দেখা কথা'র অর্থ কি? 'কথা' কি দেখা যায়? রবীন্দ্রনাথ 'কথা' দেখিলেন কিরূপে? বৈদিক ঋষিগণ যেমন 'মন্ত্র' দেখিতে পাইতেন,

রবীন্দ্র কি তেমনই 'কথা' দেখিয়া 'গানে গাঁথা' করিয়াছেন? রমাপ্রসাদ বাবুর এই 'দেখা কথা'টি যদি অর্থহীন প্রলাপ না হয়—তবে তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, বৈদিক ঋষিগণ সত্য সত্যই মন্ত্র দেখিতে পাইতেন—স্বীকার করিতে হইবে যে, ঋষিগণের মন্ত্রসমূহ, সত্য সত্যই আপ্ত ও অপৌরুষেয়—এবং সে-গুলি সেই অব্যক্ত সচ্চিন্ময় কর্তৃক ঋষি-নয়নে প্রকাশিত হইত। স্বীকার করিতে হইবে যে, ঋষিগণের মন্ত্রদৃষ্টি ও মন্ত্রের অপৌরুষেয়ত্ব কাল্পনিক নহে—ঐতিহাসিক সত্য। এই হেতু চন্দ বাবু তাঁহার প্রথম ও দ্বিতীয় প্রবন্ধ, 'ইতিহাসের হিসাবে' 'বেদমন্ত্র নিত্য ও অপৌরুষেয় হইতে পারে না', 'ইতিহাসের হিসাবে এই বেদমন্ত্র-গুলি পুরুষরচিত গীত' ইত্যাদি যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা তাঁহার নিজেরই 'দেখা কথা'র প্রয়োগবলেই অগ্রাহ্য হইতেছে। 'আপ্ত বাক্যের দিন চলিয়া গিয়াছে' বলিয়া আপ্ত বাক্য অনৈতিহাসিক নহে। বেদ-বিকাশেরও একটা প্রকৃত ইতিহাস আছে। বেদ pre-historic হইলেও তাহার একটা history আছে। তাহা লৌকিক বুদ্ধিতে কতকটা mysteryর মত মনে হয় বলিয়া মিথ্যা নহে। 'প্রকৃত সত্যে উপনীত হওয়া দর্শনের ও বিজ্ঞানের সাধ্যাতীত' বলিয়াই কি বেদের আপ্ত বাক্যগুলি অনৈতিহাসিক ও অলীক? আর এই আপ্তগুলি 'অনিত্য', 'পুরুষরচিত' ও অমূলক বলিয়াই কি 'এদেশের দার্শনিকেরা' কুশাগ্রবুদ্ধি কপিল-কণাদ-গোতম-ব্যাস-জৈমিনি-পতঞ্জলি-শঙ্করা-চার্য্যাদি দার্শনিকেরা—'প্রত্যক্ষাদি প্রমাণে তৃপ্ত না হইয়া আপ্ত বাক্যের উপর স্বীয়মত প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিতেন'? সত্য যদি সৎ পদার্থেরই সত্ত্ব হয়—সত্য যদি সৎ-পদার্থেরই অন্তঃস্থিত হয়, তবে সেই সচ্চিন্ময়ই যে ঋষিগণকে সত্য দেখাইয়াছিলেন, ইহা ধ্রুব সত্য। চন্দ বাবু Carlyleএর ধুয়া ধরিয়া বলিয়া-ছেন *—'আপ্ত বাক্যের দিন চলিয়া গিয়াছে'—'সেই প্রকার ঋষি এখন হইতেও পারে না, হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে।' কারণ, Carlyle বলিতেছেন—

'The Hero as Divinity, the Hero as Prophet, are productions of old ages; not to be repeated in the new. They presuppose a certain rudeness of conception, which the progress of more scientific knowledge puts an end to. There needs to be, as it were, a world vacant, or almost vacant of scientific forms, if men in their loving wonder are to fancy their fellow-man either a god or one speaking with the voice of a god. Divinity and Prophet are past.'

---

* ইহা হইতে প্রাচীন ঋষিগণের প্রতি রমাপ্রসাদ বাবুর কিরূপ উচ্চ ধারণা ও শ্রদ্ধা, তাহা বেশ বুঝা যায়। অথচ তিনি রবীন্দ্রনাথকে এক জন প্রাচীন ঋষির সদৃশ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য মূল প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন!

ইহার মর্ম্ম এই—ঐশীশক্তিসম্পন্ন মনুষ্য ও ত্রিকালজ্ঞ পুরুষ পুরাকালের কল্পিত বস্তু। বুদ্ধিবৃত্তির যে স্থূলতাবশতঃ এই প্রকার সত্তায় বিশ্বাস জন্মে, বিজ্ঞানের প্রসারে তাহা দুরীভূত হয়! মানব-সমাজ যখন বৈজ্ঞানিকতত্ত্বশূন্য অবস্থায় থাকে, তখনই মানুষ আর এক জন অসাধারণগুণসম্পন্ন মানুষকে দেবতা বা দেবতার প্রতিনিধি বলিয়া ভাবিতে পারে। Carlyleএর এই বাক্যেরই প্রতিধ্বনি করিয়া চন্দ বাবু বলিয়াছেন—'সেই প্রকার ঋষি এখন হইতেও পারে না, হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে'। কিন্তু তিনিই তাঁহার মূল প্রবন্ধে 'এই যুগে' সেই 'অভাবনীয় ব্যাপারকে সম্ভব করিয়া' কিরূপে রবীন্দ্রনাথ 'ঋষি' হইয়াছেন, তাহা বুঝাইয়াছেন! সে যাহা হউক, দ্বিতীয় প্রবন্ধে তিনি সুর বদলাইয়া বলিতেছেন—রবীন্দ্রনাথ ওয়ার্ডসোয়ার্থের মত ঋষি। তাঁহার এই নূতন প্রস্তাবের ভিত্তি কি?—ওয়ার্ডসোয়ার্থ সম্বন্ধে Matthew Arnoldএর কয়েকটি কথা। Arnold বলিয়াছেন—'ওয়ার্ডসোয়ার্থের শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি এমনই মনোহর, অসাধারণ ও অনিবার্য্য যে মনে হয় যেন প্রকৃতি দেবী স্বয়ং কবির বর্ণনীয় বিষয়গুলি নির্ব্বাচন করিয়া—কবির হস্ত হইতে কলম লইয়া সেগুলি স্বহস্তে লিখিয়া দিয়াছেন।' * এই সূত্র ধরিয়া চন্দ বাবু বলিতেছেন—'যে ভাবটা প্রকাশ করিবার জন্য মেথু আর্ণোল্ড এতগুলি কথা খরচ করিয়াছেন, সেই ভাবটা আমাদের 'মন্ত্র' শব্দের দ্বারা অতি চমৎকার প্রকাশিত হয়। যে কবিতা 'inevitable', যে কবিতা স্বতঃবিকশিত অপৌরুষেয় মনে হয়, তাহা 'মন্ত্র', তাহার রচয়িতা 'ঋষি'।'

এ স্থলে দুইটি বিষয় বুঝিবার আছে। প্রথম, Matthew Arnoldএর ঐ বাক্যের প্রকৃত অর্থ কি। দ্বিতীয়—Arnoldএর ঐ বাক্য কেন 'মন্ত্র' শব্দ দ্বারা সংক্ষেপে 'অতি চমৎকার প্রকাশিত হয়।' প্রথম কথা সম্বন্ধে বক্তব্য এই—এ স্থলে Arnold একটি আলঙ্কারিক ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন—এই ভাষার সরল অর্থ এই, ওয়ার্ডসোয়ার্থের শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক; কাব্যকলার কোনও প্রকার কৌশলের সাহায্যে রচিত নহে;—'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ' বুঝিতে পারিলে—

'With her fair works did Nature link, The human soul that through me ran'—

এই সম্বন্ধ সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিলে, কবির হস্ত দিয়া যেরূপ লেখা,

---

* "Nature herself seems…to take the pen out of his hand, and to write for him with her own bare, sheer, penetrating power,"—ওয়ার্ডসোয়ার্থ

তাঁহার স্বীয় রচনা-চেষ্টা ব্যতীত, যন্ত্রের কার্য্যবৎ বাহির হইয়া থাকে, ওয়ার্ডসোয়ার্থের উৎকৃষ্ট কবিতাগুলি ঠিক সেইরূপ। কবির রচনার এই ভাবটি প্রকাশ করিতে শ্রেষ্ঠ কাব্য-সমালোচক স্বয়ং কবি Arnold একটি সুন্দর অলঙ্কার ব্যবহার করিয়া বলিয়াছেন, কবিকে লিখিতে না দিয়া প্রকৃতিদেবীই যেন স্বয়ং কবিতাগুলি লিখিয়া দিয়াছেন। ইহা একটি উৎপ্রেক্ষামাত্র; ইহার ভিতর বাস্তব তত্ত্ব কিছু নাই। যদিও কিছু থাকে, ত সে সব অলৌকিক বিষয়ে Matthew Arnold বিশ্বাস করেন না। ওয়ার্ডসোয়ার্থ সম্বন্ধে Arnold-এর এই উৎপ্রেক্ষা কবির ঋষিত্ব-বাচক নহে। প্রকৃতির বরপুত্র ওয়ার্ডসোয়ার্থের স্বাভাবিক আরণ্যগান—‘his native wood notes’ শুনিয়া মুগ্ধ আর্নোল্ড কবির প্রতি প্রকৃতিদেবীর অনুগ্রহের আরোপ করিয়াছেন মাত্র। আলঙ্কারিক আরোপ ও বৈদিক ঋষিগণের মন্ত্র-দর্শন, স্বতন্ত্র পদার্থ। একটি কবি-কল্পনা—অপরটি ঐতিহাসিক সত্য।

দ্বিতীয় কথা এই—ঋষিগণের মন্ত্রদর্শন যদি ঐতিহাসিক সত্য না হইত—যদি তাহা আলঙ্কারিক আরোপমাত্র হইত, তবে শ্রুতি-মন্ত্রসমূহের অসাধারণ মহিমা ও সত্যস্বরূপতা থাকিত না—এবং শ্রুতিবাক্যকে কঠোর-বিচারী শাস্ত্রকারগণ প্রমাণরূপে কখনই গ্রহণ করিতেন না। আপ্তত্ব বা অপৌরুষেয়ত্বই বৈদিক মন্ত্রের প্রাণবস্তু। এই প্রাণ-সাক্ষাৎকারেই ঋষির ঋষিত্ব। মন্ত্রের মূলে, ঋষিত্বের মূলে এই বাস্তব-বীক্ষণ আছে বলিয়াই মন্ত্র ও ঋষিত্বের এত মাহাত্ম্য। বৈদিক মন্ত্রের এই বিশেষ লক্ষণ আছে বলিয়াই—লৌকিক ব্যবহারে ‘মন্ত্র’ শব্দের একটা অসাধারণ প্রতিপত্তি আছে। এই জন্যই, ওয়ার্ডসোয়ার্থের প্রতি প্রকৃতিদেবীর অনুগ্রহের যে সকল কথা মেথু আর্নোল্ড কহিয়াছেন, তাহা এক ‘মন্ত্র’ শব্দের দ্বারা ‘অতি চমৎকার প্রকাশিত হয়।’ আদর্শ না থাকিলে কি আরোপ সম্ভব হয়? মূল বস্তু না থাকিলে কি উৎপ্রেক্ষা হয়? উপমেয় না থাকিলে উপমানের স্থান কোথায়? ওয়ার্ডসোয়ার্থ সম্বন্ধে মেথু আর্নোল্ডের উক্ত বহু কথা যে এক কথায়—এক ‘মন্ত্র’ শব্দের দ্বারা ‘চমৎকার প্রকাশিত’ হয়, তাহার কারণ বৈদিক মন্ত্রের অপৌরুষেয়ত্ব। এ স্থলে রমাপ্রসাদবাবুর নিজের উক্তিই আর্ষ মন্ত্রের অপৌরুষেয়ত্বের পরোক্ষ-প্রমাণ!

সে যাহা হউক, ওয়ার্ডসোয়ার্থ ‘যে হিসাবে ঋষি,’ রবীন্দ্রনাথকে ‘সেই হিসাবে ঋষি বলা’ই যদি রমাপ্রসাদবাবুর উদ্দেশ্য থাকিত, তবে এ কথা তাঁহার মূলপ্রবন্ধেই বলিতেন। মূল প্রবন্ধে Wordsworthএর নামগন্ধ নাই। মূল প্রবন্ধ

লিখিবার কালে চন্দবাবুর এ উদ্দেশ্য আদৌ ছিল না। তিনি রবীন্দ্রনাথকে বৈদিক ঋষিরূপে প্রতিপন্ন করিবার জন্য সে প্রবন্ধে কেন এত 'পণ্ডশ্রম করিলেন' ?

চতুর্থ কথা এই—'রবীন্দ্রনাথের গীত উচ্চ অঙ্গের কবিতা কি না', তাহা বুঝাইবার জন্য রমাপ্রসাদবাবু তাঁহার দ্বিতীয় প্রবন্ধে 'কাব্য-প্রকাশ'-কার হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন—'কাব্য শ্রবণমাত্র পরমানন্দ দান করে এবং প্রিয়তমার বচনের ন্যায় মনোহারিত্ব সঞ্চারিত করে'...কাব্যপ্রকাশকার কাব্যকে বেদাদির ও পুরাণাদির সহিত তুলনা করিয়াছেন। বেদাদির অর্থাৎ শ্রুতি স্মৃতির উপদেশকে তিনি বলিয়াছেন 'প্রভুসম্মিত', অর্থাৎ প্রভুর আদেশের তুল্য ...এই (কান্তাসম্মিততয়ার) হিসাবে রবীন্দ্রনাথের অনেক গীতই উৎকৃষ্ট কাব্য।' এই উদ্ধৃত অংশ হইতে পাঠকগণ স্পষ্টই বুঝিতে পারিবেন, কাব্যপ্রকাশ-কারের মতে কাব্যের উপদেশের লক্ষণ 'কান্তা-সম্মিততা', আর বৈদিক মন্ত্রের উপদেশের লক্ষণ 'প্রভুসম্মিততা'। তাহা যদি হইল, তবে রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গীত বেদের 'মন্ত্র-সংহিতা' কিরূপে হইবে ? মূল প্রবন্ধে রমাপ্রসাদবাবু রবীন্দ্র-নাথের গীতি-কবিতাকে 'ঋষিদৃষ্ট মন্ত্র-সংহিতা' বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এখন তিনি বলিতেছেন, রবীন্দ্রনাথের গীতি-কবিতাগুলি উৎকৃষ্ট 'কাব্য'। মূল প্রবন্ধে তিনি 'মন্ত্র' ও 'কাব্য' এই দুইয়ের লক্ষণ এইরূপ করিয়াছেন—'যে গীত দেখা কথার উপর প্রতিষ্ঠিত, শোনা বা শেখা কথার সম্পর্কবর্জ্জিত, তাহা মন্ত্র; যে গীতে শেখা কথার ও শোনা কথার প্রাধান্য, তাহা 'কাব্য'-মাত্র।' আর এই লক্ষণানুসারেই তিনি রবীন্দ্রনাথের গীতি-কাব্যকে 'ঋষি-দৃষ্ট মন্ত্রসংহিতা' বলিয়াছেন, এবং উচ্চকণ্ঠে ইহাও ঘোষণা করিয়াছেন যে, 'অন্য কোনও শ্রেণীর 'কাব্যের সহিত রবীন্দ্রনাথের উৎকৃষ্ট গীতি-কবিতার তুলনা করিলে, তাহার প্রতি অবিচার করা হইবে।' এক্ষণে সুধীবর্গ দেখুন, প্রবন্ধকারের নিজের কথাই তাঁহার বিরুদ্ধ হইয়াছে, এবং তাঁহার নিজ কথার প্রমাণস্বরূপ আনীত 'কাব্যপ্রকাশ'-কার তাঁহারই বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদান করিতেছেন।*

পঞ্চম কথা এই—শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ রবীন্দ্রনাথকে 'ঋষি' প্রতিপন্ন করিতে গিয়া শেষে তাঁহাকে 'বাউল' করিয়াছেন! 'From what height to what pit fallen'! কোথায় 'ঋষি', আর কোথায় 'বাউল'! এ যে হাইকোর্টের 'জজ' দ্বারকানাথ মিত্রকে 'দারোগা' হইবার আশীর্ব্বাদের

* রমাপ্রসাদবাবুর প্রবন্ধে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসঙ্গতি অনেক আছে। বাহুল্যভয়ে তাহার উল্লেখে বিরত হইতে হইল।

মতন! ইহা কিরূপে সম্ভব হইল! রমাপ্রসাদ বাবু তাঁহার মূল প্রবন্ধের মূল প্রস্তাবের পরিবর্ত্তন করিয়া দ্বিতীয় প্রবন্ধের টানাপোড়েন নূতন করিয়া বুনিয়াছেন বলিয়াই এইরূপ অঘটন ঘটিয়াছে। প্রথম প্রবন্ধে তিনি 'রবীন্দ্রনাথের কাব্য-রহস্য' এই ভাবে প্রকাশিত করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন যে, 'রবীন্দ্রনাথের 'গীতিকাব্য' ঋষির দৃষ্ট নবমন্ত্রসংহিতা' ; কিন্তু দ্বিতীয় প্রবন্ধে তিনি কথা পাল্‌টাইয়া বলিতেছেন—'রবীন্দ্রনাথের অনেক গীত এই দেশের প্রাচীন ঋষির মন্ত্রের মত।...'গীতে'র ভাষা এত সহজ, রচনা এতই স্বাভাবিক, এত inevitable, যেন কোন মানুষ রচনা করে নাই, অপৌরুষেয় মন্ত্র। তার উপর পালার মহিমা রবীন্দ্রনাথের 'গীত'কে দিব্য মহিমায় মণ্ডিত করিয়াছে।... 'গীতাঞ্জলি'তে, 'গীতি-মাল্যে', 'গীতালি'তে এই পালা পূর্ণতা লাভ করিয়াছে।' পাঠক লক্ষ্য করিবেন, মূলপ্রবন্ধে যে স্থলে 'গীতিকাব্য' ছিল, দ্বিতীয় প্রবন্ধে সে স্থলে 'গীত' বসিয়াছে। এইরূপ পরিবর্ত্তনের উদ্দেশ্য এই যে, রমাপ্রসাদ বাবু, পূর্ব্বে যাহাই বলুন—এখন বলিতে চাহেন যে, রবীন্দ্রনাথের কেবল 'গীত'-গুলিই ঋষির 'মন্ত্র'। কিন্তু এই মন্ত্রময় গীতগুলি কবির শেষযুগের রচনা 'গীতাঞ্জলি', 'গীতালি' প্রভৃতি পুস্তকেই আছে। আবার, 'অপৌরুষেয়-মন্ত্র'-ভাব ছাড়া এই সব গানের আর একটি বিশেষ লক্ষণ (চন্দবাবুর নিজভাষায়) এই যে, 'এইরূপ ভাবের গান বাঙ্গালার বাউলের মুখে অনেক সময় শুনিতে পাওয়া যায়, এবং রবীন্দ্রনাথের অনেক গীত পাঠ করিলে মনে হয়, বাঙ্গালার বাউল সম্প্রদায়ের ভিতর দিয়া যে ভাবের ধারা বহিয়া আসিয়াছে, তাহা আদি-ব্রাহ্মসমাজের আব-হাওয়ায় পরিবর্দ্ধিত রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ে পতিত হইয়া বিস্তার লাভ করিয়াছে।' অতএব রবীন্দ্রনাথের গানগুলি একাধারে আর্ষমন্ত্র ও বাউল-সঙ্গীত, এবং সেই হেতু ঋষি রবীন্দ্রনাথ বাউল রবীন্দ্রনাথ। কবির 'ঋষি'-ভাব দেখাইবার জন্য শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ 'গীতাঞ্জলি' হইতে—

ফুলের মত আপনি ফুটাও গান,
হে আমার নাথ এই ত তোমার দান।
ওগো সে ফুল দেখিয়া আনন্দে আমি ভাসি
আমার বলিয়া উপহার দিতে আসি,
তুমি নিজ হাতে তারে তুলে লও স্নেহে হাসি,
দয়া করে' প্রভু রাখ মোর অভিমান।—

এই গীতটি তুলিয়া বলিতেছেন—'এই গীতে যিনি কপটতা লক্ষ্য করেন, তিনি রবীন্দ্রনাথকে অবশ্য 'ঋষি' বলিবেন না। কিন্তু যিনি এই স্বতঃবিকশিত সরল

পংক্তি কয়টিকে অকপটোক্তি মনে করেন, তিনি এই গীতের রচয়িতাকে ঋষি বলিয়া অভিনন্দিত করিতে পারেন।' উদ্ধৃত গানটিতে ঋষিত্বের কোনও পরিচয়ই পাওয়া যায় না। কোনও কবিতা 'সরল' ও 'অকপট' হইলেই কি ঋষির মন্ত্র হয়? কি 'অতীন্দ্রিয় সত্য' এই গীতের মধ্যে নিহিত আছে, যাহা 'সাধক,' 'দার্শনিক' ও 'বৈজ্ঞানিক', ইঁহাদের কেহই দেখিতে পান নাই, যাহা কেবল কবি রবীন্দ্রনাথই দেখিতে পাইয়াছেন? ফলতঃ কাব্যের নিকষে এই গীতটি উৎকৃষ্ট রচনা নহে। ইহার মধ্যে একটি ছল বা কৌতুক আছে মাত্র;—দত্ত বস্তু নিজের মনে করিয়া দাতাকে দান। ইহাতেই কি গানটি ঋষির ধ্যানলব্ধ 'মন্ত্র' হইয়া উঠিল? আবার, ইহা কবির 'অকপটোক্তি'ও নহে। রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পাইয়া 'সাপের পাঁচ পা' দেখিয়াছেন, ইহা স্বীকার করিতে পারি, কিন্তু তিনি যে তাঁহার প্রভুর 'হাত' ও 'হাসি' দেখিতে পাইয়াছেন, ইহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। আবার, কবি যদি স্পষ্ট বুঝিতেই পারিতেছেন যে, তাঁহার গান বাঁধার শক্তি ঈশ্বরেরই দান, তবে রচিত গানকে নিজের বলিয়া মনে অভিমান থাকিবে কেন? 'কাব্য' বলিয়া তাহার সত্য কি মনস্তত্ত্বের বাহিরে? রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ গীতই 'কপটোক্তি'। তাঁহার গানে ভান আছে, প্রাণ নাই। তাহা প্রদর্শনের স্থল বর্ত্তমান প্রবন্ধ নহে। সে যাহা হউক, রবীন্দ্রনাথের 'বাউল' ভাব দেখাইবার জন্য শ্রীযুত রমাপ্রসাদ 'গীতালি' প্রভৃতি পুস্তক হইতে কয়েকটি গীত উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই গীতগুলিতে এই প্রকার ধূয়া আছে:—

(১) 'হালের কাছে মাঝি আছে করবে তরী পার।'

(২) 'দুঃখ যদি না পাবে ত দুঃখ তোমার ঘুচবে কবে?'

(৩) মরতে মরতে মরণটারে শেষ করে' দে একেবারে।'

(৪) 'চোখে দেখিস্, প্রাণে কানা
হিয়ার মাঝে দেখ না ধরে ভুবনখানা।'

(৫) 'জীবনকে তোর ভ'রে নিতে মরণ আঘাত খেতেই হবে।'

ইহাদের সারবত্তা বা অভিনবত্বের পাঠকগণ বিচার করিবেন। গীতগুলির ধরণ বাউলের গানেরই মত হইয়াছে। রমাপ্রসাদ বাবুও বলিয়াছেন—'এইরূপ ভাবের গান বাঙ্গালার বাউলের মুখে অনেক সময় শুনিতে পাওয়া যায়।' কিন্তু তাহা হইলে যদি 'বাউল সম্প্রদায়ের ভাবের ধারা রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ে পতিত হইয়া বিস্তার লাভ' করিয়া থাকে, তবে 'তাঁহার মৌলিকতা কোথায়?' এই স্বকৃত প্রশ্নের উত্তরে চন্দবাবু ফরাসী সমালোচক স্যাঁ বুভ'এর বাক্য উদ্ধৃত

করিয়া বলিতেছেন—'বাউলের ভাব, বৈষ্ণবের ভাব, ব্রাহ্মের ভাব রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া নূতন আকারে সৃষ্ট হইয়া গীতে প্রকাশিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ লোকটির সম্বন্ধে আমরা রাগ দ্বেষ পোষণ করিতে পারি, কিন্তু এইরূপ দ্বেষের···বশবর্ত্তী হইয়া যদি আমরা 'গীতাঞ্জলি'র 'গীতালি'র পালা উপেক্ষা করি, তবে আমরা যে 'প্রাণে কানা' তাহাই প্রতিপাদিত হইবে।···যে বাউলের গান এত কাল বাঙ্গালার পল্লীর কোণে কোণে গীত হইতেছিল, তাহা আজ সমগ্র সভ্য জগৎ মাতাইয়া তুলিতে উদ্যত হইয়াছে। সুতরাং জমীদার রবীন্দ্রনাথকে···বিলাসী রবীন্দ্রনাথকে···সার ডাক্তার রবীন্দ্রনাথকে ভাল লাগে না বলিয়াই কি ঋষি রবীন্দ্রনাথের, বাউল রবীন্দ্রনাথের গান উপেক্ষা করা চলে?'

এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, রবীন্দ্রনাথের প্রতি ব্যক্তিগত বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া যে সমালোচকগণ তাঁহার কাব্যসমালোচনা করেন, এরূপ একটা 'কানা' কথা শ্রীযুত রমাপ্রসাদের মত এক জন সুশিক্ষিত লোকের মুখে শোভা পায় না। কবির কাব্যের দোষ দেখাইলে তাঁহার প্রতি 'দ্বেষ' করা হয় না। কবির যথার্থ প্রশংসা যেমন চাটুকারিতা নহে, তেমনই তাঁহার কাব্যের দোষ-প্রদর্শনও দ্বেষ-প্রকটন নহে। রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কাব্য-বস্তুর যদি দু'চার কথায় সমালোচনা করিতে হয়, তবে আমরা বলিব, 'তিনি বঙ্গের কাব্যগঙ্গায় 'সোনার তরী' ভাসাইয়া দিয়াছেন; তিনি বঙ্গের কবিতা-ত্রিস্রোতার বক্ষে দেবী-রাণীর অনন্তসুন্দর-সঙ্গীত-নির্ঝর বজ্‌রা আনিয়া বাঁধিয়াছেন! আধুনিক বঙ্গীয় কাব্যের সোনার তরী তাঁহারই 'সোনার ধানে গিয়াছে ভরি'।—বঙ্গকবিগণের সোনার বজ্‌রায় আমরা তাঁহার জন্য এক মণিময় আসন রাখিয়াছি।' * কবি রবীন্দ্রনাথের প্রতি আমাদের এই উচ্চধারণা কি তাঁহার প্রতি 'দ্বেষে'র পরিচায়ক? রবীন্দ্রের কোন্ স্তাবক, কোন্ ভক্ত, কোন্ স্বজন তাঁহার এমন প্রশংসা করিয়াছেন? রবীন্দ্রনাথকে 'ঋষি' বলিলে বা তাঁহাকে 'বাউল' বলিলে তাঁহার গৌরব করা হয় না—তাঁহাকে যথার্থই উপহাস করা হয়।

শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ তাঁহার মূল প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথে যে 'ঋষি' উপাধির আরোপ করিয়াছিলেন, তাহা তর্কের অনুরোধে কোনও মতে রক্ষা করিবার জন্য দ্বিতীয় প্রবন্ধে কবির প্রকৃত শ্রেষ্ঠ কাব্য ছাড়িয়া দিয়া, তাঁহার 'গীতালি' প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট রচনা লইয়া রবীন্দ্রনাথকে বাউল ঋষি বা বিশুদ্ধ

* এই ক্ষুদ্র লেখকের—'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি প্রকাশ্য পত্র' হইতে উদ্ধৃত। হিতবাদী—(১৩২০ সাল ৪ঠা পৌষ) দ্রষ্টব্য।

'বাউল' করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কবির এই অধুনাতন গীতরচনায় বাউল সম্প্রদায়ের দেহতত্ত্ব বা অধ্যাত্মভাবের গন্ধ পাইয়া তাঁহার স্বদেশীয় অতি-ভক্তগণ ও বিদেশীয় অল্পজ্ঞগণ 'মাতিয়া উঠিতে' পারেন, কিন্তু তাহাতে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত গৌরবের বৃদ্ধি হইবে না, বরং হ্রাস হইবে। কারণ, কালিদাস তুলসীদাস হইয়া গেলে—মেঘদূত, কুমারসম্ভব ছাড়িয়া 'দোঁহা' রচিতে থাকিলে, তাহাতে কবির অধোগতির সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যেরও বিষম ক্ষতি হইয়া থাকে। এরূপ পরিবর্ত্তন কবি-প্রতিভার পরিণতি নহে—বিকৃতি। কিন্তু আমাদের এই সমালোচনা শুনিয়া রবীন্দ্রনাথ হয় ত 'সবুজপত্রে' গা ঢাকিয়া আপনার মনকে সম্বোধন করিয়া বলিবেন—

ওরে আমার কাঁচা!
ও সব কথা তুচ্ছ ক'রে পুচ্ছটি তোর নাচা।

আর ইহা শুনিয়া, কবির কাঁচা ও পাকা ভক্তের দল, কবির ঐ তানে নাচিয়া উঠিয়া বোধ হয় বলিলেন,—'ধন্য বাউল রবীন্দ্রনাথ!' ধন্য তোমার গীত!'

শ্রীযতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

প্রবাল-দ্বীপ।

ভারত ও প্রশান্ত সাগরের মধ্যে নানা আকারের ছোট বড় অসংখ্য প্রবাল-দ্বীপ আছে। পূর্ব্ব-বর্ণিত উপায়ে প্রবাল-শৈল বাড়িয়া এই সকল দ্বীপের সৃষ্টি হইয়াছে। তাহাদের আকৃতিভেদে ডারউইন প্রবাল-শৈলগুলিকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। এই শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে তাঁহার সহিত প্রবাল-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতদিগের মতভেদ নাই। তাঁহার মতে, কোরাল-শৈল তিন শ্রেণীর—

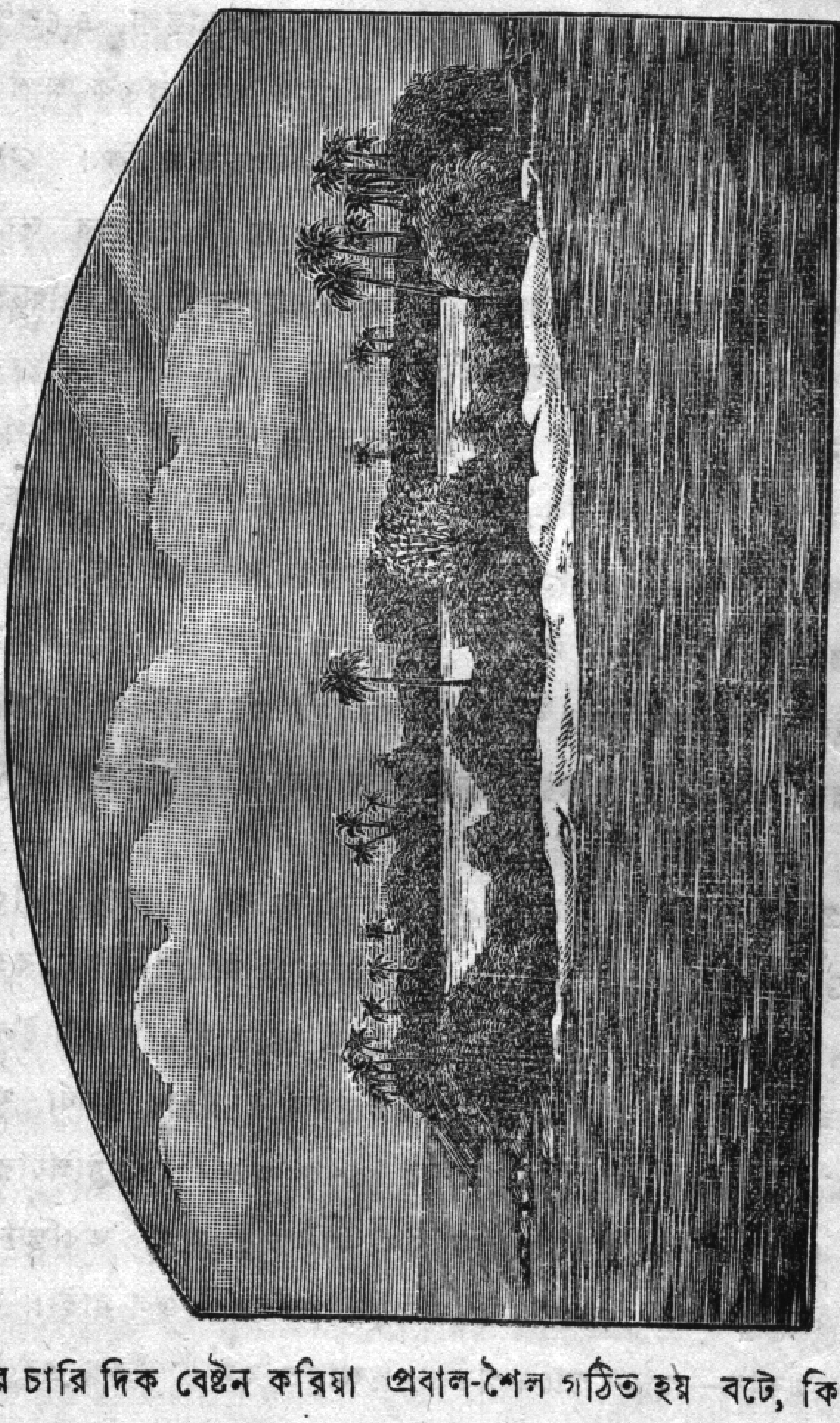
(ক) Fringing reefs বা বেলা-শৈল।

(খ) Barrier reefs বা প্রাকার-শৈল।

(গ) Atolls বা বলয়াবর্ত্ত-শৈল।

প্রথম শ্রেণীর শৈলকে কেহ কেহ Shore reefs বলেন বলিয়া আমি সেগুলিকে বেলা-শৈল বলিয়াছি। ইংরাজী fringe শব্দের অর্থ ঝালর। কাপড়ের যেমন ঝালর থাকে, এই শ্রেণীর শৈলগুলি তেমনই দ্বীপের ঝালর। মরিসস, বোরবোঁ প্রভৃতি দ্বীপের চারি দিকে কোরাল-শৈলের ঝালর আছে। ঠিক

যেথানে দ্বীপের ভূখণ্ড শেষ হইয়াছে, সেই স্থল হইতে প্রবাল-শৈল আরম্ভ হইয়া ঝালরের মত সমুদ্রের ভিতর চলিয়া গিয়াছে। এই সকল দ্বীপের বেলা-ভূমি কেবল বালুকাময়ী নহে, সেগুলি প্রবাল-ময়ী। অবশ্য প্রবাল-শৈলের উপর সমুদ্রের তরঙ্গলীলায় অনেক বালুকা আসিয়া পড়িলেও, সে বেলা প্রবাল-জীবের কঙ্কাল-গঠিত। শ্রীক্ষেত্রে সাগরকূলে দাঁড়াইয়া বালুকাময়ী বেলাভূমির উপর বীচি-বিক্ষুব্ধ সিন্ধুর ক্রীড়া দেখিতে কত আনন্দ হয়। আমার বোধ হয়, এই শ্বেত-বিদ্রুমের বেলার উপর তরঙ্গলীলা আরও মনোহর।



বলয়াবর্ত্ত প্রবাল-শৈল।

দ্বীপের চারি দিক বেষ্টন করিয়া প্রবাল-শৈল গঠিত হয় বটে, কিন্তু যে স্থলে দ্বীপের উপর দিয়া বহিয়া আসিয়া কোনও স্রোতস্বতী মহাসাগরের সহিত আপনার ক্ষীণ কলেবরটুকু মিশাইয়া দেয়—সেই সঙ্গমস্থলে প্রবাল-শৈল রচিত হয়

না। লবণাম্বু না পাইলে প্রবাল-জীব কঙ্কাল গড়িতে পারে না। তাই নদীর জলে তাহাদের বিতৃষ্ণা। এই সকল নদীর সঙ্গমস্থল ব্যতীত বোরবোঁ প্রভৃতি দ্বীপের চারি দিক ব্যাপিয়া কোরাল-শৈল বিদ্যমান।

বলিয়াছি, ঠিক যে স্থলে ভূখণ্ড শেষ হইয়াছে, সেই স্থল হইতে আরম্ভ করিয়া এই শ্রেণীর বেলা-শৈল সাগরের মধ্যে চলিয়া গিয়াছে। বেলা-শৈলের ও ভূখণ্ডের মধ্যে কোনও ব্যবধান নাই। কিন্তু যে স্থলে সিন্ধুর গভীরতা দেড় শত ফুটের অধিক, সে স্থলে প্রবাল-শৈলের শেষ। কারণ, কোরাল-জীব দেড় শত ফুটের অধিক গভীর জলে প্রাণধারণ করিতে পারে না। বলা বাহুল্য, এ শ্রেণীর শৈল প্রায় সাধারণতঃ জলের মধ্যে ডুবিয়া থাকে। ভাঁটার সময় কতক অংশ জাগিয়া উঠে বটে, কিন্তু শৈলের অধিক ভাগ জলের মধ্যে নিমজ্জিত থাকে। সেই নিমগ্ন অংশে অবশ্য প্রবাল-জীব যথাসম্ভব দ্বীপ গাঁথিতে ব্যস্ত। সমুদ্রের তরঙ্গাঘাতে শৈলের অনেক অংশ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, অনেক প্রবালের চাঁই চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া বেলাভূমির উপরটা একপ্রকার মসৃণ করিয়া দেয়।

ডারউইনের পরবর্ত্তী মারে প্রভৃতি প্রবালতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিয়াছেন যে, প্রবাল-শৈলের যে দিকটা সমুদ্রের দিকে, সেই দিকের জীবগুলা খুব পুষ্ট, এবং সেই দিকে প্রবাল-শৈল বেশ স্বচ্ছন্দে বাড়িয়া উঠে। তাঁহারা অনেক স্থলে পরীক্ষা করিয়া জানিয়াছেন যে, প্রবাল-বেলা সমুদ্রের দিক হইতে কূলের দিকে গড়ানে। কথাটি স্মরণ করিয়া রাখিলে পরে উভয় সম্প্রদায়ের তর্কের কথা বুঝিয়া উঠা সহজ হইবে। সে মত-দ্বন্দ্বের কথা পরে বলিব।

এইবার প্রাকার-শৈলের কথা বুঝাইবার চেষ্টা করিব। অষ্ট্রেলিয়ার উত্তরে একটি প্রকাণ্ড প্রবালদ্বীপ আছে, সে কথার উল্লেখ করিয়াছি। কেহ বলেন, সেটি লম্বে এগার শত মাইল; কেহ বলেন, সেটি সাড়ে বার শত মাইল লম্বা। আকারে এটি লম্বা প্রাচীরের মত। প্রস্থের তুলনায় ইহার দৈর্ঘ্য খুব কম। কোনও স্থলে ইহা ত্রিশ মাইলের অধিক প্রশস্ত নহে। অষ্ট্রেলিয়ার উত্তর-পূর্ব্ব উপকূল হইতে ইহা বিশ হইতে ত্রিশ মাইলের মধ্যে অবস্থিত। এই প্রাকার-শৈল ও অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যে অবস্থিত সমুদ্রখণ্ডে বেশী জল নাই। মনে হয়, দেড় শত ফিট গভীর—স্থানে স্থানে গভীরতা আরও কম। কিন্তু এই ভীমকায় প্রাকারের পূর্ব্ব দিকে প্রশান্ত মহাসিন্ধু দুই তিন হাজার ফুট গভীর।

এই সুদীর্ঘ প্রাকার-শৈলের সহিত বেলা-শৈলের প্রধান পার্থক্য এই

যে ইহা ভূখণ্ডের সহিত লিপ্ত নহে। বেলা-শৈল ভূসংলগ্ন প্রাকার-শৈল-ভূমি হইতে পৃথক। ভূখণ্ডের প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে সমুদ্রের মধ্যে দাঁড়াইয়া এই ভীম প্রবাল-প্রাকার যেন অষ্ট্রেলিয়ার সেই অঞ্চলের বাঁধের কার্য্য করিতেছে। এই শ্রেণীর দ্বীপে নারিকেল প্রভৃতি বৃক্ষের খুব প্রাচুর্য্য।

কতকগুলি প্রাকার-শৈল ছোট ছোট দ্বীপকে সম্পূর্ণভাবে বেষ্টন করিয়া থাকে। বলা বাহুল্য, ইহাদের দৃশ্য বড় মনোহর। দুর্গ-পরিখার মত দ্বীপকে ঘিরিয়া সমুদ্রের বক্ষে প্রাকার-শৈল বর্দ্ধিত হয়। দ্বীপের মধ্যে আবদ্ধ স্থির শান্ত সিন্ধুনীর-বক্ষে পরিখা নারিকেল বৃক্ষের ছায়া ধারণ করিয়া দৃষ্টিসুখ সম্পাদন করে। ডারউন প্রশান্ত সাগরের বেলাবোলা নামক দ্বীপের পাহাড়ের চূড়া হইতে এই পরিখা দেখিয়া আনন্দ বোধ করিয়াছিলেন। দ্বীপ ও বেষ্টক প্রাকারের মধ্যের জলের বর্ণ ফিকা সবুজ। সেগুলি সাধারণতঃ এক শত হইতে দেড় শত ফুট গভীর। ভানিকারো নামক একটি দ্বীপের চতুর্দ্দিকের বেষ্টক সাগর ৩৩৬ ফুট গভীর। এই সকল পরিখা-শৈল (Encircling Barrier reefs) নানা আকারের। ইহাদের তিন মাইল হইতে চুয়াল্লিশ মাইল অবধি বিস্তৃতি দেখা গিয়াছে।

তৃতীয় শ্রেণীর প্রবাল-শৈলের নাম আটোল বা বলয়াবর্ত্ত শৈল। এই দ্বীপগুলি সাধারণতঃ চক্রাকার, এবং সেই চক্রাকার ভূখণ্ডের ভিতর এক একটি হরিতবর্ণের হ্রদ আবদ্ধ। উপরে যে পরিখা-শৈলের কথা বলিয়াছি, সেগুলির গণ্ডীর মধ্যে দ্বীপ না থাকিয়া সমস্ত স্থলটি হরিৎবর্ণের সিন্ধুনীরে পরিপূর্ণ হইলে যেরূপ দেখিতে হইত, এই আটোলগুলির আকৃতি সেইরূপ। পরিখা-শৈলে এবং বলয়াবর্ত্ত শৈলে কেবল এইটুকু পার্থক্য—পরিখা-শৈলের মধ্যে জলও আছে, ভূখণ্ডও আছে; বলয়াবর্ত্ত শৈলের মধ্যে কেবল হ্রদ বিদ্যমান। অবশ্য, সব আটোল-দ্বীপগুলি ঠিক গোল হয় না। কাহারও আকার বাদামী, অনেকের আকার এলো-মেলো চক্রের মত। অবশ্য, অধিকাংশই চক্রাকার। কিন্তু সকলের আকৃতি এক প্রকারের। সমুদ্রের মধ্যে অপ্রশস্ত প্রবাল-দ্বীপ এক একটি হ্রদ-পরিবৃত। এই বলয়াবর্ত্ত দ্বীপগুলি দেখিতে বড় মনোহর। আমি এই প্রবন্ধে আটোলের একটি চিত্র দিয়াছি। প্রশান্ত মহাসাগরের নীলাম্বু মধ্যে ক্ষুদ্র দ্বীপটি—মধ্যে শান্ত হ্রদ—দ্বীপের উপর নারিকেলাদি বৃক্ষ দ্বীপটিকে হরিতবর্ণে সুশোভিত করিয়া রাখিয়াছে। আটোল দ্বীপের আকৃতি খুব উচ্চ পাড়ে পরিবৃত দিঘীর মত।

এই সকল বলয়াবর্ত্ত দ্বীপের একটি বিশেষত্ব আছে। প্রায় অধিকাংশ দ্বীপ

অন্ততঃ এক স্থলে অসংলগ্ন ; চক্রাকার দ্বীপের এক এক স্থল খোলা ; ঠিক যেন মধ্যস্থিত হ্রদে প্রবেশ করিবার ফটক। কোনও কোনও দ্বীপে-একাধিক প্রবেশ-দ্বার থাকে। কোনও কোনও ক্ষুদ্র বলয়াবর্ত্ত দ্বীপে প্রবেশ-দ্বার আদৌ নাই। বলা বাহুল্য, এই সকল ফটকের দ্বারা সমুদ্রের জলের সমতা রক্ষিত হয়। যে সকল দ্বীপে প্রবেশ-দ্বার নাই, সে সকল দ্বীপে শৈলের ফাটা ফুটার ভিতর দিয়া জল প্রবিষ্ট ও বহির্গত হইয়া সমতা রক্ষা করে। এই সকল হ্রদ এক শত, দেড় শত ফুট। স্থানে স্থানে আরও অধিক গভীর। সুতরাং প্রশান্ত মহা-সাগরের অর্ণবপোতদিগের এগুলি বেশ নিরাপদ বিশ্রামস্থল। যতই ঝড় ঝাপটা প্রবল ঝঞ্ঝার উপদ্রবে প্রশান্ত মহাসাগর উদ্বেলিত হউক না, আটোল-দ্বীপ-পরিবৃত হ্রদের ভিতর আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিলে আর অর্ণবপোতের আশঙ্কা থাকে না। পাদ্রী হুইট্‌মী সাহেব * সামোয়া দ্বীপের নিকট চতুর্দ্দিকে বদ্ধ দুইটি আটোল দ্বীপের ভিতর নির্ম্মল জলের হ্রদ দেখিয়াছিলেন। যে সকল দ্বীপের প্রবেশ-দ্বার নাই, তাহাদের মধ্যে প্রায়ই ফোয়ারা থাকে। শিলার ফাটাফুটার ভিতর দিয়া সাগরজল প্রবেশ করিয়া এই সকল উৎসের সৃষ্টি করে, সন্দেহ নাই। নির্ম্মল জলের হ্রদ সম্বন্ধে রেভারেণ্ড হুইট্‌মী বলেন যে, খুব দীর্ঘ বিবর্ত্তের মধ্য দিয়া সন্নিকটবর্ত্তী মহাদেশ হইতে নির্ম্মল জল আসিয়া এই সকল হ্রদ পূর্ণ করে।

বলয়াবর্ত্ত দ্বীপগুলি সাগরপৃষ্ঠ হইতে দশ বার ফুটের অধিক উচ্চ হয় না। ইহার কারণও সহজে বুঝিতে পারা যায়। জলের বাহিরে প্রবাল-জীব বাঁচিতে পারে না। সমুদ্রের জলের সীমা অবধি কোরাল-শৈল বাড়িলে, তরঙ্গমালা বালুকা প্রভৃতি আনিয়া তাহাদের উপর চাপাইতে আরম্ভ করে। অবশ্য, পবনদেব সহায়তা করেন। কাজেই বালী, কাদা, কোরালের চাঙ্গড়, শুক্তি, শামুক প্রভৃতি পড়িয়া তরঙ্গাঘাতে নিষ্পিষ্ট হইয়া দ্বীপের ভূখণ্ডের সৃষ্টি করে। তাহার পর সমুদ্রের শৈবাল, উদ্ভিদ প্রভৃতি ভাসিয়া আসিয়া ক্রমে পচিয়া ভূমির উর্ব্বরতা সম্পন্ন করে। যে সকল বৃক্ষের বীজ শক্ত আবরণের মধ্যে স্থাপিত, সাধারণতঃ সেই সকল বৃক্ষই প্রবাল-দ্বীপে জন্মলাভ করে। কারণ, সেই সকল বীজ তরঙ্গ-হিল্লোলে ভাসিতে ভাসিতে আসিয়া প্রবাল-দ্বীপের নবীন ভূখণ্ডে আশ্রয় লাভ করে।

বিশেষজ্ঞেরা বলেন যে, প্রবাল-দ্বীপে নারিকেলের খুব প্রাদুর্ভাব। সব শুদ্ধ

* ইনি Encyclopædia Britannicaয় Pacific Ocean নামক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

গাছ পালা পঞ্চাশ রকমের বেশী হয় না। ছোট ছোট আটোল দ্বীপগুলি সাধারণতঃ এক এক স্থলে কয়েক গজ মাত্র প্রশস্ত। আবার স্থানে স্থানে এক মাইল চওড়া। কিন্তু প্রায় এই সমস্ত ভূখণ্ডই উদ্ভিদে পূর্ণ, হরিতকায়। সারাওয়ারী, মাওরী প্রভৃতি জাতি এই সকল দ্বীপের অধিবাসী। ইহারা নারিকেল-ফল খাইয়া জীবনধারণ করে। ইহারা সমুদ্রে ধীবরের কার্য্যও করে। খৃষ্টান মিশনারীদিগের উদ্যমে ইহাদের মধ্যে অনেকে খৃষ্টানধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে। এই সকল দ্বীপে শুকপক্ষী পাওয়া যায়। আর টিক্‌টিকি গিরগিটি শ্রেণীর জীবও আছে।

আটোল-দ্বীপের হ্রদের তলদেশে নানা শ্রেণীর প্রবাল-কীট দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য, দ্বীপ-নির্ম্মাতা শ্বেত কোরালের অভাব নাই। এই সকল হ্রদের ভিতর অশেষ প্রকার প্রবাল-কীট-পুষ্ট মৎস্যের বসবাস আছে।

বহু দিন ধরিয়া এই সকল দ্বীপ-স্রষ্টা শ্বেত-প্রবাল-জীবদিগের বিষয় আলোচনা করিয়া প্রাণতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা বুঝিয়াছেন যে, দেড় শত ফুটের নিম্নে উহারা প্রাণধারণ করিতে পারে না। বেলা-শৈলের চারি দিকে নৌকা লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইলে এ কথার সত্য উপলব্ধি করা দুরূহ নহে। বেলা-শৈলের গঠন-প্রণালী বুঝিতে বিশেষ কষ্ট হয় না। অনুকূল স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া প্রবাল-জীব বাড়িতে থাকে; তাহাদের কঙ্কাল জমিয়া ক্রমশঃ শৈলের আকার ধারণ করে।

কিন্তু প্রাকার-শৈল ও বলয়াবর্ত্ত শৈল লইয়া প্রবাল-তত্ত্বানুসন্ধিৎসু পণ্ডিতদিগকে বড় গণ্ডগোলে পড়িতে হইয়াছিল। কিরূপে এই বিচিত্র দ্বীপগুলির সৃষ্টি হইল, সে প্রশ্ন লইয়া পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে অনেক প্রমাণ-প্রয়োগ, তর্ক-বিতর্ক চলিয়া আসিতেছে; এখনও সে সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছে বটে, তবে এক রকম মোটামুটি উভয় পক্ষেরই তর্কের মূলে সত্য আছে—ডারউনের প্রতি বিজয়-লক্ষ্মী একটু অধিক প্রসন্না। এবার অতি সংক্ষেপে তাহার পরিচয় দিব।

এই মতদ্বন্দ্বের কারণটা অতি সহজ। আটোল দ্বীপের বিচিত্র আকৃতি দেখিয়া বাস্তবিকই সকলের মনে হয় যে, প্রবাল-জীবগুলা তাহাদের রচিত শৈল সকল এরূপ ভাবে গাঁথিয়া তুলিল কেন? তাহারা বেলা-শৈল গাঁথিবার সময় ত ওরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করে না; সরল ভাবে দ্বীপ গাঁথিয়া যায়। পরিখা-শৈল বা বলয়াবর্ত্ত শৈলের নির্ম্মাণে তাহাদের মনে এমন

শিল্প-চাতুর্য্য দেখাইবার বাসনা জাগরূক হয় কেন? অনেক গবেষণা করিয়া প্রাচীন পর্য্যটকেরা স্থির করিয়াছিলেন যে, ভিতরদিকের প্রবাল-জীবগুলিকে সমুদ্রের কঠোর তরঙ্গাঘাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য প্রবাল-জীব ঐরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করে। আমার বোধ হয়, মোটের উপর তাহাদের ধারণা ছিল যে, কুম্ভকার যেমন চাকের উপরের এঁটেল মাটীর তালকে টিপিয়া টাপিয়া কেবল ধারের দিকেই গড়িয়া তোলে, ভিতর ফাঁকা রাখিয়া দেয়; প্রবাল-জীবেরাও তেমনই তাহাদের পাহাড়গুলা দ্বারবানের সিদ্ধি ঘুঁটিবার বাটীর আকারে গড়িয়া তোলে। বলা বাহুল্য, এ মত অমূলক; কারণ, শৈল-রচয়িতা প্রবাল-জীবেরা সমুদ্রের দিকেই বেশী স্বচ্ছন্দে বাড়িতে পারে। হ্রদের দিকে তাহারা প্রচুর আহার্য্যও পায় না; কূলও পায় না।

আর এক শ্রেণীর লোকের ধারণা ছিল যে, সাগরাভ্যন্তরীণ আগ্নেয় গিরির মুখের উপর উপনিবেশ স্থাপন করিয়া প্রবাল-জীব চক্রাকার শৈল গড়িয়া তোলে। বোধ হয়, সকলেই জানেন যে, আগ্নেয় গিরির মুখ চক্রাকার; সেই মুখের ভিতর দিয়া ক্ষিপ্ত গিরি তপ্ত ধাতু গৈরিকাদি উদ্গিরণ করে। ইহাদের ধারণা ছিল যে, প্রশান্ত মহাসাগরের গর্ভে অনেক নির্ব্বাপিত আগ্নেয় গিরি আছে। বস্তুতঃ, বিদ্রুম জীব তাহাদেরই মধ্যে আশ্রয় লইয়া ঐরূপ বিচিত্র আকারের শৈল রচনা করিয়াছিল।

ডারউইন এ মতেরও খণ্ডন করিয়াছেন। অনেকগুলি আটোল দ্বীপের আকার ও পরস্পরের সান্নিধ্যের আলোচনা করিয়া তিনি সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, এ ধারণার মূলেও সত্য নাই।

ডারউইনের অভ্যুত্থানের পূর্ব্বে Chamisso নামক পণ্ডিতের থিওরীর বড় প্রসিদ্ধি ছিল। তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, প্রবাল-জীবেরা যখন সমুদ্রের দিকে সচ্ছন্দে বাড়িতে পারে, তখন তাহারা স্বভাবতঃই সেই দিকে বাড়িয়া উঠিয়া ছত্রাকারে শৈলগুলির সৃষ্টি করিয়াছিল।

কিন্তু এই সকল সিদ্ধান্তের বিপক্ষে দুইটি বিতর্ক ডারউইনকে বড় সন্দিহান করিয়া তুলিয়াছিল। প্রথমতঃ, উক্ত প্রকারে গড়িয়া তুলিবার উপযুক্ত স্থানের কোনও নিদর্শন প্রশান্ত সাগরের মধ্যে নাই। দ্বিতীয়তঃ, অনেকগুলি প্রবাল-শৈলের তলদেশ অবধি পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারা গেল যে, তাহারা কেবল দেড় শত ফুট মাত্র প্রবাল-রচিত নহে; বহুদূর পর্য্যন্ত সেই সকল আটোলের প্রাচীরগুলি প্রবাল-রচিত। বিদ্রুম জীব যদি দেড় শত ফুটের

অপেক্ষা গভীর জলে প্রাণধারণ করিতে না পারে, তাহা হইলে এত গভীর জলে প্রবাল-শৈল গড়িল কে? কথাটা ধাঁধার মত বোধ হইল। ডারউইন ভাবিয়া চিন্তিয়া একটা খুব সরল থিওরী উপস্থাপিত করিলেন।

প্রবাল-দ্বীপ সাগরাভ্যন্তরীণ পাহাড়ের উপর গঠিত হইয়াছে, সে কথা তিনি মোটে বিশ্বাস করিলেন না। বাস্তবিক, এ রকম গিরিমালার কল্পনা করা যায় না। যাহার প্রত্যেক শিখরটি ঠিক দেড় শত ফিটের নীচে অবধি রহিয়া গেল, তাহার কোনও চূড়া জলের উপর উঠিয়া নিজের বা অন্যান্য গিরি-শৃঙ্গের অস্তিত্ব ঘোষণা করিল না!

প্রাকার বা পরিখা-শৈল সম্বন্ধে তাঁহার বিপক্ষ পক্ষের অভিমত ছিল যে, দ্বীপের কতক অংশ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় সেই ভগ্নাংশে প্রবাল-জীব বাসা করিয়া প্রাকার গাঁথিয়া তুলিয়াছে। বলা বাহুল্য, এ ধারণা ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। ভাঙ্গিয়া গেলে দ্বীপের কূল গড়ানে হইত না। কিন্তু প্রাকার-পরিবৃত প্রত্যেক দ্বীপেরই উপকূল ঢালু। তিনি আরও অনেক যুক্তির দ্বারা এ মতের ভ্রান্তি সপ্রমাণ করিলেন। সকলের পরিচয় দিবার স্থান আমাদের নাই।

প্রবাল-শৈল যে দেড় শত ফুটের নিম্নেও অবস্থিত, সে কথা তিনি সপ্রমাণ করিলেন। ভারি সীসার তলায় মোম মাখাইয়া সাগরের মধ্যে ঝুলাইয়া দিয়া তিনি প্রবাল-শৈলের নিম্নস্তরের ছাপ তুলিয়া আনিলেন; সময়ে সময়ে ভগ্ন শিলাদিও উঠাইলেন। 'বিগ্‌লে'র কাপ্তেন ফিজরয় (Fitz·oi) তাঁহাকে এ বিষয়ে সহায়তা করেন। এই উপায়ে তিনি স্থির করিলেন যে, প্রবাল-শৈল-গুলির ভিত্তি বাস্তবিক গভীর জলে প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃতপক্ষে অন্যান্য অনেককেই স্বীকার করিতে হইল যে, প্রবাল-শৈলগুলি গভীর জল হইতে উঠিয়াছে। ডার্‌উইন অসাধারণ মনীষা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যে সরল সিদ্ধান্তটি কাহারও মনে উদিত হয় নাই, তিনি সেই সিদ্ধান্ত সুধীবৃন্দের সমক্ষে উপস্থাপিত করিলেন। তিনি বলিলেন, দেড় শত ফুটের নীচে প্রবাল-জীব জন্মে না, এ কথা সর্ব্ববাদিসম্মত। এ বিষয়ের প্রমাণ অখণ্ডনীয়। তাহা হইলে দুইটীর মধ্যে একটী সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত;—হয় সমুদ্রের জল বাড়িয়াছে; আর না হয় যে জমীর ধারে প্রবাল-জীব বেলা-শৈল গাঁথিয়াছিল, সেই জমী বসিয়া গিয়াছে। জমী যতই বসিয়া যাইতেছে, ইহারা ততই শৈল গাঁথিয়া তুলিতেছে।

বলা বাহুল্য, এই সরল সাদা কথাটা সহজেই বুঝা যায়। বাস্তবিকই দুইটী বিপরীত সিদ্ধান্তের মধ্যে একটী নিশ্চয়ই অভ্রান্ত। সমুদ্রের জল স্থানে স্থানে হাজার ফিট অবধি বাড়িয়া উঠিয়াছে, এ কথাটা অসম্ভব। সমুদ্রপৃষ্ঠের সমতা সম্বন্ধেও কাহারও সন্দেহ নাই। সমুদ্রের এক স্থলে এক ফুট জল বাড়িয়া উঠিলে পৃথিবীর সর্ব্বত্র সমুদ্রের জল এক ফুট বাড়িয়া যাওয়া আবশ্যক। প্রশান্ত মহাসাগরে হাজার ফিট জল বাড়িলে অনেক দেশ সিন্ধুগর্ভে নিমগ্ন হইত, ইহা বুঝিতে অধিক কল্পনাশক্তির প্রয়োজন হয় না। সুতরাং সাগরের জল বাড়িয়াছে বলিয়া দেড় শত ফুটের নীচে কোরাল-শৈল বিদ্যমান, এ ধারণা ভ্রান্ত।

অতএব, তাঁহার সিদ্ধান্ত এই যে, যে ভূমিকে আশ্রয় করিয়া কোরাল-জীব শৈল রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, ধীরে ধীরে সেই সকল ভূখণ্ড সাগরগর্ভে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে; এবং যে পরিমাণে জমী বসিয়া গিয়াছে, প্রবাল-জীবেরা সেই পরিমাণে শৈল গাঁথিয়া তুলিয়া প্রাকারাদির সৃষ্টি করিয়াছে। এ বিষয়টী তিনি বেশ সুন্দরভাবে বুঝাইয়াছেন।

আমি পূর্ব্বে বোর্‌বোঁ দ্বীপের চতুর্দ্দিকবর্ত্তী বেলা-শৈলের উল্লেখ করিয়াছি। এই বোরবোঁ দ্বীপ যদি ধীরে ধীরে ভারত মহাসাগরের গর্ভে নিমগ্ন হয়, তাহা হইলে তাহার সহিত প্রবাল-শৈলগুলিও ধীরে ধীরে নামিয়া যাইবে। সেই সময় যদি প্রবাল-জীবগুলি অক্লান্ত পরিশ্রমের দ্বারা শৈলগুলিকে উপর দিকে গাঁথিয়া তুলে, তাহা হইলে ক্রমশঃ জলের ভিতর বেলা-শৈলগুলি চারি দিকেই নিমজ্জমান বোর্‌বোঁ দ্বীপের ভূখণ্ড ছাড়াইয়া উঠিবে, সন্দেহ নাই। তরঙ্গাঘাতে ভগ্ন হইয়া কতকগুলা প্রবাল-কঙ্কাল বোর্‌বোঁ দ্বীপের ভূখণ্ডের কোরাল-বালুকার সৃষ্টি করিবে, দুই একটা প্রবাল-শৈলের ভিত্তিও সেই নিমজ্জিত দ্বীপের উপর স্থাপিত হইবে। কিন্তু তাহারা বেলা-শৈল-নির্ম্মাণে কোরাল-জীবের সহিত প্রতিযোগিতায় পরাজিত হইবে। বেলা-শৈল ক্রমশঃ মাথা তুলিয়া জলের ভিতর হইতে বাহিরে উঠিবে, এবং আটোল দ্বীপের আকার ধারণ করিবে। পূর্ব্বে যে ভূখণ্ড বোর্‌বোঁ দ্বীপের পৃষ্ঠ ছিল, এখন তাহা স্বল্পমাত্রায় কোরালে আবৃত হইয়া আটোল শৈলে পরিবেষ্টিত হ্রদের তলদেশে পরিণত হইবে। ডারউইনের মতে, প্রশান্ত সাগরের সমস্ত বলয়াবর্ত্ত দ্বীপগুলি ঐরূপে সৃষ্ট হইয়াছে।

বলয়াবর্ত্ত শৈল সম্বন্ধে আর একটী কথা বোধ হয় এ স্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে

না। পূর্ব্বে বলিয়াছি, আটোলের হ্রদে প্রবেশ করিবার জন্য প্রবেশ-দ্বার দৃষ্ট হয়। বাস্তবিক, অজ্ঞান প্রবাল-জীব ঝঞ্ঝা পীড়িত নাবিকের হিতের জন্য বা আপনাদিগের পূর্ত্তশিল্পের পরিচয় দিবার জন্য এই সকল ফটকের সৃষ্টি করে নাই। আমার মনে হয়, পর্য্যাটকদিগের বেলাশৈলের বর্ণনা হইতে এই সকল প্রবেশ-দ্বারের অস্তিত্বের কারণ বুঝিতে পারা যায়। পূর্ব্বে বলিয়াছি, মহাসিন্ধুর সহিত স্রোতস্বতীর সঙ্গমস্থলগুলিতে বেলাশৈলের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় না। আমার বোধ হয়, যখন বেলা-শৈল বর্দ্ধিত হইয়া বলয়াবর্ত্ত দ্বীপের আকার ধারণ করে, তখন ঐ সকল সঙ্গমস্থল ফাঁকা রহিয়া যায়, এবং সেইগুলিই প্রবেশ-দ্বারে পরিণত হয়।

প্রাকার-দ্বীপগুলিও ঠিক ঐ প্রণালীতে উৎপন্ন হইয়াছ। অষ্ট্রেলিয়ার পূর্ব্ব দিকের যে প্রাকারের কথা বলিয়াছি, তাহা প্রথমে বেলা-শৈল ছিল। তখন অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ আধুনিক প্রাকারাধিকৃত স্থল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ক্রমশঃ অষ্ট্রেলিয়ার উত্তর-পূর্ব্বের বিশ ত্রিশ মাইল সাগরের মধ্যে বসিয়া যাইতে লাগিল। বেলা-শৈলও বসিয়া গেল; কিন্তু প্রবাল-জীবের কর্ম্মকুশলতায় আবার ক্রমশঃ জাগিয়া উঠিল। নিমজ্জমান ভূখণ্ডের উপর সাগর-নীর ক্রীড়া করিতে লাগিল। পূর্ব্বতন বেলা-শৈল বাড়িয়া প্রাকার-শৈলে পরিণত হইল।

পরিখার মত প্রাকার-শৈলের রচনার ক্রমও ঠিক ঐ প্রকার। দ্বীপের চারিধারের নিম্ন ভূমি ডুবিতে আরম্ভ করিলে তাহার সংলগ্ন বেলা-শৈল ক্রমে পরিখা-শৈলে পরিণত হয়। ভূমিকম্প হইয়া ঐ প্রদেশে দ্বীপের ধারগুলি বসিয়া যায়। সে বিষয়ে কীলিঙ, আবটালে, ডারউইন চাক্ষুষ প্রমাণ পাইয়াছিলেন। আটোল দ্বীপের প্রান্তস্থিত নারিকেল বৃক্ষ তিনি নিমগ্ন হইতে দেখিয়াছিলেন। পূর্ব্বে তাহারা অপেক্ষাকৃত উচ্চভূমিতে বিদ্যমান ছিল। অবশ্য এ সকল কার্য্য দুই এক দিনে হয় না। সুতরাং এ বিষয়ে চাক্ষুষ প্রমাণ পাওয়া অসম্ভব। খুব মোটামুটি হিসাব করিয়া হাক্সলে বলিয়াছিলেন যে, প্রবাল-শৈল এক ইঞ্চি বাড়িতে এক বৎসর সময় লাগে। এই হিসাবে এক একটি দ্বীপ বাড়িতে দশ বারো হাজার বৎসর লাগে। এ বিষয়ে চাক্ষুষ প্রমাণের আশা বাতুলতামাত্র।

প্রশান্ত সাগরের মধ্যে স্থানে স্থানে অনেক দ্বীপ বসিয়া গিয়াছে, সে বিষয়ে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ সংগ্রহ করিতেও ডারউইন্ কুণ্ঠিত হন নাই। যে সকল প্রদেশে আগ্নেয় গিরি থাকে, সে সকল প্রদেশে কখনও ভূমি বসিয়া যায় না।

তাই নিজেদের 'নিমজ্জমান' থিওরী সকল প্রকারে পরীক্ষা করিবার জন্য ডারউইন অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে লাগিলেন যে, প্রবাল-দ্বীপের সন্নিকট-বর্ত্তী স্থানে আগ্নেয়গিরিমালা আছে কি না। তিনি সমগ্র প্রশান্ত মহাসাগরের এক বিচিত্র মানচিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন। তাহা দ্বারা দেখাইয়াছিলেন যে, প্রবাল দ্বীপপুঞ্জের সন্নিকটে আগ্নেয় গিরি নাই। প্রবাল-শৈলগুলি মহাসিন্ধুর মাঝে মাঝে আগ্নেয়গিরিমালা মহাসাগরের উপকূলে অবস্থিত। কোনও পদার্থের মধ্যস্থল চাপিলে যেমন তাহার প্রান্তভাগ ফুলিয়া উঠে, প্রশান্ত মহাসাগ-রের মধ্যেরও অনেক দ্বীপ তেমনই বসিয়া যায়; আর প্রান্তের আগ্নেয়গিরিমালা-পরিবৃত ভূখণ্ড ফুলিয়া উঠে।

অবশ্য, পৃথিবীর এ সকল পরিবর্ত্তন অনেক সময়সাপেক্ষ। কিন্তু ভূপৃষ্ঠের যে সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, সে কথা ভূতত্ত্ববিদেরা সপ্রমাণ করিয়াছেন। তাই তাঁহারা আমাদের এই সংস্কারবিরুদ্ধ কথাটার প্রচার করেন যে, পৃথিবীর মধ্যে তরঙ্গায়িত সিন্ধুই কেবল অচল অটল—ভূখণ্ড নিত্য পরিবর্ত্তনশীল!

আমার মনে হয় যে, বৈজ্ঞানিক জগতের থিওরীগুলাও তেমনই পরিবর্ত্তন-শীল। একটী সামান্য নূতন প্রমাণ আবিষ্কৃত হইলে বিজ্ঞান-জগতের সমস্ত মৌলিক ধারণা একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। ডারউইন ১৮৩১ খৃঃ হইতে ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দ অবধি বিগ্‌ল্ জাহাজে ঘুরিয়া নানা তথ্যের আবিষ্কার করিয়া-ছিলেন। ১৮৪২ খৃঃ অব্দে তিনি প্রবাল-শৈলের উৎপত্তি সম্বন্ধে তাঁহার থিওরি বিবুধসমাজে প্রকাশিত করেন। তাঁহার থিওরি লইয়া নানা প্রকার আলোচনা চলিতে লাগিত। কেহ তাঁহার যুক্তি তর্ক দৃঢ় করিবার জন্য প্রমাণ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন; কেহ তাঁহার প্রতিবাদ করিবার জন্য সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ১৮৫১ খৃঃ লুই আগাসিজ (Loues Agassiz.) নামক পণ্ডিত প্রমাণ করিলেন যে, ফ্লোরিডার দক্ষিণের প্রবাল-দ্বীপ জমী ডুবিয়া হয় নাই। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে কার্ল সেম্পার (Karl Semper) পীনু (Penu) দ্বীপে আটোলের সন্নিকটে আগ্নেয় গিরির সন্ধান পাইলেন।

ডারউইন যেমন 'বিগ্‌ল্' জাহাজে ঘুরিয়া প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, জন মরে তেমনই 'চ্যালেঞ্জার' নামক জাহাজে ঘুরিয়া তথ্য সংগ্রহ করিয়া-ছিলেন। তিনি তাঁহার মতামত ১৮৮০ খৃঃ অব্দে প্রকাশিত করিয়া ডারউইনের থিওরীর ভ্রান্তি প্রমাণে অগ্রসর হইলেন। তিনি বলিলেন যে, 'নিমজ্জমান' থিওরীর মূলে আদৌ সত্য নাই। ডারউইন প্রশান্ত মহা-

সাগরের গর্ভের প্রকৃত অবস্থাটা জানিতে পারেন নাই। প্রশান্ত সাগরের ভিতর অনেক ঢিপি আছে। সেগুলি সমুদ্রগর্ভ হইতে উঠিয়াছে, এবং সমুদ্রের পৃষ্ঠ হইতে প্রায় দুই শত ফুটের নীচে আসিয়া শেষ হইয়াছে। প্রশান্ত সাগরের এই সকল উচ্চ ভূখণ্ডের কথা ডারউইন অবগত ছিলেন না। ডারউইনের আমোলের পর অনেক শাঁখ শামুক প্রভৃতি সামুদ্রিক জীব আবিষ্কৃত হইয়াছে। দেখা গিয়াছে যে, অসংখ্য প্রাণীতে মহাসিন্ধু পূর্ণ। এই সকল জীবের কঙ্কাল চূণের মত পদার্থে গঠিত। প্রথমে সেই উচ্চস্থলগুলি দেড় শত ফুটের নীচে ছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সকল সামুদ্রিক জীবের কঙ্কাল ঐ সকল ঢিপির উপর পড়িয়া ক্রমশঃ সেগুলি বাড়িয়া উঠে। এইরূপে যখন সাগরের ভিতরের উচ্চস্থানগুলি বাড়িয়া কোরাল জন্মিবার অনুকূল স্থলে পরিণত ও উন্নত হয়, তখন কোরাল-জীব তাহাদের উপর বাসা বাঁধে, এবং কালে আটোল ও প্রাকার-দ্বীপের সৃষ্টি করে। ঐরূপ ভাবে নানা প্রকার সামুদ্রিক জীবের কঙ্কাল প্রশান্ত মহাসিন্ধুর ভিতরের ঢিপিগুলার উপর পড়িয়া গলিয়া ভাঙ্গিয়া ঐ সকল ভূখণ্ডকে বাড়াইয়া তুলিতেছে; তাহার কতকগুলি প্রমাণও তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

কোরাল বাহিরের দিকে বাড়িতে থাকে, এ কথা ডারউইন স্বয়ং স্বীকার করিয়াছিলেন। কারণ, বাহিরের দিকে অর্থাৎ সমুদ্রের দিকে আহার্য্য পাইবার সুবিধা অধিক। ক্রমশঃ প্রবাল-শৈল বাড়িয়া উঠিলে ভিতরের দিকের জীবগুলা জীবন-সংগ্রামে পরাজিত হইয়া তেমন বাড়িতে পারে না। আওতায় পড়িয়া যেমন গাছ নষ্ট হয়, ইহাদের অবস্থাও সেইরূপ হইয়া পড়ে। বাহিরের দিক্ দিয়া বাড়িয়া তাহারা ক্রমে বলয়াবর্ত্ত-শৈলের সৃষ্টি করে।

মোটের উপর মরে মাসিসোর বৈজ্ঞানিক ধারণাই দৃঢ়তর করিলেন। টাহিটি দ্বীপের প্রাকার-শৈল লইয়া তিনি বুঝাইলেন যে, প্রাকার-শৈলগুলিও ঐরূপে বাহিরের দিক্ দিয়া বাড়িয়া প্রাচীরের আকার ধারণ করিয়াছে। নানারূপ প্রমাণের দ্বারা তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে, ডারউইনের 'নিমজ্জমান' থিওরী ভ্রান্ত।

এতদুভয় পক্ষের বিশেষজ্ঞদিগের মতামত বিচার করিবার জন্য ইংলণ্ডের বিখ্যাত রয়েল সোসাইটী এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, যদি ডারউইনের মত অভ্রান্ত হয়, তাহা হইলে প্রবাল-দ্বীপ ভেদ করিয়া খুব নীচের স্তর হইতে পাথর বা মাটী তুলিয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে

যে, গভীর স্তরে প্রবাল আছে কি না। যদি স্তরে প্রবাল না পাওয়া যায়, তাহা হইলে বুঝা যাইবে যে, তাঁহার জমী বসিয়া যাওয়ার থিওরী কল্পনামাত্র। ডারউইন সীসার তলায় মোম লাগাইয়া বাহিরের দিক্ দিয়া যে কাজ করিয়াছিলেন, ইঁহারা শৈলের আভ্যন্তরীণ অবস্থা পরীক্ষা করিয়া সে বিষয় নির্ণয় করিবার সঙ্কল্প করিলেন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা এক দল তথ্য-সংগ্রাহককে প্রশান্ত মহাসাগরে পাঠাইয়া দিলেন।

তাঁহারা বহুকষ্টে প্রবাল-শৈলের অভ্যন্তরে বোমা মারিতে আরম্ভ করিলেন। একটী দ্বীপের এগার শত ফুট ভিতর হইতে প্রবাল বাহির হইল। একটী আটোল হ্রদের আড়াই শত ফুট নীচে প্রবাল রত্ন আবিষ্কৃত হইল। এইরূপে নানা স্থল হইতে দেড় শত ফুটের নীচে কোরাল পাওয়া গিয়াছে।

রয়েল সোসাইটীর পরীক্ষার ফলে স্পষ্ট সপ্রমাণ হইয়াছে যে, ডারউইনের 'নিমজ্জমান' থিওরী অলীক নহে। অনেক দ্বীপ যে এই ভাবে সৃষ্ট হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কিন্তু অপর পক্ষের প্রমাণগুলিও একেবারে অগ্রাহ্য করা যায় না। অনেক সময় কোরাল-জীব মরের বর্ণিত টিপির উপর বা নির্ব্বাপিত আগ্নেয় গিরির উপর উপনিবেশস্থাপন করিয়া দ্বীপ গাঁথিয়া তুলিয়াছে। মোটের উপর যেখানে সুবিধা পাইয়াছে, কোরাল জীব সেইখানেই বাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে।

অবশ্য, এ বিষয়ে আমরা যে পণ্ডিতদিগের শেষ সিদ্ধান্ত শুনিয়াছি, তাহা মনে হয় না। কেবল যে 'ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্', তাহা নহে। এ ঋষি-বাক্য সকল তত্ত্বেই প্রযোজ্য।

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।

'কেলেঙ্কারি'।

১

জগতে যদিও এখন আনন্দের মাত্রা বড় কম, কিন্তু রমানাথ মুখুয্যে যে মেসে থাকিত, সেখানে আনন্দ পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করিত।

রমানাথ কে? সে কলেজের ছাত্র নয়, কোনও আপিসের কেরাণী নয়, ধর্ম্মপ্রচারক কিংবা দোকানদারও নয়। অথচ রমানাথের অনেকগুলি পেশা। সে একটু গাহিতে জানে, তবলা বাজায়, পাখোয়াজের অনেকগুলি বোল মুরলী

বাবুর খাতা হইতে সংগ্রহ করে, কেরাণীদের আপিসের কৈফিয়ৎ এবং ছুটীর দরখাস্ত লিখিয়া দেয়, গীতার টীকাও মধ্যে মধ্যে বাহির করে, অনেকগুলি পুস্তকালয়ের এজেণ্ট, এবং সন্ধ্যাকালে মিত্তিরদের বাটীতে একটি ছাত্রকে পড়ায়। এতগুলি বিষয়ে লিপ্ত থাকিলেও রমানাথকে তুমি গড়ের মাঠে, কিংবা হাবড়া ষ্টেশনে যখন খুসী দেখিতে পাইবে। নিজে সর্ব্বদাই প্রফুল্ল, এবং সকলকে প্রফুল্ল করিতে চাহে। রমানাথের কেশ ও নখর অপেক্ষাকৃত আয়তনে দীর্ঘ। হয় ত কর্ত্তন করিবার সময় পায় না।

সংসারে রমানাথের আছে কে? কেহ তাহার খবর জানে না। অথচ সংসারের যে অংশ রমানাথের এখন বসতি, তাহা সম্পূর্ণভাবেই তাহার। সংসারে যে আনন্দসঞ্চার করিতে পারে, সে-ই সংসারের মালিক। সেই আনন্দটুকু যাহারা নষ্ট করে, তাহারা চোর।

রমানাথকে কেহ ভাল করিয়া না জানিলেও, তাহার উপর সকলের ষোল আনা বিশ্বাস। মেসের মেম্বরদের মধ্যে প্রায় সকলেই নিজের টাকা কড়ি রমা-নাথের নিকট জমা রাখিয়া শান্তি লাভ করে। অনেকে সন্ধ্যাকালে ছাতের উপর বসিয়া রমানাথের নিকট সুখ-দুঃখের কথা কহে, এবং রমানাথ তাহার এমন সুন্দর সামঞ্জস্য করিয়া দেয় যে, তাহারা আর সে কথা পাড়ে না; শীঘ্র ভুলিয়া যায়।

বলা বাহুল্য যে, রমানাথই মেসের ম্যানেজার। সম্প্রতি মেসের একটা 'সীট্' খালি হওয়াতে রমানাথ একটু ব্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। বাটীর ভাড়াটা বেশী, এবং মেম্বরের সংখ্যাও বড় কম। তাহার উপর এক জন লোক কমিয়া প্রত্যেকের উপর প্রায় তিন টাকা হারে ভাড়া বাড়িয়া যাওয়াতে রমানাথ সেদিন বিশেষ চিন্তাযুক্ত হইয়া বীডন ষ্ট্রীটের চৌমাথায় পাইচারী করিতেছিল। সেই সময় চৌমাথায় আর এক জন লোকও চিন্তাযুক্ত হইয়া সেইখানে দাঁড়াইয়া ট্রামের গতায়াত দেখিতেছিল। রমানাথ ধীরে ধীরে তাহার নিকট গিয়া বলিল, 'মহাশয়কেও চিন্তাযুক্ত দেখ্ছি।'

হঠাৎ এ প্রকার সম্বোধনে একটা লোকের চটিবার কথা, কিন্তু অপরিচিত যুবা তাহাতে বরং খুসী হইয়া বলিল 'নিশ্চয়। যদি আমার চিন্তা সম্বন্ধে আপনার জ্ঞানলাভ করিবার ইচ্ছা থাকে, তবে একবার দীঘির ধারে বসিলে কি হয়?'

রমানাথ বলিল, 'চলুন।' উভয়ে চৌমাথা পার হইয়া হেদুয়ার জনাকীর্ণ দীঘির একটা অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন স্থানে বসিল।

রমানাথ বলিল, 'আমার বেশ বিশ্বাস যে, আপনি গায়িতে জানেন।'

যুবক। আমারও বেশ বিশ্বাস যে, আপনি বাজাইতে পারেন। কারণ, আপনার পদবিক্ষেপ লক্ষ্য করিয়া আমি দেখিলাম যে, আপনি ধামারের চালে পাইচারী করিতেছিলেন, এবং তাহা খুব 'লয় দোরস্ত'। যদিও কলিকাতার রাস্তায় ধামারের তালে চলা একরকম অসম্ভব, তবুও আপনার বাহাদুরী দেখিয়া আমি মনে মনে খুব প্রশংসা করিতেছিলাম, এবং কেবল সেই জন্য আমি ট্রাম চড়িয়া চলিয়া যাই নাই।

বৃথা বাক্যব্যয় না করিয়া যুবক একখানা বহি রমানাথের হস্তে সমর্পণ করিয়া বলিল, 'আপনি বাজান্, আমি একটা ধামার গাই।' রমানাথ বাক্যব্যয় না করিয়া সেই বহি চাপড়াইয়া বোল আরম্ভ করিল। দীঘির পাড়ের লোক একত্র হইয়া শুনিতে দাঁড়াইয়া গেল।

২

গান থামিয়া যাইবার পূর্ব্বেই উভয়ের মধ্যে যে সখ্যের সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা বলা বাহুল্য। থামিয়া যাইবার পর তাহা আরও প্রগাঢ় ভাব ধারণ করিল। যুবক বলিল 'আপনার সঙ্গত চমৎকার। যদি আপনার বাসস্থানের নিকট কোনও একটা জায়গায় আমার থাকিবার যোগাড় করিয়া দিতে পারেন, তবে আমি কৃতার্থ হই।'

রমানাথ। আপনার নিবাস ?

যুবক। আমি চোর ডাকাত নহি। সাদাসিধা লোক। আমার নাম বিনোদবিহারী চাটুর্য্যে। ——পুরের চাটুর্য্যেদের নাম শুনিয়া থাকিবেন।

রমানাথ। তাঁহারা জমীদার।

যুবক। আমি তাঁহাদেরই এক সরিকের পুত্র। বি, এ পড়ি। কিন্তু গান বাজনায় বড় সখ্। একটী আত্মীয়ের বাটীতে এখন অবস্থিতি, কিন্তু আমার ইচ্ছা, স্বাধীনভাবে একটা মেসে থাকি। তাহারা এত গোঁড়া হিন্দু এবং 'ফাইন-আর্টস্'-বর্জ্জিত যে, আমার সেখানে থাকা অসম্ভব।

রমানাথ বলিল, 'তবে, আমাদের মেসে আসুন। সেখানে একটা "সীট্" খালি আছে।'

দুই দিন পরেই বিনোদ সেই মেসে জুটিয়া গেল।

মেসে বিনোদবিহারীর অবস্থান হইলে সকলে বুঝিতে পারিল যে, সে একটা অদ্ভুত রকমের লোক। প্রথমতঃ, তাহার মতের স্থিরতা নাই। কোনও দিন

পুরাতন খবরের কাগজের মধ্যে জড়াইয়া সমস্ত রাত্রি রাখিয়া দেয়, এবং প্রাতঃকালে রাস্তার কুকুর ডাকিয়া খাওয়ায়। যখন সকলে ঘুমায়, তখন সে একটা এসরাজ্ লইয়া বাজাইতে বসে। দ্বিতীয়তঃ, সে মধ্যে মধ্যে খোলা ছাতে দর্শনশাস্ত্রের বহি মাথায় দিয়া ঘুমাইয়া পড়ে, এবং নিদ্রা হইতে উঠিয়া একবার বহির পাতাগুলি উল্টাইয়া যায়। তৃতীয়তঃ, সে গান গাহিবার সময় রমানাথ ভিন্ন অন্য কাহাকেও নিকটে বসিতে দেয় না।

রমানাথ সকলের নিকট বলে, 'বিনোদ একজন খাঁটী লোক। ওস্তাদ লোক। কিন্তু হঠাৎ একদিন কেলেঙ্কারি করিয়া বসিবে।'

পাছে বিনোদ একটা 'কেলেঙ্কারি' করিয়া বসে, এই জন্য রমানাথ তাহার উপর একটু নজর রাখিত। একদিন রমানাথ বিনোদকে একলা পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি খুব "র‍্যাশনালিস্টিক", কিন্তু হঠাৎ গণ্ডীর বাহির হইয়া যাইও না।'

বিনোদ। রমা দা'! বোধ হয়, তুমি আমাকে কখনও বেতালা পাও নাই।

রমানাথ সলজ্জভাবে বলিল 'না। অথচ, বোধ হয়, সাবধান করিয়া দিবার অধিকার আমার আছে। মধ্যে মধ্যে তাল কাটিবার ঝোঁক খুব তোমার। এখন সামলাইয়া লইতে পার, হয় ত ভবিষ্যতে কোনও একদিন পারিবে না'।

বিনোদ ভাবিয়া দেখিল। বলিল, 'রমা দা'! খুব সম্ভব। কিন্তু তুমি একটা প্রকাণ্ড ভরসা। ভবিষ্যতে যদি টলিয়া পড়ি, তোমাকেই সামলাইয়া লইতে হইবে।'

উভয় বন্ধু ছাতের উপর বসিল। শরতের শেষ মেঘগুলি ধীরে ধীরে আকাশে ভাসিয়া গেল, সন্ধ্যা হইল, তখনও দু জনে বসিয়া।

এই রকম সময়ই প্রাণের কথা কহিবার সময়। তাই, বিনোদ মুখখানি যত দূর সম্ভব গম্ভীর করিয়া ধীরে ধীরে রমানাথকে জিজ্ঞাসা করিল, 'রমা দা'! তুমি কখনও আত্মহত্যার চেষ্টা করিয়াছ?'

রমানাথ স্মিতমুখে বিনোদের দিকে চাহিল। বাস্তবিকই কি বিনোদের পাগলের ছিট্ আছে?

বিনোদ রমানাথের মুখভঙ্গী দেখিয়া খুব হাসিল। 'আমি আত্মহত্যার আধ্যাত্মিক ভাবের দিকে গিয়াছি, রমা দা'! যেটুকু আমাদের মধ্যে "র‍্যাশনালিস্টিক", সেটুকু বলি দিবার সময় জীবনে মধ্যে মধ্যে আসে। প্রেমরজ্জু গলায় দিয়া কখনও সেটুকু নষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছ কি?'

রমানাথ চুপ করিয়া রহিল।

বিনোদ আবার আগ্রহসহকারে বলিল, 'আমার নিকট কোনও কথা

লুকাইও না। তুমি যাহাকে বিবাহ করিয়াছ, তাহাকে ভালবাস, এ খবরটুকু আমাকে দিতে হইবে।'

রমানাথ বলিল, 'সে খবর দিবার সময় এখনও আসেনি।'

৩

বন্ধু যদি বন্ধুকে তাহার প্রাণের কথা না কহে, তবে বন্ধুর মনে ব্যথা লাগে। হয় ত বন্ধুত্ব ভাঙ্গিয়া যায়। কিন্তু বিনোদের অটুট হৃদয়বলের বিরুদ্ধে অন্য কোনও বাহিরের শক্তি দাঁড়াইতে পারিল না। ভাঙ্গনের রেখা পর্য্যন্ত পড়িল না। বিনোদ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, 'আচ্ছা, তোমার বাক্স হইতে চিঠিগুলি লইয়া লুকাইয়া পড়িব।'

এই রকম মৎলবে অনুপ্রাণিত হইয়া বিনোদ বেলা বারটার সময়ে নিজের ঘরে পাইচারি করিতেছিল। একে একে মেসের ছাত্রবর্গ, কেরাণীবর্গ, এবং সর্ব্বশেষে রমানাথ নিজের নিজের কর্ম্মক্ষেত্রে বাহির হইয়া গেল; কেবল একটা লোক বারান্দায় দাঁড়াইয়া ছিল। সে ছাপাখানায় কাজ করে। তাহার নাম হাবু।

বিনোদ জিজ্ঞাসা করিল, 'হাবু! তুমি আজ ছাপাখানায় যাইবে না?'

হাবু লোকটা খুব শান্তপ্রকৃতি, দীনহীনের মত, এবং সচরাচর কাহারও সঙ্গে কথা কহে না। বিনোদের নিকটে আসিয়া হঠাৎ কাঁদ-কাঁদ মুখে বলিল, 'বিনোদ বাবু, আমার একটা কথা আছে।'

বিনোদ। বল।

হাবু। আমি গরীব লোক, ভাল খাইব, তাহার সংস্থান নাই। আমি দেখিতে পাই যে, আপনি প্রত্যহ কট্‌লেট্‌গুলি কুকুর দিয়া খাওয়ান্। যদি আমাকে দেন, তবে শরীরে বল হয়।

বিনোদ। বেশী বলের দরকার কি?

হাবু। উদর সংস্থানের জন্য আমাকে অনেক রাত্রি জাগিয়া পড়িতে হয়, গীতার টীকাও লিখিতে হয়; সাময়িক সাহিত্যের সমালোচনা করিতে হয়— যাহাতে প্রবৃত্তি নাই,সেগুলির আলোচনা করিতে গেলে শরীরে বল চাহি, শরীরে বল না থাকিলে মনও অচল হইয়া পড়ে। ঐ পক্ষীর মাংসটায় খুব বল হয়।

বিনোদ। তোমার দাঁত পড়িয়া যাইবে।

হাবু নম্রভাবে বলিল, 'দাঁত বাঁধাইয়া লইব। সেটার খরচ বাদ দিলেও যাহা লাভ থাকিবে, তাহাতে আমার দিনপাত হইবে।'

বিনোদ হাসিয়া বলিল, 'দেখিতেছি, তুমি খুব হিসাবী লোক; সুধু হিসাবী নয়, তুমি দার্শনিক লোক। আচ্ছা, আজ হইতে তোমাকে আমি "পক্ষিমাংসে"র রোস্ট ও কটলেট খুব করিয়া জোগাইব। তুমি আমাকে গীতার টীকা লিখিয়া দিও। যদি সেটা ভাল হয়, তবে আমাদের দেশে একটা বড় ছাপাখানা আছে, তাহার ম্যানেজার করিয়া দিব।'

হাবু বিরাট্ কৃতজ্ঞতাসহকারে তাহার চক্ষের তারা উর্দ্ধগামী করিয়া ছাতের দিকে তাকাইয়া রহিল। বিনোদ আবার বলিল, 'দেখ হাবু, তোমার জন্য একটা নিষিদ্ধ কাজ করিতে বাধ্য হইতেছি। তুমি ব্রাহ্মণ, তোমাকে "পক্ষিমাংস" জোগাইয়া দেওয়া আমার ধর্ম্ম নহে।'

হাবু। অমন কথা বলিবেন না। এটা আমার হিতের জন্য। যাহাতে পরের হিত হয়, তাহা অধর্ম্ম হইতে পারে না। আজকাল যে সকল লেখা বাহির হইতেছে, তাহা খুব জোরের লেখা—তাহা বুঝিতে হইলে সেই রকম জোরের দরকার।

বিনোদ। এবং তাহাতে দন্তস্ফুট করিতে গেলে বাঁধানো দাঁতের দরকার। আচ্ছা, তুমি এখন যাও।

হাবু বলিল,'যদি কখনও কোনও দরকার হয় ত বলিবেন,আমি আজ্ঞাকারী।'

হাবু চলিয়া গেলে বিনোদ মনে মনে খুব হাসিয়া বলিল, 'পরের হিতের জন্য যখন নিষিদ্ধ কাজ করা যুক্তিসঙ্গত, তখন রমা দা'র বাক্সটা খুলিতে আপত্তি কি?'

তখন বিনোদ রমানাথের ঘরে প্রবেশ করিয়া নিজের চাবিগুলি একে একে পরীক্ষা করিয়া দেখিল। একটা চাবি রমানাথের বাক্সে লাগিয়া গেল। চোর তাহার মধ্য হইতে কতকগুলি পুরাতন ও কতকগুলি নূতন পত্র তন্ন তন্ন করিয়া পাঠ করিল। শেষ পত্রখানি শনিবারের।

'বারুইপুর। শনিবার।

'আসিতে পারিবে না লিখিয়াছ। আসিও না। একবার কি পূজার জন্যও আসিতে নাই? মার মনে বড় দুঃখ হইবে।

'বিমলার জন্য কি করিতেছ? তাহার বিবাহ না দিলে চলিবে না। বিমলার খুব জ্বর হইয়াছিল। সে তোমাকে দেখিতে চায়। বলে, "দাদাকে একবার আসিতে লিখিও। হয় ত আর দেখা হইবে না।"

দুঃখের সংসার ক্রমেই অন্ধকারে ভরিয়া যাইতেছে। একটু দুধ পাওয়া যায় না যে, বিমলাকে খাইতে দি।'

৪

বারুইপুরের বনবাদাড়সঙ্কুল একটা পুষ্করিণীর পাড়ে চন্দ্রকান্ত মুখুর্য্যের বাড়ী। চন্দ্রকান্ত অনেক দিন পুরোহিত-বৃত্তি করিতেন, কিন্তু প্রায় দুই তিন বৎসর হইল, রোগে পীড়িত হইয়া বাটীতে বসিয়া কেবল তালপত্রের পুঁথি লিখিতেন। যখন নিজে লিখিতে পারিতেন না, তখন কন্যা বিমলাকে দিয়া লেখাইতেন।

চন্দ্রকান্তের অনেক দেনা হইয়াছিল। প্রায় পাঁচ শত টাকা। গরীবের পক্ষে পাঁচ শত টাকাই অনেক। এ দেনাটা তাঁহার প্রথমা কন্যার বিবাহের। দুই বৎসর হইল, শ্বশুরালয়ে জ্বরবিকারে কন্যাটি মারা গিয়াছে। কেবল দেনাটুকু আছে।

পুত্র রমানাথ দেনাশোধের প্রায় যোগাড় করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু চন্দ্রকান্তের দ্বিতীয়া কন্যা বিমলা এখন বয়ঃস্থা। আবার পাঁচ শত না জুটাইলে বিবাহ হয় কিসে? রমানাথ মাসে মাসে যে দশ বিশ টাকা পাঠাইয়া দিত, তাহাতে কোনও ক্রমে কষ্টে সংসার চলিত।

তাই প্রাতঃকালে আম্রবৃক্ষের তলে একখানি ছোট খাটিয়ায় বসিয়া চন্দ্রকান্ত নিজের ছোট সংসার এবং জগতের বড় সংসার সম্বন্ধে মানসিক সমালোচনা করিতেছিলেন। পূর্ব্বকালে ভগবানের তরফ হইতে ব্রাহ্মণদিগের একটা ভরসা আসিত, একালে সে ভরসাটুকু আর আসে না। হয় ত ভগবানেরই পতন হউক, কিংবা ব্রাহ্মণের পতন হউক, একটা কিছু হইয়াছে নিশ্চয়। কিন্তু ভগবানের পতন অবতার না হইলে হয় না। তাহাও ত হয় নাই। অতএব, ব্রাহ্মণদেরই পতন হইয়াছে, এই রকম একটা সূক্ষ্মবিচার করিয়া চন্দ্রকান্ত ডাকিলেন, 'বিমলা, এক ছিলিম তামাক্ সাজিয়া আন্।'

চন্দ্রকান্তের একটা চাকর ছিল। কিন্তু তাহার কর্ম্মক্ষেত্র এত বিস্তৃত যে, সময়ে ডাকিয়া পাওয়া ভার। এই জন্য তাহারও নাম বোধ হয় মধুসূদন। বিপদের সময় দূরে থাকুক, সম্পদেও মধুসূদন কেবল অন্নগ্রাসের সময় রন্ধন-শালায় ব্রাহ্মণীর নিকট উপস্থিত হইত। কাজেই সাংসারিক কর্ম্ম বিমলা, রমানাথের স্ত্রী, এবং রমানাথের মাতা বাঁটিয়া লইতেন। বিমলা তামাকু লইয়া আসিলে 'বৌ' তাহা সাজিয়া দিল, ব্রাহ্মণী তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিলেন। বিমলা হুঁকা লইয়া বৃক্ষতলে গেল।

এমন সময়ে দূরে একটা শব্দ হইল, 'হুম্।' বিমলা চমকিয়া সে দিকে দৃষ্টিপাত করিল।

'বাবা, এক জন ভদ্রলোক বোধ হয় আপনাকে ডাক্‌ছেন্।'

চন্দ্রকান্ত তাঁহার বিশ বৎসরের পুরাতন 'ঘুন্‌সি' বাঁধা চসমা চক্ষুদ্বয়ের সম্মুখে কোনও প্রকারে রক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, অদূরে একটি ভদ্র-লোক বিনীতভাবে দাঁড়াইয়া। চন্দ্রকান্ত ডাকিলেন, 'আসুন। আপনার উদ্দেশ্য কি ?'

আগন্তুক আমাদের হাবু।

সে সসম্ভ্রমে বলিল, 'আমার একটা প্রায়শ্চিত্তের দরকার। সেই জন্য এক জন বিচক্ষণ ভট্টাচার্য্য আবশ্যক। আপনার নাম শুনিয়াছি, এবং জানিতে পারিয়াছি যে, প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে আপনার ন্যায় পণ্ডিত বঙ্গদেশে নাই। আমাকে এ দায় হইতে রক্ষা করিতে হইবে। আমি পাঁচ শত টাকা দিব।'

ইহা বলিয়াই হাবু চন্দ্রকান্তের পা জড়াইয়া ধরিল। চন্দ্রকান্ত চক্ষের নিমিষে বুঝিতে পারিলেন যে, সংসারে এখনও ধর্ম্ম জাজ্বল্যমান। তাঁহার চক্ষু দিয়া অশ্রু বহিল।

'আহা! মহাশয় করেন কি ? আপনি যে ব্রাহ্মণ দেখিতে পাইতেছি। নমস্কার গ্রহণ করুন। প্রায়শ্চিত্ত বড় শক্ত জিনিস। ব্যাপারখানা প্রথমে বুঝি। বসুন।'

হাবু খাটিয়ার এক পার্শ্বে বসিয়া বলিল, 'ব্যাপার বড় গুরুতর। যে কাজটা করিয়াছি, তাহা সকলেই বলে পাপ, অথচ তাহার প্রায়শ্চিত্তের বিধান কি, তাহা কোনও পণ্ডিতই জানে না।'

চন্দ্রকান্ত একটু সরিয়া বসিলেন। 'কুষ্ঠ টুষ্ঠ হয় নাই ত ?'

হাবু। এখনও হয় নাই, কিন্তু হইবে কি না, তাহার বিচার আপনার হাতে। আপাততঃ দাঁত পড়িয়া গিয়াছে।

চন্দ্রকান্ত। কথাটা বলিয়া ফেলুন।

হাবু। আমি অখাদ্য ভক্ষণ করিয়াছি।

চন্দ্রকান্ত আরও সরিয়া গেলেন—'গোমাংস নয় ত ?'

হাবু। না। মুর্গী। কেবল তাহাই নয়, তাহারই জোরে সমগ্র গীতার টীকা লিখিয়াছি।

চন্দ্রকান্তের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। তিনি সত্রাসে বলিলেন, 'সর্ব্বনাশ করিয়াছ!'

৫

হাবু বলিল, 'এখন আপনিই ভরসা। প্রথমতঃ লোকালয়ে এ কথা প্রচার করিতে চাহি না। অথচ যখন একটা ক্রিয়াকর্ম্ম করিতে হইবে, সেটা কি রকম করিয়া হয়, তাহার বিধান করুন।'

চন্দ্রকান্ত গৃহে গিয়া পঞ্জিকাখানা, যাজ্ঞবল্ক্য এবং পরাশরসংহিতা, এবং নস্যের ডিবা লইয়া আসিলেন। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টার পর তিনি বলিলেন, 'এটা কেবল আপনার গ্রহদোষ। যত দূর গণনায় বুঝিতে পারা যায়, এ গ্রহদোষটা পূর্ব্বে কোনও লোকের উপর বর্ত্তিয়াছিল, সে আপনার ঘাড়ে চালাইয়া দিয়াছে। যদিও সে লোকটা নিজে অভক্ষ্য ভক্ষণ করে নাই, কিন্তু আপনি লোভযুক্ত হইয়া তাহার পাপ নিজের স্কন্ধে বহন করিয়াছেন, এবং সেই অবস্থায় ধর্ম্মশাস্ত্রের টীকা লিখিয়া ভগবানের অবমাননা করিয়াছেন। কেবল গ্রহশান্তিতে খণ্ডিয়া যাইবে। ইহার জন্য আপনার চিন্তা নাই, আপনি বাটীতে গিয়া আয়োজন করুন, আমি কল্যই প্রাতঃকালে যাইব। কিন্তু অদ্যই দিন ভাল ছিল।'

হাবু। সেইটুকুই মুস্কিল। এখানে কোনও—মনে করুন, আমবাগানের মধ্যে হয় না কি? আর একটা কথা, যাহার পাল্লায় পড়িয়া আমি পাপের ভাগী হইয়াছি, সে লোকটাও গ্রহদোষ খণ্ডাইতে চাহে। সে ধর্ম্মশাস্ত্র কিছু কিছু জানে।

চন্দ্রকান্ত। তিনি কোথায়?

হাবু। মাঠের ধারে সবৎসা একটা গাভী লইয়া বসিয়া আছেন।

চন্দ্রকান্ত। কি আশ্চর্য্য! যে গ্রহের কোপ হইয়াছে, তিনি শনি। শনিকে সন্তুষ্ট করিতে হইলে সবৎসা গাভী দরকার। এ কথাটা আমিও ভুলিয়া গিয়াছিলাম। এ সকল তত্ত্ব জানিয়াও লোকে পাপপথে যায়! ভগবানের কি লীলা! তাঁহাকে ডাকুন।

হাবু তাহার রুমাল দিয়া ইসারা করাতে সবৎসা গাভী লইয়া বিনোদ উপস্থিত হইল। বিনোদের মাথায় একটা বৃহৎ পুঁটুলির মধ্যে নানা রকম যজ্ঞের সরঞ্জাম একটা ফর্দ্দের সঙ্গে বাঁধা ছিল। সেগুলি সম্মুখে রাখিয়া বিনোদ চন্দ্রকান্তকে প্রণাম করিল।

চন্দ্রকান্ত ভাবিলেন, 'কি সুন্দর ছেলেটি! আজ বোধ হয় ভগবান্‌ই ছলনা করিয়া ইহাদিগকে আমার নিকট পাঠাইয়াছেন। জগতে কখন কি ঘটে, বলা যায় না।'

হাবু। তবে অন্তই ত হইতে পারে ?

চন্দ্রকান্ত। কোনও আপত্তি নাই। তোমরা পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া আইস।

হাবু ও বিনোদ স্নান করিতে গেলে, বিমলা ছুটিয়া গাভীর নিকট আসিল। 'বৌদিদি! কেমন সুন্দর গরু দেখ্‌বি আয়!' বৌদিদিও এতক্ষণ ভয়ানক আগ্রহসহকারে বিমলার সঙ্গে কপাটের আড়ালে দাঁড়াইয়া কথাবার্ত্তা শুনিতেছিল, সেও অবগুণ্ঠনভার স্কন্ধে ফেলিয়া দিয়া এক লাফে আঙ্গিনায় প্রবেশ করিল। উভয়ের স্নেহের উচ্ছ্বাস দেখিয়া গাভী এবং বৎস উভয়েই উভয় সুন্দরীর হস্ত লেহন করিতে লাগিল। বিমলা খুব আহ্লাদে চীৎকার করিয়া বলিল, 'কি চমৎকার গরু!'

ব্রাহ্মণী রন্ধনশালা হইতে বলিলেন, 'তোরা অত কাছে যাস্‌নে। হয় ত মারখাণ্ডী গরু।'

বিমলা খুব হাসিয়া বলিল, 'না, মা! এই দেখ!' ইহা বলিয়া বিমলা গাভীর সিং ধরিয়া রন্ধনশালার সম্মুখে লইয়া গেল।

বৌ বলিল, 'মা, এরা পোষা গরু।'

বিনোদ গাছের আড়াল হইতে তাহাদের উৎসাহ দেখিয়া মনে মনে ভাবিল, 'দৃশ্যখানা বেশ! পাছে ইহা দেখিয়া কেহ সংসার ভুলিয়া যায়, এই জন্য রমা দা' লুকাইয়া রাখিয়াছিল।'

ভৃত্য মধুসূদন গাভী দেখিয়া বলিল, 'মা, ঘরে এইবার লক্ষ্মী এসেছেন। এর অতি কম ছ' সের দুধ হবে।'

বিমলা। ও কথা বলিতে নাই। আগে পূজা হইয়া যাউক।

বৌ। আচ্ছা, এটা কিসের পূজা? আমি ত কোনও ঠিক পাই না। এটা বোধ হয় একটা দৈব ঘটনা। আমি ঠাকুরকে মানাইয়াছিলাম যে, বিমলার যেন একটু দুধ খাওয়ার যোগাড় হয়।

বিমলা। কোন্‌ ঠাকুরকে মানাইয়াছিলে?

উভয়ে উভয়ের মুখ চাহিয়া হাসিল।

চন্দ্রকান্ত ঘর হইতে বলিলেন, 'তোমরা সময় নষ্ট করিও না। শীঘ্র ফুল তুলিয়া আন। ভদ্রলোকের ছেলেরা অনাহারে থাকিতে পারিবেন না।'

যথাসময়ে গ্রহদোষের শান্তি হইয়া গেল। অতিথিদ্বয় মিষ্টান্নগুলি ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়া বিদায় লইল।

৬

একে বর্ষাকাল, তাহার উপর বনবাদাড় ভাঙ্গিয়া এবং বারুইপুরের ডোবা পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া বিনোদ জ্বরে পড়িয়াছে। আসল কথাটা লুকাইয়া বিনোদ রমানাথকে বলিয়া গিয়াছিল যে, সেই দিনই বাটী হইতে ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু বারুইপুর হইতে বিনোদের বাসগ্রাম একদিনের পথ। অনেক দিনের পর দেশে গিয়া এবং চর্ব্ব্য চূষ্য আহার করিয়া বিনোদ তাহাদের দোতালার মুক্তছাতে শিশিরে দুই ঘণ্টা ঘুমাইয়াছিল। নিদ্রা হইতে উঠিয়া সে ছোটদিদিকে ডাকিল। ছোটদিদি তৎক্ষণাৎ বলিল, 'কাকা তোমার বিয়ের সম্বন্ধ করেছেন। খুব সুন্দরী।' তৎক্ষণাৎই বিনোদের জ্বর পরিস্ফুট হইয়া পড়িল।

প্রাতঃকালে জ্বর প্রায় ১০৪ ডিগ্রী। বিনোদের পিতা নাই। বিনোদের খুড়া নির্ম্মল চাটুর্য্যেই উভয় সরিকের বিষয় দেখেন। তিনি নিতান্ত নিরীহ মানুষ। বিনোদের মাতা তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'ছোট্ ঠাকুর পো! তুমি করিলে কি? এ সময় কি বিবাহের সম্বন্ধ করিতে আছে? বিবাহের কথা শুনিয়াই বাছা জ্বরে পড়িয়াছে।'

নির্ম্মল চাটুর্য্যে ফাঁপরে পড়িয়া বলিলেন 'মেয়েটি বোধ হয় কুলক্ষণা। যাহা হউক, যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে। এখন কলিকাতা হইতে এক জন ডাক্তার ডাকান' নিতান্ত দরকার।'

বিনোদ বিছানা হইতে বলিল, 'আমাদের মেসে রমানাথবাবুকে খবর দিবেন। তিনি ভাল ডাক্তার লইয়া আসিবেন।'

রমানাথ তাহার পরদিনই ডাক্তার সঙ্গে করিয়া ছুটিয়া আসিল। ডাক্তার রোগীকে দেখিয়া বলিলেন, 'এটা সম্পূর্ণ "ডাহা" ম্যালেরিয়া। জ্বর ছাড়িয়া গেলেই কুইনাইন দিতে হইবে।'

বিনোদ রমানাথকে দেখিয়া খুব খুসী। যখন খুব জ্বর তখন বিনোদ বলিত, 'তুমি নিকটে বসিয়া থাক, এবং মাঝে মাঝে নাড়ী টিপিয়া দেখিও।'

রমানাথ সারা রাত্রি জাগিয়া বসিয়া থাকিত। দ্বিপ্রহর রাত্রি যখন, তখন বিনোদ একবার চীৎকার করিয়া বলিল, 'কি চমৎকার গরু!' এবং হাসিয়া উঠিল।

রমানাথ ডাক্তারকে সে কথা বলাতে ডাক্তার বাবু বলিলেন, 'সচরাচর "ডাহা" ম্যালেরিয়া-রোগী গরুর স্বপ্নই দেখে।'

রমানাথ গম্ভীরভাবে বলিল, 'পূর্ব্বে এ কথা শুনি নাই।'

ছোট দিদি ঝিকে দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে, বিনোদের সম্প্রতি বিবাহের কথা উঠিয়াছিল, এবং জ্বরের ঠিক পূর্ব্বে বিনোদকে সেই কথা বলা হয়। বিনোদের মাতার মত যে, বিবাহের ভয়েই বিনোদের জ্বর হইয়াছে।

ডাক্তারবাবু বলিলেন, 'বিবাহের পূর্ব্বেই যখন এত ভয়, বিবাহ হইলে ইঁহাকে প্রত্যহ কুইনাইন খাইতে হইবে। ইঁহার জন্য কলিকাতা হইতে একটা টনিক্ আমি তৈয়ারি করিয়া পাঠাইয়া দিব। অকালে বিবাহের প্রস্তাবনাই বঙ্গদেশে ম্যালেরিয়ার কারণ, অথচ সকলে মশকের দোষ দিয়া থাকে।'

ডাক্তারের অসাধারণ চিকিৎসায় বিনোদের জ্বর তিন দিনেই ছাড়িয়া গেল। বিনোদ বড় দুর্ব্বল।

কয় দিনের রাত্রিজাগরণে রমানাথের চোখে কালিমা পড়িয়া গিয়াছে। আজ রোগীর শিয়রে বসিয়া রমানাথ কি ভাবিতেছিল। বিনোদ জিজ্ঞাসা করিল, 'রমা দা', বাড়ী যাইবার চেষ্টা করিতেছ বুঝি?'

রমানাথ। বাড়ী যাইব কি কলিকাতায় যাইব, তাহাই ভাবিতেছি।

বিনোদ। বাড়ী যাও। আচ্ছা, রমা দা'! তুমি বাড়ীর কথা আমাকে বল না কেন? আমি ত তোমাকে সে রকম ভাবি না। আমাদের বাড়ীতে এ কয়-দিনের মধ্যেই সকলে তোমাকে বাড়ীর ছেলের মত ভাবিয়াছে, কিন্তু তুমি দূরে থাক কেন?

রমানাথ। বিনোদ! তোমার বাড়ী এবং আমার বাড়ী অনেক তফাৎ। তোমরা বড়লোক, আমরা দরিদ্র। তোমরা করুণদৃষ্টিতে তাকাইতে পার, আমরা ভিক্ষার্থী না হইলে মাথা তুলিয়া চাহিতে পারি না।

বিনোদ। যদি বড়লোক দরিদ্রের ঘরে ভিক্ষা মাগিতে যায়?

রমানাথ। কিসের ভিক্ষা?

বিনোদ। প্রেমের ভিক্ষা। আমি শুনিয়াছি যে, স্বর্গেও অনেক ঔষধ পাওয়া যায় না। আধিব্যাধিনিবারণের জন্য দেবতাবর্গ তাহা বনে বনে খুঁজিয়া বেড়ান। আমরা ত সামান্য মানুষ। এক জায়গায় বসিয়া, যাহা প্রাণ চাহে তাহাই যদি পাইতাম, তবে সমাজের এবং কর্ম্মক্ষেত্রের অর্থ কি? আর একটা কথা,—রমা দা'! আমি একটা কেলেঙ্কারি করিয়া বসিয়াছি। তার কোনও চারা নাই।

৭

রমানাথের মনে একটা দারুণ সন্দেহ হইল।

'বিনোদ, এক সময় তোমাকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলাম যে, গণ্ডীর বাহিরে যাইবার তোমার দুর্দ্দম্য প্রবৃত্তি। তোমার চরিত্র নষ্ট হয় নাই ত?'

বিনোদ। সে ভয় নাই। নষ্ট না হইয়া ভাল হইয়াছে। অনেক সময় একটা 'কেলেঙ্কারি'র গুণে চরিত্র ভাল হয়। নৈতিক নিয়ম পালন করিলে তাহা হয় না। আমি সে দিন 'হেডনিজ্‌ম্‌' (ভক্তি এবং আনন্দতত্ত্ব) পড়িতেছিলাম। যদি সুখের যথার্থ আদর্শ কোনও জায়গায় হঠাৎ দেখা যায়, তখন আর বিচার করিবার দরকার থাকে না।

রমানাথ বিনোদের ঘর্ম্মাক্ত ললাট ও কেশ তাহার শীর্ণ কোমল হস্ত দিয়া মুছাইয়া দিয়া বলিল, 'এখন কেলেঙ্কারির কথাটা আমাকে বলিবে কি?'

বিনোদ বলিল, 'না।'

'তোমারও যেমন দৈন্যের গর্ব্ব আছে, আমারও সেইরকম ঐশ্বর্য্যের গর্ব্ব আছে। তুমি ভিক্ষা করিতে যেমন ঘৃণা অপমান বোধ কর, আমিও ভিক্ষা করিতে সেই রকম লজ্জা পাই। সুতরাং আমি কথনই বলিব না। তোমার অপমান্ যদি ফিরাইয়া লও, আমার লজ্জাও আমি টানিয়া লইব।'

রমানাথ। এখনও তাহার সময় হয় নাই।

বিনোদ। অতএব আমারও হয় নাই। কিন্তু একটা প্রতিজ্ঞা তুমি কর—আমার 'কেলেঙ্কারি'র কথা যদি তুমি জানিতে পার, তবে তুমি রাগ করিবে না?

রমানাথ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বিনোদের প্রেমের আব্‌দার-ভরা সুন্দর মুখখানি দেখিতে লাগিল। পরে ধীরে ধীরে বলিল, 'না, কথনই রাগ করিবনা। তোমার ভালবাসায় আমার সমাজতন্ত্রের বালির বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।'

এমন সময় ঝি আসিয়া খবর দিল,—'রমা বাবুকে মা ঠাকরুণ ডাকছেন।'

রমানাথ ধীরে বাড়ীর মধ্যে গেল। গৃহে সর্ব্বত্র ঐশ্বর্য্যের চিহ্ন। সকলই পরিচ্ছন্ন, শান্তিপূর্ণ। মেজের উপর মাদুর পাতিয়া বিনোদের বিধবা মাতা ও বিনোদের বিধবা ছোট দিদি মূর্ত্তিমতী দুইটি দেবীর ন্যায় প্রফুল্লমুখে উপবিষ্টা।

বিনোদের মাতা বলিলেন, 'বাবা, তুমি আমাদেরই ঘরের ছেলে। তুমি বিপদের সময় যে সহায়তা করিয়াছ, তাহার মূল্য নাই। এখন আমাদের একটা মিনতি রাখিতে হইবে।'

রমানাথ সঙ্কুচিত হইয়া বসিয়া পড়িল। তাহার মুখ শুষ্ক হইয়া গেল।

বিনোদের মাতা তাহার অন্তরের কথা বুঝিতে পারিয়া হাসিয়া বলিলেন, 'বাবা!

সে ভয় নাই। উপরন্তু আমরাই কিছু চাহি; এবং আমরা যাহা চাহিতেছি তাহা সামান্য। তোমার বাড়ীতে আমরা একবার যাইব।

রমানাথ স্তম্ভিত হইয়া বলিল, 'আপনারা আমাদের বাড়ীতে যাইবেন!'

বিনোদের ছোটদিদি বলিল, 'ভাই! আজই আমরা যাইব। তোমার সঙ্গে যাইব। গাড়ী পাল্কী সবই প্রস্তুত। এই মনে কর, তীর্থস্থানে যাইতে আমাদের ত লজ্জা হয় না, তবে তোমাদের বাড়ীতে যাইতে লজ্জা কি? আমাদের আবদার রাখিতে হইবে, নচেৎ বুঝিব যে, তোমার বিনোদের উপর মায়া মমতা নাই। বিনোদ যেমন আমাদের সর্ব্বস্ব, যে তাহার হিতাকাঙ্ক্ষী, সেও তাই।'

রমানাথ তাহার বাষ্পাতুর চক্ষুর দৃষ্টি বাহিরের দিকে নিক্ষেপ করিয়া বলিল, 'যাহা আপনাদের মত, তাহাই হউক।'

রমানাথ স্নান করিতে বাহিরে চলিয়া গেল।

ছোটদিদি দৌড়িয়া বিনোদের শয্যার নিকট আসিল। 'বিনোদ, আমরা একবার কালীঘাটে যাইতেছি, কাল্‌ই ফিরিয়া আসিব।'

বিনোদ। ব্যাপারখানা কি?

ছোটদিদি। মহালয়া। তুমি বোধ হয় ঠাকুর দেবতাদের কোনও খবর রাখ না?

বিনোদ। কিছু কিছু রাখি।

ছোটদিদি। আমরা মহালয়া সারিয়াই চলিয়া আসিব। খুড়ীমা থাকিলেন, যদি সাবু দানা ইচ্ছা না হয়, দুধ শুজির বন্দোবস্ত করিয়া যাইতেছি।

বিনোদ। ধন্যবাদ!

ছোটদিদি। বিনোদবাবু! তুমি মনে কর, তুমিই বড় চালাক, তাহা নয়। আমিও খুব চালাক। তোমার জ্বরের কথা সব আমি জানি। তুমি সারাদেশ ছুটোছুটি করিয়া পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া বেড়াও। এ সব কি ভাল কথা বিনোদ?

বিনোদ (স্মিতমুখে)। তোমাকে কে খবর দিল?

ছোটদিদি। পুলিস।

৮

বিনোদের মাতা তাঁহার বিধবা কন্যা এবং রমানাথকে সঙ্গে করিয়া রমানাথের বাড়ীতে উপস্থিত। চন্দ্রকান্ত পূজা আহ্নিক সাঙ্গ করিয়া আম্রবৃক্ষের তলে বসিয়া আছেন। বিমলা তাহার গোবৎস লইয়া তৃণ জোগাইতেছে। ব্রাহ্মণী পুত্রবধূর চুল বাঁধিয়া দিতেছেন।

আজ মহালয়া। বন বাদাড়ের মধ্যে, ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত দেশে, মহালয়া কিসের?

হয় ত মহালয়া মৃত্যুরাজ্যেরই একটা অঙ্গ। হয় ত মহালয়া দুঃখেরই পরম দৃশ্য। কোনও খানেই আনন্দ নাই। বৃক্ষে না, ভূমিতে না, জলে, স্থলে, গৃহে, এবং আকাশে কোথাও না। মানুষ কৈ? আনন্দ করিবে কে? যন্ত্র নহিলে সঙ্গীত কোথায়?

সকলেই ম্রিয়মাণ। চুপ করিয়া বসিয়া। রোগে শোকে ক্লিষ্ট। গাছের পাখীগুলিও নিস্তব্ধ।

চন্দ্রকান্ত ভাবিলেন, 'যদি পয়সা কড়ি থাকিত, তবে কলিকাতায় চলিয়া যাইতাম; এ রকম শ্মশানে বাস করা অসম্ভব।'

এমন সময় সেই নিরানন্দের মধ্যে তিনখানি পাল্কী লইয়া প্রায় বত্রিশ জন লোক চন্দ্রকান্ত মুখোপাধ্যায়ের বাটীর সম্মুখে উপস্থিত হইল। পাল্কী হইতে প্রথমে রমানাথ, এবং তৎপরে দুইটি আনন্দময়ী মূর্ত্তি বাহির হইল।

রমানাথ পিতার চরণে প্রণাম করিয়া বলিল, 'ইঁহারা —পুরের জমীদার-দিগের ঘরের—বিনোদ বাবু আমার বন্ধু—ইনি তাঁহার মাতা, এবং ইনি তাঁহার সহোদরা। দয়া করিয়া আমাদের কুটীরে পদার্পণ করিয়াছেন—পরম সৌভাগ্য।'

চন্দ্রকান্ত। পরম সৌভাগ্য। এস মা আনন্দময়ী, এস! এই বলিয়া মুখুয্যে মহাশয় বিনোদের ছোট দিদির মস্তকে হস্তস্থাপন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। 'বিমলা, এ দিকে আয় মা, দেখ্ত ভাই বোনের মুখ ঠিক এক রকম কি না—আমার চশ্মাখানা আজ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

রমানাথ পিতার মন্তব্য শুনিয়া নির্ব্বাক্ হইয়া সকলের দিকে চাহিতে লাগিল।

বাক্যব্যয় না করিয়া বিনোদের মাতা ও তাঁহার কন্যা চন্দ্রকান্তের গৃহে প্রবেশ করিলেন।

তাহার পরে?

তাহার পরে বিনোদের ছোট দিদি বিমলাকে ধরিয়া মাতার অঙ্কে বসাইয়া দিল। বিনোদের জননী বিমলার মলিন অবগুণ্ঠনের অভ্যন্তর হইতে তাহার নিষ্কলঙ্ক সলজ্জ মুখখানি বাহির করিয়া প্রগাঢ়ভাবে চুম্বন করিলেন।

ছোট দিদি বিমলার চুল বাঁধিতে লাগিল। 'বিনোদের পছন্দ কি যেমন তেমন পছন্দ! মা একবার ভাল করিয়া দেখ, এ রূপ ত দেখিয়া তৃপ্তি হয় না।'

বিনোদের মাতা বলিলেন, 'আমার বুকের অৰ্দ্ধেকটা খালি ছিল, ইহাকে পাইলে সেটুকু ভরিয়া যাইবে। রমানাথ, তোমার পিতাকে বল, আমি একেবারে আশীর্ব্বাদ করিয়া যাইব।'

ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণী বলিলেন, 'আপনার "কথা"ই আশীর্ব্বাদ, আমরা মনে করিতেছি যে, আজ আমাদের দীনগৃহে আপনি স্বয়ং ভগবতীরূপে অবতীর্ণা।'

রমানাথ লুকাইয়া স্ত্রীর নিকট গেল। জিজ্ঞাসা করিল, 'বল ত ব্যাপারখানা কি?'

সাধ্বী বলিল, 'তোমাকে ত চিঠি লিখিয়াছি, পাও নাই কি?' তার পর প্রায়শ্চিত্তের গল্পটা বলিতে লাগিল।

রমানাথ। এখন সব বুঝিয়াছি। বিনোদ যে একটা গভীর কেলেঙ্কারী করিবে, তাহা পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলাম। কিন্তু কেলেঙ্কারিটা আমারই মাথার উপর দিয়া চালাইবে, তাহা বুঝিতে পারি নাই।

যাহা হউক, আশীর্ব্বাদ হইয়া গেল, এবং আশীর্ব্বাদের পর যাহা হইয়া থাকে, তাহাও বাকি রহিল না। হাবু এবং রমানাথ অনেক চেষ্টা করিয়া কেলেঙ্কারির কথাটা রাষ্ট্র হইতে দেয় নাই।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

সমালোচনা না উচ্ছভাষ ?

গত ভাদ্র মাসের 'ভারতী'তে 'শ্রীনবকুমার কবিরত্ন'-নামধারী জনৈক লেখক সাহিত্য-সভার সভাপতি মহারাজ সার্ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরকে 'অকথ্য ভাষায়' গালাগালি করিয়াছেন। মহারাজের অপরাধ—তিনি সাহিত্য-সভার গত বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে একটি অভিভাষণ পাঠ করেন; সেই অভিভাষণে, আধুনিক এক শ্রেণীর লেখক বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাষাকে যেরূপ বিকৃত করিবার চেষ্টা করিতেছেন, এবং তাঁহাদের রচিত গ্রন্থাদিতে যেরূপ জঘন্য ভাবের প্রবর্ত্তনে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, তৎসম্বন্ধে প্রতিকূল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। মহারাজের এ মন্তব্য নূতন নহে। উপর্য্যুপরি তিন বৎসর ধরিয়া সাহিত্য-সভার বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে তিনি এই কথাই বলিয়া আসিতেছেন। এতদিনে তাঁহার উক্তি যে এই

লেখক-সম্প্রদায়ের মর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছে, 'নবকুমার' বাবুর গালাগালিই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। মহারাজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি; তিনিও যে আনন্দিত হইয়াছেন, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই। কারণ, তিনি বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের এক জন অকৃত্রিম সেবক ও সুহৃদ্। ভাষাজননীর প্রতি এই 'অকথ্য' অত্যাচারে নিতান্ত ব্যথিত হইয়াই তিনি এই প্রতিবাদে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, এ কথা তাঁহার অভিভাষণেই উক্ত হইয়াছে।

'নবকুমার' মহারাজকে গালাগালি করিয়াছেন, কারণ, গালাগালি ভিন্ন তাঁহার গত্যন্তর ছিল না। ইংরাজীতে একটা কথা আছে যে, মোকদ্দমায় যে পক্ষে যুক্তির অভাব, সে পক্ষের উকীল অপর পক্ষের উকীলকে গালাগালি দিয়া সে অভাবপূরণের চেষ্টা করিয়া থাকেন। আলোচ্য সংখ্যার 'ভারতী'তেই উক্ত হইয়াছে যে, 'যাঁহাদের শক্তির অভাব, গালাগালিই তাঁহাদের সম্বল।' নচেৎ শিক্ষাভিমানী কোনও ভদ্রলোক অপর এক জন পদস্থ ভদ্রলোকের প্রতি কখনও এরূপ অভদ্র ভাষা প্রয়োগ করিতে পারিতেন না। 'নবকুমার' মহারাজকে 'খেতাবী মহারাজা,' 'আনাড়ি,' 'বে-আদব,' 'ফোপর দালাল' ইত্যাদি আখ্যায় ভূষিত করিয়াছেন! মহারাজ বাহাদুরের চরিত্র আমরা যতদূর জানি, তাহাতে 'নবকুমারের' এ 'উচ্চভাষ' তিনি হাসিয়াই উড়াইয়া দিয়াছেন। 'হিতোপদেশে'র পক্ষীরা বানরদিগকে সৎপরামর্শই দিয়াছিল, কিন্তু বানরেরা তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া পক্ষীদিগের বাসা ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। উপদেশ যে শ্রেণীবিশেষের লোকের শান্তির কারণ নহে, এ কথা সকলেই জানেন। 'নবকুমারে'র ক্রোধের বিশেষ কারণ, মহারাজের অভিভাষণে 'রচয়িতার যে মনের ফোটা উঠেছে তা মোটেই বৈষ্ণবের ছবি বলে কারো ভ্রম হবার সম্ভাবনা পর্য্যন্ত নেই।' কম দুঃখের কথা! মহারাজ বৈষ্ণব হইয়াও শাক্তের খাঁড়া লইয়া কোপাইয়াছেন। কাজেই ব্যথা লাগিয়াছে। 'যেখানে অস্ত্রের ক্ষত ব্যথাও সেথায়।'

নবকুমার তাঁহার রচনায় যে শিক্ষা দীক্ষার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার মুখ দিয়া এরূপ অকথ্য ভাষা ছাড়া অন্য ভাষা বাহির হইতে পারে না। আমরা তাঁহার গালাগালির আবর্জ্জনাস্তূপে যুক্তির নামগন্ধ পাইলাম না। তথাপি তাঁহার দুই একটি উক্তিকে যুক্তি বলিয়া ধরিয়া লইয়া তদুত্তরে কয়েকটি কথা বলিব।

নবকুমার ধরিয়া লইয়াছেন যে, মহারাজ 'চল্‌তি ভাষা'র নিন্দা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি যদি ক্রোধে অন্ধ ও আত্মহারা না হইতেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইতেন যে, আলোচ্য অভিভাষণে মহারাজ স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, 'বিষয়ভেদে ভাষার তারতম্য হইয়া থাকে।' কৃষককে আলু পটোলের চাষ শিক্ষা দিবার জন্য যে ভাষা ব্যবহার করিতে হয়, কপালকুণ্ডলার রূপ-বর্ণনায় সে ভাষা 'অচল'। প্রয়োজনানুসারে সাহিত্যে কথনীয় ভাষার প্রয়োগ করিতে হয়। বিদূষকের বা জালিকদিগের কথায় ও দুষ্মন্তের কথায় প্রভেদ থাকিবে বৈ কি। কবিকঙ্কণ সমুদ্রে ঝটিকার সময় শ্রীমন্তকে যে ভাষায় কথা কহাইয়াছেন, পূর্ব্ববঙ্গবাসী মাঝিদিগকে সে ভাষায় কথা কহান নাই। এমন কি—স্বয়ং নবকুমার 'গ্যালো ব'শেখের' অভিভাষণকে গালাগালি করিতে গিয়াও সর্ব্বত্রই 'চল্‌তি ভাষা' ব্যবহার করিয়া তাঁহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে পারেন নাই। তিনি অসামাল হইয়া লিখিয়াছেন—'যে ভাষা পরমহংসের মানস যজ্ঞের চরু ঘরে ঘরে বিতরণ কর্‌ছে, যে ভাষা বিবেকানন্দের বীরবাণী শমী-শাখার মতন আপনার বুকে অনায়াসে ধারণ কর্‌তে পেরেছে, যে ভাষা রবীন্দ্রনাথের স্পর্শে পারিজাতের ফুল ফুটিয়ে বিশ্বদেবতার চরণ বন্দনা করেছে, এ সেই চল্‌তি ভাষা।' আমরা বলি—'এ সেই চল্‌তি ভাষা' নয়, ক্রিয়াপদ কয়টি বাদ দিলে এ সেই বাঙ্গালা সাহিত্যের সাধু ভাষা।

মহারাজ 'চল্‌তি ভাষার' নিন্দা করেন নাই, তিনি কেবল বলিয়াছেন যে, 'সাহিত্যের ভাষাকে প্রাদেশিকতাদুষ্ট করিলে উদ্দেশ্যের বিপরীত ফলই ফলিবে। সাহিত্যের সার্ব্বজনিকতা বিনষ্ট হইয়া এক বিরাট্ সাহিত্যের স্থলে এতগুলি প্রাদেশিক সাহিত্যের সৃষ্টি হইবে যে, এক প্রদেশের সাহিত্য অন্য প্রদেশের অধিবাসীদিগের পক্ষে আদৌ সুগম হইবে না।'

যাঁহারা Dacca University Committeeর রিপোর্ট পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিবেন, মহারাজের এই আশঙ্কা অমূলক নহে। সাহিত্য-পরিষদ্ ও সাহিত্য-সভা Dacca University Committeeর "books of a Muhammadan character" রচনার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়া গবর্মেণ্টের নিকট আবেদনপত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। বঙ্গ-বিভাগের পর পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম গবর্মেণ্ট স্কুলপাঠ্য গ্রন্থাবলীতে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ছাত্রদিগের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ভাষা প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। এইরূপে বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাষাকে টানিয়া ছিঁড়িয়া খণ্ড খণ্ড করিবার অনেক চেষ্টা

অনেক দিন হইতে হইয়াছে এবং হইতেছে। নবকুমার তাহা জানিলে তাঁহার এ 'উম্মার কসকসানি'তে লোক হাসাইতেন না।

১৩২০ সালের কার্ত্তিক মাসের 'সাহিত্য-সংহিতায়' মহারাজের যে অভিভাষণ মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন—

"এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাষার আর এক আদর্শ সৃষ্ট হইবে। তাহা এইরূপ—

'নবী মাতামহ মোর, ধর্ম্মপ্রচারক,
আমি সমাধির তাঁর সেবক অধম।
জানিতাম তারে খাঁটি রছুল সেবক,
করিল সে আহা কিবা জুলুম বিষম!
লিখিল আমায়—এস নির্ভয়ে কুফায়,
লিখাল মোস্লেমে দিয়া সে কথা হারাম,
ত্যজিয়া মদিনা আমি তাহার কথায়,
করিনু কি আহাম্মুকি বোকামির কাম।'

বাঙ্গালা সাহিত্যানুরাগী হিন্দু মুসলমান সকলকেই জিজ্ঞাসা করি, সাহিত্যের ভাষার এ আদর্শ তাঁহারা গ্রহণ করিবেন কি?'

'গ্যালো ব'শেখের' অভিভাষণেও মহারাজ এই কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—

'নবীন সম্প্রদায় প্রচলিত সাধু ভাষাকে বাঙ্গালা ভাষা বলিয়া স্বীকার করিতেছেন না; দক্ষিণ বঙ্গের মৌখিক ভাষাকেই বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাষা বলিতেছেন। কিন্তু অন্য প্রদেশের লোকেরা দক্ষিণ বঙ্গের প্রাদেশিক ভাষাকে সে প্রাধান্য দিতে চাহিতেছেন না। তাহার উপায় কি? আসাম ত অনেক দিন আমাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছে। মুসলমানেরা বলিতেছেন, এত দিন আমরা বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রচলিত ভাষাকে স্বীকার করিয়া চলিতাম—সেই ভাষায় গ্রন্থ লিখিতাম—কোনও আপত্তি করিতাম না, কারণ, তাহাতে সকল প্রদেশের সমান অধিকার ছিল; কিন্তু এক্ষণে তোমরাই যখন সেই সর্ব্ববাদিসম্মত ভাষাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া প্রাদেশিক মৌখিক ভাষাবিশেষকে সেই সিংহাসনে বসাইতে চাহিতেছ, তখন আমাদের মৌখিক ভাষাকে উপেক্ষা করিবে কেন?'

নবকুমার এই 'কেন'র কোনও উত্তর দিতে পারেন নাই। কেবল গায়ের জোরে বলিয়াছেন—'দক্ষিণ-বাংলার এই চল্তি ভাষা—একে প্রাকৃত ব'লে

নাক সেঁটকালে চল্‌বে না—এ মধুর, এর মনোহরণের ক্ষমতা আছে। ... প্রাকৃত হ'লেও, এ আমাদের একাধারে সৌরসেনী এবং মহারাষ্ট্রী। ... বাংলার অন্ত বিভাগে যদি তেমন কোনো গুণাঢ্য জন্ম গ্রহণ করেন তবে বঙ্গীয় পৈশাচীটাও না হয় আমরা মেনে নেব।' 'বাংলার অন্ত বিভাগের' লোক-দিগের এ কথা প্রীতিকর হইবে কি না, বলিতে পারি না। যত মনোহরণ করিবার ক্ষমতা কেবল 'দক্ষিণ বাংলার চল্‌তি ভাষার'ই আছে, 'বাংলার অন্ত বিভাগের' চল্‌তি ভাষার নাই, নবকুমার এ তথ্য কোথা হইতে সংগ্রহ করি-লেন? আবার 'পূর্ব্ব বা উত্তরবঙ্গে কোনো কালে যদি মিল্টন্ বা রবার্ট বার্ণসের মতন কবির উদয় হয়, তবে' নবকুমার সম্প্রদায়েরা 'গ্রেট-বেঙ্গলের পাড়াগেঁয়ে প্রভেন্‌সাল্ বা খচমচ স্কচ্ ভাষাটাও আয়ত্ত ক'রে' নেবেন, কিন্তু তাহাকে সাহিত্যের ভাষার উচ্চাসন দিবেন না। কারণ, সেটা 'পৈশাচী' ভাষা, 'প্রভেন্সাল্ বা খচমচ স্কচ্ ভাষা।' যত গুণাঢ্য কি এই দক্ষিণ বাঙ্গালাতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? উত্তর বা পূর্ব্ববঙ্গের প্রতিভাশালী লেখকেরা নবকুমার-দিগের এই অনুগ্রহে পদাঘাত করিয়া যদি আজ হইতে প্রতিজ্ঞা করিয়া বসেন যে, অতঃপর তাঁহারা 'দক্ষিণ বাংলার চল্‌তি ভাষায়' গ্রন্থ রচনা না করিয়া তাঁহাদের 'পাড়াগেঁয়ে প্রভেন্সাল্ বা খচমচ স্কচ্' ভাষাতেই গ্রন্থ রচনা করিবেন, তাহা হইলে তাহা বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের পক্ষে হিতকর হইবে কি? প্রবীণ মহারাজ বাঙ্গালা সাহিত্যে এই গৃহবিচ্ছেদনিবারণের জন্যই এত কথা বলিয়াছেন; কিন্তু হায়, জীববিশেষের শৃঙ্গে পতিত হইয়া তাঁহার সদুপদেশ-হীরার ধার ভাঙ্গিয়া গেল!

নবকুমারের আর এক ভুল বা ন্যাকামি এই যে, তিনি সহজ সাধু ভাষা ও মৌখিক চল্‌তি ভাষা এক বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। ইহা ধরিয়া লইয়া তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষার নিন্দা ও বঙ্কিমচন্দ্র, ইন্দ্রনাথ প্রভৃতির ভাষার সুখ্যাতি করিয়াছেন। তাঁহার বলিবার উদ্দেশ্য যে, মহারাজ সংস্কৃতশব্দবহুল ভাষাকেই সাহিত্যের ভাষা বলিয়াছেন, আর বঙ্কিমচন্দ্র, ইন্দ্রনাথ প্রভৃতির সহজ সাধু ভাষাকে অবজ্ঞা করিয়াছেন। মহারাজ ইহার কিছুই করেন নাই। ১৩২১ সালের মাঘ মাসের 'সাহিত্য-সংহিতা'য় প্রকাশিত তাঁহার অভিভাষণে এ সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য তিনি বিশদভাবে বুঝাইয়াছেন। বাহুল্যভয়ে আমরা তাহা এ স্থলে উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। নবকুমার যদি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'শকুন্তলা,' 'বিধবাবিবাহবিষয়ক প্রস্তাব' প্রভৃতি পাঠ করিতেন, তাহা হইলে বিদ্যাসাগরী

ভাষার নিন্দা তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইত না। রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের 'বাঙ্গালা সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব', রবীন্দ্র বাবুর 'রাজর্ষি', 'গল্পগুচ্ছ', বঙ্কিমবাবু ও ইন্দ্রনাথ প্রভৃতির গ্রন্থাবলী সুন্দর, সহজ, সাধু ভাষায় লিখিত। প্রয়োজনানুসারে তাঁহারা সংস্কৃত শব্দ ও সমাসবহুল ভাষাও ব্যবহার করিয়াছেন। তাহাতে ভাব-গৌরবের বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস হয় নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'সীতার বনবাস', তারাশঙ্করের 'কাদম্বরী', গৌড়ী রীতি অবলম্বনে রচিত সংস্কৃত গ্রন্থের কতকটা অনুবাদস্বরূপ বলিয়া কিছু সমাসবিশিষ্ট ও সংস্কৃতশব্দবহুল হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে রচনার প্রসাদগুণ নষ্ট হয় নাই। পাকা হাতে ভাষার উজ্জ্বলতাই বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভাষা গ্রাম্যতা ও প্রাদেশিকতায় দুষ্ট হইলেই নিন্দনীয়, সহজ সরল হইলে নিন্দনীয় নহে। নবকুমার সম্প্রদায়ের ভাষা সহজ সরল নহে, পরন্তু গ্রাম্যতা ও প্রাদেশিকতায় দুষ্ট। ইহা মহারাজ তাঁহার আলোচ্য অভিভাষণে ও তৎ-পূর্ব্ববর্ত্তী দুইটি অভিভাষণে সুন্দররূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। নবকুমার 'পুরোনো বঙ্গদর্শনের ফাইল উল্টে' তাঁর 'গ্যালো ব'শেথী' ভাষা বাহির করিতে পারেন কি?

এই গেল ভাষার কথা। এবার ভাব সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব। 'সবুজ পত্র' যে দিন হইতে গজাইয়াছে, সেই দিন হইতেই 'প্রতিভার অবতার' রবীন্দ্রনাথ তাহাতে ছোট বড় অনেক গল্প লিখিতেছেন। প্রায় সমস্ত গল্পেরই উদ্দেশ্য হিন্দু সমাজকে, হিন্দু সংসারকে, হিন্দুর শাস্ত্রকে, হিন্দুর আচার-ব্যবহার, হিন্দুর জীবনের চিরারাধ্য আদর্শগুলিকে ক্ষুণ্ণ বা বিদ্রূপ করা। হিন্দু জামাতা শ্বশুরকে 'শ্রীচরণেষু' পাঠে চিঠি লিখিল। শ্বশুর 'নিম্নলিখিত প্রণালীতে উপদেশ' দিলেন—'মাই ডিয়ার নরেন, চরণকে শ্রী বলিলে যে কি বলা হয় তা আমিও জানি না, তুমিও জান না; অতএব ওটা বাজে কথা। তার পরে, আমায় একেবারে বাদ দিয়া আমার চরণে কিছু নিবেদন করিয়াছ; তোমার জানা উচিত আমার চরণটা আমারই এক অংশ; যতক্ষণ এটা আমার সঙ্গে লাগিয়া আছে, ততক্ষণ উহাকে তফাৎ করিয়া দেখা উচিত না; তার পরে ঐ অংশটা হাতও নয়, কাণও নয়, ওখানে কিছু নিবেদন করা পাগলামি; তার পরে শেষ কথা এই যে, আমার চরণ সম্বন্ধে বহুবচন প্রয়োগ করিলে ভক্তি প্রকাশ করা হইতে পারে, কারণ কোনো কোনো চতুষ্পদ তোমাদের ভক্তিভাজন; কিন্তু ইহাতে আমার প্রাণিতত্ত্বঘটিত পরিচয় সম্বন্ধে তোমার অজ্ঞতা সংশোধন করিয়া দেওয়া আমি উচিত মনে করি।' [সম্প্রতি রবীন্দ্র বাবুর এক জামাতা স্বরচিত একখানি গ্রন্থ স্বীয় পত্নীর 'করকমলেষু' উপহার দিয়াছেন। শ্বশুর মহাশয় এখন

জাপানে; তাহা না হইলে বোধ হয় জামাতার প্রাণিতত্ত্বঘটিত অজ্ঞতা সংশোধন করিয়া দিতেন।]

কবি স্ত্রী হিন্দু স্বামীর সংসারে কেবল স্বার্থপরতা ও সঙ্কীর্ণতারই জঘন্য মূর্ত্তি দেখিতে লাগিল। তাহারও যে বুঝিবার ভুল হইতে পারে, এ কথা সে স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহে। কারণ, 'আমি যেটাকে ভাল ব'লে বুঝি আর কারো খাতিরে সেটাকে মন্দ ব'লে মেনে নেওয়া আমার কর্ম্ম নয়।' শেষে সে সঙ্কীর্ণতার কারাগার—তাহার স্বামীর সংসার—ভাঙ্গিয়া পলাইয়া গেল। গিয়া স্বামীকে চিঠি লিখিল—'তোমাদের ঘরের বৌয়ের যতটা বুদ্ধির দরকার বিধাতা অসতর্ক হ'য়ে আমাকে তার চেয়ে অনেকটা বেশী দিয়ে ফেলেছেন, সে এখন আমি ফিরয়ে দিই কাকে? তোমরা আমাকে মেয়ে জ্যাঠা ব'লে গাল দিয়েছ, কটু কথাই হচ্ছে অক্ষমের সান্ত্বনা—অতএব সে আমি ক্ষমা করলুম।' আবার—'কুষ্ঠরোগীকে কোলে করে তার স্ত্রী বেশ্যার বাড়ীতে নিজে পৌঁছে দিয়েছে সতী সাধ্বীর সেই দৃষ্টান্ত তোমাদের মনে জাগছিল; জগতের মধ্যে অধমতার, কাপুরুষতার এই গল্পটী প্রচার করে আসতে তোমাদের পুরুষের মনে আজ পর্য্যন্ত একটুও সঙ্কোচ বোধ হয় নি।'

এই স্ত্রীই রবীন্দ্র বাবুর আদর্শ স্ত্রী!

রবীন্দ্র বাবু কখনও সীতাকে রূপক বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন; আবার কখনও কোনও পাত্রের মুখে তাঁহার পাতিব্রত্যের গ্লানিকর উক্তি সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। আমরা প্রবন্ধান্তরে তাঁহার গল্পগুলির বিশ্লেষণ করিয়া এ সমস্ত আরও বিশদভাবে দেখাইব। এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে এই উদাহরণগুলিই যথেষ্ট।

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র ১৩২১ সালের মাঘ মাসের সাহিত্য-সংহিতায় প্রকাশিত তাঁহার আর এক অভিভাষণে রবিবাবুর এই 'কালাপাহাড়ী' চেষ্টার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। আলোচ্য অভিভাষণেও তিনি রবীন্দ্র বাবুর 'ঘরে বাইরে' নামক উপন্যাস হইতে কয়েকটী স্থল উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে, রবীন্দ্র বাবুর এই হিন্দুবিদ্বেষ এখনও তিরোহিত হয় নাই। রবীন্দ্রবাবুর মতে হিন্দুশাস্ত্রোক্ত বিধান সকল মনুষ্যত্ববিকাশের প্রধান অন্তরায়। তাঁহার মতে হিন্দু সমাজ 'চারি দিক্ থেকে আমাদের মেয়েদের মনকে যেন ছোট ক'রে বাঁকিয়ে রেখে দিয়েছে।' নবকুমারের ভাষায় বলিতে গেলে, রবীন্দ্রবাবুর মতে পতিভক্তি একটী 'অশ্বডিম্ব'। স্বামী ও স্ত্রী স্বস্বপ্রধান, স্বামী স্ত্রীর নিকট ভক্তির দাবী

করিতে পারে না, স্ত্রীও যে স্বামীকে ভক্তি করিবে, এমন কোনও ধরাবাঁধা নিয়ম থাকিতে পারে না। উপরে যাহা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতে রবীন্দ্র বাবুর এই মত স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়।

মহারাজ ইহারই প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন—'সমাজস্থিতির প্রধান সহায় দাম্পত্য প্রেম ও পতিভক্তির অত্যুন্নত আদর্শকে এইরূপে ক্ষুণ্ণ করার মার্জ্জনা আছে বলিয়া মনে হয় না।' নবকুমার ইহাতে চটিয়া লাল হইয়াছেন। তিনি কতকগুলি 'আবোল তাবোল' বকিয়াছেন। জয়দেব 'দেহি পদপল্লব-মুদারম্' বলিয়া 'পুরুষোত্তমকে দিয়ে নারীর পায়ে ধরিয়েছেন; ভগবান্‌কে মানুষের অধম প্রতিপন্ন করেছেন; কারণ মনু-শাসিত সনাতনধর্ম্মী মানুষ স্ত্রীর কাছে পূজো দাবী ক'রে থাকে, আর জয়দেব শ্রীকৃষ্ণকে দিয়ে স্ত্রীর (?) পাদপদ্ম মাথায় ধরিয়েছেন।' 'শক্তির যিনি ইষ্টদেবী তিনি পতির বুকে পা রেখেচেন, আর বৈষ্ণবের জপের মন্ত্রে আগে রাধা, তার পরে কৃষ্ণ।' [(?) এই চিহ্নটি আমাদের প্রদত্ত নহে। নবকুমার এই চিহ্ন দ্বারা ইঙ্গিতে জানাইতেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ পরস্ত্রী-গামী, কারণ রাধা ত কৃষ্ণের স্ত্রী নহেন।]

এ কথার নিষ্কর্ষ এই যে, রবি বাবুও যে দোষে দোষী, জয়দেব প্রভৃতি কবিরাও সেই দোষে দোষী। এ যুক্তির উত্তর দিতেও ঘৃণা বোধ হইতেছে! যে বৈষ্ণব কবি কৃষ্ণের মস্তকে রাধার পাদপদ্ম দিয়াছেন, সেই বৈষ্ণব কবি কৃষ্ণেরই জন্য রাধাকে সর্ব্বত্যাগিনী করিয়াছেন। রাধাকৃষ্ণ দুয়ে এক, একে দুই। তোমার রবি বাবুর বিমল-নিখিলেশের মধ্যে কি এ সম্বন্ধ আছে? ইচ্ছা করিয়া ন্যাকা সাজিলে চলিবে না। বৈষ্ণব কবি রাধাকৃষ্ণপ্রেমের বর্ণন-প্রসঙ্গে স্ত্রীকে কুলটা হইবার পরামর্শও দেন নাই, পুরুষোত্তমের অবমাননাও করেন নাই। এ কথা নবকুমার বুঝিতে না পারেন, কিন্তু তাঁহার গুরু রবীন্দ্রনাথ বুঝেন, অন্ততঃ একদিন বুঝিতেন। গৌরী মহাদেবকে পতি পাইবার জন্য কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। মহাদেব গৌরীর পতিভক্তি পরীক্ষা করিবার জন্য ব্রাহ্মণ বটুর বেশ ধরিয়া গৌরীর নিকট গিয়া শিবনিন্দা আরম্ভ করিলেন।

'ন কেবলং যো মহতোপভাষতে
শৃণোতি তস্মাদপি যঃ স পাপভাক্।'

বলিয়া বিরক্ত হইয়া গৌরী যখন সে স্থান ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন, তখন মহাদেব নিজ-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বলিলেন—

'অন্ত প্রভৃত্যবনতাঙ্গি তবাস্মি দাসঃ'।

নবকুমার ভিন্ন কেহ বলিবেন না, কালিদাস এখানে মহাদেবকে 'মানুষের অধম প্রতিপন্ন করেছেন।'

কালী শিবের বুকে পা দিয়াছেন—ফলে শাক্ত কবির ভক্তি-প্রস্রবণ ছুটিয়াছে। এ পর্য্যন্ত কেহ বলিতে পারেন নাই যে, শিবকে ছোট করিবার জন্যই এই কল্পনা। হিন্দুর দৃষ্টিতে ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া এ সকলের তাৎপর্য্য বুঝিতে হয়।

রবীন্দ্রনাথের অনুচরেরা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, রবীন্দ্রনাথের পাত্র-পাত্রীদিগের উক্তিকে তাঁহার নিজের উক্তি মনে করিয়া তাঁহার প্রতি দোষারোপ করা অন্যায়। কোনও শিক্ষিত লোক যে এ কথা বলিতে পারেন, ইতঃপূর্ব্বে আমরা তাহা ভাবিতে পারি নাই। গ্রন্থ গ্রন্থকারের মনের মুকুর-স্বরূপ। গ্রন্থ হইতে গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারা যায়। সেক্ষপীয়রের রচিত প্রায় সমস্ত গ্রন্থই নাটক। তাহাতে কেবল পাত্রপাত্রীদিগের উক্তিই আছে। কিন্তু সেক্ষপীয়রের পাত্রপাত্রীদিগের উক্তিকে অবলম্বন করিয়াই ডাউডেন প্রভৃতি মনস্বিগণ তাঁহার প্রতিভার ক্রমবিকাশ দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন; এমন কি, সেই সকল উক্তি হইতেই কবির জীবনচরিতের উপাদানও সংগৃহীত হইয়াছে। রবীন্দ্র-ভক্তদিগের যুক্তি মানিয়া লইতে হইলে ইঁহাদের চেষ্টাকে পণ্ডশ্রম বলিতে হয়। নবকুমার ন্যাকামি করিয়া বলিয়াছেন যে, লক্ষ্মণের মুখে বাল্মীকি যে সকল কথা দিয়াছেন, তাহা কবির নিজোক্তি বলিয়া ধরিয়া লইলে, তিনি লক্ষ্মণকে পিতৃঘাতী হইতে পরামর্শ দিয়াছেন, বুঝিতে হয়। বাল্মীকির রামায়ণ পড়িয়া এ পর্য্যন্ত কাহারও এ সন্দেহ হয় নাই। সমস্ত গ্রন্থ পাঠ করিলে গ্রন্থকারের সহানুভূতি কোন্ দিকে, তাঁহার উদ্দেশ্যই বা কি, অতি সহজেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। বাল্মীকি উদ্ধত লক্ষ্মণের মুখে যে উক্তি সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, ধীর রামের মুখ দিয়া তাহার অযৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। রবীন্দ্র বাবুর 'স্ত্রীর পত্র' প্রভৃতি গল্পগুলি পাঠ করিলে তাঁহার সহানুভূতি কোন্ দিকে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। নবকুমারও যে তাহা বুঝেন, তাহা তাঁহার 'পতিভক্তির অশ্বডিম্বে'ই সুপ্রকাশ। তবে গত্যন্তর না দেখিয়া তিনি ন্যাকা সাজিয়াছেন।

রবি বাবু স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যে সাম্যের কথা বলিয়াছেন, তাহা যেন 'suffragette'দের ঈপ্সিত সাম্য। হিন্দুর 'অর্দ্ধনারীশ্বর' ও 'অর্দ্ধাঙ্গিনী' প্রভৃতির অন্তর্নিহিত সাম্যভাবের সহিত ইহার কোনও সম্পর্ক নাই।

আর এক কথা নবকুমারকে বলিয়া রাখি—'মনু-শাসিত সনাতনধর্ম্মী মানুষ' স্ত্রীর কাছে যেমন 'পূজো দাবী করে থাকে', স্ত্রীকেও তেমনই 'পূজো' করিয়া থাকে। 'মনু-শাসিত' ধর্ম্মেই বলে—

'যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥
সন্তুষ্টো ভার্য্যয়া ভর্ত্তা ভর্ত্রা ভার্য্যা তথৈব চ।
যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈ ধ্রুবম্॥'

হিন্দুর স্ত্রী ভোগের সাধনমাত্র নহেন, তিনি সহধর্ম্মিণী। স্ত্রী না হইলে যে হিন্দু গৃহস্থের ধর্ম্ম চলে না। হিন্দু কি সহধর্ম্মিণীকে অবজ্ঞা করিতে পারেন? হিন্দুর পূর্ব্বপুরুষের জলগণ্ডূষপ্রাপ্তির একমাত্র উপায় ধর্ম্মপত্নী। এ ধর্ম্মপত্নী আদরের ও পূজার সামগ্রী। যাঁহারা পাতিব্রত্য ধর্ম্মকে অশ্বডিম্ব বলিয়া বুঝেন, তাঁহাদিগকে হিন্দুর দাম্পত্য-জীবনের রহস্য বুঝাইতে যাওয়া বিড়ম্বনামাত্র। আধুনিক শিক্ষা ও সভ্যতার বিষময় ফলে হিন্দুসন্তান প্রাচীন উচ্চ আদর্শ হইতে দিন দিন দূরে যাইয়া পড়িয়া নানাবিধ অশান্তি ভোগ করিতেছে। ঘরের ছেলেকে ঘরে ফিরাইয়া আনাই মহারাজের উদ্দেশ্য। তোমরা তাঁহার এই উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করিয়া আপনাদের ও সেই সঙ্গে দেশের অকল্যাণ ডাকিয়া আনিতেছ।

শ্রীসরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রাচীন শিল্প-পরিচয়।

গোমেদ।

হিমালয় পর্ব্বতে অথবা সিন্ধুপ্রদেশে গোমেদ মণির উৎপত্তি হয়। স্বচ্ছকান্তি, তুলনায় গুরু, স্নেহোদ্‌গারিরূপে প্রতিভাত, সুস্পষ্টবর্ণ, ঔজ্জ্বল্যযুক্ত, শুভ্রবর্ণ ও পিঞ্জরবর্ণ ভাগ্যপ্রদ মণি গোমেদ নামে অভিহিত হয়। গোমেদ মণিরও চারি প্রকার জাতি আছে। ব্রাহ্মণ শুক্লবর্ণ, ক্ষত্রিয় রক্তবর্ণ, বৈশ্য ঈষৎ-পীতবর্ণ, এবং শূদ্র নীলবর্ণ। ইহার শ্বেত, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণ, এই চারি প্রকার ছায়া হইয়া থাকে।

হীরকের যে সমস্ত দোষ কথিত হইয়াছে, গোমেদ মণিতেও সেই সকল দোষ

সম্ভবে। অতএব রত্নশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক অগ্নিতে অথবা শানে উহার পরীক্ষা কর্ত্তব্য। শিল্পিগণ স্ফটিকের দ্বারাই গোমেদ মণির নকল করিয়া থাকে। (১)

স্ফটিক।

স্ফটিকের উৎপত্তি সম্বন্ধে পৌরাণিক বর্ণনা হইতে জানা যায়, কাবের, বিন্ধ্য, যবন, চীন ও নেপাল, এই কয় প্রদেশে লাঙ্গল (বলদেব) দানবের মেদ নিক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন। তাহা হইতেই আকাশের মত বিশুদ্ধ তৈলাখ্য স্ফটিক উৎপন্ন হইয়াছে। স্ফটিকের বর্ণ মৃণালের ও শঙ্খের মত ধবল, এবং ইহাতে বর্ণান্তরেরও কিঞ্চিৎ সম্পর্ক থাকে। (গরুড়পুরাণ; পূর্ব্বভাগ; ৭৯।৫—৩)

যুক্তিকল্পতরুতে ইহার অনেক প্রকার বর্ণের এবং বর্ণবিশেষানুসারে নামান্তরের পরিচয় পাওয়া যায়। যথা,—হিমালয়ে, সিংহলে ও বিন্ধ্য পর্ব্বতের তটপ্রদেশে নানারূপ স্ফটিক উৎপন্ন হইয়া থাকে। তন্মধ্যে হিমালয়জাত চন্দ্র-সদৃশ স্ফটিক দুই প্রকার; এক শ্রেণী চন্দ্রকান্ত নামে ও অপর শ্রেণী সূর্য্যকান্ত নামে অভিহিত হয়। যাহা সূর্য্যকিরণসম্পর্কে ক্ষণকালমধ্যে বহ্নি বমন করে, তাহা সূর্য্যকান্ত নামে অভিহিত হয়; এবং যাহা হইতে পূর্ণচন্দ্রকরস্পর্শমাত্রে জলস্রাব হয়, তাহা চন্দ্রকান্ত নামে কথিত হয়। কলিযুগে এই মণি দুর্লভ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। বিন্ধ্য পর্ব্বতের তটদেশে অশোকপল্লবের মত ও দাড়িম্বীজের মত মন্দকান্তি (অনুজ্জ্বল) স্ফটিক উৎপন্ন হয়। সিংহল দেশে গন্ধনীলের আকার কৃষ্ণবর্ণ স্ফটিক উৎপন্ন হয়।

পদ্মরাগ মণির আকরে দুই প্রকার স্ফটিক সঞ্জাত হয়। যাহা অত্যন্ত নির্ম্মল, অথচ যেন বিশুদ্ধ জলস্রাব করিতেছে বলিয়া প্রতিভাত হয়, এবং যাহাতে জ্যোতির বাহুল্য পরিলক্ষিত হয়, তাহা 'জ্যোতিরস' নামে কথিত হয়। আবার এই জাতীয় পাষাণই যদি লোহিতবর্ণ হয়, তবে 'রাজাবর্ত্ত' নামে, এবং ঈষন্নীলবর্ণ হইলে 'রাজময়' নামে কথিত হয়। যাহা ব্রহ্মসূত্রময় (যজ্ঞোপবীতের মত), তাহা ব্রহ্মসূত্র নামে অভিহিত হয়।

বলক্ষঃ পিঙ্গলো ধক্তো গোমেদ ইতি কীর্ত্তিতঃ।
চতুর্ধা জাতিভেদস্তু গোমেদেঽপি প্রকাশ্যতে।
ব্রাহ্মণঃ শুক্লবর্ণঃ স্যাৎ ক্ষত্রিয়ো রক্ত উচ্যতে।
আপীতো বৈশ্যজাতিস্তু শূদ্রস্তু নীল উচ্যতে।

---

(১) হিমালয়ে বা সিন্ধৌ বা গোমেদমণিসম্ভবঃ।
স্বচ্ছকান্তি গুরুঃ স্নিগ্ধো বর্ণাঢ্যো দীপ্তিমানপি।

ছায়া চতুর্ব্বিধা শ্বেতা রক্তা পীতাঽসিতা তথা।
যে দোষা হীরকে জ্ঞেয়া স্তে গোমেদমণাবপি॥
পরীক্ষা বহ্নিতঃ কার্য্যাঃ শানে বা রত্নকোবিদৈঃ।
স্ফটিকেনৈব কুর্ব্বন্তি গোমেদপ্রতিরূপিণম্॥—যুক্তিকল্পতরু।

অয়স্কান্ত।

যাহা দূর হইতে লৌহকে অতি সত্বর আকর্ষণ করে, তাহা 'অয়স্কান্ত' নামে কথিত হয়। যুক্তিকল্পতরু গ্রন্থে কথিত হইয়াছে,—ইহার দুই প্রকার ভেদ দৃষ্ট হয়। যাহা নীলবর্ণ ও মসৃণ, তাহা উত্তম, এবং যাহা খর্খরে ও পিঙ্গলবর্ণ, তাহা নিকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

রত্নের আরও অনেক প্রকারভেদ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু শিল্পের সহিত তাহাদের বিশেষ সম্পর্ক নাই। অতএব এ স্থলে তাহাদের উল্লেখ অনাবশ্যক।

কৃত্রিম পদ্ধতি।

বর্ত্তমান সময়ে যেমন খাঁটীর সঙ্গে সঙ্গেই নকলের আবির্ভাব দেখা যায়, পূর্ব্বকালেও তেমনই নকল চলিত। গরুড়পুরাণে কথিত হইয়াছে যে, নিপুণ মানবগণ লৌহ, পুষ্পরাগমণি, বৈদূর্য্যমণি, স্ফটিক ও নানারঙ্গের 'কাচ', এই সকল বস্তুর দ্বারা হীরকের নকল করিয়া থাকে; অতএব বিদ্বান ব্যক্তিগণ পরীক্ষকের দ্বারা সেই সকল রত্নের পরীক্ষা করিবেন।

সেকালে কৃত্রিমতা কেবল হীরকেই সীমাবদ্ধ ছিল না; মুক্তা প্রভৃতি বহুমূল্য প্রত্যেক রত্নেরই নকল হইত। সুতরাং রত্ন চিনিবার জন্য 'রত্ন-পরীক্ষা' নামক বিদ্যাও উদ্ভাবিত হইয়াছিল।

প্রসঙ্গক্রমে ইহাও বক্তব্য যে, নকল-পদ্ধতি সমাজের একটি বিশেষ সৌখীন অবস্থার নিদর্শন বলিয়া মনে হয়। ইহাতে শিল্পীর উদ্ভাবনী শক্তির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

খাঁটী হীরা মুক্তার গহনা পরা সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। অথচ সমৃদ্ধের সাজসজ্জা বিলাসোপকরণ প্রভৃতি দেখিয়া নিঃস্ব বিলাসীর অন্তরে ভোগতৃষ্ণার সঞ্চার জগতের নৈসর্গিক নিয়ম। একমাত্র প্রতিভাবান শিল্পীই সেই প্রবল বাসনা পূর্ণ করিতে সমর্থ। সে প্রতিভাবলে আসলের অনুকরণে নকলের সৃষ্টি করিয়া তদ্দ্বারা গরীবের বাসনা পূর্ণ করিয়া থাকে।

অধুনা স্বর্ণাভরণধারণে অসমর্থ দরিদ্র-পরিবারের অঙ্গে 'কেমিকেলের' গহনা

শোভা সম্পাদন করিয়া থাকে। নকল হীরার আংটী পরিয়া অনেক গরীব বিলাসী সখ মিটাইতে সমর্থ হয়। পূর্ব্বকালেও এই রীতির অভাব ছিল না।

কবি বলিয়াছেন,—

অকাঞ্চনেঽকিঞ্চন নায়িকাঙ্গকে
কিমারকূটাভরণেন ন দ্যুতিঃ ॥

ইহার অর্থ এই, যে দরিদ্র মহিলার অঙ্গে স্বর্ণাভরণ নাই, পিত্তলের গহনায় কি তাঁহার শোভা হয় না ?

দরিদ্রের উপভোগার্থ উদ্ভাবিত নকল জিনিস ক্রমে বঞ্চকের হাতে পড়িয়া আসলের স্থানও অধিকার করে। তখনই আসল নকলের পরীক্ষার আবশ্যকতার সৃষ্টি ও তদুপযোগী বিবিধ উপায়েরও উদ্ভাবন হয়।

শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ।

অপয়া মেয়ে।

দারুণ বর্ষা। তাহাতে পল্লীগ্রাম। ঘাটের পথের দুই ধারে ঘন বেতের বন। পথে এক হাঁটু কাদা। কাদার মাঝে মাঝে দুই একখানি ইট পাতা। সেই পথ দিয়া রায়েদের বাড়ীর নূতন বৌ পিতলের কলসী কাঁখে লইয়া ঘাটে জল আনিতে যাইতেছে। পিছনে তাহার ছোট ননদ অলকা বধূর রক্ষী হইয়া চলিয়াছে।

বৌটীর নাম চিন্ময়ী। বাপের বাড়ীতে তাহাকে সকলে 'চিনু' বলিয়া ডাকিত। এখানে আসিয়া অবধি তাহার যে কোনও নাম আছে, সে কথা সে ভুলিয়াই গিয়াছে। শুধু তাই নয়, সে যে কোনও দিন কোমরে কাপড় বাঁধিয়া ছুটাছুটী করিত, সঙ্গী ও সঙ্গিনীদের সহিত জল-ডিঙ্গাডিঙ্গী খেলা করিত, ভাত খাইবার সময় মনের মত তরকারী না হইলে পা ছড়াইয়া কাঁদিতে বসিত, সন্ধ্যা হইতে না হইতেই ঘুমে ঢুলিয়া পড়িত, মা অনেক করিয়া জাগাইলে নিদ্রাজড়িতনেত্রে মার গল্প শুনিতে শুনিতে মায়ের হাতে ভাত খাইত, সে সকল কথাও সে যেন ভুলিয়া গিয়াছে। আজ এক বৎসর হইল, সে শ্বশুরবাড়ী আসিয়াছে। এক বৎসরে 'দস্যি' চিনু কি শান্ত শিষ্ট নূতন বৌ হইয়াছে, চিনুর মা দেখিলেও হয় ত তাহা বিশ্বাস করিতে পারিতেন না।

চিন্ময়ী আজ স্নান করিতে আসিবার সময় বাড়ীতে শুনিয়া আসিয়াছে, আজ

পাঁচুই শ্রাবণ। গত বৎসর পাঁচুই শ্রাবণ তাহার বিবাহ হইয়াছে। ঘাটের পথে চলিতে চলিতে তাহার সেই কথাই মনে হইতেছিল। বিবাহের পর এই এক বৎসর সে আর বাপের বাড়ী যাইতে পায় নাই। কারণ, রায়েদের বাড়ীর বৌ বাপের বাড়ী পাঠানো নিয়ম নয়। তবে যাহারা বড়মানুষের মেয়ে, অথবা যাহাদের স্বামী কিছু স্বাধীনভাবাপন্ন হইয়া রায় পরিবারের বনিয়াদী চালের ততটা খাতির রাখিতে ইচ্ছুক নহেন, সেই সকল বধূদেরই মাঝে মাঝে ভাগ্য প্রসন্ন হয়। কিন্তু চিন্ময়ীর মা বিধবা ও দুঃখিনী; তাঁহার এমন কি ক্ষমতা যে, তিনি রায়বাড়ীর বধূকে লইয়া যাইবেন?

বিবাহের দিনের কথা মনে করিয়াই চিন্ময়ীর দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিয়াছিল। সে মায়ের উদ্দেশে মনে মনে ক্রমাগত বলিতেছিল, 'তা কেন আমার বিয়ে দিলে মা, কেন আমার বিয়ে দিলে?' যে চিনু মা ছাড়া এক দিনও থাকিতে পারিত না, খেলার আমোদে মাতিয়া থাকিয়াও মাঝে মাঝে 'দাঁড়া ভাই, মা কি কর্‌ছে দেখে আসি,' বলিয়া ছুটিয়া বাড়ী আসিত, বিছানায় মা কাছ থেকে একটু সরিয়া গেলে ঘুমের ঘোরে বিছানা হাতড়াইত, সেই চিনু এক বৎসর মাকে দেখে নাই। এই এক বৎসর কি করিয়া গিয়াছে, সে কেবল তার প্রাণই জানে।

যখন চিনু ছোট ছিল, বিয়ে হইয়া মেয়েরা শ্বশুরবাড়ী যায়, এই কথা শুনিলেই তাহার আতঙ্ক হইত। তাহার জ্যাঠতুতো ও খুড়তুতো বোনেদের বিবাহের সময় কন্যা-বিদায় দেখিয়া তাহার সেই ভয় আরও বাড়িয়া গিয়াছিল। এমন কি, পথে বাজনা শুনিয়া 'বর আস্‌ছে' বলিয়া যখন ছেলে মেয়েরা ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিত, চিনু তখন মায়ের আঁচল মুঠা করিয়া ধরিয়া মায়ের কাছ ঘেঁসিয়া দাঁড়াইত, যেন তাহাকেই কে তাহার মায়ের কোল হইতে কাড়িয়া লইতে আসিতেছে। মা মেয়ের এই ভাব দেখিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারিতেন না। অন্য সকলে ত বিষম অসন্তুষ্ট হইতেন। চিনুর জ্যাঠাইমা উঠিতে বসিতে তাহাকে 'মা-আদুরে মেয়ে' বলিয়া গঞ্জনা দিতেন, চিনুর মাকেও বলিতেন, 'ছোট বৌ, ধেড়ে মেয়ে হল, কতদিন আর অমন আঁচল-ধরা করে রাখ্‌বি? মেয়ে কি পরের ঘরে পাঠাতে হবে না?'

মেয়ে ছেলে, পরের ঘরে দিতেই হইবে!—উপায় নাই, উপায় নাই! দুঃখিনীর একমাত্র সম্বল, বুকের ধন, তাহাকে বুকে রাখিবার উপায় নাই। চিনুর মা বুঝিতেন, বুঝিয়া নিঃশ্বাস ফেলিতেন। কিন্তু অবুঝ মেয়েকে সে কথা কেমন করিয়া বুঝাইবেন? লোকে দেখিতেছে, চিনু বড় হইয়া গিয়াছে, কিন্তু মা

তাহার শিশুতা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছেন। যে নিজে বুঝে না, কেমন করিয়া তাহাকে বুঝান যায় যে, 'তুই এখন বড় হইয়াছিস্ ?'

চিনু জ্যাঠাইমার দুই চক্ষের বিষ ছিল। তাহার কারণ, চিনু বড় অপয়া মেয়ে। তাহার জন্মের এক বৎসরের মধ্যেই প্রথমে তাহার জ্যাঠামহাশয়ের ও পরে তাহার পিতার মৃত্যু হয়। সঙ্গে সঙ্গে চক্‌বন্দী পরগণাও বাকী খাজনার দায়ে বিক্রয় হইয়া যায়। চিন্ময়ীর জ্যাঠামহাশয় বলিতেন, চক্‌বন্দী পরগণা আমার লক্ষ্মীর আড়ি। সেই চক্‌বন্দী পরগণা বিক্রয় হইয়া যাইবার পর সংসারের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া উঠিল, এক সঙ্গে দারিদ্র্য ও মৃত্যু সংসারে প্রবেশ করিয়া সাজানো সংসার ভাঙ্গিয়া দিয়া গেল। চিন্ময়ীই যে এই আকস্মিক অবস্থা-পরিবর্ত্তনের একমাত্র হেতু, সে বিষয়ে আর কাহারও সন্দেহ রহিল না! সেই অবধি 'অপয়া মেয়ে' বলিয়া চিন্ময়ীর একটা খ্যাতি হইয়া গিয়াছে। সে খ্যাতি লোকমুখে তাহার শ্বশুরবাড়ী পর্য্যন্ত আসিয়া পঁহুছিয়াছে।

বহু দূরে পল্লীগ্রামে, বিশেষতঃ উভয় পক্ষই পিতৃহীন বলিয়া বাহাদুরপুরে বিবাহ দিতে চিন্ময়ীর মায়ের মন সরিতেছিল না; কিন্তু সকলের মুখেই শুনিলেন, এমন সম্বন্ধ আর পাওয়া যাইবে না। ঘর বর দুই সমান। মেয়ের বহুভাগ্যে এমন সম্বন্ধ জুটিয়াছে। চিন্ময়ীর কাকা হরিশ চক্রবর্ত্তী স্পষ্টই বলিয়া দিলেন, 'এই বিবাহের সম্বন্ধে যদি মেজ বধূঠাকুরাণীর অমত থাকে, তবে আমি আর চিনুর বিবাহ সম্বন্ধে কিছুই করিব না। তিনি চিন্ময়ীকে লইয়া বাপের বাড়ী গিয়া মনের মত পাত্র স্থির করিয়া যেন বিবাহ দেন।'

ইহার পরে আবার যখন মেজ ঠাকুরঝি আসিয়া ফুস্ ফুস্ করিয়া চিনুর মার কানের কাছে বলিলেন, 'মেজ বৌ! কর্‌ছিস্ কি? রাজার ঘর থেকে মেয়ের সম্বন্ধ এসেছে, পাড়াগাঁ বলে কি এমন সম্বন্ধ ছাড়ে? একটু দূর বটে, তা বলে আর কি কর্‌বি? মেয়ে ত সুখে থাক্‌বে, তুই না হয় চোখে নাই দেখ্‌বি।' তখন আর মেজবৌ কোনও আপত্তি করিতে পারিলেন না।

বিবাহের সময় জামাই দেখিয়া চিনুর মার মনের সকল দুঃখ ঘুচিয়া গেল। কি সুন্দর বর! দেখিতে যেমন সুন্দর, হাসিটীও তেমনই মিষ্ট। বিবাহমণ্ডপে সকলে বর দেখিয়া ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। বাসরঘরে চিনুর শান্তিপুরের ঠাকুমা তাহার মুখের ঘোমটা খুলিয়া দিয়া যখন বলিয়াছিলেন, 'ওলো! দ্যাখ্ লো দ্যাখ্, কেমন রাঙ্গা বর পেয়েছিস্!' চিনুও চকিতের মত তখন একবার বরের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিয়াছিল যে, সত্যই রাঙ্গা বর কি না!

আজ ঘাটের পথে চিনুর সেই সমস্ত কথাই মনে হইতেছিল। যাহার সঙ্গে তাহার বিবাহ হইয়াছিল, তাহার সঙ্গে সেই বিবাহ পর্য্যন্তই সম্বন্ধ, তার পরে আর চিনু তাহাকে চোখে দেখে নাই; তাহার কথা এখন আর চিনুর বড় একটা মনে নাই। এখন রাত্রে শুইতে যাইবার সময় সে ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া শোয়,—'হে ঠাকুর! খুব ভোরে যেন উঠ্‌তে পারি।' ঘাটে যাইবার সময় ঠাকুরকে মনে মনে বলে, 'হে ঠাকুর, পিছল পথে যেন ঘড়া নিয়ে পড়ে না যাই।' রাঁধিতে যাইবার সময় উনুন প্রণাম করিয়া রাঁধিতে বসে, 'হে ঠাকুর, ব্যান্নুনে যেন আমার নুন না বেশী হয়।' তাহার ক্ষুদ্র মনটী এখন কেবল এই সকল চিন্তাতেই পরিপূর্ণ থাকে। কখনও কখনও কাযের অবসরে চকিতের মত যখন এক বৎসরের পূর্ব্বের কথা স্মরণ হয়, তখন তাহার বুকের মধ্যে কান্নার ঢেউ ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে থাকে,—'ওগো মাগো মা, কবে তোর কাছে যাব মা!'

চিনু ঘাটে নামিয়া ঘড়া মাজিয়া ঘড়া জলে ডুবাইয়া রাখিল,—পাছে ঘড়া ভাসিয়া যায়। চিনু একটু মাথায় ছোট, ঘড়াটীও একটু বড়, এই জন্য প্রথম প্রথম ঘড়া কাঁখে করিয়া জল আনিতে তাহাকে মাঝে মাঝে আছাড় খাইতে হইত। আজকাল অনেকটা অভ্যাস হইয়া গিয়াছে।

ঘাটের উপর অলকা চিনুর পাহারা হইয়া বসিয়া আছে। চিনু একবার সভয়ে তাহার দিকে চাহিল। জলে ডুব দিবার সময় ঘড়া উপুড় করিয়া লইয়া ঘড়াটীকেও ডুবাইতে হইবে, নিজেও সেই সঙ্গে ডুবিতে হইবে, এখানে স্নানের এইরূপ নিয়ম। এইরূপ স্নান না করিলে স্নান শুদ্ধ হইবে না। ডুবিতে গিয়া যদি মাথা কি কাপড় ভাসিয়া উঠে, সেই বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবার জন্য অলকা ঘাটে বসিয়া পাহারা দিত। এই ঘড়া লইয়া ডুব দেওয়া চিনুর বড়ই কঠিন বলিয়া বোধ হইত। হয় ত ঘড়া ভাসিয়া উঠিত, নয় ত তাহার মাথা ভাসিয়া উঠিত। সেই জন্য অলকা একটু অন্যমনস্ক হইলে সে তাড়াতাড়ি ডুব দিয়া উঠিয়া পড়িত।

অলকা অন্যমনস্কভাবে একটা মাছরাঙ্গা পাখী কেমন জলের উপর ছোঁ মারিতেছে, একমনে তাহাই দেখিতেছিল। চিনু দেখিয়া ভরসা পাইয়া তাড়াতাড়ি ডুব দিয়া উঠিয়া জল হইতে ঘড়া তুলিয়া লইল। সে ঘড়ার জল ফেলিয়া দিয়া যেমন ঘড়া ডুবাইয়া জল ভরিতেছে, অমনই অলকার চমক ভাঙ্গিল। অলকা বলিল, 'ও কি বৌঠাকুরাণী, ঘড়া নিয়ে তো ডুবলেন না, আমি বুঝি দেখি নি? দাঁড়ান, বাড়ী গিয়ে মাকে – বড় মাকে সব বলে দেব।'

চিনু ভয়ে কাঁটা হইয়া গেল ; বলিল, 'লক্ষ্মী ভাই, বলো না ভাই, আমি ভুলে গিয়েছিলাম, এই ডুব দিচ্ছি।'

'না যদি বলে দি, আমাকে কি দেবেন ? আমাকে আপনার সেই মুক্তা দেওয়া মাথার জালটা দেবেন ?'

জালটী চিনুর মায়ের নিজের হাতের তৈরী। চিনুর চোখে জল আসিল। চোখের জল মুছিয়া বলিল, 'দেব ভাই, দেব, তুমি বলে দিও না।'

'আচ্ছা, তবে আবার ঘড়া নিয়ে ডুব দিন। ওই মাথা উঠেছে, হ'ল না। আবার ডুব দিন। ওই কাপড় ভাস্‌লো। কাপড় শক্ত করে ধরে ডুব দিন না কেন ? আপনি কিছুই জানেন না! তাই ত সকলে আপনাকে সহরের মেয়ে বলে মুখ করে।'

'অলি লো অলি ! কি কচ্ছিস্ ?' বলিয়া অলকার এক সই কলসী লইয়া ঘাটে আসিয়া দেখা দিল। চিনু বুঝিল, অলকা আর বাড়ী ফিরিবে না। সকাতরে বলিল, 'ঠাকুরঝি, ভাই, আমাকে একটু এগিয়ে দিয়ে এস, আমি একলা যেতে পার্‌বো না।'

'উঃ, একলা যেতে পার্ব্বেন না ! দিনের বেলায় বেত বন থেকে ভূত এসে ধরে খাবে নাকি ? আপনি বলতে বলতে যান্—

ভূত আমার পুত, পেত্নী আমার ঝি,
রাম লক্ষ্মণ বুকে আছে, ভয়টা আমার কি ?'

শুনিয়া, দিনের বেলা হইলেও, চিনুর বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করিতে লাগিল। দু'ধারে বেতের ঝাড়, মাঝখানে সরু পথ, কি জানি যদিই ভূত দেখা যায় !

অলকার সই চিনুর মুখের দিকে চাহিয়া দয়ার্দ্র হইয়া বলিল, "যা না লো অলি, বৌ-ঠাকুরুণকে বাড়ী রেখে আয়। কিন্তু যাবি আর আসবি, নইলে ভাই আমি ঘাটে থাক্‌বো না।'

৩

বাহাদুরপুরে রায়েদের এককালে রাজার মত সম্ভ্রম ও ঐশ্বর্য্য ছিল। এখন ক্রমশঃ হীন ভগ্নাবস্থা হইয়া আসিয়াছে। ভগ্নাবশেষ অট্টালিকা ও বনিয়াদী চালচলন কেবল পূর্ব্বকালের লুপ্ত গৌরবের সাক্ষিস্বরূপ রহিয়াছে।

বড় তরফ, মধ্যম তরফ ও ছোট তরফ, তিন সরিকের বাড়ী একেবারে গায়ে গায়ে লাগালাগি। তিন সরিকের বাড়ী একই রকম গঠনের চকমিলান দ্বিতল অট্টালিকা। ভূমিকম্প ও মেরামতের অভাবে অট্টালিকার অনেক অংশই অব্যবহার্য্য

ইষ্টকস্তূপে পরিণত হইয়াছে। যে কয়েকটী কোঠা ঘর এখনও ব্যবহারের যোগ্য আছে, তাহা এখন কোনরূপে ব্যবহার করা চলিতেছে। কিন্তু দুই চারি বর্ষা বেমেরামত থাকিলে তাহাও আর জীর্ণ দেহ খাড়া করিয়া রাখিতে পারিবে কি না সন্দেহ। বাড়ী সারাণোর দিকে সরিকদের কাহারই মনোযোগ দেখা যায় না, বরং সকলেই ঘরের অভাব-পূরণের জন্য কাজ-চালানো গোছ খড়ের ঘর তুলিয়া লইতেছেন।

বাড়ীতে নারায়ণশিলা আছেন, এবং নিত্য অতিথিসেবারও ব্যবস্থা আছে। পূর্ব্বে যখন এই পরিবারের সৌভাগ্যসূর্য্য মধ্যাহ্ন-আকাশে বিরাজিত ছিল, তখন প্রতিদিন ঠাকুরবাড়ীতে অন্ততঃ পঞ্চাশ জন অতিথির পাতা পড়িত। এখন অতিথি বড় একটা আসে না, যদি বা আসে, মধ্যাহ্ন-আহারের পর আসিলে তাহার প্রসাদ পাইবার আশা বড় একটা থাকে না। কেন না, যে সরিকের যখন 'সেবার পালি' পড়ে, তখন তিনি ঠাকুরের ভোগের জন্য যতটি চাল মাপিয়া দেন, নিজের সংসারের ততগুলি চাল কম করিয়া লইয়া থাকেন। কাযেই ঠাকুরবাড়ীতে এখন আহূত, অনাহূত, রবাহূত, কোনও প্রকারেরই অতিথি বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না।

তিন পুরুষ পূর্ব্বে সকল সরিকই একত্র ছিলেন। প্রকাণ্ড একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রায় আধখানি গ্রাম জুড়িয়া ছিল। এখন অনেকে বিদেশে গিয়া বাস করিতেছেন, অনেকে বংশহীন, দুই একটী বিধবামাত্র তুলসীতলায় প্রদীপ, দিবার জন্য ভিটা আগলাইয়া পড়িয়া আছেন। আরতির সময় আর এখন কীর্ত্তনধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায় না। পূজারী কোনরূপে ঘণ্টা নাড়িয়া আরতি শেষ করে। রথ দোলে কোনরূপে নিয়মরক্ষা হয়। বড় তরফের দুই সরিক এখন পর্য্যন্ত একান্নবর্ত্তীই আছেন। জ্যেষ্ঠ পরেশ রায় সেকালের সেরেস্তাদার ছিলেন; তিনি প্রায় বিদেশেই থাকিতেন। কনিষ্ঠ ভবেশ বাড়ী থাকিয়া জোত জমা দেখা শুনা করিতেন। পরেশ রায়ের পর পর সাত আটটী সন্তান মৃত্যুমুখে পতিত হইবার পর একমাত্র শিশুপুত্র দেবেশ ও বিধবা পত্নীকে রাখিয়া তিনিও ভগ্নহৃদয়ে পরলোকে প্রস্থান করেন। ভবেশ রায়ের এখন পুত্র কন্যায় সাত আটটী সন্তান। গ্রামের সকলেই তাঁহাকে এক জন বিশেষ বুদ্ধিমান বলিয়া জানে। মামলা মোকদ্দমায় পরামর্শ দিতে তিনি এক জন অদ্বিতীয় ব্যক্তি। ভ্রাতৃজায়াকে সংসারের কর্ত্তৃত্ব দিয়া গৃহে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, এবং ভ্রাতুষ্পুত্র ভবেশকে বিদ্যালাভের প্রয়োজনীয় হেতুবাদে দূরদেশে রাখিয়া, তিনি একরূপ নিজ সংসারের মামলারও নিষ্পত্তি করিয়া লইয়াছেন। উঠিতে বসিতে প্রায়ই ভ্রাতৃজায়াকে শুনাইয়া বলেন, 'এই

ছোঁড়াছুঁড়ীগুলোর কি আর আমি ভরসা রাখি? দেবু আমার বংশের তিলক। যদি সংসার বজায় থাকে, সে কেবল সেই রাখিবে। এগুলো কেবল মাটীর ঢেলা বই ত নয়!'

দেবেশের বিবাহ দিতে তাঁহার খুল্লতাতের বড় একটা ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু ভ্রাতৃজায়া যখন অন্নজল ত্যাগ করিয়া রোদন সম্বল করিলেন, পাড়ার পাঁচ জনে 'ছি ছি' করিতে লাগিল, তখন দেখিয়া শুনিয়া বিধবার কন্যা চিন্ময়ীকেই তিনি মনোনীত করিলেন। অনেকে 'অপয়া মেয়ে' বলিয়া আপত্তি তুলিলে তিনি সে কথা কানেও করিলেন না, বরং দেবেশের ভাগ্যে যাহা অপয়া, তাঁহার ভাগ্যে তাহাই হয় তো পয়া হইতে পারে, এ আশাও তাঁহার অজ্ঞাতসারে তাঁহার মনে হয় ত উদিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু ভাগ্যগুণে বিবাহের পর দেবেশ পরীক্ষায় ফেল হওয়াতে, এবং একটী দুগ্ধবতী গরু মরিয়া যাওয়াতে, চিন্ময়ীর 'অপয়া' নামটী শ্বশুরবাড়ীতে বিশেষ করিয়া রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। দেবেশের মা যখন তখন পাড়া প্রতিবাসী পাঁচ জনের কাছে আক্ষেপ করিতে লাগিলেন, 'ছোট ঠাকুর দেখে শুনে এ কি কুলের ধুচুনী ঘরে নিয়ে এলেন? যা হবার তা ত হল, এখন দেবু আমার প্রাণগতিক কুশলে থাকলে যে বাঁচি।'

সহজেই বুঝা যায় যে, চিন্ময়ী শাশুড়ীর তেমন সুনজরে পড়ে নাই। যত কিছু সংসারের আপদ বালাই 'ছাই ফেলিতে ভাঙ্গা কুলা' চিন্ময়ীর ঘাড়ে গিয়া চাপিত। রান্নাঘরের পাশে পাঁকাটীর গাদার কাছে কৃষাণ তামাক খাইয়া কল্কের আগুন ঢালিয়াছিল, সেই আগুন ক্রমশঃ পাঁকাটীর স্তূপ হইতে রান্নাঘরে ধরিয়া গেল। কৃষাণের তাহাতে বিশেষ কোনও দোষ হইল না, দোষ হইল চিন্ময়ীর! 'ওরে! কি ঘর-পোড়ান বউ ঘরে এনেছে রে!'—খুড়শাশুড়ীর মুখোচ্চারিত হইয়া এই রব পল্লীর প্রত্যেক রমণীর কাণে গিয়া প্রতিহত হইল। সকলেই মুখ চাওয়াচায়ি করিয়া বলিল, 'তাই তো ভাই, কি বউই ঘরে আন্‌লে।' দেশে অজন্মা, তাহাও চিন্ময়ীর দোষ। আর দেবুর যদি কোনও অসুখ হইবার সংবাদ আসিত, তাহা হইলে আর কথাই নাই!

৪

চিনু কলসী কক্ষে লইয়া দুয়ারে পা দিতেই খুড়শাশুড়ী বলিলেন, 'নবাবের মেয়ের এতক্ষণ জল নিয়ে আসা হলো? ঘাটে গিয়েছ ত বাছা সে আজকের কথা নয়, উনুন যে পুড়ে ছাই হয়ে গেল, ছেলেরা ভাত পাবে কখন? সকল ভূঁই মাড়িয়ে পথ চল নাকি?'

চিন্থ নিরুত্তরে কলসী লইয়া রান্নাঘরের দাওয়ায় নামাইয়া রাখিল। যদি পিত্রালয়ে আর এক বৎসর পূর্ব্বে তাহাকে কেহ এইরূপ বলিত, তাহা হইলে সে তখনই হাত মুখ নাড়িয়া উত্তর দিত, 'হাঁ গো হাঁ—সকল ভূঁই মাড়িয়েই ত চলি। চলি ত চলি, তাতে তোমার কি হয়েছে?' কিন্তু এক বৎসরে তাহার স্বভাবের এত পরিবর্ত্তন হইয়াছে যে, এখন হয় ত পিত্রালয়ে গেলেও আর সে আগের মত কথার উত্তর দিতে পারে না।

'অলি কোথায়? সে যে তোমার সঙ্গে ঘাটে গেল, ঘাটের জলেই ডুবে মোলো নাকি? ভাল এক আপদ হয়েছে আমার। সকালে উঠে একবার ছেলেটার নড়া ধরবে, তাও যদি তাকে দিয়ে হয়! কোন্ দিকেই বা আমি কি কর্‌বো, সবই যেন আমারই দায়।'

'কি লো ছোট বৌ, সকাল বেলায় গজ্‌গজ্‌ করে বক্‌ছিস্ কি?' বলিয়া মালা হাতে করিয়া তাঁহার এক জ্ঞাতিসম্পর্কীয়া বিধবা যা আসিয়া উঠানে দাঁড়াইলেন।

'আর বক্‌ছি দিদি! আপনার দুঃখের ধান্দায় মর্‌ছি। বৌমা ত বেলায় স্নান করে বাড়ী ফিরলেন, অলি তো কোন্ চুলোয় গিয়েছে, তার ঠিক নেই। কোলের ছেলেটা যে ধরবে, এমন মনিষ্যি নেই। আবার কাল থেকে বাদ্‌লার মার জর এসেছে, সে আজ আর বাসন মাজতে আসে নি।'

'ওমা বাদলার মাও আসেনি, তবে বাসন মাজবে কে?'

'কে আর মাজবে ভাই, বৌমা বুঝি তার শাশুড়ীর ঘরের বাসন ক'খানা মেজে রেখে গিয়েছিলেন, আর ওই দেখ না—সব পড়ে রয়েছে। মনে করছি, বাদলা ছুঁড়ীকে দিয়ে মাজিয়ে নেব। এই বর্ষার দিনে কি করে ভিজে ভিজে বাসন মাজি? আমার না হয় যা হয় হলো, মরলেই বা কি আর বাঁচলেই বা কি? কোলে যে আবার একটা আপদ আছে, তার আবার দুদিন থেকে জর হচ্ছে।'

'তা তো বটেই, কোল-ছোয়ালে মানুষ, তুমি আর কি করবে? তা বাদ্‌লাকে দিয়েই মাজিয়ে নাও, ছুঁড়ী এখন বেশ কাজ টাজ কর্ত্তে শিখেছে। তা, হাঁ ছোটবৌ! তোদের ঘরে নার্‌কোল আছে, আজ দুটো পিঠেপুলী গড়বো ভাবলুম, তা ঘরে আমার নারকোল নেই।'

'হাঁ ভাই, তা নারকোল্ দেখি আছে কি না'—বলিতে বলিতে ছোট বধূর মুখের ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। তিনি আপন মনে অস্ফুটস্বরে বলিলেন, 'এসেছেন যখন, তখনই বুঝতে পেরেছি—'

এমন সময় দেবেশের মা কোথা হইতে একখানি পত্র হাতে করিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বাড়ীতে আসিয়াই উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, 'ওলো ছোট বৌ, দেবু আস্‌ছে বাড়ীতে। চিঠি লিখেছে। মঞ্জরীকে দিয়ে এখ্‌নি আমি পড়িয়ে শুনে এলাম।'

ছোট বৌ শুনিয়া সেইরূপ অস্ফুটস্বরেই আপন মনে বলিলেন, 'কেতার্থ কর্‌লেন।' তাহার পর নারিকেল-প্রার্থিনীকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, 'না দিদি, নারকোল ত ঘরে নাই, দেখি গিয়ে জিজ্ঞাসা করে—বড় গিন্নির হবিষ্যি-ঘরে যদি থাকে।'

অগত্যা নারিকেল-প্রার্থিনী আবার বড় বধূর ঘরের দুয়ারে গিয়ে বলিলেন, 'হাঁ দিদি, দেবেশ চিঠি লিখেছে? বাড়ী আস্‌ছে? আহা! আসুক আসুক। বাছা আমার বিয়ে করে অবধি ঘর-ছাড়া। কি যে পাশের পাঁশ হয়েছে, ফেল হলো তো আর বাড়ীতে মুখ দেখাবে না। আহা! আসুক আসুক, কবে আস্‌বে ভাই?'

৫

দেবেশ বাড়ী আসিবে, এই আনন্দে দেবেশের মা বধূর উপর কিঞ্চিৎ প্রসন্ন হইলেন। আহারান্তে বধূ যখন তাঁহার মুখশুদ্ধি লইয়া নতমুখে আসিয়া তাঁহার কাছে দাঁড়াইল, তখন বধূর দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে একবার চাহিয়া বলিলেন, 'আ আবাগীর ঝি, চুলগুলোও একটু সোর্ করতে জান না!'

অন্য দিন হইলে শাশুড়ীর এই আদরে চিন্ময়ীর চিত্ত পুলকিত হইয়া উঠিত। কিন্তু আজ দুই দিন হইতে তাহার মায়ের জন্য এত মন কেমন করিতেছিল যে, কোনও কাজেই সে আর মন দিতে পারিতেছিল না। কোনও কথাই যেন ভাল করিয়া তাহার মনে প্রবেশ করিতেছিল না। কেবল থাকিয়া থাকিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া পাখীগুলি দেখিতেছিল, আর ভাবিতেছিল, আমি যদি পাখী হইতাম, তাহা হইলে এখনই মার কাছে উড়িয়া চলিয়া যাইতাম।

কে জানে কেমন করিয়া শত ক্রোশ দূর হইতে এক ব্যাকুল হৃদয়ের তরঙ্গ আর এক হৃদয়ে আসিয়া প্রতিঘাত করে। এই দুই দিন যে চিন্ময়ীর মা 'ছোট-বৌ! ঠাকুরপোকে বল চিনুকে একবার আমার কাছে এনে দিতে। একবার আমি মর্‌বার সময় তার মুখখানা দেখে মরি' বলিয়া বিছানায় পড়িয়া ছটফট করিতেছিলেন, চিনু ত তাহা জানিত না, কিন্তু না জানিলেও মায়ের ব্যাকুল আকর্ষণ বহু দূর হইতে তাহার মন উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিতেছিল।

চিন্ময়ীর খুড়ীমার মায়ের উপর যে বিশেষ টান ছিল, তাহা নহে। বরং কর্তৃত্বাধীনে থাকিতে হইত বলিয়া কিছু বিরক্তিই ছিল। কিন্তু আজ মায়ের এই অবস্থা দেখিয়া সে কাঁদিয়া গিয়া স্বামীর কাছে পড়িল, 'ওগো, দিদি হয় ত আর বাঁচবে না, আমার গয়না বিক্রী করেও যদি চিনুকে আন্তে পার, তবে গিয়ে নিয়ে এস। এ আকুলি বিকুলী যে আমি আর দেখ্তে পারিনি। জান যদি মেয়ে আটকে রাখবে, তবে কেন তুমি অমন ঘরে মেয়ের বিয়ে দিলে?'

হরিশ চক্রবর্ত্তী মহাশয় মাথা চুল্কাইতে চুল্কাইতে আসিয়া মেজ বধূর ঘরের দুয়ারে দাঁড়াইলেন, বলিলেন, 'মেজ বৌ ঠাকুরুণ ভাল হয়ে যাবেন বই কি? ভয় কি? আমি পার্ব্বতী কবিরাজকে আন্তে লোক পাঠাচ্ছি।'

ছোট বৌ আবার তাহার কাছে আসিয়া চুপি চুপি বলিল, 'কবিরাজ আন্তে পাঠাও, আর যা কর, তুমি নিজে একবার চিনুকে আন্তে যাও। দিদি যদি চিনুর মুখ না দেখে মরে, তবে আমার সে দুঃখ মলেও যাবে না।'

হরিশ চক্রবর্ত্তী ভাঙ্গা-ভাঙ্গা স্বরে বলিলেন, 'যাব তো আন্তে ছোট বৌ, কিন্তু পাঠাবে কি তারা? তেমন ত মনে হয় না।'

৬

দেবেশের যে দিন বাড়ী পঁহুছিবার কথা, সেই দিন সকালে হরিশ চক্রবর্ত্তী বাহাদুরপুরে গিয়া পঁহুছিলেন। অলকা তাড়াতাড়ি বাড়ীর মধ্যে খবর দিতে ছুটিয়া গেল,—'ওগো! বৌ ঠাকুরুণের খুড়ো এসেছ গো, বৌ ঠাকুরুণকে নিতে এসেছে।'

চিন্ময়ী রান্নাঘর নিকাইতেছিল, অলকার কথা শুনিয়া তাহার বুকের ভিতরে ধড়াস্ করিয়া উঠিল। প্রথমে কি যে শুনিতেছে, তাহাই যেন সে বুঝিতে পারিল না। গোবরমাখা হাতে তাড়াতাড়ি দাওয়ায় আসিয়া ডাকিল, 'অলি ঠাকুরঝি, ঠাকুরঝি ভাই, শুনে যাও ভাই!' কিন্তু ঠাকুরঝির সে কথা কানেও পঁহুছিল না। সে তখন নূতন খবর আনিয়াছে, তাহাকে আর কে পায়! 'ও বড় মা, শুনেছ গো, বৌ-ঠাকুরুণের খুড়ো এসেছে!' বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে অদৃশ্য হইয়া গেল।

চিন্ময়ী কাঁপিতে কাঁপিতে দেয়ালের কাছে গিয়া 'হে ঠাকুর, হে ঠাকুর, আমার যেন যাওয়া হয়' বলিয়া দেয়ালে মাথা কুটিতে লাগিল, ঘরের মেঝে সদ্য নিকানো, সেখানে এখন 'গড়' করিবার উপায় নাই।

বধূর খুড়া বধূকে লইতে আসিয়াছে শুনিয়াই বড় কর্ত্রী তেলে বেগুনে জ্বলিয়া

উঠিলেন, 'হাঁ, তা আর নয়? এলেন আর মেয়ে নিয়ে গেলেন। আমি আমার বৌ পথে বসিয়ে রেখেছি আর কি! দেবু আজ সংবৎসরের পর বাড়ী আস্‌ছে, আর আমি আমার ঘরের বৌ পাঠিয়ে তার অকল্যাণ করি। আক্কেলের বলিহারী যাই।'

ক্রমশঃ পাড়ায় রাষ্ট হইয়া পড়িল, 'নতুন বৌয়ের খুড়া নূতন বৌকে লইতে আসিয়াছে।' পল্লীগ্রামে এরূপ নূতন সংবাদ সচরাচর দুর্ল্লভ। রায়-বাড়ীর প্রাঙ্গণে ঘরের দাওয়ায় দলে দলে স্ত্রীমণ্ডলীর বৈঠক বসিতে লাগিল; নানারূপ তর্ক বিতর্ক আলোচনার মধ্যে ছেলে মেয়েগুলি 'মা বাড়ী চল, বেলা হল' বলিয়া মায়ের আঁচল ধরিয়া টানাটানি করিয়া মধ্যে মধ্যে চপেটাঘাত লাভ করিতে লাগিল।

'শুন্‌লাম যে নূতন বৌমার মায়ের বড় অসুখ। আমাদের নীলমণি শুনে এসে বল্‌ছিল,———'

'অসুখ বলে অসুখ, বাঁচেই না। একেবারে নাকি এখন তখন।'

'আহা! ওই একটি মেয়ে বই আর নাই।'

'তা তো বটেই দিদি, মায়ের প্রাণ, প্রাণের ভিতর কি যে করে, তা যার পরের ঘরে মেয়ে আছে, সেই জানে।'

যিনি এ কথা বলিলেন, তিনি সম্প্রতি কন্যাকে শ্বশুরগৃহে পাঠাইয়াছেন। তাঁহার কথার উত্তরে অমনই তৎক্ষণাৎ আর এক প্রাচীনা হুঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'বল্‌ছিস্ তো বটে, কিন্তু যম আর পর এদের কাছে কি আর মায়া মমতা আছে। এই যে আমি ন বছরের মেয়ে বিয়ে হয়ে এসেছিলাম, আর কি বাপের ভিটেয় পা দিতে পেরেছি? মা মলো, তাও দেখ্‌তে পেলাম না, বাপ মলো, তাও দেখ্‌তে পেলাম না। ভাই নিতে এসে কাঁদতে কাঁদ্‌তে ফিরে গেল। কি কর্‌বো, জোর তো নেই। যাদের ঘর কর্‌তে দিয়েছে, তাদেরই ঘর কচ্ছি, পিণ্ডি রেঁধে রেঁধে তাদের গেলাচ্ছি। এই জন্য বলে যে, মেয়ে সন্তান মিথ্যে সন্তান, একটু আগুনের পিত্যেশও নাই। ওগো বৌমা, গুঁড়োর কৌটাটা এখানে দিয়ে যাওনা বাছা, মানুষ বাড়ীতে এসেছে, দেখ্‌তে পাচ্ছ না?'

ছোট কর্ত্রী এ সমস্ত কথার কোনও প্রত্যুত্তর না দিয়া নির্লিপ্তের মত নিজের কাজে নিজে ব্যস্ত ছিলেন। বড় কর্ত্রী ঘাট হইতে আসিবামাত্র আসর জম্‌কাইয়া উঠিল।

চিন্ময়ীর শাশুড়ীর চিরকালই একটু কর্ত্তৃত্ব করা অভ্যাস। বরাবর বিদেশে

নিজের সংসারে নিজেই কর্ত্রী ছিলেন। বিধবা হইয়া দেশে আসিয়াও সংসারে কর্ত্তৃত্বের আসনই পাইয়াছেন। তাঁহার বুদ্ধি তেমন প্রখর ছিল না। এ কর্ত্তৃত্বের যে মূল্য কি, তাহা না বুঝিয়াই দেবর সর্ব্ব বিষয়ে অনুগত হইয়া থাকেন, এই অভিমানেই তিনি সন্তুষ্ট থাকিতেন। বুদ্ধিমান্ দেবরও পরোক্ষে যাহাই করুন, প্রত্যক্ষে কখনও ভ্রাতৃজায়ার আদেশ অমান্য করিতেন না; স্ত্রীর উপরও তাঁহার এ সম্বন্ধে বিশেষ শাসন ছিল। তিনি মনে মনে বেশ জানিতেন যে, তিনি ইচ্ছা করিলেই বড় বধূর এই কর্ত্তৃত্বাভিমানের সহায়তাতেই নিজের অভীষ্ট সিদ্ধি করিয়া লইতে পারিবেন।

বড় কর্ত্রী আসিবার পরই আসরের সুর একটু বদ্‌লাইয়া গেল। 'তাই ত, সংবৎসরের পর ছেলে ঘরে আস্‌বে, কেমন করেই বা বৌ পাঠায়।' 'মায়ের ব্যামো, তা বলে কি হবে, পরের ঘরে যখন মেয়ে দিয়েছে, তখন কি আর নিজের এক্তার আছে?' ইত্যাদি—

কেবল এক জন স্পষ্টবক্তা সাহসে নির্ভর করিয়া বড় কর্ত্রীকে বলিলেন, 'হাঁ দিদি, তা শুন্‌ছি, বৌমার মা এখন তখন, যদি নাই বাঁচে! আহা এক সন্তান, মেয়ের মুখ দেখ্‌তে পাবে না! আন্‌তে পাঠিয়ে হয় ত সে পথের দিকে হা-পিত্যেশ করে চেয়ে আছে।'

'হাঁ মর্‌বে! মলেই হল আর কি! বিধবার মরণ এত সহজে হয় না। তা হলে আমরা কোন্ কালে মরে ভূত হয়ে যেতাম। তুই বলিস্ কি লো, আজ রাত্তিরে আমার দেবু বাড়ী আস্‌বে, আজ দুপুরে কিনা ঘরের বৌ পাঠিয়ে দেবো। মরণ তার এসে থাকে, সে মর্‌বে। মেয়ে জামাই রেখে মরে, সে তো ভাগ্যের কথা।'

চিন্ময়ী যখন শুনিল যে, তাহার মায়ের বড় অসুখ বলিয়া কাকা লইতে আসিয়াছেন, কিন্তু তাহাকে পাঠান হইবে না, তখন আর তাহার ধৈর্য্য রহিল না। সে ছুটিয়া গিয়া শাশুড়ীর পায়ের উপর উপুড় হইয়া পড়িল, দুই পা দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া অবিশ্রান্ত কাঁদিতে লাগিল। বধূর এই নির্ব্বাক্ আবেদনে শাশুড়ী কিঞ্চিৎ বিচলিত হইলেও, দেবেশ আজ বাড়ী আসিবে, বধূ কাঁদিয়া তাহার অকল্যাণ করিতেছে ভাবিয়া, আবার তাঁহার মন কঠিন হইয়া গেল। বলিলেন, 'দেবু আজ বাড়ী আস্‌বে, এ কি কাণ্ড মা! সকাল বেলা বাসী হাত, বাসী মুখ, আবাগীর ঝি কেঁদে মর্‌ছেন, ওঁর মা যেন এখনি মোলো। দিন নেই, ক্ষণ নেই, হেট্, বল্‌লেই তো আর ঘরের বৌ পাঠানো যায় না?

এমনই ত কত আয়-পুয়! ব্যারাম হলেই মানুষ মরে না। দু'দিন কি আর তর সয় না? ভাদ্দর মাস পড়বার আগে একটা ভাল দিন দেখে না হয় আবার এসে নিয়ে যাবে।'

ভবেশ রায় বৈবাহিককে গিয়া বলিলেন, 'কি করি বেয়াই, মেয়েদের ব্যাপার জানেন ত, দিন ক্ষণ না দেখে তারা কিছুতে পাঠাতে চায় না। তায় দেবেশ আজ বাড়ী আস্‌ছে। আজ ত পাঠানো অসম্ভব। এ সব কাজে আমার ত হাত নাই, কিছু বলতে গেলে এক কুরুক্ষেত্র কাণ্ড হবে। তা আপনি না হয় দু' দশ দিন থাকুন, শ্রাবণের শেষ নাগাদ্ একটা ভাল দিন দেখে বৌমাকে নিয়ে যাবেন।'

ক্ষোভে হরিশ চক্রবর্ত্তীর চোখে জল আসিল। তাঁহার মনে হইল, ভ্রাতৃ-জায়ার আপত্তি সত্ত্বেও মেয়ে সুখে থাকিবে বলিয়া তিনিই জোর করিয়া এ ঘরে মেয়ের বিবাহ দিয়াছিলেন। আর মনে হইল, আজ যদি লক্ষ্মীর আড়ি চকবন্দী পরগণা থাকিত, আজ যদি যাঁর নামে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খাইত, সেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জীবিত থাকিতেন, তবে কি আর তাঁহাকে দীন হীনের মত বাহাদুরপুরের রায়েদের বাড়ী আসিয়া এইরূপ অপমানিত হইতে হয়!

বৈবাহিকের কথার উত্তরে চক্রবর্ত্তী বলিলেন, 'আমার কি থাকিবার উপায় আছে! আমি যে বাড়ীতে এখন-তখন রুগী রেখে এসেছি। আজ্‌কের দুপুরের জোয়ারেই আমাকে নৌকা ছাড়তে হবে। তা হলে সন্ধ্যা নাগাদ বদন-গঞ্জে পৌঁছে যাব। বাড়ীতে গিয়ে যে কি বলে দাঁড়াব, তাই কেবল আমি ভাবছি।' বলিতে বলিতে আবার তাঁহার চোখে জল আসিয়া পড়িল। সংযত হইয়া বলিলেন, 'বাবাজীর সঙ্গে ত দেখা হলো না, কি আর করবো বলুন। যাক্, ভগবানের মনে যা আছে, তাই হবে। মাসের শেষে নিয়ে যাবার কথা বল্‌ছেন, রুগী যে ততদিন টেঁকে থাকে, এমন ত মনে হয় না।'

ভবেশ রায় উত্তর শুনিয়া অসন্তুষ্ট না হইয়া বরং খুসীই হইলেন। দেবেশের সঙ্গে তাহার শ্বশুরবাড়ীর কোনও ঘনিষ্ঠতা ঘটে, ইহা তাঁহার ইচ্ছা ছিল না।

হরিশ চক্রবর্ত্তী চিন্ময়ীকে অনেক প্রবোধ দিয়া গেলেন, 'এই যে মা, আমি ঘুরে এসেই তোমাকে নিয়ে যাব। তোমার মার অসুখ, অদিনে যাওয়া ত ভাল নয়। ত্রয়োদশীর দিন ভাল আছে, সেই দিন তোমাকে নিয়ে যাব। সে আর কটা দিন? আজ হল পঞ্চমী, আর দিন সাতেক। কেঁদ না মা আমার, চুপ কর।' মুখে এই সমস্ত প্রবোধবাক্য বলিতেছেন বটে, কিন্তু

চিনু যখন ব্যাকুল হইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছিল, 'না, আমি মাকে না দেখে একদিনও থাকৃতে পারবো না। আমি সাত দিন থাকতে পারবো না। আমাকে এখনি নিয়ে যান, আপনার পায়ে পড়ি আমাকে নিয়ে যান, খুড়ো মশাই! আপনার দুটী পায়ে পড়ি আমাকে নিয়ে যান', তখন তাঁহার বুক যেন ফাটিয়া যাইতেছিল।

৭

বিকাল বেলায় পশ্চিমের আকাশে খুব মেঘ করিয়া আসিতেছে দেখিয়া চিন্ময়ীর শাশুড়ী চিন্ময়ীকে বলিলেন, 'বৌমা! হাট থেকে মাছ এসে পড়ে আছে, বেলাবেলি রান্না সেরে এস, হয় ত এখনি বৃষ্টি এসে পড়বে।'

চিন্ময়ী তাহার 'খুড়ো মশাই' চলিয়া যাইবার পর সেই যে বড় ঘরের দাওয়ায় চুপ করিয়া বসিয়া ছিল, এ পর্য্যন্ত আর একবারও উঠে নাই। অন্য দিন হইলে এ জন্য তাহাকে শাশুড়ীর নিকট তিরস্কৃত হইতে হইত, কিন্তু আজ বড় কর্ত্রী কি মনে করিয়া বধূকে আর কিছু বলিলেন না, বরং চিনুর খুড়শাশুড়ী আপনার মনে গজ-গজ করিতেছিলেন, 'আজকালকার বৌদের আস্পর্দ্ধা দেখে আর বাঁচিনে। খুড়োর সঙ্গে যাওয়া হল না বলে' দাওয়ার খুঁটী-ধরে বসে রইলেন। আমাদের কত নিতে এসেছে, কত ফিরে গিয়েছে। আমরা এমন করলে ঠাকুরুণ কি আর রক্ষে রাখতেন? সমস্ত দিন গেল, ছেলেটা ধরবার নাম নেই, কুটো গাছটীও দুখানা করবার নাম নেই।'

চিনু শাশুড়ীর আদেশে যন্ত্রচালিতের মত মাছ কুটিবার জন্য উঠিল; এমন সময় সহসা ধূলায় দশ দিক অন্ধকার করিয়া প্রবল ঝড় আসিয়া পড়িল। চোখে ধূলা বালি পড়িয়া ঝড়ের ঝাপটে সে হুমড়ি খাইয়া পড়িতে পড়িতে কোনও রকমে খুঁটা ধরিয়া বাঁচিয়া গেল।

সন্ধ্যার সময় ঝড় একটু কমিল; অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। তাহার পরই আবার এত প্রবলবেগে ঝড় আসিল যে, লোকের রান্না খাওয়া দূরে থাক্, প্রাণ বাঁচানই দায় হইল। দেখিতে দেখিতে দুম্-দাম করিয়া গাছ পড়িতে আরম্ভ হইল। তাহার পর মজুমদারদের আটচালা ভূমিসাৎ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই চারি দিকে একটা আর্ত্তনাদ উঠিল। 'ওরে! গরুগুলোর দড়া কেটে দে রে! ঘর চাপা পড়ে মরবে। ওরে! বড় ঘরের চাল মড়-মড় করছে, নূতন ঘরে চল। ওরে! ক্যাবলা কোথায় গেল? ও ক্যাবলা! ছোট খোকা যে উপরের

কলরব ঝড়ের গর্জ্জনের সহিত মিশিতে লাগিল। বড় কর্ত্রী শয়নঘরে বধূকে কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া একমনে কেবল 'মধুসূদন মধুসূদন' জপ করিতেছিলেন, আর এক একবার চোখ মেলিয়া 'ওমা কি হোল মা, ওমা দেবু যে আমার নৌকায় আছে মা! আমি বড় পোড়াকপালী, তোমার নামের জোরে তুমি আমার দেবুকে বাঁচিয়ে ঘরে আন মা!' বলিয়া ব্যাকুলভাবে বধূর মুখের দিকে চাহিতেছিলেন।

মজ্জমান ব্যক্তি যেমন জলে পড়িয়া কাষ্ঠখণ্ড ধরিয়া বাঁচিবার চেষ্টা করে, এ যেন ঠিক সেইরূপ। থাকিয়া থাকিয়া ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিতেছিলেন, 'ওরে! বাছার যে জলে ডোবার রিষ্টি ছিল, আমি পোড়াকপালী বর্ষার দিনে বাড়ী আস্‌তে কেন বারণ করে পাঠালাম না? ছোট ঠাকুর যে আমাকে আগেই সে কথা বলেছিল।'

চিন্ময়ী শাশুড়ীর এই ব্যাকুলতা দেখিয়া কি করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবে, বুঝিতে না পারিয়া কেবল কোলের কাছে ঘেঁষিয়া বসিতেছিল। এক একবার ঝড়ের গর্জ্জন শুনিতেছিল, আর এ সময় যিনি নৌকায় আছেন, তাঁহার অবস্থা কল্পনা করিতেছিল। এক একবার তাহার ঘুম আসিতেছিল, আবার ঝড়ের শব্দে চমকিয়া জাগিয়া উঠিতেছিল; ক্রমশঃ ঢুলিতে ঢুলিতে শাশুড়ীর হাঁটুর কাছে মাথা গুঁজিয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

দুর্য্যোগের রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। সূর্য্যকিরণে আবার দশ দিক্ প্রসন্ন হইয়া উঠিল। দেখা গেল, গ্রামের অবস্থা অতি শোচনীয়। দুই তিন জন ঘর-চাপা পড়িয়া মরিয়াছে, গরু ছাগলও অনেক মরিয়াছে; গাছ যে কত পড়িয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই।

ছোট তরফের ভাঙ্গা চণ্ডীমণ্ডপের পাশে লোকজন জড় হইয়া বাঁশ কাঠ সরাইতেছিল। বড় তরফের প্রজা কছিমদ্দি সেই পথের ধার দিয়া মাথা চাপড়াইতে চাপড়াইতে ছুটিয়াছে দেখিয়া সকলে জিজ্ঞাসা করিল, 'কিরে কছিম! অমন করে ছুটছিস কোথায়? তোর আবার কি হলো?'

'কন্ কি, ছোট বাবুর না ডুবী হয়েছে। মাঝি কাঠ ধরে কোন গতিকে কিনারা ধরেছে, তিন জন মাল্লা আর আমার ছোট বাবু—' বলিয়াই হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বুক চাপড়াইতে চাপড়াইতে কছিম ছুটিয়া চলিয়া গেল।

সংবাদ শুনিয়া কিছুক্ষণ সকলে স্তম্ভিত হইয়া রহিল। তাহার পর এক জন

নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, 'ভবেশ রায়ের কি জোর কপাল! যে প্রার্থনা করিতেছিল, ভগবান্ তাই তার কপালে মিলিয়ে দিলেন। এই সেদিন দেবেশের রিষ্টি কাটানোর নাম করে বড় বৌর কাছে পাঁচ শো টাকা আদায় করে নিয়েছে, রিষ্টি কাটিয়েছে মাথা মুণ্ডু।'

বড় কর্ত্রী সকাল হইতে পাগলের মত এ দিকে ও দিকে ছুটাছুটী করিতেছিলেন, আর কেবল বলিতেছিলেন, 'ওরে! এক জন লোক পাঠিয়ে দিয়ে খবর নে। ওরে! তোরা কি বলাবলি করছিস? তোরা কি কোনও খবর পেয়েছিস? ওরে! ছোট ঠাকুর কোথায় গেল? বাদলার মা! একবার ডেকে দে না মা।' সকলে তাঁহাকে দেখিয়া চোখে চোখে কথা কহিতেছিল, মুখ ফুটিয়া কেহ কিছু বলিতে সাহস করিতেছিল না।

ইতিমধ্যে যে হাঁড়ি কুঁড়ি ফেলিয়া রান্নাঘর পরিষ্কার করা হইয়াছে—দেবেশের মা তাহা দেখিতে পান নাই; এখন সহসা হাঁড়ি বাহির করিতে দেখিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন 'ওরে! হাঁড়ি বার্ করছিস্ কেন তোরা? কি খবর পেয়েছিস্ বল আমাকে! ওরে বাবা রে! আমার কি হোল গো!' বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া উঠানে পড়িয়া গেলেন।

যখন তাঁহার চৈতন্য হইল, চোখ চাহিয়াই দেখিলেন, এ যে তাঁহার অঞ্চলের নিধি দেবেশ—তাঁহার মাথা কোলে রাখিয়া বসিয়া আছে! এ কি স্বপ্ন না কি? দেবেশের এখনও ভিজা কাপড়, মুখে চোখে উদ্বেগ ও শ্রান্তি যেন মাখানো রহিয়াছে। কর্ত্রী তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিতে গিয়া আবার ঘুরিয়া পড়িতেছেন দেখিয়া দেবেশ দুই হাতে তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল। কর্ত্রী উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিয়া বলিলেন, 'দেবেশ! বাবা আমার, মাণিক আমার! আমি তবে স্বপ্ন দেখ্‌ছি নে! ওরে, আমার মা লক্ষ্মীর সিঁথের সিঁদুরের জোরে আমি হারানিধি ফিরিয়ে পেয়েছি। ওলো! তোরা দেখ্ লো দেখ্। কে বলে আমার মা অপয়া? আমার বৌমা যে পূর্ণলক্ষ্মী! ওরে নৌকা সাজা, এখনই নৌকা তোয়ের কর্। এখনই আমি দেবুর সঙ্গে বৌমাকে বাপের বাড়ী পাঠাবো। মরণকালে সন্তানের মুখ দেখায় বঞ্চিত করতে চেয়েছিলাম, সেই পাপে আমার সোণারচাঁদকে হারাতে বসেছিলাম!'

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

নারায়ণ। আশ্বিন।—শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল অবতার-কথায় হিন্দুর অবতারবাদের সমর্থন করিতেছেন। প্রবন্ধটি এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। ভবিষ্যতে প্রাচীন অবতারবাদে বিপিন বাবু আর কিছুর আরোপ করিবেন কি না, তাহা অবশ্য বলা যায় না। শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকারের 'জাতীয় জীবনের ধ্বংসের কারণ' চলিতেছে। জাতীয় জীবনের ধ্বংস সম্বন্ধে ইংরেজী কেতাবে যাহা লেখে, তাহার কিছু কিছু সংগ্রহ করিতেছেন। কোনও মৌলিক তথ্য নাই। মাসিক-পত্রের বাহুল্যের ফলে এই শ্রেণীর রচনাও তরিয়া যাইতেছে। বর্ত্তমান লেখক অনেক দিন লিখিতেছেন, কিন্তু এখনও তাঁহার ভাষার 'আড়' ভাঙ্গিল না। সকলের ভাষায় পারিপাট্য থাকিবে, অবশ্য এমন আশা করা যায় না। কিন্তু মনের ভাব ভাষায় যদি না ফোটে, যদি বক্তব্যই লোকে উল্টা বুঝে, তাহা হইলে লিখিয়া লাভ কি? যথা, 'জীবনের সর্ব্ব বিভাগে পরাধীন জাতির কার্য্যকরী শক্তির স্ফূর্ত্তি (!) পাইবার সুযোগ প্রায়ই ঘটে না।' কোন কোন বিভাগে ঘটে? বোধ হয়, মা সরস্বতীর বিভাগেই এ কথাটা বেশী খাটে!—লেখক বাঙ্গালা লেখেন, কিন্তু বানানগুলি এখনও মুখস্থ করেন নাই, এবং অনেক শব্দের অর্থও শেখেন নাই। দুই একটা ভুল হইলে প্রিণ্টারের ঘাড়ে চড়ান চলিত, কিন্তু এ যে পাতায় পাতায় ভুল! প্রফুল্লকুমার প্রথমে 'অ' 'আ' মক্স করিয়া তাহার পর 'স্ক স্ক' ধরিলে ভাল হইত। বঙ্কিমচন্দ্রের কুন্দনন্দিনী আত্মহত্যা করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিল। কিন্তু 'কড়িতে বাঘের দুধ মেলে!' শ্রীচিত্তরঞ্জন দাস প্রেতলোক হইতে কুন্দকে ধরিয়া আনাইবেন, ইহা অবশ্য বিচিত্র নহে! যাঁহাদের পেত্নী দেখিবার সখ ও সাহস আছে, তাঁহারা এই বেলা সাধ মিটাইয়া লউন। শ্রীগিরীন্দ্রপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় চিত্তরঞ্জনের রোজা হইয়াছেন। আশা করি, তিনি কাহাকেও রেহাই দিবেন না। বঙ্কিম বাবু বেহাইয়ের খাতির রাখেন নাই—মৃন্ময়ীর ভয়ে কপালকুণ্ডলাকে মারিয়া ফেলিয়াছিলেন। তিনি কি জানিতেন যে, মারিলেও নিস্তার নাই! 'নারায়ণ' আবর্জ্জনার আধার হইয়া উঠিয়াছে। ভগবান্ যে পতিতপাবন, তাহা 'নারায়ণে' চাক্ষুষ প্রমাণে প্রতিপন্ন হইয়া গেল। 'চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে' চলিতেছে। শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী কোনও মতে পিতৃরক্ষা করিতেছেন!

'রাজেন্দ্রলাল বলিলেন—মুক্তি হবে না? তুমি লেখাপড়া শিখেছ, ভদ্রসমাজে বেড়াও, তুমি ·········কিনা মেছোনীদের মতন মেছোবাজারের চৌমাথায় দাঁড়িয়ে লোকের সঙ্গে গালিগালাজ করছ! ভদ্রলোকের সমাজে তোমার বসা উচিত নয়।

'আমি বলিলাম—চূড়ামণি যে বড় অন্যায় করছে। কতকগুলি ভুল প্রচার করছে।

'তিনি আরও রাগিয়া বলিলেন—ভুল প্রচার করছে, তাতে তোমার কি? তোমার একছত্র লেখায় উহার একশ পাতা পুড়ে ছাই হ'য়ে যাবে তা' জান? তুমি কি না তা'র সঙ্গে সমান উত্তর করতে যাচ্ছ! আমার বাড়ীতে তোমার জায়গা হবে না।

'আমি সভয়ে বলিলাম—এই ত, আর ত কিছু না। আচ্ছা এমন কর্ম্ম আর আমি করব না।

'তখন তিনি ঠাণ্ডা হইয়া আমাকে বসিতে বলিলেন। রাজেন্দ্রলাল আমাকে এই ঘটনায় যে শিক্ষা দিয়াছেন তাহা আমি জীবনে ভুলিব না।' সেই অবধি খবরের কাগজে আমাকে যতই

গালি দিক্ না আমি তাহার কখনই জবাব দিই না। তত্ত্বনির্ণয় করিয়া যাইতেছি, উদ্দেশ্য আমার ঠিক আছে।' ভুল ভ্রান্তি মানুষের হইয়াই থাকে। যিনি উহা ভদ্রভাবে দেখাইয়া দেন আমি তাঁহার গোলাম হইয়া যাই। গালাগালি দিলে জবাব দিই না। আমি যে নিজেই এই কার্য্য করি তাহা নহে, আমার ছাত্রবর্গকেও এ কথাটি আমি বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিই।'

এই অংশটি হইতে অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি। প্রথম, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ নরমের যম, শক্তের গোময়। দ্বিতীয়, রাজেন্দ্রলালের কাছে তিনি 'টিট' ছিলেন। তৃতীয়, তাঁহার মর্য্যাদাবুদ্ধিও অসাধারণ। তিনি ছিনে জোঁক—তাড়াইলেও নড়েন না! চতুর্থ, রাজেন্দ্রলালের উপদেশ পালন করিবার জন্যই তিনি এখন কাগজে কলমে 'মেছোনীদের মতন' মধুর 'গালিগালাজ' করেন না, পরিষদে, মিত্রসমাজে ও মোসাহেবদিগের মজলিসে প্রতিপক্ষকে "শকার বকার" করেন। পঞ্চম, নিরাপদে থাকিবার জন্যই তিনি 'শতং বদ, মা লিখ' নীতির অনুসারী হইয়াছেন। ষষ্ঠ, 'যিনি উহা ভদ্রভাবে দেখাইয়া দেন, আমি তাঁহার গোলাম হইয়া যাই।' কথাটি বড় মিষ্ট, যে বিশ্বাস করে, করুক; আমরা ত হজম করিয়া উঠিতে পারিলাম না। কোনও কাগজে যদি তাঁহার প্রতিবাদ ছাপা হয়, তাহা হইলে ত কথাই নাই; ছাপা হইতেছে শুনিলেও তিনি এমন গোলাম হইয়া যান যে, উক্ত পত্রের সম্পাদককে প্রতিনমস্কার পর্য্যন্ত করেন না। ভুল কখনও স্বীকার করিয়াছেন, তাহাও ত মনে পড়ে না! হালফিল শান্তাকে লোমপাদের অঙ্কশায়িনী করিয়াছেন। স্কুলের ছেলেরা সে ভুল দেখাইয়া দিয়াছিল। শাস্ত্রী মহাশয় তাহা কাণে তুলিলেন না। তাঁহার এমন স্পর্দ্ধা ও এমন বিনয় যে, এই বিষম মারাত্মক ভুল তাঁহার অভিভাষণ-পুস্তিকায় যেমন ছিল, ঠিক তেমনই রাখিয়া সেই অভিভাষণ বর্দ্ধমানের সাহিত্য-সম্মিলনের কেঁদো কার্য্যবিবরণে ছাপিয়া, কেমন করিয়া 'খাতির নাদারৎ' হইতে হয়, তাহা তাঁহার 'ছাত্রবর্গকে' বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন! সপ্তম, তিনি যে 'কখনই জবাব দেন না', ইহা 'ধ্রুব সত্য' বটে। কিন্তু কথামালার শেয়াল ও আঙ্গুরের গল্প শাস্ত্রী মহাশয় কি ভুলিয়া গিয়াছেন? 'তীর্থ-ভ্রমণে' মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী একখানি প্রাচীন গ্রন্থের পরিচয় দিয়াছেন। এইরূপ কতকগুলি পরিচয় লেখা ও ছাপা হইয়াছিল। কিন্তু পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণ অধিকাংশের মতে সেগুলি বর্জ্জন করিতে বাধ্য হন। সেই রদী মালগুলি এখন 'নারায়ণ'কে উৎসর্গ করা হইতেছে। ঠুঁটো কলা ও পিঁপড়ের প্রসাদী বাতাসাই যখন এ দেশে 'নারায়ণে'র প্রধান খোরাক, তখন বিস্মিত হইবার কারণ নাই! এই নিবন্ধের শেষে শাস্ত্রী মহাশয়ের আর একটি গুণের পরিচয় ও প্রমাণ আছে। নিরপেক্ষতার অনুরোধে তাহা আমরা প্রকাশ করিতে বাধ্য। 'নগেন্দ্র বাবুর হাতে পড়িয়া যদুবাবুর রোজনামচা উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিয়াছে!' ৯৫ পৃষ্ঠা ভূমিকা ও চৌত্রিশ পাত টিপ্পনী, পরিশিষ্ট ও বর্ণানুক্রমিক সূচীতে যদি কোনও প্রাচীন ভ্রমণবৃত্তান্ত 'উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর না হয়,' তাহা হইলে আমরা নাচার! ভাগ্যে হাতে পড়িয়াছিল, তাই 'হীরার ধার' বাঁচিয়া গিয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয় ভক্তবৎসল, অতঃপর কে তাহা অস্বীকার করিবে? শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল 'সকলই আছে—কিছুই নাই' প্রবন্ধে মোড় ফিরিতেছেন! ইহার উত্তর – সবই থাকে, কিছুই যায় না। 'প্রতিমাপূজা যে নিম্নাধিকারীর জন্য', বিপিন বাবু তাহা বিশ্বাস করেন না। তাহা উচ্চাধিকারীর জন্য, ইহাই তাঁহার মত। অথচ প্রতীকে তাঁহার অরুচি! শালগ্রাম শিলার ভয়ে

তিনি দেশছাড়া হন! একটি গল্প আছে, প্রাতঃস্মরণীয় মতিলাল শীল প্রত্যহ পদব্রজে গঙ্গাস্নানে যাইতেন। একদিন স্নান করিয়া ফিরিতেছেন, পথে একটা মাতাল তাঁহার সঙ্গ লইল। মতি শীল একটু সরিয়া গেলেন, পাছে মাতালের স্পর্শে অশুচি হইতে হয়। মাতাল বুঝিল, শীল মহাশয়ের সন্নিহিত হইয়া জড়িতস্বরে বলিল, 'কি বাবা, খোসায় বড়লোক, শাঁসে অরুচি?' প্রবাদ আছে, মতি শীল খালি বোতল বেচিয়া সৌভাগ্যের পত্তন করিয়াছিলেন। বিপিন বাবুরও তাই। হিন্দু শাস্ত্রের বেসাতী করেন, খোসায় খুব অনুরাগ, কিন্তু প্রায়ই তাঁহার শাঁসে অরুচি দেখিতে পাই! আর কেন? একখানা নৌকাই রাখুন, আর একখানা হইতে দক্ষিণ পদটি তুলিয়া নিন! বিপিন বাবু 'দুর্গাপূজায় হিন্দু ব্যাখ্যাতাদিগের মতে'র প্রতিবাদ করিয়াছেন। আশা করি, বিশেষজ্ঞগণ এ বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবেন। সর্ব্বশেষে 'মধুরেণ সমাপয়েৎ'—স্বর্গীয় কবিবর রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপ্রকাশিত দুর্গাস্তোত্র।

'শান্তি আর সুখে পূর্ণ কর এই দেশ,
এ বৎসর যেন নাহি হয় দুঃখলেশ।
সুত-সুতা সহ এস, কৈলাসবাসিনী!
দুর্গে! দুর্গে! ও মা দুর্গে! দুর্গতিনাশিনী!'

মা এই প্রার্থনা শুনিয়াছেন। এ সংখ্যায় আর কোনও কবিতা নাই! আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে দাস মহাশয়কে ধন্যবাদ দান করিতেছি।

বিক্রমপুর। আশ্বিন। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত। 'বিক্রমপুরে'র মলাটে যোগেন্দ্র বাবুর অস্তিত্বের প্রমাণ পাইয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। 'সাহিত্যে'র ম্যানেজার বারম্বার চিঠি লিখিয়াও তাঁহার ও ঢাকার আলবার্ট লাইব্রেরীর কোনও সাড়া শব্দ পান নাই! সহসা হারানিধির সন্ধান লাভ করিয়া আমরা পুলকিত হইয়াছি। দেখিতেছি, যোগেন্দ্র বাবুর এখনও বাঙ্গালা বানান মুখস্থ হয় নাই। সম্পাদকের সে বোধ থাকিলে, যে পত্র তাঁহার বিশুদ্ধিরক্ষার জন্য পদ্মনাভকে স্মরণ করিয়াছেন, সে পত্রে 'ভৌগলিক' কখনও 'ভৌগোলিকে'র স্থান অধিকার করিতে পারিত না। আজকাল অনেক মাসিকেই সম্পাদকের কর্ত্তব্য পালনের কোনও চিহ্ন দেখিতে পাই না। 'স্বয়মসিদ্ধঃ কথমন্যান্ সাধয়তি?' এই সংখ্যায় বারোটি সন্দর্ভের মধ্যে পাঁচটি 'কাব্যি'! চাঁদ রায়, কেদার রায় ও ঈশা খাঁর দেশে 'কাব্যি'র এত পসার! শ্রীকুলচন্দ্র দের 'আবাহন' কতকগুলি শব্দের সমষ্টি। অন্বয় নাই, অর্থ হয় না। এই 'অবাহন' 'বিক্রমপুরে' প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে! 'দশভূজা (?) বিকাশি রাজিছ দশদিশি কটাক্ষ-দিবানিশি বিভাতরে!' 'দশভূজা' কি দশভুজা? না দশ রকম 'ভুজা'? যে সম্পাদক ছাপিয়াছেন, এবং যে কবি লিখিয়াছেন, উভয়ের মধ্যে কে অধিক বেহায়া, তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলাম না। 'প্রসঙ্গ কথা'য় অনেক স্থানীয় সংবাদের সমাবেশ আছে। শ্রীকালিদাস রায়ের 'সুন্দরের জাতি' পড়িয়া ভাবিতেছি, 'অপরং বা কিং ভবিষ্যতি?'

'সুন্দর সুন্দরীগণ সব জাতি ছাড়া,
চিরসুন্দরের চির অবিমিশ্র ধারা।'

ছেলেবেলা এইরূপ আর এক জন মহাকবির মহাকাব্য শুনিয়াছিলাম,—

'লবঙ্গর বঙ্গ ছাড়া, পাঁঠার ছাড়া পা!'

শেষটা মনে নাই। সে হেঁয়ালী ভাঙ্গা চলিত, কিন্তু এ কালিদাসী মর্কটমির কোনও অর্থ আবিষ্কার করিতে পারিলাম না। 'বিক্রমপুরের ব্যবসা বাণিজ্যের বিবরণ' নামক রচনাই এ সংখ্যার একমাত্র উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। ইহাতে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য সঙ্কলিত হইয়াছে। শ্রীনলিনীনাথ দাস গুপ্তের 'বর্ষা' চারি পৃষ্ঠা ব্যাপিয়া কবিত্ব বর্ষণ করিয়াছে। রচনাকালে কবিবরের নাকের জলে ও চোখের জলে মিলিয়া যে ঘোর দুর্দ্দিনের সৃষ্টি হইয়াছিল, এ 'বর্ষা' দেখিয়া তাহা অনায়াসে অনুমান করা যায়। লেখকের কল্পনাও খুব উর্ব্বরা,—

'দু'দিকে রেশমী ক্ষেতে রূপার বিছানা পেতে

কোনখানে খালগুলি গড়াগড়ি যায়!'

আরব্যোপন্যাসে আছে, কে এক জন মুক্তা দিয়া শসার তরকারী রাঁধিয়াছিল। কিন্তু একাধিক-সহস্র রজনীতেও রূপার বিছানা নাই! অঘটনঘটনপটীয়সী প্রতিভা আশ্চর্য্য বিছানার সৃষ্টি করিয়াছে! আবার সেই বিছানায় 'খালগুলি গড়াগড়ি যায়!' ইনি মুর্শিদাবাদের কবি কালিদাসকেও লজ্জা দিয়াছেন! এই কবি 'বিক্রমপুরে' কবিতার জুড়ী হাঁকাইয়াছেন। 'আবাহনে'র সঙ্গে 'শারদ সঙ্গীত' জুড়িয়া কল্পনার রাশ ছাড়িয়া দিয়াছেন! 'শারদ সঙ্গীত' যে 'আবাহন' দাম টাট্টুর তুল্যমূল্য, তাহা আমরা অস্বীকার করিব না। আশা করি, কবিবর কুলচন্দ্র অতঃপর 'বিক্রমপুরে' কবিতার চৌঘুড়ী হাঁকাইবেন। শ্রীপরিমলকুমার ঘোষের 'আবাহন' পড়িয়া মনে হইল, 'একস্য দুঃখস্য ন যাবদন্তং তাবদ্বিতীয়ং সমুপস্থিতং মে!'

'এস গো মম দয়িততমা, এস গো চিরবাঞ্ছিতা!

কুঞ্জ-হিয়া মুঞ্জরিয়া চরণে'

কুঞ্জের হিয়া, তাহা আবার চরণে মুঞ্জরিয়া! আর এক স্থানে দেখিতেছি, 'মন্দিরা মোহচঞ্চলা!' 'মন্দিরা' কি? এ যুগের বালখিল্য কবিরাও সেই নৈয়ায়িকের মত। ইঁহাদেরও 'অর্থাণি তাৎপর্য্যং শব্দানি কোশ্চিন্তা!' 'বঁধু! কি আর বলিব আমি!' 'তোমারই ইচ্ছা হউক পূর্ণ করুণাময় স্বামী!'

স্বাস্থ্য-সমাচার। শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষের 'নিরীহ নরঘাতিনী' উপন্যাসের মত কৌতূহলোদ্দীপক; কীটাণুর ধ্বংসলীলার কাহিনী। 'ক্ষয়রোগ' নামক সুলিখিত, সুচিন্তিত নিবন্ধেই এ মাসের 'স্বাস্থ্য-সমাচার' পূর্ণ। আমরা প্রত্যেক বাঙ্গালীকে এই প্রবন্ধ পড়িতে, এবং ইহাতে বিবৃত জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ স্ব স্ব পরিবারে ও পরিচিত সমাজে প্রচার করিতে বলি। এই নিবন্ধ পুস্তিকাকারে ছাপিয়া বিতরণ করিলে দেশবাসী সাবধান হইতে পারেন। রোগীর মনে বেদনা দিবার ভয়ে, অনেক সময়ে আমরা জানিয়া শুনিয়াও সমগ্র পরিবারের ও সমাজের সর্ব্বনাশ করি। বলিতে গেলে, জীবাণু যেমন সংক্রামক রোগের বাহন, আমরাও তেমনই জীবাণুর বাহন, হইয়া পড়িয়াছি। আত্মহত্যা পাপ; নিজের অসাবধানতায় বা ইচ্ছাকৃত উদাসীনতা দ্বারা অন্যের জীবন বিপন্ন করা নরহত্যার নামান্তর;—তাহা মহাপাপ। আমরা সেই মহাপাপে লিপ্ত হইয়া জাতির ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করিতেছি। একটু সাবধান হইলে সংক্রামক রোগের অবাধ বিস্তার সম্ভব হয় না। এই সকল কথার বহুল প্রচার হইলে, রোগী স্বয়ং সাবধান হইতে পারিবেন; আত্মীয় স্বজনও রোগীর মনে বেদনা দিবার সম্ভাবনা ও শঙ্কা হইতে মুক্ত হইবেন। না জানিয়াই আমরা সংক্রামক রোগের বিস্তারে সহায়তা করি। জ্ঞান সে সম্ভাবনা দূর করিতে পারে। একটা ব্যক্তিকে বিপন্ন করিবার কাহারও অধিকার নাই। স্বনামধন্য ডাক্তার বসু এইরূপ বিবিধ বিষয়ে জ্ঞানলাভের অবকাশ দিয়া বাঙ্গালীকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিতেছেন। বাঙ্গালীর মনে 'শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্' মুদ্রিত করিয়া দিবার এই পুণ্য-চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে সফল হউক।

'সাহিত্য, ২৬শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা।

বঙ্কিম বাবুর প্রবন্ধ।

সূচনা।

সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের বাঙ্গালা গ্রন্থাবলী শিক্ষিত বাঙ্গালীমাত্রেরই সুপরিচিত। কিন্তু তাঁহার বিবিধ ইংরাজী প্রবন্ধাবলী এ পর্য্যন্ত সংগৃহীত হয় নাই, পুরাতন ও দুষ্প্রাপ্য সাময়িক পত্রাদির পৃষ্ঠায় সেগুলি অনাদৃত অবস্থায় পড়িয়া আছে। কিছুকাল পূর্ব্বে আমরা কতকগুলি এইরূপ প্রবন্ধ সংগ্রহ করিয়া পূজনীয় 'সাহিত্য'-সম্পাদক মহাশয়কে প্রদান করিয়া তাঁহার নিকট প্রস্তাব করি যে, উপযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা সেগুলির অনুবাদ করাইয়া বাঙ্গালী পাঠকগণের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের এই সকল প্রবন্ধের পরিচয় করাইয়া দেওয়া হউক। 'সাহিত্য'-সম্পাদক মহাশয় বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান-সভায় বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক পঠিত দুইটি প্রবন্ধ শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে দিয়া অনুবাদিত করাইয়া 'সাহিত্যে' প্রকাশিত করেন। সন ১৩১৯ সালের কার্ত্তিক মাসের 'সাহিত্যে' 'হিন্দু পূজোৎসবের উৎপত্তি কথা' * ও সন ১৩২০ সালের জ্যৈষ্ঠের 'সাহিত্যে' 'বাঙ্গালীর জনসাধারণের সাহিত্য' প্রকাশিত হয়। এক্ষণে বঙ্কিমচন্দ্রের আর একটি প্রবন্ধের অনুবাদ প্রকাশিত হইল। 'The Study of Hindu Philosophy' বা হিন্দু দর্শনের আলোচনা' বিখ্যাত সাহিত্য-সেবক ৺শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত Mookherjee's Magazine নামক মাসিক-পত্রে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে প্রকাশিত হয়। শম্ভুচন্দ্রকে লিখিত বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকখানি ইংরাজী পত্রে এই প্রবন্ধের উল্লেখ আছে। আমরা এই পত্রাবলীর অংশবিশেষের মর্ম্মানুবাদ নিম্নে প্রদান করিলাম।

(১)

বহরমপুর।
৫ই জানুয়ারী, ৭৩।

প্রিয় শম্ভু,

* * *. আমি তোমার জন্য কিছু লিখিতেছি। উহা একপ্রকার সমাপ্তই

* 'সাহিত্যে' ভুলক্রমে প্রকাশিত হইয়াছিল যে, এই প্রবন্ধটি 'বেথুন সভায়' পঠিত হইয়াছিল।

হইয়াছে, এবং পূর্ব্বেই পাঠাইতাম, কেবল দুই একখানি পুস্তক দেখার প্রয়োজন আছে বলিয়া উহা কিছুদিনের জন্য রাখিয়া দিয়াছি। * * *

ভবদীয়

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।'

(২)

বহরমপুর।

১৯ শে জানুয়ারী, ১৮৭৩।

'প্রিয় শম্ভু,

বহরমপুরে তিনটি উত্তম পুস্তকাগার আছে, এবং আমার প্রয়োজনীয় পুস্তকগুলি সমস্তই পাইয়াছি; কিন্তু সময়াভাবে সেগুলির সদ্ব্যবহার করিতে পারি নাই। ফাল্গুনের বঙ্গদর্শন সম্পাদনের জন্য আমি বড়ই ব্যস্ত ছিলাম। সেই জন্য 'মুখার্জ্জী'র জন্য লিখিত প্রবন্ধটি শেষ করিতে পারি নাই। যাহা হউক, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না, কারণ, উহা সমাপ্ত করিবার জন্য অপেক্ষা করিলে হয় ত উহা তোমার মাসিকপত্রের পক্ষে কিছু দীর্ঘ হইয়া পড়িবে। সেই জন্য প্রবন্ধটি যে অবস্থায় আছে, সেই অবস্থাতেই তোমাকে পাঠাইতেছি। অসম্পূর্ণ হইলেও উহা নিতান্ত অপাঠ্য হইবে না। আশা করি, তুমি উহা গ্রহণ করিবে। তোমার যদি ভাল লাগে, তাহা হইলে আমি ঐ সম্বন্ধে আর একটি প্রবন্ধ পাঠাইয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব।

আমি লেখার খস্‌ড়াটাই পাঠাইতেছি। আমার হস্তাক্ষর অতি জঘন্য, সুতরাং মুদ্রাকরকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইবে। যদি তুমি প্রবন্ধটি প্রকাশিত কর, তাহা হইলে একবার প্রুফটি আমার নিকট পাঠাইবে।

প্রবন্ধটি সযত্নে সংশোধিত করিতেও পারি নাই। যদি তোমার সময় থাকে, একবার ব্যাকরণ-ঘটিত দোষাদি সংশোধিত করিয়া লইও, আমি ব্যাকরণ-শুদ্ধ হইল কি না, ভাল করিয়া দেখি নাই।

ভবদীয়

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।'

(৩)

'বহরমপুর।

৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৭৩।

প্রিয় শম্ভু,

আমি তোমাকে নিরাশ করিয়াছি জানিয়া দুঃখিত হইলাম। কথাটা এই যে, তথা-কথিত 'লঘুসাহিত্য' অপেক্ষা গভীর বিষয়ক রচনা লেখা ঢের সহজ। সেই জন্য আমার ন্যায় কর্ম্মভারাক্রান্ত হতভাগ্যের নিকট শেষোক্ত শ্রেণীর প্রবন্ধ লেখার প্রলোভন অত্যন্ত অধিক হইয়াছিল। আমি যে প্রস্তাবটি তোমাকে পাঠাইয়াছি, তাহা যদি তোমার পছন্দ না হয়, তাহা হইলে রাবিশ-বাস্কেটে ফেলিয়া দিতে পার। আমি যত শীঘ্র সম্ভব তোমার পছন্দমত একটি রচনা পাঠাইব; কিন্তু শীঘ্র যে সে সুযোগ পাইব, তাহা বোধ হয় না। * * *

ভবদীয়

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।'

(৪)

'বহরমপুর।

১৬ই মার্চ্চ, ১৮৭৩।

প্রিয় শম্ভু,

আমি সবেমাত্র গতকল্য সন্ধ্যাকালে আমার প্রবন্ধের শেষ অর্দ্ধাংশের প্রুফ পাইয়াছি। অপর অর্দ্ধাংশ আমি এখনও পাই নাই। ডাকঘর আমার পত্রাদি নিয়মিতরূপে দিয়া থাকে, সুতরাং তাহাকে গালি দিও না। সমস্ত প্রবন্ধটির প্রুফ পাইলেই আমি ফেরত পাঠাইব। দেখিতেছি, আমার সুন্দর হস্তাক্ষর পাইয়া মুদ্রাকর মহাকীর্ত্তিকর কার্য্য করিয়াছেন। আমাকে সুস্পষ্টভাবে লিখিতে বলা মিথ্যা। * *

ভবদীয়

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।'

নিম্নলিখিত পত্র হইতে প্রতীত হয় যে, এই প্রবন্ধটির দ্বিতীয় অংশের পরিবর্ত্তে বঙ্কিমচন্দ্র 'হিন্দুর চিন্তাজগতে শঙ্করাচার্য্যের প্রভাব' সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব লিখিবার সংকল্প করিয়াছিলেন। এই সংকল্প কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না :—

(৫)

'বঙ্গ-দর্শন,

সম্পাদকীয় কার্য্যালয়, বহরমপুর

[তারিখ নাই] ১৮৭২।

প্রিয় মির্জ্জা শম্ভু চন্দ্র,

* * * * * * * *

'হিন্দুদর্শনে'র প্রতিশ্রুত দ্বিতীয় অংশ লেখা অতি দুরূহ ব্যাপার—লিখিতে গেলে আমি মারা যাইব। তোমার মাসিকপত্রের উপযুক্ত প্রবন্ধ লিখিতে হইলে আমাকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নীরস গ্রন্থাদি পাঠ করিতে হইবে! সংস্কৃত ভাষায় সবিশেষ ব্যুৎপত্তি না থাকায় আমার ন্যায় কর্ম্মভারাক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে উহা সম্পাদিত করা দুঃসাধ্য। সাংখ্যদর্শনটিই আমি রীতিমত পড়িয়াছি, এবং সাংখ্য সম্বন্ধে যাহা কিছু বক্তব্য, তাহা আমি পূর্ব্বেই 'কলিকাতা রিবিউ' পত্রে একটি প্রবন্ধে * এবং বঙ্গদর্শনে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধে § প্রকাশিত করিয়াছি। যদি তুমি প্রকাশিত করিতে সম্মত হও, তাহা হইলে আমি উদাহরণস্বরূপ 'হিন্দুর চিন্তাজগতে শঙ্করাচার্য্যের প্রভাব' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া দিব। ইহার জন্যও আমাকে কিছু সময় দিতে হইবে।

ভবদীয়

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।'

শ্রীমন্মথ নাথ ঘোষ।

হিন্দু দর্শনের আলোচনা।

[স্বর্গীয় সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহোদয়ের ইংরেজী প্রবন্ধ হইতে সঙ্কলিত।]

এ পর্য্যন্ত হিন্দু-দর্শনের, এবং সভ্যতার বিকাশে উহার প্রভাবের যথার্থ মূল্য নির্ণয়ের কোনও বিশেষ চেষ্টা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। সাধারণতঃ অনুমিত হইয়া থাকে যে, ভারতবর্ষের সীমার বাহিরে হিন্দুসভ্যতার প্রভাব বিস্তারিত হয় নাই। বোধ হয়, মোটের উপর এই অনুমান সত্য। গ্রীসের

* ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ১০৬ সংখ্যক 'কলিকাতা রিবিউ' পত্রে প্রকাশিত "Buddhism and the Sankhya philosophy" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

§ সন ১২৭৯ সালের (প্রথম বর্ষের) 'বঙ্গদর্শনে'র পৌষ সংখ্যা হইতে 'সাংখ্যদর্শন' প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়।

এবং গ্রীসের মধ্য দিয়া সমগ্র য়ুরোপের সহিত ভারতবর্ষের মানসিক সম্বন্ধ যে কিরূপ ছিল, তাহা সম্পূর্ণরূপে নির্দ্ধারিত করা বোধ হয় অসম্ভব। কিন্তু হিন্দুর চিন্তার ধারা সমগ্র ভূমণ্ডলে কি ভাবে প্রবাহিত ছিল, সে প্রশ্ন ছাড়িয়া দিলেও, হিন্দুর মানসিক বিকাশের ইতিহাসের যে একটি স্বতন্ত্র মূল্য আছে, তাহা এ পর্য্যন্ত সকলে সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। ইতিহাসপাঠকের নিকট য়ুরোপ সভ্যতার অধিকতর পরিণত অবস্থার চিত্র উপস্থাপিত করে, উন্নতি ও ধ্বংস কিরূপে প্রতিহত হইয়াছে, ভারতবর্ষ, নীরস হইলেও, তাহার অধিকতর শিক্ষাপ্রদ দৃষ্টান্তের অবতারণা করে। জীবতত্ত্বের (Physiology) সহিত রোগনিদান শাস্ত্রের (Pathology) যে সম্বন্ধ, য়ুরোপের মানসিক উন্নতির ইতিহাসের সহিত ভারতবর্ষের জ্ঞানোন্নতির ইতিহাসের সেই সম্বন্ধ; সভ্যতার অবিকৃত ও অপ্রতিহত বিকাশের নিয়মাদিনির্দ্ধারণে একের আলোচনা সাহায্য করে; সভ্যতার রোগ ও বিনাশের কারণাদির অনুসন্ধানে অপরের আলোচনায় অধিকতর সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া যায়।

য়ুরোপে ক্রমে ক্রমে সংস্কৃত সাহিত্যাদির আলোচনা হইতেছে, এবং ইহা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে, ভারতবর্ষের সাহিত্য ও ইতিহাস বর্ত্তমান কালের য়ুরোপীয় পণ্ডিতদিগের সাগ্রহ দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, পৌরাণিক ও ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্বন্ধীয় সাহিত্যই সুধীবৃন্দের চিত্ত আকৃষ্ট করিতেছে; হিন্দুর ইতিহাসের উত্তরযুগে উচ্চতর বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে মানসিক বিকাশের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার আলোচনায় তাঁহারা মোটেই মনোযোগী নহেন। অবশ্য ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, সকল আর্য্যজাতির প্রাথমিক বিশ্বাসের সহিত হিন্দু পৌরাণিক উপাখ্যানাদির সত্য বা কল্পিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকায় হিন্দুর পৌরাণিক সাহিত্য বিশ্বজনীন কৌতূহলের উদ্দীপক; পক্ষান্তরে, কেবলমাত্র ভারতবর্ষের নিজস্ব বলিয়াই হিন্দুদর্শনের আদর। বাস্তবিক আমরা এই দেশের সন্তান বলিয়া আমাদের নিকট হিন্দু পুরাণ অপেক্ষা হিন্দুদর্শনের অনুশীলনই অধিকতর প্রয়োজনীয়। যাহা সকল জাতির সাধারণ সম্পত্তি—যাহা বিশ্বজনীন—যাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য প্রত্নতত্ত্বের কুহেলিকায় আচ্ছন্ন, তাহার অপেক্ষা, যাহা আমাদের দেশের নিজস্ব, যাহা আমাদের অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী ও বোধগম্য, তাহাই আমাদিগের অধিকতর চিত্তাকর্ষক।

কিন্তু হিন্দুদর্শন যে একটি অতি প্রয়োজনীয় আলোচনার বিষয়, এ পর্য্যন্ত আমরা কোনও প্রকারে তাহা স্বীকার করিবার প্রবৃত্তি দেখাই নাই। সত্য বটে,

নদীয়ার নিভৃত টোলে এবং সংস্কৃত শিক্ষার অন্যান্য কেন্দ্রে এখনও হিন্দুদর্শন সসম্ভ্রমে অধ্যাপিত ও ভক্তিসহকারে অধীত হইয়া থাকে; কিন্তু টোলে যে ভাবে দর্শনাদি অধীত হয়, তাহাতে কোনও সুফল প্রসূত হয় না। পণ্ডিতেরা যে ভাবে দর্শনের অধ্যাপনা করেন, তাহাতে কেবলমাত্র বাক্‌চাতুরী শিক্ষা দেওয়া হয়, এবং বৃথা বাক্‌বিতণ্ডার নৈপুণ্যই সাধারণতঃ দর্শনজ্ঞানের প্রকৃষ্ট পরিচায়ক বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। যেখানে পাঁচটি বর্ণই যথেষ্ট, সেখানে জগদীশ কেন নয়টি বর্ণ প্রয়োগ করিলেন, গদাধরের টীকায় ব্যবহৃত একটি অনিশ্চিতার্থ শব্দের কতগুলি বিভিন্ন অর্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে, এই সকল প্রশ্নের মীমাংসাই মানববুদ্ধির উচ্চতম অনুশীলনের বিষয় বলিয়া অনুমিত হয়। যদি কোনও শুভদৈবপ্রভাবে টোলের দর্শনশাস্ত্র অকস্মাৎ পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হয়, তাহা হইলে মানবজাতির সংগৃহীত প্রয়োজনীয় জ্ঞানরাশির কিছুমাত্র ক্ষতি হইবে না।

হিন্দুদর্শন হিন্দুর নিকট দুই ভাবে আলোচনীয়। প্রথমতঃ, আমরা ইহা শাস্ত্র বলিয়া, ইহাতে যে জ্ঞানরত্ন সঞ্চিত আছে, তাহা লাভ করিবার জন্য ইহার আলোচনা করিতে পারি। দ্বিতীয়তঃ, ইহা হইতে ভারতের অতীত কাহিনী, যে সকল সামাজিক মহাপরিবর্ত্তন ভারতবর্ষে সংঘটিত হইয়াছে, এবং অনেক সময়ে যাহার মূলে বা ফলে এই শাস্ত্রই বিদ্যমান দেখা যায়—অতি বিশদভাবে উজ্জ্বলতর আলোকে আমাদের নিকট প্রতীয়মান হয়। সকলেই স্বীকার করিবেন যে, য়ুরোপের বিজ্ঞান ও দর্শন এক্ষণে আমাদের মধ্যে যে অত্যুজ্জ্বল আলোকধারা বর্ষণ করিয়াছে, তাহাতে হিন্দুদর্শনশাস্ত্রলব্ধ প্রকৃতিবিষয়ক জ্ঞান নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতিভাত হয়।

হিন্দু দর্শনশাস্ত্রের প্রধান মূল্য পুরাতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের হিসাবে। যে সকল দার্শনিক মত ভারতবর্ষে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, তদ্দ্বারাই ভারতের ভাগ্যচক্র পরিচালিত হইয়াছে, তদ্দ্বারাই ভারতবাসীর চরিত্র গঠিত হইয়াছে, তাহা হইতেই হিন্দু ঐহিক সুখকে অবজ্ঞা করিতে ও কর্ম্ম হইতে নিবৃত্তিকেই সুখের পরাকাষ্ঠা বলিয়া বিবেচনা করিতে শিখিয়াছে; বস্তুতঃ দেশবাসিগণের চরিত্রের সমস্ত দোষ গুণই উক্ত দার্শনিক মতসমূহ হইতেই উদ্ভূত। সুতরাং এই হিসাবে হিন্দুদর্শন-শাস্ত্রের আলোচনার প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক। কিন্তু এ বিষয়ের আলোচনায় এতদ্দেশীয় পণ্ডিতদিগের কোনও ঔৎসুক্য লক্ষিত হইতেছে না। এ পর্য্যন্ত যে সকল ভারতবাসী এ দেশের পুরাবৃত্ত সম্বন্ধে আলোচনা করিতে অগ্রসর হইয়া-

ছেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই য়ুরোপীয়গণের পন্থা অনুসরণ করিয়াছেন, বিদেশীয় দিগ্‌গজদিগের নির্ম্মিত পর্ব্বতপ্রমাণ অট্টালিকার উপর কয়েক মুষ্টি মশলা নিক্ষেপ করিয়াছেন মাত্র। * য়ুরোপীয়গণের দৃষ্টান্ত ও উৎসাহ দ্বারা অনুমোদিত না হইলে কোনও কার্য্যই আমাদের ভাল লাগে না; তাঁহারা যে সকল পর্ব্বতশিখরে আরোহণ করিতে চেষ্টা করেন নাই, আমরা তাহাতে উঠিতে সাহস করি না। ইহা যে আমাদের অধুনাতন দেশবাসিগণের মানসিক চরিত্রের দুর্ব্বলতার ও উদ্ভাবনী শক্তির হীনতার প্রমাণ, তাহা দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইবে। য়ুরোপীয়গণের পদাঙ্ক না দেখিলে আমরা কোনও পথে চলিতে সাহস করি না। নূতন পথে চলিবার আমাদের সাহসেরই অভাব, ক্ষমতার অভাব নাই। সর্ব্বদাই অকৃতকার্য্য হইবার একটা বিভীষিকা আমাদের নয়নসমক্ষে বর্ত্তমান থাকে, এবং সেই বিভীষিকাই আমাদের অকৃতকার্য্যতার প্রধান কারণ হইয়া উঠে।

য়ুরোপে হিন্দু দর্শনশাস্ত্রের চর্চ্চা একবারে উপেক্ষিত হয় নাই বটে, কিন্তু উহার যথার্থ তাৎপর্য্য এ পর্য্যন্ত সম্যক্ উপলব্ধ হয় নাই। উহা বুঝিতে এখনও বিলম্ব আছে। দেশবাসিগণই শিক্ষারম্ভের সময় হইতে দেশের প্রচলিত প্রণালীতে চিন্তা করিতে শিখে; সুতরাং শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে। বিদেশীয়ের নিকট তাহা দুর্ব্বোধ ও অদ্ভুত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এই জন্যই য়ুরোপে হিন্দুদর্শনের আলোচনা নিষ্ফল হইয়াছে। পক্ষান্তরে, একশ্রেণীর দেশীয় পণ্ডিত আজীবন একাগ্রতার সহিত উক্ত শাস্ত্রের অনুশীলন করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহারা কেবল তর্ক ও বিতণ্ডাবিদ্যারূপেই উহা শিক্ষা করেন। এরূপ অনুশীলনও নিষ্ফল। যাঁহারা য়ুরোপীয় বিজ্ঞান শাস্ত্রের সহিত পূর্ণপরিচয়জনিত গভীর জ্ঞানের দ্বারা এই কার্য্যের বিশেষ যোগ্যতা লাভ করিয়াছেন, এইরূপ দেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তিগণই হিন্দু দর্শনশাস্ত্রকে মানবজাতির সংকীর্ত্তির ইতিহাসে যথাযোগ্য স্থানে স্থাপিত করিতে পারিবেন।

কিন্তু কোনও শাস্ত্রের আলোচনা করিতে হইলে একটা বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইবে, নতুবা কোনও ফল হইবে না। যাঁহারা কেবল জ্ঞানতৃষ্ণাবশতঃ জ্ঞানচর্চ্চা করেন, তাঁহারা প্রায়ই উদ্দেশ্যবিহীন ও বিশৃঙ্খলভাবে কার্য্য করেন।

* ভারতবাসীমাত্রই গৌরবের সহিত স্মরণ করিবেন যে, তাঁহাদের মধ্যে অন্ততঃ এক জন এরূপ প্রতিভাশালী প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ছিলেন, যাঁহার প্রতি উল্লিখিত বাক্য প্রযুক্ত হইতে পারে না। [বলা বাহুল্য, বঙ্কিমচন্দ্রের এই মন্তব্য ভারতগৌরব রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত। শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ।]

অন্যান্য বিদ্যার আলোচনায় তাহাতে উপকার হইতে পারে, কিন্তু উক্তভাবে হিন্দু শাস্ত্রের আলোচনা করিলে কোনও উপকার নাই। হিন্দু দর্শন অধ্যয়ন করিতে হইলে কতকগুলি লক্ষ্য স্থির করিতে হইবে, নতুবা উহা বিড়ম্বনা মাত্র। আমার বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য এমন কতকগুলি প্রধান লক্ষ্য নির্দ্দেশ করা, যাহার প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

১। হিন্দু পুরাণের সহিত হিন্দু দর্শনের সম্বন্ধ।—যাঁহারা পুরাণ বা দর্শন সম্বন্ধে কিছুমাত্র আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকের এইরূপ একটা অস্পষ্ট ধারণা আছে যে, পুরাণ হইতেই দর্শনের উৎপত্তি। আবার কেহ কেহ মনে করেন যে, যখন পৌরাণিক ধর্ম্মের প্রতি লোকের অনাস্থা জন্মে, এবং অবশেষে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয়, তখন সেই বিপ্লবের ফলে বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদগুলির উদ্ভব হয়, এবং তন্মধ্যে কতকগুলি যেমন জাতীয় ধর্ম্মের বিরুদ্ধমত প্রচার করে, তেমনই কতকগুলি উক্ত ধর্ম্মের রক্ষা ও জ্ঞানানুমোদিত ভিত্তির উপর পুনঃস্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রচারিত হয়। এ সমস্তই সম্ভবতঃ সত্য, কিন্তু ইহা হইতে ইতিহাসের মহাসমস্যাগুলির মীমাংসা হয় না। আমরা দেখিতে পাই যে, যে স্থানে একদিকে উদ্বুদ্ধ বিবেকবাদ ও অপর দিকে কঠোর সংশয়বাদ প্রতিষ্ঠা-লাভ করিয়াছে, সেই স্থানেই উভয়ের পার্শ্বে পৌরাণিক ধর্ম্ম তাহার বিরাট গ্রন্থাবলী ও হাস্যোদ্দীপক আচারপদ্ধতি লইয়া উন্নতশীর্ষে বিরাজমান,—এমন কি, উভয়ের উপর নিজের জেতৃত্ব ঘোষণা করিতেছে। ইহার কারণ কি? পুরাণ হইতে দর্শন উদ্ভূত হইয়াছে, এ কথা স্বীকার করিলেও, কেমন করিয়া প্রত্যেক পৌরাণিক গল্প হইতে দার্শনিক তত্ত্ব বিকশিত হইল, তাহাও নির্ণয়যোগ্য। সর্ব্ব-শেষে ইহাও নির্ণয় করা বিশেষ প্রয়োজন যে, আমাদের দেশীয় চিন্তাপ্রণালী, দর্শন ও পুরাণ উভয়ের মধ্যেই সমভাবে বিদ্যমান; এবং যাহা হইতেই দর্শন ও পুরাণ ও আমাদের জাতীয় স্বভাব বিশেষত্ব লাভ করিয়াছে, তাহাই বা কিরূপ?

আমার উদ্দেশ্য একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করিব। হিন্দু দর্শন ও পুরাণ, উভয়ের মধ্যেই ত্রিগুণবাদের অস্তিত্ব দেখা যায়। দর্শন শাস্ত্রে পরমাত্মার ত্রিগুণ সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, উল্লিখিত হইয়াছে। পরমাত্মার এই ত্রিবিধ গুণের প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ পুরাণে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের উল্লেখ দেখা যায়। বৈদিক সাহিত্যে এই ত্রিমূর্ত্তির উল্লেখ নাই। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে আমরা অগ্নি, বায়ু ও সূর্য্য নামক অপর একটি ত্রিমূর্ত্তির সাক্ষাৎ পাই। পৌরাণিক ত্রিমূর্ত্তি এই পুরাতন বৈদিক ত্রিমূর্ত্তির প্রতিনিধিস্বরূপ (নিরুক্ত ৭-৫)। এই বৈদিক ত্রিমূর্ত্তি আবার জ্যোতির

নামান্তর। পৃথিবীসম্ভূত জ্যোতির নাম অগ্নি, অন্তরীক্ষসম্ভূত জ্যোতির নাম বায়ু, এবং আকাশসম্ভূত জ্যোতির নাম সূর্য্য (নিরুক্ত ১২·১৯)। জ্যোতির এই ত্রিমূর্ত্তির মূল ঋগ্বেদোক্ত বিষ্ণুর ত্রিবিক্রম বলিয়া দর্শিত হইয়াছে। নিরুক্তে এইরূপ ব্যাখ্যা আছে—"যদিদং কিঞ্চ তদ্বিক্রমতে বিষ্ণুঃ। ত্রিধা নিধত্তে পদং। ত্রেধা ভাবায় পৃথিব্যাং অন্তরীক্ষে দিবি ইতি শাকপূণিঃ।" ঋগ্বেদের যে ঋকের এই স্থলে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহা এই:—"ইদং বিষ্ণুর্ব্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং" ইত্যাদি। সুতরাং অন্ততঃ এই স্থলে আমরা একটি দার্শনিক মতের মূল ঋগ্বেদোক্ত একটি উপাখ্যানের মধ্যে দেখিতে পাই। উল্লিখিত পরমাত্মার ত্রিগুণত্ববাদের এইরূপ অদ্ভুত কল্পনা কিরূপে উদিত হইয়াছিল, তাহার অন্য কোনও সঙ্গত কারণ দেখা যায় না।

যিনি বৈদিক যুগে প্রথম সূচনা হইতে বৌদ্ধযুগে পূর্ণবিকাশ পর্য্যন্ত হিন্দু-সন্ন্যাসধর্ম্মের ইতিহাস রচনা করিবেন, তিনি সমগ্র ভারতবর্ষের কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন। য়ুরোপের মধ্যযুগে সন্ন্যাসধর্ম্ম কিরূপ অমঙ্গলকর প্রভাব বিস্তৃত করিয়াছিল, তাহা ভয়ঙ্কর-বিবর-বর্ণনে অদ্বিতীয় লেকি (Lecky) অতি স্পষ্ট-ভাবে প্রদর্শিত করিয়াছেন; কিন্তু ভারতবর্ষ অপেক্ষা পৃথিবীর আর কোনও দেশে উক্ত ধর্ম্মের কুপ্রভাব হইতে অধিকতর শোচনীয় ফল প্রসূত হয় নাই। পুরাণ ও দর্শন, উভয় শাস্ত্রেই সন্ন্যাস ধর্ম্মের গভীর ছায়া পড়িয়াছে। বকল্ (Buckle) দেখাইয়াছেন, প্রকৃতির গম্ভীর দৃশ্যাদি এবং অপরাজেয় শক্তি হইতে কিরূপে কুসংস্কারের জন্ম হয়। মানুষ কল্পনাবলে এই সকল অদ্ভুত রহস্যময় প্রাকৃতিক শক্তির প্রতি ইচ্ছাশক্তি ও অতিমানুষিক কামাচার ও অপকার করিবার ক্ষমতার আরোপ করিয়া থাকে। একবার যখন মানুষ স্বীকার করিয়া লয় যে, এই সকল শক্তির দোষ গুণ বিচারের অধীন ক্ষমতা আছে, এবং ইহারা রুষ্ট বা তুষ্ট হইতে পারে, তখন সে ইহাও স্বীকার করিয়া লয় যে, মানুষের ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত কার্য্যকলাপ দর্শন করিয়া তাহারা প্রায়ই অসন্তুষ্ট হইয়া থাকে। ইহা হইতেই পাপের অনুভূতি। পাপের অনুভূতি হইতেই প্রায়শ্চিত্তের উৎপত্তি। রুষ্ট দেবতাদিগকে তুষ্ট করিবার জন্য উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন। যতদিন মানবজাতি অনুতাপবাদের উন্নত মার্গ অবলম্বন করিতে না পারে, ততদিন শারীরিক ক্লেশস্বীকারই প্রায়শ্চিত্তের একমাত্র পথ বলিয়া অনুমিত হয়। ইহা হইতেই হিন্দুধর্ম্মে সন্ন্যাসবাদের উদ্ভব।

দর্শনশাস্ত্র উচ্চতর আদর্শ সন্ধান করিয়া এবং অধিকতর যুক্তিসঙ্গত ভিত্তির

উপর দণ্ডায়মান হইয়া পাপবাদ পরিহার করিয়াছিল। কিন্তু মূল কারণগুলি সমভাবেই বিদ্যমান ছিল। প্রকৃতির অসীম শক্তিনিচয় সর্ব্বদিকেই অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তারিত করিয়াছিল। পুরাকালে জীবিকার উপকরণাদি অতি সামান্যই ছিল। এতদ্দেশের প্রাকৃতিক অবস্থাও এরূপ ছিল যে, মানুষের ক্ষুদ্র শক্তি সহজেই প্রতিহত ও পরাজিত হইত। এই সকল কারণে মানবজীবন দুর্ব্বিষহ বোধ হইত। ধর্ম্মশাস্ত্রবিদ্‌গণ যাহা রুষ্ট দেবতার অভিশাপ বলিয়া বোধ করিতেন, হিন্দু দার্শনিকগণ তাহা প্রকৃতির অপরাজেয় শক্তির স্বাভাবিক নিয়মের অনুযায়ী বলিয়া বিবেচনা করিতেন। এই কারণে ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত পাপবাদের স্থলে দর্শন-শাস্ত্রে দুঃখবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই পাপবাদ ও দুঃখবাদ যথাক্রমে হিন্দু পুরাণ ও হিন্দু দর্শনের সর্ব্বত্র সমভাবে পরিদৃশ্যমান। সাংখ্যদর্শনের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য—ভোগনিবৃত্তি দ্বারা দুঃখনিবৃত্তি। বৌদ্ধ দর্শন ভোগনিবৃত্তিতেই সন্তুষ্ট নহে। উহার মতে, আত্মার নিবৃত্তি বা নির্ব্বাণই মোক্ষলাভের একমাত্র উপায়। বেদান্তমতে ঐহিক দুঃখসমূহ অসত্য, এবং এই পরিদৃশ্যমান জগৎ মায়াময়। যোগদর্শন মোক্ষলাভের উপায়-নির্দ্ধারণে নিরাশ হইয়া প্রাকৃতিক শক্তিকে প্রতিহত করিবার নিমিত্ত এক অদ্ভুত প্রণালীর সৃষ্টি করিয়াছে। সকল শ্রেণীর দার্শনিকেরাই মানবজন্মের অশেষ দুঃখের চিন্তায় অভিভূত হইয়া এই দুঃখনিবারণের জন্য তাঁহাদের সকল শক্তির প্রয়োগ করিয়াছেন। যে বিস্তৃত ক্ষেত্রে পাপবাদ ও দুঃখবাদ, এই দুইটি প্রধান মত প্রসারিত হইয়াছে, এবং সন্ন্যাস-বাদ, অদৃষ্টবাদ, রাজনীতিক বিষয়ে অবহেলা, এবং কাব্যাদিতে আদিরসাধিক্যের কারণস্বরূপ হইয়াছে—সেই বিস্তৃত ক্ষেত্র হিন্দুমাত্রের সাগ্রহে অনুশীলনের যোগ্য।

২। হিন্দুদর্শনের সহিত বিজ্ঞানের সম্বন্ধ।—ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, আধুনিক য়ুরোপে 'দর্শন' যে সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয়, ভারতবর্ষে কখনও উহা সে অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। ভারতবর্ষে উহা প্রকৃতির জ্ঞানের সমার্থবাচক ছিল। সুতরাং বিজ্ঞান দর্শনেরই অঙ্গীভূত ছিল। প্রাচীন হিন্দুগণ একটি ভুল প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন। অত্যধিক ভক্তিভাব থাকিলে প্রায়ই Deductive প্রণালী ভিন্ন কোনও প্রণালী অবলম্বিত হয় না। সুতরাং হিন্দুরা কেবলমাত্র বিশুদ্ধ Deductive প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন, সূক্ষ্মভাবে পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা, দর্শন ও বিজ্ঞানের আলোচনায় উপেক্ষিত হইত। এমন কি, Deductive প্রণালীমতেও যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, তাহাও অনেক স্থলে গৃহীত হয় নাই। অনেক সময়ে ভিত্তিহীন বাক্যকে বিচারের

মূলস্বরূপ গ্রহণ করিয়া তর্কশাস্ত্রানুমোদিত অভ্রান্ত সূত্রাদির প্রয়োগ করিয়া প্রাচীন হিন্দু দার্শনিক অদ্ভুত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া, তাঁহাদের শ্রম সার্থক জ্ঞান করিতেন। প্রতিভাশালী ব্যক্তির মনে সময়ে সময়ে দার্শনিক সত্যের উজ্জ্বল আলোক স্বতঃই প্রতিভাত হইয়া থাকে; কিন্তু হিন্দু ঋষিগণ এই সকল সত্য হইতেও তর্ক দ্বারা চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার প্রয়াস পাইতেন না।

যখন ফ্লোরেন্সের উদ্যানরক্ষকগণ দেখিল যে, জলোত্তোলন যন্ত্রে বত্রিশ ফিটের অধিক উচ্চে জল উঠিল না, তখন টরিচেলির মনে সহসা এই সত্য প্রতিভাত হইল যে, জলের উপরিস্থিত বায়ুর পীড়নই উহার কারণ। কিন্তু টরিচেলি এই অনুমান করিয়াই নিশ্চিন্ত হন নাই। তিনি এইরূপ ভাবিলেন যে, যদি বায়ুর পীড়নবশতঃই জল উঠে, তবে উক্ত কারণে পারদও উঠিবে। তিনি একটি কাচনির্ম্মিত নল পারদে পূর্ণ করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার অনুমান সত্য। এই সত্যাবিষ্কার অল্প গৌরবের বিষয় নহে; কিন্তু য়ুরোপীয় অধ্যবসায় এই আবিষ্কারেই ক্ষান্ত হয় নাই। প্যাস্ক্যাল ভাবিলেন যে, যদি বায়ুর চাপেই কাচনির্ম্মিত নলের মধ্যে পারদ উঠিয়া থাকে, তবে আমরা যত উর্দ্ধে উঠিব, ততই বায়ুর ভার কমিয়া যাওয়ায় পারদ নামিতে থাকিবে। তিনি একটি ব্যারোমিটার লইয়া পাই দি ডোমের (Puy the dome) শীর্ষদেশে উঠিয়া দেখিলেন যে, পারদ নামিয়া গিয়াছে।

টরিচেলির পরিবর্ত্তে যদি কোনও হিন্দু দার্শনিক এই সত্যের আবিষ্কার করিতেন, তাহা হইলে তিনি কেবল একটি সংক্ষিপ্ত সূত্রে 'বায়ুর ভার আছে' এই উক্তি করিয়াই নিরস্ত হইতেন। বায়ুর চাপের পরিমাণ কত, তাহা বলিতেন না। তিনি পারদ লইয়াও কোনও পরীক্ষা করিতেন না। কোনও হিন্দু প্যাস্ক্যাল ব্যারোমিটার লইয়া হিমালয়শিখরে আরোহণ করিতেন না। এতৎসদৃশ আর একটি দৃষ্টান্ত দেখা যাউক। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পৃথিবীর দৈনন্দিন গতির আভাস পাওয়া যায়। আর্য্যভট্ট স্পষ্টভাবে উক্ত গতির উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, নক্ষত্রমণ্ডল স্থির আছে। পৃথিবীর অবিরাম আবর্ত্তনবশতঃই গ্রহনক্ষত্রাদির উদয়াস্ত দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত সূর্য্যের দৃশ্যমান বার্ষিক গতি ও গ্রহদিগের সাময়িক গতির বিষয়ও সকলেই জানিতেন। এই তিনটি সত্য, অর্থাৎ পৃথিবীর দৈনিক আবর্ত্তন, নক্ষত্রদিগের নিশ্চলতা এবং সূর্য্যের দৃশ্যমান বার্ষিক গতি হইতে একমাত্র সিদ্ধান্ত হইতে পারে যে, সূর্য্যই সৌরজগতের কেন্দ্র। কিন্তু এই অভিমত কখনও স্পষ্টভাবে প্রচারিত হয় নাই—কখনও প্রমাণিত করিবার চেষ্টা হয় নাই—কখনও সত্য বলিয়া গৃহীত হয় নাই—এবং ইহা হইতে

জ্যোতিষ শাস্ত্রের অন্যান্য নিয়মগুলি আবিষ্কৃত করিবার চেষ্টা হয় নাই। আধুনিক য়ুরোপে কোপার্নিকসের অনুমান হইতে কেপ্‌লারের নিয়মগুলির এবং সুবিখ্যাত মাধ্যাকর্ষণবাদের আবিষ্কার অবশ্যম্ভাবী হইয়াছিল। কিন্তু ভারতবর্ষে আর্য্যভট্ট যে প্রশংসনীয় আবিষ্কার ঘোষণা করিলেন, তাহা হইতে যে আর কিছু নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইবে না, তাহা একপ্রকার নিশ্চিত ছিল।

এইরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু কথাটা এই যে, ভারতবর্ষ কি মানবজাতির জ্ঞানভাণ্ডার কিছুমাত্র সমৃদ্ধ করে নাই? অবলম্বিত প্রণালীর দোষগুলি কি অসাধারণ মনীষাবলে নিরাকৃত হয় নাই? তবে কি ভারতবর্ষের মানসিক বিকাশের ইতিহাস কেবলমাত্র ভ্রমপরম্পরার বিবরণমাত্র? যদি না হয়, যদি হিন্দুদর্শনের অন্তর্নিহিত কোনও সংগ্রহযোগ্য সত্য থাকে, তবে তাহা কোথায়, এবং কিরূপে পাওয়া যায়? বিজ্ঞানের ইতিহাসে হিন্দুদর্শনের স্থান কোথায়?

যাঁহারা ভক্তিভরে মিলের কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধীয় নিয়মের ব্যাখ্যা পাঠ করিবেন, তাঁহারা দেখিয়া বিস্মিত হইবেন যে, মিল যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, হিন্দু নৈয়ায়িকগণও ঠিক সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। মিল 'কারণে'র যে সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহার সার মর্ম্ম এই—'যে পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা বা ঘটনা-পরম্পরা হইতে অপর একটি ঘটনা সর্ব্বদাই ঘটে, কখনও অন্যথা হয় না, সেই ঘটনা বা ঘটনাপরম্পরা শেষোক্ত ঘটনার কারণ বলিয়া অভিহিত হয়।'

এই সংজ্ঞার সহিত নৈয়ায়িকদিগের সংজ্ঞার যথেষ্ট সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। তাঁহারা বলেন, 'অন্যথাসিদ্ধিশূন্যস্য নিয়মপূর্ব্ববর্ত্তিতা কারণত্বম্।'

মিলের সংজ্ঞার দুইটি অংশ, যথা ঘটনাসংযোগ এবং পরবর্ত্তী ঘটনার অনন্যথাত্ব—সংস্কৃত সংজ্ঞায় প্রথমে স্পষ্টভাবে প্রতীত না হইতে পারে। কিন্তু অনুধাবন করিয়া দেখিলে এই আপাতলক্ষিত অসম্পূর্ণতা দূরীভূত হয়। হিন্দু দর্শনে যেরূপ সংক্ষিপ্ত সূত্রের আকারে শিক্ষা দেওয়া হইত, তাহাতে ঘটনাসংযোগের বিষয় স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হওয়া সম্ভব হয় নাই। ঘটনাসংযোগ যে এই সংজ্ঞার বহির্ভূত নহে, ইহাই যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। কিন্তু এই বিষয় অন্য অন্য সূত্রে বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। মিলের unconditionality শব্দের পরিবর্ত্তে ন্যায়ে একটি তদর্থবাচক শব্দের প্রয়োগ না করিয়া প্রকারান্তরে বাগ্‌বাহুল্য দ্বারা ঐ ভাব প্রকাশ করা হইয়াছিল, তাহা অন্য এক স্থান পাঠ করিলে হৃদয়ঙ্গম হয়। মিল unconditionality শব্দের অর্থ বুঝাইবার জন্য দিবা ও রাত্রির দৃষ্টান্ত

দিয়াছেন। দিবার পূর্ব্বে সততই রাত্রি হয় বটে, কিন্তু রাত্রি দিবার কারণ নহে। যে হেতু সূর্য্য না উদিত হইলে দিবা হয় না। সুতরাং দিনকে রাত্রির unconditional' পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা বলা যায় না। 'অন্যথাসিদ্ধিশূন্যস্ত' এই বাক্যের অর্থ ঠিক তাহাই। সূর্য্য না উদিত হইলে দিন হইতে পারে না। সুতরাং সূর্য্যোদয়ই দিবার কারণ, রাত্রি দিবার কারণ নহে—যদিও রাত্রি সততই দিনের পূর্ব্ববর্ত্তী। এই দুইটি সংজ্ঞার সাদৃশ্য নিতান্ত বিস্ময়কর।

আলোচনার বিষয় এই যে, হিন্দুদর্শনের অবিশুদ্ধ অংশ বাদ দিলে এইরূপ বিশুদ্ধ স্বর্ণ কতটুকু পাওয়া যায়?

সচরাচর লোকে যেরূপ অনুমান করে, উহা তত অল্প নহে।

কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধীয় নিয়মের এই দার্শনিক কল্পনা হইতে একটি গভীরতর তত্ত্বের আভাস পাওয়া যায়। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিয়মের দ্বারাই শাসিত বলিয়া প্রতীতি জন্মে। নিয়মই জগতের শাসয়িতা, এই দৃঢ় প্রতীতিই আধুনিক য়ুরোপকে অতীতযুগের য়ুরোপ ও অন্যান্য দেশসমূহের বহু উর্দ্ধে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। এ বিষয়ে আমার বিস্তৃত আলোচনার স্থান নাই। আমি এইটুকুই বলিয়া ক্ষান্ত হইব যে, সাংখ্য ন্যায়াদি উচ্চতর হিন্দুদর্শনে উক্ত নিয়মবাদেরই প্রভুত্ব লক্ষিত হয়। মীমাংসাদি নিকৃষ্টতর দর্শনগুলিতে উহার বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইতে পারে, কিন্তু উৎকৃষ্টতর দর্শনগুলিতে নিয়মের প্রাধান্য স্পষ্টরূপে স্বীকৃত হইয়াছে। উহাতে দৈবহস্তক্ষেপ, বা বিশেষ বিধান, বা অলৌকিক ব্যাপারাদি, এমন কি, জগৎসৃষ্টি পর্য্যন্ত স্বীকৃত হয় নাই। বস্তুতঃ কার্য্য-কারণের নিয়মবাদ একবার দার্শনিক ভাবে স্বীকৃত হইলে, এই ব্রহ্মাণ্ড যে নিয়ম দ্বারাই শাসিত, এই কল্পনাই পরমার্থ-বিষয়ক অন্যান্য সকল কল্পনাকে অপসারিত করিবে, ইহা অবশ্যম্ভাবী। উৎকৃষ্টতর হিন্দুদর্শনগুলিতে তাহাই হইয়াছে।

৩। হিন্দুদিগের রাজনীতিক ও সামাজিক জীবনে হিন্দু-দর্শনশাস্ত্রের প্রভাব।—হিন্দুদর্শন-আলোচকের এইটিই সর্ব্বপ্রধান আলোচ্য বিষয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, বৌদ্ধ ধর্ম্মের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি সাংখ্যাদি দর্শনের নিকট কি পরিমাণে ঋণী, এই একটি প্রশ্নই দর্শন-আলোচকের নিকট অসীম কৌতূহলজনক। কিন্তু আমার প্রস্তাবের এই অংশ এত গুরুতর যে, উহা বর্ত্তমান প্রস্তাবের শেষভাগে বিবৃত করা বিড়ম্বনামাত্র। ভবিষ্যতে এ বিষয়ের আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

উপবাস-তত্ত্ব।

বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্যদেশসমূহে রোগবিশেষে উপবাসের উপকারিতা সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছে। আমাদের দেশে উপবাস একটী নূতন জিনিস নহে। অতি প্রাচীন কাল হইতে বহুদর্শী শাস্ত্রকারগণ সংযম ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য উপবাসের প্রয়োজন বুঝিয়া, উপবাস ধর্ম্মসাধনের একটী প্রধান সহায় বলিয়া প্রচার করিয়া গিয়াছেন। নিষ্ঠাবান্ হিন্দু স্ত্রী-পুরুষ, বার, ব্রত, পূজা ও তিথি উপলক্ষে উপবাস করিয়া থাকেন। হিন্দুর বারমাসে তের পার্ব্বণ, সুতরাং প্রাচীন-সম্প্রদায়ভুক্ত অনেক নরনারীর মাসের মধ্যে ২।৪ দিন উপবাসে কাটিয়া যায়। এদেশে উচ্চ বর্ণের হিন্দু বিধবাগণ মাসের মধ্যে দুই দিন নিরম্বু উপবাস করিয়া থাকেন। হিন্দুরমণীগণ পতি, পুত্র, আত্মীয় স্বজনগণের মঙ্গলকামনায় 'মানত' করিয়া 'সোমবার', 'শুক্রবার' প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বারে আহার পরিত্যাগ করিয়া থাকেন।

শুদ্ধ হিন্দুধর্ম্মে কেন, মুসলমানদিগের মধ্যেও 'রোজা' প্রচলিত আছে। এই পার্ব্বণ উপলক্ষে একমাস কাল তাঁহাদের দিবাহার নিষিদ্ধ। যাঁহারা প্রকৃত ধর্ম্মানুরাগী, তাঁহারা এই সময়ে রাত্রিকালেও স্বল্প ভোজন করিয়া থাকেন। তবে অনেক মুসলমান দিবাভাগে আহার না করিলেও রাত্রিতে এত অধিক আহার করেন যে, উপবাসের জন্য তাঁহাদিগকে কোনও কষ্ট পাইতে হয় না। এ সম্বন্ধে একটী ঘটনা আমার মনে পড়িতেছে। কিছু দিন পূর্ব্বে আমি দিল্লী যাইতেছিলাম। কানপুরে গাড়ী পঁহুছিলে আমার গাড়ীতে ৩।৪ জন সম্ভ্রান্ত মুসলমান উঠিলেন, এবং তাঁহাদের সঙ্গে অন্যান্য আসবাবের সহিত কয়েকটা মুখবাঁধা বড় ডেক্‌চি দেখিলাম। রাত্রিশেষে তাঁহাদের ভাষোপযোগী উচ্চ কথাবার্ত্তায় আমার নিদ্রাভঙ্গ হইলে দেখিলাম যে, তাঁহারা সকলে মিলিয়া ডেক্‌চির মধ্যস্থিত পোলাও, মাংসের কাবাব ইত্যাদি ভক্ষণ করিতেছেন। এত ভোরে লোকের এরূপ আহারে প্রবৃত্তি জন্মে, ইহা আমার ধারণা ছিল না। আহার শেষ করিয়া যখন তাঁহারা ধূমপানে মনোযোগ করিলেন, তখন আমি কৌতূহলবশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাদিগকে এরূপ অসময়ে ভোজনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তাঁহারা হাসিয়া নিজ ভাষায় উত্তর দিলেন, 'বাবু সাহেব, আমাদের "রোজা" চলিতেছে। প্রভাত হইলে সমস্ত দিন ভোজন নিষিদ্ধ, তজ্জন্য ভোর থাকিতে আহার শেষ করিলাম।' আমি মনে মনে হাসিলাম, ভাবিলাম, এ মন্দ উপবাস

নহে। একবার সন্ধ্যার পর 'রোজা' খোলা হইয়াছে, পুনরায় ভোরের সময় এইরূপ গুরুপাক দ্রব্য ভক্ষণ করা হইল, ইহাতে ১২ ঘণ্টা কেন, ২৪ ঘণ্টার মধ্যেও আহার করিবার প্রয়োজন হইবে না।

ইহুদী ও প্রাচীন খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে উপবাসপ্রথা প্রচলিত আছে। ইহুদীদিগের ধর্ম্ম-গ্রন্থে লিখিত আছে যে, তাঁহাদের ধর্ম্মগুরু মোজেস্ (Moses) নিবিড় অরণ্যে চল্লিশ দিন অনশন-ব্রত অবলম্বন করিয়া ধর্ম্ম-সাধনা করিয়াছিলেন। তাঁহারা তাঁহাদিগের পর্ব্বাদি উপলক্ষে এখনও উপবাস করিয়া থাকেন।

বৌদ্ধেরাও তাঁহাদিগের ধর্ম্মানুমোদিত দিবসে নিরশন-ব্রত পালন করিয়া থাকেন।

যাহা হউক, উপবাস ধর্ম্ম-সাধনের অনুকূল কি না, তাহা এ স্থলে বিচার্য্য নহে। স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে উপবাসের উপযোগিতা আছে কি না, তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

আমার প্রথম বক্তব্য এই যে, মানুষ যদি আজীবন পরিমিত-ভোজী হয়, শরীরপোষণের জন্য যে পরিমাণ যে জাতীয় খাদ্যের প্রয়োজন, তাহা যদি নিক্তির ওজনে গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহার উপবাস করিবার প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্যগ্রহণই আমাদের স্বাস্থ্যভঙ্গের মূল কারণ। খাদ্যের এই অতিরিক্তাংশ দেহ-পুষ্টির জন্য গৃহীত হয় না, উহা অন্ত্রমধ্যে থাকিয়া বিকার প্রাপ্ত হয়, এবং নানাবিধ বিষাক্ত পদার্থ (Toxins) উৎপাদন করে। এই সকল বিষাক্ত পদার্থ রক্ত-স্রোতের সহিত মিশ্রিত হইয়া শরীরের সর্ব্বত্র সঞ্চালিত হয়, এবং শারীরিক সমস্ত যন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়া উহাদিগের স্বাভাবিক শক্তির অপচয়, দৌর্ব্বল্য এবং ক্রিয়ার ব্যাঘাত উৎপাদন করে। শিরঃপীড়া, যকৃতের রোগ, অজীর্ণ, উদরাধ্মান, পেট-বেদনা, বমন, উদরাময়, জ্বর প্রভৃতি নানা রোগের মূলকারণ—অন্ত্রের মধ্যে প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্যের পচন। এরূপ অবস্থায় পুনরায় খাদ্য গ্রহণ করিলে উপরোক্ত বিষাক্ত পদার্থসমূহ শরীরের মধ্যে আরও অধিকপরিমাণে সঞ্চিত হয়, সুতরাং পূর্ব্বকথিত রোগগুলির লক্ষণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এবং পরিণামে অন্ত্রশূল, মূত্রশূল, বহুমূত্র প্রভৃতি নানাবিধ দুঃসাধ্য রোগ দেহের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। খাদ্যের এই অতিরিক্তাংশ ও তদুৎপন্ন বিষাক্ত দ্রব্য নাশ করিবার একমাত্র উপায়—উপবাস। আমরা আহার বিষয়ে যত সাবধানই হই না কেন, আমাদিগের বিবেচনায় যত অল্পপরিমাণ আহার গ্রহণ করি

না কেন, আমরা অধিকাংশ সময়ে প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ করিয়া থাকি। অনেক স্থলে মোটের উপর খাদ্যের পরিমাণ অতিরিক্ত না হইলেও বিভিন্নজাতীয় খাদ্যের মাত্রা আমরা ঠিক রাখিতে পারি না। হয় ত ভাত, মিষ্টান্ন (শর্করাজাতীয় খাদ্য) অল্প খাইয়া ঘি দুধ (তৈলজাতীয় খাদ্য) অধিক গ্রহণ করি, অথবা মাছ মাংস প্রভৃতি আমিষ-জাতীয় খাদ্য প্রয়োজনাতিরিক্ত পরিমাণে গ্রহণ করিয়া অনিয়মের বশবর্ত্তী হই। কোনও একজাতীয় খাদ্য অতিরিক্তপরিমাণে খাইলে তাহা পরিপাক না হইয়া উহা হইতে বিভিন্ন বিষাক্ত দ্রব্য উৎপন্ন হয়, এবং বাত রোগ (Rheumatism, gout), পাথরী রোগ (Gravel), বহুমূত্র রোগ (Diabetes) প্রভৃতি নানাবিধ অজীর্ণ-ঘটিত রোগ জন্মিয়া থাকে।

উপবাস করিলে এই সকল বিষাক্ত দ্রব্যের পরিমাণ দেহমধ্যে বৃদ্ধি প্রাপ্ত না হইয়া, যাহা সঞ্চিত থাকে, তাহা ক্রমে ক্রমে দেহ হইতে নির্গত হইয়া যাইবার অবসর প্রাপ্ত হয়। আমরা যে খাদ্য গ্রহণ করি, তাহা নিঃশ্বাস-গৃহীত অক্সিজেন্-সংযোগে দেহমধ্যে মৃদুভাবে দগ্ধ হইয়া (slow conbustion) ক্রমশঃ তাপ ও কার্য্য করিবার শক্তি উৎপাদন করে। যদি উপবাস করা যায়, তাহা হইলে নূতন খাদ্যের অভাবে পূর্ব্ব-সঞ্চিত খাদ্যাংশ ক্রমে ক্রমে দগ্ধ হইয়া নাশ প্রাপ্ত হয়, সুতরাং তাহাদের অপকারিতা দূর হইয়া দেহ নির্ম্মল ও স্ফূর্ত্তিযুক্ত হয়। দীর্ঘ-উপবাসে শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়ে সত্য, কিন্তু দুই চারি দিনের উপবাসে শরীর ক্লেদশূন্য হইয়া যথোচিত স্বচ্ছন্দতা লাভ করিয়া থাকে।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, কতদিন মানুষ উপবাস সহ্য করিতে পারে? এ বিষয়ে মতের বিশেষ অনৈক্য দৃষ্ট হয়। পাশ্চাত্য চিকিৎসা-শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে যে, মানুষ নিরম্বু উপবাস করিলে দশ বার দিন, এবং জল পান করিয়া শুদ্ধ আহার ত্যাগ করিলে এক মাস পর্য্যন্ত, কোনও রূপে বাঁচিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু এই দীর্ঘ উপবাসের পর তাহার অবস্থা এরূপ শোচনীয় হয় যে, খাদ্যাদি গ্রহণ করিলেও অনেক সময়ে সে দুই এক দিনের অধিক বাঁচে না। প্রবল দুর্ভিক্ষের সময়ে এরূপ ঘটনার সমাবেশ বিরল নহে।

বয়স ও শরীরের অবস্থাভেদে অধিক বা অল্পদিন উপবাস সহ্য করিতে পারা যায়। বৃদ্ধ লোকেরা যুবা অপেক্ষা এবং যুবকগণ বালকদিগের অপেক্ষা অধিক দিন উপবাসের কষ্ট সহ্য করিতে পারে। স্থূলকায় ব্যক্তিগণ কৃশ লোকের অপেক্ষা অধিক দিন পর্য্যন্ত উপবাস করিতে পারে। টেলারের (Taylor) মেডিক্যাল্

বাসে মানুষ দশদিন পর্য্যন্ত বাঁচিতে পারে। তিনি তাঁহার পুস্তকে এক জন প্রৌঢ় ব্যক্তির সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, সে মাঝে মাঝে এরূপ গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইত যে, কিছুতেই তাহাকে জাগাইতে পারা যাইত না। একবার ঐ ব্যক্তি ৫দিন ৫ রাত্রি উপর্য্যুপরি গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত ছিল। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তাহাকে ১ ফোঁটা জল বা ১ কণা আহারীয় দ্রব্য গ্রহণ করাইতে পারা যায় নাই। এই সময়ে তাহার শৌচ প্রস্রাব বন্ধ থাকিত। যখন তাহার নিদ্রা ভাঙ্গিত, তখন সে সহজ মানুষের মত ব্যবহার করিত, এবং নিদ্রার পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত ঘটনা তাহার মনে থাকিত। সচরাচর দুই বা তিন দিন ব্যাপিয়া এইরূপ গাঢ় নিদ্রা তাহাকে অভিভূত করিত।

ডাক্তার গাই (Guy) তাঁহার পুস্তকে একখানি জলমগ্ন জাহাজের বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন। তিনি বলেন যে, ১৮ জন আরোহীর মধ্যে ১ জন মাত্র বিনা জল ও আহারে ১৮ দিন পর্য্যন্ত জীবিত ছিল। অবশ্য ইহাদিগকে ১৮ দিন সমুদ্রের উপর ঝড়, বৃষ্টি, রৌদ্র, বিষম শারীরিক ক্লেশ ও মানসিক উদ্বেগ সহ্য করিতে হইয়াছিল; তাহা না হইলে হয় ত আরও কেহ কেহ এতদিন নিরম্বু উপবাস সহ্য করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে সমর্থ হইত। ডাক্তার লায়ন্ (Lyon) তাঁহার মেডিকেল্ জুরিস্প্রুডেন্সে লিখিয়া গিয়াছেন যে, এক জন পাগল শুদ্ধ জল পান করিয়া ৪৭ দিন বাঁচিয়াছিল, এবং আর এক জন পাগল মাঝে মাঝে একটু নেবুর রস ও জল খাইয়া ৬৪ দিন পর্য্যন্ত জীবিত ছিল।

আমেরিকার ডাক্তার ট্যানার্ তাঁহার নিজ দেহে উপবাসের পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি ৪০ দিন পর্য্যন্ত অনাহারে ছিলেন, কেবল মাঝে মাঝে প্রচুর জল পান করিতেন। উপবাসের জন্য তাঁহার শরীরের কোনও ক্ষতি হয় নাই। উপবাসের সময় কতকগুলি ডাক্তার দিবারাত্র তাঁহার নিকট উপস্থিত থাকিয়া তিনি গোপনে আহার করেন কি না, তাহা ধরিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা ট্যানার্কে কোনরূপ খাদ্যগ্রহণ করিতে দেখেন নাই। তথাপি তাঁহারা, মানুষ যে এত দীর্ঘকাল উপবাস করিতে পারে, তাহা বিশ্বাস করেন নাই। ইহার পর এমন অনেক প্রামাণিক ঘটনা জানা গিয়াছে, যাহাতে ট্যানারের পরীক্ষার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইবার কোন কারণ দেখা যায় না।

পঞ্জাবের হরিদাস সাধুর ইতিবৃত্ত-পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ৪০ দিবস পর্য্যন্ত মাটীর নীচের ঘরে নিরম্বু উপবাস অবস্থায় আবদ্ধ থাকিয়াও তাঁহার দেহের কোনও ক্ষতি হয় নাই।

'মেডিকেল্ গেজেট্' নামক পত্রিকায় নিম্নলিখিত ঘটনাটি প্রকাশিত হইয়াছিল :—

এক জন সুস্থকায় বৃদ্ধ ব্যক্তি ঘটনাক্রমে ২৩ দিন একটী কয়লার খনির মধ্যে আবদ্ধ ছিল। এই ২৩ দিন সে এককালীন অনাহারে ছিল। কেবল মাঝে মাঝে নিকটে যে কিয়ৎপরিমাণ পঙ্কিল জল ছিল, তাহাই পান করিয়াছিল। যখন তাহাকে উদ্ধার করা হইল, তখন তাহার বেশ জ্ঞান ছিল। উদ্ধারকর্ত্তা-দিগকে সে চিনিতে পারিয়াছিল ও তাঁহাদের নাম বলিয়াছিল। কিন্তু সে এত কৃশ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল যে, হাত দিয়া মুখে খাবার তুলিবার শক্তি তাহার ছিল না। যথোচিত সেবা শুশ্রূষার পর সেই ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়া বলিয়াছিল যে, প্রথম দুই দিন সে ক্ষুধার জন্য বড় কষ্ট পাইয়াছিল। তাহার পর তাহার ক্ষুধা মোটেই ছিল না, কিন্তু পিপাসার যন্ত্রণায় সে অস্থির হইয়াছিল। ২৩ দিনের মধ্যে ১বার মাত্র তাহার দাস্ত হইয়াছিল, কিন্তু সে সহজ অবস্থার ন্যায় মূত্র ত্যাগ করিত।

চিকিৎসা ও সেবাশুশ্রূষা সত্বেও সে ব্যক্তি তিন দিনের অধিক বাঁচে নাই। তাহার পেট এত ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিল, এবং চামড়া এত পাতলা হইয়া-ছিল যে, হাত দিলেই তাহার শিরদাঁড়ার হাড়গুলি একে একে গণা যাইত। আমাদের দেশে দুর্ভিক্ষের সময়ে এরূপ শোচনীয় দৃশ্য অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে আলেক্জাণ্ডার্ জ্যাক্স্ নামক এক ব্যক্তি ৫০ দিন উপবাস করিয়াছিল। টেলারের মেডিকেল্ জুরিস্প্রুডেন্স্ নামক পুস্তকে এই বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। এই উপবাসের সময় তাহার দেহের ভার ১৭ সের কমিয়া গিয়া-ছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যদিও তাহার শরীর শুষ্ক ও কৃশ হইয়া-ছিল, তথাপি দৈর্ঘ্যে তাহার শরীর ১ ইঞ্চি বাড়িয়াছিল। তাহার একটী গুঁড়া পেটেণ্ট্ ঔষধ ছিল। মধ্যে মধ্যে সে সেই ঔষধ খাইত ও জলপান করিত। ৫০ দিনে সে দুই ছটাক মাত্র ঔষধ গ্রহণ করিয়াছিল। সে বলিত যে, তাহার ঔষধের অপূর্ব্ব ক্ষমতায় সে উপবাস সহ্য করিতে সমর্থ হইয়াছে। পঞ্চাশ দিন উপবাসের পর ১৯শে সেপ্টেম্বর বেলা ৪টার সময়ে সে 'পারণা' করিয়াছিল। প্রথম দুই এক দিন লঘু আহার করিয়া পরে সে পূর্ব্বে যেমন আহার করিত, সেইরূপ ভাবে আহার করিয়া সুস্থশরীরে ছিল।

১৮৯০ সালে শাক্সি (Succi) নামক ইটালীবাসী এক ব্যক্তি ৪০ দিন

উপবাস করিয়া সুস্থশরীরে ছিল। সে প্রচুরপরিমাণে জল পান করিত, এবং মধ্যে মধ্যে মাদকদ্রব্য সেবন করিত।

রোগ-উপশমের জন্য আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে লঙ্ঘনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। লঙ্ঘন অর্থে যে কেবল উপবাস, তাহা নহে। চরক-সংহিতায় উক্ত হইয়াছে যে, অগ্নিবেশের প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া গুরু আত্রেয় উত্তর করিলেন যে, যাহা কিছু লঘুতা-সম্পাদক, তাহাকেই লঙ্ঘন কহে। যথা—

তদগ্নিবেশস্য বচো নিশম্য গুরুরব্রবীৎ।
যৎকিঞ্চিল্লাঘবকরং দেহে তল্লঙ্ঘনং স্মৃতম্॥

উপবাস লঙ্ঘনের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, যথা—

চতুঃপ্রকারা সংশুদ্ধিঃ পিপাসা মারুতাতপৌ।
পাচনান্যুপবাসাশ্চ ব্যায়ামশ্চেতি লঙ্ঘনম্॥

আয়ুর্ব্বেদ-গ্রন্থে জ্বর ও অন্যান্য নানাবিধ রোগের উপশমের জন্য লঙ্ঘনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। লঙ্ঘন সকল স্থলে এককালীন আহার-বিরহিত উপবাস অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই; রোগে লঘু খাদ্য গ্রহণ করিলেও উহা লঙ্ঘন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। জ্বরবিশেষে প্রথম ৭ দিবস লঙ্ঘন করিতে বলা হইয়াছে, কিন্তু জ্বরের উপশম হইলেই সুশ্রুত লঘু আহারের ব্যবস্থা করিয়াছেন, নচেৎ জ্বর বৃদ্ধি হইবার, এমন কি, অতিশয় ক্ষীণ হইয়া মরিয়া যাইবারও সম্ভাবনা। চরক বলিয়াছেন যে, রোগীর বলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া উপবাস দ্বারা চিকিৎসা করিবে। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রকারেরা দীর্ঘ উপবাসের ব্যবস্থা কোথাও করিয়া যান নাই। কোনও কোনও জ্বরে ৭ দিন লঙ্ঘনের ব্যবস্থা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতেও খাদ্য-গ্রহণ একেবারে নিষেধ করেন নাই। তাঁহারা অতিলঙ্ঘন দোষাবহ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, যথা—

পর্ব্বভেদোঽঙ্গমর্দ্দশ্চ কাসঃ শোষো মুখস্য চ।
ক্ষুৎপ্রণাশোঽরুচি তৃষ্ণা দৌর্ব্বল্যং শ্রোত্রনেত্রয়োঃ॥
মনসঃ সম্ভ্রমোঽতীক্ষ্ম ঊর্দ্ধবাতস্তমো হৃদি।
দেহাগ্নিবলনাশশ্চ লঙ্ঘনেঽতিকৃতে ভবেৎ॥

পর্ব্বভেদ, অঙ্গমর্দ্দ, কাস, মুখশোষ, ক্ষুধানাশ, অরুচি, তৃষ্ণা, শোত্র ও নেত্রের দুর্ব্বলতা, মনের ব্যাকুলতা, সর্ব্বদা উর্দ্ধবাত, হৃদয়ের মোহ এবং দেহ ও অগ্নির বলক্ষয়—এই সকল অতিলঙ্ঘনের ফল। চরক সংহিতা—সূত্রস্থান।

তাঁহাদের মতে লঙ্ঘনের উপকারিতা নিম্নলিখিত লক্ষণ দ্বারা বুঝা যায়:—

বাতমূত্রপুরীষাণাং বিসর্গে গাত্রলঙ্ঘনে।
হৃদয়োদ্গারকণ্ঠাস্যশুদ্ধৌ তন্দ্রাক্লমে গতৌ॥
স্বেদে জাতে রুচৌ চৈব ক্ষুৎপিপাসাসহোদয়ে।
কৃতং লঙ্ঘনমাদেশ্যং নির্ব্ব্যথে চান্তরাত্মনি॥

বাতমূত্র পুরীষের ত্যাগ হইলে, শরীরের লঘুতা হইলে, হৃদয়, উদ্গার, কণ্ঠ ও মুখের বিশুদ্ধি হইলে, তন্দ্রা ও ক্লম অপগত হইলে, ঘর্ম্ম হইলে, রুচি বোধ হইলে, ক্ষুৎ পিপাসা হইলে এবং অন্তরাত্মা সম্যক্ প্রকারে ব্যথাহীন হইলে লক্ষণ সম্যক্ হইয়াছে বলা হয়। (চরক সংহিতা—সূত্রস্থান।)

চিকিৎসক-সম্প্রদায়ের বাহিরের লোক এ সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকে তাঁহাদের মত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কোনও কোনও চিকিৎসকও এ বিষয়ে তাঁহাদের অভিজ্ঞতার সমর্থন করিয়াছেন। সিন্‌ক্লেয়ার্ সাহেব তাঁহার Fasting Cure নামক পুস্তকে, তাঁহার নিজ দেহের উপর যে পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা এবং অন্যান্য বিশ্বাসযোগ্য লোকের এ বিষয়ের পরীক্ষার ফল লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বহুদিন নানা রোগ ভোগ করিয়া কোনও চিকিৎসার দ্বারা উপকার লাভ করিতে পারেন নাই। অবশেষে হতাশ হইয়া দীর্ঘ উপবাস গ্রহণ করিয়া একেবারে রোগমুক্ত হইয়া বৃদ্ধ বয়সে শরীর ও মনের সম্পূর্ণ স্বচ্ছন্দতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার অভিজ্ঞতা বিলাত ও আমেরিকার নানাবিধ সংবাদপত্র ও মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইবার পর অনেক রোগী তাঁহার মতের অনুসরণ করিয়া আরোগ্য লাভ করিয়াছে। তাঁহার "Fasting Cure" নামক পুস্তক পাঠ করিলে এ বিষয়ের বিশেষ বিবরণ জানিতে পারা যায়।

আমি যে দীর্ঘ-উপবাসের বিষয় বর্ণনা করিয়াছি, তাহা পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের পরীক্ষা ও অভিজ্ঞতার উপর অবস্থিত। যেরূপ পরিশ্রম ও ক্লেশ স্বীকার করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে তদন্ত করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া দুঃসাধ্য রোগের প্রতীকারের জন্য এই উপায় অবলম্বন করিলে কোনও ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা মনে হয় না। তবে আমি নিজে দীর্ঘ উপবাসের পক্ষপাতী নহি। আমার বিশ্বাস যে, নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে এককালীন চারি পাঁচ দিনের অধিক উপবাস করিবার আবশ্যকতা নাই। যাঁহারা অজীর্ণ-ঘটিত নানারূপ রোগ ভোগ করিয়া থাকেন, তাঁহারা যদি একাদশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা প্রভৃতি তিথি উপলক্ষে কেবল প্রচুর জল পান করিয়া আহার একেবারে পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের যথেষ্ট উপকার হইবার সম্ভাবনা।

সে দিন ব্রিটিশ মেডিকেল্ জর্ণালে (British Medical Journal) উপবাস-দ্বারা বহুমূত্র রোগের চিকিৎসা সম্বন্ধে একটী সুন্দর প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে, মাঝে মাঝে ৩।৪ দিন উপবাস করিয়া, দীর্ঘকালব্যাপী বহুমূত্র রোগ সারিয়া গিয়াছে, এরূপ অনেকগুলি রোগীর বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। এ দেশে বহুমূত্র রোগের যেরূপ প্রাবল্য, তাহাতে ইহার উপশমের জন্য নাতিদীর্ঘ উপবাস অবলম্বিত হইলে বিশেষ উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা।

দ্বারবঙ্গের মাননীয় বর্ত্তমান মহারাজ বাহাদুর কিছুদিন পূর্ব্বে একবার ৫ দিন এবং তৎপরে ১৫ দিন উপবাস করিয়াছিলেন। প্রথমবারে উপবাসের সময় তিনি কেবল জলপান করিতেন, কোনরূপ আহার্য্যদ্রব্য গ্রহণ করেন নাই। দ্বিতীয়বারে জলপানের সহিত মধ্যে মধ্যে সামান্য পরিমাণ দুগ্ধপান করিতেন। তিনি আমাকে লিখিয়াছেন যে, এই উপবাসে তাঁহার কিছুমাত্র কষ্ট হয় নাই। কিছুদিন হইতে তাঁহার শ্রবণশক্তি একটু কমিয়া গিয়াছিল; দ্বিতীয়বার উপবাসের পর তিনি এ সম্বন্ধে বিশেষ উপকার লাভ করিয়াছেন। মহারাজ বাহাদুর বলেন যে, তাঁহার অভিজ্ঞতায় উপবাস দ্বারা শরীরের জড়তানাশ ও শক্তির বৃদ্ধি সাধন হয়, এবং দূষিত পদার্থসমূহ শরীর হইতে নির্গত হইয়া যায়। তবে যাহাতে শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া না পড়ে, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া উপবাস করা উচিত।

কলিকাতার আর্মেনিয়ান্ কলিজিয়েট্ ইস্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক মিঃ উইটেন্বর্গ বহুদিন বাতরোগে কষ্ট পাইয়া একেবারে শয্যাশায়ী হইয়াছিলেন। তিনি এই দীর্ঘ উপবাস ব্রত অবলম্বন করিয়া এক্ষণে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছেন; দুই তিন সপ্তাহের উপবাস তাঁহার পক্ষে কিছুমাত্র কষ্টকর নহে। তিনি অনেকবার এইরূপ দীর্ঘ উপবাস করিয়াছেন, এবং প্রয়োজন হইলে এখনও করিয়া থাকেন। উপবাসের সময় তিনি কেবল উষ্ণ জল পান করিয়া থাকেন। তিনি কলিকাতায় বাস করেন। ইচ্ছা করিলে যে কেহ তাঁহার নিকটে যাইয়া এ সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা অবগত হইতে পারেন।

সিন্‌ক্লেয়ার্ বলেন যে, উপবাস করিলে প্রত্যহ প্রায় আধ সের করিয়া শরীরের ভারের লাঘবতা হয়। প্রথমতঃ চর্ব্বি ও পরে মাংস প্রভৃতি অন্যান্য শারীরিক উপাদান ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। যাঁহারা নিতান্ত স্থূলদেহ, তাঁহাদিগের স্থূলতা কমাইবার একমাত্র উপায় উপবাস—ঔষধসেবনে স্থূলতার হ্রাস হয় না। স্থূল-দেহ ব্যক্তি অধিক দিন উপবাস করিলেও কোনও ক্ষতি হয় না; দেহসঞ্চিত চর্ব্বি খাদ্যের পরিবর্ত্তে শরীররক্ষার জন্য ব্যয়িত হয়।

কত দিন উপবাস করিয়া প্রাণ ধারণ করা যাইতে পারে, তৎসম্বন্ধে সিন্‌ক্লেয়ার্ বলেন যে, তাঁহার অভিজ্ঞতায় ৩ মাস কাল পর্য্যন্ত মানুষ উপবাস সহ্য করিতে পারে। ৩০, ৪০, বা ৫০ দিনের উপবাস পালন করিয়া অনেক লোকেই নানা দুঃসাধ্য রোগ হইতে মুক্ত হইয়াছে। ৮, ১০, ১২, বা ১৫ দিনের উপবাস তাঁহার মতে সকলেই সহ্য করিতে পারে। তিনি নিজে ১২ দিন এবং তাঁহার স্ত্রী ১০ দিন একটানে উপবাস করিয়াছিলেন। তাঁহাদের উভয়েরই বৃদ্ধ বয়স, এবং উভয়েই অজীর্ণ ও অজীর্ণ-ঘটিত নানা প্রকার ব্যাধিতে বহুকাল ব্যাপিয়া বিষম যন্ত্রণা ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন। ইহার পরেও তাঁহারা মধ্যে মধ্যে ৫।৬ দিবসব্যাপী উপবাস কয়েক বার পালন করিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, তিনি ও তাঁহার স্ত্রী এই উপবাস-ব্রত-উদ্যাপনের পর এক্ষণে যেরূপ শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ভোগ করিতেছেন, তাহা তাঁহারা সারা জীবনে কখনও উপভোগ করেন নাই।

সিন্‌ক্লেয়ার্ বলেন যে, দীর্ঘ অনশন-ব্রত গ্রহণ করিলে প্রথম ২।৩ দিন অভ্যাসবশতঃ প্রবল ক্ষুধায় কষ্ট পাইতে হয়। তিনি যে উপবাসের কথা বলিয়াছেন, তাহা নিরম্বু উপবাস নহে। তিনি এই সময়ে প্রচুরপরিমাণে জল পান করিতে উপদেশ দিয়াছেন। শীতল জল অপেক্ষা উষ্ণ-জল-পান অধিক উপকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জলপান দ্বারা দেহমধ্যে বহুদিনসঞ্চিত ক্লেদ-সমূহ নির্গত হইয়া যায়। তিনি এই সময়ে প্রত্যহ গরম জলের (অর্দ্ধসের হইতে ৩ পোয়া জল) দ্বারা নিম্ন অন্ত্র ধৌত করিবার ব্যবস্থা (Enema) করিয়াছেন। উপবাসের সময় অধিক পরিশ্রমের কার্য্য করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তবে তিনি বলেন, প্রথম অবস্থায় ৪।৫ মাইল পদব্রজে ভ্রমণ এবং অন্যান্য দৈনিক কার্য্য সহজেই করিতে পারা যায়, তাহাতে কোনও ক্ষতি হয় না। উপবাস-আরম্ভের ২।৩ দিন পরে ক্ষুধা একেবারেই থাকে না, শরীর স্বচ্ছন্দ ও লঘু বোধ হয়, এবং শরীরের ও মনের স্ফূর্ত্তি ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। অবশ্য শরীর ক্রমশঃ শুষ্ক হইতে থাকে, এবং ১০।১২ দিনের উপবাসে ৬।৭ সের ওজন কমিয়া যায়। ইহাতে ভয় পাইবার কোনও কারণ নাই। উপবাস ভঙ্গ করিয়া আহারগ্রহণের পর অতি শীঘ্র এই দেহের ভার পুনরায় বাড়িয়া যায়, অথচ শরীরে কোন রোগ বা গ্লানি থাকে না। উপবাসের সময় প্রত্যহ শীতল বা ঈষদুষ্ণ জলে স্নান করিবার উপদেশ দিয়াছেন।

তিনি বলেন যে, যদি কাহারও উপবাস করিয়া কোনও অনিষ্ট হইয়া থাকে,

তবে তাহা তাহার ভ্রান্ত পূর্ব্ব-সংস্কার ও মানসিক ভীতিজনিত। উপবাসের সময় শারীরিক দৌর্ব্বল্য অনুভূত হইতে পারে, শ্রমজনিত কর্ম্ম করিতে গেলে সহজেই ক্লান্তি জন্মিবার সম্ভাবনা, নাড়ীর গতি ক্ষীণ, এমন কি, মিনিটে ৪০ বার (৮০ বার স্বাভাবিক) পর্য্যন্ত ইহার স্পন্দন হইতে পারে, কিন্তু এই সকল লক্ষণ দেখা গেলেও ভয় পাইবার কোনও কারণ নাই। তিনি বলেন যে, এই ভয়ের জন্য অনেকে ২।৩ দিন উপবাস করিয়াই ছাড়িয়া দিয়াছেন—ইহাতে তাঁহারা উপবাসের যথোচিত সুফল প্রাপ্ত হন নাই। তাঁহার মতে, যাঁহারা দীর্ঘ উপবাস করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এ সম্বন্ধে যে সকল পুস্তক আছে, তাহা যেন পূর্ব্বে পাঠ করেন, এবং যাঁহারা দীর্ঘ উপবাস করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকটে থাকিয়া এবং তাঁহাদের পরামর্শ লইয়া যেন এই কার্য্যে প্রথম প্রবৃত্ত হন।

উপবাস-ভঙ্গ সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে, উপবাসের প্রথম ২।৩ দিন ক্ষুধার জ্বালা উপস্থিত হয়, কিন্তু তাহার পরেই ক্ষুধার সম্পূর্ণ নিবৃত্তি হইয়া যায়। তৎপরে যখন ক্ষুধা পুনরায় অনুভূত হইবে, তখনই উপবাস ভঙ্গ করা উচিত। কাহারও কাহারও ১০।১২ দিন উপবাসের পর ক্ষুধার উদ্রেক হয়, কাহারও তদপেক্ষা অধিক বা অল্প দিনের মধ্যে ক্ষুধাবোধ হয়। তিনি বলেন, ক্ষুধার পুনরুদ্রেকের পূর্ব্বে উপবাস ভঙ্গ করিলে উপবাসের সুফল সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করিতে পারা যায় না।

যাঁহারা এই পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের উপবাস সম্বন্ধে মত ও অভিজ্ঞতা জানিতে বাসনা করেন, তাঁহারা নিম্নলিখিত পুস্তকগুলিতে এই বিষয়ের বিশদ বিবরণ দেখিতে পাইবেন :—

1. The Fasting Cure ... Upton Sinclair.
2. Fasting in the cure of Disease　Dr. L. B. Hazzard.
3. Perfect Health ... C. C. Haskell.
4. Fasting, Hydro-therapy and Exerc ... Bernarr Macfadden.
5. Fasting, Vitality & Nutrition　Hereword Carington.

'পারণা'র সময় অর্থাৎ উপবাস শেষ হইলে যখন আহার পুনঃ গ্রহণ করিতে হইবে, তখন বিশেষ সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। সিন্‌ক্লেয়ার্ বলেন যে, অল্প অল্প গরম দুগ্ধ পান করিয়া উপবাস ভঙ্গ করা উচিত। প্রথম ২।৩ দিন শুদ্ধ দুগ্ধের উপর নির্ভর করিতে হইবে; পরে ক্রমে ক্রমে অন্যান্য খাদ্য অল্পপরিমাণে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। যাঁহাদের দুগ্ধ সহ্য হয় না, তাঁহাদের পক্ষে ২।৩ দিন আঙ্গুর,

নেবু প্রভৃতি ফলের রস প্রশস্ত। দীর্ঘ উপবাসের সময় পরিপাকযন্ত্রাদি একপ্রকার নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে ; এই সময়ে আহারের মাত্রা অধিক হইলে বা দুষ্পাচ্য দ্রব্য ভক্ষণ করিলে, অন্ত্রশূল ও অন্যান্য ক্লেশপ্রদ রোগ হইবার সম্ভাবনা।

সিন্‌ক্লেয়ার্‌ বলেন যে, অজীর্ণঘটিত যে কোনও রোগ, সর্দ্দিজ্বর, শিরঃপীড়া, নানাবিধ বাতরোগ, যকৃতের পীড়া, মূত্ররোগ, শ্বাসরোগ, চর্ম্মরোগ, কোষ্ঠকাঠিন্য, জ্বর, অপস্মার প্রভৃতি নানাবিধ ব্যাধির উপবাস দ্বারা উপশম হইয়া থাকে, এবং অনেক স্থলে উহাদিগের এককালীন আরোগ্য সাধিত হয়। তবে এককালীন আরোগ্য সাধনের জন্য দীর্ঘ উপবাসের প্রয়োজন। তাঁহার মতে, যে কোনও বয়সে উপবাস ব্রত অবলম্বন করিতে পারা যায়, এবং শরীর যতই দুর্ব্বল হউক না কেন, বুঝিয়া উপবাস করিলে কোনও অনিষ্ট হয় না। ক্ষয় রোগে তিনি উপবাস করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তবে ২।৪ জন ক্ষয়রোগী উপবাস করিয়া উপকার প্রাপ্ত হইয়াছে, এরূপ ঘটনা তিনি পুস্তকে প্রকাশ করিয়াছেন। যাঁহারা রোগ-মুক্তির জন্য উপবাস অবলম্বন করিয়াছিলেন, সেইরূপ ১০৯ জন লোকের (স্ত্রী ও পুরুষ) নিকট হইতে তাঁহাদিগের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে পত্র পাইয়াছিলেন। ইঁহারা গড় পড়তায় প্রত্যেকে ৬ দিন উপবাস করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে ১০০ জন উপবাস দ্বারা বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—বাকী ৯ জনের বিশেষ কোনও উপকার হয় নাই। এ স্থলে বলা কর্ত্তব্য যে, এই শেষোক্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে অনেকেই ৩।৪ দিবসের অধিক উপবাস করিতে সমর্থ হন নাই।

আমাদের দেশে হিন্দু বিধবাগণের প্রতি মাসে দুই দিন করিয়া উপবাসপালন সম্বন্ধে শাস্ত্রকারগণের যে বিধি আছে, তৎসম্বন্ধে অনেকের ধারণা এই যে,ঐ বিধি তাঁহাদের নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক। কিন্তু উপবাসসম্বন্ধীয় গ্রন্থাদি পাঠ করিলে মনে হয় যে, তাঁহাদের ঐ ধারণা স্থিরযুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্য অনেক সময়ে উপবাসের প্রয়োজন হইয়া থাকে। হিন্দু বিধবাগণ অনেক বিষয়ে সংযম অভ্যাস করেন বলিয়া তাঁহাদের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকে। যে বিধির পালনে সংযম অভ্যাস ও স্বাস্থ্য-রক্ষা হয়, তাহা কষ্টসাধ্য হইলেও, তাহার ব্যবস্থা শাস্ত্রকারগণের নির্ম্মমতার পরিচায়ক নহে। আমাদের স্বাস্থ্যপালনের সকল বিধি শাস্ত্রকারেরা ধর্ম্ম-সাধনের সহিত যোগ করিয়া দিয়াছেন। পুরুষগণের পক্ষেও শাস্ত্রে উপবাসের বিধি আছে। তবে যদি তাঁহারা তাহা পালন না করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যবস্থাকে শাস্ত্রকারদিগের একদেশদর্শিতার পরিচায়ক বলা সঙ্গত নহে। তবে এ কথা বলা যাইতে পারে যে, অসমর্থের পক্ষে বলপূর্ব্বক কোনও নিয়ম

পালন করিতে বাধ্য করা সঙ্গত নহে, এবং উহা যে অনেক স্থলে অন্ধ সংস্কারানুবর্ত্তিতার পরিচায়ক, তাহাতে সন্দেহ নাই। সংযমের প্রকৃত অর্থ বুঝিয়া যাঁহারা উপবাস করিবেন, তাঁহাদের পক্ষেই উহা পালনীয়। প্রত্যেক বিধি দেশকালপাত্র-বিবেচনায় প্রযুক্ত হইলে সর্ব্বথা সুফল প্রসব করে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা উপবাসের সময় যে অন্ত্রধৌত-করণের ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, উহা আমাদের দেশের পক্ষে নূতন নহে। যোগ-শাস্ত্রে দেহ সাধনক্ষম ও শক্তি-সম্পন্ন করিবার জন্য অন্ত্রধৌত-ক্রিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, এবং এখনও কেহ কেহ উহা সম্পাদন করিতে সমর্থ। তবে যে উপায়ে উহা সম্পাদিত হইয়া থাকে, তাহা অপেক্ষা পাশ্চাত্য প্রণালী অতিশয় সহজ-সাধ্য, সুতরাং সর্ব্বথা আচরণীয়।

এক্ষণে উপবাসের অপব্যবহার সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

কখনও কখনও উপবাস দ্বারা আত্মহত্যাসাধনের চেষ্টা করা হইয়া থাকে। এই চেষ্টা অনেক স্থলেই ফলবতী হয় না; কারণ, যদি ভোজ্য দ্রব্য ও পানীয় সহজে আহরণ করিবার সুবিধা থাকে, তাহা হইলে উপবাসের কষ্টে অতি অল্প লোকেই উহা সংগ্রহ করিতে বিরত থাকে। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে বিলাতে যে সকল স্ত্রীলোক 'সফ্রাজেট্' (Suffragette) দলভুক্ত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অনেকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইবার পর কারাবাস-প্রতিবাদ-হেতু অনশন-ব্রত অবলম্বন করিয়াছিল। কারাগৃহের কর্ত্তৃপক্ষগণ অনন্যোপায় হইয়া অবশেষে নল চালাইয়া তাহাদিগকে আহার্য্য দ্রব্য গ্রহণ করিতে বাধ্য করিয়াছিল, এবং এই কার্য্য আদালতে আইনসঙ্গত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিল।

উপবাস দ্বারা নরহত্যা সাধন করিবার দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল নহে। মুসলমান-শাসন-সময়ে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রবল শত্রুর অনশন দ্বারা মৃত্যুসাধনের কথা অনেক ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে। দুর্দ্দান্ত জমীদারগণ সময়ে সময়ে এই নৃশংস উপায় অবলম্বন করিয়া অবাধ্য প্রজা শাসন করিতেন, ইহাও শুনা যায়। বিলাতে ষ্টণ্টন্ (Staunton), তাহার ভ্রাতা, ভ্রাতৃজায়া এবং ষ্টণ্টনের উপপত্নী এলিস্ রোডস্ একত্র মিলিত হইয়া অনশন দ্বারা ষ্টণ্টনের স্ত্রীর হত্যাপরাধে দণ্ডিত হইয়াছিল। তাহারা এক বাটীতে বাস করিত, এবং সকলে মিলিয়া এই দুষ্কার্য্য সাধন করিয়াছিল। ষ্টণ্টনের স্ত্রীর মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে যখন সেই গৃহ হইতে তাহার উদ্ধারসাধন হয়, তখন অনাহারে তাহার অবস্থা এরূপ শোচনীয় হইয়াছিল যে,

চিকিৎসা ও শুশ্রূষা দ্বারা সে আরোগ্য লাভ করিতে পারে নাই। অনশনে মৃত্যুর সমস্ত লক্ষণ তাহার দেহমধ্যে প্রকাশিত হইয়াছিল। অপরাধীদিগের হত্যাপরাধে যাবজ্জীবন কারাবাস দণ্ড হইয়াছিল, কেবল উপপত্নী পরে মুক্তি-লাভের আদেশ পাইয়াছিল।

বিলাতে শিশুজীবনরক্ষার উদ্দেশ্যে একটী আইন প্রচলিত আছে। আমা-দিগের দেশে বিধবাদিগের সন্তান জন্মিলে লজ্জানিবারণার্থ এবং বংশমর্য্যাদা-রক্ষার জন্য অনেক সময়ে তাহারা গর্ভমধ্যেই নষ্ট হইয়া থাকে। বিলাতে অবি-বাহিতা রমণীগণ গর্ভবতী হইলে শিশুসন্তানগণ গোপনে পরিত্যক্ত হইয়া অর্থ-সাহায্যে অপরের দ্বারা প্রতিপালিত হইয়া থাকে। ইহার জন্য কতকগুলি আশ্রম স্থাপিত আছে; ইংরাজীতে এই সকল আশ্রমকে 'মেটার্ণিটী হোম্' (Maternity home) কহে। অবিবাহিতা গর্ভবতী রমণীগণ এই স্থানে আসিয়া গোপনে সন্তান প্রসব করেন এবং আশ্রমের কর্তৃপক্ষগণ হত-ভাগিনী জননীগণের নিকট যথেষ্ট অর্থ লইয়া অপর কতকগুলি স্ত্রীলোকের উপর ঐ সকল শিশুগণের লালনপালনের ভার অর্পণ করেন। এইরূপ শিশুসন্তান-দিগের পালনের কার্য্য ইংরাজীতে 'বেবি ফার্ম্মিং' (Baby farming) নামে পরিচিত। সময়ে সময়ে অর্থলোভে কিরূপ লোমহর্ষণ শিশুহত্যা সাধিত হয়, তাহা চিন্তা করিলে হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়ে। দুরাচারিণী রমণীগণ সমস্ত অর্থ আত্মসাৎ করিবার জন্য সময়ে সময়ে অযত্ন করিয়াও আহার না দিয়া এই সকল অসহায় শিশুগণের হত্যা সাধন করিয়া থাকে। টেলারের মেডিক্যাল্ জুরিস্প্রুডেন্সে এ সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে, তাহা হইতে দুই চারিটী কথা এ স্থলে উদ্ধৃত হইল।

Under this heading (Baby farming) may be described one of the revolting crimes known to the law. In effect, it amounted (and still amounts) to taking babies and young infants to a house for the ostensibl purpose of nursing and bringing them up, and deliberately murdering them by starvation and neglect and even by less doubtful means. (Taylor's Principles and Practice of Medical jurisprudence, Ed. 1910, Vol 1. page 616.)

১৯০৩ খৃষ্টাব্দে লান্সেট্ (Lancet) নামক স্বনামপ্রসিদ্ধ ইংরাজী চিকিৎসা পত্রিকা এই পাপাচারের প্রতীকারের জন্য তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় যে, ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে মিসেস্ ডায়ার্ (Mrs Dyer) নামক এক জন স্ত্রীলোক এই ব্যবসায় চালাইয়া অনেকগুলি শিশুসন্তানকে নৃশংসভাবে হত্যা

করিয়াছিল। অবশেষে ধরা পড়িলে তাহার প্রাণদণ্ড হইয়াছিল। ১৯০৩ সালে জানুয়ারী মাসে বিলাতে এইরূপ আর একটী মোকদ্দমা হয়। তাহাতে প্রমাণিত হয় যে, স্যাক্ (Sach) এবং ওয়াল্টার্স্ (Walters) নামক দুই জন স্ত্রীলোক অনেক শিশুসন্তানের পালনের ভার গ্রহণ করিয়া অযত্ন, অনাহার, এমন কি, বিষপ্রয়োগ দ্বারা তাহাদিগের হত্যাসাধন করিয়াছিল। ধরা পড়িয়া তাহাদের দুই জনেরই প্রাণদণ্ড হইয়াছিল। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে এই নৃশংস হত্যা ব্যাপার নিবারণের জন্য বিলাতে একটী আইন (Infant Life Protection Act) প্রচলিত হয়। কিন্তু এই আইনের মধ্যে অনেক দোষ থাকাতে এই পাপ-স্রোত একেবারে নিবারিত হয় নাই। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে স্যাক্ এবং ওয়াল্টার্সের দ্বারা আইন সত্ত্বেও এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পুনরভিনয় হইয়াছিল। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে এই আইনের পুনঃসংশোধন হইয়াছে, এবং এক্ষণে এই পাপের স্রোত এক প্রকার নিবারিত হইয়াছে।

কখনও কখনও উপবাসের দোহাই দিয়া প্রতারণা করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিবার চেষ্টা হইয়া থাকে। সারা জেকব্‌স্ (Sarah Jacobs) নামক ত্রয়োদশবর্ষীয়া এক বালিকাকে উহার পিতা মাতা, সে দুই বৎসর উপবাস সহ্য করিতেছে বলিয়া, তাহাকে সাধারণের সমক্ষে প্রদর্শন করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিত। অবশেষে ৪ জন ধাত্রী (Nurse) দিবারাত্রি ঐ বালিকার নিকটে থাকিয়া তাহাদের প্রবঞ্চনা ধরিবার চেষ্টা করিয়াছিল। ক্রমে যখন তাহার অবস্থা মন্দ হইয়া আসিতে লাগিল, তখন তাহারা খাদ্য গ্রহণ করিবার জন্য ঐ বালিকা ও তাহার পিতা মাতাকে যথেষ্ট অনুরোধ করিয়াছিল, কিন্তু কেহই তাহাদের কথা শুনে নাই। নয় দিবসের পর ঐ বালিকার মৃত্যু হয় এবং তাহার পিতামাতা নরহত্যার সাহায্য করিয়াছে বলিয়া কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। পিতাকে ১ বৎসর এবং মাতাকে ৬ মাস কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছিল।

শ্রীচুণীলাল বসু।

প্রত্যাগমন।

১

'প্রত্যহ এমন কলহ বিবাদ কি ভাল?'

সুরমা শয্যায় উপুড় হইয়া শুইয়া বই পড়িতেছিল। মুখ না তুলিয়াই স্বামীর কথার উত্তর করিল—'কে ঝগড়া কর্‌তে বলে?'

'মা যা' বলেন, সেই মত চল্‌লেই ত হয়।'

সুরমা সেই ভাবে থাকিয়াই উত্তর করিল—'আমার দ্বারা তা হ'বে না।'

'কেন, তা' কি এত শক্ত?'

'শক্ত হ'ক্ আর সহজ হ'ক্, আমি যেটাকে ভাল ব'লে বুঝি, আর কারো খাতিরে সেটাকে মন্দ ব'লে মেনে নেওয়া আমার কর্ম্ম নয়।'

'দেখ, সংসারে থাক্‌তে গেলে সকলকে নিয়ে মানিয়ে গুছিয়ে চল্‌তে হয়। সকলেরই মন যে একরকম হবে তা' এ পৃথিবীতে অসম্ভব। মা যা' ভাল মনে করেন, তুমি তা' ভাল মনে কর না। মা'য়ের এ বয়সে তাঁর সংস্কারগুলি পরিত্যাগ করা যত অসম্ভব, তোমার পক্ষে তত অসম্ভব নয়। তুমি যদি একটু জেদ ছাড়, তা হ'লে আমি মা'কে বুঝিয়ে দেখ্‌তে পারি। কি বল?'

সুরমা ভ্রূকুটিকুটিলনেত্রে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—'তোমাদের অভ্যাসের অন্ধকারে আমাকে ঢেকে রাখ্‌তে চাও?'

কি সুন্দর মুখখানি! বিরক্তিব্যঞ্জক হইলেও তাহা হইতে চোখ ফিরান যায় না! নগেন্দ্র ভাবিল, মহাকবি যথার্থই বলিয়াছেন—'কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাং।' সুরমা আবার পাঠে মন দিল। নগেন্দ্র ধীরভাবে বলিল—

'দেখ, তুমি এমন সুন্দর হ'য়েও সংসারকে অসুন্দর ক'রে তুল্‌ছ কেন?'

সুরমা পড়িতে পড়িতেই বলিল—'কি কর্‌ব বল? তোমাদের ঘরের বৌয়ের যতটা বুদ্ধির দরকার, বিধাতা অসতর্ক হ'য়ে আমাকে তার চেয়ে অনেকটা বেশি দিয়ে ফেলেছেন, সে এখন আমি ফিরিয়ে দিই কাকে? তোমরা আমাকে মেয়েজ্যাঠা ব'লে দুবেলা গাল দাও। কটু কথাই হচ্ছে অক্ষমের সান্ত্বনা—অতএব সে আমি ক্ষমা কর্‌লুম্।'

নগেন্দ্র এই উত্তরে ঈষৎ উত্তেজিত হইয়া বলিল—'মেয়েজ্যাঠা কি আমরা ব'লেছি? তুমি কি কবিতা লিখেছিলে, ও বাড়ীর পুঁটী তা নিয়ে গিয়ে

সকলকে দেখায়। তাই লোকে এই কথা বলেছে। নিজের লেখা সাবধান ক'রে রাখ্‌লেই ত হয়।'

সুরমা সক্রোধে বলিল—'আমি কি জান্‌তুম—পাড়াগেঁয়ে মেয়েগুলো এত চোর?'

নগেন্দ্রেরও ক্রোধ হইয়াছিল; কিন্তু সে আত্মসংবরণ করিল। বুঝিল, এরূপ স্থলে ক্রোধে বিপরীত ফলই ফলিয়া থাকে। কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া পুনরায় ধীরভাবে বলিল—'দেখ, মা তোমাকে প্রাণের সহিত ভালবাসেন। তোমার সে দিন সামান্য একটু অসুখ ক'রেছিল, মা ভাবনায় অস্থির; ঠাকুরের কাছে কত মানসিক ক'রেছিলেন।'

সুরমা একটু বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিল—'সে কেন জান? আমি ম'লে এক রাশ টাকা দিয়ে আর কেউ তোমার সঙ্গে মেয়ের বে দেবে না। আমার বাবার মত বোকা ত আর জগতে দ্বিতীয় নাই!'

নগেন্দ্র এই তীব্র বিদ্রূপে নিতান্ত ব্যথিত ও ক্রুদ্ধ হইল। তথাপি অতিকষ্টে মনোভাব গোপন করিয়া বলিল—'আমাকে যা' ইচ্ছা বল; কিন্তু আমার স্নেহময়ী সরলা জননীর উপর এ স্বার্থপরতার আরোপ ক'র না। মায়ের আমার মনে মুখে এক।'

'তা জানি!'

নগেন্দ্র এই ব্যঙ্গোক্তি শ্রবণ করিয়া উত্তেজিতভাবে বলিল—'না, তা' জান না। জান্‌লে কখনও এ কথা ব'ল্‌তে না। আমি মায়ের এক সন্তান, তুমি তাঁর কত আদরের এক বউ, তায় বড় লোকের মেয়ে। তোমাকে যে তিনি কত ভালবাসেন, কত আদর যত্নে তোমাকে রাখ্‌তে চান্‌, তোমার হৃদয়ে এতটুকু যদি সহানুভূতি থাক্‌ত, তা' হ'লে তা' বুঝ্‌তে পার্‌তে। তোমার রাগের কারণ—তিনি তোমার দু'বেলা ঘাটে গিয়ে সাবান মাখা, দিন রাত বই মুখে দিয়ে প'ড়ে থাকা, কবিতা লেখা, বেলা পর্য্যন্ত শুয়ে থাকা, ঠাকুর দেবতার কাজে, সংসারের কাজে অনিচ্ছা, অশ্রদ্ধা—এইগুলা দেখ্‌তে পারেন না। তিনি এ সব দেখে এত বিরক্ত হন্‌ কেন জান?—পাড়া প্রতিবেশীরা তোমাকে কল্‌কেতার বিবি ব'লে, জ্যাঠা মেয়ে ব'লে, কত উপহাস করে, নির্লজ্জ ব'লে গা টেপাটিপি করে। আর মায়েরও ধারণা, গৃহস্থের বউয়ের এ রকম চাল চলনে লক্ষ্মী ছেড়ে যান। তুমিই বল দেখি, তোমার এই সব কাজগুলো কি এত ভাল?'

সুরমার সুন্দর মুখখানি যেন অলক্তকরাগরঞ্জিত হইয়া উঠিল, ওষ্ঠাধর স্ফুরিত হইতে লাগিল। সে সক্রোধে বলিল—

'আমার কাজ ভাল কি মন্দ—পাড়াগেঁয়েরা তার কি বুঝ্‌বে?'

নগেন্দ্র এবার রুক্ষভাবে উত্তর করিল—'আমি কি তোমায় জোর ক'রে বিয়ে কর্‌তে গিয়েছিলাম? তোমার বাপ সহুরে লোকের সঙ্গে তোমার বিয়ে দিলেই ত পার্‌তেন।'

'বাবার দুর্বুদ্ধি। তিনি কি ভেবেছিলেন,—তুমি বি, এ, ফেল হ'য়ে যে পাড়াগেঁয়ে সেই পাড়াগেঁয়েই থেকে স্কুলমাষ্টারি কর্‌বে? তিনি ত এখনও বল্‌ছেন, তুমি কল্‌কেতায় গিয়ে আমাদের বাড়ীতে থেকে লেখা পড়া কর। তা' তোমাকে যে পাড়াগেঁয়ে ভূতে পেয়েছে!'

'পাড়াগেঁয়ে ভূতকে যখন এত ঘৃণা, তখন বাপের বাড়ী থেকে না এলেই পার্‌তে।'

'বিয়ের পর এই দেড় বৎসর কি এসেছিলুম, না ইচ্ছে ক'রে আস্‌তুম্? তোমার বাপ আন্‌তে গেলেন যে!'

'তাঁকে ফিরিয়ে দিলেই হ'ত।'

'বাবা অতটা অভদ্রতা ক'র্‌তে পার্‌লেন না। কিন্তু এখন দেখ্‌ছি—ফিরিয়ে দিলেই ভাল হ'ত। এই মাস খানেক এসেছি, এতেই যেন আমার মর্‌তে ইচ্ছা কর্‌ছে।'

সুরমা ক্রন্দনের সুরে এই কথা বলিয়া চক্ষু আবৃত করিল। নগেন্দ্র একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া শয্যাপার্শ্ব হইতে মুক্ত বাতায়নের নিকট গেল। শরতের নির্ম্মল আকাশে দশমীর চাঁদ হাসিতেছে; চাঁদের কিরণ পুকুরের জলে নাচিতেছে, গাছের মাথায় বিশ্রাম করিতেছে। প্রকৃতির নির্ম্মল সৌন্দর্য্যে নগেন্দ্রের প্রথম যৌবনের প্রেমপিপাসু নির্ম্মল হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল। সে শয্যা-শায়িতা সুন্দরী পত্নীর দিকে চাহিল। দেখিল, সুরমার সর্ব্বাঙ্গ চাঁদের কিরণে ভরিয়া গিয়াছে, যেন এক রাশ চাঁপাফুলের উপর কে এক রাশ শেফালিকা ঢালিয়া দিয়াছে। সে ধীরে ধীরে আবার শয্যাপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। পত্নীর হাতখানি ধরিয়া ব্যাকুলভাবে বলিল—'ছি! কাঁদিতেছ? আমি তোমাকে কষ্ট দিবার জন্য কোনও কথা বলি নাই।'

তথাপি সুরমা মুখের কাপড় খুলিল না। সজোরে স্বামীর হাত হইতে আপনার হাত সরাইয়া লইয়া, পাশ ফিরিয়া শুইল। নগেন্দ্র অত্যন্ত ব্যথিত হইল;

কম্পিত কণ্ঠে বলিল—'একটা মস্ত ভুল উভয় পক্ষেই হ'য়েছে, কিন্তু তা' শোধ্রাবার ত আর উপায় নাই! তোমাকে সুখী কর্বার সম্পূর্ণ ইচ্ছা সত্ত্বেও আমরা কেউ তোমাকে সুখী কর্তে পার্লাম না!' একটু থামিয়া পরে বলিল—'কিন্তু নারাণপুরের মুখুয্যেদের মেজ বউ, তোমার বিন্দু দিদি—সে ত কল্কাতার মেয়ে—তোমার বাপের চেয়েও তার বাপ বড়লোক—কিন্তু তার সুখ্যাতি সকলেই করে। সে ত পাড়াগেঁয়ে ব'লে কাহাকেও ঘৃণা করে না। আমি পাড়াগেঁয়েই হই, আর দরিদ্রই হই, তোমার স্বামী। আমার প্রতি তোমার একটা কর্ত্তব্য আছে ত? স্বামী মূর্খ, দুশ্চরিত্র, দরিদ্র হ'লেও স্ত্রীর'—

'পূজার পাত্র। এই কথা বল্বে ত? না, তা নয়। স্ত্রীর উপর স্বামীর এমন অন্যায় দাবীর কথা আমি স্বীকার করি না। এই শোন,—রবিবাবুর মৃণাল তার স্বামীকে কি লিখেছিল।' বলিয়া সুরমা বইখানি তুলিয়া লইয়া পড়িতে লাগিল—

'কুষ্ঠরোগীকে কোলে ক'রে তার স্ত্রী বেশ্যার বাড়ীতে নিজে পৌঁছে দিয়েছে, সতী সাধ্বীর সেই দৃষ্টান্ত তোমাদের মনে জাগ্ছিল; জগতের মধ্যে অধমতার, কাপুরুষতার এই গল্পটা প্রচার করে আস্তে তোমাদের পুরুষের মনে আজ পর্য্যন্ত একটুও সঙ্কোচ বোধ হয় নি!'

সুরমা বলিল - 'আমাকে যদি তোমরা আর বিরক্ত কর, তা' হ'লে এই মৃণালের মত আমিও এক দিকে চ'লে যাব।'

নগেন্দ্র কিয়ৎকাল স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পরে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে মেঝের উপর আসিয়া বসিল, এবং বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের প্রশ্নোত্তর সংশোধন করিতে লাগিল।'

ফুলশয্যার রাত্রি হইতে আজ পর্য্যন্ত এই নবদম্পতীর নৈশ প্রেমালাপ এই পদ্ধতিতেই চলিয়া আসিতেছিল।

২

ভাদ্রের অপরাহ্ণ। নারাণপুরের মুখুয্যেদের বড় ঘরের রোয়াকে বসিয়া মেজ বউ মহাভারত পড়িতেছে; তাহার শ্বশ্রূ, যাতৃদ্বয় ও কয়েকজন প্রতিবেশিনী তাহার সম্মুখে বসিয়া তাহা শ্রবণ করিতেছে। একটি খোকা মেজ কাকীমার কোলে ঘুমাইতেছে, আর একটি খুকী কাকীমা'র গায়ে ঠেস দিয়া বসিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে। সাবিত্রীর উপাখ্যান আরম্ভ হইয়াছে।

এমন সময় অর্দ্ধাবগুণ্ঠনবতী একটি সুন্দরীকে উঠান দিয়া তাঁহাদের

দিকে আসিতে দেখিয়া সকলেই বিস্মিতনেত্রে সেই দিকে চাহিল। সুন্দরী কাছে আসিতেই মেজ বৌ চিনিল। পুস্তকখানি ভূমিতে রাখিয়া ও খোকাকে তাহার জননীর কোলে দিয়া, মেজ বউ তাড়াতাড়ি উঠিয়া উঠানে নামিয়া গেল, এবং সুন্দরীর হাত ধ'রিয়া উপরে তুলিয়া আনিল। আসিতে আসিতে জিজ্ঞাসা করিল—'রমা, হঠাৎ যে? বাড়ীর সব ভাল ত?'

সঙ্গে দাসী ছিল, বলিল—'হাঁ, সব ভাল। আপনাকে দেখ্‌বার জন্যে বৌদিদির বড় ইচ্ছে হ'ল, তাই এসেছেন।'

'তা' বেশ ক'রেছ বোন্‌।'

মেজ বৌয়ের শ্বাশুড়ী বলিলেন—'ওমা, তোমার মামাতো বোন্‌, রায়পুরের চাটুয্যেদের বউ? আহা দিব্যি মেয়েটি ত! তা' বেশ ক'রেছ মা, এসেছ, এস ব'স।'

মেজ বউ গোপনে ইঙ্গিত করিল। সুরমা সেই ইঙ্গিতক্রমে দিদির শ্বাশুড়ীকে প্রণাম করিয়া পদধুলি লইল। তিনি সুরমার চিবুক ধরিয়া সস্নেহে তাহাকে চুম্বন করিলেন ও আশীর্ব্বাদ করিলেন—'সুখে থাক মা, সীঁথির সিঁদুর অক্ষয় হোক্‌। চাঁদের মত একটি খোকা হ'ক্‌। বুড়ী, একটা আসন এনে দাও ত দিদি!'

বুড়ী আসন আনিবার পূর্ব্বেই সুরমা দিদির পার্শ্বে মাটীর উপরেই উপবেশন করিল। দত্ত-গৃহিণী বলিলেন—'এ কি নগেনের বউ?'

মেজ বউ বলিল—'হাঁ। তুমি কি নগেনকে জান, কায়েত-কাকী?'

'ও মা সে কি কথা গো? নগেনকে আর আমি জানিনি? সে আর আমাদের হাবু যে বরাবর একসঙ্গে পড়েছে। নগেন কতবার আমাদের বাড়ীতে এসেছে। অমন ছেলে হয় না—রূপে গুণে সমান। কি মিষ্টি কথা! কেমন ঠাণ্ডা স্বভাব! লোকের বিপদ আপদে প্রাণ দিয়ে উপকার করে।'

মেজ বৌয়ের শ্বাশুড়ী বলিলেন—'মাগীর কপাল ভাল, যেমন ছেলে তেমনি বউ হ'য়েছে।'

ঘোষাল জ্যাঠাই বলিলেন—'মেজ বৌমা, বেলা গেল, সাবিত্রীর কথার যেখান্‌টা আরম্ভ করলে, সেটা শেষ ক'রে ফেল, শুনে বাড়ী যাই; ঠাকুর দেবতার কথা অর্দ্ধেক ব'লে রাখ্‌তে নেই।'

মেজ বউ পড়িতে লাগিল—

"সাবিত্রী-মাহাত্ম্য-কথা অতি চমৎকার।
যাঁর নামে ধন্য ধন্য জগৎ সংসার॥

শ্বশুর শাশুড়ী সেবে দেবের সমানে।
নানা সেবা করে নিত্য পতি সত্যবানে॥
লক্ষ্মীর সমান হয় সতী পতিব্রতা।
নিত্য নিয়মিত পূজে ব্রাহ্মণ দেবতা॥
দেবতা সেবিয়া শ্রেষ্ঠ পুরুষ পাইল।
মধুর সম্ভাষে বনবাসী বশ কৈল॥
অত্যন্ত তুষিল সর্ব্ব ভূতে দয়াবতী।
তাঁর গুণে তুল্য দিতে নাহি বসুমতী॥
যত্নে আচরিল যত নানাবিধ কর্ম্ম।
নিত্য নিয়মিত যত বেদবিধি ধর্ম্ম॥
ইষ্টেতে একান্ত মতি করে আচরণ।
শিল্প যত কর্ম্ম চিত্র বিচিত্র রচন॥"

অধ্যায় পাঠ শেষ হইল। শ্রোত্রীমণ্ডলী স্ব স্ব গৃহে চলিয়া গেলেন। তখন সুরমাকে লইয়া মেজ বৌ নিজ কক্ষে প্রবেশ করিল।

৩

সুরমা বলিল—'দিদি, বাড়ী যাব, এ জন্মে আর এ মুখ করব না। তাই তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

'এই ত সে দিন এসেছিস্, এর মধ্যে আবার যাবি? সেখানকার খবর ভাল ত?'

'ভাল, কিন্তু এ পাড়াগেঁয়েদের জ্বালায় অস্থির হ'য়ে উঠেছি, বিন্দু দিদি! মরণ হয় ত বাঁচি।'

সুরমার চোখে জল পড়িতেছিল। বিন্দু সস্নেহে তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া বলিল—'ছিঃ, ও কথা কি বলতে আছে? কি হ'য়েছে বল্ দেখি?'

'কেন, তুমি কি আমার শ্বশুরবাড়ীর সুখের কথা জান না?'

'কৈ না! তাঁরা ত লোক ভাল শুনি। আর নগেন ত তোকে খুব ভালবাসে।'

'অমন ভালবাসার মুখে ছাই! পাড়াগেঁয়ে স্কুল-মাষ্টার, তার আবার ভালবাসা!'

বিন্দু হাসিয়া উঠিল। বলিল—'সহরে বড়লোকের ছেলে, উকীল, ডেপুটী না হ'লে ভালবাসতে জানে না, নয়?'

সুরমা বিরক্ত হইয়া বলিল—'কি হাস বিন্দু দিদি ? আমার গা জ্বালা করে। পাড়াগাঁ তোমারই ভাল লেগেছে। আমি হ'লে এ শ্মশানপুরীতে লাথি মেরে বাপের বাড়ী চ'লে যেতুম।'

বিন্দু ঈষৎ বিরক্তিব্যঞ্জক স্বরে বলিল—'ছিঃ রমা! গৃহস্থের বাড়ীকে কি শ্মশান বল্‌তে হয় ?'

সুরমা ঈষৎ লজ্জিত হইল, বলিল—'অল্প দুঃখে কি এ কথা মুখ দিয়ে বের হয় দিদি ?'

বিন্দু বলিল –'তোর দুঃখটা কি, তাই বল্ না।'

'আমি সাবান মাখি, নাটক নভেল পড়ি, কবিতা লিখি, বেলায় উঠি, কাজ কর্ম্ম জানি না; আমার মত বউ সংসারে থাকলে লক্ষ্মী ছেড়ে যায়। আর কত ব'ল্‌ব ?'

'তাঁরা এ সব পছন্দ করেন না, আর তোমার এ সব না হ'লে চল্‌বে না। এই ত ? তা' দিদি, অবস্থা বুঝে কাজ না করলে কি কেউ সুখী হ'তে পারে ? যত দিন না বে হ'য়েছিল, ততদিন বাপের আদরের এক মেয়ে, যা মনে হ'য়েছে, তাই ক'রেছ। কিন্তু এখন যে তুমি বউ।'

'হলেমই বা বউ ? বউ ব'লে কি চোর দায়ে ধরা পড়েছি ? এবার হ'ল কি শোন! বাড়ী থেকে আস্‌বার সময় বৌদিদিকে বলে এসেছিলাম—ভাই, আমাকে ত বনবাসে পাঠাচ্ছ। তা' দয়া ক'রে একটি কাজ ক'র—নূতন নাটক উপন্যাস কিছু বেরুলেই ডাকে পাঠাইয়া দিও। জান ত পাড়াগাঁ মূর্খের দেশ; কারও সঙ্গে কথা কইতে ইচ্ছা করে না। বই না পেলে পাগল হ'য়ে যাব। তা' বৌদিদি দয়া ক'রে ক'খানি বই পাঠাইয়াছেন। এই শাশুড়ীর রাগ দেখে কে ?—"এ সব বিবিয়াণী চল্‌বে না—গেরস্তর বউ রাতদিন বিছানায় শুয়ে শুয়ে বই পড়্‌লে লক্ষ্মী ছেড়ে যাবে—" সে কত কথা, তোমায় আর কি ব'ল্‌ব ? আমি রাগ না সাম্‌লাতে পেরে আপন মনেই ব'লে ফেল্‌লুম—"পাড়াগেঁয়ে লোক কল্‌কেত্তা থেকে বউ আন্‌তে গেছ্‌লে কেন ?" শুন্‌তে পেয়ে আর যায় কোথা ? ছেলেকে কত কথা বল্‌লে। বলে কি না—আবার ছেলের বে দেবে। দিক্ না, আমি বাপের বাড়ী চ'লে যাই, আমার হাড় জুড়াক্।'

'তা' নগেন কি বল্‌লে ?'

'মাষ্টার মহাশয় মাষ্টারী চালে কত উপদেশ দিতে লাগ্‌লেন। আমি বল্‌লাম—"দেখ, আমি কচি খুকী নই; উপদেশ দিতে হয় স্কুলের ছেলেদের দাওগে।

এ পাড়াগাঁয়ে আমি কোনও মতে থাকতে পারব না। আমার পরামর্শ শোন; কল্‌কেতায় চল, বাবা যা' বলেছেন, তাই কর। আমাদের বাড়ীতে থেকে আবার বি, এ, পাশ করবার চেষ্টা কর। তার পর ওকালতী পাশ দিয়ে দাদার সঙ্গে হাইকোর্টে বেরোও।" এ কথায় তাঁর মানে বিষম আঘাত লাগ্‌ল। বাবু ফোঁস্ ক'রে বল্লেন—"কি ঘরজামাই হ'তে বল? আমি বাপ মায়ের এক ছেলে, আমার কিসের অভাব?—" এই রকম কত কি বক্‌তে লাগ্‌ল—একটু কাঁদা হ'ল। আমি শুয়ে পড়লুম। আজ সকালে আমিও কারও সঙ্গে কথা কইলুম না, আমার সঙ্গেও কেউ কথা কইলে না। প্রত্যহ এ ঝগড়ার চেয়ে বাপের বাড়ী যাওয়াই ভাল। তাই ঝিকে দিয়ে পাল্কী আনিয়ে চলে এসেছি। এইখান্ থেকে বাবাকে চিঠি লিখ্‌ব। বাবা লোক পাঠালেই চ'লে যাব। এক সঙ্গেই যাই চল না, বিন্দু দিদি! তুমিও ত অনেক দিন বাপের বাড়ী থেকে এসেছ।'

বিন্দু বলিল—'আমার এখন কি ক'রে যাওয়া হবে বোন্? সেজ বউ ও মাসে প্রসব হবে। আমার শাশুড়ীর শরীর ভাল নয়; বড় দিদিও ছেলে পিলে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। তার উপর ঠাকুরের সেবা আছে। আমি না হ'লে কে ভোগ রাঁধ্‌বে?'

'তুমি যে কি দিয়ে গড়া, বিন্দু দিদি, তা' বুঝতে পারলুম না। অল্প বয়সে কপাল পুড়েছে। রাজা বাপ কত সাধ্য সাধনা করলেন নিজের কাছে নিয়ে রাখ্‌তে। তা' তুমি কি না এই পাড়াগাঁয়ে থেকে এক বেলা হু'মুঠো অশ্রদ্ধার ভাত খাচ্ছ!'

বিন্দু রুক্ষ স্বরে বলিল—'অশ্রদ্ধার ভাত কেন রমা?'

সুরমা ঈষৎ কুণ্ঠিত হইয়া বলিল—'তা দিদি, দিন রাত দশটা দাসীর খাটুনী খাটলে সকলেই শ্রদ্ধা করে।'

বিন্দু কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় তাহার শাশুড়ী একখানি থালায় খাবার ও এক গেলাশ জল লইয়া কক্ষে প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন—'মেজ মা!'

'কেন মা!'

'বাছা কখন্ এসেছে একটু জল খেতে দাও না মা!'

সুরমা উত্তর করিল—'আমি এখন কিছু খাব না।'

'তা কি হয় মা! আমাদের পাড়াগাঁয়ে কোথা কি পাব, মেজমা বাড়ীতে

রসকরা ক'রেছিলেন, তাই গোটা কতক খেয়ে একটু জল খাও মা! তুমি এসেছ শুনে কর্ত্তা ভারি খুসী হ'য়েছেন। আজই নগেনকে আন্‌বার জন্যে লোক পাঠাইয়া দিতেন, তা' আকাশে মেঘ দেখে আর পাঠান হ'ল না। কা'ল নিজে গিয়ে নিয়ে আস্‌বেন। ছেলে বউ এক সঙ্গে না থাক্‌লে কি ঘর মানায়?'

গৃহিণী সুরমাকে কোলে বসাইয়া জোর করিয়া গোটাকয়েক রসকরা খাওয়াইলেন। পরে যাইবার সময় বলিলেন—'মেজ মা, এ বেলা আর তোমার রাঁধ্‌তে হবে না। যাও, কাপড় কেছে এসে ছ'বোনে নিশ্চিন্ত হ'য়ে গল্প কর।'

বিন্দু বলিল, 'না মা, তুমি আগুনতাতে যেও না, আবার অসুখ কর্‌বে। ভারি ত রান্না, কতক্ষণ লাগ্‌বে। চ' রমা, কাপড় কেচে আসি।'

৪

রাত্রে সুরমা দিদির কাছে শয়ন করিয়া বলিল—'দিদি, তোমার শাশুড়ী যে নূতন মানুষ দেখ্‌ছি। শুনেছি উনিও তোমাকে বড় কম জ্বালান্‌নি। ছেলে যাতে বউকে দেখ্‌তে না পারে, সে জন্যে ছেলের কাছে বউয়ের নামে কত লাগাতেন। এখন বউয়ের কপাল পুড়েছে, বউ দাসীর মত খাট্‌ছে, তাই বুঝি বউয়ের আদর হ'য়েছে?'

বিন্দু বলিল,—'রমা! মানুষ মানুষকে যত দিন আদরের বস্তু ব'লে না চিন্‌তে পারে, ততদিন তাকে কেমন ক'রে আদর কর্‌বে দিদি? আমরাই কি একেবারে সকলকে আদর যত্ন ক'রে থাকি? শ্বশুর শাশুড়ী যে বউকে দেখ্‌তে পারেন না, তার কারণ, আমার ত মনে হয়, তাঁরা ভয় করেন যে, বউ তাঁদের ছেলেকে পর ক'রে দেবে। তার উপর যদি বৌ হ'তে তাঁদের মর্য্যাদার হানি হয়, তা হ'লে ত কথাই নাই। কিন্তু বউ যদি এমন ভাবে চলে যে, শ্বশুর শাশুড়ীর এই দুইটি ভয় না থাকে, তা' হ'লে কোনও গোলই হয় না।'

'আমার শাশুড়ীর আমি কি করেছি ভাই যে, তিনি আমার উপর এত অত্যাচার করেন?'

'তুমি কি কর নাই ভাই! তুমি ত তাঁর ছেলেকে তোমার বাপের বাড়ী নিয়ে গিয়ে একেবারে পর ক'রে দিতে চাও'—

'তা আমার বাপের বাড়ীই কেন? কল্‌কেতায় আলাদা বাসা ক'রেই না হয় থাকুক্ না; শ্বশুর শাশুড়ীও সেখানে থাক্‌তে পারেন।'

বিন্দু হাসিয়া বলিল—'বেশ কথা। তুমি চৌদ্দ পনর বৎসরের মেয়ে, কল্‌কাতা

ছেড়ে স্বামীর কাছে থাক্‌তেও তোমার ইচ্ছা হচ্ছে না; আর তোমার শ্বশুর শাশুড়ী আজ পঞ্চাশ ষাট্‌ বৎসর ধ'রে যে দেশের জলবাতাসে মানুষ হয়েছেন, সহস্র বন্ধনে যে দেশের মাটীর সঙ্গে বাঁধা র'য়েছেন, তুমি এই বয়সে তাঁদের সেখান থেকে টেনে ছিঁড়ে অন্য জায়গায় নিয়ে যেতে চাও! কেন না, তোমার মত ক্ষুদ্র বালিকার পাড়াগাঁ ভাল লাগে না! এটা যদি তাঁদের অসহ্য হয়, সে জন্য কি তাঁদের দোষ দেওয়া যায় ভাই? তাঁরা এ দেশের দশ জনের এক জন। তোমার শ্বশুরবাড়ী আমার শ্বশুরবাড়ী থেকে এক ক্রোশ দূর। কিন্তু এখানে একটা সামাজিক কথা উঠ্‌লে, তোমার শ্বশুরকে ডাকা হয়, তার মীমাংসা কর্‌তে। কিন্তু কল্‌কেতায় তিনি কে?'

সুরমা কোনও কথা কহিল না। বিন্দু বলিতে লাগিল—'তার পর দেখ, তুমি এখানে এসে কল্‌কেতার চালে চল্‌তে গেলে, পাড়াগেঁয়ে লোক ব'লে এঁদের ঘৃণা কর্‌তে লাগ্‌লে'—

'না দিদি, আমি প্রথম প্রথম একদিনের জন্যও ঘৃণার কথা মুখে আনি নাই।'

'মুখে বল নাই, কিন্তু মনে ব'লেছ ত! তা' ভাই, মানুষের মন অন্তর্যামী। এই ছেলেটা দেখ না—তিন বছরের ছেলে আমি মেরে কুটে দিলেও আমাকে জড়াইয়া ধরিবে, কিন্তু ও বাড়ীর ঠান্‌দিদি আদর ক'রে খাবার দিতে এলেও নেবে না। মনের ভাব মুখে না প্রকাশ ক'র্‌লেও কোথা দিয়ে কি ক'রে যে আমাদের ব্যবহারে প্রকাশ পায়, তা' আমরা বুঝ্‌তে পারি না, কিন্তু অপরে ঠিক ধ'র্‌তে পারে। কাজেই তোমার ঘৃণায় এঁদের আত্মমর্য্যাদার হানি হয় না কি? তুমি ভাই, এত পড়, এটা বোঝ না কেন?'

বিন্দু চুপ করিল, ভাবিল, সুরমা কিছু উত্তর করিবে। কিন্তু কোনও উত্তর না পাইয়া বলিতে লাগিল—

'আর দেখ, নিত্য সাবান মাখা, নাটক নভেল পড়া—এ সব এ দেশে নূতন। নূতন একটা কিছু হ'লেই লোকে তা অনেকটা অপ্রীতি ও ঘৃণার চক্ষে দেখে। তোমার শাশুড়ী যদি তা' নাই চান, নাই বা কর্‌লে। তুমি যদি ও সব বিষয়ে অত জেদ না কর, তাঁরাও এ সব নিবারণের জন্যে অত জেদ কর্‌বেন না। আর বই পড়া—মাঝে মাঝে তোমার শাশুড়ীকে রামায়ণ মহাভারত পড়ে শুনিও দেখি, তা হ'লে তোমার পড়াশুনায় তিনি আপত্তি কর্‌বেন না। কিন্তু তাও বলি ভাই, অত নাটক নবেল, বিশেষতঃ আজ্‌কাল অপরিণতবুদ্ধি পাঠক পাঠিকাদের মাথা বিগ্‌ড়ে দেবার জন্যে যে সব বই লেখা হ'চ্ছে, তা পড়া ভাল নয়।

এবার কল্‌কেতায় গিয়ে একখানা বই পড়্‌লুম, তাতে আমাদের হিন্দু সমাজের স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধকে বিদ্রূপ করা হ'য়েছে, এমন কি, প্রকারান্তরে সীতা দেবীর চরিত্রে পর্য্যন্ত কটাক্ষ করা হ'য়েছে! গা শিউরে উঠ্‌ল! হিন্দুর মেয়ে সীতার মত সতী হ'ব, তাঁর মত চিরপবিত্র হ'য়ে, স্বামিভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে, মাটীর শরীর মাটীতে মিশ্‌য়ে দেব, এই গর্ব্বই আমরা ক'রে থাকি। সেই মা জানকীর সতীত্বে কটাক্ষ! হিন্দুর বংশে জন্মে এ কথা লিখ্‌লে কি ক'রে? সেই দিন থেকে এই সব আধুনিক লেখার উপর আমার যারপরনাই অশ্রদ্ধা হ'য়েছে।'

সুরমা বলিল—'দিদি, তুমি এ সব শিখ্‌লে কোথা?'

বিন্দু ঈষৎ হাসিয়া বলিল—'তুই যে স্কুলমাষ্টারদের নিন্দা কর্‌ছিস্‌, সেই একজন পাড়াগেঁয়ে স্কুলমাষ্টারের কাছে।'

সুরমা বলিল, 'বুঝেছি, জামাইবাবুও ওই স্কুলে মাষ্টারী কর্‌তেন শুনেছি।'

বিন্দু কম্পিতকণ্ঠে বলিল—'রমা, ভাগ্যদোষে তাঁকে হারিয়েছি। তিনি মানুষ ছিলেন না রে, দেবতা! তাঁর হাতে না পড়্‌লে, আমি হয় ত তোরই মত হ'তুম। বাপের আদরের গর্ব্বে, ধনের গর্ব্বে, অল্প শিক্ষার গর্ব্বে, নিজের চারি দিকে আত্মাভিমানের এমন উঁচু পাথরের প্রাচীর গ'ড়ে বস্‌তুম যে, চিরকাল একাকীই তার মধ্যে বাস ক'রে, শেষে উপকথার রাজকন্যার মত নিজেই পাথর হ'য়ে যেতুম। আমি তোর চেয়ে কম পড়িনি, তোর চেয়ে কম আমার আত্মাভিমান ছিল না। কিন্তু আমি স্পর্শমণি পেয়েছিলুম, তাই আমার লৌহজন্ম ঘুচে গেছে।'

উভয়ে কিয়ৎকাল নীরব হইয়া রহিল। সুরমা সেই নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বলিল—'আজকালকার অনেক বই প'ড়ে মনটা কি-রকম যেন হ'য়ে পড়ে দিদি তা' বুঝ্‌তে পারি—যেন যা' আছে তার কিছু ভাল লাগে না!'

বিন্দু বলিল—'এই দেখ্‌না, রমা, তুই ঐ সব বিষ খেয়ে খেয়ে, এমনই হ'য়েছিস্‌ যে, পাড়াগেঁয়ে স্কুলমাষ্টার ব'লে অমন স্বামীর বুকভরা অকলঙ্ক পত্নীপ্রেমকে পর্য্যন্ত অবজ্ঞা কর্‌তে আরম্ভ ক'রেছিস্‌! কেন রে, এরা কি মানুষ নয়? এদের কি হৃদয় নাই? কাল তুই নগেনকে অত রূঢ় কথা বল্‌লি, তার মা'কে অপমান কর্‌লি, পাড়াগেঁয়ে ব'লে তাদের কত ঘৃণা কর্‌লি; কিন্তু সে তোকে একটি রূঢ় কথা বল্‌লে না! শুনেছি, জমীদার এক অনাথা বিধবার উপর অত্যাচার ক'র্‌তে চেষ্টা ক'রেছিল ব'লে সে লাঠী হাতে তাকে শাসন কর্‌তে গিয়েছিল। কিন্তু তুই স্ত্রী, তুই তাকে মর্ম্মান্তিক অপমান

কর্লি—তেজস্বী যুবা বালকের মত কাঁদ্‌লে! বল্ দেখি তার বুকে কত ব্যথা বেজেছে। আর এই যে আজ চ'লে এলি, সে তাদের কি অপমান ক'রে এলি! নগেনের বাপ এক জন দলপতি। তাঁর বউয়ের এ আচরণে তাঁর মাথা কত হেঁট হ'য়েছে! স্বামিনিন্দা শুনে সতী দেহত্যাগ ক'রেছিলেন যে রে! আর তুই নিজের মুখে অমন দেবতার মত স্বামীর নিন্দা কর্লি! কা'ল ত সাবিত্রীর উপাখ্যান শুন্‌লি? রাজার মেয়ে বনবাসীর গলায় মালা দিয়ে বনকে স্বর্গ ক'রে তুলেছিলেন!'

এবার সুরমা কাঁদিল। বালিশে মুখ লুকাইয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। বলিল—'তা' দিদি, আমি যে ওঁদের কষ্ট দিবার জন্যেই এ সব বলি, তা' নয়। অনেক সময় ব'লে ফেলে মন কেমন করে। এক একবার মনে করি, ওঁরা যা' বলেন, তাই কর্‌ব; কিন্তু সে ভাব আবার কোথায় চ'লে যায়। তার চোখে জল দেখে আমার কি একেবারেই কষ্ট হয় নাই দিদি? তা' নয়। একবার ইচ্ছা হ'ল, হাতে ধ'রে ক্ষমা চাই, কাঁদ্‌তে বারণ করি। কিন্তু তা' পার্‌লুম না। কে যেন গলা চেপে ধ'র্‌লে!'

'গর্ব্ব, বোন্, গর্ব্ব! বাপের এক মেয়ে, চিরকাল দর্পে দম্ভে কাল কাটিয়েছ, সুশিক্ষা ত হয় নাই! কিন্তু রমা, হিন্দুর ঘরের মেয়ে আমরা, আমরা দেবী হ'ব, আমরা পরের জন্য নিজের প্রাণ দেব। নীলকণ্ঠের মত, যত অমঙ্গলের বিষ আমরা খেয়ে, সংসারকে সুধাময় ক'রে তুল্‌ব। আমাদের আদর্শ মা জানকী—সাবিত্রী। আমরা পশুর মত আত্মসুখ খুঁজে বেড়াব, কেন রে? পৃথিবীতে সব জিনিসই কি নিজের মনের মত হয়? কিন্তু মনের মত হয় না বলে নিজে অসুখী হওয়া ও অন্যকে অসুখী করা কি ভাল? যা মনের মত নয় তাকে মনের মত ক'রে নিতে হ'বে, যা অসুন্দর তাকে সুন্দর ক'রে তুল্‌তে হ'বে। এই ত বাহাদুরী, এই ত মহত্ত্ব। মানুষের, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের, এতেই সম্মান—এতেই গর্ব্ব।'

এবার সুরমা দিদির গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। অনেকক্ষণ কাঁদিয়া শেষে বলিল—'দিদি, ওঁদের মুখে তোমার এত সুখ্যাতি কেন, তা' আজ বুঝ্‌লুম। বল্‌তে কি, তুমি সেই বিন্দু দিদি হ'য়ে কি ক'রে সকলকে বশ ক'র্‌লে, তা' নিজের চোখে দেখ্‌ব, ইহাই আমার এখানে আসার প্রধান উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য সফল হ'য়েছে—স্পর্শমণির স্পর্শে আমারও, বোধ হয়, এবার লৌহজন্ম ঘুচে গেল।'

৫

সুরমা যখন পরদিন শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিল, তখন দেখিল তাহার দিদি তাহার অনেক পূর্ব্বে উঠিয়া গিয়াছে। বাড়ীর অন্য সকলেও উঠিয়া কাজকর্ম্ম করিতেছে। বিন্দু গৃহকর্ম্ম শেষ করিয়া স্নানান্তে ঠাকুরঘরের কাজে নিযুক্ত হইয়াছে। কক্ষের বাহির হইতে সুরমার লজ্জা করিতে লাগিল। এমন সময় খোকা 'কাকী মা, কাকী মা' করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সুরমা তাড়াতাড়ি খোকাকে তুলিয়া কোলে করিল। খোকা, বোধ হয়, ঘুমের ঘোরে তাহাকে 'কাকী-মা'ই মনে করিল; কারণ, সে সুরমার কোলে গিয়া আর কাঁদিল না।

সুরমা খোকাকে কোলে লইয়া কক্ষের বাহির হইতেই বড় বউ তাহার সম্মুখীন হইল। বড় বউ হাসিতে হাসিতে বলিল—'এই যে চুপ ক'রেছে। মেজ কাকীমাকে না দেখ্‌তে পেলে ছেলেগুলি যেন পাগল হয়। ঐ দেখনা ভাই, সব ছেলে মেয়েরা ব'সে আছে। মেজ কাকী মা এসে খাবার দেবে, তবে খাবে; আমাদের দেওয়া মনে ধরে না।'

বিন্দুর শাশুড়ী সুরমাকে ছেলে কোলে করিয়া আসিতে দেখিয়া বলিলেন—'দু'টি বোন্‌কে কি ভগবান্ এক ছাঁচে গ'ড়েছিলেন! এই দেখ না মা আমার কতক্ষণই বা বাড়ীতে এসেছে, এরই মধ্যে ছেলেদের আপনার ক'রে নিয়েছে! কল্‌কেতার মেয়ে না হ'লে কি এত গুণ হয়?' সুরমা ভিতরে লজ্জায় পুড়িতে লাগিল।

বড় বৌ হাসিতে হাসিতে বলিল—'তা' মা, কল্‌কেতার মেয়ের কাছ থেকে আমরাও অনেক শিখেছি।'

গৃহিণী হাসিতে হাসিতে বলিলেন—'শিখেচ বৈ কি, মা, শিখেছ বৈ কি।'

এমন সময় বিন্দুর শ্বশুর ভিতর-বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া সুরমাকে দেখিয়া বলিলেন—'এই বুঝি আমার রায়পুরের বৌ মা গা?'

সুরমা খোকাকে তাহার মাতার ক্রোড়ে দিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া বৃদ্ধকে প্রণাম করিল। বৃদ্ধ বাষ্পগদ্গদকণ্ঠে কত আশীর্ব্বাদ, কত প্রশংসা করিলেন। শেষে বলিলেন—'আজ আমি বিকালে নিজে গিয়ে নগেনকে নিয়ে আস্‌ব। জেলেদের খবর দিয়েছি, একটা বড় দেখে মাছ ধর্‌তে।' সুরমা নিতান্ত সঙ্কুচিত ভাবে, যেন দেওয়ালের সঙ্গে মিশিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বিন্দু ঠাকুরঘর হইতে বাহির হইয়া উঠানে তুলসী তলা পরিষ্কার করিতে

লাগিল। শ্বশুর বলিলেন—'মেজ মা, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌তে এসেছিলাম। তুমি ত, মা, গরু গরু ক'রে পাগল হ'য়েছ; একটা ভাল গরু পাওয়া গেছে, নেব কি ?'

মেজ মা ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি দিলেন। বৃদ্ধ তথাপি বলিলেন—'কিন্তু মা, আমার তত মত হয় না; কেবল তোমারই খাটুনি বাড়বে। যদো বেটার দ্বারা গরুর যা' যত্ন হয়, তা 'ত দেখেছ ?'

বিন্দু ঘোমটার ভিতর হইতে অতি মৃদু কণ্ঠে বলিল—'গরু না হ'লে কি গৃহস্থের ঘর মানায়, বাবা! যে দিন থেকে দুধ কেনা আরম্ভ হ'য়েছে, সে দিন থেকে আপনার শরীর আধখানি হ'য়ে গেছে।'

বৃদ্ধ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। গৃহিণীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—'মেজ মা'র আমার ইচ্ছা, আমি বুড়ী কি নেপুর মত হই, আর উনি আমাকে মনের সাধে খাওয়ান। আর কেউ আমাকে রোগা হ'তে দেখে নি, উনিই আমার শরীরের জন্যে ভেবে অস্থির! তবে যাই, গরুটা কিনে আনি, মেজ মা যখন ধরেছেন, তখন ত আর ছাড়্‌বেন না।'

৬

'দিদি, একখানা পাল্‌কী আন্‌তে বল না।'

'এত সকালে পাল্‌কী ? কোথা যাবি ?'

'বাড়ী যাব।'

'কোথা ?'

'শ্বশুরবাড়ী।'

'তা' কি হয় ? আমার শ্বশুর শ্বাশুড়ী না খাইয়ে যেতে দেবেন কেন ? ও বেলা নগেনকে আন্‌বার কথা হচ্ছে। আমি একখানা ভাল ক'রে চিঠি লিখে দেব, সে আস্‌তে অমত কর্‌বে না।'

'না দিদি, তুমি যেমন ক'রে পার, তোমার শ্বশুর শ্বাশুড়ীর মত করাও।'

'এত ব্যস্ত কেন বল্‌ দেখি ?'

'কা'ল থেকে আমার শ্বাশুড়ী উপবাস ক'রে আছেন।' বলিয়া সুরমা কাঁদিতে লাগিল। বিন্দু বলিল—

'উপবাসী আছেন, তুই জান্‌লি কেমন ক'রে ?'

সুরমা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—'আর একদিন আমি রাগ ক'রে না খেয়ে ঘরে খিল দিয়ে শুয়েছিলুম। আমার শ্বাশুড়ী কত সাধ্য সাধনা কর্‌লেন, দোর

খুল্লুম না। তার পর দিন দেখি, হাঁড়ির ভাত হাঁড়িতে আছে, শাশুড়ীও খান্ নাই। একজন অতিথি উপবাসী থাক্‌লে তিনি খান্ না, আমি ত বউ।'

বিন্দু হাসিতে হাসিতে বলিল—'পাড়াগেঁয়েদের ও একটা রোগ আছে। আমাদের সহরে ও সব বালাই নেই। আর কেউ থাক্ আর না থাক্, নিজের হ'লেই হ'ল।'

পাল্‌কী আসিল। বিন্দুর শাশুড়ী কাঁদিতে কাঁদিতে সুরমাকে পাল্‌কীতে তুলিয়া দিলেন যেন আপনার কন্যাকে শ্বশুরবাড়ী পাঠাইতেছেন। সুরমা সজল নেত্রে তাঁহার পদধূলি লইয়া বলিল—

'মা, আবার আস্‌ব। এত বেশী দূর নয় মা!'

সুরমা পাল্‌কীতে উঠিয়া আবার দিদির পদধূলি লইল, বলিল—'দিদি, আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমারই মত হ'তে পারি।'

বিন্দু সাশ্রুনেত্রে ভগিনীকে বিদায় দিল।

৭

সুরমা ঠিকই অনুমান করিয়াছিল। গত রাত্রিতে তাহার শাশুড়ী জলস্পর্শ করেন নাই। প্রথমে অভিমানে বউকে উদ্দেশে অনেক তিরস্কার করিয়াছিলেন; কিন্তু শেষে ছেলেকে বলিলেন—

'আমারই দোষ রে বাবা! বাস্তবিকই বড় লোকের মেয়ে, চিরকাল কল্‌কেতায় বাস, সে দু'দিন ঘর কর্‌তে এসে একেবারে আমাদের মত হ'তে পারবে কেন? তোর আবার বে' দেব ব'লেছি ব'লে সে অভিমানে চ'লে গেছে রে!'

গৃহিণী কাঁদিতে কাঁদিতে কর্ত্তাকে বলিলেন—'তুমি এখনই নারাণপুরে গিয়ে বৌমাকে আমার নিয়ে এস।'

পুত্র বলিল—'না বাবা, সে অপমানে আর কাজ নাই। আপনি আন্‌তে গেলে আমি দেশ ছেড়ে চ'লে যাব।'

'অপমান কি রে! ঘরের ছেলে রাগ ক'রে গেছে, তাকে ডেকে আনা অপমান! ঐ বয়সে তোকে লেখাপড়ার জন্যে বকলে তুই যে কতবার রাগ ক'রে না খেয়ে পাড়ার কারো বাড়ীতে গিয়ে ব'সে থাক্‌তিস্। আবার কত সাধ্য সাধনা ক'রে আন্‌তে হ'য়েছে। আর সে বেচারীর দোষই বা কি? চিরকাল যা' ক'রে এসেছে তোদের এখানেও তাই ক'রতে গিয়েছে, তোরা

গোঁ ধরে, তখন তাদের যত বাধা দেবে তারা ততই সেই কাজ করবে? তা' এ আর আমি তোদের বোঝাতে পারলুম না।'

গৃহিণী পূর্ব্ববৎ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—

'তার দোষ কিছুই নয় গো, যত দোষ আমার। আমি কেন আবার ছেলের বে' দিতে চাইলুম?'

পুত্র বলিল—'নিজে এসে মায়ের পায়ে ধরুক। আন্‌তে যাওয়া কোন মতেই হবে না।'

এমন সময় বউ সত্য সত্যই নিজে আসিয়াই শাশুড়ীর পায়ের উপর পড়িল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—'মা, আমি তোমার নির্ব্বোধ মেয়ে, আমার সব দোষ ক্ষমা কর।

শাশুড়ী কাঁদিতে কাঁদিতে বউকে হাতে ধরিয়া তুলিয়া বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বার বার তাহার মুখ চুম্বন করিতে লাগিলেন। অঞ্চল দিয়া তাহার চক্ষু মুছা-ইতে মুছাইতে বলিলেন—'ক্ষমা কি মা! তুমি আমার ঘরের লক্ষ্মী ঘরে এস।'

* * *

রাত্রে নগেন্দ্র একাকী আপনার শয়নকক্ষে মেঝের উপর বসিয়া বই পড়িতেছিল। সুরমা নিঃশব্দে যাইয়া তাহার পার্শ্বে বসিল। নগেন্দ্র জানিতে পারিয়াও কিছু বলিল না, কিন্তু তাহার বুকের ভিতর ঢিপ্ ঢিপ্ করিয়া শব্দ হইতেছিল। সুরমা স্বামীর হাত হইতে বইখানি কাড়িয়া লইয়া বলিল—'হাঁ গা, তুমি না কি দেশ ছেড়ে চ'লে যাবে?'

নগেন্দ্র ছাদের দিকে চাহিয়া বলিল—

'ইচ্ছা ত।'

সুরমা নগেন্দ্রের হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে বলিল—'এ দিকে ফিরেই বল না। বলি, গেরুয়া প'রে বেরুবে, না একখানা কালাপেড়ে কাপড় কুঁচিয়ে রাখ্‌ব?'

নগেন্দ্র তদবস্থ হইয়াই বলিল—'ভেবে দেখি।'

সুরমা এবার আপনার মৃণালকোমল বাহুদ্বারা নগেন্দ্রের কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া বলিল—'তবু ছাদের দিকে চেয়ে রইলে? ভাব্‌বে আবার কবে?'

দুই জনে চোখোচোখি হইল। নগেন্দ্র সাশ্রুনয়না সুন্দরী পত্নীর কাতরতা-পূর্ণ মুখখানির দিকে চাহিয়া আত্মসংবরণ করিতে পারিল না। পত্নীকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—'রমা, তুমি কি সেই রমা?' রমা স্বামীর বক্ষে মুখ

লুকাইয়া প্রাণ ভরিয়া কাঁদিল। নগেন্দ্রেরও চক্ষে ধারা বহিতে লাগিল। বহুক্ষণ উভয়েই নীরব হইয়া রহিল। শেষে রমা স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু হাস্য করিতে করিতে বলিল—'তবে আর গেরুয়া নিয়ে কাজ নাই, কি বল ?'

নগেন্দ্র সস্নেহে পত্নীর কিশলয়কোমল হাত দুইখানি ধরিয়া বলিল—

'তুমি নিতে দিলে কই ?'

'এক দিন কিন্তু আমাকে নিয়ে বিন্দু দিদির বাড়ী যেতে হ'বে।'

'তথাস্তু।'

শ্রীসরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।

বুরহানপুর।

বুরহানপুর অথবা বরহানপুর, এই দুই নামেই উক্ত নগরী অভিহিত হয়। আমরা কিন্তু প্রথমোক্ত নামেই ইহাকে অভিহিত করিব। ১৪০০ খৃষ্টাব্দে খান্দেশের তুর্কবংশীয় প্রথম রাজা নাসির খাঁ এই নগরের প্রতিষ্ঠা করেন। বুরহান উদ্দীন আউলিয়া নামক বিখ্যাত মুসলমান সাধুর নামানুসারে নগরীর নাম বুরহানপুর হইয়াছিল।

এই প্রাচীন ঐতিহাসিক বাদশাহী সহর বোম্বাই ও মধ্যপ্রদেশের সীমান্ত-রেখার সন্ধিস্থলে অবস্থিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত বাদ-শাহী আমলে দিল্লী হইতে এক জন মোগল শাসনকর্ত্তা প্রেরিত হইতেন; এবং বুরহানপুরে অবস্থিতি করিতেন। সেই সময়ে বুরহানপুর বহুল সৌধমালায় শোভিত, মস্‌জীদ্‌ মিনারে ভূষিত, দুর্গপ্রাচীরে সুরক্ষিত, জনকোলাহলে মুখ-রিত, সমৃদ্ধিসম্পন্ন নগরী ছিল। এখনও পূর্ব্ব গৌরবের বহু চিহ্নাবশেষ বক্ষে ধারণ করিয়া বুরহানপুর তরঙ্গময়ী তাপ্তীর অবস্থিত স্বচ্ছ নীর-মুকুরে আপনার কঙ্কালাবশেষ প্রতিবিম্ব দর্শন করিতেছে।

খাণ্ডোয়া হইতে বুরহানপুরের দূরত্ব ৪৩ মাইল। জি. আই. পি. রেলওয়ের একটি ষ্টেশন। খাণ্ডোয়া হইতে ১২-১৫ মিনিটের ট্রেনে বুরহানপুর যাত্রা করি-লাম। এই ট্রেণে মধ্য-শ্রেণী না থাকায় তৃতীয়-শ্রেণীতে উঠিলাম। আমাদের কামরায় কয়েক জন মুসলমান ব্যবসায়ী উঠিয়াছেন। তাঁহাদের এক জন আমাকে চুরুট খাইতে দেখিয়া একটি চাহিয়া লইলেন। চুরুট ধরাইয়া অনভ্যাসবশতঃ একে-

বারে গলা পর্য্যন্ত ধূম টানায় ভয়ঙ্কর কাশিতে আরম্ভ করিলেন। চক্ষু রক্তবর্ণ হইল। অতিকষ্টে হাস্তসংবরণ করিয়া তাঁহাকে ধূম টানিয়াই ছাড়িয়া দিতে উপদেশ দিলাম।

এইখানে পথের কথা একটু লিখি। পথের শোভা বড়ই চিত্তাকর্ষক। ডোঙ্গরগাঁও ষ্টেশন হইতে পাহাড় আরম্ভ হইল।—রৌদ্রদীপ্ত মধ্যাহ্নে নীলপাহাড়ের কোথাও আলোক ঝল্‌সিতেছে; কোথাও নিবিড় ছায়ায় কালো হইয়া গিয়াছে। দু'ধারে জঙ্গল; শীত ঋতুর প্রকোপে অনেক গাছপালার পাতা ঝরিয়া গিয়াছে। মাণ্ডব ষ্টেশনের দক্ষিণে শৈলারণ্যের পশ্চাদ্‌ভাগ হইতে আসিরগড়ের গিরিদুর্গ দেখা যাইতে লাগিল। মাণ্ডবের পরই চাঁদনী ষ্টেশন। এই ষ্টেশন হইতেই উক্ত দুর্গে যাইবার পথ। ১৩৭০ খৃষ্টাব্দে শা আসির নামক কোনও পশুপালক উক্ত দুর্গ নির্ম্মাণ করে, এইরূপ জনশ্রুতি। ট্রেণ হইতে এই পার্ব্বত্য দুর্গের দৃশ্য বড়ই গম্ভীর ও চিত্তহারী। চাঁদনী ষ্টেশন হইতে কেল্লা খুবই ভাল দেখায়, এবং প্রায় সমস্ত পথ এই দুর্গটি নয়নের অন্তরাল হইতে চায় না। চাঁদনীর বাম দিক্ হইতে সাতপুরা গিরিশ্রেণী দৃষ্ট হইতে লাগিল। অবিরল শৈলকানন ভেদ করিয়া ট্রেণ বুরহানপুরের নিকটবর্ত্তী হইল। ট্রেণ-লাইন হইতে দূরবর্ত্তী বুরহানপুরের দৃশ্য অতিশয় মনোমুগ্ধকর। সমস্ত সহর যেন নিবিড় পাদবরাজিতে সমাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। সেই নিবিড় কাননরাজি ভেদ করিয়া কালো কালো অসংখ্য মিনার নীল গগন চুম্বন করিতেছে। ক্রমে ট্রেণ বেলা তিনটার সময় বুরহানপুর ষ্টেশনে পঁহুছিল। ষ্টেশনে ডাকাডাকি করিয়া কুলী না পাওয়াতে রেলওয়ে-পুলিশের সাহায্যে দ্রব্যাদি সহ প্লাট্‌ফরমে অবতরণ করিলাম। এখানে এতদ্দেশীয় পুলিসের সম্বন্ধে একটি কথা না বলিলে অবিচার করা হয়। বঙ্গদেশীয় পুলিস দরিদ্র পরিব্রাজকদিগকে কোনও সাহায্য করে না। কিন্তু পশ্চিম-ভারতের পুলিস যে কোনও পথিককে যথাসাধ্য সাহায্যপ্রদানে সতত অগ্রসর। কুলী না থাকায় কনেষ্টবল জনৈক রেলওয়ে-কুলীকে ডাকিয়া আমার দ্রব্যাদি নামাইয়া দিল, এবং তাহাকে পারিশ্রমিকস্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ অর্থ দিতে বলিল।

ষ্টেশনের বাহিরে আসিয়া সহরে যাইবার জন্য আট আনা দিয়া একখানি টাঙ্গা ভাড়া করিলাম। সহর রেলওয়ে-ষ্টেশন হইতে তিন মাইল পথ। এই পথটি অতি সুন্দর পাকা পথ। উভয় পার্শ্বে সুদীর্ঘ আম্র ও নিম্বতরুশ্রেণী পথটিকে ছায়াময় করিয়াছে। টাঙ্গা যুড়ী ঘোড়ায় সবেগে টানিয়া যাইতেছে। পথের উভয় পার্শ্বে প্রান্তর। স্থানে স্থানে সৌধ ও ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হইতেছে।

দেখিতে দেখিতে সুন্দর প্রাচীরপরিবেষ্টিত নগরীর তোরণসমীপে উপস্থিত হইলাম। তোরণ অতিক্রম করিয়া টাঙ্গা নগরীমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। অপরাহ্ণে নগরী নিস্তব্ধ! জনকোলাহল নির্ব্বাপিত! সহরের মধ্যস্থিত পথ অতিসঙ্কীর্ণ। দুইখানি টাঙ্গা পাশাপাশি যাইতে পারে না। পথের দু'ধারে খর্পরাচ্ছাদিত দ্বিতল সৌধশ্রেণী! দ্বার ও গবাক্ষ অবরুদ্ধ! সম্ভবতঃ পৌরজনবর্গ এখনও ঘুমাইতেছেন। এমন কি, বালকবালিকারও সাড়াশব্দ নাই। তাহারা বোধ হয় বিদ্যালয়ে পড়িতে গিয়াছে। সৌধশ্রেণীর ছাদ খর্পরাচ্ছাদিত হইলেও, অনেক সৌধের কাষ্ঠ-স্তম্ভসংবলিত, চারুকার্য্যসমন্বিত অলিন্দও গবাক্ষ, তাদৃশ মনোহারী না হইলেও, বেশ সুদৃশ্য। টাঙ্গা নির্জ্জন নগরীপথে ছুটিতে ছুটিতে আমার গন্তব্য-গৃহদ্বারে উপস্থিত হইল। মনে হইল, বাটীতে কেহ নাই। টাঙ্গা-চালক বহুক্ষণ ডাকাডাকি করাতে চক্ষু মুছিতে মুছিতে দুই জন হিন্দুস্থানী দ্বার খুলিয়া বাহির হইল। আমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এই কি গোষ্ঠবাবুর বাড়ী ?' তাহারা আমার মুখে গোষ্ঠবাবুর নাম শুনিবামাত্র আমাকে তাঁহার কোনও আত্মীয় ভাবিয়া আমার দ্রব্যাদি সহ একেবারে উপরে লইয়া গেল। আমি কিন্তু গোষ্ঠ-বাবুকে কখনও দেখি নাই। উপরে গিয়া কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'বাবু কোথায় ?' তাহারা হিন্দীতে বলিল, 'আপনি বিশ্রাম করুন, বাবু কাছারী হইতে এখনই আসিবেন।'

বসিয়া বিশ্রাম করিতেছি, এমন সময়ে খর্ব্বাকৃতি, গৌরবর্ণ, কুঞ্চিত-কেশ, চটুলনয়ন, কোট-পেণ্ট্‌লান-পরিহিত, সুদর্শন একটি বাবু গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। ইনিই বাবু গোষ্ঠবিহারী দে, অত্রত্য মুন্সেফ; হুগলী জেলার অধিবাসী। আমি বুরহানপুরে আসিব, কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহাকে জানাইয়াছিলাম। তিনি আমাকে দেখিবামাত্র অতিপরিচিতভাবে মধুরহাস্যে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, 'প্রত্যহই আপনার প্রতীক্ষা করিতেছি। মধ্যে শুনিলাম, আপনি উজ্জয়িনীতে ছিলেন।' আমি বলিলাম, 'অনেক আগেই আমার এখানে আসা উচিত ছিল, কিন্তু পথে কয়েকটি স্থান দেখিতে বিলম্ব হইয়া গেল।' যাহা হউক, ইনি পরমাত্মীয়ের ন্যায় আমার সহিত ব্যবহার করিলেন। কথাপ্রসঙ্গে জ্ঞাত হইলাম, ইনি সাহিত্যপ্রিয়; বাঙ্গালা সাহিত্যের অনেক খবর রাখেন; কবিতাও প্রচুর মুখস্থ আছে। এই অপরিচিত সুদূর দেশে আমার একজেলা-বাসী এরূপ ভদ্রলোকের সহবাসে বড়ই আনন্দ ও তৃপ্তি অনুভব করিয়াছিলাম। নানা কথায় সময় কাটিতে লাগিল।

১৮ই জানুয়ারী; ১৯১৪; রবিবার।—প্রভাতে চা পান করিয়া সহর-দর্শনে বহির্গত হইলাম। গতকল্য যখন নগরে প্রবেশ করি, তখন ইহার ঘুমন্ত ভাব দেখিয়াছিলাম। এখন সহর জাগিয়াছে। রাস্তায় লোক জন যাতায়াত করিতেছে। প্রথমে বাজারে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলাম, নানাবিধ তরিতরকারী; শাক্‌শবজী, আলু, ফুলকপি, মৎস্য, মাংস প্রভৃতি বিক্রয় হইতেছে—মণিহারীর দোকানও বসিয়াছে, লোকের ভিড় তেমন ঘন না হইলেও মন্দ নহে। একটা খোলা জায়গাতে বাজার বসে।

বাজার দেখিয়া এখানকার জামামস্‌জীদ দেখিতে গেলাম। বাস্তবিক, ইহা অপূর্ব্ব জিনিস! এরূপ ধরণের মস্‌জীদ সচরাচর দৃষ্ট হয় না। ইহা সম্পূর্ণ নূতন ধরণের। সুদৃশ্য তোরণদ্বার অতিক্রম করিয়া বিস্তৃত প্রাঙ্গণে উপনীত হইলাম। মস্‌জীদ কৃষ্ণপ্রস্তরে নির্ম্মিত। সারি সারি পনেরটি খিলান, অর্থাৎ পনের-কুকুরে—এবং পর পর পাঁচটি সুদীর্ঘ বারান্দা মস্‌জিদাভ্যন্তরে অবস্থিত। সাধারণ মস্‌জিদে দুইটিমাত্র বারান্দা থাকে। মস্‌জীদে উচ্চ গম্বুজ নাই। আলিসা ও প্রস্তরায় (cornice) কারুকার্য্য, এবং খিলানগুলির সন্ধিস্থলে প্রস্তরে উৎকীর্ণ বড় বড় ফুল বড়ই মনোহর! মসজীদের দুই প্রান্তে দুইটি আকাশস্পর্শী মিনার দণ্ডায়মান।

মস্‌জীদ দেখিয়া তাপ্‌তীতীরে প্রাচীন বাদশাহী দুর্গ দেখিতে গেলাম। গোষ্ঠ বাবুও সঙ্গে ছিলেন। দুর্গটি চারি তল। একেবারে নদীগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়াছে। প্রায় ৮০ ফুট উচ্চ। দুর্গের অবস্থা—জীর্ণ, ভগ্ন। অনেক কক্ষের দ্বার ও গবাক্ষ কিছুই নাই। ইহার কতকাংশ ডাক-বাঙ্গলো ও বিশ্রামভবন রূপে ব্যবহৃত হইতেছে। একটি স্নানাগার বা 'হামাম' দেখিলাম। ইহার উপরিভাগে গম্বুজ—ভিতরের আস্তরণ মধুচক্রের ন্যায় ছিদ্রবিশিষ্ট। পূর্ব্বে এই দুর্গসংলগ্ন অনেক প্রাসাদ সৌধ ছিল। শাসনকর্ত্তা এইখানেই থাকিতেন। এক্ষণে সে সমস্ত ভূপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া গিয়াছে।

দুর্গের উপর হইতে চারি দিকের দৃশ্য বড়ই নেত্রসুখকর। রজতময়ী তাপতীর পরপারে শ্যামল প্রান্তর ও বৃক্ষরাজি দূর নীলিমায় মিশিয়া রহিয়াছে। আর পশ্চাদ্‌ভাগে আমাদের পূর্ব্বকথিত সেই শৈলচূড়স্থিত আশীরগড়ের কেল্লা নিবিড় ধূমল নীল মেঘবক্ষে আরব্যোপন্যাসের বিরাট দৈত্যের ন্যায় গম্ভীরমূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া আছে! দেখিলে হৃদয়ে যুগপৎ বিস্ময় ও ভীতি উপস্থিত হয়!

দুর্গশিখর হইতে নামিয়া আসিয়া আমরা এখানকার বিদ্যালয় দর্শন করিলাম। বিদ্যালয়ের নিকটেই একটি উন্মুক্ত স্থানে দুইটি সুদীর্ঘ মিনার দণ্ডায়মান। মিনারের গঠনও বিচিত্র। ঠিক যেন দুইটি আকাশস্পর্শী প্রকাণ্ড বাতি কিয়দ্দূর ব্যবধানে কে বসাইয়া দিয়াছে। মস্‌জীদের কিছুমাত্রও চিহ্ন নাই; কোন্ কালে ভূমিসাৎ হইয়াছে! এইরূপ মিনার ফেরকী পাঠান-বংশের শিল্প-নিদর্শন। বুরহানপুরের অনেক স্থানেই এইরূপ যুগল-মিনার আছে, কিন্তু মস্‌জিদ্ নাই। সেকালের স্থপতিরা ভূকম্পে ভূমিসাৎ হইবার আশঙ্কায় মিনার-নির্ম্মাণে স্থাপত্য-কৌশলে যেরূপ কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন, মস্‌জীদ-নির্ম্মাণে তদ্রূপ করিলে, সেগুলি আজিও বর্ত্তমান থাকিত।

১৯শে জানুয়ারী, সোমবার, ১৩১৪।—প্রভাতে সহরের উত্তর দিকে গোষ্ঠ বাবুর সহিত যাত্রা করিলাম। সেই সঙ্কীর্ণ পথ। উভয় পার্শ্বে দ্বিতল খর্পরাচ্ছাদিত সৌধশ্রেণী। আমরা দক্ষিণ তোরণ অতিক্রম করিয়া সহরের বহির্ভাগে আসিয়া পড়িলাম। এই অংশে তাপতী নদী হইতে ওতাউলী নামে একটি শাখা নদী বহির্গত হইয়া পশ্চিমাভিমুখে গিয়াছে। ইহা এক্ষণে শুষ্ক, নীরশূন্য। নদীগর্ভ গভীর বালুকায় পরিপূর্ণ। নদীর উত্তর দিকে উচ্চ-নীচ ভূমি—আম্র নিচু প্রভৃতি বড় বড় ফলের গাছ—ছায়াময় বটবৃক্ষ প্রভৃতি। চতুর্দ্দিকের উদ্ভিদ্‌শোভা নয়ন-মনোমোহন! আমরা ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া ওতাউলী-তীরে শাহ নাবাজ খাঁয়ের সমাধি-ভবনে উপনীত হইলাম। ইনি বাদশাহ অওরঙ্গজেবের শ্বশুর ছিলেন। আগ্রার ইৎমদ্দোলার খাঁজের এই দ্বিতল রম্য সমাধিভবন দেখিতে মন্দ নহে। আমরা ইহার উপরে আরোহণ করিয়া শীতল সমীরণ উপভোগ করিতে করিতে চতুর্দ্দিকে কত ভগ্ন ও অভগ্ন সমাধি, মস্‌জীদ প্রভৃতির দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। আমি প্রাচীন দৃশ্যে চিরমুগ্ধ! সেই দূর অতীতের কত স্মৃতি প্রাণে জাগিয়া উঠে! কিছুকাল অবস্থানের পর অনিচ্ছায় নামিয়া আসিলাম; কারণ, দেখিবার জিনিস অল্প নহে।

পদ্মদলবৎ-বেদিকার উপর আর একটি অতি সুন্দর সমাধি দেখিলাম। সমাধি-মন্দিরও শীর্ষদেশ পর্য্যন্ত পদ্মাকারে বিরচিত। অভ্যন্তরেও নানা শিল্পচাতুর্য্য বহুবর্ণে প্রদর্শিত হইয়াছে। কে এ ব্যক্তি? যিনি মরণের পরে কবিত্ব ও সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত সমাধিতলে চিরবিশ্রাম করিতেছেন?

কিছু দূরে বিবিকা-মস্‌জীদ নামক একটি বিচিত্র ভজনালয়। এই বিবি মহাশয়া

জেনাবাদে আমরা প্রান্তরমধ্যে একটি ইষ্টকনির্ম্মিত প্রকাণ্ড সরাই দেখিলাম। ইহার চতুর্দ্দিকে পথিকখিলান-সমন্বিত অলিন্দ। বিশাল চতুষ্কোণ প্রাঙ্গণ। নগরীর সমৃদ্ধিকালে এই সরাইয়ে মিশর, আরব্য, পারস্য, তুরস্ক, আফ্‌গানিস্থান ও মধ্য-এসিয়ার নানা প্রদেশ হইতে বণিকগণ সমবেত হইতেন। তখন ইহা সতত কোলাহলমুখর থাকিত! এক্ষণে জনশূন্য সন্ধ্যায় একটি দীপও জ্বলে না। প্রাঙ্গণ নিবিড়বনাকীর্ণ—ঘুঘু চরিতেছে। কক্ষসমূহ বন্য-কপোতের আশ্রয়স্থল!

সরাইয়ের পশ্চিমেই একটি প্রাচীন মস্‌জীদে জনৈক মহম্মদীয় সাধুর কবর। উত্তর দিকে আর একটি মস্‌জীদ-সমন্বিত সরাই; ইহার উত্তরে আর একটি মসজীদ ছিল, তাহা আর নাই; কেবল সমুচ্চ মিনার দুটি তাহার স্মৃতি জাগাইতেছে। এ স্থানে এরূপ আরও কত কি ছিল, তাহা বলিতে পারি না। জীর্ণ নিদর্শনেই অতীত বৈভব বুঝাইতেছে।

এইবার আমরা জেনাবাদের প্রাসাদ-উদ্যানে প্রবিষ্ট হইলাম। এদেশের লোকে ইহাকে আহুখানা বলিয়া থাকে। আহুখানা অর্থে মৃগোদ্যান (deer park)। প্রাচীর-পরিবেষ্টিত উদ্যান-প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে পূর্ব্বে সুরক্ষিত কাননভূমি ছিল; তাহাতে ঝাঁকে ঝাঁকে নানাজাতীয় চিত্রিত হরিণ ছুটাছুটি করিত। এই কাননেই নবাবেরা সদলবলে মৃগয়া করিতেন। সেই জন্য প্রাসাদ-উদ্যানের 'আহুখানা' নাম হইয়াছে।

আহুখানায় মধুর ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজড়িত। সম্রাট্ সাজাহান যখন যুদ্ধ বিগ্রহ উপলক্ষে দাক্ষিণাত্যে অবস্থান করেন, তখন রূপসীশ্রেষ্ঠা মম্‌তাজমহল তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। সেই অনিন্দ্যসুন্দরী বুরহানপুরে তনুত্যাগ করেন। তাঁহার শবদেহ এই জেনাবাদের উৎসপ্রস্রবণোচ্ছ্বসিত, কুসুমস্তবকবহুল, সুরভিসমীর-মন্দির রাজোদ্যানে সমাহিত হয়। সম্রাট্-মহিষী এই স্থানে ছয় মাস সমাহিত ছিলেন। তৎপরে তাঁহার শব দিল্লীতে নীত ও জুমা মসজীদের সম্মুখে সমাহিত হয়। পরে আগরায় বিশ্ববিখ্যাত তাজমহল নির্ম্মিত হইলে মমতাজমহল চিরতরে তথায় সমাধিস্থ হন।

সেই প্রথম সমাধি-স্মৃতি বুরহানপুরে আজিও বিদ্যমান। একটি গম্বুজযুক্ত, প্রত্যেক দিকে তিনটি করিয়া সুন্দর খিলান-সমন্বিত বারদ্বারীর মধ্যস্থলে 'মমতাজ' সমাহিত ছিলেন। বারদ্বারীর সম্মুখে একটি সুন্দর চতুষ্কোণ জলাধার। তাহারই মধ্যস্থলে মর্ম্মররচিত মনোহর ফোয়ারা ছিল। সতত জলোচ্ছ্বাসে জলাধার

পরিপূর্ণ থাকিত। এক্ষণে পূর্ব্ব-শ্রী গত হইয়াছে—গম্বুজ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে—জলাধার শুষ্ক, ফোয়ারা অন্তর্হিত! হায়, আগ্রার স্মৃতি কি মমতাজের অপর সমস্ত স্মৃতিই মুছিয়া ফেলিবে?

মমতাজের পূর্ণগর্ভ সমাধিসৌধের সম্মুখেই আর একটি বারদ্বারী আছে। ইহা অতি সুন্দর। মধ্যস্থলে পাশাপাশি তিনটি হস্তিপৃষ্ঠবৎ ছাদ। সৌধের চারি কোণে চারিটি প্রস্তররচিত সোপান; যে কোণ দিয়া ইচ্ছা উপরে উঠিতে পারা যায়। ছাদের চারি কোণে চারিটি মিনারেট। ইহার সম্মুখেই সুবৃহৎ চতুষ্কোণ জলাধার। তাহার মধ্যস্থলে একটি চতুষ্কোণ বেদিকা। বারদ্বারীর সম্মুখ হইতে একটি সেতু দ্বারা বেদিকায় যাইতে হয়। এই বেদিকার উপর বসিয়া, বুরহানপুরের শাসনকর্ত্তা সুন্দরীললনাকুল-পরিবৃত হইয়া নিদাঘ-সন্ধ্যার শীতল সমীরে চিত্ত-বিনোদন করিতেন! জলপূর্ণ জলাধারে মৃদু তরঙ্গ উঠিত! রঙ্গিণ মৎস্যকুল ক্রীড়া করিত! চারি দিকে উচ্ছ্বসিত প্রস্রবণের জলোচ্ছ্বাসে বায়ু স্নিগ্ধ হইত! আর গোলাপ, মালতী, মল্লিকা, বেলা, যুথিকা প্রভৃতি প্রস্ফুটিত প্রসূন-পুঞ্জের প্রাণহরা সৌরভ দিগন্ত মাতাইয়া তুলিত!

হায়, কোথায় সে দিন—যেন নিশান্তের সুখস্বপ্নের ন্যায় দূর অতীতের বিস্মৃতি-সাগরে বিলীন হইয়া গিয়াছে।

উপরি-উক্ত জলাধারের পূর্ব্বাংশে বাদশাহী আমলের জল-সরবরাহের ব্যাপার দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। এক্ষণে নানাদেশে জলের কল দেখিয়া অনেকে বহু প্রশংসা করিয়া থাকেন। কিন্তু মুসলমানী আমলের জলের ব্যবস্থা আরও সুন্দর বলিয়া মনে হয়। শুনিলাম, প্রায় দশ বার মাইল দূরস্থিত পাহাড়ের নির্ঝরিণীর জল লহর কাটিয়া কিংবা পাইপের দ্বারা নগরে নগরে আনীত হইত। সেই জলে জলাধারসমূহ পূর্ণ হইত, প্রস্রবণ উচ্ছ্বসিত হইত, এবং সহরের পথিপার্শ্বস্থ সুদীর্ঘ জলস্তম্ভ সকল সতত পরিপূর্ণ থাকিয়া এই রৌদ্রদীপ্তদেশে তৃষ্ণার্ত্ত নাগরিক, পথিক ও পশু পক্ষীর তৃষ্ণা নিবারণ করিত। কল বন্ধ হইবার ভয় ছিল না। আর সে জলের আস্বাদ কি! যেমন মিষ্ট, তেমনই ঠাণ্ডা! আর জল সতত স্নিগ্ধ হইবে বলিয়া, মধ্যে মধ্যে প্রান্তরবক্ষে স্থানে স্থানে কতকগুলি মৃত্তিকা-নির্ম্মিত নল বসান আছে! তাহার সাহায্যে বায়ু প্রবিষ্ট হইয়া, ভূগর্ভস্থ প্রণালীবাহিত নীর শীতল করিয়া দিতেছে। সেকালের এইরূপ জলের ব্যবস্থা এখনও প্রাচীন বাদশাহী সহরগুলি হইতে অন্তর্হিত হয় নাই।

আহুখানার প্রাসাদ উদ্যানের সহিত একটি কৌতুকাবহ ঐতিহাসিক স্মৃতি

বিজড়িত রহিয়াছে। সম্রাট্ অওরঙ্গজেবের কাকা মহাশয় বুরহানপুরের শাসনকর্ত্তা (Governor) ছিলেন। জৈনবাদী নাম্নী একটি রূপসী যুবতী নর্ত্তকী তাঁহার রক্ষিতা ছিল। অওরঙ্গজেব বুরহানপুরে অবস্থানকালে, আহুখানার উদ্যানে জৈনবাদীকে দেখিয়া তাহার রূপলাবণ্যে আত্মহারা হইয়া পড়েন। উহাকে পাইবার নিমিত্ত কাকার হাতে-পায়ে ধরেন। অবশেষে বহুক্লেশে নাছোড়বান্দা অওরঙ্গজেব আপনার ছত্রবাই নাম্নী একটি সুন্দরী যুবতীকে খুড়া মহাশয়ের জৈনবাদীর সহিত অদল-বদল করিয়া, জৈনবাদীকে লইয়া অওরঙ্গাবাদে পলায়ন করিলেন। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের প্রখর উষ্ণবাতাসে অতি অল্প দিনেই সেই প্রফুল্ল প্রসূন ঝরিয়া গেল!

পাঠক-পাঠিকা মনে করিবেন না যে, জৈনবাদীর নামানুসারে এ স্থলের নাম জেনাবাদ হইয়াছে! মুসলমান বাদশাহগণ বিলাসের চূড়ান্ত উদাহরণ হইলেও, তাঁহারা ধর্ম্মের মর্য্যাদা সর্ব্বদা রক্ষা করিয়া চলিতেন। জৈনুদ্দীন চিস্তি নামক জনৈক সাধু এখানে বহুদিন অবস্থান করায়, তাঁহারই নামে 'জেনাবাদ' নামকরণ হইয়াছে।

এ সকল ঐতিহাসিক কথায় পর্য্যাটকের অধিকার নাই। তবে তাঁহাকে যখন কোনও স্থানের কথা লিখিতে হয়, তখন সে স্থানের ঐতিহাসের ক্ষীণ রেখাপাত করিতে হয়। সেটুকু নিতান্ত আবশ্যক। আর বর্ত্তমান সময়ে দেশে বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস-রচনা-প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। পাঠকের ঐতিহাসিক কৌতূহলনিবৃত্তির এমন সোজা উপায় আর নাই।

বুরহানপুরে খুব তুলার কারবার হইয়া থাকে। এ দেশ হইতে নানা স্থানে তুলা রপ্তানী হয়। তুলার কুঠী হইয়াছে। এখানে নানাবিধ কার্পাসবস্ত্র প্রস্তুত হয়। তদ্ভিন্ন বহু প্রকারের রঙ্গীন রেশমী বস্ত্র, বুটিদার ছিট্, ফুলদার জরীর পাড়, রুমাল প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। কাপড়ের পাড়ের নিমিত্ত সূক্ষ্ম স্বর্ণসূত্র প্রস্তুত করিবার প্রণালী বড়ই চিত্তাকর্ষক।

মুসলমান ও মহারাষ্ট্র অধিবাসীর সংখ্যাই বেশী। অধিকাংশ মারহাঠী দাউলের কারবার করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিয়া থাকে। তাহারা সচরাচর সামান্য আহার্য্যেই সন্তুষ্ট থাকে; অন্ন, রুটী, ডাল, আচার, দুগ্ধ, ঘৃত ও মিষ্টান্নেই সন্তুষ্ট। পাল পার্ব্বণে তরিতরকারী খায়। ব্রাহ্মণেরা কখনও মৎস্যমাংস খান না।

ইংরাজ-দূত সার টমাস রো জাহাঙ্গীর-পুত্র পরভেজের সহিত ১৬১৪ খৃষ্টাব্দে

এখানে সাক্ষাৎ করেন। ফরাসী পরিব্রাজক টেবার্ণিয়ে দুইবার আসিয়াছিলেন। প্রথমে ১৬৪১ খৃষ্টাব্দে; দ্বিতীয়বার ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে। তিনি লিখিয়াছিলেন, ইহা খুব বড় সহর, কিন্তু ধ্বংসোন্মুখ; অধিকাংশ ঘরবাড়ীরই খোড়ো চাল—সহরের মাঝখানে বিরাট কেল্লা। টেবার্ণিয়ে ভারি কুৎসাপ্রিয় ছিলেন। তিনি স্বীয় ভ্রমণ-বৃত্তান্তে এখানকার জনৈক শাসনকর্তার গভীর কলঙ্ক ঘোষণা করেন।

বর্ত্তমান বুরহানপুরের সম্বন্ধে একটি প্রবাদ-বচন প্রচলিত;—

'চার চিজ অস্ত তোফে বুরহান্
গরম্ গর্দ্দা গাদা ও গোরস্থান।'

অর্থাৎ, চারিটি দ্রব্য লইয়াই বুরহানপুর; যেমন গরম, তেমনই ধূলা, তেমনই ভিক্ষুক ও তেমনই কবর!

বুরহানপুরে দুই তিন দিন থাকিব বলিয়া আসিয়াছিলাম, কিন্তু গোষ্ঠবাবু এমনই সজ্জন যে, তাঁহার অতিশয় যত্নে ও রসনাতৃপ্তিকর আহারে এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল। সাঞ্চী, ভূপাল, উজ্জয়িনী, ইন্দোর, ওঙ্কার প্রভৃতি ঘুরিয়া বুরহানপুরে বড়ই আরাম উপভোগ করিয়াছিলাম। বুরহানপুরের সুখস্মৃতি অনেক-দিন আমার মনে থাকিবে।

২৩শে জানুয়ারী, ১৯১৪, প্রিয়দর্শন প্রবাসী সুহৃদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া সন্ধ্যা ৬টা—৪৫ মিনিটের ট্রেণে নাসিক অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম।

ভারতে বাণিজ্য-সংঘর্ষ।

ইস্‌লামের অভ্যুদয় হইলে আরব্য মোসলমান দুই দিক হইতে স্বর্ণপ্রসূ ভারতবর্ষে প্রবিষ্ট হন। এক দল মোসলমান অসিহস্তে সিন্ধুদেশে আগমন করেন। অন্য দল তুলাদণ্ড লইয়া মালবার দেশে উপনীত হন।

মোসলমান বণিকদের মালাবারে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে সেখানে খৃষ্টান্ এবং ইহুদীগণ বাণিজ্য ব্যবসায়ে নিরত ছিলেন। ইঁহাদের সঙ্গে নবাগত মোসলমানদের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। আমরা প্রথমতঃ মালাবারে মোসলমানদের আগমনের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া, তাহার পর সে সংঘর্ষের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিব।

এক দল মোসলমান আদমের পদচিহ্নদর্শনপূর্ব্বক পুণ্যসঞ্চয়মানসে সিংহল-দ্বীপাভিমুখে যাত্রা করেন। তাঁহাদের অর্ণবপোত প্রবল বায়ু কর্ত্তৃক তাড়িত

হইয়া ক্র্যানগোনোর নামক সমুদ্র-বন্দরে উপস্থিত হয়, এবং মোসলমান যাত্রীরা পথশ্রমে ক্লিষ্ট হইয়া বন্দরে অবতরণ করেন। এই দেশের সমিরা-উপাধিধারী অধিপতি তাঁহাদিগকে সমাদরসহকারে গ্রহণ করেন, এবং কতিপয় মোসলমান সাধুর ব্যবহারে অতিশয় প্রীত হন। সমিরা তাঁহাদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন, এবং তাঁহাদের উত্তরে সন্তোষ লাভ করিয়া ইসলাম-ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। অতঃপর সমিরা মক্কাভিমুখে যাত্রা করেন। কিন্তু তথায় পঁহুছিবার পূর্ব্বেই তিনি কাল-গ্রাসে পতিত হন। তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে মোসলমানদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন ও মসজিদ-নির্ম্মাণের অনুমতি প্রদান জন্য স্বীয় উত্তরাধিকারীর নিকট প্রেরণ করেন।

এই পত্রানুসারে নূতন সমিরা মোসলমানদের সঙ্গে সদয় ব্যবহার করেন, এবং প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তৃবর্গকে নিম্নলিখিত লিপি প্রেরণ করেন।—'হবিবের পুত্র মল্লিক ও আরও কতিপয় মোসলমান আমাদের এই দেশে ভ্রমণ করিতে আসিয়াছে ; এই স্থানেই বাস করিতে ইচ্ছা করিয়াছে। অতএব পরলোক-গত সমিরার আদেশ-অনুসারে তোমাদিগকে জানান যাইতেছে যে, যে স্থানেই উক্ত মল্লিক অথবা তাহাদের জাতীয় অন্য কেহ বাস করিতে ইচ্ছা করে, সেখানেই তাহাদিগকে ভূমিপ্রদানপূর্ব্বক বাসগৃহ অথবা মসজিদ-নির্ম্মাণার্থ অনুমতি দিতে হইবে।' মল্লিক প্রথমতঃ ক্র্যান্‌গোনোর নামক সমুদ্র-বন্দরে বাসস্থান নির্দ্দেশ করেন। এই স্থানে তিনি একটি মসজিদ ও উদ্যানবাটিকা নির্ম্মাণ করেন। অতঃপর তিনি দেশের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া কতিপয় স্থানে মসজিদ নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক ইস্‌লাম-ধর্ম্মের জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিবার জন্য মোল্লা নিযুক্ত করেন। এই সময় হইতে মোসলমানগণ মালাবারে ইস্‌লাম-ধর্ম্মের প্রচার করিতে থাকেন। উত্তরোত্তর তাঁহাদের প্রভাব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। অতঃপর তাঁহারা কতিপয় সমুদ্র-বন্দরের শাসনভার লাভ করেন। তাঁহাদের সৌভাগ্য দর্শন করিয়া ইহুদী ও খৃষ্টান বণিকদের ঈর্ষ্যা উপস্থিত হয় ; তাঁহারা নানা উপায় অবলম্বন করিয়া মোসলমানদের অনিষ্টসাধনে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু এই সময় গুজরাট ও দক্ষিণা-পথে দিল্লীর সুলতানদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে মালাবারের মোসলমান-দের বিশেষ অনিষ্ট সাধিত হইতে পারে নাই।

কিন্তু অবশেষে মোসলমানদের ভাগ্যচক্র নিম্নগামী হইয়াছিল। হিজিরা ৯০০ অব্দে খৃষ্টান পর্ত্তুগীজগণ বাণিজ্যার্থ মালাবারে উপস্থিত হন, এবং আরব্য

* সমিরা শব্দের অর্থ—সমুদ্র অর্থাৎ সমুদ্রের তীরবর্ত্তী দেশের অধিপতি।

বণিকদিগের পক্ষে সমুদ্র-বন্দরসমূহ রুদ্ধ করিবার জন্য তাঁহারা আরব্য বণিকগণ অপেক্ষা অধিকপরিমাণ অর্থ দিতে সমর্থ বলিয়া নিবেদন করেন। কিন্তু সমিরা তাঁহাদের বাক্যে কর্ণপাত না করাতে, তাঁহারা মোসলমান বণিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করিয়া, তাঁহাদের বাণিজ্যতরী সকল আক্রমণ করেন। রাজশক্তির এইরূপ অবমাননায় সমিরা অতিশয় ক্রুদ্ধ হন, এবং আক্রমণকারীদের প্রাণনাশ এবং ধন লুণ্ঠন জন্য আদেশ দেন। রাজাদেশে ৭০ জন সম্ভ্রান্ত পর্ত্তুগীজ বণিক নিহত হন। অবশিষ্ট খৃষ্টানেরা নৌপথে পলায়নপূর্ব্বক প্রাণরক্ষা করেন।

অতঃপর তাঁহারা সমিরার শত্রু কোচিন-রাজ্যের শরণাপন্ন হন। পর্ত্তুগীজ বণিকেরা কোচিন-অধিপতির অনুমতিক্রমে সে রাজ্যে সদুর্গ বাণিজ্যালয় স্থাপন করেন, এবং মসজিদ ভূমিসাৎ করিয়া তথায় গির্জ্জা নির্ম্মাণ করেন। ইহার পর তাঁহারা ক্যানানোরে বাণিজ্যালয়, দুর্গ ও গির্জ্জা প্রতিষ্ঠিত করেন। পর্ত্তুগীজ বণিকগণ ইয়োরোপে আদা ও গোলমরিচ রপ্তানী করিতে থাকেন; এবং অন্য কেহ এই ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলে, তাহাকে বাধা দিতে আরম্ভ করেন।

সমিরা এই সকল সংবাদ অবগত হইয়া কোচিনের অধিপতিকে আক্রমণ করেন, এবং যুদ্ধক্ষেত্রে তিন জন সামন্তরাজকে হত ও তাঁহাদের রাজ্য অধিকৃত করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হন। কিন্তু অল্পকালমধ্যেই নিহত সামন্ত রাজন্যগণের উত্তরাধিকারিবৃন্দ উত্থিত হইয়া আপন আপন রাজ্য পুনরধিকার করেন, এবং কোচিনের অধিপতি পূর্ব্ববৎ পর্ত্তুগীজদের সহায়তা করিতে থাকেন। এই সকল ঘটনায় সমিরা ক্রোধে একেবারে জ্বলিয়া উঠিলেন, এবং বিপুল সৈন্য সহ কোচিন দেশ আক্রমণ করিলেন। তিনি তথায় উপনীত হইবার পূর্ব্বেই পর্ত্তুগীজ বণিকেরা অন্য স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাতে সমিরা ভগ্নমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আইসেন, এবং দক্ষিণাপথ, গুজরাট ও মিশরের সুলতানগণের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া নিম্নলিখিত লিপি প্রেরণ করেন।—'আমার নিজের দেশের জন্য কোনও ভয় নাই, কিন্তু মোসলমান প্রজাপুঞ্জের জন্য শঙ্কিত হইয়াছি। আমি নিজে হিন্দু হইলেও, মোসলমান প্রজাদিগকেও হিন্দু প্রজার ন্যায় রক্ষা করা কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া বোধ করি। কিন্তু পর্ত্তুগীজ নরপতি আমার অপেক্ষা বলশালী; আমি আততায়ী পর্ত্তুগীজদিগকে বিনষ্ট করিয়া দেখি যে, পর বৎসর তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে! এ জন্য আমি মোসলমান নরপতিদের সহায়তা প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইয়াছি। অতএব আমার বিনীত অনুরোধ এই যে, আপনার ধর্ম্মের সম্মানরক্ষার্থ প্রণোদিত হইয়া ইয়োরোপীয়দিগকে আক্রমণ জন্য বিজয়ী

সৈন্যে পরিপূর্ণ রণতরী সকল প্রেরণ করুন, এবং যে সকল গাজি ধর্ম্মসংরক্ষণ করিয়া স্বর্গগামী হইয়াছেন, তাঁহাদের শ্রেণীভুক্ত হউন।'

মিশের দেশের খলিফা এই পত্র প্রাপ্ত হইয়া নৌসেনাপতি আমীর হোসেনের নেতৃত্বে ভারত-উপকূলে তেরখানা যুদ্ধজাহাজ প্রেরণ করেন। গুজরাট ও দক্ষিণাপথের সুলতানদ্বয়ও যুদ্ধজাহাজ পাঠান। এই সম্মিলিত নৌ-সেনা পর্ত্তুগীজদিগকে বিপুলবিক্রমে আক্রমণ করে। কিন্তু পর্ত্তুগীজেরা যুদ্ধে জয়লাভ করেন; কয়েকখানা আরব্য জাহাজ তাঁহাদের হস্তে পতিত হয়; সম্মিলিত নৌবল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়।

সমিরা এই পরাজয়ের সংবাদ অবগত হইয়া বিমর্ষ হইয়া পড়েন, এবং পর্ত্তুগীজদিগকে দূরীভূত করিবার আশা পরিত্যাগ করেন। পর্ত্তুগীজেরা যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ক্রমশঃ শক্তিশালী হইয়া উঠিতে থাকেন। এই সময় সমিরা কার্য্যোপলক্ষে স্বরাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যত্র গমন করেন। এই সুযোগে পর্ত্তুগীজ সেনা তাঁহার রাজধানী কালিকট আক্রমণ করিয়া নগরবাসীদের ধনরত্ন লুণ্ঠন করে, এবং তথাকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জুমা মসজিদ দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয়। পরদিন নগরবাসীরা অস্ত্রধারণ করিয়া পাঁচ শত পর্ত্তুগীজকে হত্যা করে। এই সময় অনেক পর্ত্তুগীজ সৈন্য ভয়ব্যাকুলচিত্তে জাহাজ প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময় জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করে। কিন্তু এই সকল দুর্ঘটনা সত্ত্বেও পর্ত্তুগীজদের বল খর্ব্ব হয় নাই; তাঁহারা কৌশলে এক জন বিদ্রোহী সামন্তের নিকট হইতে রাজধানীর দেড় ক্রোশ দূরে একখণ্ড ভূমি গ্রহণপূর্ব্বক তথায় দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। অতঃপর তাঁহারা ক্রমে দক্ষিণাপথে প্রবেশ করিতে সমর্থ হন, এবং এক জন প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাকে বহুমূল্য উপঢৌকন দ্বারা বশীভূত করিয়া গোয়া অধিকারপূর্ব্বক তথায় আপনাদের প্রধান বাণিজ্যালয় ও দুর্গের প্রতিষ্ঠা করেন।

সমিরা পর্ত্তুগীজদিগকে খর্ব্ব করিতে অসমর্থ হইয়া ভগ্নচিত্তে কালগ্রাসে পতিত হন। অতঃপর তদীয় ভ্রাতা মালাবারের সিংহাসনে আরোহণ করেন। নূতন সমিরা পর্ত্তুগীজদের সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করেন। এই সন্ধি-অনুসারে পর্ত্তুগীজেরা কালিকটে বাণিজ্যালয় ও দুর্গ প্রতিষ্ঠিত করিবার সনন্দ প্রাপ্ত হন। তাঁহারা মোসলমানদিগকে প্রতিবৎসর চারি জাহাজ গোলমরিচ ও আদা রপ্তানী করিতে দিতে সম্মত হন। অবিলম্বে পর্ত্তুগীজেরা দুর্গ নির্ম্মাণ করেন, কিন্তু মোসলমানদিগকে পূর্ব্বোক্ত সর্ত্তমত বাণিজ্য করিতে দিতে অসম্মত হন। তাঁহারা এইরূপ বাধা দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, সুযোগ পাইলেই ঘোর নৃশংসতা-

সহকারে মোসলমান বণিকদিগকে উৎপীড়িত করিতেন। এই সময় ইহুদী বণিকগণ রাজশক্তির অন্তর্নিহিত দুর্ব্বলতা-দর্শনে সাহসী হইয়া উঠেন, এবং পর্ত্তুগীজদের অনুসরণ করিয়া বহুসংখ্যক মোসলমান বণিককে নিহত করেন।

সমিরা আপন অনুসৃত নীতির ভ্রম বুঝিতে পারিয়া অনুতপ্ত হন, এবং অচিরে সৈন্য সহ ইহুদীদের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। তিনি সৈন্যবলে স্বরাজ্যের সকল স্থান হইতে ইহুদীগকে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। তার পর পর্ত্তুগীজদের দুর্গ অধিকার করেন। সমিরা এই ভাবে পর্ত্তুগীজদিগকে পর্য্যুদস্ত করিয়া চারিখানি বাণিজ্য-পোত ইয়োরোপে প্রেরণ করেন।

পর্ত্তুগীজ বণিক্‌কুল মালাবার হইতে বহিষ্কৃত হইয়া গুজরাটে প্রবেশ করিয়া শক্তিসঞ্চয়ে উদ্যোগী হন। তাঁহারা তিন হাজার ছয় শত ইয়োরোপীয় সৈন্য ও দশ হাজার ভারতীয় সৈন্য লইয়া গুজরাটে প্রবেশ করেন। গুজ-রাটের সেনাপতি মুস্তাফা খাঁ বিপুলবিক্রমে তাঁহাদের গতিরোধ করেন। পর্ত্তুগীজগণ সে প্রবল আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার অব্যবহিত পরেই গুজরাট রাজ্যে তাঁহাদের প্রভাব-বিস্তারের সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। দিল্লীর বাদশাহ হুমায়ুন গুজরাট রাজ্য আক্রমণ ও অধিকার করেন। তত্রত্য অধিপতি বাহাদুর শাহ রাজ্য ছাড়িয়া পলায়ন করেন। এই রাজবিপ্লব পর্ত্তুগীজদের অনুকূল হইয়াছিল। তাঁহারা সমুদ্রতীরের বন্দরসমূহ অধিকার করিয়া শক্তিশালী হইয়া উঠেন, এবং আপনা-দের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্যে বাহাদুর শাহের পক্ষ অবলম্বন করেন।

পর্ত্তুগীজগণ পূর্ব্বেই দক্ষিণাপথে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন; এক্ষণে গুজরাটে প্রভাব-বিস্তার করিয়া অতিশয় শক্তিশালী হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের কৌশলে ও উৎপীড়নে মোসলমান বণিকগণ সঙ্কুচিত হইয়া, পড়েন। তাঁহাদের বৈদেশিক বাণিজ্য বন্ধ হইবার উপক্রম হয়। এ কারণ গোলকুণ্ডার অধিপতি ও দক্ষিণাপথের মোগল সুবাদারের সহিত সম্মিলিত হইয়া, সমিরা পর্ত্তুগীজদিগকে আক্রমণ করেন। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহাদের পরাভব ঘটে।

অতঃপর পর্ত্তুগীজগণ অপ্রতিহতপ্রভাবে বাণিজ্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং আরব ও পারস্যের উপকূলের বাণিজ্য একচেটিয়া করিয়া লইলেন। তাঁহারা মালাবার-উপকূলে বাণিজ্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াই বৈদেশিক বাণিজ্য একচেটিয়া করিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন। সেই জন্য তাঁহারা এক দিকে ভারত-মহাসাগরস্থিত দ্বীপপুঞ্জে (সুমাত্রা, মালাক্কা, সিংহল প্রভৃতি) প্রবেশলাভ করিয়া দুর্গ

নির্ম্মাণ করেন; অপর দিকে মালবার, গুজরাট, দক্ষিণাপথ প্রভৃতি দেশের অধিপতিদের সহিত সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হন। তাঁহারা উৎকট সাধনাবলে সমস্ত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আপনাদের অভীষ্ট সিদ্ধ করেন। তাঁহাদের অনুমতি ব্যতীত কেহ ভারত-মহাসাগরে বাণিজ্য-পোত প্রেরণ করিলেই, তাঁহারা উহা ধৃত করিতেন। এই ভাবে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে তাঁহাদের নিকট হইতে অনুমতি-গ্রহণের প্রথা বদ্ধমূল হয়। এই প্রথা বদ্ধমূল হইলে, তাঁহারা অন্যকে অনুমতি-প্রদানের নিয়ম রহিত করিয়া, ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য একচেটিয়া করিয়া তুলেন। এই ক্ষমতা অপ্রতিহত রাখিবার অভিপ্রায়ে প্রধান প্রধান বাণিজ্যপথের মুখে পর্ত্তুগীজদের দুর্গ নির্ম্মিত হয়। তাঁহারা আপনাদের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সর্ব্বদা সতর্ক ও সাবধান থাকিতেন। একবার জালাল-উদ্দীন আকবর শাহের কয়েকখানি অর্ণবপোত তাঁহাদের বিনা অনুমতিতে মক্কাতে প্রেরিত হইয়াছিল; এই জন্য তাঁহারা প্রত্যাগমনকালে জেড্ডা বন্দরের সন্নিধানে সেই সকল অর্ণবপোত লুণ্ঠন করেন। তাঁহাদের এইরূপ অসমসাহসিকতা দেখিয়া ভারতবাসীরা পর্ত্তুগীজদের প্রভাবে অভিভূত হইবেন, ইহা বিচিত্র নহে।

পর্ত্তুগীজগণ ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে প্রথমে ভারতবর্ষে আগমন করেন। সেই সময়েই মোসলমান বণিকদের সহিত তাঁহাদের সংঘর্ষের সূচনা হয়। দেশাধিপতিবৃন্দ মোসলমানদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাঁহাদিগকে পর্য্যুদস্ত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁহারা ক্রমশঃ প্রতাপশালী হইয়া উঠেন। প্রায় ১০০ বৎসর তাঁহাদের ক্ষমতা ও প্রতাপ অপ্রতিহত ছিল। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষে ওলন্দাজগণ ভারতবর্ষে বাণিজ্য-উপলক্ষে উপস্থিত হন। তাঁহাদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতার সূত্রপাতেই পর্ত্তুগীজ-শক্তি ভাঙ্গিয়া পড়ে। দুই কারণে পর্ত্তুগীজগণ ওলান্দাজদের সংঘর্ষে আপনাদের প্রাধান্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে স্পেন ও পর্ত্তুগাল সম্মিলিত ও এক রাজ্যে পরিণত হয়। ইহার ফলে এসিয়ার অন্তর্গত পর্ত্তুগীজ অধিকারের শাসন সংরক্ষণ সম্বন্ধে ঔদাসীন্য জন্মে। সার এডওয়ার্ড কোলব্রুক লিখিয়াছেন,— পর্ত্তুগিজ কর্ত্তৃপক্ষের দুর্নীতি ও উৎকোচ-লোলুপতাই এসিয়ায় পর্ত্তুগীজ-শক্তির পতনের মূল কারণ। এসিয়াবাসীমাত্রই পর্ত্তুগীজদের অত্যাচারে অতিশয় উৎপীড়িত ও লাঞ্ছিত হইত। ফলতঃ এসিয়ার সকল জাতিই পর্ত্তুগীজ-শক্তির ধ্বংসকামী ছিল। এই সকল কারণে পর্ত্তুগীজ-শক্তি শিথিলমূল বৃক্ষের ন্যায়

প্রথম সংঘর্ষেই উন্মূলিত হয়। পর্ত্তুগীজের পূর্ব্ব প্রতাপ ও সম্ভ্রম বহুকাল বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষে গোয়া, দিও, দামন আজ পর্য্যন্তও তাহার অতীত গৌরবের চিহ্ন বহন করিতেছে। এই সকল স্থান এখনও পর্ত্তুগীজের অধিকারভুক্ত।

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

সমালোচনা-সোপান।

[স্বর্গীয় ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় রচিত।]

প্রথম পরিচ্ছেদ।—সমালোচনার সাধারণ লক্ষণ।

সমালোচনা কাহাকে বলে?—চিন্তা-শক্তি ও জ্ঞান;—সমালোচনা হইতে জ্ঞান উদ্ভূত;—বস্তু ও অবস্তু;—পদার্থ ও তাহার স্বরূপ;—সাদৃশ্য, পার্থক্য ও সম্বন্ধ;—তুলনায় জ্ঞানোদয়;—উদাহরণচতুষ্টয়,—বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, রাজনৈতিক ও দার্শনিক,—তাহাদের বিশ্লেষণ; সাদৃশ্য, পার্থক্য ও সম্বন্ধ,—তিনের বিস্তৃত ব্যাখ্যা;—বৈজ্ঞানিক-শ্রেণী-নির্ব্বাচন,—বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ;—কিরূপে তাহা করিতে হয়;—সার-সংগ্রহ,—সম্বন্ধপরম্পরা;—জ্ঞানের কার্য্য-কারণ-সংজ্ঞা-নির্ণয়,—জ্ঞান কাহাকে বলে? জ্ঞান ও বিজ্ঞানে প্রভেদ কি? সমালোচনাই জ্ঞানোদয়ের অবলম্বন ও উপায়।

কোনও দ্রব্যের স্বরূপ-নির্ণয় করিতে হইলে, তাহার সমালোচনা করার প্রয়োজন। সভ্যজগতে দ্রব্যমাত্রেরই যথাসম্ভব স্বরূপ নির্ণীত হওয়া আবশ্যক। সুতরাং সমালোচনা অবশ্যম্ভাবিনী।

মনুষ্যের চিন্তা-শক্তি তাহার জ্ঞানমাত্রের মৌলিক কারণ। সমালোচনা চিন্তা-শক্তি-পরিচালনার নামান্তরমাত্র। জ্ঞানমাত্রেরই মূলে সমালোচনা স্বতঃ-নিহিত। সমালোচনা-রূপ সোপান দ্বারাই মনুষ্য জ্ঞান-রূপ উচ্চ শৈলে আরোহণ করিতে সমর্থ হয়। সমালোচনা ব্যতিরেকে জ্ঞান অসম্ভব। *

সমালোচনা ও জ্ঞান।

বস্তু হইতে অবস্তুর জ্ঞান জন্মে। বস্তু কি জানিতে হইলে, আরম্ভ কি—ইহা জানাও একরূপ অপরিহার্য্য; অর্থাৎ, উভয়ের স্বরূপ ও পারস্পরিক সম্বন্ধ কি—ইহা স্থির করার প্রয়োজন। এই স্বরূপ ও সম্বন্ধ-স্থিরী-করণ-প্রক্রিয়াকেই সাধারণতঃ সমালোচনা বলি। সমালোচনা-প্রক্রিয়া প্রধানতঃ কিরূপে সম্পাদিত হয়, এবং তাহার মৌলিক প্রকৃতি কি, প্রথমতঃ তাহারই আলোচনা করিব।

বস্তু ও অবস্তু।

---

* জ্ঞান 'প্রত্যক্ষ' ও 'অনুমিত' প্রভৃতি যে 'প্রমাণ'-লব্ধই হউক, জ্ঞানমাত্রেরই মূলে, মুখ্য

পদার্থতত্ত্ববিৎ স্থির করিলেন যে, পদার্থ (matter) * আর কিছুই নয়,—কতকগুলি স্বরূপ বা ধর্ম্মের (properties) সমবায়মাত্র। এই স্বরূপ বা ধর্ম্ম দ্বিবিধ ;—স্থির ও অস্থির। স্থিরধর্ম্ম,—যথা,—ভার, বিস্তার, স্থানরোধকত্ব, বিভাজ্যতা, স্থিতিস্থাপকত্ব, ইত্যাদি। অস্থির ধর্ম্ম,—যথা ;—আকুঞ্চনীয়তা, প্রসারণীয়তা, ঘনতা, তারল্য, শীতলতা, উষ্ণতা, কাঠিন্য, কোমলতা ইত্যাদি। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, পদার্থের এই সকল স্বরূপ বা ধর্ম্ম মূলতঃ কিরূপে স্থিরীকৃত হইল? ভারত্ব বা স্থান-রোধকত্ব, বিভাজ্যতা বা স্থিতিস্থাপকত্ব, তরলতা বা কাঠিন্য,—এবংবিধ এক একটী স্বরূপের অস্তিত্ব আছে,—বৈজ্ঞানিক কিরূপে এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইলেন? উত্তর,—পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার দ্বারা। কিন্তু এই পর্য্যবেক্ষণ বা পরীক্ষার প্রকৃতি ও প্রকরণ কিরূপ? সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিলে অনুভূত হইবে যে, কোনও একটী স্বরূপের ভাবের উপলব্ধি বা নির্ণয় করার পূর্ব্বে, বা অন্ততঃ তাহা করার সঙ্গে সঙ্গেই, তাহার বিপরীত ভাবের কল্পনা করা অপরিহার্য্য। ভারত্ব কি জানিতে হইলে, যুগপৎ ভার-শূন্যত্বের কল্পনা করিয়া, উভয়ের পার্থক্য অনুভব করি ; নতুবা ভারত্বের ভাব কিরূপে বুঝিব? কোমলতার সহিত কঠিনতার, বা কঠিনতার সহিত কোমলতার পার্থক্যানুভূতিই কোমলতা ও কঠিনতার ভাব হৃদয়ঙ্গম ও স্থির করিবার একমাত্র উপায়। এইরূপে, পদার্থের স্বরূপ বা ধর্ম্মের নিরূপণ করিতে তদ্বিপরীত স্বরূপের সহিত তাহার তুলনা করিয়া, সম্বন্ধ স্থির করার প্রয়োজন হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, স্বরূপনির্ণয়ের সঙ্গে সঙ্গেই সম্বন্ধ-নির্ণয়-প্রক্রিয়ার আরম্ভ, অথবা স্বরূপ-নিরূপণ ও সম্বন্ধ-নির্ণয়, উভয়ই পরস্পরের অনুগামী। একটীর সহিত অপর কার্য্যটীর স্বভাবতঃই সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধ বা বিমিশ্র উভয়বিধ কার্য্য-প্রক্রিয়াই মূলতঃ সমালোচনা। কথাটা পরিষ্কার হইল না। গুটিকতক উদাহরণ দেওয়া আবশ্যক।

সমালোচনার প্রক্রিয়া; পদার্থ ও তাহার স্বরূপ।

১। বৈজ্ঞানিক গতির লক্ষণ স্থির করিতেছেন ;—'এক স্থান হইতে অপর স্থানে যাওয়ার নাম গতি (motion)। মনে কর, আমি যেন কোনও গৃহে

বা গৌণ-কল্পে, সমালোচনা অবস্থিত। জ্যামিতির 'স্বতঃসিদ্ধ' ও 'স্বীকার্য্য'গুলিও, মূলতঃ বিনা সমালোচনায় সিদ্ধ হয় নাই।

* বলা বাহুল্য যে, এ স্থলে পদার্থের সাধারণ ও স্থূল অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। পদার্থের সূক্ষ্ম-তত্ত্ব-ঘটিত 'ন্যায়দর্শনে'র তর্কে প্রবৃত্ত হই নাই।

১ম উদাহরণ—বিজ্ঞানালোচনা—গতি ও স্থিতি।

বসিয়া আছি, তখন তোমরা আমাকে স্থির বা গতি-বিহীন বলিতে পার; কিন্তু তাহার পর যখন আমি ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে আরম্ভ করি, তখন আমার ক্রিয়ার নাম গতি। আর এক স্থানে স্থির হইয়া থাকার নাম স্থিতি। এই গতি ও স্থিতি নিরপেক্ষা ও সাপেক্ষা বা প্রত্যক্ষা উভয়ই হইতে পারে। গতি বা স্থিতির নিরপেক্ষা আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। সচরাচর সাপেক্ষা গতি বা সাপেক্ষা স্থিতিই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি; সেই জন্য ইহাদিগকে প্রত্যক্ষাও বলে। যখন কোনও একটী বস্তু চলিতেছে, আর একটী স্থির রহিয়াছে দেখিতেছি, তখন তুলনায় বলি—এ চল, ও স্থির; সুতরাং একের গতি ও অপরের স্থিতি পরস্পরের সাপেক্ষ।' *

২। পরন্তু সাহিত্য-সমালোচক গীতি-কাব্যের স্বরূপ-ব্যাখ্যা করিতেছেন;—'যখন হৃদয় কোন একটা বিশিষ্টভাবে আচ্ছন্ন হয়, স্নেহ কি শোক কি ভয় কি

গীতিকাব্য নাটক ও মহাকাব্য।

যাহাই হউক, তাহার সমুদয়াংশ কখনও ব্যক্ত হয় না। কতকটা ব্যক্ত হয়, কতকটা ব্যক্ত হয় না। যাহা ব্যক্ত হয়, তাহা ক্রিয়ার বা কথার দ্বারা। সেই ক্রিয়া এবং কথা নাটকের সামগ্রী। যেটুকু অব্যক্ত থাকে, সেটুকু গীতিকাব্য-প্রণেতার সামগ্রী। যেটুকু সচরাচর অদৃষ্ট, অদর্শনীয়, এবং অন্যের অননুমেয়, অথচ ভাবাপন্ন ব্যক্তির রুদ্ধ-হৃদয়-মধ্যে উচ্ছ্বসিত, তাহা তাঁহাকে ব্যক্ত করিতে হইবে। মহাকাব্যের বিশিষ্ট গুণ এই যে, কবির উভয়বিধ অধিকার থাকে, ব্যক্ত ও অব্যক্ত উভয় ভাবই তাঁহার আয়ত্ত। মহাকাব্য, নাটক ও গীতি-কাব্যে এই একটী প্রধান প্রভেদ বলিয়া বোধ হয়। * * * * সত্য বটে যে, গীতি-কাব্য-লেখককেও বাক্যের দ্বারাই রসোদ্ভাবন করিতে হইবে; নাটককারেরও সেই বাক্য সহায়। কিন্তু যে বাক্য বক্তব্য নাটককার কেবল তাহাই বলাইতে পারেন। যাহা অব্যক্তব্য তাহাতে গীতি কাব্যের অধিকার।' †

৩। পক্ষান্তরে, রাজনীতিবেত্তা উৎকৃষ্ট শাসন-প্রণালীর লক্ষণ-স্থিরীকরণপ্রসঙ্গে 'উন্নতি কি' বুঝাইতেছেন;—"স্থায়িত্ব ও তদ্ভিন্ন আরও কিছু উন্নতির অন্তর্ভূত।

* পদার্থ-বিজ্ঞান। প্রথম ভাগ। শ্রীকানাইলাল দে রায় বাহাদুর প্রণীত। ১৮৭৪। এই উদ্ধৃত অংশে ভাষার সামান্য শিথিলতা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে।

† বিবিধ সমালোচন। শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। ১৮৭৬।

৩য় উদাহরণ রাজনৈতিক সমালোচনা ; উন্নতি, স্থায়িত্ব ও শৃঙ্খলা।

* * * * কোন বিষয়ের উন্নতির সহিত তদ্বিষয়ের স্থায়িত্ব স্বভাবতঃ সংশ্লিষ্ট। কোন বিষয়বিশেষের উন্নতির জন্য স্থায়িত্ব ধ্বংসীকৃত হইলে, তৎসহিত অন্যান্য বিষয়ের উন্নতিরও ধ্বংস সংসাধিত হয়। এই ধ্বংসজনিত ক্ষতির তুলনায় প্রাগুক্ত উন্নতি যদি মূল্যহীন হয়, তাহা হইলে, এরূপ বুঝিতে হইবে যে, কেবলমাত্র স্থায়িত্ব উপেক্ষিত হয় নাই ; তাহার সঙ্গে সাধারণতঃ উন্নতির সম্বন্ধেও ভ্রম উপস্থিত হইয়াছিল। * * * *

'অপিচ, শৃঙ্খলা উন্নতির অন্তর্গত। উন্নতি শৃঙ্খলার অন্তর্গত নহে। শৃঙ্খলা (order) যাহা অতি-অল্প-পরিমাণে সম্পাদন করে, উন্নতির দ্বারা তাহা অধিক-পরিমাণে সম্পাদিত হয়। * * * উন্নতিসাধনার্থে শৃঙ্খলা অন্যতম উপায়মাত্র ; কেন না সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-বৃদ্ধি করিতে হইলে, যে পরিমাণে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বর্ত্তমান আছে, তাহার রক্ষা করা একান্ত কর্ত্তব্য। অতএব শৃঙ্খলা উন্নতির উপায়মাত্র। উন্নতির অনুরূপ উদ্দিষ্ট বিষয় নহে।' *

৪। অতঃপর দার্শনিক তুলনা দ্বারা দর্শন ও বিজ্ঞানের প্রভেদ দেখাইতেছেন ;—'দর্শন বিজ্ঞানের অন্তর্গত নহে, এবং বিজ্ঞানও দর্শনের শাখা নহে। দর্শন ও বিজ্ঞান উভয়ের মধ্যে নিগূঢ় ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও তাহারা স্বতন্ত্র। নীতি-বিজ্ঞান

৪র্থ উদাহরণ ;—দার্শনিক সমালোচনায় দর্শন ও বিজ্ঞান।

মনুষ্যের নৈতিক বা ধর্ম্মপ্রবৃত্তিগত ভাবসমূহের 'দৈর্ঘ্য প্রস্থে' পরিমাণ করে ; কিন্তু নীতি-দর্শন উক্ত ভাবনিচয়ের উচ্চতম ও গভীরতমস্থল-নিহিত আভ্যন্তরিক সত্তার পর্য্যালোচনায় নিযুক্ত। প্রকৃতিগত ভাবপরম্পরার একত্রীভূত অস্তিত্ব এবং পারস্পরিক আবির্ভাব এবং এতদুভয় হইতে যে সকল সাধারণ নিয়ম নিষ্কাশিত হয়, তাহারই আলোচনা করা বিজ্ঞানের অধিকার। বিজ্ঞান ভাবপরম্পরার সংযোজন-শৃঙ্খল ও তাহাদিগের অন্তস্তলনিহিত সার-সত্তার আলোচনায় প্রবৃত্ত হয় না ; কিন্তু দর্শন এতদুভয়েরই অনুসরণ দ্বারা সমগ্র নৈতিক প্রকৃতির চরম উদ্দেশ্যনির্ণয়ের চেষ্টা করে। বিজ্ঞান এরূপ চেষ্টাকে বৃথা ও নিষ্ফল বলা সত্ত্বেও দর্শন উহা হইতে বিরত হয় না।' †

---

* Considerations on Representative Government by J. S. mill.

† Ethical philoscphy and Evolution ; by Proffessor W. Knight

আমরা উপরে, চারিখানি ভিন্ন ভিন্ন পুস্তক হইতে চারিটী ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের সমালোচনা যথাক্রমে উদ্ধৃত ও অনুবাদিত করিয়া দিয়াছি। প্রথমতঃ, স্থিতির সহিত গতির তুলনা দ্বারা বৈজ্ঞানিক গতির সাধারণ লক্ষণ ও ধর্ম্ম বুঝাইলেন। স্থিতির 'স্থিতিত্ব' হেতুই গতির 'গতিত্ব'; অতএব গতি কি বুঝিতে হইলে, স্থিতির প্রকৃতির অনুধাবনও আবশ্যক; সুতরাং উভয়ের সম্বন্ধ পর্য্যালোচনা করা অপরিহার্য্য। ব্যাখ্যাকার, 'স্থিতি'র স্বরূপনির্ণয় দ্বারা গতির অভাবত্ব দেখাইয়া, 'গতি' কি, তাহার ভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

সমালোচনার সারসংগ্রহ ও বিশ্লেষণ।

দ্বিতীয় সমালোচনা গীতি-কাব্যের। সমালোচক গীতি-কাব্য কি স্থির করিতে, নাটক ও মহাকাব্যের আংশিক স্বরূপনির্ণয় করিলেন। যে হেতু নাটক ও মহাকাব্য কি পদার্থ, ইহা কিয়ৎপরিমাণে না বুঝিলে, গীতি কাব্যের প্রকৃতি কি, উৎকৃষ্টরূপে অনুভূত হয় না। গীতি-কাব্য, মহাকাব্য ও নাটক, তিনই কাব্য। ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি-অনুসারে, ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। কিন্তু তিনেরই পারস্পরিক অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে; অতএব একটীর লক্ষণনিরূপণার্থ অবশিষ্ট দুইটীর সহিত তাহার সম্বন্ধ কি, উদ্‌ঘাটন করা আবশ্যক। নহিলে বক্তব্য বিষয়ের ব্যাখ্যা বা সমালোচনা করা অসম্ভব।

তৃতীয় উদাহরণ ;—উন্নতি কাহাকে বলে ? শুভ বা মঙ্গলের দিকে অগ্রসর হওয়ার নাম উন্নতি ও তাহা হইতে বিচ্যুতির নাম অবনতি। উন্নতিসাধনার্থ অবনতি-নিবারণ করা প্রথমেই আবশ্যক। অগ্রসর হওয়ার পূর্ব্বে যদ্দ্বারা পশ্চাৎ-পদ হওয়ার কারণ বিদূরিত হয়, এমন ব্যবস্থা করার প্রয়োজন। নতুবা প্রকৃত-প্রস্তাবে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। অগ্রসরণই উন্নতি, পশ্চাৎপতনই অবনতি। অতএব, অবনতির কারণ বিদ্যমানে উন্নতি অসম্ভব। অস্থায়িত্ব ও বিশৃঙ্খলা অবনতির কারণ; সুতরাং উন্নতির অন্তরায়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, স্থায়িত্ব ও শৃঙ্খলা ভিন্ন, অস্থায়িত্ব ও বিশৃঙ্খলা (তাহার অর্থ অবনতি) নিবারিত হওয়া অসম্ভব। সুতরাং উন্নতির সহিত স্থায়িত্ব ও শৃঙ্খলার অপরিহার্য্য ও অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা বর্ত্তমান। অতএব, উন্নতি কি ব্যাখ্যা করিতে, স্থায়িত্ব ও শৃঙ্খলা, এবং উহাদের বিপরীত স্বরূপ অস্থায়িত্ব ও বিশৃঙ্খলা বা অবনতির সহিত উন্নতির যে সম্বন্ধ, তাহা আলোচিত করা আবশ্যক হইয়াছে। নতুবা প্রকৃত তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করা, অর্থাৎ উন্নতিবিষয়ক জ্ঞানে উপনীত হওয়া যাইত না। উন্নতির বিপরীত

ভাব অবনতি কি, সংক্ষেপে বুঝাইয়া, তবে উন্নতি পদার্থের প্রকৃতিনির্ণয় করা ও তদ্বিষয়ক ভাব হৃদয়ে প্রতিভাত করা সম্ভব হইয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, স্বরূপনির্ণয় ও সম্বন্ধ-নিরূপণের প্রক্রিয়া পরস্পরে; সম্বন্ধ—একটী অপরটীর অনুগামী; অথবা একের সম্পাদনার্থ অপরের সাহায্য প্রয়োজন। উপরি-উক্ত প্রথম তিনটী উদাহরণে, স্বরূপনির্ণয়ার্থ সম্বন্ধ আলোচিত হইয়াছে; আর, চতুর্থ উদাহরণে, সম্বন্ধ-স্থিরীকরণ-উদ্দেশে, স্বরূপের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ফলতঃ উভয় দিকেই প্রক্রিয়া প্রায় একই প্রকার। স্বরূপনির্ণয়ার্থ যেমন সম্বন্ধের আলোচনা করার প্রয়োজন, সম্বন্ধনির্ণয় হেতু তেমনই স্বরূপের তত্ত্বানুসন্ধান আবশ্যক। স্বভাবতই একটী কর্ত্তৃক অপরটী আকৃষ্ট হয়। পুনশ্চ, পদার্থের কার্য্যের বা স্বরূপের ভাব সত্তা অনুভব করিতে, তদ্বিপরীত সত্তার আলোচনা বা কল্পনা করা কার্য্যতঃই প্রয়োজন হয়।

পারস্পরিক সম্বন্ধ হইতেই যাবতীয় পদার্থের বৈজ্ঞানিক শ্রেণীবিভাগ হইতেছে। অতএব সেই 'সম্বন্ধে'র পর্য্যালোচনা দ্বারা সমালোচনার মৌলিক প্রকৃতির আরও কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা করিতে, এবং তদ্দ্বারা সমালোচনা-প্রক্রিয়া সাধারণতঃ যেরূপে সম্পাদিত হয়, তাহাও আরও কিয়ৎপরিমাণে দেখাইতে চেষ্টা করা যাইতেছে।

পার্থক্য ও সাদৃশ্য সম্বন্ধেরই অন্তর্গত, এবং বৈজ্ঞানিক শ্রেণী-বিভাগের এবং জাতিনির্ব্বাচনের মূল ভিত্তি। অপিচ, পার্থক্য ও সাদৃশ্যানুভূতি হইতেই মনুষ্য-জ্ঞানের প্রাথমিক বিকাশ। অতএব পদার্থগত অন্যান্য সম্বন্ধের উল্লেখ করিবার পূর্ব্বে পার্থক্য ও সাদৃশ্যের কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক হইতেছে।

পার্থক্য।

সংসারে যত প্রকার দ্রব্য আছে, অর্থাৎ যতপ্রকার দ্রব্য এ পর্য্যন্ত মনুষ্যের জ্ঞানাধীনে আসিয়াছে, তাহাদিগের সকলেরই এক একটী স্বতন্ত্র নাম আছে। দ্রব্যমাত্রই এক একটী স্বতন্ত্র নামে অভিহিত হয় কেন? হওয়ার কারণ কি? কারণ, তাহাদিগের পারস্পরিক পার্থক্য বা বিভিন্নতা। আলোক ও অন্ধকার বিভিন্ন পদার্থ, এই কারণেই এতদুভয়ের স্বতন্ত্র নাম। আলোককে আলোক বলা যায়; কারণ, উহা অন্ধকারের প্রতিদ্বন্দ্বী। যদি আলোক ও অন্ধকার একই পদার্থ হইত, উহাদিগকে স্বতন্ত্র নাম দিবার কিছুমাত্র আবশ্যকতা

পদার্থাদির পার্থক্য,—নামকরণের মূল।

হইত না। আলোক অন্ধকার হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন এবং বিপরীত; এই কারণেই অন্ধকার ও আলোকের স্বতন্ত্র বস্তুত্ব। রাম শ্যাম হইতে বিভিন্ন, এই কারণেই শ্যামের ন্যায় রামেরও স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব। ক্ষুধা তৃষ্ণা হইতে বিভিন্ন, এই কারণেই ক্ষুধা তৃষ্ণা দুইটী স্বতন্ত্র নাম। এইরূপে, দেখা যাইতেছে যে, পার্থক্য বা বিভিন্নতা দ্বারাই পদার্থমাত্রের স্বতন্ত্র বস্তুত্ব বা ব্যক্তিত্ব স্থিরীকৃত হয়। ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি ও প্রয়োজন অনুসারে, ভিন্ন ভিন্ন পদার্থকে নাম প্রদত্ত হইয়াছে ও হইয়া থাকে।

অনেক বস্তু আছে, যাহাদিগের পরস্পরের মধ্যে বিভিন্নতা সুস্পষ্ট ও প্রবল; আবার অনেক বস্তু আছে, যাহাদিগের বিভিন্নতা অতি অল্প ও ক্ষীণ। অল্প বা অধিক পরিমাণে হউক, বস্তুমাত্রেরই কোনও না কোনরূপ পারস্পরিক বিভিন্নতা আছে; তজ্জন্যই তাহাদিগের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও বস্তুত্ব।

বস্তুত্ব।

ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় ও স্বতন্ত্র স্বরূপ-বিশিষ্ট বস্তু সম্বন্ধে এই কথা; অর্থাৎ, তাহাদের আকৃতি, অঙ্গ-গঠনের বৈচিত্র্য ও বর্ণাদি বাহ্যাবয়ব বা বহির্দৃশ্যাদিঘটিত পার্থক্য, তথা তাহাদের আভ্যন্তরিক গুণ, লক্ষণ, স্বভাব, বা স্বরূপাদিঘটিত পার্থক্য, অন্যান্য জাতীয় পদার্থ হইতে স্ব স্ব জাতীয় পদার্থের স্বাতন্ত্র্য বা স্বজাতিত্ব সূচিত করিয়া স্বতন্ত্র-নাম-করণোপযোগী করে। পক্ষান্তরে, একই জাতীয় বহু পদার্থের মধ্যে প্রত্যেকের অবয়ব ও স্বভাবগত স্বরূপাদি একইরূপ সাধারণ-লক্ষণ সমন্বিত ও স্বজাতীয়-সম-ভাবাপন্ন হইলেও সংস্থানাদির পার্থক্যানুসারে তাহাদের স্বাতন্ত্র্য সূচিত হয়। এই স্বাতন্ত্র্যজনিত পৃথক্ নাম-করণ প্রয়োজন হয় না; পার্থক্যের ব্যঞ্জক কোনও বিশেষণ দ্বারা পৃথককৃত পদার্থকে বিশেষিত ও দ্রব্যমাত্রের পারস্পরিক বিভিন্নতার আধিক্য ও অল্পতানুসারে, তাহাদিগকে তুলনা-করণোপযোগী পর্য্যবেক্ষণের তারতম্য হয়। স্থূলদৃষ্টিতে, সূর্য্য কিংবা

পার্থক্যের অল্পাধিক্য; সূক্ষ্মতর সমালোচনার আবশ্যকতা।

চন্দ্রের সহিত, নক্ষত্রগুলির বাহ্যতঃ যে বিভিন্নতা, তাহা উপলব্ধি করা অপেক্ষাকৃত সহজ ও অল্পায়াস-সাধ্য; কিন্তু নক্ষত্রগুলির পারস্পরিক পার্থক্যানুভব করিতে হইলে, কিঞ্চিদধিক পর্য্যবেক্ষণ ও চিন্তা-শক্তি পরিচালন করা আবশ্যক হয়। একটা হস্তীর সহিত একটী পিপীলিকার সাধারণতঃ যে যে অংশে বিভিন্নতা, তাহার নির্ণয় করা যেরূপ সহজ; দুইটী পিপী-

লিকার আকৃতিগত পারস্পরিক পার্থক্য স্থির করা অবশ্য তাদৃশ সহজ নহে। তিক্তে মধুরে যে আস্বাদগত পার্থক্য, তাহা অতি-অল্প আয়াসেই স্থিরীকৃত হইতে পারে; কিন্তু দুইটী মধুরের কোনটী কতটুকু মধুর, ইহা প্রভেদ করিতে অপেক্ষাকৃত অধিক বিচক্ষণতা আবশ্যক হয়। অতএব, দেখা যাইতেছে যে, যে সকল স্থলে পার্থক্যের অল্পতা, সেই সকল স্থলে উক্ত পার্থক্য-নিরূপণ করিতে, পর্য্যবেক্ষণের সূক্ষ্মতা ও চিন্তাশক্তির নিপুণতার প্রয়োজন হয়।

বস্তুসমূহের নিকট সমাবেশ দ্বারা, তাহাদিগের পারস্পরিক পার্থক্যের অধিকতর স্পষ্টরূপে অনুভব করা যায়। দুইটী গোলাপ পুষ্প পার্শ্বে পার্শ্বে রাখিয়া, একটু সূক্ষ্মরূপে তুলনা কর, দেখিবে, উভয়ের আকার, বর্ণ ও সৌরভগত একতাধিক্য সত্ত্বেও, গোলাপ দুইটীর মধ্যে কোনও না কোনও অংশে কিছু-না-কিছু বিভিন্নতা আছে।

উভয়ে দুইটী স্বতন্ত্র স্থানে অবস্থিত থাকাতে পৃথক্ হইয়াছে। এই অবস্থিতি-জনিত পার্থক্যও পার্থক্য বটে, এবং সে পার্থক্যও কোনও না কোনও নামে পরিচিহ্নিত করা আবশ্যক হইয়া থাকে।

সম্মুখে ঐ স্ফটিকাধার ভেদ করিয়া, বর্ত্তিকালোক সমগ্র গৃহে প্রতিফলিত হইয়াছে। আলোকটী সম্যক্ উজ্জ্বল ও দীপ্তিমান্। কিন্তু গৃহমধ্যে যদি এক্ষণে একটী বাষ্পীয়ালোক আনীত হয়, বর্ত্তিকালোকের ঔজ্জ্বল্য ও দীপ্তির হ্রাস হইবে; তাহাকে আর আলোকের পূর্ণ আদর্শ বলিয়া বোধ হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। পক্ষান্তরে, বাষ্পীয়ালোকের সন্নিকটে একটী তাড়িতালোক সংস্থাপিত হউক, বর্ত্তিকালোকের ন্যায়, বাষ্পীয়ালোকও দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে, এবং তাড়িতালোকের ঔজ্জ্বল্যই তখন প্রবল ও পূর্ণ বলিয়া বোধ হইবে। এক্ষণে বর্ত্তিকালোক, বাষ্পীয়ালোক ও তাড়িতালোক, এই তিনের মধ্যে যে পারস্পরিক বিভিন্নতা, তাহা তাহাদিগের একত্র সমাবেশ দ্বারাই অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্টরূপে বুঝিতে পারি। প্রত্যুত, আলোকত্রয়ের একত্র সংস্থাপন, কখনও প্রত্যক্ষ না করিলে, তাহাদিগের পারস্পরিক বিভিন্নতা কদাচিৎ বিশদরূপে অনুভব করিতে পারিতাম না।

সমাবেশ ও সমালোচনা।

শকুন্তলা ও সাবিত্রী দুইটী স্বতন্ত্র চিত্র। এ স্থলে আমরা শিল্পী চিত্রকরের বর্ণ-চিত্রের কথা বলিতেছি না; কবির বাক্য-চিত্রের কথা বলিতেছি। চিত্রদ্বয়ের সমাবেশ দ্বারা, উভয়ের সৌন্দর্য্যগত পার্থক্য উপলব্ধি করিতে পারি। শকুন্তলা ও সাবিত্রী উভয়েই প্রণয়ের জীবন্ত প্রকৃতি;—পবিত্রতা ও কমনীয়তার

অনন্ত আবাসস্থল; উভয়ই আত্মোৎসর্গের এবং পতি-প্রাণতার কবিতাময়ী প্রতিমা;—কবি-কল্পনা-প্রসূত মনোমোহিনী সৃষ্টি। শকুন্তলা সুন্দরী, সাবিত্রীও সুন্দরী। শকুন্তলার পার্শ্বে সাবিত্রী দাঁড়াইলেন। সৌন্দর্য্যের সহিত সৌন্দর্য্য মিলিল। কিন্তু উভয়েরই কি একইরূপ সৌন্দর্য্য ?

তাড়িতালোকের মিলনে বাষ্পীয় ও বর্ত্তিকালোক যেরূপ ক্ষীণপ্রভ হয়, এ স্থলের মিলন সেরূপ নহে। সাবিত্রীর সৌন্দর্য্য দ্বারা, যেমন শকুন্তলার সৌন্দর্য্যের হ্রাস হয় না, শকুন্তলার সৌন্দর্য্যে তেমনই সাবিত্রী-সৌন্দর্য্য অক্ষুণ্ণ থাকে; অথচ উভয়েরই সৌন্দর্য্যের প্রকৃতিগত বিশিষ্ট পার্থক্য আছে; পার্থক্য আছে বলিয়াই, উভয় চিত্রের সৃষ্টি ও সমাবেশ অধিকতর সুন্দর। আর সেই পার্থক্যের তুলনা ও নিরূপণ করিবার জন্যই, উভয়ের তুলনা ও সমালোচনা আবশ্যক।

সাদৃশ্য।

একটী বস্তুর সহিত অপর একটী বস্তুর পার্থক্যানুভূতিই তত্তৎ-বস্তুসম্বন্ধীয় জ্ঞানের প্রারম্ভ।* পক্ষান্তরে, বস্তুসমূহের পার্থক্যানুভূতির সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদিগের মধ্যে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

রামের ব্যক্তিত্ব শ্যামের ব্যক্তিত্ব হইতে পৃথক্ হওয়া সত্ত্বেও রাম ও শ্যাম অনেক অংশে সদৃশ। কেন না, উভয়েই মনুষ্য; উভয়েরই চক্ষু-কর্ণাদি সমান ইন্দ্রিয় আছে; উভয়েই চিন্তাশক্তিবিশিষ্ট, ইত্যাদি।

(১) একটী বৃক্ষ অপর একটী বৃক্ষের সদৃশ।

(২) এক দিন অপর দিনের তুল্য।

(৩) 'দুর্গেশনন্দিনী' ও 'আইভ্যানহো' সমশ্রেণীর কাব্য।

উপরে যে কয়েকটী পদার্থের নাম উল্লেখ করা হইল, তাহাদিগের সাদৃশ্য অবশ্য পার্থক্যের সহিত বিজড়িত; যেহেতু পার্থক্য ব্যতিরেকে স্বতন্ত্র বস্তুত্ব অসম্ভব।

রাম ও শ্যাম। রামের সহিত শ্যামের অনেক অংশে সাদৃশ্য থাকিলেও অনেক অংশে পার্থক্য আছে। সে সাদৃশ্য ও পার্থক্য কি, সহজেই অনুমেয়।

একটী বৃক্ষ অপর একটী বৃক্ষের অনুরূপ হইলেও, প্রথমটী হয় ত অধিক

* এইরূপ পার্থক্যানুভূতি বস্তুগত বৈষয়িক বা ব্যবহারিক জ্ঞান বটে। কিন্তু অস্মদ্দেশীয় দার্শনিক ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে, যে জ্ঞান, তাহা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। অদ্বৈতবাদমতে, সর্ব্ববিধ পার্থক্যের অননুভূতিই আধ্যাত্মিক পরম জ্ঞান। বলা বাহুল্য, তাহা এ স্থলে আলোচ্য নহে।

পল্লবপত্রবিশিষ্ট, এবং দ্বিতীয়টী অধিক ফলপুষ্পযুক্ত। এবং উভয়ে ভিন্ন দুই স্থানে অবস্থিতিনিবন্ধন পৃথক্।

অদ্য ও কল্য, দুই দিনই একরূপ; কিন্তু অদ্যকার উত্তাপ, কল্যকার অপেক্ষা অধিক; অদ্য, কল্যের পরে সমাগত। তদ্ভিন্ন আরও গুরুতর বিভিন্নতা আছে।

'দুর্গেশনন্দিনী' ও 'আইভ্যানহো' সমশ্রেণীর গ্রন্থ হইলেও, ভাষা, ভাব ও কাব্যোল্লিখিত চরিত্রে বহুবিধ পার্থক্য আছে।

পরন্তু কোনও কোনও দ্রব্যে সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে; কেবল অবস্থিতির স্থান-ভেদে তাহাদিগের মধ্যে পার্থক্য লক্ষিত হয়। যেমন, দক্ষিণ ও বাম হস্ত, উভয়ই সম্পূর্ণ অনুরূপ; কিন্তু স্বতন্ত্র স্থানে অবস্থিত. এ জন্য একখানি দক্ষিণ হস্ত ও অপরখানি বামহস্ত।

এইরূপে, কোনও কোনও দ্রব্যের মধ্যে পারস্পরিক সাদৃশ্য অধিক ও পার্থক্য অল্প, এবং কোনও কোনও দ্রব্যের মধ্যে ঠিক ইহার বিপরীত। অর্থাৎ, পার্থক্যের আধিক্য ও সাদৃশ্যের অল্পতা লক্ষিত হয়।

দুইটী বালকের মধ্যে আকৃতিগত ও প্রকৃতিগত সাদৃশ্যের আধিক্য, কিন্তু একটী বালকে ও একটী বৃদ্ধে পার্থক্যই অধিক। পক্ষান্তরে, একটী মনুষ্যে ও একটী পশুতে যে পার্থক্য, তাহা আরও অধিক। কিন্তু ইহারা সকলেই জীবন-বিশিষ্ট; অর্থাৎ, জীবনীশক্তি ইহাদিগের মধ্যে সাধারণ; সুতরাং সেই অংশে ইহাদিগের পারস্পরিক সাদৃশ্য আছে। মূলে একতা আছে।

একই ভাষায় লিখিত দুইখানি সম শ্রেণীর কাব্য-গ্রন্থের মধ্যে কোনও কোনও বিষয়ে যেরূপ সাদৃশ্য থাকিতে পারে, সেই ভাষায় লিখিত একখানি বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় গ্রন্থের সহিত উহাদিগের (কাব্য-গ্রন্থদ্বয়ের) সেরূপ সাদৃশ্য থাকিতে পারে না। প্রত্যুত, বিলক্ষণ পার্থক্যই লক্ষিত হয়। পরন্তু, অপর ভাষায় লিখিত একখানি বিজ্ঞান বা কাব্যের সহিত, যখন ঐ একই ভাষায় লিখিত তিন গ্রন্থের কাহারও তুলনা করি, তখন পারস্পরিক পার্থক্যের পরিমাণ অধিকতর হয়। কিন্তু গ্রন্থগুলি ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় লিখিত ও ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির হইলেও, সেগুলি সকলই মনুষ্যের চিন্তাশক্তিপ্রসূত ও মনুষ্য-ভাষায় লিখিত বটে। অপিচ, উহাদিগের সকলেরই উদ্দেশ্য মনুষ্যের জ্ঞানবৃদ্ধি বা চিত্তস্ফূর্ত্তি সাধন করা। এ কারণ, সাধারণতঃ উহাদিগের পারস্পরিক সাদৃশ্য বিদ্যমান। সে সম্বন্ধে, মূলতঃ উহারা সকলেই এক।

এইরূপে, দেখা যায় যে, একতার মধ্যে বিভিন্নতা ও বিভিন্নতার মধ্যে একতা

প্রকৃতির সর্ব্বত্রই বিদ্যমান। একতা হইতে বিভিন্নতা ও বিভিন্নতা হইতে একতা; অথবা, অপর কথায়, সাধারণত্ব হইতে বিশেষত্ব এবং বিশেষত্ব হইতে সাধারণত্ব, সমালোচনার দুইটী ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী দ্বারা নির্ণীত হইয়া থাকে। এই দুই প্রণালীর একটীকে বিশ্লেষণ (Analysis বা Deduction) ও অপরটীকে সংশ্লেষণ (Synthesis বা (Induction) বলা হয়। ক্রমশঃ এই প্রণালীদ্বয়ের আলোচনা করা যাইতেছে।

বিশ্লেষণ ও বিশেষণ।

[ক্রমশঃ।

যাই

১

তরণী বাহিয়া,
তরুচ্ছায়া দিয়া।
পশ্চিম-আকাশে
মেঘ-খণ্ড ভাসে;
অরণ্য দু'ধারে
শ্বসিছে আঁধারে।

ভগ্ন উচ্চতীর,—
কৃষক-কুটীর;
তুলসীর তলে
সন্ধ্যাদীপ জ্বলে।

দীর্ঘশ্বাস সনে
কত ভাবি মনে,—
কৃষক-সংসার,
আর—আর—আর।

ঘুরি যাহা খুঁজি',—
হেথা আছে বুঝি!
সে উপকথায়
দিন যেন যায়!

২

বাহি তরী ধীরে,—
নিস্তব্ধ তিমিরে
অশ্বত্থ নিবিড়,
প্রাচীন মন্দির।
পলা'ল শৃগাল,
ডাকে ফেরুপাল।

গ্রাম-মধ্য হ'তে
আসে বায়ু-স্রোতে
সংকীর্ত্তন-ধ্বনি—
গভীরা রজনী।
অবসন্ন মন,—
এই কি জীবন?

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

সবুজ পত্র। আশ্বিন ও কার্ত্তিক।—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'জাপানের পত্র' বাস্তবিকই উপভোগ্য। এবার বৈচিত্র্যে, কৌতুকে ও মৌলিকতায় অত্যন্ত মনোহর হইয়াছে। প্রথমে একটু 'দার্শনিকতা' আছে। তার পর কবিত্ব। একটা উল্লেখযোগ্য তথ্যও আছে।—'প্রকৃতির মধ্যে মানুষের যে অন্ন আছে, তা ফলে শস্যে বিচিত্র এবং সুন্দর; কিন্তু সেই অন্নকে যখন গ্রাস করতে যাই, তখন তাকে তাল পাকিয়ে একটা পিণ্ড করে তুলি।' কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বোধ হয় আজকাল তাহাদের বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই চলিতেছেন। এই রচনায় তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে। রবীন্দ্রনাথ দুই একটি অতি সংক্ষিপ্ত জাপানী কবিতার নমুনা দিয়াছেন।—'পুরাণো পুকুর, ব্যাঙের লাফ, জলের শব্দ।' একটি সম্পূর্ণ কবিতা। তিনটি ক্ষুদ্র বাক্য, চরণে চরণে সাজানো।—বাঙ্গালায় এবার নিশ্চয়ই এইরূপ কবিতা দেখিতে পাইব।—'ঠাকুর-দালান, কবির লাফ, কলের শব্দ!' কেমন কবিতা হইল? আর একটি কবিতা—অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ,—'স্বর্গ এবং মর্ত্ত্য হচ্চে ফুল, দেবতারা এবং বুদ্ধ হচ্চেন ফুল,—মানুষের হৃদয় হচ্চে ফুলের অন্তরাত্মা।' রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,—'এই কবিতাগুলির মধ্যে কেবল যে বাক্‌সংযম তা নয়—এর মধ্যে ভাবেরও সংযম।' রবিবাবু যদি জাপান হইতে এই সংযমযুগলের আমদানী করিতে পারেন! রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি পড়িয়া আমাদের পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হইয়াছে;—'শান্তিনিকেতন আশ্রমে যখন আমি এক-এক দিন এক-একটি গান তৈরী করে, সকলকে শোনাতুম, তখন সকলের কাছে সেই গান তার হৃদয় সম্পূর্ণ উদ্‌ঘাটিত করে দিত। অথচ সেই সব গানকেই তোড়া বেঁধে কল্‌কাতায় এনে যখন বান্ধবসভায় ধরেচি, তখন তারা আপনার যথার্থ শ্রীকে আবৃত করে রেখেচে। তার মানেই কল্‌কাতার বাড়ীতে গানের চারিদিকে ফাঁকা নেই—সমস্ত লোকজন ঘরবাড়ী, কাজকর্ম্ম, গোলমাল, তার ঘাড়ের উপর গিয়ে পড়েছে।' কিন্তু আমাদের মনে হয়, 'মানে'টুকু রবীন্দ্রনাথ ঠিক ধরিতে পারেন নাই। কথামালার সেই গল্পটি মনে আছে ত? প্রাণভয়ে দৌড়ান ও আহারের চেষ্টায় দৌড়ান? বোলপুরের বেতনভোগী বন্ধুদের দৌড়ে ও কলিকাতার বান্ধবসমাজের দৌড়ে একটু তফাৎ হইবে না? কিন্তু একটি কথা মনে হইতেছে, রবিবাবুর বান্ধবসমাজ কি জানেন না, 'মিত্রদ্রোহী ন মুঞ্চতি?' এই পত্রের সর্ব্বাপেক্ষা উপভোগ্য অংশ—'এখানে মেয়ে পুরুষের সামীপ্যের মধ্যে কোনো গ্লানি দেখ্‌তে পাইনে। অন্যত্র মেয়েপুরুষের মাঝখানে যে একটা লজ্জা সঙ্কোচের আবিলতা আছে, এখানে তা নেই। মনে হয় এদের মধ্যে মোহের একটা আবরণ যেন কম। তার প্রধান কারণ, জাপানে স্ত্রীপুরুষের একত্র বিবস্ত্র হয়ে স্নান করার প্রথা আছে। এই প্রথার মধ্যে যে লেশমাত্র কলুষ নেই, তার প্রমাণ এই—নিকটতম আত্মীয়েরাও এতে মনে কোনো বাধা অনুভব করে না। এমনই করে এখানে স্ত্রীপুরুষের দেহ, পরস্পরের দৃষ্টিতে কোনও মায়াকে পালন করে না। দেহ সম্বন্ধে উভয় পক্ষের মন খুব স্বাভাবিক। অন্য দেশের কলুষ দৃষ্টি ও দুষ্টবুদ্ধির খাতিরে আজকাল সহরে এই নিয়ম উঠে যাচ্চে। কিন্তু পাড়াগাঁয়ে এখনও এই নিয়ম চলিত

আছে।' আর কেহ রবীন্দ্রনাথের 'বিবসনা' দেখিয়া কুণ্ঠিত হইবেন না! একনিঃশ্বাসে এমন সাতকাণ্ড দর্শন, মনস্তত্ত্ব ও মৌলিক চিন্তার সৃষ্টি আর কখনও দেখিয়াছ কি? পৃথিবীতে মেয়ে পুরুষে যে কারণে এক সঙ্গে 'ন্যাংটো' হয়ে স্নান করে না, সে কারণটা কি অস্বাভাবিক! ভারতবর্ষের রাজ-কবির মতে, সেটা 'লজ্জা সঙ্কোচের আবিলতা'! আমাদের মোহের আবরণ বেশী, তাই আমরা বিবসন ও বিবসনার অভিনয় করিতে পারি না। বাস্তবিক, রবীন্দ্রনাথ অতি উচ্চ স্তরে উঠিয়াছেন! শুকদেব গোস্বামীর মনে লজ্জা সঙ্কোচের আবিলতাও ছিল না, মোহের চুলায় যাক্, একটু কৌপীনেরও আবরণ ছিল না! কবে সমস্ত বিশ্ব এই নব শুকদেবের অনুসরণ করিবে? মানবজাতির মধ্যে যাহারা এখনও 'বিবস্ত্র হয়ে বেড়ায়', কেবল স্নানের সময়ে নয়, জন্ম হইতে মরণ পর্য্যন্ত কোনওরূপ ঘেরাটোপ পরে না, যাহাদিগের কবিকে আদৌ বলিতে হয় না—

'ফেল গো! বসন ফেল ঘুচাও অঞ্চল!'

কেন না, বসনের তথা অঞ্চলের সহিত তাহাদের কোনও সম্বন্ধই নাই, সেই আদিম মানব-মানবীর 'নিকটতম আত্মীয়েরাও এতে কোনো বাধা অনুভব করে না!' অতএব, প্রতিপন্ন হইল,—'এই প্রথার মধ্যে লেশমাত্র কলুষ নাই!' এমন যুক্তি, এমন উপপত্তি জগতে দুর্লভ, তাহা কে অস্বীকার করিবে? পঞ্জাবে এখনও স্ত্রী-পুরুষে এক ঘাটে উলঙ্গ হইয়া স্নান করিবার প্রথা আছে। তবু তাহাদের মধ্যে 'লজ্জা সঙ্কোচের আবিলতা' এখনও পঞ্চত্ব লাভ করে নাই। আশা করি, রবীন্দ্রনাথ দেশে ফিরিয়া ভারতবর্ষে এই প্রথা প্রচলিত করিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটী করিবেন না। যাহাতে দেশের অর্থাৎ মানুষের কলুষদৃষ্টি ও দুষ্টবুদ্ধিও পঞ্চভূতে মিশিয়া যায়, আশা করি, দেশবাসীও সে পক্ষে অবহিত হইবেন! আবার সিদ্ধান্ত দেখুন,—'পৃথিবীতে যত সভ্যদেশ আছে, তার মধ্যে কেবল জাপান মানুষের দেহ সম্বন্ধে মোহমুক্ত, এটা আমার কাছে খুব বড় জিনিস বলে মনে হয়।' দেহ সম্বন্ধে মোহমুক্তির একমাত্র প্রমাণ—জাপানের নর-নারী উলঙ্গ হইয়া একত্র এক স্নানাগারে এক টবে স্নান করে! রবীন্দ্রনাথ 'ঋষি' হইয়াছিলেন, এইবার পরমহংস হইলেন! আবার সেই বইখানির কথা মনে হইতেছে,—'Is genius insanity?'—সার রবীন্দ্রনাথের জন্য বাঙ্গালীর উদ্বিগ্ন হইবার কারণ আছে। চিঠিখানির উপসংহারে আছে,—'যা মনে হচ্চে তাই বল্‌ব, এই আমার মৎলব।' কিন্তু এ দেশে একটা উপদেশ আছে,—'শতং বদ, মা লিখ।' সেটা লঙ্ঘন করিতেছেন কে? 'খুলিল মনের দ্বার না লাগে কবাট' হইয়া উঠিল যে! 'জানো আমার সকল কাজেই originality' এই পত্রের দার্শনিকতায় অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপন্ন হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিব না। প্রমথ ভায়া! বাঙ্গালীরা দাদাশ্বশুরকে নাচায়, তুমি শ্বশুরকে বেশ নাচাইতেছ! 'বাংলা সাহিত্যে বাংলা ভাষা'য় ও পক্ষের মামুলী তর্কের পুনরাবৃত্তি। নূতনের মধ্যে 'তিনি (প্রমথ চৌধুরী) বাংলা থেকে সংস্কৃতকে তাড়াতে উদ্যত হননি, বরং উচিত আদরে অভ্যর্থনা কোরে বসাচ্ছেন।' সংস্কৃত খুব আপ্যায়িত হবেন। আমরাও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। হরিতকৃষ্ণ! তাহার কারণ এই যে, 'বাংলা'য় হালে পাণি পায় না। প্রমথ কি করিতেছেন—জানেন? ঠিক যেন কোনও বখা ছোকরা বুড়ো ঠাকুরদাদাকে গাঁজার আড্ডায়

টানিয়া লইয়া গিয়া মজা করিতেছে! প্রমথর 'উচিত আদরে' ও কলিকাতার ককনীর দরদে বুড়ো সংস্কৃত হাঁপাইয়া উঠিতেছে। 'ফরাসী ও জার্ম্মাণ' নিবন্ধটি উল্লেখযোগ্য। 'হিন্দু সঙ্গীতে রাগ ও মেলডি'তে সবুজ পত্রের অর্দ্ধেক পূর্ণ হইয়াছে। শ্রীসুরেশানন্দ ভট্টাচার্য্যের 'প্রাণ ও মরণ' প্রহেলিকা। এমন ভীষণ কবিতা এ যুগেও চোখে অল্প পড়িয়াছে। শ্রীপ্রমথ চৌধুরীর 'সনেট' পড়িয়া আমরা নিরাশ হইয়াছি, লজ্জিত হইবার উপায় নাই। কেন না, আমরা বিবসন-যুগের জন্য প্রস্তুত হইতেছি। ইহার প্রধান বক্তব্য ও সৌন্দর্য্য,—কাঁচুলীর ব্যর্থ চেষ্টা। যাহা 'ব্যক্ত করে হৃদয়ের উদয়ের রঙ্গ'; তাহা নিশ্চয়ই সেই যুগের জন্য প্রস্তুত হইবার মহলা। আশা ও আনন্দের বিষয় এই যে, বাঙ্গালীরা এখনও একঘাটে স্ত্রী-পুরুষে উলঙ্গ হইয়া স্নান করিতে না পারুক, কিন্তু কোনও কোনও পাড়ায় এক সঙ্গে বসিয়া এশ্রেণীর কবিতা পড়িতে পারে!

অর্ঘ্য। কার্ত্তিক। এই সংখ্যা হইতে অর্ঘ্যের প্রবর্ত্তক ও ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীঅমূল্যচরণ সেন আবার সম্পাদনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি। 'সাময়িকী' উল্লেখ-যোগ্য; উপভোগ্য। আশা করি, ইহা ক্রমে বিস্তৃতি ও গভীরতা লাভ করিবে। নূতন সম্পাদকের অধিকারে প্রথম সূচনা দেখিয়া মনে হইতেছে, 'অর্ঘ্য' ভাব ও ভাষার বিশুদ্ধি-রক্ষার জন্য যথাশক্তি চেষ্টা করিবে। সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করি, অমূল্যবাবুর এই চেষ্টা সফল হউক। এবারকার 'সাময়িকী'তে অনেক কাজের কথা, ভাবিবার কথা আছে। কিন্তু 'সাময়িকী' নামটা উদ্ভট বলিয়া মনে হইতেছে। সম্পাদকের 'সাহিত্য-গুরুদিগের সাধনা' উল্লেখযোগ্য। শ্রীপ্রিয়-লাল দাস 'রবীন্দ্রনাথে' লিখিয়াছেন,—'রবীন্দ্রনাথের কাব্যে বৈষ্ণব কবিগণের প্রভাব বিশেষ-ভাবে লক্ষিত হয়।' ছন্দের অনুকরণ ও শব্দের সঙ্কলনই 'বৈষ্ণব কবিগণের প্রভাব' নয়। শ্রীসুহাসচন্দ্র রায়ের 'অকারণ ক্রোধ' গল্পটি সুখপাঠ্য। লেখকের গল্প বলিবার শক্তি আছে। অনুশীলনে সে শক্তি বিকাশ লাভ করিবে। 'প্রবর্ত্তক' রবীন্দ্রনাথের 'অয়ি ভুবনমোহিনী'র পক্ষপাতী; তিনি বলেন, আধ্যাত্মিক ভাবে মাকে 'ভুবনমনমোহিনী' বলিলে ক্ষতি নাই। রুচি ও প্রবৃত্তির কথা। যাঁহাদের ইচ্ছা হয়, তাঁহারা বলুন। 'অর্ঘ্যে'র সম্পাদক বলিতেছেন,—সাধক কবিদের গানের নজীর এ ক্ষেত্রে খাটে না।

সন্দেশ। কার্ত্তিক।—'লোভী ছেলে' ত্রিবর্ণে মুদ্রিত চিত্র। 'সন্দেশে'র ছবি যেমন হয়, এখানি তেমন হয় নাই। বিশ্বামিত্র, নিরেট গরুর কাহিনী, পুণ্যের হিসাব প্রভৃতি তরুণ পাঠকদের চিত্তবিনোদন করিবে। 'কানে খাটো বংশীধরে'র ছবিখানি বেশ। 'সন্দেশে'র বিজ্ঞান বেশ হইতেছে। কিন্তু ভাষাটা গড়পার হইতে বালিগঞ্জে চলিয়া না যায়। 'সন্দেশ' এখন আমাদের 'সবে ধন নীলমণি';—ইহার সার্ব্বভৌমিকতা নষ্ট না হয়। কলিকাতার মুদ্রাদোষ ও ধ্বনি-বিকৃতি 'সহজ ভাষা' নহে। যে ভাষা বেহারের প্রান্ত হইতে আসামের সীমা পর্য্যন্ত সকলে পড়িতে ও বুঝিতে পারে, সে ভাষাকে অবিকৃত না করিয়াও সহজ, প্রাঞ্জল, সরল করা যায়, পূর্ব্বাচার্য্যগণ তাহা হাতে-কলমে সপ্রমাণ করিয়া গিয়াছেন।—'সন্দেশ' শুধু শিশুর ভোগ্য নয়, ইহা বয়স্কদের পাতেও চলে।—এ 'সন্দেশে'র অধিকতর সমাদর হইলে আমরা আনন্দিত হইব।

উদ্বোধন। কার্ত্তিক।—পূজ্যপাদ স্বামী শ্রীসারদানন্দের 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলামৃত' চলিতেছে। স্বামী শ্রীশুদ্ধানন্দের 'মানব-সমাজে ধর্ম্মের প্রয়োজন' সুচিন্তিত ও সুলিখিত সন্দর্ভ। স্বর্গীয়া

নিবেদিতার আচার্য্য 'শ্রীবিবেকানন্দ' বাঙ্গালা সাহিত্যে অমর হইয়া থাকিবে। শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরীর 'ফেডরিক্ নীচে' এখনও সমাপ্ত হয় নাই। 'স্বামি বিবেকানন্দের পত্র' হইতে একটু উদ্ধৃত করিতেছি,—'আমার পিতা যদিও উকীল ছিলেন, তথাপি আমি ইচ্ছা করি না যে, আমার প্রিয়জনের মধ্যে কেহ উকীল হয়। আমার প্রভু ইঁহার বিরুদ্ধে ছিলেন, এবং আমার বিশ্বাস, যে পরিবারে কতকগুলো উকীল আছে, সে পরিবার নিশ্চয়ই একটা গোলযোগে পড়বে। আমাদের দেশ উকীলে ছেয়ে গেছে—প্রতিবৎসর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হাজার হাজার উকীল বার হচ্ছে। আমাদের জাতের পক্ষে এখন আবশ্যক কর্ম্মতৎপরতা ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্বাবিষ্কার-উপযোগী প্রতিভা।'

নারায়ণ। কার্ত্তিক।—শ্রীবিপিনচন্দ্র পালের 'জাতীয় বর্ণভেদের কথা' উল্লেখযোগ্য। এই বাদ-বিবাদসঙ্কুল বিষয়ে মতভেদ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু বিপিনবাবুর 'কথা' সামাজিকগণের বিচার্য্য —অনুশীলনযোগ্য। শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষের 'মায়ের দেখা' নামক কবিতাটি পড়িয়া আমরা তৃপ্ত হইয়াছি। স্বর্গীয় কবি রঙ্গলালের 'বিরহ-বিলাপ' বাঙ্গালা ভাষার হারানিধি। সাহিত্যের curio।

অর্চ্চনা। কার্ত্তিক।—শ্রীগিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ 'হেরম্ব গণেশ' নামক ক্ষুদ্র নিবন্ধে সংক্ষেপে গণপতি-মূর্ত্তির পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীসুহাসচন্দ্র রায়ের 'বিচিত্র-প্রসঙ্গ' পড়িয়া আমরা পরম কৌতুক অনুভব করিয়াছি। রচনায় মুন্সীয়ানা আছে। বাঙ্গালা সাহিত্যে শক্তিশালী শিক্ষানবীশ প্রায়ই দেখিতে পাই না। সুহাসচন্দ্রের রচনায় শক্তির আভাস আছে। শ্রীসতীশ-চন্দ্র বর্ম্মণের 'রক্ষা' মামুলী কবিতা। তবে বোঝা যায়। সমস্যা নহে। কিন্তু বিশেষত্ব নাই। ছোট আদালতের ভয়ে আত্মাপুরুষ শুকাইয়া যায়, কিন্তু কবিতার উৎস শুকায় না! 'রাধা' বাঙ্গালা সাহিত্যে অন্ততঃ এই তত্ত্ব সপ্রমাণ করিয়া সার্থক হইয়াছে। শ্রীননীগোপাল মজুমদারের 'পুরাতন' উল্লেখযোগ্য।—কিন্তু নামকরণে এ কি ঢং চলিত হইল? শ্রীহরিহর শাস্ত্রীর 'দ্বৈতবাদ ও দুর্গাপূজা' ও শ্রীনিবারণচন্দ্রদাস গুপ্তের 'সাহিত্যে স্বলিখিত ও অপরলিখিত জীবনচরিতের স্থান' সুচিন্তিত ও সুলিখিত। সম্পাদকের 'মানুষ ভূত' গল্পটি তাঁহার পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠার অনুরূপ হয় নাই। সাহিত্য-প্রসঙ্গে শ্রীনবকুমার কবিরত্নের 'অভিভাষণ না অতিভাষণে'র উত্তর আছে। আর কেন? ছদ্ম-নামের চর্ম্মাবৃত কবিরত্নের যথেষ্ট শাস্তি হইয়া গিয়াছে।

উদ্বোধন। আশ্বিন।—'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা-প্রসঙ্গ' ও 'আচার্য্য শ্রীবিবেকানন্দ' চলিতেছে। 'বেদান্তে সৃষ্টিতত্ত্ব' ও 'মুক্তির পথে' উল্লেখযোগ্য। 'মেহার কালীবাড়ী ও সর্ব্বানন্দ ঠাকুর' সুখপাঠ্য। 'সৌন্দর্য্যতত্ত্ব' নামক উপাদেয় গ্রন্থের সমালোচনায় সমালোচক চিন্তাশীলতার ও ভাবুকতার পরিচয় দিয়াছেন। আশা করি, এই সমালোচনা 'সৌন্দর্য্যতত্ত্বে' বাঙ্গালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণে'র মত পদ্য 'উদ্বোধনে' শোভা পায় না। এখন কবিতাকে ঘুম-পাড়ানোই দরকার হইয়া উঠিয়াছে। অপকবিতার অপমৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু যদি সন্ন্যাসীরাও তাহাকে নাচাইতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে আমরা নাচার।

কবিতা

আসিছে কিশোরী, বনপথ দিয়া,
নতমুখী কত লাজে!
নবীন হৃদয়ে নবীন প্রণয়
মৃদুল মধুর বাজে।

কটিতটে দুলে মাধবী-মেখলা,
উরসে বেলার মালা;
নীল-বাসে ঢাকা তনু-গৌরীলতা—
জলদে তড়িৎ-জ্বালা।

বকুল-সিঁথীটী পড়িছে সরিয়া,
অলকে অশোক-দাম;
সুরভি নিঃশ্বাসে দুলিছে নোলক,
আঁখি-পদ্ম অভিরাম!

পড়িছে খসিয়া বেণীর মল্লিকা,
দুলিছে কর্ণিকা-ফুল;
বাম করে ঝরে রসাল-মঞ্জরী,
দক্ষিণে পলাশ-ফুল।

ফুলধনু সম সুভুরু দু'খানি,
কপাল অরধ-চাঁদ;
চিবুকে শোভিছে মৃগমদ-বিন্দু,
নয়নে কাজল-ফাঁদ।

চম্পক-বরণ চরণে নূপুর—
গুঞ্জরে মধুপ-দল ;
পদ-পরশনে শিহরে ধরণী,
তৃণ আরো সুকোমল !

কত সুখ-আশে কত লাজে ত্রাসে,
আশে-পাশে দূরে চায় !
নব কুরুবক ফুল্ল মুখখানি
গোলাপে রাঙ্গিয়া যায় !

সম্মুখে সরসী, বিমল আরসী,
রূপ-আভা পড়ে জলে !
বকুলের ছায়া কূল হ'তে সরে,
ফুটে পদ্ম দলে দলে।

টগর-কিরীটে উষার কিরণ
উছলি' পিছলি' লুটে ;
মিলাল কুন্দের মধুর হাসিটী
কুসুম্ভ-অধরপুটে !

চকিত নয়ন—সভয় ভ্রমর
আকাশে উড়িতে চায় !
কোথা ভাব-সখী, ভাষা-সহচরী ?
কে পথ দেখাবে তায় ?

পড়িল বসিয়া তমাল-তলায়—
হৃদয়ে বিঁধিছে কি যে !
শিথিল শরীর, শ্লথ কেশ-বেশ,
শিশিরে আঁচল ভিজে।

তরু লতা পাতা জিজ্ঞাসে বারতা,
হরিণী বিস্ময়ে চায় ;
তটে উথলিয়া কাঁদিছে তটিনী,
শ্বসিছে কাতরে বায়।

কে পথ দেখাবে, কেবা সাথে যাবে ?
যাবে কোন্ স্বর্গপুরে ?
জগতের জীব জানে না ত্রিদিব,
নিজ সুখ-দুখে ঘুরে।

বসন্ত পলাল, মলয় লুকাল,—
তুমি কি দেখ নি চেয়ে ?
কত ফুল ফুটে' পায়ে যে লুটাল,
কত পাখী গেল গেয়ে !

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

বঙ্কিম বাবুর আর একটি প্রবন্ধ।

সূচনা।

বঙ্কিমচন্দ্রের যে ইংরাজী প্রবন্ধটির অনুবাদ নিম্নে প্রকাশিত হইল, তাহা ৺ শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'মুখার্জীস্ ম্যাগাজিনে' (১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর-সংখ্যায়) প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ১৪ই মার্চ্চ তারিখে শম্ভুচন্দ্রকে লিখিত বঙ্কিমবাবুর একখানি পত্র দৃষ্টে প্রতীত হয় যে, তিনি প্রথম হইতেই 'মুখার্জীস ম্যাগাজিনে'র লেখকশ্রেণীভুক্ত হন, কিন্তু নবপ্রকাশিত 'বঙ্গদর্শনে'র সম্পাদনে ব্যস্ত থাকা ও শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন উক্ত পত্রিকার জন্য কিছু লিখিয়া উঠিতে পারেন নাই। এই প্রবন্ধটি 'মুখার্জীস্ ম্যাগাজিনে' প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম প্রবন্ধ। 'মুখার্জীস্ ম্যাগেজিনে' তাঁহার আর একটিমাত্র প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল—তাহার অনুবাদ গত মাসের 'সাহিত্যে' প্রকাশিত হইয়াছে।

বর্ত্তমান প্রবন্ধটি সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ৫ই জানুয়ারী তারিখ সংবলিত একখানি পত্রে বরহমপুর হইতে শম্ভুচন্দ্রকে লিখিয়াছিলেন—

'স্বীকারোক্তিটি কোথাও ছাপিও না। ক্যাম্বেল ও বার্ণার্ড * উভয়েই আমাকে বিলক্ষণ চিনেন, এবং অনায়াসেই পাপস্বীকারকারীকে ধরিয়া ফেলিতে পারিবেন। অবশ্য তাঁহারা আমাকে ফাঁসী দিবেন না, তবে, উহা তাঁহাদের মনঃপূত হইবে না।'

'মুখার্জীস ম্যাগাজিন' বরাবরই বিলম্বে প্রকাশিত হইত। বঙ্কিমচন্দ্রের আপত্তি সত্ত্বেও শম্ভুচন্দ্র প্রবন্ধটি পত্রস্থ করিয়াছিলেন। তবে প্রবন্ধটির নিম্নে প্রবন্ধলেখকের নাম মুদ্রিত করেন নাই।

নব্য বাঙ্গালীর স্বীকারোক্তি।

সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনের বাহ্যাবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিলে, ইংরাজী-শিক্ষিত বাঙ্গালী যে উত্তরোত্তর ইংরাজী-ভাবাপন্ন হইতেছেন, তাহা কোনও ইংরাজী-শিক্ষিত বাঙ্গালীই অস্বীকার করিবেন না। আমাদের গৃহে, গৃহসজ্জায়, ব্যবহৃত যানে, আহার্য্যে ও পানীয় দ্রব্যে, বেশভূষায়, পত্রে ও কথোপকথনে, বিদেশীয় ইংরাজের ছাপ আছে। যে ভাবে আমরা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করি, তাহা নিরীক্ষণ করিলে সকলের নিকটেই ইহা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হইবে। ইংরাজের শিল্প, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের আদর্শ লইয়া আমরা আমাদের গৃহ নির্ম্মিত ও সজ্জিত করিয়া থাকি। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ প্রশস্ত গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইলে পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের কথা উপেক্ষা করিয়া বারো মাসে তেরো পার্ব্বণে নিমন্ত্রিত দেবতাদিগের বাসের গৃহখানিই তাঁহাদের উপযুক্ত করিবার চেষ্টা পাইতেন। দেবদেবীর প্রতিমা-স্থাপনের জন্য নির্দ্দিষ্ট গৃহ বা পূজার দালানেই বাটীনির্ম্মাণ-তহবিলের অধিকাংশ অর্থ ব্যয়িত হইত, উহাতেই শিল্পীর শ্রেষ্ঠ কারুকার্য্যসমূহ ক্ষোদিত হইত, দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে উহাই বাটীর সকল গৃহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইত; এক কথায়, উহার সৌন্দর্য্য ও শিল্পনৈপুণ্যই গৃহস্বামীর সামাজিক অবস্থা ও প্রতিপত্তির পরিচয় প্রদান করিত। ইংরাজীশিক্ষিত নব্যবাঙ্গালীর নির্ম্মিত গৃহে পূজার দালানের অভাবই পরিলক্ষিত হয়। পূর্ব্বে যে এরূপ ছিল না, ভাষাবিজ্ঞান তাহার সাক্ষ্য দিবে—বাঙ্গালায় পল্লীগ্রামে এখনও দালান ও ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ, একার্থবাচক। চেয়ার, টেবিল, পাখা (অধিকাংশ স্থলে কেবল

* স্যর জর্জ্জ ক্যাম্বেল তখন বাঙ্গালার লেফটেনাণ্ট গবর্ণর, এবং মিষ্টার (পরে স্যর) চার্লস

গৃহসজ্জার জন্য মাত্র) আমেরিক্যান ঘড়ি, নানাবর্ণের কাচের পাত্রাদি, 'সচিত্র লণ্ডন নিউজে'র ছবি, কেরোসিনের ল্যাম্প, রেণল্ডের উপন্যাস, টম পেনের Age of Reason, বায়রণের কাব্যগ্রন্থাবলী প্রভৃতির দ্বারা পূর্ণ বুক্‌শেল্‌ফ্‌, এবং ইংরাজী বাদ্যযন্ত্রাদি নব্যবাঙ্গালীর বৈঠকখানায় সখের আসবাব। কলিকাতা ও উহার উপকণ্ঠের কথা আর বলিব না। এই সেদিন সুদূর রাজসাহীতে—ইংরাজী সভ্যতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ ডগ্‌কার্টের ব্যবহার দেখিয়া লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুর তত্রত্য সভ্যতাপ্রাপ্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের রুচির প্রশংসা করিয়াছিলেন। ছোটলাট বাহাদুর যে পরিহাস করেন নাই, এ কথা খুলিয়া বলিবার কোনও প্রয়োজন ছিল না। স্বায়ত্তশাসনপ্রণালী সম্বন্ধে বঙ্গেশ্বর যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাতে উক্ত সম্ভ্রান্তব্যক্তিগণ কত দূর আস্থাস্থাপন করিয়াছিলেন তাহা বলা যায় না; কিন্তু, ডগ্‌কার্ট সম্বন্ধে তিনি যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে যে তাঁহাদের মনের কথা প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আমরা আর নিরামিষাশী ও পানদোষশূন্য নহি। বীফ্‌রোষ্ট্‌ বা ভীল্‌-কাট্‌লেট্‌ আহার করিতে আমাদের কোনও বিচারমূলক আপত্তি নাই; ইংরাজের ন্যায় ইংরাজীভাবে মদ্যপানাদি করিতে আমাদের বিচারে বা ব্যবহারে কোনও বাধা নাই। কথোপকথনে আমরা নয় ভাগ ভাঙ্গা ইংরাজী ও এক ভাগ বিশুদ্ধ বাঙ্গালা বলি। এ দেশের পত্র-লিখনের ভারাক্রান্ত পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া আমরা Cook's Universal Letter-writerএর আদর্শে পত্র লিখি। আমাদের পিতামহগণ কর্তৃক ব্যবহৃত ছোট আঁট জামা ও ঢিলা লম্বা চাপকান আমরা পরিত্যাগ করিয়াছি। তাহার পরিবর্ত্তে আমরা ইংরাজী ফ্যাশানের সার্ট পরিতেছি, এবং আমাদের চাপকান দিন দিন ইংরাজী কোটের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট ও দৈর্ঘ্যে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে। ইংরাজ রাজকর্ম্মচারীদিগের চক্ষুঃশূল—আমাদের বিলাতী জুতার কথা—নাই বলিলাম।

যৎসামান্য ইংরাজী শিক্ষা, এবং জাতিগত, রাজনীতিবিষয়ক ও ধর্ম্মগত পার্থক্যের তিনটি আবরণে আচ্ছাদিত ইংরাজের অনুকরণ, এক পুরুষের মধ্যে বাঙ্গালার সামাজিক আচার ব্যবহারাদির এত দূর পরিবর্ত্তন সংসাধিত করিয়াছে। ইহা হয় ত প্রথমে বিসদৃশ বলিয়া মনে হইতে পারে যে, এই দুইটি কারণের মধ্যে দ্বিতীয়টিই এই পরিবর্ত্তনের প্রধান কারণ; যদিও প্রথমটি কিছু মাত্রায় বর্ত্তমান না থাকিলে দ্বিতীয়টি এত ফলপ্রসূ হইত না।

সামান্য ইংরাজী শিখিয়া ও ছয় মাস ইংলণ্ডে ভ্রমণ করিয়া আসিলে আচার, ব্যবহার ও রুচির যে পরিবর্ত্তন হয়, এখানে বসিয়া সমগ্রজীবন ইংরাজী সাহিত্যের চর্চ্চায় অতিবাহিত করিলেও সেরূপ পরিবর্ত্তন হয় না। ইংরাজী শিক্ষা ও ইংরাজের অনুকরণের প্রবৃত্তি, এই উভয় শক্তি আমাদিগকে বিভিন্ন দিকে আকর্ষণ করিয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্তের অসদ্ভাব নাই; কিন্তু ফলে দেখা যায় যে, শেষোক্ত শক্তিই প্রথমোক্ত শক্তি অপেক্ষা প্রবলতর।

বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন জীবের নিকট ধর্ম্মকর্ম্মের সহিত সম্পর্কশূন্য অন্যান্য বাহ্য আচার ব্যবহারাদির যে কোনও গুরুত্ব আছে, এই কথাটি আমরা ইংরাজের নিকট হইতেই শিখিয়াছি, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। আত্মরক্ষাবিষয়ক কর্ত্তব্য সম্বন্ধে স্পষ্ট উপদেশ সত্ত্বেও, কঠোর সন্ন্যাসধর্ম্মপালনই আমাদের শাস্ত্রের প্রধান শিক্ষা। সংসারের অসারতা ও ক্ষণবিধ্বংসিতা সম্বন্ধে দৃঢ়বিশ্বাসই এই শিক্ষার মূল।

যাঁহার কাব্যে এই মনুষ্য-প্রকৃতির অন্তরতম প্রদেশের যাবতীয় ভাবনিচয় প্রতিফলিত হইয়াছে, বিশ্বমানবপ্রকৃতির সেই অদ্বিতীয় ও অমর কবির ন্যায় আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণও এইরূপ ভাবিতেন ও অনুভব করিতেন:—

পাপে পূর্ণ মৃৎপিঞ্জরে, মন রে আমার,
কুপ্রবৃত্তিনিচয়ের কঠোর শাসনে,
বসিয়া কাতর কেন কাঁদ অনিবার,
সাজাইয়া দেহ তব বিচিত্র ভূষণে?
যে দেহের পরিণাম কীটের আশ্রয়,
সে দেহ সাজালে কেন এত যতনে?
নশ্বর এ দেহে কেন এত অপব্যয়,
কীটের কবলে যা'র নিয়তি মরণে?
তবে কেন? দেহ ভৃত্য, হ'ক তা'র ক্ষয়;
দেহপাত করি' কর পুণ্যের সঞ্চয়;
বিলাসিতা বিনিময়ে কর স্বর্গ ক্রয়;
আত্মারে করহ পুষ্ট, দেহ হ'ক লয়।
নরের ভক্ষক যমে বিনাশিবে তবে,
যমের মরণ হ'লে মৃত্যু নাহি রবে।

অবশ্য সর্ব্বত্র তাঁহারা এই মতানুসারে চলিতে পারিতেন না; কারণ, মানুষের পক্ষে তাহা অসম্ভব। কিন্তু শরীররক্ষার জন্য যতটুকু আবশ্যক, আহারে ও বেশপারিপাট্যে তদতিরিক্ত মনোযোগ প্রদান করিবার কোনও প্রয়োজন

আছে, এ কথা তাঁহারা মনে করিতে পারিতেন না। ইংরাজী সভ্যতা হিন্দুদিগের তেত্রিশ কোটী দেবতাকে স্থানচ্যুত করিয়া তাঁহাদের সিংহাসনে বিলাসিতা ও মর্য্যাদাজ্ঞানকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। আমাদের বিশ্বাসের এই পরিবর্ত্তন স্বীকার করিবার সাহস ও স্পষ্টবাদিতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে আত্মানুসন্ধানের দ্বারাই হউক, বা পরোক্ষভাবে আমাদের বাহ্য জীবনে অন্তঃপ্রকৃতির আভাস লক্ষ্য করিয়াই হউক, যে দিক হইতেই এ বিষয় দেখা যায়, আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, আমাদের এই পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে।

আমরা একান্নবর্ত্তী পরিবারের প্রথা রহিত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছি। আমরা জীবিকার জাতীয় আদর্শ আরও উন্নত করিবার চেষ্টা পাইতেছি। চরিত্রের স্বাধীনতা বর্দ্ধিত করিবার প্রয়াস পাইতেছি। কথাগুলি শুনিতে বেশ। তাহাদের প্রকৃত অর্থ কি, তাহা কি কখনও ভাবিয়া দেখিয়াছ? সমবেতভাবে কিরূপে কার্য্য করিতে হয়, যে সমাজ এখনও তাহা বিন্দুমাত্র শিক্ষা করে নাই, সেই সমাজের একমাত্র বন্ধন তোমরা বিচ্ছিন্ন করিতে উদ্যত হইয়াছ। তোমরা এত আবেদন নিবেদন করিতেছ, সংবাদপত্রে অনবরত আন্দোলন করিতেছ, কিন্তু তোমরা কি মনে কর যে, তোমাদের একান্নবর্ত্তী পরিবারের পরিবর্ত্তে তোমাদের গ্রাম্য মিউনিসিপ্যালিটী তোমাদিগকে সমবেতভাবে কার্য্য করিতে শিখাইবে? যাহারা চিরপ্রচলিত প্রথানুসারে তোমাদের সাহায্যের আশা করিয়া আছে, সেই সকল আত্মীয়দিগকে বঞ্চিত করা কি নিষ্ঠুরতা নহে? স্বার্থের দিক দিয়া দেখিলেও তোমরা কি দেখিতে পাইতেছ না যে, একত্র বাস ও আহারাদি করিলে কত অল্পব্যয়ে চলিতে পারে, এবং তাহাতে নিঃস্ব দেশবাসিগণের কত সুবিধা হয়? যদি তোমার গণিতজ্ঞান থাকে, এবং তুমি হিসাবী হও, তাহা হইলে তুমি সহজেই অনুমান করিতে পারিবে যে, কত টাকা কত আনা কত পয়সা এই প্রথায় বাঁচিয়া যায়। তোমরা একটা নিষ্ঠুর স্বাতন্ত্র্যের প্রথা প্রচলিত করিবার চেষ্টা পাইতেছ এবং এই প্রথা ক্রমে ক্রমে সমাজের নিম্নস্তরেও প্রবেশ লাভ করিতেছে—তোমাদের উচ্চশিক্ষার ন্যায় বাষ্পাকারে উপর দিকে উঠিতেছে না। চরিত্রের স্বাধীনতা-বর্দ্ধনই বটে! নিজের মনকে এই বলিয়া প্রবোধ দিও না। তোমাদের দরিদ্র আত্মীয়দিগের চরিত্রের স্বাধীনতা-বৃদ্ধি বিষয়ে তোমাদের স্বার্থ ও তোমাদের কর্ত্তব্য যেরূপ একসুরে গায়িতেছে, তাহাতে তোমাদের ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত যে, তোমরা কি করিতে

যাইতেছ। একটি কথা বেশ স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হইতেছে; এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই যে, যাঁহারা অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তি, তাঁহাদের মধ্যেই এই আত্মনির্ভরতা বৃদ্ধির ইচ্ছা সমধিক বলবতী।

আমরা জাতিভেদ তুলিয়া দিয়াছি। কেবল নীচ বা উচ্চকুলে জন্মহেতু যে হাস্যজনক সামাজিক পার্থক্য কল্পিত হয়, আমরা তাহা গ্রাহ্য করি না। কিন্তু আমাদের এতদূর উদারতা নাই যে, সাম্য ও মৈত্রীর অসম্ভব মন্ত্র আমাদের মূলমন্ত্রস্বরূপ গ্রহণ করি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমরা এখনও তত দূর ফরাসী-ভাবাপন্ন হই নাই। আমরা উচ্চ ইংরাজীশিক্ষা লাভ করিয়াছি। আমাদের শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে ইংরাজী ধরণের, এবং আমরা ইংরাজীধরণে সমাজের সংস্কার সাধিত করিতে চাহি। আমরা কাহাকে 'ভদ্রলোক' বলি, জানিতে চাও? আমরা নিম্নে উহার একটি উদাহরণ দিতেছি।

"প্রশ্ন। 'ভদ্র' কাহাকে বল?

উত্তর। 'তিনি বরাবর গাড়ী রাখিতেন'—(থার্টেলের বিচার)।"

ব্যাঙ্কে যাঁহার যত টাকা আছে, সমাজে তিনি তত মাননীয়। একশত পুরুষ ধরিয়া চরিত্রোৎকর্ষপ্রদর্শন বা পুণ্যার্জ্জন করিলেও তাহা কিছুই নহে।

আমাদিগের মধ্যে যাঁহারা অসাধারণ বিবেকশাসিত বুদ্ধির অধিকারী, এবং সাদরে ইংরাজের স্বাতন্ত্র্য ও স্বেচ্ছাধীনতার উপদেশগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা সমাজে ঠিক ইংরাজেরই মত আহার, বেশভূষা ও ব্যবহার করিয়া থাকেন, কেবল অনভ্যাসবশতঃ যাহা কিছু ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়। অবশ্য, বাঙ্গালীর উচ্চারণের বিশেষত্ব একবারে লোপ হয় না, এবং ইংরাজীর শব্দপ্রয়োগপ্রথা সময়ে সময়ে আয়ত্তের বাহিরে গিয়া পড়ে, এবং সর্ব্বোপরি কৃষ্ণবর্ণকে শ্বেতবর্ণে পরিণত করা রসায়ন ও ত্বক্‌শোধন বিদ্যার বর্ত্তমান ক্ষমতার বহির্ভূত; কিন্তু প্রধান উদ্দেশ্য বিষয়ে—অর্থাৎ, ঠিক ইংরাজের ন্যায় পরিচ্ছদ-পরিধান (ও আনুষঙ্গিকভাবে ইংরাজের বাড়ী সময়ে সময়ে খানায় নিমন্ত্রণলাভ, এবং রেলের কুলি ও ঠিকাগাড়ীর গাড়োয়ানদের নিকট সময়ে সময়ে সেলাম লাভ) এবং বাক্যে এবং অঙ্গভঙ্গী দ্বারা 'নিগার'দের প্রতি সর্ব্বদা ঘৃণা-প্রদর্শন বিষয়ে তাঁহাদের চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে সফল হইয়া থাকে। কে তাঁহাদের নিন্দা করিবে? বাঙ্গালীর দেশীয় পরিচ্ছদ যদি অধীনতার চিহ্নস্বরূপ বিবেচিত হয়, তবে যত শীঘ্র তাহা পরিত্যক্ত হয়, ততই ভাল।

আমাদের দ্বৈতবাদই বল, একেশ্বরবাদই বল, অগ্রসর বা অত্যগ্রসর ব্রাহ্ম-

ধর্ম্মই বল, আর কোমৎ-বাদই বল (যাহার নৈতিক উৎকর্ষের বিষয় সম্প্রতি একখানি কলিকাতার সংবাদপত্রের একাধিক সংখ্যায় নিপুণতার সহিত আলোচিত হইয়াছিল) এ সকল 'বাদ'ই মূলে আর কিছুই নহে, আমাদের হিন্দুধর্ম্মের বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টামাত্র। কোনও সুসভ্য মানব আহার এবং পান সম্বন্ধে অর্দ্ধসভ্য-মনুষ্য-নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে পারে না; কোনও সুসভ্য মানব অজ্ঞানান্ধ পিতামাতার কুসংস্কার-প্রণোদিত বহুব্যয়সাধ্য ক্রিয়াকলাপনির্ব্বাহের জন্য আপনার সাধারণ আরামের সামগ্রীগুলি পরিত্যাগ করিতে পারে না; কোনও সুসভ্য মানব এরূপ কোনও ব্যক্তিকে শ্রদ্ধার পাত্র বিবেচনা করিতে পারে না, যাহার শ্রদ্ধার দাবী কেবল সেকেলে ধরণের আত্ম-সংযমজনিত জীবনের বিশুদ্ধতা, এবং মিথ্যা ইতিহাস, মিথ্যা ভূগোল ও মিথ্যা বিজ্ঞানে পূর্ণ সংস্কৃত সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের উপর স্থাপিত; কোনও সুসভ্য মানব চিরবৈধব্যের নৈতিক শ্রেষ্ঠতায় বিশ্বাসস্থাপন করিতে পারে না। এইরূপ আরও কত বিরক্তিকর ব্যাপার আছে। কতকগুলি প্রয়োজনীয় বাক্য স্বীকার করিয়া লইলেই তর্কশাস্ত্রের বলে সকলকে একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে যে, হিন্দুধর্ম্মের বিনাশসাধন অবশ্যকর্ত্তব্য।

স্বীকার করিলাম। কিন্তু মানুষের আধ্যাত্মিক প্রকৃতি ও শূন্যতা-বিদ্বেষী (abhors a vacuum) নানা ধর্ম্মমতবাদের আলোচনায়, ব্যক্তি ও সমাজ—উভয়সম্বন্ধীয় হিন্দুনীতিশাস্ত্রের উপদেশাবলী প্রায় সমস্তই পরিত্যক্ত হইয়াছে, এবং উহার পালন অপেক্ষা লঙ্ঘনই অধিকতর সম্মান লাভ করিতেছে। উহার পরিবর্ত্তে আমাদের নূতন নীতিশাস্ত্র কোথায়? সেই শাস্ত্রের উপদেশ পালন করাইবার জন্য সাধারণ লোকমতই বা কোথায়? আমাদের মধ্যে কে এমন আছেন, যাঁহার চরিত্রের বিশুদ্ধতা, নম্রতা, পরার্থে আত্মবিস্মৃতি, রাজনীতি হইতে অসংশ্লিষ্ট যথার্থ দেশহিতৈষিতা, নিকৃষ্ট জীবে দয়া, জ্ঞান ও ধর্ম্মের জন্য জীবনোৎসর্গ মুহূর্ত্তের জন্য হিন্দুধর্ম্মের আশ্রয়ে লালিত ও পরিবর্দ্ধিত উচ্চশ্রেণীর সাধুদিগের চরিত্রের সহিত তুলনীয় হইতে পারে? বৃক্ষের ফল দেখিয়া বৃক্ষের বিচার হওয়া উচিত।

৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ।

প্রথম কুমারগুপ্তের রাজ্য-সময়ের একখানি তাম্রশাসন।

ধানাইদহ-লিপি।

'মানসী' পত্রিকার বিগত বঙ্গাব্দের আষাঢ়-সংখ্যায় প্রকাশিত 'গুপ্তযুগে বঙ্গদেশ' শীর্ষক প্রবন্ধের এক স্থলে লিখিতে বাধ্য হইয়াছিলাম যে, ধানাইদহ-লিপির যে পাঠ প্রত্নতত্ত্ব-পারদর্শী, প্রাচীন-লিপি-পাঠ-পারগ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ মহোদয় উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, তাহা সর্ব্বাংশে মূলানুগত হয় নাই;—এবং সম্পূর্ণভাবে নূতন করিয়া এই লিপিটি প্রবন্ধান্তরে সমালোচিত হইতে পারিবে। স্বাস্থ্যভঙ্গ প্রভৃতি নানা কারণে এতদিন সেই প্রতিশ্রুতি পালন করিয়া উঠিতে পারি নাই। সম্প্রতি বাঙ্গালার পুণ্ড্রবর্দ্ধনে আবিষ্কৃত গুপ্তযুগের নূতন পাঁচখানি তাম্র-শাসন বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির হস্তগত হইয়াছে, এবং সমিতির অনুগ্রহে সেগুলির পাঠোদ্ধার কার্য্যের ভার আমার উপরই সমর্পিত হইয়াছে। এই নবাবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে ধানাইদহ-লিপির বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়-কর্ত্তৃক উদ্ধৃত পাঠের পুনরালোচনার প্রয়োজন অনুভূত হওয়ায়, বর্ত্তমান প্রবন্ধের সত্বর সূত্রপাতের সম্ভাবনা সমুত্থিত হইয়াছে। নবাবিষ্কৃত প্রাচীন তাম্রশাসন পাঁচখানি যথাসময়ে যথাস্থানে প্রকাশিত হইবে। কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, ইতিমধ্যেই পরকীর্ত্তি-বিলোপ-লোলুপ আমাদের স্বদেশীয় কয়েক জন প্রত্নতত্ত্ববিদের কৃপায় কি প্রকারে এই নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসনগুলি তাঁহাদের হস্তগত হইতে পারে, তাহার চেষ্টা দেখা দিয়াছিল। কি প্রকারে প্রথম আবিষ্কারের ও প্রথম পাঠোদ্ধারের যশোমাল্য দ্বারা স্বীয় শীর্ষ শোভিত করিবেন, সে চিন্তায় তাঁহারা সুষুপ্তিবঞ্চিত হইয়া, লিপিপাঠ-পটুতা দ্বারা অপরের যশোভাজন হইবার যোগ্যতা আছে কি না, তদ্বিষয়ে নানারূপ অসঙ্গত কথোপকথনে ব্যস্ত হইয়া, দুঃখ অনুভব করিতেছিলেন। এই ত সে দিন আমাদের সমিতির নূতন প্রতিমা-গৃহের শিলা-বিন্যাস-উৎসবে উপস্থিত গণ্যমান্য বিদেশীয় মনীষিগণ প্রাচীন-ইতিহাস-সঙ্কলনের উপাদান-সংগ্রহ, তদুদ্ধার ও তদ্ব্যাখ্যার দুরূহতা লক্ষ্য করিয়া আমাদিগকে কত

উৎসাহ-বাক্যে উৎসাহান্বিত করিয়া গেলেন। স্বয়ং মহানুভব বঙ্গেশ্বর ও ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের অন্যতম প্রধান রাজপুরুষ শ্রীযুক্ত ডাক্তার স্পুনার মহোদয় যাহাতে নবাবিষ্কৃত অন্যান্য শিল্প-নিদর্শন ও এই পঞ্চ তাম্রশাসন আমাদের সমিতি-ভবনেই রক্ষিত থাকে, তাহার ব্যবস্থা করিবার পরামর্শ করিয়া গেলেন। কোনও অনুসন্ধান-সমিতির কোনও লিপি-পাঠক কোনও যুগের কোনও প্রাচীন তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধার করিতে সমর্থ হইবেন কি না, তদ্বিষয়ে যাঁহাদের সংশয় উপস্থিত হয়, তাঁহাদের অবগতির জন্য ইহা বলা যাইতে পারে যে, সাহিত্য-ক্ষেত্রে যে কোনও বিষয়ে যিনি যাহা প্রকাশিত করেন, তিনি তাহার সম্পূর্ণ দায়িত্বভার স্কন্ধে লইয়া এবং তাহা সকলের সমালোচনার বস্তুরূপেই প্রকাশিত করেন। যাঁহাদের অন্যের শক্তি সম্বন্ধে এইরূপ সদর্প সন্দেহ উপস্থিত হয়, তাঁহারা কেন যে নিজশক্তি না মাপিয়া বুঝিয়া অপরের উপর গোপনে কটাক্ষপাত করেন, তাহা বুঝা দুষ্কর। যাহা হউক, পাঠকগণ এই অবান্তর মুখবন্ধের জন্য লেখককে ক্ষমা করিবেন। এখন প্রস্তুত বিষয়ের অনুসরণ করা যাউক।

প্রায় দশ বৎসরের অধিক হইতে চলিল, পুণ্ড্রবর্দ্ধনের রাজসাহী জেলার নাটোর মহকুমার অন্তঃপাতী খলিসাডাঙ্গা নামক ক্ষুদ্র নদীর তীরবর্ত্তী ধানাইদহ নামক গ্রামে, প্রায় সার্দ্ধ-সহস্র বৎসর পূর্ব্বে প্রাচীন গুপ্তাক্ষরে উৎকীর্ণ, এই জীর্ণ তাম্রশাসন-খণ্ড আবিষ্কৃত হইয়াছিল। বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির ডিরেক্টার শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় স্থানীয় জমীদার শ্রীযুক্ত মৌলবী এরসাদ আলি খাঁ চৌধুরী মহাশয়ের নিকট হইতে তাম্রশাসন-খণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহা এখন সমিতির প্রতিমা-গৃহে সযত্নে রক্ষিত হইতেছে। শ্রদ্ধেয় মৈত্রেয় মহাশয়ের অনুমতিক্রমে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বাবু ইহার পাঠোদ্ধার করিয়া, তাহার পাঠ বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় ইংরেজি ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে এক ইংরেজি প্রবন্ধে, এবং বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় [১৬শ ভাগে] আর এক বাঙ্গালা প্রবন্ধে প্রকাশিত করেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তদীয় পাঠেরই আলোচনা করা হইবে, এবং আমাদের পাঠ পণ্ডিতগণের বিচারের জন্য উদ্ধৃত করা হইবে।

১৯০৬—৭ খৃষ্টাব্দে, কলিকাতার শিল্প-প্রদর্শনীতে এই শাসন-খণ্ড প্রদর্শিত হইবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিল। সেই সময়ে এই জীর্ণ শাসনের কতক জর্জ্জরিত অংশ খসিয়া পড়িয়া যায়। সেই অংশ ত্রুটিত হওয়ার পূর্ব্বে কুমার-

গুপ্তের নামের 'ম' ও 'র' অক্ষর-দ্বয় শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দৃষ্টিগোচরে আসিয়াছিল। গুপ্তাব্দের ত্রয়োদশাধিক এক শত বৎসরের উল্লেখ থাকায়, ইহা নির্ব্বিবাদে বলা যাইতে পারে যে, তাম্রশাসনখানি 'পরম দৈবত-পরমভট্টারক-মহারাজাধিরাজ [প্রথম] শ্রীকুমারগুপ্তের' রাজ্য-শাসন-সময়েই উৎকীর্ণ হইয়াছিল। বলা বাহুল্য যে, ১১৩ গুপ্তাব্দ খৃষ্টাব্দের ৪৩২—৪৩৩ সংবৎ। দামোদরপুরের নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন পাঁচখানির মধ্যে দুইখানি শাসন এই মহারাজাধিরাজের শাসনসময়ে সম্পাদিত হইয়াছিল।

ধানাইদহ লিপিটি সমগ্র পাওয়া যায় নাই। ইহার এক খণ্ডিত অংশ বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহাতে সর্ব্বসমেত সপ্তদশ পংক্তি লিখিত আছে। যে অংশ খসিয়া পড়িয়া লুপ্ত হইয়া গিয়াছে—তাহা সমগ্র তাম্রখণ্ডের ঈষদধিক এক-তৃতীয়াংশ ছিল বলিয়া অনুমিত হইতে পারে। লিপির ১৫—১৬ পংক্তিতে লিখিত ধর্ম্মানুশংসী শ্লোকত্রয়ের যে অংশ তাম্রলিপিতে এখনও বর্ত্তমান আছে, তাহা পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, প্রত্যেক পংক্তি হইতেই প্রায় ১৬—১৭টি অক্ষর খসিয়া পড়িয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান তাম্রখণ্ডেরও উপরের দক্ষিণ কোণ ও নীচের বাম কোণ হইতে কতক অংশ ত্রুটিত হইয়াছে। অধিগত অংশের অত্যধিক জীর্ণতার জন্য পাঠোদ্ধার ও ব্যাখ্যাকার্য্য যে অত্যন্ত কষ্টকর হইয়াছে, তাহাতে সংশয় না থাকিলেও, নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসনপঞ্চক ও ফরিদপুরের পূর্ব্বাবিষ্কৃত তাম্রশাসনচতুষ্কের সাহায্যে ধানাইদহ-লিপির অনেক তথ্য বুঝিয়া লওয়া যাইতে পারে।

লিপিটি ধর্ম্মানুশংসী শ্লোকাংশ ব্যতীত সংস্কৃত-গদ্যে লিখিত। ইহা কোনও রাজকীয় দানলিপি বা প্রশস্তি নহে। ইহা সে-কালের ভূমিবিক্রয়সম্বন্ধীয় একখানি দলীল। ব্রাহ্মণকে দান করিবার জন্যই ভূমি ক্রীত হইয়াছিল। ভারতবর্ষে এযাবৎ আবিষ্কৃত ভূমিবিক্রয়-সম্পর্কিত তাম্রশাসনাবলীর মধ্যে ইহাই সর্ব্বপ্রাচীন বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বাবুর মতে, এই লিপির বর্ণাক্ষর-বিন্যাস-[orthography] সম্বন্ধে বিচার বড়ই কঠিন কার্য্য। কিন্তু লিপির প্রাপ্তাংশ হইতে অক্ষরবিন্যাস-সম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত বিশেষত্ব কয়েকটি সহজেই লক্ষিত হইতে পারে।—

(ক) অনেক স্থলে অক্ষরের সহিত সংযোজিত 'আ'-কার চিহ্নটি অক্ষরের উপরিভাগে ব্যবহৃত না হইয়া, অক্ষরের নীচের বামকোণে অঙ্কুশাকারে প্রদত্ত

লক্ষিত হয়। যথা, খাসক (পং ৫), গ্রামাষ্ট (পং ৬), খাদাপার বা খাটাপার (পং ৭), গুণাগুণ (পং ১৩)।

(খ) অবগ্রহ-চিহ্ন ব্যবহৃত হয় নাই—যথা,—বিষয়েস্বুবৃত্ত (পং ৭)।

(গ) রেফ-সংযোগে—গ, ণ, ত, ম, য ও ব—এই কয়টি বর্ণের দ্বিত্ব সাধিত হইয়াছে, যথা,—বর্গগ্ (পং ৪), স্বর্গগ্ (পং ১৫), উৎকীর্ণ্ণ (পং ১৭), কীর্ত্তি (পং ৪) শর্ম্ম (পং ৩ ও পং ৫), ধর্ম্ম (পং ৪), মর্য্যাদা (পং ৭), পূর্ব্ব (পং ২ ও পং ১৬), সর্ব্ব (পং ৯)। কিন্তু এই যুগের অন্যান্য অনেক শাসনের ন্যায় এই শাসনে, রেফ-সংযোগে 'ষ'-এর দ্বিত্ব সম্পাদিত হয় নাই—যথা, বর্ষ (পং ১৫)।

(ঘ) স্বরবর্ণের মধ্যে 'আ'কার-চিহ্ন, 'ই'কার-চিহ্ন এবং 'উ'কার-চিহ্নের ব্যবহার প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে—যথা, আযুক্তক (পং ১১), ইহ (পং ৭), উৎকীর্ণ্ণং (পং ১৭)।

(ঙ) পদান্ত 'ম'কার পরবর্ত্তী 'প'-এর ও অন্তস্থ-'ব'র সহিত সংযুক্ত করা দৃষ্ট হয়—যথা, স্বদত্তাম্পর—(পং ১৪), পরদত্তাম্বা (পং ১৪)।

(চ) রফলা-সংযোগে 'ক'এর দ্বিত্ব সাধিত হইয়াছে, যথা—ক্ক্রমেন (ণ), (পং ৮)।

অতঃপর শ্রীযুক্ত রাখালদাস বাবুর পাঠ উদ্ধৃত করিয়া, আমাদের পাঠ উদ্ধৃত করা হইবে। তৎপর যথাসাধ্য অনুবাদ লিপিবদ্ধ করিয়া, ঐতিহাসিক কয়েকটি তথ্যের আলোচনা করা যাইবে।

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উদ্ধৃত পাঠ। *

১।...[শ্রীকুমার-গুপ্ত-রাজ্য-স] ম্বৎসর শত-ত্রয়োদশুত্ত [র][১]...

২।...[অস্যা] ন্=দিবসপূর্ব্বায়াং পরম-দৈবত পর [ম]...

৩।...ক্ষুদ্র [ক নিবাসিনঃ] ব্রাহ্মণ শিবশর্ম্ম নাগশর্ম্ম মহ...

৪।...[দে] বকীর্ত্তি ক্ষমবন্ত গোষ্ঠক বর্গপাল পিঙ্গল গু (?) ক্কু[২]ক কাল...

৫।..বীষ্য দেবশর্ম্ম বিষ্যভদ্র খুষক উপক গোপাল...

৬।...শীভদ্র স্থমপহরণ (?) ভ্যা—গ্রামাষ্ট কুলাধিকরণ...

---

* এই পাঠ ও পাঠসম্বন্ধীয় ১নং ও ২নং টীকাদ্বয় Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1909, পত্রিকার 460—461 পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত হইল।

১। দশোত্তর—পাঠ করিতে হইবে।

২। শব্দটি—'ক্র (?) ক্কুক' রূপেও পঠিত হইতে পারে।

৭।…চরণ-বিজ্ঞাপিত…মহাখুষাপারবিষয়ে নিবত্তমর্য্যাদাস্থিতি…

৮।…নীবী-ধর্ম্ম-ক্ষয় মালভ্য . দর্হথমাশাদা নম্নবক্ লেন (?) বা…

৯।…পলে (?) ত্যভিহিত …সর্ব্বলম্ব…করপ্রতি-প্রতিকুটুম্বিভিরবস্থাপ্যক…

১০।· পরিত্যক্তেন য বি……চ…দহ্কমিতি যতস্ত্যগতি প্রতিপাদ্য…

১১।…বরনালক সদ (?) বি…ছা…কৃত্য বস-লক (?) দত্ত ততঃ সুযুক্তক…

১২।…ভূ (?) কটকরুন্তেভ্য (?) ছান্দশ (?) ব্রাহ্মণ বরাহস্বামিনে দত্তং তদ্ব…

১৩।· ভূম্যাদান্ = ক্ষেপ (?) চ শুনু (?) গুণমনুচিন্ত্য শরীরকল্যা (?) নকস্থ চো…

১৪।…শ উক্তঞ্চ ভগবতা দ্বৈপায়নেন স্বদত্তাম্পরদত্তাম্বা…

১৫।…তৃভিঃ সহ পচ্যতে ষষ্টি (ং) বর্ষসহস্রাণি স্বর্গেগ মোদতি ভূমিদ [ঃ]…

১৬।…পূর্ব্বদত্তাং দ্বিজাতিভ্য [ঃ] যত্নাদ্রক্ষ যুধিষ্ঠির মহী…

১৭।…[ও] য়ম্ শ্রীভদ্রেন উৎকীর্ণ্ণং স্হেশ্বরদাসে [ন]…

অস্মদীয় পাঠ।

১।…ম্বৎসর[1]—শ [( ] ত ত্রয়োদশোত্ত[2]

২।·· [f][3] ন্দবস-পূর্ব্বায়াং পরম-দৈবত-পর[4]—

৩।…। কুটু [ম্বি]……ব্রাহ্মণ-শিবশর্ম্ম-নাগশর্ম্ম-মহ[5] —

৪।…বকীর্ত্তি-ক্ষেমদত্ত-গোষ্ঠক-বর্গপাল-পিঙ্গল-শুক্লক-কাল—

৫।…প (?)-বিষ্ণু [দেব] শর্ম্ম-বিষ্ণুভদ্র-খাসক-রামক-গোপাল-

৬।…স (?) স্থ (?) শ্রীভদ্র-সোমপাল-রামাস্থাঃ (?) গ্রামষ্টকুলাধিকরণঞ্চ

৭। বিষ্ণুণা[6] (?) বিজ্ঞাপিতা-ইহ থাদা (টা ?)-পারবিষয়েনুবৃত্ত-মর্য্যাদাস্থি [তি]—

১। "সম্বৎসর" পাঠ ছিল।

২। "ত্রয়োদশোত্তরে" পাঠ ছিল।

৩। "অস্থান্দিবস—" পাঠ ছিল।

৪। "পরম-ভট্টারক-মহারাজাধিরাজ—" পাঠ ছিল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

৫। "মহত্তর"—পাঠ ছিল বলিয়া বোধ হয়। পরবর্ত্তী নামগুলি মহত্তরগণেরই নাম হইতে পারে।

৬। যিনি বিজ্ঞাপন করিলেন—এই স্থানে তাঁহার নামবাচক শব্দের তৃতীয়ান্ত পদের উল্লেখ থাকার সম্ভব।

৮।...নীবীধর্ম্মক্ষয়েণ লভ্য [তে] [ত] দহ'থ মমাদ্যানেনৈব ক্রমেন (ণ) দা [তুং]—

৯।...সমেত্যা (?) ভিষ্টিতৈ (: ?) সর্ব্বমেব × জ্ঞা (?) কর-প্রতিবেশি (?) কুটুম্বিভিরবস্থাপ্য ক—

১০।... × রি × কন × যদিতো × ×[7] [ত] দবধুতমিতি যতস্তথেতি প্রতিপাদ্য।

১১। ...বকনলা[8] [ভ্যা] মপবিঞ্চ্য ক্ষেত্রকুল্যবাপমেকং দত্তং-ততঃ আযুক্তক—

১২।... × ভ্রা (?) তৃ-কটক-বাস্তব্য-ছন্দোগ-ব্রাহ্মণ-বরাহস্বামিনো[9] দত্তং তদ্ধ—

১৩।...ভূম্যা দা [নাক্ষে] পে চ গুণাগুণ মনুচিন্ত্য শরীর-ক(কা)ঞ্চনকস্ত চি—

১৪।...আ [উ]ক্তঞ্চ ভগবতা দ্বৈপায়নেন স্বদত্তাম্পরদত্তাম্বা —

১৫।...[ভিঃ] সহ পচ্যতে [॥ *] ষষ্টিং বর্ষ সহস্রানি (ণি) স্বর্গেগ্‌ মোদতি [ভূমিদঃ] [। *]

১৬।...[পূ] র্ব্বদত্তাং দ্বিজাতিভ্যো যত্নাদ্রক্ষ যুধিষ্ঠির [। *] মহীং [মহী-মতাঞ্ছ্রেষ্ঠ]

১৭।...য় [ং] স্থ (?) শ্রীভদ্রেন উৎকীর্ণ্নং স্থ (স্ত) ম্ভেশ্বরদাসে [ন]...

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বাবুর উদ্ধৃত পাঠে প্রতি পংক্তির উভয় দিকে [......] এইরূপ চিহ্নের ব্যবহার দেখিয়া বোধ হইতেছে যে, তিনি উভয় পার্শ্ব হইতেই লিপির লোপ হইয়াছে মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু তাম্রপট্টখণ্ডের বাম দিক হইতে লিপিলোপের কোনও অনুমান করা যায় না। সেই দিক, দক্ষিণদিকের ন্যায়, ভগ্নও নহে, ত্রুটিতও নহে। বাম ধারটি সরলভাবেই বর্ত্তমান আছে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, তাম্রখণ্ডের দক্ষিণদিক হইতে সমগ্র তাম্রশাসনের কিঞ্চিদধিক এক-তৃতীয়াংশ খসিয়া পড়িয়া গিয়া সেই স্থানের লিপি সহ লুপ্ত হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, রাখালদাস বাবুর পাঠের প্রতিপংক্তিতেই ভুলভ্রান্তি রহিয়া গিয়াছে। উদ্ধারকার্য্যে যথোচিত মনোনিবেশের অভাব ও সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তির অভাব এত অশুদ্ধির কারণ। তাহা না হইলে বলিতে হইবে, তিনি প্রাচীন অক্ষরের মধ্যে অনেকগুলিকে চিনিয়া লইতে পারেন নাই। তিনি তাঁহার ইংরেজী প্রবন্ধে এই লিপির অক্ষর-তত্ত্ব-সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন,

---

৭। "অবধুত" শব্দের 'ব'কারটি পংক্তির নীচে উৎকীর্ণ দেখা যায়।

৮। "অষ্টক-নবক-নলাভ্যাম্"—পাঠ ছিল বলিয়া বিবেচিত হয়।

৯। "তদ্ধর্ম্মমবেক্ষ্য"—ইত্যাদি রূপ পাঠ থাকিতে পারে।

তাহা যুক্তিযুক্ত নহে। তিনি অষ্টম পংক্তিতে যে অক্ষরকে 'লে' মনে করিয়াছেন, তাহা 'ল' নহে, তাহা 'ম'কারে 'এ'কার-যুক্ত যুক্তাক্ষর। নবম পংক্তিতে এইরূপ একটি যুক্তাক্ষর দৃষ্ট হয়। একাদশ পংক্তিতে "কুল্যবাপমেকং" স্থলে, ও সপ্তদশ পংক্তির "স্থ (স্ত)ম্ভেশ্বর দাসেন" স্থলেও আমরা 'ম'-কে সেই ভাবেই উৎকীর্ণ দেখিতে পাই। তাঁহার পাঠের প্রধান প্রধান কয়েকটি ভুল দেখাইয়া দেওয়া আবশ্যক। 'কুটুম্বি'কে [৩পং] তিনি 'ক্ষুদ্র' করিয়াছেন। 'ক্ষেমদত্ত'কে [৪পং] 'ক্ষমবস্তু' করিয়া অক্ষেমভাজন হইয়াছেন। 'বিষ্ণুভদ্রকে' [৫পং] 'বিষ্যভদ্র' পাঠ করিয়া 'বিষ্ণু'র প্রতি অভক্তি দেখাইয়াছেন। 'সোমপাল রামাদ্যা' স্থলে [৬পং] 'সুমপহরণ (?) ভ্যা'-পাঠ কৌতুকাবহ হইয়াছে।'ইহ'কে [৭নং] 'মহা' পাঠ করিয়া "থাদা (টা ?) পারবিষয়"কে 'মহাবিষয়' মনে করিবার কোনও কারণ ছিল না। আবার, এই পংক্তিতেই—বিষয়ে (তদ্দেশে) 'অনুবৃত্ত' অর্থাৎ প্রচলিত 'মর্য্যাদা'কে "নিবৃত্ত-মর্য্যাদা" পাঠ করিয়া লিপিপাঠের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারেন নাই। "অনেনৈব ক্রমেন (ণ) দাতুং" [৮পং] অংশকে "নমু বক্রলেন (?) বা" রূপে উদ্ধৃত করিয়া, 'লেন' শব্দের উপর বৃথা বক্তৃতা করিয়াছেন। "অবধৃতমিতি যতস্তথেতি" [১০পং] এই পাঠকে "দহ্বকমিতি যতস্ত্যজতি" এইরূপ পাঠ করিয়া, শুদ্ধপাঠের অবধারণ করিতে না পারিয়া, অশুদ্ধ পাঠের উপর 'ত্যজ্' ধাতুর প্রয়োগ করিতে পারেন নাই। "[অষ্টক-ন] বক-নলাভ্যামপবিঞ্ছ্য ক্ষেত্রকুল্য বাপমেকং দত্তম্" [১১পং] লিপির এই প্রধান অংশের পাঠ স্থির করিতে না পারিয়া, রাখালদাস বাবু সে স্থলে "বরনালক সদ (?) বি······হ······ক্বত্য বসলক দত্ত" এইরূপ পাঠ করিয়া, লিপিতাৎপর্য্য-গ্রহণে অসমর্থ হইয়াছেন। রাজপদধারী 'আযুক্তক'কে [১১পং] 'সুযুক্তক' মনে করিতে গিয়া, গুপ্তযুগের 'আ'কারটি কিরূপ, তিনি তাহা বিস্মৃত হইয়াছেন। "—কটকবাস্তব্য-ছন্দোগ-ব্রাহ্মণ"কে [১২পং] "কটকবস্তেভ্য (?) ছান্দশ (?) ব্রাহ্মণ" রূপে পাঠ করিয়া রাখালদাস বাবু ব্রাহ্মণের বাসস্থানের ও বিদ্যাবত্তার পরিচয়প্রাপ্তির পথ রুদ্ধ করিয়াছেন। ভূমির দানে ও আক্ষেপে কি 'গুণাগুণ' লব্ধ হয়, তদ্বিষয়ে এত পড়িয়াও তিনি "গুণাগুণমনুচিন্ত্য" [১৩পং] স্থলে "গুণু (?) গুণ-মনুচিন্ত্য" পাঠ করিতে যাইয়া, মূলানুগত পাঠের অনুচিন্তন করেন নাই। 'স্থ(স্ত)ম্ভেশ্বর দাস'কে [১৭ পং] 'স্থক্লেশ্বরদাস' মনে করিয়া, লিপিলেখকের যথেষ্ট লাঞ্ছনা করিয়াছেন। আর আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাঠভেদ পাঠকবর্গ উভয়ের পাঠের পর্য্যালোচনা করিলেই বুঝিতে

লিপিটি খণ্ডিত অবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া গেলেও, তাহার অংশানুবাদ যে একবারে অসম্ভব, রাখালদাস বাবুর মত বিশেষজ্ঞের তাহা বলা সুসঙ্গত হয় নাই। না বলিয়াই বা উপায় কি? পাঠ উদ্ধৃত না হইলে অনুবাদ বা ব্যাখ্যা হইবে কিরূপে? আমরা নিম্নে অধিগতাংশের যথাসাধ্য একটি অনুবাদ দিবার চেষ্টা করিব। এই প্রকার ভূমিবিক্রয়সম্বন্ধীয় দলীলসমূহের লিপিকে ছয়টি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। লিপির প্রথম ভাগে কোন্ রাজার শাসনসময়ে কে কাহার নিকট ভূমিক্রয়ের প্রার্থনা বিজ্ঞাপিত করেন, তদ্বিষয়ক বিজ্ঞাপন। দ্বিতীয় ভাগে বিষয়বিশেষে [দেশ-বিশেষে] ভূমিবিক্রয়ে ভূমির প্রচলিত মূল্যের নির্দ্দেশ, এবং সেই মর্য্যাদা অনুসারে ভূমিবিক্রয়ের উপযোগিতা-প্রদর্শন। তৃতীয় ভাগে ভূমির সত্ত্বাবধারণকারিগণ কর্ত্তৃক পরীক্ষাপূর্ব্বক মন্তব্য-প্রকাশ ও বিক্রয়ের অনুমোদন। চতুর্থ ভাগে তাঁহাদের অবধারণক্রমে প্রচলিত নলাদি দ্বারা ভূমি ছেদ করিয়া বিক্রয়ার্থ প্রদান। পঞ্চমভাগে যিনি যে ব্রাহ্মণকে দান করিবার উদ্দেশ্যে ভূমি ক্রয় করেন, সেই ব্রাহ্মণকে তাঁহার দান। সর্ব্বশেষে, ষষ্ঠ ভাগে প্রদত্ত ভূমির অনাক্ষেপসহকারে প্রতিপালনের জন্য ধর্ম্মানুশংসী শ্লোকাদির উল্লেখ ও লিপি-সমাপ্তি। ধানাইদহ-লিপির অধিগত অংশ হইতেও আমরা এইরূপ বিষয়-বিভাগসূচক ভাগের পরিচয় প্রাপ্ত হইতে পারি। সপ্তম পংক্তির "বিজ্ঞাপিতাঃ" শব্দ পর্য্যন্ত প্রথমভাগ। অষ্টম পংক্তির "দাতুং" শব্দ পর্য্যন্ত দ্বিতীয় ভাগ। দশম পংক্তির "অবধৃতমিত্তি যতঃ" পর্য্যন্ত তৃতীয় ভাগ। একাদশ পংক্তির "ক্ষেত্রকুল্য বাপমেকং দত্তম্" পর্য্যন্ত চতুর্থ ভাগ। দ্বাদশ পংক্তির "বরাহস্বামিনো দত্তং" পর্য্যন্ত পঞ্চম ভাগ। তৎপর লিপিশেষ পর্য্যন্ত ষষ্ঠ ভাগ।

অনুবাদ।

ত্রয়োদশাধিক এক শত সংবৎসরে...... [অমুক] দিবসে। পরম-দৈবত পরম-[ভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীকুমারগুপ্তের রাজ্যশাসনসময়ে]...... [অমুক ব্যক্তি কর্ত্তৃক] গ্রামের কুটুম্বি [গৃহস্থ]......ব্রাহ্মণ শিবশর্ম্মা নাগশর্ম্মা ......এবং দে(?)ব কীর্ত্তি, ক্ষেমদত্ত, গোষ্ঠক, বর্গপাল, পিঙ্গল, শুঙ্কুক, কাল...... বিষ্ণুদেবশর্ম্মা, বিষ্ণুভদ্র, খাসক, রামক, গোপাল......স্থ(?)শ্রীভদ্র, সোমপাল, রাম প্রভৃতি মহত্তরগণ, ও গ্রামের অষ্টকুলাধিকরণ বিজ্ঞাপিত হইলেন—"এই খাদা (খাটা ?) পার বিষয়ে প্রচলিত মর্য্যাদা-স্থিতি [অনুসারে]......নীবীধর্ম্ম-ক্ষয়পূর্ব্বক [এইরূপ মূল্যে] ভূমি প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব অদ্য সেই ক্রম

অনুসারে আমার [নিকট হইতে মূল্য লইয়া এক কুল্যবাপ ভূমি প্রদত্ত হউক]। যে হেতু অভিহিত সর্ব্ব……প্রতিবেশী (?) কুটুম্বিগণ-কর্ত্তৃক অবস্থাপনপূর্ব্বক… [ভূমি প্রদত্ত হইতে পারে বলিয়া] অবধৃত হইয়াছে—সুতরাং সেই অবধারণ অনুসারে 'তাহাই হউক' বলিয়া প্রতিপাদনপূর্ব্বক অষ্টক-নবক নল দ্বারা ভূমি বিভাগ করিয়া [প্রার্থীকে] এককুল্যবাপ-পরিমিত ভূমি প্রদত্ত হইল। তৎপর আয়ুক্তক [কর্ম্মচারী]……কটক-নিবাসী ছন্দোগ [সামবেদাধ্যায়ী] ব্রাহ্মণ বরাহস্বামীকে প্রদান করিলেন। অতএব [ধর্ম্মের অপেক্ষা করিয়া] ভূমির দান ও আক্ষেপ করিলে কি গুণ-দোষ উপস্থিত হয়, তাহার অনুচিন্তন করিয়া, এবং শরীর ও সুবর্ণের [অস্থিরতা আলোচনা করিয়া প্রদত্ত ভূমি রক্ষিত হউক]। ভগবান দ্বৈপায়নও এই সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"ভূমি স্বদত্ত হউক, আর পরদত্তই হউক-[যিনিই ইহা হরণ করিবেন, তিনিই পিতৃগণ সহ বিষ্ঠায় কৃমিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া] পচিতে থাকিবেন॥ ভূমিদানকারী ষষ্টি সহস্র বৎসর স্বর্গে সুখভোগ করেন, এবং [আক্ষেপকারী ও আক্ষেপের অনুমোদনকারী তত বৎসর পর্য্যন্ত নরকে বাস করেন]॥ হে যুধিষ্ঠির! ব্রাহ্মণগণকে পূর্ব্বে যে মহী প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা যত্নপূর্ব্বক রক্ষা কর। যেহেতু, হে মহীমানদিগের শ্রেষ্ঠ, [দান অপেক্ষা দানের অনুপালন অধিক শ্রেয়োদায়ক। স্থ (?)শ্রীভদ্র কর্ত্তৃক [লিখিত বা] উৎকীর্ণ। সুস্তেশ্বর দাস কর্ত্তৃক উৎকীর্ণ [বা লিখিত]।

তাম্রশাসন-লিপির মর্ম্ম হইতে অবগত হওয়া যাইতেছে যে, কোনও [অজ্ঞাত-নামা] ব্যক্তি বিষয়ের বা গ্রামের গৃহস্থগণকে, মহত্তরগণকে ও অষ্টকুলাধিকরণ-সংজ্ঞক রাজকর্ম্মচারীকে সম্বোধনপূর্ব্বক বিজ্ঞাপন করেন যে, তিনি খাদাপার বিষয়ে [বা খাটাপার বিষয়ে] প্রচলিত বিক্রয়মর্য্যাদা-অনুসারে মূল্য দিয়া এক কুল্যবাপ-পরিমিত ভূমি ক্রয় করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। সেই ভূমি নীবীধর্ম্মের ক্ষয় করিয়া ক্রীত হইবে। তৎপর এই বিক্রয় অবধারিত হইলে তিনি [ক্রেতা সম্ভবতঃ এক জন 'আয়ুক্তক' বা রাজকর্ম্মচারী ছিলেন] এক কুল্যবাপ ভূমি মূল্য-বিনিময়ে প্রাপ্ত হইলেন। এই ক্রেতা আবার কোনও অজ্ঞাতনামা, কটকে [রাজধানীতে বা সেনানিবাসে] নিবাসকারী বরাহস্বামী নামক ছন্দোগ [সাম-বেদাধ্যায়ী] ব্রাহ্মণকে প্রদান করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বাবু তাঁহার পূর্ব্বোল্লিখিত ইংরেজী প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন যে, তাম্রশাসনের তৃতীয় পংক্তিতে উল্লিখিত ব্রাহ্মণ শিবশর্ম্মা ও নাগশর্ম্মা 'ক্ষুদ্রক' নামক কোনও স্থানের অধিবাসী ছিলেন। কিন্তু তাম্রশাসনে তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত

হওয়া গেল না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বিষয়টির নাম "মহাখুসপার" নহে। 'ইহ' [=অস্মিন্] শব্দের পর 'খাদাপার' বা 'খাটাপার' বলিয়া বিষয়টির নাম উৎকীর্ণ দেখা যায়। বোধ করি, এই বিষয়টি পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তিরই অন্তঃপাতী অন্যতম বিষয়। তাম্রশাসনখানি খণ্ডিত অবস্থায় পাওয়া যাওয়াতেই ভুক্তির নাম ও এক কুল্যবাপ ভূমির প্রচলিত মূল্য সম্বন্ধে কিছু জানা গেল না। কুমারগুপ্তাদির নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসনে পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির অন্তঃপাতী কোটিবর্ষ বিষয়ের নামোল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে; এবং ধর্ম্মপালদেবের [খালিমপুরে আবিষ্কৃত] তাম্রশাসনে পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির অন্তঃপাতী মহান্তাপ্রকাশ ও স্থালীকট নামক দুইটি বিষয়ান্তরের উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। পুণ্ড্রবর্দ্ধনের এই সকল বিষয়ে প্রচলিত বিক্রয়মর্য্যাদা ও পূর্ব্ববঙ্গের বিষয়াদিতে প্রচলিত বিক্রয়মর্য্যাদা একরূপ ছিল না। পুণ্ড্রবর্দ্ধনে তিন দীনার মুদ্রায় এক কুল্যবাপ খিল ভূমি বিক্রীত হইত। পূর্ব্ববঙ্গে আবিষ্কৃত প্রাচীন তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তথায় চারি দীনার মুদ্রায় এক কুল্যবাপ ভূমি বিক্রীত হইত। নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসনের প্রকাশসময়ে এই সমস্ত বিষয় বিশদভাবে বলা যাইবে।

আলোচ্য তাম্রশাসনখণ্ডের ষষ্ঠ পংক্তিতে উল্লিখিত "গ্রামাষ্টকুলাধিকরণ" সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। শ্রীযুত রাখালদাস বাবু এই সংজ্ঞাবাচক শব্দটি সম্বন্ধে তাঁহার ইংরেজী প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন—"A local officer (Kulādhikarana) who exercised authority over eight villages, is mentioned in l. 6." নবাবিষ্কৃত একখানি শাসনে আমরা মহত্তর, গ্রামিক [গ্রামপতি] প্রভৃতির নামের সহিত "অষ্টকুলাধিকরণ" সংজ্ঞক পদেরও উল্লেখ পাইয়াছি। কিন্তু এই পদধারী ব্যক্তিকে অষ্টগ্রামের তত্ত্বাবধান করিতে হইত, এইরূপ অর্থ অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। তিনি "গ্রামাষ্টের [আট গ্রামের] কুলাধিকরণ [কর্ম্মচারী]" ছিলেন না; বরং তিনি গ্রামের [গ্রাম সম্বন্ধে "অষ্ট কুলের অধিকরণ" ছিলেন। মনুসংহিতার রাজধর্ম্মসম্বন্ধীয় সপ্তম অধ্যায়ের ১১৯ শ্লোকে আমরা সংজ্ঞাবাচক 'কুল' শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাই। যথা—

"দশী কুলং তু ভুঞ্জীত বিংশী পঞ্চ কুলানি চ।
গ্রামং গ্রামশতাধ্যক্ষঃ সহস্রাধিপতিঃ পুরম্॥"

দশ গ্রামের অধিপতি স্ববৃত্তির জন্য এক "কুল" ভোগ করিবেন, ইত্যাদি। কুল্লূকভট্ট টীকাতে কুল শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—"'ষড় গবং মধ্যমং হলম্' ইতি তথাবিধহলদ্বয়েন যাবতী ভূমির্বাহ্যতে তৎ কুলমিতি বদন্তি"—

অর্থাৎ, ছয়টি গরুতে একটি মধ্যম হল হয়; এইরূপ হলদ্বয় দ্বারা যে পরিমিত ভূমি কর্ষিত হয়, তাহাই কুল-সংজ্ঞায় পরিচিত। বিংশতি গ্রামের অধিপতি যেমন নিজের জন্য পাঁচ-কুল-পরিমিত ভূমি ভোগ করিতে পারিতেন, যে অধিকরণকে [কর্ম্মচারীকে] অষ্ট-কুলের তত্ত্বাবধানপূর্ব্বক ভোগ করিতে হইত, তিনিই বোধ হয়, "অষ্টকুলাধিকরণ"-সংজ্ঞক রাজপক্ষীয় কর্ম্মচারিবিশেষ ছিলেন। ধানাইদহ-লিপির "গ্রামাষ্টকুলাধিকরণ" শব্দের 'অষ্ট' শব্দটি 'গ্রাম' শব্দের সঙ্গে অন্বিত না হইয়া, 'কুল' শব্দের সঙ্গে অন্বিত হইবে।

'ছন্দোগ' ব্রাহ্মণকে 'ছান্দশ' ব্রাহ্মণ পাঠ করিয়া শ্রীযুক্ত রাখালদাস বাবু দানপ্রতিগ্রহীতা বরাহস্বামীর বেদজ্ঞান সম্বন্ধে বিশেষভাবে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রাদ্ধে কোন্ কোন্ ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইতে হয়, মনুসংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ের ১৪৫ শ্লোকে তাহার উল্লেখকালে লিখিত হইয়াছে যে,—

"যত্নেন ভোজয়েচ্ছ্রাদ্ধে বহ্বৃচং বেদপারগম্।
শাখান্তগমথাধ্বর্য্যুং ছন্দোগং তু সমাপ্তিকম্॥"

এই শ্লোকেও 'ছন্দোগ' শব্দের প্রয়োগ পাওয়া যাইতেছে।

ভূম্যাদিদানবিষয়ে "নীবীধর্ম্ম" ও "নীবীধর্ম্মক্ষয়" সম্বন্ধে দুই একটি কথা লিখিয়াই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। 'নীবী' শব্দের আভিধানিক পর্য্যায়ে আরও দুইটি শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা—"নীবী পরিপণো মূলধনম্" ইত্যমরঃ। টীকাতে দেখা যায় যে—"ক্রয়বিক্রয়াদি-ব্যবহারে যৎ মূলধনং তস্য ত্রীণি এতানি"। অর্থাৎ, এই তিনটি শব্দ ক্রয় বিক্রয় প্রভৃতি ব্যবহারে যাহা মূলধন—তদর্থে প্রযুক্ত হয়। "বণিজাং মূলধনে" ইতি মুকুটঃ। মুকুটের মতে, ব্যবসায়ে বণিক্‌গণের যাহা মূলধন, সেই অর্থেও 'নীবী' শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

প্রথমকুমারগুপ্ত-নন্দন স্কন্দগুপ্তের রাজ্য-সময়ের একটি পাষাণ-স্তম্ভ-লিপিতে (১০) "অক্ষয়-নীবী"রূপে একটি গ্রামক্ষেত্র প্রদত্ত হইবার কথা প্রাপ্ত হওয়া যায়; এবং ১৩১ গুপ্তাব্দ-সংবলিত সাঁচিতে, আবিষ্কৃত, একখানি পাষাণ-লিপিতেও (১১) "অক্ষয়-নীবী"-রূপে দ্বাদশ দীনার মুদ্রার দানের বিষয় উল্লিখিত দেখা যায়। যে ভূমি বা যে ধন "অক্ষয়নীবী"রূপে প্রদত্ত হয়, তাহার সম্বন্ধে এই বুঝিতে হইবে যে, প্রদত্ত মূলদ্রব্যটি [ভূমি বা ধন] প্রতিগ্রহীতা নষ্ট করিতে পারিবেন না; তাহার 'বৃদ্ধি' বা 'আয়' হইতে বৃত্তি নির্ব্বাহিত করিতে হইবে। ভূমিসম্বন্ধে

(১০) Fleet C. I. I. No 12.
(১১) Fleet C. I. I. No 62.

প্রতিগ্রহকারী প্রদত্ত ভূমির আয়প্রত্যায়েরই যথেচ্ছ ভোগ করিবেন মাত্র, কিন্তু মূল ভূমিটির নীবীধর্ম্মের ক্ষয় করিতে পারিবেন না। যে স্থলে [যথা, আলোচ্য তাম্রশাসনে] নীবীধর্ম্মের ক্ষয়সহকারে ভূম্যাদি ক্রীত বা বিক্রীত হইতে পারে, তথায় বুঝিতে হইবে যে, দাতা ভূমির নীবীধর্ম্মের ক্ষয় করিয়া প্রদান করিয়াছেন, এবং প্রতিগ্রহীতা তাহার যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারিবেন ; ইচ্ছা করিলে তিনি ভূমিটি হস্তান্তরিত বা তাহা বিক্রয় করিতে পারেন।

শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক।

স্ত্রী-হট্ট।

পুরাকালে ভারতবর্ষে স্ত্রীস্বাধীনতার বিস্তৃতি স্থানে স্থানে বিলক্ষণভাবে ঘটিয়াছিল, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। মণিপুরে স্ত্রীসেনার সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ তাহার একটি দৃষ্টান্ত।* সম্প্রতি চীনদেশীয় একখানি পুরাতন গ্রন্থের অনুবাদ হইয়াছে। * তাহাতে দেখা যায় যে, ঐতিহাসিক যুগেও, এমন কি, মোগল পাঠানদিগের রাজত্বকালে, পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের বিস্তীর্ণ রাজ্যগুলির মধ্যে স্ত্রীস্বাধীনতার সম্যক বিকাশ হইয়াছিল। গ্রন্থখানির বিশেষত্ব এই যে, ইহা সরল ভাষায় রচিত, এবং কোনও স্থানই অতিরঞ্জিত নহে।

যে সময়ের ইতিহাস গ্রন্থে বর্ণিত, তখন বঙ্গদেশে গণেশ নামক এক জন স্বাধীন রাজা ছিলেন। রাজা গণেশের অধিকার যত দূর বিস্তৃত ছিল, তাহার সীমা অতিক্রম করিলে, স্ত্রীহট্ট নামক একটি রমণীয় দেশে উপস্থিত হওয়া যাইত। পরিব্রাজক হুংচাং সেই দেশের বর্ণনা তিন অধ্যায়ে সমাপ্ত করিয়াছেন। তাহার সারাংশ সংগ্রহ করিয়া এই প্রবন্ধ।

হুংচাং বলেন যে, স্ত্রীহট্ট 'যাদু'র স্থান। আধুনিক শ্রীহট্টের সহিত স্ত্রীহট্টের কোনও সম্বন্ধ আছে কি না, তাহা ঠিক নির্ণয় করা যায় না। কারণ, অনেকাংশে আসামের সহিত বর্ণিত দেশের কোনও সাদৃশ্য নাই। বরং মণিপুরের সহিত কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। যখনকার কথা, তখনও চব্বিশ-পরগণা, বর্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতির অনেকাংশ বোধ হয় আবাদই হয় নাই। এমন কি, বোধ হয়,

---

* পরিব্রাজক হুংচাঙ্গের বঙ্গদেশ আসাম ভ্রমণবৃত্তান্ত ; ইংরাজী অনুবাদ, লায়ার এণ্ড কোং ; ১৯১৬। মূল্য ২৲।

স্ত্রীহট্ট হইতে পরে এক জাতি আসিয়া বঙ্গদেশের দক্ষিণাংশে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিল। তাহারাই বাঙ্গালীর পূর্ব্বপুরুষ কি না, তাহাও জানিবার কোনও উপায় নাই।

যাহা হউক, স্ত্রীহট্ট নামক দেশের বর্ণনা অদ্ভুত বলিয়াই উল্লেখযোগ্য। সে দেশে তখন রমণীগণ সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন ছিলেন। পুরুষগণ সেই স্বাধীনতা সম্যক্‌ভাবে রক্ষা করিয়া দেশের শ্রীবৃদ্ধি করিতেন।

দেশের রাজা এক জন পুরুষ। রাজার নাম কামদেব। রাজা কামদেব অতিশয় সুপুরুষ, ধর্ম্মপরায়ণ, এবং বৃদ্ধ। তাঁহার চক্ষু অতিশয় বৃহৎ; এমন কি, সাত আট ক্রোশের মধ্যে যত পদার্থ, তাহা চক্ষুর নিমেষেই দেখিতে পাইতেন। রাজা অত্যন্ত মৌনী, এবং নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে রাণীর সহিতও বাক্যালাপ করিতেন না। রাণীই রাজমন্ত্রী, এবং রাজসভার পারিষদবর্গ সকলেই স্ত্রীলোক। হুংচাং বলেন যে, কোনও মন্ত্রণা আরম্ভ হইলে, প্রথমতঃ মন্ত্রী রাজার চক্ষু পট্টবস্ত্রে বন্ধন করিয়া দিতেন, এবং মন্ত্রণা স্থির হইলে রাজার কর্ণে তাহা সঞ্চারিত করা হইত। রাজা তাহা বিচার করিয়া হয় ত বলিতেন,—হুং (অর্থাৎ আমার অনুমোদিত); কিংবা চাং (মৌন) হইয়া বসিয়া থাকিতেন। তখন মৌনং সম্মতি-লক্ষণং বলিয়া তাহা ধর্ত্তব্য হইত।

রাজধানী খুব ছোট একখানি গ্রাম। তাহার চতুষ্পার্শ্বে নরকঙ্কালময় প্রাচীর। এ কঙ্কালসমষ্টি রাজবংশীয় পুরুষদের। স্ত্রীদিগের দাহপ্রথা প্রচলিত ছিল, কিন্তু পুরুষদিগের কঙ্কাল রক্ষা করিয়া প্রাচীর নির্ম্মাণ করা একটি পুরাতন প্রথা ছিল। কথিত, আছে যে, সেই রাজবংশের আদিপুরুষগণ স্ত্রীদিগকে অবরুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়া কস্মিনকালে প্রাচীর ভাবে ধনুর্ব্বাণহস্তে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। কিন্তু হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হইয়া তাঁহারা কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিলেন, প্রাণবায়ু এবং প্রাচীরের অভ্যন্তরস্থা স্ত্রীবর্গ উভয়েই নিষ্ক্রান্ত হইয়া পড়িল। সেই অবধি কোনও রাজপুরুষ মানবলীলা সংবরণ করিলে প্রাচীরে তাঁহার কঙ্কাল সংলগ্ন করিয়া দেওয়া হইত, এবং নাসিকাগহ্বরের উর্দ্ধদেশে ও কপালের মধ্যদেশে তাঁহার নাম ও রাজত্বকাল অঙ্কিত হইত। হুংচাং তাহা লক্ষ্য করিয়া বলেন যে, কঙ্কালের সংখ্যা দেখিয়া বোধ হয়, সেই বংশ অতিশয় প্রাচীন, এমন কি, আর্য্যদিগের ভারতবর্ষে প্রবেশের পূর্ব্বে সেই দেশের রাজগণ দিগ্বিজয় করিতেন, অন্ততঃ স্ত্রীলোকেরা ত নিশ্চয় করিত। হুংচাং আরও বলেন যে, পূর্ব্বকালের কঙ্কাল দেখিয়া বোধ হয়, তৎকালীন মানবদেহ অতিশয় বৃহৎ ছিল,

পরে ক্রমে ক্ষুদ্রাকার হইয়া পড়িয়াছিল (কিংবা বিজ্ঞানের মতে তাহারা অতিশয় বৃহৎকলেবরসম্পন্ন মর্কট ছিল। প্রমাণাভাবে কিছু বলা যায় না। স্ত্রীস্বাধীনতা মর্কটের মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়)।

রাজধানীর মধ্যে রাজবাটী ব্যতীত অন্য কোনও বাটী নির্ম্মিত হয় নাই। প্রাচীর হইতে দ্বাদশটী পথ সর্পাকারে দেশের নানা স্থানে নানা দিকে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। রাজধানী দুই ভাগে বিভক্ত। এক দিকে রাজবংশীয় পুরুষগণের বাসস্থান; অপর দিকে স্ত্রীলোকের বাসস্থান। উভয়ের মধ্যে একটি স্রোতস্বিনী প্রবাহিতা। তাহার উপরে সুন্দর সেতু সিংহদ্বার পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

দেশ সম্পূর্ণ স্বাধীন। যতটুকু রাজপরিবারের ভরণপোষণের নিমিত্ত প্রয়োজনীয়, প্রজাগণ কেহই তাহার অধিক কর দিত না। রাজ্যসংক্রান্ত যত আয়ব্যয় স্ত্রীসভাতন্ত্রেই নির্দ্দিষ্ট হইত। টাকা লইয়া কিংবা স্বর্ণরৌপ্যাদি লইয়া কারবার কেবল বাণিজ্যেই পরিচ্ছিন্ন ছিল। সঞ্চিত সম্পত্তির মধ্যে শস্যের ভাগই অধিক। আবকারী বিভাগে কোনও আয় ছিল না।

দেশটাই স্ত্রীলোক লইয়া। স্ত্রীলোকদিগের ভূমিতে স্বত্ব। স্ত্রী প্রজাই ভূম্যধিকারিণী। পুরুষ তাহাদিগের অধীনস্থ শ্রমজীবিমাত্র। ভূম্যধিকারিণী প্রাতে ক্ষেত্রের দিকে যাইতেন; পুরুষগণ লাঙ্গল কাঁধে করিয়া ও বলদ হাঁকাইয়া তাঁহার অনুসরণ করিত। ক্ষেত্রকর্ষণ শেষ হইলে ভূম্যধিকারিণী তাঁহার অঞ্চলস্থ মুড়ি ও মুড়কি প্রভৃতি সকলকে বণ্টন করিয়া দিতেন। তাহাতে কখনও দ্বন্দ্ব কলহ প্রভৃতি হইত না।

ধর্ম্মাধিকরণে স্ত্রী বিচারার্থ পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া বেদীর উপর বসিয়া থাকিতেন। কোনও ফৌজদারী মোকদ্দমা হইলে প্রথমে আসামীকে নির্দ্দোষ অনুমান করিয়া স্ত্রীবেশে (অবগুণ্ঠন দিয়া) কাঠগড়ায় দাঁড়াইতে হইত। অপরাধ সপ্রমাণ হইলে তাহাকে অবগুণ্ঠন মুক্ত করিয়া পুরুষবেশে দাঁড়াইতে হইত। বলা বাহুল্য যে, স্ত্রীলোকদিগকে আসামী করিয়া চালান দেওয়া আইনবিরুদ্ধ ছিল। দেওয়ানী মোকদ্দমা হইত না; কারণ, পুরুষের কোনও স্বত্ব না থাকাতে বিবাদের মীমাংসার দরকার হইত না।

কারাগারের অধ্যক্ষ (জেলার) স্ত্রীলোক। দণ্ডিত অপরাধিগণ কারাগারে বন্দী হইলে প্রাতঃকালে উঠিয়া তাহাদিগকে প্রথমে ঈশ্বর-বন্দনা করিতে হইত। ঈশ্বরকে পিতৃসম্বোধন করা বারণ ছিল; সুতরাং তাঁহাকে সকলে মাতৃভাবে বন্দনা করিয়া তিন ঘণ্টা চণ্ডীপাঠ করিত। ধর্ম্মে আস্থা না থাকাতে ইহা তাহাদের পক্ষে

যমযন্ত্রণার ন্যায় কষ্টকর হইত, এবং অল্প দিনেই তাহারা শীর্ণ হইয়া পড়িত। তখন তাহাদিগকে হঠযোগ অভ্যাস করিতে হইত। ক্রমে জিহ্বা দীর্ঘ হইয়া খেচরী মুদ্রা অবলম্বন করিলে, তাহারা অল্পাহারেই মুক্তিলাভ করিত। হুংচাং বলেন যে, একাধারে ধর্ম্মরক্ষা ও দণ্ডবিধান, কেবল এই দেশেই তিনি দেখিয়াছিলেন। কারাগারের প্রহরিবর্গ সকলেই স্ত্রীলোক, এবং বন্দিগণ বিধানোচিত যোগাভ্যাস না করিলে, তাহারা কঠিন শাস্তি দিয়া তাহাদিগকে সৎপথে লইয়া যাইত।

সে দেশের সেনা ও সেনাধ্যক্ষ সকলেই স্ত্রীলোক। সকলেই অশ্বারোহণ-পটু, বর্ম্মাবৃতা, এবং সকলেই ধনুর্ব্বাণ এবং অসি প্রভৃতি লইয়া মুহুর্মুহু রাজ্যরক্ষা করিত।

বাণিজ্যও সম্পূর্ণ স্ত্রীলোকের হস্তে। পুরুষগণ নৌকার দাঁড় টানিত, এবং বস্ত্রের মোট বহিত।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, শ্রমজীবী সকলেই পুরুষ। শিল্পকার্য্যও তাহাদিগের হস্তে ন্যস্ত। গৃহে বসিয়া শিল্পকার্য্য, মিষ্টান্ন প্রস্তুত, চিনি, ঘৃত ও তৈল প্রস্তুত, বস্ত্ররঞ্জন, জুতা তৈয়ারী, মৎস্য ধরা, ঢেঁকিতে পাড় দেওয়া প্রভৃতি যত রকম পরিশ্রমের মূল্য আছে, তাহার ভার পুরুষদিগের উপর। পুরুষগণ রন্ধনেও পটু। তাহারা পাল্কী প্রভৃতি অতিশয় দক্ষতা সহ বহন করিত। বলা বাহুল্য, স্ত্রীলোক ব্যতীত অন্য কাহারও যানে আরোহণ করিবার অধিকার ছিল না। রাণী যখন রথে বসিতেন, তখন রাজা সারথি হইয়া অশ্বচালনা করিতেন।

বিদ্যাশিক্ষায় কেবল স্ত্রীলোকদিগেরই অধিকার ছিল। পুরুষগণ বিদ্যাচর্চ্চা করিতে বাধ্য হইতেন, কিন্তু শিক্ষালাভ করিতে পারিতেন না। ইহা বিশেষরূপে বুঝা উচিত। প্রত্যেক বিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্ত্রীলোক; কিন্তু তিনি যাহা ছাত্রী-বর্গকে শিখাইবেন, তাহা তাঁহার স্বামীকে মুখস্থ করিয়া বিদ্যালয়ে আওড়াইতে হইত। ফলে পরিশ্রমের ভার পুরুষের উপর। ছাত্রীবর্গের সহিত তাহাদিগের পরিবারস্থ বালবৃন্দ নোট-বহি লইয়া আসিত, এবং তাহাতে অধ্যাপনার সারাংশ টুকিয়া লইয়া পরীক্ষার সময় ছাত্রীগণকে মুখস্থ করাইয়া দিতে হইত। ইহারই গুণে ছাত্রীগণ পাঠাভ্যাসে জীর্ণা শীর্ণা না হইয়া সুস্থ সবল দেহে পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়া আসিত। কেবল বালকবৃন্দই অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িত।

ছাত্রীগণ 'ডিগ্রী' পাইলে 'সেনেট' তাঁহাদিগকে উপাধি দ্বারা ভূষিত করিতেন। 'সেনেট' অতিশয় বৃদ্ধা প্রতিভাসম্পন্না মহিলাগণের সমিতিবিশেষ। নিম্নলিখিত গুণের মধ্যে অন্ততঃ একটা না থাকিলে, কেহ 'সেনেটে'র মেম্বর হইতে পারিতেন না।

১। ভূতপূর্ব্ব ধর্ম্মাধিকরণের বিচারিকা।

২। অন্ততঃ দশটি পুত্রকন্যার গর্ভধারিণী।

৩। পঞ্চসহস্র সেনার অধ্যক্ষ।

৪। অন্ততঃ দুই শত বিঘা ভূমির অধিকারিণী (প্রজাস্বত্ববিশিষ্ট।)

৫। বাণিজ্যে যাঁহার অন্ততঃ বৎসরে দশ সহস্র টাকার কারবার।

৬। যাঁহার অন্ততঃ এক শত যজমান আছে।

৭। রাজবংশীয়া বৃদ্ধা।

সকলেরই ডিগ্রীধারিণী হওয়া চাহি।

স্ত্রীহট্টের বিশ্ববিদ্যালয় রাজধানী হইতে সপ্ত ক্রোশ দূরে স্থিত প্রকাণ্ড মন্দির-বিশেষ। মাতৃভাষা ছাড়া সকল ভাষাই, বিশেষতঃ চীনদেশের, এবং সিংহল প্রভৃতি দেশের ভাষা তথায় শিখান হইত। ইহার কারণ যে, পুরুষগণই মাতৃভাষায় হীন। স্ত্রীলোকেরা সকলেই স্বভাবতঃ মাতৃভাষায় দক্ষ। সুতরাং যুদ্ধার্থ ও বাণিজ্যার্থ স্ত্রীলোক বিদ্যার্থিনীদিগকে অন্যদেশীয় ভাষা ছাড়া আর কিছুই শিখিতে হইত না।

হুংচাং বলেন যে, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতবর্ষের অনেক স্থান—যেমন অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, মগধ, সৌরাষ্ট্র, দ্রাবিড়, কাঞ্চী, কাশী প্রভৃতি হইতে স্ত্রীলোকেরা আসিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিতেন। তাঁহারা কেহ কাহারও ভাষা জানিতেন না, এবং শিখাইবারও কোনও উপায় ছিল না। অথচ স্ত্রীহট্টের স্ত্রীস্বাধীনতা নামজাদা বলিয়া তাঁহারা পরস্পরের মধ্যে মনোভাবজ্ঞাপনার্থ একটা সাধুভাষা স্থাপন করিয়াছিলেন;—তাহার নাম গ্রন্থে 'হিজিবিজি' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এই 'হিজিবিজি' ভাষা ব্রহ্মপুত্র হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বারবঙ্গের সীমা পর্য্যন্ত নারীগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল, এবং তাহার গুণ এই যে, অন্য যে কোনও ভাষা হউক না কেন, তাহার ভাব অবলীলাক্রমে তাহার মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া, অল্পদিনের মধ্যে কাব্য, দর্শন ও উপন্যাস প্রভৃতির প্রণয়ণ করা যাইত, এবং তদ্দ্বারা সম্পূর্ণ একটা নূতন ভাবের সমাবেশ হইয়া পড়িত। কেহ বুঝিতে পারিত না যে, তাহার মধ্যে পুরাতন কোনও ভাবের লেশমাত্র আছে।

এই ভাষার গুণে স্ত্রীহট্টে এক অপূর্ব্ব সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। তাহা সেই দেশের আচার ব্যবহারেই বুঝা যাইবে।

ভিষক, কবিরাজ, বৈদ্য প্রভৃতি সকলেই স্ত্রীলোক। স্ত্রীলোক ভিন্ন নাড়ী কেহ বুঝিতে পারে না, ইহাই সে দেশের ধারণা ছিল। বৈদ্যরাণী সমভিব্যাহারে

তাঁহার স্বামী ঔষধের পুঁটুলী লইয়া চিকিৎসায় নিষ্ক্রান্ত হইতেন। ঔষধ-বণ্টনের ভার (কম্পাউণ্ডার) সেই স্বামীরই উপর। সুতরাং এই সুযোগে তিনি দুই পয়সা উপার্জ্জন করিয়া লইতেন। স্ত্রীলোকের রোগ হইলে পাচন প্রভৃতি (আধুনিক এলোপ্যাথির মত বলিয়া বোধ হয়) ব্যবহৃত হইত। পুরুষ রোগগ্রস্ত হইলে কেবল বৃষ্টির জলপান তাঁহার পক্ষে ব্যবস্থা (আধুনিক হোমিওপ্যাথির মত)। বর্ষাকালে বৃষ্টির জল সংগ্রহ করিয়া গৃহস্থগণ কলসীপুর্ণ করিয়া রাখিতেন। এমন কি, শতবর্ষের বৃষ্টিবারি অনেকের বাড়ীতে থাকিত। বৈদ্যরাণী নাড়ী টিপিয়া কত বর্ষের পুরাতন জলের অংশ পান করিতে হইবে, তাহাই বলিয়া, রোগীকে রোগমুক্ত করিতেন। কতকগুলি ঔষধ সকলেরই পক্ষে প্রযোজ্য ছিল; যথা, জ্বর হইলে আড়ার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া পিতৃনাম-উচ্চারণ; বিকার হইলে গৃহিণীর দিকে কাতরভাবে দৃষ্টি; বাতরোগ হইলে কাব্যে নূতন ছন্দের আবিষ্কার; আমাশয় রোগ হইলে ছোট ছোট উপন্যাস-প্রণয়ন; বায়ুরোগ হইলে ইতিহাস-চিন্তা, (কিম্বা প্রত্নতত্ত্ব); এবং কোনও কঠিন পুরাতন রোগ হইলে গীতার সংগ্রহ; এবং যক্ষ্মা হইলে কেবল বিশ্বের সমালোচনা ইত্যাদি। এগুলি পুরুষদিকে পূর্ব্বে সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হইত।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে সকলেরই স্বাধীনতা ছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সকলেই পরস্পরের ধর্ম্মে যথেষ্ট সহায়তা করিতেন। পুরুষগণ নিরাকার ঈশ্বরের পক্ষ ছিলেন। স্ত্রীগণ সাকার ঈশ্বর, অর্থাৎ দেবদেবী প্রভৃতির পূজা করিতেন। পুরুষগণ যদিও অন্তরের সহিত দেবদেবী বিশ্বাস করিতেন না, কিন্তু মন্দিরের এবং গৃহের যত পূজার সরঞ্জাম, তাঁহারাই সংগ্রহ করিতেন, এবং মন্ত্র প্রভৃতিও উচ্চারণ করিতেন। পুষ্পচয়ন, চন্দনের সার প্রস্তুত, ঘণ্টাবাদন, আরতি এবং বলিদান প্রভৃতি যত কিছু তাঁহাদেরই পরিশ্রমের উপর নির্ভর; কেবল ভক্তিটুকু স্ত্রীলোকের। সেই রকম, যদিও স্ত্রীলোকেরা নিরাকার ঈশ্বর অন্তরে বিশ্বাস করিতেন না, কিন্তু পুরুষগণের পরিশ্রমের পুরস্কারস্বরূপ তাঁহারা বলিতেন যে, ঈশ্বর বাস্তবিক নিরাকার, এবং মনের অতীত পরম পুরুষ। তাঁহার মায়া বুঝা ভার, অতএব আসক্তশক্তি। দর্শন শাস্ত্রের সহিত সামঞ্জস্য করিবার নিমিত্ত তাঁহারা বলিতেন, সাংখ্যের (দৈবী) প্রকৃতিই পাতঞ্জলের ঈশ্বর, এবং বেদান্তের পরমাত্মা, কিংবা কণাদের পরমাণু—ইত্যাদি। স্ত্রীলোক কবিগণ কাব্যে ঈশ্বরকে বিরাট পুরুষরূপে উল্লেখ করিয়া প্রকৃতির মধ্যে তাঁহার নৃত্যগীত প্রভৃতির বর্ণনা করিতেন;—যেমন জলধিতরঙ্গ, বিহঙ্গকাকলি, সুদূরাগত বংশীর তান, মনের মধ্যে পূরবীরাগিণীর

ঝঙ্কার, দেহের মধ্যে মরণের তাণ্ডব, ইত্যাদি। পুরুষগণ তাহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিতেন।

শারীরিক গঠনে স্ত্রীলোকেরা পুরুষ অপেক্ষা অর্দ্ধহস্ত উচ্চ ছিলেন। পুরুষগণ বক্রভাবে চলিতেন, এবং পথে কোনও স্ত্রীলোকের দল আসিলে পুরুষগণ সসম্ভ্রমে তাঁহাদিগকে পথ ছাড়িয়া দিতেন। কোনও পুরুষ ঘটনাক্রমে রমণীর প্রেমে বদ্ধ হইলে তাঁহাকে গোঁফ এবং দাড়ী মোচন করিতে হইত, এবং সন্ধ্যার সময় মাঠের মধ্যে শৃগালের রোলের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে হইত।

বিবাহপ্রথা সর্ব্বাপেক্ষা অদ্ভুত। চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রমের পূর্ব্বে স্ত্রীলোকের বিবাহ নিষিদ্ধ, এবং পঁচিশ বৎসর বয়ঃক্রম না হইলে পুরুষের বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। স্ত্রীলোকেরা সচরাচর অশীতি বৎসরে দেহত্যাগ করিতেন ও পুরুষগণ পঁয়ষট্টি বৎসরে মানবলীলা সংবরণ করিতেন। যদি কোনও স্ত্রী অশীতি বৎসরের পূর্ব্বে কালকবলে পতিতা হইতেন, তবে তাঁহার স্বামী গ্রাম্য বারওয়ারী পূজায় পঞ্চ সুবর্ণমুদ্রা চাঁদা দিয়া স্বীর বয়ঃক্রমের দ্বিগুণ বয়ঃপ্রাপ্তা কোনও কুমারী কিংবা বিধবার পাণিগ্রহণ করিতে পারিতেন। যথা :—

বিপত্নীক পুরুষের বয়ঃক্রম (যদি)				দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর বয়ঃক্রম (তবে)
৩০	×	২	=	৬০
৩৫	×	২	=	৭০
৪০	×	২	=	৮০

বিবাহের পূর্ব্বে বরের মাতার সহিত কন্যার পিতার পণ লইয়া লেখাপড়া হইত। কন্যার মাতা বরকে আশীর্ব্বাদ করিবার পূর্ব্বে তাহাকে বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া লইতেন। অনেক সময় ভূর্জ্জপত্রে প্রশ্নাবলী লিখিয়া পাঠান হইত। তাহার উত্তর বরের পিতা কন্যার মাতাকে পাঠাইয়া দিতেন।'

প্রশ্ন।

১। বরের জন্মপত্রিকা আছে কি না? নরগণ কি রাক্ষসগণ?

২। দন্তের সংখ্যা কত?

৩। এবং গলদেশের আয়তন?

৪। ওজনে কত?

৫। আহারের পরিমাণ ও গুরু ও লঘু আহারের পরিণাম।

৬। নিদ্রাবস্থায় নাসিকাগর্জ্জন কত দূর হইতে শ্রুত হয়?

হুংচাং বলেন যে, শীতকালেই বিবাহের শুভদিন ধার্য্য হইত। কন্যা-পক্ষীয় লোকেরা কন্যাকে লইয়া অশ্বারোহণপূর্ব্বক বরের বাটীতে যথাকালে উপস্থিত হইয়া সিংহনিনাদ করিতেন। তখন বরপক্ষীয় লোক সকলে শৃগালের ন্যায় ধ্বনি করিয়া তাঁহাদিগের অভ্যর্থনা করিত। কন্যা বহির্বাটীতে আসরে বসিয়া লগ্নের অপেক্ষা করিতেন। বরের চক্ষু পট্টবস্ত্রে বাঁধিয়া বরপক্ষীয় লোক তাহাকে যজ্ঞস্থানে পিঁড়ির উপর বসাইয়া দিত।

বিবাহের মন্ত্রাদি ধর্ম্মশাস্ত্রানুযায়ী। বরের পিতা বর-দান করিলে কন্যা যজ্ঞস্থলে অসিহস্তে দণ্ডায়মানা হইতেন, এবং বরকে তিন সপ্তবার তাঁহার চতুর্দ্দিকে একাদিক্রমে ঘুরিতে হইত।

বাসরে বরকে কন্যাপক্ষীয় স্ত্রীলোকদিগের নিকট নৃত্যগীত ও কবিত্বের পরিচয় দিতে হইত। পরীক্ষা শেষ হইলে বর করযোড়ে কন্যার নিকট গিয়া বলিত, 'আর্য্যকন্যে! আপনার জয় হোক।' কন্যা তখন মৃদুস্বরে বলিতেন, 'হে প্রিয়, আমি তোমার প্রণয়ে বদ্ধ হইলাম।' বর তখন করযোড়ে বলিত, 'হে সর্ব্বাপেক্ষা বরণীয়ে! হে মধুর মধু! আমি কৃতার্থ হইলাম।' তখন মহাকলরবসহকারে কন্যা এবং বরপক্ষীয় লোকে বলিয়া উঠিত, 'বর কৃতার্থ হইয়াছেন!'

কন্যা বরকে সঙ্গে লইয়া পিত্রালয়ে প্রত্যাগত হইলে, প্রথমতঃ কন্যার ভ্রাতা শ্যালক সম্বোধনে পরিতুষ্ট করিয়া গৃহের মধ্যে লইয়া যাইতেন। সুখ-দুঃখময় দাম্পত্য জীবন-নাট্যশালার—ভবিষ্যৎ সবুজ-গৃহে (গ্রীন্‌রুম) বর প্রবেশ করিয়া তাহা স্বহস্তে মার্জ্জনা করিতে 'সুরু' (আরম্ভ) করিত। মার্জ্জনা সাঙ্গ হইলে বর 'গৃহক' নাম ধারণ করিত। (ইহা গৃহিণীর স্বামিবাচক শব্দ)। যাহার নিজের গৃহ নাই, অথচ গৃহিণীর স্বামী, হুংচাং বলেন যে, এই প্রকার জীবাত্মার নামই গৃহক। এই প্রথার ফলে তদানীন্তন গার্হস্থ্যজীবন অতিশয় শান্তিময় ছিল। ঘটনাক্রমে গৃহকের গৃহিণীর সহিত কলহ হইলে শান্তিভঙ্গের অপরাধে তাহাকে আসামী করিয়া চালান দিবার বিধি ছিল। কিন্তু স্ত্রী স্বামীর জামীন হইলে মোকদ্দমা 'রুজু' হইত না।

পূর্ব্বে বলা গিয়াছে যে, কর্ম্ম হইতে অবসর-প্রাপ্তিই সে দেশের বিবাহের সময়। তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী জীবন সমস্তই 'ব্রহ্মচর্য্য'-ময়। বর্ণাশ্রম ও জাতিভেদ প্রথা ক্রিয়াকর্ম্মেই রক্ষিত হইত। কোনও উৎসবের সময় ব্রাহ্মণজাতীয় পুরুষগণ বাটীর

বাহিরে কদলীবৃক্ষের তলে বসিতেন, এবং তাহারই পত্র কাটিয়া লইয়া দধি ও চিনি ও নানাবিধ মিষ্টান্ন ভোজন করিতেন। যাঁহাদিগের শাস্ত্রজ্ঞান ছিল, তাঁহারা শূদ্র বলিয়া গণ্য হইতেন। হুংচাং বলেন যে, যাঁহারা শাস্ত্রানুযায়ী কর্ম্মকাণ্ডেরও প্রবর্ত্তক, অথচ শাস্ত্রে জ্ঞান নাই, তাঁহারা ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত হইতেন। এই জন্য শূদ্র জাতিই শাস্ত্রের টীকা প্রস্তুত করিয়া ব্রাহ্মণগণকে বুঝাইত; তন্ত্র প্রভৃতি শূদ্রেরই করতলস্থ ছিল। কোনও ব্রাহ্মণের অহঙ্কার ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়বর্গ প্রবল হইলে শূদ্রগণ তন্ত্রের অনুষ্ঠান করিয়া তাহাকে কাণা কিংবা খোঁড়া করিয়া দিত। বৈশ্যগণ গোশালায় বসিয়া ফলমূল ভক্ষণ করিত। হুংচাং বলেন যে, ব্রাহ্মণ এবং শূদ্রের মধ্যে রেষারুষি হইলে বৈশ্যগণই ধর্ম্মরক্ষা করিতেন। কখনও কখনও ধর্ম্ম পলাইয়া ক্ষত্রিয়ের আশ্রয় লইতেন। মোটের মাথায় ধর্ম্ম পলাতকা আসামীর মত ইতস্ততঃ লুক্কায়িত হওয়াতে, সকলে 'ধর্ম্ম কি পদার্থ', এবং কি করিয়া ইহার রক্ষা হয়, এই বিষয়ের সর্ব্বদা আলোচনা করিত।

শ্রাদ্ধের অপূর্ব্ব প্রথা ছিল। পুত্র কেবল মাতৃশ্রাদ্ধ করিত। কন্যার শ্রাদ্ধে অধিকার ছিল না। কিন্তু বিবাহিতা স্ত্রী স্বামীর শ্রাদ্ধ করিতে পারিতেন। ফলে স্ত্রী মরিয়া গেলে পুরুষের শ্রাদ্ধ পাছে উঠিয়া যায়, এই আশঙ্কায় 'পরস্পরের শ্রাদ্ধ-সমিতি' নামক একটা বিরাট সম্মিলনী স্থাপিত হইয়াছিল। তাহাতে যে কোনও ব্যক্তি হউক না কেন, অনুকম্পাপরবশ হইয়া অন্য কাহারও শ্রাদ্ধ করিতে পারিতেন। সাহিত্যিকগণের মধ্যে এই প্রথা খুব প্রবল ছিল।

সামাজিক প্রথার মধ্যে গোটাকতক উল্লেখযোগ্য। পুরুষগণ 'বিড়ি' সেবন ও 'পান' চর্ব্বণ করিতে পারিতেন। স্ত্রীলোকেরা পুরুষগণকে রাত্রিকালে শৃঙ্খল দ্বারা বদ্ধ করিয়া রাখিত। এই জন্য চুরী ডাকাতীর কোনও ভয় ছিল না। পুরুষগণ স্বর্ণ-অলঙ্কার প্রভৃতি ব্যবহার করিতেন। স্ত্রীলোকের অলঙ্কার ব্যবহার করিবার অধিকার ছিল না। পুরুষেরা চরণে নূপুর পরিধান করিয়া ও হস্তে বংশী লইয়া বিকালে বায়ুসেবন করিতে পারিতেন। সকলেরই এক একটি গহনার বাক্স ছিল। তাহার মধ্যে প্রিয়তমার চিঠিপত্র এবং অন্যান্য বহুমূল্য দ্রব্য সঞ্চিত হইয়া থাকিত। স্ত্রীলোক ইচ্ছা করিলে অনূঢ়া থাকিতে পারিতেন, কিন্তু কোনও পুরুষ বিবাহ না করিলে তাহাকে তৈলের ঘানি টানিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইত।

পুরুষগণের হাস্য করিবার অধিকার ছিল না। কেহ হঠাৎ হাসিয়া ফেলিলে সে উন্মাদগ্রস্ত বলিয়া সাব্যস্ত হইত, এবং তাহার গলদেশ পর্য্যন্ত পুষ্করিণী কিংবা

নদীর জলে মগ্ন করিয়া তিন ঘণ্টা কাল রাখা হইত। সেই সময়টুকু তাহার স্ত্রী তটস্থ কদম্ব কিংবা অন্য কোনও বৃক্ষে বসিয়া স্বামীকে শ্রীমদ্ভাগবতের কোনও একটি অধ্যায় পাঠ করিয়া শুনাইতেন।

সংসার যে দুঃখময়, এবং দুঃখেই মানবের ঈশ্বর-সন্দর্শন হয়, ইহা সকল পুরুষেরই বিশ্বাস ছিল। তাহারা বলিত যে, সংসার জুড়িয়া মহা ক্রন্দনের রোল না উঠিলে ভগবানের অবতীর্ণ হওয়া অসম্ভব।

কিন্তু যদি হঠাৎ এবংবিধ ক্রন্দনের রোল উঠে, সেই ভয়ে স্ত্রীসমাজ পুরুষগণের সুখবিধানের জন্য বিশেষরূপে যত্নবান হইতেন। ভাল ভাল খাদ্য দ্রব্য পুরুষদিগের আহারেই লাগিত। তাহাদিগের ক্ষুধার সতত যাহাতে উদ্রেক হয়, ইহার দিকে সকলের তীক্ষ্ণদৃষ্টি ছিল। এই জন্য প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগ করিয়াই পুরুষগণের শয়নগৃহে শূন্যে হাত পা ছুঁড়িয়া এবং উচ্চৈঃস্বরে বক্তৃতা করিয়া শারীরিক ও মানসিক ব্যায়াম সাধন করিবার সুন্দর প্রথা ছিল।

স্ত্রীহট্টে সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যা এত দূর উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল যে, বর্ণনাতীত। চিত্রগুলি সকলই কল্পনাময়। চিত্রাঙ্কিত স্ত্রী এবং পুরুষের মুখের ছাঁদ একই রকম। চক্ষু ও ভ্রূ খুব টানা। হস্তের অঙ্গুলি (পাঁচটা, কিংবা ভ্রমক্রমে ছয়টা হইলেও) চম্পক কলির মত। পদতল ভূগর্ভে নিহিত, কিংবা বস্ত্রাবৃত। বাহু আজানুলম্বিত। হুংচাং বলেন যে, পশু, পক্ষী ও স্বাভাবিক নদ, নদী, বন, উপবনের দৃশ্য সকলই সুন্দর, কল্পনাময়। জিজ্ঞাসা করাতে তাঁহাকে একটি চিত্রকর বলিয়াছিলেন যে, পরলোকে সূক্ষ্ম ভৌতিক দেহ যেমন দেখায়, এবং তাহার প্রতিকৃতি স্বপ্নে যেরূপ প্রতিবিম্বিত হয়, এ সকলের চিত্রের ছবিগুলি অবিকল সেইরূপ। ক্রমে বিশ্বে এই মূর্ত্তি সকল প্রকাশ হইয়া পড়িবে। সত্যযুগের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইবে।

সঙ্গীত এবং নাটকাভিনয় প্রভৃতি কলাবিদ্যার উৎকর্ষ সম্বন্ধেও হুংচাং বলিতে ছাড়েন নাই। 'কমেডি' কিংবা প্রহসন প্রভৃতির অভিনয় কুত্রাপি হইত না। যাঁহাদের বিবাহ হয় নাই, তাঁহারাই রঙ্গালয়ে প্রবেশের অধিকারী ছিলেন। দৃশ্যপটগুলি অতিশয় মনোহর ছিল। অভিনয়কালে স্ত্রীলোককে পুরুষ এবং পুরুষকে স্ত্রীলোক সাজিতে হইত। সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী এবং অভিনয়পটু মহিলা মহর্ষি প্রভৃতির 'পার্ট' লইতেন। মহর্ষি বাল্মীকি, ব্যাস প্রভৃতি সকলেই ষোড়শী, গেরুয়া-বসন পরিবৃতা, এবং পক্ককেশা। ইঁহাদের 'আর্টিষ্টিক্ অ্যাক্ট' এত দূর প্রবল হইয়া পড়িত যে, দর্শকবৃন্দ উল্লাসে নৃত্য করিতে থাকিতেন। পুরুষগণ স্ত্রীলোকের

'পার্ট' লইয়া দর্শকবৃন্দকে যথাসাধ্য ভক্তিরসে পরিপ্লুত করিতেন। স্ত্রীহট্টের অভিনয় দেখিতে তিব্বত হইতে লামাগণ, এবং তাতার হইতে শেখ, মোল্লা প্রভৃতি ঘন-ঘন যাতায়াত করিতেন। পটক্ষেপণের পর 'কনসার্ট' হইত না। দর্শক-বৃন্দ ভাবের আবেশে ক্রন্দনের সহিত একরকম নাসিকাগর্জ্জন করিতেন; তাহা-তেই কনসার্টের ফল হইত।

সঙ্গীতের আলোচনাকালে স্ত্রীলোকগণ ধ্রুপদ গায়িতেন, এবং পুরুষগণ কীর্ত্তন গায়িতেন। তখনও খেয়াল টপ্পার সৃষ্টি হয় নাই। কোনও রমণীর গায়িবার কালে তাঁহার স্বামী তানপুরা ছাড়িতেন। স্ত্রীলোকদিগের নৃত্য করিবার প্রথা ছিল না। পুরুষেরাই পায়ে নূপুর দিয়া এবং গলায় কলসের মত একটা পদার্থ বাঁধিয়া নৃত্য করিতেন। সেই কলস বারিপূর্ণ থাকিত, এবং নর্ত্তকের কণ্ঠ শুষ্ক হইলে তিনি সেই জল পান করিতেন। গান বাঁধিবার সময় পুরুষগণ লেখনী ও মস্যাধার লইয়া বৃক্ষে উঠিতেন। পাছে নরলোকের কোনও ভাব আসিয়া পড়ে, এই ভয়ে তাঁহাদিগের অধোদৃষ্টিনিক্ষেপ নিষিদ্ধ ছিল।

এই সকল প্রথার বর্ণনা করিয়া, হুংচাং বলেন যে, স্ত্রীহট্টের সামাজিক, নৈতিক, মানসিক, এবং শারীরিক উৎকর্ষ, এবং সভ্যতার চরম উন্নতির কতকগুলি বিশেষ কারণ ছিল।

প্রথম কারণ, পরিমিত আহার, এবং বহুকালব্যাপী ব্রহ্মচর্য্য। এক মুষ্টি চাউল এবং এক পোয়া দুগ্ধ হইলেই একটা লোকের পক্ষে যথেষ্ট। তাহার উপর প্রত্যেক মাসে সাত আট দিন উপবাসের নিয়ম ছিল। শিশু সন্তান তিনবেলা অর্দ্ধ সের দুগ্ধ পাইলেই সন্তুষ্ট থাকিত। ইহার অধিক হইলে অগ্নিমান্দ্য অবশ্যম্ভাবী।

দ্বিতীয় কারণ, স্বাস্থ্যরক্ষার বিধান। দেশে জঙ্গল হইলে সকলে তৎক্ষণাৎ তাহা কাটিয়া দগ্ধ করিত, এবং দগ্ধ কাষ্ঠের অঙ্গার লইয়া অস্বাস্থ্যকর স্থানে জ্বালাইয়া দিত। বাটীর নিকট কোনও বৃক্ষ থাকিতে পাইত না। বহুদূরে বাগান থাকিলেও, তাহার উচ্চতা সার্দ্ধ তিন হস্তের অধিক হইলে, ভূস্বামী বৃক্ষগুলির মস্তক কর্ত্তন করিয়া দিতেন। কাজেই বৃক্ষের ফল হইলে সকলে অনায়াসে পাড়িয়া লইতে পারিত। প্রত্যেক বাটীর চালা, কিংবা অট্টালিকার ছাত, ইচ্ছা করিলে, দিনের বেলা সরাইয়া লওয়া যাইত। সুতরাং বর্ষাকাল ছাড়া অন্যকালে দিনের বেলা ঘরে এবং প্রাঙ্গনে সূর্য্য-রশ্মি পরিপূর্ণভাবে খেলিত।

কোনও নদী কিংবা স্রোতস্বিনীর গতি কেহ রুদ্ধ করিতে পারিত না। প্রত্যেক পুষ্করিণীর পাড়ে এক একটি পুরাতন বাটী থাকিত। তাহাতে মনুষ্য বাস

করিত না। সেগুলি কালক্রমে চামচিকা ও বাদুড়ে পরিপূর্ণ হইয়া যাইত, এবং তাহারা মশা ধরিয়া খাইত। সেই জন্য, হুংচাং বলেন যে, সে দেশে কখনও ম্যালেরিয়া হয় নাই। শীতকালে কেহ পশমীবস্ত্র ব্যবহার করিতেন না। বায়ু-সেবনকালে সকলে মুখব্যাদান করিতেন, এবং সেবিত বায়ু রীতিমত গলাধঃকরণ করিতেন। প্রাতঃকালে নাসিকা দ্বারা জলপান করা অনেকের অভ্যাস ছিল। কর্ণের কোনও আবরণ নাই বলিয়া সকলেই সামান্য কার্পাসের তুলা দিয়া রাখিতেন। বর্ষাকালে বৃষ্টির জল পান করাই সে দেশের রীতি ছিল। অন্য কালে বড় বড় কলসীতে কয়লা ও বালি দিয়া সকলে জল বিশুদ্ধ করিয়া লইতেন।

বাটীগুলি উচ্চ জমীর উপর নির্ম্মিত হইত। এক স্থানে পঞ্চাশটির অধিক বাটীর সংস্থাপন নিষিদ্ধ ছিল। বাটী হইতে অন্ততঃ শত হস্ত দূরে গোশালা, এবং তাহার কিছু দূরে শৌচশালা নির্দ্দিষ্ট হইত।

তৃতীয় কারণ, কেহই বিলাসী ছিলেন না। সকলেরই চাল চলন অনেকটা সন্ন্যাসীর মত। হুংচাং বলেন যে, সে দেশের লোক জগৎকে শিক্ষা দিতে আসিয়াছিল। কিন্তু শিখিতে আসে নাই। এ সম্বন্ধে হুংচাং-এর সহিত স্ত্রীহট্টের বিজ্ঞানাধ্যাপক শ্রীমতী রাধিকামোহন দাসীর (শ্রীযুত রাধিকামোহন দাসের স্ত্রী) যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা উল্লেখযোগ্য।

শ্রীমতী। এক এক সময় আসে যে, মানবের সম্পূর্ণ বিকাশ হইয়া যায়। মানবত্ব চরম সীমায় উপস্থিত হয়। সে জাতি ক্রমে লোপ পায়।

হুংচাং। আপনি পুনর্জ্জন্ম মানেন ?

শ্রীমতী। যে ভাবে উহার একটা আদর্শ আছে, সেটুকু না ধরিলে বিকাশের কোনও অর্থ নাই। কেবল, দৈহিক বিকাশ হইলেই ক্রমবিকাশ বলা যায় না। কোনও বৃক্ষের অধোভাগের ডালপালা খুব বিস্তৃত, পত্র-পুষ্পে পূর্ণ। সচরাচর আমরা মনে করি, তাহাদেরই সম্পূর্ণ বিকাশ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখিলে, উপরের সরু ডালগুলিই সর্ব্বতোভাবে শীর্ষস্থানীয়। তাহাদের পদ উচ্চ। বৃক্ষত্বের তাহাই পরিণাম। আমরা মাথাটা ছাঁটিয়া দিয়া গোড়ার দিক খুব বর্দ্ধিত করিয়া মনে করি যে, মনুষ্যত্বের চরম অবস্থা লাভ করিতেছি। বীজের মধ্যে যাহা আছে, তাহা হইতে বৃক্ষ অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে না। কিন্তু অধোভাগের বীজ ছাড়াও আর একটি বীজ উর্দ্ধভাগ দিয়া বৃক্ষে সঞ্চারিত হয়। তাহারই গুণে ক্রমবিকাশ হয়। সেইটুকু পুনর্জ্জন্মের মত। যে রকম আপনারা পুনর্জন্ম বুঝেন, তাহা মানি না। ক্রমবিকাশের মাথার উপর

ভাবে দেহ ও মনকে নির্ম্মাণ করিলে সেই আদর্শের বীজ ক্রমশঃ সঞ্চারিত হইবে, তাহাই বিজ্ঞান অনুসন্ধান করিতেছে।

হুংচাং। পূর্ব্বে যাহারা খুব উন্নত হইয়াছিল, সেই বংশের মানবের এখন অবনতি কেন?

শ্রীমতী। সে বংশের মানব এখন আছে কি না সন্দেহ। কালক্রমে যুগে যুগে জীব জন্তুর পরিণাম অন্য রকম দাঁড়াইয়াছে। নানা প্রকার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কিন্তু আধারের বিকাশ যে দিক দিয়া যে রকম করিয়াই হউক না কেন, চরম অবস্থার ভাব সকলেরই এক রকম। প্রথম যুগের অবসানে যে সকল কথা উচ্চারিত হইয়াছিল, প্রত্যেক যুগের অবসানেই তাহাই হইবে। অথচ বাহিরের দিকে তাকাইলে বোধ হইবে, এখন উন্নতি এবং উৎকর্ষ হয় ত অন্য কোনও যুগ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পূর্ব্ব যুগের মানব ইন্দ্রিয় দ্বারাই যাহা দেখিত, শুনিত, এবং শিখিত, এখন কলের দ্বারা সেই লুপ্ত ইন্দ্রিয়ের কার্য্য সারিয়া লইতেছে।

হুং চাং। ইহা কি ক্রমবিকাশের চিহ্ন নহে?

শ্রীমতী। এক ভাবে বটে। আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, আমাদিগের ইন্দ্রিয়গুলি কলবিশেষ, এবং প্রকৃতির মধ্যেই তাহার উপাদান রহিয়াছে। আমারা বিজ্ঞানের সাহায্যে সেগুলি তৈয়ারী করিয়া লইতে পারি। প্রাকৃতিক শক্তি, পূর্ব্বে যাহা স্বাভাবিক বিকাশ বলিয়া গণ্য হইত, এখন মানবের হাত দিয়াই সেগুলির ব্যবহার হইতেছে।

হুংচাং। ইহা কি মানবের স্বাধীনতার চিহ্ন নহে?

শ্রীমতী। প্রকৃতির শক্তি স্বীয় আয়ত্তের মধ্যে আনিলে পুরুষ স্বাধীনতা লাভ করে নিশ্চয়, কিন্তু সে স্বাধীনতার ফল দ্বিবিধ—প্রথম ধ্বংস, এবং প্রলয়। দ্বিতীয়—জগতের দুঃখনিবৃত্তি। স্বাধীনতা মানবেরই যে নিজস্ব, তাহা নহে। ভূমি, জল, বায়ু, নদ, নদী, পাদপ, এবং প্রস্তর, সকলেই স্বাধীনতার প্রয়াসী। মানব তাহাদিগের স্বাধীনতা হরণ করিয়া নিজের সুখের জন্য গৃহনির্ম্মাণ এবং বংশবৃদ্ধি করে—তাহা ক্ষণিক এবং বাহ্য বিকাশমাত্র। মনুষ্যত্বের বাস্তবিক বিকাশ তাহা নয়। স্বাধীনতা বলপ্রয়োগ দ্বারা হয় না। এক জনকে অধীন না করিয়া দিলে, আমরা স্বাধীনতা কি, তাহা বুঝিতে পারি না। বলপূর্ব্বক প্রকৃতিকে অধীন করিলে, তাহাতে কেবল ধ্বংসের সূত্রপাত হয়। জমীকে জোর করিয়া উর্ব্বরা করিলে তাহার উৎপাদন-দ্রব্যে সারত্ব কম থাকে, এবং শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায়। কল কৌশলে উড়িতে এবং দৌড়িতে শিখিলে আমরা তাহাকে বাহাদুরী বলিয়া

থাকি। কিন্তু ফলে মানব অপদার্থ হইয়া পড়ে। পশু পক্ষীর স্বাধীনতা হরণ করিয়া তাহাদিগকে আমরা ধরিয়া খাই, এবং কৌশলে একটা অস্বাভাবিক সমাজ-সংগঠন করিয়া কতক লোক তাহার ফল উপভোগ করে; ইহা ত স্বাধীনতার চিহ্ন নহে। রাজা হইলেও স্বাধীন হয় না, প্রজাতন্ত্রের সৃষ্টিও স্বাধীনতা নহে। স্বাধীনতা একটা মধুর জিনিস। কতটুকু স্বাধীনতা, এবং কতটুকু অধীনতা, কোন সময় এবং কি করিয়া প্রযোজ্য, এই বিষয়টা স্থির হইয়া গেলে স্বাধীনতা এবং অধীনতার পার্থক্য থাকে না। সেই অবস্থা হইতে দুঃখনিবৃত্তি হয়। স্নেহ এবং করুণা হইতে তাহার উৎপত্তি। মাতৃস্নেহ ও পিতার শাসন একই জিনিস।

হুংচাং। আপনার মতে, বিশ্বের প্রত্যেক পরমাণুকে স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। নদী বহিয়া যাউক, তাহার জল লইব না। জমী পড়িয়া থাকুক, তাহা চাষ করিব না। দস্যুও আসিয়া লুণ্ঠন করুক, তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইব না।

শ্রীমতী। আপনি স্বাধীনতা দিবার পূর্ব্বেই সকলকে আসামী সাব্যস্ত করিয়া বসিয়া আছেন! আপনার নিজের ইচ্ছা থাকিলে, স্নেহ থাকিলে, করুণা থাকিলে, পরমাণুগুলি আপনাকেই রক্ষা করিবে। কীটাণু আপনার শরীরে ব্যাধি সঞ্চারিত করিবে না। মাতা বসন্ত এবং বিসূচিকাগ্রস্ত সন্তানকে বক্ষে ধারণ করিলেও রোগে সংক্রামিত হয় না। জগৎ বিষপূর্ণ। কিন্তু স্নেহের মধুর মধ্যে গরল শান্তি পাইয়া চুপ করিয়া থাকে। সেইটুকু থাকিলে নদী বিনা আপত্তিতে জলদান করিবে, বসুন্ধরা অল্প আয়াসেই শস্যশালিনী হইবে, এবং দস্যুর লুণ্ঠনে প্রবৃত্তি থাকিবে না।

হুংচাং। তবে আপনারা পুরুষবর্গকে অধীন করিয়া নিজের স্বাধীনতায় এত মনোযোগী কেন?

শ্রীমতী মুখে বস্ত্র দিয়া হাসিলেন। 'আপনি যে চক্ষে সমাজ দেখিতেছেন, আমরা সে চক্ষে দেখি না। বাঁধিয়া রাখিলেই যদি স্বাধীনতা-হরণ করা হয়, তবে দুষ্ট শিশু সকলেই স্বীয় দোষে স্বাধীনতা-ভ্রষ্ট। কিন্তু আমরা তাহা মনে করি না।—আমাদের বোধ হয় যে, যাহারা গুরুভার বহন করে, তাহারাই অধীন; এবং যাহাদের ভার বহন করিতে হয় না, তাহারাই স্বাধীন। যদি ঈশ্বর বলিয়া কোনও পুরুষ থাকেন, তবে তিনি স্বাধীনতা হইতে সর্ব্বাপেক্ষা বঞ্চিত, অথচ যাঁহাদের তিনি পালনার্থ নিয়মডোরে বাঁধিয়া রাখেন, তাহারা মনে করে যে, তাহারাই অধীন। কিন্তু আমাদের দেশের পুরুষ তাহা কখনই মনে করে না। তাহারা এক সময় স্বাধীনতার সুখ দেখিয়াছে, এবং এখন অধীনতার সুখও

দেখিতেছে। তাহারা জানে যে, কোনটাতেই সুখ নাই। লাথি মারিলেও যে দুঃখ, খাইলেও সেই দুঃখ। প্রথমে যখন মনুষ্যত্বের বিকাশ হয় না, তখন পদাঘাত দুঃখজনক বলিয়া বোধ হয়। ক্রমে মনুষ্যত্বের বিকাশ হইলে পদাঘাত করিয়া স্ত্রীলোককে কষ্ট দেওয়া আরও কষ্টজনক হইয়া পড়ে। সুতরাং এখন তাহারা নির্ব্বিবাদে এবং পরমসুখে এই দেশে বসিয়া জগৎকে শিক্ষা দিতেছে।

হুংচাং। যত দূর বুঝা যায়, আপনাদের বিচারে সুখ দুঃখের প্রভেদ নাই। তবে আপনারা পরম সুখী কিসে?

শ্রীমতী। ঐটুকু তোমাদের দেশ এখনও বুঝে নাই। প্রবৃত্তিতেও সুখ নাই, নিবৃত্তির মধ্যেও নাই। অথচ, প্রথম চালে উভয়ের মধ্যে আছে, সেটুকু রাজসিক, এবং প্রভেদ ও পরিবর্ত্তন হইতে তাহার উৎপত্তি। কিন্তু আমাদের সুখ একটা বিরাট নেশার মত। বিশ্বের সমতল ভূমির উপর দাঁড়াইয়াই আমাদের আনন্দ। শূন্যে হেলিয়া দুলিয়া আনন্দ। মরিয়াও আনন্দ, বাঁচিয়াও আনন্দ। মরণের সঙ্গে আমরা যাই, জীবনের সঙ্গে আমরা আসি। এই রকম অবিশ্রান্ত ঘুরিতেছি। তোমাদেরও একটা সময় আসিবে, যখন ইহার সত্য সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকিবে না।

নিধিরাম।

বিদ্রোহ।

১

গুরুচরণ মিত্র, যিনি বেলিয়াঘাটা ডিবিশনের পুলিস-ইনস্পেক্টর, যাঁহার বেতন দুই শত টাকা, এবং অন্ন বস্ত্রের কোনও কষ্ট নাই, যাঁহার স্ত্রী খুব সুন্দরী, রসিকা; এবং বিদুষী, এবং যাঁহার পুত্র দুইটি এবং অবিবাহিতা কন্যা একটি, যাঁহার কলিকাতায়——ষ্ট্রীটের মোড়ে দোতালা বাটী, এবং পিতৃসঞ্চিত ঐশ্বর্য্যের বলে অন্ন বস্ত্রের কোনও অভাব নাই, অশ্বশালায় চারিটি ঘোড়া, এবং দুইখানা গাড়ী, যাঁহার উপরন্তু একখানা মোটর-কার, সেই গুরুচরণ মিত্র তিন মাসের ছুটী লইয়া বাটীতে উপস্থিত। খুব সবল শরীর, প্রত্যহ দুইটি কুক্কুটের মাংসে জঠরানল শীতল হয় না, দিব্য বিনা-তৈলে-তৈলাক্ত উজ্জ্বল শ্যাম চেহারা, দাঁত একটাও পড়ে নাই, চুল একটাও পাকে নাই, বুদ্ধির কোনও অংশ ভ্রংশ হয় নাই। রিজার্ভ হইতে আরম্ভ করিয়া রাস্তাঘাটের প্রহরী কনষ্টেবলবর্গ যাঁহাকে দেখিয়া

অহরহঃ তটস্থ এবং বন্দনা-পরায়ণ, চোর এবং দস্যু যাঁহার নামে কম্পমান, সেই গুরুচরণ কর্ম্মক্ষেত্র হইতে কিঞ্চিৎ অবসর লইয়া গৃহস্থ-ধর্ম্মক্ষেত্রে বিশ্রাম-লাভার্থ বহির্ব্বাটীর গদীর উপর তাকিয়ায় ঠেস্ দিয়া আলবোলাসহযোগে ধূম পান করিতেছেন। সঙ্গে প্রভুভক্ত পরিচারক অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ কনষ্টেবল জনার্দ্দন পুত্তলিকার ন্যায় এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান।

গুরুচরণের বাটীতে আসিয়া ধর্ম্মজগতের দিকে খানিকটা দৃষ্টিপাত আরম্ভ হইয়াছিল, সুতরাং তিনি চক্ষু নিমীলিত করিয়া, এবং বাম জানুর উপর দক্ষিণ পদ বিধিমতে স্থাপিত করিয়া, এবং মধ্যে মধ্যে তাহাদিগকে দোলাইয়া, এবং অবসরমতে বাম পদতল বিছানার চাদরের উপর ঘষিয়া, এবং তাহাতে আরাম পাইয়া, ভাবিতেছিলেন যে, সংসারের অনেক কর্ত্তব্য কর্ম্ম এখনও অবশিষ্ট। এই রকম ভাবের উদ্রেক হওয়াতে, তিনি 'অহঃ'-রূপ একটা ধ্বনি মুখ-গহ্বর হইতে উৎপন্ন করিয়া, আলবোলার নল শয্যার এক পার্শ্বে রাখিয়া দিলেন।

জনার্দ্দন কর্ত্তাকে ধর্ম্মভারাক্রান্ত দেখিয়া খুব সতর্কভাবে তাহার পুরাতন গোঁফে তা দিতে লাগিল। গুরুচরণ তাহা লক্ষ্য করিয়া একটু বিরক্ত হইলেন, কিন্তু সময়ের গুণে পুনরপি করুণ-রসের সঞ্চার হওয়াতে, তিনি কেবলমাত্র বলিলেন—

'জনার্দ্দন! তোমার কি রকম বোধ হচ্ছে?'

জনার্দ্দন। হুজুরের যে রকম বোধ হচ্ছে, তার চেয়েও প্রবল রকম।

গুরুচরণ। যারা নেমক খায়, তাহাদের ঐ রকম স্বভাবতঃ বোধ হয়; কিন্তু পুলিসের থানা ও বাস্তুভিটায় অনেক তফাৎ—জনার্দ্দন! অনেক তফাৎ। যেমন কশাইখানার সঙ্গে দেবমন্দিরের তফাৎ। অহঃ।

জনার্দ্দন। তা ঠিক, তবে গৃহস্থের বাটীতে 'ডিসিপ্লিনে'র বড় অভাব। কেহ ডাকিলে শীঘ্র উত্তর দেয় না। কোনও নিয়মিত সভ্য উত্তর নেই। যার যেমন খুসী পাইচারী করে' বেড়ায়, কাহারও সঙ্গে কারও মিল নেই। আশ্চর্য্য এলোমেলো ব্যবহার!

গুরুচরণ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, 'জনার্দ্দন, তোমার এখনও পুলিসের ভাব যায় নাই। ঘর কন্না না করিলে এর তত্ত্ব বুঝা শক্ত। বোধ হয় তুমি গীতা পড়েছ? আচ্ছা। কুরুক্ষেত্রে বক্তৃতাকালে ভগবান্ খুব 'ডিসিপ্লিনে'র পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু গৃহের মধ্যে তিনি এক সত্যভামার জ্বালাতেই গৃহত্যাগী হবার যোগাড় করেছিলেন। যাহা হউক—

কর্ত্তার চিন্তাস্রোত ক্রমে ধর্ম্মরূপ গুহার নিভৃততম প্রদেশে ধাবমান দেখিয়া জনার্দ্দন খুব গম্ভীর হইয়া উত্তর দিল,—'ঠিক্! আমাদের এ সম্বন্ধে বিজ্ঞতা খুব কম।'

গুরুচরণ বাবু। এ সংসার খানিকটা ভালবাসার সংসার, খানিকটা দাঙ্গা হাঙ্গামার। দাঙ্গা হাঙ্গামার খুন খারাপির সংসার নিয়ে আমরা পুলিসের কাজ চালাই, সেই জন্য আমাদের মেজাজ খুব গরম থাকে, আর কথাবার্ত্তা খুব চড়া ও কড়া রকমের হয়। কিন্তু ভালবাসার সংসারের ভাব ভঙ্গী ঠিক তারি উল্টা। সেখানে মেজাজ খুব ঠাণ্ডা রাখা দরকার, আর কথাবার্ত্তা খুব খাদে ও নরম কোমল স্বরে হওয়া চাই। অনেকটা থানা-পরিদর্শনের সময় বড় সাহেব এলে' আমরা যেমন হয়ে থাকি, সেই রকম।

জনার্দ্দন। তার আর সন্দেহ কি?

এমন সময় কানাই চাকর আবার তামাক দিয়া চলিয়া গেল। গুরুচরণ বাবু তাহা অনেক টানিয়াও ধূমের লেশমাত্র পাইলেন না। অভ্যাসবশতঃ মেজাজ খানিকটা গরম হইয়া উঠিল। আবার কষিয়া টানিতে লাগিলেন। তথাপি ধূমের কোনও লক্ষণ নাই! গুরুচরণ বাবু অভ্যাসবশতঃ ভাবিলেন, ব্যাটা মনে করে যে, আমি তামাক টানিতেই জানি না, সেই ভরসায় তামাক চুরী করিয়া আমাকে ফাঁকি দেয়। তখন গুরুচরণ উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন, 'কানাই, এখানে আয়।'

২

অবশ্য, কানাই পুলিসের আদব কায়দা জানিত না, এবং স্নান করিবার বেলা হইয়া গিয়াছিল। অতএব সে কর্ত্তার 'লক্ষ্মীবিলাস' তৈলের শিশির খানিকটা চাঁদির উপর ঢালিয়া দিয়া মস্তকের অন্যান্য অংশে তাহা সঞ্চারিত করিতেছিল। কর্ত্তার বজ্রগম্ভীর শব্দ শুনিয়া সে নেপথ্যে উত্তর দিল, 'তেল মাখছি, এখন অবসর নাই।'

ইহাতে গুরুচরণ বাবু আশ্চর্য্য হইলেন। জনার্দ্দন অবাক হইয়া গেল। তাহা দেখিয়া গুরুচরণ বাবু লজ্জিত হইলেন। জনার্দ্দন বলিল, 'হুজুরের অনুমতি হইলে একবার ঠুকিয়া দিই।'

গুরুচরণ। তাহাতে আমার আপত্তি আছে। কর্ম্মক্ষেত্রে ঠুকিলে সুযশ হয়; ঘরে ঠোকাঠুকি করলে নিন্দার ভাগী হইতে হয়। ঘরে আইনমত চলাই ভাল। আচ্ছা, দেখ ত, লোক্‌টা কি ক'চ্ছে।'

জনার্দ্দন জানালার ফাঁক দিয়া কানাইয়ের কার্য্যকলাপ দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। সে তৎক্ষণাৎ গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহার গলা টিপিয়া ধরিল, এবং 'লক্ষ্মীবিলাস' তৈলের শিশি সহিত তাহাকে কর্ত্তার নিকট আনিয়া হাজির করিল।

'এই দেখুন, অর্দ্ধেকটা তৈল চুরী ক'রে মাথায় মেখেছে।'

কানাই। রান্না-ঘরে তেল ছিল না।

গুরুচরণ দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। সংসারে তাঁহার নানাবিধ কর্ত্তব্য কর্ম্ম এখনও পালন করা বাকি আছে, তাহার একটা প্রমাণ সম্মুখে—ও হাতে হাতে!

গুরুচরণ। জনার্দ্দন! একে থানায় চালান দাও চাকর হইয়া বিশ্বাসঘাতকতা! ৪০৯ ধারার অপরাধ।

কানাইকে থানায় চালান দেওয়াতে বাটীতে এক মহা গণ্ডগোল পড়িয়া গেল। কানাইয়ের মা চীৎকার করিয়া পাড়ায় বাড়ী বাড়ী রাষ্ট্র করিয়া দিল, 'কর্ত্তা এক জন দস্যি। তাঁর কাছে ঝি চাকর থাকবে কেন? আমার কানাইয়ের মত ধার্ম্মিক চাকর কল্‌কেতা সহরে নাই। যতবার চুরী করেছে, বাছা তা বলে' করেছে। লুকিয়ে সে কখনও চুরী করে নাই। তবে তার অপরাধ কি?'

পাড়ার যত ঝি বলিল, 'কোনও অপরাধই হয় নাই। ওদের বাড়ীতে আর চাকরী করিস নে। পুলিস কোর্টের মধুসূদন উকীলের কাছে যা। সে ছাড়িয়ে এনে তাকে চাকরী দেবে।'

কানাইয়ের মা চলিয়া যাওয়াতে বাটীর সৈরভি ঝিও বোঁচকা বাঁধিতে লাগিল। সে মধ্যে মধ্যে যতগুলি কাপড় ও কর্ত্রী ঠাকুরাণীর সেমিজ চুরী করিয়া সঞ্চিত করিয়াছিল, তাহা সেই পুঁটুলীর মধ্যে বাঁধিয়া খিড়কী-দ্বার পার হইতেছিল, এমন সময় মোটর-কারের 'সোফার' বাবু তাহার পথ জুড়িয়া দাঁড়াইল।

'তুমি কার হুকুমে বোঁচকা নিয়ে যাচ্ছ?'

সৈরভি বেগতিক দেখিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। দীনু ঠাকুর (রাঁধুনী ব্রাহ্মণ) রন্ধনশালা হইতে জিজ্ঞাসা করিল, 'সৈরভি! কান্‌ছিস্ ক্যানো রে।'

সৈরভি। আমার মানহানি কচ্ছে।

তাহা শুনিয়া এক লাফে দীনুঠাকুর বাহিরে আসিয়া 'সোফার' বাবুকে

বলিল, 'তোমার এত বড় আস্পর্দ্ধা! সোমত্ত বয়সের মেয়ে মানুষ কি, তা তুমি জান? তোমার নামে নালিশ ক'রবো।'

'সোফার' বাবু চটিয়া বলিল, 'তা যা হয় কোরো, আপাততঃ বেটী কাপড় চুরী কোরে পালাচ্ছে, তার একটা তদ্‌বির করা দরকার।'

তদবির করিতে গিয়া সোফার সৈরভির মস্তক হইতে কাপড়ের পুঁটুলী কাড়িয়া লইল। তাহা দেখিয়া দীনুঠাকুর তাহার কান টানিয়া ধরিল, এবং সোফার দীনুঠাকুরের নাক টিপিয়া ধরিল, এবং উভয়ে মল্লযুদ্ধে মত্ত হইয়া ঘোরগর্জ্জনসহকারে গলির মধ্যে পড়িয়া গেল।

গৃহিণী স্নান করিয়া 'ঘরে বাহিরে' নামক বহির খানিকটা পাঠ করিতেছিলেন, এবং মধ্যে মধ্যে তাহাদের কাণ্ড দেখিতেছিলেন। মল্লযুদ্ধের হাঁক ডাকে কর্ত্তা বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া 'সোফার' বাবু দীনুকে ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া পড়িল।

দীনু ঠাকুর কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, 'মহারাজ! দেখুন, এই ব্যাটা নারীহত্যা ও ব্রহ্মহত্যার চেষ্টা কচ্ছিল।'

'সোফার' বাবু বলিল, 'কিছুই নয়। এই ঝিকে বাটীর কাপড় চুরী ক'রয়া পলাতকা দেখিয়া আমি আট্‌কাচ্ছিলুম।'

গুরুচরণ মিত্র সৈরভির দিকে তাকাইয়া বজ্রগম্ভীরস্বরে বলিলেন, 'তুই এ কাপড় কোথায় পেলি?'

সৈরভি ভয়ে অবগুণ্ঠন টানিতে লাগিল। এমন সময় গৃহিণী খিড়কীর দ্বারে আসিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, 'আমার কাপড়। আমি ওকে ধোপার বাড়ী পাঠাচ্ছিলুম। তোমার এখানে আসা নিতান্ত অসভ্যের ন্যায় হয়েছে।'

গৃহিণীর নির্ভয় ব্যাখ্যা শুনিয়া সৈরভি করুণস্বরে ক্রন্দনের রোল বিস্তার করিল।

কর্ত্তা বিরক্ত হইয়া কেবল বলিলেন, 'অহ্‌:'; 'অঃ'; 'অক্‌'।

গৃহিণী আবার বলিলেন, 'সোফার'কে এখুনি জবাব দিয়ে দাও।'

কর্ত্তা বলিলেন, 'আইন অনুসারে ওর 'বাস্তব' ভুল হয়েছে। 'মিষ্টেক্ অফ্ ফ্যাক্‌ট্'। এতে কোনও অপরাধ হয় না। আইনের অজ্ঞতাই অপরাধ।'

গৃহিণী। 'বাস্তব' ভুলই আসল ভুল। আইন সকলে জানে না, সুতরাং আইনের ভুল সকলেরই হয়।

কর্ত্তা। এ সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা।

গৃহিণী। তোমার ও তর্কের কোনও সারত্ব নেই। পুলিসের লোকের যত আইনের বিদ্যে, তা সকলেই জানে।

৩

গৃহিণী তরুবালার ভাই মধুসূদন বাবু পুলিস কোর্টের উকীল। গৃহিণী সর্ব্বদা বাঙ্গালা কাগজপত্র পাঠ করেন। এই সব কথা মনে পড়াতে কর্ত্তা গুরুচরণ বাবুর বেশ বিশ্বাস হইয়া গেল যে, গৃহিণীর মাথা ক্রমশঃ খারাপ হইয়া যাইতেছে। সেইটুকু সংশোধন করিবার জন্য তিনি বলিলেন, 'উকীল মোক্তারই যে আইন্ জানে, তা নয়। তারা জানে কেবল জুয়াচুরী। কাগজওয়ালারাও মিথ্যা কথা লিখে' সকলের মনস্তুষ্টি ক'রে পয়সা নেয়। সংসারে পাপ কত বেড়ে যাচ্ছে, তা ইংরিজি ডিটেক্‌টিভ নভেলগুলো পড়লেই বুঝ্‌তে পারবে। আমরা ত হাতে হাতে দেখ্‌ছি।'

গৃহিণী। পুলিশ আর হাকিম কত সাধু, তাও বেশ দেখা যায়। বৎসরে অন্ততঃ একটা দুটো লোক ঘুস কিংবা অন্য কোনও অপরাধ ক'রে জেলে যাচ্ছে, নয় ত ডিস্‌মিস্ হচ্ছে। এতে বোঝা যায় যে, অনেকে ধরা পড়ে না। আরও বোঝা যায় যে, তাদের আদর্শ বড় নীচ। আমার বোধ হয়, ডিটেক্‌টিভ-নভেল না প'ড়ে যদি বার্নার্ড শ' ওইব্‌সেন প্রভৃতি পড়, তবে পাপের গোড়াটা একটু দৃষ্টিপথে আসে।' গুরুচরণ গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, 'একটু লেখা পড়া শিখে যা দোষ হয়, তাই তোমার হয়েছে। অর্থাৎ, মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। দৃষ্টিটাও খারাপ হয়ে যাচ্ছে।'

গৃহিণী। বেশী লেখাপড়া শিখ্‌লে তোমার সোফারের মাথা কেটে ফেলতুম। এখন কেবল বলছি যে, ওকে এখনি ছাড়িয়ে দাও।'

গুরুচরণ। আচ্ছা, আমার আপত্তি নেই, কিন্তু তোমার বামন ও চাকরাণী আগে ছাড়িয়ে দাও।

গৃহিণী তরুবালা ধীরভাবে বলিলেন, 'বেশ।'

এই রকমে কথাবার্ত্তা শেষ হওয়াতে কর্ত্তারও যেমন নীরবে রাগ বাড়িতে লাগিল, গৃহিণীরও তার দ্বিগুণ বাড়িতে লাগিল। বেগতিক, দেখিয়া ঝি ও দীনুঠাকুর এক দিক দিয়া পলাইল; 'সোফার' বাবুও কার ফেলিয়া ও পেট্রলের টিনগুলি গণিয়া দিয়া অন্য দিক দিয়া চলিয়া গেল।

বড় খোকা ও খুকী সকাল সকাল আহার করিয়া স্কুলে গিয়াছিল। ছোট খোকা (তিন বৎসরের কচি শিশু) গৃহিণীর আজ্ঞানুক্রমে সৈরভির বস্ত্রাচ্ছাদনে

লুকাইয়া 'মামার বাটী' চালিত হইয়া গিয়াছিল। আপাততঃ অন্য কোনও কাজ না থাকাতে গৃহিণী তাঁহার ভ্রাতাকে একখানা দীর্ঘ পত্রিকা লিখিতে বসিলেন।

গুরুচরণ মিত্র বাহিরে আসিয়াই সেদিনকার দৈনিক পত্রের 'ওয়ার কলম্' (যুদ্ধের ভাগটা) একনিঃশ্বাসে পাঠ করিলেন। মনে মনে ভাবিলেন যে, যুদ্ধের মূলে সবই এক রকম, কেবল বড় বড় যুদ্ধে গোলাগুলি চলে, এই যা। জগৎ এখনও সম্পূর্ণভাবে অসম্পূর্ণ, এবং ইহার নিয়ন্তা সর্ব্বশক্তিমান্ হইয়াও শক্তিহীন।

জনার্দ্দন সিংহ ইত্যবসরে আহারাদি সমাপ্ত করিয়া বৈঠকখানার দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইল। গুরুচরণ তাহাকে দেখিয়া ভাবিলেন, 'এরা দার-পরিগ্রহ না ক'রে বেশ এক রকম আছে।'

জনার্দ্দন সিংহ খবরটা মোটামুটি জানিতে পারিয়াছিল, সেই জন্য ভয়ে কোনও কথা কহিল না। তাহাকে নীরব দেখিয়া কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার খাওয়া দাওয়া হয়েছে ত ?'

জনার্দ্দন আজ অবসর পাইয়া আহারের মাত্রা বেশী রকম চড়াইয়া দিয়াছিল। কর্ত্তার প্রশ্নের মর্ম্ম বুঝিয়া সে বলিল, 'আজ কোনও রকমে চারিটি —।'

কর্ত্তা। আজ তিথিটা কি ?

জনার্দ্দন। পূর্ণিমা।

কর্ত্তা। অঃ! আজ আমি উপোস দিব—মনে করেছি।

জনার্দ্দন। আজ্ঞা হাঁ। সেটা খুব ভাল। মধ্যে মধ্যে পিত্তি এত বেড়ে যায় যে, শাস্ত্র পূর্ণিমা ও অমাবস্যার দিন উপবাসের সরাসর বিধি ক'রেছেন।

কর্ত্তা। এই তিন ঘণ্টাতেই যে রকম বোধ হ'চ্ছে, তাতে আজ কথাটা রক্ষা কর্ত্তে পারব কি না, ঠিক বুঝতে পাচ্ছিনে।

জনার্দ্দন। তবে কাজ নাই। যাদের বাতের ব্যামো, তারাই অমাবস্যাটাও রাখে, নচেৎ পূর্ণিমাই যথেষ্ট।

ইতিমধ্যে খোকা ও খুকী উভয়েই স্কুল হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

খুকী বলিল, 'মা, এসেছি!'

খোকা বলিল, 'মা, আজ এক্জামিনে ফার্ষ্ট হয়েছি।' গৃহিণী গম্ভীরভাবে বলিলেন, 'কৃতার্থ হলেম।'

এ রকম গম্ভীর ও নীরস সম্ভাষণ পুত্র কন্যা পূর্ব্বে কখনও শুনে নাই, সেই জন্য খুকী কিঞ্চিৎ জেরা করিয়া কহিল, 'আমার জলখাবার কৈ ?'

গৃহিণী। আজ জলখাবার তৈরি হয় নাই।

খোকা। ছোট খোকা কৈ?

গৃহিণী। মামার বাড়ী। তোমাদেরও সেখানে যেতে হবে।

খুকী। বাবা কোথায়?

গৃহিণী। তা আমি জানিনে। ওঁকে বলা হোক্ যে, ওঁর ভাত ঢাকা আছে, ইচ্ছা হ'লে খাবেন, না হ'লে না খাবেন। আমরা পটলডাঙ্গায় যাচ্ছি।

গুরুচরণ বাহির হইতে সকলই শুনিতে পাইতেছিলেন। তাঁহার মেজাজ বেতর খারাপ হইয়া পড়িল। তিনি জনার্দ্দনকে ডাকিয়া বলিলেন, 'জনার্দ্দন, বিদ্রোহানল সম্পূর্ণভাবে প্রজ্বলিত হয়েছে।'

৪

বিদ্রোহটা কাহার, এবং প্রজ্বলিত হইল বা কিরূপে, তাহা বৃদ্ধ জনার্দ্দন সিং সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না।

গুরুচরণ বলিলেন, 'দেখ জনার্দ্দন! বিদ্রোহটা বেয়াকুফ্ লোকের মধ্যেই হয়। উদাহরণে দেখ। যখন সিপাহীবিদ্রোহ হয়, তখন তারা মনে করেছিল যে, আমরা তাদের ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ কচ্ছি, অথচ তারা নিজের ধর্ম্ম নিজেই ধ্বংস ক'চ্ছে। সাঁওতাল-বিদ্রোহের সময় সেই অসভ্যগুলো মনে করেছিল যে, তারা একটা নিজের রাজ্য জঙ্গলের মধ্যে স্থাপন ক'রবে; অথচ তাদের পায়ে পর্য্যন্ত কেহ হাত দেয় নাই। মুণ্ডা-বিদ্রোহের সময় বির্‌সা মুণ্ডা মনে করেছিল যে, সে একটা অবতার, এবং ভগবান তাকে স্বাধীন হবার জন্ম পাঠিয়েছেন। অথচ যতগুলো অবতার, তারা কেবল খুন খারাপি ক'রে দেশটাকে ছারখার করে' গিয়েছিল। তার ফলে ধর্ম্ম দূরে থাকুক, কেবল অধর্ম্মই যুগে যুগে বেড়ে যাচ্ছে। এই রকম, এখন যারা কথায় কথায় বিদ্রোহ কর্ত্তে প্রস্তুত, তারা নিছক ঘোর অপগণ্ডের দল। হয় ত স্ত্রীলোক, নয় ত ছেলে পুলে। তারা মনে করে যে, স্বামী ও বাপগুলোকে ঠেঙ্গিয়ে, এবং নির্দ্দোষগুলোর টাকাকড়ি কেড়ে নিয়ে, এবং নষ্ট ক'রে জননী জন্মভূমির গৌরব বৃদ্ধি ক'রবে। এতে তোমার কি বোধ হয়?' জনার্দ্দন বিনীতভাবে নিবেদন করিল, 'এতে স্পষ্ট বোধ হয় যে, তাদের মাথায় বিদ্রোহের পোকা জন্মাচ্ছে। আমি কোনো খবরের কাগজে একবার পড়ে দেখেছিলুম যে, সকল রোগেরই এক এক রকম পোকা থাকে, সেগুলি এক দেশ হ'তে অন্য দেশে দৌড়ে বেড়ায়। আমার বোধ হয়, আমাদের দেশে সেই পোকা সুযোগ

পেয়ে স্ত্রীলোক ও ছেলেপুলেদের মাথায় সঞ্চারিত হ'চ্ছে। এমন কি, সাহিত্যিক ও কাগজওয়ালাদের মাথায়—

গুরুচরণ। যাদের লম্বা লম্বা চুল?

জনার্দ্দন। ঠিক্ তাই। লম্বা চুল ও সুগন্ধ পেলেই সেই পোকাগুলো তার মধ্যে প্রবেশ করে; আমি যখন আলিপুরের থানায় ছিলুম, তখন এক জন পঞ্জাবী কন্‌ষ্টেবলের মাথায় সেই পোকা ঢুকে প'ড়েছিল। এমন কি, কাণের মধ্যেও গোটা কতক পৌঁছেছিল। অনেক ওষুধ দিয়েও সেগুলি গেল না। তার পর কালীঘাটের সনাতন হালদার পরামর্শ দিলেন যে, হাবড়া ষ্টেশনে ইলেকট্রীক্ লাইটের সম্মুখে কান খাড়া ক'রে ও চুল এলো ক'রে দাঁড়িয়ে থাকিস্। আলো দেখ্‌লেই পোকাগুলো সেই দিকে দৌড়ে বেরুবে। তাইতে বাস্তবিক লোকটা সে যাত্রা পরিত্রাণ পেয়েছিল।

গুরুচরণ বাবুর মনে হইল যে, কথাটা খুব সম্ভব। এমন সময় একখানা গাড়ী খিড়কীদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। গুরুচরণ বাবু চক্ষুর নিমিষে বুঝিতে পারিলেন যে, ইহা পটলডাঙ্গা-প্রস্থানের যোগাড়।

ইহা রোধ করিবার কোনও উপায় তিনি দেখিতে পাইলেন না। কোনও কনষ্টেবল কিংবা কর্ম্মচারী বিদ্রোহ করিলে, অথবা থানা হইতে অনুমতি না লইয়া চলিয়া গেলে, অপরাধীর বিরুদ্ধে ২৯ ধারার মোকদ্দমা রুজু করা ভিন্ন কোনও উপায় নাই। কিন্তু গৃহস্থাশ্রম থানা নহে, এবং স্ত্রীপুত্রের সঙ্গে কনষ্টেবলের কোনও বাস্তব সাদৃশ্য নাই। সুতরাং এক বিষয়ের আইন অন্য বিষয়ে খাটাইতে গেলে গোলযোগ হইবার সম্ভাবনা। তাহার দৃষ্টান্তস্থলে গুরুচরণের মনে পড়িল যে, স্বায়ত্ত-শাসনের আইন বঙ্গদেশে ঠিক খাটে নাই। তাহার উপর যদি 'হোমরুল' চাপান যায়, তবে ঠিক এই রকম কেলেঙ্কারি হওয়া সম্ভব। নিরুপায় হইয়া গুরুচরণ জনার্দ্দনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

দেখিতে দেখিতে গাড়ী রাস্তা পার হইয়া চলিয়া গেল। গুরুচরণ জনার্দ্দনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এখন কি করা যায়?'

জনার্দ্দন। হুজুরের ষ্টার থিয়েটার দেখবার ইচ্ছা ছিল, একবার জানিয়েছিলেন। হঠাৎ মনে পড়ে গেল যে, আজ শনিবার। 'ক্যাণ্ডেল্ লাইটে' সীতার বনবাসের অভিনয়।

কর্ত্তা। সেটা আমারও মনে ছিল, কিন্তু গোলমাল হয়ে মেজাজটা খারাপ হয়ে গিয়েছে।

জনার্দ্দন। কিন্তু অনেক সময় থিয়েটার দেখ্‌লে মেজাজ ভাল হয়ে যায়। কলিকাতায় থাকার ঐটুকু সুবিধা।

কর্ত্তা। তবে তুমি দু' পয়সার কচুরী নিয়ে এস ; নির্জ্জলা উপবাস করিব, আমার সে রকম ইচ্ছে নেই। যদিও পূর্ণিমা, তা হলেও রাত্রি জাগ্‌লে অনাহারে বায়ু নিতান্ত চ'ড়ে যাবে।

জনার্দ্দন জলখাবার আনিতে গেল। গুরুচরণ বাবু ইজি-চেয়ারে পা দুলাইয়া স্বগত নানারকম আলোচনা করিতে লাগিলেন। তখন প্রায় সন্ধ্যা। বাটী নির্জ্জন। বাটীর মধ্যে তালা বন্ধ। বাহিরে দুইটিমাত্র ঘর খোলা, তাহার মধ্যে একটাতে তাঁহার বাহিরে যাইবার বস্ত্রাদি ছিল। সেই বস্ত্র হইতে তাঁহার পছন্দসই কাপড় খুঁজিতে গিয়া একটা পুরাতন ছদ্মবেশ বাহির হইয়া পড়িল। সেটা ব্রহ্মচারীর বেশ। বহুদিন পূর্ব্বে সেই বেশ পরিধান করিয়া গুরুচরণ বাবু একটা ডাকাতীর মোকদ্দমার কিনারা করিয়াছিলেন। হঠাৎ কি মনে হওয়াতে তিনি ব্রহ্মচারীর বেশ ধারণ করিলেন।

৫

জনার্দ্দন কচুরী হস্তে প্রত্যাবৃত হইয়া ব্রহ্মচারিবেশী কর্ত্তাকে তখনই চিনিতে পারিল। পুলিস-কর্ম্মচারীদের একটা মহৎ গুণ আছে যে, তাহাদের দলের লোককে, যে কোনও ছদ্মবেশেই থাকুক না কেন, অনায়াসে চিনিতে পারে। সুতরাং বাক্যব্যয় না করিয়া কচুরী কর্ত্তার হস্তে দিল।

গুরুচরণ তাহা খাইয়া জনার্দ্দনকে বলিলেন, 'তুমি সাবধানে বাটী আগ্‌লাও, সমস্ত জিনিসপত্র প'ড়ে আছে, আমার আস্‌তে অনেক রাত্রি হবার সম্ভব।'

জনার্দ্দন। তার জন্য আপনার চিন্তা নাই। ইতিহাসে পড়েছি, অওরংজেব বাদশার রাজত্বকালে মহারাষ্ট্রদের রাজা শিবজী এই রকম একটা বিপদে প'ড়ে বিজাপুরের দুর্গ এক জনমাত্র প্রহরীর হাতে সমর্পণ ক'রে বেরিয়ে পড়েছিলেন।

কর্ত্তা। কিন্তু দুর্গ শত্রুপক্ষ এসে জয় করেছিল।

জনার্দ্দন। তা হ'লে কি হয়, একটা পয়সাও চুরী যায় নাই। প্রহরীর যতটুকু কর্ত্তব্য, তা সে পালন করেছিল।

গুরুচরণ বাবু ভাবিয়া দেখিলেন যে, বাস্তবিক পক্ষে জনার্দ্দনের চুরী ডাকাতী ছাড়া অন্য কিছু বোধ করা সাধ্যাতীত। সুতরাং তিনি একখানা গাড়ী ডাকিয়া ষ্টার থিয়েটারে চলিয়া গেলেন।

উকীল মধুসূদন বাবুও টিকিট কিনিয়া রঙ্গালয়ে প্রবেশ করিতেছেন। প্রথমে তাঁহার মনে হইল, হয় ত মেয়েছেলেরাও তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছে। কিন্তু তাহার কোনও লক্ষণ দেখিতে না পাইয়া তিনিও একখানি টিকিট কিনিয়া মধুসূদন বাবুর পার্শ্বেই বসিয়া পড়িলেন।

মধুসূদন বাবু অতিশয় সদালাপী ভদ্রলোক, এবং আইন সম্বন্ধে তাঁহার গভীর জ্ঞান। পার্শ্বেই এক জন বৃদ্ধ ব্রহ্মচারীকে উপবিষ্ট দেখিয়া কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহাশয়ের নিবাস?'

গুরুচরণ। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে।

মধুসূদন। কি করা হয়?

গুরুচরণ। দেখ্‌তেই পাচ্ছেন, আমি সাধু পুরুষ, গুরুগিরি ক'রে বেড়াই।

কথার ভঙ্গী ও চড়া সুর লক্ষ্য করিয়া প্রবীণ উকীল মধুসূদন বাবু বলিলেন, 'আপনার শিষ্যগুলির বেশী ভাগ বোধ হয় পুলিসের লোক?'

গুরুচরণ। আপনি আমাকে 'সি, আই, ডি'র কোনও লোক মনে করেছেন না কি?

মধুসূদন। ঠিক তা নয়, তা হ'লে আমি চুপ করে থাকতেম। কেন না, আমার নাম তাদের খাতায় দর্জ্জ বোধ হয়।

গুরুচরণ। আপনি ঠিক ধ'রেছেন; আমার শিষ্যের মধ্যে প্রধান গুরুচরণ মিত্তির, বীডন ষ্ট্রীটে থাকে।

মধুসূদন বাবু তাঁহাকে নমস্কারপূর্ব্বক বলিলেন, 'কি আশ্চর্য্য! আমার ভগ্নীর সঙ্গে তাঁর যে বিবাহ হয়েছে। আমার নাম মধুসূদন দে। পুলিস কোর্টের উকীল।

গুরুচরণ বাবু তাঁহার ছদ্মবেশ পাকা রকম হইয়াছে দেখিয়া পরম পুলকিত হইলেন। এত পাকা যে, তাঁহার শ্যালক পর্য্যন্ত লক্ষ্য করিতে পারেন নাই! প্রকাশ্যে বলিলেন, 'খুব আনন্দের বিষয়। আমি গুরুচরণের কাছে আপনার নাম শুনেছি।'

ক্রমে অভিনয়ের দুই একটা দৃশ্য দেখিতে দেখিতে গুরুচরণ বাবুর ধর্ম্মভাব উদ্দীপ্ত হইয়া অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। মধুসূদন বাবু তাহা দেখিয়া কহিলেন, 'আপনার খুব ভাব লেগেছে। আমাদের হৃদয় এত কঠিন যে, অভিনয় নিতান্ত ভাল না হ'লে চোখ্‌ দিয়ে জল পড়ে না।'

গুরুচরণ। ওটা অভ্যাস, কেবল অভ্যাস। আপনার 'বনবাস' সম্বন্ধে কি মত? রামের কি সেটা উচিত হয়েছিল?

মধুসূদন। উচিত হ'লে আমাদের দুঃখই হ'ত না।

গুরুচরণ। ঐখানে আপনাদের সম্পূর্ণ ভুল। ভগবান যে কাজ্‌টা করেন, সেটা ঠিক না হ'লে ঋষিরা লিখ্‌বেন কেন? বিদ্রোহাচরণ কর্‌লে স্ত্রীলোককে বনবাস দেওয়াই ঠিক শাস্তি। বিদ্রোহী পুরুষ হ'লে তাকে 'ইন্‌টরন্‌' করাই প্রশস্ত। অবশ্য, বল্‌তে হবে যে, দুটোই সন্দেহের উপর নির্ভর কচ্ছে। কিন্তু অনেক সময় সন্দেহটা ঠিক হয়ে পড়ে। হয় ত সীতার বেলায় তা হয়নি, কিন্তু সেকালের প্রথার সঙ্গে একালের আইন কানুনের এত মিল্‌ যে, তাই দেখে আমার চোখ দিয়ে অশ্রু বেরুচ্ছিল।

মধুসূদন। আপনি দেখ্‌ছি আইন কানুনও বেশ জানেন। আচ্ছা, কেবল সন্দেহ ক'রে একটা লোককে আপনার কষ্ট দেবার কি অধিকার আছে? দোষ অন্ততঃ খানিকটা সাব্যস্ত না হ'লে তাকে ত নিরপরাধ মনে কর্ত্তে হবে?

গুরুচরণ। সন্দেহ কি অমনই হয়? ভাব ভঙ্গী, কথাবার্ত্তা, চাল চলন, সঙ্গদোষ, চোট্‌পাট্‌ আস্ফালন, নানা রকম লক্ষণ দেখে সন্দেহ আপনিই এসে পড়ে। তার সম্পূর্ণ কৈফিয়ৎ পাওয়া না গেলে সেগুলো প্রমাণ হয়ে পড়ে।

৬

পট-ক্ষেপণের পর গুরুচরণ বাবু বিশদরূপে বুঝাইতে লাগিলেন, 'এই দেখুন, একটা সামান্য বিষয় —লঙ্কায় বাস করা নিয়ে রামচন্দ্রের সীতার উপর সন্দেহ হয়েছিল। কেন? দশ জনে সেই সন্দেহ করেছিল ব'লে'।'

মধুসূদন। সে সব দশ জন পুলিসের বুদ্ধিওয়ালা।

গুরুচরণ। ঠিক তা নয়। এই দেখুন, ভগবানকেই মানুষ সন্দেহ করে; সেই জন্য ঢাকঢোল বাজিয়ে তাঁকে সময় অসময়ে বিরক্ত কর্ত্তে ছাড়ে না। অনেকে কাজ গুছিয়ে নেবার জন্য বলে,—ঠাকুর! আপাততঃ এই উপকারটা ক'রে দাও, পাঁচ পয়সার সিন্নি দেব। এই ত গেল ভগবানের উপর বিশ্বাস। তার পর দেখুন, মানুষ কোন কাজটায় মানুষকে বিশ্বাস করে? আগে আমরা স্ত্রীলোকদের ভয়ানক সন্দেহ করতুম ব'লে' ঘরে বন্ধ করে' রেখে' দিতুম। পরে যখন দেখা গেল যে, বন্ধ ক'রে বিশেষ কোনও লাভ নাই, তখন তাদের অনেকটা স্বাধীনতা দিয়েছি। কিন্তু এখনও সন্দেহ হ'লে খানাতালাসী করবার অধিকার আপনাদের গিয়েছে কি? সে কি রকম খানাতালাসী? মনের মধ্যে খানাতালাসী। অর্থাৎ, আগে তুমি দেখ্‌তে চাও, তোমার স্ত্রী পুত্র আত্মীয় কুটুম্ব তোমাকে বাস্তবিক ভালবাসে কি না; যদি কোনও ভালবাসার কথা বলে, সেগুলি

খাঁটী কিনা। তবে তুমি ভালবাস্তে রাজি হও। সংসারে প্রবঞ্চনা ও ফাঁকি দেওয়া এত প্রবল হয়ে পড়েছে, লেখাপড়া শিখে কথাবার্ত্তা আদব কায়দা এত দোরস্ত হয়েছে যে, দোকানদারের ত কথাই নাই, বন্ধু বান্ধবকেও সন্দেহ না কর্‌লে বিষম বিপদ। এতে দু এক জন নির্দ্দোষ লোকের কষ্ট হয় বটে, কিন্তু ফলে তোমারই জয় হয়। সেই জন্য শাস্ত্র বলেছেন, "যতঃ ধর্ম্মোস্ততঃ জয়ঃ।" সন্দেহ করাটাই প্রধান ধর্ম্ম। বিশ্বাস করাটা অধর্ম্ম। বিশ্বাস কর্‌লে চুরী ডাকাতী খুন খারাপি এত বেড়ে যাবে যে, সামলানো মুস্কিল হবে।

মধুসূদন বাবু ব্রহ্মচারীর বক্তৃতা শুনিয়া মনে মনে ভাবিলেন যে লোকটা বাস্তবিক পুলিসেরই গুরুঠাকুর। একটু হাসিয়া বলিলেন, 'আপনার কথাগুলি সারগর্ভ, তাতে কোনও সন্দেহ নাই; কিন্তু আপনি যেমন দশ জনকে সন্দেহ করেন, আপনাকেও তারা সেই ধর্ম্ম অনুসারে সন্দেহ কর্‌বে, ফলে সংসারে কখনও শান্তিস্থাপন হবে না। ক্রমে সকলে সকলের মন থেকে তফাৎ হয়ে যাবে।'

গুরুচরণ। ভবিষ্যতে ফলটা কি দাঁড়াবে, তার দিকে দৃষ্টিপাত করা শাস্ত্র-বিরুদ্ধ। সন্দেহ করা হ'চ্ছে জ্ঞানীর কর্ম্ম, বিশ্বাস করা জ্ঞানবিরুদ্ধ। যদি কোনটারই ফলের দিকে দৃষ্টিপাত না করে' নিরপেক্ষভাবে দেখেন, তবে বুঝতে পারবেন যে, জ্ঞানযোগের সঙ্গে কর্ম্মযোগের সম্বন্ধ কেবল সন্দেহটা নিয়ে। ভগবান্ এই বিশ্বের বিরাট মায়াটা সন্দেহের চক্ষে দেখেন বলে'ই জীবাত্মা সন্দেহপরায়ণ হয়। এই সন্দেহটা যখন পরস্পরের কর্ম্মে ঘুচে যাবে, তখন জীব আপনা-আপনি ঈশ্বরকে বিশ্বাস কর্‌বে।

মধুসূদন। আপনি খুব বিচক্ষণ লোক। যদি গীতার একখানা টীকা করেন, তবে খুব বিক্রয় হয়।

গুরুচরণ। আমার শিষ্য গুরুচরণ তিন মাসের ছুটী নিয়ে আমার পরামর্শানুসারে একখানা টীকা লিখ্‌ছে। এখনও ছাপায় নাই। তার মনটা ভাল নেই। আজ একটা মহাকাণ্ড হয়ে গেছে।

মধুসূদন। আমি শুন্‌তে পারি কি?

গুরুচরণ। আপত্তি নেই, তবে কথাটা পারিবারিক, আর আপনার বোধ হয় এরি মধ্যে জানা হয়েছে।

মধুসূদন। বাস্তবিক আমি কিছু জানিনে।

গুরুচরণ (সন্দিগ্ধনেত্রে)। কেন? আজ বেলা তিনটের সময় আপনার ভগ্নী ছেলেপুলে নিয়ে আপনার ওখানে ত গিয়েছেন। তিনি নিশ্চয় বলে' থাক্‌বেন।

মধুসূদন বাবু আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন।

'আমি কিছু বুঝতে পাচ্ছিনে। আমার ভগ্নীর কাছ থেকে আজ কেবলমাত্র একখানা চিঠি পেয়েছি যে, গুরুচরণ সকলকে নিয়ে থিয়েটার দেখ্‌তে আসবে, এই কথা ছিল, কিন্তু তাঁর মত বদ্‌লে যাওয়াতে আমার ভগ্নী একটু দুঃখিত হয়েছিল; কেন না, গুরুচরণ শেষে একলা যাবে বলে' ঠিক করেছিল। তার পর ঝি ছোট খোকাকে নিয়ে আমার স্ত্রীর নিকট রেখে গেছে।'

গুরুচরণ কথাটা হঠাৎ বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। 'বোধ হয়, আপনার ভুল হ'চ্ছে, আমি নিজের চথে দেখেছি, তারা গাড়ী ক'রে পটলডাঙ্গায় রওনা হয়েছে। আজ কারও খাওয়া দাওয়া হয় নাই। বোধ হয়, একটা খুব ঝগড়া হয়ে গেছে।'

মধুসূদন বাবু বলিলেন, 'পুলিসের লোকের পক্ষে এটা হওয়া কিছুই আশ্চর্য্য নয়; বিশেষতঃ, আপনার মত সন্দেহবাদী গুরু যখন তাঁহার সারথি। আমার বোধ হয়, বিষয়টার অনুসন্ধান করা উচিত। বিশেষতঃ, আমার ভগ্নী একটু 'সেন্‌সিটিভ্'। তা হ'লেও সে খুব 'সেন্‌সিব্‌ল,' সেটা বল্‌তে হবে।' ইহা বলিয়া মধুসূদন বাবু বল্লেন, 'আমি যাচ্ছি।'

৭

মধুসূদন বাবু ইহা বলিয়াই রঙ্গালয় হইতে বাহির হইলেন। গুরুচরণ বাবুও বিশেষ রকম চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। যদি পটলডাঙ্গায় না গিয়া থাকে, তবে তাঁহার স্ত্রী ও ছেলেপুলে গেল কোথা? একটা বিষম সমস্যা! 'সেন্‌সিটিভ্' স্ত্রীলোক অনেক সময় আত্মহত্যাও করে' থাকে। কিন্তু বনবাসে গিয়াও সীতা আত্মহত্যা করেন নাই, এটা একটা মস্ত দৃষ্টান্ত। একটা স্কুলের ছোকরার মত গৌরবর্ণ লম্বা বালক তাঁহার পশ্চাৎভাগে লেসের পর্দ্দা-ঢাকা বক্সে আপাদমস্তক 'কেপ'-অল্‌ষ্টারে আবৃত হইয়া ও প্রকাণ্ড সবুজ চশমা নাকে দিয়া বসিয়া ছিল। গুরুচরণ নিকটে কাহাকেও না দেখিয়া সেই বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ওহে ছোকরা! তুমি বলতে পার, সীতা আত্মহত্যা করেন নাই কেন?'

বালক উঠিয়া পড়িল, এবং যাইবার সময় খুব নম্রস্বরে বলিয়া গেল, 'আপনি একটা প্রকাণ্ড গরু। স্বামীর যদি বুদ্ধিভ্রংশ হয়ে যায়, তবে সতী আত্মহত্যা করে না, তার বুদ্ধিটুকু শাণিয়ে দেয় মাত্র।'

গুরুচরণ বাবু ভাবিলেন যে, ছোট ছোট ছেলেরাও আজকাল একটু লেখা-পড়া শিক্ষা করিয়া বাচাল হইয়া পড়িয়াছে।

খানিকক্ষণ পরেই যবনিকা-পতন হইয়া গেল।

গুরুচরণ বাবু বিলক্ষণ সন্দিগ্ধচিত্তে বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন রাত্রি প্রায় এগারটা। সিংহদ্বারে গুরুচরণ পাইচারী করিতেছিল। গুরুচরণ বাবু তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সব মঙ্গল ত?'

জনার্দ্দন। মঙ্গল সম্পূর্ণ। কিছু চুরী যায় নাই।

গুরুচরণ কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়াই বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন 'বাটীতে লোকের কোলাহল হচ্ছে কেন? মধুসূদন বাবু এসেছেন নাকি?'

জনার্দ্দন। মধুসূদন বাবু এসেছেন। কোলাহল তার পূর্ব্ব হতেই আরম্ভ হয়েছিল, অর্থাৎ, হুজুর যতক্ষণ ছিলেন, ততক্ষণ সকলে বাটীর মধ্যে তালা বন্ধ করে' ছিল, আপনি বেরিয়ে যাওয়াতে তারা কোলাহল বিস্তার করে ফেল্লে।

গুরুচরণ। এখনও আমি ঠিক বুঝতে পাচ্ছিনে।

জনার্দ্দন। আমি পূর্ব্বেই হুজুরকে রিপোর্ট করেছি যে, গৃহস্থ-সংসারে 'ডিসিপ্লিন্' রাখা শক্ত। আসল কথা, এঁরা কেউ বাড়ী হতে বেরুন নি। গিন্নী, ছেলেপুলে, দাসদাসী, বামুন ঠাকুর, সকলেই বাড়ীর মধ্যে আপনার ভয়ে লুকিয়ে ছিল। বোধ হয়, খিচুড়ী খেয়ে দিনটা কাটিয়েছে; কেন না, বাজার হতে তরকারী পর্য্যন্ত আসে নাই, আর মাছ ভাজার শব্দ পর্য্যন্ত হয় নাই। এমন কি, সেই কানাই চাকরটা, যাকে থানায় চালান দিয়েছিলেন, সেটা জামীনে খালাস হয়ে' আবার কোন তক্কে বাড়ীতে ঢুকে পড়েছে। এতে আমাকে দোষী করবেন না। ভেবে দেখুন, বাড়ীটা প্রকাণ্ড, আর লোকগুলো টানা বুদ্ধিমান। বিজাপুরের দুর্গের কথা বলেছিলেন, সেটা মধ্যযুগের কথা। তখন শত্রুপক্ষ দুর্গের বাহির হতে প্রবেশ করিত, আজকাল দুর্গের মধ্যেই এমন ভাবে লুকিয়ে থাকে যে, বুঝিবার সাধ্য নেই।

গুরুচরণ। জনার্দ্দন! আমার সন্দেহ হচ্ছে যে, যখন গাড়ীখানা বেরিয়ে গিয়েছিল, তখন তুমি জান্তে যে, সেটা খালি গাড়ী। আরও একটা সন্দেহ হচ্ছে, তুমি যে কচুরী কিনে এনেছিলে, সে বাড়ীর তৈরি কচুরী। কেন না, তার আস্বাদন খুব ভালো, আর দু' পয়সায় আটখানা কচুরী বাজারে পাওয়া যায় না, সে কথা তখন মনে হয়নি।

জনার্দ্দন বিনীতভাবে বলিল, 'হুজুরের ডিটেক্‌টিভ্-বুদ্ধির উপরে চলে, এমন সাধ্য কাহার? তবে আমার কৈফিয়ৎ আছে। মা আমাকে ঐ আটখানা কচুরী সকালে খেতে দিয়েছিলেন। পাছে আপনি উপবাসী থাকেন, তাই সেগুলি

লুকিয়ে রেখেছিলেম। এই লউন আপনার দুই পয়সা। আজ হ'তে আমাকে অব্যাহতি দিন।'

ইহা বলিয়াই জনার্দ্দন পাগড়ী দিয়া তাহার চক্ষু আবৃত করিল। বোধ হয়, তার অশ্রু ছুটিতেছিল। গুরুচরণ বাবু ভাবিলেন যে, হয় ত জনার্দ্দন খুব পাকা অভিনেতা, নয় খুব প্রভুভক্ত। প্রথমটা খুব সম্ভব; কেন না, জনার্দ্দন পুলিসের পুরাণো লোক। দ্বিতীয়টাও সম্ভব, কারণ—রামচন্দ্র যদিও সীতাকে সন্দেহ করেছিলেন; হনুমানকে সন্দেহ করেন নি। ইহা মনে করিয়া জনার্দ্দনের মনে একটু বিশ্বাস হইল, এবং সেই বিশ্বাসের সঙ্গে মেজাজ কিঞ্চিৎ করুণাপূর্ণ হইয়া গেল। তখন তিনি বলিলেন, 'জনার্দ্দন, তুমি কিছু মনে ক'র না। সন্দেহ ও বিশ্বাসের মধ্যস্থলে এমন একটা যায়গা আছে যে, সেখানে খানিকক্ষণ দাঁড়ালে, একটা শান্তি পাওয়া যায়। বিদ্রোহটাকে প্রথমে যা মনে করেছিলাম, সেটা ঠিক সে রকম নয়। এটা আমাদের বিদ্রোহ, নিরুপায় ও নিঃসহায়দের বিদ্রোহ। বিশ্বে যারা ভালবাসা চায়, কিন্তু যাদের কাছে চায়, তারা মন খুলে দেয় না, সন্দেহ করে, এটা সেই ভালবাসার বিদ্রোহ। এতে ২৯ ধারা চলে না।'

৮

জনার্দ্দনের নিকট এবংবিধ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গুরুচরণ বাবু ব্রহ্মচারীর বেশ ছাড়িয়া আবার ধুতি পরিধান করিলেন। খানিকক্ষণ পরেই খোকা ও খুকী তাঁহাকে আসিয়া জড়াইয়া ধরিল।

খুকী। বাবা! আজ সমস্ত দিন মা আমাদের বাড়ীতে বন্ধ করে রেখে দিয়েছিলেন। খেতে দেন নাই।

খোকা। আমি দুখানা কচুরী খেয়েছি। কিন্তু মা কিছুই খান নাই।

খুকী। মা লুকিয়ে মামার সঙ্গে অলষ্টর গায় দিয়ে আপনাকে থিয়েটরে খুঁজতে গিয়েছিলেন। মা খুব চালাক। আপনি বাবাজীর পোষাক পরেছিলেন, মা তা টের পেয়েছেন। কিন্তু মামা তা টের পান্ নি।

খোকা। কিন্তু মামা সন্দেহ করেছিলেন (হাস্য)।

খুকী। মা আজ সমস্ত দিন কেঁদেছেন। চোখ ফুলে গেছে।

খোকা খুকীকে ভৎর্সনা করিয়া বলিল, 'যাঃ! ও কথা বল্‌তে নাই।' ইহা বলিয়া পিতার মুখের দিকে তাকাইল।

গুরুচরণ গম্ভীরভাবে তাহাদের বুকে টানিয়া লইয়া বলিলেন, 'আচ্ছা, বলুক।'

খুকী কিন্তু আর সে কথা বলিল না, কি মনে করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

খোকা পিতার কর্ণে চুপি চুপি বলিল, 'মা খুকীকে মেরেছেন। তিনি বলেন, "তোর বিয়ের জন্যই ত আমার ভাবনা, নচেৎ সংসারে আমার ভাবনা কিসের"?'

গুরুচরণ বাবু খুকীর মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন, 'আমি তোর মাকে ব'কব এখন।'

ইহা বলিয়া গুরুচরণ বাবু বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতে চাহিলেন, কিন্তু পা সরিল না। তিনি দীনু ঠাকুরকে ডাকিয়া বলিলেন, 'তোদের রান্না সব তৈরি ত?'

দীনু। সব ঠিক।

মধুসূদন বাবু দোতালা হইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ব্রহ্মচারী মহাশয় ফিরে এসেছেন না কি?'

গুরুচরণ বাবু হাসিয়া বলিলেন, 'এসেছেন। আপনি একবার এ দিকে এলে ভাল হয়।'

মধুসূদন নীচে আসিয়া বলিলেন, 'বিদ্রোহানলের অবস্থা এখন কি রকম?'

গুরুচরণ। অনেক সময় বিদ্রোহ না হ'লে সমাজের মতিগতি ঠিক বুঝা যায় না। সেইটুকু বুঝতে পারলে আইনটা বদলে ফেলা যেতে পারে।

মধুসূদন। তা হ'লে পুলিসওয়ালাদের চাকুরী যায় যে।

গুরুচরণ। চাকুরী অনেক দিকে হয়। আমার বোধ হয়, ভবিষ্যতে আমাদের পুলিসের কাজ ছেড়ে কৃষ্ণনাম কর্ত্তে হবে। তখন বৈষ্ণবধর্ম্মে আর চালাকী চল্‌বে না। এখনকার বৈষ্ণবগুলো যেমন মূর্খ, তেমনই ঠাণ্ডা। ভবিষ্যতের বৈষ্ণব পুলিসের লোক থেকেই হবে। তখন দেশে আর বিদ্রোহের গন্ধ থাকবে না।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

সকারের সাফল্য।

ঠিক স্মরণ নাই, সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির ও তাহার পূর্ব্বাংশে স্থিত পরেশনাথ মন্দিরের মধ্যবর্ত্তী কোনও এক স্থানের Municipal sewer নির্ম্মাণ করিবার সময় আমার সহকারী ভূগর্ভে প্রোথিত এক স্ফটিক-ভাণ্ড অবিষ্কার করিয়া আমায় উপহার দেন। ইহার উপর খরোষ্ঠী অক্ষরে লিখিত ছিল—'শকারং পরমেশানি! শৃণু বর্ণং শুচিস্মিতে!' অবশিষ্টাংশের পাঠোদ্ধারে সমর্থ হই নাই।

আমি বহুকষ্টে কৌটা খুলিয়া দেখি যে, তাহার মধ্যে একটি পত্রে কি লিখা রহিয়াছে। পাঠ করিয়া দেখি, ইহা কোনও প্রাচীন, ভূত-ভবিষ্যৎ-বেত্তা ঋষির আধুনিক বাঙ্গালায় লিখিত রচনা; নাম, 'সকারের সাফল্য'।

প্রবন্ধটি লইয়া মাসিক পত্রে বিশেষ গবেষণা চলিতেছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল দরবার লাইব্রেরীর এক পুরাতন কীটদষ্ট পুথি'র মধ্যে ইহার reference পাইয়াছেন; তাহার সাহায্যে ইনি আবিষ্কার করিয়াছেন যে, বাঙ্গালা অক্ষর খরোষ্ঠী বা মহারাষ্ট্রী বা সৌরাষ্ট্রী অক্ষরের স্নুষা, কিংবা শ্বশ্রূ-স্বরূপ, অর্থাৎ গোত্র এক।

সতীশ বিদ্যাভূষণ মহাশয় নাকি সিকিমের উপকণ্ঠস্থ গিয়াংসির বৌদ্ধ মঠে একখানি প্রাচীন বৌদ্ধ ন্যায়-গ্রন্থের টীকায় এ বিষয়ের উল্লেখ পাইয়াছেন। সুখের বিষয়, তাঁহাকে মূল টীকাটি পড়িতে হয় নাই। তিনি সংবাদ পাইয়াছেন, St. Petersburg Libaryর গ্রন্থ-রক্ষক রুসীর ভাষায় যে অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার জর্ম্মান্ সংস্করণের ইংরাজী অনুবাদের পাদটীকায় ইহার সংক্ষিপ্ত সমালোচনা আছে। অতএব সন্দেহের কোনও কারণ নাই যে, ইহা প্রক্ষিপ্ত নহে। বিশ্বকোষের বিশ্ববিশ্রুত বসুজা মহাশয় শ্যামল বর্ম্মার তাম্রশাসনে ও কাশী বিদ্যাবাগীশের অপ্রকাশিত সম্বন্ধনির্ণয় গ্রন্থে ইহার রাশি রাশি উল্লেখ পাইয়াছেন; শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণেরাও নাকি এই কথা বলিয়াছেন। আমি ম্লেচ্ছভাষাবিৎ নই; আপনারা যদি অনুবাদ করিয়া দেন, তবে আমার আবিষ্কারটি আদি ও অকৃত্রিম বলিয়া নোবেল-পুরস্কার পাইবার প্রত্যাশা করিতে পারি। পুরাতন-প্রসঙ্গ-রচয়িতাও আমায় support করিবেন; তিনি বীডন্ উদ্যানে বসিয়া কৃষ্ণকমল বাবুর নিকট এ বিষয়ের আভাষ পাইয়াছেন। অতএব,

রাখালদাস বাবুকে ভয় করিবার কোনও কারণ নাই; মুদ্রা ঘাঁটিয়া ঘাঁটিয়া প্রক্ষিপ্ত বলা তাঁহার মুদ্রাদোষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখনই রাজশাহী হইতে মৈত্রেয় মহাশয়কে আনাইয়া মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষের তাম্রশাসন হইতে নজীর বাহির করাইয়া উপহাসাস্পদ করিব। অতএব রাখাল বাবু সাবধান।

আমরা তিন সহোদর এক সংসারেই আছি; তিন সংখ্যাটি অশেষ-শুভদায়ক; তোমরা তিনের সহিত ত্র্যহস্পর্শের স্পর্শদোষ ঘটাইয়া শঙ্কিত হও; কিন্তু বৈষ্ণব শাস্ত্র পাঠ করিলে তিনের মাহাত্ম্য বুঝিবে। তিনের প্রতি এমনই শ্রদ্ধা যে, ৪ জনকে সাড়ে তিন জন বলা হইয়াছে, তথাপি ৪ জন বলা হয় নাই।

চৈতন্যচরিতামৃতে আছে:—

'শিখি মাইতীর ভগ্নী শ্রীমাধবী দেবী।
বৃদ্ধতপস্বিনী তেঁহো পরমা বৈষ্ণবী।
প্রভু লেখা করে যেই রাধিকার গণ।
জগতের মধ্যে পাত্র সাড়ে তিন জন।'

তিনটী ঘণ্টা না দিলে রেলগাড়ী ষ্টেশন ছাড়ে না; তিন বার না ডাকিলে নিলাম সিদ্ধ হয় না; এবং বিচারালয়ে সাক্ষীদের তিনবার ডাকিতে হয়; তিনের মহিমার প্রচারার্থ তামা, তুলসী ও গঙ্গাজল দ্বারা শপথ লইবার ব্যবস্থা ও সমাজদ্রোহীকে শাস্তি দিবার জন্য ধোপা, নাপিত ও কলু বন্ধ করা হয়। এ কথা জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে লোমহর্ষণ-পুত্র সৌতি বৈশম্পায়নের নিকট শ্রবণ করিয়া নৈমিষারণ্যে শৌনক প্রভৃতি ঋষিগণের নিকট বর্ণনা করিয়াছিলেন। অতএব তিনের 'জয়মুদীরয়েৎ'। যেখানে দ্বিবচন বা দুইএর উল্লেখ দেখিবে, সেইখানেই বিষম সন্দেহ; নিশ্চয়ই কোনও দুষ্ট অভিসন্ধির চেষ্টা, যেমন হুঁকা কল্‌কে—তাম্রকূটসংযোগে হুঁকা-কলিকার দ্বারা অভ্যর্থনা করিলে Indian Penal Codeএর Cheating সেক্‌সনে নালিস চলে; ডাঃ রাসবিহারী ঘোষের নিকট শুনিয়াছি যে, এতৎ সম্বন্ধে Privy Councilএর Ruling আছে।

আমরা একান্নবর্ত্তী সংসারে বাস করি বলিয়াই এক নামে, এক শিলমোহরে সমস্ত কার্য্য নিষ্পন্ন হয়। বহুবচন একবচনে পর্য্যবসিত; কেন না, আমরা একাই এক শ'। সেই জন্য 'আমরা' না বলিয়া 'আমি' বলিব।

আমার বিশ্বরূপ যে সন্দর্শন করে নাই, সে কখনই সৌভাগ্যশালী নহে; সামান্য protoplasmic cellএর মধ্যেও আমি, আর বিশাল সৌরজগতেও আমার

দেখিবে। সৃষ্টির মূলে আমি, কেন না, 'সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়'। পঞ্চ-তন্মাত্রে আমায় দেখিতে পাও না বলিয়া আমার উপর নিষ্ফল আক্রোশ করিও না। এই জন্যই আমি ঈশ্বরকৃষ্ণের দ্বারা আভাষে বলাইলাম, 'প্রতিবিষয়াধ্যবসায়ো-দৃষ্টং ত্রিবিধং' ইত্যাদি। আমি সৃষ্টির আদিতে মহাকাশে স্পন্দনের সাহায্যে শক্তির বিকাশ দেখাইয়াছিলাম। সৃষ্টিমূলক ষড়্‌ভাববিকারের মধ্যেও আমায় দেখিবে। আমি আণবিক বিশ্লেষণ ও প্রসারণে আছি; কিন্তু আকুঞ্চনে নাই; কারণ, আমি কিছুতেই সঙ্কুচিত হই না।

আমার জ্ঞান না হইলে সর্ব্ববিধ ভাষায় প্রবেশাধিকার হয় না; নিপাতনে আমি সিদ্ধ হই বলিয়া 'পৃষোদরাদিত্বাৎ' সূত্রে স্বীকার করা হইয়াছে। সামাজিক বলিয়া আমি একা থাকিতে পারি না; সেই জন্য আমি সংত সন্ধি ও সমাস দ্বারা সম্বদ্ধ। তদ্ধিতে আমিই আছি। ব্যাকরণে একটু প্রবেশাধিকার হইলে দেখিবে যে, ষ্ণিক, ষ্ণ আমারই রূপান্তরমাত্র। আমি অষ্টাধ্যায়ী পাণিনি, সুপদ্ম ব্যাকরণ, সংক্ষিপ্তসার, সিদ্ধান্ত-কৌমুদীতে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত আছি। স্পর্শ ও উষ্ম বর্ণ আমি। বৈয়াকরণেরা বিসর্গ ও অনুস্বারকে অযোগবাহ দোষ দিয়া হস্ত ধরিয়া বহিষ্কৃত করিয়া দিলেও, আমি আশ্রয়স্থানভাগী ও অনুনাসিক বলিয়া ইহাদিগকে সাদরে স্থান দিয়া থাকি। আমার সদৃশ স্বজন-প্রতিপালক কোথায়? বিশেষ্য বিশেষণ, সর্ব্বনামে আমি; সমাপিকা, অসমাপিকা হিসাবে সর্ব্ববিধ ক্রিয়ার মধ্যে আমি। তবে সময় সময় আমাকে নিষ্ক্রিয় অবস্থায়ও থাকিতে হয়।

আমি পঞ্চবিধ প্রত্যয়ের মধ্যে শুদ্ধ স্ত্রীপ্রত্যয়ে বর্ত্তমান; স্ত্রীজাতিকে আমি যত প্রত্যয় বা বিশ্বাস করি, এমন কাহাকেও করি না। আমি স্ত্রীলোককে সমধিক শ্রদ্ধা করি বলিয়া অনেকে সন্দেহ করেন যে, আমি স্ত্রৈণ; আমি Chivalrous বলিয়াই এই আক্রোশ।

আমার ধাতু আদৌ ক্ষীণ নহে বলিয়া উপসর্গের সংখ্যা অধিক নহে; সর্ব্ব-সাকল্যে বিংশতিমাত্র। তবে আমি সর্ব্বদাই পরস্মৈপদী; আমার সূত্র, বিধি, ব্যবস্থা সকল সম্যকরূপে আলোচনা করিলে আমাকে আত্মনেপদী বলিয়া ভ্রম হইবে না।

আমি সাদাসিধা মানুষ বলিয়া অসরলের সহিত মিশি না। ইহার প্রমাণ "ন খলর্থানাম্"। আমার সর্ব্বত্রই গতিবিধি, আদরে অনাদরে সমভাব; অনাদর করিলেও সম্বন্ধ রাখি। তাহার সাক্ষী 'ষষ্ঠী চানাদরে'।

সমাসে আমার মহিমা বিশেষ প্রকাশিত। ইহার সাক্ষী 'মহতো মহা বিশেষ্যে'।

আমার সাহায্যেই সাহিত্যদর্পণ-কার শব্দার্থ ও রসাদির অপকর্ষজনিত শ্রুতি-কটুতা, অসমর্থতা ও অশ্লীলতা প্রভৃতি দোষ ধরিতে সমর্থ হইয়াছেন। আমার গুণেই রসের উৎকর্ষবিধায়ক ধর্ম্মের গুণ সংজ্ঞার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমারই গুণে প্রসাদগুণের এত প্রতিপত্তি। তোমাদের দৃষ্টিবিভ্রমবশতঃই অলঙ্কারে আমার দর্শন পাও না। সাহিত্যে একটু প্রবেশাধিকার হইলে দেখিবে যে, অনু-প্রাস, নিদর্শনা, বিশেষোক্তি, সমাসোক্তি, ব্যাজস্তুতি প্রভৃতি সর্ব্বত্রই আমি আছি। আমার সরলস্বভাববশতঃই আমি যমক, কাকু, বা বক্রোক্তিতে বিরাজ করি না।

ছন্দোবদ্ধ হউক আর নাই হউক, আমার স্বরলহরীর সাহায্যেই সঙ্গীতের সার্থ-কতা; বিষ্ণুপুরেই হউক আর বারাণসীতেই হউক, কালোয়াতী কসরৎ বা দন্ত-রুচির কৌমুদী-বিকাশে আমায় দেখিবে না।

দর্শনে আমার সর্ব্বদা দর্শন মিলিবে; সর্ব্বদর্শনসংগ্রহই ইহার প্রমাণ। নিম্নাধিকারীর জন্য কল্পিত বলিয়া পুরাণে আমায় পাইবে না। শ্রুতি, স্মৃতি, দর্শনে আমি; প্রাচীন ন্যায়ের আমি বিশেষ ভক্ত নহি বলিয়াই বঙ্গদেশে পক্ষধর মিশ্রের শিষ্য শিরোমণি দ্বারা নব্য ন্যায়ের প্রকাশ করি; তৎপরে বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীকে দিয়া ভাষাপরিচ্ছেদ লিখাই। আমার প্রাধান্য স্বীকার করিয়াই বৈশেষিক, সাংখ্য ও ন্যায় দর্শনে 'সামান্য বিশেষের' সঞ্জ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। ঈশ্বরকৃষ্ণের কারিকায়, বেদব্যাস-ভাষ্যে, শঙ্করাচার্য্যের শারীরক ভাষ্য ও শঙ্কর-মিশ্র কৃত 'উপস্কার' টীকায় আছি; বঙ্গবাসীর সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী মহা-শয়েরা আমাকে আরও বিশদ (বা বিকৃত) করিবার জন্য 'পরিষ্কার' নামে এক টীকা প্রকাশিত করিয়াছেন।

বেদান্তের সোঽহং ও তত্ত্বমসির মধ্যে আমার বিজয় ঘোষিত হইতেছে। আমার প্রতি সম্মান-প্রদর্শনার্থ কশ্যপবংশীয় মহর্ষি উলূক বৈশেষিক দর্শন দশ অধ্যায়ে বিভক্ত করিয়াছেন। আমারই আদেশে পতঞ্জলি সর্ব্বপ্রথমেই সমাধিপাদ ও সাধনপাদের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির ব্যাখ্যাও করিয়াছেন। ব্যাস-ভাষ্যে ইহা বেশ সুগম করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে যদি বোধগম্য না হয়, বেদান্তবাগীশের বঙ্গভাষানুবাদ-পাঠেও বিশদ হইবে, আশা করি।

আমি উপন্যাস বা নবন্যাসের ভক্ত বলিয়া মনে করিও না যে, আনন্দমঠ ভালবাসি; সেই জন্যই সদাশয় গবমেণ্ট ইহাকে Proscribe করিয়াছেন। তোমরা যাহাই বল, কপালকুণ্ডলাখানির লিখা আদৌ ভাল নহে, তাহা হইলে দার্শনিক ঔপন্যাসিক দামোদর বাবুকে বিশদ করিবার জন্য ইহার উপসংহার লিখিতে হইত না; শুনিতেছি, আর একখানি উপসংহার শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

আমি মাসিক সাহিত্যে প্রকাশিত হইয়া বঙ্গীয় সাহিত্যের মাসিক একোদিষ্ট শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করি; ইহাতে শাস্ত্রোচিত উপদেশই পালন করা হয়। কেন না, মনুসংহিতায় আছে :—

পিতৃণাং মাসিকং শ্রাদ্ধমন্বাহার্য্যং বিদুর্ব্বুধাঃ।

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য পিতৃমাতৃস্থানীয় বলিয়াই মাসিক শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা।

আমি সাহিত্যে, দর্শনে, ইতিহাসে, উপন্যাসে, জ্যোতিষে, রসায়নে, চিকিৎসা-শাস্ত্রে, এমন কি, সামুদ্রিকে আছি! বৃত্রসংহার, পলাশীর যুদ্ধ, প্রভাস, অবকাশ-রঞ্জিনী, শকুন্তলা-তত্ত্ব, সীতার বনবাস, ভ্রান্তিবিলাস, সামাজিক প্রবন্ধ, নিশীথ-চিন্তা, সধবার একাদশী, সুরধুনীকাব্য, বঙ্গসুন্দরী, সারদামঙ্গল, সবিতা-সুদর্শন, স্বর্ণলতা, রাজসিংহ, চন্দ্রশেখর, বিষবৃক্ষ, সোনার তরী, সাজি ইত্যাদি পুস্তক আমিই লিখিয়া দিয়াছি। সাহিত্য-সম্পাদক শালপ্রাংশু ব্যূঢ়োরস্ক সমাজপতি মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলে বুঝিবে, আমার কথা সত্য কি না।

জ্যোতিষ ও সামুদ্রিক শাস্ত্রে আমার বিশেষ আস্থা। আমিই বারাণসীধামে বাপুদেব শাস্ত্রী ও সুধাকর দ্বিবেদীকে জ্যোতিষ শিখাইয়াছিলাম; উড়িষ্যার চন্দ্রশেখর আমারই শিষ্য; র‍্যাভেন্স কলেজের যোগেশ বাবু আমারই সাকরেদ্।

আমি দশকর্ম্মে আছি। কুলিক বেলা ও কুলিক রাত্রিতে আমায় দেখিতে পাইবে না; সেই জন্য এই সময় আমি সমস্ত শুভ কার্য্য নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছি। আমিই সূর্য্যের দ্বাদশ রাশিভোগ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছি; সপ্তশলাকাচক্র-অঙ্কন বিষয়ে আমারই শিক্ষার প্রয়োজন।

Copernicus, Sir Isaac Newton, Flamstead, Herschel, Adams, Cassiniji, Bessel, Huygginsur প্রভৃতি জ্যোতিষশাস্ত্রবেত্তাকে আমিই শিখাইয়াছি; টলেমি আমার সহিত মিলিত হয় নাই বলিয়াই ত কোপার্ণিকাসের সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করিলাম। সংবাদপত্রের সম্পাদকদিগের style আমিই বরাবর শুদ্ধ করিয়া দিয়া আসিতেছি; যথা—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত,

হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস পাল, শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কাশীপ্রসাদ ঘোষ, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, শিশিরকুমার ঘোষ, নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, দ্বারিকানাথ বিদ্যাভূষণ, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। আমি সমস্ত সামাজিক অনুষ্ঠানের মধ্যে আছি। আমিই শালগ্রামশিলারূপে বিবাহবাসরে, শ্রাদ্ধে, সপিণ্ডকরণে, সর্ব্বত্র বিদ্যমান। স্ত্রীলোকের গর্ভসঞ্চার, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, সাধভক্ষণ ও প্রসবের পর ষেটেরা-পূজা, অন্নপ্রাশন হইতে শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত সকল সময়েই আমায় বর্ত্তমান দেখিবে। শুভপরিণয় আমারই আশীর্ব্বাদে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়; সেই জন্যই বিবাহের concert বা string bandএ, এমন কি, বিবাহের procession বা শোভাযাত্রার acetylene lampএ পর্য্যন্ত আমার দর্শন মিলিবে। আমিই বাসরঘরে বসিয়া শ্যালিকার সহিত রহস্য করি; শুভদৃষ্টির সময় আমিই দৃষ্টিনিক্ষেপ করি। আমাকে বিবাহের বরসজ্জা, বারাণসী জোড়, সোনার ঘড়ী ও ফুলশয্যায় দেখিবে। আমি সাধকের সাধনমালা, বৈষ্ণবের তুলসী। সময়ে সময়ে সেবাদাসীরও বন্দোবস্ত করিয়া থাকি। আমার Supplying Agencyতে সমস্ত মিলিবে।

আমার উপদেশ না শুনিলেই মানুষের বুদ্ধিভ্রংশ হয়; এই জন্যই প্রতাপ অল্প বয়সে মরিয়াছিল এবং ঋষিস্বভাব চন্দ্রশেখর প্রায়শ্চিত্তের পর শৈবলিনীকে লইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল; কেন না, শাস্ত্রে আছে, সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ। আমার আদেশ না শুনিয়াই দ্বাপরযুগে ভীষ্মের বিষম বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছিল। পিতা শান্তনু ও বিমাতা সত্যবতীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য ভীষ্ম রাজা হইতে পারিলেন না বলিয়াই শেষে কত কষ্ট সহ্য করিয়া তাঁহাকে শরশয্যায় প্রাণত্যাগ করিতে হইল; তাঁহার মাতা সুরধুনী বোধ হয় তাঁহাকে অভিসম্পাত করিয়াছিলেন, কেন না, পুত্রের দোষে তাঁহার Dowager Empress হইবার সাধে বাদ পড়িয়াছিল।

আমার মত ধনিসন্তান মুড়ি-মুড়কিতে নাই; আমি পিষ্টক, পায়স, সন্দেশে সপরিবারে বিরাজমান; তবে গ্রীষ্মকালে পরিশ্রমের পর সিরাপের অভাবে সরবৎ প্রস্তুত করিতে হয় বলিয়া বাতাসাকে একেবারে বরখাস্ত করি নাই; আমি গুড় স্পর্শ করি না; শর্করা বা মিছরীর সূঁটেই আমি কার্য্য সারি। আমি নিরামিষ আমিষ ভেদে উভয়বিধ আহারের মধ্যেই আছি; তবে মিষ্টান্নের প্রতিই আমার দৃষ্টি অধিক; রোগীর জন্য হাঁসপাতালে আমি পিশ্‌পাশের ব্যবস্থা করি।

আমি সর্ব্ববিধ সমন্বয়ের মধ্যে আছি। শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের শাস্ত্র-ব্যাখ্যা, থিয়োসফিক্যাল সোসাইটী, রামকৃষ্ণ মিশন, বা কেশবচন্দ্র সেন প্রবর্ত্তিত

সম্প্রদায়ের মধ্যে আমি নিশ্চিন্তে বিরাজ করিতেছি। রাজনীতিক্ষেত্রেও Constitutional Agitation-রূপ সমন্বয় বা খিচুড়ীর মধ্যে আমায় দেখিবে। আমি চতুষ্পাঠীতে থাকিয়া শাস্ত্রাভ্যাস করি; হোষ্টেলে থাকিয়া প্রত্যুষে স্বদেশী আন্দোলন ও সায়াহ্নে সাজাহানের রিহার্স্যাল দিয়া থাকি।

সভা, সম্প্রদায়, সমিতি, সমাজ, আশ্রম প্রভৃতি নামগুলি obsolete বলিয়া আজকাল মিশন্ খুলিয়াছি, যথা—আর্য্যমিশন্, রামকৃষ্ণমিশন্, বামা মিশন্, মঙ্গলগঞ্জ মিশন্ ইত্যাদি। ইহাতে আমার দোষ নাই।

আমি সর্ব্ববিধ উৎসবে আছি; ব্যসনেও আমায় দেখিবে। আমার মত বন্ধু কে আছে? আমাকে দুর্ভিক্ষে আর রাজদ্বারে দেখিতেছ না বলিয়া বিস্ময়ের কারণ নাই। দুর্ভিক্ষ কোথায়? Government ত দুর্ভিক্ষ ঘোষণা করেন নাই; আর রাজদ্বারে ত আমায় দেখিবেই না। আমি যে রাজসভায় থাকিয়া শোভাবৃদ্ধি করি। আমি সখীসংবাদে, সত্যপীরের পাঁচালীতে, মনসার ভাসানে, কীর্ত্তিবাসের রামায়ণে, কাশীরাম দাসের মহাভারতে, এমন কি, জগাস্যাকরার চণ্ডীর গানে ও শুক-সারীর সংবাদে আছি; কিন্তু মাণিকচাঁদ গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গলে বা ময়নামতীর গানে নাই। কিন্তু মুস্কিল-আসানে আছি!

আমার মত artist কোথায়? শিল্পের উৎকর্ষ আমারই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া। আমি দেশীয় শিল্পের বিশেষ পক্ষপাতী বলিয়া তোমাদের লতানে আঙ্গুল বা পটোলচেরা চোখে অভিব্যক্ত মোগল বা জাপানী শিল্প যাহা তোমরা চালাইতেছ, তাহা আমি আদৌ appreciate করি না। তোমাদের realistic, idealistic কথাগুলি বড়ই ঝাপসা; সোজাসুজি classical artএর অনুশীলন করিতে আমি অবশ্য উপদেশ দিই না; শিল্পের স্বাতন্ত্র্য-রক্ষা অবশ্যকর্ত্তব্য স্বীকার করি; তাহা বলিয়া curious বা grotesque করিবার কোনও সার্থকতা নাই। তোমরা স্বল্পব্যয়সাধ্য, সহজ-রচনীয় ও সুবিধাজনক যে সমস্ত সৌধ নির্ম্মাণ করিতেছ, তাহা হইতে শিল্পশ্রী দূরে পলাইয়াছে। ইষ্টকের স্তূপ ভিন্ন ইহাদিগের আর কোনও সংজ্ঞায় অভিহিত করা যায় না; ইহাদের শীর্ষদেশ দুই একটি গম্বুজে বা শেখরে শোভিত হইয়া এমন বিসদৃশ হইয়াছে যে, আমি কিছুতেই হাস্য সংবরণ করিতে পারি না; তোমরা নাকি আবার ইহাকে Indo-Saracenic, Moresqe প্রভৃতি সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়া আত্মপ্রসাদ পাও!

আমারই নেশার আবেশে মানুষ শশবিষাণ কিংবা আকাশকুসুম দেখিয়া থাকে; কখনও কখনও সরিষাপুষ্প দেখিয়া মস্তক ঘুরিয়া যায়; আমি তখন বাস্তব-

রাজ্যে ফিরাইয়া আনি, নেশা কাটাইবার জন্য সরবতের ব্যবস্থা করিয়া থাকি।

আমি না থাকিলে আবার নেশা সময় সময় জমে না। আমি প্রসন্ন গোয়ালিনীরূপে সম্মুখে না আসিলে আফিমের দোকান নিঃশেষ করিলেও কমলাকান্তের নেশা নিশ্চয়ই জমিত না। ঈশানী পার্শ্বে ছিলেন বলিয়াই মহেশ্বরের সিদ্ধির নেশা ধরিত; এবং এই অবস্থায় তিনি কত সাধনরহস্যের কথা কহিয়াছেন, কত শাস্ত্রব্যাখ্যা করিয়াছেন।

আগম নিগম বেদ পঞ্চতন্ত্র কথা

পঞ্চমুখে পঞ্চমুখ কহেন উমারে।

সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ Sparkling Champagneএ আমায় সর্ব্বদা দেখিবে। আমি সোডা-ওয়াটার-রূপে উগ্র সুরার সহিত মিশিয়া গোলাপী নেশার সৃষ্টি করি। পল্লীগ্রামে বাসনিবন্ধন সোডা-ওয়াটার মিলিত না; এই কারণেই দেবেন্দ্রনাথকে তীব্র ব্র্যাণ্ডি পান করিতে হইত, এবং এই জন্যই আমার প্রসাদে বঞ্চিত হইলেন। হীরার বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও কুন্দনন্দিনীলাভ ঘটিল না, বরং হতাশে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া জয়দেবের "স্মরগরলখণ্ডনং" গাহিতে গাহিতে প্রাণত্যাগ করিতে হইল। এ কথা Death Registration আফিসের Sub-Registrarএর নিকট বঙ্কিমবাবু নাকি শুনিয়াছিলেন। কিন্তু কলিকাতা নগরীতে বাস সত্ত্বেও দীনবন্ধুবাবু নিমে দত্তকে কেন যে উগ্র ব্র্যাণ্ডি পান করাইয়া, তাহার বুদ্ধিভ্রংশ ঘটাইয়া দিলেন, তাহা গবেষণার বিষয়। ইহার জন্য নিমচাঁদকে সার্জ্জেণ্টের হস্তে অশেষ নির্য্যাতন সহিতে হইয়াছিল। আমি অনুসন্ধিৎসার সাহায্যে জানিয়াছি যে, নিমচাঁদ কাপ্তেন রিচার্ডসনের ছাত্র ছিলেন; সে সময় Soda-water এ দেশে ছিল না; Scott Thomsonএর অফিস সবে খোলা হইতেছে; Sod-water machine তখনও এ দেশে আসে নাই। রাজেন্দ্রলালের বিবিধার্থ সংগ্রহ কিংবা Asiatic Researches বা Asiatic Societyর Journalএ এ কথা লিখে না।

আমার সম্বন্ধ নৈকষ কুলীনের সহিত; বংশজের সহিত আমার করণ-কারণ নাই; এই জন্যই ব্র্যাণ্ডি বা হুইস্কির সহিত আমার সম্পর্ক; মহেশচন্দ্র শাহার আশ্রয়ে পালিতা, এবং অজ্ঞাতকুলশীলা বলিয়া ধান্যেশ্বরীকে সম্মান প্রদর্শন করা দূরে থাক, যে ইহার উপাসনা করে, তাহাকে বিপন্ন করি, এবং তাহার বাস্তুভিটায় ঘুঘু চরাই। যোগেশকে দেখিলে আমাকে এ কথা আর বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না।

রাণী মুদিনীর গলিস্থ সরাবের দোকানে যিনি একবার যোগেশকে দেখিয়াছেন, তিনি বিশেষ অবগত আছেন যে, তাঁহার দুরবস্থার শেষ ছিল না; অনেকে ইহার জন্য স্বর্গীয় গিরিশ বাবুকে দোষারোপ করিয়া বলেন যে তাঁহার ত বিশ্বনাথ লাহার দোকানে বেশ প্রতিপত্তি ছিল, আপাততঃ ধারে transaction করিয়া এক কেশ পাঠাইয়া দিলেই চলিত। আমি গিরিশ বাবুকে বলিতে শুনিয়াছি যে, তাঁহার যোগেশ সাদাসিধা মানুষ ছিলেন, এবং কিছুমাত্রও ambitious বা Scheming ছিলেন না।

আমি রসস্বরূপ—রসো বৈ সঃ। শীতকালে যখন রাস্তা কুয়াসায় ঝাপসা থাকে, তখন আমিই শিউলির কলসে খেজুর-রস-রূপে প্রকাশিত হইয়া প্রভাতী তৃষ্ণা নিবারণ করি। সম্প্রতি চা আমার পশার মাটী করিয়াছে; শুনিয়াছি, চার পেয়ালার রস নিঃশেষিত না হইলে না কি সংবাদপত্রের রসাস্বাদ করা যায় না; এই জন্যই আমি Press Act পাশ করিয়াছি। আমি চা'র উপর চিরকালই অসন্তুষ্ট; পূর্ব্বে ইহার শুল্ক না দিতে Washingtonকে উপদেশ দিয়াছিলাম; আমার আদেশ পালন করিয়াছিলেন বলিয়াই আমেরিকাকে স্বাধীনতা দিয়াছিলাম, তোমরাও চা ছাড়িয়া দাও—স্বাধীনতা না পাও, অন্ততঃ dyspepsia সারিবে ও শরীরের লাবণ্যশ্রী খুলিবে।

সাধকশ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদের জন্মভূমি বারাসত সবডিভিসনের অন্তর্গত হালিসহর গ্রামে আমি; ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্মভূমি বীরসিংহ গ্রামে আমি; অক্ষয়কবি শ্রীমধুসূদনের জন্মভূমি যশোহরের প্রসিদ্ধ সাগরদাঁড়িতে আমি। স্বর্গীয় বক্তা ও পত্রিকা-সম্পাদক কৃষ্ণদাস পালের কাঁসারীপাড়ায় আমারই আশ্রয়ে থাকিয়া কথা ফুটিয়াছিল ও হাতে-খড়ি হয়। ঋষিকল্প ভূদেব মুখোপাধ্যায় আমারই আদেশে শিক্ষাবিভাগে কার্য্য না করিলে এডুকেশন গেজেট সম্পাদন করিতে পারিতেন না, কিংবা সামাজিক প্রবন্ধও লিখিতে পারিতেন না।

অদ্বৈতাবংশাবতংস শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের জন্মভূমি শান্তিপুরে আমি; আর শ্রীকেশবচন্দ্রের সারকুলার রোডস্থিত কমলকুটীরের চালেও নববিধানের নিশান উড়াইতেছি। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সাধনস্থল দক্ষিণেশ্বরে আমি; ভাস্করানন্দ ও বিশুদ্ধানন্দের পীঠস্থান বারাণসীধামেও আমি। মধ্বাচার্য্যের শিক্ষাস্থল অনন্তেশ্বরের মঠে আমি; শঙ্করাচার্য্যের শৃঙ্গেরী মঠ আমিই স্থাপিত করিয়াছি। সৈয়দ আলীর শিষ্য সুফী-মতপ্রবর্ত্তক মীরমন্সুর আলীসাহের প্রচারস্থল পারস্যের অন্তর্গত সিরাজ ও ইস্পাহানে আমি। আমিই মিথিলেশ্বর শিবসিংহের

সভায় বিদ্যাপতিকে আনিয়াছিলাম। সার রবীন্দ্রনাথের জমিদারী শিলাইদহে আমি; বিশ্রাম বা সাধনস্থল শান্তিনিকেতনেও আমি, এবং যোড়াসাঁকোর বাটীতেও সময় সময় থাকি।

ন্যাড়া নেড়ীর বিষম উপদ্রব বলিয়া আমায় নবদ্বীপে দেখিতে পাইবে না, এই জন্যই প্রাচীন নবদ্বীপ এখন গঙ্গাগর্ভে নিমজ্জিত; তবে আমাকে শ্রীচৈতন্য ও বাসুদেব সার্ব্বভৌমের লীলাভূমি শ্রীক্ষেত্রে পাইবে।

আমিই সুন্দর নামে মালিনী মাসীর আশ্রয়ে থাকিয়া বিদ্যার মন্দিরে সুড়ঙ্গ কাটি, এবং বীরসিংহ রায়ের আদেশে মশানে আনীত হইয়া চোর-পঞ্চাশতে কালিকার স্তব করিয়া মুক্ত হই। সম্প্রতি সনেট-পঞ্চাশৎ নামে একখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে; শুনিতেছি, বিদ্যাসুন্দরের দ্বিতীয় সংস্করণে ইহা সন্নিবিষ্ট হইবে; সবুজ-পত্রের সম্পাদক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিব, এ সংবাদ সত্য কি না। এ বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নাই। সনেট শব্দসংস্কৃত কোনও গ্রন্থে নাই। গ্রন্থকার এ শব্দটি ইংরাজীর ভাণ্ডার হইতে চুরী করিয়া স্বদেশীয় শব্দ-সম্পদের শ্রীবৃদ্ধি করিতে উদ্যত। তাঁহার সাধুচেষ্টার জন্য শত সহস্র ধন্যবাদ। সুতরাং পুস্তকখানি দাঁড়াইতেছে চোর-পঞ্চাশৎ; অতএব সন্দেহের কোনও কারণ নাই। গ্রন্থকার কি করিয়া গোপন করিবেন? তাঁহারাই ত বলিয়াছেন:—

'মুখের হাসি চাপ্‌লে কি হয়, প্রাণের হাসি চোখে খেলে।'

শ্রীমনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়।

প্রাচীন শিল্প-পরিচয়।

রাজোপকরণ।

যুক্তিকল্পতরু গ্রন্থে নয়টি জিনিস 'রাজোপকরণ' নামে অভিহিত হইয়াছে। গ্রন্থকার প্রথম বলিয়াছেন যে, ছত্র, ধ্বজ, সিংহাসন ও যান প্রভৃতি হইতে যাহা ভিন্ন, যাহা বহিরঙ্গ-রূপে বিবেচিত হয়, তাহাই 'উপকরণ' বলিয়া কথিত আছে। অতঃপর তিনি চামর, ভৃঙ্গার, চসক, প্রসাধনী, বিতান, শঙ্খ, ব্যজন, দর্পণ ও অম্বর, এই নয়টি বস্তুকে 'উপকরণ' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং এই নয়টি পদার্থ পারিভাষিক 'উপকরণ' সমাখ্যা লাভ করিয়াছে।

উক্ত নববিধ উপকরণের মধ্যে চামরের বর্ণনা অতিবিস্তৃত। আমরা সেই বিস্তৃত বর্ণনার মধ্য হইতে সারভূত যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ প্রদর্শিত করিব।

পূর্ব্বকালের প্রায় সমস্ত জিনিসের ব্যবহারেই শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং উপকরণ-ব্যবহারেরও বিশেষ নিয়ম লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহগণের দশাবিশেষ অনুসারে নরপতিদিগের জন্য দশানুযায়ী উপকরণ-ব্যবহার ব্যবস্থাপিত হইয়াছিল, এবং দশানুসারে ব্যবহার্য্য বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা ও পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। সূর্য্যাদিগ্রহের দশায় জাত রাজাদিগের ভোগ্য চামর যথাক্রমে ভব্য, ভদ্র, জয়, শীল, মুখ, সিদ্ধি, চল ও স্থির, এই আট নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহাদের পরিমাণও যথাক্রমে এক এক বিতস্তি বৃদ্ধি করিবার উপদেশ আছে।

জাঙ্গল-দেশ-জাত ও আনূপদেশজাত রাজা যথাক্রমে স্থলজ এবং জলজ চামর ব্যবহার করিবেন, এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল। আবার ব্রাহ্মণাদি চতুর্বিধ নৃপতির চামর-নিহিত মালাশ্রেণীতে যথাক্রমে হীরক, পদ্মরাগ, বৈদূর্য্য ও নীলমণি-খচিত হইবে, এরূপ নিয়মও দেখিতে পাওয়া যায়। চামর-নিহিত মালার বর্ণও যথাক্রমে শুক্ল, রক্ত, পীত ও নীলবর্ণ করিবার উপদেশ দেখা যায়। 'রাজকেশ' অর্থাৎ সম্রাট্ ব্যতীত সাধারণ রাজার চামর-ব্যবহারের অধিকার ছিল না।

জলজ ও স্থলজ, সাধারণতঃ চামরের এই দুই প্রকার শ্রেণীবিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। মেরু, হিমালয়, বিন্ধ্য, কৈলাস, মলয়, উদয়গিরি, অস্তাচল ও গন্ধমাদন, এই সকল পর্ব্বতে যে সমস্ত চমরী সম্ভূত হয়, তাহাদের লোমই 'চমর' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। পর্ব্বতভেদে চমরের বর্ণগত পার্থক্যের পরিচয় পাওয়া যায়। বাহুল্যভয়ে ও অনাবশ্যক-বোধে বর্ণপ্রভেদ-বিবরণ উপেক্ষিত হইল।

চমরীগুলিও ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদিভেদে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। ইহাদের লোমেরও নানাপ্রকার দোষগুণ-বিচার শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। এমন কি, দুষ্ট-চামর-ব্যবহারে মৃত্যুরও আশঙ্কা আছে।

জলজ চামর সমুদ্রজাত চমরীর লোম হইতে প্রস্তুত হয়। লবণ-সমুদ্র প্রভৃতি সপ্ত সমুদ্রের মধ্যে সমুৎপন্ন চমরীদিগের বিস্তৃত বিবরণ কথিত হইয়াছে। তাহা উপেক্ষিত হইল।

সমুদ্রজাত চমরীর লোম কি উপায়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়? পৌরাণিকগণ তাহারও একটা কৈফিয়ৎ দিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, সমুদ্রজাত চমরী-দিগের পুচ্ছ মকর প্রভৃতি জন্তু কর্ত্তৃক কৃত্ত (খণ্ডিত) হইলে, তীরবাসী পুণ্যশালী মানবগণ সেই পুচ্ছ কখনও কখনও পাইয়া থাকেন। পৌরাণিকের কল্পনা হইতে বুঝা যায় যে, ঐরাবত ও উচ্চৈঃশ্রবার ন্যায় জীব সমুদ্রগর্ভেই বাস করিতেছে।

পূর্ব্বকালে রাজাদিগের পার্শ্বে চামর আন্দোলিত হইত, সাহিত্যে এ বিষয়ের প্রভূত বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়।

শিশুপালবধ কাব্যে দেখা যায়, রাজসূয় যজ্ঞোপলক্ষে যুধিষ্ঠিরের ভবনাভিমুখে প্রস্থিত ভগবান্ কৃষ্ণের পার্শ্বে ভীমসেন সাগরের ফেনপুঞ্জসদৃশ চামর সঞ্চালিত করিয়াছিলেন। ১৩।২০

এক এক নৃপতির অনেক চামরগ্রাহিণী থাকিত। কাদম্বরী-পাঠে জানা যায়, রাজা শূদ্রক যে সময়ে সভাভঙ্গ করিয়া স্নানার্থ অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, সেই সময়ে বহুসংখ্যক চামরগ্রাহিণী স্কন্ধদেশে চামর নিহিত করিয়া এ দিক্ ও দিক্ ছুটাছুটি করিয়াছিল।

মেঘদূতে বারবিলাসিনী কর্ত্তৃক রত্নখচিত-দণ্ড-চামর গ্রহণপূর্ব্বক লাস্যনৈপুণ্য-প্রদর্শনের পরিচয় পাওয়া যায়। (পূর্ব্বমেঘ ; ৩৬ শ্লোক।) বর্ত্তমান সময়েও টপ্‌ওয়ালীদিগকে চামরহস্তে গান করিতে দেখা যায়।

দেবমূর্ত্তির উপরে চামরান্দোলন-পদ্ধতি অদ্যাপি রহিয়াছে। সুতরাং চামর রাজোপকরণ বলিয়া পরিগণিত হইলেও, প্রয়োজনান্তরের সহিত ইহার সম্পর্কের অভাব ছিল না। এমন কি, চামরবিশেষের বায়ুস্পর্শে বিবিধ রোগ বিনষ্ট হইবারও পরিচয় পাওয়া যায়। যুক্তিকল্পতরুই বলিতেছে—

অস্য বাতেন নশ্যেত্তু তৃষ্ণা মূর্চ্ছা মদো ভ্রমঃ

ইহার অর্থ, দধিসমুদ্র-জাত এই চামরের বায়ুর দ্বারা তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, মদরোগ ও ভ্রম রোগ বিনষ্ট হয়। এইরূপ অন্যান্য চামরেরও গুণবিশেষ বর্ণিত হইয়াছে।

সম্ভবতঃ পরীক্ষিত-গুণবিশেষের অনুরোধেই চামর-ব্যবহারের আবশ্যকতা অনুভূত হইয়াছিল। ইহার পরীক্ষা ব্যপারেও নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। স্থলজ চামর সুখদাহ্য ; অর্থাৎ, অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র অনায়াসেই পুড়িয়া যায়, এবং দহনসময়ে উহার মিষ্-মিষ্ শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। জলজ চামর শীঘ্র দগ্ধ হয় না, এবং উহা হইতে প্রভূত ধূম নির্গত হইয়া থাকে। মসরের জল প্রভৃতির দ্বারা চামরের সংস্কার বিহিত হইয়াছে। যদি চামরের দণ্ড কৃত্রিম বলিয়া সন্দেহ হয়, তবে অষ্টসলিল ক্বাথের দ্বারা সেই কৃত্রিমত্ব বিনষ্ট করিবার উপদেশ আছে।

যে পাত্রের দ্বারা নৃপতিদিগের অভিষেক-ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, সেই পাত্র ভৃঙ্গার-নামে অভিহিত হইয়াছে। সূর্য্যাদি-দশাজাত নৃপতিদিগের ব্যবহার্য্য

ভৃঙ্গারের আকার ও পরিমাণ, এই উভয়ই ভিন্ন ভিন্ন হইবার উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায়।

স্বর্ণ, রজত, মৃত্তিকা, তাম্র, স্ফটিক, চন্দন, লৌহ ও শৃঙ্গ, এই আট প্রকার উপাদানের দ্বারা ভৃঙ্গার নির্ম্মিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে মৃত্তিকাময় ভৃঙ্গারে কোনও প্রকার মণি নিহিত হইতে পারে না। অন্য সাত প্রকার ভৃঙ্গারে পদ্মরাগ মণি, হীরক, বৈদূর্য্য, মৌক্তিক, নীলমণি, মরকত ও মুক্তার বিন্যাসের বিধান আছে।

ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চতুর্বিধ নৃপতির ভৃঙ্গারের প্রত্যেকে কোণে যথাক্রমে শঙ্খ, পদ্ম, চন্দ্র ও কহ্লার, এই চারি প্রকার চিহ্ন বিন্যস্ত করিবে।

শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। কার্ত্তিক।—'তত্ত্ববোধিনী' এখনও আছে; অতীতের নিদর্শনের মত, সুখস্বপ্নের স্মৃতির মত, এখনও বাঙ্গালার শ্মশানে পড়িয়া আছে। দেবেন্দ্র বাবুর স্মৃতি, অক্ষয় বাবুর স্মৃতি, বিদ্যাসাগরের স্মৃতির আধার এখনও আছে, নামশেষ হইয়াও আছে। কিন্তু তবু আছে। বর্ত্তমান বর্ষে দেখিতেছি, তত্ত্ববোধিনীকে একটু জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা হইতেছে। মনীষী ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠ শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'তত্ত্ববোধিনী'র অন্যতম সম্পাদক হইয়াছেন। তাঁহার নামের উপর আর একটা বড় নাম আছে—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। কিন্তু তিনিও 'তত্ত্ববোধিনী'রই মত নিজের কাল অতিক্রম করিয়াছেন, জীর্ণ ও শীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার সম্পাদকতায় অন্য কোনও ফল না ফলুক, তাঁহার কল্যাণকামনা ও ক্ষিতীন্দ্রনাথের চেষ্টায় তত্ত্ববোধিনীর মত শুষ্ক লতা মুঞ্জরিলে আমরা আনন্দিত হইব, দেশবাসী উপকৃত হইবেন।—কিন্তু 'তত্ত্ববোধিনী' মামুলী পদ্ধতি ও বাঁধা পথ পরিত্যাগ না করিলে সে আশা সফল হইবে কি? দৃষ্টান্তস্বরূপ 'অভয় হও' শ্রেণীর প্রবন্ধের উল্লেখ করিব। এ শ্রেণীর রচনার যুগ চলিয়া গিয়াছে। 'তত্ত্ববোধিনী' সর্ব্বপ্রথমে 'তত্ত্ববোধিনী-সভা'র মুখপত্র ছিল। এখন আদি ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র হইয়াছে।—তাহা না হইলেও ক্ষতি ছিল না।—পক্ষান্তরে, আদি সমাজের মুখপত্র হইয়াও 'তত্ত্ববোধিনী' উচ্চ শ্রেণীর সন্দর্ভে ও দার্শনিক নিবন্ধে সমৃদ্ধ হইতে পারে। 'কি ভয়?' একটি ব্রহ্মসঙ্গীত। আমরা বলিব—উহারই ভয়! যে ভয়ে 'তত্ত্ববোধিনী' খুলিলাম, 'তত্ত্ববোধিনী'তেও সেই কবিতার ভয়! প্রাচীনা যেন 'অদন্তের হাসি' হাসিয়া বলিতেছেন,—'যে ভয়ে পলাও তুমি, সেই ভয় আমি!' এমন অক্ষম রচনা 'তত্ত্ববোধিনী'তে শোভা পায় না। শেষ যুগেও তত্ত্ববোধিনী রবীন্দ্রনাথের অমর গানের পারিজাতমালা ধারণ করিয়াছে। জরতীকে ন্যাকড়ার ফুল দিয়া সাজাইয়া বিড়ম্বনার সৃষ্টি করিবার কারণ কি?—এই সংখ্যায় অক্লান্তকর্ম্মী,

বাঙ্গালা সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক শ্রীযুত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারততিলক আচার্য্য শ্রীযুত বালগঙ্গাধর তিলক মহোদয়ের 'গীতারহস্য বা কর্ম্মযোগশাস্ত্রে'র অনুবাদ আরম্ভ করিয়াছেন; তাহা সূচিকাভরণের মাত্রায় প্রকাশিত হইয়াছে। গীতার কর্ম্মযোগ-পর ব্যাখ্যান এই প্রথম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।—জ্যোতি বাবুর এই অনুবাদ সম্পূর্ণ হইলে বাঙ্গালা ভাষা স্যমন্তক মণি লাভ করিবে। আমরা বলি, এই অনুবাদ অধিকমাত্রায় প্রকাশিত হউক। 'অভয় হও' ও 'শান্তিকুটীরে'র স্থান তিলকের গীতাকে দান করিলে 'তত্ত্ববোধিনী'র গৌরব বাড়িবে। 'ব্রহ্মো-পাসনা-পদ্ধতির প্রবর্ত্তন' সাম্প্রদায়িক উপাসকগণের পক্ষে উপাদেয় হইতে পারে। 'স্বরলিপি' সঙ্গীতজ্ঞগণের কাজে লাগিবে। শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর 'রাণাডের স্মৃতি-কথা'র অনুবাদ করিতেছেন। এই সংখ্যায় দ্বিতীয় অধ্যায়ের আরম্ভ হইয়াছে। ইহাও বাঙ্গালা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিবে। রাণাডের জীবন-কাহিনী আমরা প্রত্যেক বাঙ্গালীকে পড়িতে বলি। শ্রীমতী হিরণ্ময়ী চৌধুরাণী 'কি দিব তোমারে' শীর্ষক একটি গানে লিখিয়াছেন,—

'আমার—যা কিছু সকলি, কেড়ে নেছ তুমি, আর ত কিছুই নাই।'

ইহা কি ঠিক? বরং কামনা করুন—গান রচিবার বাইটুকু কাড়িয়া লউন। শ্রীলালবিহারী বড়ালের 'নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক' অবশ্যই 'ইহামুত্রফলভোগবিরাগ' না হইলে পড়া যায় না। এ সব লেখাই বা কেন, ছাপাই বা কেন, তাহা ত চিরকাল প্রহেলিকা হইয়াই রহিল! ডাক্তার শ্রীবনোয়ারীলাল চৌধুরীর 'মেণ্ডেল-মত ও পরিবর্ত্তবাদ' উপাদেয়, সারগর্ভ, বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ। 'তত্ত্ববোধিনী'তে বাঙ্গালী বিজ্ঞানের বর্ণপরিচয় করিয়াছিল। চৌধুরী মহাশয়ের মত বৈজ্ঞানিক সেই পত্রে বাঙ্গালীকে তাহার 'ক' 'খ' শিক্ষা দিলে আমরা উপকৃত হইব। শ্রীরামচন্দ্র শাস্ত্রী ও শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বৈয়াসিক-ন্যায়মালা'র অনুবাদ করিতেছেন। ইহাও সুরচিত, সুচিন্তিত।—'তত্ত্ববোধিনী' পূর্ব্বাপেক্ষা প্রবন্ধ-গৌরবে সমৃদ্ধ হইয়াছে। পাদ-পূরণার্থ সঙ্কলিত অপচারগুলির পরিহার ও অপ-কবিতার মোহপাশ ছিন্ন করিলে, 'তত্ত্ববোধিনী' বাঙ্গালার উচ্চশ্রেণীর দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক পত্রের অভাব মোচন করিতে পারিবে। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই নূতন চেষ্টার সাফল্য কামনা করিতেছি।

শ্রীভূমি। অগ্রহায়ণ।—'শ্রীভূমি' শ্রীহট্ট—করিমগঞ্জের 'মাসিক-সাহিত্য-প্রচার-সমিতি' কর্ত্তৃক এক বৎসর আট মাস প্রকাশিত হইতেছে। সুদূর শ্রীহট্টে বাঙ্গালা ভাষার পুষ্টির জন্য যাঁহারা এই পবিত্র ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতার ও ধন্য-বাদের পাত্র। 'শ্রীভূমি' উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। স্থানীয় বিষয়ে অধিকতর অবহিত হইলে পত্রিকা উদ্দেশ্যের পথে আরও অধিক অগ্রসর হইতে পারিবে।—কিন্তু 'কাব্যি' শ্রীভূমিরও ঘাড়ে চড়িয়াছে! প্রথমেই 'বঙ্গ-লক্ষ্মী'। দুঃখ হয়, নিরাশ হইতে হয়,—হবু-কবি শব্দ-চয়নে যে শ্রম ও প্রয়াস স্বীকার করিয়াছেন, তাহা অন্য বিষয়ে প্রযুক্ত হইলে কত সার্থক হইত। বঙ্গ যে 'বঙ্গ-সাগর-মন্থন-ধন', তাহা ঘোষ মহাশয় বেশ সুমিষ্ট বাক্যে প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু সে 'নন্দন-বন-মালিকা' হইল কি করিয়া? নন্দন বনের মালিকা কোন্ বাসুকি-গর্ব্বহারী সূত্রে গ্রথিত হইল? নন্দন-বনের ফুল ত কোন্ ছার, একবারে হরিচন্দন প্রভৃতির—তাহার কুঁদার কি না, কবিতায় তাহা প্রকাশ নাই—মালা হইয়া গেল! বঙ্গ-ভারতী যে এই 'জাইগ্যান্টিক্'

গড়ের ভারে একটু মুহ্যমান হইয়া পড়িবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই!—প্রভাত সকল দেশেই আসে, তবে সুধার 'দানী' বহিয়া আসে কি না, বলিতে পারি না। সন্ধ্যা সকল দেশের গলায় 'জ্যোছ্‌না মাল্যখানি' পরায় কি না, জানি না। তবে প্রভাতের পর সন্ধ্যা সকল দেশেই হয়, তাহা বোধ করি নিঃসন্দেহ। বিশ্বদেবতাও খুব সম্ভব বাঙ্গালা দেশেই 'নিরত রাজে না'; গুর্জ্জরে, মালবে, মহারাষ্ট্রে, পঞ্চনদে, মদ্রে, উৎকলেও রাজেন; গ্রীণল্যাণ্ড ও কামস্কটকায়, তথা নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডেও তিনি রাজিতে পারেন। অথচ এইগুলিই বাঙ্গালার বিশেষত্ব হইল কেন, তাহা কোন্ মল্লিনাথ সূরি বুঝাইয়া দিবেন? শ্রীঅশ্বিনীকুমার দাসের 'সিদ্ধি-তত্ত্বে' চিন্তার পরিচয় আছে। শ্রীমণিচরণ বর্ম্মণের 'রণচণ্ডীর ভবিষ্যদ্বাণী' উল্লেখযোগ্য। 'লেখক এক জন শিক্ষিত কাছাড়ী ভদ্রলোক। ইঁহারা বঙ্গভাষার চর্চ্চায় কত দূর সফলতা লাভ করিয়াছেন, এবং ইঁহাদের দেবতা, ব্রাহ্মণ ও রাজার প্রতি কিরূপ ভক্তি, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটিতে তাহা সূচিত' হইয়াছে বটে। এক জন কাছাড়ী এমন বাঙ্গালা শিখিয়াছেন, এবং বাঙ্গালা ভাষায় প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, ইহা আমরা বৃহত্তর-বঙ্গের বিজয়-সূচনা বলিয়া মনে করি। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মহিন্তা—বোধ করি খোন্তা দিয়া—'চিরমিলন' নামক একটি ছড়া লিখিয়াছেন। 'ইচ্ছা করে প্রাণের পরে তোমায় সদা রাখি, নয়ন হয়ে দেখি' আর শোনা যায় না। সহ্য হয় না। তোমার ইচ্ছার হাঁড়ী হাটে ভাঙ্গিয়া লোক হাসাইয়া লাভ কি? তার পর,—'অঙ্গে অঙ্গে পরশ দিয়ে বিবশ হয়ে থাকি—নিবিড় চুম্ব আলিঙ্গনে প্রেমের পুলক মাখি' ভদ্র-সমাজের অযোগ্য, চাবুকের যোগ্য। কিন্তু চাবুকেরও বোধ হয় একটু লজ্জা সরম আছে; সে সঙ্কুচিত হইতে পারে। যাহার কথা লিখিয়াছ, সে কি ও কে? এ সকল 'বাজারে'র 'নিবিড় আনন্দ' মা-সরস্বতীর মন্দিরে লজ্জার মাথা খাইয়া যাহারা আমদানী করে, তাহাদের কি বলিব? কোন্ ভাষায় গালি দিব? শ্রীঅম্বিকাচরণ দাসের 'ভারত-প্রদক্ষিণ ও তীর্থ-ভ্রমণ' চলন-সই। শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার আদিত্যের 'মালীর দেবতা' বিষয়-গুণে প্রশংসনীয়। এমন রচনার এ দেশে প্রয়োজন আছে। প্রথম শ্লোকগুলি ফেলিয়া দিলে কবিতাটি আরও সংহত ও উপাদেয় হইত। 'একদিনের দেখা' ন্যাকামীর 'দেয়ালা'। 'দুর্য্যোগে স্বস্তি' ও 'প্রকৃতির রূপ' না ছাপিলেই শোভন হইত। এ শ্রেণীর রচনা উৎসাহলাভের যোগ্য নহে।—আগে সাধনা, পরে সিদ্ধি। মাসিকে সাধনার চেষ্টামাত্রই শোভা পায় না। প্রাদেশিক মাসিকেও নহে। তাহাতে আদর্শ ক্ষুণ্ণ ও সাধনার পথ কণ্টকিত হয়। 'শ্রীহট্ট—কাছাড়ের তথ্যানুসন্ধান' পড়িয়া আমরা তৃপ্ত হইয়াছি; আশান্বিত হইয়াছি। শ্রীজগন্নাথ দেব এই সন্দর্ভে অনেক তথ্য পুঞ্জীভূত করিয়াছেন। 'জীবন-লক্ষ্মী' আর একটি অক্ষমতার পরিচায়ক ব্যর্থ রচনা। 'কুড়ানো ফুলে' শ্রীহট্টের এক জন গ্রাম্য কবির একটি গান সঙ্কলিত হইয়াছে। পচা ধসা কবিতা না ছাপিয়া, এইরূপ গান ছাপিলে 'শ্রীভূমি' অন্ততঃ পবিত্র থাকিতে পারে। এই সকল গানের—আর কিছু না থাকুক—ঐতিহাসিক মূল্য আছে। এগুলি সংগ্রহ করিয়া তোড়া বাঁধিবার যোগ্য।

শাশ্বতী। কার্ত্তিক।—'বিদায়কালে' সাংঘাতিক কবিতা। 'না নেশে হৃদয় আঁধার বিদায় নিতে বাসনা!' সর্ব্বনেশে শব্দবিন্যাস বটে। আবার ভণিতায় 'সুরেন্দ্র কাঁদিয়া বলে' আছে! গানটি বাঁধিতে যে 'নাকের জলে চোখের জলে' হইয়াছে, তাহা 'প্রকাশ করিয়া' বলি-

বার কোনও প্রয়োজন ছিল না। 'কবি-কথা'য় ভাস-প্রণীত 'চারুদত্ত' নাটকের আখ্যানবস্তু দক্ষতাসহকারে সঙ্কলিত হইতেছে। উপাদেয়। শ্রীনিরঞ্জন সান্ন্যালের 'বীরবলে' নূতন কথা নাই। শ্রী...ফুট্ কী-কবির 'শূন্য কুঞ্জ' শূন্যই বটে। ব্রজাঙ্গনায় মাইকেল হার মানিয়াছেন, 'অন্যে পরে কা কথা' ?—এ যুগে ব্রজের কবিতা হইতে পারে, কিন্তু তাহা শূন্য কুঞ্জের মত শূন্যই থাকিবে। শ্রীঅঘোরনাথ বসু কবিশেখরের 'যবন হরিদাসের বাস্তুভিটা' উল্লেখযোগ্য।

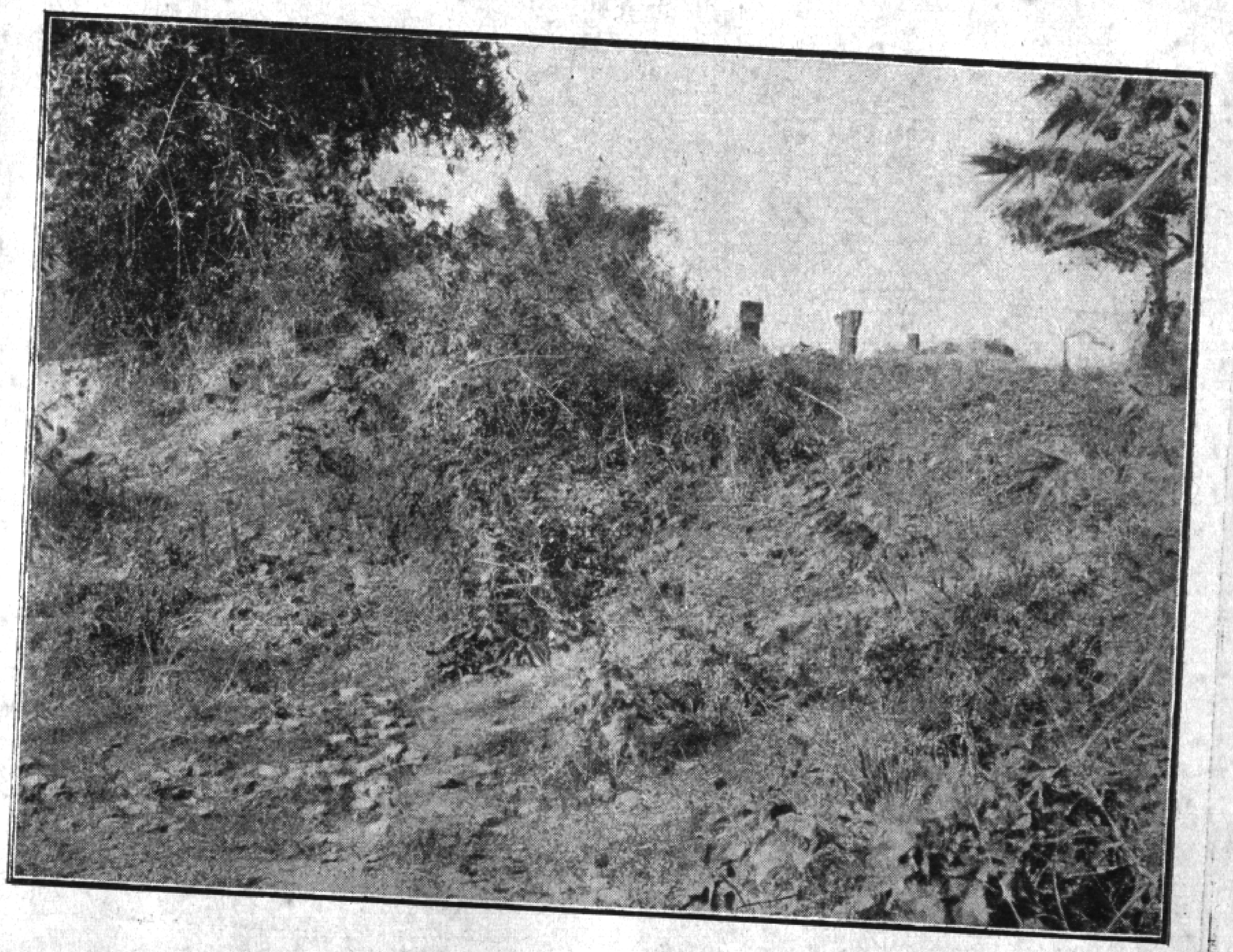
প্রতিভা। কার্ত্তিক—অগ্রহায়ণ।—প্রথমেই শ্রীঅনুকূলচন্দ্র সরকারের '১৯১৫ খৃষ্টাব্দে রসায়নচর্চ্চা' নামক উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ—বিশেষজ্ঞগণ উপকৃত হইবেন। 'প্রতিভা'র লেখকগণ খাটিয়া, ভাবিয়া, গুছাইয়া লেখেন। এক কথায়, তাঁহাদের সাধনা আছে। শুধু 'প্রতিভা' নয়, কালে বাঙ্গালা সাহিত্য এই সাধনার—এই নিষ্ঠার ফল ভোগ করিবে। অনুকূল বাবুর এই রচনাই তাহার প্রমাণ। শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ 'ক্ষুদ্রের সার্থকতা'য় রবীন্দ্রনাথের 'কণিকা'কে ভ্যাঙ্গ-চাইয়াছেন। যে সংহতি ক্ষুদ্র কবিতার প্রাণ, তাহার লেশমাত্র ইহাতে নাই। ইহার বক্তব্যও অত্যন্ত মামুলী। 'সবিতৃবরণ' শ্রীসুরেন্দ্রমোহন কাব্যতীর্থের রসোদ্গার। কলেজের 'কাব্যি' টোলে গিয়া কি রূপ ধারণ করিবে, ইহাতে তাহার পূর্ব্বাভাস আছে।—

'দ্বৈতবাদীর দ্বারশাস্ত্রা তোমার রাজে লক্ষ সোম।
তোমা হতে জগৎসত্তা মহাসৃষ্টি অনুলোম,
বিশ্ববিলীন তোমার মাঝে বিলোমকালে তুমি ওম্॥"

চিল্কার বড় বড় কাঁকড়ার দাড়াও ইহা অপেক্ষা কোমল; 'অ্যাব্রাক্যাডাব্রা'ও ইহার তুলনায় জয়দেব-সরস্বতী! শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মজুমদারের 'ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরাজী নাট্য-সাহিত্য' অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত,—কিন্তু উল্লেখযোগ্য। শ্রীমন্মথনাথ মজুমদারের 'আদর্শ ব্যায়াম-পদ্ধতি' দেশ-কাল-পাত্রের উপযোগী। শ্রীধীরেন্দ্রকুমার দত্ত 'আত্ম-তৃপ্ত' কবিতায় এখনকার কবিদের একটা কৈফিয়ৎ দিয়াছেন। গান কাহার ভাল লাগে, কেহ বিরাগে দূরে সরিয়া যায়, কেহ বিদ্রূপ, কেহ বা স্নেহ দান করে, তা এঁরা জানেন। তবু 'আপনার ভাবে আপনার মনে গাইয়া যেতেছি গান।' সাধু। কিন্তু 'ভাবে' ত নয়; তাহারই যে অভাব! যাহা হউক, এত দিন পরে জানা গেল, ইঁহাদের অনেকেই জ্ঞান-পাপী। শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ সেনের 'হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্য' একটি ক্ষুদ্র ঐতিহাসিক নিবন্ধ। শ্রীরাজেন্দ্রকুমার মজুমদার বিদ্যাভূষণের 'জয়পুর-কাহিনী' সুখপাঠ্য। কিন্তু অনেক বাজে কথা আছে। হাত মুখ ধুইবার গরম জলে পাঠককে পোড়াইয়া লাভ কি? শ্রীসুরেন্দ্রমোহন কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণ-তীর্থ বলিতেছেন, 'সম্রাজী' ও 'সম্রাজ্ঞী'—উভয়ই অশুদ্ধ। 'সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব' ও 'সম্রাজ্ঞী শ্বশ্রাং ভব' বৈদিক প্রয়োগ। 'কিন্তু বৈদিক শব্দ লৌকিক ভাষায় বিশুদ্ধ বলিয়া স্থান পায় না।' লৌকিক-ব্যাকরণ-রচনার যুগে সংস্কৃতে পাইত না। বাঙ্গালায় বৈদিক শব্দকে আমরা বরণ করিয়া লইলে হানি কি? 'চার-ইয়ারী কথা'র সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় সমালোচক লিখিয়াছেন,—'ইয়ারদের এই সব কথা পড়িবার সময় মনে হইতেছিল, যেন য়্যানাটোল ফ্রান্সের বঙ্গানুবাদ পাঠ করিতেছি।' আশ্চর্য্য! লেখক নদীপ্রবাহের ও আষাঢ়ের ধারার প্রভেদ বুঝিতে পারেন নাই! তাল ও কাঁকুড় যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ফল, তাহাও অনেককে বুঝাইয়া দিতে হয়! 'কবিগানে' প্রাচীন কবিদের রচনা সঙ্কলিত হইতেছে। 'শ্রীভূমি'ও এইরূপ

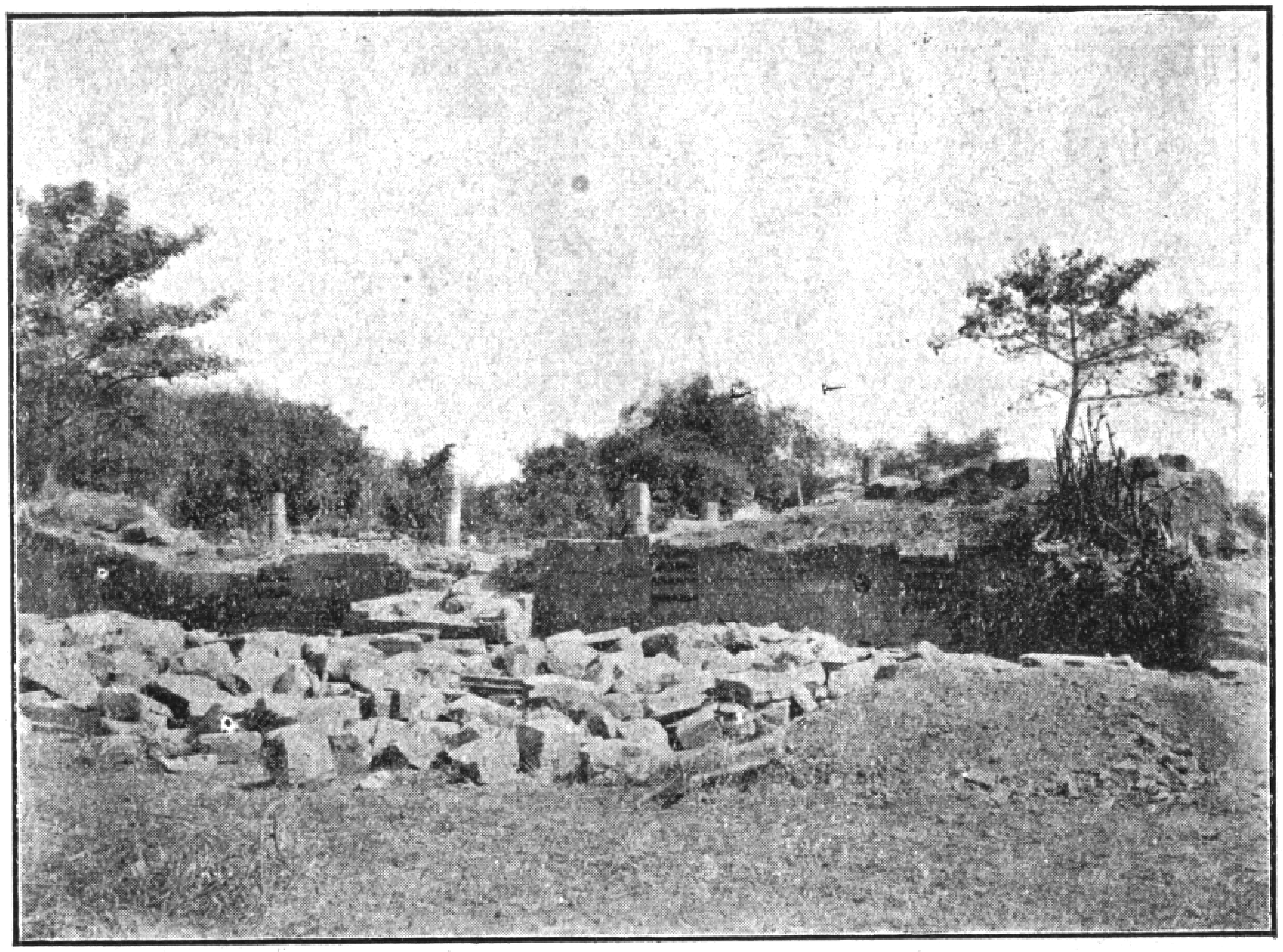
সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সুলক্ষণ। সকল প্রদেশে এইরূপ সংগ্রহের ব্যবস্থা হইলে আমরা অনেক লুপ্ত রত্নের সন্ধান পাইব।

গৃহস্থ। অগ্রহায়ণ।—'গৃহস্থ' উচ্চশ্রেণীর মাসিকপত্র। গুরুতর বিষয়ের আলোচনায় পূর্ণ, অথচ বৈচিত্র্যে রমণীয়। ইহাতে নবীন বঙ্গের প্রাণের কামনা ফুটিয়া উঠিতেছে। উদ্দাম আশা ও উদ্ভট কল্পনা ও বিসদৃশ তুলনা এই কামনার স্রোতে কখনও কখনও ভাসিয়া যায় বটে, কিন্তু আন্তরিক অকৃত্রিম অকপট আশায় যাহার উদ্ভব, তাহাকে সত্য বলিয়া সকল সময়ে বরণ করিতে না পারিলেও, উপেক্ষা করা যায় না। মনে হয়, আমাদের বয়সের ধর্ম্মে যাহা আমরা ধরিতে পারি না, যুগধর্ম্মে ইঁহারা তাহার অধিকারী হইয়াছেন। রুশিয়ার সাহিত্যের ভাব—আত্মা বাঙ্গালার সাহিত্যে, বাঙ্গালীর আধারে, শবদেহে যোগীর আত্মার প্রবেশের মত সহসা সঞ্চারিত হইতে পারে কি না, সে সম্বন্ধে এ বয়সে একটু সংশয় স্বাভাবিক, বোধ করি, অবশ্যম্ভাবী। বিশ্ব-সাহিত্যের যে ক্ষেত্রে যে নব অনুষ্ঠানের সূচনা বা প্রাচীন ভাবের নূতন পরিণতির কাহিনী কর্ণগোচর হইতেছে, তাহাই বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর উপযোগী কি না, তাহাও না ভাবিয়া থাকা যায় না। কিন্তু যে আগ্রহ, যে কামনা, যে দেশভক্তি জগতের সকল ভাব ও সকল অনুষ্ঠানকে ধরিয়া বাঙ্গালায় আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিতেছে, সেই পবিত্র দেশপ্রীতির চরণে নত না হইয়া ত থাকা যায় না। এই জন্য আমরা সাগ্রহে, সাবধানে ও সানন্দে 'গৃহস্থ' পড়ি; উপকৃত হই। কখনও নিরাশ না হই, এমন নহে। কিন্তু অনেক সময়েই আশায় উদ্দীপ্ত হই। মনে হয়, 'গৃহস্থে'র বুকে নব্য বাঙ্গালীর নব-জীবনের স্পন্দন শুনিতে পাই, আশার উত্থান ও নিরাশার পতন দেখিতে পাই। ইহাতে দোকানদারী নাই, ক্ষুদ্র মতবাদ-মত্ত উদ্ধতের আস্ফালন নাই। আছে পূজা, নিবেদন,—পূজায় প্রবৃত্ত করিবার জন্য প্রেরণা ও উদ্দীপনা। সে আহ্বানে সর্ব্বদা লিপিচাতুরীর পরিচয় থাকে না, অনেক সময়ে রচনায় অক্ষমতাও ফুটিয়া উঠে। কিন্তু বিষয়গুণে সব ঢাকিয়া যায়। আমরা 'গৃহস্থে'র পক্ষপাতী। 'গৃহস্থ' গত মাসে অষ্টম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। এখন তাড়নার সময়। তাই আদরের সঙ্গে সঙ্গে একটু তাড়নাও করিলাম।—'গৃহস্থ' দীর্ঘজীবী হউক, 'গৃহস্থে'র ইঙ্গিতে বাঙ্গালী যেন আবার গৃহস্থ হইতে পারে। এখন ত বাঙ্গালী পথে বসিয়াছে। এবার 'গৃহস্থে'র 'আলোচনা'য় অনেক জ্ঞাতব্য তথ্যের সমাবেশ আছে। শ্রীরমাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের 'বর্দ্ধমান জেলায় গ্রাম্য শাসন-প্রনালী' উল্লেখযোগ্য—প্রত্যেক বাঙ্গালীর অবশ্যপাঠ্য। শ্রীবিনয়কুমার সরকারের 'কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়' সুখপাঠ্য, বিবিধ তথ্যে পূর্ণ। বিনয় বাবু 'ভুবন ভ্রমিয়া' বাঙ্গালীর জন্য তথ্য সংগ্রহ করিতেছেন। আশা করি, আমরা সার্থক করিতে পারিব। 'সমাজ-প্রসঙ্গ' সুচিন্তিত সন্দর্ভ। 'কদলীর চাষ' ও 'ন্যায়শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা'য় বৈশিষ্ট্য আছে। শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন 'বাঙ্গালী সৈন্যে' প্রতিপন্ন করিয়াছেন,—পুরাণে বাঙ্গালী সৈনিকের উল্লেখ আছে। কবিতাগুলি 'গৃহস্থে'র কলঙ্ক। আর নরক ঘাঁটিতে পারি না।



INDIA PRESS, Calcutta.

১ নং চিত্র
খননের পূর্ব্বাবস্থা।



২ নং চিত্র
খননারম্ভে মস্‌জেদ আবিষ্কারের সূত্রপাত।

India Press, Calcutta.

বরেন্দ্র-খনন-বিবরণ।

ভূমিকা।

পুরাকালের পুণ্ড্রদেশ মধ্যযুগে বরেন্দ্রীমণ্ডল নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিতম্'—কাব্যে দেখিতে পাওয়া যায়,—পাল-সাম্রাজ্যভুক্ত অন্যান্য মণ্ডলের ন্যায় বরেন্দ্রীমণ্ডলও বহুসংখ্যক সামন্ত-চক্রে বিভক্ত ছিল। ইহাকে কাব্য-কথা বলিয়া উপেক্ষা করা যায় না।—কারণ, খালিমপুরে আবিষ্কৃত ধর্ম্মপালদেবের তাম্রশাসনে (১) প্রসঙ্গক্রমে নারায়ণবর্ম্মা নামক এক মহা-সমন্তাধিপতির উল্লেখ দেখিয়া বুঝিতে পারা যায়,—পাল-সাম্রাজ্যে সত্য সত্যই সামন্তপ্রথা প্রচলিত ছিল।

কালক্রমে সামন্তবর্গের নাম-গোত্র বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে; কিন্তু তাঁহাদিগের রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। এখনও অনেক ধ্বংসাবশেষ "রাজবাড়ী" নামে কথিত হইয়া আসিতেছে,—অনেক "রাজ-বাড়ী"র প্রাকার-পরিখাবেষ্টিত রাজদুর্গের সীমাচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে,—অনেক সুবৃহৎ সরোবর পূর্ব্বসমৃদ্ধিসূচক পূর্ত্তকর্ম্মনিষ্ঠার পরিচয় প্রদান করিতেছে,—এবং অসংখ্য স্তূপ অসংখ্য স্মৃতিচিহ্ন ভূগর্ভে নিহিত করিয়া রাখিয়াছে। খনন করাইতে পারিলে, এখনও পুরাকীর্ত্তির অনেক নিদর্শন আবিষ্কৃত হইবার আশা করা যাইতে পারে। খনন-কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করিলে, মুসলমান-শাসনের পূর্ব্ববর্ত্তী কালের প্রকৃত ইতিহাসের উদ্ধার-সাধনের সম্ভাবনা দেখিতে পাওয়া যায় না।

---

(১) গৌড়-লেখমালা ৯—২৮ পৃষ্ঠা।

কোন্ সময় হইতে "বরেন্দ্রী-মণ্ডল"-নাম প্রচলিত হইয়াছিল, তাহার অধিক পরিচয় আবিষ্কৃত হয় নাই। সন্ধ্যাকর নন্দীর "রামচরিতম্"- কাব্যে এই নাম দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। বৈদ্য-দেবের তাম্রশাসনে (গৌড়-লেখমালা ১৩৩ পৃষ্ঠায়) "বরেন্দ্রী"-শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। উড়িষ্যার অন্তর্গত তালচীরে আবিষ্কৃত গয়াড়তুঙ্গ দেবের তাম্রশাসনে (J & P or A. S. B. New Series Vol. XII No 6 pp 291-295) "বরেন্দ্র-মণ্ডল" নাম দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। তিব্বতীয় গ্রন্থে "বরেন্দ্রে"র নাম সুপরিচিত। ত্রিকাশেষ-নামক কোষগ্রন্থে দেখা যায়,—পুণ্ড্রদেশই "বরেন্দ্রী"-নামে পরিচিত হইয়াছিল। যথা,—"পুণ্ড্রাঃ স্যু র্বরেন্দ্রী গৌড়-নীবৃতি।"

মুসলমান-শাসনকালের প্রকৃত ইতিহাস সংকলিত করিবার জন্যও খনন-কার্য্য আবশ্যক। মুসলমান-লিখিত ইতিহাস-গ্রন্থের সহিত সমসাময়িক ক্ষোদিত-লিপির প্রবল পার্থক্য যতই আবিষ্কৃত হইতেছে, মুসলমান-লিখিত ইতিহাসগ্রন্থের পূর্ব্বমর্য্যাদা ততই ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িতেছে! এখন আর কেবল মুসলমান-লিখিত ইতিহাস-গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া মুসলমান-শাসনসময়ের প্রকৃত ইতিহাস সংকলিত হইতে পারে না। তাহার জন্যও তথ্যানুসন্ধান আবশ্যক। তাহার পক্ষেও বরেন্দ্রীমণ্ডলকে প্রধান অনুসন্ধানক্ষেত্র বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে;—কারণ, মুসলমান-শাসনের প্রথম আমলের অধিকাংশ প্রধান কীর্ত্তিচিহ্ন বরেন্দ্রীমণ্ডলেই সংস্থাপিত হইয়াছিল।

পুরাকীর্ত্তি-সংরক্ষণপরায়ণ সুসভ্য বৃটিশ-গবর্মেণ্ট বরেন্দ্রীমণ্ডলের কোনও কোনও পুরাতন অট্টালিকার সংরক্ষণ-ব্যবস্থার সূত্রপাত করিয়া অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন; কিন্তু বৃটিশ-গবর্মেণ্ট বরেন্দ্রীমণ্ডলের কোনও স্থানেই খনন-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার জন্য অদ্যাপি আয়োজন করেন নাই। তথাপি কোনও ইংরাজ-রাজপুরুষ খননকার্য্যের প্রয়োজন অস্বীকার করিতে পারেন নাই। (২)

যাঁহারা বরেন্দ্রমণ্ডলের ধ্বংসাবশেষ পরিদর্শন করিয়াছেন, তাঁহারাই দেখিয়াছেন,—যেখানে পুরাতন মুসলমান-কীর্ত্তিবিজ্ঞাপক মস্‌জেদ বা দরগা বর্ত্তমান আছে, সেইখানেই বা তাহার অনতিদূরে হিন্দু-কীর্ত্তির পুরাতন স্থান ও তাহার ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান থাকিবার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং মুসলমান-কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ খনন করিলে, মুসলমানকীর্ত্তিচিহ্নের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান-শাসনের পূর্ব্ববর্ত্তী কালেরও অনেক কীর্ত্তিচিহ্ন আবিষ্কৃত হইবার সম্ভাবনা আছে। খনন-কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করিলে, তাহার সন্ধানলাভের উপায় নাই। (৩)

---

(২) দিনাজপুরের ভূতপূর্ব্ব কলেক্টর স্বনামখ্যাত ওয়েষ্টমেকট বরেন্দ্রমণ্ডলের নানা স্থল পরিদর্শন করিয়া স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া গিয়াছেন;—"I should like also to endeavour to trace the old towns especially those occupied by Muhammadan shrines as at Mahi Santosh; for I consider the selection of a site for a mosque by the early Muhammadans to be an indication that on the spot they found plenty of material in Hindu buildings, or in other words that the site had been occupied by extensive masonry buildings before the Muhammadan conquest."—J. A. S. B 1875 p. 190.

(৩) খনন-কার্য্যের প্রয়োজন বুঝাইবার জন্য দিনাজপুরের ভূতপূর্ব্ব কলেক্টর ওয়েষ্টমেকট লিখিয়া গিয়াছেন,—"Besides the possibility of finding inscriptions, it would be interesting to discover the plan of those great buildings of which the granite cornices, mouldings, and pillars, and the delicately carved doorways have been spread far and wide through the neighbouring districts, wherever materials were required for new erections.—J. A. S. B. 1875 p. 192.

এই কার্য্যে অগ্রসর হইবার প্রয়োজন দিন দিন অধিক অনুভূত হইতেছে। পুরাতন স্তূপ হইতে লোকে ইচ্ছামত ইষ্টক-প্রস্তর সরাইয়া লইয়া যাইতেছে;—নবাগত সাঁওতাল কৃষকগণ অনেক পুরাতন স্তূপকে সমভূমিতে পরিণত করিয়া শস্যক্ষেত্র প্রস্তুত করিতেছে;—এইরূপে ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের অনেক উপাদেয় ক্ষেত্র দিন দিন বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িতেছে।

এরূপ সময়ে গবর্মেণ্ট খননকার্য্যে অগ্রসর হইতে না পারিলেও, দেশের লোকের খনন-কার্য্যের আয়োজন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু গবর্মেণ্টের সহায়তা ভিন্ন দেশের লোকের চেষ্টায় খননকার্য্যে সম্পূর্ণ সফলকাম হইবার পক্ষে অন্তরায়ের অভাব নাই। ইহা যেমন বহুব্যয়সাধ্য, সেইরূপ অভিজ্ঞতাসাধ্য কঠিন ব্যাপার। অনুশীলনের অভাবে দেশের কৃতবিদ্যগণ এরূপ কার্য্যসম্পাদনের অনধিকারী হইয়া রহিয়াছেন। ভূস্বামিগণের অনুমতি ও উৎসাহ না পাইলে, শিক্ষিত-সমাজের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে না পারিলে, শ্রমসহিষ্ণু অধ্যবসায়শীল অনুসন্ধান-নিপুণ খননকার্য্য-পরিচালনদক্ষ সেবকদল গঠিত করিতে না পারিলে, অর্থভাণ্ডার সংগৃহীত হইলেও, এরূপ কার্য্যে সহসা সম্পূর্ণ সফলকাম হইবার আশা করা যাইতে পারে না।

এ বিষয়ে দেশের শিক্ষিত-সমাজের দৃষ্টি-আকর্ষণের আশায় "বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনে"র কলিকাতার অধিবেশনে পঠিত "উত্তরবঙ্গের প্রত্নসম্পৎ"—শীর্ষক প্রবন্ধে কুমার শরৎকুমার রায় লিখিয়াছিলেন :—

"এই সমস্ত প্রাচীন নগরের যথাযোগ্য প্রত্নসম্পদের উদ্ধার করিতে হইলে, খনন-কার্য্যের আরম্ভ করিতে হইবে। প্রত্নসম্পদের উদ্ধারসাধন হইলেই, ইতিহাসের উদ্ধার হইবে। নচেৎ যে উপাদান এ পর্য্যন্ত সংগৃহীত হইয়াছে, তদ্দ্বারা প্রকৃত ইতিহাস লিখিত হইতে পারে না। তাহা লইয়া সন্তুষ্ট থাকিলে প্রকৃত ইতিহাসের উদ্ধার কোনও কালেই সম্পন্ন হইবে না। বাঙ্গালীকেই বাঙ্গালার ইতিহাসের উদ্ধার সাধন করিতে হইবে, এবং তাহাকেই কুদ্দালি-হস্তে ভূগর্ভে অবতরণ করিতে হইবে।"

এই কথাগুলি সকল বাঙ্গালীরই প্রণিধানযোগ্য। ইহা কুমার শরৎকুমারের ব্যক্তিগত খেয়ালের কথা নহে;—ইহাই বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধান-প্রণালীর যুক্তিযুক্ত কথা। বক্তৃতার উচ্ছ্বাসে "আত্মবিস্মৃত" বাঙ্গালীকে প্রবুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে অনেকেই এই কথার অবতারণা করিয়া থাকেন। তথাপি ইহা এখনও কথার কথা হইয়া রহিয়াছে; এমন কি, যাঁহারা ইহার প্রধান প্রধান বক্তা, ইহা তাঁহাদিগকেও পথ-প্রদর্শনের আয়োজন করিবার জন্য উৎসাহযুক্ত করিতে পারে নাই। তাঁহাদিগের দৃষ্টান্তের অনুকরণ না করিয়া, কুমার শরৎকুমার রায় খননকার্য্যের

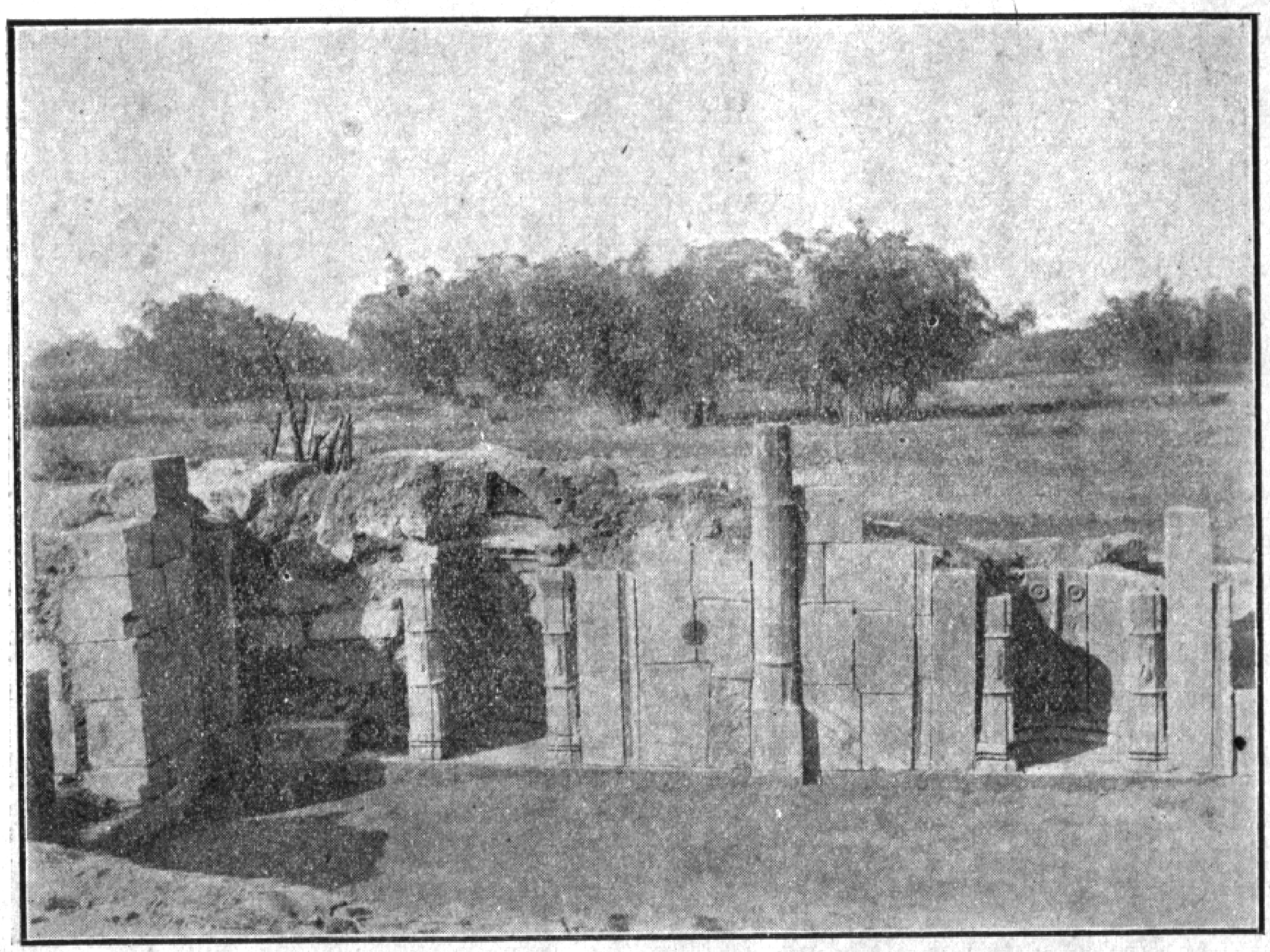
পথপ্রদর্শন করিবার জন্যই ধীরে ধীরে প্রস্তুত হইতেছিলেন! এবার সৌভাগ্যক্রমে বরেন্দ্রীমণ্ডলের একটি পুরাতন স্তূপের খননকার্য্যের সুযোগ উপস্থিত হইবামাত্র তিনি প্রভূত অর্থব্যয় করিয়া তাহা সম্পন্ন করিয়া আসিয়াছেন। ইহাই বাঙ্গালীর এ বিষয়ের সর্ব্বপ্রথম আত্মচেষ্টার নিদর্শন বলিয়া, ইহার একটি আনুপূর্ব্বিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করা কর্ত্তব্য।

মাহি-সন্তোষের ধ্বংসাবশেষ।

১৯১১ খৃষ্টাব্দে দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট মহকুমার সম্ভ্রান্ত অধিবাসিবর্গের আন্তরিক আমন্ত্রণে বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির কতিপয় সদস্য বালুরঘাটের নিকট-বর্ত্তী কোনও কোনও ধ্বংসাবশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিবার সময় বালুরঘাটের তিন মাইল দক্ষিণে অবস্থিত মাহি-সন্তোষ নামে সুপরিচিত পত্নীতলা থানার অন্তর্গত একটি পুরাতন স্থানের ধ্বংসাবশেষও পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছিলেন। তৎকালে তথায় মৃৎপ্রাকার-পরিখা-বেষ্টিত একটি দুর্গাকার স্থান, ইষ্টকপ্রাচীরবেষ্টিত একটি পুরাতন দরগা, ইষ্টক-প্রস্তর-পরিপূর্ণ একটি জঙ্গলাকীর্ণ স্তূপ, এবং অনেকগুলি পুরাতন সরোবর দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। দরগার প্রাচীরে ছোট বড় দুই-খানি মুসলমান-শিলালিপি সংযুক্ত ছিল; তাহার পাঠ ও ব্যাখ্যা অধ্যাপক ব্লকম্যান কর্ত্তৃক পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছিল। (৪)

ইষ্টক-প্রস্তর-পরিপূর্ণ জঙ্গলাকীর্ণ স্তূপের সর্ব্বোচ্চ স্থানে দুই তিনটি প্রস্তর-স্তম্ভের অগ্রভাগমাত্র দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল; এবং স্তূপের নানা স্থানে অনেক প্রস্তরখণ্ড অযত্ন-বিন্যস্ত অবস্থায় ইতস্ততঃ বর্ত্তমান ছিল। প্রস্তরগুলি দেব-মন্দিরের প্রস্তর বলিয়াই প্রতিভাত হইয়াছিল। তাহা অযত্নে অনাদরে বরেন্দ্রের জনহীন জঙ্গলমধ্যে পড়িয়া থাকায়, পুরাতত্ত্বানুসন্ধানকারিগণ তাহার পরিচয়-লাভে বঞ্চিত ছিলেন। যে সকল ইংরাজ-রাজকর্ম্মচারী মাহি-সন্তোষের ধ্বংসা-বশেষের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা কেহই এই স্তূপের উল্লেখ করেন নাই। স্তূপ হইতে দুই একটি প্রস্তরস্তম্ভ উঠাইয়া আনিয়া, বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির সংগ্রহালয়ে সুরক্ষিত করিতে পারিলে, কালে তাহার সাহায্যে ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানের পথ উন্মুক্ত হইতে পারিবে মনে করিয়া, স্তম্ভ তুলিয়া আনিবার জন্য ভুস্বামিগণের অনুমতি গ্রহণ করা হইয়াছিল। তৎকালে কুলী সংগ্রহ করিতে না পারিয়া, এবং কুলীগণ স্তম্ভ স্পর্শ করিতে ভীত ও অসম্মত হইতে পারে জানিয়া, বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির সদস্যগণ ভুস্বামিগণের অনুমতি

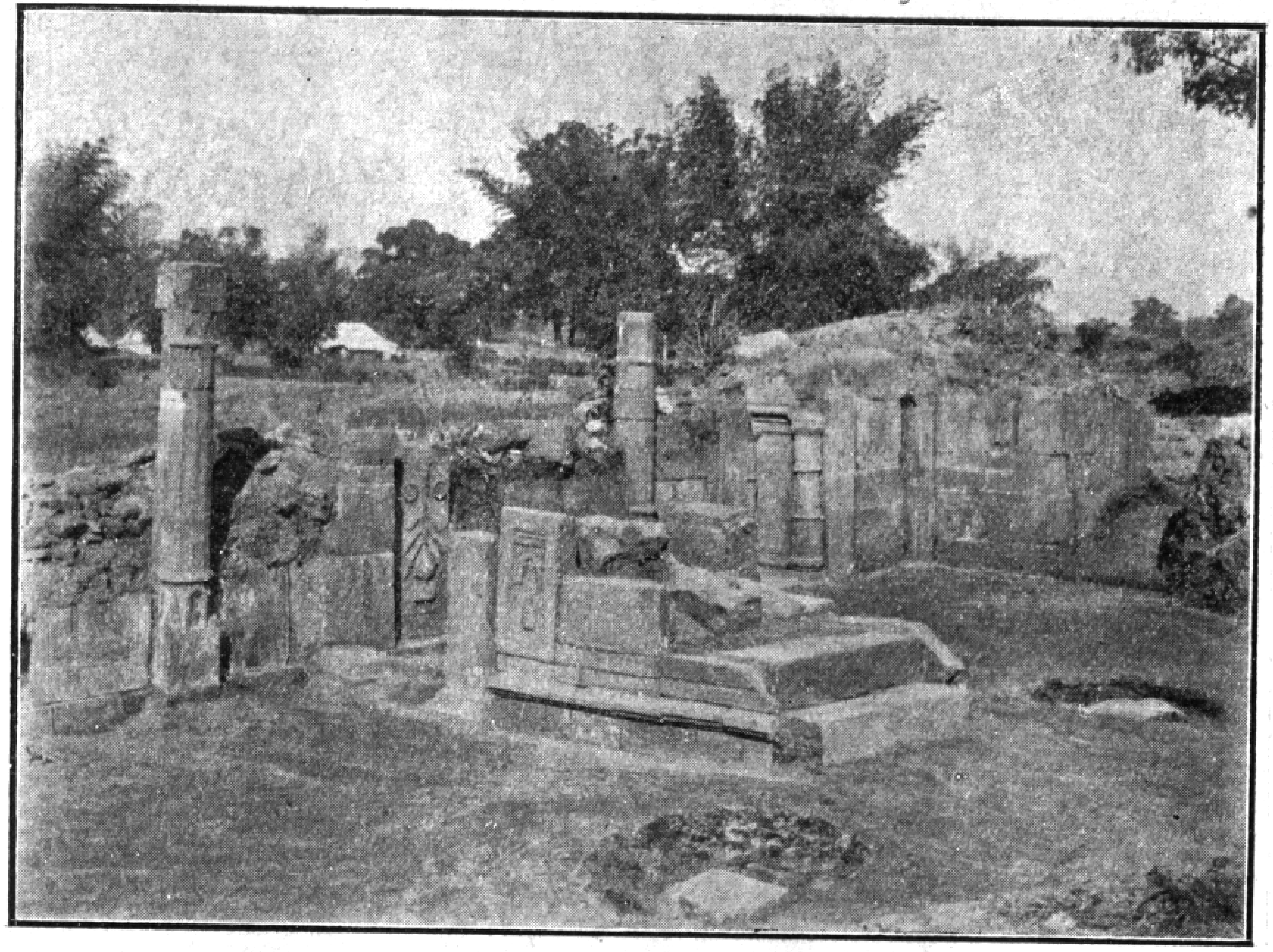
(৪) J. A. S. B. 1875 pp 290—291.



৩ নং চিত্র

খনন শেষে মস্‌জেদের অভ্যন্তরের পশ্চিমভিত্তির একাংশ।

India Press Calcutta.



৪ নং চিত্র

খনন শেষে মস্‌জেদের অভ্যন্তরের পশ্চিম ভিত্তির অপরাংশ।

INDIA PRESS, Calcutta.

প্রাপ্ত হইয়াও উপযুক্ত অবসরের অপেক্ষায় রক্তহস্তে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে মাহি-সন্তোষের ধ্বংসাবশেষের রহস্যোদ্ঘাটনের জন্য তথ্যানুসন্ধানের সূত্রপাত হয়।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে আমার পক্ষে পুনরায় মাহি-সন্তোষের ধ্বংসাবশেষ-পরিদর্শনের সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। ১২শে নবেম্বর তারিখে বালুরঘাটের সব্‌ডিভিসন্যাল্ অফিসার শ্রীযুক্ত মৌলবী আবদুল আজিজ ও দিনাজপুরের স্বনামখ্যাত সরকারী উকীল শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমার সহিত ধ্বংসাবশেষ দর্শন করিতে গমন করিয়াছিলেন। তখন দেখা গিয়াছিল,—দরগার প্রাচীরসংলগ্ন ছোট শিলালিপিখানি বর্ত্তমান নাই! কেবল বড় শিলালিপিখানি বর্ত্তমান আছে; কিন্তু তাহাও ভূপতিত হইয়াছে! এই দুইখানি শিলালিপির বিবরণ অধ্যাপক ব্লকম্যানের প্রবন্ধের কৃপায় সুধীসমাজে সুপরিচিত; এবং এই দুইখানি শিলালিপির সহিত বাঙ্গালার ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্ত্তমান;—এই কথা বুঝাইয়া দিয়া, দরগার প্রাচীরের জীর্ণ-সংস্কার করাইতে ও যে শিলালিপি বর্ত্তমান আছে, তাহা প্রাচীরে পুনঃসংস্থাপিত করাইতে পরামর্শ দান করিয়া, সব্‌ডিভিসন্যাল্ অফিসার সাহেবের হস্তে কয়েকটি মুদ্রা দিয়া, সর্ব্বসাধারণের নিকট হইতে সংরক্ষণকার্য্যের জন্য চাঁদা-সংগ্রহের প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলাম।

খনন-সূত্রপাত।

ঐতিহাসিক-সমাজে সুপরিচিত একখানি শিলালিপি হারাইয়া গিয়াছে; অপরখানি ভূপতিত অবস্থায় অপহৃত হইবার সুযোগদান করিতেছে;—এরূপ অবস্থায় স্তূপের স্তম্ভগুলিও অপহৃত হইতে পারে। তাহা হইলে, ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানের পথ চিরদিনের জন্য রুদ্ধ হইয়া পড়িবে। এইরূপ মনে হইয়াছিল বলিয়া, স্তূপ হইতে স্তম্ভ উঠাইয়া বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির সংগ্রহালয়ে লইয়া গিয়া তাহার সংরক্ষণের সুব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপলব্ধি করিয়াছিলাম; এবং বালুরঘাট-নিবাসী বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির সদস্য স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ দেবেন্দ্রগতি রায়ের উপর স্তম্ভ-উত্তোলনের ভার ন্যস্ত করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলাম। অল্পদিনের মধ্যে সংবাদ পাওয়া গেল—দুইটি স্তম্ভে সংস্কৃত ক্ষোদিতলিপি দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, এবং কোনও কোনও প্রস্তরফলকে দেবমূর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। তখন বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে স্তূপখননের যথাযোগ্য আয়োজন করিবার জন্য ভূস্বামিগণের লিখিত অনুমতি গ্রহণ করা হইল। এই স্তূপটি জমীদার-

গণের স্বত্বগত খাসপতিত স্থান বলিয়া সার্ব্বে সেটেলমেণ্টের খতিয়ানে উল্লিখিত থাকায়, তাঁহাদিগের অনুমতি ও সহায়তা গ্রহণ করিয়া খনন-কার্য্যের ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল।

বালুরঘাট মহকুমার সব্‌ডিভিসন্যাল্ অফিসার সাহেবের সহৃদয়তায়, ভূস্বামিগণের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত শেখপ্রকাশ সান্যাল ও শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত অধিকারী মহাশয়দ্বয়ের উৎসাহপূর্ণ সহায়তায়, এবং শ্রীমান্ দেবেন্দ্রগতির অক্লান্ত পরিশ্রমে, অল্পদিনের মধ্যেই ধ্বংসাবশেষের এক পার্শ্বে অনেকগুলি কুটমণ্ডপ সংস্থাপিত হইল;—শ্রমসহিষ্ণু খননদক্ষ সাঁওতাল-মুণ্ডা-ঘাসী-রাজবংশী-জাতীয় কুলী সংগৃহীত হইল;—খনন কার্য্য-পরিচালনার উপযুক্ত সমস্ত সরঞ্জাম পুঞ্জীভূত হইল;—এবং কুমার শরৎকুমার রায় উপযুক্ত অর্থভাণ্ডার লইয়া সমিতির কতিপয় সদস্য সমভিব্যাহারে মাহি-সন্তোষ-যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন। এইরূপে বিগত বড়দিনের ছুটীতে শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ, অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল, শ্রীমান্ বিমলাচরণ মৈত্রেয় ও আমি, কুমার শরৎকুমারের সঙ্গে উত্তর-বঙ্গ-রেলপথের হিলি-ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া, তথা হইতে কিয়দ্দূর গোযানে ও কিয়দ্দূর হস্তিপৃষ্ঠে অগ্রসর হইবার পর, ২৪শে ডিসেম্বর প্রাতঃকালে প্রায় দশক্রোশ-দূরবর্ত্তী মাহি-সন্তোষের ধ্বংসাবশেষে উপনীত হইলাম। অনুসন্ধান-সমিতির সদস্য স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ শ্রীরাম মৈত্রেয় বরেন্দ্রভূমির নানা স্থানের সহিত বাল্যকাল হইতে সুপরিচিত। তিনিও মাহি-সন্তোষে উপনীত হইয়াছিলেন। দিনাজপুরের উকীল উৎসাহশীল শ্রীমান্ জ্যোতিষচন্দ্র গুপ্ত বৈজ্ঞানিক খনন-প্রণালী-পরিদর্শনের জন্য আমাদের সহিত মিলিত হইয়া দল পুষ্ট করিয়াছিলেন। বালুরঘাটের কতিপয় কর্ম্মঠ ভদ্রসন্তান এবং পুলিস-ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন সেন প্রসন্নচিত্তে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সময়ে সময়ে আমাদের সহিত শারীরিক শ্রমস্বীকারে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

খনন-ব্যবস্থা।

আমাদের কার্য্য নানা ভাগে বিভক্ত করিয়া লইতে হইয়াছিল। মাহি-সন্তোষ ও তাহার নিকটবর্ত্তী অন্যান্য ধ্বংসাবশিষ্ট স্থান পরিদর্শন করা, সেই সকল স্থানসংক্রান্ত জনশ্রুতি-মূলক পূর্ব্বপরিচয় সংগ্রহ করা, মাহি-সন্তোষের প্রধান ধ্বংসাবশিষ্ট স্থানগুলির প্লেনটেবল নক্সা প্রস্তুত করা, খননের পূর্ব্বে ও পরে প্রয়োজনানুরূপ ফটোগ্রাফ গ্রহণ করা, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কারুকার্য্যযুক্ত ইষ্টক-প্রস্তরের ও খননলব্ধ অন্যান্য দ্রব্যের পরীক্ষা ও বাছাই করা, কোন

স্থান হইতে কি ভাবে খনন-কার্য্য পরিচালিত করিতে হইবে, তাহা স্থির করিয়া খনন-কার্য্যের পর্য্যবেক্ষণ করা, এবং খননকারী কুলিদিগের হিসাব বিশুদ্ধভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া, দিনান্তে তাহাদিগকে মজুরি দান করা;—এই সকল কার্য্য ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ও দলের উপর ন্যস্ত করা হইয়াছিল। এই সকল কার্য্য যথাযোগ্যভাবে পরিচালিত হইতেছে কি না, তাহা সতর্কভাবে পরিদর্শন করিবারও ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

জনশূন্য গৃহশূন্য অস্বাস্থ্যপ্রদ ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এতগুলি লোকের স্বাস্থ্যরক্ষার উপযোগী অবস্থানের ও অন্নপানের সুব্যবস্থা করা এবং গোমহিষ-হস্তী প্রভৃতি সহযাত্রী জীবের খোরাক সংগ্রহ করা সকল সময়ে সকল স্থানে সহজসাধ্য হয় না। এই কার্য্যের সুব্যবস্থার উপরে মূল কার্য্যের সফলতা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে বলিয়া, বিশেষ বিবেচনার সহিত ইহার বন্দোবস্ত করিতে হয়। কুমার শরৎকুমারের অভিজ্ঞ কর্ম্মচারীর ও শ্রীমান্ দেবেন্দ্রগতির পরিচালনাধীন সারকুটিয়া-ষ্টেটের কর্ম্মচারিগণের অক্লান্ত চেষ্টায় এবং ধ্বংসাবশেষের নিকটবর্ত্তী রাঙ্গামাটীর, ভাতশালার ও বালুরঘাটের আতিথ্য-পরায়ণ সজ্জনগণের পুনঃ পুনঃ উপঢৌকন-প্রেরণে রসদবিভাগের ব্যবস্থা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল।

খনন-কার্য্যপ্রণালী।

সর্ব্বাগ্রে স্তূপের দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে একটি ফটোগ্রাফ তোলা হইয়াছিল। খনন-কার্য্য আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে স্তূপের বাহ্যদৃশ্য কিরূপ ছিল, সেই চিত্রে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। স্তূপের এক পার্শ্বে একটি বেণুবংশবন বৃদ্ধিলাভ করিয়া, দক্ষিণপশ্চিম কোণ আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। কণ্টকাবৃত লতাগুল্মে ও বেতসপুঞ্জে অনেক স্থানই দুর্গম হইয়া পড়িয়াছিল। বহুস্থানে বিষধর বৃশ্চিক বর্ত্তমান থাকায়, অসতর্ক ভাবে চলাচলের অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছিল। সর্পের ও সর্পডিম্বের প্রাদুর্ভাব স্থানটিকে কিঞ্চিৎ ভয়াবহ করিয়া রাখিয়াছিল। অভিনব সাঁওতাল-বসতি সংস্থাপিত হইবার পূর্ব্বে এখানকার ব্যাঘ্রভীতিও সুপরিচিত ছিল। অনেকগুলি বৃশ্চিক ধরিয়া শিশিবদ্ধ করা হইয়াছিল; এবং দুই একটি সর্পকে মারিয়া ফেলিতে হইয়াছিল। পূর্ব্বাহ্ণে আট ঘটিকা হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত, এবং অপরাহ্ণ দুই ঘটিকা হইতে সায়ংকাল পর্য্যন্ত সকল বিভাগের কার্য্য পরিচালিত হইয়াছিল।

কোন্ কোন্ স্থান খনন করিতে হইবে, এবং কোন্ কোন্ স্থান খনন করিতে

হইবে না, তাহা স্থির করাই বৈজ্ঞানিক খনন-প্রণালীর সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য। যে সকল স্থানে গাঁথুনী বর্ত্তমান আছে, এবং খননের পরেও সুরক্ষিত হইতে পারিবে, তাহা যাহাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত না হয়, এবং অট্টালিকার যে সকল অংশ উদ্ঘাটিত করিতে পারিলে, তাহার স্থাপত্য-ব্যবস্থা সুন্দররূপ উপলব্ধি করিতে পারা যাইবে, তাহা যাহাতে খনন-কার্য্যের অত্যাচারে বিনষ্ট বা ক্ষতিগ্রস্ত না হইতে পারে, তৎপ্রতি সতর্ক দৃষ্টি বর্ত্তমান থাকা আবশ্যক। তাহার জন্য খুঁটাগাড়ি করিয়া, রশী বাঁধিয়া, খননযোগ্য স্থান সুনির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া, সদস্যগণকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কুলী খাটাইবার ভার প্রদান করা হইয়াছিল।

খনন-বিবরণ।

স্তূপটি উত্তর-দক্ষিণে লম্বা ছিল। তাহার পশ্চিমাংশের শীর্ষদেশে সমব্যবধান-বিন্যস্ত কয়টি প্রস্তরস্তম্ভের অগ্রভাগমাত্র দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল। এই দুইটি বাহুদৃশ্যের জন্য স্তূপের পশ্চিম পার্শ্ব মস্‌জেদের পশ্চিম দিকের দেয়ালের ধ্বংসাবশেষ বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল। প্রথমে এই অংশের উভয় পার্শ্ব হইতে মাটী সরাইয়া ফেলিতে গিয়া, মস্‌জেদের পশ্চিম-দেয়াল দেখিতে পাওয়া যায়; এবং তাহার ভিত্তির পরিসর জানিতে পারায়, অন্যান্য দিকের ভিত্তির স্থাননির্দ্দেশের উপায় আবিষ্কৃত হয়। ক্রমে খনন-কার্য্য যতই অগ্রসর হইতে লাগিল, মস্‌জেদের ধ্বংসাবশিষ্ট অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ততই প্রকাশিত হইয়া পড়িল।

অসংখ্য ইষ্টক-প্রস্তর ভাঙ্গিয়া পড়িয়া স্তূপের সৃষ্টি করিয়াছিল। তাহা সরাইয়া বাহিরে আনয়ন করা সহজসাধ্য ছিল না। সেগুলি সরাইবার সময় দেখিতে পাওয়া গেল,—কত স্তম্ভ ভূপতিত রহিয়াছে, কত স্তম্ভশীর্ষ (বোধিকা) ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, কত কারু-কার্য্যখচিত শিলাফলক খণ্ডবিখণ্ড হইয়া গিয়াছে, এবং তাহাদের অযত্নবিন্যস্ত বিপুল কলেবরের পার্শ্বদেশ দিয়া কত বৃক্ষমূল ভূগর্ভে প্রবেশ লাভ করিয়াছে।

মস্‌জেদ।

মস্‌জেদটি পূর্ব্বমুখে অবস্থিত ছিল। পূর্ব্বদিক হইতে পাঁচটি প্রবেশ-দ্বার দিয়া উপাসকগণ তাহার মধ্যে প্রবেশ লাভ করিত। উত্তর এবং দক্ষিণ দিকে তিনটি করিয়া ছয়টি দ্বার-জানালা বর্ত্তমান ছিল। উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিকে, দ্বারগুলির মধ্যবর্ত্তী ভিত্তিগাত্রের বাহিরের দিকে কারুকার্য্য-খচিত ইষ্টক-রচিত কুলুঙ্গী বর্ত্তমান ছিল। তাহার সকলগুলিই নষ্ট হইয়া গিয়াছে; দুই একটির



৫ নং চিত্র
খননে আবিষ্কৃত স্তম্ভলিপি।

INDIA PRESS, Calcutta.



ধানাইদহে আবিষ্কৃত

প্রথম কুমার গুপ্তের রাজ্য সময়ের তাম্রশাসন খণ্ড।

India Press, Calcutta.

যৎসামান্য চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে, কিন্তু কারু-কার্য্য-খচিত ইষ্টকগুলি বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই সকল ইষ্টকের কারু-কার্য্যে গৌড়ের ধ্বংসাবশিষ্ট মস্‌জেদ-সংলগ্ন ইষ্টকের কারু-কার্য্যের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। কুলুঙ্গীগুলি সুদৃশ্য করিবার জন্যই এই সকল ইষ্টক ব্যবহৃত হইয়াছিল। কিন্তু কুলুঙ্গীগুলি পূর্ব্বাবস্থায় বর্ত্তমান না থাকায়, তাহার চিত্র সংগৃহীত হইতে পারে নাই; তদভাবে কারু-কার্য্য-খচিত ইষ্টকের ফটোগ্রাফ গৃহীত হইয়াছে। পশ্চিম দিকের দেয়ালের পূর্ব্বপৃষ্ঠ বিশেষ যত্নের সহিত সুসজ্জিত হইয়াছিল; মস্‌জেদে প্রবেশ করিলে, তাহাই সর্ব্বাগ্রে দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। এই দেয়ালে সমব্যবধান-বিন্যস্ত পাঁচটি অর্দ্ধবৃত্তাকার প্রকোষ্ঠ (সেজ্‌দাগা) রচিত হইয়াছিল; এবং একটির সম্মুখে একটি বেদীও (মিম্বর) নির্ম্মিত হইয়াছিল। এগুলি সুদৃঢ় প্রস্তরে রচিত হইলেও সম্পূর্ণভাবে আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই। সকলগুলিরই শীর্ষদেশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছে; এবং মধ্যস্থলবর্ত্তী সেজ্‌দাগার সকল প্রস্তরই খসিয়া গিয়াছে। এই শেষোক্ত স্থানটি কষ্টিপ্রস্তরের দেবমূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া গঠিত হইয়াছিল। এক্ষণে কারুকার্য্যহীন প্রস্তরখণ্ড সাজাইয়া দিয়া এই স্থানটির শূন্য গর্ভ পূর্ণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

যে সকল ইষ্টক-প্রস্তর ভাঙ্গিয়া পড়িয়া স্তূপের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা সরাইয়া ফেলিবার পর, মস্‌জেদের সম্পূর্ণ আয়তনের পরিমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। বাহিরের আয়তন ৭৯ ফুট ৮ ইঞ্চি × ৫২ ফুট ৮ ইঞ্চি, এবং মস্‌জেদের অভ্যন্তরের হর্ম্ম্যতলের আয়তন ৬৬ ফুট × ৩৯ ফুট থাকা দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। হর্ম্ম্যতলে সমব্যবধান-বিন্যস্ত আটটি প্রস্তরস্তম্ভ সংস্থাপিত হইয়াছিল। স্তম্ভগুলি যথাস্থানে বর্ত্তমান না থাকিলেও, তাহাদের পাদপীঠের চিহ্ন এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। এই আটটি প্রস্তরস্তম্ভের উপর ভার বিন্যস্ত করিয়া, পঞ্চদশ-গম্বুজ-যুক্ত মস্‌জেদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। গম্বুজগুলি ইষ্টকখণ্ডের সহিত চুন মিশ্রিত করিয়া নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। তাহা সমস্তই ভূপতিত হইয়াছিল; কিন্তু স্থানে স্থানে জমাট-বাঁধা গম্বুজের অংশ মাটীর ভিতর মধ্যে হইতে বাহির হইয়াছিল। মস্‌জেদটি যখন সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন ছিল, তখন ইহার চারি কোণে চারিটি মিনার ঊর্দ্ধে মস্তক উত্তোলন করিয়া ইহার শোভাবর্দ্ধন করিত। মিনারগুলি বর্ত্তমান নাই; কিন্তু তাহাদের চারিকোণের চারিটি ভিত্তিমূল খনন করিয়া বাহির করা হইয়াছে। ভিত্তিমূলের স্থাপত্য-ব্যবস্থা দেখিয়া বুঝিতে পারা যায়,— মিনারগুলি অষ্টকোণ-বিশিষ্ট ছিল। তাহার সাজসজ্জা কিরূপ ছিল, তাহার পরিচয়-

বিজ্ঞাপক কারু-কার্য্য-খচিত দুই চারিখানি ইষ্টক ভিন্ন আর কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। ধ্বংসাবশেষ হইতে যে সকল ক্ষুদ্র ও বৃহৎ প্রস্তর বাহির হইয়াছে, তাহা সমস্তই হিন্দুর ও বৌদ্ধের মন্দির হইতে সমাহৃত হইয়াছিল বলিয়া পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। যে সকল প্রস্তরনির্ম্মিত দ্বারশাখা ও উদুম্বর ধ্বংসাবশেষের ভিতর হইতে বাহির হইয়াছে, তাহাদের আয়তন দেখিলে, তাহারা কিরূপ সুবৃহৎ দেবমন্দির হইতে সমাহৃত হইয়াছিল, তাহার কিছু কিছু আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়।

মসজেদ-প্রাঙ্গণ ও গোরস্থান।

মস্‌জেদের সম্মুখে প্রাচীর-বেষ্টিত উত্তর দক্ষিণে লম্বা একটি বিস্তৃত প্রাঙ্গণ বর্ত্তমান ছিল। উত্তর দিকে তাহার প্রবেশদ্বার ও দক্ষিণ দিকে পুষ্করিণীর সোপান-সংলগ্ন আর একটি দ্বার বর্ত্তমান ছিল বলিয়া বোধ হয়। প্রাচীরের, দ্বারের, ও সোপানের ইষ্টকগুলি অনেক দিন অপহৃত হইয়া গিয়াছে; তথাপি তাহাদের স্থান-নির্দ্দেশের উপযোগী কিছু কিছু ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। মস্‌জেদের উত্তরে একটি প্রাচীর-বেষ্টিত ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণের চিহ্ন ধরিয়া খনন করিতে আরম্ভ করায়, তন্মধ্যে একটি গোর-স্থান আবিষ্কৃত হইয়াছে। যে কবরটি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, তাহা পূর্ব্ব পশ্চিমে লম্বা। তাহার পূর্ব্বদিকের দেওয়ালের বহির্ভাগে একটি প্রদীপ জ্বালাইবার ক্ষুদ্র কুলুঙ্গী বাহির হইয়াছে। কুলুঙ্গীটী নিতান্ত ক্ষুদ্র হইলেও কৌতূহলপূর্ণ। ইহার খিলান বিল্বপত্রের ন্যায় ত্রিপত্রাকার,—হিন্দুস্থাপত্যের নিদর্শনসূচক। মুসলমান-শাসনের প্রথম আমলে এইরূপ খিলান অনেক দিন পর্য্যন্ত মুসলমানী স্থাপত্যেও ব্যবহৃত হইয়াছিল। ইহা কবরটির প্রাচীনত্বের পরিচয় প্রদান করিতেছে। এই স্থানের মাটী সরাইবার সময় অনেকগুলি মৃৎপ্রদীপ, একটি লৌহ-নির্ম্মিত বর্ষাফলক ও একটি তীরফলক প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। গোর-স্থানের সকল অংশ সম্পূর্ণরূপে খনন করিবার অবসর না থাকায়, অন্যান্য কবরগুলির আয়তন জানিতে পারা যায় নাই। কত কাল এই কবর ভূগর্ভে লুক্কায়িত আছে, কতকাল মৃতের প্রতি সম্মান-প্রদর্শনের জন্য এখানে কেহ সন্ধ্যাকালে প্রদীপ দিবার আয়োজন করে নাই, কেহ তাহার সন্ধান প্রদান করিতে পারে না। কবরগুলি যে কত প্রাচীন, ইষ্টক-বিন্যাস দেখিয়া তাহা কিয়ৎপরিমাণে অনুমান করা সম্ভব হইলেও, বিশুদ্ধভাবে সময় নিরূপণ করিবার উপযোগী নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। বৃহৎ কবরটির উপরিভাগের ইষ্টক সমতল হইয়া গিয়াছে, তথাপি কবরটি এখনও সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় নাই।

পূর্ব্বতন লোকালয়।

পূর্ব্ব-পশ্চিমে লম্বা ইষ্টকনির্ম্মিত একটি রাজপথের দক্ষিণে মস্‌জেদটি নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই রাজপথ পূর্ব্বাস্যে অনেক দূর পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। তাহার উভয় পার্শ্বে বহুসংখ্যক পুরাতন পুষ্করিণী বর্ত্তমান থাকিয়া, পুরাকালের জনাকীর্ণ লোকালয়ের সাক্ষ্যদান করিতেছে। অধিকাংশ পুষ্করিণী উত্তর-দক্ষিণে লম্বা, এবং একালের পুষ্করিণীর তুলনায় সুবৃহৎ বলিয়া কথিত হইবার যোগ্য। কোনও কোনও পুষ্করিণী এত পুরাতন যে, তাহার চারি দিকের পাহাড় সমতল হইয়া গিয়াছে; এবং তন্মধ্যস্থ গভীর জলাশয়টি নলবনে বা শস্যক্ষেত্রে পরিণত হইতে চলিয়াছে। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা পুষ্করিণী হিন্দুকীর্ত্তি-বিজ্ঞাপক বলিয়াই ঐতিহাসিক-সমাজে সুপরিচিত। মহীপালদীঘি, তপনদীঘি, সাগরদীঘি প্রভৃতি সর্ব্বলোকবিদিত হিন্দুকীর্ত্তির নিদর্শনগুলি উত্তরদক্ষিণে লম্বা। মাহি-সন্তোষের ধ্বংসাবশেষ-মধ্যস্থ উত্তরদক্ষিণে লম্বা সরোবরগুলি যে জনাকীর্ণ লোকালয়ের সাক্ষ্যদান করিতেছে, তাহা যে মুসলমান-শাসনকালের পূর্ব্ববর্ত্তী লোকালয় ছিল, তাহা এইরূপে অনুমিত হইতে পারে। এই অনুমান অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। সরোবরগুলি পুরাতন সমৃদ্ধির পরিচয় প্রদান করিতেছে। যে লোকালয়ে এতগুলি পুরাতন সরোবর বিদ্যমান ছিল, তাহাতে দেবমন্দিরও বিদ্যমান ছিল বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। স্থানে স্থানে দুই একটি স্তূপ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু মস্‌জেদ রচিত হইবার পর, দেবমন্দিরের অবস্থান-ভূমিতে এখন আর প্রস্তর পড়িয়া থাকিবার আশা করিতে পারা যায় না। যাহা ছিল, তাহা নাই; এখন কেবল তাহার পরিচয়-বিজ্ঞাপক আভাসমাত্রই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

দরগা।

দরগাটি এখনও সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয় নাই। এখনও লাখেরাজভোগী ফকীর-বংশধরগণ তাহার সেবক-রূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। এখনও হিন্দু-মুসলমান ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে দরগায়ে আসিয়া "সিন্নি"দান করিয়া থাকেন। তথাপি দরগার পূর্ব্বাবস্থা বর্ত্তমান নাই। যে অবস্থা বর্ত্তমান আছে, তাহাও দিন দিন অধিক শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে! ইহা এখনও পবিত্র ক্ষেত্ররূপে পূজিত হইতেছে বলিয়া, ইহার কোনও স্থান খনন করা হয় নাই। প্রস্তর-গঠিত চতুষ্কোণ একটি সুদৃঢ় চত্বরের উত্তরাংশে ইষ্টকপ্রাচীরবেষ্টিত কবর বর্ত্তমান আছে। একটি কবর হইলেও, তাহা মাই ও সন্তোষী নাম্নী মাতার ও

কন্যার যুক্তকবর বলিয়া পূজিত হইতেছে। তাহার দক্ষিণে প্রাচীর-বেষ্টিত আর একটি অংশে কতকগুলি কবরের চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। ইহার দক্ষিণে চত্বরের অবশিষ্ট অংশের পশ্চিম দিকে ইষ্টকগঠিত প্রাচীর (ইদ্‌গা) দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার সম্মুখে ইদের সময় নমাজ হইয়া থাকে। অন্যান্য দিকে প্রাচীর বর্ত্তমান নাই। এই দর্‌গাটির প্রাঙ্গণে অনেকগুলি ইষ্টকালয়ের ভিত্তি-পীঠমাত্রই বর্ত্তমান আছে।

দুর্গ ও পুরাতন কূপ।

দুর্গাকার স্থানটি এখনও "গড়" নামেই কথিত হইয়া আসিতেছে। ইহা কাহার গড়, বা কত দিনের গড়, সে বিষয়ে কেহ কোনরূপ উত্তর দান করিতে পারে না। ইহার চারি দিকে এখনও সুদৃঢ় মৃৎপ্রাচীর উচ্চাবস্থায় বর্ত্তমান আছে। মৃৎপ্রাচীরের প্রত্যেক পার্শ্বের মধ্যভাগে দুর্গ-তোরণের অবস্থান-সূচক ব্যবধান দেখিতে পাওয়া যায়। এই মৃৎপ্রাচীরের বাহিরে চতুর্দ্দিকে একটি অবিচ্ছিন্ন পরিখা; তাহার অনেক অংশ এখনও সলিলপূর্ণ। পশ্চিম দিকে প্রধান প্রবেশদ্বার অবস্থিত ছিল মনে করিয়া, তাহার আনুমানিক অবস্থান-ভূমি খনন করিতে গিয়া, ইষ্টক-নির্ম্মিত প্রহরিকক্ষের ও দুর্গতোরণের ভিত্তিমূল আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই স্থানে পরিখার কিয়দংশ পর্য্যন্ত একটি ইষ্টকনির্ম্মিত সরল পথ বাহির হইয়া গিয়াছে। তাহা দুর্গসেতুর আশ্রয়স্থান ছিল বলিয়াই প্রতিভাত হয়। এই স্থানের পরিখা বর্ষার পর অল্পদিনের মধ্যেই শুষ্ক হইয়া যায়। ইহার অপর তীর হইতে সরলভাবে পশ্চিম মুখে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবার পর, একটি জঙ্গলাবৃত পুরাতন কূপ দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। তাহার চারি দিকে মৃত্তিকা খনন করায়, কূপের ইষ্টক-বেষ্টনী বাহির হইয়া পড়িয়াছে। এই বেষ্টনীর পরিসর প্রায় ৭ ফুট। তাহার জন্যই কূপমধ্যস্থ যত্ন-বিন্যস্ত ইষ্টকরাশি এখনও স্বস্থানে বর্ত্তমান থাকিয়া, কূপটিকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে। এই অঞ্চলটি অল্পদিন হইতে সাঁওতাল কৃষকগণের অধ্যবসায়বলে সর্ষপক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। এই সকল ক্ষেত্র এখনও ইষ্টকখণ্ডে আচ্ছন্ন রহিয়াছে; কিন্তু এখানে ইষ্টকনির্ম্মিত কিরূপ অট্টালিকাদি বর্ত্তমান ছিল, তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

পশ্চিম দিকের দুর্গতোরণ দিয়া দুর্গে প্রবেশ করিলে, একটি বিস্তৃত ক্ষেত্রে উপনীত হইতে হয়। তাহা প্রায় সমতল। তাহার সম্মুখে একটি স্তূপ; তাহাই দুর্গমধ্যস্থ সর্ব্বোচ্চ স্তূপ। পশ্চিম দুর্গ-তোরণের সমসূত্রে পূর্ব্ব দিকে অগ্রসর

হইলে, এই স্তূপের যে অংশে উপনীত হইতে হয়, তথায় অনেক দূর পর্য্যন্ত খনন করিয়া ইষ্টকের বা প্রস্তরের চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। ইহাতে অনুমান হয়,—এই সর্ব্বোচ্চ স্তূপটী দুর্গমধ্যস্থ প্রধান তোরণের ধ্বংসাবশেষ,—ইহার ভিতর দিয়াই দুর্গাভ্যন্তরের প্রাসাদপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতে হইত। মৃৎপ্রাচীর সুদৃঢ় হইলেও, কেবল মৃত্তিকা-সমষ্টিতে গঠিত হইয়াছিল কি না, তাঁহার পরীক্ষা করিবার জন্য এক স্থান খনন করিয়া দেখিতে পাওয়া গিয়াছে—তাহার অভ্যন্তরে ইষ্টক-প্রাচীর নিহিত রহিয়াছে। এখন এই দুর্গমধ্যে কেহ বাস করে না; এখানে এখনও কৃষিকার্য্যের সূত্রপাত হয় নাই। দরগার সেবকগণ বর্ত্তমান থাকিলেও, তাঁহারা ভিন্ন গ্রামে বাস করেন,—দরগার প্রাঙ্গণমধ্যে বা নিকটে কেহ বাস করে না। যেখানে মস্‌জেদ বাহির হইয়াছে, তাহার পূর্ব্বে ও পশ্চিমে কৃষিকার্য্যের সূত্রপাত হইয়াছে; এবং তাহার কিয়দ্দূর পূর্ব্বে ও দক্ষিণ-পূর্ব্বে সাঁওতাল, মুণ্ডা প্রভৃতি নবাগত কৃষকগণ কুটীর নির্ম্মাণ করিয়াছে। তাহারাই এখন পরিত্যক্ত সমৃদ্ধিশূন্য ধ্বংসাবশিষ্ট পুরাতন জনাকীর্ণ বৃহৎ নগরের একমাত্র অধিবাসী। তাহাদের চেষ্টায় বন জঙ্গল পরিষ্কৃত হইতেছে; কিন্তু তাহাদের সেই চেষ্টাই পুরা-কীর্ত্তির চিহ্ন-লোপ করিয়া, তথ্যানুসন্ধানের পথ অধিক দুর্গম করিয়া তুলিতেছে!

হিন্দুবৌদ্ধ-স্মৃতিচিহ্ন।

এই খনন-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানের উপযোগী যে সকল স্মৃতি-চিহ্ন দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে স্তম্ভলিপি সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ-যোগ্য। দুইটি স্তম্ভের ঊর্দ্ধভাগের কিঞ্চিৎ নিম্নে দুই পংক্তিতে একই লিপি ক্ষোদিত রহিয়াছে। তাহা এই,—

১। শ্রীরাজপুরীয় লে

২। খক শ্রীম*বদেবঃ

যে সকল দেবমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে; তাহার একটিও অক্ষত অবস্থায় বর্ত্তমান নাই। মূর্ত্তির বিপরীত পৃষ্ঠ মসৃণ করিয়া লইয়া, তাহাতে মুসলমানী কারুকার্য্য ক্ষোদিত করা হইয়াছিল। তাহাকে সম্মুখে স্থাপিত করিবার জন্য মূর্ত্তিযুক্ত অপর পৃষ্ঠ ভিত্তির মধ্যে গাঁথিয়া ফেলা হইয়াছিল। সেই কার্য্যের সুবিধা-সাধনের জন্য মূর্ত্তিগুলির শিল্পোদ্ভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছাঁটিয়া ফেলা হইয়াছিল। এই-রূপে যাহা বিধ্বস্ত হইয়াছিল, তাহা কোন্ শ্রীমূর্ত্তির ভগ্নাবশেষ, এখনও তাহার কিছু কিছু আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সকল শ্রীমূর্ত্তির মধ্যে মহিষমর্দ্দিনীর, বিষ্ণুর, এবং সূর্য্যের মূর্ত্তি উল্লেখযোগ্য। ইহার একখানির পাদপীঠে দানপতির

নাম ক্ষোদিত রহিয়াছে। মস্‌জেদ-বিচ্যুত প্রস্তররাশির মধ্যে একটী গৌরীপট্ট ও দুইখানি বুদ্ধমূর্ত্তিসংযুক্ত দ্বারফলকও বাহির হইয়া পড়িয়াছে। এই সকল প্রস্তর এক যুগের শিল্পরীতির পরিচয় প্রদান করে না; এক শ্রেণীর প্রস্তর-রূপেও প্রতিভাত হয় না। প্রস্তরগুলি যে নানা সময়ের হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দির হইতে সমাহৃত হইয়াছিল, এবং ঐ সকল মন্দির যে মস্‌জেদের অবস্থান-ভূমির পার্শ্বে বা অনতিদূরেই বর্ত্তমান ছিল, তাহাই যুক্তিসঙ্গত অনুমান বলিয়া প্রতীয়মান হয়। প্রস্তরগুলি বৃহদায়তন। এই সকল প্রস্তর নিকটে বা অনতিদূরে বর্ত্তমান থাকিলে, মস্‌জেদ-নির্ম্মাতা প্রস্তর-আহরণের জন্য বহুদূরে হস্ত প্রসারণ করিবার প্রয়োজন অনুভব করিতেন না। প্রস্তরগুলি কত দূর হইতে, কোন্ পুরাকীর্ত্তির অবস্থান-ভূমি হইতে সমাহৃত হইয়াছিল, তাহা জানিবার জন্য স্বভাবতঃই কৌতূহল উপস্থিত হয়। এই কৌতূহল চরিতার্থ করিবার উপযোগী লিখিত প্রমাণ বর্ত্তমান না থাকিলেও, একটি অবস্থা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাহার তথ্যনির্ণয়ের উদ্দেশ্যে মাহি-সন্তোষের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে ও তাহার অনতিদূরবর্ত্তী অন্যান্য স্থানে পুরাতন স্তূপাদির নিদর্শন বর্ত্তমান আছে কি না, তাহার অনুসন্ধান-কার্য্যের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। যেখানে ইষ্টকপ্রস্তর-পরিপূর্ণ ভগ্নস্তূপ এখনও বর্ত্তমান আছে, তাহার অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখিতে পাওয়া গিয়াছে—দরগা হইতে দুই মাইল, চারি মাইল, আট মাইল, দশ মাইল দূরবর্ত্তী অনেক স্থানেই ইষ্টক-প্রস্তরপূর্ণ অনেক ধ্বংসাবশেষ এখনও বর্ত্তমান আছে। কিন্তু দরগার চতুর্দ্দিকের পুরাতন সরোবরগুলি মুসলমান-শাসনের পূর্ব্বকালবর্ত্তী যে জনাকীর্ণ লোকালয়টির পূর্ব্বতন সমৃদ্ধির পরিচয় প্রদান করিতেছে, কেবল তাহার চতুঃসীমার মধ্যেই এখন আর কোনও ইষ্টকপ্রস্তর-পরিপূর্ণ ভগ্নস্তূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা ওয়েষ্টমেক্‌টের অনুমানেরই পক্ষ সমর্থন করে। ইহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র মনে হয়,—দরগায় এবং মস্‌জেদে যে সকল প্রস্তর ব্যবহৃত হইয়াছিল, তাহা বহুদূর হইতে আনীত হয় নাই,—তাহা একদিন এই স্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত হিন্দুবৌদ্ধ দেবালয়ের অঙ্গপ্রত্যঙ্গরূপে হাতের কাছে বর্ত্তমান ছিল। তজ্জন্য অল্পায়াসেই মস্‌জেদ নির্ম্মিত হইতে পারিয়াছিল।

যাহারা সমতল ভূমিতে বাস করিয়াও, বহুদূরবর্ত্তী পর্ব্বত-কন্দর হইতে প্রস্তর-ফলক কাটিয়া আনিয়া, তদ্দ্বারা শিল্পসুষমাসংযুক্ত মন্দির-রচনার উপাদান প্রস্তুত করিয়াছিল, তাহাদের অধ্যবসায়, তাহাদের মহোচ্চ আদর্শ, তাহাদের সমুন্নত শিল্পরুচি ও তাহাদের সমুচিত সমৃদ্ধি এখন স্বপ্নকাহিনীতে পর্য্যবসিত হইয়াছে!

পরবর্ত্তী কালে যাহারা সেই সকল প্রস্তর-ফলক হাতের কাছে প্রাপ্ত হইয়া তাহার সাহায্যে অপেক্ষাকৃত অল্পায়াসে হর্ম্ম্যনির্ম্মাণে ব্যাপৃত হইয়াছিল, তাহাদের পরকীর্ত্তিসংরক্ষণ-পরাঙ্মুখ অত্যুৎকট বীরদর্পের কথাও স্বপ্ন-কাহিনীতে পর্য্যবসিত হইয়াছে! এখন বরেন্দ্র এক মহাশ্মশানভূমিতে পরিণত হইয়াছে। সেই শ্মশানভূমির চিতাভস্ম হিন্দুর কীর্ত্তি ও মুসলমানের কীর্ত্তি সমানভাবেই আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে! পুরাকালের বাঙ্গালার এবং বাঙ্গালীর সুখদুঃখের প্রকৃত পরিচয় লাভ করিতে হইলে, এই মহাশ্মশানের খনন-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে। একটি স্থানের খনন-কার্য্যে সমগ্র পূর্ব্বপরিচয় উদ্ঘাটিত হইবার আশা করা যাইতে পারে না। তাহার জন্য নানা স্থানে খনন-কার্য্যের সুব্যবস্থা করিতে হইবে; এবং দেশের লোককেই তাহার যথাযোগ্য আয়োজন করিতে হইবে। মাহি-সন্তোষের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে যতটুকু খনন-কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারিয়াছে, তাহা একটি স্থানের পক্ষেও পর্য্যাপ্ত বলিয়া কথিত হইতে পারে না। তথাপি তাহা বাঙ্গালার ইতিহাসের এক অন্ধকারাচ্ছন্ন পুরাতন কক্ষকে অভিনব আলোক-সম্পাতে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছে। তাহাই কুমার শরৎকুমার-প্রবর্ত্তিত, বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি-সম্পাদিত এই অপর্য্যাপ্ত খনন-কার্য্যের আশাতীত পুরস্কার। অতঃপর তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

ভেকধারিণী।

১

ক্ষুদী বৈষ্ণবী তন্তুবায়ের কন্যা। তাহার পৈতৃক বাসস্থান কোথায় ছিল, তাহা রামচন্দ্রপুরের কেহই জানিত না; এবং তাহার বয়স কত, তাহার চেহারা দেখিয়া, তাহা কেহই বুঝিতে পারিত না। জনরবে প্রকাশ, রামচন্দ্রপুরের জমীদার চৌধুরী মহাশয়দের সদরের পেস্কার কৃপাসিন্ধু চক্রবর্ত্তী প্রথম যখন রামচন্দ্রপুরে চাকুরী করিতে আসেন, সেই সময় একটী অল্পবয়স্কা পরিচারিকা সঙ্গে লইয়া

আসিয়াছিলেন ; কিন্তু চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের অনুগ্রহে তাহাকে পরিচারিকার মত থাকিতে হইত না। তাহার পরিধানে ধোপদস্ত চওড়া ফিতে পেড়ে শাড়ী, হাতে কাচের পল-তোলা সবুজ চুড়ি, এবং তাম্বূলরাগরঞ্জিত ওষ্ঠে হাসির ছটা দেখিয়া গ্রামের লোক চক্রবর্ত্তীর রসাধিক্যের কথা লইয়া যখন তখন আলোচনা করিত; গ্রামের দুষ্ট ছেলেরা চক্রবর্ত্তীকে দূরে দেখিয়া তাহার শ্রুতিগম্য স্বরে যে সরস ছড়াটির আবৃত্তি করিত, তাহাতে ক্ষুদী চাকরাণীর ও চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নাম অতি মধুর ভাবে জড়িত ছিল ; সে ছড়া শুনিয়া চক্রবর্ত্তী ক্ষেপিতেন, এবং ক্ষুদী 'আ মর, ঘাটে পড়া ড্যাকরারা !' বলিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিত। কিন্তু দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপশালী পেস্কার মহাশয়ের নামের সহিত তাহার নাম সংযুক্ত হইয়াছে দেখিয়া, সে মনে মনে বিলক্ষণ আত্মপ্রসাদ উপভোগ করিত।

কিছুদিন পরে রামচন্দ্রপুরে চক্রবর্ত্তীর পরিবারবর্গের শুভাগমন হইলে, ক্ষুদী চাকরাণীর চাকরী গেল। কিন্তু চক্রবর্ত্তীর সহিত তাহার সম্বন্ধ বিলুপ্ত হইল না। চক্রবর্ত্তী তাহাকে বাসায় আশ্রয়দানে অসমর্থ হইয়া তাহার জন্য একখানি চালা ঘর তুলিয়া দিলেন। পাড়ার দুষ্ট লোকেরা বলিত, চক্রবর্ত্তী অন্যের অলক্ষ্যে মধ্যে মধ্যে তাহার ঘরে তামাক খাইতে যাইতেন। বস্তুতঃ ক্ষুদী চাকরাণীর সেই চালা ঘরের দিকে চক্রবর্ত্তীর তীক্ষ্ণদৃষ্টি ছিল ; গ্রামের কোনও বদ্‌লোক তাঁহার ভয়ে অদূরবর্ত্তী তেঁতুল গাছের তলায় ঝড়ের সময় পাকা তেঁতুল কুড়াইতে যাইতে সাহস করিত না। চক্রবর্ত্তীর আদেশে চৌধুরী মহাশয়ের পাইক ও বরকন্দাজেরা লম্বা লম্বা পাকা বাঁশের লাঠী লইয়া সেই পথে সর্ব্বদা বিচরণ করিত, এবং যখন তখন 'ক্ষুদী, হুঁসিয়ার !' বলিয়া তাহাকে সতর্ক করিত। ইহাতে ক্ষুদী জ্বালাতন হইয়া মধ্যে মধ্যে তাহাদিগকে বলিত, "আমি খুব হুঁসিয়ার আছি, তোরা নিজের চরকায় তেল দেগা, অল্‌পেয়ে হাবাতে নির্ব্বংশের বেটা !" গালি খাইয়া তাহারা পরমসন্তুষ্টচিত্তে অন্য দিকে প্রস্থান করিত, এবং যথাসময়ে চক্রবর্ত্তীকে জানাইত, ক্ষুদী খুব হুঁসিয়ার আছে। কেবল একদিন একটু গোলমাল হইয়াছিল। নফর দাসের পুত্র গগন দাস রাজমিস্ত্রীর কাজে দু' পয়সা উপার্জ্জন করিয়া বেশ হৃষ্টপুষ্ট ও বিলক্ষণ রসিক হইয়া উঠিয়াছিল। সে এক দিন অপরাহ্ণকালে তাহার তেল-চুক্‌-চুকে বাবরী-কাটা চুলে টেরির বাহার দিয়া, চার আনার গামছাখানি কাঁধে ফেলিয়া, এক জোড়া খঞ্জনী হাতে লইয়া চুহুরীপাড়ায়, শ্যামা বাগ্দীর বাড়ীতে বেহুলার গানের মহলা দিতে যাইতেছিল ; পথিমধ্যে বকুলতলায় আসিয়া গগন দেখিতে পাইল, ক্ষুদী একখানি বাহারে ফিতে পেড়ে কাপড় পরিয়া

অঞ্চলবদ্ধ একগোছা চাবি কাঁধের উপর দিয়া পিঠে ফেলিয়া, তাম্বূল-রসে কালো ঠোঁট দু'খানি রাঙ্গা করিয়া কোথায় বেড়াইতে যাইতেছে। গগনের তখন মহা স্ফূর্ত্তি! সে একবার চঞ্চল দৃষ্টিতে চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিল, কোথাও জনপ্রাণী নাই; সে ক্ষুদীর সহিত একটু রসিকতা করিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিল না; মুচকি হাসিয়া বলিল, "এত বাহার দিয়ে যাওয়া হচ্ছে কুতায়? ইস্, পান খেয়ে মুখখান যে এক্কিবারে 'আঙ্গা' করে ফেলেছ, টিকেয় আগুন ধরিয়ে দিয়েছ যে!" তাহার পর সে খঞ্জনীতে মৃদু আঘাত করিয়া মোলায়েম স্বরে গান ধরিল,—

"কলিকালের রঙ্গ দেখে অঙ্গ জ্বলে যায়,
দাসী বাঁদীর বাহার হেরি প্রাণে বাঁচা দায়।"

সঙ্গীত আর অধিক দূর অগ্রসর হইল না; ক্ষুদী চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া কণ্ঠস্বর সপ্তমে তুলিয়া যে বীর রসের অবতারণা করিল, তাহার আবর্ত্তে পড়িয়া সত্যই গগনের 'প্রাণে বাঁচা দায়' হইল। সে গান বন্ধ করিয়া, রণে ভঙ্গ দিয়া, ঝোড় জঙ্গল ডিঙ্গাইয়া ও পগার পার হইয়া পলাইতে পলাইতে শুনিল, ক্ষুদী বলিতেছে, "এখন ল্যাজ গুটিয়ে কুকুরের মত পালাচ্ছিস্ কেন রে ড্যাক্‌রা! ইয়ার্কি দিবার আর লোক পেলিনে? তোর জন্যে মুড়ো খ্যাঙ্‌রা তুলে রেখেছি। ঝাঁটার চোটে পিট্ ফেটে রস গড়াবে!—দেখিস্, কাল তোর কি নাকাল হয়।"

গগনদাসের মন বড় দমিয়া গেল। সে বেহুলার পালায় লখিন্দর সাজিত। কিন্তু সে দিন সে ভাল করিয়া তালিম দিতে পারিল না; তাহার বক্তৃতা ক্রমাগত বাধিয়া যাইতে লাগিল; কি এক অজ্ঞাত ভয় তাহার বুকের ভিতর ধড়্ ফড়্ করিতে লাগিল। ক্ষুদীর 'মুড়ো খ্যাঙ্‌রা'কে সে ভয় করিত না, কিন্তু ক্ষুদীর বাহন চক্রবর্ত্তীর সিংএর গুঁতা কিরূপ সংঘাতিক, তাহা সে জানিত।

পরদিন প্রভাতে গগন মিস্ত্রী কর্ণিক লইয়া হালদার-বাড়ীর প্রাচীর গাঁথিতে বাহির হইয়াছে, এমন সময় জমীদার-বাড়ীর বরকন্দাজ রূপো সর্দ্দার মাথায় লাল পাগড়ী বাঁধিয়া, তৈলপক্ক পাঁচ হাত লম্বা বাঁশের লাঠী কাঁধে লইয়া নাগরা জুতার মস্ মস্ শব্দ করিতে করিতে ভীষণাকৃতি যমদূতের ন্যায় গগনের সম্মুখে উপস্থিত! গঞ্জিকা-ধূম-পানে তাহার চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ, দক্ষিণ বাহুমূলে তাম্রনির্ম্মিত তাগা, কণ্ঠে তিনগাছা সাদা পুঁতির মালা, মধ্যে

মধ্যে এক একটি লাল পলা সেই মালায় গ্রথিত, হরীতকীর আকার-বিশিষ্ট একটি প্রকাণ্ড সোনার মাদুলী কণ্ঠনালীর ঠিক নিম্নভাগে দোদুল্যমান। তাহার লোমপূর্ণ বক্ষঃস্থল অতি বিশাল, বাহুমূলের সমুচ্চ মাংসপেশী অসাধারণ দৈহিক বলের পরিচায়ক; তাহার কটিদেশে মাল কোঁচার উপর রৌপ্যনির্ম্মিত একগাছি সরু গোট!—রূপো সর্দ্দারের ভ্রুকুটিকুটিল, ভাঁটার ন্যায় গোল, রোষ-কষায়িত রক্তবর্ণ চক্ষুর দিকে চাহিয়া গগন মিস্ত্রীর প্রাণ উড়িয়া গেল; ভয়ে তাহার মুখ শুকাইয়া বিবর্ণ হইল; তাহার বুকের মধ্যে কে যেন লোহার দুরমুস্ পিটিতে লাগিল। প্রথমে তাহার মুখে কোনও কথা বাহির হইল না। রূপো বরকন্দাজের এই অপ্রত্যাশিতপূর্ব্ব আবির্ভাবের কারণ বুঝিতে না পারিয়া গগন মিস্ত্রী কর্নিক সহ দক্ষিণ হস্ত ললাটে স্পর্শ করিয়া তাহাকে অভিবাদন করিল, এবং শুষ্ক ওষ্ঠ রসনা রসসিক্ত করিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, "বরকন্দাজ সাহেব, এত সকালে কি মনে ক'রে এ গরীবের বাড়ী পায়ের ধূলো দিলেন? তামাক সেজে আনব?"

রূপো বরকন্দাজ তাহার আকর্ণবিস্তৃত কাল কোঁকড়া গোঁফে তা দিয়া বাজখাঁই আওয়াজে বলিল, "আর কুটুম্বিতে করতে হবে না, শালা বদমাস্! মরবার পাখা উঠেছে। শীগ্‌গির বের কর আমার রোজ চার আনা, তার পর দোস্‌রা কথা ক'স্।"

গগন মিস্ত্রী ভয়ে ভয়ে বলিল, "আমার কি কশুর হয়েছে যে, বরকন্দাজের রোজ দিতে হবে? দোষ ঘাট কিছু করে থাকি ত আল্‌বৎ রোজ দেব।"

রূপো বাগ্‌দী চক্ষু দুটি কপালে ও কণ্ঠস্বর আকাশে তুলিয়া বলিল, "চুপরাও, হারামজাদ! আগে বের কর আমার রোজ, পাজী উল্লুক! তার পর কথা ক'বি। কর্নিক নেড়ে দু' পয়সা আন্‌তে শিখে তোর বড্ড তেল হয়েছে, কেমন? মাদার গাছে যাস্ দাদ্ চুল্‌কুতে! বেটা নচ্ছার!"—সঙ্গে সঙ্গে গগনের গণ্ডদেশে এক প্রচণ্ড চপেটাঘাত।

সেই বিরাট চপেটাঘাতে গগনের মনে হইল, তাহার মুণ্ডটা উড়িয়া গিয়াছে। 'বাবা রে, মেরে ফেল্লে রে!' বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া গগন সেই স্থানে বসিয়া পড়িল।

গগনের আর্ত্তনাদ শুনিয়া তাহার বৃদ্ধা জননী ও বিধবা ভগিনী বাহিরে আসিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। দুই তিন জন প্রতিবেশী ঝাঁপের আড়ালে দাঁড়াইয়া ব্যাপার কি দেখিতে লাগিল; বরকন্দাজের সম্মুখে আসিয়া

তাহার এবংবিধ বীরত্ব-প্রকাশের কারণ জিজ্ঞাসা করিতে কাহারও সাহস হইল না।

অবশেষে সেই পাড়ার মাতব্বর প্রজা নটবর দাস হুঁকা হাতে লইয়া কাশিতে কাশিতে রঙ্গভূমিতে সমাগত হইল, এবং বিনয়নম্র বচনে রূপো বরকন্দাজকে বলিল, "সর্দ্দার, এত গোসা হয়েছেন কেন? গগন ছেলে মানুষ, আপনার থাপ্পড় বরদাস্ত করতে পারবে কেন? ভিরমি 'নেগে' মারা যাবে!"

রূপো বলিল, "ওর মরাই ভাল, দু পয়সা রোজগার ক'রে হারামজাদের বড্ড তেল হয়েছে!—রাস্তায় দাঁড়িয়ে মেয়ে মানসের সঙ্গে মস্‌করা? চল্, শীগ্‌গির পেস্কার বাবু তোকে তলব দিয়েছেন। আমার রোজের চারগণ্ডা পয়সা আগে বার কর।"

নটবর দাস গগনের মাকে বলিল, "বরকন্দাজ এসেছে, রোজ আদায় না করে ছাড়বে না, থামকা কেন বে-ইজ্জৎ হবে, মা? যেথান থেকে পার, চার আনার পয়সা এনে দাও।"

ঘরের ভিতর সুচকোঁড় গাছের আঁশে নির্ম্মিত এক গাছি শিকে বাঁশের আড়ায় ঝুলিতে ছিল; শিকের মধ্যে তিনি চারিটি হাঁড়ি উপর্য্যুপরি সজ্জিত; একটি হাঁড়ির মধ্যে একখানি ময়লা ন্যাকড়ায় বাঁধা কয়েকটি সিকি, দুয়ানি ও পয়সা ছিল। গগনের মার ইহা স্ত্রীধন। সে কাঁশারী ও কামারদের কাছে বাবলা কাঠের কয়লা বিক্রয় করিয়া দুই চারি পয়সা সঞ্চয় করিত। পুত্রের নির্য্যাতন-দর্শনে ভীত হইয়া পুত্রবৎসলা জননী তাহার সেই কষ্টসঞ্চিত অর্থ হইতে দুইটি দুয়ানী লইয়া বরকন্দাজের সম্মান রক্ষা করিল। রূপো বরকন্দাজ গগনকে ধরিয়া লইয়া পেস্কার বাবুর বাসায় চলিল।

পেস্কার কৃপাসিন্ধু চক্রবর্ত্তীর দয়ার শরীর। গগন রূপো বাগদীর হস্তে কিঞ্চিৎ উত্তম-মধ্যম লাভ করিয়াছে বুঝিয়া, আর তাহাকে অধিক উৎপীড়ন করিলেন না। সে দিন রবিবার। নবগৌর নরসুন্দর সে সময় পেস্কার বাবুকে কামাইতে আসিয়াছিল। কৃপাসিন্ধুর হঠাৎ কি খেয়াল হইল, তিনি নবগৌরকে বলিলেন, এ ছোঁড়া বড় রসিক, পথে ঘাটে মেয়ে মানুষ দেখিলে উহার মাথা ঘুরিয়া যায়, একটু শৈত্যক করা দরকার, উহার মাথাটা ন্যাড়া করিয়া দে।"

নবগৌর দেখিল, মজা মন্দ নহে। সে তৎক্ষণাৎ ক্ষুর বাহির করিয়া গাড়ুর জলে গগণের মাথা ভিজাইয়া লইল, তার পর মস্তকে ক্ষুর-সঞ্চালন! গগন দুই একবার মাথা নাড়িয়া আপত্তি প্রকাশ করিল। কৃপাসিন্ধু ফরসীর

নলটা মুখ হইতে নামাইয়া বলিলেন, "খবরদার, মাথা নড়াইলে ক্ষুরের চোটে মাথা দিয়ে রস গড়াবে। চুপ চাপ্ বসে থাক; যেমন কর্ম্ম, তার তেমনি ফল ভোগ কর।"

গগন অগত্যা নবা নাপিতের হস্তে মস্তক সমর্পণ করিল। তাহার মস্তকের এক পাশের বাবরী কাটা চুল দেখিতে দেখিতে নির্ম্মূল হইয়া ধূলায় লুটাইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া তাহার চক্ষু হইতে টস্ টস্ করিয়া জল ঝরিয়া মাটী ভিজাইয়া ফেলিল। গগন কাঁদিয়া বলিল, "হুজুর! ধর্ম্ম-অবতার! এবারকার মত আমার কসুর মাফ্ করুন, আমি নাকে কাণে খত দিচ্ছি, এমন কর্ম্ম আর কখনও হবে না ধর্ম্ম-অবতার!"

'ধর্ম্ম-অবতার' বলিলেন, ঠিক বল্‌ছিস্?—এখন থেকে মেয়ে মানুষ দেখ্‌লে মাটীর দিকে চোখ্ নামিয়ে পথে চল্‌বি?"

গগন চক্ষু মুছিয়া বলিল, "হাঁ হুজুর!"

পেস্কার বাবু বলিলেন, "নবা! তবে আর কাজ নেই। হতভাগার উপযুক্ত শাস্তি হয়েছে। এখন তোর ক্ষুর বন্ধ কর, ওকে ছেড়ে দে!"

নবগৌর বলিল, "হুজুর, মাথার একটা পাশ কামানো হয়েছে, আর এক পাশে যে ক্ষুর দেওয়া হয়ই নি।"

বাবু বলিলেন, "না হয়েছে, না হয়েছে। আর দরকার নেই, ছেড়ে দে। আমি মাফ্ করিছি।"

অগত্যা নবগৌর ভাঁড়ে ক্ষুর পুরিল। আধখানা মাথা ঘসা-পয়সার মত তেলা, আর আধখানায় লম্বা বাব্‌রী! গগন কাঁদিয়া করযোড়ে বলিল, "হুজুর, আমার তামাম মাথায় ক্ষুর বুলিয়ে ছাড়া করবার হুকুম হোক্। এ মাথা নিয়ে আমি মুখ দেখাতে পারবো না।"

বাবু বলিলেন, "সে হচ্ছে না। ঐ তোর শাস্তি। দেখ নবা, এখানে যে কয় ঘর নাপিত আছে, তাদের সকলকে আমার নাম করে বলে দিবি, কেউ যেন গগনার বাকি আধখানা মাথা কামিয়ে না দেয়। বুঝলি? আমার এ হুকুম যে না শুনবে, তাঁকে ভিটে-ছাড়া করব।"

গগন মাথায় গামছা জড়াইয়া লজ্জানিবারণপূর্ব্বক বাড়ী আসিল। লজ্জায় সে দুই দিন বাড়ীর বাহির হইল না। তাহার মা, হরিবোলা, রামধন, জগবন্ধু প্রভৃতি পরামাণিকগণের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া তাহার পুত্রের লজ্জানিবারণের জন্য অনুনয় বিনয় করিতে লাগিল; আধখানা মাথা কামাইতে দুই আনা পর্য্যন্ত মজুরী দিতে

রাজী হইল; কিন্তু কেহই তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইল না। সকলেই বলিল, "বাপ্ রে! কার ঘাড়ে তিনটে মাথা যে, তোমার ছেলের আধখানা মাথা কামিয়ে পেস্কার বাবুর কোপে পড়্‌বে? আমরা দুটো কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে সংসার করি, শেষে ভিটে কেটে তাড়িয়ে দেবে! ও কাজ আমাদের দিয়ে হবে না।"

গ্রামে মুখ দেখাইতে না পারিয়া গগন অগত্যা তৃতীয় দিন প্রত্যুষে ময়ামারী গ্রামে তাহার মামার বাড়ী চলিল। সেখানে এক নাপিত এই দায় হইতে তাহাকে উদ্ধার করিল।

তাহার পর হইতে রামচন্দ্রপুরের আর কোনও লোক ক্ষুদীর সহিত পরিহাস করিতে সাহসী হয় নাই; ক্ষুদী নির্ব্বিবাদে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। কৃপাসিন্ধুও নিশ্চিত হইলেন। ক্ষুদীর কুটীরে গুরুগম্ভীরে তাঁহার হুঁকা ডাকিতে লাগিল।

২

ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পরের কথা। কৃপাসিন্ধু চক্রবর্ত্তী অনেক দিন গত হইয়াছেন। রামচন্দ্রপুরে তাঁহার ভিটায় এখন কালকাসিন্দা ও লাল ভেরেণ্ডার জঙ্গল। যেখানে তাঁহার বৈঠকখানা ছিল, সেখানে একটা প্রকাণ্ড শিমূল গাছ শাখাসমূহ মেলিয়া দাঁড়াইয়া আছে; তাহার অদূরে পেটো মহাজন গোবর্দ্ধন সাহা 'হালি' বড় মানুষ হইয়া মাটী কাটিয়া ইঁটের পাঁজা পোড়াইয়াছিল; সেই গর্ত্তটি বেতবনে পূর্ণ; সন্ধ্যাকালে সেখানে ব্যাঘ্র-গর্জ্জন শুনিতে পাওয়া যায়।

কৃপাসিন্ধু যে জমীদারের পেস্কারী করিয়া বাঘে গরুকে এক ঘাটে জলপান করাইয়াছেন, সেই দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপশালী জমীদার-বংশ প্রায় ফেরার। বংশে বাতি দিতে যাঁহারা বাঁচিয়া আছেন, তাঁহারা সম্পত্তি ভাগবাটোরা করিয়া লইয়া 'চটকস্য মাংসে' ক্ষুন্নিবারণ করিতে পারিতেছেন না; অগত্যা তাঁহাদিগকে জমিদারী বিক্রয় করিয়া বা বন্ধক দিয়া গোয়ালার জলের দাম, ডাক্তারের ভিজিট, ম্যালেরিয়ার কুইনাইন, এবং উমেশ সা শুঁড়ীর প্রাপ্যের ব্যবস্থা করিতে হইতেছে। তাহার উপর মধ্যে মধ্যে নূরবক্স সর্দ্দারের বাড়ী হইতে দুর্ম্মূল্য 'রামপাখী' সংগ্রহ করা আছে। সুতরাং চৌধুরী-বংশধরেরা পূর্ব্ব প্রতিপত্তি অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য কেহ মিউনিসিপালিটীর কমিশনর, কেহ অনাহারী ম্যাজিষ্ট্রেট্ হইতেছেন। এই অনাহারী মহাশয়েরা কিঞ্চিৎ আহারের লোভে বাজারে গিয়া সবজীর দোকানে মূলার ল্যাজ ধরিয়া টানাটানি করেন। যাঁহাদের কিঞ্চিৎ

কলিকাতায় বাসা ভাড়া লইয়া গড়ের মাঠে হাওয়া খান, এবং রাত্রে থিয়েটার দেখেন; আর কোথায় যান, তাহা তাঁহাদের মোসাহেবের দলের জানা থাকিতে পারে। কিন্তু গ্রামের কোনও ভদ্রলোকের সহিত দৈবাৎ সাক্ষাৎ হইলে মুখ ফিরাইয়া থাকেন, এবং গ্রামে গিয়া বসবাস করিবার জন্য কেহ অনুরোধ করিলে বলেন, "সে কুস্থানে কি মানুষ যায়? একটু দাঁড়াইবার যায়গা নাই। কেবল জঙ্গল, মশা, আর ম্যালেরিয়া!"

ক্ষুদীর যৌবন চিরস্থায়ী হয় নাই; কৃপাসিন্ধু অবর্ত্তমানে তাহার অদৃষ্টাকাশে দুর্দ্দিনের মেঘ ঘনাইয়া আসিল। তাহার হাতে কিছু টাকা ছিল, এ জন্য অনেকেই তাহার রক্ষক হইবার জন্য উমেদারী আরম্ভ করিল। কেহ তাহাকে ভাগবত শুনাইতে যাইত; কেহ তাহার নিকট নিঃস্বার্থভাবে কৃষ্ণকথা বিলাইতে যাইত। কিন্তু ক্ষুদী বড় চালাক, কেহ সেখানে দন্তস্ফুট করিতে পারিল না; ক্ষুদীর টাকার ঘটী কোথায় প্রোথিত আছে, কেহই তাহার সন্ধান পাইল না; ভাগবত-পাঠ, কৃষ্ণকথা-বিতরণ অনর্থক হইল। সকলেই নিরাশ হইয়া হাল ছাড়িয়া দিল।

শেষে যিনি হা'ল ধরিলেন, তিনি পাকা মাঝি! রামচন্দ্রপুরের বোষ্টম্-সমাজের দুস্তর ভবজলধিঃপারের কর্ণধার। তাঁহার নাম কানাইদাস মোহন্ত। তাঁহার ভাঁটার মত গোল মাথাটি কামানো; যথাস্থানে একটি বিপুল আর্কফলা; তরমুজের বোঁটা অপেক্ষা অনেক অধিক স্থূল। সংকীর্ত্তনের সময় নৃত্যের তালে তালে তাঁহার মাথার উপর তাহা নৃত্য করিতে থাকে; তিনি ভাবাবেশে বিহ্বল হইয়া ঘন-ঘন 'খুদী'র দিকে চান, ঘর্ম্মধারায় 'রাধাকৃষ্ণ চরণ ভরসা'র ছাপা দ্রব হইয়া বাহুমূল প্লাবিত করে, ঢক্কাকার বিরাট বর্ত্তুল উদর মৃদু মৃদু কম্পিত হইতে থাকে, এবং তাঁহার কটিতটবেষ্টিত পাতলা মলমলের বহির্ব্বাস শ্লথ হইয়া কৌপীনের মহিমা সুপ্রকাশিত করে। তাঁহার দুই নয়নের প্রেমাশ্রু নাসিকার দুই পাশ দিয়া গড়াইয়া অপ্রতিহতভাবে অধর স্পর্শ করে। সংকীর্ত্তন জমিয়া যায়।

গতযৌবনা ক্ষুদীর মনে হরিভক্তির সঞ্চার হইয়াছিল। একদিন সঙ্কীর্ত্তনের সময় কানাইদাস বাবাজীর ভক্তিবিহ্বল ভাব দেখিয়া সে মনে করিল, ইনিই মানুষ। যদি কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিতে হয়, তবে তাহা ইঁহারই নিকট মিলিবে। ক্ষুদী পর দিন হইতে বাবাজীর আখ্ড়ায় যাতায়াত করিতে লাগিল। তাঁহার অনেকগুলি সেবাদাসী ছিল, কিন্তু ক্ষুদীর ভিতর তিনি 'বস্তু' দেখিতে পাইলেন; ক্ষুদীকে তিনি সাগ্রহে ধর্ম্মোপদেশ খয়রাৎ করিতে লাগিলেন। ক্ষুদী মুক্তির পথ

দেখিতে পাইল। একদিন সে মোহন্তজীর পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "প্রভু, আমি মরিলে কি গতি হইবে?"

কানাইদাস মোহন্ত ভুঁড়িতে হাত বুলাইয়া নিমীলিতনেত্রে বলিলেন, "ম্যাথরে তোমার পায়ে দড়ি বাঁধিয়া শ্মশানে ফেলিয়া আসিবে। শেয়াল শকুনে তোমাকে 'চিবাইয়া' খাইয়া ফেলিবে।"

ক্ষুদী বলিল, "প্রভু, ইহার কি কোনও উপায় হয় না?"

প্রভু বলিলেন, "উপায় যে না আছে, তা নয়; তবে সে কঠিন কাজ!—পা ছাড়।"

ক্ষুদী বলিল, "প্রভু, আপনি আমার উদ্ধারের উপায় বলিয়া না দিলে 'ছিচরণ' ত্যাগ করিব না।"

প্রভু গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "ভেক্ নিতে পারিস্?"

ক্ষুদী বলিল, "পারি। আমাকে ভেক লইয়া দেন। উদ্ধার করুন।"

প্রভু বলিলেন, "সাধ যায় বৈষ্ণব হতে, বুক্ ফাটে মচ্ছব দিতে।—মচ্ছব দিতে হবে; সে অনেক টাকার কাজ। মচ্ছব দিতে পারবি? বৈষ্ণব-সেবা যার তার কর্ম্ম নয়।"

ক্ষুদী বলিল, "প্রভু, আমি মচ্ছব দিব। আমার যা কিছু সঞ্চিত আছে, মচ্ছবেই ব্যয় করিব।"

বাবাজী প্রসন্নমনে বলিলেন, "সাধু, সাধু! তোর কৃষ্ণপ্রেম জন্মিয়াছে, আর কোনও ভয় নাই। তোর ভেক লইবার ব্যবস্থা করিতেছি। কিন্তু টাকাগুলা আগে চাই।"

ক্ষুদী পেস্কারের পেস্কারী করিয়া এবং নানা স্থানে মহাজনী করিয়া যাহা কিছু সঞ্চয় করিয়াছিল, সমস্তই তাহার একঘটী টাকা কানাইদাস মোহন্তের পাদপদ্মে সমর্পণ করিল। মোহন্তজী তাহাকে ভেক দিলেন, এবং কিঞ্চিৎ অর্থব্যয় করিয়া একটি মচ্ছবও দিলেন। অবশিষ্ট টাকা তাঁহার তহবিল-ভুক্ত হইল, এবং মহাজনীতে খাটিতে লাগিল। কানাইদাস মোহন্ত রামচন্দ্রপুরের প্রসিদ্ধ মহাজন; প্রতিমাসে মুন্সেফী আদালতে তাঁহার আট দশটি মামলা লাগিয়াই থাকে।—এই মক্কেলটিকে লাভ করিবার জন্যই মহকুমার উকীল জন্মেজয় ভড় কণ্ঠদেশে তিন কণ্ঠী মালা ধারণ করিয়াছেন; সাক্ষী শিখাইতে তাঁহার ন্যায় লব্ধ-প্রতিষ্ঠ উকীল সে অঞ্চলে দ্বিতীয় নাই।

ক্ষুদীর কুটীরের অদূরে এক জন মোক্তার বাস করিতেন। ক্ষুদী উঠ্‌বন্তী

জমীতে বাস করিত। খুদীর ঘরখানি সহ সমস্ত জমী মোক্তার নিরঙ্কুশ বাবু জমীদারের নিকট মৌরসী করিয়া লইলেন। ক্ষুদী তাঁহারই পরিবারভুক্ত হইয়া তাঁহার ছোট ছোট ছেলেগুলিকে মানুষ করিতে লাগিল।

এরূপ একটি বিনা-মাহিনায় ঝি পাইয়া নিরঙ্কুশ-পত্নী নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। ক্ষুদী দু'বেলা দুটি খাইত, আর ছেলেদের ভার বহন করিত; রাত্রে সে ছেলেদের কাছে লইয়া শয়ন করিত, তাহাদের ঘুম পাড়াইত, এবং শীতকালের রাত্রে তাহাদের লেপ গা হইতে সরিয়া গিয়াছে কি না, দশবার উঠিয়া দেখিত। ক্ষুদী খাওয়াইয়া না দিলে তাহাদের পেট ভরিত না।

ছেলে তিনটি মানুষ হইল; ক্ষুদীর কাজ ফুরাইল। কিন্তু তাহার জঠর-যন্ত্রণা তাহাকে ত্যাগ করিল না। সে বসিয়া বসিয়া খাইতে লাগিল। নিরঙ্কুশ বাবু একদিন বলিলেন, "কতদিন ধরে' তোকে খাইতে দিব? আমার সে শক্তি নাই; তুই ভেক লইয়াছিস্, ভিক্ষা করিয়া পেটের ভাত কর। আমার বাড়ীতে আর খাইতে পাইবি না।"

অগত্যা ক্ষুদী ভিক্ষায় বাহির হইল। কানাইদাস বাবাজী আর তাহার সহিত ভাল করিয়া কথা কহেন না, তখন আর কথা কহিবার আবশ্যকতা ছিল না। ক্ষুদী দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া অপরাহ্ণে কুটীরে আসিয়া দু'টি রাঁধিয়া খায়;—কিন্তু নিরঙ্কুশের ছেলেদের না দেখিয়া থাকিতে পারে না। যে দিন সেই দুই একটি পয়সা ভিক্ষা পায়, তাহা দিয়া সন্দেশ কিনিয়া ছেলেদের খাইতে দেয়।

নিরঙ্কুশ বাবু বুদ্ধিমান মোক্তার। যে বৎসর পুরন্দরপুর কুঠীর নীলকর হেণ্ডারসন্ সাহেবের সহিত প্রজাদের ফৌজদারী মামলা বাধে, সেই নীল-বিদ্রোহের সময় নিরঙ্কুশ সাহেবদের মোক্তারী করিয়া বিলক্ষণ দশ টাকা রোজকার করিলেন; বেশ গুছাইয়া উঠিয়া বাড়ীটি পাকা করিবার সঙ্কল্প করিলেন; কিন্তু ক্ষুদীর কুটীর খালি না পাইলে তাঁহার পাকা ঘরের রোখ্ মারা যায়!—ক্ষুদী সামান্য কিছু লইয়া তাহার কুটীরখানি তাঁহাকে বিক্রয় করিতে বাধ্য হইল। জমী তাঁহার, ক্ষুদীকে নোটীশ দিয়া উঠাইয়া দিবেন বলায়, সে আর প্রতিবাদ করিল না; ঘর বিক্রয় করিল।

ক্ষুদীর মাথা রাখিবার স্থান রহিল না। ক্ষুদী দুই একদিন নিরঙ্কুশের গৃহে শয়ন করিতে গিয়াছিল; তাহার স্ত্রী বলিয়াছিল, "তুই নানা রোগে ভুগ্‌ছিস্; কোন্‌দিন আমার ঘরে মরে' পড়ে' থাকবি; তোকে ফেল্‌বে কে?—তুই পথ দেখ্ বাছা! আর আমাকে জ্বালাতন করিস্ নে।"

ক্ষুদী কাঁদিয়া বলিল, "তোমার ছেলেদের কোলে পিঠে ক'রে মানুষ করেছি ; ওদের না দেখে' যে থাকতে পারিনে! আমাকে তাড়িয়ে দিও না, বৌমা!"

গিন্নী নথ ঘুরাইয়া বলিল, "আর মায়া-কান্না দেখিয়ে কাজ নেই, দূর হ আমার ঘর থেকে।"

ক্ষুদী পথে গিয়া দাঁড়াইল।

বৃন্দাবন দাস বৈরাগ্য, গৃহী 'বোষ্টম'। রীতিমত সংসারী। তাহার পুত্র কন্যা অনেকগুলি। বৃন্দাবনের বিস্তর কাজ। কাজের চাপে তাহার আহার নিদ্রার অবসর ছিল না। সে শ্রাদ্ধ-বাড়ীতে 'ধম্বল' দিত ; গ্রাম্য বাজারে তামাক বিক্রয় করিত ; বৈশাখ, কার্ত্তিক ও মাঘ মাসে এক যোড়া করতাল বাজাইয়া সন্ধ্যাকালে ও শেষ রাত্রে পুত্র সহ গ্রামাপথে ও গৃহস্থের বাড়ীর দরজায় টহল দিয়া বেড়াইত ; এবং 'কহ গোবিন্দ, ভজ গোবিন্দ, লহ গোবিন্দ নাম' গাইয়া রাত্রি-শেষে নিরীহ গ্রামবাসীদের ভজন শুনাইতে গিয়া নিদ্রাসুখের ব্যাঘাত করিত। তাহার পর প্রভাতে বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া টহলের দক্ষিণা আদায় করিয়া বেড়াইত। এতদ্ভিন্ন শীতকালে পরের খেজুর গাছে উঠিয়া খেজুর-রস চুরী করা তাহার কর্ত্তব্যের একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ ছিল। তাহায় আদর্শে তাহার পঞ্চ পুত্রও এই সকল বিদ্যায় পারদর্শী হইতেছিল।

ঘরখানি বিক্রয় করিয়া ক্ষুদী বৈষ্ণবী কিছু টাকা পাইয়াছে শুনিয়া বৃন্দাবন-দাস পথে আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল ; এবং মিষ্টস্বরে বলিল, "পিসী, তোমার দুঃখের কথা সব শুনেছি ; আমি থাক্‌তে তুমি পথে দাঁড়াবে ? তা কি হয় ? রাধাগোবিন্দজীর মনে (উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া) যা আছে, তাই হবে ; চল, আমার বাড়ী চল, আমার ছেলে পাঁচটা শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে যদি দু'মুঠো খেতে পায় ত তুমিও পাবে। তোমাকে আর লাঠী ধ'রে বাড়ী বাড়ী ভিক্ষে করে ফিরতে হবে না। আহা, বুড়ো মানুষ!"

ক্ষুদী বৃন্দাবনের কুটীরে আশ্রয় হইল ; বৃন্দাবন তাহাকে তিন দিন খাইতে দিল। বৃন্দাবনের আদরে ও মিষ্ট কথায় ভুলিয়া ক্ষুদী তাহার শেষ সম্বল,—কুটীর-বিক্রয়-লব্ধ টাকা কয়টি তাহার নিকট গচ্ছিত রাখিল। বৃন্দাবন বলিল, এই টাকায় সে তাহাকে 'ছিবিন্দাবন' করাইয়া আনিবে। কিন্তু টাকাগুলি হস্তগত করিয়াই বৃন্দাবন নিজমূর্ত্তি ধারণ করিল ; পিসীর আর কোনও খোঁজ খবর লইল না ; বৃন্দাবনের বৈষ্ণবী তাহাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিল ; আর ঘরে উঠিতে দিল না।

অগত্যা ক্ষুদী এখন দত্তদের গোয়াল-ঘরে 'বিচালী'র গাদায় আশ্রয় লইয়াছে। বার্দ্ধক্যে তাহার দেহ বাঁকিয়া সগুণ ধনুকের আকার ধারণ করিয়াছে। শরীর শুকাইয়া মাংস জর-জর হইয়াছে; অন্নাভাবে উদরের মাংস পিঠে ঠেকিয়াছে; চক্ষু কোটরগত ও দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্তপ্রায়; মস্তকের দুই চারি গুচ্ছ রুক্ষ কেশ শণের ন্যায় শুভ্র। দুই পা চলিতে সে তিনবার বসে, তথাপি একমুঠা ভাতের জন্য লাঠী ধরিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া বেড়ায়, এবং হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলে, "রাধে কৃষ্ণ, দুটো খেতে দেও, মা লক্ষ্মী!"

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

'ব্যাপ্তিপঞ্চক'।

কলিকাতা-নিবাসী শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ মহাশয়, তাঁহার ছাত্র শ্রীযুত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষের দ্বারা "ব্যাপ্তিপঞ্চকে"র এই বঙ্গানুবাদ প্রকটিত করিয়াছেন। রাজেন্দ্র বাবু তর্কতীর্থ মহাশয়ের নিকট "ব্যাপ্তিপঞ্চক" পড়িবার সময়ে ইহার সকল কথা স্মৃতিপথে জাগরূক রাখা দুঃসাধ্য মনে করিয়া, ইহার অনুবাদ ও সুবিস্তৃত ব্যাখ্যা লিখিতে আরম্ভ করেন, এবং যতক্ষণ তাহা অধ্যাপক মহাশয়ের মনোমত না হইত, ততক্ষণ ইহা পুনঃপুনঃ নূতন করিয়া লিখিতেন। এইরূপে এই গ্রন্থের বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা ও অনেক রহস্য সংগ্রহ করিয়া, তাহা সুরক্ষিত করিবার বাসনায়, শ্রীযুত ঘোষ মহাশয় এই অনুবাদ সম্পাদন করেন। গ্রন্থের প্রারম্ভে যে 'নিবেদন' লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে গ্রন্থ-সম্পাদক ঘোষ মহাশয় এই কথাই প্রকাশ করিয়াছেন। 'উৎসর্গপত্রে'ও রাজেন বাবু বলিয়াছেন,—"যাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম এবং অসীম অনুকম্পার ফলে এই গ্রন্থমধ্যে তদুপদিষ্ট বাণী যথাযথভাবেই লিপিবদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছি, মদীয় অধ্যাপকদেব সেই পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ মহোদয়ের উদ্দেশে গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার ন্যায় এই গ্রন্থখানি উৎসর্গ করিলাম।" সুতরাং এই বঙ্গানুবাদের বক্তা তর্কতীর্থ মহাশয় ও লেখক ঘোষ মহাশয়, ইহা স্পষ্টই জানা যাইতেছে। তথাপি এই গ্রন্থের টাইটেল-পেজে 'অনুবাদক ও সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ' ইহা লিখিত হইল কেন, বুঝিতে পারিলাম না।

সম্পাদক শ্রীযুত ঘোষ মহাশয়, এই গ্রন্থের প্রথমে ১২৪ পৃষ্ঠাব্যাপী দীর্ঘ ভূমিকা লিখিয়াছেন। তাহাতে তিনি অনেক কথা বলিবারই চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু কোনও কথাই গুছাইয়া বলিতে পারেন নাই। এমন কি, স্থানে স্থানে ভাষার বিশুদ্ধিও রক্ষিত হয় নাই। গঙ্গেশের প্রবাদমূলক চরিতে সম্পাদক মহাশয় একাধিকবার 'বিদ্যালয়-গৃহকোণে' লিখিয়াছেন। 'আলয়' ও 'গৃহ' যে একই পর্য্যায়ের শব্দ, ইহা সম্পাদকের জানা উচিত ছিল। ঘোষ মহাশয় গঙ্গেশ প্রভৃতি গ্রন্থকারদিগের জীবন সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহাতে নূতন কিছুই জানা যায় না। তিনি রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর "নোটিসেস্ অফ্ সংস্কৃট্ ম্যানস্ক্রীপ্ট্স্" এবং অন্যান্য কতকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থের ভূমিকা অবলম্বন করিয়া এই সকল চরিত লিখিবার চেষ্টা

করিয়াছেন। ইহাতে মৌলিক অনুসন্ধানের কোনও পরিচয়ই পাওয়া যায় না। সম্পাদক মহাশয় এই চরিত-রচনায় এতই পরতন্ত্র যে, শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর "নোটিসেস্ অফ্ সংস্কৃট্ ম্যানুস্‌ক্রিপ্‌ট্‌স্"এ যে সকল শ্লোক ভুল ছাপা হইয়াছে, ঘোষ মহাশয়ের ভূমিকাতেও তাহাই অবিকল মুদ্রিত হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নে আমরা এইরূপ একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম,—

"প্রকাশদর্পণোদ্ভৎকৃত্তির্ব্যাখ্যা কৃতোজ্জ্বলা।
তথাপি যোজনামাত্রমুদ্দিশ্যায়ং মমোদ্যমঃ॥"

"প্রকাশদর্পণোদ্যোত—" ইহাই প্রকৃত পাঠ। 'উদ্যোত' স্থানে 'উদ্ভৎ' করায় যে ছন্দোভঙ্গ হইয়াছে, তাহাও ঘোষ মহাশয় বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। এই 'উদ্যোত' বাসুদেব সার্ব্বভৌমের পুত্র, জনেশ্বর বাহিনীপতি মহাপাত্রের লিখিত এক টীকাগ্রন্থ। এই টীকা পক্ষধর মিশ্র কৃত 'আলোকে'র উপর রচিত।

ঘোষ মহাশয়, তাঁহার ভূমিকায় অনেক স্বকপোল-কল্পিত মতও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—

"রঘুনাথ নৈয়ায়িকশ্রেষ্ঠ হইলেও তাঁহাকে অদ্বৈতবাদানুরাগী পণ্ডিত বলিতে হয়। ইহার প্রমাণ—তাঁহার গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ, এবং খণ্ডন-খণ্ড-খাদ্যের টীকা প্রভৃতি"। (—ভূমিকা, ২৭ পৃঃ)

রঘুনাথ, "খণ্ডন-খণ্ড-খাদ্যে"র টীকা লিখিয়াছেন, এই হেতুতেই যে তাঁহাকে অদ্বৈতবাদী পণ্ডিত বলিতে হইবে, ইহা অদ্ভুত যুক্তি। 'বেদান্তপরিভাষা'-কার, পরম বৈদান্তিক, ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্র, গঙ্গেশকৃত 'তত্ত্বচিন্তামণি' নামক ন্যায়শাস্ত্রের প্রধান গ্রন্থের 'তর্কচূড়ামণি' নামক টীকা লিখিয়াছেন বলিয়া কি তাঁহাকে দ্বৈতবাদী পণ্ডিত বলিতে হইবে? তাহার পর, বৰ্দ্ধমানোপাধ্যায় শঙ্কর মিশ্র প্রমুখ অন্যান্য নৈয়ায়িকেরাও "খণ্ডন-খণ্ড-খাদ্যে"র টীকা লিখিয়াছেন। ইহাতে তাঁহাদিগকেও কি অদ্বৈতবাদী পণ্ডিত বলিব? সেই সময়ে "খণ্ডন-খণ্ড-খাদ্য" ও "আত্মতত্ত্ববিবেকে"র টীকা লেখা নৈয়ায়িকদিগের একটা গৌরবের বিষয় ছিল। এই জন্য অনেক নৈয়ায়িকই উক্ত উভয় গ্রন্থসংক্রান্ত টীকা টিপ্পনীর রচনা করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, রঘুনাথের মঙ্গলাচরণ শ্লোক যে অদ্বৈত-মত-পোষক নহে, ইহা সম্পাদক মহাশয়, উক্ত শ্লোকের গদাধর ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি কৃত ব্যাখ্যা দেখিলে জানিতে পারিবেন।

ঘোষ মহাশয়, ৪১ পৃষ্ঠায় রঘুনাথ-রচিত বলিয়া নিম্নলিখিত শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

"যেষাং কোমলকাব্যকৌশলকলালীলাবতী ভারতী
তেষাং কর্কশতর্কবক্রবচনোদ্গারেঽপি কিং হীয়তে।
যৈঃ কান্তাকুচমণ্ডলে কররুহাঃ সানন্দমারোপিতা-
স্তৈঃ কিং মত্তকরীন্দ্রকুম্ভশিখরে ক্রোধান্ন দেয়াঃ শরাঃ॥"

যাঁহারা সংস্কৃত সহিত সাহিত্যের পরিচিত, তাঁহারা সকলেই বোধ হয় জানেন যে, এই শ্লোকটী জয়দেব-কৃত "প্রসন্নরাঘব" নামক সুললিত নাটকের প্রস্তাবনায় উল্লিখিত হইয়াছে। এইরূপ ভ্রান্তিবিজৃম্ভিত প্রত্নতত্ত্বের আলোচনা করিয়া 'প্রত্নতাত্ত্বিক' নামে বিখ্যাত হইবার চেষ্টা করা অপেক্ষা তৎসম্বন্ধে নীরব থাকাই কি সুশোভন নহে? আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইতিপূর্ব্বে এই-ভূমিকারই ২৪ পৃষ্ঠার পাদটীকায় "যেষাং কোমলকাব্য"—ইত্যাদি শ্লোকটী "প্রসন্নরাঘব" নাটকের

প্রস্তাবনায় লিখিত বলিয়া উদ্ধৃত হইয়াছে। সম্পাদক মহাশয়ের এইরূপ অপূর্ব্ব ধারণাবতী ধী যে অতিমাত্র প্রশংসার্হ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইহার পরে যে শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাও রঘুনাথ-রচিত নহে। উহা "মুকুন্দানন্দ-ভাণে" দৃষ্ট হয়। ঘোষ মহাশয়, অনেক গবেষণার পর লিখিতেছেন,—

"কারণ, গদাধরও নিজগ্রন্থে 'শিরোমণির বাক্য অবলম্বনে রচিত' এইরূপ পদ প্রয়োগ করিয়াছেন যথা,—

"অভিবন্দ্য মুহুঃ সমাদরাৎ পদপঙ্কজযুগং পুরদ্বিষঃ।
বিবৃণোতি গদাধরঃ সুধীরতিদুর্ব্বোধগিরঃ শিরোমণেঃ॥"

ইতি অনুমানখণ্ডে গাদাধরীপ্রারম্ভ।" ৪৮ পৃঃ

প্রথমতঃ শ্লোকটী এ স্থলে বিকৃতভাবে উদ্ধৃত হইয়াছে। "পদপঙ্কজ" স্থলে "পদপাথোজ" হইবে। তা'র পর, "শিরোমণির বাক্য-অবলম্বনে রচিত" ইহা এই শ্লোকটীর কোন্ অংশের অর্থ, তাহা আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধির অগোচর। 'সুধী গদাধর শিরোমণির অতি দুর্ব্বোধ বাক্যের ব্যাখ্যা করিতেছেন'—ইহাই শ্লোকটীর শেষার্দ্ধের অর্থ। সম্পাদক মহাশয় নিজেই শ্লোকটীর নিম্নে "ইতি অনুমানখণ্ডে গাদাধরীপ্রারম্ভ" এইরূপ লিখিয়া স্বীয় ভূয়োদর্শিতা খ্যাপন করিয়াছেন। কিন্তু অনুমানখণ্ডের গাদাধরী যে শিরোমণির বাক্য-অবলম্বনে রচিত নহে, উহা যে শিরোমণি-কৃত দীধিতি গ্রন্থের আদ্যন্তের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা, ইহা কি ঘোষ মহাশয় গুরুশুশ্রূষা করিয়াও অবগত হন নাই?

ঘোষ মহাশয়, গঙ্গেশ উপাধ্যায় প্রভৃতির গবেষণাপূর্ণ জীবনচরিত লেখার পর তাঁহার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ মহোদয়ের জীবনচরিত লিখিয়াছেন। এই চরিতের এক স্থানে লিখিত আছে,—

"তর্কতীর্থ মহাশয় কোটালিপাড়া নিবাসী মহামহোপাধ্যায় রামনাথ সিদ্ধান্তরত্নের নিকট অধ্যয়নার্থ আগমন করেন।"—(৫৩ পৃঃ)

কোটালিপাড়া-নিবাসী এই মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতের উপাধি 'সিদ্ধান্তরত্ন' নহে,—'সিদ্ধান্ত-পঞ্চানন'। যিনি এই সেদিনকার পণ্ডিত রামনাথ সিদ্ধান্ত পঞ্চানন মহাশয়ের কথা বলিতে গিয়া ভুল করিয়া বসেন, তাঁহার পক্ষে অতি প্রাচীন গঙ্গেশোপাধ্যায় প্রভৃতি পণ্ডিতগণের চরিত-রচনার চেষ্টা কত দূর সাহসিকতার পরিচায়ক, তাহা পাঠকগণই অনুমান করিবেন।

ঘোষ মহাশয় 'নব্যন্যায়ের ইতিহাস' লিখিতে গিয়া বলিয়াছেন,—"দেশীয় প্রবাদ অনুসারে বাৎস্যায়নই চাণক্য।"

চাণক্য ও বাৎস্যায়ন যে অভিন্ন ব্যক্তি, এ পক্ষে কেবল দেশীয় প্রবাদই প্রমাণ নহে—চাণক্য-রচিত "অর্থশাস্ত্রে" এ সম্বন্ধে বলবৎ প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের 'আন্বীক্ষিকী-স্থাপনা' নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষে লিখিত হইয়াছে,—

"প্রদীপঃ সর্ব্ববিদ্যানামুপায়ঃ সর্ব্বকর্ম্মণাম্।
আশ্রয়ঃ সর্ব্বধর্ম্মাণাং শশ্বদান্বীক্ষিকী মতা॥
সেয়মান্বীক্ষিকী প্রমাণাদিভিঃ পদার্থৈর্বিভজ্যমানা—

প্রদীপঃ সর্ব্ববিদ্যানামুপায়ঃ সর্ব্বকর্ম্মণাম্।
আশ্রয়ঃ সর্ব্বধর্ম্মাণাং বিদ্যোদ্দেশে প্রকীর্ত্তিতা ॥"

—এই ভাবে শেষ চরণের পরিবর্ত্তন করিয়া, বাৎস্যায়ন, স্ব-কৃত স্থায়-ভাষ্যের প্রথমাংশে এই শ্লোকটী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহাতে স্পষ্টই মনে হয় যে, ভাষ্য-কার ও অর্থশাস্ত্র-কার একই ব্যক্তি। কারণ, শ্লোকটীর চতুর্থ চরণ—"বিদ্যোদ্দেশে প্রকীর্ত্তিতা"—এই ভাবে পরিবর্ত্তিত হওয়ায়, —ভাষ্য-কারের এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত হইতেছে যে, আমিই "অর্থশাস্ত্রে"র "বিদ্যাসমুদ্দেশ" পরিচ্ছেদে এই আন্বীক্ষিকীর প্রাধান্য কীর্ত্তন করিয়াছি। বাৎস্যায়ন যদি অন্য ব্যক্তি হইতেন, তাহা হইলে কখনও "অর্থশাস্ত্র'স্থ শ্লোকের চরণ পরিবর্ত্তন করিতে পারিতেন না।

ঘোষ মহাশয়, 'নব্যন্যায়ের লক্ষণ" প্রকরণে লিখিয়াছেন,—

"কণাদ ষট্পদার্থবাদী * * * যদি বলা হয়, অধিকরণ-সিদ্ধান্তবলে কণাদেরও সপ্তপদার্থ স্বীকৃত—বলিব। তাহা হইলে বলিব—অভাবটী প্রাচীনমতে অধিকরণস্বরূপ"—(৬০ পৃঃ)

কণাদ যে ষট্পদার্থবাদী নহেন, সপ্তপদার্থই তাঁহার অঙ্গীকৃত, ইহা—

"ক্রিয়াগুণব্যপদেশাভাবাৎ প্রাগসৎ।"—৯।১।১
"সদসৎ।"—৯।১।৩
"যচ্চান্যদসদতস্তদসৎ।"—৯।১।৫

এই চারিটী সংস্কৃত সূত্রের আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। এই সূত্র কয়েকটীতে যথাক্রমে প্রাগভাব, ধ্বংস, অন্যোন্যাভাব ও অত্যন্তাভাবের কথা বলা হইয়াছে। আর এই অভাব কণাদের মতে অধিকরণস্বরূপ, ইহা কোনও ক্রমেই বলিতে পারা যায় না। কারণ, কণাদের মতে, আত্যন্তিক দুঃখ-ধ্বংসের নাম মুক্তি, এবং মুক্তির প্রতি সপ্তপদার্থের তত্ত্বজ্ঞান কারণ। (১)

এখন অভাব যদি অধিকরণস্বরূপ হয়, তাহা হইলে, দুঃখধ্বংসরূপ মুক্তি, তত্ত্বজ্ঞানের কার্য্য হইতে পারে না। কেন না, দুঃখধ্বংস অভাব পদার্থ, সে যদি তাহার অধিকরণ আত্মার স্বরূপ হয়, তবে মুক্তিও নিত্যপদার্থে পরিণত হইল, তাহার আর কোনও কারণ থাকিতে পারে না। আত্মা নিত্য বলিয়া তাহার যেমন কোনও কারণ নাই, তেমনই, মুক্তিও যদি আত্মার স্বরূপ হয়, তবে তত্ত্বজ্ঞান তাহার প্রতি কারণ হইবে কিরূপে? সুতরাং মহর্ষি কণাদ যে দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়ের ন্যায় অভাবকেও পদার্থান্তর বলিয়া স্বীকার করিতেন, সুতরাং তিনি সপ্তপদার্থবাদী, ইহা আর অপ্রতিপন্ন হয় না। এই জন্যই কণাদ-সূত্রের ভাষ্যের ব্যাখ্যাগ্রন্থ শ্রীধরাচার্য্যকৃত "ন্যায়কন্দলী"তে ও উদয়নাচার্য্য-কৃত "দ্রব্যকিরণাবলী"তে অভাব যে কণাদের সম্মত পদার্থান্তর, ইহা উদ্‌ঘোষিত হইয়াছে। (২) সুপ্রসিদ্ধ অভিধান "অমরকোষে"র মহেশ্বর-কৃত "অমরবিবেক" টীকাতেও দ্রব্যাদি অভাবান্ত সপ্তপদার্থ কণাদের সম্মত বলিয়া কথিত হইয়াছে।

---

(১) "আত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তিরসহ্যসংবেদননিখিলদুঃখোপরমরূপত্বাদপরাবৃত্তেশ্চ নিশ্চিতং শ্রেয়ঃ তস্য কারণং দ্রব্যাদিস্বরূপজ্ঞানম্।"—ন্যায়কন্দলী, ৬ পৃষ্ঠা।

(২) "অভাবস্তু পৃথগনুপদেশো ভাবপারতন্ত্র্যাৎ ন ত্বভাবাৎ।"—ন্যায়কন্দলী; ৭ পৃষ্ঠা।

(৩) শঙ্করমিশ্র, স্বকৃত "বাদিবিনোদ" গ্রন্থের এক স্থানে, কোন্ কোন্ দার্শনিকের মতে কি কি পদার্থ, তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। এই গ্রন্থসন্দর্ভে দ্রব্য, গুণাদি সপ্তপদার্থই যে কণাদ মহর্ষির সম্মত, তাহা অতি স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ আছে। (৪) কাজেই কণাদ ষট্পদার্থবাদী ছিলেন, এবং প্রাচীন বৈশেষিক মতে, অভাব অধিকরণের স্বরূপ—এইরূপ সিদ্ধান্ত করা একান্ত অসমীচীন। প্রাভাকর-মতে, অভাব পদার্থান্তর নহে,—অধিকরণের স্বরূপ; এই জন্য "নত্বভাবানামধিকরণাত্মকত্বং লাঘবাৎ"—ইত্যাদি "সিদ্ধান্তমুক্তাবলী"র গ্রন্থোত্থিতির ভূমিকারূপে তাহার ব্যাখ্যা 'দিনকরী'তে উক্ত হইয়াছে,—

"নন্বভাবস্ত দ্বিধেত্যাদি বিভাগোঽনুপপন্নোঽভাব এব মনোভাবাদিত্যভিপ্রায়েণ প্রাভাকরঃ শঙ্কতে।"

এইরূপ অনুশীলন করিয়া দেখিলে বলিতে হয় যে, সম্পাদক ঘোষ মহাশয়, এ স্থলে 'উদোর বোঝা বুধোর ঘাড়ে' চাপাইয়াছেন।

"নব্যন্যায়ের প্রতিপাদ্য" অধ্যায়ে ঘোষ মহাশয় ঘোষণা করিয়াছেন,—"এই মোক্ষলাভের উপায় সম্বন্ধে বেদে কথিত হইয়াছে যে, পরমাত্মার জ্ঞানলাভ করিতে পারিলে মোক্ষ হয়, এবং এই পরমাত্মার জ্ঞানলাভ করিতে হইলে তদ্বিষয়ক শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন আবশ্যক।"—(৬২ পৃঃ)

ঘোষ মহাশয়, এখানে নব্যন্যায়ের প্রতিপাদ্য মোক্ষের কারণ-নিরূপণের প্রমাণ-রূপে "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ"—(৪।৫।৬) এই বৃহদারণ্য উপনিষদের ভাবার্থ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু নব্যনৈয়ায়িকদিগের মতে, পরমাত্মার জ্ঞান মোক্ষের হেতু নহে,—জীবাত্মার জ্ঞানই মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ। তাঁহারা বলেন, "ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতি প্রিয়ো ভবতি"—এই উপক্রম করিয়া ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্য, তাঁহার মুমুক্ষু পত্নী মৈত্রেয়ীকে উপদেশ করিয়াছেন যে, আত্মার শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন, মোক্ষের হেতু। আত্মার সুখের জন্যই পতি, পত্নীর প্রেমাস্পদ হয়,—এই উপক্রমের পর আত্মার শ্রবণাদি জ্ঞান মোক্ষের হেতু, ইহা বলায়, এই আত্মপদের অর্থ এখানে জীবাত্মা,—পরমাত্মা নহে। কারণ, পরমাত্মার সুখ নাই। কাম শব্দের অর্থ এখানে সুখ। কাজে কাজেই জীবাত্মার উপক্রমে কথিত "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ"—এই শ্রুতির দ্বারা জীবাত্মার শ্রবণাদি যে মোক্ষের হেতু,

---

"এতেন পদার্থা এব প্রধানতয়োদ্দিষ্টা বেদিতব্যাঃ। অভাবস্ত স্বরূপবানপি পৃথক্ নোদ্দিষ্টঃ প্রতিযোগিনিরূপণাধীননিরূপণত্বাৎ। ন তু তুচ্ছত্বাৎ। উৎপত্তিবিনাশচিন্তায়াং প্রাগভাব-প্রধ্বংসাভাবয়োর্বৈধর্ম্ম্যে চেতরেতরাত্যন্তাভাবয়োস্তত্র তত্র দর্শয়িষ্যমাণত্বাৎ ইতি।"—

দ্রব্যকিরণাবলী, কাশী-মুদ্রিত পুস্তকের ৬ পৃঃ।

(৩) "তে চ পদার্থা দ্রব্যগুণকর্ম্মসামান্যবিশেষসমবায়া ভাবাঃ সপ্তেতি কণাদমতম্।"—১৬৭ পৃষ্ঠা।

(৪) "কাণাদ-গৌতমীয়াশ্চ সপ্তপদার্থান্ মন্যন্তে। তে চ দ্রব্যগুণকর্ম্মসামান্যবিশেষ-সমবায়া ভাবাঃ।"

ইহা পরিস্ফুটভাবে প্রতীত হইতেছে। বিশ্ববিশ্রুত নব্য নৈয়ায়িক গদাধর ভট্টাচার্য্য স্ব-কৃত "মুক্তিবাদে"র শেষাংশে স্পষ্টই লিখিয়াছেন,—

"দীধিতিকৃৎপ্রভৃতয়স্তু ন বারে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতীত্যাদিনাত্মনঃ সুখাদ্যর্থং তৎসম্পাদকতয়া পতিপুত্রাদেরনুরাগবিষয়ত্বরূপং প্রিয়ত্ব-মুক্তং তত্রাত্মপদং স্বাত্মপরমেব ন ত্বীশ্বরপরং তস্য সুখাভাবাৎ। * * * এবঞ্চ স্বাত্মন এবোপক্রান্ত-তয়া আত্মা বারে শ্রোতব্য ইত্যাদিশ্রুত্যা স্বাত্মনঃ শ্রবণাদেরেব মোক্ষহেতুতা প্রত্যায্যতে ন তু পরমাত্মনঃ।"

তার্কিক-শিরোমণি 'দীধিতি'-কার রঘুনাথপ্রমুখ নব্য নৈয়ায়িকদিগের মতে, জীবাত্মার জ্ঞানই যে মোক্ষের সাক্ষাৎ হেতু, ইহা স্পষ্টই জানা যাইতেছে।' সুতরাং পরমাত্মার জ্ঞান মোক্ষের হেতু, ইহা নব্যন্যায়ের প্রতিপাদ্য নহে। ঘোষ মহাশয় এ বিষয়ে একটু সাবধানতা অবলম্বন করিলেই ভাল করিতেন

ঘোষ মহাশয় ভূমিকায় এক স্থানে (৬৪ পৃঃ) "তদ্বচনাদাম্নায়স্য প্রামাণ্যম্" (১।১।৩)— এই বৈশেষিক সূত্রের অনুবাদে লিখিয়াছেন,—"বেদ ধর্ম্ম-প্রতিপাদক, এই কারণেই তাহার প্রামাণ্য।"

"প্রশস্তপাদ-ভাষ্যে"র ব্যাখ্যাবসরে শ্রীধরাচার্য্য "তদ্বচনাদাম্নায়স্য প্রামাণ্যম্"—এই সূত্রের অর্থ করিয়াছেন যে, এখানে 'তৎ' শব্দে আমাদিগের অপেক্ষা কোনও বিশিষ্ট পুরুষ উদ্দিষ্ট হইয়া-ছেন; সেই বিশিষ্ট পুরুষের প্রণীত বলিয়াই আম্নায় অর্থাৎ বেদ প্রমাণ। ঈশ্বরের উচ্চারিত বলিয়াই যে বেদের প্রামাণ্য, ইহা ন্যায়-বৈশেষিক শাস্ত্রের বহু গ্রন্থে পুনঃ পুনঃ উদ্‌ঘোষিত হইয়াছে। ন্যায়শাস্ত্রের প্রথম গ্রন্থ "সিদ্ধান্তমুক্তাবলী"র প্রথমাংশের ব্যাখ্যায় মহাদেবভট্টও একাধিকার বলিয়াছেন,—

"শ্রুতীনামীশ্বরোচ্চরিতত্বেন প্রামাণ্যাদীশ্বরসন্দেহে শ্রুতিপ্রামাণ্যস্যাপি সন্দিগ্ধত্বাৎ।"

"উক্তানুমানেন ঈশ্বরসিদ্ধৌ তদুচ্চরিতত্বেন বেদস্য প্রামাণ্যনিশ্চয়াৎ।"

বৈশেষিক সূত্রের "উপস্কার" নামক টীকায় শঙ্কর মিশ্রও উদ্ধৃত সূত্রের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, —উপক্রান্ত না হইলেও এখানে 'তৎ' শব্দে প্রসিদ্ধি-সিদ্ধ ঈশ্বর বুঝিতে হইবে। সুতরাং 'তদ্-বচনাৎ'—ঈশ্বর প্রণয়ন করিয়াছেন বলিয়া বেদের প্রামাণ্য। স্বর্গীয় জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয়, "বিবৃতি" নামক বৈশেষিক সূত্রের যে অতি উত্তম টীকা রচনা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি আর একটু অধিক বলিয়াছেন যে, এখানে ঈশ্বর-বাচক 'তৎ' শব্দই প্রযুক্ত হইয়াছে। কেন না, ভগবদ্‌গীতায়—"ওঁ তৎসদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ—এই বাক্যে 'তৎ' ব্রহ্মের একটী নাম, ইহা উক্ত হইয়াছে। সর্ব্বজ্ঞপ্রায়, মহাতার্কিক উদয়নাচার্য্য, স্বকৃত "আত্মতত্ত্ববিবেক" (বৌদ্ধাধিকার) গ্রন্থের শেষে নানা বিচার-বিতর্কের পর, পরমেশ্বরের প্রণীত বলিয়াই নিখিল বেদের প্রামাণ্য অবধারণ করিয়াছেন। (৪)

---

(৪) "তস্মাদ্ বিরুদ্ধাগমব্যুদাসেন বেদা এবার্ব্বাচীনপুরুষপূর্ব্বকত্বশঙ্কাব্যুদাসেন পরমেশ্বরপ্রণীত-ত্বাদেব ভূতার্থভাগস্যাপ্রামাণ্যশঙ্কাব্যুদাসেন প্রমাণমেবেতি নিয়মঃ।"—

আত্মতত্ত্ববিবেক; ৯৪ পৃঃ (৺জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননের সংস্করণ।)

কাজেই ঈশ্বরের উচ্চারিত বলিয়াই যে বেদ প্রমাণ, ইহা তার্কিক সম্প্রদায়ের অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত। যদিও শঙ্কর মিশ্র 'যদ্বা"—বলিয়া 'তৎ' শব্দে পূর্ব্বোপক্রান্ত ধর্ম্মের পরামর্শ করিয়া ব্যাখ্যান্তর প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং সেই ব্যাখ্যানুসারে ধর্ম্মের প্রতিপাদন হেতু বেদের প্রামাণ্য—এইরূপ অর্থ প্রতীত হইলে, 'বা'কারের প্রয়োগ নিবন্ধন এ অর্থে শঙ্কর মিশ্রেরও অনাস্থা সূচিত হইতেছে। ধর্ম্মের প্রতিপাদন হেতু বেদের প্রামাণ্য, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলে, 'ইতরেতরাশ্রয়' দোষও হয়। কারণ, বেদে উক্ত হইয়াছে বলিয়াই যাগ যজ্ঞাদি ধর্ম্মকার্য্য প্রামাণিক; সুতরাং ধর্ম্মকার্য্যের প্রামাণিকতা—বেদে বিহিত বলিয়াই সিদ্ধ হইতেছে। এখন আবার যদি বেদে ধর্ম্মের প্রতিপাদন আছে বলিয়া তাহার প্রামাণ্য, ইহা বলা যায়, তাহা হইলে, বেদ ও ধর্ম্ম পরস্পরের মুখাপেক্ষা করে বলিয়া, বেদের প্রামাণ্য এবং ধর্ম্মের প্রামাণিকত্ব—উভয় অসিদ্ধ হইয়া পড়ে। অন্য উপায়ে বেদের প্রামাণ্য সিদ্ধি করিয়া, সেই বেদরূপ প্রমাণ-গম্য বলিয়া, ধর্ম্মের প্রামাণিকত্ব প্রতিপাদন করিতে হইবে। যদি বলা যায়, "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ"—ইত্যাদি সর্ব্বসাধারণের স্বীকৃত ধর্ম্মের কথা বেদে উক্ত বলিয়া তাহার প্রামাণ্য সিদ্ধ হইবে; তাহা হইলে, বৌদ্ধ জৈনাদি নাস্তিকের গ্রন্থকেও আমাদের প্রমাণ বলিয়া ধরিয়া লইতে হয়। কারণ, সে সকল নাস্তিক-গ্রন্থেও অনেক সাধারণ ধর্ম্মের কথা বিঘোষিত হইয়াছে। এই জন্য 'বেদ ধর্ম্ম-প্রতিপাদক, সুতরাং প্রমাণ', এইরূপ সূত্রার্থে শঙ্কর মিশ্রের নিজেরও নির্ভর নাই; তাই "যদ্বা"—বলিয়া ঐরূপ ব্যাখ্যা-কৌশলমাত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। যথার্থবক্তা ঈশ্বরের উচ্চারিত বলিয়াই যে "স্বর্গকামো যজেত" ইত্যাদি বেদবাক্যের প্রামাণ্য, ইহা মহর্ষি কণাদ, ষষ্ঠাধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে "বুদ্ধিপূর্ব্বা বাক্যকৃতির্বেদে" ইত্যাদি সূত্রে স্পষ্টই প্রকাশ করিয়াছেন। কাজে কাজেই 'তদ্বচনাদাম্নায়স্য প্রামাণ্যম্'—এই সূত্রের প্রকৃত ব্যাখ্যার পরিবর্ত্তে, বেদ ধর্ম্মপ্রতিপাদক,—এই কারণেই তাহার প্রামাণ্য",—এইরূপ অনুবাদ সম্প্রদায়বিরুদ্ধ।

সম্পাদক ঘোষ মহাশয় ইহার পর জগদীশ-কৃত "তর্কামৃত" নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থের আংশিক বঙ্গানুবাদ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। "তর্কামৃতে"র এই ভাষান্তরে আমরা অনুবাদকের নৈপুণ্যের পরিচয় পাইলাম না। অনুবাদের অনেক স্থলই অসঙ্গত বলিয়া মনে হইল। নিম্নে এইরূপ কতিপয় স্থান উদ্ধৃত করিলাম।—

মূল "তর্কামৃতে" আছে,—"এতৎ কারণত্রয়ং ভাবকার্য্যমাত্রস্য।" ইহার অনুবাদ করিয়া, গ্রন্থকারের ন্যূনতা-পরিহারের উদ্দেশে (?) অনুবাদক মহাশয়, পশ্চাল্লিখিত অংশ বন্ধনীমধ্যে নিবিষ্ট করিয়াছেন।—

"জ্ঞান, ইচ্ছা, কৃতি ও দ্বেষাদির অসমবায়ি কারণ নাই।" (ভূমিকা, ৬৭ পৃঃ)।

এইরূপ অত্যন্ত অশুদ্ধ কথা লিখিয়া বিদ্যাপ্রকাশ করিবার ব্যর্থ চেষ্টা, সত্যই হাস্যাস্পদ। বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা প্রভৃতি আত্মবিশেষগুণের অসমবায়ী কারণ. আত্মমনঃসংযোগ। "প্রশস্তপাদ-ভাষ্যে"র ব্যাখ্যায় শ্রীধরাচার্য্য লিখিয়াছেন,—

"সুখাদীনাং সমবায়িকারণমাত্মা তত্র সমবায়াদাত্মমনঃসংযোগস্তেষাং সমবায়িকারণম্।"—(১০১ পৃঃ)।

শঙ্কর মিশ্রও "আত্মেন্দ্রিয়মনোঽর্থসন্নিকর্ষাৎ সুখদুঃখে।"—(৫।২।১৫)—এই সূত্রে "উপস্কার" নামক টীকায় বলিয়াছেন,—

"যদ্যপি মনঃ সন্নিকর্ষাধীনঃ সর্ব্বোপ্যাত্মবিশেষগুণস্তথাপি সুখদুঃখে তীব্রসংযোগিত্বয়া ইতি স্ফুটত্বাদুক্তম্।"

তার্কিকচূড়ামণি, স্বর্গীয় জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয় উদ্ধৃত বৈশেষিক সূত্রের 'বিবৃতি' নামক ব্যাখ্যাগ্রন্থে অতি স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন যে,—

"সুখদুঃখে ইত্যুপলক্ষণম্ আত্মবিশেষগুণসামান্যস্য বিবক্ষিতং সর্ব্বত্রাত্মমনঃসংযোগস্যাসমবায়িকারণত্বাদিতি।"

"ত্বচো যোগো মনসা জ্ঞানকারণম্।" এই কারিকাংশের "সিদ্ধান্তমুক্তাবলী"র ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে 'দিনকরী' টীকাতেও উক্ত হইয়াছে,—

"আত্মমনঃসংযোগরূপাসমবায়িকারণনাশাৎ—"

জ্ঞান, ইচ্ছাদির যে সমবায়ী কারণ আত্মা, এ সম্বন্ধে আর অধিক প্রমাণবাক্য উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন মনে করি। তর্কশাস্ত্রের এই সাধারণ কথা যিনি জানেন না, নব্যন্যায়ের অনুবাদে হস্তার্পণ করা সত্য সত্যই তাঁহার পক্ষে দুঃসাহসের কার্য্য। এই অনুবাদের সহিত এক জন প্রাচীন পণ্ডিতের সংস্রব আছে, ইহাতে আমরা আরও বিস্মিত হইতেছি। "জ্ঞান, ইচ্ছা, কৃতি ও দ্বেষাদির অসমবায়ি কারণ নাই।"—এই সকল অদ্ভুত কথা, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষের নিজস্ব নয়,—তাঁহার অধ্যাপক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ মহোদয়ের উপদিষ্ট। কারণ, তাঁহার বাণীই যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

"তত্রাসন্নং জনকং দ্বিতীয়ঃ—" অসমবায়ী কারণের এই লক্ষণানুসারে জ্ঞানাদি ইচ্ছাদির অসমবায়ী কারণ হইয়া পড়ে, এই জন্য অসমবায়ী কারণের লক্ষণে জ্ঞানাদি আত্ম-বিশেষগুণের ভেদ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। জ্ঞান, ইচ্ছা প্রভৃতি আত্মার বিশেষগুণগুলি, নিমিত্ত কারণই হয়,—অসমবায়ী কারণ হয় না। তাই "ভাষাপরিচ্ছেদ"-কার বিশ্বনাথ লিখিয়াছেন,—"অথ বৈশেষিকে গুণে আত্মনঃ স্যান্নিমিত্তত্বং—" সুতরাং জ্ঞান, ইচ্ছা, কৃতি প্রভৃতি গুণগুলি, কাহারও অসমবায়ী কারণ হয় না। কিন্তু ইহাদের অসমবায়ী কারণ নাই—এ অভিনব অভিজ্ঞান, ঘোষ মহাশয় কাহার নিকট হইতে অর্জ্জন করিলেন, জানি না।

"ত্রসরেণুগুলিতে সাবয়বদ্রব্যগঠিতত্ব আছে" (৬৭ পৃঃ)

সংস্কৃত 'ঘটিত' শব্দের অপভ্রংশে বাঙ্গালায় 'গঠিত' ব্যবহার হইয়া থাকে। সুতরাং বাঙ্গালা 'গঠিত' শব্দের উত্তর সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয় 'ত্ব' বসাইলে কোন্ দেশী ভাষা হয়, বুঝ না।

"যদি বল, আকাশই কেন এই সম্বন্ধ-ঘটক হউক না? তাহা হইলে বলিতে হইবে, তাহার শব্দাশ্রয়ত্ব দ্বারাই ধর্ম্মগ্রাহক প্রমাণ সিদ্ধ হয় বলিয়া রবিক্রিয়াদি উপনায়কত্বের সম্ভাবনা নাই। (৬৮ পৃঃ)

মূলের অপেক্ষাও এ অনুবাদ দুর্ব্বোধ হইয়াছে।

"আকাশ, কাল, দিক, আত্মা ও পরমাণুগুল অবৃত্ত পদার্থ; অর্থাৎ, ইহারা কোথায়ও থাকে না। সমবায়কেও অবৃত্তি পদার্থ বলা হয়।" (৬৯ পৃঃ)

সমবায়কেত অবৃত্তি পদার্থ বলা হয় না। প্রশস্তপাদভাষ্যের "ন্যায়কন্দলী" টীকায় শ্রীধরাচার্য্য বলিয়াছেন,—স্বাত্মক স্বরূপ সম্বন্ধে দ্রব্যাদিতে সমবায় থাকে। (৬) পরমব্যুৎপন্ন

(৬) "সমবায়স্য বৃত্ত্যন্তরং নাস্তি। তস্মাদস্য স্বাত্মনা স্বরূপেণৈব বৃত্তির্ন বৃত্ত্যন্তরেণেত্যর্থঃ। —ন্যায়কন্দলী, ৩৩০ পৃঃ।

নৈয়ায়িক স্বর্গীয় জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয়ও স্বকৃত বৈশেষিক সূত্রের 'বিবৃতি' নামক টীকার শেষে শাস্ত্রার্থসংগ্রহে স্পষ্টতঃ লিখিয়াছেন,—

"সমবায়শ্চ বিশেষণতাসম্বন্ধেন দ্রব্যাদিপঞ্চকে তিষ্ঠতি।" "স্বরূপ সম্বন্ধে সমবায়, দ্রব্যাদি পঞ্চ পদার্থে থাকে।" সুতরাং জগদীশের "তর্কামৃতে" সমবায়কে অবৃত্তি বলা হইল কেমন করিয়া? এ গ্রন্থের মর্ম্ম কি, আমরা অনুবাদককে জিজ্ঞাসা করিতেছি।

"যাহা নিত্য দ্রব্যে থাকে এবং অন্ত্য, তাহাই বিশেষ।"—(৭৩ পৃঃ)

ইহা কোন্ দেশী অনুবাদ? 'অন্ত্য' শব্দের অর্থ কি?

ঘোষ মহাশয়, "তর্কামৃতে"র অবশিষ্টাংশের অনুবাদে বিরত হইয়া, ইহার পর অন্যান্য বিষয়ের অবতারণা করিয়া, "ব্যাপ্তিলক্ষণ সম্বন্ধে মতভেদ" প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন,—

"প্রশস্তপাদ-ভাষ্যে ব্যাপ্তিলক্ষণ নাই। ন্যায়কন্দলীতেও তাহাই।" (৯৩ পৃঃ)

মূলগ্রন্থ না দেখিয়া অসঙ্কোচে এইরূপ মত প্রকাশ করিলে পণ্ডিতসমাজে হাস্যাস্পদ হইতে হয়। প্রশস্তপাদ ও শ্রীধরের মতে 'অবিনাভাব' অর্থাৎ অব্যভিচরিতত্বই ব্যাপ্তির লক্ষণ। (৭) নীতিশাস্ত্রে আছে,—"শতং বদ মা লিখ"। সম্পাদক মহাশয়, লিখিতভাবে এইরূপ আরোপিত মতবাদের প্রচার না করিলেই ভাল করিতেন। তার পর তিনি "সোন্দড় মতে শিরোমণিকৃত ব্যাপ্তিলক্ষণ যথা—" বলিয়া "ব্যধিকরণধর্ম্মাবচ্ছিন্নাভাব" গ্রন্থের ১৪টা লক্ষণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহাও এক মস্ত ভুল। "ব্যধিকরণে"র প্রথম দুইটি লক্ষণমাত্র শিরোমণি-কৃত, অবশিষ্ট ১২টী লক্ষণই চক্রবর্ত্তী, প্রগল্‌ভ প্রমুখ প্রাচীন তার্কিকগণের উদ্ভাবিত। ইহার মধ্যে সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পক্ষধর মিশ্র ও বাসুদেব সার্ব্বভৌমের নির্ম্মিত ব্যাপ্তির লক্ষণও উল্লিখিত আছে। সুতরাং ১৪টি লক্ষণই শিরোমণি-কৃত কেমন করিয়া হইল, বুঝিলাম না।

ইহার পর সম্পাদক মহাশয় "ব্যাপ্তি-পঞ্চক-পাঠার্থীর জ্ঞাতব্য" বিষয়ের মধ্যে লিখিয়াছেন—

"ফলতঃ এই সকল ব্যাপ্তিলক্ষণের মধ্যে এই ব্যাপ্তি-পঞ্চকোক্ত ব্যাপ্তি-লক্ষণ কয়টি যে, কেবল একটি দোষ ভিন্ন নির্দ্দোষ, তাহা পাঠকবর্গ, গ্রন্থমধ্যেই দেখিতে পাইবেন।" (৯৫)

এখানে 'একটী দোষ' শব্দে, 'ইদং বাচ্যং জ্ঞেয়ত্বাৎ' ইত্যাদি কেবলান্বয়ী স্থলে লক্ষণসংলগ্ন হয় না—এই দোষকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। কিন্তু ব্যাপ্তিপঞ্চকের লক্ষণগুলি কেবল যে এই একটী দোষেই দুষ্ট নহে,—অন্যান্য স্থলেও যে তাহার দোষ আছে, তাহা আমরা গ্রন্থমধ্যেই দেখিতে পাইতেছি। মথুরানাথ স্বয়ং গ্রন্থশেষে কেবলান্বয়ী স্থলে পাঁচটী লক্ষণের অব্যাপ্তি দোষ দেখাইবার পরে বলিতেছেন,—

"এতচ্চ উপলক্ষণম্। দ্বিতীয়ে কপিসংযোগোতদ্বৃক্ষত্বাদিত্যাদাবব্যাপ্তিঃ। * * * তৃতীয়ে * * বহ্নিমান্ ধূমাদিত্যাদাব্যাপ্তিরিত্যপি দ্রষ্টব্যম্।"

(৭) "অবিনাভাবস্মরণং অনুমেয়প্রতীতৌ অনুমানাঙ্গম্ ইতি দর্শয়তি বিধিস্ত্বিতি।"—ন্যায়কন্দলী, ২০৫ পৃঃ)।

"বিধিস্তু যত্র ধূমস্তত্রাগ্নিরগ্ন্যভাবে ধূমোঽপি ন ভবতীতি। এবং প্রসিদ্ধসময়স্যাসন্দিগ্ধধূমদর্শনাৎ সাহচর্য্যানুস্মরণাৎ তদনন্তরমগ্ন্যধ্যবসায়ো ভবতীতি।"—প্রশস্তপাদভাষ্য, ২০৫ পৃঃ।

"অপি ভোঃ কোঽয়মবিনাভাবো নাম অব্যভিচারঃ।"—ন্যায়কন্দলী, ২০৬ পৃঃ।

অর্থাৎ, কেবলান্বয়ী স্থলে যে দোষ দেখান হইল, তাহা উপলক্ষণমাত্র ; দ্বিতীয় লক্ষণে 'কপি-সংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাৎ' এই স্থলে, এবং তৃতীয় লক্ষণে 'বহ্নিমান্ ধূমাৎ' ইত্যাদি স্থলেও, অব্যাপ্তি দোষ হয়, দেখিয়া লইও। আলোচ্য গ্রন্থেও উদ্ধৃত মাথুরী টীকাংশের ব্যাখ্যায় লিখিত হইয়াছে,—

"অবশ্য, এই যে কেবলান্বয়ি-সাধ্যক-অনুমিতি-স্থলের অব্যাপ্তির কথা বলা হইল, তাহা উপ-লক্ষণমাত্র ; অর্থাৎ, এ দোষ ভিন্ন অন্য দোষও হয়, ইত্যাদি।"

সুতরাং ব্যাপ্তিপঞ্চকোক্ত ব্যাপ্তি-লক্ষণ কয়টী কেবল একটী দোষ ভিন্ন নির্দ্দোষ হইল কিরূপে ?

"সম্বন্ধ-সংক্রান্ত কতিপয় কথা" বলিতে গিয়া সম্পাদক মহাশয় বলিয়াছেন,—

"দিক্-কৃত বিশেষণতা অর্থাৎ দৈশিক সম্বন্ধ। ঐ সম্বন্ধে সকল পদার্থই দিকের উপর থাকে। কেহ কেহ আবার মূর্ত্তমাত্রেরই দিক্ উপাধি স্বীকার করেন। সুতরাং সেই মতে যাবৎ পদার্থই মূর্ত্তের উপর এবং দিকের উপর থাকে।"

মূর্ত্তমাত্রেরই দিগুপাধিত্ব স্বীকার করা হয় না ; অন্য মূর্ত্তই দিগুপাধি হইয়া থাকে। "ব্যধিকরণ" ও "সিদ্ধান্তলক্ষণ" প্রভৃতি গ্রন্থে জগদীশ ইহা স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন। (৮)

"কারণতা ও কার্য্যতা, যাহা কারণ ও কার্য্য, তাহার স্বরূপ হয়, সুতরাং পরমাণু-পরিমাণ-ভিন্ন সপ্ত পদার্থই হয়।" (১১৫ পৃঃ)

কারণতা ও কার্য্যতা সম্বন্ধ যদি কারণ ও কার্য্যের স্বরূপ হয়, তাহা হইলে, কারণতা ও কার্য্যতা পরমাণু-পরিমাণ-ভিন্ন সপ্ত পদার্থেরই স্বরূপ কেমন করিয়া হয়, বুঝিলাম না। "পারিমাণ্ডল্য-ভিন্নানাং কারণত্বমুদাহৃতম্"—এখানে 'পারিমাণ্ডল্য' উপলক্ষণ, বিশেষ, অতীন্দ্রিয় জাতি ও অতীন্দ্রিয় অভাব প্রভৃতিও কারণ হয় না। তা'র পর, 'পারিমাণ্ডল্য' শব্দের এখানে কেবল পরমাণু-পরিমাণই অর্থ নহে। 'মুক্তাবলী'কার লিখিয়াছেন,—"পারিমাণ্ডল্যং—অণুপরিমাণম্।" সুতরাং দ্ব্যণুকের পরিমাণও কারণ হয় না। কাজেই কারণতা যদি কারণের স্বরূপ হয়, তাহা হইলে, দ্ব্যণুক, বিশেষ, অতীন্দ্রিয় জাতি প্রভৃতিও 'কারণতা' হইতে পারে না। কার্য্যতা কার্য্যের স্বরূপ হইলে, গগনাদি নিত্য পদার্থমাত্রই ত কার্য্যতা সম্বন্ধ হইতে পারে না। সুতরাং পরমাণুপরিমাণ-ভিন্ন সপ্ত পদার্থই 'কার্য্যতা' কেমন করিয়া হয় ?

"অভাব-সংক্রান্ত কতিপয় কথা"য় সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"ত্রিবিধ অভাবই তাহাদের প্রতিযোগীর সংসর্গের আরোপ হইতে প্রতীতিগোচর হয়।" (১১৬ পৃঃ)

প্রাগভাব, ধ্বংস ও অত্যন্তাভাব—এই ত্রিবিধ সংসর্গাভাবের জ্ঞান যে সেই সেই অভাবের প্রতিযোগীর আরোপ হইতে উৎপন্ন হয় না, সুতরাং সংসর্গারোপজন্য প্রতীতিবিষয়ত্ব, সংসর্গাভাবের লক্ষণ হইতে পারে না—ইহা রঘুনাথ শিরোমণিই "সিদ্ধান্তলক্ষণে"র "দীধিতি"তে "লক্ষ্যতে চ

(৮) "নিত্যানামব্যাবর্ত্তকত্বাৎ জন্যানামেব মূর্ত্তানাং দিগুপাধিতয়া * * * অতএব প্রলয়ে দিগ্‌দেশবিভাগো নাস্তীত্যপি সিদ্ধান্তঃ সঙ্গচ্ছতে * *।"—ব্যধিকরণ, ১ম লক্ষণ। "কালোপাধিতা-বৎ দিগুপাধিত্বস্যাপি মনসি অসত্ত্বাৎ, অব্যাবর্ত্তকত্বাৎ * *।"—সিদ্ধান্তলক্ষণ, ২৯ পৃঃ (জীং সং)।

নিয়মাঘটিতমেব সংসর্গাভাবাদিলক্ষণম্”—এই স্থানে বলিয়াছেন। সুতরাং রঘুনাথ, জগদীশ প্রমুখ তার্কিকগণের লিপি অনুসারে, ‘ভেদভিন্নাভাবত্ব ই যে সংসর্গাভাবের নিষ্কৃষ্ট লক্ষণ, ইহা প্রতীত হইতেছে।

“ঘটধ্বংসও তদ্রূপ কপালে থাকে” (১২০ পৃঃ)।

ঘট-ধ্বংসের আশ্রয় কেবল কপালই (ঘটাবয়ব) হয় না ;—ঘটের ধ্বংস, স্বরূপ-সম্বন্ধে কালেও থাকে তাই “সিদ্ধান্তলক্ষণে” জগদীশ লিখিয়াছেন,

“প্রাচাং মতে ভূতলাদিদেশস্যেব কালস্যাপি দৈশিকবিশেষণতয়া ধ্বংসবত্ত্বাৎ, অতএব ত্বক্‌সংযুক্তকালে বিশেষণতয়া বায়ুস্পর্শনাশস্য গ্রহঃ শব্দানিত্যতায়াং মিশ্রৈরুক্তঃ।”—২৪ পৃঃ। (জীং সং)।

সুতরাং ‘কোন্ অভাব কোথায় থাকে’, ইহা নিরূপণ করিবার সময়ে এই সকল মতবাদের উল্লেখ করা কি উচিত ছিল না ?

সম্পাদক মহাশয়ের এই বিস্তৃত ভূমিকাতে এইরূপ বিবিধ অশুদ্ধিই প্রধানতঃ আসন পাইয়াছে। আমরা প্রত্যেক অশুদ্ধির উল্লেখ করিবার পরিশ্রম স্বীকার করিতে পারিলাম না।

এইবার আমরা মূল “ব্যাপ্তিপঞ্চকে”র অনুবাদ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব। কারণ, ইহার মধ্যেই প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে। বর্ণাশুদ্ধি ত প্রত্যেক পৃষ্ঠায় দুই তিনটী করিয়া আছে। তাহার উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন মনে করি।

“অনুমিতি-হেতু” পদের অর্থ—অনুমান যে প্রমাণ, তাহার যে অনুমিতি, তাহার হেতু, অর্থাৎ কারণ। (২৩ পৃঃ)

অনুমানে বর্ত্তমান যে প্রামাণ্য, সেই প্রামাণ্যের অনুমিতির হেতুই এখানে ‘অনুমিতি-হেতু’ পদের অর্থ মথুরানাথ স্পষ্টই লিখিয়াছেন,—

“অনুমিতিহেত্বিত্যস্যানুমাননিষ্ঠপ্রামাণ্যানুমিতিহেত্বিত্যর্থঃ।”

কেবল এই এক স্থানে নহে,—ইহার পরেও এই অশুদ্ধি সংক্রান্ত হইয়াছে ; যথা—

“অনুমান যে একটী প্রমাণ তাহার অনুমিতি” (২৬ পৃঃ)

প্রামাণ্যের অনুমিতিস্থলে অনুবাদক বার বার এইরূপ প্রমাণের অনুমিতি লিখিয়াছেন। ইহার পরে এই অশুদ্ধির সঙ্গে আর একটী অশুদ্ধিও যোগদান করিয়াছে।—

“অনুমানের প্রমাণের যে হেতু, তাহার কারণ যে ব্যাপ্তি-জ্ঞান ; ” (২৬ পৃঃ)

এখানে লেখা উচিত ছিল,—অনুমানের প্রামাণ্যের যে অনুমিতি, তাহার কারণ যে ব্যাপ্তি-জ্ঞান।

সম্পাদক মহাশয় অনুমিতির কার্য্যকারণ ভাব সম্বন্ধে এতই অনভিজ্ঞ যে, “অনুমিতিস্থল-সংক্রান্ত কতিপয় কথা”য় লিখিয়াছেন,—

“কেহ কেহ অনুমিতির করণ-ব্যাপ্তিভেদে অনুমিতির ভেদ করিয়া থাকেন” (১২৩ পৃঃ)

ন্যায়শাস্ত্রের প্রথম গ্রন্থ “ভাষাপরিচ্ছেদে”র অন্তর্গত “অনুমান-খণ্ডে”র প্রারম্ভেই লিখিত আছে,—“ব্যাপারস্তু পরামর্শঃ করণং ব্যাপ্তিধীর্ভবেৎ।” অর্থাৎ, অনুমিতি-রূপ কার্য্যের ব্যাপার—পরামর্শ, করণ—ব্যাপ্তিজ্ঞান।

অনুমিতির করণ—ব্যাপ্তি, এ অভিনব সিদ্ধান্ত সম্পাদক মহাশয় কোথায় পাইলেন ?

"সাধ্য = ঘটত্বাত্যন্তাভাব। যথা—'ঘটো নাস্তি'।" (১০৯ পৃঃ)

ঘটত্বাত্যন্তাভাবের অর্থ কি, 'ঘটো নাস্তি'—এই অভাব? 'ঘটো নাস্তি' বলিলে ত ঘটের অত্যন্তাভাব বুঝায়। "ভগবদ্গীতা"দির স্থায় শেষে কি স্থায়শাস্ত্রেও 'আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা' আসিয়া প্রবেশলাভ করিল?

"এইবার প্রাচীন মতানুসারে সাধ্যাভাবের অধিকরণতাটী যে সম্বন্ধে ধরিতে হইবে, তাহাই এই স্থলে বলা হইতেছে। এই প্রাচীন মতটী আর কিছুই নহে, পরন্তু ইহা—'অভাবের অভাব ভাব-স্বরূপ' অর্থাৎ 'অত্যন্তাভাবের অত্যন্তাভাব প্রতিযোগিস্বরূপ' এবং 'অন্যোন্যাভাবের অত্যন্তাভাব, প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক ধর্ম্মস্বরূপ'—এই মতানুসারে—" (১১৩ পৃঃ)

"সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তিসাধ্যসামান্যীয়প্রতিযোগিতা-বচ্ছেদকসম্বন্ধেন সাধ্যাভাবাধিকরণত্বং বক্তব্যম্"—এই গ্রন্থ-সন্দর্ভে মথুরানাথ, "সাধ্যাভাববদ-বৃত্তিত্ব"—এই ব্যাপ্তিলক্ষণে কোন্ সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধরিতে হইবে, তাহার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অনুবাদক এ ক্ষেত্রে বলিতেছেন,—মথুরানাথ ইহা প্রাচীন মতানুসারে বলিয়াছেন; তাঁহার নিজের মতে, সর্ব্বত্র স্বরূপ-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ বলিলেই চলিবে। "যে হেতু নব্য-গণের মত এই যে,—"ভাব-পদার্থের অত্যন্তাভাবের অত্যন্তাভাব প্রতিযোগিস্বরূপ নহে, * * পরন্তু তাহাও একটী অভাব পদার্থ হয়।" (১০৯ পৃঃ)

ভূমিকাতেও এক স্থানে অভাব সম্বন্ধে নব্য ও প্রাচীনগণের মতভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে,—

"অত্যন্তাভাবের যে অত্যন্তাভাব, তাহা প্রাচীন মতে, প্রতিযোগিস্বরূপ বলিয়া স্বীকার করা হয়। কিন্তু নব্য মতে তাহা ঘটস্বরূপ হয় না;" (১১৯ পৃঃ)

লেখক মহাশয় এই অভিনব সিদ্ধান্তে কেমন করিয়া উপনীত হইলেন, জানি না। নব্য নৈয়ায়িকেরা যে অভাবের অভাব প্রতিযোগীর স্বরূপ বলেন না—অতিরিক্ত মানেন, ইহা লেখক কোথায় দেখিলেন? নব্য নৈয়ায়িককুলচূড়ামণি, মনীষিশ্রেষ্ঠ রঘুনাথ শিরোমণি, "সিদ্ধান্ত-লক্ষণে"র শেষে "অভাবত্বঞ্চেদমিহ নাস্তীদমিদং ন ভবতীতি প্রতীতিসাক্ষিকভাবাভাবসাধারণঃ স্বরূপসম্বন্ধবিশেষঃ"—এই গ্রন্থাংশে অভাবত্ব যে ভাবাভাব-সাধারণ, তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঘটত্বাভাবে যে অভাবত্ব আছে, তাহা অভাবগত; আর ঘটত্বাভাবাভাব ঘটত্বের স্বরূপ বলিয়া তাহার উপর যে অভাবত্ব আছে, তাহা ভাবগত। সুতরাং নব্যমতে অভাবের অভাব প্রতিযোগীর স্বরূপ হয় না, ইহা কেমন করিয়া বলিব? নব্য নৈয়ায়িক জগদীশ তর্কালঙ্কার, "ব্যধিকরণধর্ম্মাবচ্ছিন্না-ভাব" গ্রন্থের প্রথমাংশে "যদপি—" কল্পে বহ্নিসংযোগের স্বরূপ অভাব ধরিয়া দোষ দিয়াছেন। যদি অভাবের অভাব প্রতিযোগীর স্বরূপ না হয়, তাহা হইলে ত আর বহ্নির অভাবাভাব বা সংযোগের অভাবাভাব, বহ্নি বা সংযোগের স্বরূপ হইতে পারে না। তা'র পর; অভাব যে ভাব ও অভাব—উভয়-রূপই হয়, ইহা মথুরানাথ নিজেও "সিদ্ধান্তলক্ষণে" লিখিয়াছেন।" (৯) সিদ্ধান্ত-লক্ষণে"র অন্যান্য স্থানেও তিনি অভাবের অভাব যে প্রতিযোগীর স্বরূপ হয়, ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। (১০)

---

(৯) 'তথাপি সর্ব্বেষামেব ভাবরূপাণামভাবরূপাণাং বা অভাবানাং * * সর্ব্বসিদ্ধতয়া—" (৬৭ পৃঃ ; জীঃ সং)।

(১০) "এবং কপিসংযোগাভাববান্ * * কপিসংযোগাভাবনিষ্ঠা কপিসংযোগনিরূপিতা প্রতিযোগিতাবাধিতা—" ৬১ পৃঃ জীঃ সং।

অভাবের অভাব যে ভাব-স্বরূপ হয়, তাহা এই "ব্যপ্তিপঞ্চকে'ই মথুরানাথ একাধিকবার বলিয়াছেন। (১১) যদিও তিনি এই গ্রন্থের দ্বিতীয় লক্ষণে লিখিয়াছেন, "অভাবাভাবস্যাতিরিক্তত্বমতেন এতল্লক্ষণকরণাৎ "—অভাবাভাব অতিরিক্ত, এই মতে, এই লক্ষণ করা হইয়াছে—তাহাতে এটী যে নব্য মত, ইহা কিসে প্রকাশ পাইল ? তা'র পর, মথুরানাথ এই লক্ষণেই চরম কল্পে লিখিয়াছেন,—সংযোগাদি অননুগত ভাব পদার্থ, সেই সেই পদার্থের অভাবাভাব না হইলেও, ঘটত্বাভাবাভাব বা দ্রব্যত্বাভাবাভাব প্রভৃতি অতিরিক্ত নহে,—উহা লক্ষণতঃ ঘটত্বাদির স্বরূপ; কেন না, ঘটত্ব দ্রব্যত্বাদি অনুগত পদার্থ। মথুরানাথ দ্বিতীয় লক্ষণের পরিষ্কারের উদ্দেশেই এই সকল মতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। নতুবা তৎকৃত অন্যান্য নানা গ্রন্থের আলোচনা করিলে জানিতে পারা যায় যে, তিনি অননুগত পদার্থকেও অভাবাভাব বলিয়াছেন। (১২) সুতরাং নব্য নৈয়ায়িকেরা যে অভাবাভাবকে ভাবের স্বরূপ বলেন না, এইরূপ নির্দ্দেশ করা অত্যন্ত অসমীচীন।

"ব্যাপ্তিপঞ্চকে"র এই বঙ্গানুবাদে প্রায় অধিকাংশ স্থলেই এইরূপ বিবিধ অশুদ্ধ কথা স্থান লাভ করিয়াছে। মাসিকপত্রের কলেবরে এত স্থান নাই,এবং আমাদের এত অবসর নাই যে, সেই সকল প্রত্যেক অশুদ্ধির আলোচনা করিতে পারি। সুতরাং আমরা এইখানেই গ্রন্থ-সমালোচনা-রূপ অপ্রিয় কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইলাম। পুস্তকের যে পর্য্যন্ত আলোচনা করিলাম, তাহাতেও সকল অশুদ্ধির কথা উল্লেখ করিতে পারি নাই। স্থানাভাবে অনেক অশুদ্ধির উল্লেখই পরিত্যাগ করিয়াছি। এই পুস্তকের সহিত যদি শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ মহাশয়ের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ না থাকিত, তাহা হইলে আমরা এই অপ্রিয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতাম না।

উপসংহারে বক্তব্য এই, যাঁহারা ন্যায়শাস্ত্রে প্রবেশ লাভ করেন নাই, যদিও এই পুস্তক-পাঠে তাঁহাদের কিছুমাত্র উপকার হইবে না, এবং যাঁহারা ন্যায়শাস্ত্রে কৃতবিদ্য, তাঁহাদের পক্ষেও এ পুস্তক-পাঠ একবারেই নিষ্প্রয়োজন, তথাপি এই পুস্তক-সম্পাদনে ঘোষ মহাশয় অসীম ধৈর্য্যসহকারে যেরূপ অসাধারণ পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয়।

শ্রীহরিহর শাস্ত্রী।

---

(১১) "গুণকর্ম্মান্যত্ববিশিষ্টসত্ত্বাভাববান্ গুণত্বাদিত্যাদৌ সত্ত্বাত্মকসাধ্যাভাবাধিকরণত্বস্য—"

'কপিসংযোগাভাববান্ সত্ত্বাদিত্যাদৌ নিরবচ্ছিন্নসাধ্যাভাবাধিকরণত্বাপ্রসিদ্ধ্যা—"

"দ্রব্যত্বাদেরপি দ্রব্যত্বাভাবাভাবরূপত্বাৎ।"

(১২) "কপিসংযোগাভাববান্ সত্ত্বাদিত্যাদিত্যাদৌ নিরবচ্ছিন্নসাধ্যাভাবাধিকরণত্বস্যাপ্রসিদ্ধ্যা –" ব্যাপ্তিপঞ্চক, ১ম লক্ষণ।

"কপিসংযোগাভাববান্ * * কপিসংযোগাভাবনিষ্ঠা কপিসংযোগনিরূপিতা প্রতিযোগিতা-

নবাবী আমলে বাঙ্গালার জমীদার।

১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে শেষ গৌড়েশ্বর দায়ুদ খাঁ'র নিধনের পর বাঙ্গালায় মোগল যুগের বা নবাবী আমলের সূত্রপাত, এবং দুই শত বৎসর পরে, ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে, কোম্পানী যখন সুবে বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানের কর্ত্তব্য সম্পাদনে (to start forth as Duan) বদ্ধপরিকর হইয়া ওয়ারেণ হেষ্টিংসকে গভর্ণর পদে বরণ করিয়া পাঠাইলেন তখন তাহার পরিসমাপ্তি। এই আমলে বাঙ্গালার জমীদার-শ্রেণী অত্যন্ত প্রভাবশালী ছিলেন। দেশের ভাগ্যচক্র অনেক সময় জমীদার-গণের ইঙ্গিতে আবর্ত্তিত হইয়াছে। প্রজাসাধারণের ইঁহারা শুধু কর-সংগ্রাহক ছিলেন না, ভাগ্যবিধাতাও ছিলেন। নবাবী আমলের বাঙ্গালী-সাধারণের ইতিহাস মোগল বাদশাহগণের এবং সুবাদারগণের ইতিহাস অপেক্ষা জমীদার-গণের ইতিহাসের সহিত অধিকতর বিজড়িত।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষপাদের মোগলদ্রোহী ঈশা খাঁ মসনদ আলি, কেদার রায়, মুকুন্দ রায়, প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি ভূঁইয়াগণের ইতিবৃত্ত বাঙ্গালী পাঠকসমাজে সুপরিচিত। বাদশাহ আকবরের রাজস্বসচিব রাজা তোড়রমল্ল ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে সুবে বাঙ্গালার বিভিন্ন সরকারের ও মহালের যে জমাবন্দী করেন তাহা তখন ভূঁইয়াগণের অধিকৃত ভাঁটি প্রদেশে অর্থাৎ পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বঙ্গে আমলে আসিতে পারে নাই, কাগজে পত্রে লেখামাত্রই ছিল। বাঙ্গালা প্রকৃত প্রস্তাবে বশীভূত হইয়াছিল বাদসাহ জাহাঙ্গীরের সময়ে, এবং বাঙ্গালার সমস্ত মহালের প্রকৃত জমাবন্দী সম্পন্ন হইয়াছিল ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দের কিছু পূর্ব্বে সাহজাদা সুজার সুবে-দারীর সময়ে। কিন্তু তাহার পরেও বাঙ্গালার জমীদারগণের যে বিশেষ পরাক্রান্ত হইয়া উঠিবার অবসর ছিল, চিতুয়া ও বর্দা পরগণার জমীদার শোভা সিংহের ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দের বিদ্রোহ তাহার পরিচায়ক। এই বিদ্রোহের কাহিনীও পাঠক-সমাজে সুপরিচিত। এই বিদ্রোহ কিরূপ ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছিল, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সমসময়ের চিঠীপত্রে তাহার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়। সুতানটিতে তখন কোম্পানির প্রধান কুঠী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এবং সুতানটি ও বাঙ্গালার অন্যান্য স্থানের কুঠী মান্দ্রাজের (Fort St. George) অধীন ছিল। ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দের ৩০শে সেপ্টেম্বরের পত্রে মান্দ্রাজের কর্ত্তৃপক্ষ লণ্ডনের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট লিখিতেছেন—

"34. In Bengall your Honours affairs went on (notwithstanding the troubles at Surat) without any impediment from the Government. But their last Letter complains of the disturbance occasioned by the rebellion of a Raja......The advice we have received is in the Letters No by which it appears that the Rajas forces have taken Possession of Hughly ffort and the Choukeys upon the river to Muxadavad, so that the goods could not pass but by their leave. The Dutch assisted the Moors, and regained Hughly ffort. But the master of the Vessell that came from Bengall saies that the Rajas men hath retaken it and there doth not yet appear an Army of the Kings to subdue them. So that how far they will proceed or how long continue masters of what they have is uncertain. That which respects your Honours affairs is the present security the of 'ffactory. The carrying on the Investment and fortifying of the Factory. The Agent and Councill seem to have taken most prudent method for those purposes in maintaining a friendship with both parties in such a manner as that the Raja doth not suspect them, and yet the Nabob sends them thanks for their assistance". Wilson's *Old Fort William in Bengal (Indian Records Series)*. Vol. I., pp. 19—20.

"সুরাটে গোলমালসত্ত্বেও বাঙ্গালায় আপনাদের কারবার শাসনকর্ত্তৃগণ হইতে কোন বাধা প্রাপ্ত হয় নাই। ... কিন্তু তাঁহাদের (সুতানটি কুঠীর কর্ত্তৃপক্ষের) শেষ চিঠীতে একজন রাজার বিদ্রোহজনিত গোলমালের উল্লেখ আছে। আমরা বাঙ্গালা হইতে আগত নং চিঠীতে [এই ঘটনার] বিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছি। এই বিবরণ হইতে জানা যায়, রাজার সৈন্যগণ হুগলি দুর্গ এবং তথা হইতে মুকসুদাবাদ পর্য্যন্ত নদীর তীরে যত চৌকি আছে সমস্ত দখল করিয়াছে; সুতরাং তাহাদের অনুমতি ব্যতীত মাল [জলপথে] আনা নেওয়া যায় না। ডচ্ গণ মুসলমানদিগকে [নবাবী ফৌজকে] সহায়তা করিয়াছিল এবং হুগলি দুর্গ পুনরধিকার করিয়াছিল। কিন্তু বাঙ্গালা হইতে যে জাহাজ আসিয়াছিল তাহার অধ্যক্ষ বলেন, রাজার লোকেরা পুনরায় ঐ দুর্গ অধিকার করিয়াছে এবং উহাদিগকে দমন করিবার জন্য বাদশাহের তরফ হইতে কোন সেনা আসে নাই। অতএব বিদ্রোহীরা কতদূর অগ্রসর হইবে এবং যাহা তাহারা অধিকার করিয়াছে তাহা কতদিন অধিকারে রাখিবে তাহা স্থির করা কঠিন। কুঠীর যাহাতে কোন প্রকারে বিপদ না ঘটে সেই দিকেই কেবল আপনাদের কর্ম্মচারিগণের দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। কারবার চালান এবং কুঠীকে দুর্গে পরিণত করা [কর্ত্তব্য]। এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য আপনাদের প্রধান কর্ম্মচারী এবং পরামর্শসভা বিবেচনাপূর্ব্বকই কায করিয়াছেন—উভয় পক্ষের সহিত এমনভাবে সদ্ভাব রাখিয়া

চলিয়াছেন যে, রাজা তাঁহাদিগের সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ পোষণ করেন না, পক্ষান্তরে রাজার সহিত বিরোধে সহায়তা করার জন্য নবাব তাঁহাদিগকে সাধুবাদ প্রদান করিয়াছেন।"

১৬৯৭ খৃষ্টাব্দে বাদশাহ ঔরঙ্গজেব স্বীয় পৌত্র আজিমুস্‌সানকে বাঙ্গালার নবাব নাজিম এবং মির্জা হাদিকে কার তলব খাঁ উপাধি দান করিয়া বাঙ্গালার দেওয়ান বা রাজস্ব বিভাগের অধ্যক্ষনিয়োগ করেন। মির্জা হাদি কার তলব খাঁ বাদশাহের নিকট হইতে পরে যথাক্রমে মুর্শিদকুলি খাঁ এবং জাফর খাঁ খেতাব প্রাপ্ত হয়েন, এবং দেওয়ানীর সঙ্গে সঙ্গে সুবে বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার নবাব নাজিমের পদও লাভ করেন। মুর্শিদকুলি খাঁ বাঙ্গালার জমীদারগণের যম-স্বরূপ ছিলেন। রাজস্ব আদায়ের জন্য ইনি জমীদারগণের উপর অমানুষিক অত্যাচার আরম্ভ করেন, এবং সুবার প্রত্যেক মহালের নূতন জরীপ জমাবন্দী করেন। তাঁহার অত্যাচারে অনেক প্রাচীন জমীদারী ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। চাকলা রাজসাহীর জমীদার রাজা উদিৎনারায়ণ এবং পরগণা মামুদাবাদের জমীদার সীতারাম বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হয়েন। নবাব এই সকল পুরাতন জমীদারী নাটোরের রামজীবনের হস্তে প্রদান করিয়া বিশাল রাজসাহী জমিদারীর সৃষ্টি করেন। মুর্শিদ কুলি খাঁর অত্যাচার এবং অনাচারের মধ্যে এই অভিনব রাজসাহী জমীদারীর সৃষ্টি একটি শুভানুষ্ঠান। প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী ভবানীর কর্তৃত্বাধীনে এই জমীদারী দেশের অশেষ কল্যাণসাধন করিয়াছিল।

রাজস্ব আদায় এবং বৃদ্ধি সম্বন্ধে মুর্শিদ কুলি খাঁ নিতান্ত নিষ্ঠুর হইলেও সৈন্য-সামন্তপোষণ এবং প্রজাশাসনসম্বন্ধে বাঙ্গালার জমীদারগণের যে সকল অধিকার ছিল, তাহাতে তিনি হস্তক্ষেপ করেন নাই। মুর্শিদ কুলি খাঁর শাসনের ফলে জমীদারগণের প্রভাবপ্রতিপত্তির কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। 'রিয়াজুস্‌-সলাতীন' গ্রন্থে দেখা যায়, ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে নবাব সরফরাজ খাঁর সহিত আলিবর্দ্দি খাঁর গিরিয়া ক্ষেত্রে যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে রাজসাহীর জমীদার রামকান্তের লোকেরা আলিবর্দ্দির বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। আলিবর্দ্দি খাঁ রাত্রিকালে যাইয়া নবাব সরফরাজ খাঁর শিবির হঠাৎ আক্রমণের প্রস্তাব করিলে রাজসাহীর জমীদারীর লোকেরা তাঁহাকে পথ দেখাইয়া নবাবের শিবিরসন্নিধানে লইয়া যায়, এবং এই সূত্রে আলিবর্দ্দি নবাবকে সহজে পরাজিত এবং নিহত করিতে সমর্থ হইয়া মুর্শিদাবাদের মস্‌নদে আরোহণ করেন। (১)

(১) Abdul Salam's translation of *Riyazu S-Salatin*, p. 315.

বাঙ্গালায় কোম্পানীর রাজত্বের ভিত্তিও জমীদারী। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে কোম্পানী সাহজাদা আজিমুস্‌সানের অনুগ্রহে লক্ষ্মীকান্ত মজুমদারের উত্তরাধিকারিগণের নিকট ১৫০০৲ টাকা মূল্যে বয়নামা দ্বারা কলিকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুর, এই তিন মৌজা খরিদ করিয়া জমীদারীসূত্রে ইংরেজ-শাসনের সূত্রপাত করিয়াছিলেন। (২) পলাশীর পুরস্কারস্বরূপ চব্বিশ পরগণার জমীদারী, এবং কাশিম আলিখাঁকে মসনদে বসাইয়া বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর এবং চট্টগ্রামের জমীদারী-লাভ। কোম্পানী জমীদারী হইতে দেওয়ানী, এবং দেওয়ানী, হইতে সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

কোম্পানীর দপ্তরের কাগজপত্রে, অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে বাঙ্গালার জমীদারেরা কিরূপ প্রতাপশালী ছিলেন, তাহার কথঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়। ১৭৪৮ হইতে ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দের যে সকল কাগজ বা পত্র গভর্মেণ্টের দপ্তরে আছে, লঙ্গ সাহেব তাহার কিয়দংশমাত্র প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। (৩) এই সকল কাগজপত্রে দেখা যায়, ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমানের এবং বীরভূমের রাজা কোম্পানীর এবং নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতেছিলেন। জুন মাসে বর্দ্ধমান রাজের এবং কোম্পানীর সিপাহীগণের মধ্যে একটি ছোট রকম যুদ্ধ হয়। তাহাতে কোম্পানীর তরফের এক জন সার্জন (sergeant) এবং ৫০ জন সিপাহী নিহত হয়, এবং লেফ্‌টেনেণ্ট ব্রাউন আহত হয়েন। কোম্পানীর কার্য্যবিবরণীতে নিবদ্ধ হিউ ওয়াট্‌স কর্ত্তৃক হলোয়েলের বরাবরে লিখিত পত্রে এই যুদ্ধের এই প্রকার বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে—

"The day before yesterday they stopped Gocool Mojundor in his palanquin and threatened to confine him: this day Sook Lall, a jemadar, killed one of my sepoys, who was then unarmed in the town. I sent to enquire the reason, but could get no answer, therefore 1 sent a subadar with 3o sepoys to bring him to me, but to make no disturbance. Before they reached his house 7 or 800 forces were gathered who presented their matchlocks as my sepoys were advancing; at this intelligence I sent onders to the subadar to retire to the Raja's Cutcherry, and I detached Lieutenant Brown with about 200 men to his assistance with orders to avoid engaging if possible, but before Mr. Brown could speak to them they began firing; this occasioned an action in which 1 am sorry to say we have been greatty worsted, the serjeant and about

(২) Wilson's *Old Fort William in Bengal* Vol. I., pp. 38-40.

(৩) Long's *Selections form Unpublished Records of Government,* Vol, I., Calcutta, 1869.

50 sepoys killed upon the spot, Mr Brown and some others slightly wounded. Since the return of our forces to their quarters, I have intelligence that the enemy were increased to 5,000 strong and premeditated an open rupture by seizing upon the treasure". (Long, 468).

এই গোলমাল আপোসে মিটাইয়া ফেলিবার জন্য কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষ সামনার সাহেবকে বর্দ্ধমানে পাঠাইয়াছিলেন। নবেম্বর মাসে নবাব জাফর আলি খাঁ (মীরজাফর) পদচ্যুত এবং তাঁহার জামাতা কাশিম আলি খাঁ তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, এবং কোম্পানীকে বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, ও চট্টগ্রাম, এই তিন জেলা প্রদান করিলেন। এই সময় বর্দ্ধমানের রাজা তিলকচাঁদ বীরভূমের রাজার, সাহজাদা সাহ আলমের এবং মারাঠাগণের সহিত মিলিত হইয়া মুর্শিদাবাদ আক্রমণের উদ্যোগ করিতেছিলেন। এই ষড়যন্ত্রসম্পর্কীয় চিঠিপত্র বিশেষ কৌতূহলজনক। নবেম্বর মাসে সুলেমান বেগ লিখিতেছেন, বর্দ্ধমানের রাজা ১৫০০০ সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছেন। যথা—

"Now I am informend that the Burdwan Rajah is entering men into his service; that 15,000 peons, pikes and robbers and others are already in pay and others are daily entering. I am informed of this from people that are continually coming from that side" (504).

নবাব কাশিম আলি খাঁ নবেম্বর মাসে কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষকে লিখিতেছেন, বর্দ্ধমানের জমীদার এবং বীরভূমের রাজা একত্র হইয়া বিদ্রোহাচরণ করিবার আয়োজন করিতেছেন। যথা—

"I am informed that the zemindar of Burdwan has bad intentions, and has conferences with the Beerboom Rajah, and they have agreed to act in conjunction; I hope that you will send troops to Chuckla Burdwan, Midnapur, Islamabad, to take possession of them and nothing can accrue from their bad intentions, and by God's grace I will speedily go myself and chastise the Beerboom Rajah. What more shall I write?". (506)

নবাব কাশিম আলি খাঁ বর্দ্ধমান রাজের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া ডিসেম্বর মাসে লিখিত একখানি পত্রে তাঁহাকে গালি দিতেও সঙ্কুচিত হয়েন নাই। যথা—

"Today I am come to the Tewah Baug, and the day after to-morrow shall go to Rommurah, I desire you will not be backward. in chastising the Burdwan Rajah, he is of a bad caste. I beg you will he expeditious in sending your troops and the affair will soon be settled and the zemindar will be brought to subjection. If Major White goes to Beerboom road he will join Major York, and return they act in conjunction and they will chastise Beerboom Rajah" (512).

ডিসেম্বর মাসে নবাব কাশি আলি খাঁ আবার লিখিতেছেন—

"The Zemindar of Burdwan and others have wrote to the Shah Zeadat that when Hossein Ali Khan proceeds to Patna they will join the Mahrattas and take possession of Muxadabad, to which the Shah Zeadat has consented" (519).

কোম্পানীর সেনার ক্ষিপ্রকারিতার গুণে বর্দ্ধমান রাজের এবং তাঁহার সহযোগিগণের সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইয়াছিল। মেজর ইয়র্ক কোম্পানীর এবং নবাবের ফৌজ লইয়া বীরভূমের রাজধানী নাগোর অধিকার করিয়া বীরভূম রাজকে পার্ব্বত্য জঙ্গলে আশ্রয় লইতে বাধ্য করিয়াছিলেন। কাপ্তান মার্টিন হোয়াইট ২৯শে ডিসেম্বর বর্দ্ধমানের এবং সঙ্গতগোলার মধ্যে নদীর তীরের যুদ্ধে বর্দ্ধমানের ফৌজ পরাজিত করিয়া বিপক্ষদলের মিলনের পথ রুদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। (৪)

সৈন্যসামন্ত-পোষণের সামর্থ্য অবশ্য খুব বড় বড় জমীদারগণেরই ছিল, কিন্তু ছোট বড় সকল প্রকার জমীদারই প্রজার একপ্রকার হর্ত্তাকর্ত্তাবিধাতা ছিলেন। প্রজার মধ্যে বিবাদবিসংবাদ উপস্থিত হইলে জমীদার বা তাঁহার কর্ম্মচারী তাহার বিচার করিতেন। ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দের ২৮শে সেপ্টেম্বরের কৌন্সিলের কার্য্য বিবরণে, গভর্ণর ভেরেলষ্ট (Verelst) সাহেবের এই মন্তব্য প্রদত্ত হইয়াছে—

Mr. Verelst remarks that it never was his intention that ryots from all parts of the province should, on every trivial complaints, apply to the cutcherry of Burdwan; his orders regarding the pergunnah cutcherry related to such as were established for the collections of the revenues only, not those for the administration of justice. As it is an established custom in all parts of the country for the zemindar or head farmer of the lands to administer justice in their several districts in all cases that are not of very great importance, he left the same to them; how this came to be brought into the cutcherry at Burdwan he knows not, but thinks it is a great grievance to the ryots, which ought to be immediately redressed by orders to the zemindars and farmers to attend to the complaints of their several ryots, or by appointing proper persons to that business as may be found most conducive to the ease, satisfaction and happiness of the ryots (956)."

বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর এবং চট্টগ্রাম, এই তিন জেলা কোম্পানীর হস্তগত হইলে ভেরেলষ্ট এই তিন জেলার রাজস্বের বন্দোবস্তের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড ক্লাইব যখন দ্বিতীয় বার গভর্ণর হইয়া আসেন, তখন ভেরেলষ্ট

(৪) Long's *Selections*, p 558.

তাঁহার সহযোগী এবং বিশ্বাসভাজন পরামর্শদাতা ছিলেন, এবং লর্ড ক্লাইব পদত্যাগ করিলে ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারী ভেরেলষ্ট তাঁহার পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। জমীদার এবং ইজারাদারগণের নিকট হইতে রাজস্ব-আদায়ের জন্য ভেরেলষ্ট বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানে কাছারী স্থাপন করিয়াছিলেন। প্রজারা সময় সময় জমীদারের কাছারীতে না যাইয়া কোম্পানীর কাছারীতে নালিস রুজু করিত। তাই ভেরেলষ্ট এই মন্তব্যে বলিতেছেন, কোম্পানীর কাছারী রাজস্ব আদায়ের জন্য স্থাপিত হইয়াছে, প্রজার মামলা মকদ্দমার বিচারের জন্য স্থাপিত হয় নাই।' গুরুতর অভিযোগ ভিন্ন অন্যান্য বিষয়ের মীমাংসা এ দেশে বরাবর জমীদারেরাই করিয়া আসিতেছেন, সুতরাং এই চিরন্তন প্রথা রহিত করা কর্ত্তব্য নহে, এবং এই প্রথা প্রচলিত থাকিলেই প্রজাগণ সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারিবে। ভেরেলষ্টের মতে, কোম্পানীর কাছারীতে নালিস করিতে আসা একটা খুব কষ্টের বিষয় (great grievance)। ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে বা তৎপূর্ব্বে প্রজাসাধারণের মধ্যে কি ভাবে মামলা মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইত, এবং তাহা কষ্টকর কি সুখকর ছিল, এই বিষয়ের অভিজ্ঞতা-লাভে ভেরেলষ্টের যেমন সুযোগ ঘটিয়াছিল, অন্য কোনও কোম্পানীর কর্ম্মচারীর তেমন সুযোগ ঘটিবার সম্ভাবনাই ছিল না।।

লর্ড ক্লাইব কোম্পানীর নামে দেওয়ানী সনন্দ লাভ করিয়া সুবে বাঙ্গালায় সুবাদারের বা নবাবের নামে, অথচ কোম্পানীর কর্ত্তৃত্বাধীনে, যে দোতরফা শাসন-রীতি (double government) প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, তাহার ফলে দেশময় একটা অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল। সেই সময় জমীদারী বিচারকার্য্যেও বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবার কথা। এই দোতরফা শাসনপ্রথার মূলোৎপাটনে আদিষ্ট হইয়া ওয়ারেণ হেষ্টিংস ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে বাঙ্গালার গভর্ণরের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ওয়ারেণ হেষ্টিংস জমীদারগণের রায়তের মামলা মকদ্দমার বিচারের অধিকার রহিত করিয়া মফস্বলের স্থানে স্থানে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের ১৫ই অগষ্টের পত্রে মফস্বলে বিচার-রীতির এই ঘোর পরিবর্ত্তনের এইরূপ কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা—

'The Zemindars, Farmars, Shiedars, and other officers of the Revenue, assuming that Power for which no Provision is made by the Laws of the Land, but which, in whatever manner it is exercised, is preferable to a total Anarchy ; It will however be obvious, that the judicial Authority, lodged in the Hands of men who gain their Livelihood by the Profits on

the collection of the Revenue, must unavoidably be converted to Sources of private Emolument; and, in Effect, the greatest Oppressions of the Inhabitants owe their Origin to this necessary Evil.' (৫)

এখানে হেষ্টিংস ও তাঁহার সহাযোগিগণ বলিতেছেন যে, যাহারা প্রজার খাজানা আদায় করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে, তাহাদের হাতে বিচারের ভার থাকিলে নিশ্চয়ই তাহারা সেই সূত্রে পয়সা উপার্জ্জন করিতে চেষ্টা করে; এবং কার্য্যতঃ এই অপরিহার্য্য কুপ্রথার ফলে দেশের অধিবাসিগণের উপর গুরুতর অত্যাচার হয়। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দের ১৮ই অক্টোবর তারিখে উপস্থাপিত এক পত্রে (৬) (minute) কৌন্সিলের সদস্য ক্লেভারিং, মনসন ও ফ্রান্সিস জমীদারগণের এই অধিকার কাড়িয়া লইবার জন্য হেষ্টিংসের উপর দোষারোপ করিয়াছিলেন, এবং হেষ্টিংসও তাহার উত্তর দিয়াছিলেন। বাহুল্যভয়ে সেই উক্তি প্রত্যুক্তি এখানে উদ্ধৃত হইল না। কিন্তু উপরে উদ্ধৃত বচন-প্রমাণ হইতে দেখা যাইবে যে, নবাবী আমলে জনসাধারণের প্রকৃত শাসনকর্ত্তা ছিলেন জমীদারগণ। নবাবী আমলের বাঙ্গালীর এবং বাঙ্গালার প্রকৃত ইতিহাস জমীদারগণের এবং জমীদারী-নিচয়ের ইতিহাসের সহিত বিশেষভাবে সম্বন্ধ। নিম্নে নবাবী আমলের প্রধান কয়েকটি জমীদারীর তালিকা প্রদত্ত হইল। গ্রাণ্ট-সঙ্কলিত বাঙ্গালার রাজস্বের বিবরণ হইতে প্রত্যেক জমীদারীর আয়তনের পরিমাণ দেওয়া হইল।

	জমীদারীর নাম।	আয়তন (বর্গমাইল)।
১।	রাজসাহী জমীদারী	১২,৯০৯
২।	বর্দ্ধমান জমীদারী	৫,১৭৪
৩।	বীরভূম জমীদারী	৩,৮৫৮
৪।	দীনাজপুর জমীদারী	৩,৫১৯
৫।	কৃষ্ণনগর (নদীয়া) জমীদারী	৩,১৫১
৬।	পাচেট জমীদারী (রাজ্য)	২,৭৭৯
৭।	বিষ্ণুপুর জমীদারী (রাজ্য)	১,২৫৬
৮।	ইউসফপুর বা যশোহর জমীদারী	১,৩৬৫ (৭)

(৫) Forrest's *Selections from the State Papers of the Governors-General of India, Warren Hastings,* Vol II, p. 285.

(৬) Forrest's *Selections from the Letters, Despatches, and other State Papers Preserved in the Foreign Department of the Government of India,* 1772—1785 (Calcutta, 1890). Vol II, pp. 432—433, 454—456.

(৭) Mr. J. Grant's *Analysis of the Finances of Bengal Appendix,* No 4 *The Fifth Report from the Select Committee on the Affairs of the East India, Company,* (Madras, 1883), Vol. I. pp. 318—321.

এই সকল জমীদারীর পূর্ব্ব অধিকারিবর্গের বংশধরগণ এখনও বর্ত্তমান আছেন। এই সকল রাজবংশের ও জমীদারীর নবাবী আমলের, এবং কোম্পানীর আমলের প্রথম ভাগে—যখন জমীদারীগুলি অটুট ছিল—তখনকার, এবং উহাদের অধঃপতনের ইতিহাসের উৎকৃষ্ট উপাদানেরও অভাব নাই। প্রত্যেক রাজবাড়ী-তেই বাদশাহী ফর্মান, সনন্দ ও পরোয়ানা আছে, এবং কোম্পানীর বিভিন্ন কুঠীর কাগজপত্রে, কলিকাতা রেভিনিউ বোর্ডের ও বিভিন্ন জেলার কালেক্টরীর মহা-ফেজখানায় রক্ষিত পুরাতন কাগজপত্রে এই সকল জমীদারীর ইতিহাসের প্রচুর উপাদান আছে। এই সকল মূল দলীল দস্তাবেজ যথাসম্ভব সংগৃহীত ও প্রকাশিত হওয়া উচিত। বাঙ্গালার প্রাচীন রাজবংশনিচয়ের বংশধরগণ একত্র মিলিত হইয়া যদি এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন, তবে ইহা সহজে সুসিদ্ধ হইতে পারে।

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ।

বাঙ্গালা সাহিত্য।

[স্বর্গীয় সাহিত্য-গুরু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ইংরাজী প্রবন্ধ হইতে।]

বর্ত্তমানকালে ভারতবর্ষের অন্যান্য জাতি অপেক্ষা বাঙ্গালী জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ হইতে পারে, কিন্তু, অতীত যুগে, জ্ঞানজগতে তাহাদের স্থান অতি নিম্নে ছিল। গ্রীসের অন্তর্গত বিওসিয়া প্রদেশ উহার অধিবাসিগণের নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। পুরাকালের বাঙ্গালা প্রদেশও ভারতবর্ষে বিওসিয়ার স্থান অধিকৃত করিয়াছিল।—এ কথা এক জন বাঙ্গালী লেখক বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্রই বলিয়াছেন। এবং এই উক্তিটি অমূলক নহে। ভারতবর্ষের যে প্রাচীন সাহিত্য আজিও য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের শ্রদ্ধা ও মনোযোগ আকৃষ্ট করিতেছে, সেই সাহিত্যের পুষ্টির জন্য বাঙ্গালা প্রদেশ অতি সামান্যই করিয়াছে। বাঙ্গালী সংস্কৃতকবিদিগের মধ্যে একমাত্র জয়দেবই কিছু প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনিও প্রথম শ্রেণীর কবি নহেন। কালিদাস, মাঘ, ভারবি ও শ্রীহর্ষের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে, এরূপ এক জন বাঙ্গালীরও নাম করা যাইতে পারে না। সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগে প্রাচীনতর সংস্কৃত সাহিত্যে—কেবল এক জন বাঙ্গালীর নাম প্রসিদ্ধ,—মনুর টীকাকার কুল্লুক ভট্ট। ন্যায় ও স্মৃতিশাস্ত্রে বাঙ্গালী পণ্ডিতগণ যে জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন

তাহা এ যুগের বলা যাইতে পারে না। রঘুনন্দন ও জগন্নাথ উভয়েই ইদানীন্তন যুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম বাঙ্গালী লেখকগণের আবির্ভাবকাল নির্দ্ধারিত করা দুঃসাধ্য, তবে, বোধ হয়, তিন শত বৎসরের অধিক পূর্ব্বে অতি অল্প পুস্তকই রচিত হইয়াছিল। যিনি বাঙ্গালা ভাষায় সর্ব্বাপেক্ষা মধুর গীতিকবিতা রচনা করিয়াছেন, সেই বিদ্যাপতিই নিঃসন্দেহ আমাদের অন্যতম আদিকবি। চণ্ডীর গানের রচয়িতা, 'কবিকঙ্কণ' নামে সমধিক প্রসিদ্ধ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী আকবরের রাজত্বকালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। 'চৈতন্যচরিতামৃত'ও একখানি অতিপ্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থ। প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থাদির রচনা-কাল এখনও নির্দ্ধারিত হয় নাই বটে, কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্য স্বভাবতঃই পাঁচটি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত, এবং প্রত্যেকের শ্রেণীর সাহিত্যের চিন্তার ধারা বিভিন্ন, এবং রচনাকাল প্রায়ই পর্য্যায়ক্রমিক। এই কথা স্মরণ রাখিলে, গ্রন্থাদির রচনাকাল স্পষ্টভাবে জ্ঞাত না হইলেও নিম্নে লিপিবদ্ধ সংক্ষিপ্ত সমালোচনা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম হইবে।

সর্ব্বপ্রথম যুগ গীতিকাব্যের যুগ। এই যুগের প্রধান প্রবর্ত্তক বিদ্যাপতি। এই যুগের কবিগণ সকলেই বৈষ্ণব, এবং তাঁহাদের কবিতা হয় কৃষ্ণপ্রেম, নয় ত চৈতন্যলীলা-বিষয়ক। এই সকল গান এখনও বৈরাগীদের দ্বারা গীত হইয়া থাকে, এবং সাধারণে উহা 'কীর্ত্তন' নামে প্রসিদ্ধ। এই সকল গাণের সংখ্যা অনেক। বর্ত্তমান লেখকের অধিকারে এই শ্রেণীর প্রায় তিন সহস্র সঙ্গীতের সংগ্রহ আছে এবং তাঁহার বিশ্বাস যে এইরূপ বিস্তৃত সংগ্রহ আরও অনেক স্থলে আছে। যে সুরে এই সঙ্গীতগুলি রচিত, তাহার একটু বিশেষত্ব আছে, এবং সাধারণতঃ বাঙ্গালার অনেক গীতব্যবসায়ীও তাহা সম্যক্‌রূপে জ্ঞাত নহেন। উহাতে কীর্ত্তনের সুর মোটেই রক্ষিত হয় নাই, অথচ উহাতে এরূপ মধুর ও করুণরসের সংমিশ্রণ আছে যে, সচরাচর ভারতবর্ষীয় সুরে তাহা দুর্লভ। কিন্তু উহার মধুরতা অনেক সময়েই করতাল ও ঢক্কার অসমঞ্জস শব্দে নষ্ট হইয়া থাকে। এই সকল গানের সুরেই যে কেবল বিশেষত্ব আছে, তাহাই নহে; উহাদের ভাষারও কম বিশেষত্ব নাই। অনেকগুলি গান সম্ভবতঃ ইদানীন্তন-কালে রচিত—কিন্তু অপর কতকগুলি যে বাঙ্গালা ভাষার আদিযুগ হইতে প্রচলিত আছে, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই; এবং এই সকল গানের ভাষার, আধুনিক বাঙ্গালা অপেক্ষা তুলসী দাসের হিন্দীর সহিত অধিকতর সাদৃশ্য

আছে। প্রাচীন বাঙ্গালা ও প্রাচীন হিন্দীতে নিঃসন্দেহ অতি অল্পই পার্থক্য ছিল—বোধ হয়, মোটেই পার্থক্য ছিল না। মগধের গুপ্ত-সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পরে যে মহাবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, সেই বিপ্লবের সময়, অথবা ভারতবর্ষের ইতিহাসের অন্ধকারময় যুগের অন্যান্য বিপ্লবের সময় একই জাতি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হওয়ায় একই ভাষার উচ্চারণগত বিভিন্নতা ঘটে; তাহা হইতেই ভাষার বর্ত্তমান পার্থক্য ঘটিয়াছে।

এই বৈষ্ণব গীতিকাব্যভাণ্ডারের বিপুল সংগ্রহের সকল সঙ্গীতই যে উচ্চশ্রেণীর হইবে, ইহা আশা করা অসঙ্গত; এবং অনেকেরই মনে হইতে পারে যে, এই সংগ্রহের দশ ভাগের নয় ভাগ রচিত না হইলেও ক্ষতি ছিল না। কিন্তু অবশিষ্ট দশমাংশের মধ্যে যথার্থই দুর্ল্লভ রত্নের সন্ধান পাওয়া যায়, এবং ভাবের মাধুর্য্যে এগুলি বাঙ্গালা সাহিত্যে অপূর্ব্ব; এমন কি, বর্ত্তমান কালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিগণের রচনাও উহাদিগের সমকক্ষ নহে।

শ্রীচৈতন্য-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মই এই শ্রেণীর সাহিত্যের বিষয়। দ্বিতীয় যুগের সাহিত্য পৌরাণিক বিষয়ে পরিপূর্ণ। এই যুগের প্রধান গ্রন্থ, মহাভারত ও রামায়ণের বাঙ্গালা সংস্করণ। উহাদের সঙ্কলনকর্ত্তা কাশীদাস ও কৃত্তিবাস ভারতবর্ষের এই প্রাচীন মহাকাব্যদ্বয়ের কেবলমাত্র অনুবাদকর্ত্তা নহেন। তাঁহারা অনুবাদের হিসাবে সবিশেষ কৃতিত্বপ্রদর্শনের প্রয়াস পান নাই। কিন্তু অপর দিকে তাঁহারা অপ্রত্যাশিত সাফল্য লাভ করিয়া গিয়াছেন। এই মহাকাব্যদ্বয়ের মূল হইতে কেবলমাত্র আখ্যানবস্তু গ্রহণ করিয়া তাঁহারা তাঁহাদিগের কল্পনাশক্তিকে অব্যাহত গতি প্রদান করিয়াছেন, এবং অনেক স্থলেই মৌলিকতা দেখাইয়াছেন। আমরা এ কথা বলিতেছি না যে, তাঁহারা মূল অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কাব্যরচনা করিয়াছেন (যদি মূল সংস্কৃত কাব্যের বিপুল আয়তন সংক্ষিপ্ত করায় কিছু উৎকর্ষ সাধিত না হইয়া থাকে), তবে তাঁহারা যে সকল অতিরিক্ত বিষয় সংযোজিত করিয়াছেন, তাহাতে সংস্কৃত কবিগণের কল্পনার গাম্ভীর্য্য ক্ষুণ্ণ হইলেও, তাঁহাদিগকে মৌলিক গ্রন্থকারদিগের মধ্যে উচ্চ আসন প্রদান করিবে। মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী কবিকঙ্কণ যদিও কোনও সংস্কৃত কাব্যের অনুসরণ করেন নাই, তথাপি তিনি এই যুগেরই কবি, এবং কবিত্বহিসাবে ন্যায়তঃ কৃত্তিবাস ও কাশীদাস অপেক্ষা উচ্চতর সম্মান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তাঁহার প্রণীত কাব্যের অধিকাংশ স্থল মর্ম্মস্পর্শী ও সুন্দর। কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাঁহার রচনা হইতে কোনও অংশ উদ্ধার করিবার স্থান

নাই। এই সকল কবিদিগের ভাষায় হিন্দীর সংস্রব নাই, তথাপি উহা আধুনিক বাঙ্গালা হইতে অনেক বিভিন্ন। কবিত্বশক্তির হিসাবে তাঁহারা প্রধান বৈষ্ণব কবিগণের অপেক্ষা নিঃসংশয়ে নিকৃষ্টতর।

আমরা তৃতীয় যুগের যে সকল লেখকগণের রচনার আলোচনা করিব, তাঁহারা নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রের রাজত্বকালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আমাদের মতে, তাঁহারা অতিনিকৃষ্ট শ্রেণীর লেখক। কিন্তু তাঁহারা অনুচিত সুখ্যাতি লাভ করিয়া আসিতেছেন। ইঁহাদের মধ্যে ভারতচন্দ্র রায়ই সর্ব্বপ্রধান। ইনি সেদিন অবধি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী কবি বলিয়া বিবেচিত হইয়া আসিয়াছেন; কিন্তু এই *খ্যাতি একেবারে বিনষ্ট না হইলেও, এক্ষণে দিন দিন হ্রাসপ্রাপ্ত* হইতেছে। বিদ্যাসুন্দর ও অন্নদামঙ্গলের রচয়িতা বলিয়াই প্রধানতঃ ভারতচন্দ্রের খ্যাতি। এই দুই কাব্যের কোনটিতেই বিশেষ গুণ নাই। তবে এ কথা স্বীকর্ত্তব্য যে, মালিনী হীরার চরিত্রের তিনি যে অভব্য অথচ সতেজ ও সজীব চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, বাঙ্গালা সাহিত্যে তাহার তুলনা নাই। ভারতচন্দ্রের আর একটি প্রধান গুণ এই স্থলে স্বীকার করা কর্ত্তব্য, তিনি আধুনিক বাঙ্গালার জন্মদাতা। তাঁহার ছন্দও অতি সুললিত, এবং বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বর্ত্তমানকালের বহু প্রসিদ্ধ কবি ভারতচন্দ্রের ছন্দকে আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। উচ্চতর কবিত্বশক্তিতে ভারতচন্দ্র তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী অনেক কবি অপেক্ষা অনেকাংশে নিকৃষ্ট। তাঁহার রচনা স্থানে স্থানে অতিশয় অশ্লীলতাদোষ-দুষ্ট, এবং এই জন্য যে সময়ে বাঙ্গালা সাহিত্যের পাঠক কেবলমাত্র পুরুষজাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে, সেই সময়ে তাঁহার গ্রন্থাবলী পুনঃপ্রকাশিত হওয়া অবিধেয় বলিয়া বোধ হয়।

নবদ্বীপের কবিদিগের পরবর্ত্তী যুগে এবং বর্ত্তমান যুগের অব্যবহিত পূর্ব্বে যে সকল বাঙ্গালী লেখকের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাঁহাদের সময়ে সাহিত্যের যে দুর্দ্দশা হইয়াছিল, বোধ হয় সাহিত্যের ইতিহাসে উহার আর তুলনা নাই। এই যুগে, 'নববাবুবিলাস' ও 'প্রবোধচন্দ্রিকার' যুগে—পাঠ্য পুস্তকের (যে হিসাবে ভারতচন্দ্রের কাব্য পাঠ্য, সে হিসাবেও) একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হয়;—সাহিত্যিক আবর্জ্জনার এরূপ বিপুল সম্ভার আর কখনও দৃষ্ট হয় নাই। সৌভাগ্যবশতঃ এই আবর্জ্জনার স্তূপ এক্ষণে সাধারণের দৃষ্টিপথ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে।

যে গান গতযুগের ধনী হিন্দুদিগের অতিশয় প্রিয় ছিল, এবং যাহার জন্য

তাঁহারা প্রভূত অর্থব্যয় করিতেন, এই সময়েই সেই প্রসিদ্ধ 'কবির গানে'র সৃষ্টি হয়। 'কবির গান' কতকগুলি গানের সমষ্টি। গানগুলির মধ্যে সর্ব্বত্র সংযোগ থাকিত না, এবং দুইটি বিপক্ষ দলের গায়কগণ কর্ত্তৃক গীত হইত। প্রত্যেকেই বিপক্ষদলের নিন্দা করিত, এবং এই নিন্দাবাদ যতই কটু হইত, নিন্দাকারী ততই প্রশংসাভাজন ও শ্রোতৃবর্গ ততই আনন্দিত হইতেন; সচরাচর এই সকল গান এরূপ জঘন্যভাবে গীত হইত যে, তাহা সঙ্গীত নামের বাচ্য নহে। যদিও কোনও কোনও স্থানে গানের সুর অতি মিষ্ট ও মধুর, গানের বিষয় প্রায়ই সামান্য কথা, অথবা কষ্টকল্পিত অতিরঞ্জিত কথায় পরিপূর্ণ—যদিও রাম বসু, হরুঠাকুর ও নিতাই দাসের কতকগুলি গানে কিছু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সৌন্দর্য্য আছে। বর্ত্তমানকাল জনসাধারণের অতি প্রিয় একটি সঙ্গীত নিম্নে উদ্ধৃত হইল। উহাকে 'নবোঢ়া পত্নীর বিলাপ' বলা যাইতে পারে। যে প্রেম কি তাহা জানিয়াছে, অথচ লজ্জায় যাহার মুখে বাক্য সরে না, এরূপ বাঙ্গালী বালিকা বধূকে যিনি জানেন, তিনিই উহার মাধুর্য্য উপভোগ করিতে সমর্থ হইবেন।

'একে আমার এ যৌবন কাল, তাহে কাল বসন্ত এল,
এ সময়ে প্রাণনাথ প্রবাসে গেল।
হাসি হাসি যখন সে আসি বলে,
সে আসি শুনিয়া ভাসি নয়নজলে।
তারে পারি কি ছেড়ে দিতে, মন চায় ফিরাইতে,
লজ্জা বলে ছি ছি ছুঁইও না।'

আমরা উৎকৃষ্টতর সঙ্গীত উদ্ধৃত না করিয়া এই সঙ্গীতটিই উদ্ধৃত করিলাম। তাহার কারণ এই যে, উহাই আজি কালি বাঙ্গালী জনসাধারণের বিশেষ প্রিয়।

বাঙ্গালা সাহিত্যের বর্ত্তমান অবস্থার পর্য্যালোচনা করিবার পূর্ব্বে আমরা আর এক জন লেখক সম্বন্ধে কিছু বলিব। তিনি স্বয়ংই একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীর। আমরা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কথা বলিতেছি। তিনি অতীত ও বর্ত্তমান যুগের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান আছেন, এবং তিনি তাঁহার সময়ের সাহিত্যিক দৈন্য, এবং শেষ কয়েক বৎসরের মধ্যে সংসাধিত উন্নতির প্রকৃষ্ট নিদর্শনস্বরূপ। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মৃত্যুর পর দ্বাদশ বর্ষও অতিক্রান্ত হয় নাই; তথাপি আমরা তাঁহাকে এক অতীত যুগের কবি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকি। ইহার কারণ এই যে, বর্ত্তমান কালের প্রসিদ্ধ লেখকগণের রচনা-পদ্ধতির সহিত তাঁহার রচনা-পদ্ধতির অনেক পার্থক্য আছে।

তিনি এক জন অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি জ্ঞানহীন ও অশিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তাঁহার মাতৃভাষা ভিন্ন আর কোনও ভাষা জানিতেন না, এবং তাঁহার মতও অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ও কুসংস্কারপূর্ণ ছিল; তথাপি বিংশ বৎসরের অধিককাল ব্যাপিয়া তিনিই বাঙ্গালীজাতির সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় লেখক ছিলেন; ব্যঙ্গ ও রহস্যপূর্ণ কবিতার রচনায় তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন, এবং এই গুণেই তিনি কি কবি, কি সম্পাদক, উভয় রূপেই সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার আর কোনও উল্লেখযোগ্য গুণ ছিল না। সুকবির শ্রেষ্ঠতর গুণগুলি তাঁহাতে বর্ত্তমান ছিল না এবং তাঁহার রচনা অত্যন্ত গ্রাম্য ও অসংস্কৃত। তাঁহার রচনাদি অধিকাংশ স্থলে জঘন্য অশ্লীলতায় কলঙ্কিত। অফুরন্ত অনুপ্রাস এবং অপূর্ব্ব শব্দালঙ্কারের ছটাই তাঁহার লোকরঞ্জক হইবার প্রধান কারণ। যে যুগে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ন্যায় নিকৃষ্ট কবিও লোকনয়নে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া প্রতিভাত হইতেন, সে যুগের লোকের সাহিত্যবিষয়ক রুচি ও বিচারবুদ্ধি যে কিরূপ ছিল, তাহা দেখাইবার উদ্দেশ্যেই আমরা এই স্থলে তাঁহার কবিত্বের আলোচনা করিলাম। তিনি যে তাঁহার সমসাময়িক বাঙ্গালী লেখকদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন, এ কথা অস্বীকার করাও যায় না; কারণ, তাঁহার কিছু প্রতিভা ছিল, অপর লেখকদিগের কিছুই ছিল না। বাঙ্গালা সাহিত্যের দৈন্যের জন্য আমরা যতই দুঃখ করি না কেন, গত পনেরো বৎসরে উহা যথেষ্ট উন্নতি ও আশার সূচনা করিয়াছে। এই অল্পকালমধ্যে অন্ততঃপক্ষে এমন দ্বাদশ জন লেখকের আবির্ভাব হইয়াছে, যাঁহারা প্রত্যেকেই, সুলেখকের যে সকল সদ্‌গুণ থাকা উচিত, সেই সকল সদ্‌গুণে বিভূষিত, এবং তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা লোকরঞ্জক—এই লেখক (ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত) অপেক্ষা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ।

ইহা আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হইতে পারে যে, এই অক্ষম ও কুরুচিসম্পন্ন লেখক আধুনিক ব্রাহ্মদিগের অগ্রদূতস্বরূপ ছিলেন। অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ ভাব প্রধানতঃ তাঁহার কাব্যেই পরিলক্ষিত হয়। তাঁহার গদ্যরচনা সাধারণতঃ এই উভয় দোষ হইতে বিমুক্ত, এবং অধিকাংশ স্থলে ধর্ম্ম ও সুনীতির পক্ষসমর্থক। তিনি যে ব্রাহ্মভাবাপন্ন ছিলেন, তাহা প্রদর্শিত করিবার জন্য 'হিতপ্রভাকরে'র গদ্যাংশ হইতে কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, তিনি অশিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন, তথাপি প্রাচীন ভারতবর্ষের দর্শনশাস্ত্রাদির প্রধান মতবাদগুলির সহিত য পরিচিত ছিলেন, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কোনও কারণ নাই। কারণ,

তাঁহার ন্যায় অল্পশিক্ষিত সেকালের অনেক বাঙ্গালীই এই সকল মতবাদের সহিত পরিচিত ছিলেন। এই শ্রেণীর বাঙ্গালী দিন দিন হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে।

"হে নাথ! তুমি যে, এক কি পদার্থ, নিশ্চিতরূপে তাহা নিরূপণ করেন এমত ব্যক্তি এই মানবমণ্ডলে কাহাকেই দেখিতে পাই না। তুমি অরূপ, স্বরূপ, কিরূপ? আমি তদ্বিশেষ কিরূপে জানিতে পারিব?—তোমাকে তুমি আপনিই জান কি, না, তাহাও কেহ জানিতে পারেন না।—কারণ কোনমতেই ইহা জানিবার বিষয় নহে।—তোমাকে "তুমি" এই বচন ভিন্ন আর কি বচনে ডাকিব? আর কি বলিব?—তোমাকে নির্গুণ বলিব? সগুণ বলিব? তোমাকে নিষ্ক্রিয় কহিব? কি সক্রিয় কহিব?—তোমাকে অকর্ত্তা কহিব? কি কর্ত্তা কহিব? তোমাকে বহুবিধ বিশেষণবিশিষ্ট কহিব? কি বিশেষণবিহীন কহিব? তোমাকে অসঙ্গ কহিব? কি সসঙ্গ কহিব?—কি কহিব? কি কহিব? তোমাকে কি কহিব?—ইহার সার কথাটি আমাকে কে কহিবে?—কি প্রকারেই বা নিশ্চিত নিদর্শন প্রদর্শন হইবে? কেন না দর্শন তোমার দর্শন পান নাই, শাস্ত্র সকলের মধ্যে পরস্পর বিষমতর বিবাদ দেখিতেছি, এক শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত একরূপ, অপর এক শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত আর একরূপ। * * * যাহার যতদূর পর্য্যন্ত জ্ঞানের সীমা, তিনি ততদূর পর্য্যন্তই নিরূপণ করিয়াছেন, কিন্তু তুমি, যে, কি এক অনির্ব্বচনীয় পদার্থ, তাহা কখনই বচনীয় হইবার নহে, এবং তুমি, যতদূর রহিয়াছ ততদূর পর্য্যন্ত কেহই বোধনেত্র বিস্তার করিতে পারেন না।

"হে বস্তু! এই, যে 'আমি', আমি আমি করিতেছি, এই 'আমি'টি কি? যখন তাহাই জানিতে পারি নাই, তখন আমি 'নিজবোধনেত্রবিহীন' হইয়া তোমাকে জানিব ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?—এই 'আমি' কে?—আমি আমাকে কেনই বা আমি বলি?—এবং এই আমাকে এই 'আমি' কে বলায়?—আমি, যে 'আমি' বলি, এ বলের কি আমিই বলী?—না 'তুমি' বল? তুমিই 'বলী'? বল বল, এই 'আমি' বলিবার বল, কাহার বল?—আমার বল? কি তোমার বল?—এই কথাটি কে বলে?—এ কথাটি কে বলে?—আমি বলি? কি তুমি বল? তাহাই বল।

আমার এই দেহপরিগ্রহ কেন হইল?—আমিই কি এই দেহ?—না আমার এই দেহ?—আমি দেহধর্ম্মে আক্রান্ত হইয়া কেন দেহী হইলাম?—এই দেহে

আমার 'আমি বোধ'ই বা কেন হইল ?—এই শরীরটিই বা কি ?—এই শরীর-মধ্যে শরীরিরূপে আমিই বা কি ?—আমি এই শরীরে এই 'আমি' অধুনা যেরূপ আমিই রহিয়াছি, এই আমি কি এই 'আমিত্ব' প্রথম পাইলাম ?"

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের নাম এখন বিস্মৃতিসাগরে নিমগ্ন হইতেছে, তাঁহাকে যাঁহারা আসনচ্যুত করিয়াছেন, আমরা সেই সকল লেখকগণের রচনার আলোচনা করিব। কিন্তু উহা করিবার পূর্ব্বে বাঙ্গালা সাহিত্যের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে স্থূলভাবে কয়েকটি কথা বলিব।

ক্রমশঃ।

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ।

মহীশূর-ভ্রমণ।

বিগত ১২ই শ্রাবণ শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময় বাড়ী হইতে রওনা হইয়া যথাসময়ে ষ্টেশনে আসিয়া পঁহুছিলাম। মহীশূর রাজ্য মান্দ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত, এবং মহীশূরে আসিতে হইলে ভারতের উত্তর-পূর্ব্বাঞ্চলের যাত্রীদিগকে বেঙ্গল-নাগপুর-রেলে মান্দ্রাজ পর্য্যন্ত আসিতে হয়। অতঃপর গাড়ী বদল করিয়া সাউথ-মারাট্টা-ও-মান্দ্রাজ রেলে ব্যাঙ্গালোর পর্য্যন্ত আসিতে হয়। পুনরায় সেখানে গাড়ী বদল করিয়া শেষোক্ত রেলের অন্য গাড়ীতে উঠিয়া কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মহীশূরে আসা যায়। আমি বাড়ী হইতে হাবড়ায় বেঙ্গল-নাগপুর রেলে আসিয়া মান্দ্রাজের টিকিট ক্রয় করিলাম এবং মালপত্র লইয়া গাড়ীতে উঠিলাম। হাবড়া হইতে মহীশূর পর্য্যন্ত একবারে টিকিট করিতে পারা যায়। কিন্তু আমার ইচ্ছা ছিল যে, পথে কোনও কোনও বড় স্থানে এবং মান্দ্রাজে কয়েক দিন কাটাইয়া মহীশূরে যাত্রা করিব। এই জন্য একবারে টিকিট করি নাই। কলিকাতা হইতে মান্দ্রাজ ১০৩২ মাইল। মান্দ্রাজ হইতে ব্যাঙ্গালোর ২১৯ মাইল; এবং ব্যাঙ্গালোর হইতে মহীশূর ৮৬ মাইল। ফলতঃ কলিকাতা বা হাবড়া হইতে মহীশূর ১৩৩৭ মাইল। হাবড়া হইতে মান্দ্রাজের ১ম, ২য়, মধ্য ও ৩য় শ্রেণীর ভাড়া যথাক্রমে ৯১/১০, ৪৪।০, ২০৷৶১০, ১৩/১০ (মেলে ৩য় শ্রেণীর ভাড়া ১৪৸৵১০)। মান্দ্রাজ হইতে ব্যাঙ্গালোরের ১ম, ২য়, ৩য় শ্রেণীর ভাড়া যথাক্রমে ১৩৷৶০, ৬৸৵০, ২৸৵১০। তৃতীয় শ্রেণী (যাত্রী গাড়ীতে) ১৷১০ আনা। অতঃপর ব্যাঙ্গালোর হইতে মহীশূর উক্ত তিন শ্রেণীর ভাড়া যথাক্রমে ২৷৶০, ১৷৵০, ৷৵১০। মান্দ্রাজ-ও-সাউথ-মারাট্টা (M. S. M.) লাইনে মধ্য শ্রেণী

নাই ; তবে মেল-ট্রেণে তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী থাকে। কিন্তু যাত্রী গাড়ীতে তৃতীয় শ্রেণীর যাহা ভাড়া, মেলট্রেণের তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া তাহা অপেক্ষা কিছু বেশী।

কলিকাতা হইতে যখন গাড়ী ছাড়িল, তখন গাড়ী লোকে পূর্ণ, কটক ষ্টেশনে কতকগুলি বাঙ্গালী বাবু নামিয়া গেলেন। পুরীযাত্রিগণ খুড়দা-রোড ষ্টেশনে নামিয়া গেলেন। এইখানে বাঙ্গালীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হইল। গাড়ীতে আর বাঙ্গালী নাই। কেবল কয়েকটী হাইদ্রাবাদ-যাত্রী মুসলমান ও মান্দ্রাজী হিন্দু ছিল। গাড়ীতে আরাম করিয়া আসিতে পারিয়াছিলাম।—পথে স্থানে স্থানে ডাব, চা, কফি, কদলী পাওয়া যায়। ষ্টেশনে যে সকল মিষ্টান্নাদি বিক্রীত হয়, তাহা অতি জঘন্য।

খুড়দা হইতে প্রাতে ৫টার সময় গাড়ী ছাড়িল। তখন বেশ সকাল হইয়াছে সঙ্গে 'Brenhardf and Creation' নামক যে বইখানি ছিল, তাহাই পড়িতে-ছিলাম। মধ্যে মধ্যে গাড়ী হইতে মুখ বাড়াইয়া পার্শ্ববর্ত্তী দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। বেলা প্রায় ৮টার সময় লাইনের পূর্ব্বভাগে সুদীর্ঘ জলাশয় দেখা গেল। তিন চারি মিনিটের পর মনে হইল যে, ইহাই সেই চিল্কা হ্রদ। পার্শ্ববর্ত্তী যাত্রীদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, আমার অনুমান সত্য। জলাশয়টী সুদীর্ঘ ও সুপ্রশস্ত, স্থানে স্থানে দ্বীপসদৃশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডাঙ্গা, তাহাতে গাছ আছে। মধ্যে মধ্যে ছোট নৌকাও দেখা গেল। চিল্কা-হ্রদ বঙ্গোপসাগরের একটা খাঁড়ি, এবং ভারতবর্ষের উপদ্বীপাংশের পূর্ব্ব-উপকূলমধ্যে অবস্থিত। বঙ্গোপ-সাগরের জলে উহা পুষ্ট হইয়া থাকে। জলরাশি চঞ্চল নহে, স্থির। চিল্কা-হ্রদ উড়িষ্যার অন্তর্গত। বাঙ্গালা ও উড়িষ্যা অতিক্রম করিয়া মান্দ্রাজে প্রবেশ করিলাম। ষ্টেশনে ও গাড়ীতে মান্দ্রাজী দেখিতে পাইলাম। ওড়িয়াদিগের সহিত ভাষা ও আচার ব্যবহারে আমাদের অনেক বিষয়ে মিল আছে। কারণ, উড়িষ্যায় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্থান বলিয়া বহু বাঙ্গালী দীর্ঘকাল হইতে তথায় যাতায়াত করিয়া আসিতেছে, এবং বাঙ্গালা দেশেও অনেক ওড়িয়া যাতায়াত করে। অনেক ওড়িয়া বাঙ্গালাদেশের নানা স্থানে,—বিশেষতঃ কলিকাতায় নানাবিধ কাজে নিযুক্ত আছে। অনেক বাঙ্গালীও কর্ম্মোপলক্ষে উড়িষ্যায় বাস করিতেছেন। এজন্য ওড়িয়াদিগের সহিত বাঙ্গালীর সৌহৃদ্য আছে। উড়িষ্যার মধ্যে কয়েকটী স্থানে আমি গিয়াছি, এবং স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ও মধ্যবিত্ত অনেক ভদ্রলোকের সহিত মিশিবার সুযোগ পাইয়াছি। তাহাতেই দেখিয়াছি, ইঁহারা বাঙ্গালীর সঙ্গে যেমন মিশিতে পারেন, অপর কোনও জাতির সহিত তেমন নয়।

অথচ উড়িষ্যাকে বাঙ্গালার অঙ্গ হইতে কাটিয়া লইয়া বেহারের সহিত জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে!

গঞ্জাম হইতে যত দক্ষিণে আসিতে লাগিলাম, ততই ওড়িয়ার সংখ্যা কমিতে ও মান্দ্রাজীর সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। মনে হইল, গঞ্জামই উড়িষ্যা ও মান্দ্রাজের সমন্বয়-স্থল। এখান হইতে ওড়িয়া ও মান্দ্রাজীকে এক জাতি মনে হইতে লাগিল। কিন্তু মান্দ্রাজীদিগের কাপড় পরিধান করিবার রীতি অন্যরূপ। সাধারণ মান্দ্রাজীগণ কাছা দিয়া কাপড় পরে না। আবার যে সকল মান্দ্রাজী কাছা দিয়া কাপড় পরে, তাহাদিগের কাছার একটা খুঁট ঝুলিতে থাকে; তাহাতেই তাহাদিগকে মান্দ্রাজী বলিয়া চিনিতে পারা যায়। মান্দ্রাজীগণ স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় খোঁপা করিয়া কেশবিন্যাস করে; আবার অনেকে খোঁপায় ফুল ব্যবহার করে। মান্দ্রাজী স্ত্রীলোকেরা সাধারণতঃ কাছা দিয়া কাপড় পরে; কিন্তু এমন করিয়া অঞ্চলের ফেরতা দেয় যে, কাছা প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। কাচাকোঁচা দেখিয়া স্ত্রী পুরুষ নির্ণীত হয় না। স্ত্রীলোকগণ প্রায় ঘোমটা দেয় না। উহাদিগের বেণী পৃষ্ঠে দোদুল্যমান থাকে।

মান্দ্রাজ প্রদেশে ট্রেণ ষ্টেশনে প্রবেশ করিলে কোনও কোনও ষ্টেশন হইতে গাড়ীর মধ্যে দুই এক জন লোক উঠিয়া পড়ে, এবং ষ্টেশন হইতে গাড়ী ছাড়িলে গীত গায়িতে থাকে। আবার অন্য ষ্টেশনে গিয়া নামিয়া পড়ে। এইরূপ মান্দ্রাজ পর্য্যন্ত অনেক স্থানে গাড়ীর মধ্যে বালক বালিকা ও বয়স্ক পুরুষ রমণী পাওয়া গিয়াছিল। ইহারা বেশ গান করে। বালকবালিকাদিগের গান বড় মিষ্ট লাগিয়াছিল। গীত শেষ হইলে তাহারা যাত্রীদিগের সম্মুখস্থ হয়—অনেকেই একটা আধটা পয়সা দেয়। প্রথম প্রথম ইহাদিগের গীত বেশ লাগিয়াছিল, আহ্লাদের সহিত সকলে পয়সাও দিয়াছিল। কিন্তু পুনঃ পুনঃ এইরূপ হইতে থাকায় লোকের আর ভাল লাগিল না; সুতরাং পরবর্ত্তী গায়কগায়িকাগণ বেশী পয়সা পায় নাই। অভিনবত্ব হ্রাস হইলে এইরূপই হয়।

শনিবার অপরাহ্ণ প্রায় তিনটার সময় ওয়াল্টেয়ার ষ্টেশনে ট্রেণ আসিয়া পঁহুছিল। এখানে প্রায় আধ ঘণ্টা গাড়ী থামে। ভিজাগাপটম যাইতে হইলে এইখানে নামিয়া পুনরায় অন্য লাইনের গাড়ীতে উঠিতে হয়। ওয়াল্টেয়ার ষ্টেশনে ট্রেণ অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে জানিয়া প্লাটফরমে নামিয়া পারিপার্শ্বিক দৃশ্যটা একবার দেখিয়া লইলাম। মনোরম বটে, স্থানটী সমুচ্চ পাহাড়ে পরিবৃত। এইথান হইতে মান্দ্রাজ পর্য্যন্ত পথিপার্শ্বে বিস্তর ছোট বড় পাহাড় দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল।

মান্দ্রাজের চারিটী ষ্টেশন আছে—১ম মান্দ্রাজ (বীচ জংশন); ২য়, এগমোর; ৩য়—রায়পুরম্; ৪র্থ, সেণ্ট্রাল ষ্টেশন। বড় বড় সহরে একাধিক ষ্টেশন থাকায় অনেক সুবিধা আছে। দুঃখের বিষয়, কলিকাতার ন্যায় রাজধানীতে ই-বি-রেলের সে বন্দোবস্ত নাই। কলিকাতার পরেই একবারে দমদম ষ্টেশন; দক্ষিণে আর ষ্টেশন নাই। আমার বোধ হয়, দমদম ও শিয়ালদহের মধ্যবর্ত্তী কোনও স্থানে একটী ষ্টেশন করিলে উত্তর-কলিকাতাবাসীর যেরূপ সুবিধা হয়, শিয়ালদহ হইতে ভবানীপুর বা কালীঘাট পর্য্যন্ত ঐ লাইনটী প্রসারিত করিয়া মধ্যে মধ্যে আরও দুই একটা ষ্টেশন করিলে, দক্ষিণ-কলিকাতাবাসীর, বিশেষতঃ বালিগঞ্জ টালীগঞ্জ প্রভৃতির সাহেব-পল্লীর সেইরূপ সুবিধা হয়।

কলিকাতা হইতে যে গাড়ীতে মান্দ্রাজে আসিলাম, তাহার পরমায়ু মান্দ্রাজেই শেষ। সে গাড়ী আর অন্যত্র যায় না। অগত্যা সকল যাত্রীই মান্দ্রাজের ভিন্ন ভিন্ন ষ্টেশনে নামিতে বাধ্য হইল। গাড়ী আসিয়া ষ্টেশনে লাগিবামাত্র দলে দলে কুলী আসিয়া যাত্রীদিগের শরণাপন্ন হইল। এখানকার সকল কুলীই মান্দ্রাজী; মান্দ্রাজী কুলী ও গাড়োয়ানেরা দুই চারিটী ইংরেজী কথা কহিতে ও বুঝিতে পারে। ষ্টেশনে আসিয়া, আমার কুলী, আমি কোথায় যাইব, জিজ্ঞাসা করিল। কিন্তু কি বলিল, তাহা ঠিক বুঝিলাম না। কিন্তু আমি বলিলাম, "Bangalore train।" কুলী বুঝিয়া লইল যে, আমি ব্যাঙ্গালোরে যাইব। অতঃপর সে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজীতে বলিল যে, ব্যাঙ্গালোর ট্রেণ ছাড়িতে প্রায় তিন ঘণ্টা বিলম্ব আছে। সুতরাং আমি আর তাড়াতাড়ি না করিয়া কুলীর সঙ্গে ব্যাঙ্গালোর লাইনের প্লাটফরমে আসিয়া মালপত্র কুলীর জিম্মায় রাখিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। ষ্টেশনটী বেশ পরিচ্ছন্ন সুদৃশ্য; লালবর্ণের চূড়াবিশিষ্ট। তাহাতে ঘড়ী আছে। রাস্তায় বাহির হইয়া দেখিলাম, ইলেক্‌ট্রিক ট্রাম চলিতেছে। মোটর, বাইকও দলে দলে দৌড়িতেছে। সাধারণের ব্যবহার্য্য অশ্বপরিচালিত ছত্তরীসমন্বিত দুই চাকার গাড়ী, যাহা এ দেশে ঝট্‌কা নামে পরিচিত, তাহারও সংখ্যা যথেষ্ট। এখানকার ট্রামগাড়ী কলিকাতার মত নহে। লাইন সরু, গাড়ীও ছোট, কিন্তু যাত্রিপূর্ণ।

বেলা হইয়াছে! খাবারের দোকানের অন্বেষণ করিতেছি, এমন সময় টিকিট-ঘরের নিকটস্থ হইলাম। এখানে একটী মান্দ্রাজী ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করিলাম 'কখন টিকিট পাওয়া যাইবে?' তদুত্তরে তিনি বলিলেন, 'টিকিটের অনেক বিলম্ব আছে।' আমি যে বিদেশী, তাহা আমার চেহারা দেখিয়াই বুঝিয়াছিলেন।

আমি ধুতি পিরান উড়ানি পরিহিত, আবার চরণদ্বয় পাদুকামণ্ডিত, 'শিরপেঁচ-কল্কা'-বিরহিত। এ দেশে অনাবৃতমস্তক কাহাকেও দেখা যায় না। সাধারণতঃ এ দেশে জুতারও ব্যবহার নাই। ক্ষুদ্রবৃহন্নির্ব্বিশেষে সকলের মস্তকই হয় পাগড়ী, নয় টুপি দ্বারা আবৃত, কিন্তু পনর আনার অধিক নগ্নপদ—ইহা এদেশের চাল। উড়িষ্যা, কটক, পুরী প্রভৃতির অধিবাসিগণও সাধারণতঃ নগ্নপদ। যাহা হউক, আমার বাঙ্গালীবেশ দেখিয়া আমাকে তিনি বাঙ্গালী বলিয়া বুঝিয়াছিলেন কি না, জানি না। তবে আমি যে দাক্ষিণাত্যবাসী নহি, তাহা বুঝিয়াছিলেন। সেই জন্য তিনি আমার পরিচয় জানিয়া লইলেন, এবং আমি কলিকাতা হইতে আসিতেছি শুনিয়া, আমার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া বলিলেন যে, 'বোধ হয় আপনার কাল দিনরাত্রি ও আজ এখনও পর্য্যন্ত আহার হয় নাই।' আমি তাহা স্বীকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম যে, নিকটে কোনও স্থানে আহারাদির ব্যবস্থা আছে কি না? উত্তরে শুনিলাম যে, 'ষ্টেশনের অদূরে একটী মান্দ্রাজী ব্রাহ্মণের হোটেল আছে, তাহা কেবল ব্রাহ্মণদিগের জন্য।' তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমি ব্রাহ্মণ কি না?' আমি বলিলাম, 'ব্রাহ্মণ নহি, কায়স্থ।' আমি কায়স্থ—এ কথা দ্বারা তিনি কিছু বুঝিতে পারিলেন না; তবে ব্রাহ্মণ নহি, শুনিয়া তিনি হয় ত ভাবিয়া লইলেন, আমি কোনও অস্পৃশ্য-জাতীয়। তখন আমি বলিলাম যে, 'আমি ক্ষত্রিয়।' তখন সেই ভদ্রলোক একটা লোক সঙ্গে দিয়া আমাকে হোটেলে পাঠাইয়া দিলেন। হোটেলের ভিতর প্রবেশ করিয়া আঙ্গিনার নিকটস্থ হইলে, একটী ব্রাহ্মণ আমার পরিচয়াদি লইবার উপক্রম করিতেছিল; আমার সঙ্গী চাপরাশী তাহাকে তেলিগু ভাষায় কি বলিল। অতঃপর দ্বারস্থ ব্যক্তি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া পথ ছাড়িয়া দিল, এবং অভ্যর্থনা করিয়া একটী গৃহে বসিতে বলিল। ২।৩ মিনিট পরেই এক জন ব্রাহ্মণ আসিয়া আমাকে একটী গৃহে আহারে বসিতে বলিল। এইখানে বলিয়া রাখি—আমি প্রথম শ্রেণীর ঘরে বসিলাম। বসিবার স্থানে ইতিপূর্ব্বেই আসন, কদলীপত্র ও জলপূর্ণ গেলাস দেওয়া ছিল। বসিবামাত্র একটী পাচক ব্রাহ্মণ পরিবেশন করিতে আসিল। ব্রাহ্মণের মস্তকে অবিন্যস্ত কবরী, ললাট চন্দনলিপ্ত। প্রথমেই অন্ন আসিল, সঙ্গে সঙ্গে অন্য একজন ব্রাহ্মণ ঘৃত ও কয়েক রকম তরকারী দিয়া গেল। সাত রকম তরকারী ছিল। সকল তরকারীই নূতন রকমের। আস্বাদ হয় টক, নয় বেজায় ঝাল। পরিচিত ব্যঞ্জনের মধ্যে কেবল অড়হর ডাল। বাঙ্গালী মানুষ, চব্বিশ ঘণ্টার অধিককাল—শনিবার পুরা ও রবিবার সকাল পর্য্যন্ত উদরে অন্ন নাই, প্রাণটা টা-টা করিতেছিল! সুতরাং

ঝাল বা টকের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া গো-গ্রাসে আহারে প্রবৃত্ত হইলাম। যতই ক্ষুন্নিবৃত্তি হইতে লাগিল, ততই ঝালের প্রকোপ হাড়ে হাড়ে হৃদয়ঙ্গম হইতে লাগিল। কিন্তু কোনও ব্যঞ্জনের প্রতি হতাদর নাই, সুশীল বালকের ন্যায় 'যাহা পায় তাহাই খায়'রূপে আহার শেষ করিলাম। আসিবার সময় যথাস্থানে চারি আনা দিয়া পুনরায় ষ্টেশনে ফিরিয়া আসিলাম।

ষ্টেশনে ফিরিয়া সেই বুকিং-ক্লার্কের ঘরে গেলাম। বুকিং-ক্লার্ক মিঃ চেটী আমাকে সংবর্দ্ধনাপূর্ব্বক আসন দিয়া কথোপকথন করিতে লাগিলেন। তখনও গাড়ী ছাড়িবার এক ঘণ্টা বিলম্ব ছিল। সুতরাং অনেকক্ষণ গল্পগুজবে কাটিল। এইবার আমি মান্দ্রাজ হইতে মহীশূরের টিকিট কিনিয়া গাড়ীতে উঠিলাম। ট্রেণে তখন আদৌ লোকসমাগম হয় নাই। গাড়ীতে উঠিয়া জিনিসপত্র গুছাইয়া আরাম করিয়া বসিয়া আছি, এমন সময়ে এক জন মান্দ্রাজী নাপিত আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'Sir Shaving ?' উত্তরে সম্মতি জ্ঞাপন করিলে সে গাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া আপনার 'তোড়-যোড়' খুলিয়া আমাকে 'হাজাম' করিতে বসিল। 'হাজাম' শেষ হইলে আমি তাহাকে একটী আনী দিলাম। সে তাহাতে অস্বীকৃত হইয়া কহিল, 'Station two annas, Sir.' আমি বলিলাম 'no, one anna'। সে তখন ঈষৎ বিরক্তিসহকারে বলিল, 'one anna, one side sir'। তাহার উত্তর শুনিয়া মনে মনে হাসিলাম, এবং 'all right, all right' বলিয়া আর একটি আনী দিয়া তাহাকে বিদায় করিলাম। সে চলিয়া গেলে ভাবিলাম যে, নাপিত জাতি চিরদিনই ধূর্ত্ত হইয়া থাকে, অপিচ রসিকও বটে। বাঙ্গালার নাপিতেরা বড় কম রসিক নহে। বাঙ্গালায় ছাঁদলাতলায় বাঙ্গালী পরামাণিকেরা অনেক রকম ছড়া কাটায়, অনেক বোল-চাল চালায়, ছাঁদলাতলায় ছড়া-কাটান পরামাণিকদের একটা কর্ত্তব্য কর্ম্মমধ্যে গণ্য, ইহা তাহাদিগের পুরুষানুক্রমিক অধিকার বা previlege.

বেলা একটার সময় ব্যাঙ্গালোরের গাড়ী ছাড়িল। এক্ষণে যে লাইনে যাত্রা করিলাম, তাহা সরু লাইন বা Narrow gauge। গাড়ীগুলি ছোট, কিন্তু অধিকাংশই 'বগি' গাড়ী। মান্দ্রাজ হইতে যখন গাড়ী ছাড়িল, তখন গাড়ী লোকে পূর্ণ। ভদ্রলোক ছোটলোক, স্ত্রীলোক ও পুরুষ—সব একসঙ্গে। মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, চেটীর পরামর্শে দ্বিধা না করিয়া একবারেই তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট লইয়া ভাল করি নাই। মনে মনে স্থির করিলাম, ২।১টী ষ্টেশনের পরে অতিরিক্ত ভাড়া দিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাইব। কয়েক ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া গার্ডকে বলিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে উঠিলাম। উঠিলাম বটে, কিন্তু অতি কষ্টে সমস্ত রাত্রি কাটাইতে

হইয়াছিল। একে ত দ্বিতীয় শ্রেণীতে স্থানের অপ্রাচুর্য্য ; তাহার পর যাহারা পূর্ব্বাহ্লে স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইয়াছিল, তাহারাই সমগ্র স্থান অধিকার করিয়া রাখিয়াছিল। গাড়ীর মধ্যে যে ঝোলা থাকে, তাহাও তাঁহাদিগের মালপত্রে ঠাসা। আমি নিরুপায় হইয়া গাড়ীর পা-দানী বা ফ্লোরে শয্যা পাতিয়া লইলাম। এই অবস্থায় ব্যাঙ্গালোর অবধি আসিলাম। স্থানাভাবে পথে অত্যন্ত কষ্টভোগ করিয়া রাত্রি কিঞ্চিদধিক দশটার সময় ব্যাঙ্গালোরে পঁহুছিলাম। পুনরায় গাড়ী বদল করিয়া ব্যাঙ্গালোর নজনগড় লাইনের গাড়ীতে উঠিলাম। ইহাই শেষ বদল। এই লাইনের শেষে মহীশূর ষ্টেশন।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে।

মাসিক সাহিত্য-সমালোচনা।

অর্ঘ্য। পৌষ।—'নানা কথা' উপভোগ্য। লেখক অগ্রহায়ণের 'ভারতী'র 'চ্যুত কমল' ছবিখানির সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

'প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে এদেশে 'অশ্লীলতা-নিবারণী-সভা'র প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। এই সভার উদ্যোগী ছিলেন, তদানীন্তন ব্রাহ্মসমাজের বড় বড় মুরব্বীরা ; কাগজে কলমে ও বক্তৃতায় তাঁহারা সুরুচি ও শ্লীলতার প্রচার করিতেন। তাঁহাদেরই বংশধরেরা আজ তাঁহাদেরই কাগজে তাঁহাদের সেই মহৎ উদ্দেশ্যের মস্তকে পদাঘাত করিতেছেন। 'প্রবাসী' থিয়েটারের নাম শুনিলে এখনও মূর্চ্ছা যান ; গিরিশ ঘোষের নাম মুখে আনিতে 'প্রবাসী' সঙ্কোচ বোধ করেন, কিন্তু 'ভারতী'র এই বেয়াদবি, নির্লজ্জতা নির্ব্বিবাদে হজম করিতেছেন।' 'চ্যুত কমল' সম্বন্ধে 'নায়কে' যাহা লিখিয়াছিলাম, লেখক তাহাও উদ্ধৃত করিয়াছেন। আমরাও উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—'কলমে যাহা প্রকাশ পায়, সেই অশ্লীলই কি অশ্লীল ? তুলিতে যাহা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হয়, এবং সাক্ষর ও নিরক্ষর সকলেরই চোখের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া সর্ব্বনাশ করে, তাহা কি ? অশ্লীল না সুশ্লীল ? এমন ছবির খেউড় সুরুচি, না কুরুচি ? সচল না অচল ? ইহা ঠাকুরবাড়ীর গায়ে আঁকা হইলেও ভদ্রসমাজের দর্শনযোগ্য কি না ? নারী-সমাজকে তাহা দেখাইয়া মনুষ্যসমাজে থাকা চলে কি না ? এমন সাংঘাতিক কলা-কৌশলের ফেরি পয়সা আনিতে পারে। কিন্তু তাহা সাবাস-যোগ্য, না চাবুকের যোগ্য ?' বাঙ্গালায় লোক-মতের ছায়া আছে, কায়া নাই। নতুবা শীলতার হত্যা ভদ্রসমাজে সম্ভব হইত না।' পৌষের 'অর্ঘ্যে'র প্রধান উপাদান,—স্বর্গীয় মনীষী ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের 'বঙ্কিমচন্দ্রের কথা।' বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার সমালোচনা—পূজ্য ঠাকুরদাস বাবুর জীবনের সাধ ছিল। বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য, তাঁহার সে সাধ পূর্ণ হইল না। সাহিত্য-জীবনের প্রথম প্রভাতে ঠাকুরদাস বাবু 'সাহিত্য-মঙ্গল' নামক ক্ষুদ্র পুস্তকে কেশবচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার তুলনামূলক সমালোচনায় স্বয়ং অপূর্ব্ব সমালোচনী প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি বীজ বপন করিয়াছিলেন ; পাট

করিবার, ফসল ফলাইবার অবকাশ পাইলেন না। এ দুঃখ রাখিবার স্থান নাই। শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর 'সুন্দর-দর্শনে' উপভোগ্য। শ্রীচৈতন্যচরণ বড়ালের 'নূতন বৌ'কে ছাপার কালী মাথাইয়া সম্পাদক কি আনন্দ, কি কৌতুক, কি সুখ উপভোগ করিয়াছেন, তাহা বলিতে পারি না। ভাষা ও ভাবের বিশুদ্ধি-রক্ষায় যে পত্রের এত আগ্রহ, সে পত্রে 'বৎসরেক' প্রভৃতি শোভা পায় না। 'ভবঘুরের চিঠি' একটু পান্সে হইয়াছে। কিন্তু জাপানী পত্রে রবীন্দ্রনাথের আধুনিক রাজনীতিক অভিমতের যে সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে, সম্পাদক 'জাপান ম্যাগাজিন' হইতে তাহার একটু আভাস দিয়াছেন। আমরা 'সাহিত্যে'র পাঠকদের জন্য সেই জাপানী মন্তব্য উদ্ধৃত করিলাম। 'In the pages of the *Yomiuri* Mr. Iwano addresses an open letter to the great Indian poet Sir Robindra Nath Tagore, recently visiting Japan, in which he undertakes to express some frank opinions respecting the Poet's criticism of Japan's worship of materialism. Quoting the old Japanese proverb, that "Good medicine is bitter to the mouth," Mr. Iwano goes on to assure the poet that Japanese are in no mood to take such advice as the poet has been offering them. The poet reminds him of one who has spent his life among hermits and the struggling portion of humanity. The poet's condemnation of material civilization seems to Mr. Iwano a misunderstanding of things spiritual. To the poet material civilization appears to have complicated life over-much, an idea that possessed the old-fashioned *samurai* of Japan after the Meiji Restoration. The notion that oriental life should cherish pantheism, and believe everything has life, is too antiquated for a modern people like the Japanese. It is no wonder that India is not an independent nation, if most of the people there hold to ideas like Tagore. Japan can never accept a philosophy which lays more stress on the development of individualism than on the evolution of the state. The impossible idealism of the poems of Tagore is an obstacle to modern progress.'

'In the *Shinjin* the famous congregational pastor, Dr. Danjo's Ebina, also takes Tagore to task for his misunderstanding of Japan. To attempt to classify Japan with India, thinks Dr. Ebina, is a mistake, for Japan is to be classed only with such countries as Britain, Germany and France; that is, with modern nations. These nations imported Greek, Roman and Christian civilization which they modified to suit their national purposes, and thus have continued to flourish while the founders of former civilizations have passed away. Japan imported Indian, Chinese and other religions and civilizations, and she is now importing and assimilating western religions and civilizations, while European countries are, in turn, importing something of good from oriental civilizations. There is now a happy tendency among nations to coalesce. The thought that oriental civilization may revive to supplant all others is but the wildest of the day-dreams. No national mind can suppress

that the west will ever abandon its civilization for that of the orient. The poet evidently does not understand why such civilization as those of Assyria, Babylon, Greece and Rome have gone to ruin, while the nations that have hit upon a happy blending of the material and spiritual in life have prospered more and more. While Japan admires and reverence the poet for his great ability and noble character, she can never afford to be led by his attitude to modern science and civilization, lest she find herself in the place of India. Japan has secured her position in the modern world by adopting a very opposite policy suggested by the Indian poet.'— *The Japan Magazine. October. 1916.*

রবীন্দ্রনাথ গাল বাড়াইয়া শুধু নিজে চড় খান নাই; ভারতবর্ষকেও তাহার অংশ দিয়াছেন! 'নোবেল প্রাইজে'র সঙ্গে এটাও অবশ্য পরিপাক না করিলে চলিবে না।

যোগবল। অগ্রহায়ণ, পৌষ। মনীষী, চিন্তাশীল, শাস্ত্রদর্শী কবিরাজ শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত কবিভূষণ গত বর্ষে এই নূতন পত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। 'যোগবলে' ধর্ম্মতত্ত্ব ও প্রাচ্য বিজ্ঞান ও আয়ুর্ব্বেদের আলোচনা হয়। 'গতি' নামক একটি প্রবন্ধেই এই সংখ্যা পূর্ণ হইয়াছে। এই সন্দর্ভ পণ্ডিত্যের পরিচায়ক; বিশেষবিৎ ও সাধারণ পাঠক, উভয়েরই অনুশীলনের যোগ্য। 'যোগবল' সার্থক হউক, ইহাই আমাদের কামনা।

সুবর্ণবণিক-সমাচার। পৌষ। ইহাও নূতন পত্র; 'কলিকাতা সুবর্ণবণিক-সমাজের কর্ত্তৃত্বাধীনে পরিচালিত'। প্রথমেই শ্রীমৎ উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের একখানি ছবি আছে। তাহার পর মাসিক পত্রের পেঁচো—'কাব্যি'! সূতিকাগারেই এই সর্ব্বনাশ! শ্রীরামচন্দ্র সেন কবিতায় 'প্রার্থনা' করিয়াছেন। ইনি কখনও 'অক্ষয় বড়াল' হইতে পারিবেন না, তাহা আমরা অনায়াসে ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারি। শ্রীবিমলাচরণ লাহা 'সুবর্ণবণিক জাতির বর্ণনির্ণয়' করিতেছেন। সাম্প্রদায়িক মত ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইলে আমরা সুখী হইব। তবে প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণবে ডুব দিয়া বাঙ্গালার কোনও কোনও জাতি যেরূপ রত্ন তুলিয়াছেন, আশা করি, বিমলাচরণের ভাগ্যে তাহা ঘটিবে না। শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল স্বজাতির পত্রে 'আজ' শীর্ষক একটি সুন্দর সনেট-কমল অর্পণ করিয়াছেন।—

কত দিন পরে আজ—কত দিন পরে,
সে স্মৃতি-কুহকে চিত চমকে আবার!
বিশীর্ণ কল্পনা-ফল্গু, কি উচ্ছ্বাস-ভরে,
ছুটিছে কল্লোলি' আজ প্লাবি' পারাপার!
সে চির-মিলন-আশা, দূর বনান্তরে,
মাধবী-বাসর-কুঞ্জ রচিছে আমার!
জাগিছে সে প্রেম-স্বপ্ন নব-কলেবরে,—
তরল জ্যোৎস্নায় হেরি' তোমার আকার!
ঘুমায়ে পড়েছে দূরে জগৎ সংসার,—
পত্রে পুষ্পে সমাবৃত, মলয়-নিঃশ্বাসে
বিমূঢ় হৃদয় ভাবে,—কোথা ভাষা তার!
কি দিয়া নবীন পিক বসন্তে সম্ভাষে?
জানি,—কি বলিতে চাই; জানি না,—কি বলি!
ক্ষম' এই অক্ষমতা;—সত্যে নাহি ছলি!

'সরোজা' গল্পেও বিশেষত্ব নাই; শ্রীনিতাইচাঁদ শীলের কবিতাও তথৈব চ। শীল-কবি লিখিয়াছেন,—

'শ্মশানে ফুটে না ভাষা! নয়নের জল
মানে না বারণ তাই ঝরে অবিরল।'

সুবর্ণবণিক সমাজ ত শ্মশান নয়, সে যে অলকা। সেই অলকার মণিসোপান-মণ্ডিত-বাপী-বক্ষে তোমাদের—আমাদের অক্ষয়—কমল ফুটিয়াছে! তোমার নয়নের জল অবিরল ঝরিবার কারণ,—কুস্তী করিয়া তোমাকে চরণ মিলাইতে হইয়াছে। এমন ব্যাপারে সকলেরই 'নাকের জলে চোখের জলে' হয়। তোমার ভাগ্য ভাল, তাই শুধু চোখের জলের উপর দিয়াই এ ফাঁড়া কাটিয়া গিয়াছে। শ্রীহৃষীকেশ মল্লিক আর এক জন কবি। ইনি সমুদ্র ও বেলার 'কথা-কাটাকাটি'র ছড়া লিখিয়াছেন। এ সব ছড়া অচল। কেন অনর্থক এ পণ্ড-শ্রম। 'শুন প্রাণ বেলা' শুনিলে জ্বর আসে। অথচ, কবিবর কত নিশি জাগিয়া এই মস্ত ভাবটাকে 'কাব্যি'র আকার দিয়াছেন! কবিতাকে ম্যালেরিয়া করিয়া তুলিয়া লাভ কি? বরং তাহাকে তোমাদের সাতগাঁয়ে পাঠাইয়া দাও, তাহাকেই ম্যালেরিয়া ধরুক। যদি অক্কা পায়, বাঙ্গালা সাহিত্য নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিবে। শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা স্বসমাজে অতিসঙ্ক্ষেপে' আদর্শ-পরিবর্ত্তনে'র পরামর্শ দিয়াছেন। উত্তম। কিন্তু কবিতা-লেখা যেন 'সুবর্ণবণিক সমাজে'র কল্যাণে সুবর্ণবণিক লেখকগণের পেশা না হইয়া পড়ে। নরেন্দ্রনাথ আদর্শে এটা উজ্জ্বল করিয়া দিলেন না কেন? নরেন্দ্রনাথের মত আদর্শ থাকিতেও সুবর্ণবণিক শিক্ষানবিশগণ 'অক্ষয় বড়াল' হইবার জন্য এত লালায়িত হইলেন কেন? চেষ্টায় সব হয়, হইতে পারে, কিন্তু অক্ষয় বড়াল হয় না। তিনি বিধাতার দান।

নরত্বং দুর্লভং লোকে বিদ্যা তত্র সুদুর্লভা।
কবিত্বং দুর্লভং তত্র শক্তি স্তত্র সুদুর্লভা।

ইহা ধ্রুব সত্য, সার সত্য। শ্রীরসময় লাহার 'বাঙ্গালী পল্টন' নামক কবিতাটি উল্লেখযোগ্য। কিন্তু কবিতাটি পৌষের 'মালঞ্চে'ও ছাপা হইয়াছে। রসময় পরম 'বৈষ্ণব', বাবাজীর মত চেহারা; কারও বাড়ীতে জলগ্রহণ করেন না। কিন্তু 'এক', মুর্গি দুই দরগায় জবাই করিলেন! 'মজার আমেজে' মজার গন্ধ নাই।—'সুবর্ণবণিক-সমাচার' কমলবিলাসী সাহিত্যের দলে নাম না লেখাইলে আমরা সুখী হইব। কাগজখানিতে যাহাতে সার পড়ে, উদ্যোগীরা তাহার ব্যবস্থা করুন। যাঁহারা লক্ষ্মীর প্রসাদে ধন্য, তাঁহারা ভারতীর প্রসাদও লাভ করুন; তাঁহাদের মধ্যে শত অক্ষয়, সহস্র নরেন্দ্র আবির্ভূত হউন, ইহাই আমাদের আন্তরিক আশীর্ব্বাদ।

উপাসনা। পৌষ। 'আলোচনী' এখন প্রবন্ধে পরিণত হইয়াছে। 'উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ' এ সংখ্যার আলোচ্য। 'ভাব্‌বার কথায়' হিতবাদ আছে। কিন্তু গুছাইয়া বলিবার চেষ্টা নাই। যা মনে আসিবে, তাই লিখিব, এবং তাই ছাপিব কি না, তাও 'ভাব্‌বার কথা' বটে। একেই ত ভাল কথা কানে তুলিবার এ কাল নহে। তাহার উপর চিন্তার হাঁড়ী হইতে আধ-সিদ্ধ ভাত নামাইয়া পাঠক তাড়াইয়া লাভ কি? শ্রীকালিদাস রায়ের 'অযোগ্য' সাহিত্যের অযোগ্য হইলেও, তাঁহার শূকরীর মত বহুপ্রসবিনী প্রতিভার অযোগ্য হয় নাই। 'ভারতীয় ভক্তিতত্ত্বে'র বক্তব্য এত বহু যে, 'একোহহম্ বহু স্যাম্' মনে পড়ে! শ্রীবিনয়কুমার সরকারের 'আমেরিকার সভ্যতা' সুখপাঠ্য নিবন্ধ, নানা তথ্যে পূর্ণ। বিনয় বাবু ইউরোপ, আমেরিকা, মিশর, চীন ও জাপান প্রভৃতি দেশ হইতে বাঙ্গালীর জন্য নানা তত্ত্ব আহরণ করিয়া জাতির কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন। শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় 'টিপ্পনীতে 'ভাষায় বিপ্লববাদে'র

আলোচনা করিয়াছেন। লেখক পুরাতন ধারার সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু 'চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী।' যাহারা আমাদের সমাজ, তন্ত্র, ধর্ম্ম, ধারা,—নীতি ও রুচি, কিছুরই শাসন মানে না, তাহারা ব্যাকরণ ও অভিধানের প্রভুতা স্বীকার করিবে কেন? শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'করুণা' দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি! 'হন্ত মাতঃ কুমারলক্ষণস্যাপি পুত্রঃ!'—ইহার নায়ক-নায়িকাও মিলনকুঞ্জে কলা খাইবে কি না, তাহা অবশ্য দ্রষ্টব্য।

গম্ভীরা। পৌষ। 'বিবিধ প্রসঙ্গের 'আমাদের কর্ম্মযোগ' বাঙ্গালীকে পড়িতে বলি। কিন্তু প্রসঙ্গও প্রবন্ধ হইয়া উঠিতেছে। বাজে কথা বাদ দিলে আরও সংযত, সুতরাং অধিকতর সার্থক হইতে পারিত। 'আরবের বাণী' উল্লেখযোগ্য। 'পাশ্চাত্য কর্ম্মবিজ্ঞানের সংক্ষিপ্ত পরিচয়' যেমন মনোহারী, তেমনই হিতকারী। 'গম্ভীরা'য় এইরূপ প্রবন্ধের আধিক্য বাঞ্ছনীয়। 'জর্ম্মনী ও বর্ত্তমান যুদ্ধ' যুদ্ধের পরও বোধ হয় বহুদিন চলিবে। এত স্বল্পমাত্রায় ছাপিলে, এ শ্রেণীর প্রবন্ধ নিষ্ফল হয়।—ভাষার লেখকের আদৌ দৃষ্টি নাই। 'বলাৎকার করিয়াই যদি জগতে উন্নতি লাভ করিতে হয়'—শুধু অপপ্রয়োগ নহে, অসহ বটে, অমার্জ্জনীয়ও বটে। কবিতাগুলি সব রাবিশ। কাহাকে ফেলিয়া, কাহাকে চটাইয়া—কাহার আদর করিব?

স্বাস্থ্য-সমাচার। পৌষ।—'অজীর্ণতা' সময়োপযোগী ও নানাবিধ তথ্যে পরিপূর্ণ। সহজ ভাষায় লেখা। সকলে পড়িয়া বুঝিতে পারিবে। কারণ জানিলে সাবধান হইবার অবকাশ ঘটে। লেখক মহাশয় পাঠককে কারণগুলি বুঝাইয়া দিয়াছেন। অব্যাহতিলাভের পথ আছে। এখন ইচ্ছা হইলে হয়। ইচ্ছাই আমাদের হয় না; মামুলী অভ্যাস যে আমরা ছাড়িতে পারি না। নূতন অভ্যাসের আয়াসকে বাঘ ভাবিয়াই যে আমরা সর্ব্বনাশের পথ প্রশস্ত করিতেছি। শ্রীবিমলেন্দু মিত্রের 'পল্লীকথা'ও বাঙ্গালীর অবশ্যপাঠ্য;—তাঁহার উপদেশ গ্রামবাসীরা শিরোধার্য্য করিলে, বাঙ্গালী বাঁচিতে পারে। শ্রীবেণীমাধব দের 'দেশীয় পথ্য ও মুষ্টিযোগ' গৃহস্থের উপকারে আসিবে।

দ্রষ্টব্য।—ধানাইদহ লিপির প্রতিলিপির ব্লক যথেষ্ট সময় থাকিতে প্রস্তুত করিতে দিয়াও যথাসময়ে পাই নাই। এই জন্য পৌষের 'সাহিত্যে' দিতে পারি নাই। এই সংখ্যায় প্রকাশিত হইল। অধ্যাপক বসাক মহাশয় ও পাঠকবর্গের নিকট এ জন্য আমি ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

সম্পাদক।

বরেন্দ্র-খনন-বিবরণ।

পাষাণ-পরিচয়—স্থাপত্য-রীতি।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে চীনদেশের তীর্থ-যাত্রী ইয়নচুয়ঙ্গ আমাদের দেশে অনেক অট্টালিকা দেখিয়া গিয়াছিলেন। তাহার পর, পাল-সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়ে, একটি দীর্ঘকালব্যাপী স্থাপত্য-প্রবণ গঠন-যুগের আবির্ভাব হইয়াছিল। সে যুগে "কুলভূধর-কক্ষতুল্য" অনেক অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাহার পরবর্ত্তী ও মুসলমান শাসনের পূর্ব্ববর্ত্তী সেন-রাজগণের শাসন-সময়েও অনেক অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাম্রশাসনে, শিলালিপিতে, সমসাময়িক গ্রন্থে ইহার কিছু কিছু সমাচার প্রাপ্ত হওয়া যায়। সে সকল অট্টালিকার একটিও এখন পূর্ব্বাবস্থায় বর্ত্তমান নাই; এখন কেবল অনেক অট্টালিকার ধ্বংসাবশিষ্ট ইষ্টক-প্রস্তর অনেক স্থান আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে।

এই সকল অট্টালিকা বর্ত্তমান থাকিলে, বঙ্গভূমি কেবল "সুজলা সুফলা মলয়জ-শীতলা শস্য-শ্যামলা" বলিয়াই কীর্ত্তিত হইত না। তাহা কাব্য-সৌন্দর্য্যের উপভোগ্য নিদর্শন,—দেশের পক্ষে বিধাতার আশীর্ব্বাদ-প্রসূত নৈসর্গিক সৌভাগ্য-বিলাস;—কিন্তু মানব-চেষ্টার পরিচয়-বিজ্ঞাপক ঐতিহাসিক অবদান-নিদর্শন নহে। স্থাপত্য-কীর্ত্তি বর্ত্তমান থাকিলে, তাহা দেশের লোকের পুরুষকারের পরিচয় প্রদান করিতে পারিত। যে দেশ পর্ব্বতশূন্য নদীবহুল সমতল ক্ষেত্র, সে দেশের পাষাণ-প্রাসাদ দেশের লোকের আত্মচেষ্টার অভ্রান্ত নিদর্শন বলিয়াই প্রতিভাত হইত। তাহা যখন বর্ত্তমান নাই, তখন তাহার ধ্বংসাবশিষ্ট পাষাণ-খণ্ডও উপেক্ষণীয় নহে। তাহা যেমন পুরাতন শিল্প-সুষমার লুপ্তাবশিষ্ট শেষ নিদর্শন, সেইরূপ ইতিহাসের উদ্ধারসাধনের অপরিহার্য্য শেষ অবলম্বন।

যে বাহু এখন রোগাতুর বলিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে, ইহাতে তাহার স্বাস্থ্যসুলভ অধ্যবসায়পূর্ণ অমিত বলের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়;—যে চিত্ত এখন পূর্ত্তকর্ম্মনিষ্ঠা বিস্মৃত হইয়া, দিন দিন অধিক আত্মম্ভরী হইয়া উঠিতেছে, ইহাতে তাহার স্বার্থসম্পর্কশূন্য অকাতর আত্মত্যাগের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়;—যে কুশাগ্রবুদ্ধি এখন সংকীর্ণতার ক্ষুদ্র গণ্ডী ক্ষুদ্রতর করিয়া, মানব-

স্বভাবসুলভ উচ্চাকাঙ্ক্ষার শেষ নিঃশ্বাস চিররুদ্ধ করিবার আয়োজন করিতেছে, ইহাতে তাহার অসীম অভ্যুদয়লালসার স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তির সন্ধান লাভ করা যায়।

বাঙ্গালীর পূর্ব্বকাহিনীকে রাজ-বংশের উত্থান-পতনের কাহিনীমাত্র মনে করিয়া, ইতিহাস-সঙ্কলনের আয়োজন করিতে হইলেও, এই সকল পাষাণ-খণ্ডের প্রতি সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা প্রদর্শন করা যায় না;—বাঙ্গালীর সার্ব্বজনীন সুখ-দুঃখের,—আশা-আকাঙ্ক্ষার,—শিক্ষা-দীক্ষার প্রকৃত ইতিহাস-সঙ্কলনের আয়োজন করিতে হইলে, ইহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করা অসম্ভব। সে কালের বাঙ্গালীর প্রকৃত পরিচয় লাভ করিতে হইলে, পাষাণ-পরিচয় উদ্‌ঘাটিত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে;—তাহা আধুনা বিস্মৃত, অপরিজ্ঞাত, উপেক্ষিত;—কিন্তু তাহা চিরস্মরণীয় হইবার উপযুক্ত।

উড়িষ্যার কথা পৃথক্। তথায় এখনও অনেক অট্টালিকা অক্ষত-কলেবরে দণ্ডায়মান থাকিয়া, সেকালের নরসিংহগণের বিপুল অভ্যুদয়ের পরিচয়-প্রদানে তাহাদের জন্মভূমির মুখ উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। উড়িষ্যার দুই চারিটি স্থানে যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, বাঙ্গালার অনেক স্থানেই যে সেইরূপ অনেক অট্টালিকা দেখিতে পাওয়া যাইত, বরেন্দ্রভূমির অসংখ্য ভগ্নস্তূপ তাহার আভাস প্রদান করিতে পারে। এই সকল ভগ্নস্তূপের খননকার্য্য দূরে থাকুক, ইহাদের অবস্থান-বিবরণও সঙ্কলিত হয় নাই। কত অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ এখনও ভূগর্ভে নিহিত হইয়া রহিয়াছে, তাহার সংখ্যামাত্রও সম্পূর্ণরূপে নির্ণীত হইতে পারে নাই। বরেন্দ্রভূমির অধিবাসিবর্গের নিকটি তাহার পুরাকীর্ত্তি-নিদর্শন এইরূপে অবিজ্ঞাত হইয়া রহিয়াছে;—মানবস্বভাবসুলভ কৌতূহল পর্য্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে!

এই সকল পুরাতন অট্টালিকার স্থাপত্য-রীতি কিরূপ ছিল, তাহা জানিবার প্রকৃষ্ট উপায় খনন-কার্য্য। তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবামাত্র বুঝিতে পারা যায়,—সকল বিষয়ের মূলসূত্র সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তেই একরূপ ছিল;—স্থাপত্যরীতির মূল সূত্রেও তাহার ব্যতিচার দেখিতে পাওয়া যাইত না। প্রদেশবিশেষের অট্টালিকার বাহ্য-বিকাশে শিল্প-প্রতিভার যাহা কিছু পার্থক্য লক্ষিত হইত; তাহাতে স্থাপত্য-রীতির মূলসূত্র বিচ্ছিন্ন হইত না। সুতরাং সকল স্থানের প্রাদেশিক স্থাপত্য-রীতি একটি মূলরীতির শাখা বলিয়াই কথিত হইবার যোগ্য। গৌড়ীয় স্থাপত্য-রীতি সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তব্যাপী মূল স্থাপত্য-রীতির এইরূপ একটি

শাখা ;—উৎকলের স্থাপত্যরীতিও এইরূপ একটী শাখামাত্র। তাহা প্রাচ্য ভারতের একটি বিশিষ্ট গঠন-যুগের আবির্ভাবে পাল-সাম্রাজ্যের প্রভাব-ক্ষেত্রের মধ্যেই পুষ্টিলাভ করিয়াছিল ;—পূর্ব্বতন গুহা-শিল্পের অবশ্যম্ভাবী ক্রম-বিকাশ-রূপে ক্রমশঃ অভিব্যক্ত হয় নাই। গুহা-শিল্পের রচনা-যুগের পরে, এবং মন্দির-শিল্পের রচনা-যুগের পূর্ব্বে, প্রায় সহস্রাধিক বর্ষ অতীত হইয়া গিয়াছিল। এই দীর্ঘকালব্যাপী যুগ-ব্যবধান-মধ্যে উৎকলের কোনও স্থানে কোনও উল্লেখযোগ্য অট্টালিকা নির্ম্মিত হইবার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এখন যে সকল দেব-মন্দির উড়িষ্যার অলঙ্কার, তাহা পাল-সাম্রাজ্যের গঠন-যুগের নিদর্শন। তজ্জন্যই বরেন্দ্রভূমির ধ্বংসাবশেষনিহিত পাষাণখণ্ডের স্থাপত্য-রীতির সঙ্গে উড়িষ্যার স্থাপত্য-রীতির মূলপ্রকৃতিগত অপ্রচ্ছন্ন সাদৃশ্য বর্ত্তমান থাকা দেখিতে পাওয়া যায়।

বাস্তুশাস্ত্র।

যে শাস্ত্রে এই সকল পূর্ব্বতন অট্টালিকার স্থাপত্য-রীতির ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে, তাহার নাম বাস্তুশাস্ত্র। অনুশীলনের অভাবে তাহার অধ্যয়ন অধ্যাপনা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এই শাস্ত্রের অসম্যক্ জ্ঞান লইয়া ধ্বংসাবশিষ্ট পাষাণখণ্ডের সম্যক্ পরিচয় প্রাপ্ত হইবার আশা করা যাইতে পারে না। এই কারণে আমাদের সাহিত্যে পুরাবস্তুতত্ত্ব এখনও সমুচিত সমাদর লাভ করিতে পারে নাই। পুরাবস্তু-সংগ্রহকারকগণ এখনও অনেকের নিকট "ভারবাহী" (!) বলিয়া উপহাস লাভ করিয়া থাকেন! আমাদের এই অজ্ঞতা-সুলভ উপহাস-স্পৃহা বিজ্ঞতার কঞ্চুকে আবৃত থাকিয়া, এখনও আমাদের রসসাহিত্যলোলুপ রচনা-বিলাসকে রসসিক্ত করিয়া রাখিয়াছে! সুতরাং আমাদের সাহিত্যে ইষ্টক ইষ্টক, প্রস্তর প্রস্তর ;—তাহার অভ্যন্তরে যে উন্মাদনা-পূর্ণ মানব-প্রাণের অনির্ব্বচনীয় স্পন্দন অনুভূত হইতে পারে, তাহা অবিজ্ঞাত, অবজ্ঞাত,—ক্বচিৎ বা উপহসিত নগণ্য ব্যাপার!

মন্বত্রি-বিষ্ণু-হারীতাদি ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রযোজকগণের নাম বিলুপ্ত হয় নাই। কিন্তু বাস্তুশাস্ত্রোপদেশকগণের নাম অপরিচিত হইয়া পড়িয়াছে। এক সময়ে তাঁহাদিগের নামও সর্ব্বত্র সুপরিচিত ছিল। মৎস্যপুরাণে [২৫৩ অধ্যায়ে] তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা,—

"ভৃগুরত্রির্বশিষ্ঠশ্চ বিশ্বকর্ম্মা ময় স্তথা।
নারদো নগ্নজিচ্চৈব বিশালাক্ষঃ পুরন্দরঃ।

ব্রহ্মা কুমারো নন্দীশঃ শৌনকো গর্গ এব চ।
বাসুদেবোঽনিরুদ্ধশ্চ তথা শুক্রবৃহস্পতী।
অষ্টাদশৈতে বিখ্যাতা বাস্তুশাস্ত্রোপদেশকাঃ॥"

এক শ্রেণীর গ্রন্থে এই সকল বাস্তুশাস্ত্রোপদেশকের মধ্যে ব্রহ্মাই মূল উপদেশক বলিয়া কীর্ত্তিত হইতেন। তাঁহার কোনও গ্রন্থের সন্ধান লাভ করা যায় না। ব্রহ্মা হইতে মুনিপরম্পরাক্রমে বাস্তুজ্ঞান আগত হইয়াছিল বলিয়া, অনেক দিন পর্য্যন্ত একটি জনশ্রুতি প্রচলিত ছিল। বরাহ-মিহির [বৃহৎ-সংহিতায় ৫২ অধ্যায়ে] তাহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। যথা,—

"বাস্তুজ্ঞান মথাতঃ কমলভবা ন্মুনিপরম্পরায়াতম্।"

বরাহ-মিহিরের গ্রন্থে পুরাণোক্ত অষ্টাদশ বাস্তুশাস্ত্রোপদেশকদিগের মধ্যে গর্গের নাম বিশেষভাবে উল্লিখিত আছে। গর্গ যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছিলেন, বরাহ-মিহিরের গ্রন্থে তাহাই সংক্ষিপ্তভাবে [সমাসাৎ] সঙ্কলিত হইয়াছিল। এই সংক্ষিপ্তসারের টীকাকার ভট্টোৎপল বশিষ্ঠ-ময়-নগ্নজিতের নামের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ইঁহারা পূর্ব্বতন আচার্য্য। ইঁহাদিগের সঙ্গে সঙ্গেই বাস্তুশাস্ত্রের আলোচনা নিরস্ত হয় নাই। রামরাজ-কৃত হিন্দু-স্থাপত্যবিদ্যার সুলিখিত নিবন্ধে আরও অনেক বাস্তুবিদ্যা-গ্রন্থের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তন্মধ্যে মানসার, কশ্যপ, বৈখানস, সকলাধিকার, সনৎকুমার, সারস্বত্য ও পঞ্চরাত্র বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহার কোনও কোনও গ্রন্থের লুপ্তাবশিষ্ট পাণ্ডুলিপি এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত পুরাণ-তন্ত্রাদিতেও বাস্তুবিদ্যার অনেক বিবরণ উল্লিখিত আছে।

বিশ্বকর্ম্মার নাম জনশ্রুতিতে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার পূজা এখনও বিলুপ্ত হইতে পারে নাই। যাহারা যে কোনরূপ শিল্পকর্ম্মে জীবিকার্জ্জন করে, তাহারা সকলেই নিতান্তপক্ষে বৎসরান্তে একবার বিশ্বকর্ম্মার পূজা করিয়া থাকে। প্রতিষ্ঠাকার্য্যে এখনও শিল্পীকে সাক্ষাৎ বিশ্বকর্ম্মা মনে করিয়া সংবর্দ্ধনা করিবার ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। রামরাজ "বিশ্বকর্ম্মীয়" নামক একখানি গ্রন্থের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। উহা এখনও মুদ্রিত হয় নাই। কিন্তু "বিশ্বকর্ম্ম-প্রকাশ" নামক আর একখানি গ্রন্থ একাধিকবার মুদ্রিত হইয়াছে। বিশ্বকর্ম্মা কিরূপে বাস্তুজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, এই গ্রন্থের আরম্ভে তাহা উল্লিখিত আছে। যথা,—

"প্রবক্ষ্যামি মুনিশ্রেষ্ঠ শৃণুষ্বৈকাগ্রমানসঃ।
যদুক্তং শম্ভুনা পূর্ব্বং বাস্তুশাস্ত্রং পুরাতনম্॥

পরাশরঃ প্রাহ বৃহদ্রথায় বৃহদ্রথঃ প্রাহ চ বিশ্বকর্ম্মণে।
স বিশ্বকর্ম্মা জগতাং হিতায় প্রোবাচ শাস্ত্রং বহুভেদযুক্তম্।"

এই বর্ণনায় জানিতে পারা যায়,—বিশ্বকর্ম্মাও বাস্তুশাস্ত্রের উদ্‌ভাবয়িতা ছিলেন না। বাস্তুজ্ঞান প্রথমে শম্ভু কর্ত্তৃক প্রচারিত হইয়াছিল। তাহার পর কালক্রমে পরাশর বৃহদ্রথকে, এবং বৃহদ্রথ বিশ্বকর্ম্মাকে বাস্তুজ্ঞান দান করায়, বিশ্বকর্ম্মা জগতের হিতসাধন-কামনায় বহুভেদযুক্ত বাস্তুশাস্ত্রের রচনা করিয়াছিলেন। পুরাতন স্থাপত্য-কীর্ত্তির প্রকৃত পরিচয় লাভ করিতে হইলে, বাস্তু-শাস্ত্রের সাহায্যে পাষাণ-পরিচয় উদ্‌ঘাটিত করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। মাহিসন্তোষের ধ্বংসাবশেষ-খননসময়ে সে বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইয়াছিল। সে চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে সফল না হইলেও, তাহার আংশিক ফলও উল্লেখযোগ্য।

যে সকল পাষাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে স্তম্ভগুলি অপেক্ষাকৃত অক্ষত-কলেবরে অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় মস্‌জেদ-নির্ম্মাণে ব্যবহৃত হইয়াছিল;—অন্যান্য পাষাণ কাটিয়া ছাঁটিয়া মস্‌জেদ-নির্ম্মাণের উপযোগী করা হইয়াছিল বলিয়া তাহাদের পূর্ব্বাবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। তজ্জন্য স্তম্ভের কথাই সর্ব্বাগ্রে আলোচিত হইবার যোগ্য।

ভারতবর্ষের নানাস্থানে বহুসংখ্যক পাষাণ-স্তম্ভ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল স্তম্ভ প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে;—কতকগুলি অট্টালিকার সহিত সম্পর্কশূন্য; কতকগুলি অট্টালিকার অঙ্গীভূত। যেগুলি অট্টালিকার অঙ্গীভূত, তাহাও দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে;—কতকগুলি ভিত্তির সঙ্গে সম্পর্কশূন্য; কতকগুলি ভিত্তির অঙ্গীভূত।

অট্টালিকার সহিত সম্পর্কশূন্য পাষাণ-স্তম্ভ একটিমাত্রই এক স্থানে স্বতন্ত্রভাবে সংস্থাপিত হইবার উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত হইত। তাহার উপর অট্টালিকার কোনও অংশের ভার ন্যস্ত হইত না। অশোকস্তম্ভ, গরুড়স্তম্ভ, অরুণস্তম্ভ প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহাদের পারিভাষিক নাম স্তম্ভ নহে,—"ধ্বজ"। হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্রে "একস্তম্ভো ধ্বজো জ্ঞেয়ঃ" বলিয়া তাহা উল্লিখিত আছে। এই সকল স্তম্ভ যতই বৃহৎ হউক, অখণ্ড প্রস্তরখণ্ডে নির্ম্মিত হইত। গঠন-ব্যবস্থার মান-সামঞ্জস্যে এই শ্রেণীর স্তম্ভ শিল্প-সুষমার আধার বলিয়াই সুপরিচিত। ইহাতে সাজসজ্জার অধিক আড়ম্বর না থাকিলেও, ইহার গাম্ভীর্য্যই ইহাকে সৌন্দর্য্য দান করিত। সুনীলদিগ্‌বলয়বিন্যস্ত প্রশান্ত

প্রচ্ছদ-পটের সম্মুখভাগে দণ্ডায়মান থাকিয়া, এই শ্রেণীর সমুন্নত স্তম্ভগুলি সেকালের গৌরবস্তম্ভ-রূপেই প্রতিভাত হইত। মাহিসন্তোষের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এই শ্রেণীর একটি স্তম্ভও আবিষ্কৃত হয় নাই। যে সকল স্তম্ভ আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেগুলি অট্টালিকার অঙ্গীভূত ছিল। তন্মধ্যে যেগুলি ভিত্তির সঙ্গে সম্পর্ক-শূন্য ভাবে ব্যবহৃত হইবার উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল, সেগুলিও অখণ্ড প্রস্তর-খণ্ডে নির্ম্মিত। এই সকল স্তম্ভ নানা স্থান হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল বলিয়া, উপাদানে, আয়তনে, শিল্প-রীতিতে পার্থক্য-পূর্ণ। ইহাদের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে, স্তম্ভব্যবহার-রীতির আলোচনা আবশ্যক।

সেকালের দেবালয়ের যে প্রকোষ্ঠে শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাপিত হইত, তাহার পারিভাষিক নাম 'গর্ভ'। তাহার গঠন-ব্যবস্থা ভিত্তি-মূলক ছিল; স্তম্ভ-মূলক ছিল না। তাহার সম্মুখে একটি 'মুখ-মণ্ডপ' থাকিত। তাহার পরে একটি 'মণ্ডপ' বা 'মহা-মণ্ডপ' বা 'নাট-মন্দির'ও গঠিত হইত। ইহাই পূর্ণাঙ্গ দেবালয়ের গঠন-ব্যবস্থা বলিয়া সুপরিচিত ছিল। ইহার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, কেবল ভিত্তি-মূলক 'গর্ভে'র প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া, কোনও কোনও লেখক লিখিয়া গিয়াছেন,—আমাদের পুরাতন মন্দির-রচনায় স্তম্ভের ব্যবহার অপরিজ্ঞাত ছিল! বাস্তুশাস্ত্রে 'মণ্ডপ'-নির্ম্মাণের যেরূপ ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই ইহার পর্য্যাপ্ত প্রত্যুত্তর। এই কার্য্যে যতগুলি স্তম্ভ ব্যবহৃত হইত, তাহার সংখ্যানুসারেই 'মণ্ডপ'গুলি নানা নামে কথিত হইত। মৎস্যপুরাণে ইহার বিবরণ সন্নিবিষ্ট আছে।

মূল মন্দিরের উচ্চতা অপেক্ষা 'মণ্ডপে'র উচ্চতা অল্প থাকিত বলিয়া, এবং 'মুখ-মণ্ডপে'র উচ্চতা আরও অল্প থাকিত বলিয়া, স্তম্ভগুলির উচ্চতা অধিক হইত না। মাহিসন্তোষের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে যে সকল স্তম্ভ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তৎসমস্তই অনুচ্চ স্তম্ভ। এই সকল স্তম্ভ যে সকল মন্দির হইতে সমাহৃত হইয়াছিল, তাহাদের 'মুখমণ্ডপে'র ও 'মণ্ডপে'র সহিত ইহাদের সম্পর্ক ছিল। উড়িষ্যার প্রচলিত ভাষায় 'মুখমণ্ডপে'র নাম "জগমোহন", 'মণ্ডপে'র নাম "নাট-মন্দির"। কেহ কেহ ইহাকে উড়িষ্যার প্রাদেশিক স্থাপত্য-রীতির নিদর্শন বলিয়াই ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। এই সিদ্ধান্ত যে বিচারসহ নহে, মাহিসন্তোষের পাষাণস্তম্ভই তাহার প্রধান প্রমাণ। উড়িষ্যার ন্যায় বাঙ্গালার পুরাতন মন্দিরেও 'জগমোহন' ছিল,—'নাটমন্দির' ছিল। উড়িষ্যার সকল মন্দিরে এই দুইটি অতিরিক্ত অঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায় না;—হয় ত বাঙ্গালার সকল মন্দিরেও

দেখিতে পাওয়া যাইত না। কিন্তু মাহিসন্তোষের মস্‌জেদ-নির্ম্মাণকালে যে সকল মন্দির হইতে পাষাণস্তম্ভ সমাহৃত হইয়াছিল, সেগুলি যে পূর্ণাঙ্গ মন্দির ছিল, তাহাতে সংশয় নাই। এরূপ পূর্ণাঙ্গ মন্দির অধিকব্যয়সাধ্য,—অধিক-সমৃদ্ধি-সূচক,—অধিক-শিল্পসুষমাযুক্ত।

যে সকল স্তম্ভ ভিত্তির সহিত সম্পর্কশূন্য, তাহা বাস্তুশাস্ত্রে "মহাস্তম্ভ" নামে উল্লিখিত। "মহাস্তম্ভ" পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত। মৎস্যপুরাণে (২৫৫ অধ্যায়ে) "পঞ্চ মহাস্তম্ভে"র পরিচয়-সূচক এইরূপ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়;—

"রুচক শ্চতুরঃ স্যাত্ অষ্টাস্রো বজ্র উচ্যতে।
দ্বিবজ্রঃ ষোড়শাস্রস্তু দ্বাত্রিংশাস্রঃ প্রলীনকঃ।
মধ্যপ্রদেশে যঃ স্তম্ভো বৃত্তো বৃত্ত ইতি স্মৃতঃ॥"

যে স্তম্ভ চতুষ্কোণ, তাহার নাম "রুচক';—যে স্তম্ভ অষ্টকোণসমন্বিত, তাহার নাম 'বজ্র';—যে স্তম্ভ ষোড়শ-কোণ-সমন্বিত, তাহার নাম 'দ্বিবজ্র';—যে স্তম্ভ দ্বাত্রিংশৎকোণ-বিশিষ্ট, তাহার নাম প্রলীনক;—এবং যে স্তম্ভ বর্ত্তুল, তাহার নাম 'বৃত্ত'। ইহাই আর্য্যাবর্ত্ত-প্রচলিত বাস্তুশাস্ত্রোক্ত "পঞ্চ মহাস্তম্ভে"র শ্রেণী-বিভাগ-সূচক পুরাতন কারিকা। অন্যবিধ সংজ্ঞারও ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। তদনুসারে 'রুচকে'র নাম 'ব্রহ্মকাণ্ড';—'বজ্রে'র নাম 'বিষ্ণুকাণ্ড';—'দ্বিবজ্রে'র নাম 'রুদ্রকাণ্ড'। মাহিসন্তোষের ধ্বংসাবশেষমধ্যে যে সকল স্তম্ভ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে কতকগুলি বজ্র-শ্রেণীর ও কতকগুলি দ্বিবজ্র শ্রেণীর স্তম্ভ।

ভিত্তির অঙ্গীভূতভাবে ব্যবহৃত যে সকল স্তম্ভ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদের আয়তন সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র। সেগুলি 'সেজ্‌দাগা'র উভয় পার্শ্ব রক্ষার জন্য ভিত্তির অঙ্গরূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। তন্মধ্যে অনেকগুলি কৃষ্ণ বর্ণের কঠিন প্রস্তরে নির্ম্মিত,—তিন অংশে বিভক্ত,—প্রত্যেক অংশ লৌহকীলকযোগে দৃঢ়বদ্ধ। এই স্তম্ভগুলির গাত্রে শৃঙ্খলনিবদ্ধ দোদুল্যমান ঘণ্টার কারুকার্য্য এবং শীর্ষদেশে সর্পফণার সুপরিস্ফুট আভাস দেখিয়া বুঝিতে পারা যায়,—এগুলি কোনও শৈব-মন্দির হইতে সমাহৃত হইয়াছিল। একটি গৌরীপট্ট আবিষ্কৃত হইয়া, এই সিদ্ধান্তের পক্ষ সমর্থন করিয়াছে।

যে স্তম্ভগুলি অপেক্ষাকৃত উচ্চ, তাহা অখণ্ড বালুকা-প্রস্তরে নির্ম্মিত। তন্মধ্যে কেবল দুইটির গাত্রে একই লিপি ক্ষোদিত থাকা দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। লিপিযুক্ত স্তম্ভ দুইটি মস্‌জেদ-নির্ম্মাণকালে ভিত্তির অঙ্গীভূতরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকিলেও, ভিত্তির সহিত সম্পর্ক-শূন্য মহাস্তম্ভরূপেই নির্ম্মিত হইয়াছিল, এবং মন্দির-রচনায় সেই ভাবেই ব্যবহৃত হইয়াছিল। ইহাদের

নিম্নভাগে—চতুর্থাংশের মধ্যে বাস্তুশাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট পুরাতন প্রথায় দ্বারপালের মূর্ত্তি উৎকীর্ণ ছিল। সেই মূর্ত্তিচিহ্ন যৎসামান্য বিকৃত করিয়া এবং লিপিযুক্ত অংশ ভিত্তিমধ্যে নিবিষ্ট করিয়া, মস্‌জেদ-নির্ম্মাতা এই স্তম্ভদ্বয়কে মসজেদে লাগাইয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং ইহাতে যে মূর্ত্তি বা লিপি উৎকীর্ণ ছিল, বাহির হইতে তাহা দেখিতে পাওয়া যাইত না। ইহার কারুকার্য্যও ইহাকে শৈব-মন্দিরের স্তম্ভ বলিয়া প্রতিভাত করিতেছে। এই স্তম্ভ দুইটী মন্দিরে আরোহণ করিবার সোপান-শ্রেণীর উভয় পার্শ্বে সংস্থাপিত ছিল বলিয়াই বোধ হয়। লোকে মন্দিরসম্মুখবর্ত্তী হইবামাত্র স্তম্ভলিপি দেখিতে পাইত। স্তম্ভলিপি সুস্পষ্ট; অক্ষরের আয়তন সুবৃহৎ। এই লিপি যে দানপতির কীর্ত্তি-ঘোষণা করিত, তাঁহার সম্বন্ধে পরিচয় প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই। তাঁহার নামমাত্রই উল্লিখিত আছে;—তিনি "শ্রীরাজপুরীয় লেখক" ছিলেন। এই স্তম্ভলিপির অক্ষরত্বে ইহাকে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর সমকালবর্ত্তী বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতেছে। তৎকালে লেখক-শব্দ কায়স্থ-বাচক হইয়া পড়িয়াছিল। বরেন্দ্র-মণ্ডলের কায়স্থগণ তৎকালে উচ্চ রাজপদে আরূঢ় হইয়া, সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়াছিলেন। এই লিপিসংযুক্ত স্তম্ভযুগল সেই সমৃদ্ধির পরিচয় প্রদান করিতেছে।

স্তম্ভের অবস্থান-ক্ষেত্র "পীঠিকা" নামে ও স্তম্ভোপরি সংস্থাপিত শীর্ষভাগ "বোধিকা" নামে কথিত হইত। এই দুইটি পৃথক্ প্রত্যঙ্গের মধ্যবর্ত্তী অঙ্গটির নামই স্তম্ভ। মাহিসন্তোষের ধ্বংশাবশেষের মধ্যে অনেকগুলি "পীঠিকা" ও "বোধিকা" আবিষ্কৃত হইয়াছে। 'বোধিকা' স্তম্ভশীর্ষের সহিত লোহকীলকযোগে সম্বদ্ধ থাকিত; তাহার চিহ্ন এখনও দেদীপ্যমান রহিয়াছে। 'পীঠিকা'র মধ্যস্থলে একটি চতুষ্কোণ ছিদ্রের মধ্যে স্তম্ভমূল প্রোথিত থাকিত। এরূপ চতুষ্কোণ-ছিদ্র-সংযুক্ত স্তম্ভ-পীঠও আবিষ্কৃত হইয়াছে। মসজেদ যখন ভূপতিত হইয়াছিল, তখন অনেক স্তম্ভকেও ভূপাতিত করিয়াছিল; কোনও কোনও স্তম্ভ সেই আকস্মিক পতনবেগে খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছিল। তজ্জন্য মস্‌জেদে ব্যবহৃত সকল স্তম্ভ অক্ষত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায় নাই।

দ্বার।

পাণ্ডুয়ার ভুবন-বিখ্যাত "আদিনা" মস্‌জেদের প্রস্তরনির্ম্মিত প্রবেশ-দ্বার একটি মন্দির-দ্বার। প্রথম আমলের অনেক মুসলমানী অট্টালিকায় মন্দির-দ্বারই প্রবেশদ্বার-রূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। মন্দির-দ্বার যদৃচ্ছাক্রমে নির্ম্মিত হইত

না। তাহা বাস্তু-শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ-অনুসারেই নির্ম্মিত হইত। দ্বারের বিস্তারের সহিত উচ্চতার অনুপাত সুনির্দ্দিষ্ট ছিল; তাহার সহিত মন্দিরের উচ্চতার অনুপাতও সুনির্দ্দিষ্ট ছিল। মৎস্যপুরাণে (২৫৪ অধ্যায়ে) দ্বারের সাধারণ "মান" সংক্ষেপে কথিত হইয়াছে। যথা,—

"গর্ভমানেন মানং তু সর্ব্ববাস্তুষু শস্যতে।"

সকল বাস্তুতেই "গর্ভে"র পরিমাণ অনুসারে দ্বারের পরিমাণ স্থিরীকৃত হইত। "বিস্তারার্দ্ধং ভবেদ্‌গর্ভঃ" এই সূত্রে জানিতে পারা যায়,—বাস্তুক্ষেত্রের যাহা বিস্তার, তাহার অর্দ্ধই 'গর্ভে'র পরিমাণ ছিল।

"গর্ভপাদেন বিস্তীর্ণং দ্বারং দ্বিগুণমায়তম্।"

এই সূত্রে জানিতে পারা যায়,—"গর্ভে"র চতুর্থাংশের সমান করিয়াই দ্বার-বিস্তার স্থির করিয়া লইতে হইত। এই বিস্তারের দ্বিগুণ দ্বারের উচ্চতা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল।

এরূপ অনুপাত-সম্পন্ন দ্বারগুলি মন্দিরের আয়তনের সঙ্গে রচনা-সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারিত। কিন্তু সেই দ্বারকে মস্‌জেদে ব্যবহার করায়, তাহা মস্‌জেদের রচনা-সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারিত না। তথাপি প্রথম আমলের মুসলমানী অট্টালিকার এই স্থাপত্য-গত অসামঞ্জস্যই রচনা-রীতিতে পরিণত হইয়া পড়িয়াছিল। অপেক্ষাকৃত উত্তর-কালের নির্ম্মিত মাহিসন্তোষের মস্‌জেদে এই রচনা-রীতি অনুসৃত হইবার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। এখানে একটি মন্দিরদ্বারও মস্‌জেদ-দ্বার-রূপে ব্যবহৃত হয় নাই। যে সকল মন্দির হইতে স্তম্ভাদি সমাগত হইয়াছিল, তাহার দ্বারগুলি কোথায় গেল,—প্রথমে এইরূপ একটি জিজ্ঞাসা মনের মধ্যে স্বতই উদিত হইয়াছিল। পরে খনন-কার্য্য অগ্রসর হইবার সঙ্গে সঙ্গে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে,—দ্বারগুলিও সমাহৃত হইয়াছিল, কিন্তু মস্‌জেদের দ্বার-রূপে ব্যবহৃত হয় নাই। দ্বার-পাষাণকে খণ্ড খণ্ড করিয়া, খণ্ডগুলিকে কাটিয়া ছাঁটিয়া, মস্‌জেদের ভিত্তিমধ্যে গাঁথিয়া ফেলা হইয়াছিল;—কোনও কোনও খণ্ডের বিপরীত পৃষ্ঠ মসৃণীকৃত করিয়া, তাহাতে মুসলমানী কারুকার্য্যও ক্ষোদিত করা হইয়াছিল। মস্‌জেদ-ভিত্তির যে সকল অংশ ধ্বসিয়া পড়িয়াছিল, তন্মধ্যে এইরূপে রূপান্তরিত দ্বার-পাষাণের নানা খণ্ড দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। অনেক দ্বার-পাষাণখণ্ড এখনও মস্‌জেদের ধ্বংসাবশিষ্ট ভিত্তিমধ্যে প্রোথিত হইয়া রহিয়াছে। একটি মন্দির-দ্বারও পূর্ব্বাবস্থায় বর্ত্তমান না থাকায়, তাহার রচনা-রীতির পূর্ণ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়

নাই। তথাপি দ্বার-পাষাণখণ্ডে নানা রচনা-যুগের নিদর্শন দেখিতে পাওয়া গিয়াছে।

দ্বারশাখা ও উদুম্বর।

চারিখানি দারু-সংযোগে দারুময় দ্বার নির্ম্মিত হয় বলিয়া, তাহা "চৌকাঠ" নামে কথিত হইয়া থাকে। প্রস্তরময় দ্বারও এইরূপে চারিখানি প্রস্তরেই নির্ম্মিত হইত। যে দুইখানি প্রস্তর প্রবেশ-পথের উভয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিত, তাহার সাধারণ নাম "দ্বার-শাখা" বা "শাখা" ;—যে দুইখানি প্রস্তর ঊর্দ্ধে ও নিম্নে বিন্যস্ত হইত, তাহার সাধারণ নাম "উদুম্বর" বা "উড়ুম্বর"। এই চারিখণ্ড প্রস্তরের মধ্যে উদুম্বরদ্বয়ের দৈর্ঘ্য অপেক্ষা শাখাদ্বয়ের দৈর্ঘ্য অধিক হইলেও, সকল খণ্ডের বিস্তার ও বাহুল্য (বেধ) সমান ছিল। শাখার চতুর্থাংশ বিস্তারের, এবং উদুম্বরের চতুর্থাংশ "বাহুল্যে"র পরিমাণ নির্দ্দেশ করিত। সুতরাং দ্বার-পাষাণচতুষ্টয়ের অংশমাত্র প্রাপ্ত হইলেও, তাহার বিস্তারের ও বাহুল্যের সাহায্যে পূর্ণাঙ্গ দ্বারের আয়তনের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে ;—তাহার সাহায্যে মন্দিরের আয়তনেরও পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। কেবল তাহাই নহে,—দ্বারের উচ্চতার সহিত মন্দিরমধ্যস্থ শ্রীমূর্ত্তির উচ্চতারও একটি সুনির্দ্দিষ্ট অনুপাত প্রচলিত ছিল। তজ্জন্য শ্রীমূর্ত্তির আয়তন হইতে মন্দিরের, এবং দ্বারের আয়তন হইতে শ্রীমূর্ত্তির শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট আয়তন আবিষ্কৃত হইতে পারে। এই উপায়ে মাহিসন্তোষের মস্‌জেদে ব্যবহৃত দ্বারশাখার ও উদুম্বরের ভগ্নাংশ ধরিয়া, মন্দিরের ও শ্রীমূর্ত্তির আয়তনের আভাস প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

দ্বারশাখা কখনও কখনও একটিমাত্র শাখা-রূপে নির্ম্মিত হইত। কিন্তু তাহা সচরাচর তিন শাখা হইতে নব-শাখা পর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন শাখার সমষ্টি-রূপেই নির্ম্মিত হইত। এই সকল শাখার কারুকার্য্য ও বিস্তার মন্দির-দ্বারকে সৌন্দর্য্যের সঙ্গে গাম্ভীর্য্য দান করিত। ঊর্দ্ধে সংস্থাপিত উদুম্বরের মধ্যস্থলে শ্রীমূর্ত্তি ক্ষোদিত করাইবার রীতি প্রচলিত হইয়াছিল। হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্রে বিষ্ণুমন্দির-দ্বারের ঊর্দ্ধাবস্থিত উদুম্বরের মধ্যস্থলে দিগ্‌গজসমূহ কর্ত্তৃক স্নাপ্যমানা লক্ষ্মীর শ্রীমূর্ত্তি ক্ষোদিত করাইবার নির্দ্দেশ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,—

"তস্য মধ্যে স্থিতা দেবী সাক্ষাল্লক্ষ্মীঃ সুরেশ্বরী।
কর্ত্তব্যা দিগ্‌গজৈঃ সা তু স্নাপ্যমানা ঘটেন তু।"

বিষ্ণু-মন্দিরের ন্যায় বৌদ্ধ-মন্দিরেও উদুম্বরমধ্যে শ্রীমূর্ত্তি ক্ষোদিত করাইবার রীতি প্রচলিত হইয়াছিল। মস্‌জেদের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে বুদ্ধমূর্ত্তি সংযুক্ত

দুইখানি উদুম্বরের ভগ্নাংশ আবিষ্কৃত হইয়াছে। দুইখানিই বালুকা-প্রস্তরে নির্ম্মিত;—একখানিতে ধ্যানমুদ্রায়, অপরখানিতে ভূমিস্পর্শ-মুদ্রায় পদ্মাসনে উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্ত্তি ক্ষোদিত রহিয়াছে।

শ্রীমূর্ত্তি-প্রস্তর।

যাহারা মসজেদ-নির্ম্মাণের জন্য পাষাণ-সংগ্রহে ব্যাপৃত হইয়াছিল, তাহারা শ্রীমূর্ত্তিগুলিও পরিত্যাগ করে নাই; শ্রীমূর্ত্তি-ফলকের বিপরীত পৃষ্ঠ মসৃণ করিয়া লইয়া, তাহাতে মুসলমানী কারুকার্য্য ক্ষোদিত করাইয়াছিল। এইরূপে ব্যবহৃত মহিষমর্দ্দিনীর, বিষ্ণুর, সূর্য্যের শ্রীমূর্ত্তির নানা অংশ মসজেদ হইতে খসিয়া পড়িয়া, তাহার পরিচয় প্রদান করিয়াছে। এই শ্রেণীর প্রস্তরগুলি অধিক মসৃণ বলিয়া, "সেজদাগা"-নির্ম্মাণেই ব্যবহৃত হইয়াছিল; তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া নমাজ করা হইত। মূর্ত্তিগুলি দেখিতে পাওয়া যাইত না; কিন্তু মূর্ত্তিবিরোধিগণকে মূর্ত্তির নিকটেই নতজানু হইতে হইত! দেব-মন্দিরের অনায়াস-লব্ধ উপাদানে মসজেদ-নির্ম্মাণের ব্যস্ততা তৎকালে এরূপ অসঙ্গত ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টি-আকর্ষণ করিতে পারে নাই;—শিল্প-প্রয়োজনের নিকট মুসলমান ধর্ম্মের চিরবাঞ্ছিত সুদৃঢ় সংস্কার প্রকারান্তরে লাঞ্ছিত হইতে বাধ্য হইয়াছিল। শ্রীমূর্ত্তির ন্যায় তাহার আসনপ্রস্তরও মসজেদ-নির্ম্মাণে ব্যবহৃত হইয়াছিল। দুই একখানি বৃহদায়তনের আসন-প্রস্তর বাহির হইয়া পড়িয়াছে। শ্রীমূর্ত্তির আয়তনের সঙ্গে আসন-প্রস্তরের আয়তনের অনুপাত নির্দ্দিষ্ট ছিল। সেই অনুপাতের সাহায্যে বুঝিতে পারা যায়,—কোনও কোনও শ্রীমূর্ত্তি বিলক্ষণ বৃহদায়তন ছিল,—তাহা মসজেদ-নির্ম্মাণকালে নানা খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছিল। মসজেদের ধ্বংসাবশিষ্ট ভিত্তিমধ্যে হয় ত এই সকল শ্রীমূর্ত্তির ভগ্নাংশ এখনও নিহিত হইয়া রহিয়াছে। মূর্ত্তি-প্রস্তরকে মসজেদ-নির্ম্মাণের উপযোগী করিবার জন্য নানা কৌশলের অবতারণা করিতে হইয়াছিল,—একখানি শ্রীমূর্ত্তির ধ্বংসাবশেষে তাহার পরিচয় সুব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে।

শিখর-প্রস্তর।

ইষ্টক-নির্ম্মিত দেবমন্দিরেও পাষাণনির্ম্মিত দ্বার বা স্তম্ভ ব্যবহৃত হইতে পারে। সুতরাং মাহিসন্তোষের ধ্বংসাবশেষমধ্যে আবিষ্কৃত পাষাণ-স্তম্ভ ও পাষাণ-দ্বার দেখিয়া, মন্দিরগুলি আদ্যন্ত পাষাণে গঠিত হইয়াছিল কি না, তাহার নিঃসন্দিগ্ধ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কিন্তু যে বহুসংখ্যক ভিত্তি-প্রস্তর ও শিখর-প্রস্তর আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে সকল সংশয় নিরস্ত হইয়া যায়।

কারণ, প্রস্তরনির্ম্মিত ভিত্তি ও শিখর কেবল প্রস্তরনির্ম্মিত দেবালয়েই দেখিতে পাওয়া যায়। উড়িষ্যার ন্যায় বরেন্দ্রভূমিতেও যে প্রস্তরনির্ম্মিত দেবালয় বর্ত্তমান ছিল, মাহিসন্তোষের ধ্বংসাবশেষ এইরূপে তাহার পরিচয় প্রদান করিয়া, একটি বহুমূল্য ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান প্রদান করিয়াছে।

দেবমন্দিরের ভিত্তির উপরিভাগে অবস্থিত অঙ্গের নাম—শিখর, বা বিমান। শিখরের উচ্চতা ভিত্তির উচ্চতার দ্বিগুণ বলিয়া বাস্তুশাস্ত্রে উল্লিখিত আছে। সুতরাং শিখর বা বিমান বহুসংখ্যক প্রস্তরখণ্ডে গঠিত হইত। তাহার ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন নামে কথিত হইত। শিখর-রচনারীতির পার্থক্যে মন্দিরগুলি নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হইত। যথা,—

মেরু-মন্দর-কৈলাস-বিমানচ্ছন্দ-নন্দনাঃ।
সমুদ্গ-পদ্ম-গরুড়-নন্দিবর্দ্ধন-কুঞ্জরাঃ॥
গুহরাজো বৃষো হংসঃ সর্ব্বতোভদ্রকো ঘটঃ।
সিংহো বৃত্ত শ্চতুষ্কোণঃ ষোড়শাষ্টাস্রয়ঃ তথা॥
ইত্যেতে বিংশতিঃ প্রোক্তাঃ প্রাসাদাঃ সংজ্ঞয়া ময়া।
যথোক্তানুক্রমেণৈব লক্ষণানি বদাম্যতঃ॥

বরাহমিহির এইরূপে মেরু-মন্দর-কৈলাসাদি বিংশতি বিভিন্ন শ্রেণীর মন্দিরের নাম লিপিবদ্ধ করিয়া, তাহাদের লক্ষণাদিরও উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়,—মেরু শ্রেণীর মন্দির ষট্‌কোণবিশিষ্ট, চতুর্দ্বার-সমন্বিত, বিচিত্র-কুহর-যুক্ত দ্বাদশভূমি-সম্পন্ন হইত। যথা,—

"তত্র ষড়স্রি-র্মেরু র্দ্বাদশভৌমো বিচিত্রকুহরশ্চ।
দ্বারৈ র্যুত শ্চতুর্ভি র্দ্বাত্রিংশদ্ধস্তবিস্তীর্ণঃ॥"

টীকাকার "বিচিত্র" শব্দের "নানা প্রকার" অর্থ ধরিয়া, ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। "কুহর" শব্দের অর্থ—বাতায়ন। মন্দির-শিখর ভিন্ন ভিন্ন "রথকে" বিভক্ত হইত; প্রত্যেক "রথক" অনেকগুলি "ভূমি"তে বিভক্ত হইত। এই সকল পারিভাষিক শব্দ এখন অপরিচিত হইয়া পড়িয়াছে। ইহার পরিচয়-প্রকাশের জন্য বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট স্থাপত্য-ব্যবস্থার উল্লেখ করিয়া, কাশ্যপ একটি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। ভট্টোৎপল তাহা উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন। যথা,—

"ভূমিকা স্তত্র কর্ত্তব্যা বিচিত্র-কুহরান্বিতাঃ।
দ্বাদশোপর্য্যুপরিগা বর্ত্তুলাস্তৈঃ সমাবৃতাঃ॥"

ইহাতে বুঝিতে পারা যায়,—"কুহর"গুলির সহিত ভূমিকার সম্পর্ক ছিল; এবং "দ্বাদশ ভূমি" উপর্য্যুপরি বিন্যস্ত, দ্বাদশ স্তরে বিভক্ত, বর্ত্তুলাভাসযুক্ত

অণ্ডাকার প্রস্তরে নির্ম্মিত হইত। মন্দর-শ্রেণীর মন্দিরে দশটি ভূমি; কৈলাস ও বিমান-শ্রেণীর মন্দিরে আটটি ভূমি, নন্দন-শ্রেণীর মন্দিরে ছয়টি ভূমি থাকিত। ভূমি-বিভাগ-সূচক বর্ত্তুলাভাসযুক্ত অনেকগুলি পাষাণখণ্ড মাহিসন্তোষের মস্‌জেদের ধ্বংসাবশেষমধ্যে আবিষ্কৃত হইয়াছে। শিখরের নানা অংশে নানা কারুকার্য্যসমন্বিত প্রস্তরখণ্ড সন্নিবিষ্ট হইত। এই শ্রেণীরও অনেক পাষাণ-খণ্ড আবিষ্কৃত হইয়াছে। শিখরের নানা স্থানের অলঙ্করণ-কার্য্যে "কীর্ত্তিমুখ" ব্যবহৃত হইত। এইরূপ "কীর্ত্তিমুখে"র নানা ভগ্নাংশও আবিষ্কৃত হইয়াছে। সকল শিখর-প্রস্তরগুলি প্রাপ্ত হইলে, এবং তাহা অপরিবর্ত্তিত-আকারে প্রাপ্ত হইলে, তাহার সাহায্যে শিখর-রচনা করিয়া, সেকালের বরেন্দ্রভূমির মন্দির-শিখরের আদর্শ দেখাইয়া দিবার সুযোগ ঘটিতে পারিত। কিন্তু শিখর-প্রস্তর-গুলি মস্‌জেদের ভিত্তিমধ্যে নিবদ্ধ হইবার সময়ে রূপান্তরিত হইয়াছিল; নানা স্থানে নানা ভাবে বিন্যস্ত হইয়াছিল; এবং এখনও এই শ্রেণীর অনেক পাষাণ-খণ্ড ধ্বংসাবশিষ্ট ভিত্তিমধ্যে প্রোথিত রহিয়াছে। তজ্জন্য সকল পাষাণখণ্ড যথাযোগ্যভাবে পরীক্ষিত হইতে পারে নাই। শিখরশীর্ষে যে "আমলক-শিলা" সুবিন্যস্ত হইয়া, মন্দিরের শোভাবর্দ্ধন করিত, তাহাও নানা খণ্ডে বিভক্ত হইয়া, মস্‌জেদের ভিত্তিগঠনে ব্যবহৃত হইয়াছিল। সুতরাং সমস্ত পাষাণখণ্ড সংগৃহীত হইতে পারিলেও, তাহাদের সাহায্যে পূর্ণাঙ্গ শিখর রচিত হইতে পারিত না। তথাপি এই সকল পাষাণখণ্ড বাস্তুশাস্ত্রসম্মত পুরাতন স্থাপত্য-রীতির পরিচয় প্রদান করিয়া, একটি প্রণিধানযোগ্য ঐতিহাসিক তথ্য উদ্‌-ঘাটিত করিয়া দিয়াছে।

মন্দির-রহস্য।

সেকালের দেবমন্দিরের গর্ভ-মধ্যস্থ ভিত্তিগাত্রে কারুকার্য্যের আতিশয্য দেখিতে পাওয়া যাইত না; অধিকাংশ গর্ভমধ্যে মসৃণ ভিত্তিমাত্রই নির্ম্মিত হইত;—কেবল দুই চারিটি অতিব্যয়সাধ্য দেবমন্দিরের গর্ভভিত্তিগাত্রে কিছু কিছু কারুকার্য্য সংযুক্ত হইত। কিন্তু অধিকাংশ দেবালয়ের বহির্ভাগের আদ্যন্ত এরূপ কারুকার্য্য খচিত হইত যে, তাহা একালের কোনও কোনও পাশ্চাত্য শিল্প-সমালোচকের বিচারে প্রয়োজনাতীত ব্যয়বাহুল্যের নিদর্শন বলিয়াই নিন্দিত হইয়াছে। মন্দিরগুলি এরূপ রীতিতে নির্ম্মিত হইত কেন, তাহা এইরূপে বাদানুবাদের সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে।

মন্দিরমধ্যস্থ শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখীন হইবার পূর্ব্বে, মন্দির-প্রদক্ষিণের ব্যবস্থা

প্রচলিত ছিল। তাহা এখনও একেবারে পরিত্যক্ত হয় নাই। প্রদক্ষিণ-কালে বহির্ভাগের বিচিত্র কারুকার্য্য উপাসকের আগ্রহপূর্ণ সরল চিত্ত অলৌকিক ভক্তি-মাহাত্ম্যে পরিপূর্ণ করিয়া, তাহাকে দেবদর্শনের অধিকারী করিয়া তুলিত; ভক্ত উপাসকের দৃষ্টিতে দেব-মন্দির দেবতারূপেই প্রতিভাত হইত। যে কারণেই হউক, দেবমন্দিরকে "দেবমূর্ত্তিভূত" বলিয়া দর্শন করিবার জন্য এখনও উপদেশ প্রদত্ত হইয়া থাকে। হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্রের এইরূপ উপদেশটি উল্লেখযোগ্য। যথা,—

"শুকনাসা স্মৃতা নাসা বাহূ ভদ্রকরৌ স্মৃতৌ।
শিরস্ত্বন্তং নিগদিতং কলসং মূর্দ্ধজং স্মৃতম্।
কণ্ঠং কণ্ঠমিতি জ্ঞেয়ং স্কন্ধং বেদী নিগদ্যতে।
পায়ূপস্থে প্রণালে তু ত্বক্ সুধা পরিকীর্ত্তিতা।
মুখং দ্বারং ভবেদস্য প্রতিমা জীব উচ্যতে।
তচ্ছক্তিং পিণ্ডিকাং বিদ্ধি প্রকৃতিঞ্চ তদাকৃতিম্।
নিশ্চলত্বং তু গর্ভোঽস্য অধিষ্ঠাতাস্য কেশবঃ।
এব মেব হরিঃ সাক্ষ্যাৎ প্রাসাদত্বেন সংস্থিতঃ।"

শ্রীহরিই প্রাসাদ-রূপে বর্ত্তমান। প্রাসাদ-শিখরের "শুকনাসা" নামক প্রত্যঙ্গ তাঁহার নাসা,—"ভদ্রকর" নামক প্রত্যঙ্গ তাঁহার বাহুযুগল,—"অন্ত" নামক প্রত্যঙ্গ তাঁহার মস্তক,—প্রাসাদশীর্ষাবস্থিত "কলস" তাঁহার কেশপাশ,—"কণ্ঠ" নামক প্রত্যঙ্গ তাঁহার কণ্ঠ,—"বেদী" তাঁহার স্কন্ধদেশ,—"প্রণাল"-দ্বয় তাঁহার পায়ূপস্থ,—"সুধা" (চূণ) তাঁহার ত্বক্,—"দ্বার" তাঁহার মুখ,—গর্ভমধ্যস্থ "প্রতিমা" তাঁহার জীব,—প্রতিমার "পিণ্ডিকা" জীব-শক্তি, পিণ্ডিকার "আকৃতি" তাহার প্রকৃতি,—"গর্ভ" এই দেবায়তনরূপী দেবমূর্ত্তির নিশ্চলত্ব-বিজ্ঞাপক,—ইহার "অধিষ্ঠাতা" স্বয়ং কেশব। এইরূপে শ্রীহরিই স্বয়ং মন্দিররূপে বিরাজ করিয়া থাকেন।

বৈষ্ণব-তন্ত্রোক্ত এই বর্ণনা কবিজনসুলভ কল্পনামাত্র বলিয়া উপেক্ষিত হইতে পারে না। শাক্ত তন্ত্রেও দেব-মন্দির "দেবমূর্ত্তিভূত" বলিয়া সমাদৃত। দ্বার-পূজাপদ্ধতিতে তাহার বিশদ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহাতে দেবমন্দির দ্বারের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ও তন্নিহিত বিবিধ দ্বার-দেবতার পূজা করিবার ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ আছে। ইহার মধ্যে কোনরূপ ঐতিহাসিক তথ্য নিহিত রহিয়াছে কি না, এখনও তাহার আলোচনার সূত্রপাত হয় নাই। চিরপুরাতন চৈত্য-পূজার সঙ্গে মূর্ত্তি-পূজা মিলিত হইয়া, এইরূপ ব্যবস্থা প্রচলিত করিয়াছে কি না, কেহ তাহার তথ্যানুসন্ধানের আয়োজন করিলে, মন্দির-রচনারীতির মূল রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইতে পারে।

এই সকল বর্ণনায় ও ব্যবস্থায় দেবমন্দিরের যে সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পারিভাষিক নাম জানিতে পারা যায়, সেই সকল পারিভাষিক নামে সুপরিচিত অনেকগুলি পাষাণখণ্ড মাহিসন্তোষের ধ্বংসাবশেষখননে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। কতকগুলি বিচ্ছিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বা তাহাদের অংশমাত্র দেখিয়া, জীব-দেহের রচনা-সৌন্দর্য্যের সম্পূর্ণ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই সকল পাষাণ-খণ্ড দেখিয়াও সেইরূপ ধ্বংসাবশিষ্ট দেবমন্দিরের রচনা-সৌন্দর্য্যের সম্পূর্ণ পরিচয় লাভ করা অসম্ভব। তথাপি খনন-কার্য্য ইতিহাসের "জীর্ণোদ্ধার" নামে কথিত হইবার যোগ্য। শাস্ত্রে "জীর্ণোদ্ধারে"র দ্বিগুণ ফল উল্লিখিত আছে।—

"পতিতং পতমানং তু তথার্দ্ধ স্ফুটিতং নরঃ।
সমুদ্ধৃত্য হরের্ধাম দ্বিগুণং ফল মাপ্নুয়াৎ॥"

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

বাঙ্গালা সাহিত্য।

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

বর্ত্তমানকালে বাঙ্গালা প্রদেশের একটি প্রধান বিশেষত্ব এই যে, ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের সহিত তুলনায় এই প্রদেশে সাহিত্যক্ষেত্রে অধিকতর উৎসাহ দেখা যাইতেছে। কিন্তু যদিও মুদ্রাযন্ত্র প্রতিদিন অসংখ্য গ্রন্থ ও সাময়িকপত্রাদি প্রসব করিতেছে, বর্ত্তমান সাহিত্যের মূল্য তাহার পরিমাণের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। বস্তুতঃ যাহা প্রকাশিত হইতেছে, তাহার অধিকাংশই আবর্জ্জনাস্বরূপ। কতকগুলি অধুনাপ্রকাশিত বাঙ্গালা পুস্তক আছে বটে, যাহা আমরা পরে প্রশংসার সহিত উল্লেখ করিব, কিন্তু প্রতিবৎসর বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্র কর্ত্তৃক উৎক্ষিপ্ত অসংখ্য গ্রন্থাদির তুলনায় উহার সংখ্যা এত অল্প যে, উহা সমস্ত সাহিত্যের প্রকৃতিগত দোষ স্খালন করিতে পারে না। যে শ্রেণীর লোক সাধারণতঃ বাঙ্গালা ভাষার লেখক ও বাঙ্গালা সাহিত্যের সমালোচক, সেই শ্রেণীর ব্যক্তিদের নিকট হইতে আমরা উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ফলের প্রত্যাশা করিতে পারি না। অর্দ্ধশিক্ষিত ক্ষিপ্রলেখকগণই বাঙ্গালা গ্রন্থের প্রণয়নে ব্রতী। এই কার্য্যে শিক্ষিত বাঙ্গালীর বিজাতীয় ঘৃণা আছে, এবং ইঁহারা মাতৃভাষায় লেখা নিতান্ত অপমানজনক মনে করেন। সমালোচনা ততোধিক নিকৃষ্ট। যতদিন

নিপুণ সমালোচনার একান্ত অভাব থাকিবে, ততদিন উন্নত ও সতেজ বাঙ্গালা সাহিত্যের আবির্ভাবের আশা করা বিড়ম্বনামাত্র। উপযুক্ত অনুশীলনের অভাবে শিক্ষিত বাঙ্গালীও এই ক্ষেত্রে প্রাচীন পণ্ডিতদিগের ন্যায়ই অক্ষম।

যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষার বর্ত্তমান লেখকদিগের সহিত পরিচিত, তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, ইঁহাদিগকে—সুলেখক ও কুলেখক, সকলকেই—দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে; 'সংস্কৃত' সম্প্রদায় ও 'ইংরাজী' সম্প্রদায়। প্রথম শ্রেণীর লেখকগণ দেশের প্রাচীন সাহিত্য ও সংস্কৃত বিদ্যার প্রভাবে প্রভাবিত, এবং শেষোক্ত শ্রেণী প্রতীচ্য জ্ঞান ও সভ্যতার ফলস্বরূপ। বাঙ্গালী লেখকগণের অধিকাংশই সংস্কৃত-শ্রেণীভুক্ত, কিন্তু সুলেখকগণের অধিকাংশই অপর-শ্রেণীভুক্ত।

সংস্কৃত লেখকগণের অথবা য়ুরোপীয় গ্রন্থকারদিগের নিকট ঋণী নহেন, বর্ত্তমান কালে এরূপ খাঁটী বাঙ্গালী লেখকের শ্রেণী নাই। 'সংস্কৃত শ্রেণী'র লেখকগণ অপেক্ষা কৃত আধুনিক সংস্কৃত লেখকদিগের আদর্শ গ্রহণ করিয়া থাকেন, এবং তাঁহাদের রচনায় মৌলিকতার একান্ত অভাব পরিদৃষ্ট হয়। 'ইংরাজী শ্রেণী'র লেখকদিগের রচনা প্রধানতঃ মৌলিকতার জন্যই 'সংস্কৃতশ্রেণী'র লেখকগনের রচনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। 'সংস্কৃত শ্রেণী'র লেখকদিগের বিশেষত্ব এই যে, উঁহারা প্রায়ই মৌলিক রচনায় হস্তক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হন না। এমন কি, বিদ্যাসাগরের যশঃস্পৃহাও কতকগুলি গ্রন্থের অনুসরণ অথবা অনুবাদ অপেক্ষা উর্দ্ধে উঠে নাই। যদি তাঁহারা কখনও মৌলিক রচনায় প্রবৃত্ত হন, তবে তাঁহারা প্রায়ই তাঁহাদের পূর্ব্বগামিগণের অবলম্বিত পথেরই অনুসরণ করেন। আদিযুগ হইতে যে সকল কথা বারংবার কথিত হইয়াছে, শ্রদ্ধাসহকারে তাহারই পুনরাবৃত্তি করেন। যদি প্রেমের বিষয় লিখিতে হয়, তবে পঞ্চপুষ্পশর হস্তে মদনদেবকে আনিতেই হইবে, এবং তৎসঙ্গে অলিকুল, সুমন্দ পবন এবং প্রাচীন সাহিত্যে উল্লিখিত অন্যান্য সহচর সমভিব্যাহারে দুর্দ্দান্ত বসন্তরাজ তাঁহার সাহায্যকল্পে অবতীর্ণ হইবেন। যদি বিরহের গীত রচনা করিতে হয়, তবে হতভাগ্য বিরহীকে তাঁহার স্নিগ্ধকিরণ দ্বারা দগ্ধ করিতেছেন বলিয়া সুধাকরের নিন্দা করিতে হইবে ও তাঁহাকে অভিশাপ দিতে হইবে, এবং প্রাগৈতিহাসিক যুগে যেরূপ ভ্রমর, সুরভি কুসুম, সুমন্দ পবন প্রভৃতির উল্লেখ করা হইত, ঠিক সেই ভাবে তাহাদের উল্লেখ করিতে হইবে। এই সকল লেখকদিগের রচনায় সুন্দরী রমণী হইলেই ইন্দুনিভ আনন, পদ্মনেত্র, মেঘসদৃশ কেশদাম ও গরুড়চঞ্চুবিনিন্দিত নাসিকা থাকিবে।

এই লেখকদিগের রচনা-ভঙ্গীও ভাবেরই অনুরূপ। চিরপ্রচলিত প্রয়োগানুযায়ী শব্দবিন্যাসাদিই সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে; এবং শ্রুতিকঠোর সংস্কৃত শব্দ-তরঙ্গের অবিশ্রান্ত গর্জ্জনে কর্ণকুহর প্রপীড়িত হইয়া উঠে। ভাবপ্রকাশের উপযোগী হইলেও বিদেশীয়দিগের বচনবিন্যাসপ্রণালীর ছায়াও ঘৃণার সহিত পরিত্যক্ত হইয়া থাকে।

এই অসহনীয় পাণ্ডিত্যগর্ব্ব টেকচাঁদ ঠাকুর কর্ত্তৃকই সর্ব্বপ্রথমে প্রতিহত হয়, এবং এই জন্য তিনি আমাদের নিরবচ্ছিন্ন প্রশংসার পাত্র। উচ্চশিক্ষা এবং স্বাভাবিক বুদ্ধির বলে তিনি দেখিতে পাইলেন যে, এরূপ বিশুদ্ধসংস্কৃতানুসারিণী ভাষায় সেবা করিবার প্রয়োজন নাই। তিনি যে ভাবে 'আলালের ঘরের দুলাল' লিখিতে আরম্ভ করিলেন, তাহা দেখিয়া সংস্কৃতজ্ঞগণ স্তম্ভিত হইয়া গেলেন, এবং এরূপ ভাষার প্রচলন বাঞ্ছনীয় নহে, এই অভিমত প্রকাশ করিলেন। রচনা-পদ্ধতির চিরানুসৃত পথ পরিহারপূর্ব্বক সম্পূর্ণ বিপরীত পন্থা অবলম্বন করিয়া টেকচাঁদ তাঁহার রচনাবলীতে দৃঢ়প্রযত্নে পাণ্ডিত্যসূচক বাক্যবিন্যাস যথাসম্ভব পরিবর্জ্জিত করিলেন। সংস্কৃত শব্দের এইরূপ পরিবর্জ্জনে তাঁহার রচনার কিছু সৌন্দর্য্যহানি ঘটিয়াছিল বটে, কিন্তু ভাষার এই সংস্কার অতি উপযুক্ত সময়েই প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। তিনি পূর্ব্বগামী লেখকদিগের উচ্ছিষ্টাবশেষ আবর্জ্জনার ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া স্বভাবের অনন্ত ভাণ্ডার হইতে আপনার রচনার উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ইহাতে তিনি সাধনোচিত সাফল্য ও সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

অপর কতিপয় লেখকও টেকচাঁদ ঠাকুরের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তদনুরূপ অথবা তদপেক্ষা অধিকতর সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে ঔপন্যাসিক কালীপ্রসন্ন সিংহ, কবিবর মধুসূদন দত্ত ও নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের নাম উল্লেখযোগ্য।

বর্ত্তমানকালে বাঙ্গালী জীবিত ব্যক্তিগণের মধ্যে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অপেক্ষা আর কেহই আমাদের অধিকতর শ্রদ্ধার পাত্র নহেন। হিন্দু বিধবাদিগের অবস্থার উন্নতিসাধনের জন্য তিনি অক্লান্ত চেষ্টা করিয়াছেন, এক জন পণ্ডিত ও অধ্যাপক হইয়াও তিনি সর্ব্বাগ্রে তাহাদের পক্ষসমর্থন করিয়া যে সৎসাহস প্রদর্শিত করিয়াছেন, এবং যেরূপ গভীর গবেষণা ও অবিচলিত অধ্যবসায়-সহকারে তিনি উক্ত সাধু উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন, তাঁহার উদার পরহিতচিকীর্ষা এবং বাঙ্গালাভাষাশিক্ষার বিস্তারকল্পে তিনি যে প্রভূত

পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি স্বদেশহিতৈষিগণের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকৃত করিয়াছেন। দেশবাসিগণের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা অর্জ্জনোপযোগী বহুবিধ এবং বিশিষ্ট সদ্‌গুণাবলী তাঁহাতে বিদ্যমান আছে। কিন্তু উৎকৃষ্ট রচনাশক্তি তন্মধ্যে গণনীয় হইতে পারে না। তিনি সুলেখক বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন সত্য; সেরূপ খ্যাতি ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্তও লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু উভয়ের মধ্যে কাহারও উক্ত খ্যাতি যথার্থ প্রাপ্য নহে; উভয়েই তুল্যরূপে ঐরূপ খ্যাতির অনুপযুক্ত। অপর ভাষা হইতে সুচারুরূপে অনুবাদ করিতে পারিলেই যদি গ্রন্থকারদিগের মধ্যে উচ্চস্থানলাভের অধিকারী হওয়া যায়, তবে বিদ্যাসাগরের সে অধিকার আছে, এ কথা স্বীকার করি। যদি শিশুদিগের জন্য অতি উত্তম পাঠ্যপুস্তক রচনা করিলেই উক্ত অধিকার দৃঢ়ীভূত হইতে পারে, তবে বিদ্যাসাগরের দাবী প্রবল বলিয়া মানিতে হইবে। কিন্তু অনুবাদ বা শিশুপাঠ্য পুস্তক-রচনায় উচ্চশ্রেণীর প্রতিভা-প্রদর্শন, আমাদের মতে, অসম্ভব। অনুবাদ ও শিশুপাঠ্য পুস্তক রচনা ভিন্ন বিদ্যাসাগর আর কিছুই করেন নাই। তাঁহার সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক ক্ষুদ্র প্রস্তাব এ স্থলে উল্লেখযোগ্য নহে, এবং বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে তিনি যে সকল পুস্তিকা লিখিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধেও বর্ত্তমান প্রস্তাবে কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। শিশুগণের স্কুলপাঠ্য পুস্তকগুলি বাদ দিলে, তাঁহার পাঁচখানিমাত্র অনুবাদ গ্রন্থ বাকী থাকে, যথা—হিন্দী হইতে অনূদিত 'বেতাল-পঞ্চবিংশতি', সংস্কৃত হইতে ভাষান্তরিত 'শকুন্তলা', 'সীতার বনবাস', এবং মহাভারতে'র উপক্রমণিকা, এবং ইংরাজী হইতে অনূদিত 'ভ্রান্তিবিলাস' বা Comedy of Errors। এই সকল গ্রন্থ সম্বন্ধে এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হয় যে, অনুবাদ বা অনুসৃতিগুলি অতি সুন্দর। বোধ হয়, বাঙ্গালা ভাষায় এই শ্রেণীর অন্যান্য গ্রন্থ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর। 'সীতার বনবাস' ও অপর পুস্তক কয়খানির ন্যায় কোনও অংশে 'মৌলিক' নহে। উহার প্রথম অধ্যায়টি ভবভূতির 'উত্তররামচরিত' নামক সুন্দর গ্রন্থ হইতে গৃহীত, এবং অবশিষ্ট তিনটি অধ্যায় মূল রামায়ণ হইতে, যে রামায়ণ হইতে ভবভূতিও রস সংগ্রহ করিয়াছিলেন—সেই রামায়ণ হইতেই সংগৃহীত; বস্তুতঃ 'সীতার বনবাস' পুস্তকখানি বাল্মীকির মহাকাব্য হইতে নির্ব্বাচিত কয়েকটি দৃশ্যের পুনর্বর্ণনমাত্র। ইহার ভাষা অতি মধুর ও স্বচ্ছন্দগতিবিশিষ্ট, কিন্তু তাদৃশ ওজস্বিনী নহে। দৃশ্যগুলিও সুনির্ব্বাচিত এবং অলৌকিক অংশগুলি পরিত্যক্ত হওয়ায় অধিকতর বাস্তবানুরূপ হইয়াছে, কিন্তু বিদ্যাসাগরের স্বসম্প্রদায়ভুক্ত অন্যান্য লেখকগণের ন্যায় তাঁহার ভাষাতেও শব্দাড়ম্বর ও পুনরুক্তি দোষ লক্ষিত হয়।

আমরা 'সংস্কৃত' শ্রেণীর আর এক জনমাত্র লেখকের নাম উল্লেখ করিব। তাঁহার নাম পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন। তাঁহার রচনার কোনও বিশেষগুণের জন্য নহে, তাঁহারা খ্যাতি আছে বলিয়াই তাঁহার নাম উল্লেখ করিতেছি। তাঁহার নাটকগুলির মধ্যে একখানি কৌলীন্যপ্রথার বিরুদ্ধে লিখিত 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব', এবং আর একখানি বহুবিবাহের বিরুদ্ধে লিখিত 'নবনাটক'। 'রত্নাবলী', 'মালতী-মাধব' এবং 'শকুন্তলা'রও তিনি অনুবাদ করিয়াছেন। এই অনুবাদগুলি অতি জঘন্য, এবং তাঁহার স্বরচিত মৌলিক গ্রন্থগুলির ন্যায় শব্দাড়ম্বরপূর্ণ। স্থূলতঃ, আমাদের বিবেচনায় এই লেখকের যশোমাল্য জনসাধারণ কর্ত্তৃক অপাত্রে অর্পিত হইয়াছে।

এই লেখকের পর আমরা সানন্দে ইংরাজী সম্প্রদায়ের লেখকগণের গ্রন্থাদির আলোচনা করিব। আমরা ইতঃপূর্ব্বেই 'টেকচাঁদ ঠাকুর' ছদ্মনামধারী বাবু প্যারীচাঁদ মিত্রের কথা বলিয়াছি। তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ 'আলালের ঘরের দুলাল।' ইহাকে বাঙ্গালা ভাষার প্রথম নভেল বলা যাইতে পারে। গল্পাংশ অতি সরল, এবং সংক্ষেপে বিবৃত হইতে পারে। বৈদ্যবাটীর বাবুরাম বাবু এক জন বৃদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণ। আদালতে চাকরী করিয়া, বিচারার্থিগণের উপর উপদ্রব করিয়া প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিয়াছেন। এক্ষণে কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া জমীদারী ও সওদাগরী কর্ম্ম করিতেছেন। তাঁহার চারিটি সন্তান,—দুইটি পুত্র ও দুইটি কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্র মতিলাল মূর্খ, স্বার্থপর ও দুশ্চরিত্র যুবক, পিতার অযথা আদরে একবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এক জন গুরুমহাশয় তাহাকে বাঙ্গালা শিক্ষা দেন। ব্যয়সঙ্কোচের জন্য এক জন মূর্খ পূজারী তাহার সংস্কৃত শিক্ষক নিযুক্ত হন। এবং এক জন বৃদ্ধ দরজী ব্যবসায় ছাড়িয়া তাহাকে পারস্য ভাষা শিক্ষা দেয়। তিন জনের শিক্ষাদানের ফল সহজেই অনুমেয়। গুরুমহাশয় কিছুদিন পরে ছাত্রের উপদ্রবে চাকরী ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন। ছাত্রটি গুরুমহাশয়ের দধিতে চূণ মিশাইয়া দিত, তাঁহার কাপড়ের ভিতর জলন্ত কয়লা পুরিয়া দিত, এবং অন্যান্য নানাবিধ কৌতুক করিত। সুযোগ পাইলেই পূজারী বেচারীর মাথায় ঢিল ছুঁড়িয়া মারিত। ছাত্রের এই কদভ্যাস কিছুতেই দমন করিতে না পারিয়া পূজারী বেচারীও কর্ম্ম পরিত্যাগ করিল। মুন্সীর দাড়িতে মতিলাল একদিন অগ্নিসংযোগ করিয়া দিয়া কৌতুক দেখিতেছিল। তিনি তদ্দণ্ডেই কার্য্যত্যাগ করিয়া গেলেন।

বাবুরাম বাবু পুত্রের প্রাচ্যভাষাদিতে ব্যুৎপত্তি দেখিয়া সবিশেষ প্রীত হইলেন, এবং ভাবিলেন, এইবার ইংরাজী শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। অতএব, মতিলালকে কলিকাতায় প্রেরণ করা হইল। সেখানে সে একটি ইংরাজী স্কুলে যাতায়াত করিতে লাগিল। কিন্তু পারস্য ও সংস্কৃত ভাষায় তাহার যেরূপ বিদ্যা হইয়াছিল, ইংরাজীতে তদপেক্ষা অধিক কিছু হইল না। সে ইয়ারদিগের সহিত তাস ও পাশা খেলা, মোরগের লড়াই, ঘুড়ি উড়ান প্রভৃতি আমোদপ্রমোদে মনোনিবেশ করিল। ইতিমধ্যে তামাক, চরস, ব্রাণ্ডীও ধরিল। একদিন এক গণিকালয়ে জুয়া খেলিতে খেলিতে সঙ্গীদিগের সহিত পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হইল। সকলেই দোষী প্রমাণিত হইয়া শাস্তি পাইল। কেবল মতিলাল তাহার পিতার পুরাতন বন্ধু মিঞাজান মিঞার কৌশলে নিষ্কৃতি পাইল। সে সপ্রমাণ করিল, মতিলাল সেদিন অন্যত্র ছিল, ঘটনাস্থলে ছিল না। যাহা হউক, এই ঘটনার পরেই মতিলালের ইংরাজী শিক্ষা বন্ধ হইল। সে বাড়ী ফিরিয়া আসিল, এবং শীঘ্রই তাহার শুভবিবাহ সম্পন্ন হইল।

ইতিমধ্যে মতিলালের অনুজ রামলাল বয়ঃপ্রাপ্ত হইল, এবং বরদা বাবু নামক জনৈক বুদ্ধিমান ও সুশিক্ষিত ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ বিভিন্ন পথে চলিতে লাগিল। সে পুস্তকপাঠে মনোযোগী হইল, এবং পিতা ও অন্যান্য আত্মীয়বর্গের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিল, এবং আর আর সকলের প্রতি শিষ্ট ব্যবহার করিতে লাগিল। সকল দিকেই সে এক জন আদর্শ বালক হইয়া উঠিল। কিন্তু যে কারণেই হউক, বাবুরাম বাবু ও তাঁহার বন্ধুদিগের নিকট ইহা বিসদৃশ বোধ হইল, এবং তাঁহারা বরদা বাবুর হস্ত হইতে নিষ্কৃতির পথ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। ইহার সহজ উপায়,—তাঁহার নামে ফৌজদারী নালিশ। অতএব মিঞাজান মিঞার সাহায্যে বিনা দোষে তাঁহার নামে এক গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত করা হইল।

বরদা বাবু আমলাকে ঘুস না দেওয়ায় নিশ্চয়ই স্বীয় নির্ব্বুদ্ধিতার শাস্তি পাইতেন, কেবল ইংরাজী ভাষা জানিতেন বলিয়াই ম্যাজিষ্ট্রেটকে সকল অবস্থা পরিষ্কার রূপে বুঝাইতে পারিয়া, বিপদ হইতে উদ্ধার হইলেন। কারণ, যখন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁহার চুরুট, সংবাদপত্র ও গোপনীয় পত্রগুলির প্রতি অবহেলা না করিয়া সাক্ষীদের জবানবন্দী যতটুকু শুনিতে পারা যায়, ততটুকু মাত্র শুনিয়াছেন, তখন সেরেস্তাদার মহাশয় খুব দৃঢ়ভাবে সাহেবকে বুঝাইয়া দিলেন যে, আসামীর দোষ সপ্রমাণ হইয়াছে, তাহার

দণ্ডাজ্ঞা হওয়া উচিত। কেবল ইংরাজী জানিতেন বলিয়াই বরদা বাবু নির্দ্দোষ বলিয়া অব্যাহতি পাইলেন।

এই সময়ে উচ্চবংশীয় কুলীন বাবুরাম বাবুর নিকট এক বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত হইল। বিবাহে কিছু অর্থলাভেরও সম্ভাবনা থাকায় তিনি তৎক্ষণাৎ সম্মতি দিলেন। মতিলালের মাতা পতিপরায়ণা সতী ছিলেন। তিনি জীবিতা থাকিতেই বাবুরাম দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করিলেন। এই ঘটনার কিছুদিন পরেই তাঁহার মৃত্যু হইল। তিনি দুইটি বিধবা পত্নী রাখিয়া গেলেন ; তাহার মধ্যে এক জন বালিকামাত্র। মতিলাল তখন পিতার গদীতে আরোহণ করিলেন, এবং যথাযোগ্য সমারোহের সহিত পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিলেন। তাহার পর বিলাস-সাগরে আপনাকে নিমজ্জিত করিলেন। ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তির জন্য জলের মত অর্থব্যয় করিতে লাগিলেন। মাতা কখনও সদুপদেশ দিতে গেলে তাহার পুরস্কারস্বরূপ প্রহার লাভ করিতেন। অতঃপর তিনি কন্যাকে লইয়া গৃহপরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। তাহাতে মতিলালের আনন্দের সীমা রহিল না।

অবশেষে, এরূপ স্থলে যেমন আশঙ্কা করা যায়, মতিলাল ঘোর দুর্দ্দশায় পতিত হইলেন। উত্তমর্ণেরা তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া লইল। তিনি গৃহত্যাগ করিলেন, এবং নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে কাশীধামে উপস্থিত হইলেন। সেখানে এক জন বিজ্ঞ পণ্ডিতের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। সেই পণ্ডিত তাঁহার চরিত্রসংশোধন করিলেন। কাশীতে তাঁহার মাতা ও ভগ্নী এবং বরদাবাবুর সহিত সাক্ষাৎ ও পুনর্ম্মিলন হইল। সকলে বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়া একত্রে সুখে বাস করিতে লাগিলেন।

'আলালের ঘরের দুলালে'র গল্পাংশ এইটুকুমাত্র, কিন্তু এই পুস্তকের অন্যান্য গুণের তুলনায় গল্পটা কিছুই নহে। ইহাতে যে সকল মানব-চরিত্রের নক্সা আছে এবং বাঙ্গালী-জীবনের যে সকল চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহাতেই এই পুস্তকের যথার্থ মূল্য নির্দ্ধারিত হইবে। বিচারালয়ে যতটুকু জানিতে পারা যায়, অধিকাংশ য়ুরোপীয়গণ এদেশের লোকদিগের বিষয়ে তদতিরিক্ত কিছুই জানেন না। বিচারালয়গুলি প্রায়ই এরূপ পাষণ্ড শ্রেণীর লোকে সমাকীর্ণ থাকে যে, সেরূপ আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। যেমন পুরীতে জগন্নাথ-মন্দিরে লোকে ধর্ম্মাধর্ম্ম ও জাতির বিচার করে না, সেইরূপ বিচারালয়ে ধার্ম্মিক ও সত্যবাদী ব্যক্তিও মিথ্যা কথা কহা দোষ বলিয়া বিবেচনা করেন না। সুতরাং

য়ুরোপীয়দিগের নিকট দেশীয় জীবনের যথার্থ নক্সাপূর্ণ এরূপ পুস্তক অতীব মূল্যবান। সত্য বটে, পুস্তকখানির কোনও কোনও স্থলে অতিরঞ্জন লক্ষিত হয়, এবং গল্পোল্লিখিত পাত্রগুদিগের চিত্র খুব জীবন্ত ও চরিত্র-বৈচিত্র্যে সুপরিস্ফুট হইলেও, সজ্জনদিগের চিত্র বড়ই ছায়ার মত বোধ হয়। স্ত্রীচরিত্রগুলিও অতি অস্পষ্টভাবে অঙ্কিত; সকলগুলিই একরূপ, এবং উহা হইতে ভারতবাসীর দৈনিক জীবনে অন্তঃপুরবাসিনীদের কিরূপ প্রভাব, তাহার কোনও আভাস পাওয়া যায় না। কিন্তু উক্ত দোষগুলির অস্তিত্ব সত্ত্বেও বর্ণিত চিত্র ও চরিত্রগুলি পুস্তকখানিকে যথার্থ মূল্যবান করিয়াছে। পুস্তকখানি হইতে দীর্ঘ অংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইবার আমাদের স্থান নাই, কিন্তু নিম্নলিখিত উদাহরণ হইতে বুঝা যাইবে যে, স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ অমার্জ্জিত ও গ্রাম্যতাদুষ্ট হইলেও, গ্রন্থকারের ভাষা কিরূপ ওজস্বিনী ও স্বাভাবিক:—

"বৈদ্যবাটীর বাবুরাম বাবু, বাবু হইয়া বসিয়াছেন। হরে পা টিপিতেছে। এক পাশে দুই এক জন ভট্টাচার্য্য বসিয়া শাস্ত্রীয় তর্ক করিতেছেন—আজ লাউ খেতে আছে—কাল বেগুণ খেতে নাই—লবণ দিয়া দুগ্ধ খাইলে সদ্য গোমাংস ভক্ষণ করা হয় ইত্যাদি কথা লইয়া ঢেঁকির কচ্‌কচি করিতেছেন। এক পাশে কয়েক জন শতরঞ্চ খেলিতেছে, তাহার মধ্যে এক জন খেলওয়াড় মাথায় হাত দিয়া ভাবিতেছে—তাহার সর্ব্বনাশ উপস্থিত—উঠসার কিস্তিতেই মাত। এক পাশে দুই এক জন গায়ক যন্ত্র মিলাইতেছে—তানপূরা মেও মেও করিয়া ডাকিতেছে। এক পাশে মুহুরিরা বসিয়া খাতা লিখিতেছে—সম্মুখে কর্জদার প্রজা ও মহাজন সকলে দাঁড়াইয়া আছে,—অনেকের দেনা পাওনা ডিগ্রি ডিস্‌মিস্ হইতেছে,—বৈঠকখানা লোকে থই থই করিতেছে। মহাজনেরা কেহ কেহ বলিতেছে, মহাশয়! কাহার তিন বৎসর—কাহার চার বৎসর হইল আমরা জিনিস সরবরাহ করিয়াছি, কিন্তু টাকা না পাওয়াতে বড় ক্লেশ হইতেছে—আমরা অনেক হাঁটাহাঁটি করিলাম—আমাদের কাজ কর্ম্ম সব গেল। খুচুরা খুচুরা মহাজনেরা যথা তেলওয়ালা, কাঠওয়ালা, সন্দেশওয়ালা তাহারাও কেঁদে ককিয়ে কহিতেছে—মহাশয়, আমরা মারা গেলাম—আমাদের পুঁটি মাছের প্রাণ এমন করিলে আমরা কেমন করে বাঁচিতে পারি? টাকার তাগাদা করিতে করিতে আমাদের পায়ের বাঁধন ছিঁড়িয়া গেল,—আমাদের দোকান পাট সব বন্ধ হইল, মাগ ছেলেও শুকিয়ে মরিল। দেওয়ানজী এক একবার উত্তর করিতেছে—তোরা আজ যা টাকা পাবি বই কি—এত বকিস্ কেন?

তাহার উপর যে চোড়ে কথা কহিতেছে, অমনি বাবুরাম বাবু চোক মুখ ঘুরাইয়া তাহাকে গালি গালাজ দিয়া বাহির করিয়া দিতেছেন।”

‘আলালের ঘরের দুলাল’ ব্যতীত টেকচাঁদ ঠাকুর আরও কয়েকখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ‘রামারঞ্জিকা’ নামক গ্রন্থখানি প্রধানতঃ স্বামী ও স্ত্রীর কথোপকথনের আকারে লিপিবদ্ধ নানাবিধ সামাজিক ও নৈতিক বিষয়ের আলোচনার সমাবেশ। যে সকল রমণী অধিক বয়সে লেখাপড়া শিখিতেছেন, তাঁহাদের জন্যই এই পুস্তকখানি লিখিত হয়। ‘মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়’ নামক পুস্তকে ঐ শ্রেণীর আধুনিক বহু বাঙ্গালা পুস্তকের ন্যায় সুরাপানের দোষসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ‘যৎকিঞ্চিৎ’ নামক গ্রন্থে ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যা আছে, তেমন চিত্তাকর্ষক নহে। ‘অভেদী’ টেকচাঁদ ঠাকুরের অভিনব গ্রন্থ। ইহাতেও উল্লিখিত বিষয় আলোচিত হইয়াছে, এবং এই গ্রন্থ লিখিয়াই তিনি প্রবল-প্রতাপান্বিত বাবু কেশব চন্দ্র সেন ও তাঁহার শিষ্যগণের রোষভাজন হইয়াছেন।

টেকচাঁদ ঠাকুরের পর ‘হুতোমে’র নাম আপনা হইতেই আইসে। কারণ, টেকচাঁদ-প্রবর্ত্তিত রচনাভঙ্গীর অনুসরণকারী কৃতী লেখকগণের মধ্যে কালীপ্রসন্ন সিংহ বা হুতোম একজন সর্ব্বপ্রধান লেখক। বাল্যকালে তিনি সংস্কৃত হইতে অনেক গ্রন্থ অনুবাদিত করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ ‘মহাভারতের’ অনুবাদ করিয়া তিনি বিখ্যাত হইয়াছেন। উক্ত গ্রন্থকে এ যুগের সর্ব্বাপেক্ষ মহৎ গ্রন্থ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু অনুবাদক বলিয়াই তিনি প্রসিদ্ধ নহেন। ‘হুতোম প্যাঁচার নক্সা’র প্রণেতা বলিয়াই তিনি সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। এই পুস্তকে ডিকেন্সের ‘Sketches by Boz’-এর মত সকল শ্রেণীর লোকের, এমন কি, সশরীরে বর্ত্তমান ব্যক্তিগণেরও হাস্যরসোদ্দীপক আচার ব্যবহার প্রভৃতি সরস ও ওজঃপূর্ণ (যদিও অনেক স্থলে অশ্লীলতা-দোষদুষ্ট) ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। উহার মধ্যে চড়কপূজা, বারোইয়ারি, হুজুক, বুজরুকী, বাবু পদ্মলোচন দত্ত ওরফে হঠাৎ অবতার, এবং স্নানযাত্রার উল্লেখ করা যাইতে পারে। নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে ‘হুতোমে’র রচনাভঙ্গীর কথঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যাইবে। সন্ধ্যার পর কলিকাতার বাঙ্গালীটোলার দৃশ্য—

“এ দিকে সহরে সন্ধ্যাসূচক কাঁসর-ঘণ্টার শব্দ থাম্‌লো। সকল পথের সমুদায় আলো জ্বালা হয়েছে। ‘বেলফুল’ ‘বরফ’ ‘মালাই’ চীৎকার শুনা যাচ্চে। আবগারীর আইন অনুসারে মদের দোকানের

সদর দরজা বন্ধ হয়েছে, অথচ খদ্দের ফিচ্চে না। ক্রমে অন্ধকার গা-ঢাকা হয়ে এলো; এ সময় ইংরাজী জুতো, শান্তিপুরে ডুরে উড়্‌নি আর সিমলের ধুতির কল্যাণে রাস্তায় ছোট লোক ভদ্দর লোক আর চেন্‌বার যো নাই। তুখোড় ইয়ারের দল হাসির গর্‌রা ও ইংরাজী কথার ফর্‌রার সঙ্গে খাতায় খাতায় এর দরজায়, তার দরজায় ঢুঁ মেরে মেরে বেড়াচ্ছেন; এঁরা সন্ধ্যা জ্বালা দেখে বেরুলেন, আবার ময়দা-পেষা দেখে বাড়ী ফির্‌বেন! মেছো-বাজারের হাঁড়িহাটা, চোরবাগানের মোড়, যোড়াসাঁকোর পোদ্দারের দোকান, নতুন বাজার, বটতলা, সোণাগাছির গলী ও আহিরীটোলার চৌমাথা লোকারণ্য- কেউ মুখে মাথায় চাদর জড়িয়ে মনে কচ্চেন, কেউ তাঁরে চিন্‌তে পার্‌বে না। আবার অনেকে চেঁচিয়ে কথা কয়ে কেসে হেঁচে লোককে জানান দিচ্চেন যে, 'তিনি সন্ধ্যার পর দুদণ্ড আয়েস ক'রে থাকেন।'

"সৌখীন কুঠীওয়ালা মুখে হাতে জল দিয়ে জলযোগ ক'রে সেতারটী নিয়ে বসেচেন। পাশের ঘরের ছোট ছোট ছেলেরা চীৎকার ক'রে—বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় পড়্‌চে। পীল-ইয়ার ছোক্‌রারা উড়্‌তে শিখ্‌চে। স্যাকরারা দুর্গাপ্রদীপ সাম্‌নে নিয়ে রাং ঝাল দিবার উপক্রম করেছে। রাস্তার ধারের দুই একখানা কাপড়, কাঠ-কাঠরা ও বাসনের দোকান বন্ধ হয়েছে, রোকোড়ের দোকানদার ও পোদ্দার সোণার বেনেরা তহবিল মিলিয়ে কৈফিয়ৎ কাটচে। শোভাবাজারের রাজাদের ভাঙ্গা বাজারে মেছুনীরা প্রদীপ হাতে ক'রে ওঁচা পচা মাচ ও দোনা ইলিশ নিয়ে ক্রেতাদের 'ও গামচাকাঁধে, ভাল মাচ নিবি?' 'ও খেংরা-গুঁপো মিন্সে, চার আনা দিবি' ব'লে আদর কচ্চে—মধ্যে মধ্যে দুই এক জন রসিকতা জানাবার জন্য মেছুনী ঘেঁটিয়ে বাপান্ত খাচ্চেন। রেস্তহীন গুলিখোর, গেঁজেল ও মাতালেরা লাঠী হাতে ক'রে কাণা সেজে 'অন্ধব্রাহ্মণকে কিছু দান কর দাতাগণ' ব'লে ভিক্ষা ক'রে মৌতাতের সম্বল কচ্চে। * * *

"আজ নীলের রাত্রি। তাতে আবার শনিবার; শনিবার রাত্রে সহর বড় গুলজার থাকে! পানের খিলির দোকানে বেললণ্ঠন আর দেয়ালগিরী জ্বল্‌চে। ফুর্‌ফুরে হাওয়ার সঙ্গে বেলফুলের গন্ধ ভুরভুর ক'রে বেরিয়ে যেন সহর মাতিয়ে তুলেচে। রাস্তার ধারের দুই একটা বাড়ীতে খেম্‌টা নাচের তালিম হচ্চে, অনেকে রাস্তায় হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে ঘুঙুর ও মন্দিরার রুণু রুণু শব্দ শুনে স্বর্গসুখ উপভোগ কচ্চেন; কোথাও একটা দাঙ্গা হচ্চে। কোথাও পাহারওয়ালা এক জন চোর ধ'রে বেঁধে নে যাচ্চে, তার চারি দিকে চার পাঁচ

জন হাস্‌চে আর মজা দেখ্‌চে, এবং আপনাদের সাবধানতার প্রশংসা কচ্চে; তারা যে একদিন ঐ রকম দশায় পড়্‌বে, তার ভ্রূক্ষেপ নাই।"

প্রাতঃকালে দৃশ্য পরিবর্ত্তিত হইয়াছে :—

"এ দিকে গির্জ্জার ঘড়ীতে টুং টাং ঢং টুং টাং ঢং ক'রে রাত চারটে বেজে গেল—বারফট্‌কা বাবুরা ঘরমুখো হয়েছে। উড়ে বামুনেরা ময়দার দোকানে ময়দা পিষ্‌তে আরম্ভ করেছে। রাস্তার আলোর আর তত তেজ নাই। ফুর্‌ফুরে হাওয়া উঠেছে। বেশ্যালয়ের বারাণ্ডার কোকিলেরা ডাক্‌তে আরম্ভ করেছে, * দু একবার কাকের ডাক, কোকিলের আওয়াজ ও রাস্তার বেকার কুকুরগুলোর খেউ খেউ রব শোনা যাচ্চে; এখনও মহানগর যেন নিস্তব্ধ ও লোকশূন্য।' ক্রমে দেখুন; 'শ্যামের মা চল্‌তে পারে না,' "ওদের ন-বউটা কি বজ্জাত মা' 'মাগী যেন জক্কী,' প্রভৃতি নানা কথার আন্দোলনে রত দুই একদল মেয়ে মানুষ গঙ্গাস্নান কত্তে বেরিয়েছেন। চিৎপুরের কসাইরা মটন চাপের ভার নিয়ে চলেছে। পুলিসের সার্জ্জন, দারোগা, জমাদার প্রভৃতি গরীবের যমেরা রোঁদ সেরে মস্ মস্ ক'রে থানায় ফিরে যাচ্চেন।

'গুড়ুম ক'রে তোপ প'ড়ে গেল! কাকগুলো কা কা করে বাসা ছেড়ে ওড়্‌বার উজ্জুগ কল্লে। দোকানীরা দোকানের ঝাঁপতাড়া খুলে, গন্ধেশ্বরীকে প্রণাম ক'রে, দোকানে গঙ্গাজলের ছড়া দিয়ে, হুঁকার জল ফিরিয়ে তামাক খাবার উজ্জুগ কর্চ্চে। ক্রমে ফর্‌সা হয়ে এলো। মাছের ভারীরা দৌড়ে আস্‌তে লেগেচে, মেছুনীরা ঝগড়া কত্তে কত্তে তার পেছু পেছু দৌড়েছে। বদ্দিবাটীর আলু, হাসনানের বেগুন বাজ্‌রা বাজ্‌রা আস্‌চে, দিশী বিলাতী যমেরা অবস্থা ও রেস্তমত গাড়ী পাল্কী চ'ড়ে ভিজিটে বেরিয়েছেন। জরবিকার, ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব না পড়্‌লে এঁদের মুখে হাসি দেখা যায় না। * *।

'টুলো পুঁজুরি ভট্টচাজ্জিরা কাপড় বগলে ক'রে স্নান কত্তে চলেছে, আজ তাদের বড় ত্বরা, যজমানের বাড়ী সকাল সকাল যেতে হবে। 'আদবুড়ো বেত্তোরা মর্ণিংওয়াকে বেরিয়েছেন। উড়ে বেহারারা দাঁতন হাতে ক'রে স্নান কত্তে দৌড়েছে। ইংলিশম্যান, হরকরা, ফিনিক্স, এক্সচেঞ্জ গেজেট, গ্রাহকদের দরজায় উপস্থিত হয়েছে। হরিণমাংসের মত কোন কোন বাঙ্গালা খবরের কাগজ বাসি না হ'লে গ্রাহকেরা পান না—ইংরাজী কাগজের সে রকম নয়, গরম গরম ব্রেক্‌ফাষ্টের সময় গরম গরম কাগজ পড়াই আবশ্যক।'

বিশুদ্ধ এবং ওজস্বিনী বাঙ্গালা ভাষার সর্ব্বোৎকৃষ্ট লেখকগণের মধ্যে

বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় অন্যতম। তাঁহার ভাষায় বিদ্যাসাগরের পাণ্ডিত্য-গর্ব্বিতা বিশুদ্ধতা নাই, অথচ টেকচাঁদ ও হুতোমের মত গ্রাম্যতা বা অশিষ্টতা নাই। দুঃখের বিষয় এই যে, তিনি শিক্ষা-বিষয়ক পুস্তক ভিন্ন অন্য গ্রন্থ অল্পই লিখিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ঐতিহাসিক উপন্যাসের ক্ষুদ্র পুস্তক-পাঠেই প্রতীয়মান হয় যে, তিনি যেটুকু লিখিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক লিখিবার ক্ষমতা তাঁহার আছে। বর্ত্তমান প্রস্তাবে উক্ত গ্রন্থ হইতে কোনও অংশ উদ্ধৃত করিবার স্থান নাই।

ক্রমশঃ।

৺ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ।

নিষ্করুণ বাঙ্গালী।

বাঙ্গালীর উপর বিধাতার যতগুলি অভিসম্পাত আছে, তাহাদের মধ্যে একটি এই যে, ঘুষ না দিয়া বাঙ্গালীর কোনও কার্য্য হইবার নহে। চাকরী করিতে হইলে ঘুষ দিতে হইবে; সাহেব সুবার সঙ্গে দেখা করিতে হইলে তাঁহাদের নন্দী ভৃঙ্গীদিগকে ঘুষ দিতে হইবে; কলেজে ভর্ত্তি হইতে হইলে কেরাণীকে ঘুষ দিতে হইবে; হাঁসপাতালে গিয়া চিকিৎসা করাইতে হইলেও উত্তম, মধ্যম, অধম অনেক দেবতাকে ঘুষে তৃপ্ত করিতে হয়; কলিকাতায় বিনা ঘুষে মড়া-পোড়ান পর্য্যন্ত চলে না। সুতরাং প্রথমশ্রেণীর একখানি কামরা রিজার্ভ করিয়াও আমাকে যে রেলের গার্ড হইতে আরম্ভ করিয়া কুলীমজুরদিগকে পর্য্যন্ত কিছু কিছু ঘুষ দিতে হইল, সে জন্য আমার কোনও দুঃখ হইল না। যতদিন বাঙ্গালী বাঁচিবে, ততদিন তাহাকে ঘুষ দিতে হইবে; মরিলেও যে সে এ দায় হইতে নিস্তার পাইবে, এমন মনে করিবার সাহসও আমার নাই। ঘুষ দিবার আজীবনব্যাপী বদ্ধমূল সংস্কার কত জন্মের কর্ম্মফলে লোপ পাইবে, বা আদৌ লোপ পাইবে কি না,—এ কথা কে বলিতে পারে?

পূজার ছুটী। দলে দলে লোক ষ্টেশনে আসিতেছে। ধনী, মধ্যবিত্ত, দরিদ্র—সকলেই ছুটাছুটি করিতেছে। বাঙ্গালী স্ত্রীলোকেরা ঘোমটা দিয়া ছেলে কোলে করিয়া অগ্রবর্ত্তী পুরুষদিগের অনুধাবন করিতেছে; পশ্চাতে

রেলওয়ে-কুলী এক মোট মাথায়, এক মোট হাতে লইয়া, চলিয়াছে। কোন গাড়ী-তেই স্থান নাই, তথাপি সকলেই উঠিতে চেষ্টা করিতেছে। এক গাড়ীতে প্রবেশ করিতে বাধা পাইয়া অন্য গাড়ীর দিকে ছুটিতেছে। কেহ চীৎকার করিয়া বলিতেছে—'আপনি ত আচ্ছা লোক মশাই, আমরাই গলদ্ঘর্ম্ম হয়ে মরৃছি, তবু আপনি দোর খোল্‌বার জন্য ধাক্কা মারছেন!' কেহ বলিতেছে—'কেন, আমরা কি ভাড়া দিই নাই?' কোথাও বচসা হইতে হাতাহাতি হইবার উপক্রম হইতেছে। কোথাও গার্ডকে ডাকা হইতেছে। যেখানে গার্ড আসিয়া জোর করিয়া লোককে গাড়ীতে উঠাইয়া দিতেছে, সেখানে নবপ্রবিষ্ট আরোহীরা বাধা-প্রদানকারীদিগকে বলিতেছে—'কেমন, এখন হ'ল ত! লাল-মুখের গুঁতো না হ'লে হয় না!' যেখানে গার্ড আরোহীদিগকে প্রবেশ করিতে দিল না, সেখানেও অন্য পক্ষের ঐ একই জয়গর্ব্বোক্তি। একখানি ইণ্টার ক্লাসের স্ত্রীলোকের কামরায় চুণা গলির এক জন আধফরসা 'সাহেব' 'মেমসাহেব'কে লইয়া বসিয়া আছেন। সে কামরায় আর কেহ নাই। কিন্তু সে দিকে কি গার্ড কি আরোহীরা কেহই যাইতেছে না। 'নেটিভ' স্ত্রীলোকদিগের জন্য দুই তিনখানি মাত্র গাড়ী। তাহার ভিতর অপোগণ্ড, কিশোরী, যুবতী, প্রৌঢ়া, বর্ষীয়সী,—সকল বয়সের,—হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি সকল ধর্ম্মের,—বাঙ্গালী, বেহারী, উড়িয়া, মহারাষ্ট্রী প্রভৃতি সকল জাতির, শিশু ও স্ত্রীলোক, বাঙ্গালীর সুসজ্জিত লাইব্রেরির পুস্তকাবলীর ন্যায়, কে কাহার ঘাড়ে বসিয়াছে, তাহার স্থিরতা নাই। একটিকে টানিয়া বাহির করিতে হইলে অপরগুলি স্থানচ্যুত হইয়া ছড়াইয়া পড়িবে। এক মুঙ্গের-মোহিনী তামাক টানিয়া কাশিতে কাশিতে এক বাঙ্গালী রমণীর মুখের দিকে ধুম পরিত্যাগ করিল। রমণী মুখে কাপড় দিয়া বলিল—'আঃ মরণ, লজ্জা করে না, তামাক খাচ্চে দেখ!' কিন্তু তাহার কফোণি হইতে মণিবন্ধ পর্য্যন্ত কাঁসার বালার বহর দেখিয়া আর অধিক কথা বলিতে পারিল না।

পান, বিড়ি, 'হট্টী'র সরবরাহ খুব চলিতেছে। কাগজওয়ালারা 'ষ্টেশ্‌ম্যান', 'ডেলিনুজ', 'বাঙ্গালী' করিয়া হাঁকিতেছে। পনর-আনা-এক্আনা-চুল-ছাঁটা, চোখে-চশমা, হাতে wrist-watch বাঁধা, মুখে চুরুট-ছোকরা বাবুরা গাড়ীর-মধ্যে স্ব স্ব স্থান সুরক্ষিত করিয়া রাখিয়া, ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে মেয়ে কামরাগুলির সম্মুখে পদচারণা করিতেছে; তাঁহাদের বিশ্বাস, মেয়েরা সকলে—অন্ততঃ তাহাদের স্বজাতীয়া বাঙ্গালী রমণীরা—তাহাদের সেই অদ্ভুত মূর্ত্তির

দিকে চাহিয়া তারিফ করিতেছে। বাবুদের কেহ কেহ হয়ত জননীর অহোরাত্র-পরিশ্রম-লব্ধ টাকাগুলি আত্মসাৎ করিয়া পলাইয়া আসিয়াছেন।

এক-দুই-তিন-ঘণ্টা বাজিল। ট্রেন একবার তীব্র চীৎকার করিয়া চলিতে আরম্ভ করিল।

ব্যাগ হইতে সংবাদপত্রগুলি বাহির করিয়া পড়িতে লাগিলাম। দেখিলাম, এক জন বাঙ্গালী সম্পাদক লিখিয়াছেন—'পূজার ছুটিতে বাঙ্গালী বাবুরা নানা স্থানে ফূর্ত্তি করিবার জন্য চলিয়াছেন; বাড়ীতে হতভাগিনী রমণীরা রহিল—দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া গোসেবা আর ঠাকুরপূজা করিবার জন্য! এমন স্বার্থপর নিষ্করুণ জাতির আবার উন্নতি!' স্ত্রীকে পড়িয়া শুনাইলাম। স্ত্রী বলিলেন—'লেখকের অন্যায় কথা। তিনি ষ্টেশনে আসিয়া স্বচক্ষে দেখিয়া গেলে, তাঁহার ভুল বুঝিতে পারিতেন। এই গাড়ীতে যে এত বাঙ্গালী ভদ্রলোক চলিয়াছেন, ইহাঁদের সকলের অবস্থা ত ভাল বোধ হইল না; কিন্তু অনেকেই ত স্ত্রী-পুত্র-কন্যাগণকে লইয়াই চলিয়াছেন। তবে যাঁহাদের অবস্থায় একেবারে কুলায় না, তাঁহারা কি করিবেন? স্ত্রীলোকদিগকে একাকী পাঠান যায় না; কাজেই নিজেরা বাহির হইয়াছেন। সমস্ত বৎসরের হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর পর দুই চারি দিনের জন্য একটু স্থানপরিবর্ত্তনও, সহৃদয় সম্পাদক মহাশয়ের সহ্য হইল না! ইঁহাদেরই জীবনের উপর যে সমস্ত পরিবারের জীবন নির্ভর করিতেছে। ভগবান্ আজ আমাদিগকে টাকা দিয়াছেন, কিন্তু যদি তাঁহার ইচ্ছায় আমরা একদিন দরিদ্র হইয়া পড়ি, আর তোমাকে সাধারণ বাঙ্গালীর ন্যায় পরিশ্রম করিয়া সংসার চালাইতে হয়, তাহা হইলে আমি আমার সামান্য একটু গহনা থাকিলেও তাহা বাঁধা দিয়া বা বিক্রয় করিয়া সেই টাকায় তোমাকে জোর করিয়া এই ছুটীতে দু'দিন নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিবার জন্য বিদেশে পাঠাইয়া দিতাম।'

আমি হাসিয়া বলিলাম—'আমি তোমাদিগকে ছাড়িয়া আসিতাম না।'

স্ত্রী বলিলেন—'তোমাকে জোর করিয়া পাঠাইয়া দিতাম। তুমি বাঁচিলে তবে ত আমরা।'

আমি বলিলাম—'সাহেবরা বলেন, আমরা বড় স্বার্থপর; আমরা আমাদের স্ত্রীলোকদিগকে দাসীর ন্যায় খাটাইয়া লই, কিন্তু তাহাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে আদৌ দৃষ্টি করি না। আপনারাই ভাল খাই, ভাল পরি, তাহারা না খাইতে পাইলেও ফিরিয়া দেখি না।'

'সাহেবরা বল্‌তে পারেন, তাঁরা আমাদের ঘরের খবর ত জানেন না। কিন্তু জেনে শুনে এদেশের লোকেরা ও কথা বলেন কি ক'রে? আমার 'সই'কে ত জান? তার স্বামী চাকরী করেন, বেশী মাইনে পান না, তার উপর তিন চারিটি ছেলে মেয়ে। সই বলে, "ভাই, তাঁকে ভাল জিনিস যা সামান্য কিছু খেতে দেওয়া যায়, তা' থেকেও তিনি কিছু কিছু পাতে ফেলে রেখে যান। কত মাথার দিব্য দিই, শুনেন না। বলেন—একে অভাবের সংসার, তায় শাশুড়ী নেই যে, বউকে দেখে শুনে খাওয়াইবেন। তাই যা খেতে না পারি, তোমার জন্যে পাতে ফেলে রেখে যাই। আমি বলি—কি পাগলের মত বল, আমি কি আমার জন্যে না রেখে তোমাকে দিই? তা ভাই, লজ্জার কথা বল্‌তে কি, এক একদিন হাঁড়ি দেখিয়ে বিশ্বাস করাতে হয়।" আমরা হিন্দুর মেয়ে, লোককে খাওয়াতে আমাদের যে আনন্দ, নিজে খেয়ে সে আনন্দ হয় না। মা'কে দেখেছ ত—(শৈলবালা স্বর্গগতা শাশুড়ীর কথা উঠায় তাঁহাকে হাত জোড় করিয়া উদ্দেশে প্রণাম করিল)—সংসারে কারও খাবার কোনও অভাব নাই; তবু তিনি নিজে ভাল জিনিষ খেতে পার্‌তেন না; পাঁচ জনকে দিয়ে, সামান্য একটু যা' থাকৃত, তাই খেতেন।'

আমি বলিলাম—'তোমরা কিন্তু এ বিষয়ে বড় বাড়াবাড়ি কর। নিজের শরীরকে একেবারে তুচ্ছ ক'রে সংসারের সেবায় মন দাও। প্রথমতঃ, ভগবান্ যে শরীর দিয়েছেন, সে শরীরকে তুচ্ছতাচ্ছীল্য কর্‌বার অধিকার কারও নাই; দ্বিতীয়তঃ, নিজের শরীর নষ্ট হ'লে কেবলই কি নিজেরই গেল? সংসারের সকলেরই যে তাতে কষ্ট ও অশান্তি।'

'শরীরকে অবহেলা করা দোষ, তা' স্বীকার করি। যে ইচ্ছা করে' শরীরের অযত্ন করে, তার ভারি অন্যায়। কিন্তু অবস্থা অনুসারে বাধ্য হ'য়ে অতিরিক্ত পরিশ্রমে যেমন পুরুষকেও শরীর ক্ষয় কর্‌তে হয়, অনেক স্ত্রীলোককেও সেইরূপ নিজের শরীর নষ্ট কর্‌তে হয়। তার, উপায় কি? কিন্তু সকলেই কি শরীর নষ্ট করে? মাছের মুড়ো না খেলে কি শরীর রক্ষা হয় না। পুষ্টিকর খাবার পেট ভ'রে খেতে পেলেই হ'ল। ভাল মন্দ জিনিস শ্বশুর, শাশুড়ী, স্বামী, সন্তান, সকলের সঙ্গে সমান ভাগে খেতে হ'বে, এ লোভ যে হিন্দুর মেয়ের হবে, তা'র মরণই ভাল। তার পর পরবার। দেখ্‌তে ত পাই, যার স্বামী আধময়লা কাপড় প'রে প্রত্যহ আপিস করে, তার স্ত্রীরও দুই একখানা গহনা আছে, দুই একখানা ভাল কাপড় আছে।

স্বামী কতটা স্বার্থত্যাগ করলে এই গহনা কাপড় হয়, তা কি নিন্দুক মহাশয়েরা জানেন না?'

* * * *

ভোর বেলা গাড়ী পুরী ষ্টেশনে পঁহুছিল। তখন যাত্রীদের নামিবার ও মালপত্র নামাইবার একটা মহাশব্দ আরম্ভ হইল। আবার ঘুষ দিবার পালা। কুলী কাহারও মাল টানিয়া তুলিয়া বলিল—'বাপ্ রে বাপ! ইয়ে তিন মোন্‌সে জাস্তি হোগা।' 'সে কি বাবু, হাবড়ায় যে ওজন ক'রে দিয়েছে।' 'হিঁয়া ফের্ ওজন হোগা।' এই বলিয়া মাল্ লইয়া প্ল্যাটফরমের এক পার্শ্বে ফেলিয়া রাখিল। 'তবে ওজন কর না বাপু!' 'তোমারা নবাব কা মাফিক বাৎ হ্যায়। দো ঘণ্টা বাদ ওজন হোগা।' 'সে কি! আমাদের মেয়েরা যে বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে!' কুলী কোনও উত্তর না করিয়া চলিয়া গেল। ভদ্রলোক কি করেন, আট আনা ঘুষ দিতে স্বীকার করিলেন। শেষে দুই টাকায় রফা। টাকা দুইটি দিবামাত্র কুলী মোট লইয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে আসিল, ওজন করিল না। মোট নামাইয়া সে আবার হাত পাতিল। 'আবার কি?' 'মুটের ভাড়া?' ভদ্রলোক 'কি ঝকমারি!' বলিয়া চারিটি পয়সা দিলেন। কুলী তাহা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল—'চার আনাসে এক পয়সা কম্‌তি নেহি।' আর কি হইবে, চারি আনাই দিতে হইল। একই মালের জন্য একদফা হাবড়ায় ঘুষ, আর এক দফা পুরীতে। কোথাও টিকিট কলেক্টর ছেলের বয়স লইয়া গোলমাল আরম্ভ করিয়াছে—এ ছেলের আধা ভাড়া হইতেই পারে না। তাঁহাকেও প্রসন্ন করিতে হইল।

আমার চাকর গাড়ী লইয়া দাঁড়াইয়াছিল। আমরা গাড়ী চড়িয়া আমার 'সাগরাবাসে'র অভিমুখে প্রস্থান করিলাম।

৩

সকাল সন্ধ্যায় সমুদ্রতীরে কি জনতা! স্ত্রীপুরুষ বালক বালিকার মহামেলা; স্বামী পুত্রের বা কন্যার হাত ধরিয়া চলিয়াছেন, পার্শ্বে একটু ঘোমটা টানিয়া স্ত্রী চলিয়াছেন; পশ্চাতে দাস বা দাসী শিশুকে কোলে লইয়া চলিয়াছে। কোথাও বহুক্ষণব্যাপী ভ্রমণে পরিশ্রান্ত ব্যক্তিগণ বালুকার উপর বসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন। বালক বালিকারা সমুদ্রের দিকে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া ছুটাছুটি করিয়া নানা বর্ণের ঝিনুক কুড়াইতেছে। সমুদ্র গোঁ গোঁ শব্দ করিতে করিতে কূলে আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িতেছে, তাহার কি দুঃখ, সেই জানে!

জেলেরা ভেলায় চড়িয়া উত্তাল তরঙ্গ ভেদ করিয়া সমুদ্রে মাছ ধরিতে যাইতেছে। ভ্রমণকারীদিগের মধ্যে কেহ কেহ পয়সা আনি দুয়ানি প্রভৃতি সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ করিতেছেন, আর উলঙ্গ জালিক-বালকেরা জলে ডুবিয়া তাহা তুলিয়া আনিতেছে। আমরাও বেড়াইতেছিলাম। সাগরকূলের এই দৃশ্যে আমরা অত্যন্ত প্রীতি অনুভব করিতেছিলাম।

সেদিন বেড়াইতে বেড়াইতে আমরা অনেক দূর গিয়া পড়িয়াছি। আমার চারি বৎসরের কন্যা হেমা কখনও হাঁটিতেছে, কখনও বা চাকরের স্কন্ধে উঠিয়া যাইতেছে। আমার স্ত্রী বলিলেন—'আর কাজ নাই, চল ফিরিয়া যাই।' ফিরিলাম। কিয়দ্দূর আসিতে আসিতে দেখি, আমাদের সম্মুখে অনতিদূরে একটি পুরুষ ও একটি রমণী চলিয়াছেন। একটি বালক পুরুষটির হাত ধরিয়া চলিয়াছে; আর একটি শিশুকে তিনি ক্রোড়ে করিয়াছেন। স্ত্রীলোকটির বক্ষেও একটি শিশু, সে মাতার স্কন্ধে মাথা রাখিয়া ঘুমাইতেছে। আমাদের পদশব্দে স্ত্রীলোকটি একবার আমাদের দিকে ফিরিয়া চাহিল, তখনই মুখ ফিরাইয়া মাথার কাপড় টানিয়া দিল। শীর্ণ পাণ্ডুর মুখ! বয়স বাইশ তেইশের অধিক হইবে না, কিন্তু দেখিলে চল্লিশের উপর বলিয়া মনে হয়। রমণী কঙ্কালসার দেহে অতিকষ্টে শিশুসন্তানটিকে বহন করিতেছে।

দেখিয়া কষ্ট হইল। আমার স্ত্রী অতি মৃদুস্বরে আমাকে বলিলেন—'হেমাকে আমি কোলে করিয়া লইতে পারি। গোবিন্দ উঁহার শিশুটিকে কোলে লইলে হয় না?'

আমি একটু চিন্তা করিয়া ভদ্রলোকটির নিকট অগ্রসর হইয়া বলিলাম—'যদি কিছু মনে না করেন, একটি কথা বলি।' ভদ্রলোকটি বিস্মিত হইয়া বলিলেন—'কি—বলুন না।'

আমি রমণীর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলাম—'উঁহাকে অত্যন্ত দুর্ব্বল দেখিতেছি, শিশুটিকে লইয়া পথ চলিতে উঁহার অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে। আমার স্ত্রীর ইচ্ছা, শিশুটিকে আমার চাকরের কোলে দেন।'

ইতি মধ্যে আমার স্ত্রী সেই রমণীর পার্শ্বে গিয়া অস্ফুটস্বরে তাঁহার সহিত কি কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিয়াছেন। রমণী দুই একবার ঘাড় নাড়িলেন—বোধ হয় আমার স্ত্রীর প্রস্তাবে তাঁহার অসম্মতি জানাইলেন। কিন্তু আমার স্ত্রী ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি জোর করিয়া নিদ্রিত শিশুটিকে রমণীর বক্ষঃ হইতে কাড়িয়া লইয়া গোবিন্দের হস্তে দিলেন। পুরুষটির চক্ষু সজল

হইয়া উঠিল। তিনি আমাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার জন্য কি বলিতে যাইতেছিলেন, আমি তাহাতে বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—

'আপনারা কোথা হইতে আসিতেছেন?'

'কলিকাতা হইতে?'

'কত দিন এখানে থাকিবেন?'

'মহাপ্রভুই জানেন।'

আমি বলিলাম—'কেন বলুন দেখি?'

পুরুষটি একটি গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—

'কি আর বলিব মহাশয়! অতি সামান্য বেতনে কেরাণীগিরি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করি। সংসারে আমি, আমার স্ত্রী ও এই তিনটি শিশু। দুঃখের সংসারে আমার স্ত্রীর গুণে দুঃখের জ্বালার অনেক লাঘব হইয়াছিল। প্রত্যহ অভাবের সহিত স্ত্রীকে কিরূপ সংগ্রাম করিতে হইত তাহা বুঝিতাম বুঝিয়া অন্তরে যন্ত্রণা অনুভব করিতাম; কিন্তু একদিনও উঁহার মলিন মুখ দেখি নাই। উঁহার সুব্যবস্থায় কখনও আমাকে ঋণদায়ে পড়িতে হয় নাই। গত শ্রাবণ মাসে আমার বিষম পীড়া হয়। কয়েকদিন আমি সংজ্ঞাশূন্য অবস্থায় ছিলাম। আমার স্ত্রী তাঁহার গহনাপত্র সমস্ত বিক্রয় করিয়া আমার চিকিৎসা করাইয়া আমার প্রাণরক্ষা করেন। আমি বাঁচিলাম, কিন্তু অত্যধিক পরিশ্রমে উঁহার শরীর নষ্ট হইতে লাগিল। পাছে আমি উদ্বিগ্ন হই, এই জন্য যতদিন গোপন করা সম্ভব, উনি নিজ শরীরের অবস্থা গোপন করিয়াছিলেন। কিন্তু আজ মাস খানেক হইল উঁহার শরীরের অবস্থা বড়ই খারাপ হইয়াছে। ডাক্তার পুরীতে আনিবার পরামর্শ দিলেন। হাতে একটি পয়সা নাই। স্ত্রীর একান্ত নিষেধ সত্ত্বেও সকালে ছেলে পড়ান, দশটা হইতে সন্ধ্যা ছয়টা পর্য্যন্ত আফিসে চাকরী, আবার রাত্রে ছেলে পড়ান, এইরূপে আর আফিসের দরোয়ানের নিকট হইতে ধার করিয়া, মোট যাট্ টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলাম। তাহা হইতে রেলভাড়া গিয়াছে। আজ আট দিন হইল আসিয়াছি। এক পাণ্ডার বাড়ীতে আছি। একখানি ক্ষুদ্র কুঠারী, তাহারই ভাড়া প্রত্যহ বার আনা। শরীরের উপকার কিছুমাত্র হয় নাই। তাই বলিতেছিলাম, এখন মহাপ্রভুর মনে যা' আছে, তাহাই হইবে।' বলিয়া ভদ্রলোকটি এমনই একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন যে, তাহাতে তাঁহার সমস্ত শরীর কম্পিত হইয়া উঠিল।

তাঁহারা সমুদ্রতীর হইতে সহরের ভিতর দিকে চলিলেন। আমরা বিদায় লইলাম। নিষেধ সত্ত্বেও গোবিন্দ তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে শিশুটিকে ক্রোড়ে লইয়া তাঁহাদের বাসা পর্য্যন্ত চলিল।

আসিতে আসিতে স্ত্রীর নিকট ঐ কথাই শুনিলাম। বাড়ীতে ফিরিয়া আসিবার কিয়ৎকাল পরে গোবিন্দ ফিরিয়া আসিল। তাহার নিকট উঁহাদের বাসার যে বিবরণ শুনিলাম, তাহাতে আমাদের যেন হৃৎকম্প হইতে লাগিল। স্ত্রী বলিলেন—'আর কালবিলম্ব করা উচিত নয়। এই পরিবারটিকে রক্ষা করিতে হইলে আজই উহাদিগকে উঠাইয়া এখানে আনা উচিত।'

বিকাল বেলা গোবিন্দকে সঙ্গে লইয়া তাঁহাদের বাসায় গেলাম। কি আবর্জ্জনা, কি দুর্গন্ধ! রোগীর কথা দূরে থাকুক, সুস্থ অবস্থায় যে কেহ সেখানে থাকিবে, তাহারও স্বাস্থ্যহানি অবশ্যম্ভাবী। আমরা বাহিরে দাঁড়াইয়া শুনিলাম, গৃহস্বামীর সহিত সেই দরিদ্র পরিবারের বাদ বিতণ্ডা চলিতেছে। আজ গত এক সপ্তাহের ভাঁড়া পাঁচ টাকা চারি আনা মিটাইয়া দিবার সময় গৃহস্বামী বলিল—'প্রত্যহ এক টাকা হিসাবে দিতে হইবে।' কারণ, তাঁহারা ঐ কুঠারী-সংলগ্ন একটি অপ্রশস্ত দালানও ব্যবহার করিতেছেন। ভদ্রলোক বলিলেন—'দালান ত কুঠারীরই সামিল।' গৃহস্বামী বলিল—'না, এ সময় ঐ দালানেরই ভাড়া প্রত্যহ এক টাকা।' এইরূপে বাদবিতণ্ডা হইতে হইতে গৃহস্বামী অতি-রুক্ষভাবে বলিল—'পয়সা নেই ত পুরীতে হাওয়া খেতে আস্‌বার বড়মানুষী কেন? আজ শুদ্ধ আট দিনের আট টাকা ভাড়া দিয়ে এখনই উঠে যাও।' রমণী ক্ষীণস্বরে স্বামীকে বলিল—'তাই কর, চল আজই রাত্রের গাড়ীতে কল্‌কাতায় যাই। তোমাকে বার বার বারণ কর্‌লুম এখানে আস্‌তে, তুমি ত শুন্‌লে না! সকলে না এসে তুমি একেলা এলে বরং তোমার শরীর কিছু ভাল হ'ত।' ভদ্রলোক দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—'মহাপ্রভুর যখন তাই ইচ্ছা, তখন চল বাড়ীই যাওয়া যাক্‌। সন্ধ্যার গাড়ীতেই যাব। তার বন্দোবস্ত করি।' বলিয়া বাহিরে আসিলেন।

আমাকে দেখিয়া কৃতজ্ঞতাসহকারে বলিলেন—'আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা গ্রহণ কর্‌বেন, মহাশয়! আমার স্ত্রীর নিকট আপনার স্ত্রীর কথা শুনে তাঁকে দেবী বল্‌তে ইচ্ছা করে। মনে ক'রেছিলাম, যাবার পূর্ব্বে আর একদিন আপনাদের সঙ্গে দেখা ক'রে আস্‌ব। কিন্তু তা' আর হ'ল না। আমরা আজই চলিলাম।'

'তা' আমরা বাহির হইতেই শুনিয়াছি। কিন্তু আমার একটি অনুরোধ আছে। আমি আপনার স্ত্রীকে সহোদরার ন্যায় জ্ঞান করি। যতদিন তিনি সুস্থ না হ'ন্, ততদিন সমুদ্রতীরে আমার বাড়ীতেই আপনারা থাকিবেন। আমার স্ত্রীরও এই অনুরোধ।'

ভদ্রলোক কিয়ৎকাল নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন। তাঁহার চক্ষু দিয়া কৃতজ্ঞতার অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। আমার ইঙ্গিতে গোবিন্দ একখানি গাড়ী আনিয়া হাজির করিল, এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বেই তাঁহারা আমার 'সাগরাবাসে' উপস্থিত হইলেন।

আমার সহোদরা ছিল না। কিন্তু সে বৎসর আমি ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় সহোদরার অভাব অনুভব করি নাই। একটি প্রীতিপূর্ণ পবিত্র হৃদয় একান্ত আগ্রহে আমার জন্য 'যমের দুয়ারে কাঁটা' দিয়াছিল।

সত্যই কি বাঙ্গালী স্ত্রীপীড়ক, স্বার্থপর, নিষ্করুণ জাতি?

শ্রীসরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রাচীন শিল্প-পরিচয়।

প্রসাধনী।

নববিধ রাজোপকরণের মধ্যে প্রসাধনী অন্যতম। ইহা এখন চিরুণী নামে পরিচিত। ইহা সাধারণের ব্যবহার্য্য হইলেও, নৃপতিদিগের ব্যবহার্য্য এই ক্ষুদ্র জিনিসটিরও বিশেষ নিয়ম অবধারিত হইয়াছিল। যুক্তিকল্পতরু-পাঠে জানা যায় যে, দশ, নয়, আট ও সাত অঙ্গুলী পরিমিত প্রসাধনী যথাক্রমে ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণ নৃপতিদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। আবার জাঙ্গলাদি ত্রিবিধ দেশজাত রাজাদিগের জন্য কাষ্ঠজ, ধাতুজ এবং শৃঙ্গজাত প্রসাধনী বিহিত হইয়াছিল। সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহের দশাবিশেষজাত নৃপতিদিগের জন্য স্বর্ণ ও রজত প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ধাতুতে নির্ম্মিত প্রসাধনীর ব্যবস্থা দেখা যায়। মৃগ-শৃঙ্গ, মহিষ-শৃঙ্গ ও গজ-দন্ত, এই ত্রিবিধ জান্তব পদার্থের দ্বারা রাজার প্রসাধনী প্রস্তুত হইত। চামর-দণ্ডের ন্যায় উহাতেও রত্নবিন্যাসের পরিচয় পাওয়া যায়।

বিতান।

বিতান বা চন্দ্রাতপের বিবরণ সংস্কৃত সাহিত্যে অতি সুপরিচিত। তাহা অন্যত্র আলোচিত হইবে; সুতরাং উপকরণ প্রকরণে উহা উপেক্ষিত হইল।

শয্যা।

নৃপতিদিগের উপভোগ্য শয্যারও নানাপ্রকার বর্ণবিভাগ দেখা যায়। অমাত্য, রাজা ও সম্রাট, ইঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন শয্যার ব্যবস্থা ছিল। শুক্লবর্ণ শয্যা সকলের পক্ষেই উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

বাৎস্যায়নের কামসূত্র-পাঠে জানা যায় যে, শয্যা-রচনা চতুঃষষ্টি কলার অন্যতম কলা বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। (১) টীকাকার যশোধরের ব্যাখ্যান হইতে জানা যায় যে, ঋতুভেদ, এবং অনুরক্ত, বিরক্ত ও মধ্যস্থ, অর্থাৎ যে অনুরক্তও নয়, অথচ বিরক্তও নয়, এই তিন প্রকার লোকের অভিপ্রায়ানুসারে এবং আহারের পরিণামবিশেষানুসারে ভিন্ন ভিন্ন শয্যা-রচনার কৌশল উদ্ভাবিত হইয়াছিল। গ্রীষ্ম ঋতুতে ব্যবহার্য্য শয্যা বর্ষাকালে বা শীতসময়ে সুখপ্রদ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। সুতরাং সমৃদ্ধ মানবের বিভিন্ন শয্যা-নির্ম্মাণ-প্রণালী শিল্পীদিগের চিন্তার বিষয় হইয়াছিল। রামায়ণ-পাঠে ভরতের উক্তি হইতে জানা যায় যে, শয্যার উপর ঋতুভেদে সুখপ্রদ চর্ম্ম বিস্তৃত হইত; উৎকৃষ্ট আস্তরণও ব্যবহৃত হইত। অনুরক্ত বিরক্তাদির উপযোগিনী শয্যায় কিরূপ প্রভেদ ছিল, বর্ত্তমান সাহিত্যে তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না। শয্যার কোমলতাই সাধারণতঃ উৎকর্ষ বলিয়া বিবেচিত হইত। নৈষধচরিতে নলরাজার শয্যা শশাকের মত কোমল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। যুক্তিকল্পতরুতে সাধারণতঃ শয্যার পাঁচটি গুণ কথিত হইয়াছে। যথা—'বিশীর্ণতা, কোমলতা, উচ্চতা, সমতা, এবং স্বচ্ছতা'। অত্রত্য বিশীর্ণতা শব্দে তোষক প্রভৃতির মধ্যবর্ত্তী পদার্থের শিথিলতা অভিপ্রেত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

বাৎস্যায়নের কামসূত্রে সমৃদ্ধ মানবদিগের বাসভবনে দুই প্রকার শয্যা রাখিবার ব্যবস্থা দেখা যায়। এই দুই শয্যার মধ্যে এক শয্যা শয়নের জন্য, অপর শয্যা সম্ভোগার্থ ব্যবহার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। প্রথমোক্ত শয্যা শ্লক্ষ্ণ, অর্থাৎ অতি মনোরম হওয়া আবশ্যক। ইহার উভয় দিকে অর্থাৎ শিরোভাগে ও চরণের দিকে উপাধান (বালিস) স্থাপিত, এবং ইহা মধ্যভাগে বিনত, অর্থাৎ বিশেষরূপ মৃদু হওয়া আবশ্যক। ইহার উত্তরচ্ছদ (উপরের চাদর) শুক্লবর্ণ।

সম্ভোগার্থ শয্যা প্রতিশয্যিকা নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহার আকার ক্ষুদ্র, এবং উচ্চতা কিঞ্চিৎ ন্যূন হইবার ব্যবস্থা আছে।

(১) শয়নরচনম্।

এই দ্বিবিধ শয্যার ব্যবস্থা কেবল সদাচারসম্পন্ন ব্যক্তির জন্যই কল্পিত হইয়াছিল। সাধারণের পক্ষে এক প্রকার শয্যারই পরিচয় পাওয়া যায়। সম্ভোগসাধন শয্যা অপবিত্র, সুতরাং তাহাতে শুচি ব্যক্তির শয়ন কর্ত্তব্য নহে। অতএব, তাহার জন্য পৃথক শয্যার প্রয়োজন।

শয্যার উপকরণ তোষক, গদী প্রভৃতি তুলার জিনিস তুলিকা নামে অভিহিত হইয়াছে। কুলচূড়ামণিতন্ত্রে প্রসূন-তুলিকার উল্লেখ পাওয়া যায়। পুষ্পশয্যার বর্ণনা অন্যান্য স্থলেও পরিদৃষ্ট হয়।

ব্যজন।

ব্যজনের অর্থাৎ পাখারও বর্ণ ও পরিমাণের ব্যবস্থা দেখা যায়। ত্রিবিধ রাজার জন্য ইহারও পৃথক্ পৃথক্ উপাদান নির্দ্দিষ্ট ছিল। পক্ষ, বস্ত্র ও শলাকা, এই ত্রিবিধ উপাদানের দ্বারা 'ব্যজন' নির্ম্মিত হইত।

দর্পণ।

দর্পণ রাজাদিগের অষ্টম উপকরণ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। স্বর্ণ, রজত, সিসক ও লৌহ, এই চারি প্রকার ধাতুর দ্বারা দর্পণ প্রস্তুত হইত। পূর্ব্বকালে কাচের দ্বারা দর্পণ নির্ম্মিত হইত কি না, যুক্তিকল্পতরুতে তদ্বিষয়ের কোনও উল্লেখ দেখা যায় না। কিন্তু সে কালেও যে দর্পণে পারদের ব্যবহার হইত, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। কারণ, ভব্য নামক দর্পণের 'রসাঢ্য' বিশেষণ দেখা যায়। এ স্থলে রস-শব্দ পারদার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। চারি জাতি রাজার জন্য ভব্য, সুখ, জয় ও ক্ষেম, এই চারিপ্রকার দর্পণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

ভব্য-দর্পণ একবিতস্তি-পরিমিত হইত। এই পরিমাণ হইতে ক্রমে চারি অঙ্গুলি বৃদ্ধি করিলে দর্পণের সুখ, জয় ও ক্ষেম সংজ্ঞা হইত। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, দীর্ঘে প্রস্থে চতুরঙ্গুলিপরিমিত বিজয় নামক দর্পণ সকলেরই সুখপ্রদ বলিয়া বিবেচিত হইত। কিন্তু চক্রবর্ত্তী অর্থাৎ সার্ব্বভৌম, সামান্য রাজা ও ব্রাহ্মণ, ইঁহাদের দর্পণের পরিমাণ পৌরুষ, তদর্দ্ধ, এবং তদর্দ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। একটি পুরুষ দাঁড়াইলে তাহার যে উচ্চতা অনুভূত হয়, তাহাই 'পৌরুষ' নামে অভিহিত হইয়াছে। অষ্টলৌহ-বিনির্ম্মিত অর্থাৎ অষ্টপ্রকার ধাতুর দ্বারা ঘটিত দর্পণ সকলেরই উপযুক্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। লক্ষণানুসারে দর্পণের আবার দৈব, মানুষ ও রাক্ষস, এই তিন প্রকার সংজ্ঞা দেখিতে পাওয়া যায়। দৈব দর্পণের ব্যবহারে সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি হয়; মানুষ-দর্পণের ব্যবহারে

সুখ-সম্পদ্-লাভ হয়; এবং রাক্ষস-দর্পণ-ব্যবহারে বিপদ্ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু কার্য্যবিশেষে আবার সকলের পক্ষেই ত্রিবিধ দর্পণ ব্যবহারের বিধি আছে।

ভোজরাজের মতে, দেবতার আরাধনকার্য্যে দৈব-দর্পণ ব্যবহার্য্য; বিলাসের জন্য মানুষ-দর্পণ, এবং যুদ্ধকার্য্যে রাক্ষস-দর্পণে মুখদর্শন বিহিত হইয়াছে।

শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ।

বাঙ্গালার প্রাচীন ইতিহাস।

প্রথম বক্তৃতা।

[কলিকাতার চৈতন্য লাইব্রেরীতে শ্রীযুত অনরেবল এফ. জে. মোনাহান কর্ত্তৃক প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ।]

ভারতীয়-ইতিহাস-আলোচনায় অন্তরায়—প্রাদেশিক ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তা—ভারতের ও বাঙ্গালার ইতিহাসের উপকরণ—উত্তর-ভারতের ঐতিহাসিক যুগের আরম্ভকাল,—ভারতীয় সভ্যতার মূলস্থান ও প্রসার-ক্ষেত্র—ভারতীয় সভ্যতা ও বৈদেশিক আক্রমণ;—মৌর্য্যযুগের সভ্যতার অবস্থা—মৌর্য্যযুগের বাঙ্গালাদেশ,—খৃষ্টীয় দ্বিতীয় হইতে পঞ্চ শতাব্দী, গুপ্ত-সাম্রাজ্য ও হুণ-আক্রমণ—খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী,—খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী, হর্ষ-সাম্রাজ্য—গৌড়—কর্ণ-সুবর্ণ—শশাঙ্ক—পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ও কামরূপ—হর্ষের শাসনকালে বাঙ্গালার অবস্থা,—তিব্বত ও চীনের সহিত রাজনৈতিক সম্পর্ক—যশোবর্ম্মের বাঙ্গালা-আক্রমণ—বাঙ্গালার রাজ-নির্ব্বাচন, বাঙ্গালীর সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার মূল-প্রকৃতি।

ভারতীয়-ইতিহাস-আলোচনার অন্তরায়।

১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ লিখিয়াছিলেন যে,—"ভারতবর্ষের ইতিহাসে, আলেকজান্দারের আক্রমণের পূর্ব্বে কোনও রাজনীতিক ঘটনার কাল নিরূপিত হইবার উপায় ছিল না; এবং মুসলমান-বিজয়ের পরবর্ত্তী কাল ব্যতীত তৎ-পূর্ব্বকালের রাষ্ট্রীয় ব্যাপারাদির কার্য্যকরণ-সম্বন্ধের ধারা-আবিষ্কারের চেষ্টাও অসম্ভব ছিল।" ভিন্সেণ্ট স্মিথ তাঁহার ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস বিষয়ক সর্ব্বজনপ্রশংসিত পুস্তকের মুখবন্ধে, প্রাগুক্ত ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের পর হইতে, এতদ্দেশের লুপ্ত ইতিহাসের পুনরুদ্ধারকার্য্য যে কিরূপ বহুলপরিমাণে অগ্রসর হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়া, এবং তাঁহার স্বরচিত গ্রন্থ যে ভারতবর্ষের অষ্টাদশ-শতাব্দীব্যাপী রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের প্রধান প্রধান ঘটনার ধারাবাহিক বিবরণের প্রযত্নমাত্র, তাহা নিবেদন করিয়া, ভারতীয় ইতিহাসের যে কোনও যুগের তথ্যানুসন্ধানে যে বিশিষ্ট অন্তরায় সমুপস্থিত হয়, তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত

হইয়াছেন। সে অন্তরায়ের হেতু এই যে, ইউরোপখণ্ডের যে-কোনও দেশের অধিবাসিগণ সামাজিক হিসাবে ও রাজনীতিক হিসাবে এক জাতি ; কিন্তু ভারতবর্ষ ভৌগোলিক ও রাজনীতিক হিসাবে এক হইলেও, ঐতিহাসিক আলোচনার পক্ষে এক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না ; এবং এই কারণে, ইউরোপখণ্ডের দেশগুলির ইতিহাস-আলোচনায় যেরূপ সুবিধা আছে, ভারতবর্ষের ইতিহাস-আলোচনায় তাদৃশ সুবিধা নাই। তিনি বলিয়াছেন :—

"সাগর-ভূধর-পরিবেষ্টিত ভারতবর্ষ যে ভৌগোলিক হিসাবে এক, সে বিষয়ে তর্কের অবসর নাই ; এবং ভৌগোলিক হিসাবে এক হওয়ায়, তাহার এক নামকরণই যথার্থ হইয়াছে। ভারতীয় সভ্যতার আদর্শের নানা অঙ্গ আছে ; তাহার সহিত জগতের অন্যান্য প্রদেশের সভ্যতার অঙ্গের কোনও সাদৃশ্য নাই ; কিন্তু সেগুলি এই সমগ্র দেশের—অথবা মহাদেশের—পক্ষে এমন সাধারণ যে, মানুষের সামাজিক ও মানসিক ক্রমবিকাশের ইতিহাস-আলোচনা-কালে সে সভ্যতাকে এক বলিয়াই ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। কিন্তু অবিসংবাদী শক্তিসম্পন্ন সার্ব্বভৌম নৃপতির শাসনাধীনে, ভারতবর্ষের যে পূর্ণাঙ্গ রাজনীতিক একতা ঘটিয়াছিল, তাহা গতকল্যকার ঘটনা ; তাহার বয়ঃক্রম কোনও ক্রমে এক শতাব্দী হইবে। ভারতবর্ষের পুরাযুগের নৃপতিবৃন্দের মধ্যে যাঁহারা সুপ্রসিদ্ধ, তাঁহারা একচ্ছত্র ভারত-সাম্রাজ্যের আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করিতেন, এবং তাহার সংস্থাপনে ন্যূনাধিকপরিমাণে সাফল্যও লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু কেহই সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই।—তাহাতেই প্রতীয়মান হয় যে, ভারতের রাজনীতিক ইতিহাসে একতার অভাব ছিল; এবং সেই একতার অভাবই ঐতিহাসিকের কার্য্যকে দুরূহ করিয়া তুলিয়াছে।

"গ্রীসের ইতিহাস-লেখকের পক্ষে এতাদৃশ দুরূহতার পরিমাণ আরও অধিক ; কিন্তু সে ক্ষেত্রে, একতার অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসের কৌতূহল অন্তর্হিত হইয়া যায়। ভারতবর্ষের পক্ষে ব্যাপার ঠিক ইহার বিপরীত। একতা-লাভের মাত্রার সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের কৌতূহলের মাত্রাও বর্দ্ধিত হইয়া উঠে।—কারণ, রাজনীতিক ঐক্যতার শৃঙ্খলে বাঁধিয়া ভারতেতিহাসের আনুপূর্ব্বিক ঘটনাবলীকে সুবিন্যস্ত না করিলে, তাহারা দুঃসহরূপে বিরক্তিকর হইয়া দাঁড়ায়।

"ভারতবর্ষের ইতিহাসকে পঠনীয় করিতে হইলে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের ইতিহাসকে নগণ্য করিয়া, অথবা অতি নিম্ন স্থান দিয়া, মুখ্যতঃ তাহাতে প্রধান প্রধান রাজবংশের ইতিহাসের আলোচনা করা ব্যতীত উপায় নাই। এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ তাঁহার

সুপ্রতিষ্ঠিত গ্রন্থে এই নীতিরই অনুসরণ করিয়াছিলেন; এবং কার্য্যতঃ দিল্লীর সুলতানদিগের ও তাঁহাদিগের মোগল উত্তরাধিকারিগণের কার্য্যবিবরণেই তাঁহার আখ্যায়িকা নিবদ্ধ করিয়াছিলেন। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থেও সেই নীতিই প্রযুক্ত হইয়াছে।—যে সকল রাজবংশ স্ব স্ব শাসনকালে সার্ব্বভৌমত্ব লাভ করিয়াছিল, বা তাহার আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিল, এই গ্রন্থে সেই সকল রাজবংশই বিশিষ্টরূপে আলোচিত হইল।"

উপরি-উদ্ধৃত বাক্যের সহিত আমি একমত হইতে পারিলাম না।—কারণ, উহাতে ভারতবর্ষের প্রাদেশিক স্থানীয় ইতিহাসের কৌতুহলকে উৎসাহ-হীন করে।

প্রাদেশিক ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তা।

আমার বোধ হয়, ভারতবর্ষে সামাজিক ও রাজনীতিক একতার যেরূপ অভাব, এবং বিষয়ের যেরূপ বিস্তৃতি ও প্রকার-বাহুল্য, তাহাতে ভারতবর্ষের সাধারণ ইতিহাস-অধ্যয়নের সহিত, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ বা দেশবিভাগকে স্বয়ং সম্পূর্ণ ক্ষুদ্রতর রাজনীতিক রাষ্ট্র-জ্ঞানে, তাহাদিগকেও ইতিহাসের বিশেষ তথ্যানুসন্ধানে সংযুক্ত না করিলে, ভারতবর্ষের ইতিহাসকে সমগ্রভাবে উপস্থাপিত করিবার চেষ্টা সুফল প্রসব করিবে না। ইউরোপের বিভিন্ন প্রদেশের ইতিহাস যে সকল গ্রন্থে নিবদ্ধ আছে, সেই সকল বিশিষ্ট পুস্তকের সাহায্য ব্যতিরেকে, ইউরোপের ইতিহাস-অধ্যয়নের চেষ্টা করিলে যেমন হয়, ইহাও তেমনই হইবে। আমার ধারণা, ভারত-ইতিহাসে যে সাধারণের এমন অমনোযোগ, তাহার প্রধান হেতু এই যে, সুপ্রতিষ্ঠ ইতিহাস-গ্রন্থসমূহে ভারতবর্ষ কেবল সমগ্র ভাবেই বিবেচিত হইয়াছে; এবং তাহারই ইতিহাস গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে প্রাদেশিক ও স্থানীয় ইতিবৃত্ত আদৌ সমাদর লাভ করে নাই। আমার আরও মনে হয়,—এক হিসাবে ধরিতে গেলে, মুসলমান-রাজত্বের ইতিহাস-গ্রন্থনিচয়ে, দিল্লীর সুলতানগণের ও তাঁহাদিগের মোগল উত্তরাধিকারিবর্গের কার্য্যাবলীই নিবদ্ধ হওয়ায়, ভারতবর্ষ ও তাহার ইতিহাস সম্বন্ধে বহু ভ্রান্ত ধারণার উদ্ভব হইয়াছে। ইহাও বলিতে পারি যে, ভিনসেণ্ট স্মিথের রচিত গ্রন্থ অতি সুন্দর হইলেও, তিনি ভারত-ইতিহাসের যে সকল অন্তরায়ের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাই তাঁহার গ্রন্থকে অনেকাংশে নীরস ও দুষ্পাঠ্য করিয়া তুলিয়াছে। অথচ, যাঁহারা বাঙ্গালার ইতিহাসের অধ্যয়নে আগ্রহবান্, তাঁহারাও তাঁহার গ্রন্থে ভারতের এতৎপ্রদেশসম্বন্ধীয় আলোচনা কিঞ্চিৎ অপ্রচুর বলিয়াই বোধ করিবেন।

ভারতের ও বাঙ্গালার ইতিহাসের উপকরণ।

প্রাদেশিক ইতিহাসের উপকরণ এক্ষণে অতি সামান্য, সন্দেহ নাই। কিন্তু একটু আলোচনা করিলেই দেখা যাইবে যে, অন্ততঃ বাঙ্গালার ইতিহাসের সকল মূল এখনও সম্পূর্ণরূপে অনুসন্ধান করা হয় নাই। এ পর্য্যন্ত যাহা আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা কৌতুহলোদ্দীপক বটে, এবং আমাদের জ্ঞানের মাত্রা, ধীরে ধীরে হইলেও, ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইতেছে; কিন্তু ইতিহাসের তত্ত্বানুসন্ধিৎসুর নিকট এখনও আলোচনা ও গবেষণার বিস্তৃত ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে।

ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ, ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের মূল উপকরণগুলিকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম,—জনশ্রুতি;—যাহা প্রধানতঃ দেশীয় সাহিত্যে লিপিবদ্ধ আছে। দ্বিতীয়,—বৈদেশিক পর্য্যাটক ও ঐতিহাসিকগণের রচনা,—যাহাতে ভারতবর্ষের নানা বিষয় সম্বন্ধে অভিমত স্থান লাভ করিয়াছে। তৃতীয়,—পুরাবস্তুতত্ত্বঘটিত প্রমাণ;—ইহাকেও আবার স্মৃতিসম্বন্ধীয়, লেখ-সম্বন্ধীয়, এবং মুদ্রা-সম্বন্ধীয়, এই তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এবং চতুর্থ,—সমসাময়িক অথবা প্রায় সমসাময়িক দেশীয় সাহিত্যের কতিপয় গ্রন্থ;—যাহাতে ঐতিহাসিক বিষয়েরই আলোচনা আছে।

ইয়োরোপের পণ্ডিতগণের নিকট ইতিহাসের যে সকল উপাদান সুবিদিত, এবং সমুপনীত, তাহার বিচার করিয়া দেখিলে, ভিন্‌সেণ্ট স্মিথের এই চতুর্ব্বিধ বিভাগকেই সম্পূর্ণ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু যত দূর জানিতে পারা গিয়াছে, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাকে প্রকৃত ঐতিহাসিক গ্রন্থ বলা যাইতে পারে, ভারতবর্ষের প্রাচীন সাহিত্যে এমন কোনও গ্রন্থ নাই; সে সাহিত্য আছে—সংস্কৃত মহাকাব্যে ও পুরাণে, এবং রাজতরঙ্গিণী, হর্ষচরিত, গৌড়বহো ও রামচরিত প্রভৃতি ঐতিহাসিক, অথবা চরিতাখ্যায়ক কাব্যে বর্ণিত অর্দ্ধ-ঐতিহাসিক আখ্যায়িকায়; আর আছে ধর্ম্ম, বিজ্ঞান, ব্যাকরণ, দর্শন, স্মৃতি ও অন্যান্য বিষয়ের গ্রন্থে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত নানা বিষয়ের উল্লেখ—তাহাই কত ঐতিহাসিক ঘটনার ও আখ্যায়িকার উপর, এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের ও বিভিন্ন কালের সভ্যতার ও সামাজিক অবস্থার উপর আলোকসম্পাত করে। এই কারণে, সংস্কৃত হউক, পালি হউক, বাঙ্গালা হউক, বা হিন্দী হউক, অপর কোনও প্রাকৃত বা প্রাদেশিক ভাষাই হউক, ভারতীয় সমগ্র সাহিত্যই ভারতবর্ষের ইতিহাসের উপাদান-সংগ্রহের অনুসন্ধান-ক্ষেত্র। এ ক্ষেত্র যে কত বৃহৎ, তাহা আমাদের

অবিদিত নহে। যে সকল গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার কথা ছাড়িয়া দিলেও, সুধী-সমিতি কর্ত্তৃক সংগৃহীত কত রাশীকৃত হস্তলিখিত পুঁথি আছে,—যাহা এখনও মুদ্রিত হয় নাই; বা যাহার নাম এখনও নির্ঘণ্ট-পুস্তকে স্থান লাভ করে নাই। তাহা ছাড়া আরও কত হাতের লেখা পুঁথি ব্যক্তিবিশেষের অধিকারে,অথবা ভারতবর্ষের, সিংহলের, নেপালের, বা তিব্বতের, কিংবা হয় ত মহাচীনের, চীনের, বা মধ্য-এসিয়ার বৌদ্ধ-বিহারের গ্রন্থাগারে রক্ষিত হইতেছে। তিব্বতের বৃহৎ বৃহৎ বৌদ্ধ-আশ্রমে হস্তলিখিত পুঁথির কত বিরাট সংগ্রহ রহিয়াছে। সেই সকল পুঁথির ভিতর এমন অনেক সংস্কৃত পুঁথি বা সংস্কৃতের তিব্বতীয় অনুবাদ বাহির হইতেছে, যাহার অনুলিপি বা মূল এক্ষণে ভারতের কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। তিব্বতের এই সকল বৌদ্ধ-গ্রন্থাগারগুলি অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে, বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক নূতন তত্ত্বলাভের সম্ভাবনা আছে। কারণ, মধ্যযুগে, বিশেষতঃ নবম ও দশম খৃষ্টীয় শতাব্দীর সন্নিহিত কালে, বাঙ্গালার পালরাজগণ ভারতবর্ষের বৌদ্ধ নৃপতিগণের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন; এবং তৎকালে বাঙ্গালা ও তিব্বতের মধ্যে খুব যাতায়াত ছিল বলিয়াই বিশ্বাস করা যায়।

তাহার পর ভারতের প্রাচীনকালের ও মধ্যযুগের ঐতিহাসিক তত্ত্ব সম্বন্ধে চৈনিক প্রমাণাদি যে এখনও সম্যক্ অনুসন্ধান করিয়া দেখা হয় নাই, ইহা সকলেই জানেন; এবং ভারতবর্ষ ও চীনের ভিতর যে যোগাযোগ, তাহা বৌদ্ধ তীর্থযাত্রিগণের দ্বারাই সংরক্ষিত হইত বলিয়া, প্রাগুক্ত কারণে, এমন আশা করা যাইতে পারে যে, ভারতবর্ষ-সম্বন্ধীয় চৈনিক সাহিত্যে বাঙ্গালার তত্ত্ব বিশেষরূপে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। পুরাবস্তুতত্ত্বের ক্ষেত্রও সম্যক্‌রূপে তথ্যানুসন্ধানের বিষয়ীভূত হয় নাই। ভূপৃষ্ঠ-খনন কার্য্য এ যাবৎ যৎসামান্য হইয়াছে। বাঙ্গালায়, ধরিতে গেলে, কিছুই হয় নাই। কিন্তু বাঙ্গালায় এমন অনেক স্থান আছে, যেখানে বিবেচনাপূর্ব্বক খনন করাইলে অনেক মূল্যবান্ ঐতিহাসিক তথ্যের উদ্ধার লইবার সম্ভাবনা;—যথা, মালদহের অন্তর্গত প্রাচীন নগর গৌড়; গৌড়ের যে ধ্বংসাবশেষ সুবিখ্যাত, এবং লর্ড কর্জ্জনের উদ্যোগে যাহা সযত্নে রক্ষিত হইতেছে, তাহা মুসলমান আমলের ধ্বংসাবশেষ; কিন্তু কিংবদন্তী আছে, মুসলমান-বিজয়ে প্রাচীন বৌদ্ধ ও হিন্দু নগর ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে, তাহারই উপকণ্ঠে এই মুসলমান-নগর নির্ম্মিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত, মুর্শিদাবাদ জেলার রাঙ্গামাটী, যাহা প্রাচীন কর্ণসুবর্ণ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে; এবং ঐ জেলার কান্দীর সন্নিহিত পাঁচথুপি—পঞ্চসংখ্যক বৌদ্ধস্তূপ হইতে ঐরূপ নাম গ্রহণ করিয়াছে

বলিয়া কথিত হয়, এবং ঐ পঞ্চস্তূপের একটির ধ্বংসাবশেষ অদ্যাবধি দেখিতে পাওয়া যায়। বগুড়া জেলার মহাস্থান, যাহা প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরের অবস্থান-ক্ষেত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে; বগুড়া জেলার (?) পাহাড়পুর ও বিহার-স্থিত স্তূপসমূহ। ঐ জেলার পাঁচবিবি ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী মহীপুর; এই স্থানে মাটীর উপরই প্রাচীন গৃহাদির বহু ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া রহিয়াছে; খনন করিলে আরও অনেক পাইবার সম্ভাবনা। দিনাজপুর জেলার জগদ্দল—পালযুগের একটি প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থানভূমি বলিয়া পরিগৃহীত। রাজসাহী জেলার বিজয়নগর—সেনরাজগণের রাজধানী বিজয়পুরীর অবস্থানভূমি। এইরূপ আরও অনেক স্থান আছে। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে প্রাচীনতার যে সকল বিরাট নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়, বাঙ্গালায় সাধারণ পরিভ্রমণকালে সেরূপ নিদর্শন নয়নগোচর হয় না, এবং ইহাতে সাধারণ দর্শকের মনে হইতে পারে যে, বাঙ্গালা দেশের কোনও ইতিহাস নাই—ইহার প্রাচীন সভ্যতার কোনও প্রমাণও নাই। কিন্তু তাহা নিতান্তই ভ্রান্ত ধারণা। বাঙ্গালার প্রাচীন সভ্যতার অস্তিত্ব ছিল, এবং তাহার প্রমাণও বিদ্যমান আছে; কিন্তু সে সকল অনুসন্ধান করিয়া দেখিবার বিষয়। সেগুলি আমাদের চোখে না পড়িবার একটা কারণ এই যে,—বাঙ্গালা মহা-পরিবর্ত্তনের লীলাভূমি—প্রাকৃতিক, সামাজিক ও রাজনীতিক, কত পরিবর্ত্তন বাঙ্গালায় ঘটিয়াছে। প্রাচীনকালে যে সকল স্থান রাজনীতিক বা ব্যাবসায়িক কেন্দ্র বলিয়া সুপরিচিত ছিল, এখন সে সকল স্থানের আর সে পূর্ব্বগৌরব নাই। এখন সে সকল স্থানে মানবসাধারণের তেমন গতিবিধিও দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহার পর, বাঙ্গালার মাটী চিররসসিক্ত বলিয়া, যত্নের ত্রুটী ঘটিলে, তাহা সৌধাবলীকে অতি শীঘ্রই ধ্বংসগ্রস্ত করিয়া ফেলে, এবং পরিত্যক্ত স্থানগুলি সত্বরই জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া পড়ে। গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ-সমূহ শতাব্দী ধরিয়া জঙ্গলে পরিব্যাপ্ত ছিল—কদাচিৎ কেহ উহা দর্শন করিতে যাইত। এখন সে সকল স্থান অনেকপরিমাণে পরিষ্কৃত হইয়াছে, এবং মালদহ পর্য্যন্ত রেলপথ বিস্তৃত হওয়ায়, গৌড় এখন পূর্ব্বের মত দুর্গম নহে। মালদহ, দিনাজপুর, রাজসাহী, বগুড়া ও রংপুরের কতকাংশ লইয়া যে ভূ-মেখলা প্রাচীনকালে 'বরেন্দ্র' বা 'বরেন্দ্রী' বলিয়া পরিচিত ছিল, এবং যাহা এক্ষণে 'বরিন্দ' বলিয়া অভিহিত, এককালে তাহাতে যে বহুলোকের ঘনবসতি ছিল, তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়; এবং এখনও প্রাচীন সভ্যতার বহু নিদর্শন তথায় বিদ্যমান আছে। তাহার পর ঠিক কোন সময়ে, বা কি কারণে উহা পরিত্যক্ত

হইয়া জঙ্গলাকীর্ণ হইল, অস্বাস্থ্যকর হইল, উহার প্রাচীন স্থাপত্যের ও ভাস্কর্য্যের বৈভব লোকলোচনের বহির্ভূত হইয়া পড়িল, তাহা কেহই বলিতে পারে না। সম্প্রতি কয়েক বৎসর হইল, এই ভূখণ্ড পুনরায় বহুলপরিমাণে পরিষ্কৃত হইয়াছে, এবং প্রধানতঃ সাঁওতাল আগন্তুকবর্গের অনুগ্রহে উহাতে চাষ-আবাদ হইতেছে, এবং এইরূপে পুরাতত্ত্বের কৌতূহলোদ্দীপক অনেক পদার্থ আবিষ্কৃত হইয়া পড়িতেছে। বলিতে আনন্দ হইতেছে,—ইহার কতকগুলি সামগ্রী রামপুর বোয়ালিয়ার বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির মনোহর সংগ্রহালয়ে সংগৃহীত ও সংরক্ষিত হইয়াছে; এবং রংপুর, বগুড়া ও মালদহে আরও কতকগুলি সংগৃহীত হইয়া আছে। বাঙ্গালার পলিমাটির উপর দিয়া যে সকল বৃহৎ বৃহৎ নদী বহিয়া যাইতেছে, তাহাদিগের প্রবাহপথ-পরিবর্ত্তন হেতু যে ধ্বংসকার্য্য সম্পাদিত হয়, তাহাই বাঙ্গালার অনেক প্রদেশে প্রাচীন সৌধের অভাবের এক বৃহৎ কারণ। এই সকল নদী যখন পাড় ভাঙ্গিয়া অন্যপথে বহিয়া যায়, তখন তাহাদিগের সম্মুখে যে সকল ইষ্টকরচিত গৃহাদি পতিত হয়, তাহারা তত্তাবতের অধঃখনন করিয়া তাহাদের ধ্বংসসাধন করে; এবং সেই সকল ধ্বংসাবশেষকে মৃত্তিকা ও বালুকার গর্ত্তে প্রোথিত করিয়া ফেলে। ঢাকার গেজেটীয়ার পাঠ করিলে জানিতে পারা যায়,—এই সেদিন, অষ্টাদশ শতাব্দীতে, পূর্ব্ববঙ্গের তাৎকালিক খুব বড় জমীদার রাজা রাজবল্লভ ঢাকা জেলার নানা স্থানে বহুতর দেবমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; কিন্তু নদীর প্রবাহ-পরিবর্ত্তনের ফলে তৎসমুদয়ের বিলয়-প্রাপ্তি ঘটিয়াছে।

ভারতের, বিশেষতঃ বাঙ্গালার প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার অনেক বিষয় থাকিলেও, এ পর্য্যন্ত যে সকল ঐতিহাসিক উপাদান প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে, মুসলমান-বিজয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী ঐতিহাসিক যুগে বাঙ্গালা যে কিরূপ স্থান অধিকার করিয়াছিল, তাহার মোটামুটি ধারণা করা অসম্ভব নহে। এ বিষয় সম্বন্ধে যে সকল তত্ত্ববার্ত্তা আমাদের পরিজ্ঞাত আছে, আমি এক্ষণে তাহাই অতিসংক্ষেপে বিবৃত করিব।

বলিয়া রাখিতে চাই যে, আমি কোনও মৌলিক গবেষণার চেষ্টা করি নাই। আমি যে সকল তথ্য আপনাদের সমক্ষে উপস্থাপিত করিব, তাহা অধুনা প্রকাশিত কতিপয় গ্রন্থে দৃষ্ট হইবে। তন্মধ্যে ম্যাক্‌ক্রিণ্ডেল কর্ত্তৃক প্রকাশিত ভারতবর্ষের, গ্রীক ও রোমীয় আলোচনার সংগ্রহ-পুস্তক, ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ রচিত ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত রামচরিত কাব্যের ভূমিকা,

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত বাঙ্গালার পালরাজ-বিষয়ক গ্রন্থ ও বাঙ্গালার ইতিহাস, এবং বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত রমাপ্রসাদ চন্দ রচিত গৌড়রাজমালা, বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির প্রকাশিত গৌড়লেখমালা হইতে, এবং অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় পালরাজগণের অধঃপতন সম্বন্ধে গতবৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সকল বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা হইতে আমি অনেক তথ্য লাভ করিয়াছি।

আমি যে সকল ঐতিহাসিক উপাদানের উল্লেখ করিয়াছি, সে সম্বন্ধে আরও কিছু বলা প্রয়োজন। বাঙ্গালার, অথবা ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের, প্রাচীন কালের বিবরণ যে সকল তাম্রলিপিতে প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেগুলি বিধিসম্মত দলীলমাত্র; অর্থাৎ, সেগুলি ধর্ম্ম অনুষ্ঠানের অনুকূলে নৃপতিদত্ত ভূমিদানপত্র। হিন্দু ব্যবহারশাস্ত্রের ব্যবস্থানুযায়ী এই সকল ভূমিদানপত্র লিখিত হইত। গৌড়লেখমালার অবতরণিকায় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা হইতে এইরূপ একটি বিধান উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন; তাহাতে লিখিত আছে— কার্পাসনির্ম্মিত পটে, অথবা তাম্রপাত্রে বা ফলকে, প্রপিতামহ-পিতামহ-পিতৃদেবের বংশবীর্য্যশ্রুতাদি-গুণাবলীর ও আত্মগুণাবলীর উল্লেখ করাইয়া, গ্রহীতার ও দত্ত-ভূমির পরিচয়সূচক সীমাচিহ্নাদির বিবরণ লিখাইয়া, আপন রাজমুদ্রায় সংযুক্ত করাইয়া, অব্দাদির উল্লেখ করাইয়া, তাম্রশাসন উৎকীর্ণ করাইবেন।

এতৎব্যবস্থানুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ও ভিন্ন ভিন্ন কালে রচিত ভূমিদানপত্রে অনেক প্রয়োজনীয় ঐতিহাসিক তথ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ভূমিদানপত্রের প্রারম্ভে রাজ্যাধিষ্ঠিত নৃপতি ও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের যে সমুদায় উৎপ্রেক্ষাবহুল প্রশংসাসূচক শ্লোক পরিদৃষ্ট হয়, তাহা হইতে ঐতিহাসিকতত্ত্বের উদ্ধারকালে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক। এইরূপ বিবরণে যদি কোনও নৃপতির রাজ্য হিমগিরি হইতে বিন্ধ্যপর্ব্বত পর্য্যন্ত, অথবা পূর্ব্বসমুদ্র হইতে পশ্চিমসমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, এইরূপ লিখিত থাকে, তাহা হইলে, তাহার আক্ষরিক অর্থগ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে; এবং যদি কোনও নৃপতি কর্তৃক বৈরী নৃপতির, বা জাতির, বা দেশের বিজয়বার্ত্তা লিখিত থাকে, তাহা হইলেও, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর স্থায়ী বিজয় অনুমান করিয়া লওয়া নিরাপদ নহে। লেখ-গর্ভে ঐরূপ কোনও উক্তি থাকিলে, সাধারণতঃ এই পর্য্যন্ত অনুমান করা যাইতে পারে যে, প্রশস্তির বিষয়ীভূত নৃপতির, এবং বিজিত-রূপে বর্ণিত নৃপতির, জাতির, বা দেশের সহিত কোনও প্রকার সংঘর্ষ হইয়াছিল। সে সংঘর্ষের পরিণতি সম্বন্ধে

সঙ্গত অনুমান করিতে হইলে, বিপক্ষ-পক্ষীয় লিপিতে ঐ যুদ্ধের ফলাফল কিরূপভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহার সহিত তুলনা করিয়া দেখা প্রয়োজন। অথবা, তুলনার নিমিত্ত যদি নিরপেক্ষ পক্ষের ঐ বিজয়-সম্বন্ধীয় কোনও লিপি প্রাপ্ত হওয়া যায়, সে আরও উত্তম।

উত্তর-ভারতের ঐতিহাসিক যুগের আরম্ভকাল।

প্রকৃত কথা বলিতে গেলে, আমার বিবেচনায়, উত্তর-ভারতের ঐতিহাসিক যুগ ৩২৭ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে আলেকজান্দারের আক্রমণের সহিত আরব্ধ হইয়াছে বলিয়াই ধরিতে হয়।—ইহারই অল্পকাল পরে ৩২১ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে মৌর্য্যবংশের প্রথম সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করেন। আমার এই উক্তি সম্বন্ধে অবশ্য তর্ক উপস্থিত হইতে পারে; কারণ, ঐতিহাসিক প্রমাণ বলিলে কি বুঝায়, সে বিষয়ে এক এক ব্যক্তির এক একরূপ ধারণা, এবং ঐতিহাসিক যুগের আরম্ভের একটা বিশেষকালনির্দ্দেশ ব্যাপার কাহারও কাহারও মতে স্বেচ্ছাচারিতা বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে। কিন্তু যত দূর জানা গিয়াছে, তাহাতে আমি নিজে উহাকে আলেকজান্দারের আক্রমণ-কালেই স্থাপিত করিব। এই আক্রমণের ফলে ভারতবর্ষে গ্রীক বা মেসিডোনীয় শক্তি স্থায়িরূপে প্রতিষ্ঠিত না হইলেও, এবং এই আক্রমণ অতিকায় আকারে সুসম্পন্ন অভিযান বলিয়া বর্ণিত হইলেও, ভারতবর্ষের ইতিহাসে এ ঘটনার বিশেষ গুরুত্ব আছে বলিয়াই আমার ধারণা। কারণ, গ্রীকজাতির সহিত ভারতবর্ষের এই প্রথম প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ ঘটিল, এবং এই সংস্পর্শ ভবিষ্যৎ বহু শতাব্দী ধরিয়া—হয় ত পঞ্চম খৃষ্টাব্দে হূণদিগের আক্রমণকাল পর্য্যন্ত, বা তাহার পরেও, অক্ষুণ্ণ ছিল। ইউরোপ হইতে ভারতে আসিবার পথ সমুদ্রপথ, এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা ভারতবর্ষে এই সমুদ্রপথেই আগমন করিয়াছে, এই ধারণা আমাদের মনে এমনই বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে যে, পশ্চিম এসিয়ার যে সকল রাজ্যে গ্রীক সভ্যতা প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল, তাহাদের সহিত, এবং তাহাদের যোগে ইউরোপীয় সভ্যতার তাৎকালিক কেন্দ্র গ্রীক ও রোমের সহিত খৃষ্টধর্ম্মস্থাপনার প্রায় তিন শতাব্দ পূর্ব্ব হইতে কয়েক শতাব্দ কালের পর পর্য্যন্তও যে ভারতের খাস গমনাগমন ও একরূপ ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল, তাহা স্বতঃই ভুলিয়া যাই। এই সম্পর্কের প্রকৃতি ও পরিমাণ যে কি ছিল, এবং ইহার ফলাফল যে কি হইয়াছিল, তাহার তথ্য আমরা অবগত নহি; কিন্তু আলেকজান্দারের আক্রমণ যে সংস্পর্শের সূচনা করিয়া দিয়াছে, সেই সংস্পর্শের প্রভাবে গ্রীক ও ভারতীয় চিন্তারাজ্যে কত না আদান-প্রদান ঘটিয়াছে।

চন্দ্রগুপ্তের উত্তরাধিকারী, মৌর্য্যবংশীয় নৃপতি বিন্দুসার যে কতকগুলি ডুমুর ফল, শুষ্ক দ্রাক্ষাজাত মদ্য, এবং এক জন দার্শনিক পাঠাইবার নিমিত্ত পত্র লিখিয়াছিলেন, জনৈক গ্রীক লেখক সে কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। অশোকের অনুশাসনসমূহে দেখিতে পাওয়া যায়—তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারকগণকে সিরিয়া, ইজিপ্ট, সিরিন, মেসিডোনিয়া ও এপিরাসে প্রেরণ করিয়াছিলেন। মৌর্য্যসম্রাটগণ যে সিরিয়া, ইজিপ্ট ও মেসিডোনিয়ায় ধর্ম্মপ্রচারক পাঠাইতেন, এবং গ্রীকমদ্য ও গ্রীক দার্শনিকগণকে স্বদেশে আনয়ন করিতেন, তাহা সম্ভবতঃ নিরর্থক ছিল না। আজ আমরা যে ইউরোপীয় সভ্যতাকে পাশ্চাত্য সভ্যতা বলিয়া অভিহিত করিতেছি, তাহা প্রকৃতপ্রস্তাবে, প্রধানতঃ এই গ্রীক-রোমীয় সভ্যতা হইতে উদ্ভূত।—সে সভ্যতা গ্রীস ও রোম হইতে ক্রমে ইউরোপের অন্যান্য স্থানে প্রসারিত হইয়া পড়িয়াছে, এবং সভ্যতা বলিতে ইউরোপ যাহা বুঝে, তাহাও এই গ্রীক-রোমীয় প্রভাব-সঞ্জাত ;—এই সকল বিবেচনা করিয়া দেখিলে, গ্রীস ও রোমের সহিত ভারতের প্রাচীন সংস্পর্শের গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম হয়।

সুদূর দক্ষিণাংশ ব্যতীত সমগ্র ভারতময় এবং ভারতবর্ষের বর্ত্তমান উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশ অতিক্রম করিয়াও যে মৌর্য্যসাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল, তাহার রাজধানী ছিল বাঙ্গালার পশ্চিম সীমা-সংলগ্ন মগধে, বা দক্ষিণবিহার প্রদেশে,—পাটলিপুত্রে—বর্ত্তমান পাটনায়। মৌর্য্য-সাম্রাজ্যের রাজত্বকাল ১৩৭ বৎসর। মৌর্য্যসাম্রাজ্যের অধঃপতনের পর, গুপ্তরাজগণের আমলেও পুনরায় সাম্রাজ্য গঠিত হয়—বাঙ্গালা ও উত্তর-ভারতের অধিকাংশ ভূভাগই তাহার অধিকারভুক্ত ছিল ; গুপ্তরাজগণ চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন ; এবং তাঁহাদিগের রাজধানীও পাটলিপুত্র নগরেই অবস্থিত ছিল।

আমার বিবেচনায়, বাঙ্গালার প্রাচীন ইতিহাসের প্রথম মূল্যবান্ তথ্য এই যে,—ঐতিহাসিক যুগের প্রারম্ভে, বাঙ্গালারই সন্নিকটে, পাটলিপুত্র নগরে, ভারতীয় সভ্যতার ও রাজনীতিক শক্তির কেন্দ্র প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। কেহ কেহ ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক যুগের আরম্ভকে আরও দুই শত বৎসর পিছাইয়া দেন ; অর্থাৎ, খৃষ্টপূর্ব্ব সার্দ্ধ পঞ্চম শতাব্দীতে নির্দ্দেশ করেন।—উহাই জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবর্ত্তনের আনুমানিক কাল বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। এই নিরূপিত কালকে ঐতিহাসিক যুগের আরম্ভকাল বলিয়া গ্রহণ করিলে দেখিতে পাই যে,

ঐরূপ সময়ে প্রতিদ্বন্দ্বী কোশল (বর্ত্তমান অযোধ্যা ও কাশী) রাজ্যকে উৎখাত করিয়া মগধরাজ্য উত্তর-ভারতে চক্রবর্ত্তীর পদে সমারূঢ় হইয়াছিল।

ভারতীয় সভ্যতার মূল স্থান ও প্রসার-ক্ষেত্র।

জাতিতত্ত্বের একটা উপন্যস্ত সিদ্ধান্ত এই যে,—আর্য্যগণ ভারতবর্ষে আগমন করিয়া পঞ্চনদ প্রদেশে, অথবা গঙ্গার উর্দ্ধ-স্রোতোধৌত প্রদেশে উপনিবেশস্থাপন করেন ; এবং বেদের রচনাকালেও ইহারই একতম প্রদেশে আর্য্যনিবাস অবস্থিত ছিল। এই দুইটি উপন্যস্ত সিদ্ধান্তই সত্য হইতে পারে, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত তাহা অনুমানমাত্র—কেবল আন্দাজের ব্যাপার। বৈদিক যুগ ঐতিহাসিক যুগ নহে, এবং আর্য্যগণ কবে কোন্ পথে আসিয়া উপনিবেশস্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের ঠিক জানা নাই। ভারতবর্ষের যে প্রাচীনতম ঐতিহাসিক তথ্য আমাদিগের পরিজ্ঞাত আছে, তাহাতে ভারতীয় সভ্যতার মূলস্থান উত্তর-ভারতে নয়, পঞ্চনদে নয়, গঙ্গার উর্দ্ধ-স্রোতোধৌত প্রদেশেও নয়,—তাহার পূর্ব্ব দিকে—বাঙ্গালার সীমা-সংলগ্ন মগধে। খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় বা সার্দ্ধ পঞ্চম শতাব্দীতে আমাদিগের ঐতিহাসিক যুগের আরম্ভকাল গণনা করিলে, মনে হয়,—এই পাটলিপুত্রই ৭৫০, অথবা ১০০০ বৎসর কাল ধরিয়া, উত্তর-ভারতে ভারতীয় সভ্যতার একটি প্রধান কেন্দ্র-রূপে বিদ্যমান ছিল। তৎকালে উত্তর-ভারতে রাজনীতিক শক্তির ও সভ্যতার আরও অনেক কেন্দ্র ছিল। গ্রীক, অথবা ন্যূনাধিকপরিমাণে গ্রীক-ভাবাপন্ন পার্থীয়ানগণ পঞ্চনদ ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন কালে রাজত্ব করিয়াছিলেন।—তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ রাওয়লপিণ্ডির নিকট তক্ষশিলায় রাজধানী স্থাপিত করিয়াছিলেন, এবং কুষাণ রাজ্যের রাজধানীও পেশোয়ার নগরে অবস্থিত ছিল। কিন্তু ঐ সকল রাজন্যবর্গের সভ্যতা—বৈদেশিক, গ্রীক সভ্যতা ; তাহা ভারতীয় সভ্যতা নহে। এবং আমার মতে, ইহাই বলা সম্ভবতঃ সঙ্গত যে, ঐতিহাসিক যুগের আরম্ভ হইতে গুপ্ত-রাজ্যের ধ্বংসকাল পর্য্যন্ত, স্বদেশ-সঞ্জাত ভারতীয় সভ্যতার কেন্দ্রস্থান ছিল পাটলিপুত্রে ;—পরে সপ্তম শতাব্দীতে আমরা কান্যকুব্জে হর্ষের রাজধানী দেখিতে পাই। কিন্তু নবম শতাব্দীর প্রথম ভাগে সে কান্যকুব্জেরও ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটে, এবং প্রথম পালরাজগণকে পুনরায় পাটলিপুত্রের রাজসভাতেই অধিষ্ঠিত দেখি। নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রতীহার রাজ্য বা সাম্রাজ্যের রাজধানী-রূপে কান্যকুব্জ পুনরায় গৌরবান্বিত হইয়াছিল,—এবং সুলতান মামুদ কর্ত্তৃক একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কান্যকুব্জ-বিজয় পর্য্যন্ত তাহার যে গৌরব অক্ষুণ্ণ ছিল। পূর্ব্বাংশে বাঙ্গালার

গৌড়রাজ্য এই কালের অধিকাংশ সময়ে, কান্যকুব্জের ঘোরতর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। সভ্যতায় ও ধনসম্পদে গৌড়রাজ্য কান্যকুব্জকে অতিক্রম না করিলেও, সম্ভবতঃ কোনও অংশে ন্যূন ছিল না, এবং ধর্ম্ম, সাহিত্য ও শিল্প সম্বন্ধে গৌড়রাজ্য বৌদ্ধ-জগতের প্রধান কেন্দ্র ছিল।

বাঙ্গালার প্রাচীন ইতিহাসের সহিত মগধ ও বিহারের প্রাচীন ইতিহাস ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ; এবং স্থানীয় বা প্রাদেশিক ইতিহাস-গ্রন্থে বাঙ্গালা ও বিহারের আলোচনা বোধ হয় একত্র হওয়াই সুসঙ্গত। প্রাচীন কাল হইতে, উত্তর-ভারতের একটি প্রধান সভ্যতা-কেন্দ্রের এত সন্নিকটে বাঙ্গালার অবস্থিতি-বশতঃ, বাঙ্গালায় যে একরূপ প্রাচীনকালেই সভ্যতার বিকাশ হইয়া থাকিবে, এরূপ অনুমান অযৌক্তিক নহে। বাঙ্গালার সভ্যতা-বিকাশের অনুকূল আর একটি হেতু এই যে, উত্তর-পশ্চিম হইতে ভারতবর্ষ সময় সময় যে সকল ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠী ও জাতির আক্রমণ সহিয়াছে, বাঙ্গালাকে তাহার ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য, মুসলমান-বিজয়ের পূর্ব্বে, সেরূপ কোনও আক্রমণ সহিতে হয় নাই।

ভারতীয় সভ্যতা ও বৈদেশিক আক্রমণ।

সাধারণের একটা বিশ্বাস আছে,—অতি পুরাকালে উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে আর্য্য-নামধেয় একটি জাতি আসিয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। সভ্যতায় তাঁহারা ভারতের আদিম অধিবাসী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন।—তাঁহারা সেই আদিম অধিবাসিবর্গকে পরাজিত করিয়া, এবং শাসনে আনিয়া, ভারতবর্ষের অধিকাংশ ভূভাগে তাঁহাদিগের আপন সভ্যতার প্রতিষ্ঠা করেন। এ বিশ্বাসের নির্ভর, সাধারণ জনশ্রুতি ;—জাতিতত্ত্বের উপন্যস্ত সিদ্ধান্ত অথবা বর্ত্তমান সামাজিক ব্যবস্থার বাহ্যরূপ ইহার পক্ষ সমর্থন করিতে পারে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত ঐতিহাসিক প্রমাণ দ্বারা ইহা সমর্থিত হয় নাই। আমি এ কথা বলি না যে, ঐ সাধারণ জনশ্রুতির মূলে কোনও সত্য নাই ; অথবা, উহা সম্পূর্ণই কাল্পনিক ; অথবা, কোনও কালেই উহার সমর্থনে ঐতিহাসিক প্রমাণ মিলিবে না। আমি ইহাই বলিতে চাই যে, বর্ত্তমানে আমাদের জ্ঞানের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে ঐতিহাসিক প্রমাণ দ্বারা উহা এখনও সমর্থিত হয় নাই।

ঐতিহাসিক কালে ভারতবর্ষ উত্তর-পশ্চিম হইতে পুনঃপুনঃ আক্রান্ত হইয়াছে ; কিন্তু সে সকল আক্রমণের কর্ত্তা জনশ্রুতির উল্লিখিত 'আর্য্য' নহে, এবং মুসল-মান-আক্রমণের পূর্ব্বে, তাহাদের মধ্যে কেহ যে এতদ্দেশে স্থায়িভাবে তাঁহাদের সভ্যতার প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছে, এরূপ কথাও বলা যাইতে পারে না। বরং

ইহাই সত্য—তাহাদের মধ্যে যাহারা ভারতবর্ষে থাকিয়া গিয়াছিল, তাহারা অবশেষে ভারতের সভ্যতা গ্রহণ করিয়া, এতদ্দেশের জনসাধারণের সহিত মিশিয়া, এক হইয়া গিয়াছিল। উত্তর-পশ্চিমাগত এই সকল প্রাচীন আক্রমণকারী—মেসিডোনীয়, গ্রীক, শক, পহ্লব (বা পার্থীয়ান্) যবন (বা ইন্দো-গ্রীক), কুষাণ (বা য়ুয়েসিস্], অথবা হুণ,—কেহই বিজয়ী আক্রমণকারি-রূপে কখনও বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত, কিংবা যত দূর নিশ্চিত জানা যায়, তাহাতে পাটলিপুত্র পর্য্যন্তও অগ্রসর হয় নাই। হুণদিগের সহিত অন্বয়সম্বন্ধযুক্ত গুর্জ্জর বা গুজরগণ কর্তৃক পরবর্ত্তী কালে বাঙ্গালা, অন্ততঃ বিহারের কিয়দংশ একাধিকবার আক্রান্ত হইয়াছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু সেই আক্রমণের পূর্ব্বেই গুর্জ্জরগণ ভারতবর্ষে দীর্ঘকাল বসবাস হেতু সম্পূর্ণরূপে ভারতবর্ষীয় হইয়া গিয়াছিল। পক্ষান্তরে, মধ্যে মধ্যে বাঙ্গালায় যে সকল আক্রমণকারী আসিয়াছে, তাহারাও উত্তর ও উত্তর-পূর্ব্ব হইতে—নেপাল, তিব্বত ও আসামের দিক হইতে আসিয়াছে। সে সকল আক্রমণের বিস্তৃত বৃত্তান্ত আমরা অবগত নহি। কিন্তু সম্ভবতঃ দেশবাসীর সংখ্যাসমষ্টিতে তাহাদের নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছে।

মৌর্য্য যুগের সভ্যতার অবস্থা।

মৌর্য্য সাম্রাজ্যের প্রারম্ভে ভারতবর্ষের অবস্থার সম্বন্ধে প্রধান প্রামাণিক লেখক—মেগাস্থিনিস্। আলেকজান্দারের মৃত্যুর পর সেলিউকস্ নিকেটর নামক তাঁহার জনৈক সেনাধ্যক্ষ ভারতবর্ষের পশ্চিম সীমান্তে, মধ্য ও পশ্চিম-এসিয়ার কতকাংশ লইয়া, এক রাজ্য স্থাপন করেন—মেগাস্থিনিস্ তাঁহারই দূত-রূপে প্রথম মৌর্য্যসম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় উপস্থিত ছিলেন। আলেকজান্দার কর্তৃক বিজিত প্রদেশসমূহ পুনরুদ্ধার করিবার আশায় সেলিউকস্ পঞ্জাব প্রদেশ আক্রমণ করেন। কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত কর্তৃক সম্পূর্ণ পরাজিত হইয়া, কেবল সমগ্র পঞ্জাব নহে, পরন্তু আফগানিস্থানেরও অনেকাংশ প্রত্যর্পণ করিয়া, তিনি সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাহার পর, উক্ত নৃপতিদ্বয়ের মধ্যে শান্তি সংস্থাপিত হইয়াছিল, এবং মেগাস্থিনিস্ পাটলিপুত্রে সেলিউকসের দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। মেগাস্থিনিস্ চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যসম্পর্কে যাহা কিছু দেখিয়াছিলেন, বা শুনিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। মেগাস্থিনিসের রচিত সম্পূর্ণ বিবরণ আমাদিগের হস্তগত হয় নাই। তাঁহার রচনা হইতে উদ্ধৃত কতকগুলি অংশ, এবং তাঁহার রচনার উপর নির্ভর করিয়া অপরাপর গ্রীক লেখকগণ যাহা লিখিয়া গিয়াছেন—আমরা কেবল তাহাই প্রাপ্ত হইয়াছি। মেগাস্থিনিস্

বলিয়াছেন,—পাটলিপুত্র প্রাসিজাতি (প্রাসির সদৃশ সংস্কৃত শব্দ 'প্রাচ্য'—পূর্ব্ব-দিকস্থ ; কর্ত্তৃক অধ্যুষিত প্রদেশের প্রধান নগর ছিল ; এবং ইহার পূর্ব্বদিকে 'গঙ্গারিডি' নামক জাতির রাজ্য ছিল। মেগাস্থিনিসের অনুসরণ করিয়া ঐতিহাসিক ডিওডোরাস্ লিখিয়া গিয়াছেন,—গঙ্গা সমুদ্রে সঙ্গত হইবার পূর্ব্বে গঙ্গারিডি-প্রদেশের পূর্ব্বসীমা অঙ্কিত করিয়া বহিয়া গিয়াছিল। তিনি আরও লিখিয়াছেন যে—গঙ্গারিডি রাজের বহুতর ভীষণাকার রণকুঞ্জর থাকায়, কোনও বৈদেশিক নৃপতি তাঁহার রাজ্য অধিকার করিতে সমর্থ হয় নাই। প্লিনি গঙ্গারিডিকে কলিঙ্গের সহিত সংযুক্ত করিয়াছেন।—প্রাচীন কালে উড়িষ্যাই কলিঙ্গ নামে সুপরিচিত ছিল।

খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর লেখক ভৌগোলিক টলেমী বলেন, গঙ্গা-সাগর-সঙ্গমের নিকটবর্ত্তী প্রদেশে গঙ্গারিডিগণ বাস করিত, এবং গঙ্গে-নামক নগরে তাহাদিগের রাজধানী ছিল। লাটিন গ্রন্থকারগণও গঙ্গারিডির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন; যথা, ভার্জ্জিল (জর্জ্জিকস্ নামক গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে), ভ্যালেরিয়াস ফ্লেসিউস্ ও কুইন্টাস্ কার্টিনয়। তাহারা বাঙ্গালার কত অংশ অধিকার করিয়াছিল, তাহা নিশ্চিতরূপে না জানিলেও, কতকাংশ যে তাহারা অধিকার করিয়াছিল, এবং তাহারা যে একটা বিশিষ্ট জাতি ছিল, তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। মিত্ররাজ্য-রূপেই হউক, অথবা প্রত্যক্ষ-শাসনাধীন রাজ্য-রূপেই হউক, তাহাদিগের আবাস-ভূমি যে অশোকের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

মেগাস্থিনিসের বর্ণনায় চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য যেরূপ ভাবে চিত্রিত হইয়াছে, তাহাতে বোধ হয় যে, মৌর্য্যরাজত্বকালের প্রথম সময় হইতে বাঙ্গালার অধিকাংশ অংশেও সেইরূপ শাসনপ্রণালী, সেইরূপ ব্যবহারবিধি, সেইরূপ সভ্যতার সাধারণ অবস্থা বিদ্যমান ছিল। ভিন্সেণ্ট স্মিথের রচিত গ্রন্থের ৫ম অধ্যায়, অথবা রৌলিসন্ কর্ত্তৃক সম্প্রতি প্রকাশিত ভারতবর্ষের সহিত পাশ্চাত্য-জগতের সম্পর্ক-সম্বন্ধীয় পুস্তকে, এই বিবরণের সংক্ষিপ্তসার সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কৌটিল্যের বহুতথ্যপূর্ণ অর্থ-শাস্ত্রে এই বিবরণের সমর্থক প্রমাণ দৃষ্ট হয়। কৌটিল্যেরই অপর নাম চাণক্য,—তিনি চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী ছিলেন ; এবং তিনিই অর্থশাস্ত্রের রচয়িতা বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। কৌটিল্যের গ্রন্থ মহীশূরে আর. শ্যাম শাস্ত্রী কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও ইংরেজী ভাষায় অনূদিত হইয়াছে, এবং ইংরেজীতে নরেন্দ্রনাথ লাহা, এবং বাঙ্গালায় যোগেন্দ্রনাথ সমাদ্দার ইহার বহুতথ্যপূর্ণ সারাংশ প্রকাশিত করিয়া-

ছেন। এই সকল বিবরণ পাঠ করিলে আর সন্দেহ থাকে না যে, মৌর্য্যযুগে উত্তর ভারতের সভ্যতার অবস্থা অতিশয় উন্নত ছিল।—আমরা পয়ঃপ্রণালী প্রভৃতির রীতিমত ব্যবস্থা সহ পূর্ত্তবিভাগের উল্লেখ দেখিতে পাই। পাটলিপুত্রের নাগরিক ব্যবস্থার নিমিত্ত ষড়বিভাগসম্পন্ন একটি সমিতি ছিল;—তাহাদের কোনও বিভাগে জন্মমৃত্যুর তত্ত্ব লিপিবদ্ধ হইত; কোনও বিভাগ বা শ্রমজাত শিল্পের তত্ত্বাবধান করিত; কোনও বিভাগ বা ব্যবসায় বাণিজ্যের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল; ইত্যাদি। ষড়ঙ্গবিশিষ্ট একটি সমিতির হস্তে সামরিক ব্যবস্থার ভার অর্পিত ছিল। চন্দ্রগুপ্তের সময়ে উত্তর-ভারতে ধর্ম্মের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা আমরা অবগত নহি। কিন্তু ইহা জানি যে, তাঁহার পৌত্র অশোকের রাজ্যকালে, বৌদ্ধধর্ম্ম, জৈনধর্ম্ম ও নানাবিধ ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্ম্ম একত্র বিদ্যমান্ ছিল। অশোক বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, সমগ্র ভারতময় ও পৃথিবীময় তাহা প্রচারের জন্য প্রয়াস পাইয়াছিলেন, এবং ধরিতে গেলে বৌদ্ধধর্ম্মকে তাঁহার সাম্রাজ্যের বিধিসম্মত ধর্ম্ম করিয়াছিলেন,—ইহা সকলের সুবিদিত। কিন্তু তাঁহার কোনও ধর্ম্মের উপরই বিরাগ বা বিতৃষ্ণা ছিল না, এবং জৈন ধর্ম্মের ও ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্ম্মেরও তিনি পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

ক্রমশঃ।

শ্রীবিমলাচরণ মৈত্রেয়।

হুগলী বা দক্ষিণ রাঢ়। *

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে পণ্ডিত-প্রবর কৃষ্ণমিশ্র তদীয় "প্রবোধচন্দ্রোদয়" নাটকে, "গৌড়ং রাষ্ট্রমনুত্তমং নিরুপমা তত্রাপি রাঢ়া ততো ভূরিশ্রেষ্ঠিকনাম ধাম পরমং তত্রোত্তমো নঃ পিতা।" ইত্যাদি দম্ভবাক্যে যে রাঢ়ের ঐশ্বর্য্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন; যে দেশের শ্যামায়মান ধরিত্রী "বঙ্গে সুবিখ্যাত দামোদর নদের ক্ষীরসম স্বাদুনীরে"র পূতপ্রবাহ-ধারায় পরিপুষ্ট; যে দেশের প্রধান নাবিস্থান সপ্তগ্রামের পণ্যবাহী অর্ণবযান একদা সুনীল জলধির উর্ম্মি-রাশি ভেদ করিয়া পণ্যসম্ভারের বৈচিত্র্যে বিদেশবাসীর বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল; যে স্থান প্রেম-ভক্তির অবতার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রিয়পার্ষদ অভিরাম স্বামী, উদ্ধারণ দত্ত, রঘুনাথ দাস, পরমহংস রামকৃষ্ণ, মহাত্মা রামমোহন প্রমুখ মহাপুরুষগণের পূত পদ-রজ বক্ষে ধারণ করিয়া ধন্য হইয়াছে; যে স্থান পণ্ডিতকুলবরেণ্য জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, "ন্যায়-

* ৺অম্বিকাচরণ গুপ্ত প্রণীত। কলিকাতা, ৮০ নং গ্রে ষ্ট্রীট হইতে শ্রীললিতমোহন পাল দ্বারা প্রকাশিত এবং ১৩১ নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীটস্থ গোবর্দ্ধন প্রেস হইতে শ্রীগোবর্দ্ধন পান দ্বারা মুদ্রিত। মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা।

কন্দলী-প্রণেতা শ্রীধরাচার্য্য, স্মৃতিসর্ব্বস্ব-রচয়িতা ঠাকুর নারায়ণ, কবি কেনারাম, শ্রীধর্ম্মমঙ্গল-প্রণেতা মাণিকরাম গাঙ্গুলী, অনাদিমঙ্গলের কবি রঘুনন্দন আদক, সাধক-কবি রসিকচন্দ্র, দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর, মনীষী ভূদেব, উমেশচন্দ্র (বটব্যাল), সারদাচরণ, এবং বাণীর বরপুত্র সর্ব্বাধিকারি-বংশাবতংসগণের জ্ঞানগরিমায় সমুজ্জ্বল, সেই দেশের—বাঙ্গালীর গৌরবের সেই দক্ষিণ-রাঢ়ের—ইতিহাসের প্রথমার্দ্ধ লোকলোচনের গোচরীভূত হইয়াছে। যিনি এই গ্রন্থের রচনা করিয়া ভাষাজননীর পদে অর্ঘ্য প্রদান করিয়াছিলেন, নির্ম্মম কালের আহ্বানে তিনি সম্প্রতি নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া নিন্দা প্রশংসার অতীত রাজ্যে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। তিনি যে শ্রমসাধ্য ব্যাপারে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, তাহা সুসম্পন্ন করিয়া যাইতে পারেন নাই। আশা করি, এই গ্রন্থ-পরিসমাপ্তি-কল্পে দক্ষিণ রাঢ়ে মাতৃভাষানুরাগী যোগ্য ব্যক্তির অভাব হইবে না।

আলোচ্য গ্রন্থখানিতে হিন্দু, পাঠান ও মোগল রাজত্বকালের দক্ষিণ-রাঢ়ের বিবরণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবৃত হইয়াছে। এই বিবিধ-তথ্যপূর্ণ গ্রন্থখানিকে হুগলী জেলার গেজেটীয়ার বলা সঙ্গত হইবে না। কারণ, গেজেটীয়ারের ন্যায় এই গ্রন্থে দক্ষিণ-রাঢ়ের নদনদীর সংস্থান, প্রাকৃতিক বিবরণ, মঠ, মসজিদ, দেবালয়, পুণ্যস্থান, প্রাচীনকীর্ত্তি, কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যাদির বিবরণ সংগৃহীত হয় নাই। অথচ, ইহা বিজ্ঞান-সম্মত-প্রণালীতে লিখিত ইতিহাসও নহে। গৌড়-রাজমালার গ্রন্থকার মনীষী শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বঙ্গভাষায় ইতিহাস-রচনায় যে নূতন ধারার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, বাঙ্গালার ইতিহাস-প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় যে ধারার অনুসরণ করিয়াছেন, বাঙ্গালার ঐতিহাসিক সম্প্রদায়, দেশের অতীত-ইতিহাসত উদ্ধারের একমাত্র প্রকৃষ্ট পন্থা বলিয়া যে ধারা অক্ষুন্ন ও অব্যাহত রাখিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন, আলোচ্য গ্রন্থখানিতে তাহার কোনও পরিচয়ই পাওয়া যায় না।

রামায়ণ বা মহাভারতের ন্যায় প্রাচীনগ্রন্থে রাঢ়ের নাম উল্লিখিত না হইলেও, রাঢ়ের প্রাচীনত্বে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। জৈন "আচারাঙ্গ-সূত্র" ও "কল্পসূত্র" পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, জৈন ধর্ম্মের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর বা বর্দ্ধমান স্বামী খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে অরণ্যসঙ্কুল "রাঢ়ে"র "বজ্জভূমি" ও সুভ্ভ ভূমি প্রভৃতি নানা স্থানে বহুকাল বিচরণ করিয়াছিলেন। (১) অধ্যাপক জেকবী এই রাঢ় ও সুভ্ভ ভূমিকে রাঢ় ও সুহ্মদেশ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (২) আচারাঙ্গ সূত্রে বজ্জভূমির যেরূপ পরিচয় ও বিবরণ লিখিত হইয়াছে, তাহাতে উহাকে সুহ্মের পশ্চিমাংশস্থিত আটবিক প্রদেশ বলিয়া নির্দ্দেশ করা অসঙ্গত নহে। রাজাবলী নামক সিংহলের ইতিহাসে লিখিত আছে যে, বঙ্গাধিপের সেনাপতি, বঙ্গরাজদুহিতা সুপ্রদেবীর মাতুলপুত্র ও পতি (মহাবংশে ইনি অনুরু নামে অভিহিত), সুপ্রদেবীর পিতার মৃত্যুর পরে বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করেন, এবং তিনি রাঢ়দেশে সিংহপুর নামক একটি নগরের প্রতিষ্ঠা করিয়া উহা সিংহবাহুর হস্তে সমর্পণ করেন। (১)

---

(১). J. A. S. B. 1870. P. 287.

(২). Prof. Jacobi's Acharanga Sutra Bk I. Chapt 8. Sec 3. and Dr. Bulher's Indian Sect of the Jains.

(১). Uphanis Rajabali pt I.

মহাবংশে সিংহবাহুই সিংহপুরের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। (২) দীপবংশ হইতে জানা যায় যে, সিংহবাহুর পুত্র ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বিজয় সিংহ "লাল" প্রদেশের অন্তর্গত সিংহপুর নামক স্থান হইতে অনুচরবর্গ সহ সিংহল দ্বীপে উপনীত হইয়া, তথায় একটি উপনিবেশ-স্থাপন করিয়াছিলেন। (৩) ঐতিহাসিকগণ "লাল" ও রাঢ়কে অভিন্ন বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। (৪) পন্নবণা নামক চতুর্থ উপাঙ্গে রাঢ়ের অপর নাম "কোড়িবর্ব" বলিয়া লিখিত আছে (৫) দেখিয়া, শব্দগত সাদৃশ্য অনুসারে কেহ কেহ কোড়িবর্ষকে কোটীবর্ষ বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু কোটীবর্ষনামীয় একটি বিষয় পুণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির অন্তর্গত ছিল বলিয়া জানা গিয়াছে; সুতরাং কোড়িবর্ষের সহিত কোটীবর্ষের অভিন্নত্ব-প্রতিপাদন অসম্ভব।

খাজুরাহোতে প্রাপ্ত ১০০২ খ্রীষ্টাব্দের একখানি শিলালিপিতে রাঢ়ের নাম সম্ভবতঃ সর্ব্বপ্রথম উৎকীর্ণ হইয়াছে। (৬) ভুবনেশ্বর-প্রশস্তিতে এবং বল্লালসেনের ও উড়িষ্যার গঙ্গরাজগণের তাম্রশাসনে রাঢ়ের নাম অভিহিত আছে (৭)। রাজেন্দ্র চোলদেবের ত্রয়োদশ রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ তিরুমলৈ শিলালিপিতে তাঁহার উত্তরাপথাভিযান প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে যে, তিনি "সাগরের ন্যায় রত্নসম্পন্ন" "উত্তিরলাড়ম্" এবং সকল দিকে প্রসিদ্ধ বলিয়া "তক্কণলাড়ম্" জয় করিয়াছিলেন। (৮) স্বর্গীয় ডাক্তার কিলহরণ উত্তিরলাড়ম্‌কে উত্তর লাট অর্থাৎ উত্তর গুজরাট এবং তক্কণলাড়ম্ দক্ষিণ লাট অর্থাৎ দক্ষিণ গুজরাট মনে করিয়াছিলেন (৯)। তিরুমলৈ শিলালিপির পুনঃসম্পাদনকালে ডাক্তার হুল্‌জ ও স্বর্গগত পণ্ডিত বেঙ্কয় স্থির করিয়াছিলেন যে, পূর্ব্বোক্ত শব্দদ্বয় দ্বারা উত্তর বিরাট ও দক্ষিণ বিরাট সূচিত হইতেছে। (১) বেঙ্কয় বলিয়াছিলেন যে, "ইলাড" শব্দ দ্বারা সংস্কৃত "বিরাট" বুঝাইতে পারে; "লাট" বুঝায় না। (২) গৌড়রাজমালার গ্রন্থকার বলেন, "তক্কনলাড়ম্ ও উত্তিরলাড়ম্ শব্দদ্বয় দ্বারা দক্ষিণ রাঢ় ও উত্তর রাঢ় সূচিত হইতেছে।" (৩) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই শেষোক্ত সিদ্ধান্ত সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করিয়া লিখিয়াছেন,—"কোশল বা দণ্ডভুক্তি জয় করিয়া দক্ষিণ লাট বা দক্ষিণ বিরাটে যুদ্ধযাত্রা করা, দক্ষিণ লাট বা দক্ষিণ বিরাট হইতে যুদ্ধার্থ বঙ্গদেশে আগমন, বঙ্গদেশ হইতে উত্তর লাট বা দক্ষিণ বিরাট জয়ার্থ গমন এবং উত্তর লাট বা

---

(২), Turnour's Mahawanso, Chap. VI.

(৩). Ibid Chap. VII.

(৪), Burnout. E, Muller and Ant XI. 198, note 2, XII. 650, E. Kuhn, Ind. Aut XII. pp 54-50. S. B. E. XXII Bk I, Lect 8. Lesson 3. p 84, Jacobi's note I.

(৫). Ind. Ant XX P. 375.

(৬). Epi Ind. vol I. P. 149.

(৭). Epi Ind vol VI P. 205. L 3. J. A. S. B. 1896 P. P. 144, 250.

(৮). Ibid vol IX P. 232-233.

(৯). Ibid vol VII App P. 120. no 733.

(১). Epi Ind. vol IX P 231.

(২). Anunal Report on Epigraphy, Madras, 1906-07. P. 87.

(৩), গৌড়রাজমালা, পৃঃ ৪০।

উত্তর বিরাট হইতে গঙ্গাতীরে প্রত্যাবর্ত্তন অসম্ভব; সুতরাং শব্দগত সাদৃশ্য অনুসারে তক্কণলাড়ম্ দক্ষিণ রাঢ়, এবং উত্তিরলাড়ম্ উত্তর-রাঢ়-রূপে গ্রহণ করাই সুসঙ্গত।" (৩) প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকেও দক্ষিণ রাঢ়ের নাম দুইবার উল্লিখিত হইয়াছে। (৫) সুতরাং খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্ব হইতেই যে রাঢ়দেশ দুইটি বিভিন্ন অংশে বিভক্ত ছিল, তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অজয় নদ এই দুই বিভাগের সীমা রক্ষা করিতেছে।

গ্রন্থকারের মতে, রাঢ়দেশই গ্রীকদিগের নিকট গঙ্গারিডি রাজ্য বলিয়া পরিচিত ছিল। কিন্তু গঙ্গারিডি যে রাঢ়দেশেই সীমাবদ্ধ ছিল, তাহা মনে হয় না। পাটলিপুত্র নগর যে দেশের রাজধানী ছিল, গ্রীকদূত মেগাস্থিনিস তাহাকে "প্রাসিই" বলিয়া অভিহিত করিয়া, তাহার পূর্ব্বদিকে গঙ্গারিডি নামক একটি স্বতন্ত্র রাজ্যের উল্লেখ করিয়াছেন বটে, কিন্তু কেবল রাঢ়দেশের অধিপতির পক্ষে পরাক্রান্ত মগধ রাজ্যের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া, স্বাধীনতা রক্ষা করা সম্ভবপর হইত না। বাঙ্গালার অপর দুই বিভাগ পুণ্ড্র ও বঙ্গ নিশ্চয়ই তৎকালে গঙ্গারিডি রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

প্রাচীন রাঢ়ের রাজধানী কোথায় ছিল, তাহা অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই। প্লিনির পার্থেলিস ও টলেমির গঙ্গে বন্দরের অবস্থান লইয়া আধুনিক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ নানা মতবাদের প্রচার করিয়াছেন, কিন্তু কেহ এ পর্য্যন্ত কোনও চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং গঙ্গে বন্দর ও পার্থেলিস নগর রাঢ়ের কোন স্থানে অবস্থিত ছিল, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। বঙ্গাধিপতি অনুরঙ্গ বা সিংহবাহুর প্রতিষ্ঠিত সিংহপুর ও হুগলী জেলার সিঙ্গুর যে অভিন্ন, শব্দের ধ্বনিগত সাদৃশ্য ব্যতীত তাহার কোনও বিশ্বাস যোগ্য প্রমাণ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। প্রবোধচন্দ্রোদয়ের রাঢ়াপুরীর অবস্থান সম্বন্ধে বিশেষ কোনও অনুসন্ধান হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কৃষ্ণ মিশ্র রাঢ়াপুরীকে গৌড়ের অন্তর্গত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। De Barrosএর মানচিত্রে Rara নামক একটি নগর গঙ্গানদীর পশ্চিম তীরে প্রাচীন গৌড় নগরের পরপারে অবস্থিত ছিল, এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। Blaevএর মানচিত্রে Rara স্থানে Para লিখিত হইয়াছে। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে অঙ্কিত মানচিত্রসমূহে এই স্থানটি নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের ভূরিশ্রেষ্ঠ নগর দম্ভের জন্মস্থান বলিয়া পরিচিত। ভূরিশ্রেষ্ঠ ও ভুরস্থট সম্ভবতঃ অভিন্ন। প্রবোধচন্দ্রোদয়ের বর্ণনায় মনে হয়, এক সময়ে এই স্থান জ্ঞান-গরিমায় ও ঐশ্বর্য্যে ভারত-প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু ভূরিশ্রেষ্ঠ নগর সমগ্র রাঢ়দেশের রাজধানী ছিল কি না, তাহার প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। স্থান-পরিচয়-প্রসঙ্গে গ্রন্থকার বহু জ্ঞাতব্য বিষয় অতি প্রাঞ্জল ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; ফলে উহা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। কিন্তু অনেক স্থলেই তিনি অলৌকিক কিংবদন্তীতে অতিমাত্রায় আস্থাস্থাপন করিয়া ইতিহাসের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন। অনেক প্রয়োজনীয় কথাও ইহাতে সন্নিবিষ্ট হয় নাই। আবশ্যকবোধে তাহার কয়েকটি কথা এ স্থলে উল্লেখ করা গেল।

---

(৪), বাঙ্গালার ইতিহাস—প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২২২।

(৫), "দক্ষিণ-রাঢ়াপ্রদেশঃ"। Prabodhacamdradaya (N. S. P. Ed); Canto II PP. 52 and 59 after VV. 2 and 8

ত্রিবেণী।—গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী, এই নদীত্রয়ের সঙ্গমস্থল যেমন যুক্তবেণী বলিয়া পরিচিত, তেমনই, এই নদীত্রয় যে স্থানে বিচ্ছিন্ন হইয়া ত্রিধারায় বিভক্ত হইয়াছে, সেই স্থানও মুক্তবেণী বলিয়া অভিহিত। যুক্তবেণী প্রয়াগ হিন্দুর একটি প্রধান তীর্থ। মুক্তবেণী ত্রিবেণীতেও বহু নরনারী মুক্তিকামনায় তীর্থস্নান করিয়া থাকেন। (১) সরস্বতী নদী ত্রিবেণীঘাটে গঙ্গা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত দক্ষিণবাহিনী হইয়া সাঁকরেলের নিকটে পুনরায় গঙ্গার সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। যমুনা নদী পূর্ব্ববাহিনী হইয়া কাঁচড়াপাড়ার প্রান্তদেশ বিধৌত করিয়া গোবরডাঙ্গার তিন ক্রোশ দূরে তিবির নিকটে ইছামতীর প্রবাহমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে।

স্মার্ত্ত-প্রবর রঘুনন্দন তদীয় প্রায়শ্চিত্ত-তত্ত্ব গ্রন্থে গঙ্গামাহাত্ম্য-বর্ণনায় ত্রিবেণীর অপর নাম দক্ষিণ প্রয়াগ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। (২) বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে তীর্থবর্ণনা-প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে যে, "ত্রিবেণীস্থ সরস্বতী ও যমুনাও প্রয়াগসদৃশ ফল প্রদান করিয়া থাকে।" (৩) ধোয়ীকবির পবনদূত-গ্রন্থোক্ত "ভাগীরথ্যা স্তপনতনয়া যত্র নির্যাতি দেবী" মুক্তবেণী ত্রিবেণীকে লক্ষ্য করিয়াই লিখিত হইয়াছে। (৪)

গঙ্গাসঙ্গমের অনতিদূরে গঙ্গাতীরে কৃষ্ণপ্রস্তরনির্ম্মিত গাজির দরগা, বা জাফর খাঁর সমাধি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার অনতিদূরে একটি সুবৃহৎ মসজিদ আছে। জনসাধারণের নিকট ইহা গাজির দরগা বা দফ্‌রা গাজীর কুড়ুল বলিয়া পরিচিত। গঙ্গাস্তব-প্রণেতা দরাফ খাঁ বাঙ্গালার জলবায়ুর দোষে সপ্তগ্রামবিজয়ী তুর্কী বীর জাফর খাঁতে পরিণত হইয়াছেন কি না, তাহা বিবেচ্য। জাফর খাঁর সমাধি দুই ভাগে বিভক্ত। ইহার পূর্ব্বভাগে জাফর খাঁ ও তাঁহার স্ত্রী, এবং পশ্চিম ভাগে তাঁহার ভ্রাতা "বড় গাজী" ও তৎপুত্রগণ সমাহিত হইয়াছেন। জাফর খাঁর সমাধিগৃহে চারিটি দ্বার আছে। প্রত্যেক দ্বারেই হিন্দু-প্রস্তর-শিল্পের প্রচুর নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়াছে। বড় গাজীর সমাধির অভ্যন্তরে কয়েকখানি প্রস্তরে প্রাচীন বঙ্গাক্ষরে ক্ষোদিত লিপি অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় D. Money এই ক্ষোদিত লিপিগুলির যে বিকৃত পাঠোদ্ধার করিয়াছিলেন, শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় তাহার সংশোধন করিয়াছেন। (১) ক্ষোদিত লিপিগুলি হইতে বোধ হয় যে, ঐগুলি মন্দিরের উর্দ্ধভাগে সন্নিবিষ্ট, প্রস্তরে ক্ষোদিত রামায়ণ ও মহাভারতের চিত্রাবলীর পাদদেশে সংলগ্ন ছিল। মন্দিরের অনতিদূরে

---

(১) প্রাচীন পুঁথিতে ত্রিবেণীর সঙ্গমস্থলেই সপ্তর্ষির বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণে লোকে যে স্থানে স্নান করিয়া থাকে, তাহা সঙ্গমের উত্তরে।

(২) প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বম্‌- -গঙ্গামাহাত্ম্য—পৃঃ ১০০।

(৩) বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণম্‌; পূর্ব্বখণ্ডম্‌—৮ অঃ—৩৩।৩৪ শ্লোঃ।

(৪). Pavana-duta in Verse 34. J. A. S. B. 1705. Vol I. Page 58.

(১) J. A. S. B. 1909, P. 246.

রাখাল বাবুর সংশোধিত পাঠ :—(১) শ্রীসীতানির্ব্বানঃ রামাভিষেকঃ। (২) সাভিষেক। (৩) শ্রীরামেণ রাবণবধঃ। (৪) শ্রীকৃষ্ণবাণাসুরয়োর্য়ুদ্ধম্‌। (৫) ধৃষ্টদ্যুম্নদুঃশাসনয়োর্য়ুদ্ধম্‌। (৬) সীতাবিবাহঃ। (৭) কংশবধঃ। (৮) চাণুরবধঃ। (৯) খরত্রিশিরসোর্ব্বধঃ......। (১০)......বস্ত্রহরণঃ।

অবস্থিত পুর্ব্বোক্ত মসজিদটি অতি অল্পকাল পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইলেও, ইহার পূর্ব্বে এই স্থানে বহু-সংখ্যক মসজিদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। তৎসমুদয়ের ক্ষোদিত লিপিগুলি বর্ত্তমান মসজিদে গ্রথিত হইয়াছে। এই ক্ষোদিত লিপিগুলি হইতেই সপ্তগ্রামের প্রাচীন ইতিহাস সঙ্কলন করা যাইতে পারে। সপ্তগ্রামের বৌদ্ধ ও জৈন নিদর্শন, বৈষ্ণবতীর্থ, সপ্তগ্রাম, ত্রিবেণী ও পাণ্ডুয়ার প্রাচীন কীর্ত্তি কলাপের বিস্তৃত পরিচয়, এবং প্রাচীন সপ্তগ্রামের ইতিহাস সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ১৫শ ভাগে অত্যন্ত যোগ্যতার সহিত বিবৃত হইয়াছে। এই গ্রন্থমধ্যে তাহার বিশদ আলোচনা থাকিলে গ্রন্থের মর্য্যাদা অনেক বৃদ্ধি পাইত।

মন্দারণ।—তবকাৎ-ই-নাসিরি গ্রন্থে উমর্দ্দন (উরমর্দ্দন বা অজমর্দ্দন) নাম উল্লিখিত হইয়াছে। বাঙ্গালার পাঠান শাসনকর্ত্তা বক্তিয়ার উদ্দীন উজবেক-ই-তুগ্রিল খাঁ, উমর্দ্দনেরা রাজার রাজধানীতে সসৈন্যে অতর্কিতভাবে উপস্থিত হইলে, রাজা রাজধানী ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হন। কিন্তু তাঁহার পরিবার ও অনুচরবর্গ এবং বিপুল ধনরাশি ও হস্তিসমূহ বিজয়ী মোসলমান সেনার করায়ত্ত হয়। (১) তবকাৎগ্রন্থে লিখিত আছে যে, তুগ্রিল যাজনগর জয় করিবার পরে উমর্দ্দন প্রদেশ হস্তগত করেন। এ জন্য কেহ কেহ অনুমান করেন যে, উমর্দ্দন প্রদেশ যাজনগর বা উড়িষ্যার অন্তর্গত ; এবং মন্দারণ (উ—মন্দার) উমর্দ্দনের অপভ্রংশমাত্র। মন্দার দেশ উড়িষ্যার রাজা চোরগঙ্গ কর্ত্তৃক বিজিত হইয়াছিল। ভবিষ্যৎ পুরাণে মন্দারণ মান্দারের দেশ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। (২) পাঠানরাজ হোসেন শাহার সেনাপতি ইস্মাইল গাজী মন্দারণের দুর্গে অবস্থিতি করিতেন। মন্দারণে ইস্মাইল গাজীর সমাধির উপর ক্ষোদিত লিপিযুক্ত একটি শিলাস্তম্ভ বিদ্যমান আছে।

আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে মন্দারণ বাঙ্গালার পশ্চিম-সীমাস্থিত একটি সরকার বলিয়া পরিচিত। উড়িষ্যার গঙ্গবংশীয় রাজগণের শাসনকালে মন্দারণ বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার সীমা রক্ষা করিত।

মন্দারণের প্রাচীন নাম অপার মন্দার বলিয়া কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। (৩) রামচরিতে রামপালদেবের সামন্ত-চক্রমধ্যে "দেবগ্রাম-প্রতিবদ্ধ বালবলভী-পতি" বিক্রমরাজের পরে "অপার-মন্দার-মধুসূদনঃ সমস্তাটবিক-সামন্ত-চক্রচূড়ামণিঃ" শূরবংশীয় লক্ষ্মীশূরের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু এই অপার-মন্দারের অবস্থান নির্ণয় করিবার কোনও উপায় অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। কারণ, লক্ষ্মীশূরের বংশ-পরিচয়, অথবা তাঁহার নাম অপর কোনও প্রাচীন গ্রন্থে বা শিলালিপিতে আবিষ্কৃত হয় নাই।

মাহনাদ—এই স্থানে উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরের মন্দিরের অনুকরণে নির্ম্মিত একটি অপূর্ব্ব শিবমন্দির বিদ্যমান আছে। এই মন্দিরমধ্যে জটেশ্বরনাথ নামে একটি শিবলিঙ্গ বিরাজমান। মন্দিরের চতুর্দ্দিকে বৌদ্ধ শ্রমণদিগের বহু সমাধি দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দির-প্রাঙ্গণে ধর্ম্মঠাকুরের নামে শিবচতুর্দ্দশী তিথিতে প্রতিবৎসর একটি 'যাত' বা

(১) Raverty's Tabagat-i-Nasiri, P. 763.

(২) Ind. Ant. Vol XX. P. 420.

(৩) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—রাজন্যকাণ্ড—১৯৯ পৃঃ।

মেলার অনুষ্ঠান হয়। জটেশ্বরের মন্দিরটি চন্দ্রকেতু নামক জনৈক রাজার দুর্গ বলিয়া পরিচিত। মন্দিরের সন্নিকটে চন্দ্রতীর্থ নামক একটি দীর্ঘিকা আছে। মহানাদের বশিষ্ঠ-কূপই পাণ্ডুয়ার জিয়ন-কুণ্ড বা জিয়ন-কূপ বলিয়া অভিহিত।

বিক্রমপুর।—আরামবাগ মহকুমার অনতিদূরে বিক্রমপুর গ্রামে বিশালাক্ষীদেবীর মন্দির বিদ্যমান আছে। শ্রীধর্ম্মমঙ্গলের কবি মাণিক গাঙ্গুলী সোনার রঙ্কিনীদেবীর বন্দনা করিয়া এই বিক্রমপুরের বিশালাদেবীর চরণবন্দনা করিয়াছেন।

আরসা সাজলা মনখাবাদ।—এই আরসা বা পরগণার নাম বারচক শাহ, ফতো শাহ ও হুসেন শাহের ক্ষোদিত লিপিতে পাওয়া গিয়াছে। সপ্তগ্রাম এক্ষণে আরসা পরগণায় অবস্থিত। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, আরসা সাজলা মনখাবাদ সর্ব্বজনবিদিত হওয়ায়, ক্রমে ক্ষুদ্রাকার হইয়া আরসায় পরিণত হইয়াছে। ক্রমে লোকে এই আরসা বা পরগণার প্রকৃত নাম বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে।

লাওবলা।—যে কয়েকটি ক্ষোদিত লিপিতে সাজলা মনখাবাদের উল্লেখ আছে, সেই কয়টিতেই লাওবলার নাম পাওয়া যায়। বারচক শাহের ক্ষোদিত লিপিতে লাওবলা নগর বলিয়া পরিচিত। সপ্তগ্রামের অপর ক্ষোদিত লিপিত্রয়ে ইহা থানা অর্থাৎ সেনানিবাস নামে অভিহিত। সপ্তগ্রামের পরপারে, যমুনাতীরে নাওপালা নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রাম বিদ্যমান আছে। মোগল-শাসনকালে ভাগীরথীর পশ্চিম তট সাতগাঁও সরকারের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সুতরাং পাঠান-শাসনকালে ভাগীরথীর অপর পারে সপ্তগ্রামের অধীন সেনা-নিবাস থাকা আশ্চর্য্য নহে।

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত-"দিগ্বিজয়-প্রকাশ" গ্রন্থে লিখিত আছে :—(১)

কুলপালো দেশপালো বিখ্যাতঃ পশ্চিমে তটে।
কুলপালস্য দ্বৌ পুত্রৌ হরিপালোঽহিপালো॥
জ্যেষ্ঠঃ সিন্দুর পশ্চিমে স্বনাম বসতিং কৃতঃ।
হরিপালো মহাগ্রামো হট্টবাপিসমন্বিতঃ।
হরিপালোহি তত্রৈব তন্তুবায়স্য গোষ্ঠীষু।
রাজা বভূব বিপ্রেষু সাঙ্গাপি সংজ্ঞকেষু চ।
অহিপালো মাহেশে চ রাজ্যং ত্যক্ত্বা চ পশ্চিমে।
ত্রিবেণীসন্নিধানে চ চক্রদ্বীপস্য সন্নিধৌ॥
উমুরদ্বীপমধ্যে চ বসতিং কৃতবান্ মুদা।
অহিপালস্য ত্রয়ঃ পুত্রাঃ বেদযোষিৎ সুজজ্ঞিরে॥
কৃতধ্বজো বিভাণ্ডশ্চ কেশিধ্বজো মহাবলঃ।
কৃতধ্বজস্য তনয়ো বিরলিসংজ্ঞকো বলিঃ॥
সুগন্ধিগ্রামমধ্যে চ চকার বসতিং মুদা॥ * * *

ইহা হইতে জানা যায় যে, পাল-বংশের বহুশাখা রাঢ়দেশের নানা স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য

(১) দিগ্বিজয়-প্রকাশ ; সপ্তজাঙ্গোল-বিবরণ।

প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই সমুদয় রাজার পরিচয় এবং তাঁহাদের রাজ্যের বিবরণ এই গ্রন্থে সংগৃহীত হয় নাই। গ্রন্থমধ্যে লক্ষ্মণসেনের মাধাইনগর তাম্রশাসনের পাঠ উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু উহা ভ্রমপ্রমাদে পূর্ণ। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় উক্ত তাম্রশাসনের যে পাঠোদ্ধার করা হইয়াছে, তাহাই ঐতিহাসিকগণ গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং এই ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ পাঠের উপর নির্ভর করিয়া গ্রন্থকার যে সমুদয় ঐতিহাসিক তথ্যের আলোচনা করিয়াছেন, তাহার কোনও মূল্য নাই।

গ্রন্থকার কয়েকটি অদ্ভুত কথার অবতারণা করিয়াছেন, যথাঃ—

১। "সুপ্রসিদ্ধ কবি কালিদাস সিংহপুর হইতে সিংহলে গমন করিয়া সেখানকার রাজকবি কুমারদাসের রচিত

সিয়, তাঁবরা, সিয়তাঁবরা, সিয় সেবনী।
সিয় সহুরা নিদিন লেবাতন সেবেনী।

এই শ্লোকের দুই পদ পূরণ করিয়া বারাঙ্গনাহস্তে নিধনপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন"! (৭৪ পৃঃ)

২। "শূর-বংশীয়েরা পাঁচপুরুষ মাত্র রাঢ়দেশে রাজত্ব করিলে, দাক্ষিণাত্যের অধিপতি রাজেন্দ্র চোল রণশূরকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া তাঁহার রাজ্য অধিকার করেন। (৬৮ পৃঃ)

৩। বল্লালের অবসরগ্রহণের পর লক্ষ্মণ সেনকেও পালবংশীয়গণের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হইয়াছিল। (৪৩ পৃঃ)

বলা বাহুল্য যে, এই সমুদয় উক্তির সমর্থক কোনও প্রমাণ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই।

শ্রী যতীন্দ্রমোহন রায়।

সমুদ্র-মন্থন।

১

ফেনিয়া ফুঁসিয়া উঠে কল্লোলে গর্জ্জনে
মন্থিত সাগর;
ঘুরিছে মন্থন-দণ্ড, ভৈরব-শ্রবণে
আবর্ত্ত-ঘর্ঘর।
দাও দাও, সুধা দাও— চাহে নরামর,
দ্যুলোক ভূলোক।
দাও মৃত্যুঞ্জয়ী সুধা— অজর—অমর,
অরোগ—অশোক।

২

নীল জল পাংশুবর্ণ, উঠিল কর্দ্দম,
শঙ্খ, শুক্তি কত ;
কত তিমি, তিমিঙ্গিল— নাহি তার ক্রম,
সদ্যঃ-জীবগত।
আছাড়িয়া পড়ে মৎস্য মরণ-শিলায়—
তটে স্তূপাকার ;
উৎক্ষেপিয়া, বিক্ষেপিয়া গর্জ্জে উভরায়
ক্ষুব্ধ পারাবার !

৩

সহে না, সহে না ক্লেশ— দিবস রজনী !
মন্থন-সম্ভব—
উঠে লক্ষ্মী নিরুপমা, দেব-কণ্ঠ-মণি—
কৌস্তুভ দুর্লভ !
ঐরাবত, উচ্চৈঃশ্রবা উঠে একে একে,
মন্দার সুন্দর ;
উঠে শশী—মুগ্ধনেত্রে সুরাসুর দেখে,
চাহে পরস্পর !

৪

'কোথা সুধা কোথা সুধা, আছে কোন স্তরে ?
সমুদ্র অতল !
ঘুরাও মন্থন-দণ্ড, ক্লান্ত অজগরে
দাও নব বল।'
এবার উঠিল সুধা —মন্থনের সার—
দেব-ভোগ্য যাহা,
দেব-সঞ্জীবনী সুধা দেব ভিন্ন আর
ভুঞ্জে কেবা তাহা ?

৫

অমৃত-বণ্টন লয়ে সুরাসুর মাঝে
বাজিল সংগ্রাম ;

দেব-মায়া হরি' সুধা দেবতার কাজে
গেল দিব্য-ধাম !
রণশ্রান্ত অসুরের জ্বলে' উঠে হিয়া ;
সুধা অপহৃত ;—
'দাও দাও—সুধা দাও—' উঠিল গর্জ্জিয়া,
কোথায় অমৃত !

৬

ক্ষিপ্ত, ক্রুদ্ধ দিতিসুত আরম্ভিল ক্ষোভে
মন্থন আবার ;
সিন্ধু-গর্ভে আলোড়িয়া অমৃতের লোভে
ছাড়িল হুঙ্কার !
আবর্ত্তে ফেনিল সিন্ধু, আবিল কর্দ্দমে,—
উঠে অন্তঃস্তর ;
শিলা, ধাতু, জীব, অস্থি, উঠে অনুক্রমে
কঙ্কাল-পঞ্জর।

৭

শূন্য-কুক্ষি লবণাম্বু, পন্নগ কাতর
ছাড়ে বিষ-শ্বাস ;
ঝলকে গরল উঠে— মৃত্যুর দোসর,
বিশ্বের সন্ত্রাস !
হাহাকার জীবলোকে, অসুর বিহ্বল,—
কাঁপে থর-থর ;
কালকূটে বিশ্ব জ্বলে, ত্রস্ত দেবদল
স্মরে 'হর হর !'

৮

জগতের জীব মরে বাসুকি-গরলে,
নহে স্থির প্রাণ—
জীব-দুঃখে দুঃখী শিব তীব্র হলাহলে
করিলেন পান।

*   *

এস এস, বিষ-কণ্ঠ! বিশ্ব ছারখার
পাপ-বিষ-দাহে,
এস এস, মরে জীব, রক্ষ আরবার—
গরল-প্রবাহে।

শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়।

সংগ্রহ।

'নারায়ণ!—নারায়ণ!!'

বাঙ্গালীর উপায় কি? বাঙ্গালী কোন পথের যাত্রী? বাঙ্গালী কি 'পাকা ঘুঁটী কাঁচাইয়া' সত্য সত্যই রসাতলে প্রবেশ করিবে? বাঙ্গালীকে বাঙ্গালী না রাখিলে আর কে রাখিবে?

মাঘ মাসের 'নারায়ণ'খানি পড়িয়া এই সকল প্রশ্নই মনে উঠিতেছে। শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাস সুশিক্ষিত;—অক্‌স্‌ফোর্ডের Culture-এ উজ্জ্বল, আবার বাঙ্গালার মহাজন-পদাবলীর অনুশীলনে মধুর! তিনি 'উজ্জ্বলে মধুরে' মণ্ডিত কবি। তিনি সাহিত্যের ও সমাজের অনেক সভার সভাপতি হইয়া বাঙ্গালীকে গন্তব্য পথের নির্দ্দেশ করেন। তাঁহার 'নারায়ণে'র বিগ্রহে এ কি ঘৃণাকারজনক, দুর্গন্ধ, কুৎসিত ক্ষতচিহ্ন! 'নারায়ণে'র সাক্ষাৎ পাইয়াও যদি জুগুপ্সায় 'নারায়ণ! নারায়ণ!' বলিয়া উঠিতে হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালীর উপায় কি?

বাঙ্গালায় যাহা হয় নাই, তাহাই করিবার জন্য চিত্তরঞ্জন 'নারায়ণে'র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার সে প্রতিজ্ঞা—সে সঙ্কল্প পূর্ণ হইয়াছে!—বাঙ্গালা সাহিত্যে—অর্থাৎ আধুনিক বাঙ্গালা অক্ষরে ছাপা কেতাবের বাজারে অনেক কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালায় 'বেশ্যাশাস্ত্র' ও 'লম্পট-পুরাণ' ছাপা হইয়াছে। এমন অনেক কেতাব দেখিয়াছি, ভদ্রসমাজে যাহাদের নাম উল্লেখ করিবারও উপায় নাই। অশ্লীলতা ও কদর্য্যতা, কৌৎসিত্য ও কুরুচিরও অনেক দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি। কিন্তু সত্যের অনুরোধে স্বীকার করিতে হইতেছে,—চিত্তরঞ্জনের 'নারায়ণে' যাহা দেখিতেছি,—এমনটি আর কখনও দেখি নাই।

অজ্ঞাতনামা, অশিক্ষিত, ক্ষুৎপীড়িত ব্যবসায়ী জঠর-জ্বালায় উন্মত্ত হইয়া কামের ফেরী করে। ভদ্রসমাজে সে শ্রেণীর ফেরীওয়ালার প্রবেশাধিকার থাকে না। কিন্তু চিত্তরঞ্জনের 'নারায়ণ' তাঁহার নামের বর্ম্মে আবৃত হইয়া অসঙ্কোচে, অবলীলাক্রমে, নিতান্ত নির্লজ্জ, উলঙ্গ কামের ও বিবসনা কাময়মানা রতির কদর্য্য, কুৎসিত, বীভৎস, জুগুপ্সাজনক নারকীয় 'কেচ্ছা' ভদ্রসমাজে পরিবেষণ করিতেছে! ইঙ্গ-বঙ্গ-লাঞ্ছিত ভারতচন্দ্রের অশ্লীলতাও ইহার তুলনায় 'ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান'! কবির লালী, তর্জ্জার খেউড়ও ইহার তুলনায় ভগবদ্গীতা! ইতিপূর্ব্বে আর কেহ কখনও বাঙ্গালার ভদ্রসমাজে, ভদ্র-সাহিত্যে, ভদ্রজনপাঠ্য মাসিকে এমন লোমহর্ষণ 'কামায়ন' প্রচার করিয়া এত অসমসাহসিকতা, দাম্ভিকতা ও 'খাতির-নাদারতা'র পরিচয় দিয়াছেন কি না

মাঘের 'নারায়ণে'র বক্ষে ক্রূর 'ক্যান্সারে'র মত 'কমলের দুঃখ' দগ্‌দগ্‌ করিতেছে। এ দুঃখ শুধু কমলের নয়;—কুমুদের, কহ্লারের, ইন্দীবরের; জাতির, যূথীর, মালতীর; পলাশের, শিমুলের, ঘেঁটুর! বাঙ্গালার নন্দন হইতে বনবাদাড় পর্য্যন্ত যেখানে যে আছে, এ দুঃখ তাহারই! কেবল বিছুটীর দুঃখ করিবার কারণ নাই! কারণ, 'কমলের দুঃখে' একমাত্র তাহারই একচেটে অধিকার!

স্বর্গীয় গুপ্ত-কবির বংশজ শ্রীমান সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত এই 'কমলের দুঃখ' রচিয়াছেন।—শুনিতে পাই,—চিত্তরঞ্জনের সমালোচনী প্রতিভার নিকষে সত্যেন্দ্রকৃষ্ণের প্রতিভার যাচাই হইয়া গিয়াছে। তাহা চীনের পান্না না হউক, গিনি বটে। লোকে বলে,—বাঙ্গালা সাহিত্যের বড়বাজারের মহাভারত পোদ্দার, মনীষী ব্রজেন্দ্রকুমার শীল মহাশয় চিত্তরঞ্জনের যাচাই কবুল করিয়াছেন! চিত্তবাবুর পরিষদে প্রচার,—সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ একাধারে সেক্সপীয়র, ইব্‌সেন, হফ্‌ম্যান্, হার্ডী।

সেই সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ 'কমলের দুঃখে' Realism বা 'স্বাভাবিকতা'র আরোপ করিবার জন্য 'হেনা' ও 'যুঁই' ছড়াইয়া দিয়াছেন! এ হেনা কামের বাগানে ফোটে। এ যুঁই রতির মালঞ্চে লোটে। বিলাসের হাটে, লালসার মেলায় এ হেনার রক্তে হতভাগ্য ও হতভাগিনীদের কর-চরণ রঞ্জিত হয়। মালিনীরা এই যুঁইয়ের একহারা ও ডবল-মালা ও 'গড়ে' গাঁথিয়া, মালীর মারফৎ লম্পটপুরের লক্ষ্মীছাড়া পাড়ার মোড়ে বেচিতে পাঠায়।

ধনী চিত্তরঞ্জনের পয়সায় হীরে মালিনীর নাতিনীদের বেসাতীর সেই গড়ে সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ কিনিয়া আনিয়াছে, এবং চিত্তরঞ্জনের প্রতিষ্ঠিত 'নারায়ণে'র কণ্ঠের পারিজাত-মালিকা নর্দ্দমায় নিক্ষেপ করিয়া, তাহার স্থানে পরাইয়া দিয়াছে! বল, বাঙ্গালায় কাঞ্চন-কৌলীন্যের দিগ্বিজয় সম্পূর্ণ হইল কি না? বল, বাঙ্গালীর স্বর্ণগর্দ্দভপূজা এত দিনে সার্থক হইল কি না? বল, বাঙ্গালা দেশে পয়সায় অসম্ভব সম্ভব হয় কি না?

সসঙ্কোচে আমরা 'হেনা-যুঁই'-সংবাদ পাঠকের সম্মুখে ধরিতেছি।—

'কিন্তু ভাই দেখ্, যত সেই ছবিখানার দিকে তাকাই, ততই যেন বুকের ভেতর কেমন করতে লাগল—কি সোন্দর আর কি জোয়ান। শুনেছি, এখন বিয়ে হয় নি। দেখ্, গোলাপী, তুই ঠিক বলেছিস্, যাদের মাগ নেই, তাদের কাছে থাকাই ভাল। তারা তবু একটু দরদ করে। এই জন্যেই একে আরো দেখ্‌তে পারিনে।—কি সোন্দর, মাইরি দেখ্‌লেই যেন ভালবাসতে ইচ্ছা করে। উঃ, কি চেটাল বুক, আর কেমন লম্বা—কি থাক থাক লতানে চুল আর টক্‌টকে গোলাপের আভায় রং যেন ফেটে পড়ছে। মাইরি, তোকে আর কি বল্‌ব।—এ পাখী যদি না ধর্‌তে পারি, তবে মিছেই পাখী পোষার সাধ। * * * * মার যেমনঃকেবল টাকা, টাকা, টাকা, কেন্ না, এ রাস্তায় এসেছি—বলে কি মন প্রাণ সব ভাসিয়ে দিতে হবে নাকি? এসেছি সুখের জন্যে, যাতে সুখ হয়, তাই করব।' *

পুনরপি,—

'আমি সিঁড়ি দিয়ে উঠে দেখি, আমারই খাটের ওপর আমার সেই গুণধর মর্ত্তের দেবতা

* 'নায়কে' উদ্ধৃত অংশ হইতেও কিছু কিছু 'সাহিত্যে' বাদ দিতে হইল।—সাহিত্য-সম্পাদক।

যাকে তোমরা স্বামী বল তিনি, আর তাঁর অধিষ্ঠাত্রী দেবী, মাথা থেকে পা অবধি ফুলের সাজে সেজে, * * * কি অবস্থায় রয়েছেন।'

এ ভাষা, এ ভাব, এই আকাঙ্ক্ষা, এই লালসা, এমন নির্লজ্জ, উলঙ্গ, উদ্দাম কাম, এমন রক্তমাংসের 'ফিলজফী' যে সাহিত্যে ছাপা হয়, এবং নির্বিবাদে চলিয়া যায়, কোনও রসতত্ত্ব, কোনও মহাজন-পদাবলী, কোনও বৌদ্ধধর্ম্ম, কোনও সাগরসঙ্গীত সে সাহিত্যের অধোগতির বেগ রুদ্ধ করিতে পারে কি ?

এই বীভৎস ব্যাপার উপেক্ষা করিবার উপায় থাকিলে, আমরা এ নরক ঘাঁটিতাম না। ইহার সঙ্গে একটা স্পর্দ্ধার—জিদের,—'খাতির-নাদারতে'র ভাব আছে। এই শ্রেণীর জঘন্য রচনা আপনার যোগ্য স্থান আপনিই অনায়াসে বাছিয়া লইতে পারিবে। সে জন্য আমাদের মাথাব্যথা নাই। কিন্তু যিনি আমাদের সমাজে 'আর্ট' বলিয়া কাম ফেরী করিতেছেন, তিনি যে বাঙ্গালীর শিরোমণি! তিনি ভাবিয়া চিন্তিয়া, বুঝিয়া সুঝিয়া, 'অনেক চিন্তার পর' এই শ্রেণীর রচনা আবার ছাপিতে আরম্ভ করিয়াছেন! শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাসের এই বিচারবুদ্ধির 'সাইকলজী' নিশ্চিতই বাঙ্গালীর গবেষণার বস্তু। তাই আজ শ্রবণের অবকাশ দিলাম। শ্রবণের পর, মনন। তার পর, নিদিধ্যাসন। যদি প্রথমটার কল্যাণে শেষ সোপান পর্য্যন্ত পঁহুছিতে পারেন, তাহা হইলে, বাঙ্গালার 'আর্ট' ও বাঙ্গালীর ভাগ্য, উভয়ে একটা রফা-বন্দোবস্ত সম্ভব হইতে পারে।

প্রথমে যখন এই শ্রেণীর অপচার ও ব্যভিচার 'নারায়ণে' ছাপা হয়, তখন সমগ্র বাঙ্গালীর শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুত সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় হইতে আরম্ভ করিয়া সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ পর্য্যন্ত অনেকে প্রতিবাদ করিয়া দাস মহাশয়কে পত্র লিখিয়াছিলেন। সার গুরুদাস প্রভৃতি কয়েক জন 'নারায়ণ' ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। বিপিনবাবু 'নারায়ণে'ই খোদ 'নারায়ণে' অধিষ্ঠিত এই শ্রেণীর অপচারের নিন্দা করিয়াছিলেন। তাহার পর কিছু দিন চিত্তরঞ্জনের 'নারায়ণে' বারযোষার লীলা,—উলঙ্গ কামের নারকীয় ছবি ছাপা হয় নাই। চিত্তরঞ্জন আবার তাহার সূচনা করিলেন। এবার সুদে-আসলে ধার শোধ করিয়াছেন!

ইহার অর্থ এই যে, 'আমি সাধারণের ধার ধারি না। আমার মতে যাহা প্রতিভার দান, তাহা আমি দু' হাতে ছড়াইব। কেন না, দ্বিজেন্দ্রলালের সেই বোতল-পাণি হীরোদের মত,—

'আমরা করিনে কাউকে কেয়ার!'

এই সৎসাহস অতুলনীয়! এই আর্ট-বাৎসল্য অত্যন্ত রমণীয়। 'স্বাভাবিকতা'র এমন আরাধনা যতই শোচনীয় হউক,—চূড়ান্তস্থানীয়!

গত ১৫ই ও ১৬ই পৌষ শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাস 'বিক্রমপুর-সম্মিলনী'র দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তাঁহার অভিভাষণে দাস মহাশয় বলিয়াছিলেন,—'টাকার জোরে কেমন করিয়া যে মানুষ মানুষের উপর অত্যাচার করিতে পারে, ইউরোপে বর্ত্তমান কালে Strike, 'Combine' বা ধর্ম্মঘট এবং অন্যান্য অনেক ঘটনা তাহার প্রমাণ।'

ইউরোপে ধর্ম্মঘট তাহার প্রমাণ হইতে পারে, কিন্তু আমাদের এই দুর্ভাগ্য দরিদ্র দেশে—

টাকার জোরে কেমন করিয়া যে মানুষে মানুষের উপর অত্যাচার করিতে পারে, সাহিত্যক্ষেত্রে তিনিই তাহার প্রমাণ; তাঁহার 'নারায়ণ'ই তাহার প্রমাণ; তাঁহার সত্যেন্দ্রকৃষ্ণই তাহার প্রমাণ; তাঁহার সত্যেন্দ্রকৃষ্ণের বারঘোষা-প্রতিভার আটাশে মাণিক হেনা—যুঁই তাহার প্রমাণ। আর, নির্ব্বাক্, নিঃস্পন্দ, মূক; স্বর্ণচ্ছটামুগ্ধ, শুদ্ধ বাঙ্গালীও তাহার চমৎকার—প্রকৃষ্ট—প্রত্যক্ষ—নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ!

সত্যেন্দ্র গুপ্ত-কবির সহোদরের দৌহিত্র। তিনি বাঙ্গালায় গুপ্ত-কবির পরিচয়ে আপনার পরিচয় দিয়া থাকেন। বোধ হয়, তিনি ঠাকুরদাদার রচনা পড়িয়াছেন।—গুপ্ত-কবি পাঁঠার জননীকে বলিয়াছিলেন,—'স্বর্ণকুঁকী, রত্নগর্ভা পাঁঠার জননী'। সত্যেন্দ্রকে আর কি বলিব,—গুপ্ত-কবির ভাষায় বলি,—তোমার প্রতিভাও সেইরূপ 'স্বর্ণকুঁকী, রত্নগর্ভা' বটে! নতুবা এমন ছাগকুলসুলভ উদ্দাম কাম প্রসব করিতে পারিত না। *

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

সৌরভ। মাঘ। সার ডাক্তার আশুতোষের বাঁকীপুর-সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত 'অভি-ভাষণ' কয়েকটি মাসিকে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে। তথাপি তাহা মাঘের 'সৌরভে' মুদ্রিত হইল কেন, বলিতে পারি না। অনধিকারী সমুদ্রাগমচক্রবর্ত্তীর অনধিকারচর্চ্চায় এমন কিছু বস্তু বা মৌলিকতা নাই যে, তাহার ওড়োন-পাড়ন না করিলে, মাসিকপত্র-সম্পাদকগণের প্রত্যবায় ঘটিবে! অনধিকারচর্চ্চা সাহিত্যক্ষেত্রেই সর্ব্বাগ্রে ধরা পড়ে। কিন্তু আমরা এমনই অন্ধ যে, একটা অভিভাষণে সাত রকম ভাষার খিচুড়ী, মূর্খবিনোদন বিশেষণের অন্তঃসার-শূন্যতা ও সুলভ, মৌখিক উদ্দীপনার গিলটীও ধরিতে পারি না! পাটনাই কফী ও ছোলার মত পাটনাই অভিভাষণও খুব বড় ও উমদা না হইয়া যায় না, গোলা লোকে এমন অনুমান-খণ্ডের আশ্রয় লইয়া ঠকিতে পারে। কিন্তু যাঁহারা মাসিকপত্রের সম্পাদক, তাঁহারা তালকানা হইলে উপায় কি? 'ইতিহাস'ও বাঁকীপুরের সাহিত্য-সম্মিলনের ইতিহাস-শাখার সভাপতির অভিভাষণ। ইহাও 'নব্য-ভারতে' ছাপা হইয়া গিয়াছে। 'তীর্থলীলা' নামক পদ্যে দেখিতেছি,—'সরম-সরু-সূতায় গাঁথা মায়ায় রত্ন-হার!' কবি যে 'কাটুনা কাটেন সরু সরু'—সে বিষয়ে আর সন্দেহ হইতে পারে না। সরম যদি সরু-সূতার মূর্ত্তিতেও ঘটে থাকিত, তাহা হইলে এমন কবিতা ছাপিতে একটু দ্বিধাবোধ হইত। যেটুকু ছিল, তাহা মায়ার রত্নহার গাঁথিতেই খরচ হইয়া গিয়াছে! 'কোম্পানীর আমলে শিক্ষার অবস্থা' এবার 'সৌরভে'র মান রাখিয়াছে। প্রবন্ধটি এখনও সমাপ্ত হয় নাই। 'সাহিত্য-সম্মিলন' প্রবন্ধে লেখক যাহা লিখিয়াছেন, প্রত্যেক

---

* নায়ক; ৩০শে মাঘ, সোমবার; ১৩২৩।

সাহিত্যসেবীর তাহা চিন্তনীয়। সাহিত্যেও গণতন্ত্র চাই। কাঞ্চন-কৌলীন্য, পায়ার কৌলীন্য যেন সাহিত্যক্ষেত্রে বদ্ধমূল হইতে না পারে। লেখক যে সকল অপচারের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা উপসর্গ; মূল রোগ নয়। লোক-মত যদি আপনাকে সাহিত্যেও প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে, তাহা হইলে সম্মিলনও তাহারই অনুসরণ করিবে, তাহাকে অতিক্রম করিতে পারিবে না। আর, আমরা যদি গড্ডলিকা-প্রবাহের মত স্বর্ণগর্দ্দভের অনুসরণ করি, লোক-মতের গলায় শিকলী বাঁধিয়া তাহাকে কুকুরের মত সম্মিলনের বারোয়ারীতে টানিয়া লইয়া যাই, এবং খোস্‌-খেয়ালের হুকুমে তাহাকে উঠিতে ও বসিতে বাধ্য করি, তাহা হইলে শত বৎসর বিলাপ করিয়াও আমরা সম্মিলনে—পরিষদে—সাহিত্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে পারিব না।

জগজ্জ্যোতিঃ। মাঘ। শ্রীসন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় 'অশোকে'র গল্প লিখিতেছেন। গল্পের ভঙ্গী মন্দ নয়। কিন্তু ভাষায় গুরু-চণ্ডাল দোষ আছে। তাহা ত সহজেই বর্জ্জন করা যায়। শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রীর 'প্রাতিমোক্ষ' পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। এইরূপ প্রবন্ধই 'জগজ্জ্যোতিঃ'কে শোভা পায়। শ্রীগোকুলদাস দের 'ভগবান বুদ্ধ ও দেবদত্ত' পালি ভাষা হইতে সঙ্কলিত উপাদেয় কাহিনী। 'মন্তব্য ও সংবাদে' বিশ্ববিশ্রুত কীর্ত্তি স্বর্গীয় রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুরের স্মরণ-সভার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। ক্ষুদ্র মুকুরে যেমন বড় ছবি প্রতিবিম্বিত হয়, এই ক্ষুদ্র বিবরণে তেমনই বাঙ্গালীর বাবদুকতার প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলেন,—'প্রায় ২৩ বৎসর পূর্ব্বে যখন আমি কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যাপক ছিলাম, তখন শরৎবাবুর সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়।' ইহাতে দুইটি তথ্য আছে। প্রথম, 'প্রায়' তেইশ বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যাভূষণ মহাশয় Land of সরপুরিয়া and সরভাজা'র কলেজে অধ্যাপক ছিলেন। কিন্তু এ তথ্যও অসম্পূর্ণ। কেন না, ঠিক তেইশ বৎসর, বা বাইশ বৎসর আড়াই মাস, বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাহা শপথ করিয়া বলেন নাই। আশা করি, কোনও প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব পাঁজী পুঁথি দেখিয়া ঠিক কালটা নির্ণয় করিয়া দিবেন। দ্বিতীয়,—ঐ সময়ে তিব্বতভ্রমণকারী শরচ্চন্দ্র তিব্বতালোড়নকারী বিদ্যাভূষণের সহিত পরিচিত হন। ইহাও দাস মহাশয়ের জীবনের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা, সে বিষয়ে সংশয় নাই। আশা করি, এই তথ্য চন্দ্রমণ্ডলের মত শরচ্চন্দ্রের জীবনকে বেষ্টন করিয়া থাকিবে।—'পুরাতত্ত্বভূষণ' শ্রীচারুচন্দ্র বসু বলেন,—'শরৎ বাবুর সুদীর্ঘ জীবন শুধু বৌদ্ধসাহিত্য-আলোচনায় ব্যয়িত হইয়াছিল। তিনি প্রসিদ্ধ চীন-পরিব্রাজক ফাহিয়ান্ ও হিউয়েন্ সাঙ্গ অপেক্ষা কোনও অংশে কম নহেন।' শরৎবাবুর মত মনীষী বাঙ্গালায় বিরল। তিনি নব্য বঙ্গের এক জন অগ্রগণ্য বাঙ্গালী, সে বিষয়ে মতভেদ হইতে পারে, না। কিন্তু এ তুলনা কি সঙ্গত? বশিষ্ঠে ও শাতাতপে তুলনা চলিতে পারে, দিলীপে ও বিশ্বামিত্রে তুলনা হয় না। তাহার পর,—'গঙ্গার অপর পারে পুরাংগ্রী বা ভোটবাগান নামক প্রাচীন বৌদ্ধবিহার অধুনা শিবমন্দিরে পরিণত হইয়াছে—ইহা পূর্ব্বকালে জনৈক লামা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি প্রথমতঃ সেই ভুটিয়াদের স্কুলের শিক্ষক ছিলেন।' শরৎবাবু সেই ভুটিয়াদের—ভোটবাগানের ভুটিয়া স্কুলের শিক্ষক ছিলেন না। তিনি দার্জ্জিলিঙ্গের সরকারী ভুটিয়া স্কুলে শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

উদ্বোধন। মাঘ। 'আচার্য্য শ্রীবিবেকানন্দ' চলিতেছে। স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে

বুদ্ধদেব কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, এই সংখ্যায় তাহার বিবরণ আছে। স্বামীজী একদিন বলিয়াছিলেন, 'তোমরা কি কখনও বীরগণের হৃদয়ের বিষয় চিন্তা কর নাই? উহা মহৎ, অতি মহৎ, সে মহত্ত্বের তুলনা নাই—তথাপি উহা আবার নবনীতের ন্যায় কোমল!' ভবভূতির উক্তি মনে পড়ে—

'বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি।
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কো নু বিজ্ঞাতুমর্হতি।'

স্বামীজীর চরিত্রেও আমরা এই দুই বিরোধী ভাবের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করিয়াছি। 'অবতারগণকে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করা সম্বন্ধে' একদিন কোনও রমণী প্রশ্ন করিলে স্বামীজী উত্তরে বলিয়াছিলেন,—'বলিতে কি, যদি আমি ন্যেজারেথনিবাসী ঈশার সময়ে যুডিয়ায় বাস করিতাম, তাহা হইলে আমি অশ্রুধারায় নহে—হৃদয়ের শোণিতে তাঁহার চরণযুগল ধৌত করিয়া দিতাম!' ভক্তি, উদারতা ও গুণগ্রাহিতার চূড়ান্ত নয় কি? শ্রীশরৎপ্রিয় দেবশর্ম্মার 'গল্প-স্বপ্নে'র ভাষা অত্যন্ত সঙ্কর। 'নীচে-রচিত গ্রন্থাদির পরিচয়' ও 'ইউরোপের দর্শনের ইতিহাস' চলিতেছে। এবারকার 'উদ্বোধন' প্রবন্ধে বড় দীন। এবার স্বামী বিবেকানন্দের চারিখানি চিঠি ছাপা হইয়াছে।

উপাসনা। মাঘ। উপাসনায় আর সম্পাদকের সে একাগ্রতা নাই। অন্ততঃ এ সংখ্যার দৈন্য দেখিয়া তাহাই ত মনে হয়। সম্পাদকের 'আলোচনা'ও পানসে হইয়া পড়িয়াছে; তবে তাহা অচল নয়। কিন্তু 'অতিবুদ্ধির গলায় দড়ি' উপাসনায় শোভা পায় না। 'বীর-কুমার-সম্ভব কাব্য'ও তথৈব চ। গত কয়েক মাস হইতে 'উপাসনা'র মূলমন্ত্র যেন হারাইয়া গিয়াছে। নবীন সম্পাদক কি ইহার মধ্যেই শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন? তবে উপাসনা সাহিত্যে 'নূতন কিছু করো'র মনে রাখিতেছে বটে! যথা,—শ্রীকালিদাস রায়ের 'ভৈরবসুন্দর' কবিতার—'তোমার চণ্ডিমা মাঝে কি মাধুরী ভৈরব সুন্দর!'. কবি কালিদাসের 'চণ্ডিমা'য় উপাসনাও 'ভয়ঙ্করী প্রলয়ঙ্করী' হইয়া উঠিল!

স্বাস্থ্য-সমাচার। মাঘ। 'আলোচনা'য় দেখিতেছি,—'কংগ্রেসে পল্লীসংস্কার, পানীয় জলের সংস্থান সম্বন্ধে কোনও কথা হইল না কেন? আমরা এই ব্যাপার দেখিয়া বিস্মিত ও দুঃখিত হইয়াছি। ভারতের পল্লীগুলি দেশবাসীর পৌরুষ, মনীষা ও প্রতিভার উন্মেষের পুণ্যক্ষেত্র। পল্লীর উন্নতির উপর যে জাতির ভাবী উন্নতি নির্ভর করিতেছে, এ কথা কে না জানেন? কথাটা পুরাতন হইতে পারে, কিন্তু এ যে জীবন মরণের কথা। পুরাতন হইলেও ইহার প্রয়োজনীয়তা তিলমাত্র হ্রাস পায় নাই, বরং প্রতি বৎসর পল্লীর সংস্কার ও স্বাস্থ্যোন্নতিসাধন সমস্যাটি অধিক গুরুতর হইয়া উঠিতেছে। ভ্রম বা উপেক্ষা,—যে কারণেই এই ত্রুটী ঘটিয়া থাকুক, উহা অমার্জ্জনীয়।' কথাগুলি বর্ণে বর্ণে সত্য। কংগ্রেসে বাঙ্গালীর জীবন-মরণ-সমস্যার স্থান নাই। সাহিত্যেও নাই। আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সাহিত্য-সম্মিলনের অভিভাষণে বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যের কথা তুলিয়া কমলবিলাসী কবির উপাসক-মহলে উপহসিত হইয়াছিলেন! 'চাচা, আপন বাঁচা' কথাটা বড় পাকা। কিন্তু আমরা সেই পাকা কথাটাই ভুলিয়া গিয়াছি। 'আমি'ই যদি না থাকি, আমার বংশধরাই যদি ধ্বংসসাগরে মিশিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়, বাঙ্গালী জাতির পারম্পর্য্য ও আমার জাতির অস্তিত্বই যদি বিলুপ্ত হয়, তাহা হইলে কংগ্রেসের রাজনীতিক আন্দো-

জনের ফল কে ভোগ করিবে?—দুর্ব্বল দেহে সবল আত্মার অধিষ্ঠান হয় না। আর, রাজনীতিক অধিকার সম্বন্ধেও বলা যায়, 'নায়ং বলহীনের লভ্যঃ'। আর্থিক দুরবস্থা আমাদের শারীরিক দুর্দ্দশার মুখ্য কারণ। আবার, আর্থিক দুরবস্থার অবসানও আমাদের শারীরিক ও মানসিক শক্তিসাপেক্ষ। উভয়ই পরস্পর-সাপেক্ষ। আমরা গাড়ীর আগে ঘোড়া না জুতিয়া, ঘোড়ার আগে গাড়ী জুতিয়া উন্নতির তীর্থে যাত্রা করিয়াছি।—কংগ্রেসে গ্রাম-সংস্কারের জন্য প্রস্তাব বিধিবদ্ধ করিয়াই বা লাভ কি? সে প্রস্তাব কে কার্য্যে পরিণত করিবে? দু' জন, দশ জন, বিশ জনে মিলিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংঘের সৃষ্টি করিয়া, হাতে-কলমে গ্রামের সংস্কার,—স্বাস্থ্যের যথাসম্ভব উন্নতি করিয়া আদর্শের সৃষ্টি না করিলে, আমাদের জাতিকে স্বাস্থ্য-মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে না পারিলে, এ দুর্দ্দশার অবসান হইবে না। জীবনে, স্বাস্থ্যে, বলে, পূর্ণ মনুষ্যত্বে যাহাদের রুচি নাই, তাহাদের দুর্ভাগ্যের কি তুলনা আছে? 'শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্' যাহাদের মূল মন্ত্র, তাহারা স্বাস্থ্য-সাধনায় পশুর অধম,—আত্মরক্ষায় স্থাণু অপেক্ষাও অধিক নিশ্চেষ্ট। ক্রমাগত আলোচনায় সাধারণের এ বিষয়ে দৃষ্টি পড়িবে। তাহার পর যদি চিন্তা জাগে, চেষ্টাও আত্মপ্রকাশ করিবে। আশা এই যে, যখন এত দিন আছি, তখন আরও কিছু কাল থাকিতে পারি। যদি ইহার মধ্যে জাগিতে পারি, বাঁচিবার পথ দেখিতে পাই, এবং সেই পথে যাত্রা করিবার সাধ, সাহস ও শক্তি লাভ করি, তাহা হইলে আবার সোনার বাঙ্গালায় মানুষ রাখিয়া যাইতে পারিব। এই বিশাল বঙ্গে এক 'স্বাস্থ্য-সমাচার'ই বাঙ্গালীকে সেই মন্ত্রে দীক্ষিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। এই জন্য আমরা 'স্বাস্থ্যসমাচারে'র এত পক্ষপাতী, এমন ভক্ত।—আন্তরিক চেষ্টা ব্যর্থ হয় না। যুগযুগান্তরেও এ চেষ্টার ফল ফলিবে।—'খোকার কান্না-কাটী' ও 'অজীর্ণতা' উল্লেখযোগ্য। 'সর্পাঘাতের কতিপয় চিকিৎসাপ্রণালী' অন্য পত্র হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই সকল পদ্ধতি যে সম্পাদকের বা কোনও বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষায় সিদ্ধ বা প্রতিপন্ন নয়, তাহা প্রকাশ থাকিলে ভাল হইত।

সবুজ পত্র। মাঘ। শীতে কি 'সবুজ পাতা' এ দেশেও কাবু হইয়া পড়ে?—ঝরিয়া যায়? তাহার অপচার সমান চলিয়াছে, কিন্তু বস্তু অত্যন্ত অল্প। সকল প্রবন্ধেই শিরোবেষ্টন-পূর্ব্বক নাসিকাপ্রদর্শনের অভিনয়; সামান্যকে খুব ফলাইয়া, ফেনাইয়া বড় করিবার চেষ্টা! সোজা কথায় বলিলে যেন প্রবন্ধই হয় না। অথচ সোজা করিবার জন্যই ইঁহারা চিরাগত বাঙ্গালা সাহিত্যটাকে বাতীল ও নামঞ্জুর করিয়া তথাকথিত কথিত ভাষাকে সাহিত্যের মজলিসে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছেন! শ্রীবীরেশ্বর মজুমদারের 'স্বপ্ন ও জাগরণ' উল্লেখযোগ্য। শ্রীমৃগেন্দ্রনাথ মিত্রের 'শিশু-শিক্ষা' এবারকার 'সবুজ পত্রের সেরা প্রবন্ধ। ইহাতে অনেক কাজের কথা আছে। সে কথাগুলি অভিভাবকগণের অবশ্য-জ্ঞাতব্যও বটে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, লেখক ঘুর-পাক না দিয়াও বেশ সোজা ভাষায় সহজ-ভাবে তাঁহার বক্তব্য সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। ইহাকে পাতা-চাপা ফুল বলা চলে!

বিক্রমপুর। মাঘ। শ্রীমুকুলচন্দ্র দের 'জাপানের কথা' ভাষার মুদ্রাদোষে পরিপূর্ণ, কিন্তু সুখপাঠ্য। চিত্রকর মুকুলচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত মন্তব্য—'জাতিটা ক্রমেই জেগে উঠ্‌ছে। উঁহারা বেঁটে বটে, কিন্তু দেখ্‌তে বেশ সুশ্রী। সৌন্দর্য্যের সহিত শক্তির এমন মধুর মিলন আর কোথাও তেমন

দেখা যায় না।' শ্রীসোঽহং স্বামীর 'আমিত্বের সঙ্কোচ' ও 'আমিত্বের বিস্তার' আমরা বাঙ্গালীকে পড়িতে বলি। বুঝিবার চেষ্টা করিলে চিন্তাশীল উপকৃত হইবেন। ইহা কবিতা নয়, কারিকার আকারে বদ্ধ সন্ন্যাসীর উপদেশ। ছাপায় বোধ হয় দুই এক স্থলে ভুল হইয়াছে। যেমন,—'দ্বৈত দ্বৈত দ্বন্দ্বাতীত।' বোধ হয়, দ্বৈতাদ্বৈত দ্বন্দ্বাতীত'ই অভিপ্রেত। শ্রীগোপীনাথ দত্তের 'বিক্রমপুরের দেবনিবাস—কালাপাহাড়তলা' সুখপাঠ্য। শ্রীনিবারণচন্দ্র মজুমদারের 'পল্লীগৃহস্থ' উল্লেখযোগ্য।

সুবর্ণবণিক সমাচার। মাঘ। কবিতার ছড়াছড়ি। qualityর অভাব quantity দ্বারা পূর্ণ করিবার চেষ্টা? বঙ্গীয় সুবর্ণবণিক-সম্মিলনীর সভাপতির 'অভিভাষণ' আমরা সাবধানে পাঠ করিয়াছি। 'বিদ্যা, নীতি ও ধর্ম্মশিক্ষা দ্বারা জাতীয় উন্নতিসংসাধনই আমাদের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য হওয়া আবশ্যক।' অন্যত্র—'সামাজিক একতাস্থাপন * * ইহা যে সকল উন্নতিসাধনের মূলীভূত, তাহা বলাই বাহুল্য। একত্র কাজ করিতে না পারিলে আমরা কোন দিকেই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিব না।' এ সদুপদেশ সকল জাতির পক্ষেই বহুমূল্য। গল্পের বল্লাল যাহা করিয়া গিয়াছেন, সে জন্য আক্ষেপ করিয়া কোনও লাভ নাই। আজ কুলীনের কি দুর্দ্দশা! ভট্টনারায়ণ 'রাধেয়' কর্ণের মুখে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, আমরা তাহাই এই নানা জাতির অধ্যুষিত ভেদ-ভিন্ন দেশের প্রত্যেক বর্ণের মূলমন্ত্র বলিয়া মনে করি,—

'দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম, মমায়ত্তং তু পৌরুষম্।'

বরেন্দ্র-খনন-বিবরণ।

ইতিহাসে মাহিসন্তোষের স্থান।—নাম-রহস্য।

ধ্বংসাবশেষমধ্যস্থ দরগাটি "মাহিসন্তোষের দরগা" নামেই সুপরিচিত। প্রকৃত নাম—"মাই-সন্তোষীর দরগা";—জমীদারী কাগজে সেই নামই প্রচলিত আছে। প্রবাদ এই যে,—এখানে এক মাতা (মাই) ও তাঁহাদের কন্যা (সন্তোষী) সমাধি-নিহিত রহিয়াছেন; তাঁহারা মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বিনী ছিলেন; সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া "পীর" হইয়াছিলেন।

বরেন্দ্রভূমির আরও দুই একটি স্থানে "মাই-সন্তোষী"র দরগা দেখিতে পাওয়া যায়। তজ্জন্য ইহা একটি সাম্প্রদায়িক নাম বলিয়া প্রতিভাত হয়। এই সম্প্রদায়ের সহিত মাতা-কন্যার পীরত্ব-লাভের সম্পর্ক থাকিতে পারে; কিন্তু তাঁহারা কোথায় সমাধি-নিহিত রহিয়াছেন, তাহা নিঃসন্দেহে নির্ণয় করা কঠিন। অন্যান্য স্থানের দরগা অপেক্ষা এই স্থানের দরগাটি অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করায়, ইহাই সমাধি-স্থান বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। কিন্তু এখানকার দুর্গ ও অন্যান্য কীর্ত্তিচিহ্ন এই স্থানকে পীরের স্থান অপেক্ষা রাজনগরের স্থান বলিয়াই অধিক পরিচয় প্রদান করে। শতবর্ষপূর্ব্বে তথ্যানুসন্ধানের অধিক সুযোগ বর্ত্তমান ছিল। তৎকালে বুকানন হামিল্টন মুসলমান পীরের সংস্কৃত নাম শ্রবণ করিয়া, বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন; তথ্যানুসন্ধানের জন্য এখানে পদার্পণ করিতে পারেন নাই। তখন এ অঞ্চল বনানী-অঞ্চলে অবগুণ্ঠিত ছিল।

দরগার নাম যাহাই হউক, মাহিসন্তোষ-নামে কোনও গ্রাম বা মৌজা দেখিতে পাওয়া যায় না। দরগাটি যে মৌজার অন্তর্গত, তাহা সন্তোষ-পরগণার চৌবাট মৌজা; কিন্তু দরগা ও তাহার প্রাঙ্গন "কাঞ্চন-নগর" বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। নিকটে কি দূরে কোনও মৌজা "কাঞ্চন-নগর" নামে কথিত হয় না। মাই-সন্তোষীর প্রবাদ হইতেই দরগার বর্ত্তমান নাম প্রচলিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। স্থান জনসাধারণের নিকট "মাহিগঞ্জ" বলিয়াই সাধারণতঃ পরিচিত। কিন্তু জমীদারী কাগজে এই নাম দেখিতে পাওয়া যায় না।

পূর্ব্বে আত্রেয়ী-তীরে "মাহিগঞ্জ" নামে একটি প্রসিদ্ধ বন্দর বর্ত্তমান ছিল। তাহা অনেক দিন উঠিয়া গিয়াছে। তাহার স্থান এখন কৃষিক্ষেত্রে ও বিজনবনে পরিণত হইয়াছে; কিন্তু লোকে এখনও তাহার স্থান দেখাইয়া দিয়া থাকে। পাঁচ ছয় বৎসর হইতে দরগার প্রাঙ্গনে প্রতি সোমবারে একটি হাট বসিতেছে; তাহা "মাহিগঞ্জের হাট" বলিয়া কথিত হইতেছে। দরগাটি মাতা-কন্যার যুক্ত নামে পরিচিত; কিন্তু গঞ্জের সঙ্গে কন্যার নাম সংযুক্ত হয় নাই কেন, তাহা অপরিজ্ঞাত।

অধ্যাপক ব্লকম্যান লিখিয়া গিয়াছেন,—খৃষ্টীয় পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব্বে স্থানের নামের সঙ্গে পারসীক ভাষায় গঞ্জ-শব্দের সংযোগ দেখিতে পাওয়া যাইত না। (১) সুতরাং "মাহিগঞ্জ" নামটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক। কিন্তু সন্তোষ নামটিকে সেরূপ আধুনিক বলিবার উপায় নাই। মুসলমান-শাসন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বেও সন্তোষ নাম প্রচলিত ছিল। মুসলমান-লিখিত প্রাচীনতম ইতিহাসে [তবকাৎ-ই-নাসিরী গ্রন্থে] তাহা উল্লিখিত আছে। তাহার সহিত মুসলমান-শাসনের প্রথম আমলের ইতিহাসের কথা জড়িত হইয়া রহিয়াছে।

মুসলমান-বিজয়।

প্রচলিত ইতিহাসে বখ্‌তিয়ার খিলিজির বঙ্গ-বিজয় যে ভাবে উল্লিখিত হইয়া আসিতেছে, তাহা কেবল আরব্যোপন্যাসের ন্যায় বিস্ময়াবহ নহে; অপিচ, অপরিহার্য্য কুজ্‌ঝটিকাময়। তাহার কোনরূপ সমসাময়িক বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পরবর্ত্তী কালে মিন্‌হাজ-ই-সিরাজ লোকমুখে গাল-গল্প শ্রবণ করিয়া [তবকাৎ-ই-নাসিরী গ্রন্থে] যে কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া

(১) The name Mahiganj can not be very old, though "Mahi" may be an allusion to Mahipal. All names ending with the Persian *ganj* are modern and I can not point to a single place ending in *ganj* that existed, or had received that name, before the 15th and 16th centuries.—J. A. S. B. 1875. p. 290.

অধ্যাপক ব্লকমান ইংরাজী রিপোর্টে মাহিগঞ্জের নাম দেখিয়া, তাহাকে মহীগঞ্জ মনে করিয়া, মহীপালদেবের সঙ্গে তাহার সম্পর্ক থাকিলেও থাকিতে পারে বলিয়া যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাকে সিদ্ধান্তরূপে অবলম্বন করিয়া, কোনও কোনও বাঙ্গালী লেখক এখানে মহীপাল দেবের কীর্ত্তিচিহ্ন দর্শন করিয়াছেন। দিনাজপুর জেলায় মহীপাল দেবের কীর্ত্তিচিহ্নরূপে "মহীপাল-দীঘি" বর্ত্তমান আছে; তাহার নাম মাহিপাল-দীঘি হয় নাই। সুতরাং মহীগঞ্জের নাম সেই জেলার লোকের নিকট মাহিগঞ্জে পরিণত হইবার সম্ভাবনা অল্প বলিয়াই বোধ হয়। মাই-গঞ্জ কালক্রমে মাহি-গঞ্জ হইয়া থাকিতে পারে; তাহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক নামকরণ।

গিয়াছেন, তাহাই সমসাময়িক কাহিনীর ন্যায় ব্যবহৃত হইতেছে। তাহাতে খিলিজী-বীর মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার অর্থাৎ বখ্‌তিয়ারের পুত্র মহম্মদ বঙ্গ-বিজেতা বলিয়া উল্লিখিত। কিন্তু তিনি কোন্ পথে বাঙ্গালা দেশে উপনীত হইয়াছিলেন,—বাঙ্গালাদেশের কোন্ অংশে কত দূর পর্য্যন্ত অধিকার বিস্তৃত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন,—অধিকৃত অংশের শাসন-প্রণালীই বা কিরূপ ছিল,—এ সকল বিষয়ের সম্যক্ পরিচয় প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই।

আধুনিক তথ্যানুসন্ধান যত দূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছে, তাহাতে বুঝিতে পারা যায়,—মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার খিলিজীর বিজয়-ব্যাপার বাঙ্গালা দেশের একটি ক্ষুদ্র অংশেই সীমাবদ্ধ থাকিতে বাধ্য হইয়াছিল। তাহাকে "বঙ্গ-বিজয়" নামে অভিহিত করিলে, অত্যুক্তি হইয়া পড়ে। তখন কেন, তাহার পরেও অনেক দিন পর্য্যন্ত বাঙ্গালা দেশের অনেক স্থান স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া, মুসলমান-শাসন-বিস্তারের গতিরোধ করিয়া রাখিয়াছিল। যে অংশে মুসলমান-অধিকার বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, তাহাও আধুনিক হিসাবের অধিকৃত রাজ্য বলিয়া কথিত হইতে পারিত না;—তাহা আত্মীয়প্রতিপালনদক্ষ বলদৃপ্ত ভাগ্যান্বেষণকারীর অভিযানবিধ্বস্ত ধ্বংসাবশেষ বলিয়াই উল্লিখিত হইবার যোগ্য। মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার তাঁহার শাসন-শৃঙ্খলা সুসংস্থাপিত করিবার পূর্ব্বেই, তিব্বত-বিজয়ে ধাবমান হইয়াছিলেন। সে অভিযান-কাহিনী করুণ কাহিনী। তাহা ভগ্নহৃদয় ব্যর্থমনোরথ পলায়নপরায়ণ বীরবিক্রমের অচিন্তিতপূর্ব্ব অকীর্ত্তিকর পরিণাম। যিনি নোদিয়া বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন,—লক্ষ্মণাবতী ধূলিসাৎ করিয়াছিলেন,—দেবীকোটে সেনানিবাস সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, এবং তথা হইতে তিব্বত-বিজয়ের জন্য রণযাত্রা করিয়াছিলেন, —তিনি দেবীকোটে প্রত্যাবর্ত্তনের পরেই স্বজনহস্তে নিহত হইয়া, ইহলোক পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার তরুণ রাজ্য-লালসার করুণ কাহিনী। এই কাহিনীর সহিত কেবল উত্তর-বঙ্গের কিয়দংশের সম্বন্ধেরই পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। সে পরিচয় যেরূপ সংক্ষিপ্ত, সেইরূপ অল্পকালস্থায়ী। তাহার গৌরবঘোষণার জন্য [তবকাৎ-ই-নাসিরী গ্রন্থে] নানা কথা উল্লিখিত থাকিলেও, তাহা সমসাময়িক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে অসমর্থ।

খিলিজীগণের গৃহকলহ।

মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ারের শোচনীয় পরিণাম খিলিজীগণের গৃহকলহের পরিণাম বলিয়াই উল্লিখিত হইবার যোগ্য। প্রথম ভাগ্যবিপর্য্যয়ের সঙ্গে সঙ্গেই

তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছিল। অধিকৃত রাজ্য খিলিজী সহযোগিগণের মধ্যে জায়গীর-রূপে বণ্টন করিয়া দিয়া, মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার তাঁহাদের নায়করূপে দেবী-কোটের সেনানিবাসে বাসস্থান সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। এই স্থানটি দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর থানার অন্তর্গত,—পুরাতন বাণনগরের একাংশে অবস্থিত। ইহার নিকটবর্ত্তী স্থানগুলি প্রধান প্রধান অনুচরগণের জায়গীর-রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। সকল জায়গীরের নাম ইতিহাসে স্থানলাভ করে নাই। যেগুলির নাম জানিতে পারা যায়, তন্মধ্যে একটির নাম 'কাঙ্গার'। তাহা হাসামুদ্দীন খিলিজীর জায়গীর-রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

রাজসাহী জেলার মান্দা থানার অন্তর্গত গাঙ্গোর নামক স্থান বহু পুরাতন কীর্ত্তিচিহ্নে খচিত হইয়া রহিয়াছে। এই অঞ্চল হইতে অনেক হিন্দুবৌদ্ধ মূর্ত্তি সংগৃহীত হইয়াছে; একখানি সংস্কৃত শিলালিপিও আবিষ্কৃত হইয়াছে। অধ্যাপক ব্লকম্যান অনেকগুলি হস্তলিখিত তবকাৎ-ই-নাসিরী-গ্রন্থ পরীক্ষা করিয়া, কোনও কোনও গ্রন্থে হাসামুদ্দীনের জায়গীর গাঙ্গোর নামে উল্লিখিত,—দেখিতে পাইয়া-ছিলেন। দেবীকোটের দক্ষিণ-পূর্ব্বাংশে অবস্থিত মসিদা ও সন্তোষ নামক আরও দুইটি স্থানের নাম উল্লিখিত আছে। মসিদা ও সন্তোষ নামক দুইটি পরগণা এখনও প্রচলিত আছে। সন্তোষের নাম মন্তোষ-রূপে মুদ্রিত হইয়াছে। অধ্যাপক ব্লকম্যান তাহাকে লিপিকরপ্রমাদের নিদর্শন বলিয়া ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। খিলিজীগণের গৃহকলহের সঙ্গে গাঙ্গোর-মসিদা-সন্তোষ-দেবীকোট, এই চারিটি স্থানের নাম জড়িত হইয়া রহিয়াছে। ইহাই তৎকালে মুসলমানাধিকৃত বাঙ্গালা-দেশের প্রধান স্থান বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল; কিন্তু ইহার কোনও স্থানেই শাসনশৃঙ্খলা দৃঢ়ভাবে সংস্থাপিত হইবার অবসর পাইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না।

মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ারের নিধনকর্ত্তা আলিমর্দ্দন খিলিজী দেবীকোট অধিকার করিয়া প্রাধান্যলাভের চেষ্টা করিতে গিয়া, সহসা কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তৎকালে মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ারের বিশ্বস্ত পার্শ্বচর মহম্মদ-ই-সেরান উড়িষ্যার পথে যুদ্ধযাত্রায় বহির্গত হইয়াছিলেন বলিয়া, আলিমর্দ্দনের পক্ষে দেবীকোট অধিকার করা সম্ভব হইয়াছিল। কিন্তু মহম্মদ-ই-সেরান গৃহকলহের সমাচার পাইবামাত্র দেবীকোটে উপনীত হইয়া, তাহার শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন;—তাঁহার আদেশে আলিমর্দ্দন গাঙ্গোর দুর্গে কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি তথা হইতে পলায়ন করিয়া, দিল্লীশ্বরের শরণাগত হইয়া, তাঁহার অধীনতা-স্বীকারের অঙ্গী-

কারে, তাঁহার সেনা-সাহায্যে দেবীকোট আক্রমণ করায়, যুদ্ধ বিগ্রহের সূত্রপাত হইয়াছিল। এই যুদ্ধবিগ্রহের আক্রমণ—আত্মরক্ষার নানা চেষ্টা অবশেষে আলি-মর্দ্দনকেই বিজয়দান করিয়াছিল। মুসলমান-লিখিত ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়,—মহম্মদ-ই-সেরান নিহত হইয়া, সন্তোষ নামক স্থানে সমাধিনিহিত হইয়াছিলেন।

মাহিসন্তোষের দরগা সন্তোষ পরগণার অন্তর্গত। এই সমাচার পাইয়া, অধ্যাপক ব্লকম্যান লিখিয়া গিয়াছেন,—এই স্থান সেই সন্তোষ-নামক স্থান হইলে, এখানকার ধ্বংসাবশেষের মধ্যেই মহম্মদ-ই-সেরানের সমাধিস্থানের অনুসন্ধান করিতে হইবে। মাহিসন্তোষের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে মহম্মদ-ই-সেরানের সমাধি বর্ত্তমান থাকুক আর নাই থাকুক, এই স্থানের সঙ্গে মুসলমান-শাসনের প্রথম আমলের ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য সম্পর্ক সংস্থাপিত হইয়াছিল।

মুসলমানশাসন-প্রতিষ্ঠা।

বাঙ্গালা দেশে মুসলমান-শাসনের আবির্ভাব বাঙ্গালীর পক্ষে অবশ্য-জ্ঞাতব্য ঐতিহাসিক ব্যাপার। তাহার সকল কথা এখনও যথোপযুক্তরূপে আলোচিত হইতে পারে নাই। কিছুদিন পূর্ব্বে মুদ্রার ও শিলালিপির সাহায্যে তথ্যনির্ণয়ের জন্য যেরূপ প্রবল আগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে মন্দীভূত হইয়া পড়িয়াছে। তাহার পরে যে সকল শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা মুদ্রিত বা আলোচিত হইতেছে না।

বাঙ্গালা দেশের যে অংশে মুসলমান-শাসন প্রথমে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল, তাহা অনেক দিন পর্য্যন্ত "লক্ষ্মণাবতী-দেবীকোট" নামে পরিচিত ছিল। তাহার সঙ্গে উত্তর-বঙ্গের কিয়দংশের সাক্ষাৎসম্বন্ধ থাকিলেও, সমগ্র বাঙ্গালাদেশের সম্বন্ধ বর্ত্তমান ছিল না। "লক্ষ্মণাবতী দেবীকোট" যে রাজ্যের পরিচয় প্রদান করিত, সে রাজ্য কাহার, তাহা লইয়া প্রথম হইতেই দিল্লীর সহিত তর্কবিতর্কের সূত্রপাত হইয়াছিল। এবং তাহা দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধকলহে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। তদুপলক্ষে মুসলমান মুসলমানের কণ্ঠলগ্ন না হইয়া, পরস্পরের কণ্ঠচ্ছেদ করিয়াছিল। ধর্ম্মে এক হইয়াও, বাঙ্গালার মুসলমান দিল্লীর মুসলমানের অধীনতা স্বীকার করিতে অসম্মত হইয়াছিল কেন, তাহার কারণপরম্পরা প্রচলিত ইতিহাসে উল্লিখিত হয় নাই। তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে, স্বভাবতই মনে হয়,—ধর্ম্ম অপেক্ষা স্বার্থ বড় হইয়া উঠিয়াছিল;—আত্মবোধ অপেক্ষা দেশাত্মবোধ অধিক প্রাধান্যলাভ করিয়াছিল;—বাঙ্গালার মুসলমান বাঙ্গালী

হইয়া, বাঙ্গালীর স্বাতন্ত্র্যরক্ষার জন্য প্রাণপণ করিয়াছিল ;—বাঙ্গালী মুসলমানের সঙ্গে বাঙ্গালী হিন্দুও যোগদান করিয়া, দিল্লীর আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য প্রাণবিসর্জ্জন করিয়াছিল। তাহাদের আত্মরক্ষার চেষ্টা প্রথমে বিফল হইয়া গিয়াছিল ; দিল্লীশ্বরের প্রতিনিধি গৌড়ের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে স্বাতন্ত্র্য-লালসা বিলুপ্ত না হইয়া উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। অবশেষে খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঙ্গালা স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল।

হাজি ইলিয়াস্ বাঙ্গালার প্রথম স্বাধীন সুলতান বলিয়া ইতিহাসে উল্লিখিত। তাঁহার পুত্র সেকেন্দার আদিনা মসজেদ রচনা করিতে গিয়া আপন নাম চির-স্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় ঘিয়াসুদ্দীনের স্মৃতিচিহ্ন সোনার-গাঁয় বর্ত্তমান আছে। তাহার পর রাষ্ট্রবিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল। তাহাতে হিন্দু-রাজা গণেশ গৌড়ের সুলতান হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র যদু মুসলমান হইয়া, জালালুদ্দীন নাম ধরিয়া, সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। জালালুদ্দীনের পরে তাঁহার পুত্র রাজ্যভোগ করিলে, আবার ইলিয়াসের বংশধর নাসির শাহ সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। এই সকল স্বাধীন সুলতানের শাসন-কালেই শাসনশৃঙ্খলা দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছিল।

মুসলমান-শাসন, বিস্তৃত হইবার সময় হইতেই, তিনটি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। লক্ষ্মণাবতী-দেবীকোট প্রথম প্রদেশ বলিয়া, সুলতান-গণই সেই প্রদেশের শাসনকার্য্য পরিচালিত করিতেন। দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গে ও পূর্ব্ব-বঙ্গে রাজপ্রতিনিধির শাসন প্রচলিত হইয়াছিল। তৎসূত্রে সপ্তগ্রাম ও সুবর্ণ-গ্রাম শাসনকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল।

বার্ব্বাকাবাদ।

সুলতান নাসির শাহ ইতিহাসে প্রথম মামুদ শাহ নামে উল্লিখিত। তাঁহার পূর্ণনাম—নাসিরুদ্দুনীয়া ওয়াদ্দীন আবুল মুজাফ্ফর মামুদ শাহ। হিজরী ৮৪৬ হইতে ৮৬৪ পর্য্যন্ত তাঁহার শাসনকালের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তাঁহার সময়ের একখানি ৮৬২ হিজরীর (১৪৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৩ ডিসেম্বরের) শিলালিপি গৌড়ের ধ্বংসাবশেষমধ্যস্থ কোতোয়ালী দরজার সঙ্গে সংযুক্ত ছিল ; তাহাতে একটি সেতুনির্ম্মাণের পরিচয় উল্লিখিত আছে। ইহাই তাঁহার শাসন-সময়ের শেষ শিলালিপি বলিয়া পরিচিত। ৮৬০ হিজরীর একখানি শিলালিপি ত্রিবেণীতে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। তাহাতে নাসির শাহের পুত্র বার্ব্বাক শাহ কর্ত্তৃক একটি

সুলতান-রূপে উল্লিখিত না থাকায়, এবং ইহা তাঁহার পিতার শাসনকালের মধ্যে সম্পাদিত হওয়ায়, অধ্যাপক ব্লকম্যান লিখিয়া গিয়াছেন—এই শিলালিপি-সম্পাদনকালে বার্ব্বাক শাহ দক্ষিণ-পশ্চিম-বঙ্গের শাসনকর্ত্তা থাকাই প্রতিভাত হয়।

মুসলমান-শাসন বিস্তৃত হইবার পর, বাঙ্গালা দেশের যে সকল অংশ সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে মুসলমান কর্ত্তৃক শাসিত হইয়াছিল, তথায় অনেক মস্‌জেদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। শিলালিপিতে তাহার পরিচয় প্রকাশিত হইতেছে। এই সকল শিলালিপি ধরিয়া ইতিহাসের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে মনে হয়,—বাঙ্গালার যে সকল অংশে শিলালিপি দেখিতে পাওয়া যায় না, তথায় সাক্ষাৎসম্বন্ধে মুসলমান-শাসন বিস্তৃত হইতে বিলম্ব ঘটিয়া থাকিবে। লক্ষ্মণাবতী-দেবীকোট অঞ্চলে ও সুবর্ণগ্রাম অঞ্চলেই অতি পুরাতন মুসলমান শিলালিপির সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। দেবীকোটের পূর্ব্বাঞ্চলে—আত্রেয়ী-করতোয়া-প্রবাহমধ্যস্থ বরেন্দ্র-মণ্ডলের কেন্দ্রস্থলে,—সেরূপ পুরাতন শিলালিপি দেখিতে পাওয়া যায় নাই। এই প্রদেশে সর্ব্বপ্রথম মুসলমান শিলালিপি সুলতান বার্ব্বাক শাহের শিলালিপি। ইহাতে অনুমান হয়,—খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই অঞ্চলটি সাক্ষাৎসম্বন্ধে মুসলমান-শাসনের অধীন হয় নাই। এই অঞ্চলের হিন্দু রাজা গণেশের গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করিবার বৃত্তান্ত ইহারই পক্ষ সমর্থন করে।

উত্তর-বঙ্গে মুসলমান-শাসন বিস্তৃত হইবার কাহিনী এখনও পর্য্যাপ্তরূপে সঙ্কলিত হয় নাই। অধ্যাপক ব্লকম্যান লিখিয়া গিয়াছেন,—উত্তর-বঙ্গের রাজারা যথেষ্ট পরাক্রমশালী ছিলেন; তাঁহারা তজ্জন্যই পুনঃ পুনঃ মুসলমান-আক্রমণের বেগ সহ্য করিয়াও, অৰ্দ্ধ-স্বাধীনতা উপভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। (২) তিনি ইহার কোনরূপ প্রমাণের উল্লেখ করেন নাই। ইহা তাঁহার অনুমান-মাত্র বলিয়াই প্রতিভাত হয়। কিন্তু আত্রেয়ী-করতোয়া-মধ্যস্থ বরেন্দ্রমণ্ডলে পুরাতন মুসলমান শিলালিপির অভাব এই অনুমানের পক্ষ সমর্থন করিতে পারে। সুলতান বার্ব্বাক শাহের শাসন-সময়ের শিলালিপিই এই অঞ্চলের প্রথম মুসলমান শিলালিপি। সুলতান বার্ব্বাক-শাহ এই অঞ্চলের নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া, বার্ব্বাকাবাদ নাম প্রচলিত করিয়াছিলেন। ইহাও প্রথম বিজয় ব্যাপারের আভাস প্রদান করিতে পারে।

(2) The Rajahs of Northern Bengal were powerful enough to preserve a semi-independence inspite of the numerous invasions from the time of Bakhtiyar-khiliji.—J. A, S. B. 1873. p. 239.

সম্রাট আকবরের সময়েও এই অঞ্চল সরকার বার্ব্বাকাবাদ নামে উল্লিখিত হইত। ৩৮টি পরগণা সরকার বার্ব্বাকাবাদের অন্তর্গত ছিল। তন্মধ্যে সন্তোষের নাম দেখিতে পাওয়া যায় না। মাহিসন্তোষের ধ্বংসাবশেষমধ্যে যে দুইখানি শিলালিপি দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল, তাহার একখানি ৮৬৫ হিজরীর (১৪৬০—৬১ খ্রীষ্টাব্দের) এবং একখানি ৮৭৬ হিজরীর (১৪৭১—৭২ খৃষ্টাব্দের)। দুইখানি শিলালিপিতেই সুলতান বার্ব্বাক শাহের উজীর উলুখ ইকরার খাঁ কর্ত্তৃক মস্‌জেদ নির্ম্মিত হইবার কথা উল্লিখিত আছে।

মাহিসন্তোষের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে যে পুরাতন দুর্গাদি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই বার্ব্বাকাবাদের রাজধানীর স্মৃতিচিহ্ন বলিয়া অনুমিত হয়। শিলালিপির পাঠ অধ্যাপক ব্লকম্যান কর্ত্তৃক পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহা পুনরায় পরীক্ষিত হইতেছে। তাহার ফল প্রকাশিত হইলে, মাহিসন্তোষের ধ্বংসাবশেষের ঐতিহাসিক সম্পর্ক পুনরায় আলোচিত হইবে।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

'হনোজ্‌ দিল্লী দূরস্ত্‌'।

১

বাবর হইতে অওরঙ্গজেব—ছয় পুরুষে ভারতে মোগলদিগের পাদশাহীর শেষ। বাবর বাহুবলে রাজ্য জয় করিয়াছিলেন; হুমায়ুন তাহা রক্ষা করিতেই বিব্রত হইয়াছিলেন; আকবর বিদেশকে স্বদেশ করিয়া—হিন্দুর সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ সংস্থাপিত করিয়া—হিন্দুকে সহায় করিয়া আবার রাজ্য গঠিত করিয়াছিলেন। তাহার পর জাহাঙ্গীর। তিনি রাজনীতিক পিতা আকবরের সুগঠিত রাজ্য পাইয়াছিলেন। রাজনীতিক পিতা আকবর ও সঞ্চয়শীল স্থাপত্যপ্রিয় পুত্র সাহজাহান—উভয়ের মধ্যে বিলাসী জাহাঙ্গীর। যে নূরজাহানকে তিনি তরুণ যৌবনে প্রেমদান করিয়াছিলেন—যাঁহার জন্য তিনি নরহত্যাপাপেও লিপ্ত হইয়াছিলেন—তিনি তাঁহার জীবন-তরীর ও সাম্রাজ্য-তরণীর কর্ণধার ছিলেন। তাঁহাকে বাদ দিলে, জাহাঙ্গীর ভালবাসিতেন—মদিরা, আর কাশ্মীর। শীতের পর রাজধানীর প্রান্তরে উষ্ণশ্বাস অপগত হইতে না হইতে তিনি কাশ্মীরে যাইতেন—কাশ্মীরের প্রাকৃতিক শোভায় মুগ্ধ হইয়া, কাশ্মীরের কুসুমের মধ্যে

জীবন-বসন্তের কুসুম নূরজীহানকে লইয়া বসন্তযাপন করিতেন। কথিত আছে, একবার রাজকার্য্যে তাঁহার কাশ্মীরগমনে বিলম্ব ঘটিলে, তিনি আদেশ করিয়াছিলেন, আমি না যাওয়া পর্য্যন্ত যেন কাশ্মীরের বসন্ত চলিয়া না যায়। কর্ম্মচারীরা পর্ব্বত হইতে বরফ আনিয়া প্রান্তর আবৃত করিয়াছিল। জাহাঙ্গীর কাশ্মীরে যাইলে সে বরফ গলিয়া গেল—তখন দেখিতে দেখিতে উপত্যকা কুসুমাবৃত হইল—বাদশাহের আদেশে কাশ্মীরে বসন্তকে বাঁধা থাকিতে হইয়াছিল!

সেবারও জাহাঙ্গীর কাশ্মীরে যাইতেছিলেন। তখন তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন। নূরজীহানই রাজ্যের শাসক—রাজার চালক। নূরজীহানের পিতা গিয়াস তখন মৃত। কুশাগ্রবুদ্ধি পিতা কন্যার উত্তেজনাচঞ্চল হৃদয়কে সদুপদেশে সংযত রাখিতেন। সে সদুপদেশে বঞ্চিত হইয়া নূরজীহান তখন ভুল করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এত দিন তিনি বুদ্ধিমান কুমার সাহজাহানের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। সাহজাহান বুদ্ধিমান, বীর, পিতার দক্ষিণ হস্ত। তিনি ক্রমে ক্রমে রাজ্যভার হস্তগত করিতেছিলেন। তিনি আসফ খাঁর জামাতা—আসফ খাঁ নূরজীহানের ভ্রাতা, জাহাঙ্গীরের মন্ত্রী। নূরজীহান সাহজাহানের পক্ষ ত্যাগ করিয়া জাহাঙ্গীরের কনিষ্ঠ পুত্র সারিয়ারের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। সারিয়ার সুপুরুষ—নূরজীহানের ও সের আফগানের দুহিতার স্বামী। কিন্তু রাজ্যশাসনে সারিয়ারের যোগ্যতা ছিল না। সাহজাহান দাক্ষিণাত্যে গমন করিলেন। পিতাপুত্রে মনান্তর হইল। পাদশাহী সিংহাসনের উত্তরাধিকার লইয়া ষড়যন্ত্র চলিতে লাগিল। আসফ খাঁ সাহজাহানের, সেনাপতি মহবত খাঁ পারভেজের, এবং নূরজীহান সারিয়ারের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। নূরজীহানই প্রথম চাল চালিলেন; তাঁহার উপদেশে সম্রাট্ মহবতকে অপমানিত করিলেন। তাঁহার অপরাধ, তিনি সম্রাটের অনুমতির অপেক্ষা না রাখিয়াই কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। সম্রাট তাঁহার জামাতাকে বেত্রাঘাত করাইয়া একটা গাধায় চড়াইয়া অপমানিত করিয়াছিলেন। মহবতকে সম্রাটের নিকট আসিতে আদেশ করা হইয়াছিল। মহবত বিপদ বুঝিয়া সঙ্গে চারি পাঁচ হাজার রাজপুত সেনা লইয়া সম্রাট-সন্দর্শনে আসিলেন। আসফ তাঁহার প্রতি বিরক্তির চিহ্নমাত্র দেখাইলেন না। কিন্তু তিনি সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পাইলেন না। সাক্ষাৎ করিতে পাইলে কি হইত, বলা যায় না; কারণ, মহবত প্রভুভক্ত বীর ছিলেন—পারভেজের পক্ষাবলম্বনে তাঁহার বিশেষ স্বার্থও ছিল না। লাঞ্ছিত

মহবত মান ও প্রাণ নাশের আশঙ্কায় চঞ্চল হইয়া সুযোগ সন্ধান করিয়া রাজ-শিবিরের সংবাদ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

ক্রমে কাশ্মীরের পথে সম্রাট বিতস্তার তীরে আসিয়া উপনীত হইলেন। শিবিরে সম্রাট নিশাযাপন করিতে লাগিলেন। পাদসাহ সফরে বাহির হইলে, রাত্রিকালে সম্রাট শিবিরে নিদ্রিত হইলে, অন্যান্য তাম্বু, আসবাব প্রভৃতি পরবর্ত্তী আড্ডায় লইয়া যাওয়া হইত। এবারও তাহাই হইতেছিল। সমস্ত রাত্রি জিনিসপত্র বিতস্তার পরপারে লওয়া হইতেছিল—নদীর উপর নৌকা দিয়া যে সেতু নির্ম্মিত ছিল, সেই সব নৌকার উপর ভারবাহীদিগের নগ্ন-পদ-শব্দ শ্রুত হইতেছিল। মন্ত্রী আসফ খাঁ পরপারেই শিবিরসন্নিবেশ করিয়াছিলেন—সম্রাটের যে কোনও বিপদ ঘটিতে পারে, তাহা তিনি মনেও করেন নাই। বহু দিন নিরাপদে বাস করিলে মানুষ অসতর্ক হয়।

যখন রাত্রি শেষ হইল, তখন সম্রাটের জরীর কাজকরা রক্তবর্ণ তাম্বু ব্যতীত আর সব তাম্বুই নদীর পর পারে লওয়া হইয়াছে—পরবর্ত্তী আড্ডার দিকে পাঠান হইয়াছে—সঙ্গে সঙ্গে অধিকাংশ অনুচরও চলিয়া গিয়াছে।

২

আকাশের পূর্ব্ব প্রান্ত অরুণরাগরঞ্জিত হইতে না হইতে দূরে অশ্বক্ষুরধ্বনি শ্রুত হইল—ধূলিরাশি দিগন্তে কুজ্ঝটিকার মত প্রতীয়মান হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে এক শত রাজপুত সহচর লইয়া মহবত খাঁ সম্রাটের শিবির-দ্বারে আসিয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"পাদশাহ কোথায়?" দ্বাররক্ষী বলিল, "আমি যাইয়া তাঁহাকে সংবাদ দিতেছি।" মহবত সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া অগ্রসর হইয়া সম্রাটের সমীপে উপস্থিত হইলেন, এবং বিনীত ভাব দেখাইয়া নিবেদন করিলেন, তিনি বুঝিয়াছেন, আসফের ক্রোধ হইতে তাঁহার অব্যাহতি নাই—তিনি অপমানিত ও নিহত হইবেন। তাই তিনি প্রভুর পদপ্রান্তে উপনীত হইয়াছেন; সম্রাট তাঁহার যে শাস্তি বিধান করিতে হয়, করুন।

মহবত মুখে যাহাই বলুন, কাজে সম্রাটকে বন্দী করিলেন। সম্রাট পরিচ্ছদ-পরিবর্ত্তনের জন্য জেনানা-শিবিরে যাইতে চাহিলেন। মহবত বুঝিলেন, নূরজী-হানের বুদ্ধির সঙ্গে তিনি পারিয়া উঠিবেন না। তিনি সম্রাটকে শিবিকায় আরোহণ করাইয়া শিবির হইতে বাহির করিয়া গজপৃষ্ঠে আরোহণ করাইলেন। ততক্ষণে মহবতের অনুচরগণ আসিয়া শিবির বেষ্টিত করিয়াছে; সেতু নষ্ট করা হইয়াছে।

দেখিতে দেখিতে এই ঘটনা ঘটিয়া গেল। অরুণরাগ আলোকের স্পর্শে গগন-গাত্রে বিলীন হইতে না হইতে—প্রভাত-বৈতালিক বিহগের বিরাব শেষ হইতে না হইতে, বন্দী সম্রাটকে লইয়া সেনাপতি মহবত যাত্রা করিলেন।

মহবত বীর, কিন্তু বিচক্ষণ রাজনীতিক নহেন। সম্রাটকে বন্দী করিবার সময় তিনি নূরজীহানের কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। কিছু দূর যাইয়া তাঁহার সে কথা মনে পড়িল। তখন তিনি ফিরিলেন; কিন্তু শিবিরে আসিয়া আর নূরজীহানকে পাইলেন না!

মহবতের চালে ভুল হইল।

৩

কি কৌশলে কেমন করিয়া নূরজীহান ছদ্মবেশে ভগ্নসেতু বিতস্তা পার হইয়াছিলেন—কেমন করিয়া ভীতিবিহ্বল চঞ্চল অনুচরগণের মধ্য দিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ভ্রাতার শিবিরে উপনীত হইয়াছিলেন, ইতিহাসে তাহা জানা যায় না। আসফ খাঁ যখন সম্রাটের ও ভগিনীর উদ্ধারের উপায়-চিন্তায় ব্যাকুল হইতেছিলেন, তখন সহসা নূরজীহান তাঁহার সম্মুখে উপনীত হইলেন। ভ্রাতা বিস্মিতভাবে ভগিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি!"

নূরজীহান সে কথার উত্তর না দিয়া অনবধানতার জন্য ভ্রাতাকে তীব্র তিরস্কার করিলেন। সে তিরস্কারের তীব্রতা তীক্ষ্ণবাণের মত আসফকে বিদ্ধ করিল। সেনানায়কদিগকে আহ্বান করিয়া মহবতকে আক্রমণ করিবার মন্ত্রণা চলিতে লাগিল। নূরজীহান তখনও ছদ্মবেশ ত্যাগ করেন নাই—তিনি সেই বেশেই মন্ত্রণাগারে বসিয়া রহিলেন। শেষে তাঁহারই উত্তেজনায় ওমরাহ ফেদাই খাঁ বলিলেন, তিনি রাত্রিকালে পরপারে যাইয়া মহবতকে আক্রমণ করিবেন। সেতু নাই—তিনি সন্তরণে বিতস্তার বারিবিস্তার অতিক্রম করিবেন। তখন নূরজীহান বেশ পরিবর্ত্তনার্থ গমন করিলেন; যাইবার সময় ভ্রাতাকে আদেশ করিয়া গেলেন—দিল্লীতে সংবাদ পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে বিলম্ব না হয়।

যে নূরজীহান ফেদাই খাঁর আক্রমণ প্রতিহত হইলে স্বয়ং গজপৃষ্ঠে সেনাচালনা করিয়া নদী পার হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন—আহত হস্তী ফিরিয়া স্রোতে ভাসিয়া কূলে আসিলে স্থিরভাবে অঙ্কশায়িনী শরাহত দৌহিত্রী—সারিয়ারের পুত্রীর অস্ত্রক্ষতের চিকিৎসা করিয়া তবে শিবিরে প্রত্যাগত হইয়াছিলেন, তাহার পর প্রাণনাশ-শঙ্কা তুচ্ছ করিয়া একাকিনী সম্রাটের সেবার জন্য শত্রু-শিবিরে গমন করিয়াছিলেন, এবং তথায় ষড়যন্ত্রের ফলে বন্দী পাদশাহের উদ্ধার-

সাধন করিয়া ছিলেন, সেই নূরজীহান মন্ত্রীর ও সেনাপতিদিগের পরামর্শের অপেক্ষা না করিয়া, স্বয়ং কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণ করিতে লাগিলেন। নারীবুদ্ধির নিকট রাজনীতিকদিগের বুদ্ধি পরাভব মানিল।

৪

নূরজীহান ছদ্মবেশ ত্যাগ করিয়া রাজবেশে সজ্জিত হইয়া আসিলেন।

আসফ খাঁর আদেশে দিল্লীতে পাঠাইবার জন্য প্রহরী এক জন মোগলকে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল। দিল্লী দূরপথ, কিন্তু মোগল যুবক—বলিষ্ঠ; উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাইলে রণ্-পায় দিল্লী যাইতে প্রস্তুত। তখন পারাবতের পক্ষতলে পত্র দিয়া পাঠান রীতি ছিল; আর রণ্-পায় দূত দ্রুতবেগে পথ অতিক্রম করিত। গোপনীয় সংবাদ লিখিয়া শূন্যগর্ভ গুলিতে পুরিয়া, গুলি গলিত সীস দিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হইত। দূত শত্রুহস্তে পতিত হইবার সম্ভাবনা বুঝিলে গুলিটি জলে বা জঙ্গলে ফেলিয়া দিত। বিশ্বাসী দূত দিয়া সংবাদ পাঠান হইত—তাই আসফের প্রহরীরা দরিদ্র কিন্তু সদ্বংশজাত মোগল যুবককে আনিয়াছিল। তাহার দেহ সুগঠিত; মুখভাব দৃঢ়তাব্যঞ্জক; দেখিলেই সদ্বংশজাত বলিয়া বুঝা যায়। আসফ খাঁ যুবকের পারিশ্রমিক লইয়া দর কষাকষি করিতেছিলেন।

সহসা শিবিরের পশ্চাতে একটি দ্বারের পর্দ্দা সরাইয়া নূরজীহান কক্ষে প্রবেশ করিলেন; বলিলেন, "আগামী পরশ্ব প্রাতে সূর্য্যোদয় হইতে না হইতে যদি দিল্লীর দুর্গে যাইয়া সংবাদ দিতে পার, তবে হাজার আসরফী বক্সিস মিলিবে।"

হাজার আসরফী! যুবক চমকিয়া সেই দিকে চাহিল; চাহিয়া আসরফীর কথা ভুলিয়া গেল—এমন রূপ ত সে মানুষে কখনও দেখে নাই! এ কি মানুষ, না পরী? সে একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল—চক্ষু ফিরাইতে পারিল না।

নূরজীহান তাহার অবস্থা বুঝিলেন। তিনি জানিতেন, যে রূপের স্মৃতি জাহাঙ্গীর কিছুতেই হৃদয় হইতে মুছিতে পারেন নাই, সে রূপ দেখিয়া মোগল যুবক যে মুগ্ধ—বিস্মিত—স্তব্ধ হইবে, তাহা একান্তই স্বাভাবিক। তিনি বলিলেন, "আমি বেগম—নূরজীহান।"

বেগম—নূরজীহান! যাঁহাকে দেখিয়া যুবক জাহাঙ্গীর মুগ্ধ হইয়াছিলেন—প্রায় চল্লিশ বৎসর বয়সে দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়া পাদশাহ যে মেহেরউন্নিসার কথা ভুলিতে পারেন নাই—যাঁহাকে পতিহন্তার পত্নী হইতে অস্বীকৃতা দেখিয়া তিনি বলপ্রয়োগে বেগম না করিয়া দীর্ঘ ছয় বৎসর প্রেমের আকর্ষণে আকৃষ্ট

করিবারই প্রয়াস পাইয়াছিলেন—সেই বেগম, ভারতের রাজনীতি-তরীর কর্ণধার সেই নূরজীহান! যে নুরজীহান পতিহন্তাকে পতিত্বে গ্রহণ করিবেন না বলিয়া ছয় বৎসর তাঁহার অর্থ স্পর্শ না করিয়া সূচীশিল্পে লব্ধ অর্থে জীবনধারণ করিয়াছিলেন—শেষে পাদশাহের প্রেমের অবিচলিততায় আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার বেগম হইয়াছিলেন,—ভারতের ভাগ্যবিধাতার নিয়ন্ত্রী সেই নূরজীহান—দুনিয়ার আলো—তাই বটে!

মুগ্ধ মোগল কুর্নীশ করিতেও ভুলিয়া গেল।

বসনাভ্যন্তর হইতে একমুষ্টি স্বর্ণমুদ্রা বাহির করিয়া যুবকের সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া বেগম বলিলেন, "এই—তোমার পথের খরচ।"

আসরফীগুলা ঝন্ ঝন্ করিয়া পড়িয়া কোমল গালিচার উপর গড়াইয়া স্থানে স্থানে নিশ্চল হইল। যুবকের চমক ভাঙ্গিল। সে আসরফীগুলি কুড়াইতে লাগিল।

নূরজীহান জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি দিল্লী চেন?"

এইবার যুবক কুর্নীশ করিল, বলিল, "না। দিল্লী ধনীর সহর—আমি দরিদ্র।"

"ভাল—অন্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেও সে দিল্লীর পথ দেখাইয়া দিতে পারিবে। পথ জানিয়া যাইতে পারিবে ত?"

"পারিব।"

তখন নূরজীহান আসফ খাঁকে পত্র লিখিতে বলিলেন। পত্র লিখিত হইলে, নূরজীহান তাহাতে পাদশাহা মোহর ছাপিয়া দিলেন। পাদশাহের যে অঙ্গুরী পরওয়ানায় ছাপা হইত—তাহারই অনুরূপ একটি নূরজীহানের অঙ্গুলীতে শোভা পাইত। জাহাঙ্গীর নামে পাদশাহ্ ছিলেন—নূরজীহানই কাজে পাদশাহ্ ছিলেন।

আশফ খাঁর নির্দ্দেশে তাঁহার ভৃত্য পত্রখানি গুলিতে পুরিয়া গুলির ছিদ্র বন্ধ করিয়া দিল। নূরজীহান স্বহস্তে যুবককে গুলি দিলেন,—দিল্লীতে যাইয়া কিরূপে কাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গুলি দিতে হইবে, সব বলিয়া দিলেন; তাহার পর সে যে পাদসাহের দূত, তাহার নিদর্শন দিয়া, তাহাকে বিদায় করিলেন।

যুবক যথারীতি কুর্ণীশ করিয়া পিছু হটিয়া বাহির হইয়া গেল।

নূরজীহান ভ্রাতার সহিত মহবতকে আক্রমণের উপায় বিচার করিতে

লাগিলেন। মহবত বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তিনি আক্রান্ত হইলে সম্রাটের বিপদ ঘটিবে; স্বয়ং সম্রাটও তাঁহার উদ্ধারের চেষ্টা করিতে নিষেধ করিয়াছেন—তিনি বন্দী নহেন। তিনি প্রভুভক্ত ভৃত্য মহবতকে ক্ষমা করিয়াছেন। প্রমাণ-স্বরূপ মহবত জাহাঙ্গীরের অঙ্গুরী পাঠাইয়াছিলেন। আসফ সেই অঙ্গুরী বাহির করিয়া দেখাইলেন। নূরজীহান সেই অঙ্গুরী চুম্বন করিয়া অঙ্গুলীতে পরিধান করিলেন; তাহার পর বলিলেন, "সম্রাটকে আমি যেমন জানি, আর কেহ তেমন জানে না।"

আসফ খাঁ মনে মনে বলিলেন, "তাহাতে আর সন্দেহ নাই।"

"সম্রাটকে তুষ্ট করিয়া অঙ্গুরী কেন—তক্ত ও জাফরান লওয়াও কষ্টসাধ্য নহে।"

আসফ চিন্তিতভাবে বলিলেন, "কিন্তু একটা—কথা; আক্রমণ করিলে সম্রাটের বিপদ ঘটিতে পারে, তাই—"

ভ্রাতার কথা শেষ করিতে না দিয়া নূরজীহান রত্নখচিত পাদুকাবৃত চরণে গালিচার উপর পদাঘাত করিয়া বলিলেন, "বিপদ! দিল্লীর পাদশাহের বিপদ! ক্ষুধিত কুক্কুর মহবতের সাধ্য কি যে সে সম্রাটের বিপদ ঘটায়?"

আসফ খাঁ ভগিনীর কথার দৃঢ়তায় স্তম্ভিত হইলেন।

নূরজীহান বলিলেন, "আজ তুমি ভারত সাম্রাজ্যের মন্ত্রী হইয়া পূর্ব্ব কথা বিস্মৃত হইয়াছ; পিতামাতার পূর্ব্বাবস্থা আর তোমার মনে পড়ে না। কিন্তু মনে রাখিও, দারিদ্র্যদুঃখে—ক্ষুধার তাড়নায় স্বদেশ হইতে আসিবার সময় পথে প্রসূত কন্যাকে ভার ভাবিয়া মরুমধ্যে ফেলিয়া রাখিয়া আমাদের পিতামাতা চলিয়া আসিয়াছিলেন। দুঃখে কিরূপ কাতর ও চঞ্চল হইলে পিতা—মাতা সন্তানকে মারিয়া ফেলিতে পারে, তাহা কল্পনা করিতে পার কি? আমি সেই কন্যা—সেই পিতৃমাতৃপরিত্যক্তা কন্যা—ভাগ্যপরিবর্ত্তনে আবার মাতার অঙ্কে উপনীতা হইয়া—মাতৃস্তন্যে বর্দ্ধিতা হইয়া, রাজনীতির প্রবাহে ভাসিয়া, আজ দিল্লীর সিংহাসনে উপনীত হইয়াছি। আর তুমি—আমার ভ্রাতা—আজ হিন্দুস্থানের পাদশাহ জাহাঙ্গীরের মন্ত্রী। এ অবস্থায় কোনও মানুষ কি আপনার বিপদ ঘটিতে পারে ভাবিয়া সম্রাটের বিপদে নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতে পারে যে, তুমি ছলের অন্বেষণ করিতেছ?"

ভগিনীর তিরস্কারে আসফের ধৈর্য্যচ্যুতির উপক্রম হইতেছিল। তিনি বলিলেন, "কে বলে, আমি ছলের অন্বেষণ করিতেছি?"

নূরজাঁহান বলিলেন, "আমি। আসফ! মনের অগোচর পাপ নাই। তুমি আপনি বুঝিয়া দেখ।"

"তুমি নারী—রাজনীতির রহস্যভেদ করিতে পার না; তাই উত্তেজনায় বিপদের কথা ভাবিবার অবকাশ পাইতেছ না।"

নূরজাঁহান হাসিলেন—সে হাসি বিদ্রূপের। তিনি বলিলেন, "কিন্তু এই নারীর বুদ্ধিতেই তুমি আজ মন্ত্রী হইয়া বিজ্ঞতা-প্রকাশের অবকাশ পাইয়াছ। বিপদের কথা আমি যত ভাবিতে পারি, আর কে তত পারে? মাতৃগর্ভ হইতে আমি বিপদের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া জয়ী হইয়াছি। আসফ খাঁ, তুমি বিপদের পরিচয় পাও নাই, তাই ভীত হইতেছ।"

আসফ খাঁ আর কোনও উত্তর দিতে পারিলেন না।

তাঁহাকে নিরুত্তর দেখিয়া নূরজাঁহান বলিলেন, "এখনও ভাবিবার সময় আছে —ভাবিতেছ? তুমি নিশ্চয় জানিও, নূরজাঁহানের নারীদেহে প্রাণ থাকিতে জাহাঙ্গীরের উদ্ধারসাধনের কোনও চেষ্টারই ক্রুটী হইবে না—হইতে পারিবে না।"

এখন আর প্রৌঢ়া বেগম নূরজাঁহান পাদশাহ জাহাঙ্গীরের জন্য ব্যস্ত নহেন —পত্নী পতির জন্য ব্যস্ত—তরুণী মেহের-উন্-নিসা তরুণ হৃদয়ের প্রবল প্রেম লইয়া প্রণয়াস্পদ সেলিমের জন্য, সেলিমকে পাইবার জন্য জীবন পণ করিয়াছেন। প্রেম দেহের অবস্থা বিচার করে না—সে মনের যৌবন দূর হইতে দেয় না।

নূরজাঁহান আসফ খাঁর কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

আসফ বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। রাজনীতির বিচারাভ্যাসে তাঁহার হৃদয়ের প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল—ষড়যন্ত্রের ও স্বার্থের মধ্যে বাস করিয়া তিনি কোনও কার্য্যেই সহসা বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইতে পারিতেন না—গুপ্ত উদ্দেশ্যের সন্ধান না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। নহিলে নূরজাঁহানের যে ব্যাকুলতা সেনানায়কদিগের হৃদয়ে সংক্রান্ত হইয়া তাঁহাদিগকে সন্তরণে বিগলিততুষার হিমবারিবিস্তার অতিক্রম করিতে উত্তেজিত করিয়াছিল, আসফও সেই ব্যাকুলতার প্রভাব হইতে মুক্ত থাকিতে পারিতেন না।

নূরজাঁহান মোগল প্রাসাদের ও মোগল সাম্রাজ্যের ষড়যন্ত্রে অনভিজ্ঞ ছিলেন না; তিনিই অনেক ষড়যন্ত্রের কেন্দ্র ছিলেন। কিন্তু তিনি নারী; আপনার স্বভাবকে একেবারে পরিবর্ত্তিত করিতে পারেন নাই—বিচার-বিবেচনার তুষারস্তূপের চাপে স্বাভাবিক ভাবাবেগ বিনষ্ট করিতে পারেন নাই। তাই আজ যখন প্রেম তাঁহার চিত্তকে পূর্ণ করিয়া প্রেমাস্পদের সহিত মিলন-

কামনা প্রদীপ্ত করিয়াছিল, তখন তিনি আর বিচার-বিবেচনার অবকাশ পাইলেন না। আজ তাঁহার সকল কার্য্যে—প্রতি পদক্ষেপে তাঁহার হৃদয়ের চাঞ্চল্য আত্ম-প্রকাশ করিতেছিল।

৫

নূরজীহানের প্রদত্ত আসরফীগুলি লইয়া, হাজার আসরফীর ও নূরজীহানের রূপের স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে মোগল যুবক গৃহে ফিরিয়াছিল—কেবল সন্ধ্যাগমের অপেক্ষা করিতেছিল—অন্ধকার হইলেই সে দিল্লী যাত্রা করিবে। দিল্লী—পাদশাহের রাজধানী—ঐশ্বর্য্যের সৃষ্টি—মর্ত্তে বেহেস্ত; না জানি সে কেমন!

যুবকের মনে হইতেছিল, আজ যেন দিন বড় দীর্ঘ—সন্ধ্যা আর হইতে চাহে না! সে একাধিকবার গৃহের বাহিরে আসিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিল, তখনও আকাশভরা রৌদ্র! ক্রমে রৌদ্রের তেজ কমিয়া গেল—শেষে দূরে গিরিশৃঙ্গে বর্ণের বৈচিত্র্য বিকাশ করিয়া সূর্য্য বনালী-যবনিকার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন হইল। ক্রমে সূর্য্য ডুবিয়া গেল—মেঘের উপর রক্তাভা লাগিয়া রহিল। শেষে সে আভাও মুছিয়া গেল। বিহগকাকলী সন্ধ্যাসমাগম সূচিত করিল—সন্ধ্যার ধূসর গগনে নক্ষত্র ফুটিয়া উঠিতে না উঠিতে চতুর্থীর ক্ষীণকলেবর চন্দ্র একটি উজ্জ্বল-তারকা লইয়া ভাসিয়া উঠিল। যুবক রণ্-পা লইয়া বাহির হইল।

সে প্রদেশের পথ যুবকের অপরিচিত ছিল না—শিকারে, যুদ্ধে, সে বহুবার সে সব পথে গিয়াছে। সে ইচ্ছা করিয়া সরল পথ ছাড়িয়া একটু বাঁকা পথ ধরিল—যদি মহবতের লোক জানিতে পারে। নূরজীহানও সে বিষয়ে তাহাকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন। সে ধীরে ধীরে বিতস্তার কূলে কূলে বনভূমির মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া কিছু দূরে যাইয়া নদী পার হইল—তাহার পর প্রান্তর পার হইয়া সড়কে উঠিল।

পথে উঠিয়া সে দ্রুত চলিতে লাগিল—হাজার আসরফী! জীবনে আর কোনও দিন শ্রম করিতে হইবে না—বিলাসে জীবনযাপন করিতে পাইবে। একদিনের পরিশ্রমে আর কেহ কি কখনও এত অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিয়াছে? সে যত ভাবিতে লাগিল, তত তাহার উৎসাহ বাড়িতে লাগিল—মানসিক উত্তেজনায় শরীরের শক্তিও যেন বাড়িয়া গেল।

যখন রাত্রি শেষ হইল, তখন যুবক ভাবিল—কাল যখন রাত্রি পোহাইবে, তখন দিল্লীতে পঁহুছিতে হইবে; নহিলে সব বৃথা হইবে। সে একটি বৃক্ষমূলে বসিল; বৃক্ষের উপর বিহগের কূজন—বৃক্ষমূলে প্রভাত-পবনের স্নিগ্ধসঞ্চার।

সমস্ত রাত্রি শ্রমের ও অনিদ্রার ফলে যুবকের দেহে যে বিকার উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা দূর হইতে লাগিল। যুবকের নিদ্রাকর্ষণ হইতে লাগিল। একবার ঢুলিয়াই সে চমকিয়া উঠিল; ঘুমাইয়া পড়িলে বিলম্ব হইতে পারে; বিলম্ব হইলে সবই ব্যর্থ হইবে। আর এক রাত্রি—তাহার পর বিশ্রাম—জীবনে সুখের ও নিদ্রার অনন্ত অবসর। হাজার আসরফী! হামিদার পিতা আর দরিদ্র বলিয়া তাহাকে কন্যাদান করিতে কুণ্ঠিত হইবে না। হামিদা—তাহার যৌবনের স্বপ্ন! কিন্তু সে শিবিরে কি রূপই দেখিয়াছে!

যুবক উঠিল—আবার পথ চলিতে লাগিল। কিন্তু বেলা যত বাড়িতে লাগিল—সূর্য্যের তাপ যত প্রখর হইতে লাগিল, সে ততই শ্রান্তি বোধ করিতে লাগিল। তাহাকে মধ্যে মধ্যে বৃক্ষের ছায়ায় বিশ্রাম করিতে হইল। সঙ্গে যে খাবার ছিল, তাহার কতকাংশ আহার করিয়া সে মধ্যাহ্নের পর আবার চলিতে লাগিল—পিপাসা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ক্রমে ঘন ঘন বিশ্রামের প্রয়োজন হইতে লাগিল—পাত্রস্থিত পানীয় শেষ হয় দেখিয়া সে পানের মাত্রা কমাইয়া দিল। ঘর্ম্মাক্তকলেবরে যুবক চলিতে লাগিল—মানসিক শক্তির দ্বারা দেহের অবসন্নতা জয় করিয়া দিল্লীর পথে চলিতে লাগিল!—দিল্লী!—দিল্লী কত দূর?

৬

আবার সূর্য্য অস্ত গেল—সন্ধ্যার শীতল বাতাসে যুবকের শরীর যেন একটু স্নিগ্ধ হইল। কিন্তু তাহার উৎকণ্ঠা বাড়িতে লাগিল। এক রাত্রি গিয়াছে—একটি দিনও গিয়াছে; আর এক রাত্রিমাত্র অবশিষ্ট। আকাশে যে সব তারকার দীপ্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে, সেই সব তারা প্রভাতালোকে নির্ব্বাপিত হইবার পূর্ব্বে দিল্লীর দুর্গে সংবাদ দিতে হইবে—নহিলে সব ব্যর্থ! হাজার আসরফী স্বপ্নমাত্র হইবে, সে যে দরিদ্র মোগল, সেই দরিদ্র মোগলই থাকিবে। এত শ্রম কি নিষ্ফল হইবে? এত আশা কি শেষে হতাশায় পরিণতি লাভ করিবে?

তাহা হইবে না। যুবক আবার দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল। কিন্তু চরণ আর চলিতে চাহে না! পদে যেন কি ভার বোধ হইতেছিল। দিল্লী যত নিকট হইতে লাগিল, সে তত অবসন্ন হইতে লাগিল। যুবক চলিতে লাগিল, আর আকাশের দিকে চাহিতে লাগিল—আকাশে তারকা দেখিয়া রাত্রির পরিমাণ বুঝিতে লাগিল। তাহার উৎকণ্ঠা কেবলই বাড়িতে লাগিল। সে কি সত্য সত্যই অসাধ্যসাধনের আশা করিয়াছিল? দিল্লী কি এতই দূর? শরীর ত আর সহে না! মনের বল ত আর দেহের অবসন্নতাকে পরাভূত করিতে পারে

না! তাহার মনে হইতে লাগিল, সে রণ্-পা হইতে পড়িয়া যাইবে। দিল্লী কত দূর, তাহাও ত সে জানে না—জিজ্ঞাসা করিয়াও জানিতে পারে না। যে যাহার গৃহে সুপ্ত—শুধু সে জাগিয়াই হাজার আসরফীর স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে স্বপ্ন-সঞ্চালিতবৎ অগ্রসর হইতেছে।

৭

রাত্রি শেষ হইয়া আসিল—উষা না ফুটিতে পূর্ব্বগগনমূলে তাহার যে হাসি ফুটিয়া উঠে, সেই হাসি দেখা দিল। শঙ্কিতনেত্রে যুবক সম্মুখে চাহিল—দূরে ধূসর গগনের নিম্নে ও কি? ও কি সৌধশ্রেণী? ঐ কি দিল্লী!—সাধনার সিদ্ধি! আশার উত্তেজনায় যুবক আবার দ্রুত চলিল। বুঝি অদৃষ্ট সদয়!

নগরে প্রবেশ করিয়াই যুবক দেখিল—কতকগুলি সমাধিমন্দির—ধনীর সমাধি। নহিলে অত ব্যয়ে কেহ মন্দির নির্ম্মাণ করিতে পারে না। দরিদ্রের দেহ কোথায় মাটীতে মিশায়, কেহ তাহার সন্ধান রাখে না—ধনীর দেহের শেষ শয়ন-স্থানও সগর্ব্বে আত্মপ্রকাশ করিতে চাহে। তখনও সহর সুপ্ত। কেবল জরায় কুব্জা, মলিনছিন্নবেশা এক বৃদ্ধা সেই সমাধিমন্দির মার্জ্জন করিতেছিল। অতুল ঐশ্বর্য্যের পার্শ্বেই দীন দারিদ্র্য—ইহাই জগতের নিয়ম। প্রভাতে লোক দেখিবে—মন্দির মার্জ্জিত—সজ্জিত। তাই দিবালোকবিকাশের পূর্ব্বেই সামান্যবৃত্তি-ভোগিনী বৃদ্ধা প্রতিদিন মন্দির মার্জ্জিত করিয়া যায়।

যুবক বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিল, "দিল্লী কত দূর?"

বৃদ্ধা ফিরিয়া চাহিল। যুবক রণ্-পা হইতে নামে নাই। বৃদ্ধার বড় রাগ হইল—কেহ যে দিল্লী চিনে না, এমন হইতে পারে না। তবে যুবক তাহাকে দরিদ্রা—বৃদ্ধা দেখিয়া বিদ্রূপ করিয়াছে—দিল্লী কত দূর! তাহারও একদিন যৌবন ছিল; তখন তাহার মুখেও বিদ্রূপ শোভা পাইত—আজই না হয় সে দিন আর নাই। বৃদ্ধা বলিল, "দিল্লী দূর্ অস্ত"—দিল্লী বহুদূর। বলিয়াই সে কাজে মন দিল।

৮

দিল্লী বহুদূর! যে আশার উত্তেজনায় যুবক দুই রাত্রি ও এক দিন দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়াছে, সে আশার দীপ এই কথার বাতাসে নিবিয়া গেল। যুবক রণ্-পার উপর হইতে পড়িয়া গেল—তাহার শ্রান্তদেহ নিশ্চল হইল। হৃদয়ের স্পন্দন স্তব্ধ হইল। দিল্লীর দ্বারে আসিয়া তাহার পক্ষে দিল্লী দূর রহিয়া গেল; সাফল্যের সিংহদ্বারে আসিয়া সে চিরদিনের মত পরাভূত হইল।

বৃদ্ধা পতনের শব্দে ফিরিয়া চাহিল; দেখিল, যুবক নিঃস্পন্দ হইয়া পড়িয়া আছে। বৃদ্ধা মার্জ্জনী ফেলিয়া বাহিরে আসিল—যুবককে নাড়িয়া দেখিল, দেহে প্রাণ নাই! প্রেতের কাজ ভাবিয়া বৃদ্ধা ভীতিকম্পিতকণ্ঠে চীৎকার করিল—যেন যন্ত্রণায় কাতর হইয়া পেচক আর্ত্তনাদ করিল। সেই বিকট শব্দে নিকটবর্ত্তী গৃহগুলির দ্বার মুক্ত করিয়া লোক আসিল। কেহ কেহ যুবকের চৈতন্যসঞ্চারের চেষ্টা করিল। কিন্তু সব ব্যর্থ হইল।

যুবকের পরিচ্ছদে গুলি ও বাদশাহী ছাড় পাওয়া গেল। তখন সমবেত জনতায় চাঞ্চল্য লক্ষিত হইল—কোতোয়ালের কাছে সংবাদ গেল।

ক্রমে কোতোয়াল আসিলেন—তিনি ছাড় ও গুলি দুর্গে লইয়া গেলেন। তখন দিল্লীদুর্গে সকলে জানিল, পাদশাহ জাহাঙ্গীর বিদ্রোহী মহবতের বন্দী! দিল্লীতে, আবার ষড়যন্ত্র আরম্ভ হইল—সম্রাটের উদ্ধারচেষ্টা হইতে লাগিল। আর, যে সে সংবাদ আনিয়াছিল, সে দিল্লীর দ্বারে দিল্লীর নিকট হইতে দূরে রহিল।

* * * * *

তাহার পর নূরজাহানের ষড়যন্ত্রে জাহাঙ্গীরের উদ্ধার সাধিত হইয়াছিল। সেবারও রুগ্ন ভগ্ন পাদশাহকে লইয়া নূরজাহান ভারতের প্রান্তরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন—শুশ্রূষায় ভগ্নস্বাস্থ্য স্বামীর দুর্ব্বল দেহে প্রাণ রাখিয়াছিলেন।

তাঁহারই আদেশে দিল্লীর দ্বারে মোগল-যুবকের মৃত্যুস্থানে একটি ক্ষুদ্র মসজেদ নির্ম্মিত হয়। সে মসজেদের নামের সঙ্গে যুবকের পরিণাম জড়িত;—তাহার নাম—"দিল্লী দূরস্ত্" মসজেদ।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

বাঙ্গালার প্রাচীন ইতিহাস।

২

মৌর্য্যযুগের বাঙ্গালা দেশ।

এক্ষণে পরবর্ত্তী অবস্থার একটু পূর্ব্বাভাসরূপে বলিতে পারি যে,—সহস্র বৎসর সময়ের মধ্যে উত্তর-ভারতের যে তিনটি সাম্রাজ্যের ঐতিহাসিক প্রমাণ বিদ্যমান আছে, তাহাদিগের নাম—(১) চন্দ্রগুপ্ত—বিন্দুসার—অশোকের মৌর্য্যসাম্রাজ্য, (২) গুপ্তসাম্রাজ্য (খৃষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দী), এবং

(৩) হর্ষবর্দ্ধনের সাম্রাজ্য (সপ্তম শতাব্দী)। বাঙ্গালা অথবা বাঙ্গালার বৃহত্তর অংশ এই সকল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল; এবং ইহাদের সম্বন্ধে যে সকল তথ্যপূর্ণ সমাচার আমরা জ্ঞাত আছি, তাহার কতকাংশ বৈদেশিক লেখকগণের নিকট হইতে সংগৃহীত। যথা,—মৌর্য্যসাম্রাজ্য সম্বন্ধে মেগাস্থিনিস্, চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য সম্বন্ধে পঞ্চমশতাব্দীর প্রারম্ভে চৈনিক তীর্থপর্য্যটক ফা হিয়ান, এবং সপ্তম শতাব্দীতে হর্ষ সম্বন্ধে চৈনিক তীর্থ-পর্য্যটক ইউয়ান-চুয়াঙ্গ। এই তিন সাম্রাজ্যের বর্ণনায় কতকাংশে আমরা সাদৃশ্য দেখিতে পাই। সকল সাম্রাজ্যেই সভ্যতার উচ্চ আদর্শ সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। রাজশাসনের অনুষ্ঠানাদিতে ও ব্যবস্থাদিতে কিয়ৎপরিমাণে সাদৃশ্য ছিল। ইউয়ান-চুয়াঙ্গ-বর্ণিত হর্ষের রাজ্যশাসনব্যবস্থা এবং তাহার আট শত বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী অশোকের রাজ্যশাসনব্যবস্থার সাদৃশ্য বিষয়ে ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। এই সাম্রাজ্যত্রয়ে বৌদ্ধধর্ম্ম ও হিন্দুধর্ম্ম পাশাপাশি বিদ্যমান ছিল, এবং নৃপতি বৌদ্ধই হউন, অথবা হিন্দুই হউন, ধর্ম্মবিদ্বেষের কোনপ্রকার অস্তিত্ব ছিল না। ইহা অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না যে, এই তিন সাম্রাজ্যের বিচ্ছিত্তির অবসরে তাহাদিগের অধিকৃত ভূভাগ যখন বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তখনও এবংবিধ প্রকৃতির অন্তর্ধান ঘটে নাই, এবং সম্ভবতঃ, সপ্তম শতাব্দীতে হর্ষের সাম্রাজ্যধ্বংসের পরে ও অষ্টম শতাব্দীর শেষে, অথবা নবম শতাব্দীর প্রারম্ভে পালবংশের অভ্যুত্থানকালাবধি বাঙ্গালায় উহা বিদ্যমান ছিল। ইহাও অনুমান করা যাইতে পারে যে, উত্তর-ভারতে মৌর্য্যসাম্রাজ্য, গুপ্তসাম্রাজ্য, অথবা হর্ষের সাম্রাজ্যের মত উন্নত বিধিব্যবস্থা ও সুনিয়ন্ত্রিত রাজ্যশাসনপ্রণালীসমন্বিত একটা বৃহৎ সার্ব্বভৌম সাম্রাজ্য বর্ত্তমান থাকায়, ঐ সাম্রাজ্যের অন্তঃস্থিত মিত্র ও অধীন রাজ্যসমূহ, এবং সীমান্তস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যসমূহও তাহার অনুষ্ঠানাদির স্বভাবতঃই অনুকরণ করিয়া থাকিবে। এই রূপেই, প্রাচীন রোমসাম্রাজ্যের সীমান্তস্থিত অর্দ্ধ-বর্ব্বর রাজ্যসমূহ কতকগুলি রোমীয় বিধিব্যবস্থা ও অনুষ্ঠান গ্রহণ করিয়াছিল। এবং পরবর্ত্তী কালে ভারতবর্ষে সীমান্তস্থিত মিত্র ও স্বাধীন রাজ্যগুলি মোগল-রাজত্বকালে মোগলদিগের, এবং ব্রিটিশ রাজত্বকালে ইংরাজদিগের কতক কতক বিধিব্যবস্থা ও অনুষ্ঠানের অনুকরণ করিয়াছে। পরন্তু, রোমক সাম্রাজ্যের পতন হইলে, যে বর্ব্বরগণ প্রাচ্যভূমি হইতে ইউরোপকে আক্রমণ করিয়াছিল, তাহারা যেমন গ্রীক-রোমীয় সভ্যতা ও ধর্ম্ম সাধ্যানুযায়ী গ্রহণ বা আত্মসাৎ

করিয়াছিল, তেমনই পুরাকালে শক, পহ্লব, কুষাণ ও হূণ প্রভৃতি যে সকল নানা শ্রেণীর অশিক্ষিত জাতি উত্তর দিক হইতে ভারতবর্ষকে আক্রমণ করিতে আসিয়া অবশেষে এতদ্দেশেই স্থায়ী হইয়া গিয়াছিল, তাহারাও ভারতীয় আচার, নিয়ম ও বৌদ্ধ বা হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। মৌর্য্য সাম্রাজ্যের আমলেও যে আজিকার মতই গঙ্গার প্রবাহ বাঙ্গালার সম্পদ্, সভ্যতা ও গৌরব অর্জ্জনের সহায়তা করিয়াছে, এবং তৎকালে মৌর্য্য রাজধানীর সহিত বাঙ্গালার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধস্থাপনে আনুকূল্য করিয়াছে, ইহা একরূপ নিশ্চিত। সমুদ্রে আত্মবিসর্জ্জন করিবার পূর্ব্বে, জাহ্নবী এই বাঙ্গালার ভিতর দিয়াই বহিয়া গিয়াছে; ইহা যে সাম্রাজ্যের পূর্ব্বাংশের সামুদ্রিক বাণিজ্যের একটা প্রধান পথ ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

"ইরিথ্রিয়ান-সাগরের পোতযাত্রা" নামক গ্রীক গ্রন্থের (লেখকের নাম অপ্রকাশ) রচনাকাল প্রথম শতাব্দীর শেষভাগে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। উহাতে, গঙ্গার মোহানার নিকটবর্ত্তী "গঙ্গে" নামক বন্দর হইতে উৎকৃষ্ট মসলিন ও অন্যান্য সামগ্রী রপ্তানী হইবার উল্লেখ আছে। এ গ্রন্থের লেখক এক জন গ্রীক বণিক,—দক্ষিণ ইজিপ্টে বেরেনিস্ নামক স্থানে তিনি আবাসনির্ম্মাণপূর্ব্বক স্থায়ী হইয়াছিলেন, এবং ভারত সমুদ্রের তীরবর্ত্তী নানা স্থানে ব্যবসায় বাণিজ্য করিতেন। এ গ্রন্থে কোনরূপ অতিরঞ্জন নাই। সমুদ্রপথসম্বন্ধীয় ও বাণিজ্যসম্বন্ধীয় তথ্যের ইহা ব্যবসায়িকোচিত সংগ্রহ। এই গ্রন্থ যখন রচিত হয়, তখন, আজ যেমন পূর্ব্বে কলিকাতা বন্দর ও পশ্চিমে বোম্বাই বন্দর, তেমনই পূর্ব্বদিকে গঙ্গার একটি মোহানার উপর গঙ্গে বন্দর, এবং নর্ম্মদার মোহানা হইতে ত্রিশ মাইল দূরে পশ্চিম উপকূলে বারগোসা (সংস্কৃত-ভৃগুকচ্ছ, বর্ত্তমান বরোচ) বন্দর,—ভারতবর্ষের এই দুই প্রধান বন্দর ছিল। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর লেখক ভৌগোলিক টলেমিও "গঙ্গে"কে গঙ্গার মোহানার সমীপবর্ত্তিদেশবাসী গঙ্গেরিডিগণের প্রধান নগর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। টলেমি তাম্রলিপ্তিকে গঙ্গাতীরস্থ নগর বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন,—এই তাম্রলিপ্তিই আধুনিক তমলুক। বর্ত্তমান তমলুক নগর রূপনারায়ণ নদের তীরে অবস্থিত, এবং ভাগীরথীর সহিত যে স্থানে রূপনারায়ণ সম্মিলিত হইয়াছে, সে স্থান হইতে তমলুকের ব্যবধান ১২ মাইল। কিন্তু এই সকল নদনদীর প্রবাহমার্গ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, এবং প্রাচীন তাম্রলিপ্তি যে গঙ্গারই একটি শাখার তীরে অবস্থিত ছিল—ইহাই বিশেষ সম্ভব। তাম্রলিপ্তি যে প্রাচীনকাল হইতে একটি সুপ্রসিদ্ধ বন্দর,

বিশেষতঃ, সিংহলের সহিত বাণিজ্যের ইহাই যে প্রধান কেন্দ্র ছিল, সে বিষয়ে অন্য প্রমাণ আছে। প্রাগুক্ত গ্রীক গ্রন্থের কাল ও টলেমির কাল, মৌর্য্যসাম্রাজ্যের অধঃপতনের অনেক পরে। কিন্তু মৌর্য্যসাম্রাজ্যে গঙ্গার কোনও মোহানার উপরে বা সন্নিকটে যে একটি প্রকাণ্ড বন্দর ছিল, তাহা একরূপ নিশ্চিত।

খৃষ্টীয় দ্বিতীয় হইতে পঞ্চম শতাব্দী;—

গুপ্ত সাম্রাজ্য এবং হূণ-আক্রমণ।

আনুমানিক খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে মৌর্য্যসাম্রাজ্যের পতনের পর হইতে পঞ্চম শতাব্দী পর্য্যন্ত আমরা বাঙ্গালার অবস্থা একরূপ জানি না বলিলেই হয়। এই পঞ্চ শতাব্দীতে ভাগীরথীর পশ্চিমকূলবর্ত্তী বাঙ্গালা অর্থাৎ "রাঢ়" দেশকে গুপ্তসাম্রাজ্যের অন্তর্গত, এবং বাঙ্গালা, মধ্যবাঙ্গালা ও বদ্বীপভুক্ত বাঙ্গালাকে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করদ রাজ্যে বিভক্ত দেখিতে পাই।

পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমভাগে, সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত, অথবা চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে চৈনিক পর্য্যটক ফা হিয়ান ভারতবর্ষে আগমন করিয়া, তিন বৎসর পাটলিপুত্রে, এবং দুই বৎসর তাৎকালিক অন্যতম প্রধান বন্দর তাম্রলিপ্তিতে থাকিয়া, সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন, এবং বৌদ্ধ হস্তলিখিত গ্রন্থাদির নকল করেন। তাঁহার প্রদত্ত বিবরণ হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, তৎকালে গুপ্তসাম্রাজ্যের শাসনপ্রণালী বিশেষ উন্নত ও কার্য্যকর ছিল; বিশেষতঃ, মগধের নগরগুলি সুবৃহৎ ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল; দাতব্য অনুষ্ঠানের সংখ্যা ছিল না; পথে পথে পান্থশালা প্রতিষ্ঠিত ছিল; এবং পরহিতৈষী শিক্ষিত নাগরিকদিগের প্রদত্ত বৃত্তির আনুকূল্যে রাজধানীতে একটি সুবৃহৎ দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে হূণগণের একাধিক আক্রমণে গুপ্তসাম্রাজ্য খণ্ডবিখণ্ড হইয়া গেলে, উত্তর-ভারতের অধিকাংশই হূণদিগের শাসনাধীন হইয়াছিল। হূণগণ অসভ্যজাতীর বিপুল লোক-সঙ্ঘ। তাহারা আদিতে উত্তর এসিয়ার মালভূমিতে বাস করিত; তৎপরে আপনাদিগের ও আপনাদিগের পশুপালের জীবিকার সন্ধানে দুই দলে বিভক্ত হইয়া, পশ্চিম ও দক্ষিণ অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিল। এক দল প্রাচ্য ইউরোপখণ্ড আক্রমণ করিয়া ভল্‌গা নদী ধরিয়া অগ্রসর হইয়াছিল; অন্য দল অক্‌সাস্ নদীর উপত্যকার অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিল। এই শেষোক্ত হূণগণ এপথ্যালাইটিস্ বা শ্বেত হূণ নামে পরিচিত,—তাহারা পারস্য ও বর্ত্তমান আফগানিস্থান অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষে আসিয়া

প্রবেশ করিয়াছিল। এই শ্বেত হূণদিগের মধ্যে যাহারা অকৃসাস্-উপত্যকায় বসবাস নির্ম্মাণপূর্ব্বক স্থায়ী হইয়া গিয়াছিল, তাহাদিগের সম্বন্ধে ঐতিহাসিক গিবন্ বলিয়াছিলেন,—যে সংবর্দ্ধমান প্রদেশে গ্রীক শিল্পের অতি ক্ষীণ পরিচয় তৎকালেও হয় ত বর্ত্তমান ছিল, সেই প্রদেশে দীর্ঘকাল বাস হেতু এবং তদ্দেশের জলবায়ুর প্রভাবে তাহাদের আচার ব্যবহার কোমল হইয়াছিল, এবং তাহাদিগের মুখাবয়ব অলক্ষিতভাবে উন্নত হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং যে সকল হূণ ভারতবর্ষ আক্রমণ করে, তাহারা হয় ত ইউরোপ-আক্রমণকারী হূণগণের মত সম্পূর্ণ অসভ্য ও বর্ব্বর ছিল না। হূণগণের ভারত-আক্রমণের ফল ইহাই হইল যে,—গুপ্তসাম্রাজ্যের যে সকল অংশ তাহাদিগের বশ্যতা স্বীকার করিল না, তাহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িল; এবং গুপ্ত-রাজবংশ পাটলিপুত্রে তাহাদিগের রাজধানী রাখিয়া, মগধের স্থানীয় রাজবংশ হইয়া রহিল।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী।

খ্রীষ্টীয় ৫২৮ খৃষ্টাব্দের সমসময়ে, কতিপয় মণ্ডলেশ্বর, মগধরাজ নরসিংহ গুপ্ত ওরফে বালাদিত্যের, এবং মধ্য-ভারতের যশোবর্ম্ম নামক নৃপতির নেতৃত্বে দলবদ্ধ হইয়া হূণরাজ মিহিরকুলকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন। ইহাতেই হূণশক্তির মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া যায়, এবং হূণ আক্রমণকারিগণ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া এতদ্দেশের সাধারণ অধিবাসীর সহিত একরূপ অনন্য হইয়া যায়। কিন্তু ইউরোপখণ্ডে বিভিন্ন জাতি যেমন মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে, ভারতবর্ষে ঠিক সেরূপ হয় নাই; ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় এবং হূণ বা তদন্বিত অন্যজাতি, যথা—গুর্জ্জর বা গুজর, ভারতবর্ষে তাহাদের স্বাতন্ত্র রক্ষা করিয়াছিল এবং অদ্যাবধিও তাহাদিগকে পৃথক করিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। এই সকল হূণজাতির ভিতর যাহারা রাজনীতিক শক্তি অর্জ্জন করিয়া উত্তর, উত্তর-পশ্চিম, পশ্চিম ও মধ্যভারতে রাজ্যস্থাপন করিয়াছিল, তাহারাই বর্ত্তমান কতিপয় রাজপুত জাতির পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন বলিয়া কেহ কেহ বিশ্বাস করেন। ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ প্রণীত গ্রন্থের একাংশে এই বিষয় সম্পূর্ণরূপে আলোচিত হইয়াছে। ষষ্ঠ শতাব্দীর পরার্দ্ধে ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে একরূপ কিছুই জানা নাই; তবে হূণ ও তদন্বিত জাতির আক্রমণে নিদারুণ ভাবে বিধ্বস্ত হওয়ায় অন্ততঃ উত্তর-ভারতে কোনও সার্ব্বভৌমশক্তি বর্ত্তমান ছিল না, এবং দেশ কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়াছিল—ইহাই সম্ভব বলিয়া মনে হয়।

খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী ;—

হর্ষ-সাম্রাজ্য।

সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে, সুপ্রসিদ্ধ হর্ষ শক্তিশালী হইয়া উঠেন ;—পূর্ব্বে তিনি দিল্লীর উত্তরে থানেশ্বর নামক ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতিমাত্র ছিলেন। হর্ষের বংশাবলীর ও বিজয়বার্ত্তার অনেক তথ্য বাণভট্ট-রচিত হর্ষচরিত কাব্যে, এবং চৈনিক পরিব্রাজক ইউয়ান-চুয়াঙ্গের ভ্রমণকাহিনীতে প্রাপ্ত হওয়া যায়,— বাণ হর্ষের রাজসভার সভাসদ ব্রাহ্মণ, এবং ইউয়ান্‌চুয়াঙ্গ হর্ষের রাজত্বকালেই ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন।

হর্ষের বংশ গুপ্ত-রাজবংশের সহিত সম্পর্কিত ছিলেন ; হর্ষের পিতা প্রভাকরবর্দ্ধন থানেশ্বরাধিপ ছিলেন। এই প্রভাকরের জননী গুপ্তবংশেরই এক রাজদুহিতা। হর্ষ প্রভাকরের কনিষ্ঠ পুত্র। ৬০৫ খৃষ্টাব্দে প্রভাকরের মৃত্যু হইলে, জ্যেষ্ঠপুত্র রাজ্যবর্দ্ধন পিতৃরাজ্য লাভ করেন। পঞ্চনদের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে যে সকল হুণ উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, তাহাদিগের সহিত, এবং সম্ভবতঃ বর্ত্তমান মালোয়ার তাৎকালিক অধিবাসী মালব নামে পরিচিত এক জাতির সহিত প্রভাকর যুদ্ধবিগ্রহে ব্যাপৃত ছিলেন। মানচিত্রে দৃষ্টিপাত করিলেই, প্রভাকরের রাজধানী থানেশ্বর যে মালব হইতে বহু দূর তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। প্রভাকরের সহিত মালবদিগের সতত যুদ্ধবিগ্রহ হইত। ইহা হইতেই অনুমান হয় যে, তাহাদিগের অধিবাসভূমি পরস্পর সংলগ্ন ছিল। রাজ্যের সীমান্ত যে কোথায় ছিল, তাহা আমরা জ্ঞাত নহি।

প্রভাকরেরর মৃত্যুর পরও এইরূপ যুদ্ধবিগ্রহ চলিয়াছিল ; রাজ্যবর্দ্ধন ৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। যে সকল বিবরণ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতেই প্রতীয়মান হয় যে, রাজ্যবর্দ্ধন রাজ্যপ্রাপ্তির অত্যল্পকাল পরে, মালবদিগের সহিত সন্ধিবদ্ধ শশাঙ্ক নামক বঙ্গদেশাগত জনৈক নৃপতি কর্ত্তৃক নিহত হন।

গৌড়।

"গৌড়" নামের নির্দ্দেশ-আলোচনার ইহাই বোধ হয় উপযুক্ত স্থান। মালদহ জেলায় একটি বৃহৎ নগরের যে সুবিখ্যাত ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া রহিয়াছে, তাহাই এক্ষণে গৌড় নামে পরিচিত ; কিন্তু প্রাচীনকালে গৌড় বলিতে নগর বুঝাইত না ; বরং একটি দেশ, রাজ্য, বা সাম্রাজ্য বুঝাইত। অন্ততঃ কোনও কোনও গ্রন্থে, সংকীর্ণ অর্থে, বঙ্গ হইতে অর্থাৎ দক্ষিণ ও মধ্যবাঙ্গালা হইতে পৃথক করিয়া, উত্তর-বঙ্গকে, বিশেষতঃ পূর্ব্বোল্লিখিত বরেন্দ্র বা বরেন্দ্রী

নামে পরিচিত, মালদহ, রাজসাহী, দিনাজপুর, রঙ্গপুর ও বগুড়া জেলার উন্নতপৃষ্ঠ কতকাংশই গৌড় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। উত্তর-বঙ্গের নৃপতিগণ শক্তিশালী হইয়া যখন প্রত্যন্ত প্রদেশেও অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন, তখন ঐ সকল প্রদেশও গৌড়-অভিধার অন্তর্গত হইয়াছিল। কোনও কোনও রচনায় আমরা পঞ্চগৌড়ের উল্লেখ দেখিতে পাই। ইহা হইতে কেহ কেহ বলিয়াছেন,—গৌড়সাম্রাজ্যে পাঁচটি প্রদেশ ছিল। কিন্তু বোধ হয়, পঞ্চগৌড়ের "পঞ্চ" শব্দ কোনও বিশিষ্টার্থে প্রযুক্ত হয় নাই। ভারতীয় ভাষায় সময় সময় যে লক্ষণার প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়—উহাও তদ্রূপ প্রয়োগমাত্র, এবং উহা দ্বারা গৌড়সাম্রাজ্যের সমুদয় প্রদেশ বা সমগ্র সাম্রাজ্যই উদ্দিষ্ট হইয়াছে। আসাম অঞ্চলে গৌড় শব্দের এক অভিনব প্রয়োগ দৃষ্ট হয়,—তথায় মুসলমানগণের সাধারণ নাম গৌড়ীয়। বাঙ্গালা যখন আসাম প্রদেশে গৌড় নামে বিদিত ছিল, তৎকালে বাঙ্গালা হইতে যাহারা আসামে গমন করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান আসামীয় মুসলমানের অনেকেই তাঁহাদিগের বংশধর।—ইহা হইতেই হয় ত "গৌড়ীয়" নামের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। গৌড়রাজ্য বা সাম্রাজ্যের রাজধানী এক এক সময়ে এক এক স্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রাচীন ভারতে শাসক রাজবংশের পক্ষে রাজধানী-পরিবর্ত্তন নিতান্ত সাধারণ ব্যাপার ছিল; এই কারণে, গৌড়ের রাজধানী কখনও বা বগুড়া জেলার অধীন মহাস্থান নামে পরিচিত স্থানে, কখনও বা বর্ত্তমান গৌড়ের ধ্বংসাবশেষের অবস্থান-ভূমিতে, কখনও বা অধুনা-অনির্দ্দিষ্ট-স্থিতিভূমি রামাবতীপুরে, কখনও বা এক্ষণে রাজসাহী জেলার গোদাগাড়ীর সন্নিহিত বিজয়নগর নামক গ্রাম যে বিজয়পুরের অবস্থানভূমিতে বর্ত্তমান বলিয়া কথিত হইয়া থাকে, সেই বিজয়পুরে অবস্থিত ছিল।

কর্ণসুবর্ণ।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইউয়ান-চুয়াঙ্গ শশাঙ্ককে কর্ণসুবর্ণ-রাজ বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কর্ণসুবর্ণ বলিতে পশ্চিম ও মধ্য বাঙ্গালাকেই বুঝাইত বলিয়া বোধ হয়;—কর্ণসুবর্ণের রাজধানী ছিল রাঙ্গামাটী; মুর্শিদাবাদের বার মাইল দক্ষিণে ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে উহা অবস্থিত ছিল। তথায় পুরাবস্তুতত্ত্বের বহু নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

রাঙ্গামাটীর নিকট নদীর তটভূমি ১০০ হইতে ২০০ ফিট উচ্চ, এবং ইহার মৃত্তিকা কঠিন ও রক্তাভ। হয় ত তাহা হইতেই রাঙ্গামাটী নামের সৃষ্টি। যে

সকল সমুন্নত তটদেশে তরঙ্গসংঘাতে 'রাঙ্গা' মাটী বাহির হইয়া পড়িয়াছে, এমন অনেক স্থানই 'রাঙ্গামাটী' নামে কথিত হইয়াছে। একাধিক ক্ষেত্রে এইরূপ স্থানই বিশিষ্ট দুর্গ ও নগরনির্ম্মাণের নিমিত্ত নির্ব্বাচিত হইয়াছে; কারণ, যে ভূমির মূল দৃঢ় এবং যাহা প্লাবনসীমার ঊর্দ্ধে অবস্থিত, তাহাই স্বভাবতঃ নগর ও দুর্গের উপযোগী। এরূপ হওয়া বিচিত্র নহে যে, শশাঙ্কের সময়ে, মুর্শিদাবাদ জেলার বর্ত্তমান রাঙ্গামাটীর স্থানে কর্ণসুবর্ণ নামে একটি নগর শশাঙ্ক-শাসিত গৌড়রাজ্যের রাজধানী বলিয়া পরিগৃহীত হইত; এবং হয় ত বাঙ্গালার অধিকাংশ স্থান এবং উত্তর-পশ্চিমের সন্নিহিত প্রদেশও ঐ গৌড়রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

শশাঙ্ক।

ভিন্সেণ্ট স্মিথ বলিতে চাহেন যে, শশাঙ্ক গুপ্তরাজবংশতিলক ছিলেন। এ অনুমানের ভিত্তি কি, তাহা জানি না; কিন্তু এ অনুমান যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ইহাও স্মরণ রাখিতে হয় যে, শশাঙ্কের মহাশত্রু হর্ষও তাঁহার পিতামহীর অর্থাৎ প্রভাকরের জননীর দিক দিয়া গুপ্তরাজবংশাবতংস ছিলেন। সে যাহাই হউক, শশাঙ্ক যে তৎকালের এক জন মহান ও শক্তিশালী নৃপতি ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। মুর্শিদাবাদ হইতে মালব বহুদূরে বটে, কিন্তু তিনি যে মালবদিগের সহিত সন্ধিবদ্ধ হইয়া সুদূর থানেশ্বরের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছিলেন, এবং হর্ষের অগ্রজ ও পূর্ব্বাধিকারী রাজ্যবর্দ্ধনের নিধনসাধন করিয়াছিলেন, তাহা অবিসংবাদিত সত্য;—ব্রাহ্মণ ইতিবৃত্ত লেখক বাণ ও চৈনিক পরিব্রাজক ইউয়ান-চুয়াঙ্গ তৎসম্বন্ধে একইরূপ প্রমাণ দিয়াছেন। এই সকল বিবেচনা করিলে মনে হয়—শশাঙ্কের অধিকার এক সময়ে মালব রাজ্যের প্রান্ত পর্য্যন্ত—অথবা তৎসন্নিহিত প্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। শশাঙ্ক শৈব ছিলেন; বৌদ্ধদিগের তিনি নির্য্যাতন করিতেন; এবং বোধিগয়ায়, পাটলিপুত্রে বা পাটনায়, ও নেপাল পর্ব্বতের পাদদেশ পর্য্যন্ত প্রদেশে বৌদ্ধদিগের যে সকল শ্রদ্ধা ও ভক্তির বস্তু ছিল, তৎসমুদায় তিনি কলুষিত করিয়াছিলেন;—ইউয়ান-চুয়াঙ্গের বর্ণনা হইতে এইরূপ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

৬০৬ খৃষ্টাব্দে রাজ্যবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর হইতেই হর্ষের অব্দ আরব্ধ হইয়াছে; কিন্তু কোনও কারণে—কি কারণে তাহা প্রকাশ নাই—তাঁহার সিংহাসনারোহণ লইয়া গোলযোগ ঘটিয়াছিল, এবং তাহার পরও ছয় বৎসর কাল, অর্থাৎ ৬১২ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে তাঁহার যথাবিধি রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হয় নাই। হর্ষের সহিত

শশাঙ্কের যে সকল যুদ্ধবিগ্রহ হইয়াছিল, তাহার কোনও বিশদ লিখিত বিবরণ আমরা প্রাপ্ত হই নাই; কিন্তু শশাঙ্ক যে ৬১২ খৃষ্টাব্দেও প্রতাপশালী ছিলেন, একখানি তাম্রশাসনে তাহার প্রমাণ আছে, এবং যে ইউয়ান-চুয়াঙ্গ ৬৩০ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে আগমন করেন, তিনিও শশাঙ্ককে অত্যল্পকাল পূর্ব্বের নৃপতি বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন, এবং শশাঙ্কের কোনও উত্তরাধিকারীর নামোল্লেখ করেন নাই।

পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ও কামরূপ।

আমরা বাণ ও ইউয়ান-চুয়াঙ্গের প্রমাণমূলে জানিতে পারি যে, ৬১২ খৃষ্টাব্দ হইতে ৬৪৩ খৃষ্টাব্দ—এই দীর্ঘ ত্রিশ বৎসরকালব্যাপী রাষ্ট্রবিজয়ের দ্বারা হর্ষ উত্তর-ভারতে একটি বৃহৎ সাম্রাজ্য সংস্থাপিত করিয়াছিলেন; এবং সর্ব্বশেষে তিনি শশাঙ্ককে পরাভূত করিয়া, শশাঙ্কের রাজ্য স্বাধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন, অথবা মিত্র-রাজ্যে পরিণত করিয়াছিলেন—ইহাই সম্ভব বলিয়া বোধ হয়। ইউয়ান-চুয়াঙ্গ পৌণ্ড্রবর্দ্ধনকে হর্ষের সাম্রাজ্যের অধীন একটি মিত্ররাজ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, এবং তাহার রাজধানী পুণ্ড্রবর্দ্ধনের বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহারই বর্ণনা দৃষ্টে, মহাস্থান নামক স্থানে উক্ত নগরের অবস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বগুড়া সহরের কয়েক মাইল উত্তরে মহাস্থানে একটি প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। পরবর্ত্তী কালে, পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তি যে তাঁহাদিগের রাজ্যের একটি রাষ্ট্রবিভাগ ছিল, তাহা পালরাজগণের তাম্রশাসন হইতে প্রতিভাত হয়। ইউয়ান-চুয়াঙ্গ, হর্ষের বন্ধু ও মিত্ররাজ—ভাস্কর বর্ম্মা ও কুমার—এই উভয় নামে পরিচিত কামরূপাধিপতির উল্লেখ করিয়াছেন। তৎকালে কামরূপ রাজ্যের বিস্তৃতি কত দূর ছিল, তাহা আমরা জানি না। প্রবাদ এই যে, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর (বর্ত্তমান গৌহাটী) কামরূপের রাজধানী ছিল, এবং ইহার পশ্চিমসীমায় তিস্তা বা করতোয়া নদী বরেন্দ্রভূমি হইতে ইহাকে বিভক্ত করিত। তিস্তার প্রবাহপথের যে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহা আমরা জানি;—কতকগুলি নদীর অংশ এবং পরিত্যক্ত প্রবাহপথ (গঙ্গিনিকা) জলপাইগুড়ি, রংপুর ও বগুড়া জেলার বিভিন্ন স্থানে স্থানীয় লোকের নিকট করতোয়া নামেই পরিচিত। এ সমুদায় সম্ভবতঃ কোনও বৃহৎনদীর প্রাচীন প্রবাহপথকে চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছে। করতোয়া নামে একটি অপ্রশস্ত স্রোতোহীন নদী বগুড়া জেলার ভিতর দিয়া দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হইয়াছে। মহাস্থান ও বগুড়া সহর ইহারই পশ্চিম তীরে অবস্থিত।

কামরূপ রাজ্যের অধিকারবিস্তৃতির সর্ব্বোন্নত সময়ে, পূর্ব্বদিকে সমগ্র আসাম

উপত্যকা ও সুর্ম্মা উপত্যকা, অর্থাৎ বর্ত্তমান শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলা, এবং সম্ভবতঃ পূর্ব্ববঙ্গেরও কতকাংশ, কামরূপ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। আবার, কখনও কখনও এই প্রাচীন রাজ্যের বিস্তার উহা অপেক্ষা স্বল্পায়তন থাকিত। কুচবিহার রাজ্য একণে কামরূপ রাজ্যের বর্ত্তমান প্রতিনিধি।

হর্ষের শাসনকালের বাঙ্গালার অবস্থা।

অতএব, আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, হর্ষের রাজ্যশাসনকালের শেষভাগে, অর্থাৎ ৬৩০ হইতে ৬৪৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে, পশ্চিম ও মধ্য বাঙ্গালা—মিত্ররাজ্য-রূপেই হউক, অথবা শাসনাধীন করদপ্রদেশ-রূপেই হউক—তাঁহার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। উত্তর-পূর্ব্ব-বঙ্গ, অর্থাৎ পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজ্য, সাম্রাজ্যের মিত্র-রাজ্য ছিল, এবং হয় ত পূর্ব্ববঙ্গ ও উত্তর-বঙ্গেরও কতকাংশ যে কামরূপের অন্তর্গত ছিল, হর্ষের সহিত সন্ধিসূত্রে ও বান্ধবতাসূত্রে আবদ্ধ নৃপতি সেই কামরূপ রাজ্য শাসন করিতেন। হর্ষ-সাম্রাজ্যের সহিত বাঙ্গালার সম্পর্কের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে হইলে বুঝিয়া দেখিতে হইবে—সে সাম্রাজ্য হইতে আমরা সপ্তম শতাব্দীর বাঙ্গালার সভ্যতার অবস্থা, এবং সামাজিক ও রাজনীতিক অনুষ্ঠানাদির সম্বন্ধে কি পরিমাণ তথ্য প্রাপ্ত হই। চৈনিক পরিব্রাজক ইউয়ান-চুয়াঙ্গ হর্ষের অধিকারের বিভিন্ন স্থান (বাঙ্গালার অনেক স্থান তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল) পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন; তিনি চতুর্দ্দশ বৎসর কাল ভারতবর্ষে অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন; তাঁহারই বাক্য দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে—হর্ষের রাজত্বকালে দেশের সভ্যতার অবস্থা বেশ উন্নত ছিল; রাজ্যশাসনব্যবস্থা বিধিসঙ্গত ও মোটের উপর সুনিয়ন্ত্রিত ছিল; এবং অনুষ্ঠানাদিও কিয়ৎপরিমাণে উচ্চশ্রেণীর ছিল।

দেশের অধিবাসিবর্গ প্রধানতঃ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী, অথবা ব্রাহ্মণ্য-হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ছিল; এই উভয় ধর্ম্মের মূলমন্ত্র ও আদর্শ অত্যন্ত পরস্পর-বিরোধী। হিন্দুধর্ম্মের ন্যায় জৈন-ধর্ম্মের তাদৃশ সমাদর ছিল না। তবে পূর্ব্ববঙ্গে উহার কিছু প্রতিপত্তি ছিল। এই বিভিন্নধর্ম্মাবলম্বিগণ সাধারণতঃ নির্ব্বিরোধেই বসবাস করিতেন;—সময় সময় ধর্ম্মোন্মত্ততার আকস্মিক আবির্ভাবে শান্তিভঙ্গ হইত। সম্রাট হর্ষ বহুবার আপন ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন করিয়াছেন; কিন্তু শেষজীবনে তিনি ধর্ম্মনিষ্ঠ বৌদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার শাসনকালে, তিনি যখন যে ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন, তখন সেই ধর্ম্মের উপরই সানুগ্রহ দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু, স্থূলতঃ, পরধর্ম্মবিদ্বেষ তাঁহাতে প্রকাশিত হয় নাই—তিনি বৌদ্ধদিগের ও হিন্দুদিগের ধর্ম্ম ও দাতব্য অনুষ্ঠানে বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন।

তিব্বত ও চীনের সহিত রাজনীতিক সম্পর্ক।

৬৪৭ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে, অথবা ৬৪৮ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে হর্ষের মৃত্যু হইলে, অর্জ্জুন বা অরুণাশ্ব নামক তাঁহার জনৈক মন্ত্রী কর্ত্তৃক সিংহাসন বলপূর্ব্বক অধিকৃত হয়। ইহা হইতেই নিম্নলিখিতরূপে তিব্বতীয় ও নেপালীগণ কর্ত্তৃক বিহার আক্রমণের পথ উন্মুক্ত হয়।—হর্ষের সহিত চীনের রাজনীতিক সম্বন্ধ ছিল, এবং ৬৪৬ খৃষ্টাব্দে চৈনিকগণ স্বল্পসংখ্যক প্রতিহার সমভিব্যাহারে ওয়াং হিয়ান সি নামক এক দূতকে হর্ষের রাজসভায় প্রেরণ করেন। এই চৈনিক যাত্রিদল পাটলিপুত্রে পঁহুছিবার পূর্ব্বেই হর্ষের মৃত্যু হয়, এবং অর্জ্জুন বা অরুণাশ্ব নামক যে ব্যক্তি বলপূর্ব্বক সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন, তিনি এই চৈনিক দলের সহিত অসদ্ব্যবহার করেন, এবং তাহাদের দেহরক্ষিগণকে নিহত করেন। দূত ওয়াং-হিয়ান-সি ও তাঁহার সহিত আগত অপর এক জন চৈনিক কূটনীতিক-পুরুষ কোনরূপে নেপালে পলায়ন করেন। তৎকালে তিব্বতের সহিত নেপালের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, এবং সম্ভবতঃ নেপাল তিব্বতের আশ্রিত ছিল;—নেপালের ঠাকুরী-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা অংশুবর্ম্মন্ তিব্বতরাজ স্রোংসান্ গ্যাম্পোর সহিত আপন কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। এই স্রোংসান্ গ্যাম্পোই লাসা নগরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, এবং তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারকার্য্যে বিশেষরূপ প্রভাবসম্পন্ন ছিলেন বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। কিংবদন্তী এইরূপ যে, তিনি তরুণ যৌবনে নেপালরাজ অংশুবর্ম্মনের কন্যা রাজকুমারী ভৃকুটীকে, এবং পরে চীনসম্রাট্ তা'ই-সং-এর কন্যা রাজকুমারী ওয়ান-চাঙ্গকে বিবাহ করেন;—এই মহিলাদ্বয় ধর্ম্মনিষ্ঠ বৌদ্ধ ছিলেন, এবং তাঁহাদিগের জীবিতেশ্বরকেও তাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। তিব্বতরাজ স্রোংসান গ্যাম্পো তিব্বতে ভগবানের অবতার বুদ্ধ অবলোকিতেশ্বর, বা ত্রাণকর্ত্তা রূপে অবতারত্ব লাভ করিয়াছেন; এবং তিব্বতবাসী বৌদ্ধগণ তাঁহার দুই পত্নীর মধ্যে, নেপাল-দুহিতাকে "হরিৎ তারা" রূপে, এবং চীন-দুহিতাকে "শ্বেত তারা"-রূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগের স্মৃতি সংবর্দ্ধনা করিয়া থাকে। সুতরাং যখন চীনদূত ওয়াং-হিয়ান-সি নেপালে পলায়ন করিলেন, তখন নেপালরাজ অংশুবর্ম্মন্ ও তিব্বত-রাজ স্রোংসান গ্যাম্পো, উভয়েই তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিলেন; এবং তাঁহাকে সৈন্য সাহায্য প্রদান করিলেন;—সেই সকল সেনার নায়ক হইয়া ওয়াং-হিয়ান-সি বিহার আক্রমণ করিলেন; এবং সিংহাসনের অন্যায়াধিকারী অর্জ্জুন বা অরুণাশ্বকে

যশোবর্ম্মের বাঙ্গালা-আক্রমণ।

সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে হর্ষের মৃত্যুকাল হইতে অষ্টম শতাব্দীর শেষে প্রথম পালরাজ গোপালের রাজ্যারোহণ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার তত্ত্ব আমরা অতি অল্পই পরিজ্ঞাত আছি। হর্ষের মৃত্যুর পর তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া যায়; এবং সম্ভবতঃ পূর্ব্বের উল্লিখিত কালের মধ্যেই বাঙ্গালা দেশ কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশপতির মধ্যে বিভক্ত হইয়া পড়ে;—তাঁহারা পরস্পরের সহিত, অথবা বাঙ্গালার বহির্দ্দেশস্থ তাঁহাদিগেরই ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজন্যবর্গের সহিত প্রায়শঃই যুদ্ধবিগ্রহ করিতেন।

পরবর্ত্তী গুপ্তরাজবংশীয় আদিত্য সেন সম্বন্ধীয় একটি লিখিত প্রমাণ বর্ত্তমান আছে;—হর্ষের স্বর্গারোহণের পর তিনি মগধ অর্থাৎ দক্ষিণ বিহারে তাঁহার স্বাধীনতা সংস্থাপিত করেন। বাঙ্গালার কতকাংশ এই নৃপতি ও তাঁহার উত্তরাধিকারিবর্গের অধিকারভুক্ত থাকা অসম্ভব নহে। দ্বিতীয় জীবিত গুপ্তকেই আমরা গুপ্তবংশের শেষ নৃপতি বলিয়া জানি;—তিনি অষ্টম শতাব্দীর প্রথমভাগে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন।

কান্যকুব্জ-রাজ যশোবর্ম্ম কর্ত্তৃক বাঙ্গালার আক্রমণ খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে ঘটিয়াছিল বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে;—এই আক্রমণের বর্ণনা, অথবা উল্লেখ, যশোবর্ম্মের সভাসদ্ কবি বাক্‌পতিরাজ কর্ত্তৃক প্রাকৃত ভাষায় রচিত "গৌড়বহো" কাব্যে দৃষ্ট হয়। সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত নাটক মালতীমাধবের কবি ভবভূতিও এই যশোবর্ম্মের রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। প্রাকৃত ভাষায় "গৌড়বহো"র অর্থ "গৌড়বধ";—শ্রীযুক্ত শঙ্কর পাণ্ডুরং পণ্ডিত কর্ত্তৃক এই "গৌড়বহো" কাব্য সম্পাদিত হইয়াছে।

ঐতিহাসিক তথ্যের আধার হিসাবে এ গ্রন্থের মূল্য অতি সামান্য। কারণ, ইহাতে যশোবর্ম্ম কর্ত্তৃক বিজিত প্রদেশের অতিমাত্র পুষ্পিত, সুদীর্ঘ ও বিশদ বর্ণনা থাকিলেও, এবং ইহাতে অনেক প্রকৃত কাব্যসৌন্দর্য্যমণ্ডিত বর্ণনাদি সন্নিবিষ্ট থাকিলেও, বস্তুতঃ যশোবর্ম্মের অভিযান সম্বন্ধে বা দেশবিজয় সম্বন্ধে ইহা কোনও স্থির তথ্যই প্রদান করে না। প্রকৃতপ্রস্তাবে ইহা এতই নিরাশ করিয়া দেয় যে, যে গ্রন্থখানি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহাকে সুপণ্ডিত সম্পাদক মহাশয় বাক্‌পতিরাজ-রচিত কাব্যের গ্রন্থারম্ভ বলিয়াই অনুমান করেন।

রাজতরঙ্গিণী নামক কাশ্মীরের কবিতানিবদ্ধ ঐতিহাসিক কাহিনীতে দেখিতে পাওয়া যায়,—কাশ্মীরের প্রবলপরাক্রান্ত নৃপতি মুক্তাপীড়

বা ললিতাদিত্য কর্ত্তৃক ৭৪০ খৃষ্টাব্দে যশোবর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়াছিলেন। এই ললিতাদিত্যই মার্ত্তণ্ডে স্থাপিত অদ্যাবধি বর্ত্তমান্ সুবিখ্যাত সূর্য্যমন্দিরের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার শাসনাধিকার কাশ্মীরের সাধারণ পর্ব্বত-সীমা অতিক্রম করিয়া বহুদূর বিস্তৃত হইয়াছিল। যশোবর্ম্মের পর বজ্রায়ুধ সিংহাসনে অধিরোহণ করেন।—রাজতরঙ্গিণীতে দৃষ্ট হয়, তিনিও মুক্তাপীড়ের উত্তরাধিকারী জয়াপীড় কর্ত্তৃক পরাজিত ও সিংহাসনচ্যুত হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ইত্যবসরেই হর্ষদেব নামক জনৈক কামরূপেশ্বর বাঙ্গালা দেশ আক্রমণ করিয়া থাকিবেন। এতৎসম্বন্ধীয় প্রমাণ নেপালরাজ জয়দেবের একটি লেখের (৭৫৮ খৃষ্টাব্দ) উপর নির্ভর করিতেছে। তাহাতে লিখিত আছে যে, তিনি হর্ষদেবের দুহিতার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই লেখে হর্ষদেব "গৌড়-উড্র-কলিঙ্গ-কোশলেশ্বর" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। গৌড় বলিতে, আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, উত্তর-বঙ্গকে, অথবা হয় ত সমগ্র বঙ্গদেশকেই বুঝাইত। উড্র অর্থে উড়িষ্যা, কলিঙ্গ অর্থে মান্দ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত বর্ত্তমান উত্তর-সরকার নামক ভূভাগ, এবং কোশল অর্থে উড়িষ্যার পশ্চিমস্থ পার্ব্বত্যপ্রদেশ, যাহার ভিতর এক্ষণে নানা করদরাজ্য অবস্থিত। প্রাগুক্ত লেখ হইতে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সিদ্ধান্ত করেন যে, কামরূপরাজ হর্ষদেব উল্লিখিত সমুদয় দেশ সম্যকরূপে জয় করিয়া তাহা আপনার শাসনাধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু ভারতীয় নৃপতিবৃন্দের উৎপ্রেক্ষাবহুল প্রশস্তির যেরূপ সাবধানে অর্থগ্রহণের প্রয়োজন, ইতিপূর্ব্বে নিবেদন করিয়াছি, তাহা বিবেচনা করিয়া, উপরিলিখিত সিদ্ধান্তকে সম্পূর্ণ নিরাপদ বলিয়া মনে করা যায় না। রাজতরঙ্গিণীর একটি প্রণয়-কাহিনীতে পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগরের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। তথায় বর্ণিত হইয়াছে, কাশ্মীরাধিপতি জয়াপীড় কাশ্মীর পরিত্যাগপূর্ব্বক অভিযানে বহির্গত হইলে তাঁহার শ্যালক কৌশলে সিংহাসন অধিকার করেন; পরে সৈন্যসামন্ত জয়াপীড়ের পক্ষ ত্যাগ করিলে, জয়াপীড় প্রথমে প্রয়াগে (বর্ত্তমান এলাহাবাদ) গমন করেন, এবং তৎপরে একাকী ছদ্মবেশে পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে গিয়া কিছুকাল লুকাইয়া থাকেন। অবশেষে তাঁহার প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ হইয়া পড়ে, এবং পুণ্ড্রবর্দ্ধনরাজ জয়ন্ত তাঁহাকে কন্যাদান করেন; জয়াপীড় পুণ্ড্রবর্দ্ধনাধিপতিকে পঞ্চগৌড়-রাজগণের পরাজয়ে সহায়তা করেন। এবং সমগ্র দেশের অধীশ্বররূপে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইউয়ান-চুয়াঙের বিবরণ-অনুসারে যে পুণ্ড্রবর্দ্ধনের স্থান বগুড়ার নিকট বর্ত্তমান

মহাস্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে, সেই পুণ্ড্রবর্দ্ধন রাজতরঙ্গিণীতে সুন্দর ও সুশাসিত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। রাজা জয়ন্ত সম্বন্ধে অপর কোনও লিখিত প্রমাণ নাই, এবং ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ কতকটা সঙ্গত কারণেই, এ কাহিনীকে নিতান্তই উপকথা বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। কিন্তু যে রাজবংশাবলীর ইতিবৃত্ত বহু ঐতিহাসিক তথ্যের আকর বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, তাহারই একাংশকে এরূপ ভাবে উড়াইয়া দেওয়াও কঠিন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় জয়াপীড়ের পুণ্ড্রবর্দ্ধন-গমন ও রাজা জয়ন্তের সহিত তাঁহার সম্পর্কের বিবরণকে সত্য বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন; এবং তাঁহারা ইহাও বিশ্বাস করেন বলিয়া মনে হয় যে,—যে কামরূপাধিপতি হর্ষদেব বাঙ্গালা বিজয় করিয়াছিলেন, জয়াপীড় সেই হর্ষদেবের অধীনতা-শৃঙ্খলের উন্মোচনে জয়ন্তকে সহায়তা করিয়াছিলেন।

কিন্তু সে বাঙ্গালা-বিজয়ের কোনও নিশ্চিত প্রমাণ নাই, এবং রাজতরঙ্গিণীতে কামরূপাধিপ হর্ষদেবেরও কোনও উল্লেখ নাই। রাজতরঙ্গিণীতে এইরূপ লিখিত আছে যে, জয়ন্ত পঞ্চগৌড়রাজকে পরাভূত করিয়া স্বয়ং সমগ্র দেশের রাজাধিরাজ হইয়াছিলেন। ইহার অর্থ হয় ত এইমাত্র যে—বাঙ্গালা তৎকালে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজন্যবর্গের মধ্যে বিভক্ত ছিল, জয়ন্ত তাঁহাদিগের উপর প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন।

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর পূর্ব্বার্দ্ধে পঞ্জাবের সমতল প্রদেশের প্রভূত অংশ প্রবল-পরাক্রান্ত নৃপতি মুক্তাপীড় বা ললিতাদিত্য-শাসিত কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্গত ছিল, এবং এই সুদূরবিস্তৃত কাশ্মীর রাজ্যের সহিত ইহার পূর্ব্বসীমান্তস্থিত কান্যকুব্জ রাজ্যের দ্বন্দ্ব ও বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল—ইহা আমরা প্রমাণিত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। প্রমাণের মূল্য যাহাই হউক না কেন, গৌড়বহো হইতে এ প্রমাণও আমরা পাইতেছি যে, খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে কান্যকুব্জাধিপ যশোবর্ম্ম কর্ত্তৃক বাঙ্গালা আক্রান্ত হয়; এবং পরে এই যশোবর্ম্মই কাশ্মীররাজ মুক্তাপীড়ের হস্তে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়েন। এরূপ অবস্থায়, মুক্তাপীড়ের উত্তরাধিকারী জয়াপীড় যদি উত্তর-বঙ্গের মণ্ডলেশ্বরগণের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া তদেক-পরিচালিত সামন্ত-সঙ্ঘের উদ্বোধন করিয়া থাকেন, তাহা বিশেষ বিস্ময়কর নহে। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে হর্ষের মৃত্যুকাল হইতে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা সম্বন্ধে এইটুকুমাত্রই আমাদিগের জানা আছে। লেখমালা দৃষ্টে যেরূপ বুঝিতে পারা যায়, তাহাতে এইরূপ সময়েই গুর্জ্জর-রাজ

বৎস কান্যকুব্জ ও বাঙ্গালা আক্রমণ করেন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বৎস কর্তৃক বঙ্গ-বিজয়ের উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু আমার বিবেচনায়, লেখমালা দেখিয়া সফল আক্রমণের অতিরিক্ত আর কিছু নিঃসন্দেহে অনুমান করা যাইতে পারে না। দাক্ষিণাত্যে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রকূট-রাজবংশের লেখমালা হইতে দৃষ্ট হইবে যে, বাঙ্গালা-আক্রমণের অত্যল্পকাল পরেই উক্ত রাজবংশের তৃতীয় গোবিন্দ কর্তৃক বৎস আক্রান্ত ও পরাজিত হইয়া রাজপুতানার মরুক্ষেত্রে বিতাড়িত হইয়াছিলেন।

বাঙ্গালার রাজ-নির্ব্বাচন।

এই সন্ধিক্ষণে, বাঙ্গালার পাল-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। আমি বাঙ্গালার পাল-রাজবংশ বলিলাম, তাহার হেতু এই যে,—পরবর্ত্তী কালে কান্যকুব্জেও এক পাল রাজবংশ বিদ্যমান ছিল, এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশের নৃপতি ও সামন্ত রাজগণের নামের সহিতও পাল শব্দ যুক্ত থাকিত। গোপালের পিতা ও পিতামহের নাম জানিলেও, আমরা তাঁহার বংশের উদ্ভব-বৃত্তান্ত অবগত নহি। কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে একটি কৌতূহল-কর তথ্য আমাদিগের জানা আছে,—তিনি নির্ব্বাচনমূলে সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন। মালদহ জেলায় খালিমপুর গ্রামে প্রাপ্ত একখানি তাম্রশাসন হইতে এই তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়, এবং খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে লামা তারানাথ কর্তৃক তিব্বতীয় ভাষায় লিখিত বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসের দ্বারাও ইহা সমর্থিত হইয়াছে। বাঙ্গালা ও তিব্বতের বৌদ্ধগণের মধ্যে যে বহু শতাব্দী ধরিয়া ঘনিষ্ঠ সংযোগ বর্ত্তমান ছিল, তাহা সর্ব্বজনবিদিত; এবং তারানাথ সম্ভবতঃ তিব্বতের বৌদ্ধবিহারে সংরক্ষিত রাজবংশেতিহাসের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। সুতরাং উহাকে এ বিষয় সম্বন্ধে বিশেষ মূল্যবান্ প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

বাঙ্গালীর সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার মূল প্রকৃতি।

গোপাল নির্ব্বাচন-মূলে সিংহাসন প্রাপ্ত হয়েন, এই বৃত্তান্তে নির্ভর করিয়া অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় তর্ক তুলিয়াছেন যে,—"পালরাজশক্তির মূলে সাধারণ-তন্ত্রের প্রভাব বর্ত্তমান ছিল"; এবং রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন যে—"গোপাল জনসাধারণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন"। কাহারা নির্ব্বাচন করিয়াছিল, বা নির্ব্বাচনকার্য্য কিরূপ ভাবে সম্পন্ন হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে কোনও বিশদ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। খালিমপুর তাম্রশাসনে 'প্রকৃতি' শব্দের

বহুবচন 'প্রকৃতিভিঃ' ব্যবহৃত হইয়াছে। সংস্কৃত 'প্রকৃতি' শব্দের একটি অর্থ —রাজ্যের অঙ্গসমূহ, যথা—রাজা, অমাত্য, প্রজা ইত্যাদি। ক্যাপেলার-সঙ্কলিত সংস্কৃত-অভিধান হইতে ইহা উদ্ধৃত হইল। আমরা এরূপ অনুমান করিলেও করিতে পারি যে, গোপালের নির্ব্বাচন কোনও ক্রমেই সাধারণ-তন্ত্রের নির্ব্বাচন ছিল না; সম্ভবতঃ, সামন্তরাজগণ ও বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক সে নির্ব্বাচন নিষ্পন্ন হইয়াছিল। তাম্রশাসনে লিখিত আছে—দেশের অশাসন বা অরাজকতা বিদূরিত করিবার উদ্দেশ্যেই এই নির্ব্বাচন কার্য্য সম্পন্ন হয়। দেশের যে অবস্থা দূর করিবার নিমিত্ত গোপালের নির্ব্বাচন সংকল্পিত হইয়াছিল, তাহার বর্ণনার নিমিত্ত "মাৎস্য-ন্যায়" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।—ইহার আক্ষরিক অনুবাদ করিতে হইলে ইহাকে মৎস্যের ন্যায় ব্যবস্থা বা অবস্থা বলিতে হয়। কিন্তু এই সুপরিচিত শব্দের অর্থ একটু আলোচনা করিয়া দেখা সঙ্গত। অর্থশাস্ত্র নামে পরিচিত সুপ্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে অন্যান্য বিষয়ের আলোচনার সহিত রাজনীতি-বিজ্ঞানের আলোচনাও স্থান পাইয়াছে। এই সকল গ্রন্থের প্রণেতৃগণ দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন-ক্ষম প্রবল কেন্দ্রগত শক্তির প্রয়োজন আছে বলিয়া বিশিষ্ট ভাবে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। যে দেশে বা রাজ্যে ঐরূপ প্রবল কেন্দ্রগত শক্তি নাই, তাহার অবস্থা অরাজকতা বা বিশৃঙ্খলা বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছে,—এবং এই অরাজকতা বা বিশৃঙ্খলার বিশিষ্ট প্রকৃতি এই যে, বৃহৎ মৎস্য যেমন ক্ষুদ্র মৎস্যকে গ্রাস করে, সেইরূপ, প্রবলই দুর্ব্বলের ভক্ষক হইয়া দাঁড়ায়। সৃষ্টির অন্যান্য বিভাগ অপেক্ষা মৎস্য জাতির ভিতরই প্রবল কর্ত্তৃক দুর্ব্বল-ভক্ষণ-প্রথা বিশেষভাবে প্রচলিত কি না, তাহা আমি নিশ্চয় জানি না; কিন্তু অর্থশাস্ত্রসম্বন্ধীয় প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে, প্রবল কেন্দ্র-শক্তির অভাব-জনিত অরাজক অবস্থার বর্ণনের নিমিত্ত এই উপমাই ব্যবহৃত হইয়াছে।

গোপালের গৌড়াধিপ-রূপে নির্ব্বাচনকালে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে, উত্তর-ভারতের সাধারণ রাজ-নৈতিক অবস্থা কিরূপ ছিল, তৎসম্বন্ধে এ স্থলে উপস্থিত প্রমাণের আলোচনা করিয়া দেখা মন্দ নহে। তৎকালে গুর্জ্জর বা গুজরগণ কর্ত্তৃক পঞ্জাবের কিয়দংশ ও রাজপুতানা লইয়া একটি শক্তিশালী প্রবল রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল, এবং আবু পর্ব্বতের সন্নিহিত ভিনমাল তাহাদিগের রাজধানী ছিল। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে যাহারা উত্তর-ভারত আক্রমণ করিয়াছিল, গুর্জ্জরগণ সেই সকল হূণ বা তদ্বংশ্যত জাতি হইতে সমুদ্ভূত। গুর্জ্জর-

দক্ষিণে ছিল রাষ্ট্রকূটের রাজধানী নাসিক। এ রাজ্য দাক্ষিণাত্যের কতকাংশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, এবং বর্ত্তমান গুজরাটে ইহার একটি শাখা বিস্তৃত হইয়াছিল। রাষ্ট্রকূটগণের যে কোথা হইতে উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। কিন্তু ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ অনুমান করেন যে,—দাক্ষিণাত্যের কোনও মৌলিক জাতি হইতে তাঁহারা উদ্ভূত হইয়া থাকিবে। রাষ্ট্রকূটগণের সহিত গুর্জ্জরদিগের যুদ্ধ বিগ্রহ লাগিয়াই থাকিত। তৎসত্ত্বেও গুর্জ্জরগণ পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইয়া ভয়প্রদর্শন করিত, এবং সময়ে সময়ে কান্যকুব্জ ও বাঙ্গালা আক্রমণ করিত। এই সময়ে কাশ্মীরের শক্তির হ্রাস ঘটে, এবং কাশ্মীর আর অতঃপর উত্তর-ভারতের রঙ্গমঞ্চে কোনও মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে নাই। আমরা দেখিয়াছি, গোপালের রাজ্যাভিষেকের কিয়ৎকালপূর্ব্বে গুর্জ্জরগণ বাঙ্গালা আক্রমণ করিয়াছিল। কিন্তু পরে গুর্জ্জরগণ রাষ্ট্রকূটগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হওয়ায় কিয়ৎকালের নিমিত্ত তাহাদের শক্তির ও গৌরবের যে লাঘব ঘটিয়াছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এইরূপ অবস্থায়, বাঙ্গালার প্রথম পালরাজগণ যে দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূটগণের সহিত সন্ধিসূত্রে ও বন্ধুত্বসূত্রে সম্মিলিত হইয়াছিলেন, তাহা বিস্ময়কর নহে।

গুর্জ্জর রাজ্যের পশ্চিমে, হক্রা বা বাহিন্দা নামক নদীর বিলুপ্ত প্রবাহপথের দ্বারা ব্যবহিত সিন্ধুদেশ, খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে আরবগণ কর্ত্তৃক বিজিত হইয়া, তদবধি মুসলমান-শাসনাধীন ছিল। গুর্জ্জরগণের সহিত সিন্ধুদেশবাসী মুসলমানদিগের নিয়তই যুদ্ধ বিগ্রহ হইত। কিন্তু রাষ্ট্রকূটগণের সহিত শেষেও মুসলমানগণ সম্প্রীতি রক্ষা করিত, এবং রাষ্ট্রকূট রাজ্যে যে সকল বন্দর ছিল, মুসলমান ব্যবসায়ী ও পর্য্যটকগণ তাহাতে অবাধে প্রবেশ করিতে পারিত। ভারতভূমির ঐ সকল প্রাচীন মুসলমান ঔপনিবেশিকগণ রাষ্ট্রকূটদিগের বন্ধু, এবং কখনও বা সন্ধিবদ্ধ মিত্র ছিলেন; এবং এই রাষ্ট্রকূটদিগের সহিত তাৎকালিক বাঙ্গালীদিগের সন্ধিসূত্রে মিত্রতা ছিল। আমার এই ঐতিহাসিক চিত্রকে সম্পূর্ণ করিবার নিমিত্ত বলিতে পারি,—কাশ্মীররাজ জয়াপীড় যে বজ্রায়ুধকে পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত করেন, তাঁহারই উত্তরাধিকারী ইন্দ্রায়ুধ তৎকালে কান্যকুব্জের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন।

গোপালের রাজত্ব সম্বন্ধে ইহার অধিক কিছুই জানি না। কিন্তু তাঁহার পুত্র ও উত্তরাধিকারী ধর্ম্মপালের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে যাহা জানি, তাহা হইতেই অনুমান হয় যে গোপালের রাজত্বকালে সুখসমৃদ্ধিপূর্ণ ছিল, এবং পৌণ্ড্র ...

তিনি মগধ পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিয়া গৌড়ের রাজশক্তিকে সুদৃঢ় করিয়া তুলিয়াছিলেন। গোপাল ও তাঁহার পরবর্ত্তী বাঙ্গালার পালরাজগণ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, এবং তাঁহাদিগের শাসনকালে, বৌদ্ধধর্ম্মই বাঙ্গালার বহুতর লোকের ধর্ম্ম ছিল।—ধরিতে গেলে, বৌদ্ধধর্ম্মই রাজানুপালিত ধর্ম্ম ছিল। কিন্তু পালরাজগণ ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্ম্মের বিদ্বেষী ছিলেন না। ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্ম্মের নিমিত্তও তাঁহারা বৃত্তি প্রদান করিতেন; এবং তাঁহাদিগের আমলে, ঐ উভয় ধর্ম্ম পাশাপাশি নির্ব্বিরোধে অবস্থান করিত।—ইতিহাসের অতিপ্রাচীন যুগ হইতে উত্তরভারতেও সাধারণতঃ এইরূপই দেখিতে পাওয়া যায়। আধুনিক ক্ষুদ্র বিহার নগরের ভূমির উপর এক সময়ে যে উদ্দণ্ডপুরের সুবৃহৎ বিহার দণ্ডায়মান ছিল, কিংবদন্তীতে গোপালই তাহার প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন।

শ্রীবিমলাচরণ মৈত্রেয়।

বঙ্গসাহিত্য ও মুসলমান। *

বঙ্গভাষাকে নূতন ছাঁচে ঢালিবার জন্য আজ কাল বাঙ্গালার পণ্ডিতমণ্ডলে বা সাহিত্যসমাজে বিশেষ কল্পনা চলিতেছে, দেখা যায়। কেহ কেহ ভাষা হইতে বিদেশীয় শব্দগুলি বর্জ্জিত করিয়া, ইহাকে একেবারে নূতন আকারে পরিবর্ত্তিত করিতে চাহেন। কেহ কেহ আবার বঙ্গভাষার পুষ্টিসাধন, অঙ্গসৌষ্ঠব ও শব্দসম্পদ-বৃদ্ধির জন্য আরও অধিক বিদেশীয় শব্দ বা পরিভাষা ইহাতে সংযুক্ত করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। শেষোক্ত দলের মধ্যে বঙ্গদেশের মহাস্থবির পণ্ডিতাগ্রগণ্য মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এক জন। তিনি অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন-সভার সভাপতির অভিভাষণে বলিয়াছেন যে, "যাহা চলতি, যাহা সকলে বুঝে, তাহাই চালাও; যাহা চলতি নয়, তাহাকে আনিও না। যাহা চলতি, তাহা ইংরাজী হউক, পার্শী হউক, সংস্কৃত হউক,—চলুক।"

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, কোনও ভাষার পুষ্টিসাধন করিবার প্রয়োজন হইলে, তাহাতে বহুল যোগ্য—appropriate বিদেশীয় শব্দের ব্যবহার আবশ্যক হয়; নচেৎ ভাষা অঙ্গহীন হইয়া থাকে। কারণ, আমরা দেখিতে পাই যে, সকল

ভাষাতেই কিছু না কিছু বিদেশীয় শব্দ মিশ্রিত হইয়াছে। এই যে ইংরাজী ভাষা, যাহাকে এক্ষণে বিশ্বজনীন ভাষা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, এবং যে ভাষায় এক্ষণে মানবের হিতকর উচ্চতম জ্ঞান-শাস্ত্রের যাবতীয় গ্রন্থাদি প্রচুর-পরিমাণে রচিত হইয়াছে, সেই ইংরাজী ভাষায় যে কত শত বিদেশীয় শব্দ বিদ্যমান তাহা পণ্ডিতমাত্রই অবগত আছেন। কই, এ পর্য্যন্ত কোনও ইংরাজ পণ্ডিতও আপনার দেশের এরূপ গৌরবান্বিত ভাষা হইতে বিদেশীয় শব্দ বর্জ্জিত করিবার কিছুমাত্র চেষ্টা করেন নাই! বরং তাঁহারা অন্যান্য ভাষা হইতে আরও অনেক পরিভাষা বা শব্দ গ্রহণ করিয়া মাতৃ-ভাষার অঙ্গসৌষ্ঠববৃদ্ধি ও পুষ্টিসাধন করিয়াছেন। যাহাকে ভারতবাসীরা সংস্কৃত ভাষা বলেন, সেই সংস্কৃত ভাষায় যে তৎকালীন চলিত ভাষার অন্তর্গত অন্য কোনও শব্দ বা পরিভাষা নাই, তাহাও নহে। সংস্কৃত বলিলে এই বুঝায় যে, যেন প্রাচীন ভারতীয় পণ্ডিতদিগের সময় অন্যান্য ভাষা চলিত ছিল; তাঁহারা সেই ভাষা হইতে বিবিধ শব্দ বা পরিভাষা আবশ্যকমত গ্রহণ করিয়া, মার্জ্জিত করিয়া, অন্য একটি ভাষার সৃষ্টি করিয়াছিলেন; সেই মার্জ্জিত ভাষা একটি নূতন ভাষায় পরিণতি লাভ করিয়াছে। কারণ, সংস্কৃত অর্থে মার্জ্জিত বলিয়াই বোধ হয়। অতএব, এই সংস্কৃত ভাষায় প্রাকৃত, পালি প্রভৃতি ভাষার শব্দ যে একেবারেই মিশ্রিত নাই, এ কথা বলা যায় না। সংস্কৃত ভাষায় ব্যবহৃত 'হোরা' শব্দ গ্রীক ভাষা হইতে গৃহীত হইয়াছে।

যাহা হউক, প্রথমোক্ত-দলভুক্ত পণ্ডিতগণ,—অর্থাৎ যাঁহারা বিদেশীয় শব্দ বঙ্গভাষা হইতে বহিষ্কৃত করিবার প্রয়াসী—বঙ্গভাষা হইতে মুসল-মানী ভাষার শব্দগুলি পরিত্যাগ করিয়া নিরবচ্ছিন্ন খাঁটী বঙ্গশব্দ ব্যবহার করিতে একান্ত ইচ্ছুক। বিশেষতঃ, তাঁহারা মুসলমানদিগের দ্বারা কথিত বাক্যগুলির ব্যবহার ঘৃণার চক্ষেই দেখেন বলিয়া বোধ হয়। একটি দৃষ্টান্ত হইতেই তাহা অনায়াসে বুঝা যায়। ১৩২২ সালের বৈশাখ মাসের 'প্রবাসী'তে জনৈক মুসলমান লিখিত একখানি গ্রন্থের সমালোচনায় এইরূপ লিখিত হইয়াছে —"কোন মুসলমানের বাংলা রচনা পড়িতে বসিলেই আশঙ্কা হয়, না জানি উর্দ্দূ-ফার্সির কদর্য্য অপভ্রংশ মিশ্রিত হইয়া, বাংলা ভাষা তাহাতে কি অপূর্ব্ব আকার ধারণ করিয়াছে।…ইহার ভাষায় একটুকুও জটিলতা কিম্বা উর্দ্দূ-ফার্সি মুদ্রাদোষ নাই।"

অন্য একখানি গ্রন্থের সমালোচনায় সমালোচক বলিয়াছেন যে,—"গ্রন্থকারের ভাষায় এমন কয়েকটী কথা ব্যবহৃত হইয়াছিল, যাহা বাংলায় অচল। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি, তিনি জল না লিখিয়া লিখিয়াছেন পানি।" অতঃপর উক্ত সমালোচক মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রাগুক্ত বাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন,—"যাহা চল্‌তি, তাহা চালাও" ইত্যাদি। পানি শব্দ কি একেবারেই অচল? আজিকালিকার খাঁটী বাঙ্গালা দেশের অধিবাসীর সংখ্যা ৪ কোটী ৫১ লক্ষ। তন্মধ্যে ২ কোটী ৪২ লক্ষ মুসলমান। অতএব, এই ২ কোটী ৪২ লক্ষ, অথবা অর্দ্ধেক বঙ্গবাসী পানি শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাহা হইলে 'পানি' শব্দ চলতি নহে কিরূপে? কিরূপেই বা ইহাকে কদর্য্য অচলতি শব্দ বলা যায়?

যদিও বাঙ্গালার আজিকালিকার মুসলমান লেখকেরাও প্রবন্ধাদি লিখিবার সময় পানির পরিবর্ত্তে জল শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন, তথাপি তাঁহারা স্ব স্ব গৃহে পানি শব্দই ব্যবহার করেন। পানি কথাও যে একেবারেই অশুদ্ধ, অশ্রাব্য, বা অশ্লীল, তাহাও নহে। হিন্দুদিগের প্রাচীন গ্রন্থাদিতেও পানি কথার উল্লেখ দেখা যায়। এমন কি, 'প্রবাসীর' প্রচারিত নূতন রামায়ণেও স্থানে স্থানে পানি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বাঙ্গালার বহির্ভূত উত্তর-পশ্চিম প্রদেশেও (বিশেষতঃ এই বেহার অঞ্চলে, যেখানে আজ বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন হইতেছে, এখানেও) মুসলমান ছাড়া হিন্দুরাও জলের পরিবর্ত্তে 'পানি' শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। এক্ষণে কথা এই যে, যখন কেবলমাত্র এক পানি শব্দ লইয়াই হিন্দু শিক্ষিতসম্প্রদায়ের মধ্যে মতভেদ দেখা যাইতেছে, তখন মনে করা যায়, অবশ্যই মুসলমানদিগের এরূপ লেখায় হিন্দু লেখকগণের বিশেষ অশ্রদ্ধার ভাব বিদ্যমান। অতএব এমন একটি ব্যবস্থা হওয়া চাই যে, যাহাতে সকলে লিখিবার সময় একই শব্দ ব্যবহার করেন; অথবা এরূপ লেখার প্রতিবাদ না করেন। কিন্তু তাই বলিয়া যে বহুকাল হইতে বঙ্গভাষায় প্রচলিত আরবী, পার্সী, বা উর্দ্দু শব্দ বাদ দেওয়া চলে, তাহা আমার বোধ হয় না। কারণ, এমন কতকগুলি পরিভাষা বা শব্দ এরূপ চলিত হইয়া গিয়াছে যে, সেগুলি বঙ্গভাষার মজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছে। সেগুলির প্রতি-শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় আছে কি না সন্দেহ। যদিও সাহিত্য-পরিষদের চেষ্টায় নূতন নূতন শব্দের সৃষ্টি হইতেছে, তথাপি কতকগুলি কথা একেবারেই বাদ দেওয়া চলে না বলিয়াই মনে হয়। বঙ্গদেশের বিচারালয়ে ব্যবহৃত কতক-

গুলি কথাই ইহার দৃষ্টান্ত। যথা,—(১) আদালত, (২) হাকিম, (৩) মুন্সেফ, (৪) উকীল, (৫) মোক্তার, (৬) নাজির, (৭) পেশকার, (৮) সেরেস্তাদার, (৯) আর্জী, (১০) জারি, (যেমন সমনজারি, ডিক্রিজারি ইত্যাদি) (১১) ছানি. (১২) মোকাদ্দমা, (১৩) নালিশ, (১৪) পরওয়ানা, (১৫) মুলতুবী, (১৬) রায়, (১৭) দলীল, (১৮) নকল, (১৯) মেয়াদ, (২০) ওয়াদা, (২১) হলফ, (২২) আইন, (২৩) তদ্বীর, (২৪) জবানবন্দী, (২৫) দেওয়ানী, (২৬) ফৌজদারী, (২৭) পাট্টাকবুলিয়ৎ, ইত্যাদি।

যদি আদালতের স্থলে বিচারালয় ও ধর্ম্মাধিকরণ, হাকিমের স্থলে বিচারপতি, বিচারকর্ত্তা ও বিচারক, মোকদ্দমার স্থলে ব্যবহার, আইনের স্থলে ব্যবস্থা, উকীলের স্থলে ব্যবহারাজীবী বা ব্যবহারজ্ঞ বলা যায়, (অবশ্যই লেখা যাইতে পারে) তাহা হইলে, তাহা যে সাধারণ লোকের সহজে বোধগম্য হইবে, তাহা বোধ হয় না, এবং সাধারণ লোকে তাহা ব্যবহার করিতেই পারিবে না। আর, ইহাতে ভাষার মাধুর্য্য ও প্রাঞ্জলতা যে নষ্ট হইয়া যাইবে, তাহাতেও কোনও সন্দেহ নাই। কারণ, আজ কাল সকলেই সরল বাঙ্গালা লিখিবার পক্ষপাতী হইয়াছেন।

'অদ্য আদালতে আমরা উকীল হাকিমের সম্মুখে আমার মোকদ্দমায় সাক্ষীর জেরা করিয়াছিলেন', না বলিয়া, 'অদ্য বিচারালয়ে আমার ব্যবহারাজীব বিচারপতির সম্মুখে আমার সাক্ষীর সাক্ষ্যে 'কূট-প্রশ্ন' করিয়াছিলেন, যদি এরূপ বলি, তাহা হইলে, শুনিতেই বা কিরূপ কট-মট হয়, আর কতবারই বা এরূপ চলিতে পারে? এই জন্য বলিতে হয়, 'যাহা চলতি—চলুক'। তাহাতে আপত্তি কেন? বিশেষতঃ, ভাষাকে এরূপ ভাবে মার্জ্জিত করা চাই, যাহা সর্ব্বসাধারণ সহজে বুঝিতে পারে। যাহা সাধারণের পক্ষে দুরূহ, এমন ভাষার সৃষ্টি প্রার্থনীয় নহে। বাঙ্গালা ভাষায় এমন অনেক ভিন্ন ভাষার শব্দ প্রচলিত হইয়া গিয়াছে যে, যাহা আর পরিত্যাগ করা চলে না। যদি মুসলমানী শব্দের বর্জ্জনই বাঙ্গালার পণ্ডিতগণের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে, যে সকল ইংরাজী শব্দের বাঙ্গালা প্রতিশব্দ আছে কি না, জানা যায় না, কিরূপে তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করা চলিবে? আজ কাল দেখিতে পাওয়া যায় যে, সুদূর পল্লিবাসিনী রমণীরাও টাইন (time), লেট (Late) ইত্যাদি ইংরাজী কথা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

অতএব, বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি করিতে হইলে, বাঙ্গালা ভাষায় অন্যান্য ভাষার

আবশ্যক পরিভাষা ও শব্দের সংযোগ করিয়া ভাষার পুষ্টিসাধন করা উচিত। বহুকাল হইতে অন্যান্য ভাষার যে সকল শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় চলিয়া আসিতেছে, তাহা বর্জ্জন করিয়া, আবার নূতন শব্দের সংযোজন করিলে, ভাষার উন্নতি সাধিত না হইয়া, বরং তাহা আদি সৌষ্ঠবে বঞ্চিত ও মাধুর্য্যবিহীন হইয়া পড়িবে। অতএব, যাহা চলিতেছে, তাহা চলুক; তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবার আবশ্যকতা নাই।

বরং বিজ্ঞান, দর্শন, উচ্চগণিত প্রভৃতি মানবের অতি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ সকল বাঙ্গালায় অনুবাদ করিবার উদ্দেশ্যে যে সকল পরিভাষা আবশ্যক, তাহার সৃষ্টি করিয়া, বা অন্যান্য ভাষা হইতে গ্রহণ করিয়া, বাঙ্গালা ভাষায় ঐ সকল বিষয়ের গ্রন্থাদি লিখিয়া বা অনুবাদ করিয়া, বাঙ্গালা ভাষার পুষ্টিসাধন করা একান্ত আবশ্যক।

অতঃপর ক্রমশঃ যাহাতে ঐ সকল বিষয়ের অনূদিত গ্রন্থাদি বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তক রূপে গৃহীত হয়, তদ্বিষয়ে বড় বড় সাহিত্যিকের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণের চেষ্টা করা নিতান্ত আবশ্যক।

যদি উচ্চগণিত, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি মানবের হিতকর পাশ্চাত্য ও জ্ঞানশাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থাদি, যাহা এক্ষণে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠ্য, তাহা বাঙ্গালা ভাষায় অনূদিত বা রচিত হইয়া, বঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালা ভাষার যথেষ্ট উন্নতি হইতে পারে।

ইংরাজী ভাষায়ও বহুসংখ্যক বিভিন্ন ভাষার শব্দ মিলিত করিয়া ঐ ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করা হইয়াছে। অনেকেই হয় ত বলিবেন যে, ইংরাজী ভাষা খাঁটী ভাষা নহে; এ ভাষাটী মিশ্রিত ভাষা। ইহা সম্পূর্ণ সত্য যে, ইংরাজী ভাষা মিশ্রিত ভাষা। কিন্তু ইংরাজী ভাষা গ্রীক্, ল্যাটিন, ফ্রেঞ্চ, জার্ম্মাণ, আরবী, পার্শী, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষা হইতে গৃহীত শব্দ মিশ্রিত ভাষা হইলেও, কেহই ইংরাজী ভাষাকে ইংরাজী না বলিয়া, গ্রীক, ল্যাটিন, আরবী, বা অন্য কোনও ভাষা বলেন না। সকলেই ইংরাজী ভাষাই বলিয়া থাকেন। সেইরূপ, যদি বাঙ্গালা ভাষার আদি-সৌষ্ঠব অক্ষুণ্ণ রাখিবার ও শব্দ-সম্পদবৃদ্ধির জন্য বিজাতীয় ভাষা হইতে আবশ্যক পরিভাষা বা শব্দ গ্রহণ করা হয়, এবং বাঙ্গালা ভাষা এইরূপ মিশ্রিত ভাষা হইয়াও, একটি উন্নত ভাষায় পরিণত হয়, তাহাতে দোষ কি? কেহই এরূপ গঠিত ভাষাকে বাঙ্গালা ভাষা ব্যতীত অন্য কোনও ভাষা বলিবেন না।

জাতীয় ভাষা গঠন করিতে হইলে বাঙ্গালার দুইটী বিভিন্ন জাতির মিলন আবশ্যক। বাঙ্গালা ভাষা, হিন্দু ও মুসলমান—বাঙ্গালার এই দুই প্রধান জাতির মাতৃভাষা। অতএব, এক জনকে ছাড়িয়া অপর জন জাতীয় ভাষার উন্নতি করিতে পারেন না। যদি হিন্দুরা মুসলমানদিগকে ছাড়িয়া খাঁটী বাঙ্গালা ভাষার গঠন বা উন্নতিসাধন করেন, তাহা হইলে মুসলমানেরাও হিন্দুদিগকে ছাড়িয়া মুসলমানী বাঙ্গালা ভাষা গঠিত করিতে পারেন। কারণ, এই বাঙ্গালা দেশের অধিবাসীর অর্দ্ধেক মুসলমান। কিন্তু এরূপ ভেদ উপস্থিত হইলে জাতীয় ভাষার গঠন সম্ভব হয় না; বরং মধ্যে গভীর বিচ্ছেদ-সাগরের উৎপত্তি হয়। যাহাতে হিন্দু মুসলমান মিলিয়া মিশিয়া ভাষার উন্নতিসাধনে অগ্রসর হন, তাহার চেষ্টা করাই সাহিত্যরথিগণের অথবা সাহিত্য-সম্মিলনের উচিত।

যদিও সাহিত্য-সম্মিলন-সভায় যোগদান করিবার জন্য মুসলমান সাহিত্যিকদিগকে অনুগ্রহপূর্ব্বক আহ্বান করা হয়, কিন্তু ইহাতে মুসলমান সাহিত্যিকগণের স্থান বড়ই সঙ্কীর্ণ। হিন্দুরা যে মুসলমানদিগকে আহ্বান করেন, তজ্জন্য মুসলমানেরা তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ। কারণ, মুসলমান না হইলেও তাঁহাদের চলিতে পারে। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় হিন্দু ও মুসলমানের সমান অধিকার। তবে হিন্দুগণ মুসলমান অপেক্ষা শিক্ষায় বহুদূর অগ্রসর হইয়াছেন বলিয়া, মুসলমানদিগকে সঙ্গে না লইলেও তাঁহাদের চলে। কিন্তু ভাষার উন্নতি করিতে হইলে, মুসলমানদিগকে সঙ্গে লইয়া, মিলিয়া মিশিয়া, যাহাতে ভাষার উন্নতি ও পুষ্টিসাধন হয়, তাহার ব্যবস্থাই করা উচিত। কেবল নিমন্ত্রণ করিয়া মন বা মান রক্ষা করিলে চলিবে না। যাহাতে ভাষার গঠন কার্য্যে মুসলমানের বলিবার, আলোচনা করিবার, বা গঠনকার্য্যের প্রস্তাব করিবার সমান অধিকার থাকে, তাহার জন্য সম্মিলন-সভায় মুসলমানদিগের মধ্যে যোগ্য সাহিত্যিককে কর্ত্তৃত্বভারের অংশ দেওয়া চাই।

সাহিত্য-সম্মিলন-পরিচালন-সমিতিতে মুসলমান সভ্য কেহই থাকিতে পান না। কারণ, তাঁহাদের সংখ্যার অল্পতা হেতু, তাঁহাদের মধ্যে কেহই সাধারণ-সমিতির সভ্যগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইতে পান না, এবং তজ্জন্য তাঁহারা স্থানও পান না। ইহার প্রতীকার বাঞ্ছনীয়।

মোহাম্মদ কে, চাঁদ।

সমালোচন-বিজ্ঞান।—প্রথম ভাগ।

১। গোড়ার কথা।

সম্প্রতি একখানি 'পরম পাকা' মাসিকের 'পরম কাঁচা' সম্পাদক এক জন পুরাতন দলের নূতন লেখককে এই বলিয়া গালি দিয়াছেন যে, তিনি 'অজ্ঞাত-কুলশীল' ও 'ভুঁইফোঁড়', এবং 'সমালোচন-বিজ্ঞানের প্রথম ভাগও যদি তাঁহার পড়া থাকিত, তাহা হইলে তিনি এমন আনাড়ি হইতেন না'—ইত্যাদি, ইত্যাদি। একে 'অজ্ঞাতকুলশীল', তাহাতে 'ভুঁইফোঁড়', তাহার উপর আবার 'আনাড়ি'—এতগুলি চোখা বাণ যিনি একনিঃশ্বাসে বর্ষণ করিতে পারেন, তিনি যে এক জন প্রচণ্ড সমালোচক ও কুলশীলসম্পন্ন মহাপুরুষ, তাহাতে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। 'সমালোচন বিজ্ঞানে'র 'প্রথম ভাগ' কেন—হয় ত তিনি 'আখ্যান-মঞ্জরী'ও পড়িয়া ফেলিয়াছেন। সে যাহা হউক, তাঁহার এই সারগর্ভ 'সায়েন্টিফিক' সমালোচন হইতে আমরা এই অবসরে দুইটী তথ্য আবিষ্কার করিলাম—

প্রথম,—কোনও কিছু লিখিবার পূর্ব্বে 'জ্ঞাতকুলশীল' ব্যক্তি হওয়া আবশ্যক। দ্বিতীয়,—সমালোচন-বিজ্ঞানের অন্ততঃ প্রথমভাগটাও সকলের পড়িয়া রাখা দরকার। অবশ্য, প্রথমটির যে আমরা বিশেষ কোনও কিনারা করিতে পারিব, তাহা মনে হয় না;—কারণ, আমরা প্রজাপতি নাই। তবে জোড়াতাড়া দিয়া একখানি সমালোচন-বিজ্ঞান লিখিয়া দিতে পারি। বিশ্ব-সরস্বতী আমার সহায় হউন। আমি আর কোনও পুস্তকের সাহায্য লইব না, গত কয় বৎসরের—ওঁ বিষ্ণু!—গত কয় মাসের ভারতী, প্রবাসী ও সবুজ পত্রই আমার একমাত্র অবলম্বন।

২। প্রথম পাঠ। [ভূমিকা, বা উপসংহার বলিলেও চলে।]

নূতন টাট্‌কা সবুজপত্র বা ভারতী কিনিয়া তাহাদের ভাষা, মতামত ও 'কায়দা-কারণ' শিখিয়া লইতে হইবে। কিন্তু সাবধান—পুরাতন 'ভারতী' বা অন্য কিছু, যাহাতে অনেক বেফাঁস কথা আছে, তাহা কখনও পড়িবে না, বা কিনিবে না—অর্দ্ধমূল্যে দিলেও নয়—এক সঙ্গে উৎকৃষ্ট পিজবোর্ডে বাঁধাইয়া দিলেও নয়। 'নব নব, নিতুই নব, হে নবকুমার!'

৩। দ্বিতীয় পাঠ। (সরঞ্জাম।)

রবিবাবু	আধ্যাত্মিক	রসবস্তু
বিশ্বসাহিত্য	রবীন্দ্রনাথ	যুগোত্তর সাহিত্য
সৌন্দর্য্যসৃষ্টি	গীতাঞ্জলি	বিশ্বকবি
নিত্যরস	চল্‌তি কথা	ঋষি

[টিপ্পনী।—এই সকল কথা উত্তমরূপে কপ্‌চাইতে শিখিবে। প্রবন্ধের মাঝে মাঝে ছাড়িতে পারিলে লাভ আছে।]

৪। তৃতীয় পাঠ। (অনুশীলনী।)

১। না বলিয়া রবীন্দ্রনাথের দোষ ধরিতে গেলে গালাগালি দেওয়া হয়। গালাগালি দেওয়া মহাপাপ।

২। মণি, ননি, সত্য প্রভৃতি ভাল ছেলে। তাহারা কখনও গালাগালি দেয় না—কিন্তু দরকার হইলে দেয়।

৩। কোনও গণ্য মান্য প্রাচীন লোক দেখিলে, দরকার না হইলেও দেয়। তবে নামটা প্রকাশ করে না। মোটের উপর, বাহাদুরীটা বজায় থাকে।

৪। যে কবিতার বিশেষ কিছু বুঝা যায় না, তাহা আধ্যাত্মিক। পাগলে যে বকিয়া যায়, তাহা কি বুঝিতে পার? সে ত বুঝিবার নয়—সে যে প্রেরণা! সে তাহার 'আমি'কে ছাড়াইয়া বহু উর্দ্ধে 'গন্ধ' বিলি করিতেছে। বাহিরের লোককে বুঝাইবার তো তার উদ্দেশ্য নাই। 'আত্মতৃপ্তি'ই তাহার চরম 'চিজ্‌'।

৫। যিনি আধ্যাত্মিক কবিতা লিখিতে পারেন, তিনি বিশ্বকবি। আধ্যাত্মিক কবিতাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ কবিতা।

৬। যে রচনার মাথামুণ্ড কিছু নাই, যাহার ভাব দেখিলে বুঝা যায় না—তাহা চীনেম্যানের লেখা, কি হটেন্টটের লেখা, তাহা বিশ্বসাহিত্য। বিশ্বসাহিত্যই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য।

৭। যিনি নোবেল-প্রাইজ পাইয়া 'থাকেন', তিনি যদি পুরুষ হ'ন, এবং দাড়ী রাখেন, তাহা হইলে তিনি ঋষি। আর যদি স্ত্রীলোক, হন এবং দাড়ী না রাখেন, তাহা হইলে—কি হইবেন, সেটা এখন বলিতে পারিলাম না। সম্ভবতঃ, দ্বিতীয় বা তৃতীয় ভাগে তাহা প্রকাশ করিব।

৮। 'গীতাঞ্জলি'—যাহা নোবেল প্রাইজ পাইয়াছে, তাহা প্রকৃত সমজদার-দের মতে রবিবাবুর শ্রেষ্ঠ কাব্য, ঋষির মন্ত্র, এ যুগের গায়ত্রী। এমন জিনিস ভারতে হয় নাই, এসিয়ায় হইতেছে না, এবং ইয়ুরোপে হইবে না।

৫। চতুর্থ পাঠ। (ঘরপোষা ইংরাজী শব্দ।)

নোবেল প্রাইজ	আর্ট	টল্‌ষ্টয়
ইব্‌সেন	মেটারলিঙ্ক	মিষ্টিসিজম্
সায়েন্টিফিক্ (সমালোচনা)	জোলা	আর্ট ফর্ আর্ট্‌স্ সেক্।

[টিপ্পনী।— এই কথাগুলি মুখস্থ করিয়া রাখিবে। না বুঝিয়া যত্র তত্র বুকনীর মত প্রয়োগ করিতে হইবে—নহিলে বিদ্যা জাহির হইবে না।]

৬। পঞ্চম পাঠ।

১। কদাপি রবিবাবুর অবাধ্য হইবে না। তিনি যাহা বলিবেন, মন দিয়া শুনিবে, এবং না বুঝিয়া কণ্ঠস্থ করিবে।

২। রবি পরম গুরু। তিনি হেলিলে হেলিবে; দুলিলে দুলিবে; বেঁকিলে বেঁকিবে; কাৎ হইলে চিৎ হইয়া পড়িবে।

৩। তিনি আমাদের কি না করিয়াছেন? পাঁক হইতে তুলিয়া লইয়াছেন—আর্ট শিখাইয়াছেন—ইব্‌সেন পড়াইয়াছেন—বিশ্বের বারতা শুনাইয়াছেন।

৪। বিলাতী Social problemগুলি এ দেশে কল্পনা করিয়া তিনি কেমন বুড়াদিগকে ঘাল করিতেছেন! এতদিনে একটা দুশ্চিন্তা গেল—স্বদেশ-উদ্ধারের আর কোনও ভাবনা নাই।

৫। সহজ জিনিসকে শক্ত করার নাম আর্ট;—বীভৎস রসকে সুন্দর করিয়া আঁকার নাম আর্ট;—মনের ময়লা তুলিয়া বাহার দেওয়ার নাম আর্ট;—ইহা আমরা ঠাকুর মহাশয়ের কাছে শিখিয়াছি। জয়, রবিবাবুর জয়!

৬। সেক্ষপীর, ডাণ্টে, মিল্‌টন এখন তামাদী হইয়া গিয়াছে—এটা হচ্ছে 'লাং-চাং-ফেটাং-ফুস্কি'র যুগ। তাদের মত উদ্দেশ্যহীন ভাবে লিখ্‌তে পারাই চরম আর্ট। সেটাই হ'ল যুগোত্তর সাহিত্য, যা চোখের সামনের, নিজের যুগের সব কথা, সব ভাব ছাড়িয়ে গিয়ে এক অনাদি, অনন্ত, অশ্বডিম্বের মত নিরাকার ও অদৃষ্টপূর্ব্ব যুগের কথা কইবে! দেখ্‌ছো না—আজকালকার লেখা? এ তো এ যুগে বা এ দেশে আবদ্ধ নয়!—যখন সমস্ত বিশ্বে এক ভাষা আর এক ভাবের স্রোত বইবে, তখন এদের কদর হবে। আমরা তো সেই দিনের জন্যই হাঁ ক'রে বসে আছি।—জয়! রবিবাবুর জয়!

৭। এই রকম একটা বিশ্বসাহিত্য তৈয়ার করিতে হইবে। তাতে শুধু art for arts' sake থাক্‌বে, আর থাক্‌বে নিত্যরস। জিনিসটা কি, ঠিক্ বুঝা গেল না; তবে রবিবাবু আজকাল যা লিখছেন, আর তাঁহার প্রসাদাৎ

আমরা যা একটু আধটু 'মক্স' কর্‌ছি, তাই বিশ্বসাহিত্য। এ সাহিত্য দস্তুরমত মাথা ঘামিয়ে লেখা।—জয়, রবিবাবুর জয়!

৮। তার পর একটা নূতন ভাষা তৈয়ার কর্ত্তে হবে। বিদ্যাসাগর আর বঙ্কিম ভাষা বদ্‌লে খুব বাহাদুরী কিনেছে। আমাদের সে রকম একটা না কর্‌লে মান থাকে না। আর আমরা কিসেই বা কম? রায় বাহাদুর বঙ্কিম, আর পণ্ডিত বিদ্যাসাগর যা করেছিল, তা স্যার রবীন্দ্রনাথ বা ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ কি পার্ব্বেন না? আর কাজটাও তেমন শক্ত নয়—একটু আধটু হসন্ত লাগিয়ে, আর বানানগুলো একটু নতুন রকম করে' একটা নতুন ভাষা করে ফেলা যাক।—জয়, রবিবাবুর জয়!

৯। যে রবিবাবুর প্রতিবাদ করে, সে আমাদের শত্রু। সে অধম—তাহার বাঁচিয়া কোনও লাভ নাই। রবিবাবু যখন গালি দেন, তা সে সীতাকেই হউক, আর রামকেই হউক—ঠিক্ যেন 'কাতুকুতু'—পড়িলে কি হাসিটাই পায়! কিন্তু রবিবাবুকে বিদ্রূপ—অহো, সে যে একেবারে মহাগুরুনিপাত।

৭। ষষ্ঠ পাঠ।—রস।

১। রস নানাপ্রকার;—যেমন মিছ্‌রীর রস, তালের রস, রসগোল্লার রস।—মধুর হইলেও, স্বাদ বিভিন্ন। সাহিত্যেও তেমনই গ্রীক্ নাটক, ইংরাজী নাটক, সংস্কৃত নাটক প্রভৃতি। সুতরাং রস বিকাশভেদে বিভিন্ন। কিন্তু সকলপ্রকার রসে যে এক প্রকার গাঁজলা ওঠে, তাহা নিত্য ও সনাতন। এই গাঁজলা বা বিকৃতি নিয়েই আজকাল বিশ্বসাহিত্য তৈয়ার হচ্ছে।

২। পচা আলু রসে মজাইলে অতি অপূর্ব্ব আস্বাদ হয়। ইহাও বিশ্ব-সাহিত্যের এক উপকরণ। পচা আলু রসে ডোবানো শুধু ডোবানোর জন্যই, তাহার আর কোনও সার্থকতা নেই। তেম্নি art for art's sake। কুৎসিতকে সুন্দর করিয়া না দেখাইলে আর্ট কি হইল?

৩। এই দুই রসতত্ত্ব বুঝিয়া তবে সমালোচনা করিতে হয়। এইখানেই প্রথম ভাগ শেষ করিতাম। কিন্তু সমালোচনা দুইপ্রকার—(১) সাধারণ সমালোচনা—তাহা শত্রুপক্ষকে ও বিশেষ করিয়া বৃদ্ধ ও শান্তপ্রকৃতি লোকদিগকে বাছাই করিয়া গালি দেওয়া। (২) বিশ্ব-সমালোচনা। এই বিশ্ব-সমালোচনার কাজ হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের কাব্যের বিশ্লেষণ, যাহা বিশ্বকাব্যের সহিত জুড়িয়া থাকিবে। তাহার একটু নমুনা নীচে দিলাম।—

৮। সপ্তম পাঠ।—বিশ্ব-সমালোচনার নমুনা।

রবীন্দ্রনাথকে কেউ কেউ ঋষি বল্‌ছে শুনে আমরা চটিছি। এমন ধারা ভাবে রবিবাবুকে অপমান কর্ত্তে আমি নির্লজ্জ বাংলাদেশেও আগে কখনও দেখি নি। সেই পুরাকালের রুক্ষদেহ পৌত্তলিক ঋষিদের সঙ্গে রবিবাবুর তুলনা? শুনে আমাদের গা' জ্বলে যাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ ঋষি! ঋষিরা দেশের কি ক'রে গিয়েছে! তাদের কেউ কি নোবেল-প্রাইজ নিয়েছে?—জাপানে গিয়ে খেলাৎ টেলাৎ পেয়েছে?—তবু দেশের লোকের এম্‌নি গুণবোধ যে, সবাই তাঁকে ঋষি ঋষি কচ্ছে! এমন দেশে জন্মানোই ভুল। সে কথা যাক্, এটা কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, রবীন্দ্রনাথ ঋষি নন,—কিছুতেই ন'ন! বেশ, তবে তিনি কি?

রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্ম। মনে কর্ব্বেন না, এটা ছাপার ভুল—প্রিণ্টার আকারটী দিতে ভুলিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম তো বটেনই, অধিকন্তু তিনি ব্রহ্ম। ইহার প্রমাণও সাম্‌নেই পড়ে রয়েছে। রবিবাবু যদি ব্রহ্ম না হবেন, তা হ'লে তিনি ব্রহ্মসঙ্গীত লিখ্‌লেন কি ক'রে?—তাঁহার বাণী বিশ্বে ছড়িয়ে পড়্‌ল কি ক'রে?—এত ভক্তই বা জুটলো কি ক'রে'? উপনিষদে তো লেখাই রয়েছে—ব্রহ্ম কবি ছিলেন। রবিবাবুর লেখার মধ্যে যে একটা অসীম অনন্তের ভাব রয়েছে—যা' বিশ্বের সঙ্গে মিশে যেতে চায়, অথচ খসে' খসে' পড়ে—যা' আত্মার মধ্য দিয়ে পরমাত্মাকে ধর্ত্তে যায়, আবার 'আলোক ধেনু'র সঙ্গে, 'তারার আলোর গানের ঘোরে' সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে—যার ধ্বনি একদিনের বা এক জনের নয়, যা' অনাদি কাল থেকে ভূমার মধ্য দিয়ে, গ্রামোফোনের রেকর্ডের মতো, প্রভাতের আলোর মত, 'নিঃসঙ্গ পথের মতো' কেবলি বেজে উঠ্‌ছে—সে লেখা যে ব্রহ্মের নয়, এ কথা কেমন ক'রে বিশ্বাস কর্ব্ব? রবিবাবুর ব্রহ্মত্ব তাঁর সমস্ত লেখার ভেতর থেকে উঁকি মারছে।—তাঁর 'ঘরে বাইরে' পড়—'ইংরাজী-সোপান' পড়—সমস্ত মালুম হয়ে যাবে। এস, এই পয়েণ্ট্‌টা নিয়ে এখন লড়ালড়ি করা যাক্। ইহাই সমালোচনার চরম—এরই নাম সায়েণ্টিফিক্ বিশ্ব-সমালোচনা।

ইতি—প্রথম ভাগ সমাপ্ত।

কুমারগুপ্তের রাজ্য-সময়ের তাম্রশাসন।

ধানাইদহ-লিপি—[প্রতিবাদের উত্তর]।

ধানাইদহে আবিষ্কৃত মহারাজাধিরাজ প্রথম-কুমারগুপ্তের রাজ্যসময়ের তাম্রশাসনখানি সম্বন্ধে বিগত পৌষমাসের "সাহিত্যে" আমি একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছিলাম। প্রত্ন-তত্ত্ববিৎ, ঔপন্যাসিক ও ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্. এ. মহাশয় এই শাসনের যে পাঠ পূর্ব্বে বঙ্গীয় এসিয়াটীক্ সোসাইটীর পত্রিকায় ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়াছিলেন, সেই পাঠ যে মূলানুগত পাঠ নহে, এবং তিনি যে লিপিটির বর্ণাক্ষর-বিন্যাসের [orthography] দুরূহতা ও তাহার অনুবাদের অসম্ভবনীয়তা অনুভব করিয়াছিলেন, তাহাও যে সঙ্গত হইতে পারে না, আমার প্রবন্ধে আমি তাহারই সম্যগ্‌ভাবে আলোচনা করিয়াছিলাম। সম্প্রতি তিনি আমার প্রবন্ধের সমালোচনা করিয়া, "ভারতবর্ষে"র ফাল্গুন-সংখ্যায় এক প্রতিবাদ-প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন। প্রাচীন লেখ প্রভৃতি ঐতিহাসিক উপাদানগুলির যতই অধিকতর আলোচনা হয়, ততই তথ্য স্বতঃপ্রকাশিত হইয়া পড়ে। বিনা আলোচনায়, ঐতিহাসিক সত্যের প্রকাশ হয় না। কিন্তু বড়ই দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, প্রতিবাদ-প্রবন্ধে প্রতিবাদক অনেক স্থলে অন্যায়ভাবে আমার প্রতি অসংযত ও বিদ্রূপাবহ ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন। আমার প্রবন্ধে সাধারণভাবে যে কর্কশ মুখবন্ধটি লিখিত হইয়াছিল,—জানি না, আমার প্রতিবাদক নিজকে সেই মুখবন্ধের লক্ষ্য মনে করিয়া, বিদ্বেষ-পরবশ হইয়াই অধীরভাবে প্রতিপক্ষকে নিরস্ত করিবার জন্য এতটা অসংযতভাবে ঠাট্টাবিদ্রূপ করিয়াছেন কি না।

আমার প্রথম প্রবন্ধে আমি কেবল মদুদ্ধৃত পাঠ প্রকাশিত করিয়াই ক্ষান্ত হই নাই; সঙ্গে সঙ্গে অক্ষর-তত্ত্বাদি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া, লিপিটির যথাসম্ভব একটি অনুবাদ দিয়া, টীকা-রূপে নানাকথার ব্যাখ্যাও করিয়াছি, এবং শাসন হইতে প্রাপ্ত ঐতিহাসিক তথ্যগুলি সম্বন্ধেও মন্তব্য প্রকাশিত করিয়াছি। প্রতিবাদক বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার প্রতিবাদ-প্রবন্ধে আমার পাঠ ব্যতীত অন্য কিছুরই আলোচনা বা উল্লেখ করেন নাই। তাহাতে আমার সন্তুষ্ট হইবারই যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে; যে হেতু, আমি মনে করিতে পারি যে, পাঠ ব্যতীত আলোচিত অন্যান্য বিষয়গুলি তাঁহার প্রতিবাদের বিষয় নহে। সেগুলি সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আমার কোনও বিরোধ নাই; বরং সেই সেই বিষয়ে তাঁহার স্বীকৃতিই অনুমিত হইতে পারে। একটি বিষয়ের জন্য আমি রাখালদাস বাবুর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারি;—তিনি "উদীয়মান" প্রত্নতত্ত্ববিৎ নহেন,—বরং ইতিপূর্ব্বেই সম্পূর্ণভাবে "উদিত";—সুতরাং প্রতিপক্ষের লাঞ্ছনাচ্ছলেও তিনি তাহাকে যে সকল সদুপদেশ প্রদান করিয়াছেন;—তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ না করিয়াই বা উপায় কি? প্রথমতঃ, তিনি আমাকে "প্রত্নলিপিতত্ত্বের বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীর অনুমোদিত" পন্থা অবলম্বন করিতে বলিয়াছেন। কখনও যে এই পন্থা লঙ্ঘন করিয়াছি, তাহা

ত মনে হয় না। আলোচ্য প্রবন্ধেও যে তাহা করিয়াছি, তাহাও স্বীকার করিতে সম্মত নহি তথাপি অভিযুক্ত-প্রযুক্ত বলিয়া এইরূপ সদুপদেশের জন্য সাধুবাদ ছাড়া বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে আর কি দিতে পারি? দ্বিতীয়তঃ, তিনি উপদেশ করিয়াছেন যে, "প্রত্নলিপিতত্ত্বের সহিত ঘনিষ্ঠতর পরিচয় লাভ করিয়া" আমি "যেন উক্ত তাম্রশাসন-পঞ্চকের [অর্থাৎ বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির হস্তগত, দামোদরপুরের নবাবিষ্কৃত গুপ্তযুগের তাম্রশাসন পাঁচখানির] উদ্ধৃত পাঠ প্রকাশ করি"। এই উপদেশের জন্যও তাঁহাকে ধন্যবাদ করিয়াও, আত্মশক্তি-পরীক্ষাপূর্ব্বক সকলেরই সাহিত্যক্ষেত্রে উপস্থিত হওয়া বিধেয়, এই প্রসঙ্গে, "সাহিত্যে" যাহা লিখিয়াছিলাম, তাঁহাকে তাহাই পুনর্ব্বার স্মরণ করাইয়া দিতেছি, এবং তাঁহাকেও স্বপ্রদত্ত উপদেশের অনুসরণ করিয়া চলিবার জন্য [উপদেশ না দিয়া] অনুরোধ করিতেছি।—কারণ, কেহ উপদেশ দিলে রাখালদাস বাবু তাহাতে অসন্তুষ্ট হন। "পরোপদেশে পাণ্ডিত্যং সর্ব্বেষাং সুকরং নৃণাম্"—এই শিষ্টবচন সকলেরই মনে রাখা আবশ্যক। আলোচ্য তাম্রশাসনের রাখালদাস বাবুর উদ্ধৃত পাঠের "প্রতি পংক্তিতেই ভুলভ্রান্তি রহিয়া গিয়াছে" দেখিয়া, আমি আমার প্রথম প্রবন্ধে এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলাম যে, "উদ্ধার কার্য্যে যথোচিত মনোনিবেশের অভাব ও সংস্কৃত ভাষার ব্যুৎপত্তির অভাব এত অশুদ্ধির কারণ। তাহা না হইলে বলিতে হইবে, তিনি প্রাচীন অক্ষরের মধ্যে অনেকগুলিকে চিনিয়া লইতে পারেন নাই"। আমার এই উক্তি প্রতিপন্ন করিবার জন্য যাহা যেরূপভাবে বলা উচিত, তাহা সেই প্রবন্ধেই বলিয়াছি। এই প্রসঙ্গে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মরণের জন্য, এবং পাঠকবর্গের অবগতির জন্য ইহাও বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, এই অধমই যে কেবল তাঁহার প্রতি এইরূপ উক্তি প্রয়োগ করিয়াছে, তাহা নহে; বৈদেশিক পণ্ডিতগণের মধ্যেও এই বিষয়ে কেহ কেহ অনুরূপ ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় না হইয়া, যদি অন্য কেহ আমার প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিতেন, তাহা হইলে আমি সেই প্রতিবাদককে পুনঃপ্রতিবাদের অযোগ্য মনে করিতাম। কিন্তু যিনি বাঙ্গালাসাহিত্যে ইতিহাস ও উপন্যাস লিখিয়া নিজের প্রতিপত্তি এতটা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, এবং যাঁহার পারদর্শিতা সম্বন্ধে বহুলোকের অত্যন্ত উচ্চ ধারণা পরিলক্ষিত হইতেছে, এবং যিনি অন্যের বিদ্যাবত্তা সম্বন্ধে সর্ব্বদাই সন্দিহান, তাঁহার পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে বড় বড় মনীষিগণেরও কিরূপ ধারণা, দেশের কল্যাণ হইবে—মনে করিয়া, সেই সমস্ত মত ও ধারণা আমি উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। ভারত গবমেণ্টের প্রাচীন-লেখ-সঙ্কলনের পত্রিকার দশম ভাগে [Epigraphia Indica, Vol X] "New Brahmi Inscriptions of the Scythian Period" শীর্ষক একটি প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বাবু Lucknow Museum-এ অবস্থিত একবিংশতিখানি প্রাচীন লেখের পাঠাদি সঙ্কলন করিয়াছিলেন। সেই সমস্ত লিপির পাঠেও তিনি যে প্রায় প্রতি পংক্তিতে ভুল পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, তাহা লক্ষ্য করিয়া, অধ্যাপক Lüders ১৯১২ খৃষ্টাব্দের Journal of the Royal Asiatic Society-র পত্রিকায় ১৬৩ পৃষ্ঠায় যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা এই :—

"I know that it cannot be expected that the first reading and interpretation of an inscription of this class should be always final. But what may be reasonably expected, and what, I am sorry to say, is wanting in

Mr. Banerji's paper, is that carefulness and accuracy that have hitherto been a characteristic feature of the publications in the *Epigraphia Indica*. It would be a tedeous and wearisome business to correct almost line by line mistakes that might have been easily avoided with a little more attention. The following pages will show that this complaint is not unjustified."

এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া, মনীষী Lüders রাখালদাস বাবুর পাঠের ভুলভ্রান্তি প্রদর্শন করিয়া, তদীয় লিপিতত্ত্বকুশলতার অনেক বিচার করিয়াছেন। সেই প্রবন্ধের এক স্থানে অধ্যাপক Lüders লিখিয়াছিলেন—"In the fourth line we find a *sa* with the right horizontal prolonged. Mr. Banerji thinks we ought to read *s'o*, the *o* being formed by the combination of *a* and *u*, but I am afraid there will not be many palœgraphers able to follow him in his bold flight of fancy."—অথচ, রাখালদাস বাবু অনেক স্থলে কল্পিত-পাঠ-উদ্ধার-দোষে আমাকে দোষীধার্য্য করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। আমি পরে দেখাইতেছি যে, আমি ব্যাখ্যার অনুরোধে পাঠ-বিষয়ে আদৌ কল্পনার আশ্রয় লই নাই। যত দূর ব্যাখ্যা মূল পাঠের অনুগামিনী বলিয়া বিবেচনা করিয়াছি, অনুবাদ ও টীকাতে তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছি। আমার ব্যাখ্যা পাঠানুগামিনী হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করি। কখনও পাঠকে ব্যাখ্যানুগামী করি নাই। অধিকাংশ লেখের সঙ্কলন ও আলোচনা করিতে যাইয়া, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কেবল পাঠোদ্ধার করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন—অনুবাদ দিতে বড় অগ্রসর হন নাই। সে জন্য সৎসাহসের পরিচায়ক। "নহি সর্ব্বঃ সর্ব্বং জানাতি"—ইহা ত প্রত্যেকেরই মনে রাখা কর্ত্তব্য। আবার, যেখানেই অসম-সাহসিকতা দেখাইতে গিয়াছেন, সেইখানেই অকৃতকার্য্য হইয়া মনীষিগণের নিকট ব্যাখ্যাকার্য্যে অপটু বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। উপরি-উল্লিখিত Indo-Scythean যুগের লেখসমূহের মধ্যে একখানির ব্যাখ্যা সম্বন্ধে অধ্যাপক Lüders যাহা লিখিয়াছেন, তাহাও নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে—

"Mr. Banerji has attempted to translate this text. He does not shrink from explaining *susoti*, with the help of modern Bengali, as an *apabhransa* of the Sanskrit *svasriya*". I am not sure whether the pages of the *Epigraphia Indica* are really the proper place for such linguistic jokes."

ফরিদপুর জেলার খাগ্রাহাটিতে আবিষ্কৃত সমাচারদেবের সময়ের তাম্রশাসনের যে পাঠ, ব্যাখ্যা ও লিপিতত্ত্ববিষয়ক টিপ্পনী* রাখালদাস বাবু বঙ্গীয় এসিয়াটিক্-সোসাইটীর [১৯১০ খৃষ্টাব্দের] পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়াছিলেন, সে সকলে অবস্থিত ভুলভ্রান্তি লক্ষ্য করিয়া মনীষী পার্জ্জিটার মহোদয় সেই লিপিখানির পুনঃসম্পাদন-সময়ে উক্ত পত্রিকার ১৯১১ খৃষ্টাব্দের সংখ্যায় কিরূপভাবে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, বাঙ্গালার প্রত্নতত্ত্বানুশীলনকারিগণের তাহা অবিদিত নাই।

* অবশ্য, মনীষী Lüders স্বীকার করিয়াছিলেন যে, প্রাচীন লেখ-পাঠ-কার্য্য অত্যন্ত কষ্টকর ব্যাপার। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার প্রতিবাদ-প্রবন্ধে প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, ফরিদপুর জেলায় আবিষ্কৃত চারিখানি তাম্রশাসন ও "দামোদরপুরের গুপ্তযুগের পাঁচখানি তাম্র-

শাসন আবিষ্কৃত হওয়ায় প্রাচীন-যুগের খ্রীষ্টীয় চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীর ধাতুপট্টে উৎকীর্ণ লেখের পাঠোদ্ধার-কার্য্য অনায়াসসাধ্য হইয়াছে।" "সুতরাং" [তিনি লিখিয়াছেন] "বসাক মহাশয় ধানাইদহের তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধার-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া যে অধিকতর সফলকাম হইবেন, তাহা বিচিত্র নহে।" এই নূতন নয়খানি প্রাচীন লেখ আবিষ্কৃত না হইলে যে ধানাইদহ-লিপির "পাঠোদ্ধার-কার্য্য অত্যন্ত কষ্টসাধ্য" থাকিত, তাহা আমিও স্বীকার করিয়াছি। আমার প্রথম প্রবন্ধে ["সাহিত্য"—পৌষ-সংখ্যা, ৫৮৮ পৃষ্ঠা] আমি লিখিয়াছিলাম—"অধিগত অংশের অত্যধিক জীর্ণতার জন্য পাঠোদ্ধার ও ব্যাখ্যা-কার্য্য যে অত্যন্ত কষ্টকর হইয়াছে, তাহাতে সংশয় না থাকিলেও, নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসনপঞ্চক ও ফরিদপুরের পূর্ব্বাবিষ্কৃত তাম্রশাসনচতুষ্কের সাহায্যে ধানাইদহ-লিপির অনেক তথ্য বুঝিয়া লওয়া যাইতে পারে।" এই প্রকার প্রাচীন লিপির প্রথম পাঠ ও প্রথম ব্যাখ্যাই যে সর্ব্বতোভাবে চরম পাঠ ও চরম ব্যাখ্যা বলিয়া অবধারিত হইবে, তাহার নিশ্চয়তা কোথায়? এই জন্য সময়ে সময়ে তাহার আলোচনা প্রয়োজনীয় —এবং আলোচনার ফলে যদি প্রথম পাঠককে, বা প্রথম ব্যাখ্যাকারকে নিজ পাঠ বা ব্যাখ্যা পরিত্যাগ করিয়া, আলোচনাকারীর সাহায্য পাইয়া, প্রকৃত পাঠ বা প্রকৃত ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে হয়, তাহাতে তথ্যাবিষ্কারের সহায়তা উপস্থিত হইয়া ইতিহাস-চর্চ্চাকারিগণের উপকার সাধিত হইতে পারে। তাহাতে প্রথম পাঠকের, বা প্রথম ব্যাখ্যাকারীর পক্ষে অধীর হইয়া সমালোচকের উপর তীব্রভাষায় অসংযতভাবে গালাগালি করা বিধেয় নহে। বিচার-পটু সুধীসমাজই পাঠের শুদ্ধতা ও অশুদ্ধতার বিচার করিবেন। প্রতিবাদকের প্রতিবাদ-সত্ত্বেও আলোচ্য লিপির মদুদ্ধৃত পাঠ যে সর্ব্বাংশে পরিত্যাগ করিতে হইবে না, ইহাই আমার বিশ্বাস, এবং তাহাই পরে প্রদর্শিত হইতেছে।

তৃতীয়তঃ, আর একটি সদুপদেশের জন্য বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমার ধন্যবাদার্হ। "আদৌ" এবং "মধ্যে" গালি দিয়া, "অন্তে চ" গালি না দিলে প্রবন্ধ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে না—এই ভাবিয়াই, বোধ হয়, আমার প্রতিবাদক মহাশয় প্রবন্ধের "অন্তে" লিখিয়াছিলেন—"কুমারগুপ্তের রাজ্যসময়ের তাম্রশাসন" পাঠ করিয়া মনে হইতেছে যে, প্রত্নলিপিতত্ত্ব অপেক্ষা পারস্য-ভাষা অধ্যয়ন করিলে, বসাক মহাশয় অধিকতর যশোলাভ করিতে পারিতেন।" দেশের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে যাঁহারা জিজ্ঞাসু হইতে চাহেন, তাঁহাদের সকলের পক্ষেই, যে যে ভাষায় দেশীয় ইতিহাসের উপাদান লিখিত প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই সেই ভাষা শিক্ষা করা আবশ্যক। যাঁহারা পারস্য-ভাষা না জানিয়াও বাঙ্গালার পাঠান-যুগের ইতিহাস রচনা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা যে সে বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে সফলকাম হইতে পারিবেন, তাহা নিঃসংশয়ে বলা কঠিন। আমার যদি সময় ও স্বাস্থ্য থাকিত, তাহা হইলে রাখালদাস বাবুর এই সদুপদেশ কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতে পারিতাম।

প্রবন্ধারম্ভে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একটি সত্যের অপলাপ করিয়াছেন দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছি। তিনি লিখিয়াছেন,—"বসাক মহাশয় গত পাঁচ বৎসরের মধ্যে অনেকগুলি প্রাচীন শিলালিপি ও তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তন্মধ্যে সামন্তরাজ লোকনাথের তাম্রশাসন ব্যতীত অধিকাংশগুলিই খ্রীষ্টীয় দশম, একাদশ, বা দ্বাদশ শতাব্দীর লেখ।

সামন্ত লোকনাথের তাম্রশাসন ও গুপ্তযুগের দামোদরপুরে আবিষ্কৃত তাম্রশাসনপঞ্চকের পাঠোদ্ধারকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া বসাক মহাশয় এই প্রথম প্রাচীন যুগের লেখচর্চ্চা আরম্ভ করিয়াছেন।" প্রায় চারি বৎসর পূর্ব্বে যে ঢাকা বিভাগের স্কুল-ইন্‌স্‌পেক্টর শ্রীযুক্ত ষ্টেপলটন্‌ প্রদত্ত প্রতিকৃতি হইতে সপ্তম শতাব্দীর কামরূপাধিপতি ভাস্কর বর্ম্মার তাম্রশাসন-লিপির পাঠোদ্ধার করিয়া আমার পাঠ ১৯১৩ সালের জুন মাসের "Dacca Review" পত্রিকায় অনুবাদাদি সহ প্রকাশ করিয়াছিলাম,—প্রতিবাদক মহাশয় তাহা এত অল্প দিনের মধ্যেই বিস্মৃত হইয়া গেলেন! আর বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত ধানাইদহ-লিপির পাঠও যে মূলানুগত নহে, তাহাও প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে বলিয়া রাখিয়াছিলাম। তথাপি, প্রাচীন যুগের, অর্থাৎ গুপ্তযুগাদির লেখচর্চ্চা এই আমার প্রথম ঐ চর্চ্চা এই প্রথম হউক বা পুরাতনই হউক, পাঠাদি শুদ্ধ হইলেই সকলের গ্রহণীয়—নচেৎ সকলের বর্জ্জনীয়। অতঃপর উভয়ের পাঠ পুনরায় উদ্ধার করিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হইব। প্রতিবাদে তিনি যে ২৬টি বিষয় উত্থাপিত করিয়াছেন, তাহার একটি একটি করিয়া আলোচনা করা যাইতেছে।

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পাঠ।

১।......[শ্রীকুমার-গুপ্ত-রাজ্য-স] ম্বৎসর শত-ত্রয়োদশুত্ত [র]......

২।......[অস্তা]ন্‌=দিবসপূর্ব্বায়াং পরম-দৈবত পর [ম]......

৩।......কুত্র [ক নিবাসিনঃ] ব্রাহ্মণ শিবশর্ম্ম নাগশর্ম্ম মহ......

৪।......[দে]বকীর্ত্তি ক্ষমবন্ত গোষ্ঠক বর্গপাল পিঙ্গল শু(?)ঙ্কুক কাল......

৫।......বীষ্য দেবশর্ম্ম বিষ্য ভদ্র খুষক উপক গোপাল......

৬।......শীভদ্র হ্মপহরণ (?)ভ্যা-গ্রামাষ্টকুলাধিকরণ......

৭।......চরণ বিজ্ঞাপিত...মহাখুষাপার বিষয়ে-নিবত্ত মর্য্যাদাস্থিতি......

৮।......নীবী-ধর্ম্মক্ষয়মালভ্য...দহ খমাশান্ত নম্নবকত্র-লেন (?) বা......

৯।......পলে (?)ত্যভিহিত...সর্ব্বলম্ব...কর প্রতি প্রতিকুটুম্বিভিরবস্থাপ্যাক......

১০।......পরিত্যক্তেন ষ বি...চ... দহ্যকমিতি যতস্ত্যজতি প্রতিপাদ্য......

১১।......বরনালক সদ (?) বি...দ্যা-কৃত্য বস-লক (?) দত্ত ততঃ সুযুক্তক......

১২। ভূ (?) কটক বস্তেভ্য (?) ছান্দশ (?) ব্রাহ্মণ বরাহস্বামিনে দত্তং তথ......

১৩।......ভূম্যাদান্‌=ক্ষেপ (?) চ গুপ্ (?) গুণমনুচিন্ত্য শরীরকল্যা (?) নকস্য চো......

১৪।......শ উক্তঞ্চ ভগবতা দ্বৈপায়নেন স্বদত্তাম্পরদত্তাম্বা......

১৫।......ভুর্ত্তিঃ সহ পচ্যতে ষষ্টি (?) বর্ষ সহস্রাণি স্বর্গে মোদতি ভূমিদ [ঃ]

১৬।......পূর্ব্বদত্তাং দ্বিজাতিভ্য [ঃ] যত্নাদ্রক্ষ যুধিষ্ঠির মহী......

১৭।......[ও]রম্‌ শ্রীভদ্রেন উৎকীর্ণং স্থক্কেশ্বরদাসে [ন]......

অস্মদীয় পাঠ।

১।......ম্বৎসর-শ [তে] ত্রয়োদশোত্ত

২।......[দি]বস-পূর্ব্বায়াং পরম-দৈবত-পর-

৩।......। কুটু[ম্বি]...ব্রাহ্মণ-শিবশর্ম্ম-নাগশর্ম্ম-মহ-

৪।......বকীর্ত্তি-ক্ষেমদত্ত-গোষ্ট্রক-বর্গপাল-পিঙ্গল-শুক্ক-কাল-

৫।......প(?)-বিষ্ণু[দেব]শর্ম্ম-বিষ্ণুভদ্র-খাসক-রামক-গোপাল-

৬।......স(?) সু(?)শ্রীভদ্র-সোমপাল-রামাদ্যাঃ (?) গ্রামাষ্টকুলাধিকরণঞ্চ

৭।......বিষ্ণুণা (?) বিজ্ঞাপিতা—ইহ খাদা (টা ?) পারবিষয়েনুবৃত্ত-মর্য্যাদা-স্থি[তি]-

৮।......নীবীধর্ম্মক্রয়েণ লভ্য [তে] [ত]দর্হথ মমাদ্যানেনৈব ক্রমেণ (প) দা [তুং]-

৯। ....সমেত্যা (?) ভিহিতৈ [: ?] সর্ব্বমেব × জ্ঞা (?) কর-প্রতিবেশি (?) কুটুম্বি-
ভিরবস্থাপ্য ক-

১০।...... × রি × কন × যদি তো × × [ত]দবধৃতমিতি যতস্তথেতি প্রতিপাদ্য

১১।......বক-নলা[ভ্যা]মপবিঞ্ছ্য ক্ষেত্রকুল্যবাপমেকং দত্তং ততঃ আযুক্তক-

১২।......ভ্রা(?)তৃ কটক-বাস্তব্য-ছন্দোগ-ব্রাহ্মণ-বরাহস্বামিনো দত্তং তদ্ধ-

১৩।......ভূম্যা দা[নাক্ষে]পে চ গুণাগুণমনুচিন্ত্য শরীর-ক(কা)ঞ্চনকস্য চি-

১৪।......আ [উ] ক্তঞ্চ ভগবতা দ্বৈপায়নেন স্বদত্তাম্পরদত্তাম্বা

১৫। ....[ভিঃ] সহ পচ্যতে [।। *] ষষ্টিং বর্ষসহস্রান (ণি) স্বর্গে মোদতি [ভূমিদঃ] [। *]

১৬।......[পূ]র্ব্বদত্তাং দ্বিজাতিভ্যো যত্নাদ্রক্ষ যুধিষ্ঠির [। *] মহীং মহীমতাম্প্রে[ষ্ঠ]

১৭।......র[ং] সু (?)শ্রীভদ্রেন উৎকীর্ণং স্তু(স্ত)ম্ভেশ্বর দাসে[ন]...

* এ স্থলে পাঠকবর্গের অবগতির জন্য একটি কথা বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য। মূল তাম্রশাসনখানি সম্প্রতি বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির সম্পত্তি, এবং আমি মূল শাসন অবলম্বন করিয়াই পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছি। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যদি প্রতিকৃতি না দেখিয়া, পুনরায় মূল শাসনখানি আমাদের নিকট হইতে চাহিয়া লইয়া গিয়া আমার উদ্ধৃত পাঠের বিচারে প্রবৃত্ত হইতেন, তাহা হইলে আমার বিশ্বাস, তিনি মূলের সাহায্যে আমার পাঠের অধিকাংশ স্থলের শুদ্ধতা অনায়াসে স্বীকার করিতেন। সে যাহা হউক, এখন পাঠ-বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

(১) দ্বিতীয় পংক্তিতে "অস্তান্দিবসপূর্ব্বায়াম্" শব্দ দুইটিকে আমি যে ভাবে লিখিয়াছি, তাহা দেখিয়া রাখালদাস বাবুর "বোধ" হইয়াছে যে, আমি তাঁহার উদ্ধৃত পাঠটি [অর্থাৎ, "অস্তান্=দিবসপূর্ব্বায়াম্"] ভুল পাঠ মনে করিয়াছি। এই প্রসঙ্গে তিনি অন্যায়ভাবে একটু কর্কশ বিদ্রূপ করিতেও ছাড়েন নাই। তিনি লিখিয়াছেন যে,—"ইংরেজী অক্ষরে সংস্কৃত ভাষা লিখন ও পঠনে অনভ্যাসবশতঃ বসাক মহাশয় ইহা মনে করিয়াছেন।" কিন্তু আমি কখনও মনে করি নাই যে, আমার প্রতিবাদক মহাশয়ের পাঠ এ স্থলে ভুল হইয়াছে। মূল শাসনে 'ন'এর নীচে 'দ' স্পষ্ট উৎকীর্ণ রহিয়াছে দেখিয়া, আমি আমার পাঠে 'ন্দ' ছাপিয়াছি, এবং বঙ্গাক্ষরে লিখিতে হইলে তাহাই যে বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীর অনুমোদিত, ইহাই আমার বিশ্বাস। মূলে যাহা দেখিয়াছি, তাহাই যথাযথভাবে উদ্ধৃত করিয়াছি বলিয়া আমার অপরাধ হইল? আর "ইংরেজী অক্ষরে সংস্কৃত ভাষা লিখন ও পঠনে" আমার অভ্যাস আছে কি না, তদুত্তরে কেবল এই বলা যাইতে পারে যে, *Epigraphia Indica* প্রভৃতি পত্রিকায় আমি যে সকল লেখের পাঠ ইংরেজী অক্ষরে লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছি, তাহা আমার প্রতিবাদকের সহায়তায়

হইয়াছে কি? আর দেশের যাঁহারাই প্রত্নতত্ত্বানুশীলনে ব্রতী আছেন, তাঁহাদিগের সকলকেই ইংরেজী অক্ষরে লিখিত মনীষী Fleet প্রভৃতির গুপ্তযুগের লেখাদি পাঠ করিতে হয়। রাখাল-দাস বাবুর মুখে এইরূপ বিদ্রূপ নিতান্ত অশোভন হইয়াছে।

(২) তৃতীয় পংক্তিতে আমি "ক্ষুদ্রক" স্থলে "কুটুম্বিভিঃ" পাঠ করি নাই—"কুটু[ম্বি]" এইরূপ পাঠ লিখিয়াছি। রাখালদাস বাবু "ক"-এর উপরে একটি ব্যঞ্জনবর্ণ আছে বলিয়া আমাকে লক্ষ্য করিতে বলিয়াছেন। কিন্তু "ক"-এর উপরে কোনও ব্যঞ্জনবর্ণ থাকিয়া "ক্ষ" হয় না, বরং "ক"-এর নীচে "ষ" থাকিলে 'ক্ষ' হয়। সে যাহা হউক, তাম্রপট্টে আমি যাহাকে 'টু' পড়িয়াছি, এবং যাহা প্রতিবাদক মহাশয়ের মতে 'দ্র', তাহার পরের অক্ষর কয়টি খসিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে আমি তাম্রলেখে কেবল 'ক'-এর পর 'টু' বা 'দ্র' দেখিতেছি। যদি তাম্রশাসনের এই অংশ খসিয়া পড়িয়া যাইবার পূর্ব্বে [কলিকাতার শিল্প-প্রদর্শনীর সময়ে] রাখালদাস বাবু ইহাতে "ব্রাহ্মণ" শব্দের পূর্ব্বে বিসর্গচিহ্ন দেখিয়া থাকেন, তাহা হইলে, এই স্থলে "অক্ষুদ্রকুটুম্বিনঃ ব্রাহ্মণ"—ইত্যাদিরূপ পাঠ ছিল কি না, তাহা বিবেচ্য। দামোদরপুরের একখানি তাম্রশাসনে লেখপ্রারম্ভে আমরা "ব্রাহ্মণাদ্যারক্ষুদ্রপ্রকৃতিকুটুম্বিনঃ" এইরূপ একটি পাঠ প্রাপ্ত হইয়াছি। এখন যাহা তাম্রে লক্ষিত হয়, তাহা "ক দ্র" বলিয়া প্রতিভাত হয়। কিন্তু 'ক্ষুদ্রক' নামক কোনও স্থানের 'নিবাসী' ব্রাহ্মণ ইত্যাদিরূপ ব্যাখ্যার কোনও কারণ পরিদৃষ্ট হয় না। যদি 'ক দ্র' স্থানে পূর্ব্বে 'ক্ষুদ্র'ই ছিল বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও, তাম্রপট্টের যে স্থানটি খসিয়া গিয়াছে, সেখানে "কুটুম্বিনঃ" থাকিলেও থাকিতে পারিত কি না, তাহাও চিন্তনীয়।

(৪) আমি 'ক্ষ'-তে একার চিহ্ন স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি, এবং তৃতীয় অক্ষরটি যে 'দ', এবং চতুর্থটি 'ত্ত', তাহাও স্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে। সুতরাং বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় [চতুর্থ পংক্তিতে] যে শব্দটিকে 'ক্ষমবন্ধ' পাঠ করিয়াছেন—আমি সেই সংজ্ঞাবাচক শব্দটিকে "ক্ষেমদত্ত" পাঠ করিয়াছি। এই পাঠে "অসংযত কল্পনা" আমাকে কোনও "বিঘ্ন" প্রদান করে নাই।

(৫) পঞ্চম পংক্তিতে "বিষ্ণু [দেব] শর্ম্ম" ও "বিষ্ণুভদ্র" নামদ্বয়ের পাঠ সম্বন্ধে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিতেছেন যে, তিনি ফটোগ্রাফের চিত্রে "মনোযোগের সহিত পরীক্ষা করিয়া" দেখিয়া এই স্থির করিলেন যে, "মূলে দুইটি নামেই দ্বিতীয় অক্ষরটি 'ষ্ণু' নহে, পঠনকালে ইহা 'ষু' অথবা 'ষ্য' ব্যতীত আর কিছু বলা যাইতে পারে না।" প্রথমতঃ, আমি তাঁহাকে "বিষ্ণুভদ্র" শব্দটি পুনরায় দৃষ্টিগোচর করিতে অনুরোধ করিতেছি, এবং ইহার সহিত হরিষেণ-প্রশস্তির ১৯শ পংক্তিতে "বিষ্ণুগোপ" শব্দ, এবং স্কন্দগুপ্তের ইন্দোর তাম্রশাসনের ৫ম পংক্তিতে "বিষ্ণু" শব্দের সহিত মিলাইয়া দেখিতে বলিতেছি। তাহা হইলেই, আমার বিশ্বাস, তাঁহার "ষু" বা "ষ্য"-এর ভ্রম বিদূরিত হইবে। 'ষ' যে বর্ত্তমান আছে, তাহাতে সংশয় নাই। কিন্তু তাহার নীচে যে মূর্দ্ধণ্য 'ণ' আছে, এবং তাহার নীচে [মধ্যস্থল হইতে] একটি নিম্নগামী ছোট সরলরেখা লম্বিত হইয়া 'উ'কারের সূচনা করিতেছে, তাহা তিনি ভাল করিয়া দেখুন, এই আমার অনুরোধ। "বিষ্ণু [দেব] শর্ম্ম" শব্দেও তাহাই আছে।

(৬) ষষ্ঠ পংক্তিতে "ভদ্র" শব্দের পূর্ব্বে 'ষ্ণু' অক্ষরটি স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে। তাহার পূর্ব্বের

অক্ষরটি আমার নিকট সংশয়সহকারে 'মু' বলিয়া প্রতিভাত হয়। কিন্তু সেই সংশয় আছে বলিয়াই আমি আমার পাঠে "মু"-এর পর একটি প্রশ্ন-বোধক (?) চিহ্ন ব্যবহার করিয়াছি। আমার মতে, নামটি "মুশীভদ্র" বলিয়া বোধ হয়। যাহাতে 'র'ফলা লক্ষিত হইতেছে, তাহাতে 'র'ফলা যোগ করিয়া পাঠ করা কখনও যে "বিজ্ঞানসম্মত-রীতি-বিরুদ্ধ কার্য্য", তাহা আমি মনে করিতে পারি না।

(৭) ষষ্ঠ পংক্তির দ্বিতীয় শব্দটিকে "সোমপাল" পাঠ করা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে কঠিন। স্কন্দগুপ্তের কাহাউঁ শিলালিপিতে [৭ম পং] "রুদ্র-সোম" শব্দের "সোম"-অংশের সহিত "সোমপাল" শব্দের "সোম"-অংশ তুলনীয়। প্রতিবাদকের মতে, "সোমপাল" শব্দটির "চতুর্থ অক্ষরটি 'হ' কি 'ল', তাহা নির্ণয় করা কঠিন"। প্রত্যুত্তরে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, "বগর্গপাল" [৪পং] "কুলাধিকরণ" [৬পং], "লভ্য" [৮পং] প্রভৃতি শব্দের "ল" যদি "ল" হইতে পারে, তাহা হইলে "সোমপাল" শব্দেও এক-ভাবেই [একটু ক্ষুদ্রাকারে] উৎকীর্ণ "ল" অক্ষরটি কেন "ল" না হইয়া "হ"ও হইতে পারে, তাহার কারণ বুঝিতে পারা যায় না। "বরাহ" শব্দের [১২ পং] শেষ অক্ষরটি অর্থাৎ "হ"-অক্ষরটি যে "ল" নহে, তাহা সকলের নিকট সুবিদিত। "মহ" [৩পং], ইহ [৭পং], "অর্হথ" [৮পং], সহ [১৫ পং] প্রভৃতি শব্দের "হ"-কার এবং "সোমপাল"-শব্দের "ল"-কার কি একরূপ?—সুধীগণই তাহার বিচার করিবেন। তবে বলিতে হইবে যে, "সোমপাল" শব্দের শেষ অক্ষরটি যদি "ল" হইয়া পড়ে, তাহা হইলে ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের একটি অ-বিচারসহ অক্ষরতত্ত্ব ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ে; অর্থাৎ, তিনি যে মনে করেন যে, ৫ম শতাব্দীতে উত্তরাপথের পূর্ববিভাগে ব্যবহৃত অক্ষরমালায় যে "ল"-এর মত দুই একটি অক্ষর কদাচিৎ পশ্চিমবিভাগে ব্যবহৃত, তৎতৎ অক্ষরের মতই স্থানে স্থানে উৎকীর্ণ হইত, সেই মত ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ে। অতএব, তাঁহার মতে "সোমপাল" শব্দের "ল", "ল" নহে।

(৮) ষষ্ঠ পংক্তিতে আমি যে শব্দকে "রামাত্মাঃ(?)"-রূপে পাঠ করিয়াছি, তাহা রাখালদাস বাবুর মতে, "একেবারেই অস্পষ্ট" হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তিনি স্বরচিত বাঙ্গালার ইতিহাসে"র [প্রথম ভাগের] ৭৬ পৃষ্ঠায় এই লিপির যে চিত্র প্রকাশিত করিয়াছেন, সেই চিত্রেও অক্ষর তিনটি স্পষ্ট বিদ্যমান রহিয়াছে। তাঁহার মতে, তৃতীয় অক্ষরটি "ত্যা"; অথবা "ভ্যা" হইতে পারে; কিন্তু "ত্মা" হইতে পারে না। কারণ, সম্ভবতঃ তিনি বলিতে পারিতেন যে, আমি "কল্পনা বা অনুমান"কে প্রমাণ ধরিয়া "ত্মা" পাঠ করিয়াছি।

(৯) আমার প্রতি প্রতিবাদকের নবম প্রসঙ্গের আলোচনার আক্রমণটি বড়ই অন্যায় ও অসংযত বোধ হইতেছে। "সত্যের অনুরোধে"ই গুপ্তযুগের অক্ষরতত্ত্ব-সম্বন্ধে একটি নূতন তথ্যের সমাচার দিতে যাইয়া, আমি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ন্যায় প্রবীণ লিপিতত্ত্ববিদের হস্তে লাঞ্ছিত হইয়াছি। "সাহিত্যে" প্রকাশিত প্রথম প্রবন্ধে [৫৮৮ পৃ] আমি লিখিয়াছিলাম—

"অনেক স্থলে অক্ষরের সহিত সংযোজিত 'আ'-কার-চিহ্নটি অক্ষরের উপরিভাগে ব্যবহৃত না হইয়া, অক্ষরের নীচের বামকোণে অঙ্কুশাকারে প্রদত্ত লক্ষিত হয়। যথা, খাসক (পং ৫), গ্রামাষ্ট (পং ৬), খাদাপার বা খাটাপার (পং ৭), গুণাগুণ (পং ১০)।"

উদাহরণস্থলে আমার আরও দুই একটি শব্দ দেখাইয়া দেওয়া উচিত ছিল; যথা, "ব্রাহ্মণ

(পং ১২)। লিপিতত্ত্ববিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 'আ'কার-তত্ত্ব-সম্বন্ধে আমার উপরি-উল্লিখিত মতটিকে উপেক্ষণীয় বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন, এবং তাঁহার যুক্তির জন্য তিনি বুলার ও কিল্‌হর্ণের 'দোহাই' দিয়াছেন। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে রাখালদাস বাবু আমার অগ্রজপ্রতিম বন্ধু শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়ের রচিত 'গৌড়রাজমালা' গ্রন্থের সমালোচনার সময়ে [কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে] মনীষী বুলার ও কিল্‌হর্ণের মতকে "উপেক্ষিত" মনে করিয়া তন্মতাবলম্বী চন্দ মহাশয়ের মতকে অগ্রাহ্য মনে করিয়াছিলেন, সেই রাখালদাস বাবুই আবার সম্প্রতি একটি ক্ষুদ্র প্রতিপক্ষকে বিপন্ন করিতে ইচ্ছা করিয়া, বুলার ও কিল্‌হর্ণের মত তুলিয়া স্বমত পরিপুষ্ট ও সুরক্ষিত করিতে চাহিয়াছেন! যাহা এক স্থলে হেয়, তাহা অন্য স্থলে উপাদেয় হওয়া কিরূপ রীতি, তাহা বুঝিতে পারা গেল না। তিনি বুলারের 'Indian Palæography''র English Translation, p. 47 হইতে একটি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া খৃষ্টীয় ৫ম, ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে 'আ'কার যে 'অ'কারের নিম্নে কমার ন্যায় চিহ্নসহকারে লিখিত হইত, তাহা বলিয়া, সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি দৃঢ়োক্তি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, যথা—

"এই একটি অক্ষর ব্যতীত খৃষ্টীয় ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতাব্দীর কোনও লেখে বর্ণের নিম্নে 'কমা'র ন্যায় চিহ্ন দিয়া আকার বিজ্ঞাপিত হয় নাই। কোনও বর্ণের নিম্নে 'কমা'র ন্যায় চিহ্ন দেখিলে উক্তবর্ণে 'উ'-যুক্ত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।"

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অনেক স্থলে আমাকে হরিষেণ-প্রশস্তির লিপি দেখিতে অনুরোধ করিয়াছেন। তাঁহাকে কি জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে, সেই এলাহাবাদ-স্তম্ভলিপিতেই মূর্দ্ধণ্য 'ণ'কারের সহিত সংযোজিত 'আ'-কার চিহ্নটি কিরূপে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে, তিনি কি তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন? যদি না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে, সেই প্রশস্তিতে "গুণাজ্ঞা" (পং ৬), "তত্ত্বেক্ষণা" (পং ৮), "প্রণাম" (পং ১০ ও পং ২২), "ক্ষণাৎ" (পং ১৩) "দক্ষিণাপথ" (পং ২০), "প্রত্যর্প্পণানিত্য" (পং ২৬), 'বিচারণা" (পং ৩০) "সমর্প্পণানুগ্রহ" (পং ৩১) —প্রভৃতি শব্দে "ণ"এর সহিত সংযোজিত "আ"কার চিহ্নটি সেই সেই বর্ণের নিম্নে 'কমা'র ন্যায় প্রদত্তআছে কি না, তাহা তিনি একবার পরীক্ষা করুন—ইহাই আমার অনুরোধ। এবং এই 'কমা'র ন্যায় চিহ্নটি যে 'আ'কার-বিজ্ঞাপক, তাহাও বুলারের [Table IV, 2I, 1] অক্ষরতালিকা-স্তম্ভে দেখিয়া লউন, ইহাও আমার অনুরোধ। হরিষেণ-প্রশস্তিতে স্থানে স্থানে যে গ, ণ, ধ প্রভৃতি কয়েকটি অক্ষরের সহিত যুক্ত 'আ'কার চিহ্নও তত্তদক্ষরের একবারে নিম্নে না হইলেও, অন্ততঃ অক্ষরের বামদিকের মাঝখানে 'অঙ্কুশ' বা 'কমা'র আকার-রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাও অনুধাবনের বিষয়। যথা, "গান্ধর্ব্ব" (পং ২৭), "নাথাতুর" (পং ২৬), "বিধান", (পং ২৪) "অনুবিধান" ও "ধাম্না" (পং ২৮)। সেই প্রশস্তির ১৯ পংক্তিতে "বিষ্ণুগোপ" শব্দটিকেও এ স্থলে পুনরায় দেখিতে বলা যাইতে পারে, তাহা হইলে প্রতিবাদক মহাশয় "ষ্ণু" কিরূপে লিখিত হইত, তাহাও দেখিতে পাইবেন, এবং 'গ'-কারে 'ও'কার চিহ্ন দিতে হইলে যে তাহার 'আ'কার চিহ্নটি কিরূপ স্থানে অঙ্কুশাকারে বা 'কমা'র-আকারে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাও বুঝিতে পারিবেন। ধানাইদহ-লিপিতে "গোষ্ঠিক" (৪ পং) ও "গোপাল"-শব্দদ্বয়ে "গা"-অক্ষরের নিম্নে যে অঙ্কুশ বা 'কমা'র ন্যায় চিহ্ন দেখা যায়, তাহাও বোধ হয়, 'আ'কার-চিহ্নেরই বিজ্ঞাপক।

প্রথম পংক্তির "দশোত্তর" শব্দের 'শ'তেও সেইরূপ 'আ'কার-চিহ্ন প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া প্রতিভাত হয় না কি? তবে দুঃখের বিষয় এই যে, দামোদরপুরের তাম্রশাসনের পাঠ ও প্রতিকৃতি প্রকাশিত হইতে আরও বিলম্ব আছে। নচেৎ এখনই প্রদর্শিত হইতে পারিত যে, সমুদ্রগুপ্তাদির সময়েও স্থানে স্থানে [যথা 'ধা' ও 'গা'তে] যে 'আ'কার চিহ্নটি অক্ষরের মধ্যস্থলে অঙ্কুশাকারে বা 'কমা'র ন্যায় প্রদত্ত হইত, তাহা দামোদরপুরে আবিষ্কৃত প্রথম কুমারগুপ্ত ও বুধগুপ্তের সময়ের সেই সেই অক্ষরের নিম্নেই তদাকারে প্রদত্ত হইত। কারণ, আমরা দামোদরপুর-লিপির "উপযোগায়" শব্দের 'গা'তে, "অবধারণা" এবং "বসুধা" শব্দের "ধা'তে সেইরূপ 'আ'কার-চিহ্নই লক্ষ্য করিয়াছি। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মতটি সর্ব্বাংশে অবলম্বন করিলে, "উপযোগায়" স্থলে "উপযোত্তয়" এবং "অবধারণা" ও "বসুধা" স্থলে যথাক্রমে "অবধুরণা" ও "বসুধু" পাঠ করিয়া লোকসমাজের নিকট হাস্যাস্পদ হইতে হইবে। এই সমস্ত স্থলে "আ"-কার উ"কার চিনিতে ভাষার জ্ঞানও আবশ্যক হয় না কি? সত্যের অনুরোধে অত্যধিক অনুমান বা কল্পনা সকলেরই বর্জ্জনীয়—আমি অনেক স্থলে তাহা বর্জ্জন করি নাই—ইহাই রাখালদাস বাবুর অভিযোগ। ষষ্ঠ পংক্তিতে "গ্রামাষ্ট"-শব্দের, এবং দ্বাদশ পংক্তিতে "ব্রাহ্মণ"-শব্দের 'গ্রা'তে ও 'ব্রা'-তে আকার-চিহ্ন অক্ষরের নীচে বামকোণে 'কমা'র ন্যায় চিহ্ন দ্বারা বিজ্ঞাপিত হয় নাই কি? 'গ্রা'-তে নীচের বামকোণে 'কমা'র ন্যায় যে চিহ্ন, তাহাই আকার-চিহ্ন। আর প্রতিবাদক মহাশয় ফটোগ্রাফের চিত্রে 'গ্রা'-অক্ষরের উপরিভাগে প্রতিকৃত যে চিহ্নটি দেখিতে পাইতেছেন, এবং যাহাকে তিনি আকার-চিহ্ন মনে করিয়া থাকিবেন, এবং যাহা লক্ষ্য করিয়াই আমার 'দৃষ্টিশক্তি'র উপর বিদ্রূপ-শল্য নিক্ষেপ করিয়াছেন, তাহা তাম্রপট্টের অন্যান্য স্থানে পরিলক্ষিত জীর্ণতা-নিবন্ধন ক্ষয়-চিহ্নের ন্যায়, একটি ক্ষয়চিহ্নমাত্র,—অক্ষরের সহিত তাহার কোনও সম্পর্ক নাই। মূল শাসনখানি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পুনরায় দেখিলেই আমার যুক্তি বিশ্বাস করিতে পারিবেন। এই স্থলে আমার 'সঙ্গগুণে'ও আকার-চিহ্ন অনুমান করিয়া লইবার কোনও কারণ হয় নাই। মান-কুয়ারে আবিষ্কৃত প্রথম কুমারগুপ্তের সময়ের মূর্ত্তি-শিলালিপির প্রথম পংক্তিতে "বুধান"-শব্দের "ধা"-টি কিরূপ ভাবে উৎকীর্ণ, তিনি তাহাও দেখুন, এই আমার অনুরোধ। এলাহাবাদ-স্তম্ভে উৎকীর্ণ হরিষেণ-প্রশস্তির ১৬ পংক্তিতে "ধ্যান"-শব্দের "ধ্যা"-তে আকার চিহ্নটি কি ভাবে লিখিত হইয়াছে, তাহাও দেখুন। এলাহাবাদ-স্তম্ভলিপির 'পা' প্রভৃতি স্থলে এরূপ অঙ্কুশাকার বা 'কমা'র-ন্যায় 'আ'কার চিহ্নকে ঠিক আকার বলিয়া পাঠ করিয়াও, বুলার যদি তাঁহার Palæo-graphy বা প্রাচীনলিপিতত্ত্ববিষয়ক প্রবন্ধে তাহা স্পষ্ট করিয়া না দেখাইয়া বা বুঝাইয়া থাকেন, তাহা হইলেও, অন্যান্য স্থলে সেইরূপ আকার-চিহ্ন প্রাপ্ত হইলে, তাহাকে আকার পাঠ করিলে আমার অপরাধ হইবে, তাহা ত আমি কখনও ভাবিতে পারি নাই। এই ধানাইদহ-লিপিতে ও দামোদরপুরে আবিষ্কৃত তাম্রশাসনগুলিতে স্থানে স্থানে অধিগত এইরূপ আকার-চিহ্ন যদি বুলার বা কিলহর্ণ দেখিয়া যাইতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা অবশ্যই আমার আবিষ্কৃত সত্য কথাটি গ্রহণ করিতে রাখালদাস বাবুর ন্যায় কুণ্ঠিত হইতেন না। যে কারণে 'অ'কারের নীচে 'কমা'র ন্যায় চিহ্ন দ্বারা 'আ'কার সূচিত হইত, সেই কারণেই হয় ত, কোনও কোনও অক্ষরের সহিত কোনও কোনও প্রদেশে সেইরূপ চিহ্ন দ্বারাই আকার-চিহ্ন বিজ্ঞাপিত হইত।

আর কিছুদিন অপেক্ষা করিলেই বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় দামোদরপুরে আবিষ্কৃত তাম্রশাসন-পট্টক হইতে আমার আবিষ্কৃত তথ্যটির যাথার্থ্য আরও উত্তমরূপে উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

(১০) সপ্তম পংক্তির প্রথম অক্ষরটি 'চ' কি 'ব', তদ্বিষয়ে কাহারও সন্দেহ হওয়া উচিত নয়। 'চ' ও 'ব'এর প্রভেদ প্রতিবাদক মহাশয় এ স্থলে ধরিতে পারিয়াছেন বলিয়া আমার বোধ হয় না।

(১১) এই প্রসঙ্গেও প্রতিবাদক মহাশয় স্বকীয় প্রাচীন-লিপিতত্ত্ব-পারগতার পরিচয় দিবার ছলে, আমাকে বৃথাই অপ্রতিভ করিতে চাহিয়াছেন। কোন যুগে 'ই'কার কিরূপ-ভাবে লিখিত হইত, তাহার উপর তিনি এত বক্তৃতা না করিলেও হানি হইত না। আলোচ্য শাসন যে যুগের লিপি, তাহাতে 'ই'কার কিরূপ ভাবে লিখিত হইত, তাহা সকলেরই পরিজ্ঞাত। সপ্তম পংক্তিতে উল্লিখিত "থাদা (টা ?) পার"—বিষয়ের পূর্ব্বের অক্ষরদ্বয় "ইহ" কি "মহা", তাহাই তর্কের বিষয়। আমি আমার প্রথম প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম যে, যিনি গ্রামিক মহত্তরাদির নিকট ভূমিক্রয়ের প্রার্থনা জানাই-তেছেন, তিনি বিজ্ঞাপনের প্রারম্ভে [সপ্তম পংক্তির "বিজ্ঞাপিতা" শব্দের পরে]—কোন "বিষয়ে" [দেশবিভাগে] কত "অনুবৃত্ত" [প্রচলিত] মূল্যে এক "কুল্যবাপ" পরিমিত খিলভূমি বিক্রীত হইত, তাহা স্মরণ করিয়া বিজ্ঞাপন করিতেছেন,—"ইহ থাদা (টা ?) পারবিষয়েঽনুবৃত্ত-মর্য্যাদা—" ইত্যাদি। অন্যান্য ভূমিবিক্রয়-বিষয়ক তাম্রশাসনে এইরূপ রীতিরই পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। রাখালদাস বাবু কি ফরিদপুরে আবিষ্কৃত [ধর্ম্মাদিত্যের সময়ের] এবংপ্রকার ভূমিবিক্রয়-বিষয়ক তাম্রশাসনের [A. Grant—p. 195. Indian Antiquary, 1910] ১০ম পংক্তিতে লক্ষ্য করেন নাই যে, পুস্তপালগণের অবধারণার ফলে বলা হইতেছে যে, "অস্মীহ বিষয়ে" ইত্যাদি? "ইহ"কে যে তিনি কি ভাবে "মহা" পাঠ করিলেন, তাহা বুঝা মহা কঠিন। আলোচ্য শাসনের অন্যান্য স্থলের 'ম'-এর সঙ্গে, এ স্থলে যে অক্ষরটিকে তিনি 'ম' পড়িতে চাহিতেছেন, তাহার কোনও সাদৃশ্য আছে কি? বামদিকের দুইটি বিন্দু ও দক্ষিণদিকে একটি সরল রেখা লইয়া যে তৃতীয় হইতে পঞ্চম শতাব্দী পর্য্যন্ত 'ই'কার লিখিত হইত,তাহা লিপিতত্ত্বানু-শীলনকারিমাত্রই অবগত আছেন। এখানেও ইকারটি সেইরূপই উৎকীর্ণ আছে;—কেবল, বাম-দিকের বিন্দু দুইটির একটি অপরটির এত নিকটবর্ত্তী করিয়া উৎকীর্ণ হইয়াছে যে, ইহা মূলশাসনে অন্তর-যুক্ত দেখা গেলেও, ফটোগ্রাফের চিত্রে যেন বিন্দু দুইটি একীভূত হইয়াছে বলিয়া প্রতিভাত হয়। আর শব্দটি যদি "মহা" হইত, তাহা হইলেও, 'হ'-তে তিনি আকার চিহ্ন সংলগ্ন দেখিতে পাইলেন কোথায়? যদি এইরূপ 'ই'কারকে 'ম'কার পাঠ করিতে হয়, তাহা হইলে ফরিদপুরের আবিষ্কৃত সমাচারদেবের সময়ের তাম্রশাসনের ৯ম পংক্তিতে তিনি নিজেই যে শব্দটিকে "ইচ্ছাম্যহম্" পাঠ করিয়াছিলেন, সেই শব্দদ্বয়কে এখন হইতে তাঁহাকেও "মচ্ছাম্যহম্" পাঠ করিতে হইবে। দামোদরপুরের একখানি তাম্রশাসনেও আমরা অনুরূপ প্রয়োগ প্রাপ্ত হইয়াছি; যথা,— অমৃতদেবেন বিজ্ঞাপিতমিহ বিষয়ে" ইত্যাদি। তথাপি যদি মদুদ্ধৃত বিশুদ্ধ পাঠ "অপরূপ পাঠ" বলিয়া গৃহীত হয়, তবে উপায় কি? আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, বিদ্বৎ-সমাজে 'ইহ' পাঠই গ্রাহ্য হইবে; 'ইহ'কে 'মহা' পাঠ করিলে তাহাই "অপরূপ পাঠ" বলিয়া গণ্য হইবে।

(১২) বুলারের অক্ষরতালিকার চতুর্থ খণ্ডের ৫ম ও ৬ষ্ঠ স্তম্ভ খুলিয়া নিবিষ্টমনে দেখিলে প্রতিবাদক মহাশয় বুঝিতে পারিবেন যে, পঞ্চম শতাব্দীতে মূর্দ্ধণ্য 'ণ' কিরূপে লিখিত হইত, এবং অষ্টম পংক্তিতে "নীবীধর্ম্মক্ষয়ে"— অংশের পর সেইরূপ একটি অক্ষর আছে কি না? তিনি যে "ইহা 'মা' ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না" বলিয়া দৃঢ়োক্তি করিয়াছেন, তাহা অসঙ্গত ও অগ্রাহ্য।

(১৩) অষ্টম পংক্তিতে যাহা আমি "অনেনৈব ক্রমেন (ণ)" পাঠ করিয়াছি, সেই পাঠের প্রথম 'ন'কারে 'এ'কার-চিহ্নটি অস্পষ্ট বটে, কিন্তু দ্বিতীয় 'ন'কারে যে দুইটি 'এ'কার-চিহ্ন দ্বারাই 'ঐ'-কার সূচিত আছে, তাহা সকলেই স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছেন। সেই যুগে 'ঐ'কার কিরূপভাবে লিখিত হইত, তজ্জন্য বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে হরিষেণ-প্রশস্তিতে লিখিত 'ঐ'কারের আকার লক্ষ্য করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। তাঁহার এতটা ক্লেশ করিয়া সেই প্রশস্তি হইতে সাতটি উদাহরণ সংগ্রহ না করিলেও চলিত।

(১৪) প্রতিবাদক মহাশয়—"ক্রমেন(ণ)" [৮পং], "সর্ব্বমেব" [৯ পং], ও "দু(ত্ত)স্তেশ্বর" [১৭ পং]—মদুদ্ধৃত এই তিনটি শব্দের পাঠ সম্বন্ধে, বিশেষতঃ শব্দত্রয়ে স্থিত "মে" সম্বন্ধে সংশয়-প্রকাশ করিয়াও বলিয়াছেন যে, প্রথম দুই স্থলে "মে" পাঠ করিলে অর্থ করিবার সুবিধা হয় বটে, কিন্তু "তথাপি অর্থসঙ্গতির অনুরোধে, অপর কোনও বিশ্বাস-জনক প্রমাণের অভাবে, এইরূপ গুরুতর কথা স্বীকার করা যাইতে পারে না।" ১১শ পংক্তিতে "কুল্যবাপমেকং" স্থলেও "মে" কিরূপ উৎকীর্ণ আছে, তাহাও দ্রষ্টব্য। নিম্নে ২০শ আলোচনায় এই কথাটির আরও একটু অধিক আলোচনা করা যাইবে। "মে"-কে যদি, তাঁহার মতানুসারে, 'ল'ই পাঠ করিতে হয়, তাহা হইলেও বলিতে হইতেছে যে, প্রথম শব্দ দুইটির 'ল' ব্যতীত আলোচ্য শাসনে ব্যবহৃত অন্যান্য 'ল' ভিন্ন প্রকারের। কারণ, তিনি একটি অদ্ভুত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, "খ্রীষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে উত্তরাপথের পশ্চিমভাগে যে শ্রেণীর অক্ষর ব্যবহৃত হইত, তাহাতে যেরূপ আকারের "ল" দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ আকারের অক্ষর ধানাইদহের তাম্রশাসনে অন্ততঃ দুইবার ব্যবহৃত হইয়াছে।" বিজ্ঞান-সম্মত-প্রণালীর বশবর্ত্তী হইয়াই আমি এইমাত্র বলিতে চাই যে, এই কয়েক স্থলেই 'এ'কার চিহ্নটি মাত্রার উপরিভাগে ব্যবহৃত না হইয়া, অক্ষরের বামকোণে বক্রাকৃতি করিয়া সূচিত হইয়াছে।

(১৫) মূলশাসনে আমার নিকট একটি 'ঐ'কার চিহ্ন প্রতীয়মান হইয়াছে বলিয়া, আমি নবম পংক্তিতে 'অভিহিত' শব্দের সহিত, সংশয়-সূচক (?) চিহ্ন দিয়া, 'ঐ'কার সংযোগ করিয়াছি।

(১৬) উক্ত পংক্তিতে "কুটুম্বিভিঃ" শব্দের পূর্ব্বস্থিত "প্রতিবেশী" শব্দের "শি" অক্ষরটি মূল-শাসনে দেখিতে পাওয়া যায়; এই জন্য অস্পষ্ট তৃতীয় অক্ষরটিকে "বে" মনে করিয়া, প্রশ্নবোধক-চিহ্নসহকারে "প্রতিবেশি (?)-কুটুম্বিভিঃ" পাঠ করিয়াছি। তাহাতে আমার অপরাধ হইল কি প্রকারে? "বেশি" এই অংশ বন্ধনীমধ্যে আবদ্ধ রাখিলে, আমার অপরাধের মাত্রা কমিয়া যাইত!

(১৭) রাখালদাস বাবুর প্রতিবাদ অপেক্ষা করিয়া, দশম পংক্তির প্রথম শব্দটির [অর্থাৎ, যাহা

তাঁহার মতে "পরিত্যক্তেন"] পাঠ আমি পরিত্যাগ করি নাই;—যে কয়েকটি অক্ষর আমার নিকট স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইয়াছে, তাহারই যথাস্থানে উল্লেখ করিয়াছি। ইহা বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীর অনুমোদিত নহে কি?

(১৮) এই পংক্তিতে আমি যে শব্দদ্বয়কে "স্ববধৃতমিতি" বলিয়া পাঠ করিয়াছি, তৎসম্বন্ধে প্রতিবাদক মহাশয় বলিতেছেন যে, এই স্থলে কেবল "মিতি" স্পষ্ট আছে; তৎপূর্ব্বস্থিত অক্ষরটি "ত" কি "ক", তাহা বলিতে পারা যায় না। যে কেহ তাহা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়-কৃত "বাঙ্গালার ইতিহাসে" সংযোজিত প্রতিকৃতিতেও দেখিতে পাইবেন যে, অক্ষরটি "ত"। "তদবধৃত" শব্দদ্বয়ের 'ব'কারটি পংক্তির নীচে উৎকীর্ণ হইয়াছে—মূলে তাহাও স্পষ্ট বিদ্যমান আছে। আমার প্রবন্ধে ["সাহিত্য"—পৌষ-সংখ্যা, ৫৯১ পৃ] পাদটীকাতেও ইহা বলা হইয়াছে। মূলে "তথেতি"—শব্দদ্বয়ের "থে" স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু রাখালদাসবাবু বলিতেছেন যে, "অক্ষরটি অত্যন্ত অস্পষ্ট"। সুতরাং তাঁহার মতে, আমার "মত আদর লাভ করিবে না।" আমার "তথেতি" পাঠটি প্রকৃতপ্রস্তাবে "তথেতি" বলিয়াই সুধীসমাজে গ্রহণ করিবেন, এরূপ আশা করা অসঙ্গত নহে।

(১৯) শ্রীযুক্ত পার্জ্জিটার মহোদয়ের ফরিদপুরে আবিষ্কৃত তাম্রশাসনত্রয়ের "অপবিঞ্ছ্য" পাঠ দেখিয়া যে রাখালদাস বাবু ধানাইদহ-লিপির ["দশম পংক্তি" নহে] একাদশ পংক্তিতে ঐ শব্দের অস্তিত্ব বুঝিতে পারিয়া, তাহা বঙ্গীয় এসিয়াটিক্ সোসাইটীর পত্রিকায় স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহা আমি জানিতাম না। কিন্তু সেই তাম্রশাসনগুলির পাঠের সাহায্যে "অপবিঞ্ছ্য" শব্দের পূর্ব্বে ও পরে অবস্থিত শব্দ কয়টি তিনি যে কেন বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই, তাহা বলা কঠিন। সেই শব্দগুলি পাঠ করিতে না পারিলে, সমগ্র লিপির অর্থবোধ অসম্ভব।

(২০) বহুকষ্টে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় স্বীকার করিয়াছেন যে, একাদশ পংক্তিতে আমার "ক্ষেত্রকুল্যবাপ" পাঠ সম্ভবতঃ মূলানুগত। কিন্তু মদুদ্ধৃত "ক্ষেত্রকুল্যবাপমেকং দত্তং"—এই স্পষ্টরূপে উৎকীর্ণ সমগ্র পাঠটি মূলানুগত কি না,—ততখানি তিনি স্বীকার করিলেন না কেন, তাহা পাঠকবর্গ বুঝিয়াছেন কি? যদি "কুল্যবাপম্+একম্"—এই শব্দদ্বয়ও আমি ঠিক পাঠ করিয়া থাকি বলিয়া তিনি স্বীকার করেন, তাহা হইলে ব্যাকরণের সন্ধি-সূত্রানুসারে শব্দদ্বয়মধ্যে যে "মেকং" অংশটুকু প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে "ম"-এ "এ"কার-চিহ্ন কিরূপে যুক্ত হইয়া তাম্রপট্টে "মে" লিখিত হইয়াছে, তাহা ধরা পড়িয়া যায়, এবং তাহা হইলে, প্রতিবাদকের প্রতিবাদ-প্রবন্ধের চতুর্দ্দশ প্রসঙ্গের আলোচনায় আমার উপর যথেচ্ছভাবে বর্ষিত বাক্যবাণের তীক্ষ্ণতা নষ্ট হয়, এবং "ল"-এর উপর তাঁহার পূর্ব্বোল্লিখিত বক্তৃতা উড়িয়া যায়। এই প্রকার অর্দ্ধ-স্বীকৃতি বিজ্ঞান-সম্মত-প্রণালীর অনুমোদিত হইতে পারে না।

(২১) দ্বাদশ পংক্তিতে যে শব্দকে আমি সংশয়সহকারে প্রশ্নবোধক চিহ্ন সহ "ত্রা (?) তৃ" বলিয়া পাঠ করিয়াছি, তাহার দ্বিতীয় অক্ষরটি প্রতিবাদকের মতে "তু ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না"। এই অক্ষরটির নীচে উভয় পার্শ্বে যে দুইটী চিহ্ন দেখিয়া তিনি উহাকে দীর্ঘ-উকারের চিহ্ন মনে করিয়াছেন, তাহার একটি, অর্থাৎ দক্ষিণের চিহ্নটি, অক্ষরের জন্য উৎকীর্ণ

কোনও চিহ্ন নহে ; উহা তাম্রপট্টের জীর্ণতানিবন্ধন ক্ষয়চিহ্ন (আর যদি এরূপ চিহ্নই দীর্ঘ-উকারের চিহ্ন হইয়া থাকে) এবং যদি অক্ষরটি "ভূ"ই হয়, তাহা হইলে আমার অনুরোধ যে, রাখালদাস বাবু ইহার অনুরূপ অক্ষর দেখাইয়া দিয়া নিজের দৃঢ়োক্তির সমর্থন করিবেন। আর আমি যে স্থানে "কটক-বাস্তব্য" ইত্যাদি পাঠ করিয়াছি, সে স্থানে 'কটক'-শব্দের পর যাহা লিখিত আছে, তাহা, প্রতিবাদকের মতে, পাঠকের "কল্পনাশক্তির অত্যধিক প্রাবল্য না থাকিলে 'বাস্তব্য' পাঠ করা যায় না"। তিনি কি লক্ষ্য করিয়াছেন যে, পূর্ব্বপংক্তিস্থিত "অপবিষ্ণ্য"-শব্দের "ষ্ণ"-অক্ষরে যুক্ত 'য'-ফলা চিহ্নটি দ্বাদশ পংক্তির মধ্যস্থলে লম্বমান হইয়া পড়ায়, একটি অক্ষরের স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে, এবং সেই মধ্যস্থলে লম্বমান 'য'-ফলা চিহ্নের পরই "বাস্তব্য"-শব্দের তৃতীয় অক্ষরটি ["ব্য"] ক্ষোদিত আছে। তাহার পূর্ব্ব অক্ষর দুইটি "বাস্ত" কি নয়, তাহা এখন পুনরায় দেখিলেই তিনি বুঝিতে সমর্থ হইবেন।

(২২) আবার প্রতিবাদক মহাশয়ের আমার প্রতি একটি অবৈধ কটূক্তি। যাহা মূলানুগত পাঠ আছে, আমার কৃতবিদ্য বন্ধু বান্ধবের মধ্যে কেহ যে তাহার অপলাপ করিয় সে স্থলে অপ্রকৃত পাঠ সংযোজিত করিতে আমাকে অনুরোধ করিবেন, এরূপ অন্যায় কথা রাখালবাবুর মত লোক কিরূপে মনে করিতে পারেন, তাহার কারণ অনুসন্ধেয়। কথা হইতেছে, দ্বাদশ পংক্তিতে তাঁহার "ছণ্দ (ন্দ) শ" পাঠ ঠিক, কি আমার "ছন্দোগ" পাঠ ঠিক ? প্রথম কথা, 'ছ'-তে আকার আছে কি না ? প্রতিবাদক বলেন যে, তাহাতে আকার আছে, এবং আমি "কোন্ বিদ্যার বলে স্পষ্ট আকারটি লোপ" করিয়াছি, তাহা সহজে বুঝিতে পারা যায় না। এই লিপির কোনও কোনও স্থলে [যথা, ৬ষ্ঠ পংক্তির "সোমপাল" শব্দের 'ম'তে] অক্ষরের সহিত আকার-চিহ্ন যুক্ত না হইলেও, সেই অক্ষরের মাত্রার বাম কোণটি বক্রাকৃতি লক্ষিত হয়। আর, যদি 'ছ'-তে এই স্থলে প্রতিবাদকের মতানুসারে 'আ'কার-চিহ্ন-যোগ স্বীকারই করা যায়, তথাপি শব্দটি যে "ছান্দোগ" হইবে, কখনই "ছণ্দ (ন্দ) শ" হইবে না, বা হইতে পারে না, তাহাই দেখাইতেছি। তিনি বলিয়াছেন যে, 'ন্দ'-অংশে দন্ত্য ন ব্যবহৃত না হইয়া, মূর্দ্ধণ্য-ণ ব্যবহৃত হইয়াছে, কারণ. [তিনি লিখিয়াছেন] "ন্দ" লিখিত হইলে "ন" এর মাত্রা লোপ হয় না, যথা হরিষেণ-প্রশস্তির ২১শ পংক্তিতে উল্লিখিত "নন্দি" শব্দে। বিনা স্বর-সংযোগে, বা ইকারাদি-স্বর-যোগে 'ন্দ'-তে মাত্রা থাকে, কিন্তু ও-কারের সহিত সংযুক্ত দন্ত্য-ন কিরূপে লিখিত হইত, তাহা আলোচ্য শাসনের এই দ্বাদশ পংক্তির "বরাহস্বামিনো" শব্দের 'নো'-কি ভাবে লিখিত হইয়াছে, পাঠকবর্গ তাহা দেখুন। আর, হরিষেণ-প্রশস্তির ২৪শ পংক্তিতে "কন্দোপায়ন" শব্দের "ন্দ"-তে ও-কার-চিহ্ন কিরূপে উৎকীর্ণ হইয়াছে, রাখালদাস বাবু তাহা পুনরায় দেখুন, এবং দেখিয়া বলুন যে. আলোচ্য স্থলেও দন্ত্য-ন-যুক্ত দ-কারে অর্থাৎ 'ন্দ'-তে 'ওকার-চিহ্ন আছে কি না ? অথবা ইহা মূর্দ্ধণ্য-ণ-যুক্ত দকার। তিনি এখানে ['নো'-স্থলে] যাহাকে 'ণ' মনে করিতেছেন, এই পংক্তিতেই অবস্থিত "ব্রাহ্মণ" শব্দের 'ণ'কারের সহিত তাহার কি কোনরূপ সাদৃশ্য আছে ? তার পর, তৃতীয় অক্ষরটি 'ন' কি 'শ' ? জিজ্ঞাসা করি, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কি ইহাকে তালব্য 'শ' পাঠ করিতে চাহেন ? আমি নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে, আমি 'শ'-এর উদর কর্ত্তিত দেখিতেছি না। তবে ইহাকে তালব্য'শ' পড়িব কি প্রকারে ? আর একটি কথা, যদি শব্দটির "ছাণ্দ (ন্দ) শ"-পাঠই মূলানুগত

পাঠ হইত, তাহা হইলে রাখালদাস বাবুকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি যে,"ছন্দস্" শব্দটিতে দন্ত্য 'স' থাকিবে, কি তালব্য 'শ' থাকিবে ? সংস্কৃত ভাষার ব্যুৎপত্তি প্রত্নতত্ত্বে পদে পদে প্রয়োজনীয়। "ছান্দস" হইলে শব্দটি দন্ত্য'স'যুক্ত হইবে। তাম্রপট্টে স্পষ্টভাবে উৎকীর্ণ "ছন্দোগ" বা ছান্দোগ শব্দটিকে "ছান্দস"—শব্দের অর্থে প্রযুক্ত করিতে হইলেও, প্রতিবাদককে নিজপাঠ সম্বন্ধে [অর্থাৎ "ছাণ্দ(ন্দ)শ" পাঠ সম্বন্ধে] দুইটি গর্হিত ভুল কল্পনামূলে স্বীকার করিতে হয়,—সে দুইটী ওকারযুক্ত দন্ত্য ন-স্থানে ('নো') মূর্দ্ধণ্য ণ, এবং দন্ত্য-স স্থানে তালব্য'শ'-পাঠ।

(২৩) দ্বাদশপংক্তির শেষ অক্ষরদ্বয়কে আমি "তধ্ব" না পড়িয়া কেন "তন্ধ" পাঠ করিয়াছি, তাহা রাখালদাস বাবুর "আক্ষেপের বিষয়"। গুপ্তযুগে 'ধ' যে কখনও কথঞ্চিৎ ত্রিকোণাকার ছিল, তাহা কি তিনি বুলারের তালিকায় বা তৎকালীন কোনও লিপিতে দেখেন নাই ? প্রথমকুমারগুপ্তের ১১৭ সংবৎসরের [ফাইজাবাদ জেলার ভরাধাড়ীতে আবিষ্কৃত] লিপির যে পাঠ তিনি ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের বঙ্গীয় এসিয়াটিক্ সোসাইটীর পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়াছেন, সেই লিপির সপ্তম পংক্তিতে "মহারাজাধিরাজ" শব্দে, নবম পংক্তিতে "ধার্ম্মিক" শব্দে ও দশম পংক্তিতে "আযোধ্যিক" শব্দে 'ধ' যে ভাবে উৎকীর্ণ আছে, তাহা ভালরূপ লক্ষ্য করিলে, তিনি স্বপ্রদত্ত গালির জন্যই "আক্ষেপ" করিবেন।

(২৪) ত্রয়োদশ পংক্তিতে প্রতিবাদকের "ভূম্যাদানক্ষেপ" পাঠে, মুদ্রাকর-প্রমাদ-বশতঃ এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় ৪৭১ পৃষ্ঠায় "ন"তে "অ"লোপ হইয়াছে না বলিয়া, 'আ'টী লোপ হইয়াছে বলাই উচিত ছিল।

(২৫) একাদশ পংক্তিতে "আযুক্তক"-শব্দটিকে ঠিক পাঠ করিয়াও আমাকে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট গালি খাইতে হইয়াছে। এই 'আ'কারের রূপ-দর্শনের জন্য তিনি আমাকে বুলারের Indian Palæography নামক গ্রন্থের তৃতীয় চিত্রের প্রথম স্তম্ভত্রয়ে মনঃসংযোগ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। আমি তাঁহাকে সেই গ্রন্থের চতুর্থ চিত্রের সপ্তম, অষ্টম ও নবম স্তম্ভ দেখিতে অনুরোধ করিতেছি। যদি তিনি এই শব্দের প্রথম অক্ষরকে "সু" পাঠ করেন, তাহা হইলে, উপরি-উল্লিখিত ভরাধাড়ী-লিপির যে শব্দকে তিনি "আযোধ্যিক" পাঠ করিয়াছেন, তাহাকে "সুযোধ্যক" পাঠ করুন; এবং সমাচারদেবের সময়ের তাম্রশাসনে তিনি যে শব্দকে "আক্ষেপ্তা" পাঠ করিয়াছেন, তাহাকে "সুক্ষেপ্তা" পাঠ করুন। গুপ্তযুগে যে এই "আযুক্তক" শব্দটি প্রচলিত ছিল, আমার বিশ্বাস, প্রতিবাদক মহাশয় তাহা অবিদিত নহেন। ২০৭ গুপ্তসংবতের প্রথম ধ্রুবসেনের গণেশগড়-শাসনে [Epi. Ind. Vol. III, p. 320] এবং ২৮৬ গুপ্তসংবতের প্রথম শিলাদিত্যের নবলক্ষ্মী-শাসনে [Epi. Ind., Vol XI, p. 179] এই "আযুক্তক" শব্দটি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। Fleet-এর Gupta Inscription নামক গ্রন্থের ১৬৯ পৃষ্ঠার পাদটীকাও দ্রষ্টব্য। পাণিনির ২।৩।৪০ সূত্রে ["আযুক্ত-কুশলাভ্যাং চাসেবায়াম্"] 'আযুক্ত' শব্দের প্রয়োগ আছে। হরিষেণ-প্রশস্তির ২৬শ পংক্তিতে "আযুক্ত-পুরুষ" শব্দের উল্লেখ আছে।

(২৬) সপ্তদশ পংক্তিতে লেখকের নামের প্রথম অক্ষরটি যে "সু", "স্ত" নহে, তাহা কি আমি সমুদ্ধৃত পাঠে দেখাই নাই ? রাখালবাবু তাঁহার প্রতিবাদ-প্রবন্ধেও আমার যে পাঠ ছাপাইয়াছেন, তাহাতেও আমি যে প্রথম অক্ষরটিকে "সু" স্বীকার করিয়া লইয়া (বন্ধনীমধ্যে)

ইহাকে "স্তু" রূপে পাঠ করিয়াছি, তাহা বিদ্যমান আছে। তৎপরস্থিত অক্ষরটি যে কিরূপে "স্ত" হইতে পারে, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

প্রতিবাদে বৃথা উত্থাপিত কূটতর্কের মীমাংসার জন্য বর্ত্তমান প্রবন্ধের অতিবিস্তার ঘটিল। রাখালদাস বাবুর ন্যায় এক জন প্রথিতনামা প্রত্নতত্ত্ববিৎ প্রতিবাদ প্রকাশ করিয়া নিজের ভুল-ভ্রান্তির অসঙ্গতরূপে সমর্থনের প্রয়াস করায়, কর্ত্তব্যবোধে তাঁহার প্রতিবাদের প্রতিবাদ-রূপে এই প্রবন্ধরচনা অকর্ত্তব্য বিবেচিত হইবে না। সত্যনির্দ্ধারণই উভয়ের একমাত্র লক্ষ্যের বিষয় — সত্যের আলোচনার জন্যই প্রতিবাদের প্রতিবাদ করিতে হইল। ব্যক্তিবিশেষের প্রতিপত্তি-হানি কাহারও উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নয়। বিশেষতঃ, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট বাঙ্গালী অনেক বিষয়ে ঋণী। তিনি স্থিরচিত্তে সত্যের প্রতি অধিকতর মনঃসংযোগ করিয়া প্রত্নতত্ত্বের অনুশীলন করিলে, দেশের অধিকতর উপকারসাধন করিতে পারিবেন। বিদ্যা-বিষয়ক বিরোধে মনোবিকার আসিয়া আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া সত্যোদ্ধারের পথ যেন রুদ্ধ না করে।

শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

অর্চ্চনা। ফাল্গুন।—শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্যের 'সংস্কৃত নাটকে বিদূষকের চিত্র' এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই।—যতটুকু ছাপা হইয়াছে, তাহাতে কোনও বিশেষত্ব দেখিলাম না। 'বৈচিত্র্যই নাটকাদির জীবন' হইতে পারে, কিন্তু কেবল বৈচিত্র্যবিধানের জন্যই সংস্কৃত নাটকে বিদূষকের সৃষ্টি, এবং 'অতএব সংস্কৃত নাটকের পঞ্জরস্বরূপ এই বিদূষক'—লেখকের এই নির্দ্দেশ যুক্তিযুক্ত বা বিচারসহ নহে। সংস্কৃত নাটকের বিদূষক ঘটনার বিকাশ ও চরিত্রপুষ্টির সাধনও বটে। রচনাটির সূচনায় অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় নাই। 'ও পারের কথা'র লেখকের 'রাসলীলা'ও এখনও শেষ হয় নাই। 'প্রকৃত প্রেম জ্ঞানের লক্ষ্মীশ্রী' বলিলে কি বুঝায়, তাহা ত বুঝিলাম না। অন্যত্র, '"আত্মহারা" চিত্তবৃত্তিনিরোধের অবস্থা।' ইহাও সকলে স্বীকার করিবেন না। যে আপনাকে হারায়, সে কি চিত্তবৃত্তির নিরোধ করিতে পারে? সম্পাদক শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্তের 'গৃহস্থের বউ' পড়িয়া নিরাশ হইয়াছি। কেশববাবু কি পাকা ঘুঁটী কাঁচাইয়া ছকের চারি দিকে ঘুরিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন? গল্পের আখ্যানবস্তু 'ছোট গল্পে'র উপযোগী নহে। গল্পটী ছোট বটে, কিন্তু 'ছোট গল্প' নহে। ব্যারিষ্টার-প্রবর চিত্তরঞ্জন ভাড়াটে প্রতিভার মারফৎ বেশ্যার কাহিনী বিতরণ করিতেছেন। উকীল-প্রবর কেশবচন্দ্রও সেই পথের পথিক হইলেন! এমন বিষয় লইয়া সৃষ্টিকুশলী, ক্ষমতাশালী স্রষ্টা গল্প লিখিবেন না, এমন কথা বলি না। কিন্তু যে সংযমে এমন গল্প ভদ্রসমাজের পথ্য হইতে পারে, সেই সংযম নহিলে এমন গল্পে পূতিগন্ধ ভিন্ন আর কিছু থাকে না। যে প্রতিভা রাংকে সোনা করিতে পারে, সে প্রতিভাকেও অত্যন্ত সাবধানে ও সসঙ্কোচে এমন সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত হইতে হয়। গল্পের জগতে ইহা কেউটে, হেলে নয়। পক্ষান্তরে, যে স্বাভাবিকতার অনুরোধে কেশববাবু এই গল্পের প্রথম স্তরে অনেক বেশ্যাতত্ত্ব ঢালিয়া দিয়াছেন,

প্রকৃতপক্ষে 'গৃহস্থের বউ' তাহাতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হইয়াছে। ইহার আদ্যোপান্তই অস্বাভাবিক। আগুন লইয়া খেলা করিতে গেলে, যথেষ্ট সাবধান হইতে হয়। কিন্তু লেখক ইহার 'আদাবস্তে চ মধ্যে চ' অত্যন্ত অসাবধানে কলম চালাইয়াছেন।—কেশববাবু সহসা এত 'তালকাণা' হইলেন কেন? যে 'বড়মানুষের ছেলে' বেশ্যার 'পায়ের কাছে' একখানা বাড়ীর দানপত্র রাখিয়া দিতে পারে, সে 'তাহার পরদিন'ই 'তাহার বিবাহিতা স্ত্রীর কানের হীরার টপ্ চুরী করিয়া আনিয়া বেশ্যার কানে পরাইয়া দিল' কেন, তাহার কোনও স্বাভাবিক কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।—কেশব বাবুর 'সাইকলজী'ও অত্যন্ত অদ্ভুত! তাহার সিদ্ধান্তগুলিও অত্যন্ত সাংঘাতিক। 'লম্পট বহু নারীর ভজনা করে সেই একনিষ্ঠার সম্পূর্ণ সুখটুকু ভোগ করিবার জন্য। সেটুকু পায় না বলিয়াই সে একের পর এক অনেক গণিকার দ্বারস্থ হয়।' কেশববাবু উকীল। লম্পটের লাম্পট্যের তিনি যে ওকালতী করিয়াছেন, তাহা অতুলনীয়। কামটাকে একবারে নির্ব্বাসিত করিয়া তিনি মজ্জমান লম্পটকে একনিষ্ঠার তৃণ ধরিয়া পরিত্রাণ পাইবার সদুপায় করিয়া দিয়াছেন!—তাহার পর, 'যে প্রথমেই সেটুকু পায়, সে আর অন্যের দিকে তাকায় না।' ইহাও সম্পূর্ণ 'ন্যায়'-সঙ্গত! কারণ, ন্যায়শাস্ত্র বলেন,—'প্রথমোপস্থিতপরিত্যাগে প্রমাণাভাবঃ।' কেশব বাবুর 'দেবী' বলিতেছে,—'এক জন বাঙ্গালী উকীলের সঙ্গে ইনি আমাদের বাড়ী আসিয়াছিলেন। * * * আমি নায়ডুর দিকে দেখিলাম। লোচন উকীলের দিকে দেখিলাম। হাসিয়া বলিলাম, "এ আবার কাল পাষাণের দেবতা কোথা থেকে আন্‌লে?"'—বাঙ্গালী উকীলেরা যে এ পেশাও ধরিয়াছেন, আমরা তাহা জানিতাম না। অবশ্য, কেশব বাবুই এ বিষয়ে আমাদের authority!—এই বেশ্যাটি ইংরেজী ভাষায় এমন পণ্ডিত যে, মান্দ্রাজী নায়কের সঙ্গে ইংরেজীতে কথা কহিয়াছিল। নতুবা গল্পই হয় না।—লেখক অনেক সাংঘাতিক ethics-এরও সৃষ্টি করিয়াছেন। মান্দ্রাজী নাগর বেশ্যা নায়িকাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিলে, বেশ্যা বলিল,—'আমি যে বেশ্যা! আমাকে প্রকাশ্যে বার করতে পারবে? মা বোনের কাছে নিয়ে যেতে পারবে? আমার অতীত ভুল্‌তে পারবে?' নায়ক বলিল, 'কোনও লজ্জা নাই! তোমার ভিতর ধর্ম্ম আছে। "যাদের আমরা বিবাহ করি, পূর্ব্বজন্মে তারা কি ছিল কে জানে!" ধর, আজ তুমি জন্মালে, অতীতটাও জন্মের কথা। মান্দ্রাজে চলে যাব। সেখানে নূতন জীবন, নূতন পারিপার্শ্বিক অবস্থা!' কেশব বাবু পূর্ব্বেই বলিয়া দিয়াছেন, নায়ডু উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। বাস্তবিক, নায়ডু সে সময়ে উন্মত্ত না হইলে, কেশব বাবুর গল্পটি মাঠে মারা যাইত। কিন্তু কেশব বাবুও কি উন্মত্ত হইয়াছেন? 'যাদের আমরা বিবাহ করি, পূর্ব্বজন্মে তারা কি ছিল কে জানে'—পাগলে ভাবুক, কেশব বাবুর মত ভদ্রসন্তানও খেলো উদারতার অনুরোধে এমন কথা উচ্চারণ করিলেন? তাঁহার বাড়ীতে কি নারকেল-মুড়ী ব্যবস্থা করিবার কেহ নাই?—কেশব বাবু বিশাল মান্দ্রাজের একটা বিন্দু—ওয়াল্‌টেয়ারে ছুটীর কয়েক দিন কাটাইয়া মান্দ্রাজের সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থায় এমন ব্যুৎপন্ন হইয়াছেন যে, অম্লানবদনে ফয়তা দিয়াছেন, 'মান্দ্রাজে চলে যাবে।' মান্দ্রাজের প্রতি অত্যন্ত সুবিচার বটে। অনেক জিনিস 'চলে যায়' বটে, দুই একটা অসম্ভবও চলে বটে, কিন্তু তাহাই 'সাধারণ নিয়ম' নহে; তাহা 'নিয়মের ব্যতিক্রম'। উপসংহারে একবারে সিদ্ধান্তের climax! কেশব বাবুর

দেবী বলিতেছে,—'তাহার পর ছোট কথা! হিন্দু সমাজ আমায় লইবে না। * * * ব্রাহ্ম-সমাজ কুণ্ঠাবোধ করিল। সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা! বৃথা দম্ভ!'—বেশ্যার পক্ষে ও কেশব বাবুর পক্ষে কথাটা ছোট হইতে পারে, কিন্তু সমাজের পক্ষে তত ছোট নয়। কথাটা খুব বড় কথা। আশ্চর্য্য এই যে, বেশ্যা-চরিত্রের এত 'খুঁটীনাটী' যাঁহার চোখে এত বড় হইয়া প্রতিফলিত হইয়াছে, এই বড় কথাটা তাঁহার বিচারে ছোট হইয়া গিয়াছে! ব্রাহ্মসমাজ সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার ভক্ত, অতএব সে কেশব বাবুর মত উদার ও গ্রহণে নির্ব্বিকার হইতে বাধ্য, শাস্ত্রে, বা ফৌজদারী আইনে এমন কোনও যুক্তি আছে কি? 'বৃথা দম্ভ!' বৃথা দম্ভটা কি কেশব বাবুর ন্যায় মুখভারতী সংস্কারকগণেরই একচেটে নহে? ভাবা সম্বন্ধেও তাল কাটিয়াছে। যথা,—'নায়কের দিকে দেখিলাম।' 'ধর্ম্ম সৃজন করিলাম।' 'কি আনন্দ! কি পুলক!' অর্থাৎ, বিবাহের সম্ভাবনায় নায়িকার লোমহর্ষণ হইয়াছিল। সুশীলা বলিতেছে,—'এই আমার যথেষ্ট অভিব্যক্তি।' কেশব বাবুর মত বেশব বাবুর দেবীও ডারউইন পড়িয়াছিল। গল্পের গোড়ায় কেশব বাবু তাহা লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। গল্পটির উদ্দেশ্য উচ্চ; কিন্তু কেশব বাবু তাহাতে আবিলতা মাখাইয়া স্বাভাবিক করিবার চেষ্টা করিয়া 'হিতে বিপরীত' করিয়াছেন। এমন গল্প যে সংযম ভিন্ন কোনও মতে সফল হইতে পারে না, সে সংযম ইহাতে নাই। এত অসাবধান হইয়া এমন গল্প লিখিতে নাই। শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষালের 'মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের গ্রন্থাবলী' উল্লেখযোগ্য।

সবুজ পত্র।—ফাল্গুন। বসন্তে বাঙ্গালা দেশে সবুজ পত্র এমন বিবর্ণ, শুষ্ক, শ্রীহীন হইল কেন? সংবাদপত্রে যাহা শোভা পায়, তাহাতেই এবার সবুজ পত্রের ঝাঁকা পূর্ণ হইয়াছে। 'শিরোবেষ্টনপূর্ব্বক নাসিকা-প্রদর্শনের চেষ্টা' সকল প্রবন্ধে সুস্পষ্ট। যে কথা এক পৃষ্ঠায় বলা যায়, তাহা ফেনাইয়া, ফাঁপাইয়া, খুব বড় করিয়া তোলাই সবুজ পত্রের মুন্সীয়ানা! দৃষ্টান্তস্বরূপ সম্পাদকের 'আমাদের শিক্ষা' নামক প্রবন্ধটি উল্লিখিত হইতে পারে। রবীন্দ্রনাথ যখন 'সাধনা'র সম্পাদক ছিলেন, তখন একদিন বলিয়াছিলেন,—'নূতন লেখকগণের লেখা হাতে পড়িলেই মনে হয়, প্রবন্ধের অন্ততঃ প্রথম দুইটা প্যারা অনায়াসে ফেলিয়া দেওয়া যায়। দুই তিনটা প্যারার পর আসল প্রবন্ধ আরম্ভ হয়।' এ রচনাটির প্রথম 'পাঁয়তারা' দেখিয়া সেই কথা মনে পড়িল। 'আমাদের শিক্ষা' সম্বন্ধে প্রমথবাবু নূতন কথা বলেন নাই। এ সম্বন্ধে কথা উঠিলে সকলে যাহা বলে, তাহাই ঘুরাইয়া, ফিরাইয়া, মোচড়াইয়া, পাকাইয়া, বিনাইয়া বলিয়া, অবান্তর কথার বুকনী দিয়া, প্রমথবাবু পরামর্শ দিয়াছেন,—'দেশশুদ্ধ লোককে আমাদের শিক্ষা সম্বন্ধে একটু মনোযোগ দিতে অনুরোধ করি, যাতে ক'রে আমরা এ বিষয়ে একটা সঙ্গত public opinion খাড়া করতে পারি।' সমস্ত রচনাটিই এই সিদ্ধান্তটুকুর ভূমিকা। ভূমিকায় অনেক কথা আছে, কিন্তু তাহা কথার ফেনা। 'শিক্ষা' কি, সে সম্বন্ধেও সম্পাদকের ধারণা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাই বোধ হয় লেখকের মতে 'শিক্ষা'। ভারতবর্ষে শিক্ষার শত পথ মুক্ত ছিল। সে পথগুলি প্রায় লুপ্ত হইয়াছে। অক্ষর-পরিচয় ও পুঁথি-পাঠই 'শিক্ষা'র একমাত্র উপায় নহে। পুঁথি-পাঠের শিক্ষা সম্বন্ধেই লেখক ভাসা-ভাসা আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু মূলানুসন্ধানে অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। যাঁহারা শিক্ষা দেন, এবং

শিক্ষা পান, এ দেশে তাঁহাদের স্বার্থ এক নহে। শিক্ষার মালিক যেরূপ শিক্ষাপদ্ধতি নিরাপদ মনে করেন, তাহার ফলে মনুষ্যত্ব ফুটিতে পারে না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'হট্-হাউসে'র চারা। এই বিদেশী চারা কোনও মতে বাঁচিয়া আছে; কৃত্রিম আবেষ্টনে স্বাভাবিক বিকাশের আশা করা যায় না। যে শিক্ষা ভারতবাসীর মনুষ্যত্ব-লাভের অনুকূল, সে শিক্ষার অবকাশ কৃত্রিম বিশ্ববিদ্যালয়ে নাই :—জাতীয় শিক্ষা জাতীয় আদর্শেই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশের শিক্ষায় জাতীয় সাহিত্য, তন্ত্র, চিন্তা, অবদান প্রভৃতির কোনও সম্পর্কই নাই। জাতীয় আদর্শেই সকল দেশে শিক্ষার প্রতিষ্ঠা হয়। আমাদের দেশে সে আদর্শ আর যাহাই হউক, জাতীয় নহে —এ শিক্ষা সরকারী। আবার সমগ্র দেশ এ শিক্ষাও গ্রহণ করিতে পারে না। এ দেশে পুস্তকের পাতা না খুলিয়াও শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা ছিল। সেই শিক্ষার পথটা আবার মুক্ত ও প্রশস্ত করিতে পারিলে, দেশে জ্ঞানের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইতে পারে। যাহারা কখনও শিক্ষামন্দিরের মা সরস্বতীর মুখ দেখে নাই, এবং যাঁহারা এ দেশের, বিদেশের, অথবা উভয় দেশের বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিদ্যার ছালা পূর্ণ করিয়া কূপমণ্ডূক হইয়াছেন, এই উভয়ের পক্ষেই সে শিক্ষা সমান সুপথ্য। পক্ষান্তরে, স্বদেশী তন্ত্র ভাল হউক, মন্দ হউক, তাহার পরিচয় না পাইলে, মানুষ 'মানুষ' হইতে পারে না। 'ভারতীয় শিক্ষা'ই ভারতবাসীর মন গড়িতে পারে। কিন্তু এখন 'বিজাতীয়' শিক্ষার যে বস্তুর সৃষ্টি হইতেছে, তাহা উৎকৃষ্ট হইতে পারে, কিন্তু ভারতীয় নয়। জাতীয় আদর্শের সহিত চিরবিচ্ছেদ বা জাতীয়তার সহিত সম্পূর্ণ অপরিচয় কোনও শিক্ষারই উদ্দিষ্ট নয়। কিন্তু আমাদের দেশের শিক্ষা—'সার্ব্বভৌমিক' ও 'বিশ্বজনীন' শিক্ষাও নাগপাশে বাঁধা! তাহারও স্বাধীন ও স্বাভাবিক বিকাশের অবকাশ নাই। প্রমথবাবু আলোচ্য প্রবন্ধে বোধ হয় আলোচনার সূচনা করিয়াছেন। আশা করি, ভবিষ্যতে মূলের বিচারে অগ্রসর হইবেন। এই সংখ্যায় 'শিক্ষার লক্ষ্য' ও 'লোকশিক্ষা' নামক আরও দুইটী প্রবন্ধ ছাপা হইয়াছে। 'লোক-শিক্ষা'য় কাজের কথা আছে। বীরবলের 'রূপের কথা' উল্লেখযোগ্য।

সৌরভ।—ফাল্গুন। সূচীপত্রে 'তিব্বত-অভিযান' আছে, কিন্তু সৌরভে নাই। 'পুষ্পবনে পুষ্প আছে, নাহি অন্তরে' নয়; এ ক্ষেত্রে, দ্বিজেন্দ্রনাথের ভাষায় 'ঠিক তাহার উল্টা'। 'যার হাতে খাইনি, সে বড় রাঁধুনী।' সুতরাং শ্রীঅতুলবিহারী গুপ্তকে সুলেখক বলিতে পারি! শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের 'কবি সদাশিব মজুমদার' উল্লেখযোগ্য। 'কোম্পানীর আমলের শিক্ষার অবস্থা ও ব্যবস্থা'য় বিশেষ কোনও তথ্য নাই। শ্রীকালীশঙ্কর দত্তের 'ব্রহ্মদেশে দিন কয়েক প্রবাস' নিতান্তই যৎকিঞ্চিৎ। শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরীর 'লুকোচুরী' নামক পদ্যটি পড়িয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি। প্রথমে—'কেন যে এসেছিলে নাহি তা জানা।' কবুলজবাবে অবশ্য কাহারও আপত্তি হইতে পারে না। তাহার পর,—

'কেন যে ভোর বেলা
দুয়ারে দিলে ঠেলা
পাখীরা না মেলিতে আকাশে ডানা—

কিছুই খানি নাক;
কেমনে কোথা থাকো—' ইত্যাদি।

এত বড় 'ঠেলা' খাইয়াও যে কবিতা বাঁচিয়া যায়, তাহার পরমায়ু নিশ্চয়ই নিকষার মত। 'পাখীয়া না মেলিতে আকাশে ডানা'ও অতুলনীয়। 'খানি' কি 'জানি'র ইচ্ছাকৃত রূপান্তর, না ছাপার ভুল? 'নাক' ও 'থাকো'র মিল 'বা পত্র বা মিলে বাঁকে হারাইয়াছে! শেষ, মধুরেণ সমাপয়েৎ!—'দুখানি জলকণা দোদুল দুল!' শ্রীবিজয়াকান্ত লাহিড়ী চৌধুরীর 'সাগর-পথে' মাঝি উজান বেয়ে চলিয়াছে। কবি পাল উড়াইয়া ও হাল ঘুরাইয়া দিবার হুকুম দিয়াই তৃপ্ত হন নাই। তাঁহার শেষ হুকুম,—

'আর যদি রে সাগরতীরে,
যায় ত, তরী ডুবিয়ে দেরে—'

একবারে কবিতার ভরা-ডুবী! 'খেয়া'র শ্রাদ্ধ বটে! 'আক্কেল' কি দেশ হইতে একবারে অন্তর্হিত হইল?

নূতন পুস্তক—দেশ-কাহিনী !

বীরভূম-বিবরণ।

প্রথম খণ্ড

(সচিত্র)

মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী

সম্পাদিত।

শ্রীজয়দেব গোস্বামী, কবি জগদানন্দ, ইছাই ঘোষ, মহারাজ নন্দকুমার প্রভৃতি সাধক, ভক্ত, কবি ও কর্ম্মবীরের অপূর্ব্ব চরিতের একত্র সমাবেশ ! মহাপীঠ বক্রেশ্বর প্রভৃতির পবিত্র কাহিনী !

শ্রীমূর্ত্তি ও মন্দিরাদির বহু চিত্র সহ।

সর্ব্বত্র প্রশংসিত। মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ;

অথবা,

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

হেতমপুর রাজবাটী, বীরভূম।

Reg. No. C. 589.